কুমার-বিমলের

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অখন্ড সংস্করণ

সূচীপত্র

যখের ধন
আবার যখের ধণ
মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন
ময়নামতির মায়াকানন
আমাবস্যার রাত
জেরিনার কণ্ঠহার
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন
অমৃত দ্বীপ
সোনার পাহাড়ের যাত্রী
নীল সায়রের অচিনপুরে
সুন্দরবনের রক্তপাগল
কুমারের বাঘা গোয়েন্দা
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর
সূর্যনগরীর গুপ্তধন
প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ

সূচীপত্র

যক্ষপতির রত্নপুরী
কুবের পুরীর রহস্য
সুলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ
অসম্ভবের দেশে
কুমার বিমলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
অদৃশ্যের কীর্তি
পিশাচ
ডালিয়ার অপমৃত্যু
অগাধ জলের রুই কাতলা
বাবা মুস্তাফার দাড়ি
বনের ভেতরে নতুন ভয়
গুহাবাসী বিভীষণ

মান্ধাতার মুল্লুকে

যকের
ধন

এক

মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোটো বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও দামি জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরানো পকেট-বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কি, কি হল মা?'

মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'কুমার, শিগগির ওটা ফেলে দে।'

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপর পড়ে রয়েছে! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা! ঠাকুরদা কি বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?'

মা বললেন, 'ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল!'

মড়ার মাথার খুলিটা জানলা গলিয়ে আমি বাড়ির পাশে একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট-বুকখানা ঘরের একটা তাকের উপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে পুরে রাখলেন।....

দিন-কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর একটুকুও বনিবনা ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনও আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার মাথার ওপরে এখন আর কোনও অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেছি।'

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম তাঁকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'যদি কখনও দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।'

করালীবাবু বসে বসে এ-কথা সে-কথা কইতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললুম, 'ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে!'

করালীবাবু বললেন, 'কি জিনিস?'

আমি বললুম, 'একটা চন্দনকাঠের বাক্সের ভেতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি—'

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মড়ার মাথার খুলি?'

—'হ্যাঁ, আর একখানা পকেট-বই।'

মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ জঞ্জালের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে!

—'সে বাক্সটা এখন কোথায়?'

—'লোহার সিন্দুকেই আছে।'

করালীবাবু তখনই সেকথা চাপা দিয়ে অন্য কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চিৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু-চারবার ধমক দিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠল—সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল।

তারপরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন দুড়-দুড় করে ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। চারিদিকে খোঁজ করলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারই ভ্রম। বাঘার গলার শিকল খুলে দিয়ে, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম!....

সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই শুনি মা ভারি চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছেন। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি মা?'

মা বললেন, 'ওরে কাল রাত্তিরে বাড়িতে চোর এসেছিল।'

তাহলে কাল রাত্রে যা শুনেছিলুম তা ভুল নয়।

মা বললেন, 'দেখবি আয়, বড়ো ঘরে লোহার সিন্দুক খুলে রেখে গেছে।'

ঘরে গিয়ে দেখি সত্যিই তাই! কিন্তু চোর বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি—কেবল সেই চন্দনকাঠের বাক্সটা ছাড়া।

কিন্তু মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল! সিন্দুকে এত জিনিস থাকতে চোর খালি সেই বাক্সটা নিয়ে গেল কেন? আরও মনে পড়ল, কাল সকালে এই বাক্সের কথা শুনেই করালীবাবু কিরকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে কি এই বাক্সের মধ্যে কোনও রহস্য আছে? সম্ভব। নইলে, একটা মড়ার মাথার খুলি কে আর এত যত্ন করে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দেয়?

মাকে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটলুম। বাড়ির পাশের খানাটার মুখে গিয়ে দেখলুম, মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ জঞ্জালের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে! সেটাকে আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম। খুলির একপিঠে গাঢ় কালো রং মাখানো ছিল—কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে! আর যেখানেই রং নেই, সেইখানেই আঁকের মতন কি কতকগুলো খোদা রয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খুলিটাকে লুকিয়ে আবার বাড়িতে আনলুম। সাবান-জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই কালো রং উঠে গেল। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, খুলির একপিঠের সবটায় কে অনেকগুলো অঙ্ক খুদে রেখেছে। অঙ্কগুলো এই রকম ঃ

৩৬ (২)
১৭ (২)
---
(৯) ৩০
৫
(৯) ৪০
৩৯
---
(৩) ৩৩
১৯
(৯) ৩২

৪৪
৩৯
৪০
১৫ (২)
১৯

৩৭
৫
৪০
(৯) ৩০
৪২
---
(৯) ২৯
(৯) ১৩

৩৩
৫
৩৫
(৩) ৩০
(৯) ১৩

৩০
৪২
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
---
২৯ (২)
৩৭
(৯) ৩৫
---
২৫ (২)
৩
(৯) ৩২

২
২৩
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

৩৫
৫
৩০
৩১
(৯) ৩০
৩৫
---
৩৫ (২)
(৯) ৩৭

১৯
৪৮
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
---
(৩) ২৮
৩২
১৪ (২)
৩২ (২)
---
৩৩ (২)
২৯
৩৯
---
২৮ (২)
৩৯

২৮
৪০ (২)
৪৮
---
৪৪ (২)
২৮
৪৫ (২)
২৮

২০
(৩) ৩৭

৫২
১৪
৫
৪৬
(৯) ৪০

৩৩
২৯
---
৩৩ (২)
(৯) ৩৫

দুই

যকের ধন

এই অদ্ভুত অঙ্কগুলোর মানে কি? অনেক ভাবলুম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ের কথা। সেখানাও তো এই খুলির সঙ্গে ছিল, তার মধ্যে এই রহস্যের কোনও সদুত্তর নেই কি?

তখনই উপরে গিয়ে তাক থেকে পকেট-বইখানা পাড়লুম। খুলে দেখি, তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভরতি। গোড়ার দিকের প্রায় ষোল-সতেরো পাতা পড়লুম, কিন্তু সেসব বাজে কথা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম:

'১৯২০ সাল, আশ্বিন মাস।—আসাম থেকে ফেরবার মুখে একদিন আমরা এক বনের ভিতর দিয়ে আসছি। সন্ধ্যা হয়-হয়—আমরা এক উঁচু পাহাড়ে-জমি থেকে নামছি। হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত-বড়ো বাঘ! সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে যেন কার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে তাক করছে!—আরও একটু তফাতে দেখলুম, একজন সন্ন্যাসী পথের পাশে, গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাঘটার লক্ষ্য তাঁর দিকেই!

আমি তখনই চিৎকার করে উঠলুম। আমার সঙ্গের কুলিরাও সে চিৎকারে যোগ দিল। সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল, বাঘটাও চমকে ফিরে আমাদের দেখে একলাফে অদৃশ্য হল।

সন্ন্যাসী জেগে উঠেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিলেন। আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, 'বাবা, তোমার জন্যে আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম!'

আমি বললুম, 'ঠাকুর, বনের ভেতরে এমনি করে কি ঘুমোতে আছে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'বনই যে আমাদের ঘরবাড়ি বাবা!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখনই আপনার প্রাণ যেত!'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কই বাবা, গেল না তো। ভগবান ঠিক সময়েই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

শুনলুম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সন্ন্যাসীও সেই দিকে যাবেন। তাই সন্ন্যাসীকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে চললুম।

সন্ন্যাসী দুদিন আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে ত্রুটি করলুম না। তিন দিনের দিন বিদায় নেবার আগে তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো বাবা, তোমার সেবায় আমি বড়ো তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রাণরক্ষাও করেছ। যাবার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।'

আমি বললুম, 'কিসের সন্ধান?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'যকের ধনের।'

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললুম, 'যকের ধন! সে কোথায় আছে ঠাকুর?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'খাসিয়া পাহাড়ে।'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'কোনখানে আছে আমি তা জানব কেমন করে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি। খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?'

আমি বললুম, 'শুনেছি। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার ভেতর দিয়ে চীনদেশে যাওয়া যায়, আর অনেককাল আগে এক চীনসম্রাট এই গুহাপথে নাকি সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হ্যাঁ। এই রূপনাথের গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে, উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে পাবে। সে মন্দির এখন ভেঙে পড়েছে, কিছুদিন পরে তার কোনও চিহ্নও হয়তো আর পাওয়া যাবে না। একসময়ে এখানে মস্ত এক মঠ ছিল, তাতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেকালের এক রাজা বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার আগে এই মঠে নিজের সমস্ত ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হয়। পাছে নিজের ধনরত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, এই ভয়ে রাজা সে সমস্ত এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেই ধনরত্ন এখনও সেইখানেই আছে'—তারপর সন্ন্যাসী আমাকে বৌদ্ধমঠে যাবার পথের কথা ভালো করে বলে দিলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু এতদিন আর কেউ যদি সেই ধনরত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কেউ পায়নি। সে বড়ো দুর্গম দেশ, সেখানে যে বৌদ্ধমঠ আছে, তা কেউ জানে না, আর কোনও মানুষও সেখানে যায় না। মঠে গেলেও, সারা জীবন ধরে ধনরত্ন খুঁজলেও কেউ পাবে না। কিন্তু তোমাকে সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে না; ধনরত্ন ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে, তা জানবার উপায় কেবল আমার কাছে আছে।' এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে একটি মড়ার মাথার খুলি বার করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'ওতে কি হবে ঠাকুর?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'যে যক ধনরত্নের পাহারায় আছে, এ তারই খুলি। এই খুলিতে আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, এ খুলি যার কাছে থাকবে যক তাকে আর কিছুই বলবে না। খুলিতে এই যে অঙ্কের মত রেখা রয়েছে, এ হচ্ছে সাঙ্কেতিক ভাষা। এই সঙ্কেত বুঝবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলেই তুমি জানতে পারবে কোনখানে ধনরত্ন আছে'—এই বলে সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্কেত বুঝবার গুপ্ত উপায় বলে দিলেন।

তারপর এক বৎসর ধরে অনেক ভাবলুম। কিন্তু একলাটি সেই দুর্গম দেশে যেতে ভরসা হল না। শেষটা আমার প্রতিবেশী করালীকে বিশ্বাস করে সব কথা জানিয়ে বললুম, 'করালী, তোমার জোয়ান বয়স, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমাকেও ধনরত্নের অংশ দেব।'

কিন্তু করালী যে বেইমান, আমি তা জানতুম না। সে ফাঁকি দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটা আমার কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টায় রইল। দু-একবার লোক লাগিয়ে চুরি করবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। ভাগ্যে আমি তাকে যকের ধনের ঠিকানাটা বলে দিইনি।

কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ে যাবার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এই বুড়োবয়সে টাকার লোভে

একলা সেই অজানা দেশে গিয়ে শেষটা কি বাঘ-ভাল্লুক-ডাকাতের পাল্লায় প্রাণ খোয়াব? অন্য কারুকেও সঙ্গে নিতে ভরসা হয় না,—কে জানে, টাকার লোভে বন্ধুই আমাকে খুন করবে কি না।

তবে, এই পকেট-বইয়ে আমি সব কথা লিখে রাখলুম। ভবিষ্যতে এই লেখা হয়তো আমার বংশের কারুর উপকারে আসতে পারে। কিন্তু আমার বংশের কেউ যদি সত্যিই সেই বৌদ্ধমঠে যাত্রা করে, তবে যাবার আগে যেন বিপদের কথাটাও ভালো করে ভেবে দেখে। এ কাজে পদে পদে প্রাণের ভয়।'

পকেট-বইখানা হাতে করে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম।

তিন

সঙ্কেতের অর্থ

উঃ! করালীবাবু কি ভয়ানক লোক! ঠাকুরদাদার সঙ্গে সে চালাকি করতে গিয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। তারপর এতদিনেও আশা ছাড়েনি। আমি বেশ বুঝলুম, এই মড়ার মাথাটা কোথায় আছে তা জানবার জন্যেই করালী কাল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। রাত্রে এইটে চুরি করবার ফিকিরেই যে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল, তাতেও আর কোনও সন্দেহ নেই। ভাগ্যে মড়ার মাথাটা আমি বাড়ির পাশের খানায় ফেলে দিয়েছিলুম!

এখন কি করা উচিত? গুপ্তধনের চাবি তো এই খুলির মধ্যেই আছে, কিন্তু অনেকবার উল্টেপাল্টে দেখেও আমি সেই অঙ্কগুলোর ল্যাজা-মুড়ো কিছুই বুঝতে পারলুম না। পকেট-বইখানার প্রত্যেক পাতা উল্টে দেখলুম, তাতেও ঠাকুরদাদা এই সঙ্কেত বুঝবার কোনও উপায় লিখে রাখেননি। ঠাকুরদাদার উপরে ভারি রাগ হল। আসল ব্যাপারটিই জানবার উপায় নেই!

তারপর ভেবে দেখলুম, জেনেই বা কি আর এমন হাতি-ঘোড়া লাভ হত! আমার বয়স সতেরো বৎসর। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি। জীবনে কখনও কলকাতার বাইরে যাইনি। কোথায় কোন কোণে আসাম আর খাসিয়া পাহাড়, আবার তার ভিতরে কোথায় আছে 'রূপনাথের গুহা'—এসব খুঁজে বার করাই তো আমার পক্ষে অসম্ভব! তার উপরে সেই গভীর জঙ্গল, যেখানে দিনরাত বাঘ-ভাল্লুক-হাতিরা হানা দিচ্ছে! সেকেলে এক বৌদ্ধমঠ, তার ভিতরে যকের ধন—সেও এক ভুতুড়ে কাণ্ড! শেষটা কি একলা সেখানে গিয়ে আলিবাবার ভাই কাসিমের মতন টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াব? এসব ভেবেও বুকটা ধুকপুক করে উঠল!

হঠাৎ মনে হল বিমলের কথা। বিমল আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার চেয়ে সে বয়সে বছর তিনেকের বড়ো, এ বৎসর বি-এ দেবে। বিমলের মতো চালাক ছেলে আমি আর দুটি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতন জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে—দুশো ডন, তিনশো বৈঠক দেয়। তার উপরে এই বয়সেই সে অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছে—এই গেল বছরেই তো আসামে বেড়াতে গিয়েছিল। তার কাছে আমি কোনও কথা লুকোতুম না। ঠিক করলুম, যাওয়া হোক আর নাই হোক একবার বিমলকে এই মড়ার মাথাটা দেখিয়ে আসা যাক।

বৈকালে বিমলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম—তখন সে বসে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিল! আমাকে দেখে বললে, 'কিহে, কুমার যে? কি মনে করে?'

আমি বললুম, 'একটা ধাঁধা নিয়ে ভারি গোলমালে পড়েছি ভাই!'

বিমল বললে, 'কি ধাঁধা?'

আমি মড়ার মাথার খুলিটা বার করে বললুম, 'এই দেখো!'

বিমল অবাক হয়ে খুলিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'এ আবার কি?'

আমি পকেট-বইখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আমার ঠাকুরদার পকেট-বই! পড়লেই সব বুঝতে পারবে।'

বিমল বললে, 'আচ্ছা রোসো, আগে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা সাফ করে নিই।' কাল পাখি-শিকারে গিয়েছিলুম। বন্দুকে ভারি ময়লা জমেছে।'

বন্দুক সাফ করে, হাত ধুয়ে বিমল বললে, 'ব্যাপার কি বলো দেখি কুমার? তুমি কি কোনও তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ? তোমার হাতে মড়ার মাথা কেন?'

আমি বললুম, 'আগে পকেট-বইখানা পড়েই দেখো না!'—

'বেশ' বলে বিমল পকেট-বইখানা নিয়ে পড়তে লাগল। খানিক পরেই দেখলুম, বিমলের মুখ বিস্ময়ে আর কৌতূহলে ভরে উঠছে!

পড়া শেষ করেই বিমল তাড়াতাড়ি মড়ার মাথাটা তুলে নিয়ে সেটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ভারি আশ্চর্য তো!'

আমি বললুম, 'অঙ্কগুলো কিছু বুঝতে পারলে?'

বিমল বললে, 'উঁহু!'

—'আমিও পারিনি।'

—'কিন্তু আমি এত সহজে ছাড়ব না। তুমি এখন বাড়ি যাও, কুমার! খুলিটা আমার কাছেই থাক। আমি এটার রহস্য জানবই জানব। তুমি কাল সকালে এসো।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সাবধান!'

বিমল বললে, 'কেন?'

আমি বললুম, 'করালী মুখুয্যে এই খুলিটা চুরি করবার জন্যে কাল আবার হয়তো তোমাদের বাড়িতে মাথা গলাবে।'

—'আমি এত সহজে ঠকবার ছেলে নই হে!'

—'তা আমি জানি। তবু সাবধানের মার নেই।' এই বলে আমি চলে এলুম।

পরের দিন ভোর না-হতেই বিমলের কাছে ছুটলুম। তার বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। একেবারে তার পড়বার ঘরে গিয়ে দেখি, বিমল টেবিলের উপর হেঁট হয়ে একমনে কি লিখছে, আর সামনেই মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে তাড়াতাড়ি সে খুলিটাকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে গেল—তারপর আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললে, 'ওঃ, তুমি! আমি ভেবেছিলুম অন্য কেউ!'

—'কাল তো অত সাহস দেখালে, আজ এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

—'কাল? কাল সবটা ভালো করে তলিয়ে বুঝিনি। আজ বুঝেছি, আমাদের এখন সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে—কাক-পক্ষী যেন টের না পায়!'

—'অঙ্কগুলো দেখে কি বুঝলে?'

—'যা বোঝা উচিত, সব বুঝেছি।'

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, 'সব বুঝতে পেরেছ! সত্যি?'

বিমল বললে, 'চুপ চেঁচিয়ো না! কে কোথায় শুনতে পাবে বলা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে ওইখানে বোসো।'

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললুম, 'খুলিতে কি লেখা আছে, আমাকে বলো।'

বিমল আস্তে আস্তে বললে, 'প্রথমটা আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা করে যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে একখানা ইংরেজি বই পড়েছিলুম। তাতে নানারকম সাঙ্কেতিক লিপির গুপ্ত রহস্য বোঝানো ছিল। তাতেই পড়েছিলুম যে ইউরোপের চোর-ডাকাতরা প্রায়ই একরকম সঙ্কেত ব্যবহার করে। তারা Alphabet অর্থাৎ বর্ণমালাকে যথাক্রমে সংখ্যা অর্থাৎ ১, ২, ৩ হিসাবে ধরে। অর্থাৎ one হবে A, two হবে B, three হবে C ইত্যাদি। আমি ভাবলুম হয়তো এই খুলিটাতেও সেই নিয়মে সঙ্কেত সাজানো হয়েছে। তারপর দেখলুম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তখন এই সঙ্কেতগুলো খুব সহজেই পড়ে ফেললুম।'

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলুম, 'পড়ে কি বুঝলে বলো।'

বিমল আমার হাতে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে, 'খুলির সঙ্কেতগুলো ছাব্বিশটা ঘরে ভাগ করা। আমিও লেখাগুলো সেই ভাবেই সাজিয়েছি।'

কাগজের উপরে এই কথাগুলো লেখা ছিল ঃ

'ভাঙা	দেউলের	পিছনে	সরলগাছ	মুলদেশ	থেকে
পূবদিকে	দশগজ	এগিয়ে	থামবে	ডাইনে	আটগজ
এগিয়ে	বুদ্ধদেব	বামে	ছয়গজ	এগিয়ে	তিনখানা
পাথর	তার	তলায়	সাতহাত	জমি	খুঁড়লে

পথ পাবে'

আমি চিঠিখানা পড়ে মনে মনে বিমলের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'সাঙ্কেতিক লিপিটা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দি, শোনো। আমাদের বাংলা ভাষায় 'আ' থেকে শুরু করে '' ' পর্যন্ত বাহান্নটি বর্ণ। সেই বর্ণগুলিকে ১, ২, ৩ হিসাবে যথাক্রমে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ১ হচ্ছে অ, ২ হচ্ছে আ, ১৩ হচ্ছে ক, ৫২ হচ্ছে ঁ প্রভৃতি।

যেখানে 'অ'-কার বা 'এ'-কার প্রভৃতি আছে, সেখানে বর্ণের যে পাশে দরকার, সেই পাশে ব্র্যাকেটের ভেতর সংখ্যা লেখা হয়েছে। উদাহরণ দেখ ঃ—'ভ' বর্ণের সংখ্যা ৩৬, আর 'অ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ২। অতএব, ৩৬(২) সঙ্কেতে বুঝতে হবে 'ভা'। 'দ' বর্ণের সংখ্যা ৩০,

'এ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৯। অতএব 'দে' বোঝাতে লিখতে হবে (৯)৩০। 'উ'-কার বর্ণের তলায় বসে! সুতরাং $\frac{৩৫}{৫}$ থাকলে বুঝতে হবে 'বু', 'উ'র মতো 'ঊ'-কারের সংখ্যাও হচ্ছে ৫। চন্দ্রবিন্দুর সংখ্যা বাহান্ন, চন্দ্রবিন্দু উপরে বসে, কাজেই 'খুঁ'র সঙ্কেত $\frac{৫২}{১৪}$। যুক্ত-অক্ষরকে আলাদা করে ধরা হয়েছে, যেমন—'বুদ্ধদেব'। যিনি এই সংখ্যাগুলি লিখেছেন, তাঁর বানান-জ্ঞান ততটা টনটনে নয়। কেননা 'মূল' ও 'পুব' তাঁর হাতে পড়ে হয়েছে—'মুল' ও 'পূব'। ঊ-র মতো ঊ-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৬। কিন্তু তিনি উ-কারের সংখ্যা ঊ-কারের ৬-এর স্থানে বসিয়েছেন—বর্ণের তলাকার ব্র্যাকেটে।'

আমি মড়ার মাথার খুলিটা আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম—কিন্তু দৈবগতিকে হঠাৎ সেখানা ফসকে মার্বেল বাঁধানো মেঝের উপরে সশব্দে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা উঠিয়ে নিয়ে, তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে আমি বলে উঠলুম, 'ঐঃ যাঃ! খুলিটার খানিকটা চটে গিয়েছে!'

বিমল বললে, 'কোনখানটা?'

আমি বললুম, 'গোড়ার চারটে ঘর—ভাঙা দেউলের পিছনে সরলগাছ—পর্যন্ত!'

বিমল বললে, 'এই কাণ্ডটি যদি আগে ঘটত, তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যেত। যাক, তোমার কোনও ভয় নেই,—সঙ্কেতগুলো আমি কাগজে টুকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে, অঙ্কগুলো রেখে কথাগুলো এখনই নষ্ট করে ফেলাই উচিত,'—এই বলে সে সঙ্কেতের অর্থ-লেখা কাগজখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

যখন দরকার হবে, পাঁচ মিনিটের চেষ্টাতেই সঙ্কেতের অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারব,—কিন্তু বাইরের কোনও লোক খুলির সঙ্কেত দেখে কিছুই ধরতে পারবে না।

চার

সর্বনাশ

আমি বললুম, 'বিমল, সঙ্কেতের মানে তো বোঝা গেল, এখন আমরা কি করব?'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'এতে আর কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই কুমার,—আমাদের যেতেই হবে! এতবড়ো একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এর শেষ পর্যন্ত না দেখলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'আমাদের সঙ্গে কে কে যাবে?'

—'কেউ না। খালি তুমি আর আমি।'

—'কিন্তু সে বড়ো দুর্গম জায়গা। লোকজন না নিয়ে কি যাওয়া উচিত?'

বিমল বললে, 'কিছুই দুর্গম নয়, পথঘাট আমি সব চিনি, 'রূপনাথের গুহা' পর্যন্ত ঠিক যাব। তারপরের পথ কিরকম জানি না বটে, কিন্তু চিনে নিতে বেশি দেরি লাগবে না। তুমি বুঝি বিপদের ভয় করছ? ও-ভয় কোরো না। বিপদকে ভয় করলে মানুষ আজ এত বড়ো হতে পারত না। সোজা পথ দিয়ে তো শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরি কি? বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় হাসিমুখে যে সফল হয়, পৃথিবীতে তাকেই বলি মানুষের মতো মানুষ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণ দিলে মানুষের মর্যাদা কি বাড়বে? আমি অবশ্য কাপুরুষ নই—তুমি যেখানে বলো যেতে রাজি আছি! তবে অন্ধের মতো কিছু করা ঠিক নয়—জানো তো, প্রবাদেই আছে—'লাফ মারবার আগে চেয়ে দেখ'।'

বিমল বললে, 'যা ভাববার আমি সব ভেবে দেখেছি, এখন আর ভাবনা নয়!'

—'কবে যাবে?'

'কিরে বাঘা, আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যাবি?'

—'আমি তো প্রস্তুত! কাল বলো কাল, পরশু বলো পরশু!'

—'এত তাড়াতাড়ি! যাবার আগে বন্দোবস্ত করতে হবে তো!'

—'বন্দোবস্ত করব আর ছাই! আমরা তো সেখানে ঘর-সংসার পাততে যাচ্ছি না—এসব কাজে যতটা ঝাড়া-হাত-পায়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো। গোটা-দুই ব্যাগ, আর আমরা দুটি প্রাণী—ব্যাস!'

—'কোন পথে যাবে?'

বিমল বললে, 'আমাদের কামরূপ পার হয়ে এই খাসিয়া পাহাড়ে উঠতে হবে। খাসিয়া পাহাড়ের ঠিক পাশেই যমজ ভাইয়ের মতো আর একটি পাহাড় আছে—তার নাম জয়ন্তী। এদের উপরে আছে—কামরূপ আর নবগ্রাম। পূর্বে আছে উত্তর কাছাড়, নাগা পর্বত আর কপিলী নদী। দক্ষিণে আছে শ্রীহট্ট, আর পশ্চিমে গারো পাহাড়।'

—'খাসিয়া পাহাড় কি খুব উঁচু?'

—'হুঁ, উঁচু বইকি! কোথাও চার হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার, আবার কোথাও বা সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের ভেতর অনেক জলপ্রপাত আছে—তাদের মধ্যে চেরাপুঞ্জি নামে জায়গার কাছে 'মুসমাই' আর শিলং শহরের কাছে 'বীডনস' প্রপাত দুটিই বড়ো। প্রথমটির উচ্চতা এক হাজার আটশো ফুট, দ্বিতীয়টি ছয়শো ফুট। উচ্চতায় প্রথম প্রপাতটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। পাহাড়ের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণও আছে—তার জল গরম। খাসিয়া পাহাড়ে শীত আর বর্ষা ছাড়া আর কোন ঋতুর প্রভাব বোঝা যায় না—বৃষ্টি ঝড় তো লেগেই আছে। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত একটু বসন্তের আমেজ পাওয়া যায়। খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জি তো বৃষ্টির জন্যে বিখ্যাত।'

বিমল হেসে বললে, 'খালি বাঘ ভাল্লুক কেন, সেখানকার জঙ্গলে হাতি, গণ্ডার, বুনো মোষ আর বরাহ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু সাপ খুব কম।'

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'তবেই তো।'

বিমল আমার পিঠে চাপড়ে বললে, 'কুমার, তুমি কলকাতার বাইরে কখনও যাওনি বলে বন-জঙ্গলকে যতটা ভয়ানক মনে করছ, আসলে তা তত ভয়ানক নয়। আর আমি সঙ্গে থাকব—তোমার ভয় কি? জানো তো, আমি এই বয়সেই ঢের বড়ো জন্তু শিকার করেছি। আমার দুটো বন্দুকের পাশ আছে—একটা তোমাকে দেব। তুমি আজও কিছু শিকার করনি বটে, কিন্তু আমি তো তোমাকে অনেকদিন আগেই বন্দুক ছুড়তে শিখিয়ে দিয়েছি—এইবার শিক্ষার পরীক্ষা হবে।'

সেদিন আর কিছু না বলে বাড়িমুখো হলুম। মনে ভয় হচ্ছিল বটে, আনন্দও হচ্ছিল খুব। নতুন নতুন দেশ দেখবার সাধ আমার চিরকাল। কেতাবে নানা দেশের ছবি দেখে আর গল্প পড়ে সেসব দেশে যাবার জন্যে আমার মন যেন উড়ু উড়ু করত। কখনও ইচ্ছে হত রবিনসন ক্রুশোর মতন এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে, নিজের হাতে কুঁড়েঘর বেঁধে মনের সুখে দিনের পর দিন কাটাই, কখনও ইচ্ছে হতো সিন্দবাদ নাবিকের মতো রক পাখির সঙ্গে আকাশে উঠি, তিমি মাছের পিঠে রান্না চড়াই, আর দ্বীপবাসী বৃদ্ধকে আছাড় মেরে জব্দ করে দিই। কখনও ইচ্ছে হতো ডুবোজাহাজে সমুদ্রের ভেতরে যাই আর পাতালরাজের ধনভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে আসি। এমনি কত ইচ্ছাই যে আমার হতো তা আর বলা যায় না,—বললে তোমরা সবাই শুনে নিশ্চয়ই খুব ঠাট্টার হাসি হাসবে।

আসল কথা কি, যকের ধন পাওয়ার সঙ্গে নতুন দেশ দেখবার আনন্দ ক্রমেই আমাকে চাঙ্গা করে তুললে। মনে যা কিছু ভয়-ভাবনা ছিল, সেই আনন্দের ঢেউ লেগে সমস্তই যেন কোথায় ভেসে গেল।

বাড়ির কাছে আসতেই আমার আদরের কুকুর বাঘা আধহাত জিভ বার করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাকে আগ-বাড়িয়ে নিতে এল।

আমি বললুম, 'কি রে বাঘা, আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে যাবি?'

বাঘা যেন আমার কথা বুঝতে পারলে। পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দুপায়ে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে, তারপর আদর করে আমার মুখ চেটে দিতে এল। আমি তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে তাকে নামিয়ে দিলুম।

আমার এই বাঘা বিলাতি নয়, দেশি কুকুর। কিন্তু তাকে দেখলে সেকথা বোঝাবার জো নেই। ভালোরকম যত্ন করলে দেশি কুকুরও যে কেমন চমৎকার দেখতে হয়, বাঘাই তার প্রমাণ। তার আকার মস্ত বড়ো, গায়ের রং হলদে, তার উপর কালো কালো ছিট, অনেকটা চিতাবাঘের মতো, তাই তার নাম রেখেছি বাঘা। ভয় কাকে বলে বাঘা তা জানে না, আর তার গায়েও বিষম জোর। একবার হাউন্ড জাতের প্রকাণ্ড একটা বিলাতি কুকুর তাকে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু বাঘার এক কামড় খেয়েই সে একেবারে মরোমরো হয়ে পড়েছিল। আমি ঠিক করলুম, বাঘাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

পরের দিন সকালে তখনও আমার ঘুম ভাঙেনি, হঠাৎ কে এসে ডাকাডাকি করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি বিমল আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে বললুম, 'কিহে, সক্কালবেলায় হঠাৎ তুমি যে?'

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'সর্বনাশ হয়েছে! সে আবার কি?'

বিমল বললে, 'কাল রাত্রে মড়ার মাথাটা আমার বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে!'

—'অ্যাঁঃ, বলো কি?'—আমি একেবারে হতভম্বের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম!

পাঁচ

পরামর্শ

আমি বললুম, 'মড়ার মাথা কি করে চুরি গেল, বিমল!'

বিমল বললে, 'জানি না। সকালে উঠে দেখলুম, আমার পড়বার ঘরের দরজাটা খোলা, রাত্রে তালা-চাবি ভেঙে কেউ ঘরের ভিতর ঢুকেছে! বুকটা অমনি ধড়াস করে উঠল! মড়ার মাথাটা আমি টেবিলের টানার ভেতরে চাবি বন্ধ করে রেখেছিলুম। ছুটে গিয়ে দেখি, টানাটাও খোলা রয়েছে, আর তার ভেতরে মড়ার মাথা নেই।'

আমি বলে উঠলুম, 'এ নিশ্চয়ই করালী মুখুয্যের কীর্তি। সেই-ই লোক পাঠিয়ে মড়ার মাথা চুরি করেছে। কিন্তু এই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, করালী কি করে জানলে যে মড়ার মাথাটা তোমার বাড়িতে আছে?'

বিমল বললে, 'করালী নিশ্চয়ই চারিদিকে চর রেখেছে! আমরা কি করছি, না করছি, সব সে জানে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু খালি মড়ার মাথাটা নিয়ে সে কি করবে? সঙ্কেতের মানে তো সে জানে না!'

বিমল বললে, 'কুমার, শত্রুকে কখনও বোকা মনে কোরো না! আমরা যখন সঙ্কেত বুঝতে পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে করালীই বা তা বুঝতে পারবে না কেন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু সঙ্কেতের সবটাও যে আর মড়ার মাথার ওপরে নেই! মনে নেই, আমার হাত থেকে পড়ে কাল মড়ার মাথাটা চটে গিয়েছে!'

বিমল কি যেন ভাবতে ভাবতে বললে, 'তবু বিশ্বাস নেই!'

হঠাৎ আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, ঠাকুরদার পকেট-বইখানাও কি চুরি গেছে?'

বিমল বললে, 'না, এইটুকুই যা আশার কথা। পকেট-বইখানা কাল রাত্রে আমি আর একবার ভালো করে পড়বার জন্যে উপরে নিয়ে গিয়েছিলুম। ঘুমোবার আগে সেখানা আমার মাথার তলায় বালিশের নিচে রেখে শুয়েছিলুম—চোর তা নিয়ে যেতে পারেনি।'

আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, 'যাক, তবু রক্ষে ভাই! যকের ধনের ঠিকানা আছে সেই পকেট-বইয়ের মধ্যে। ঠিকানাটা না জানলে করালী সঙ্কেত জেনেও কিছু করতে পারবে না! কিন্তু খুব সাবধান বিমল! পকেট-বইখানা যেন আবার চুরি না যায়।'

বিমল বললে, 'সে বন্দোবস্ত আজকেই করব। পকেট-বইয়ের যেখানে যেখানে পথের কথা আর ঠিকানা আছে, সেসব জায়গা আমি কালি দিয়ে এমন করে কেটে দেব যে, কেউ তা আর পড়তে পারবে না!'

আমি বললুম, 'তাহলে আমরাও মুশকিলে পড়ব যে!'

বিমল হেসে বললে, 'কোনও ভয় নেই! ঠিকানা আর পথের বর্ণনা আর-একখানা আলাদা কাগজে নতুন একরকম সাঙ্কেতিক কথাতে আমি টুকে রাখব,—সে সঙ্কেত আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললুম, 'এখন আমরা কি করব?'

বিমল বললে, 'আগে মড়ার মাথাটা উদ্ধার করতে হবে!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি করে?'

বিমল বললে, 'যেমন করে তারা মড়ার মাথা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে!'

আমি বললুম, 'চোরের উপর বাটপাড়ি?'

বিমল বললে, 'তাছাড়া আর উপায় কি? আজ রাত্রেই আমি করালীর বাড়িতে যেমন করে পারি ঢুকব! আমার সঙ্গে থাকবে তুমি!'

আমি একটু ভেবড়ে গিয়ে বললুম, 'কিন্তু করালী যদি জানতে পারে, আমাদের চোর বলে ধরিয়ে দেব যে! সেই যে মড়ার মাথাটা চুরি করেছে, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই!'

বিমল মরিয়ার মতো বললে, 'কপালে যা আছে তা হবে! তবে এটা ঠিক, আমি বেঁচে থাকতে করালী আমাদের কারুকে ধরতে পারবে না।'

মনকে তবু বুঝ মানাতে না পেরে আমি বললুম, 'না ভাই, দরকার নেই। শেষটা কি পাড়ায় একটা কেলেঙ্কারি হবে?'

বিমল বেজায় চটে গিয়ে বললে, 'দূর ভীতু কোথাকার! এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে রূপনাথের গুহার যকের ধন আনতে? তার চেয়ে মায়ের কোলের আদুরে খোকাটি হয়ে বাড়িতে বসে থাকো—তোমার পকেট-বই এখনই আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি'—এই বলেই বিমল হন হন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলকে আবার ফিরিয়ে এনে বললুম, 'বিমল, তুমি ভুল বুঝছ—আমি একটুও ভয় পাইনি! আমি বলছিলুম কি—

'এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে রূপনাথের গুহায় যকের ধন আনতে?'

বিমল আমাকে বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি কি বলছ, আমি তা শুনতে চাই না। পষ্ট করে বলো, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি করালীর বাড়িতে যেতে রাজি আছ কি না?'

আমি জবাব দিলুম—'আছি।'

বিমল খুশি হয়ে আমার হাত দুটো আচ্ছা করে নেড়ে দিয়ে বললে, 'হুঁ, এই তো গুড বয়ের মতো কথা! যদি মানুষ হতে চাও, ডানপিটে হও।'

আমি হেসে বললুম, 'কিন্তু ডানপিটের মরণ যে গাছের আগায়!'

বিমল বললে, 'বিছানায় শুয়ে থাকলেও মানুষ তো যমকে কলা দেখাতে পারে না! মরতেই যখন হবে, তখন বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো মরাই ভালো। তোমরা যাদের ভালো

ছেলে বলো—সেই গোবর-গণেশ মিনমিনে ননীর পুতুলগুলোকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না! সায়েবের জুতো খেয়ে তাদেরই পিলে ফাটে, বিপদে পড়লে তারাই আর বাঁচে না, মরে বটে—তাও কাপুরুষের মতো! এরাই বাঙালির কলঙ্ক! জগতে যেসব জাতি আজ মাথা তুলে বড় হয়ে আছে—বিপদের ভেতর দিয়ে, মরণের কুছ-পরোয়া না রেখে তারা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে। বুঝলে কুমার? বিপদ দেখলে আমার আনন্দ হয়!'

ছয়

চোরের উপর বাটপাড়ি

সেদিন অমাবস্যা! চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। কেবল জোনাকিগুলো মাঝে মাঝে পিটপিট করে জ্বলছে—ঠিক যেন আঁধাররাক্ষসের রাশি রাশি আগুনচোখের মতন।

আমাদের বাড়ি কলকাতার প্রায় বাইরে, সেখানটা এখনও শহরের মতন ঘিঞ্জি হয়ে পড়েনি। বাড়িঘর খুব তফাতে তফাতে—গাছপালাই বেশি, বাসিন্দা খুব কম। অর্থাৎ আমরা নামেই কলকাতায় থাকি, এখানটাকে আসল কলকাতা বলা যায় না।

আমাদের বাড়ির পরে একটা মাঠ, সেই মাঠের একপাশের একটা কচুঝোপের ভিতর বিমল আর আমি সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছি। মাঠের ওপারে করালীর বাড়ি।

মশারা আমাদের সাড়া পেয়ে আজ ভারি খুশি হয়ে ক্রমাগত ব্যান্ড বাজাচ্ছে—বিনি পয়সায় ভোজের লোভে! সে-তল্লাটে যত মশা ছিল, ব্যান্ডের আওয়াজ শুনে সবাই সেখানে এসে হাজির হল এবং আমাদের সর্বাঙ্গে আদর করে শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই সাংঘাতিক আদর আর হজম করতে না পেরে আমি চুপি চুপি বিমলকে বললুম, 'ওহে, আর যে সহ্য হচ্ছে না।'

বিমল খালি বললে, 'চুপ!'

—'আর চুপ করে থাকা যে কত শক্ত, তা কি বুঝছ না?'

—'বুঝছি সব! আমি চুপ করে আছি কি করে?'

এ কথার উপরে আর কথা চলে না। অগত্যা চুপ করেই রইলুম।

ক্রমে মুখ-হাত-পা যখন ফুলে প্রায় ঢোল হয়ে উঠল, তখন নিশুত রাতের বুক কাঁপিয়ে গির্জে ঘড়িতে 'টং' করে একটা বাজল!

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এইবার সময় হয়েছে!'

আমি তৈরি হয়েই ছিলুম—একলাফে ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়ালুম!

বিমল বললে, 'আগে এই মুখোশটা পরে নাও!'

বিমল আজ দুপুরবেলায় রাধাবাজার থেকে দুটো দামি বিলাতি মুখোশ কিনে এনেছে। দুটোই কাফ্রির মুখ,—দেখতে এমন ভয়ানক যে, রাত্রে আচমকা দেখলে বুড়ো-মিনসেদেরও পেটের পিলে চমকে যাবে। মুখোশ পরার উদ্দেশ্য, কেউ আমাদের দেখলেও চিনতে পারবে না।

মুখোশ পরে দুজন আস্তে আস্তে করালীর বাড়ির দিকে এগুতে লাগলুম। তার বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বিমল চুপিচুপি বললে, 'মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে নাও।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এদিকে তো বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজা নেই।'

বিমল বললে, 'দরজা দিয়ে ঢুকবে কে? আমরা কি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি? এদিকে একটা বড়ো বটগাছ আছে, সেই গাছের ডাল করালীর বাড়ির দোতলার ছাদের ওপরে গিয়ে পড়েছে। আমরা ডাল বেয়ে বাড়ির ভেতরে যাব।' বিমল তার হাতের চোরা লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলে,—একটা আলোর রেখা ঠিক আমাদের বটগাছের উপর গিয়ে পড়ল।

বাড়িতে ঢুকবার এই উপায়ের কথা শুনে আমার মনটা অবশ্য খুশি হল না—কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে, বিমলের সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর উঠতে লাগলুম।

অনেকটা উঁচুতে উঠে বিমল বললে, 'এইবার খুব সাবধানে এসো। এই দেখো ডাল। এই ডাল বেয়ে গিয়ে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে হবে।'

আবছায়ার মতন ডালটা দেখতে পেলুম। বিমল আগে ডাল ধরে এগিয়ে গেল—একটা অস্পষ্ট শব্দে বুঝলুম, সে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল।

আমি দু ধারে দুপা রেখে আর দুহাতে প্রাণপণে ডালটা ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম—প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাই! সেখান থেকে পড়ে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

হঠাৎ বিমলের অস্পষ্ট গলা পেলুম—'ব্যাস! ডাল ধরে ঝুলে পড়ো।'

আমি ভয়ে ভয়ে ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম।

—'এইবার ডাল ছেড়ে দাও।'

ডাল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধুপ করে ছাদের উপরে গিয়ে পড়লুম।

বিমল আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'শাবাশ।'

আমি কিন্তু মনের মধ্যে কিছুমাত্র ভরসা পেলুম না। এসেছি চোরের মতো পরের বাড়িতে, ধরা পড়লেই হাতে পরতে হবে হাতকড়া! তারপর আর এক ভাবনা—পালাব কোন পথ দিয়ে? লাফিয়ে তো ছাদে নামলুম, কিন্তু লাফিয়ে তো আর ওই উঁচু ডালটা ফের ধরা যাবে না! বিমলকেও আমার ভাবনার কথা বললুম।

বিমল বললে, 'সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ বলেই আমাদের গাছে চড়তে হল। পালাবার সময় দরজা খুলেই পালাব।'

—'কিন্তু বাড়িতে দরোয়ান আছে যে!'

—'তার ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এখন চলো, দেখি নিচে নামবার সিঁড়ি কোন দিকে। পা টিপে টিপে এসো।'

ছাদের পশ্চিম কোণে সিঁড়ি পাওয়া গেল। বিমল আগে নামতে লাগল। আমি রইলুম পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই একটা ঘর। বিমল দরজার উপরে কান পেতে চুপি চুপি আমাকে বললে, 'এ ঘরে কে ঘুমোচ্ছে, তার নাক ডাকছে।'

চোরা-লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে আমরা দালানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একপাশে তিনটে ঘর—সব ঘরই ভেতর থেকে বন্ধ। বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। আমি তো একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। এত বড়ো বাড়ি, ভিতরকার খবর আমরা কিছুই জানি না, এতটুকু একটা মড়ার মাথা কোথায় লুকানো আছে, কি করে আমরা সে খোঁজ পাব? বিমলও যেমন পাগল! আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!

হঠাৎ বিমল বললে, 'ওধারকার দালানের একটা ঘরের দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। চলো ওইদিকে।'

বিমল আস্তে আস্তে সেইদিকে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা ঠেলতেই একটু খুলে গেল। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বিমল খানিকক্ষণ কি দেখলে, তারপর ফিরে আমার কানে কানে বললে 'দেখো!'

টেবিলের উপর মাথা রেখে করালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলুম, তাতে আনন্দে আমার বুকটা নেচে উঠল! টেবিলের উপর মাথা রেখে করালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর তার মাথার কাছেই পড়ে রয়েছে—আমরা যা চাচ্ছি তাই—সেই মড়ার মাথাটা! করালী নিশ্চয় সঙ্কেতগুলোর অর্থ

বুঝবার চেষ্টা করছিল—তারপর কখন হতাশ ও শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। করালী তাহলে সত্যিই চোর!

বিমল খুব সাবধানে দরজাটা আর একটু খুলে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। তারপর ঘুমন্ত করালীর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মড়ার মাথাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এত সহজে যে কেল্লা ফতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

এইবার পালাতে হবে। একবার বাইরে যেতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত—আর আমাদের পায় কে!

দুজনেই একতলায় গিয়ে নামলুম। উঠান পার হয়েই সদর দরজা। কিন্তু কি মুশকিল, বিমলের চোরা-লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একটা খুব লম্বা চওড়া জোয়ান দরোয়ান দরজা জুড়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে, দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে!

বিমল কিন্তু একটুও ইতস্তত করলে না, সে খুব আস্তে আস্তে দরোয়ানকে টপকে দরজার খিল খুলতে গেল। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল— একটু শব্দ হলেই সর্বনাশ!

কিন্তু বিমল কি বাহাদুর! সে এমন সাবধানে দরজা খুললে যে একটুও আওয়াজ হল না।

হঠাৎ আমার নাকের ভিতরে কি একটা পোকা ঢুকে গেল—সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচ্চো করে খুব জোরে আমি হেঁচে ফেললুম।

দরোয়ানের ঘুম গেল ভেঙে। বাজখাই গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল—'কোন হ্যায় রে!'—

লণ্ঠনটা তখন ছিল আমার হাতে। তার আলোতে দেখলুম, বিমল বিদ্যুতের মতন ফিরে দাঁড়াল, তারপর বাঘের মতন দরোয়ানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে তার গলা টিপে ধরল। খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করেই চোখ কপালে তুলে দরোয়ানজী একেবারে অজ্ঞান।

তারপর আর কি—দে ছুট তো দে ছুট! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াও তখন ছুটে আমাদের ধরতে পারত না—একদমে বাড়িতে এসে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সাত

জানলায় কালো মুখ

এক এক গেলাস জল খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে, দুজনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম। রাত তখন আড়াইটে।

বিমল বললে, 'আজ রাতে আর ঘুম নয়। কাল বৈকালের গাড়িতে আমরা আসাম যাব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি!'

বিমল বললে, 'হুঁ, তাড়াতাড়ি না করলে চলবে না। করালী রাসকেল আমাদের ওপরে চটে রইল—মড়ার মাথা যে আমরাই আবার তার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তা টের পেয়েছে! কখন কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে কে তা জানে? কালই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়তে হবে!'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'মা গেছেন শান্তিপুরে, মামার বাড়িতে। তাঁকে না জানিয়ে আমি কি করে যাব?'

বিমল বললে, 'তাঁকে চিঠি লিখে দাও—আমার সঙ্গে তুমি আসামে বেড়াতে যাচ্ছ, বড়ো তাড়াতাড়ি বলে যাবার আগে দেখা করতে পারলে না।'

আমি চিন্তিত মুখে বললুম, 'চিঠি যেন লিখে দিলুম, কিন্তু এত বড়ো একটা কাজে যাচ্ছি, অনেক বন্দোবস্ত করতে হবে যে! কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে উঠতে পারব কেন?'

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, 'তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, বন্দোবস্ত যা করবার তা আমিই করব অখন। তুমি খালি কাপড়-চোপড় আর গোটাকতক কোট-প্যান্ট নিয়ো—বুঝলে অকর্মার ধাড়ি?'

—'কেন? কোট-প্যান্ট আবার কি হবে?'

—'যেতে হবে পাহাড়ে আর জঙ্গলে। সেখানে ফুলবাবুর মতো কাছা-কোঁচা সামলাতে গেলে চলবে না—তাহলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'ভেবেছিলুম দুজনেই যাব। কিন্তু তুমি যেরকম নাবালক গোবেচারা দেখছি, সঙ্গে আর একজনকে নিলে ভালো হয়।'

—'কাকে নেবে?'

—'আমার চাকর রামহরিকে। সে আমাদের পুরানো লোক; বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান আর তার গায়েও খুব জোর। আমার জন্যে সে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।'

—'আচ্ছা, সে কথা মন্দ নয়। আমিও বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাতে তোমার আপত্তি—'

—'চুপ!' বলেই বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর ছুটে গিয়ে হঠাৎ ঘরের একটা জানলা দু-হাট করে খুলে দিলে। স্পষ্ট দেখলুম জানলার বাহির থেকে একখানা বিশ্রী কালো-কুচকুচে মুখ বিদ্যুতের মতন একপাশে সরে গেল। জানলায় কান পেতে নিশ্চয় কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল! বিমলও দাঁড়াল না—ঘরের কোণ থেকে একগাছা মাথা-সমান উঁচু মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে একছুটে বেরিয়ে গেল! আমি ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে আমাকে ডাকলে। আমি আবার দরজা খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি? লোকটাকে ধরতে পারলে?'

লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'নাঃ, পিছনে তাড়া করে অনেকদূর গিয়েছিলুম, কিন্তু ধরতে পারলুম না!'

—'লোকটা কে বলো দেখি?'

—'কে আবার—করালীর লোক, খুব সম্ভব ভাড়াটে গুণ্ডা। কুমার, ব্যাপার কিরকম গুরুতর তা বুঝছ কি? লোকটা আমাদের কথা হয়তো সব শুনেছে!'

—'বিমল, তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, আমরা কালকেই বেরিয়ে পড়ব।'

—'তা তো পড়ব, কিন্তু বিপদ হয়তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।'

—'তার মানে?'

—'করালী বোধহয় তার দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে!'

আমি একেবারে দমে গেলুম! বিমল বসে বসে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'যা থাকে কপালে। তা বলে করালীর ভয়ে আমরা যে কেঁচোর মতন হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকব, এ কিছুতেই হতে পারে না। কালকেই আমাদের যাওয়া ঠিক।'

আমি কাতরভাবে বললুম, 'বিমল, গোঁয়ার্তুমি কোরো না।'

বিমল চৌকির উপরে একটা ঘুসি মেরে বললে, 'আমি যাবই যাব। তোমার ভয় হয়, বাড়িতে বসে থাকো। আমি নিজে যকের ধন এনে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব—দেখি, করালী হারে কি আমি হারি।'

আমি তার হাত ধরে বললুম, 'বিমল, আমি ভয় পাইনি। তুমি যাও তো আমিও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, শেষটা বন-জঙ্গলের ভেতরে একটা খুনোখুনি হতে পারে! করালীরা দলে ভারি, আমরা তার কিছুই করতে পারব না।'

বিমল অবহেলার হাসি হেসে বললে, 'করালীর নিকুচি করেছে। কুমার, আমার গায়েই খালি জোর নেই—বুদ্ধির জোরও আমার কিছু কিছু আছে। তুমি কিছু ভেব না, আমার সঙ্গে চলো, করালীকে কিরকম নাকানি-চোবানি খাওয়াই একবার দেখে নিয়ো!'

আমি বিমলকে ভালোরকম চিনি। সে মিছে জাঁক কাকে বলে জানে না। সে যখন আমাকে অভয় দিচ্ছে, তখন মনে মনে নিশ্চয় কোনও একটা নূতন উপায় ঠিক করেছে। কাজেই আমিও নিশ্চিন্তমনে বললুম, 'আচ্ছা ভাই, তুমি যা বলো আমি তাতেই রাজি!'

আট

শাপে বর

সারারাত জিনিস-পত্তর গুছিয়ে, ভোরের মুখে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে যথাসময়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে রইল বিমলের পুরানো চাকর রামহরি ও আমার কুকুর বাঘা। দুটো বড়ো বড়ো ব্যাগ, একটা সুটকেস ও একটা ইকমিক কুকার ছাড়া বিমল আর কিছু সঙ্গে নিতে দিলে না।

ব্যাগ দুটোর ভিতরে কিন্তু ছিল না, এমন জিনিস নেই। ছুরি-ছোরা, কাঁচি, নানারকম ওষুধভরা ছোটো একটি বাক্স, ফটো তুলবার ক্যামেরা, ইলেকট্রিক টর্চ বা মশাল, ফ্লাস্ক, (যার সাহায্যে দুধ, জল বা চা ভরে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা সমান ঠাণ্ডা বা গরম থাকে) গোটাকতক বিস্কুট, ফল ও মাছ-মাংসের টিন (অনেক দিনে যা নষ্ট হবে না), আসাম সম্বন্ধে খানকয়েক ইংরেজি বই, ছাতা, ছোটো ছোটো দুটো বালিশ আর সতরঞ্চি, কাফ্রির সেই দুটো মুখোশ (বিমলের মতে পরে ও-দুটোও কাজে লাগতে পারে) প্রভৃতি কত রকমের জিনিসই যে এই ব্যাগ দুটোর ভিতরে ভরা হয়েছে, তা আর নাম করা যায় না। সুটকেসের ভিতরে আমাদের

জামা কাপড় রইল। আমরা প্রত্যেকেই এক এক গাছা মোটা দেখে লাঠি নিলুম—দরকার হলে এ লাঠি দিয়ে মানুষের মাথা সহজেই ভাঙা যেতে পারবে। অবশ্য, বিমল বন্দুক দুটোও সঙ্গে নিতে ভুললে না।

বাড়ি ছেড়ে বেরুবার সময় মনটা যেন কেমন-কেমন করতে লাগল। দেশ ছেড়ে কোথায় কোন বিদেশে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক আর শত্রুর মুখে পড়তে চললুম, যাবার সময়ে মায়ের পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করে যেতে পারলুম না—কে জানে এ জীবনে আর কখনও ফিরে এসে মাকে দেখতে পাব কিনা! একবার মনে হল বিমলকে বলি যে, 'আমি যাব না!' কিন্তু পাছে সে আমাকে ভীরু ভেবে বসে, সেই ভয়ে মনকে শক্ত করে রইলুম।

বিমলও আমার মুখের পানে তাকিয়ে মনের কথা বোধহয় বুঝতে পারলে। কারণ, হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কুমার, তোমার মন কেমন করছে?'

আমি সত্য কথাই বললুম—'তা একটু একটু করছে বইকি!'

—'মায়ের জন্যে?'

—'হুঁ।'

—'ভেব না। খুব সম্ভব আজকেই হয়তো তোমার মাকে তুমি দেখতে পাবে!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি করে? আমরা তো যাচ্ছি আসামে!'

—'তা যাচ্ছি বটে!'—বলেই বিমল একবার সন্দেহের সঙ্গে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে—তার চোখ-মুখের ভাব উদ্বিগ্ন। সে নিশ্চয় দেখছিল শত্রুরা আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা! কিন্তু কারুকেই দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমলের বাড়ির গাড়ি আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা গাড়িতে গিয়ে চড়ে বসলুম। গাড়ি ছেড়ে দিলে। বিমল সারা পথ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। মাঝে মাঝে তেমনি উদ্বেগের সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনপানে চেয়ে দেখতে লাগল।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। একবার চারিদিকে সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে আমি বললুম, 'বিমল, আপাতত আমাদের কোনও ভয় নেই। করালীরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি।'

বিমল সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে, 'তোমরা এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি টিকিট কিনে আনি।'

টিকিট কিনে ফিরে এসে, বিমল আমাদের নিয়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বাঘাকে জন্তুদের কামরায় তুলে দিয়ে এল। বাঘা বেচারি এত লোকজন দেখে ভড়কে গিয়েছিল। সে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে রাজি হল না, শেষটা বিমল শিকলি ধরে তাকে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

গাড়ি ছাড়তে এখনও দেরি আছে। কামরার মধ্যে বেজায় গরম দেখে, আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলুম। ঘুরতে ঘুরতে গাড়ির একেবারে শেষ দিকে গেলুম। হঠাৎ একটা কামরার ভিতর আমার নজর পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সভয়ে দেখলুম, কামরার ভিতরে করালী বসে আছে! দুজন মিশকালো

গুণ্ডার মতো লোকের সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে সে কি কথাবার্তা কইছিল—আমাকে দেখতে পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নিজেদের গাড়িতে এসে উঠে পড়লুম।

বিমল বললে, 'কিহে কুমার, ব্যাপার কি? চোখ কপালে তুলে ছুটতে ছুটতে আসছ কেন?'

আমি বললুম, 'বিমল, সর্বনাশ হয়েছে!'

বিমল হেসে বললে, 'কিছুই সর্বনাশ হয়নি! তুমি করালীকে দেখেছ তো? তা আর হয়েছে কি? সে যে আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না, আমি তা অনেকক্ষণই জানি। যাক, তুমি ভয় পেয়ো না, চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো।'

বিমল যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, আমি তা পারলুম না। আস্তে আস্তে এক কোণে গিয়ে বসে পড়লুম বটে, মন কিন্তু বিমর্ষ হয়ে রইল। বিমল আমার ভাব দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। এদিকে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

জানি না, কপালে কি আছে। জঙ্গলের ভিতরে অপঘাতেই মরতে হবে দেখছি! করালীর সঙ্গে কত লোক আছে তা কে জানে? সে যখন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন সহজে কি আর ছেড়ে দেবে? আমি খালি এইসব ভেবে ও নানারকমের বিপদ কল্পনা করে শিউরে উঠতে লাগলুম।

বিমল কিন্তু দিব্য আরামে সামনের বেঞ্চে পা তুলে দিয়ে বসে নিজের মনে কি একখানা বই পড়তে লাগল।

গাড়ি একটা স্টেশনে এসে থামল। বিমল মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখে আমাকে বললে, 'কুমার, প্রস্তুত হও! পরের স্টেশন রানাঘাট। এইখানেই আমরা নামব।'

এ আবার কি কথা! আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'রানাঘাটে নামব! কেন?

—'সেখান থেকে শান্তিপুরে, তোমার মামার বাড়িতে মায়ের কাছে যাব।'

—'হঠাৎ তোমার মত বদলালে কেন?'

—'মত কিছুই বদলায়নি,—আজ কি করব, কাল থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু তোমাকে কিছু বলিনি। এই দ্যাখো, আমি শান্তিপুরের টিকিট কিনেছি। এর কারণ কিছু বুঝলে কি?'

—'না।'

—'আমি বেশ জানতুম, করালী আমাদের পিছু নেবে। কালকেই তার চর শুনে গেছে, আমরা আসামে যাব। আজও সে জানে, আমরা আসাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। সে তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ির ভিতরে বসে থাকুক, আর সেই ফাঁকে আমরা রানাঘাটে নেমে পড়ি। দিন-দুয়েক তোমার মামার বাড়িতে বসে বসে আমরা তো মজা করে পোলাও কালিয়া খেয়েনি! আর ওদিকে করালী যখন জানতে পারবে আমরা আর গাড়ির ভিতরে নেই, তখন মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়বে! নিশ্চয় ভাববে যে আমরা তাকে ভুলিয়ে অন্য কোনও পথ দিয়ে যকের ধনের খোঁজে গেছি। সে হতাশ হয়ে কলকাতার দিকে ফিরবে, আর আমরা তোমার মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সোজা আসামের দিকে যাত্রা করব! আর কেউ আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

আমার পক্ষে এটা হল শাপে বর। ওদিকে করালীও জব্দ, আর এদিকে আমারও মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,—একেই বলে লাঠি না ভেঙে সাপ মারা! বিমলের দুখানা হাত চেপে ধরে আমি বলে উঠলুম, 'ভাই, তুমি এত বুদ্ধিমান! আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

গাড়ি রানাঘাটে থামতেই আমরা টপাটপ নেমে পড়লুম—কেউ আমাদের দেখতে পেলে না।*

নয়

নতুন বিপদের ভয়

তিনদিন মামার বাড়িতে খুব আদরে কাটিয়ে মায়ের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম। মা কি সহজে আমাকে ছেড়ে দিতে চান? তবু তাঁকে আমরা যকের ধন আর বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলিনি, তিনি শুধু জানতেন আমরা আসামে বেড়াতে যাচ্ছি।

যাবার সময়ে বিমলকে ডেকে মা বললেন, 'দেখো বাবা, আমার শিবরাত্রির সলতেটুকু তোমার হাতে সঁপে দিলুম, ওকে সাবধানে রেখ।'

বিমল বললে, 'ভয় কি মা, কুমার তো আর কচি খোকাটি নেই, ওর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

মা বললেন, 'না বাছা, কুমারকে তুমি কোথাও একলা ছেড়ে দিয়ো না—ও ভারি গোঁয়ার-গোবিন্দ, কি করতে কি করে বসবে কিছুই ঠিক নেই। ও যদি তোমার মতো শান্তশিষ্টটি হত তাহলে আমাকে তো ভেবে মরতে হত না।'

বিমল একটু মুচকে হেসে বললে, 'আচ্ছা মা, আমি তো সঙ্গে রইলুম, যাতে গোঁয়ার্তুমি করতে না পারে, সেদিকে আমি চোখ রাখব।'

আমি মনে মনে হাসতে লাগলুম। মা ভাবছেন আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ আর বিমল শান্তশিষ্ট। কিন্তু বিমল যে আমার চেয়ে কতবড়ো গোঁয়ার আর ডানপিটে, মা যদি তা ঘুণাক্ষরেও জানতেন!

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি, বিমল আর রামহরি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম—বাঘা আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। কিন্তু শান্তিপুরের স্টেশনের ভিতরে এসে, রেলগাড়িকে দেখেই পেটের তলায় ল্যাজ গুঁজে একেবারে যেন মুষড়ে পড়ল। সে বুঝলে, আবার তাকে জন্তুদের গাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে একলাটি বেঁধে রেখে আসা হবে।

রানাঘাটে নেমে আমরা আসল গাড়ি ধরলুম। বিমল খুশিমুখে বললে, 'যাক এবারে আর করালীর ভয় নেই। সে হয়তো এখন আসামে বসে নিজের হাত কামড়াচ্ছে, আর আমাদের মুণ্ডুপাত করছে।'

আমি বললুম, 'আসাম থেকে করালী এখন কলকাতায় ফিরে থাকতেও পারে।'

বিমল বললে, 'কলকাতায় কেন, সে এখন যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নেই! চলো, গাড়িতে উঠে বসা যাক।'

অনেক রাত্রে গাড়ি সারাঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, পদ্মার উপর তখনও সারার বিখ্যাত পুলটি তৈরি হয়নি। সারাঘাটে সকলকে তখন গাড়ি থেকে নেমে স্টিমারে

---

*বিমল ও কুমার যখন আসামে যায়, তখন ওখানে যাবার অন্য পথ ছিল। আজকাল কলকাতার যাত্রীরা সে পথ দিয়ে আসামে যায় না।

করে পদ্মার ওপারে গিয়ে আবার রেলগাড়ি চড়তে হত। কাজেই সারায় এসে আমাদেরও মালপত্তর নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে হল।

আগেই বলেছি, আমি কখনও কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি। স্টিমারে চড়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখে আমার যেন তাক লেগে গেল! কলকাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া নদী যে আবার আছে, এই পদ্মাকে দেখে প্রথম সেটা বুঝতে পারলুম। আকাশে চাঁদ উঠেছে আর গায়ে জ্যোৎস্না মেখে পদ্মা নেচে, দুলে, বেগে ছুটে চলছে—রুপোর জল দিয়ে তার ঢেউগুলি তৈরি। মাঝে মাঝে সাদা ধবধবে বালির চর চোখের সামনে কখনও জেগে উঠছে, কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্নের ছবির মতন। আবার মনে হল ওই নিরিবিলি চরগুলির মধ্যে হয়তো এতক্ষণ পরীরা এসে হাসিখুশি, খেলাধূলা করছিল। স্টিমারের গর্জন শুনে দৈত্য বা দানব আসছে ভেবে এখন তারা ভয় পেয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিশিয়ে গেছে!

বালির চর এড়িয়ে স্টিমার ক্রমেই অন্য তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খালাসিরা জল মাপছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছে। স্টিমারের এদিকে নানা জাতের মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে জড়ামড়ি করে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে, আর একদিকে ডেকের উপরে উজ্জ্বল আলোতে চেয়ার-টেবিল পেতে বাহার দিয়ে বসে সাহেব-মেমরা খানা খাচ্ছে! খানিকক্ষণ পরে অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি, একটা লোক আড়-চোখে আমার পানে তাকিয়ে আছে! তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই সে হন হন করে এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্টিমার ঘাটে এসে লাগল। আমরা সবাই একে একে নিচে নেমে স্টেশনের দিকে চললুম। আসাম মেল তখন আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছিল—আমরাও তার পেটের ভিতর ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলুম।

কামরার জানলার কাছে আমি বসেছিলুম। প্লাটফর্মের ওপাশে আর একখানা রেলগাড়ি—সেখানাতে দার্জিলিঙের যাত্রীদের ভিড়। ফার্স্ট ও সেকেন্ড ক্লাসের সায়েব-মেমরা কামরার ভিতরে বিছানা পাতছিল—একঘুমে রাত কাটিয়ে দেবার জন্যে। তাদের ঘুমের আয়োজন দেখতে দেখতে আমারও চোখ ঢুলে এল। আমিও শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি—হঠাৎ আবার দেখলুম, স্টিমারের সেই অচেনা লোকটা প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে তেমনি আড়-চোখে আমাদের দিকে বারে বারে চেয়ে দেখছে।

এবার আমার ভারি সন্দেহ হল। বিমলের দিকে ফিরে বললুম, 'ওহে, দ্যাখো দ্যাখো!'

বিমল বেঞ্চির উপর কম্বল পাততে পাততে বললে, 'আর দেখাশুনো কিছু নয়—এখন চোখ বুজে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার সময়।'

—'ওহে, না দেখলে চলবে না। স্টিমার থেকে একটা লোক বরাবর আমাদের ওপর নজর রেখেছে—এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে!'

শুনেই বিমল একলাফে জানলার কাছে এসে বললে, 'কই কোথায়?'

—'ওই যে।'

কিন্তু লোকটাও তখন বুঝতে পেরেছিল যে, আমরা তার উপরে সন্দেহ করছি। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

বিমল চিন্তিতের মতো বললে, 'তাই তো, এ আবার কে?'

—'করালীর চর নয় তো?'

—'করালী? কিন্তু সে কি করে জানবে আজ আমরা এখানে আছি?'

—'হয় তো করালী আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে। সে জানত আমরা দু-চারদিন পরেই আবার আসামে যাব। আসামে যেতে গেলে এ পথে আসতেই হবে। তাই সে হয়তো এইখানে এতদিন ঘাঁটি আগলে বসেছিল।'

—'অসম্ভব নয়। আচ্ছা, একবার নেমে দেখা যাক, করালী এই গাড়ির কোনও কামরায় লুকিয়ে আছে কিনা।'—এই বলেই বিমল প্লাটফর্মের উপর নেমে এগিয়ে গেল।

গাড়ি যখন ছাড়ে-ছাড়ে, বিমল তখন ফিরে এল।

আমি বললুম, 'কি দেখলে?'

—'কিছু না। প্রত্যেক কামরায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি—করালী কোথাও নেই। বোধহয় আমরা মিছে সন্দেহ করেছি।'

বিমলের কথায় আবার আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলুম—যদিও মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা লেগে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। বিমল বললে, 'ওহে কুমার, এই বেলা যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও—আসামে গিয়ে পড়লে হয়তো আমাদের আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগ করতেই হবে।'

বিমল বেঞ্চির উপরে 'আঃ' বলে সটান লম্বা হল, আমিও শুয়ে পড়লুম। সুখের বিষয়, এ কামরায় আর কেউ ছিল না, সুতরাং ঘুমে আর ব্যাঘাত পড়বার ভয় নেই।

দশ

এ চোর কে?

আমরা খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে বুদ্ধদেবের এক পাথরের মূর্তি। গভীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ নেই, সবদিকে অন্ধকার। মাথার অনেক উপরে তারাগুলো টিপ টিপ করে জ্বলছে, তাদের আলোতে আশেপাশে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পাহাড়ের মাথা—আমার মনে হল সেগুলো যেন বড়ো বড়ো দানবের কালো কালো মায়ামূর্তি। তারা যেন প্রেতপুরীর পাহারাওয়ালার মতো ওত পেতে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে—এখনই হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে! চারিদিক এত স্তব্ধ যে গায়ে কাঁটা দেয়, বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে! শুধু রাত করছে—ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম আর ভয়ে কেঁপে গাছপালা করছে—সর সর সর সর!

বিমল চুপিচুপি আমাকে বললে, 'এই বুদ্ধদেবের মূর্তি। এইখানেই যকের ধন আছে।'

হঠাৎ কে খল খল করে হেসে উঠল—সে বিকট হাসির প্রতিধ্বনি যেন পাহাড়ের মাথাগুলো টপকে লাফাতে লাফাতে কোথায় কতদূর কোন চির-অন্ধকারের দেশের দিকে চলে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, রামহরি আঁতকে উঠে দু-হাতে মুখ ঢেকে ধুপ করে বসে পড়ল, বাঘা আকাশের দিকে মুখ তুলে ল্যাজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগল।

বিমল সাহসে ভর করে বললে, 'কে হাসলে?'

আবার সেই খল খল করে বিকট হাসি! কে যে হাসছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে সে হাসি নিশ্চয়ই মানুষের নয়। মানুষ কখনও এমন ভয়ানক হাসি হাসতে পারে না।

বিমল আবার বললে, 'কে তুমি হাসছ?'

—'আমি!' উঃ, সে স্বর কি গম্ভীর!

—'কে তুমি? সাহস থাকে আমার সামনে এসো!'

—'আমি তোমার সামনেই আছি।'

—'মিথ্যে কথা। আমার সামনে খালি বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে!'

—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমাকে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাবছ? চেয়ে দ্যাখো ছোকরা, আমি যক!'

বুদ্ধদেবের সেই মূর্তিটা একটু একটু নড়তে লাগল, তার চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

বিমল বন্দুক তুললে। মূর্তিটা আবার খল খল করে হেসে বললে, 'তোমার বন্দুকের গুলিতে আমার কিছুই হবে না।'

বিমল বললে, 'কিছু হয় কিনা দেখাচ্ছি!' সে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হল।

আকাশ-কাঁপানো স্বরে মূর্তি চেঁচিয়ে বললে, 'খবরদার! তোমার গুলি লাগলে আমার গায়ের পাথর চটে যাবে! বন্দুক ছুড়লে তোমারই বিপদ হবে।'

—'হোকগে বিপদ—বিপদকে আমি ডরাই না!'

—'জানো আমি আজ হাজার হাজার বছর ধরে এইখানে বসে আছি, আর তুমি কালকের ছোকরা হয়ে আমার শান্তিভঙ্গ করতে এসেছ? কি চাও তুমি?'

—'গুপ্তধন!'

—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গুপ্তধন চাও,—ভারি আস্পা যে! এই গুপ্তধন নিতে এসে এখানে তোমার মতো কত মানুষ মারা পড়েছে তা জানো? ওই দ্যাখো তাদের শুকনো হাড়!

মূর্তির চোখের আলোতে দেখলুম, একদিকে মস্তবড়ো হাড়ের ঢিপি—হাজার হাজার মানুষের হাড়ে সেই ঢিপি অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছে!

বিমল একটুও না দমে বললে, 'ও দেখে আমি ভয় পাই না—আমি গুপ্তধন চাই।'

—'আমি গুপ্তধন দেব না।'

—'দিতেই হবে!'

—'না, না, না!'

—'তাহলে বন্দুকের গুলিতে তোমার আগুনচোখ কানা করে দেব!'

গর্জন করে মূর্তি বললে, 'তার আগেই তোমাকে আমি বধ করব!'

—'তুমি তো পাথর, এক পা এগুতে পার না, আমি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি করবে?'

—'হাঃ হাঃ হাঃ, চেয়ে দ্যাখো এখানে চারিদিকেই আমার প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে! আমার হুকুমে এখনই ওরা তোমাদের টিপে মেরে ফেলবে!'

—'কোথায় তোমার প্রহরী!'

—'প্রত্যেক পাহাড় আমার প্রহরী!'

—'ওরাও তো পাথর, তোমার মতো নড়তে পারে না। ওসব বাজে কথা রেখে হয় আমাকে গুপ্তধন দাও—নয় এই তোমাকে গুলি করলুম!'—বিমল আবার বন্দুক তুললে।

—'তবে মরো। প্রহরী!' মূর্তির আগুনচোখ নিবে গেল—সঙ্গে সঙ্গে পলক না যেতেই

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম 'যক আর নেই?'

অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো পাহাড়ের মতো মস্তবড়ো কি কতকগুলো লাফিয়ে উঠে আমাদের উপরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। বিষম এক ধাক্কায় মাটির উপর পড়ে অসহ্য যাতনায় চেঁচিয়ে আমি বললুম—'বিমল—বিমল—'

আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলুম, রেলগাড়ির বেঞ্চের উপর থেকে গড়িয়ে আমি নিচে পড়ে গেছি, আর বিমল আমার মুখের উপরে ঝুঁকে বলছে, 'ভয় কি কুমার, সে রাসকেল পালিয়েছে!'

তখনও স্বপ্নের ঘোর আমার যায়নি,—আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'যক আর নেই?'

বিমল আশ্চর্যভাবে বললে, 'যকের কথা কি বলছ কুমার?'

আমি উঠে বসে চোখ কচলে অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'বিমল, আমি এতক্ষণ একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলাম। শুনলে তুমি অবাক হবে।'

বিমল বললে, 'আর গাড়ির ভিতরে এখনই যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, তা মোটেই স্বপ্ন নয়! শুনলে তুমিও অবাক হবে!'

আমি হতভম্বের মতো বললুম, 'গাড়ির ভেতরে আবার কি কাণ্ড হল?'

বিমল বললে, 'একটা চোর এসেছিল।'

—'চোর? বলো কি?'

—'হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, একটা লোক আমাদের ব্যাগ হাতড়াচ্ছে! আমি তখনই উঠে তার রগে এক ঘুসি বসিয়ে দিলুম, সে ঠিকরে তোমার গায়ের উপরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আঁতকে উঠে বেঞ্চির তলায় হলে চিৎপাত! লোকটা পড়েই আবার দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর চোখের নিমেষে জানলা দিয়ে বাইরে একলাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল!'

—'চলন্ত ট্রেন থেকে সে লাফ মারলে? তাহলে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে!'

—'বোধহয় না। ট্রেন তখন একটা স্টেশনের কাছে আস্তে আস্তে চলছিল।'

—'আমাদের কিছু চুরি গিয়েছে নাকি?'

—'হুঁ। মড়ার মাথাটা!' বলেই বিমল হাসতে লাগল।

—'বিমল, মড়ার মাথাটা আবার চুরি গেল, আর তোমার মুখে তবু হাসি আসছে?'

—'হাসব না কেন, চোর যে জাল মড়ার মাথা নিয়ে পালিয়েছে!'

—'জাল মড়ার মাথা! সে আবার কি?'

—'তোমাকে তবে বলি শোনো। এ রকম বিপদ যে পথে ঘটতে পারে, আমি তা আগেই জানতুম। তাই কলকাতা থেকে আসবার আগেই আমাদের পাড়ার এক ডাক্তারের কাছ থেকে আর একটা নতুন মড়ার মাথা জোগাড় করেছিলুম। নতুন মাথাটার উপরেও আসল মাথায় যেমন অঙ্ক আছে, তেমনি অঙ্ক ক্ষুদে দিয়েছি,—তবে এর মানে হচ্ছে একেবারে উল্টো! এই নকল মাথাটাই ব্যাগের ভেতরে ছিল। আমি জানতুম মড়ার মাথা চুরি করতে আবার যদি চোর আসে, তবে নকলটাকে নিয়েই সে তুষ্ট হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই।'

—'বিমল, ধন্যি তোমার বুদ্ধি! তুমি যে এত ভেবে কাজ করো, আমি তা জানতুম না। আসল মড়ার মাথা কোথায় রেখেছ?

অনেকের বাড়িতে যেমন চোরাকুঠুরি থাকে, আমার ব্যাগের ভেতরেও তেমনি একটা লুকনো ঘর আছে। এ ব্যাগ আমি অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি। মড়ার মাথা তার ভেতরেই রেখেছি।'

—'কিন্তু আমাদের পিছনে এ কোন নতুন শত্রু লাগল বলো দেখি?'

—শত্রু আর কেউ নয়—এ করালীর কাজ! সে আমার চালাকিতে ভোলেনি, নিশ্চয় এই গাড়িতেই কোথাও ঘুপটি মেরে লুকিয়ে আছে।'

—'তবেই তো!'

—'কুমার, আবার তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?'

—'ভয় হচ্ছে না, কিন্তু ভাবনা হচ্ছে বটে! এই দ্যাখো না, করালীর চর যদি আজই ঘুমন্ত

অবস্থায় আমাদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যেত?'

—'করালী আমাদের সঙ্গে নেই, এই ভেবে আমরা অসাবধান হয়েছিলুম বলেই আজ এমন কাণ্ড ঘটল। এখন থেকে আবার সাবধান হব—রামহরি আর বাঘাকে সর্বদাই কাছে কাছে রাখব, আর সকলে মিলে একসঙ্গে ঘুমবও না।'

—'করালী যখনই জানবে সে জাল মড়ার মাথা পেয়েছে, তখনই আবার আমাদের আক্রমণ করবে।'

—'আমরাও প্রস্তুত! কিন্তু সে যদি সাঙ্কেতিক লেখা এখনো পড়তে না পেরে থাকে, তবে এ জাল ধরা তার কর্ম নয়!'

গাড়ি তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আর আমাদের চোখের সুমুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল বন-জঙ্গল-মাঠের দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে—ঠিক যেন বায়োস্কোপের ছবির পর ছবি! আমার আর ঘুমোবার ভরসা হল না—বাইরের দিকে চেয়ে, বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। প্রতি মিনিটেই গাড়ি আমাদের দেশ থেকে দূরে—আরও দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে, কত অজানা বিপদ আমাদের মাথার উপর অদৃশ্যভাবে ঝুলছে! জানি না, এই পথ দিয়ে এ জীবনে কখনও দেশে ফিরতে পারব কিনা!

এগারো

ছাতকে

আজ আমরা শ্রীহট্টে এসে পৌঁছেছি।

বিমল বললে, 'কুমার, এই সেই শ্রীহট্ট!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই কমলালেবুর বিখ্যাত জন্মভূমি!'

বিমল বললে, 'উঁহু, কমলালেবু ঠিক শ্রীহট্ট শহরে তো জন্মায় না, তবে এখানকার প্রধান নদী সুরমা দিয়েই নৌকায় চড়ে কমলালেবু কলকাতায় যাত্রা করে বটে! খালি কমলালেবু নয়, এখানকার কমলামধুও যেমন উপকারী, তেমনি উপাদেয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ অঞ্চলে আরও কি পাওয়া যায়?'

—'পাওয়া যায় অনেক জিনিস, যেমন আলু, কুমড়ো, শসা, আনারস, তুলো, আখ, তেজপাতা, লঙ্কা, মরিচ, ডালচিনি আর চুন প্রভৃতি। এসব মাল এ অঞ্চল থেকেই রপ্তানি হয়। কিন্তু এখানকার পান-সুপারির কথা শুনলে তুমি অবাক হবে।'

—'অবাক হব? কেন?'

—'বাংলাদেশের মতো এখানে পানের চাষ হয় না, কিন্তু এদেশে পানের সঙ্গে সুপারির বড়ো ভাব। বনের ভেতরে প্রায়ই দেখবে, সুপারিকুঞ্জেই পান জন্মেছে, সুপারি গাছের দেহ জড়িয়ে পানের লতা উপরে উঠেছে। তাছাড়া, এখানকার 'সফলাং' আর একটি বিখ্যাত জিনিস।

—'সফলাং! সে আবার কি?'

—'কেশুরের মতো একরকম মূল। খাসিয়ারা খেতে বড়ো ভালোবাসে।'

সারাদিন আমরা শ্রীহট্টেই রইলুম। এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থান খাসিয়া পাহাড়কে দেখতে পেলুম। মনে হল, এর বিশাল বুকের ভিতরে না জানি কত রহস্যই লুকানো আছে, সে রহস্যের মধ্যে ডুব দিলে আর থই পাব কিনা, তাই বা কে বলতে পারে? এ তো আর কলকাতার রাস্তার কোনও নম্বর-জানা বাড়ির খোঁজে যাচ্ছি না, এই অশেষ পাহাড়-বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছে যকের ধন, কি করে আমরা তা টের পাব? এখন পর্যন্ত করালী বা তার কোনও চরের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে না পেয়ে আমরা তবু অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। বুঝলাম, জাল মড়ার মাথা পেয়ে করালী এতটা খুশি হয়েছে যে, আমাদের উপরে আর পাহারা দেওয়া দরকার মনে করছে না! বাঁচা গেছে। এখন করালীর এই ভ্রমটা কিছুদিন স্থায়ী হলেই মঙ্গল। কারণ তার মধ্যেই আমরা কেল্লা ফতে করে নিশ্চয় দেশে ফিরে যেতে পারব।

মাঝরাত্রে স্টিমারে চড়ে, সুরমা নদী দিয়ে পরদিন সকালে ছাতকে গিয়ে পৌঁছলুম।

সুরমা হচ্ছে শ্রীহট্টের প্রধান নদী। ছাতকও এই নদীর তীরে অবস্থিত। কলকাতায় ছাতকের চুনের নাম আমরা আগেই শুনেছিলুম। তবে এ চুনের উৎপত্তি ছাতকে নয়, চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে খাসিয়া পাহাড়ে এই চুন জন্মে, সেখান থেকে রেলে করে ও নৌকা বোঝাই হয়ে ছাতকে আসে এবং ছাতক থেকে আরও নানা জায়গায় রপ্তানি হয়। চোরাপুঞ্জিতে খালি চুন নয়, আগে সেখানে লোহার খনি থেকে অনেক লোহা পাওয়া যেত, সেই সব লোহায় প্রায় আড়াইশো বছর আগে বড়ো বড়ো কামান তৈরি হত। কিন্তু বিলাতি লোহার উপদ্রবে খাসিয়া পাহাড়ের লোহার কথা এখন আর কেউ ভুলেও ভাবে না। চুন ও লোহা ছাড়া কয়লার জন্যেও খাসিয়া পাহাড় নামজাদা। কিন্তু পাঠাবার ভালো বন্দোবস্ত না থাকার দরুন, এখানকার কয়লা দেশ-দেশান্তরে যায় না।

ছাতক জায়গাটি মন্দ নয়। এখানে থানা, ডাক্তারখানা, পোস্টআপিস, বাজার ও মাইনর ইস্কুল—কিছুরই অভাব নেই। একটি ডাকবাংলোও আছে, আমরা সেইখানে গিয়েই আশ্রয় নিলুম। বিমলের মুখে শুনলুম, এখানে পিয়াইন নামে একটি নদী অছে, সেই নদী দিয়েই আমাদের নৌকায় চড়ে ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হবে—এ সময়ে নদীর জল কম বলে নৌকা তার বেশি আর চলবে না। কাজেই ভোলাগঞ্জ থেকে মাইল-দেড়েক হেঁটে আমরা থারিয়াঘাটে যাব, তারপর পাথর-বাঁধানো রাস্তা ধরে খাসিয়া পাহাড়ে উঠব। আজ ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করে কাল থেকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ।

ছাতক থেকে খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্য কি চমৎকার! নীলরঙের প্রকাণ্ড মেঘের মতো, দৃষ্টি-সীমা জুড়ে আকাশের খানিকটা ঢেকে খাসিয়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যতদূর নজর চলে—পাহাড়ের যেন আর শেষ নেই! পাহাড়ের কথা আমি কেতাবে পড়েছিলুম, কিন্তু চোখে কখনও দেখিনি, পাহাড় যে এত সুন্দর তা আমি জানতুম না; আমার মনে হতে লাগল, খাসিয়া পাহাড় যেন আমাকে ইশারা করে কাছে ডাকছে—ইচ্ছে হল তখন এক ছুটে তার কোলে গিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার সময় খানিক গল্পগুজব করে আমরা শুয়ে পড়লুম। বেশ একটু শীতের আমেজ দিয়েছিল, লেপের ভিতরে ঢুকে কি আরামই পেলুম।

বিমলও তার লেপের ভিতর ঢুকে বললে, 'ঘুমিয়ে নাও ভাই, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নাও। কাল এমন সময়ে আমরা খাসিয়া পাহাড়ে, এত আরামের ঘুম আর হয়তো হবে না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমরা তো ঘুমবো, পাহারা দেবে কে?'

বিমল বললে, 'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। দরজার বাইরে বারান্দায় রামহরি আর বাঘা শুয়ে আছে। তার ওপরে দরজা-জানলাগুলোও ভেতর থেকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি।'

আমার উদ্বেগ দূর হল। যদিও শত্রুর দেখা নেই, তবু সাবধানে থাকাই ভালো!

বারো

বিনি-মেঘে বাজ

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল! ... উঠতে গিয়ে উঠতে পারলুম না, আমার বুকের উপরে কে যেন চেপে বসে আছে। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বিমল, বিমল!'

অন্ধকারের ভিতরে কে আমার গলা চেপে ধরে হুমকি দিয়ে বললে, 'খবরদার, চ্যাঁচালেই টিপে মেরে ফেলব!'

আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, অনেক কষ্টে বললুম, 'গলা ছাড়ো, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে বললে, 'আচ্ছা, ফের চ্যাঁচালেই কিন্তু মরবে!'

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, আমার বুকের উপরে কে এ, ভূত না মানুষ?...ঘরের অন্য কোণেও একট ঝটাপটি শব্দ শুনলুম।...তারপরেই একটা গোঁঙানি আওয়াজ—কে যেন কি দিয়ে কাকে মারলে—তারপর আবার সব চুপচাপ।

অন্ধকারেই হেঁড়েগলায় কে বললে, 'শম্ভু, ব্যাপার কি?'

আর একজন বললে, 'বাবু, এ ছোঁড়ার গায়ে দস্যির জোর, আর একটু হলেই আমাকে বুক থেকে ফেলে দিয়েছিল। আমি লাঠি দিয়ে একে ঠাণ্ডা করেছি।'

—'একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি?'

—'না, অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়।'

—'আচ্ছা, তাহলে আমি আলো জ্বালি।'—বলেই সে ফস করে একটা দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালে। দেখলুম, এ সেই লোকটা—ইস্টিমারে আর ইস্টিশানে যে গোয়েন্দার মতো পিছু নিয়ে আমার পানে তাকিয়েছিল।

আমাকে তার পানে চেয়ে থাকতে দেখে সে হেসে বললে, 'কি হে স্যাঁঙাত, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছ যে! আমাকে চিনতে পেরেছ নাকি?'

আমি কোনও জবাব দিলুম না। আমার বুকের উপরে তখনও একটা লোক চেপে বসেছিল। ঘরের আর এক কোণে বিমলের দেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে, দেহে প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই। দরজা-জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম—সব বন্ধ। তবে এরা ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?

বাতি-হাতে লোকটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'ছোকরা, ভারি চালাক হয়েছ—না? যকের ধন আনতে যাবে? এখন কি হয় বলো দেখি?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'কে তোমরা?'

—'অত পরিচয়ে তোমার দরকার কি হে বাপু?'

—'তোমরা কি চাও?'

—'পকেট-বই চাই—পকেট-বই! তোমার ঠাকুরদাদার পকেট-বইখানা আমাদের দরকার। মড়ার মাথা আমরা পেয়েছি, এখন পকেট-বইখানা কোথায় রেখেছ বলো।'

এত বিপদেও মনে মনে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। এরা ভেবেছে সেই জাল মড়ার মাথা নিয়ে যকের ধন আনতে যাবে। পকেট-বইয়ের কথাও এরা জানে। নিশ্চয় এরা করালীর লোক।

লোকটা হঠাৎ আমাকে ধমক দিয়ে বললে, 'এই ছোকরা! চুপ করে আছ যে? শিগগির বল পকেট-বই কোথায়—নইলে, আমার হাতে কি, দেখছ?' সে কোমর থেকে ফস করে একখানা ছোরা বার করলে, বাতির আলোয় ছোরাখানা বিদ্যুতের মতো জ্বল জ্বল করে উঠল।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'ওই ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই আছে।'

লোকটা বললে, 'হুঁ, পথে এসো বাবা, পথে এসো। শম্ভু ব্যাগটা খুলে দ্যাখ তো।'

শম্ভু বিমলের দেহের পাশে বসেছিল, লোকটার কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে আমাদের বড়ো ব্যাগটা নেড়ে-চেড়ে বললে, 'ব্যাগের চাবি বন্ধ।'

বাতি-হাতে লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাগের চাবি কোথায়?'

আমি কিছু বলবার আগেই বিমল হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'এই যে, চাবি আমার কাছে।'—বলেই সে হাত তুললে—তার হাতে বন্দুক।

লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমিও অবাক!

—বিমল বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, 'যে এক-পা নড়বে, তাকেই আমি গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলব।'

যার হাতে বাতি ছিল, সে হঠাৎ বাতিটা মাটির উপর ফেলে দিলে—সমস্ত ঘর আবার

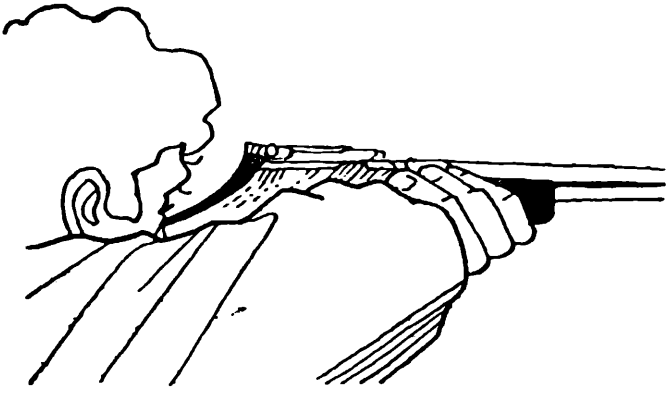

'যে এক পা নড়বে তাকেই গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলব।'

অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক তুলে দুম করে বিমলের বন্দুকের আওয়াজ হল, একজন লোক 'বাবা রে, গেছি রে' বলে চিৎকার করে উঠল, আমার বুকের উপরে যে চেপে বসেছিল, সেও আমাকে ছেড়ে দিলে,—তারপরেই ঘরের দরজা খোলার শব্দ, বাঘার ঘেউ ঘেউ, রামহরির গলা। কি যে হল কিছুই বুঝতে পারলুম না, বিছানার ওপর উঠে আচ্ছন্নের মতন আমি বসে পড়লুম।....

বিমল বললে, 'কুমার, আলো জ্বালো—শিগগির।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—'

—'ভয় নেই, আলো জ্বালো, তারা পালিয়েছে।'

কিন্তু আমাকে আর আলো জ্বালতে হল না—রামহরি একটা লণ্ঠন হাতে করে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

ঘরের ভিতরে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

বিমল মেঝের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, 'এই যে রক্তের দাগ। গুলি খেয়েও লোকটা পালাল! বোধহয় ঠিক জায়গায় লাগেনি—হাত-টাত জখম হয়েছে।'

রামহরি উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'ব্যাপার কি বাবু?'

বিমল সে কথায় কান না দিয়ে বললে, 'কিন্তু জানলা-দরজা সব বন্ধ—অথচ ঘরের ভেতরে শত্রু, ভারি আশ্চর্য তো!' তারপর একটু থেমে, আবার বললে, 'ও বুঝেছি। নিশ্চয় আমরা যখন ও-ঘরে খেতে গিয়েছিলুম, রাসকেলরা তখনই ফাঁক পেয়ে এ ঘরে ঢুকে খাটের তলায় ঘুপটি মেরে লুকিয়েছিল।

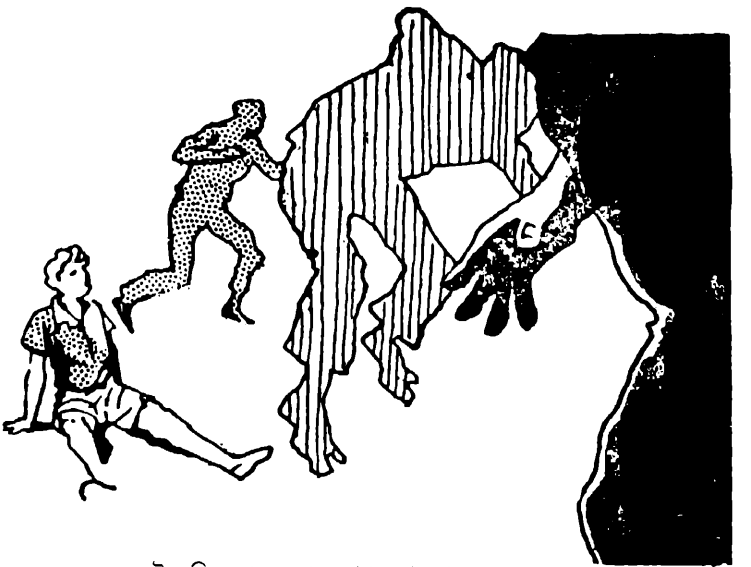

উঃ, কি ভয়ানক তার চোখ, দপ দপ করে জ্বলছে!

কথাটা আমারও মনে লাগল। আমি বললুম, 'ঠিক বলেছ! কিন্তু বিমল, তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, হঠাৎ কি করে দাঁড়িয়ে উঠলে?'

বিমল বললে, 'আমি মোটেই অজ্ঞান হইনি, অজ্ঞান হওয়ার ভান করে চুপচাপ পড়েছিলুম। ভাগ্যি বন্দুকটা আমার বিছানাতেই ছিল!'

এমন সময়ে বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের ভিতরে এসে, আদর করে আমার পা চেটে দিতে লাগল। আমি দেখলুম বাঘার মুখে যেন কিসের দাগ! এ যে রক্তের মতো! তবে কি বাঘা জখম হয়েছে? তাড়াতাড়ি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললুম, 'না অন্য কারুর রক্ত! বাঘা নিশ্চয় সেই লোকগুলোর কারুকে না কারুকে তার দাঁতের জোর বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।'

তারিফ করে তার মাথা চাপড়ে আমি বললুম, 'শাবাশ বাঘা, শাবাশ!'—বাঘা আদরে যেন গলে গিয়ে আমার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বিমল বললে, 'এবার থেকে বাঘাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুমবো। বাঘা আমাদের কাছে ঘরের ভেতরে থাকলে এ বিপদ হয়তো ঘটত না।'

আমি বললুম, 'তা তো ঘটত না, কিন্তু এখন ভবিষ্যতের উপায় কি? করালী নিশ্চয়ই আমাদের ছাড়ান দেবে না, এবার তার চরেরা হয়তো দলে আরও ভারি হয়ে আসবে।'

বিমল সহজভাবেই বললে, 'তা আসবে বইকি।'

আমি বললুম, 'আর এটাও মনে রেখো, কাল থেকে আমরা লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে পড়ব। সেখানে আমাদের রক্ষা করবে কে?'

বিমল বন্দুকটা ঠক করে মেঝের উপরে ঠুকে, একখানা হাত তুলে তেজের সঙ্গে বললে, 'আমাদের এই হাতই আমাদের রক্ষা করবে। যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারুর নেই।'

—'কিন্তু—'

—'আজ থেকে 'কিন্তু'র কথা ভুলে যাও কুমার, ও হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষের কথা।' বলেই বিমল এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়ে আবার বললে, 'চেয়ে দেখো কুমার!'

জানলার বাইরে আমার চোখ গেল। নিঝুম রাতের চাঁদের আলো মেখে স্বর্গের মতো খাসিয়া পাহাড়ের স্থির ছবি আঁকা রয়েছে! চমৎকার, চমৎকার! শিখরের পর শিখরের উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার ঝরনা রুপোলি লহর তুলে বয়ে যাচ্ছে, কোথাও আলো, কোথাও ছায়া—ঠিক যেন পাশাপাশি হাসি আর অশ্রু! বিভোর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম—এমন দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি!

বিমল বললে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'স্বপ্ন।'

বিমল বললে, 'না, স্বপ্ন নয়—এ সত্য। তুমি কি বলতে চাও কুমার, এই স্বর্গের দরজায় এসে আবার আমরা খালি হাতে ফিরে যাব?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না বিমল, না,—ফিরব না, আমরা ফিরব না। আমার সমস্ত

প্রাণ-মন ওইখানে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে! যকের ধন পাই আর না পাই—আমি শুধু একবার ওইখানে যেতে চাই।'

বিমল জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'কাল আমরা ওখানে যাব। আজ আর কোনও কথা নয়, এসো আবার নাক ডাকানো যাক।'—বলেই বন্দুকটা পাশে নিয়ে বিছানার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরেই তার নাকের গর্জন শুরু হল। তার নিশ্চিন্ত ঘুম দেখে কে বলবে যে, একটু আগেই সে সাক্ষাৎ যমের মুখে গিয়ে পড়েছিল! বিমলের আশ্চর্য সাহস দেখে আমিও সমস্ত বিপদের কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিলুম। তারপর খাসিয়া পাহাড় আর যকের ধনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, তা আমি জানি না।

তেরো

খাসিয়া পাহাড়ে

চেরাপুঞ্জি পার হয়ে এগিয়ে এসেছি অনেকদূর। চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং শহর প্রায় ষোলো ক্রোশ তফাতে। এই পথটা মোটরগাড়ি করে যাওয়া যায়। আমরা কিন্তু ওমুখো আর হলুম না। কারণ জানাপথ ধরলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা বেশি।

পাহাড়ের পর পাহাড়—ছোটো, বড়ো, মাঝারি। যেদিকে চাই কেবলই পাহাড়—কোনও কোনও পাহাড়ের শৃঙ্গের আকার বড়ো অদ্ভুত, দেখতে যেন হাতির শুঁড়ের মতো, উপরে উঠে তারা যেন নীলাকাশকে জড়িয়ে ধরে পায়ের তলায় আছড়ে ফেলতে চাইছে। পাহাড়গুলিকে দূর থেকে ভারি কঠোর দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাছে এসে দেখছি সবুজ ঘাসের নরম মখমলে এদের গা কে যেন মুড়ে দিয়েছে। কত লতাকুঞ্জে কত যে ফুল ফুটে রয়েছে—হাজার-হাজার চুনি-পান্না হীরা-জহরতের মতো তাদের 'আহা-মরি রঙের বাহার—ওই যে ফুলপরীদের নির্জন খেলাঘর। কোথাও ছোটো ছোটো ঝরনা ঝিরঝির ঝরে পড়ছে, তারপর পাথরের পর পাথরের উপরে লাফিয়ে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে চোখের আড়ালে তলিয়ে গিয়েছে। কোথাও পথের দুপাশে গভীর খাদ, তার মধ্যে শত শত ডালচিনির গাছ আর লতাপাতার জঙ্গল শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে,—সেসব খাদের পাশ দিয়ে চলতে গেলে প্রতিপদেই ভয় হয়—এই বুঝি টলে পা ফসকে অতল পাতালের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাই! সবচেয়ে বিশেষ করে চোখে পড়ে সরল গাছের সার। এত সরল গাছ আমি আর কখনও দেখিনি—সমস্ত পাহাড়ই যেন তারা একেবারে দখল করে নিতে চায়। সেসব গাছের বেশি ডালপালা-পাতার জাল নেই; মাটি থেকে তারা ঠিক সোজা হয়ে উপরে উঠে যেন সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নির্জন পাহাড়, মাঝে মাঝে কখনও কেবল দু-একজন কাঠুরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কাঠুরেরা জাতে খাসিয়া, তাদের চেহারার সঙ্গে গুর্খাদের চেহারার অনেক মিল আছে—নাক থ্যাবড়া, গালের হাড় উঁচু, চোখ বাঁকা বাঁকা, মাথা ছোটো ছোটো।

এখানে এসে এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। এতদিনেও করালীর দলের আর কোনও

সাড়া-শব্দ পাইনি। আমরা যে পথ ছেড়ে এমন অপথ বা বিপথ ধরব, নিশ্চয় তারা সেটা কল্পনা করতে পারেনি। হয়তো তারা এখন আমাদের ধরবার জন্যে শিলং শহরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে মরছে। কেমন জব্দ!

বিমল আজ দুটো বুনো মোরগ শিকার করেছে। সেই মোরগের মাংস কত মিষ্টি লাগবে তাই ভাবতে ভাবতে খুশি হয়ে পথ চলছি।

পশ্চিম আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য। আমি বললুম, 'বিমল, সারাদিন পথ চলে পা টাটিয়ে উঠেছে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। আজকের মতো বিশ্রাম করা যাক।'

বিমল বললে, 'কেন কুমার, চারিদিকের দৃশ্য কি তোমার ভালো লাগছে না?'

—'ভালো লাগছে না আবার! এত ভালো লাগছে যে, দেখে দেখে আর সাধ মিটছে না। কিন্তু এই ক্ষিদের মুখে রামপাখির গরম মাংস এরও চেয়ে ঢের ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে।'

এই বলাবলি করতে করতে আমরা একটা ছোটো ঝরনার কাছে এসে পড়লুম। ঝরনার ঠিক পাশেই পাহাড়ের বুকে একটা গুহার মতো বড়ো গর্ত।

বিমল বললে, 'বাঃ, বেশ আশ্রয় মিলেছে। এই গুহার ভিতরেই আজকের রাতটা দিব্যি আরামে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রামহরি, মোটমাট এইখানেই রাখো।'

আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই কম-বেশি মোট ছিল, সবাই সেগুলো একে একে গুহার ভিতরে নামিয়ে রাখলুম। গুহাটি বেশ বড়ো-সড়ো, আমাদের সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন লোক এলেও তার মধ্যে থাকবার অসুবিধা হত না।

গুহার ভিতরটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, এইবার রান্নার উদ্যোগ করি?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ—দাঁড়াও, আমি তোমাদের একটা মজা দ্যাখাচ্ছি, এখানে আগুনের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।' এই বলে একটা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি আর রামহরি ছুরি নিয়ে তখনই মোরগ দুটোকে রান্নার উপযোগী করে তুলতে বসে গেলুম। বাঘাও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লোলুপ চোখে, ঘাড় বেঁকিয়ে একমনে আমাদের কাজ দেখতে লাগল, তার হাব-ভাবে বেশ বোঝা গেল, রামপাখির মাংসের প্রতি তারও লোভ আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

খানিক পরেই বিমল একরাশ কাঠ ঘাড়ে করে ফিরে এল। আমি বললুম, 'এলে তো খালি কতকগুলো কাঠ নিয়ে। এর মধ্যে মজাটা আর কি আছে?'

—'এই দ্যাখো না' বলেই বিমল কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বাললে, তারপর একখানা কাঠ নিয়ে তার উপরে ধরতেই দপ করে তা জ্বলে উঠল। বিমল কাঠখানা উঁচু করে মাথার উপরে ধরলে, আর সেটা ঠিক মশালের মতন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো! অত সহজে জ্বলে, ওটা কি কাঠ?'

বিমল বললে, 'সরল কাঠ। এ কাঠে একরকম তেলের মতো রস আছে, তাই এমন সুন্দর জ্বলে। এর আর এক নাম—ধূপকাষ্ঠ।'

রামহরি সেদিন সরল কাঠেই উনুন ধরিয়ে রামপাখির মাংস চড়িয়ে দিলে। আমরা দুজনে গুহার ধারে বসে গল্প করতে লাগলুম।

তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে, একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদামামার আধখানা হাসিমুখ উঁকি মারছে—সেই আবছায়ামাখা জ্যোৎস্নার আলোতে সামনের পাহাড়, বন আর ঝরনাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

বিমল হঠাৎ বললে, 'কুমার, তুমি ভূত বিশ্বাস করো?'

আমি বললুম, 'কেন বলো দেখি?'

বিমল বললে, 'আমরা যাদের দেশে আছি, এই খাসিয়ারা অনেকেই ভূতকে দেবতার মতো পুজো করে। ভূতকে খুশি রাখবার জন্যে খাসিয়ারা মোরগ আর মুরগির ডিম বলি দেয়। যে মুল্লুকে ভূতের এত ভক্ত থাকে, সেখানে ভূতের সংখ্যাও নিশ্চয় খুব বেশি,—কি বলো?'

আমি বললুম, 'না, আমি ভূত মানি না।'

বিমল বললে, 'কেন?'

—'কারণ আমি কখনও ভূত দেখিনি। তুমি দেখেছ?'

—'না, তবে আমি একটি ভূতের গল্প জানি।'

—'সত্যি গল্প?'

—'সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে যার মুখে গল্পটি শুনেছি, সে বলে এর আগাগোড়া সত্যি।'

—'কে সে?'

—'আমাদের বাড়ির পাশে একজন লোক বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত, এখন সে উঠে গেছে। তার নাম ঈশান।'

—'বেশ তো, এখনও রান্না শেষ হতে দেরি আছে, ততক্ষণে তুমি গল্পটা শেষ করে ফেলো—বিশ্বাস না হোক, সময়টা কেটে যাবে।'

একটা বেজায় ঠাণ্ডা বাতাসের দমকা এল। দুজনেই ভালো করে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম। বিমল এমনভাবে গল্প শুরু করলে, ঈশানই যেন তা নিজের মুখে বলছে।

চোদ্দ

মানুষ, না পিশাচ?

[ঈশানের গল্প]*

আমাদের বাড়ি যে গ্রামে, তার ক্রোশ-দুয়েক তফাতেই গঙ্গা। কাজেই গাঁয়ে কোনও লোক মারা গেলে, গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়েই মড়া পোড়ানো হত।

সেবারে ভোলার ঠাকুরমা যখন মারা পড়ল—তখন আমরা পাড়ার জন-পাঁচেক লোক মিলে মড়া নিয়ে শ্মশানে চললুম। শ্মশানে পৌঁছোতে বেজে গেল রাত বারোটা।

---

*আসলে 'ঈশানের গল্প'টি আমি শুনেছিলুম স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে। ইতি—লেখক।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশান যে কেমন ঠাঁই, শহরের বাসিন্দারা তা বুঝতে পারবে না। এখানে গ্যাসের আলোও নেই, লোকজন, গোলমালও নেই। অনেক গাঁয়েই শ্মশানে কোনও ঘরও থাকে না। খোলা, নির্জন জায়গা, চারিদিকে বন-জঙ্গল, প্রতিপদেই হয়তো মড়ার মাথা আর হাড় মাড়িয়ে চলতে হয়। রাতে সেখানে গেলে খুব সাহসীরও বুক রীতিমতো দমে যায়।

আমাদের গাঁয়ের শ্মশানঘাটে একখানা হেলেপড়া দরজাভাঙা কোঠাঘর ছিল। তার মধ্যেই গিয়ে আমরা মড়া নামিয়ে রাখলুম।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশানে চিতার জ্বালানি কাঠ তো কিনতে পাওয়া যায় না, কাজেই আশেপাশের বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে হয়।

ভোলা বললে, 'আমি মড়া আগলে থাকি, তোমরা সকলে কাঠ আনো গে যাও।'

আমি বললুম, 'একলা থাকতে পারবে তো?'

ভোলা যেমন ডানপিটে, তার গায়ে জোরও ছিল তেমনি বেশি। সে অবহেলার হাসি হেসে বললে, 'ভয় আবার কি? যাও, যাও—দেরি কোরো না।'

আমরা পাঁচজনে জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটতে লাগলুম। একটা চিতা জ্বালাবার মতো কাঠ সে তো বড়ো অল্প কথা নয়। কাঠ কাটতেই কেটে গেল প্রায় আড়াই ঘণ্টা; বুঝলুম, আজ ঘুমের দফায় ইতি,—মড়া পোড়াতেই ডেকে উঠবে ভোরের পাখি।

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের একজন বলে উঠল, 'ওহে দ্যাখো, দ্যাখো শ্মশানের ঘরের মধ্যে কি রকম আগুন জ্বলছে!'

তাই তো, ঘরের ভিতরে সত্যিই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যে! অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। ঘরের কাছ বরাবর আসতেই লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, মাটির উপরে কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকটাকে উল্টে ধরে লণ্ঠনটা তার মুখের কাছে নামিয়ে দেখলুম, সে আর কেউ নয়—আমাদেরই ভোলা। তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে, সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভোলা এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর ওখানে ঘরের ভিতরে আগুন জ্বলছে—এ কেমন ব্যাপার! সকলে হতভম্ব হয়ে ঘরের দিকটায় ছুটে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কাছটায় কে তাল তাল মাটি এনে ঢিপির মতো উঁচু করে তুলেছে, আরও খানিকটা উঁচু হলেই দরজার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত! এসব কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলুম, এককোণে একরাশ কাঠ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, একটা কাঁচা মাংস-পোড়ার বিশ্রী গন্ধ উঠছে, আর কোথাও মড়ার কোনও চিহ্নই নেই!

ভয়, বিস্ময় আর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা আবার ভোলার কাছে ফিরে এলুম। তার মুখে ও মাথায় অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবার পর আস্তে আস্তে সে চোখ চাইলে। তারপর উঠে বসে যা বললে, তা হচ্ছে এই ঃ—

'তোমরা তো কাঠ কাটতে চলে গেলে, আমি মড়া আগলে বসে রইলুম। খানিকক্ষণ এমনি চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার কেমন তন্দ্রা এল। চোখ বুজে ঢুলছি, হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হল। চমকে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আমারই

মনের ভ্রম ভেবে খাটের পায়াতে মাথা রেখে আবার আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।...খানিকক্ষণ পরে আবার সেই থপ করে শব্দ। এবার আমার সন্দেহ হল হয়তো মড়ার লোভে বাইরে শেয়াল-টেয়াল কিছু এসেছে। এই ভেবে আর চোখ খুললুম না—এমনিভাবে আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। ওদিকে সেই ব্যাপারটা সমানেই চলেছে—মাঝে মাঝে সব স্তব্ধ আর মাঝে মাঝে থপ করে শব্দ। শেষটা জ্বালাতন হয়ে আমি আবার চোখ চাইতে বাধ্য হলুম। কিন্তু একি! ঘরের দরজার সামনেটা যে মাটিতে প্রায় ভরতি হয়ে উঠেছে,—আর একটু পরেই আমার বাইরে যাবার পথও যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে! কে এ কাজ করলে, এ তো যে-সে কথা নয়! আমার ঘুমের ঘোর চট করে কেটে গেল, সেই কাঁচা মাটির পাঁচিল টপকে তখনই আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে। ঘর আর গঙ্গার মাঝখানে চড়া। এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলুম খানিক তফাতে একটা ঝাঁকড়াচুলো লোক হেঁট হয়ে একমনে দুই হাতে ভিজে-মাটি খুঁড়ছে। বুঝলুম, তারই এ কাজ। কিন্তু এতে তার লাভ কি? লোকটা পাগল নয় তো?

ভাবছি, এদিকে সে আবার একতাল মাটি নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হল। মস্ত লম্বা চেহারা, মস্ত লম্বা চুল আর দাড়ি, একরকম উলঙ্গ বললেই হয়—পরনে খালি একটুকরো কপনি। সে মাথা নিচু করে আসছিল, তাই আমাকে দেখতে পেলে না। কিন্তু সে কাছে আসবামাত্র আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে তখন মুখ-তুলে আমার দিকে চাইলে,—উঃ, কি ভয়ানক তার চোখ, ঠিক যেন দুখানা বড়ো বড়ো কয়লা দপ দপ করে জ্বলছে! এমন জ্বলন্ত চোখ আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে তুমি?'

উত্তরে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে সে এমন এক ভুতুড়ে চিৎকার করে উঠল যে, আমার বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল। মহাআতঙ্কে প্রাণপণে আমি দৌড় দিলুম, কিন্তু বেশিদূর যেতে-না-যেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আর কিছু আমার মনে নেই।'

ভোলার কথা শুনে বুঝলুম, সে লোকটা পিশাচ ছাড়া আর কিছু নয়। দুষ্ট প্রেতাত্মারা সুবিধা পেলেই মানুষের মৃতদেহের ভিতরে ঢুকে তাকে জ্যান্ত করে তোলে। মরা মানুষ এইভাবে জ্যান্ত হলেই তাকে পিশাচ বলে। এই রকম কোনও পিশাচই ভোলার ঠাকুমার দেহকে আগুন জ্বেলে আধপোড়া করে খেয়ে গেছে। ভোলাকেও নিশ্চয় সে ফলার করবার ফিকিরে ছিল, কেবল আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়তেই এ যাত্রা ভোলা বেঁচে গেল কোনওগতিকে।

সেবারে আমাদের মড়া পোড়াতে হল না!

পনেরো

দুটো জ্বলন্ত চোখ

বিমলের গল্প শুনে আমার আঁৎটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল, গুহার বাইরে আর

চাইতেই ভরসা হল না—কে জানে, সেখানে ঝোপঝাপের মধ্যে কোনও বিদকুটে চেহারা ওত পেতে বসে আছে হয়তো!

আমার মুখের ভাব দেখে বিমল হেসে বললে, 'ও কি হে কুমার, তোমার ভয় করছে নাকি?'

—'তা একটু একটু করছে বইকি।'

—'এই না বললে, তুমি ভূত মানো না?'

—'হুঁ, আগে মানতুম না, কিন্তু এখন আর মানি না বলে মনে হচ্ছে না।'

—'ভয় কি কুমার, আমার বিশ্বাস এ গল্পটার একবর্ণও সত্যি নয়, আগাগোড়া গাঁজাখুরি! ভূতের গল্পমাত্রই রূপকথা, পাছে লোকে বিশ্বাস না করে, তাই তাকে সত্যি বলে আসর জমানো হয়।'

কিন্তু তবু আমার মন মানল না, বিমলকে কিছুতেই আমার কাছছাড়া হতে দিলুম না। ভয়ের চোটে রামহরির রান্না রামপাখির মিষ্টি মাংস পর্যন্ত তেমন তারিয়ে খেতে পারলুম না।

গুহার বাইরের দিকে বিমল অনেকগুলো সরল কাঠ ছড়িয়ে আগুন জ্বেলে বললে, 'কোনও জীবজন্তু আর আগুন পেরিয়ে এগিয়ে আসতে পারবে না। তোমরা দুজনে এখন ঘুমোও—আমি জেগে পাহারা দিই'। আমার পর কুমারের পালা, তারপর রামহরির।'

ছাতকের ডাকবাংলোর সেই ব্যাপারের পর থেকে রোজ রাত্রেই আমরা এমনি পালা করে পাহারা দিই।

আমি আর রামহরি গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।...

মাঝরাত্রে বিমল আমাকে ঠেলে তুলে বললে, 'কুমার, এইবার তোমার পালা।'

শীতের রাত্রে লেপ ছাড়তে কি সাধ যায়—বিশেষ এই বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে! কিন্তু তবু উঠতে হল,—কি করি, উপায় তো আর নেই!

গুহার সামনের আগুন নিভে আসছিল, আরও খানকতক কাঠ তাতে ফেলে দিয়ে, কোলের উপরে বন্দুকটা নিয়ে দেয়াল ঠেসে বসলুম।

চাঁদ সেদিন মাঝরাত্রের আগেই অস্ত গিয়েছিল, বাইরে ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। পাহাড়, বন, ঝোপঝাপ সমস্ত মুছে দিয়ে, জেগে আছে খালি অন্ধকারের এক সীমাহীন দৃশ্য, আর তারই ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে ঝরনার অশ্রান্ত ঝর্ঝর, শত শত গাছের একটানা মর-মর, লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির একঘেয়ে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ—।

হঠাৎ আর একরকম শব্দ শুনলুম। ঠিক যেন অনেকগুলো আঁতুড়ের শিশু কাঁদছে ট্যাঁয়্যা—ট্যাঁয়্যা—ট্যাঁয়্যা!

আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, এই নিশুতি রাতে, এমন বন-বাদাড়ে এতগুলো মানুষের শিশু এল কোত্থেকে? একে আজ বিশ্রী একটা ভূতের গল্প শুনেছি, তার উপরে গহন বনের এক থমথমে অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে আবার এই বেয়াড়া চিৎকার! মনের ভিতরে জেগে উঠল যত-সব অসম্ভব কথা।

আবার সেই অদ্ভুত কাঁদুনি!

আমার মনে হল এ অঞ্চলের যত ভূত-পেত্নী বাসা ছেড়ে চরতে বেরিয়ে গেছে, আর বাপ-মায়ের দেখা না পেয়ে ভুতুড়ে খোকারা এক সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কান্নার কনসার্ট।

ভয়ে সিঁটিয়ে ভাবছি—আর একটু কোণ ঘেঁসে বসা যাক, এমন সময়ে—ও কি ও!

গুহার বাইরে—অন্ধকারের ভিতরে দুদুটো জ্বলন্ত কয়লার মতন চোখ একদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে আছে!

বুক আমার উড়ে গেল—এ চোখদুটো যে ঠিক সেই শ্মশানের পিশাচের মতো!...এখানে পিশাচ আছে নাকি?

ধীরে ধীরে চোখদুটো আরও কাছে এগিয়ে এসে আবার স্থির হয়ে রইল। আমার মনে হল, আঁধার সমুদ্রে সাঁতার কাটছে যেন দুটো আগুনভাঁটা।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না—ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা কোনও রকমে তুলে ধরে দিলুম তার ঘোড়া টিপে—গুড়ুম করে ভীষণ এক আওয়াজ হল,—সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চোখদুটো গেল নিভে।

বন্দুকের শব্দে বিমল, রামহরি আর বাঘা একসঙ্গেই জেগে উঠল, বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে—'কুমার, কুমার, ব্যাপার কি?'

আমি বললুম, 'পিশাচ, পিশাচ!'

—'পিশাচ কি হে?'

—'হ্যাঁ, ভয়ানক একটা পিশাচ এসে দুটো জ্বলন্ত চোখ মেলে আমার পানে তাকিয়েছিল, আমি তাই বন্দুক ছুড়েছি!'

বিমল তখনই আমার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিলে। তারপর একহাতে লণ্ঠন, আর একহাতে বন্দুক নিয়ে আগুন টপকে গুহার বাইরে গিয়ে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে এসে বললে, 'কোথাও কিছু নেই। ভূতের গল্প শুনে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কুমার, তুমি ভুল দেখেছ।'

এমন সময় আবার সেই ভুতুড়ে খোকারা কোত্থেকে কেঁদে উঠল।

আমি মুখ শুকিয়ে বললুম, 'ওই শোনো।'

—'কি?'

—'ভূতেদের খোকারা কাঁদছে। রামহরি, তুমিও শুনেছো তো?'

বিমল আর রামহরি দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হাসি শুরু করে দিলে।

আমি রেগে বললুম, 'তোমরা হাসছ যে? এ কি হাসির কথা?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'শহরের বাইরে তো কখনও পা দাওনি, শহর ছাড়া দুনিয়ার কিছুই জানো না—এখনও একটি আস্ত বুড়ো খোকা হয়ে আছ। যা শুনছ, তা ভূতেদের খোকার কান্না নয়, বকের ছানার ডাক।'

—'বকের ছানার ডাক।'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কাছেই কোনও গাছে বকের বাসা আছে। বকের ছানার ডাক অনেকটা কচিছেলের কান্নার মতো।'

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখদুটো তো মিথ্যে নয়! বিমল যতই উড়িয়ে দিক, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—আর আমি যে ভুল দেখিনি, তা দিব্যি-গেলে বলতে পারি।

কিন্তু আজ যে রকম বোকা বনে গেছি, তাতে এদের কাছে সে ব্যাপার নিয়ে আপাতত কোনও উচ্চবাচ্য না করাই ভালো।

ষোলো

'পিশাচ' রহস্য

পরের দিন সকালে উঠে দেখি, আর এক মুশকিল। রামহরির কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। কাজেই সেদিন আমাদের সেখানেই থেকে যেতে হল—জ্বর-গায়ে রামহরি তো আর পথ চলতে পারে না! ক্রমাগত পথ চলে চলে আমাদেরও শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল, কাজেই এই হঠাৎ-পাওয়া ছুটিটা নেহাত মন্দ লাগল না।

সেদিনও বিমল দুটো পাখি মেরে আনলে, নিজের হাতেই আমরা রান্নার কাজটা সেরে নিলুম।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালকের রাতের সেই ভুতুড়ে ব্যাপারটার কথা আবার আমার মনে পড়ে গেল। বিমলের কাছে সে কথা তুলতে-না-তুলতেই সে হেসেই সব উড়িয়ে দিলে। আমি কিন্তু অত সহজে মনটাকে হালকা করে ফেলতে পারলুম না—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাপ রে!

সেদিনও সরল কাঠের আগুন জ্বেলে গুহার মুখটা আমরা বন্ধ করে দিলুম। আজ রামহরির অসুখ,—কাজেই আমাদের দুজনকেই পালা করে পাহারা দিতে হবে। আজও প্রথম রাতে পাহারার ভার নিলে বিমল নিজে।

যখন আমার পালা এল, তখন গভীর রাত্রি। আজও চাঁদ ডুবে গেছে, আর অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে নানা অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে সেই গাছের পাতার মর্মরানি, ঝরনার ঝর্ঝরানি আর বকের ছানাদের কাতরানি।

গুহার মুখের আগুনটা কমে আসছে দেখে আমি কতকগুলো চ্যালাকাঠ তার ভিতরে ফেলে দিলুম। তারপরেই শুনলুম কেমন একটা শব্দ—গুহার বাইরে কে যেন খড়মড় করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রাণপণে তাকিয়েও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বিন্দুবিসর্গ কিছুই দেখতে পেলুম না, শব্দটাও একটু পরে থেমে গেল।

কিন্তু আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বাঘা মনের সুখে কুণ্ডলী পাকিয়ে, পেটের ভিতরে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছিল, আমি তাকে জাগিয়ে দিলুম। বাঘা উঠে একটা হাই তুলে আর মাটির উপর ডন দিয়ে নিয়ে, আমার পাশে এসে দুই থাবা পেতে বসল। একহাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলুম।

আবার সেই শব্দ! বাঘার দিকে চেয়ে দেখলুম, সেও দুই কান খাড়া করে ঘাড় বাঁকিয়ে শব্দটা শুনছে। তারপরেই সে একলাফে গুহার মুখে গিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের জন্যে বাইরে যেতে না পেরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে গরগর করতে লাগল।

তার গজরানিতে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল, উঠে বসে সে বললে, 'আজ আবার কি ব্যাপার! বাঘা অমন করছে কেন?'

আমি বললুম, 'বাইরে কিসের একটা শব্দ হচ্ছে, কে যেন চলে বেড়াচ্ছে।'

'সে কি কথা!'—বলেই বিমল এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলে।

শব্দটা তখন থেমে গেছে—কিন্তু ও কি ও! আবার যে সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারের ভিতর থেকে কটমট করে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে!

বাঘা ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল, আমিও বলে উঠলুম—'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো!'

বিমল এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলে।

কিন্তু আমি বলবার আগেই বিমল দেখেছিল, সে মুখে কিছু বললে না, চোখদুটোর দিকে বন্দুকটা ফিরিয়ে একমনে টিপ করতে লাগল।

চোখদুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল—হঠাৎ বিমল বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুম করে শব্দ, আর একটা ভীষণ গর্জন, তারপরেই সব চুপ, চোখদুটোও আর নেই!

বিমল আমার দিকে ফিরে বললে, 'এই চোখদুটোই কাল তুমি দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ। এইবার তোমার বিশ্বাস হল তো?'

—'তা হয়েছে বটে, কিন্তু এ পিশাচের নয়, বাঘের চোখ।'

—'বাঘ?'

—'হ্যাঁ। বোধহয় এতক্ষণে সে লীলাখেলা সাঙ্গ করেছে, তবু বলা তো যায় না, আজ রাত্রে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই—কি জানি একেবারে যদি মরে না থাকে—আহত বাঘ ভয়ানক জীব।'

পরদিন সকালে উঠে দেখলুম—বিমল যা বলেছে তাই! গুহার মুখ থেকে খানিক তফাতে, পাহাড়ের উপরে একটা মরা বাঘ পড়ে রয়েছে—আমরা মেপে দেখলুম—পাকা ছয় হাত লম্বা। বিমলের টিপ আশ্চর্য, বন্দুকের গুলি বাঘটার ঠিক কপালে গিয়ে লেগেছে।

সতেরো

মরণের মুখে

দিন-তিনেক পর রামহরির অসুখ সেরে গেল, আমাদেরও যাত্রা আবার শুরু হল। আবার আমরা পাহাড়ের পথ ধরে অজানা রহস্যের দিকে এগিয়ে চললুম।

বিমল বললে, 'আমি একটু এগিয়ে যাই, আজকের পেটের খোরাক জোগাড় করতে হবে তো,—পাখি-টাখি কিছু মেলে কিনা দেখা যাক।'—এই বলে সে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল, খানিক পরেই আঁকাবাঁকা পথের উপরে আর তাকে দেখা গেল না—কেবল শুনতে পেলুম গলা ছেড়ে সে গান ধরেছে—

'আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!'

ক্রমে সে গানের আওয়াজও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রামহরির শরীর তখনও বেশ কাহিল হয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না, কাজেই আমাকে বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হল।

সেদিন সকালের রোদটি আমার ভারি ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন সারা পাহাড়ের বুকের উপরে কে কাঁচা সোনার মতো মিঠে হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে! হরেকরকম পাখির গানে চারিদিক মাত হয়ে আছে, গাছপালার উপরে সবুজের ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আর এখানে-ওখানে আশেপাশে গোছা-গোছা রঙিন বনফুল ফুটে, সোহাগে দুলে দুলে মাথা নেড়ে যেন বলছে—'আমাদের নিয়ে মালা গাঁথো, আমাদের আদর করো, আমাদের মনে রেখো—ভুলো না!'

কচি-কচি ফুলগুলিকে দেখে মনে হল, এরা যেন বনদেবীর খোকা-খুকি। আমি বেছে বেছে অনেক ফুল তুললুম, কিন্তু কত আর তুলব—এত ফুল দুনিয়ার কোনও ধনীর মস্ত মস্ত বাগানেও যে ধরবে না!

এমনি নানা জাতের ফুল এদেশের সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশ যে কত বড়ো ফুলের দেশ, আমরা নিজেরাই সে খবর রাখি না। আমরা বোকার মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকি, আর এই সব ফুলের ভাণ্ডার দু হাতে লুট করে নিয়ে যায় বিদেশি সাহেবরা। তারপর বড়ো বড়ো শহরের বাজারে সেই সব ফুল চড়া দামে বিকিয়ে যায়—কেনে অবশ্য সাহেবরাই বেশি। এ থেকেই বেশ বুঝতে পারি, আমাদের ব্যবসাবুদ্ধি তো নেই-ই—তারপরে সবচেয়ে যা লজ্জার কথা, স্বদেশের জিনিসকেও আমরা আদর করতে শিখিনি।

এই ভাবতে ভাবতে পথ চলছি, হঠাৎ রামহরি বলে উঠল, 'ছোটোবাবু দেখুন—দেখুন!'

আমি ফিরে বললুম, 'কি?'

রামহরি আঙুল দিয়ে মাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পথের উপর একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে। দেখেই চিনতে পারলুম, সে বিমলের বন্দুক।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পথের মাঝখানে বন্দুক ফেলে বিমল গেল কোথায়? সে তো বন্দুক ফেলে যাবার পাত্র নয়!

ব্যাপারটা সুবিধের নয়, একটা কিছু হয়েছেই। তারপর মুখ তুলেই দেখি বাঘা একমনে একটা জায়গা শুঁকছে, আর একটা কাতর কুঁই-কুঁই শব্দ করছে।

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখি, সেখানে খানিকটা রক্ত চাপ বেঁধে রয়েছে।

রামহরি প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, 'খোকাবাবু নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়েছেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ রামহরি, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কি বিপদ?'

রামহরি বললে, 'কি করে বলব ছোটোবাবু, এখানে যে বাঘ-ভাল্লুক সবই আছে।'

আমি বললুম, 'বাঘে মানুষ খায় বটে, কিন্তু ব্যাগ নিয়ে তো যায় না! বিমল বাঘের মুখে পড়েনি, তাহলে বন্দুকের সঙ্গে তার ব্যাগটাও এখানে পড়ে থাকত।'

—'তবে খোকাবাবু কোথায় গেলেন?' এই বলেই রামহরি চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকবার উপক্রম করলে।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'চুপ, চুপ,—চেঁচিয়ো না। আমার বিশ্বাস বিমল শত্রুর হাতে পড়েছে, আর শত্রুরা কাছেই আছে, চ্যাঁচালে আমরাও এখনই বিপদে পড়ব।'

—'তাহলে উপায়?'

—'তুমি এইখানে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকো। বাঘাকেও ধরে রাখো, নইলে বাঘাও হয়তো চেঁচিয়ে আমাদের বিপদে ফেলবে। আমি আগে এদিক-ওদিক একবার দেখে আসি।'

বাঘার গলায় শিকলি বেঁধে রামহরি পথের পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসল।

প্রথমে কোনদিকে যাব আমি তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু একটু পরেই দেখলুম, খানিক তফাতে আরও রক্তের দাগ রয়েছে—আরও খানিক এগিয়ে দেখলুম আরও রক্তের দাগ। তৃতীয় দাগের পরেই একটা ঝোপের পাশে খুব সরু পথ, সেই পথের উপরে লম্বা দাগ—যেন কারা একটা মস্ত বড়ো মোট ধুলোর উপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমি সেই সরু পথ ধরলুম—সে পথেও মাঝে মাঝে রক্তের দাগ দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে, এইদিকে গেলেই বিমলের দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু বিমল বেঁচে আছে কি? এ রক্ত কার? তাকে ধরে নিয়ে গেলই বা কারা? সে কি ডাকাতের হাতে পড়েছে?—কিন্তু এসব কথার কোনও উত্তর মিলল না।

আচম্বিতে আমার পা থেমে গেল—খুব কাছেই যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে।

আমার হাতের বন্দুকটা একবার পরখ করে দেখলুম, তার দুটো ঘরেই টোটা ভরা আছে। তারপর ঝোপের পাশে পাশে গুঁড়ি মেরে খুব সন্তর্পণে সামনের দিকে অগ্রসর হলুম।

আর বেশি এগুতে হল না—সরু পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে অল্প খানিকটা খালি জমি, তারপরেই পাহাড়ের খাদ।—

যে দৃশ্য দেখলুম জীবনে তা ভুলব না। সেই খোলা জমির উপরে জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে—তাদের একজনকে দেখেই চিনলুম সে করালী।

আর একদিকে পাহাড়ের খাদের ধারেই একটা বড়ো গাছ হেলে পড়েছে এবং তারই তলায় পড়ে রয়েছে বিমলের দেহ। তার মাথা ও মুখ রক্তমাখা, আর হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধা। বিমলের উপরে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে করালীর দলের আর একটা লোক।

শুনলুম, করালী চেঁচিয়ে বলছে, 'বিমল, এখনও কথার জবাব দাও। তোমার ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই নেই, সেখানা কোথায় আছে বলো।'

কিন্তু বিমল কোনও উত্তর দিলে না।

—'তাহলে তুমি মরতে চাও?'

বিমল চুপ।

করালী বললে, 'শম্ভু!'

যে লোকটা দড়ি ধরেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আজ্ঞে।'

লোকটাকে চিনলুম, ছাতকের ডাকবাংলোয় দেখেছিলুম।

করালী বললে, 'দ্যাখো শম্ভু, আর এক মিনিটের মধ্যে বিমল যদি আমার কথার জবাব না দেয়, তবে তুমি ওকে তুলে খাদের ভেতরে ছুড়ে ফেলে দিয়ো।'

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, আমার বুকটা ধুকপুক করতে লাগল, কি যে করব কিছুই স্থির করতে পারলুম না।

করালী বললে, 'বিমল, এই শেষবার তোমাকে বলছি। যদি সাড়া না দাও, তোমার কি হবে বুঝতে পারছ তো? একেবারে হাজার ফুট নিচে তোমার দেহ গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে, একটু চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।'

বিমল তেমনি বোবার মতন রইল।

আর এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব। ঠিক করলুম করালী যা জানতে চায়, আমিই তার সন্ধান দেব। কাজ নেই আর যকের ধনে, টাকার চেয়ে প্রাণ ঢের বড়ো জিনিস। মনস্থির করে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

করালী বললে, 'বিমল, এখনও তুমি চুপ করে আছ?'

এতক্ষণ পরে বিমল বললে, 'পকেট-বই পেলেই তো তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?'

করালী বললে, 'নিশ্চয়।'

বিমল বললে, 'ব্যাগের মধ্যে আমার একটা জামার ভেতর-দিককার পকেট খুঁজলেই তুমি পকেট-বই পাবে।'

ব্যাগটা করালীর সামনেই পড়েছিল, সে তখনই তার ভিতরে হাত পুরে দিল। একটু চেষ্টার পরেই পকেট-বই বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে করালীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু এ হাসি দেখে এত বিপদেও আমার হাসি পেল। কারণ আমি জানি, পকেট-বই থেকে পথের ঠিকানার কথা বিমল আগেই মুছে দিয়েছে। এত বিপদেও বিমল ভয় পেয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি,—ধন্যি ছেলে যা হোক!

বিমল বললে, 'তোমাদের মনের আশা তো পূর্ণ হল, এইবার আমাকে ছেড়ে দাও।'

করালী কর্কশ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব বইকি—শত্রুর শেষ রাখব না। শম্ভু, আর কেন, ছোঁড়াকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দাও।'

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'করালী! শয়তান! তুমি—'

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই শম্ভু বিমলকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে একেবারে ঠেলে ফেলে দিলে এবং চোখের পলক না পড়তেই বিমলের দেহ ঝুপ করে নিচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের উপরে একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এল এবং মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে আবার আমি শুনলুম—করালীর সেই ভীষণ অট্টহাসি!... তারপরেই আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আঠারো

অবাক কাণ্ড

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলুম জানি না। যখন জ্ঞান হল, চোখ চেয়ে দেখলুম, রামহরি আমার মুখের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। আমাকে চোখ চাইতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বললে, 'কি হয়েছে ছোটোবাবু, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কেন?'

কেন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, প্রথমটা আমার তা মনে পড়ল না—আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলুম—একেবারে বোবার মতো।

রামহরি বললে, 'তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার ভারি ভয় হল। বাঘাকে সেইখানেই বেঁধে রেখে তোমাকে খুঁজতে আমিই এইদিকে এলুম—'

এতক্ষণে আমার সব কথা মনে পড়ল—রামহরিকে বাধা দিয়ে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে বললুম, 'রামহরি, রামহরি—আমিও ওদের খুন করব।'

রামহরি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কাদের খুন করবে ছোটোবাবু, তুমি কি বলছ?'

বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমি বললুম, 'যারা বিমলকে খাদে ফেলে দিয়েছে।'

—'খোকাবাবুকে খাদে ফেলে দিয়েছে? অ্যাঁ—অ্যাঁ, রামহরি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি বললুম, 'এখন তোমার কান্না রাখো রামহরি। এখন আগে চাই প্রতিশোধ। নাও, ওঠো—বিমলের বন্দুকটা নিয়ে এইদিকে এসো।'

আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালুম—ঠিক করলুম সামনে যাকে দেখব তাকেই গুলি করে মেরে ফেলব কুকুরের মতো।

কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই। খাদের পাশে খোলা জমি ধু-ধু করছে—সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পেলুম না।

রামহরি পিছন থেকে বললে, 'তুমি কাকে মারতে চাও ছোটোবাবু?'

দাঁতে দাঁত ঘষে আমি বললুম, 'করালীকে। কিন্তু এর মধ্যেই দলবল নিয়ে সে কোথায় গেল?'

—'করালী'—স্তম্ভিত রামহরির মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না।

—'হ্যাঁ রামহরি, করালী। তারই হুকুমে বিমলকে ফেলে দিয়েছে।'

রামহরি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কোনখানে খোকাবাবুকে ফেলে দিয়েছে?'

আমারও গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে হতাশভাবে আমি বললুম, 'রামহরি, বিমলের খোঁজ নেওয়া আর মিছে। ...ওইখানে থেকে হাত-পা বেঁধে তাকে খাদের ভেতর ফেলে দিয়েছে। অত উঁচু থেকে ফেলে দিলে লোহাই গুঁড়ো হয়ে যায়, মানুষের দেহ তো সামান্য ব্যাপার। বিমলকে আর আমরা দেখতে পাব না!'

রামহরি মাথায় করাঘাত করে বললে, 'খোকাবাবু সঙ্গে না থাকলে কোন মুখে আবার মা-ঠাকরুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াব? না, এ প্রাণ আমি রাখব না। আমিও পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।' এই বলে সে খাদের ধারে ছুটে গেল।

অনেক কষ্টে আমি তাকে থামিয়ে রাখলুম। তখন সে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

যেখান থেকে বিমলকে নিচে ফেলে দিয়েছে, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর ধারের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলুম, বিমলের দেহটা নজরে পড়ে কিনা।

নিচের দিকে তাকাতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। উঃ, এমন গভীর খাদ জীবনে আমি কখনও দেখিনি—ঠিক খাড়াভাবে নিচের দিকে কোথায় যে তলিয়ে গেছে, তা নজরেই ঠেকে না! তলার দিকটা একেবারে ধোঁয়া ধোঁয়া—অস্পষ্ট!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পনেরো নিচেই পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা বুনো গাছের পুরু ঝোপ দেখা যাচ্ছে,—আর—আর সেই ঝোপের উপরে কি ওটা?—ও যে মানুষের দেহের মতো দেখতে!

প্রাণপণে চেঁচিয়ে আমি বললুম, 'রামহরি, দেখবে এসো!'

রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের উপরে দেহটাও নড়ে উঠল।

দেখতে দেখতে বিমলের দেহ পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এল।

আমি ডাকলুম, 'বিমল, বিমল।'

নিচে থেকে সাড়া এল, 'কুমার এখনও আমি বেঁচে আছি ভাই।'

আবার আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলুম—আনন্দের প্রচণ্ড আবেগে। রামহরি তো আমোদে আটখানা হয়ে নাচ শুরু করে দিলে।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমি বললুম, 'রামহরি, ধেই ধেই করে নাচলে তো চলবে না, আগে বিমলকে ওখান থেকে তুলে আনতে হবে যে!'

রামহরি তখনই নাচ বন্ধ করে, চোখ কপালে তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাই তো ছোটোবাবু, ওখানে আমরা কি করে যাব, নামবার যে কোনও উপায় নেই!'

উঁকি মেরে দেখলুম বিমলের কাছে যাওয়া অসম্ভব—পাহাড়ের গা বেয়ে মানুষ তো আর টিকটিকির মতো নিচে নামতে পারে না! ওদিকে বিমল যে রকম বেকায়দায় হাজার ফুট নিচু খাদের তুচ্ছ একটা ঝোপের উপরে আটকে আছে—

এমন সময়ে নিচে থেকে বিমলের চিৎকার আমার ভাবনায় বাধা দিলে। শুনলুম বিমল চেঁচিয়ে বলছে, 'কুমার, শিগগির আমাকে তুলে নাও,—আমি ক্রমেই নিচের দিকে সরে যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে আমি বললুম, 'কিন্তু কি করে তোমার কাছে যাব বিমল?'

বিমল বললে, 'আমার ব্যাগের ভেতরে দড়ি আছে, সেই দড়ি আমার কাছে নামিয়ে দাও।'

—'কিন্তু তোমার হাত-পা যে বাঁধা, দড়ি ধরবে কেমন করে?'

—'কুমার, কেন মিছে সময় নষ্ট করছ, শিগগির দড়ি ঝুলিয়ে দাও।'

বিমলের ব্যাগটা সেইখানেই পড়ে ছিল—ভাগ্যে করালীরা সেটাও নিয়ে যায়নি! রামহরি তখনই তার ভিতর থেকে খানিকটা মোটা দড়ি বার করে আনলে।

জোর বাতাস বইছে আর প্রতি দমকাতেই ঝোপটা দুলে দুলে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমলের দেহ নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কি ভয়ানক অবস্থা তার! আমার বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বিমল বললে, 'দড়িটা ঠিক আমার মুখের কাছে ঝুলিয়ে দাও। আমি দাঁত দিয়ে দড়িটা ভালো করে কামড়ে ধরলে পর তোমরা দুজনে আমাকে ওপরে টেনে তুলো।'

আমি একবার সার্কাসে একজন সাহেবকে দাঁত দিয়ে আড়াই মণ ভারী মাল টেনে তুলতে দেখেছিলুম। জানি বিমলের গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু তার দাঁত কি তেমন শক্ত হবে?

হঠাৎ বিষম একটা ঝোড়ো বাতাস এসে ঝোপের উপরে ধাক্কা মেরে বিমলের দেহকে আরও খানিকটা নিচের দিকে নামিয়ে দিলে—কোনওরকমে দেহটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বিমল একরকম আলগোছেই শূন্যে ঝুলতে লাগল। তার প্রাণের ভিতরটা তখন যে কি রকম করছিল, সেটা তার মড়ার মতো সাদা মুখ দেখেই বেশ বুঝতে পারলুম। হাওয়ার আর একটা দমকা এলেই বিমলকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি দড়ি ঝুলিয়ে দিলুম—একেবারে বিমলের মুখের উপরে। বিমল প্রাণপণে দড়িটা কামড়ে ধরলে।

আমি আর রামহরি দুজনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগলুম—দেখতে দেখতে বিমলের দেহ

পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এল; তার মুখ তখন রক্তের মতন রাঙা হয়ে উঠেছে—সামান্য দাঁতের জোরের উপরেই আজ নির্ভর করছে তার বাঁচন-মরণ!

রামহরি বললে, 'ছোটোবাবু, তুমি একবার একলা দড়িটা ধরে থাকতে পারবে? আমি তাহলে খোকাবাবুকে হাতে করে ওপরে তুলে নিই।'

আমি বললুম, 'পারব।'

রামহরি দৌড়ে গিয়ে বিমলকে একেবারে পাহাড়ের উপরে, নিরাপদ স্থানে তুলে ফেললে। তারপর তাকে নিজের বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে কাঁদতে লাগল। আমি গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিলুম।

বললুম, 'বিমল, কি করে তুমি ওদের হাতে গিয়ে পড়লে?'

বিমল বললে, 'নিজের মনে গান গাইতে গাইতে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, ওরা বোধহয় পথের পাশে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারে, আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।'

আমি বললুম, 'তারপর যা হয়েছে, আমি সব দেখেছি। তোমাকে যে আবার ফিরে পাব, আমরা তা একবারও ভাবতে পারিনি।'

বিমল হেসে বললে, 'হ্যাঁ, এতক্ষণে নিশ্চয় আমি পরলোকে ভ্রমণ করতুম—কিন্তু ভাগ্যে ঠিক আমার পায়ের তলাতেই ঝোপটা ছিল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

আমি মিনতির স্বরে বললুম, 'বিমল, আর আমাদের যকের ধনে কাজ নেই—প্রাণ নিয়ে ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে যাই চলো।'

বিমল বললে, 'তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমার ভয় হয়, তুমি যাও। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।'

উনিশ

গাছের ফাঁকে ফাঁড়া

আবার আমাদের চলা শুরু হয়েছে। এবার আমরা প্রাণপণে এগিয়ে চলেছি। পিছনে যখন শত্রু লেগেছে, তখন যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছানো যায়, ততই মঙ্গল।

কত বন-জঙ্গল, কত ঝরনা, খাদ, কত পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়েই যে আমরা চলেছি আর চলেছি, তার আর কোনও ঠিকানা নেই। মাঝে মাঝে আমার মনে হতে লাগল, আমরা যেন চলবার জন্যেই জন্মেছি, আমরা যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খালি চলবই আর চলবই! দুপুরবেলায় পাহাড় যখন উনুনে পোড়ানো চাটুর মতো বিষম তেতে ওঠে, কেবল সেই সময়টাতেই আমরা চলা থেকে রেহাই পেয়ে রেঁধে-খেয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিই। রাত্রে জ্যোৎস্না না থাকলে দায়ে পড়ে আমাদের বিশ্রাম করতে হয়। নইলে চলতে চলতে রোজ আমরা দেখি,—আকাশে ঊষার রঙিন আভাস, মস্ত এক ফাগের থালার মতন প্রথম সূর্যের উদয়, বনের পাখির ডাকে সারা পৃথিবীর জাগরণ—সন্ধ্যার আভাসে মেঘে মেঘে রামধনুকের সাতরঙা

সমারোহের মধ্যে সূর্যের বিদায়, তারপর পরীলোক থেকে উড়িয়ে দেওয়া ফানুসের মতো চাঁদের প্রকাশ। আবার, সেই চাঁদই কতদিন আমাদের চোখের সামনেই ক্রমে ম্লান হয়ে প্রভাতের সাড়া পেয়ে মিলিয়ে যায়,—ঠিক যেন স্বপ্নের মায়ার মতন!'

কিন্তু করালীর আর দেখা নেই কেন? এতদিনে আবার তার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া উচিত ছিল—কারণ এখন সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে, পকেট-বইয়ে পথের কোনও ঠিকানাই লেখা নেই। সে কি হতাশ হয়ে আমাদের পিছন ছেড়ে সরে পড়েছে, না আবার কোনদিন হঠাৎ কালবোশেখীর মতোই আমাদের সামনে এসে মূর্তিমান হবে?

এমনিভাবে দিনরাত চলতে চলতে শেষে একদিন আমরা রূপনাথের গুহার সুমুখে এসে দাঁড়ালুম। শুনেছি এই গুহার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে সুদূর চীনদেশে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। একবার এক চীনসম্রাট নাকি এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন। অবশ্য, এটা ইতিহাসের কথা নয়, প্রবাদেই এ কথা বলে। রূপনাথের গুহা বড়ো হোক আর ছোটো হোক তাতে কিছু এসে যায় না, আর তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। কিন্তু এখানে এসে আমরা অস্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—কেননা এতদিন আমরা এই গুহার উদ্দেশেই এগিয়ে আসছিলুম এবং এখানে পৌঁছে অন্তত এইটুকু বুঝতে পারলুম যে, এইবার আমরা নিশ্চয়ই পথের শেষ দেখতে পাব। কারণ যে জায়গায় যকের ধন আছে, এখান থেকে সে জায়গাটা খুবই কাছে—মাত্র দিন-তিনেকের পথ।

বিমল হাসিমুখে একটা গাছতলায় বসে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

আমি তার পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'বিমল, এখনই অতটা স্ফূর্তি ভালো নয়!'

বিমল ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেন?'

—'মনে করো, বৌদ্ধমঠে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে, যকের ধন সেখানে নেই,—তাহলে?'

—'কেনই বা থাকবে না?'

—'যে সন্ন্যাসী আমার ঠাকুরদাদাকে মড়ার মাথা দিয়েছিল, সে যে বাজে কথা বলেনি, তার প্রমাণ?'

—'না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্ন্যাসী সত্য কথাই বলেছে। অকারণে মিছে কথা বলে তার কোনও লাভ ছিল না তো!'

আমি আর কিছু বললুম না।

বিমল বললে, 'ওসব বাজে ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ কোরো না। আপাতত আজকের মতো এখানে বসেই বিশ্রাম করো। তারপর কাল আবার আমরা বৌদ্ধমঠের দিকে চলতে শুরু করব।'

সূর্য অস্ত গিয়েছে। কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। পশ্চিমের আকাশে রঙের খেলা তখনও মিলিয়ে যায়নি—দেখলে মনে হয়, কারা যেন মেঘের গায়ে নানা রঙের জলছবি মেরে দিয়ে গেছে।

সেদিনের বাতাসটি আমার ভারি মিষ্টি লাগছিল। বিমল নিজের মনে গান গাইছে, আর আমি চুপ করে বসে শুনছি—তার গান বাস্তবিকই শোনবার মতো। এইভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ সামনের জঙ্গলের দিকে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বেশ দেখলুম, একটা গাছের আড়াল থেকে করালীর কুৎসিত মুখখানা উঁকি মারছে! কুতকুতে চোখ দুটো তার গোখরো সাপের মতো তীব্র হিংসায় ভরা। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্র মুখখানা বিদ্যুতের মতো সাঁৎ করে সরে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলের গা টিপলুম, বিমল চমকে গান থামিয়ে ফেললে।

একটা গাছের আড়াল থেকে করালীর কুৎসিৎ মুখখানা উঁকি মারছে!

চুপিচুপি বললুম, 'করালী!'

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কই?'

আমি সামনের জঙ্গলের গাছটার দিকে দেখিয়ে বললুম, 'ওইখানে।'

বিমল তখনই সেইদিকে যাবার উপক্রম করলে। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'না যেয়ো না। হয়তো করালীর লোকেরাও ওখানে লুকিয়ে আছে। আচমকা বিপদে পড়তে পারো।'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না, কুমার। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এখনই ছুটে গিয়ে শয়তানের টুঁটি টিপে ধরি।'

আমি বললুম, 'না, না, চলো, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। করালী ভাবুক, আমরা ওদের দেখতে পাইনি। তারপরে ভেবে দেখা যাবে আমাদের কি করা উচিত।'

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা সেখান থেকে চলে এলুম। বেশ বুঝলুম, করালী যখন আমাদের এত কাছে কাছে আছে, তখন কোনও-না-কোনও দিক দিয়ে একটা নতুন বিপদ আসতে আর বড়ো দেরি নেই। যকের ধনের কাছে এসেছি বলে আমাদের মনে যে আনন্দের উদয় হয়েছিল, করালীর আবির্ভাবে সেটা আবার কর্পূরের মতন উবে গেল। কি মুশকিল, এই রাহুর গ্রাস থেকে কি কিছুতেই আমরা ছাড়ান পাব না?

বিশ

পথের বাধা

কি দুর্গম পথ! কখনও প্রায় খাড়া উপরে উঠে গেছে, কখনও পাহাড়ের শিখরের চারিদিকে পাক খেয়ে, আবার কখনও বা ঘুটঘুটে অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে পথটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ পথে নিশ্চয় লোক চলে না, কারণ পথের মাঝে মাঝে এমন সব কাঁটা-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে যে, কুড়ুল দিয়ে কেটে না পরিষ্কার করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ে যদি পথের ঠিকানা ভালো করে না লেখা থাকত, তাহলে নিশ্চয় আমরা এদিকে আসতে পারতুম না। পকেট-বইখানা এখন আমাদের কাছে নেই বটে, কিন্তু পথের বর্ণনা আমরা আলাদা কাগজে টুকে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছিলুম।

পথটা খারাপ বলে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেও পারছিলুম না। বিশ মাইল পথ আমরা অনায়াসে একদিনেই পেরিয়ে যেতুম, কিন্তু এই পথটা পার হতে আমাদের ঠিক পাঁচদিন লাগল।

কাল থেকে মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোনও মানুষ নেই। চারিদিক এত নির্জন আর নিস্তব্ধ যে, নিজেদের পায়ের শব্দে আমরা নিজেরাই থেকে থেকে চমকে উঠছি। মাঝে মাঝে বাঘা যেই ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, আর অমনি চারিধারে পাহাড়ে পাহাড়ে এমন বিষম প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে যে, আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়ের শিখরগুলো যেন হঠাৎ আমাদের [illegible] শব্দে জ্যান্ত হয়ে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে। পাখিগুলো পর্যন্ত আমাদের সাড়া পেয়ে কিচি[illegible] মিচির করে ডেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে পালাচ্ছে—যেন এ পথে আব কখনও তারা মানুষকে হাঁটতে দেখেনি!

পাঁচদিনের দিন, সন্ধ্যার কিছু আগে, খানিক তফাত থেকে আমাদের চোখের উপরে আচম্বিতে এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠল। সারি সারি মন্দিরের মতন কতকগুলো বাড়ি—সমস্তই যেন মিশকালো রঙে তুলি ডুবিয়ে, আগুনের মতো রাঙা আকাশের পটে কে এঁকে রেখেছে। একটা উঁচু পাহাড়ের শিখরের উপরে মন্দিরগুলো গড়া হয়েছে। এই নিস্তব্ধতার রাজ্যে শিখরের উপরে মুকুটের মতো সেই মন্দিরগুলোর দৃশ্য এমন আশ্চর্যরকম গম্ভীর যে, বিস্ময়ে আর সম্ভ্রমে খানিকক্ষণ আমরা আর কথাই কইতে পারলুম না।

সকলের আগে কথা কইল বিমল। মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—'বৌদ্ধমঠ!'

আমিও বলে উঠলুম—'যকের ধন!'

রামহরি বললে, 'আমাদের এতদিনের কষ্ট সার্থক হল।'

বাঘা আমাদের কথা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু এটা অনায়াসে বুঝে নিলে যে, আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছি। সেও তখন আমাদের মুখের পানে চেয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

—খবরদার! আর এগিয়ো না, দাঁড়াও!

আনন্দের প্রথম আবেগ কোনওরকমে সামলে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলুম। মঠ তখনও আমাদের কাছ থেকে প্রায় মাইল-খানেক তফাতে ছিল—আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম, আজকেই ওখানে না গিয়ে কিছুতেই আর বিশ্রাম করব না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠল। বিমল আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। আচমকা সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল—'সর্বনাশ।'

আমি বললুম, 'কি হল বিমল?'

বিমল বললে, 'উঃ মরতে মরতে ভয়ানক বেঁচে গেছি!'

—'কেন, কেন?'

—'খবরদার! আর এগিয়ো না, দাঁড়াও! এখানে পাহাড় ধ্বসে গেছে, আর পথ নেই!'

মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়ল—পথ নেই! বিমল বলে কি? সাবধানে দু-চার পা এগিয়ে যা দেখলুম, তাতে মন একেবারে দমে গেল। পথের মাঝখানকার একটা জায়গা ধ্বসে গিয়ে গভীর এক ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, ফাঁকের মুখটাও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া। সেই ফাঁকের মধ্যেও নেমে যে পথের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে উঠব, এমন কোনও উপায়ও দেখলুম না। পথের দু-পাশে যে খাড়া খাদ রয়েছে, তা এত গভীর যে দেখলেও মাথা ঘুরে যায়। এ কি বিড়ম্বনা, এতদিনের পরে এত বিপদ এড়িয়ে, যকের ধনের সামনে এসে শেষটা কি এইখান থেকেই বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে?

আমার সর্বাঙ্গ এলিয়ে এল, সেইখানেই আমি ধুপ করে বসে পড়লুম।...

খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলুম, ঠিক সেই ভাঙা জায়গাটার ধারে একটা মস্ত উঁচু সরল গাছের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিমল কি ভাবছে।

আমি বললুম, 'আর কি দেখছ ভাই, এখানে বসবে এসো, আজ এইখানেই রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে, কাল আবার বাড়ির দিকে ফিরব।'

বিমল রাগ করে বললে, 'এত সহজেই যদি হাল ছেড়ে দেব, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?'

আমি বললুম, 'হাল ছাড়ব না তো কি করব বলো? লাফিয়ে তো আর ওই ফাঁকটা পার হতে পারব না, ডানাও নেই যে, উড়ে যাব।'

বিমল বললে, 'তোমাকে লাফাতেও হবে না, উড়তেও বলছি না। আমরা হেঁটেই যাব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হেঁটে! শূন্য দিয়ে হেঁটে যাব কি রকম?'

বিমল বললে, 'শোনো বলছি। এই ফাঁকটার মাপ সতেরো-আঠারো ফুটের বেশি হবে না, কেমন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, ভাঙা পথের ঠিক ধারেই যে সরল গাছটা রয়েছে, ওটা আন্দাজ কত ফুট হবে বলো দেখি?'

—'সতেরো-আঠারো ফুটের চেয়ে ঢের বেশি।'

—'বেশ, তাহলে আর ভাবনা কি? আমরা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়াটা এমনভাবে

কাটব, যাতে করে পড়বার সময়ে গাছটা পথের ওই ভাঙা অংশের ওপরেই গিয়ে পড়ে। তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ তো?'

আমি আহ্লাদে একলাফ মেরে বললুম, 'ওহো, বুঝেছি। গাছটা ভাঙা জায়গার ওপরে পড়লেই একটা পোলের মতো হবে। তাহলেই তার ওপর দিয়ে আমরা ওধারে যেতে পারব! বিমল, তুমি হচ্ছ বুদ্ধির বৃহস্পতি। তোমার কাছে আমরা এক একটি গোরুবিশেষ!'

বিমল বললে, 'বুদ্ধি সকলেরই আছে, কিন্তু কাজের সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সকলেই সমানভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না বলেই তো মুশকিলে পড়তে হয়।...যাক, আজ আমাদের এইখানেই বিশ্রাম। কাল সকালে উঠেই আগে গাছটা কাটবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

একুশ

বাধার উপরে বাধা

গভীর রাত্রি। একটা ঝুঁকেপড়া পাহাড়ের তলায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের দুদিকে পাহাড় আর দুদিকে আগুন। বিমল আর রামহরি ঘুমোচ্ছে, আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি—কিন্তু ঘুমোইনি, কারণ এখন আমার পাহারা দেবার পালা।

চাঁদের আলোর আজ আর তেমন জোর নেই; চারিদিকে আলো আর অন্ধকার যেন একসঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

হঠাৎ বৌদ্ধমঠে যাবার পথের উপর দিয়ে শেয়ালের মতো কি একটা জানোয়ার বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল—দেখলেই মনে হয় সে যেন কোনও কারণে ভয় পেয়েছে।

মনে কেমন সন্দেহ হল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম বটে, কিন্তু চোখের কাছে একটু ফাঁক রাখলুম,—আর বন্দুকটাও কাপড়ের ভিতরেই বেশ করে বাগিয়ে ধরলুম।

এক, দুই, তিন মিনিট। তারপরেই দেখলুম পাহাড়ের আড়াল থেকে উপরে একটা মানুষ বেরিয়ে এল...তারপর আর একজন...তারপর আরও একজন—তারপর একসঙ্গে দুইজন। সবসুদ্ধ পাঁচজন লোক।

আস্তে আস্তে চোরের মতন আমাদের দিকে তারা এগিয়ে আসছে; যদিও রাতের আবছায়ায় তফাত থেকে তাদের চিনতে পারলুম না—তবুও আন্দাজেই বুঝে নিলুম, তারা কারা।

সব-আগের লোকটা আমাদের অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। আমাদের সামনেকার আগুনের আভা তার মুখের উপরে গিয়ে পড়তেই চিনলুম—সে করালী।

একটা নিষ্ঠুর আনন্দে বুকটা আমার নেচে উঠল। এই করালী! এরই জন্যে কত বিপদে পড়তে হয়েছে, কতবার প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গেছে, এখনও এ আমাদের যমের বাড়ি পাঠাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে; ধরি ধরি করেও কোনওবারেই একে আমরা ধরতে পারিনি—কিন্তু এবারে আর কিছুতেই এর ছাড়ান নেই।

বন্দুকটা তৈরি রেখে একেবারে মড়ার মতো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলুম। করালী আরও কাছে এগিয়ে আসুক না,—তারপরেই তার সুখের স্বপ্ন জন্মের মতো ভেঙে দেব!

পা টিপে টিপে করালী ক্রমে আমাদের কাছ থেকে হাত পনেরো-ষোলো তফাতে এসে পড়ল—তার পিছনে পিছনে আর চারজন লোক।

আগুনের আভায় দেখলুম, করালীর সেই কুৎসিত মুখখানা আজ রাক্ষসের মতোই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। তার ডানহাতে একখানা মস্ত বড়ো চকচকে ছোরা, এখানা নিশ্চয়ই সে আমাদের বুকের উপরে বসাতে চায়। তার পিছনের লোকগুলোরও প্রত্যেকেরই হাতে ছোরা, বর্শা বা তরোয়াল রয়েছে। এটা আমাদের খুব সৌভাগ্যের কথা যে, করালীরা কেউ বন্দুক জোগাড় করে আনতে পারেনি। তাদের সঙ্গে বন্দুক থাকলে এতদিন নিশ্চয়ই আমরা বেঁচে থাকতে পারতুম না।

করালী আমাদের আগুনের বেড়াটা পেরিয়ে আসবার উদ্যোগ করলে।

বুঝলুম, এই সময়। বিদ্যুতের মতন আমি লাফিয়ে উঠলুম—তারপর চোখের পলক ফেলবার আগেই বন্দুকটা তুলে দিলুম একেবারে ঘোড়া টিপে। গুড়ুম!

বিকট এক চিৎকার করে করালী মাথার উপর দু-হাত তুলে মাটির উপরে ঘুরে পড়ে গেল।

তার পিছনে লোকগুলো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তাদের দিকেও আর একবার বন্দুক ছুড়তেই তারা প্রাণের ভয়ে পাগলের মতো দৌড়ে পালাল।

কিন্তু বন্দুকের গুলি বোধহয় করালীর গায়ে ঠিক জায়গায় লাগেনি, কারণ মাটির উপরে পড়েই সে চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়াল—তারপর প্রাণপণে ছুটে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার দোনলা বন্দুকে টোটা ছিল না, কাজেই তাকে আর বাধা দিতেও পারলুম না।

কয় সেকেন্ড পরে ভীষণ এক আর্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ যেন কেঁপে উঠল—তেমন আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তারপরেই আবার সব চুপচাপ।—ও আবার কি ব্যাপার?

মিনিটখানেকের মধ্যেই এই ব্যাপারগুলো হয়ে গেল। ততক্ষণে গোলমালে বিমল, রামহরি আর বাঘাও জেগে উঠেছে।

বিমলকে তাড়াতাড়ি দু-কথায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বললুম, 'কিন্তু ওই আর্তনাদ যে কেন হল বুঝতে পারছি না। আমার মনে হল একসঙ্গে যেন জন-তিনেক লোক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।'

বিমল সভয়ে বললে, 'কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে তারা ভাঙা পথের সেই ফাঁকের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু করালী ওদিকে যায়নি—সে এখনও বেঁচে আছে।'

রামহরি বললে, 'আহা, হতভাগাদের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে, শেষটা অপঘাতে মরল!'

বিমল বললে, 'যেমন কর্ম, তেমনি ফল—দুঃখ করে লাভ নেই। করালীর যদি এখনও শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে তার কপালেও অপঘাত মৃত্যু লেখা আছে!'

আমি বললুম, 'অন্তত কিছুদিনের জন্যে আমরা নিশ্চয় করালীর দেখা পাব না। সে মরেনি বটে কিন্তু রীতিমতো জখম যে হয়েছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।'

বিমল বললে, 'আর তিনদিন যদি বাধা না পাই, তাহলে যকের ধন আমাদের মুঠোর ভিতর এসে পড়বেই—এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

বাইশ

অলৌকিক কাণ্ড

সেই সকাল থেকে আমরা ভাঙা জায়গাটার ধারে গিয়ে সরল গাছের গোড়ার উপরে ক্রমাগত কুড়ুলের ঘা মারছি আর মারছি। এমনভাবে আমরা গাছ কাটছি, যাতে করে পড়বার সময়ে সেটা ঠিক ভাঙা জায়াগাটার উপরে গিয়ে পড়ে।

দুপুরের সময় গাছটা পড় পড় হল। আমরা খুব সাবধানে কাজ করতে লাগলুম, কারণ আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা এখন এই গাছটার উপরেই নির্ভর করছে—একটু এদিক-ওদিক হলেই সকলকে ধুলো-পায়েই বাড়ির দিকে ফিরতে হবে।

...গাছটা পড়তে আর দেরি নেই, তার গোড়া মড়মড় করে উঠল।

বিমল বললে, 'আর গোটাকয়েক কোপ! ব্যাস তাহলেই কেল্লা ফতে।'

টিপ করে ঠিক গোড়া ঘেসে মারলুম আরও বার কয়েক কুড়ুলের ঘা।

বিমল বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার! সরে দাঁড়াও, গাছটা পড়ছে।'

আমি আর রামহরি একলাফে পাশে সরে দাঁড়ালুম।

মড় মড় মড়—মড়াৎ। গাছটা হুড়মুড় করে ভাঙা জায়গাটার দিকে হেলে পড়ল।

বিমল বললে, 'ব্যাস! দ্যাখো কুমার, আমাদের পোল তৈরি।'

গাছটা ঠিক মাঝখানকার ফাঁকটার উপর দিয়ে পাহাড়ের ওধারে গিয়ে পড়েছে, তার গোড়া রইল এদিকে, আগা রইল ওদিকে। যা চেয়েছিলুম তাই।...

আহার আর বিশ্রাম সেরে আমরা আবার বৌদ্ধমঠের দিকে অগ্রসর হলুম। রোদ্দুরে পাহাড়ে-পথ তেতে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেসব কষ্ট আমরা আজ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলুম না, মনে মনে দৃঢ়পণ করলুম যে, আজ মঠে না গিয়ে কিছুতেই আর জিরেন নেই।

সূর্য অস্ত যায়-যায়। মঠও আর দূরে নেই। তার মেঘ-ছোঁয়া মন্দিরটার ভাঙা চূড়া আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে। এদিক-ওদিক আরও কতকগুলো ছোটো ছোটো ভগ্নস্তূপও দূর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আরও খানিক এগিয়ে দেখলুম, আমাদের দু-পাশে কারুকার্য করা অনেক গুহা রায়েছে। এইসব গুহায় আগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করতেন, এখন কিন্তু তাদের ভিতর জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

গুহাগুলোর মাঝখান দিয়ে পথটা হঠাৎ একদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম আমাদের সামনেই মঠের সিংহদরজা।

আমরা সকলেই একসঙ্গে প্রচণ্ড উৎসাহে জয়ধ্বনি করে উঠলুম। বাঘা আসল কারণ না বুঝেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ। অনেকদিন পরে আবার সেই পোড়ো মন্দিরটার চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল।

বিমল দু-হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, 'যকের ধন আজ আমাদের!'

আমি বললুম, 'চলো, চলো, চলো। আগে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করি।'

সিংহদরজার ভিতর দিয়ে আমরা মন্দিরের আঙিনায় গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড আঙিনা—চারিদিকে চকবন্দী ঘর, কিন্তু এখন আর তাদের কোনও শ্রী-ছাঁদ নেই। বুনো চারা-গাছে আর জঙ্গলে পা ফেলে চলা দায়, এখানে-ওখানে ভাঙা পাথর ও নানারকম মূর্তি পড়ে রয়েছে, স্থানে স্থানে জীবজন্তুর রাশি রাশি হাড়ও দেখলুম। বোধহয় হিংস্র পশুরা এখন সন্ন্যাসীদের ঘরের ভিতর আস্তানা গেড়ে বসেছে, বাইরে থেকে শিকার ধরে এনে এখানে বসে নিশ্চিন্তভাবে পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়।

আমি বললুম, 'বিমল, মড়ার মাথাটা এইবার বার করো, সঙ্কেত দেখে পথ ঠিক করতে হবে।'

বিমল বললে, 'তার জন্যে ভাবনা কি, সঙ্কেতের কথাগুলো আমার মুখস্থই আছে।' এই বলে সে আউড়ে গেল—'ভাঙা দেউলের পিছনে সরল গাছ। মূলদেশ থেকে পূর্বদিকে দশ গজ এগিয়ে থামবে। ডাইনে আট গজ এগিয়ে বুদ্ধদেব। বামে ছয় গজ এগিয়ে তিনখানা পাথর। তার তলায় সাত হাত জমি খুঁড়লে পথ পাবে।'

আমি বললুম, 'তাহলে আগে আমাদের ভাঙা দেউল খুঁজে বার করতে হবে।'

বিমল বললে, 'খুঁজতে হবে কেন? দেউল বলতে এখানে নিশ্চয় বোঝাচ্ছে ওই প্রধান মন্দিরকে। ও মন্দিরটাও তো ভাঙা। আচ্ছা দেখাই যাক না।'

আমরা বড়ো মন্দিরের পিছনের দিকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

রামহরি বললে, 'বাহবা, ঠিক কথাই যে! মন্দিরের পিছনে ওই যে সরল গাছ।'

তাই বটে। মন্দিরের পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা, আর তার মধ্যে সরল গাছ মাত্র একটি, কিছু ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

চারিদিকে মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো অনেকগুলো বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে,—কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। ভাঙা, অ-ভাঙা পাথরও পড়ে আছে অগুন্তি।

বিমল বললে, 'এরই মধ্যে কোনও একটি মূর্তির কাছে আমাদের যকের ধন আছে। আচ্ছা, সরল গাছ থেকে পুবদিকে এই দশ গজ এগিয়ে থামলুম। তারপর ডাইনে আট গজ,—হুঁ, এই যে বুদ্ধদেব। বাঁয়ে ছয় গজ—কুমার, দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক তিনখানাই পাথর পরে পরে সাজানো রয়েছে। মড়ার মাথার সঙ্কেত তাহলে মিথ্যে নয়।'

আহ্লাদে বুক আমার দশখানা হয়ে উঠল—মনের আবেগ আর সহ্য করতে না পেরে আমি সেই পাথরগুলোর উপরে ধুপ করে বসে পড়লুম।

বিমল বললে, 'ওঠো—ওঠো। এখন দেখতে হবে, পাথরের তলায় সত্যি সত্যিই কিছু আছে কি না।'

আমরা তিনজনে মিলে তখনই কোমর বেঁধে পাথর সরিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলুম।...

প্রায়-হাত সাতেক খোঁড়ার পরেই কুড়ুলের মুখে মুখে কি-একটা শক্ত জিনিস ঠক ঠক করে লাগতে লাগল। মাটি সরিয়ে দেখা গেল, আর একখানা বড়ো পাথর।

অল্প চেষ্টাতেই পাথরখানা তুলে ফেলা গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম গর্তের মধ্যে সত্যি-সত্যিই একটা বাঁধানো সুড়ঙ্গপথ রয়েছে।

আমাদের তখনকার মনের ভাব লেখায় বলা যাবে না। আমরা তিনজনেই আনন্দবিহ্বল হয়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে বুকটা আমার চমকে উঠল। গর্তের ভিতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

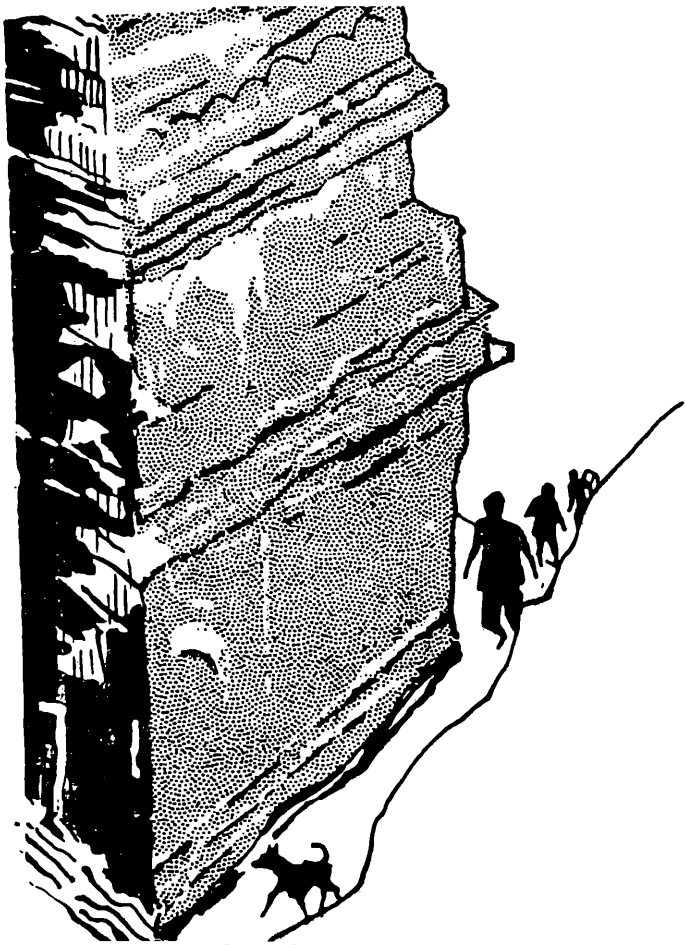

আমরা বড়ো মন্দিরের পিছনের দিকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

—'বিমল, দ্যাখো—দ্যাখো!'

বিমল সবিস্ময়ে গর্তের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তাই তো, কি কাণ্ড! এতদিনের বন্ধ গর্তের ভিতর থেকে ধোঁয়া আসছে কেমন করে?'

আমরা হেঁট হয়ে ক্রমেই ভিতরে প্রবেশ করেছি, কারণ সুড়ঙ্গের ছাদ এত নিচু যে, মাথা তোলবার কোনও উপায় নেই।

আচম্বিতে পিছনে কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

পিছনে ফিরে দেখলুম, সুড়ঙ্গের মুখের গর্ত দিয়ে বাইরের যে আলোটুকু আসছিল, তা আর দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেইরকম একটা শব্দ। তারপর আবার,—আবার।

আমি তাড়াতাড়ি ফের সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এলুম। যা দেখলুম, তাতে প্রাণ আমার উড়ে গেল!

সুড়ঙ্গের মুখ একেবারে বন্ধ!

বিমলও এসে ব্যাপারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ, সকলের আগে কথা কইলে রামহরি। সে বললে, 'কে এ কাজ করলে?'

বিমল পাগলের মতন গর্তের মুখে ঠেলা মারতে লাগল, কিন্তু তার অসাধারণ শক্তিও আজ হার মানল—গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

আমি হতাশভাবে বললুম, 'বিমল, আর প্রাণের আশা ছেড়ে দাও, এইখানেই জ্যান্ত আমাদের কবর হবে।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কাশির মতো খনখনে গলায় হঠাৎ খিলখিল করে কে হেসে উঠল! সে কি ভীষণ বিশ্রী হাসি, আমার বুকের ভিতরটা যেন মড়ার মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হাসির আওয়াজ এল সুড়ঙ্গের ভিতর থেকেই। তিনজনেই বিজলী-মশাল তুলে ধরলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না।

বিমল বললে, 'কে হাসলে কুমার?'

আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'যক, যক!'

সঙ্গে সঙ্গে আবার খিল খিল করে খনখনে হাসি!

মানুষে কখনও তেমন হাসি হাসতে পারে না। বাঘা পর্যন্ত অবাক হয়ে কান খাড়া করে সুড়ঙ্গের ভিতরের দিকে চেয়ে রইল।

পাছে আবার সেই হাসি শুনতে হয়, তাই আমি দুই হাতে সজোরে দুই কান বন্ধ করে মাটির উপর বসে পড়লুম।

চব্বিশ

ধনাগার

জীবনে এমন বুক-দমানো হাসি শুনিনি,—সে হাসি শুনলে কবরের ভিতরে মড়াও যেন চমকে জেগে শিউরে ওঠে।

হাসির তরঙ্গে সমস্ত সুড়ঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আমার মনে হল বহুকাল পরে সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়ে যক আজ প্রাণের আনন্দে হাসতে শুরু করেছে—কতকাল অনাহারের পর আজ তার হাতের কাছে খোরাক গিয়ে আপনি উপস্থিত।

উপরে গর্তের মুখ বন্ধ—ভিতরে এই কাণ্ড! এ জীবনে আর যে কখনও চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখতে পাব না, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

হাসির আওয়াজ ক্রমে দূরে গিয়ে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল—কেবল তার প্রতিধ্বনিটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গম গম করতে লাগল।

আর কোনও বাঙালির ছেলে নিশ্চয়ই আমাদের মতন অবস্থায় কখনও পড়েনি! আমরা যে এখনও পাগল হয়ে যাইনি, এইটেই আশ্চর্য!

তিনজনে স্তম্ভিতের মতো বসে বসে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম—কারুর মুখে আর বাক্য সরছে না।

বিমলের মুখে আজ প্রথম এই দুর্ভাবনার ছাপ দেখলুম। সে ভয় পেয়েছে কি না বুঝতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে হল আজ সে বিলক্ষণ দমে গিয়েছে...আর না দমে করে কি, এতেও যে দমবে না, নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়!

প্রথম কথা কইলে রামহরি। আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে বললে, 'বাবু, আর এ রকম করে বসে থাকলে কি হবে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?'

আমি বললুম, 'ব্যবস্থা আর করব ছাই! যতক্ষণ প্রাণটা আছে, নাচার হয়ে নিঃশ্বাস ফেলি এসো!'

বিমল বললে, 'কিন্তু গর্তের মুখ বন্ধ করলে কে?'

আমি বললুম, 'যক!'

বিমল মুখ ভেঙিয়ে বললে, 'যকের নিকুচি করেছে! আমি ওসব মানি না।'

—'না মেনে উপায় কি! ভেবে দ্যাখো বিমল, যে গর্তের কথা কাক-পক্ষী জানে না, সেই গর্তেরই মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে গেল কি করে?'

বিমল চিন্তিতের মতন বললে, 'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে!'

—'মনে আছে তো, কাল এই গর্তের ভিতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল?'

—'মনে আছে।'

—'আর এই বিশ্রী হাসি!'

বিমল একেবারে চুপ।

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে—'খোকাবাবু, দ্যাখো—দ্যাখো!'

ও কী ব্যাপার! আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, খানিক তফাতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে সোঁ করে একটা আগুন চলে গেল।

আমি সরে এসে পাথরচাপা গর্তের মুখে পাগলের মতন ধাক্কা মারতে লাগলুম—কিন্তু গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

বিমল বললে, 'কুমার! বিজলী-মশালটা জ্বেলে আমার সঙ্গে এসো। রামহরি, তুমি সকলের পিছনে থাকো। আমি দেখতে চাই, ও আগুনটা কিসের!'

আগুনটা তখন আর দেখা যাচ্ছিল না। বিমল বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল, আমরাও তার পিছনে চললুম। ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল!

খানিক দূরে গিয়েই সুড়ঙ্গটা আর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়েছে—সেইখানেই আগুনটা জ্বলে উঠেছিল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

হাতকয়েক দূরে, মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে বলে মনে হল—বাঘা ছুটে সেইখানে চলে গেল।

বিজলী-মশালের আলোটা ভালো করে তার উপরে গিয়ে পড়তেই বিমল বলে উঠল, 'ও যে দেখছি একটা মানুষের দেহের মতো!'

রামহরি বললে, 'কিন্তু একটুও নড়ছে না কেন?'

হঠাৎ আবার কে হেসে উঠল—হি-হি-হি-হি! কোথা থেকে কে যে সেই ভয়ানক হাসি হাসলে, আমরা কেউ তা দেখতে পেলুম না। সকলেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—হাসির চোটে সমস্ত সুড়ঙ্গটা আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল!

আমি আঁতকে চেঁচিয়ে বললুম, 'পালিয়ে এসো বিমল, পালিয়ে এসো—চলো আমরা গর্তের মুখে ফিরে যাই।'

কিন্তু বিমল আমার কথায় কান পাতলে না—সে সামনের দিকে ছুটে এগিয়ে গেল।

সুড়ঙ্গ আবার স্তব্ধ।

বিমল একেবারে সেই মানুষের দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর হেঁট হয়ে তার গায়ে হাত দিয়েই বলে উঠল, 'কুমার, এ যে একটা মড়া!'

সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের মৃতদেহ! আশ্চর্য!

বিমল আবার বললে, 'কুমার, এদিকে এসে এর মুখের ওপরে ভালো করে আলোটা ধরো তো!'

আর এগুতে আমার মন চাইছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে বিমলের কাছে যেতে হল।

আলোটা ভালো করে ধরতেই বিমল উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—'কুমার, কুমার, এ যে শম্ভু!'

হাতকয়েক দূরে, মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে মনে হল।

তাইতো, শম্ভুই তো বটে! চিত হয়ে তার দেহটা পড়ে রয়েছে, চোখ দুটো ভিতর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, আর তার গলার কাছটায় প্রকাণ্ড একটা ক্ষত!

বিমল হেঁট হয়ে শম্ভুর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'না, কোনও আশা নেই—অনেকক্ষণ মরে গেছে!'

আমি সেই ভয়ানক দৃশ্যের উপর থেকে আলোটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—শম্ভু এখানে এল কেমন করে?'

বিমল চমকে উঠে বললে, 'তাইতো ও কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি—শম্ভু এই সুড়ঙ্গের সন্ধান পেল কোত্থেকে?'

আমি বললুম, 'শম্ভু যখন এসেছে, তখন করালীও নিশ্চয় সুড়ঙ্গের কথা জানে।'

বিমল একলাফ মেরে বলে উঠল—'কুমার, কুমার! আলোটা ভালো করে ধরো—যকের ধন! যকের ধন কোথায় আছে, আগে তাই খুঁজে বার করতে হবে।'

চারিদিকে আলোটা বারকতক ঘোরাতে-ফেরাতেই দেখা গেল, সুড়ঙ্গের এককোণে একটা দরজা রয়েছে।

বিমল ছুটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে বললে, 'এই যে একটা ঘর! যকের ধন নিশ্চয়ই এর ভেতরে আছে।'

পঁচিশ

অদৃশ্য বিপদ

ঘরের ভিতরে ঢুকে আমরা সাগ্রহে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

ঘরটা ছোটো—ধুলো আর দুর্গন্ধে ভরা।

আসবাবের মধ্যে রয়েছে খালি এককোণে একটা পাথরের সিন্দুক—এ রকম কলকাতার যাদুঘরে আমি একবার দেখেছিলুম।

বিমল এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা তখনই খুলে ফেললে, আমরা সকলেই একসঙ্গে তার ভিতরে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে উঁকি মেরে দেখলুম—কিন্তু হা ভগবান, সিন্দুক একেবারে খালি!

আমাদের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত আয়োজন—সমস্তই ব্যর্থ হল!

কেউ আর কোনও কথা কইতে পারলুম না, আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাদের একূল-ওকূল দুকূল গেল! যকের ধনও পেলুম না, প্রাণেও বোধহয় বাঁচব না!'

আমি বললুম, 'বিমল, আগে যদি আমার মানা শুনতে! কতবার তোমাকে বলেছি ফিরে চলো, যকের ধনে আর কাজ নেই।'

রামহরি বললে, 'আগে থাকতেই মুষড়ে পড়ছ কেন? খুঁজে দ্যাখো আর কোথাও যকের ধন লুকানো আছে।'

বিমল বললে, 'আর কোনও খোঁজাখুঁজি মিছে। দেখছ না। আমাদের আগেই এখানে অন্য লোক এসেছে, সে কি আর শুধু-হাতে ফিরে গেছে?'

আমি বললুম, 'এ কাজ করালী ছাড়া আর কারুর নয়।'

—'হুঁ।'

—'কিন্তু সে কি করে খোঁজ পেলে?'

—'খুব সহজেই। কুমার, আমরা বোকা—গাধার চেয়েও বোকা। করালী পালিয়েছে ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলছিলুম—সে কিন্তু নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছিল।

তারপর কাল যখন আমরা সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছিলুম, সে তখন কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। কাল রাতেই সে কাজ হাসিল করেছে, আমরা যে কোনওরকমে পিছু নিয়ে তাকে আবার ধরব, সে উপায়ও আর রেখে যায়নি। বুঝেছ কুমার, করালী গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে গেছে!'

—'কিন্তু শম্ভুকে খুন করলে কে?'

—'করালী নিজেই।'

আমার বুকের উপর বসে সে হা-হা করে হাসতে লাগল!

—'কেন সে তা করবে?'

—'পাছে যকের ধনে শম্ভু ভাগ বসাতে চায়।'

হঠাৎ আমাদের কানের উপরে আবার সেই ভীষণ অট্টহাসি বেজে উঠল—'হা-হা-হা-হা-হা!'

আমি আর্তনাদ করে বলে উঠলুম, 'বিমল, শম্ভুকে খুন করেছে এই যক!'

আবার—আবার সেই হাসি!

আমার হাত থেকে বিজলী-মশালটা কেড়ে নিয়ে বিমল—যেদিক থেকে হাসি আসছিল, সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গেল—তার পিছনে ছুটল রামহরি।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একলা বসে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলুম—বিমল এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে, আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না।

উঃ, পৃথিবীর বুকের মধ্যেকার সে অন্ধকার যে কি জমাট, লেখায় তা প্রকাশ করা যায়

না—অন্ধকারের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ আমার পিঠের উপরে ফোঁস করে কে নিঃশ্বাস ফেললে। চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু গলা দিয়ে আমার আওয়াজই বেরুল না! সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

উঠে বসতে না বসতেই আমার পিঠের উপর কে লাফিয়ে পড়ল এবং লোহার মতন শক্ত দুখানা হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম—সে কিন্তু অনায়াসে আমাকে শিশুর মতো ধরে ঘরের মেঝের উপর চিত করে ফেললে—প্রাণপণে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'বিমল, বিমল, বিমল, বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও!'

আমার বুকের উপরে বসে সে হা-হা করে হাসতে লাগল।—কিন্তু তার পরমুহূর্তেই সে হাসি আচম্বিতে বিকট এক আর্তনাদের মতন বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের উপর থেকে সেই ভূত না মানুষটা—ভগবান জানেন কি—মাটির উপর ছিটকে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আমি উঠে বসলুম—অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু শব্দ শুনে যেন বুঝলাম, ঘরের ভিতরে বিষম এক ঝটাপটি চলেছে।

ছাব্বিশ

ভূত, না জন্তু, না মানুষ?

কি যে করব, কিছুই বুঝতে না পেরে, দেওয়ালে পিঠ রেখে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম—ওদিকে ঘরের ভিতরে ঝাপটা-ঝাপটি সমানে চলতে লাগল।

তারপরেই সব চুপচাপ।

আলো নিয়ে বিমল তখনও ফিরল না, অন্ধকারে আমিও আর উঠতে ভরসা করলুম না। ঘরের ভিতরে যে খুব একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কাণ্ডটা যে কি, অনেক ভেবেও আমি তা ঠাউরে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ আমার গায়ের উপরে কে আবার ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে! আঁতকে উঠে একলাফে আমি পাঁচ হাত পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রাণপণে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন আমার পানে তাকিয়ে আছে। খানিক পরেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল!

এবারে প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম। পায়ে পায়ে আমি পিছনে হটতে লাগলুম—সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোর উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে। হঠাৎ কি একটা জিনিসে পা লেগে আমি দড়াম করে পড়ে গেলুম এবং প্রাণের ভয়ে যত-জোরে-পারি চেঁচিয়ে উঠলুম....তারপরই কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম—আমি একটা মানুষের দেহের উপর কাত হয়ে পড়ে আছি!

সে দেহ কার, তা জীবিত না মৃত, এসব ভাববার কোনও সময় নেই—কারণ গেলবারের মতন এবারেও হয়তো আবার কোনও শয়তান আমার পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়বে—সেই

ভয়েই কাতর হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ তুলতেই দেখি, সুড়ঙ্গের মধ্যে বিজলী-মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আঃ, এতক্ষণ পরে!

আলো দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল, তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলুম—'বিমল, বিমল, শিগগির এসো!'

—'কি হয়েছে কুমার—ব্যাপার কি?' বলতে বলতে বিমল ঝড়ের মতন ছুটে এল—তার পিছনে রামহরি।

বিজলী-মশালের আলো ঘরের ভিতরে পড়তেই দেখলুম, ঠিক আমার সামনে, মাটির উপরে দুই থাবা পেতে বসে বাঘা জিভ বার করে অত্যন্ত হাঁপাচ্ছে। তার মুখে ও সর্বাঙ্গে টাটকা রক্তের দাগ!

বুঝলুম, এই বাঘার চোখ দুটো দেখেই এবারে আমি মিছে ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার মুখে আর গায়ে এত রক্ত কেন?

হঠাৎ বিমল বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'কুমার, কুমার, তুমি কিসের উপরে বসে আছ?'

তখন আমার হুঁশ হল—আমার তলায় যে একটা মানুষের দেহ!

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে যা দেখলুম, তা আর জীবনে কখনও ভুলব না।

ঘরের মেঝের উপর মস্ত লম্বা একটা কালো কুচকুচে মানুষের প্রায় উলঙ্গ দেহ চিত হয়ে সটান পড়ে আছে! লম্বা লম্বা জটপাকানো চুল আর গোঁফদাড়িতে তার মুখখানা প্রায় ঢাকা পড়েছে—তার চোখ দুটো ড্যাব-ডেবে, দেখলেই বুক চমকে ওঠে, হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে বড়ো বড়ো হিংস্র দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে—কে এ?....সেই অদ্ভুত মূর্তি সহজে বোঝা শক্ত যে, সে ভূত, না জন্তু, না মানুষ!

বিমল হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'এর গলা দিয়ে যে হু-হু করে রক্ত বেরুচ্ছে!'

আমি শুষ্কস্বরে বললুম, 'বিমল, একটু আগে এই লোকটা আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল।'

—'বলো কি, তারপর—তারপর?'

—'তারপর ঠিক কি যে হল অন্ধকারে আমি তা বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু বোধহয় বাঘার জন্যই এ যাত্রা আমি বেঁচে গেছি।'

—'বাঘার জন্যে?'

—'হ্যাঁ, সে-ই টুঁটি কামড়ে ধরে একে আমার বুকের উপর থেকে টেনে নামায়, বাঘার কামড়েই যে ওর এই দশা হয়েছে, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি। দ্যাখো দেখি, ও বেঁচে আছে কিনা?'

বিমল পরীক্ষা করে দেখে বললে, 'না, একেবারে মরে গেছে।'

রামহরি বাঘার পিঠ চাপড়ে বললে, 'শাবাশ বাঘা, শাবাশ বাঘা, শাবাশ।'

বাঘা আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে লাগল; আমি আদর করে তাকে বুকে টেনে নিলুম।

বিমল বললে, 'কিন্তু এ লোকটা কে?'

রামহরি বললে, 'উঃ, কি ভয়ানক চেহারা! দেখলেই ভয় হয়!'

আমি বললুম, 'আমার তো ওকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, 'হতে পারে। নইলে অকারণে তোমাকে মারবার চেষ্টা করবে কেন?'

আমি বললুম, 'এতক্ষণে আর একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি। শম্ভু বোধহয় এর হাতেই মারা পড়েছে।'

রামহরি বললে, 'কিন্তু এ সুড়ঙ্গের মধ্যে এল কি করে?'

বিমল চুপ করে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'দ্যাখো কুমার, হাসি শুনে কে হাসছে খুঁজতে গিয়ে আমরা সুড়ঙ্গের এক জায়গায় কতকগুলো জ্বলন্ত কাঠ আর পোড়া মাংস দেখে এসেছি। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ লোকটাই এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করত। আমাদের দেখে এ-ই এতক্ষণ হাসছিল—এ যে পাগল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সুড়ঙ্গের চারিদিক যে বন্ধ!'

বিমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে আনন্দভরে বলে উঠল, 'কুমার, আমরা বেঁচে গেছি! এই অন্ধকূপের মধ্যে আমাদের আর অনাহারে মরতে হবে না!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হঠাৎ তোমার এতটা আহ্লাদের কারণ কি?'

বিমল বললে, 'কুমার, তুমি একটি নিরেট বোকা। এও বুঝছ না যে, এই পাগলটা যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তখন কোথাও বাইরে যাবার একটা পথও আছে। সুড়ঙ্গের যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি, সে মুখ তো বরাবরই বন্ধ ছিল, সুতরাং সেখান দিয়ে নিশ্চয়ই পাগলাটা আনাগোনা করত না। যদি বলো সে বাইরে যেত না, তাহলে সুড়ঙ্গের মধ্যে জ্বালানি কাঠ আর মাংস এল কোত্থেকে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অন্য পথ থাকলেও আমরা তো তার সন্ধান জানি না।'

বিমল বললে, 'সেইটেই আমাদের খুঁজে দেখা দরকার। সুড়ঙ্গের সবটা তো আমরা দেখিনি।'

আমি বললুম, 'তবে চলো, আগে পথ খুঁজে বার করতে হবে। যকের ধন তো পেলুম না, এখন কোনওগতিকে বাইরে বেরুতে পারলেই বাঁচি।'

বিমল বললে, 'যকের ধন এখনও আমাদের হাতছাড়া হয়নি। পথ যদি খুঁজে পাই, তাহলে এখনও করালীকে ধরতে পারব। এখানে আর দেরি করা নয়, চলে এসো।'

বিমল আরও এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে পিছনে চললুম।

সুড়ঙ্গটা যে কত বড়ো, তার মধ্যে যে এত অলিগলি আছে, আগে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে আমরা চারিদিকে আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু পথ তবু পাওয়া গেল না। সেই চির-অন্ধকারের রাজ্যে আলো আর বাতাসের অভাবে প্রাণ আমাদের থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু উপায় নেই, কোনও উপায় নেই!

শেষটা হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম, 'বিমল, আর আমি ভাই পারছি না, পথ যখন পাওয়াই যাবে না, তখন এখানেই শুয়ে শুয়ে আমি শান্তিতে মরতে চাই।' এই বলে আমি বসে পড়লুম।

বিমল আমার হাত ধরে নরম গলায় বললে, 'ভাই কুমার, এত সহজে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না। পথ আছেই, আমরা খুঁজে বার করবই।'

আমি সুড়ঙ্গের গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, 'তোমার শক্তি থাকে তো পথ খুঁজে বার করো—আমার শরীর আর বইছে না।'

হঠাৎ বাঘা দাঁড়িয়ে উঠে কান খাড়া করে একদিকে চেয়ে রইল—বিমলও আলোটা তাড়াতাড়ি সেইদিকে ফেরালে। দেখলুম—খানিক তফাতে একটা শেয়াল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে।

বাঘা তাকে রেগে ধমক দিয়ে তেড়ে গেল, শেয়ালটাও ভয় পেয়ে ছুট দিলে—ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে বিমল বিজলী-মশালের আলোটা সেইদিকে ঘুরিয়ে ধরলে।

অল্পদূরে গিয়েই শেয়ালটা সুড়ঙ্গের উপরদিকে একটা লাফ মেরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘা হতভম্বের মতো সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শেয়ালটা কি করে পালাল দেখবার জন্যে বিমল কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটা মাথার উপর তুলে ধরে সেখানটা দেখেই মহা আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, 'পথ পেয়েছি কুমার, পথ পেয়েছি!'

বিমলের কথায় আমার দেহে যেন নূতন জীবন ফিরে এল, তাড়াতাড়ি উঠে সেইখানে ছুটে গিয়ে বললুম, 'কই, কই?'

—'এই যে!'

দেয়ালের একেবারে উপরদিকে ছোটো একটা গর্তের মতো, তার ভিতর দিয়ে বাইরের আলো রুপোর আভার মতো দেখাচ্ছে। এতক্ষণ পরে পৃথিবীর আলো দেখে আমার চোখ আর মন যেন জুড়িয়ে গেল।

বিমল বললে, 'নিশ্চয় পাহাড় ধ্বসে এই পথের সৃষ্টি হয়েছে। কুমার, তুমি সকলের আগে বেরিয়ে যাও। রামহরি, তুমি আলোটা নাও, আমি কুমারকে গর্তের মুখে তুলে ধরি!'

বিমল আমাকে কোলে করে তুলে ধরলে, গর্ত দিয়ে মুখ বাড়াতেই নীলাকাশের সূর্য, স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস আর ফলে-ফুলে ভরা সবুজ বন যেন আমাকে অভ্যর্থনা করলে চিরজন্মের মতন সাদরে!

সাতাশ

করালীর আর এক কীর্তি

বাইরের আলো-হাওয়া যে কত মিষ্টি, পাতালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেদিন তা ভালো করে প্রথম বুঝতে পারলুম। কারুর মুখে কোনও কথা নেই—সকলে মিলে নীরবে বসে খানিকক্ষণ ধরে সেই আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ভোগ করে নিতে লাগলুম।

হঠাৎ বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আলো-হাওয়া আজও আছে, কালও থাকবে। কিন্তু করালীকে আজ না ধরতে পারলে এ-জীবনে আর কখনও ধরতে পারব না। ওঠো কুমার, ওঠো রামহরি।'

আমি কাতরভাবে বললুম, 'কোথায় যাব আবার?'

—'যে পথে এসেছি, সেই পথে। করালীকে ধরব—যকের ধন কেড়ে নেব।'

—'কিন্তু এখনও যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি!'

বিমল হাত ধরে একটানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার নিকুচি করেছে! আগে তো বেরিয়ে পড়ি, তারপর ব্যাগের ভেতরে বিস্কুটের টিন আছে, পথ চলতে

ওরে বাবা রে, প্রাণ যে যায়, একটু জল দাও।

চলতে তাই খেয়েই পেট ভরাতে পারব।—এসো, এসো, আর দেরি নয়'।

বন্দুকটা ঘাড়ে করে বিমল অগ্রসর হল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

বিমল বললে, 'সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে করালী নিশ্চয় ভাবছে, আর কেউ তার যকের ধনে ভাগ বসাতে আসবে না। সে নিশ্চিন্ত মনে দেশের দিকে ফিরে চলেছে, আমরা একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলে আজকেই হয়তো আবার তাকে ধরতে পারব, এরই মধ্যে সে বেশিদূর এগুতে পারেনি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু করালী তো সহজে যকের ধন ছেড়ে দেবে না!'

—'তা তো দেবেই না।'

—'তাহলে আবার একটা মারামারি হবে বলো?'

—'হবে বইকি! কিন্তু এবারে আমরাই তাকে আগে আক্রমণ করব।'

এমনি কথা কইতে কইতে, বৌদ্ধমঠ পিছনে ফেলে আমরা অনেকদূর এগিয়ে পড়লুম।

ক্রমে সূর্য ডুবে গেল, চারিধারে অন্ধকারে আবছায়া ঘনিয়ে এল, বাসামুখো পাখিরা কলরব করতে করতে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, পৃথিবীতে এবার ঘুমপাড়ানি মাসির রাজত্ব শুরু হবে।

আমরা পাহাড়ের সেই মস্ত ফাটলের কাছে এসে পড়লুম,—সরল গাছ কেটে সাঁকোর মতো করে যেখানটা আমাদের পার হতে হয়েছিল।

সাঁকোর কাছে এসে বিমল বললে, 'দ্যাখো কুমার, আমি যদি করালী হতুম, তাহলে কি করতুম জানো?'

—'কি করতে?'

—'এই গাছটাকে যে-কোনও রকমে ফাটলের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতুম। তাহলে আর কেউ আমার পিছু নিতে পারত না।'

—'কিন্তু করালী যে জানে তার শত্রুরা এখন কবরের অন্ধকারে, হাঁপিয়ে মরছে, তারা আর কিছুই করতে পারবে না।'

—'এত বেশি নিশ্চিন্ত হওয়াই ভুল, সাবধানের মার নেই। দ্যাখো না, এক এই ভুলেই করালীকে যকের ধন হারাতে হবে।...কিন্তু কে ও—কে ও?'

আমরা সকলেই স্পষ্ট শুনলুম, স্তব্ধ সন্ধ্যার বুকের মধ্য থেকে এক ক্ষীণ আর্তনাদ জেগে উঠছে—'জল, একটু জল!'

—'কুমার, কুমার, ও কার আর্তনাদ?'

—'একটু জল, একটু জল।'

সকলে মিলে এদিকে-ওদিকে খুঁজতে খুঁজতে শেষটা দেখলুম, পাহাড়ের একপাশে একটা খাদলের মধ্যে যেন মানুষের দেহের মতো কি পড়ে রয়েছে। জঙ্গলে সেখানটা অন্ধকার দেখে আমি বললুম, 'রামহরি শিগগির লণ্ঠনটা জ্বালো তো।'

রামহরি আলো জ্বেলে খাদলের উপরে ধরতেই লোকটা আবার কান্নার স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'ওরে বাবা রে, প্রাণ যে যায়, একটু জল দাও—একটু জল দাও!'

বিমল তাকে টেনে উপরে তুলে, তার মুখ দেখেই বলে উঠল, 'একে যে আমি করালীর সঙ্গে দেখেছি!'

লোকটাও বিমলকে দেখে সভয়ে বললে, 'আমাকে আর মেরো না, আমি মরতেই বসেছি—আমাকে মেরে কোনও লাভ নেই।'

এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে-বুকে-হাতে-পিঠে বড়ো বড়ো রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন—ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ তাকে বার বার আঘাত করেছে।

বিমল বললে, 'কে তোমার এ দশা করলে?'

—'করালী।'

—'করালী?'

—'হ্যাঁ মশাই, সেই শয়তান করালী।'

—'কেন সে তোমাকে মারলে?'

—'সব বলছি, কিন্তু বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আগে একটু জল দাও—তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

রামহরি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল ঢেলে দিলে। জলপান করে 'আঃ' বলে লোকটা চোখ মুদে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

বিমল বললে, 'এইবার বলো, করালী কেন তোমাকে মারলে?'

—'বলছি বাবু, বলছি। আমি তো আর বাঁচব না, কিন্তু মরবার আগে সব কথাই তোমাদের কাছে বলে যাব।' আরও কতক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল, 'বাবু, তোমাদের পাথর চাপা দিয়ে, করালীবাবু আর আমি তো সেখান থেকে চলে এলুম। যকের ধনের বাক্স করালীবাবুর হাতেই। তারপর এখানে এসে করালীবাবু বলল, 'তুই কিছু খাবার রান্না কর, কাল সারারাত খাওয়া হয়নি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'—আমাদের সঙ্গে চাল-ডাল আর আলু ছিল, বন থেকে কাঠ-কুটো জোগাড় করে এনে আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিলুম। ...করালীবাবু আগে খেয়ে নিলে, পরে আমি খেতে বসলুম। তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার পিঠের ওপরে ভয়ানক একটা চোট লাগল, তখনই আমি চোখে অন্ধকার দেখে চিত হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আমার বুকে আর মুখেও ছোরার মতন কি এসে বিঁধল—আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কে যে মারলে তা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু করালীবাবু ছাড়া তো এখানে আর জনমুনিষ্যি ছিল না, সে ছাড়া আর কেউ আমাকে মারেনি। বোধহয়, পাছে আমি তার যকের ধনের ভাগীদার হতে চাই, তাই সে এ কাজ করেছে।' এই পর্যন্ত বলেই লোকটা বেজায় হাঁপাতে লাগল।

বিমল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারটা কতক্ষণ আগে হয়েছে?'

—'তখন বোধহয় বিকেলবেলা।'

—'করালীর সঙ্গে আর কে আছে?'

—'কেউ নেই। আমরা পাঁচজন লোক ছিলুম। আসবার মুখেই দুজন তো তোমাদের তাড়া খেয়ে অন্ধকার রাতে ওই ফাটলে পড়ে পটল তুলেছে। শম্ভুকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ভূত না দানো কার মুখে ফেলে ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। এইবার আমার পালা, জল —আর একটু জল!'

রামহরি আবার তার মুখে জল দিলে, কিন্তু এবার জল খেয়েই তার চোখ কপালে উঠে গেল।

বিমল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, 'যকের ধনের বাক্সে কি ছিল?'

কিন্তু লোকটা আর কোনও জবাব দিতে পারলে না, তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে লাগল ও জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল; তারপরেই গোটাকতক হেঁচকি তুলে সে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

বিমল বললে, 'যাক, এ আর জন্মের মতো কথা কইবে না। এখন চলো, করালীকে ধরে তবে অন্য কাজ।'

চোখের সামনে একটা লোককে এভাবে মরতে দেখে আমার মনটা অত্যন্ত দমে গেল, আমি আর কোনও কথা না বলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে চললুম এই ভাবতে ভাবতে যে, পৃথিবীতে করালীর মতন মহাপাষণ্ড আর কেউ আছে কি?

আঠাশ

ভীষণ গহ্বর

অল্প-অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, সে আলোতে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—অন্ধকার ছাড়া। প্রেতলোকের মতন নির্জন পথ। আমাদের পায়ের শব্দে যেন চারিদিকের স্তব্ধতা চমকে চমকে উঠছে। আশেপাশের কালি-দিয়ে-আঁকা গাছপালাগুলো মাঝে মাঝে বাতাস লেগে দুলছে আর আমাদের মনে হচ্ছে, থেকে থেকে অন্ধকার যেন তার ডানা নাড়া দিচ্ছে।

আমি বললুম, 'দ্যাখো বিমল, আমাদের আর এগুনো ঠিক নয়।'

—'কেন?'

—'এই অন্ধকারে একলা পথ চলতে করালী নিশ্চয় ভয় পাবে। খুব সম্ভব, সে এখন কোনও গুহায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে আর আমরা হয়তো তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব। তার চেয়ে আপাতত আমরাও কোথাও মাথা গুঁজে কিছু বিশ্রাম করে নিই এসো, তারপর ভোর হলেই আবার চলতে শুরু করা যাবে।'

বিমল বললে, 'কুমার তুমি ঠিক বলেছ। করালীকে ধরবার আগ্রহে এসব কথা আমার মনেই ছিল না।'

রক্তজবার রঙে-চোবানো ঊষার প্রথম আলো সবে যখন পূর্ব আকাশের ধারে পাড় বুনে দিচ্ছে, আমরা তখন আবার উঠে পথ চলতে শুরু করলুম।

চারিদিকে নানা জাতের পাখিরা মিলে গানের আসর জমিয়ে তুলেছে, গাছের সবুজ পাতারাও যেন কাঁপতে কাঁপতে মর্মর-সুরে সেই গানে যোগ দিয়েছে, আর তার তালে তালে ঝরে পড়ে ঝরনার জল নাচতে নাচতে নিচে নেমে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে পৃথিবীতে কেমন একটি শান্তিভরা আনন্দের আভাস! এরই মধ্যে আমরা কিন্তু আজ হিংসাপূর্ণ আগ্রহে ছুটে চলেছি—এটা ভেবেও আমার মন বার বার কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগল।...

পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথার উপরে সূর্যের মুখ যখন জ্বলন্ত মুকুটের মতন জেগে উঠল, আমরা তখন পথের একটা বাঁকের মুখে এসে পড়েছি।

বাঘা এগিয়ে এগিয়ে চলছিল, বাঁকের মুখে গিয়েই হঠাৎ সে ঘেউ ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

আমরা সবাই সতর্ক ছিলুম, সে চ্যাঁচালে কেন, দেখবার জন্যে তখনই সকলে ছুটে বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দেখলুম, খানিক তফাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! দেখবামাত্র চিনলুম, সে করালী! তার হাতে একটা বড়ো বাক্স—যকের ধন!

আমাদের দেখেই করালী বেগে একদৌড় মারলে—সঙ্গে সঙ্গে বিমলও তীরের মতন তার দিকে ছুটে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ছুটতে ছুটতে বিমল একেবারে করালীর কাছে গিয়ে পড়ল। তারপর সে চেঁচিয়ে বললে, 'করালী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে থামো। নইলে আমি গুলি করে তোমাকে কুকুরের মতো মেরে ফেলব।'

কিন্তু করালী থামলে না, হঠাৎ পথের বাঁ দিকে একটা উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল—বিমল সেখানে থমকে দাঁড়াল,—এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই সেও লাফিয়ে উপরে উঠল, আমরা তাকেও আর দেখতে পেলুম না।

ততক্ষণে আমাদের হুঁস হল—'রামহরি, শিগগির এসো' বলেই আমি প্রাণপণে দৌড়ে অগ্রসর হলুম।

সেই উঁচু জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গুহার মুখ। আমি একলাফে উপরে উঠতেই একটা বিকট চিৎকার এসে আমার কানের ভিতর ঢুকল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বিমলের কণ্ঠস্বরে উচ্চ আর্তনাদ! তারপরই সব স্তব্ধ।

আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল—বেগে ছুটে গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ভিতরে গিয়ে দেখি কেউ তো সেখানে নেই! অত্যন্ত আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পরমুহূর্তে রামহরি এসে গুহার মধ্যে ঢুকে বললে, 'কে অমন চেঁচিয়ে উঠল? কই, খোকাবাবু কোথায়?'

—'জানি না রামহরি, আমি শুনলুম গুহার ভেতর থেকে বিমল আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ভেতরে এসে কারুকেই তো দেখতে পাচ্ছি না!'

গুহার একদিকটা আঁধারে ঝাপসা। সেইদিকে গিয়েই রামহরি বলে উঠল, 'এই যে, ভেতরে আর একটা পথ রয়েছে।'

দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই তো! একটা গলির মতো পথ ভিতর দিকে চলে গেছে—কিন্তু অন্ধকারে সেখানে একটুও নজর চলে না।

আমি বললুম, 'রামহরি, শিগগির বিজলী-মশাল বের করো, বন্দুকটা আমাকে দাও।'

বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে রামহরি বিজলী-মশাল বার করলে, তারপরে সাবধানে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে তার সঙ্গে সঙ্গে চললুম।

উপরে, নিচে, এপাশে, ওপাশে গুহার নিরেট পাথর, তারই ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আবার আমার মনে পড়ল, সেই যকের ধনের সুড়ঙ্গের কথা।

আচম্বিতে রামহরি দাঁড়িয়ে পড়ে আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ!'

আমি বললুম, 'ব্যাপার কি?'

রামহরি বললে, 'সামনেই প্রকাণ্ড একটা গর্ত!'

বিজলী-মশালের তীব্র আলোতে দেখলুম, ঠিক রামহরির পায়ের তলাতেই গুহার পথ শেষ হয়ে গেছে, তারপরেই মস্তবড়ো একটা অন্ধকারভরা ফাঁক যেন হাঁ করে আমাদের গিলতে আসছে। বিমল কি ওরই মধ্যে পড়ে গেছে?

যতটা পারি গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'বিমল, বিমল, বিমল!'

পৃথিবীর গর্ত থেকে করুণস্বরে কে যেন সাড়া দিলে—'কুমার, কুমার! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

বিমল সাঁতরে এসে দড়িটা দু-হাতে চেপে ধরলে।

গহ্বরের ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে রামহরির হাত থেকে বিজলী-মশালটা নিয়ে দেখলুম, গর্তের মুখটা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত চাওড়া। তলার দিকে চেয়ে দেখলুম প্রায় ত্রিশ হাত নিচে কি যেন চক চক করছে! ভালো করে চেয়ে দেখি, জল।

আবার চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল, কোথায় তুমি?'

অনেক নিচে থেকে বিমল বললে, 'এই যে, জলের ভেতরে। শিগগির আমাকে তোলবার ব্যবস্থা করো ভাই, আমার হাত-পায়ে খিল ধরেছে, এখুনি ডুবে যাব।'

—'রামহরি, রামহরি! ব্যাগের ভেতর থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করো—জলদি!'

রামহরি তখনই পিঠ থেকে বড়ো ব্যাগটা নামিয়ে খুলতে বসে গেল। আমি বিজলী-মশালটা নিচু-মুখো করে দেখলুম, কালো জলের ভিতরে ঢেউ তুলে বিমল সাঁতার দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দড়িটা নামিয়ে দিলুম, বিমল সাঁতরে এসে দড়িটা দু-হাতে চেপে ধরলে।

আমি আবার চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল, দেওয়ালে পা দিয়ে দড়ি ধরে তুমি উপরে উঠতে পারবে, না, আমরা তোমায় টেনে তুলব?'

বিমলও চেঁচিয়ে বললে, 'বোধহয় আমি নিজেই উঠতে পারব।'

আমি আর রামহরি সজোরে দড়ি ধরে রইলুম, খানিক পরে বিমল নিজেই উপরে এসে উঠল, তারপর আমার কোলের ভিতরে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমরা দুজনে তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলুম।

ঊনত্রিশ

পরিণাম

বিমলের জ্ঞান হলে পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি করে তুমি গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লে?'

বিমল বললে, 'করালীর পিছনে পিছনে যেই আমি গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম, সে অমনি ওই অন্ধকার গলির মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল। আমিও ছাড়লুম না, গলির ভিতরে ঢুকে সেই অন্ধকারেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলুম, তারপর দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হল। কিন্তু আমরা কেউ জানতুম না যে, ওখানে আবার একটা গহ্বর আছে, ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি করতে করতে দুজনেই হঠাৎ তার ভেতরে পড়ে গেলুম।'

আমি শিউরে বলে উঠলুম, 'অ্যাঁঃ! করালী তাহলে এখনও গহ্বরের মধ্যে আছে?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু বেঁচে নেই।'

—'সে কি!'

—'যদিও অন্ধকারে সেখানে চোখ চলে না, তবু আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, সে ডুবে মরেছে। কারণ, আমরা জলে পড়বার পর ঠিক আমার পাশেই দু-চারবার ঝপাঝপ শব্দ হয়েই সব চুপ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সে সাঁতার জানত না, জানলে জলের ভেতরে শব্দ হত।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর যকের ধনের বাক্সটা?'

বিমল একটা বিষাদভরা হাসি হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'আমি যখন করালীকে

জড়িয়ে ধরি, তখনও সে বাক্সটা ছাড়েনি। আমার বিশ্বাস, বাক্সটা নিয়েই সে জলপথে পরলোক যাত্রা করেছে।'

—'কিন্তু বাক্সটা যদি গলির ভেতরে পড়ে থাকে?' বলেই আমি বিজলী-মশালটা নিয়ে আবার গুহার ভিতরকার গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু মিছে আশা, সেখানে বাক্সের চিহ্নমাত্রও নেই! আর একবার সেই বিরাট গহ্বরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম, অনেক নিচে অন্ধকারমাখা জলরাশি মৃতের মতন স্থির ও স্তব্ধ হয়ে আছে, এই একটু আগেই সে যে একটা মানুষের প্রাণ ও সাতরাজার ধনকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করে ফেলেছে, তাকে দেখে এখন আর সে সন্দেহ করবারও উপায় নেই।

হতাশভাবে বাইরে এসে অবসন্নের মতন বসে পড়লুম।

বিমল শুধোলে, 'কেমন, পেলে না তো?'

মাথা নেড়ে নীরবে জানালুম—'না।'

—'তা আমি আগেই জানি। করালী প্রাণে মরেছে বটে, কিন্তু যকের ধন ছাড়েনি। শেষ জিত তারই।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। দুঃখে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে মনটা আমার ভরে উঠল; এত বিপদ, এত কষ্টভোগের পর এতবড়ো নিরাশা! আমার ডাক-ছেড়ে কাঁদবার ইচ্ছা হতে লাগল।

বিমলও হতাশভাবে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে রামহরি বললে, 'তোমরা দুজনে অমন মনমরা হয়ে থাকলে তো চলবে না। যকের ধন ভাগ্যেই নেই তাতে হয়েছে কি?'

'প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। যা হাতে না আসতেই অত বিপদ, এত ঝঞ্ঝাট, যার জন্যে এতগুলো প্রাণ গেল, তা পেলে না জানি আরও কত মুশকিলই হত! এখন ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে চলো।'

বিমল মাথা তুলে হেসে বললে, 'ঠিক বলেছ রামহরি। আঙুর যখন নাগালের বাইরে, তখন তাকে তেতো বলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যাক। যকের ধন কি মানুষের ভোগে লাগে? করালী ভূত হয়ে চিরকাল তা ভোগ করুক—দরকার নেই আর তার জন্যে মাথা ঘামিয়ে। আপাতত বড়োই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, কুমার! তুমি একবার চেষ্টা করে দ্যাখো, পাখিটাখি কিছু মারতে পারো কি না। ততক্ষণে রামহরি ভাত চড়িয়ে দিক, আর আমি ওষুধ মালিশ করে গায়ের ব্যথা দূর করি।'

আমি বললুম, 'কাজেই!'

বিমল বললে, 'আহারের পর নিদ্রা, তারপর দুর্গা বলে স্বদেশের দিকে যাত্রা, কি বলো?'

আমি বললুম, 'অগত্যা।'

আবার যখের ধন

এক

ভূত না চোর?

সন্ধ্যাবেলা। দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে। একজনের হাতে একখানা খবরের কাগজ, আর একজনের হাতে একখানা খোলা বই। সামনে একটা টেবিল,—তার তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, মস্ত একটা দেশি কুকুর।

একজনের নাম বিমল, আর একজনের নাম কুমার। কুকুরটার নাম হচ্ছে বাঘা। 'যখের ধনে'র পাঠকরা নিশ্চয়ই এদের চিনতে পেরেছেন?

কুমার হঠাৎ খবরের কাগজখানা মহা বিরক্তির সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "খবরের কাগজের নিকুচি করেচে!"

বিমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, "কি হল হে? হঠাৎ খবরের কাগজের ওপর চট্‌লে কেন?"

কুমার বললে, "না চটে করি কি বলি দেখি? কাগজে নতুন কোন খবর নেই—সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! নাঃ, পৃথিবীটা বেজায় একঘেয়ে হয়ে উঠেচে!"

বিমল হাতের বইখানা মুড়ে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, "পৃথিবীকে তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না? তাহলে তুমি আবার মঙ্গল-গ্রহে ফিরে যেতে চাও?"

—"না, দেখা দেশ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া ভালো।"

—"ওরে বাস্‌রে, সেখানে ভয়ানক শীত!"

—"তাহলে পাতালে যাই চল।"

—"চন্দ্রলোকে গেলেও তোমাকে বোধ হয় পাতালে থাকতে হবে। সেখানে মাটির উপরে চির-তুষারের রাজ্য। পণ্ডিতরা তাই সন্দেহ করেন যে, চন্দ্রলোকের জীবরা পাতালের ভেতরে থাকে।"

—"কিন্তু চন্দ্রলোক যাব কেমন করে?"

—"সে কথা পরে ভাবা যাবে এখন,.....আপাতত রামহরির পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, বোধ হয় আমাদের জলখাবার আসচে, অতএব—"

রামহরি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল, তার দুই হাতে দু-খানা খাবারের থালা।

বিমল বললে, "এস এস, রামহরি এস! রামহরি, তুমি যখন হাসিমুখে

খাবারের থালা হাতে করে ঘরে এসে ঢোকো, তখন তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে। আজ কি বানিয়েচ রামহরি?"

রামহরি থালা দু'খানা দু'জনের সামনে রেখে বললে, "মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া!"

বিমল বললে, "আরে বাহবা কি বাহবা! হাত চালাও কুমার, হাত চালাও।"

কুমার একখানা কচুরি তুলে নিয়ে বললে, "ভগবান রামহরিকে দীর্ঘজীবী করুন! আমাদের রামহরি না থাক্‌লে এই একঘেয়ে পৃথিবীতে বাঁচাই মুস্কিল হত!"

মাছ-মাংসের গন্ধে বাঘারও ঘুম গেল ছুটে! সেও দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমে একটা 'ডন্' দিয়ে চাঙ্গা হয়ে এগিয়ে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করলে।

এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বিমল বললে, "দেখ তো রামহরি, কে ডাকে!"

রামহরি বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বললে, "একটি ভদ্রলোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেচি!"

খাবারের থালা খালি করে বিমল ও কুমার নিচে নেমে গেল। বাইরের ঘরে একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না, দিব্য ফর্সা রং, চেহারায় বেশ-একটি লালিত্য আছে।

বিমল বললে, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদেরই। আপনারা আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আমার নাম মানিকলাল বসু, আমার বাড়ি খুব কাছেই।"

বিমল বললে, "বসুন। আমাদের কাছে আপনার কি দরকার?"

—"মশাই, আমি বড় বিপদে পড়েচি। আমার বাড়িতে বোধহয় ভূতের উপদ্রব হয়েচে।"

বিমল বললে, "কিন্তু সে জন্যে আমাদের কাছে এসেচেন কেন? আমরা তো রোজা নই!"

মানিকবাবু বললেন, "এ যে সে ভূত নয় মশাই, রোজা এর কিছু করতে পারবে না। আমি আপনাদের কীর্তিকলাপ সব শুনেচি, তাই আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেচি।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি আগে খুলে বলুন দেখি!"

মানিকবাবু বললেন, "ঐ যে বললুম, ভূতের অত্যাচার! আর অত্যাচার বলে অত্যাচার? ভয়ানক অত্যাচার! উঃ!"

বিমল ও কুমার হেসে ফেললে।

—"আপনারা হাসচেন? তা হাসুন! কিন্তু আমার বাড়িটা যদি আপনাদের বাড়ি হত, তাহলে আপনাদের মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যেত। বুঝচেন মশাই, আমার বাড়িটা এখন ভূতের বৈঠকখানা হয়ে দাঁড়িয়েচে!"

—"কি রকম, শুনি?"

—"শুনুন তাহলে। ঠিক মাসখানেক আগে আমরা বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেশে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, আমাদের সদর-দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখি, উঠোনের ওপর রুপোর বাসন আর আমার স্ত্রীর গয়নাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওপরে উঠে দেখি, প্রত্যেক ঘরের তালা ভাঙা! কোন ঘরে টেবিলের ভেতর থেকে কাগজ-পত্তর বার করে কে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেছে, কোন ঘরে লোহার সিন্দুক ভাঙা পড়ে আছে, কোন ঘরে আলমারি ভেঙে কাপড়-চোপড়গুলো কে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেচে! অথচ কিছুই হারায়নি। বলুন দেখি, এসব কি ব্যাপার? চোর এলে সব চুরি করে নিয়ে যেত, কিন্তু আমার কিছুই চুরি যায়নি। একি ভুতুড়ে কাণ্ড নয়?"

বিমল বললে, "তারপর?"

—"দিন পনেরো আগে, অনেক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই শুনলুম, আমার টেরিয়ার কুকুরটা বেজায় চিৎকার করচে। তারপরেই সে আর্তনাদ করে একেবারে চুপ হয়ে গেল। আমি ভয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারলুম না, সেইখান থেকেই চেঁচাতে লাগলুম। তারপর বাড়ির সবাই যখন জেগে উঠল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, আমার কুকুরটকে গলা টিপে কে মেরে ফেলেচে। আর তার মুখে লেগে রয়েচে এক খাব্‌লা লোম!"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "লোম?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সে লোম আমার কুকুরের নয়। লোমগুলো আমি কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েচি। এই দেখুন না।"—বলেই মানিকবাবু কাগজের একটি ছোট পুরিয়া বার করে বিমলের হাতে দিলেন।

বিমল পুরিয়াটা খুলে লোমগুলো পরীক্ষা করে বললে, "আচ্ছা, এটা এখন আমার কাছে থাক্। তারপর কি হয়েছে বলুন।"

মানিকবাবু বললেন, "কাল রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে—চারিদিক স্তব্ধ। হঠাৎ শুনলুম, আমার বাড়ির ছাতের উপর দুম্ দুম্ করে শব্দ হচ্ছে,—সে মানুষের পায়ের শব্দ নয়, মানুষের পায়ের শব্দ অত ভারি হয় না, ঠিক যেন একটা হাতি ছাতময় চলে বেড়াচ্ছে! ভয়ে

আমার চুলগুলো পর্যন্ত যেন খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে-কাঁপতে কোন রকমে বিছানার উপরে উঠে বসলুম! বাড়িতে এই রকম গোলমাল দেখে আমি একটা বন্দুক কিনেছিলুম। তাড়াতাড়ি সেই বন্দুকটা নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই ছাতের উপরের পায়ের শব্দ থেমে গেল। রাত্রে আর কোন হ্যাঙ্গাম হয়নি।"

বিমল শুধোলে, "আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ। পুলিশ কোনই কিনারা করতে পারেনি।"

—"দেখুন মাণিকবাবু, আপনার সমস্ত কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে যারা যারা আসচে তারা সাধারণ চোর নয়। তারা টাকা-পয়সার লোভে আসচে না। আপনার বাড়িতে হয়তো এমন কোন জিনিস আছে, যার দাম টাকা-পয়সার চেয়ে বেশি।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মানিকবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "বিমলবাবু, এ-কথা তো আমি একবারও ভাবিনি!...হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেচেন, আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে বটে! ইচ্ছে করলে আমি রাজার ঐশ্বর্য পেতে পারি।"

—"তার মানে?"

—"তাহলে গোড়া থেকেই বলচি। আমার বাবার দুই ভাই। মেজো কাকার নাম সুরেনবাবু, ছোট কাকার নাম মাখনবাবু। গেল যুদ্ধের সময়ে আমার দুই কাকাই ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় যান। তারপর তাঁদের আর কোন খবর পাইনি। আজ তিন মাস আগে জাঞ্জিবার থেকে হঠাৎ মেজো কাকার এক মস্ত চিঠি পাই। চিঠির মর্ম মেজো কাকার ভাষাতেই আমার যতটা মনে আছে আপনাকে সংক্ষেপে বলচি ঃ

"বাবা মানিক,

আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, আমার বাঁচবার কোন আশা নেই। এতদিন আমি তোমাদের কোন খবর নিতেও পারিনি, নিজের কোন খবর দিতেও পারিনি, কারণ, আফ্রিকার এমন সব দেশে আমাকে থাকতে হয়েছিল, যেখান থেকে খবরাখবর পাঠাবার কোনই উপায় নেই।

এখন কি জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি শোনো। ইস্ট-আফ্রিকার টাঙ্গানিকা-হ্রদের কাছে এক পাহাড়ের ভিতরে আমি অগাধ ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছি। যে ঐশ্বর্য পেলে অনেক রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যাবে।

এ-ঐশ্বর্য আমারই হত। কিন্তু সাংঘাতিক পীড়ায় আমি এখন পরলোকের পথে পা দিয়েছি। আমার স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই—কাজেই ঐ ঐশ্বর্যের সন্ধান

আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম। ওখানকার সমস্ত ধনরত্ন তুমি পেতে পারো।

এই পত্রের সঙ্গে ম্যাপ পাঠালুম, সেখানি খুব যত্নে সাবধানে রেখো। কোন্ পথে, কেমন করে, কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, এই ম্যাপে সব লেখা আছে। আর কেউ যেন এই ম্যাপের কথা জানতে না পারে।

আর একটা কথা মনে রেখো। একলা যেন এই গুপ্তধন নিতে এস না। কারণ দুর্গম পথ, পদে-পদে প্রাণের ভয়,—সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি, হিপো, গণ্ডার, সাপ। অসভ্য জাতি আর নানান রকম ব্যাধি, কখন যে কার কবলে প্রাণ যাবে, কিছুই বলা যায় না। এ-সব বিপদ যদি এড়াতে পারবে বলে মনে কর, তবেই এস,—নইলে নয়।

চিঠির সঙ্গে গুপ্তধনের একটা ইতিহাস দিলুম, পড়ে দেখলে অনেক সুবিধা হবে।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন; ইতি—তোমার মেজো কাকা।"

—"বিমলবাবু, আপনি কি মনে করেন, ঐ ম্যাপের জন্যেই আমার ওপরে অত্যাচার হচ্ছে? কিন্তু এ-সব কথা তো আমি আর কারুর কাছেই বলিনি!"

বিমল ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ নীরবে পায়চারি করে বললে, "আপনার মেজো কাকার চিঠি আর ম্যাপ এখনো আপনার কাছেই তো আছে?"

—"নিশ্চয়! সেই চিঠি আর ম্যাপ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে পুরে আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েচি। সেখান থেকে কেউ তা খুঁজে বার করতে পারবে না।"

—"আপনার মেজো কাকার চিঠি পেয়েছেন, মাস-তিনেক আগে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর ঠিক তার দু-মাস পরেই আপনার বাড়িতে উপদ্রব শুরু হয়েচে। এতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, চোরেরা ঐ ম্যাপখানাই চুরি করতে চায়?"

—"এ চোরেরা কি অন্তর্যামী? ম্যাপের কথা এতদিন খালি আমি জানতুম, আর আজ আপনারা দু'জনে জানলেন।"

এমন সময়ে বাঘা এসে ঘরের ভিতরে ঢুকল। একবার মানিকবাবুর পা দুটো গম্ভীর ভাবে শুঁকে দেখলে, তারপর পথের ধারের একটা জানলার কাছে গিয়ে গর্‌গর্ করতে লাগল।

মানিকবাবু চেয়ারের উপরে দুই পা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ওকি মশাই, আপনার কুকুর অমন করে কেন? কামড়াবে নাকি?"

বিমল এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, বাইরে রোয়াকের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে কে একটা লোক জানলায় কান পেতে আছে! সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারলে না! লোকটা তড়াক্ করে রোয়াক থেকে নেমে রাস্তায় পড়েই তীরের মতো ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানিকবাবু বললেন, "ও আবার কি?"

কুমার বললে, "চোরেরা আপনার পিছনে চর পাঠিয়েছিল।"

—"আমার পিছনে! ও বাবা, কেন?"

—"কেন আর, আপনি আমাদের এখানে কেন আসচেন, তাই জানবার জন্যে। আপনি ম্যাপখানা কোথায় রেখেচেন, লোকটা নিশ্চয়ই তা শুনতে পেয়েচে।"

মানিকবাবু আবার চেয়ারের উপর হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন, "তাহলে এখন উপায়?"

বিমল বললে, "উঠুন মানিকবাবু, শীগ্‌গির বাড়িতে চলুন। আজ রাত্রে চোরেরা নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি আক্রমণ করবে। আজ আমরাও আপনার বাড়িতে পাহারা দেব।"

দুই
ভূত ও মানুষ

রাত দশটা বেজে গেছে। তারা মানিকবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

মানিকবাবুর বাড়ি একেবারে গঙ্গার খালের ধারে। প্রথমে খাল, তারপর রাস্তা, তারপর একটা ছোট মাঠ, তারপরে মানিকবাবুর বাড়ি। জায়গাটা কলকাতা হলে কি হয়, যেমন নিরালা, তেমনি নির্জন আর বাড়ি-ঘরগুলোও খুব তফাতে-তফাতে।

আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে—কিন্তু সে চাঁদের নামরক্ষা মাত্র। চারিদিক প্রায়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আশপাশের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন কালোর কোলে জমাট বাঁধা অন্ধকারের গাছ।

বিজলী-মশালের ('ইলেকট্রিক টর্চ') আলোটা একদিকে ফেলে বিমল বললে, 'মানিকবাবু, আপনার বাড়ির গায়েই ঐ যে মস্ত-বড় গাছটা ছাত ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে, ওটা বোধহয় বটগাছ?"

মানিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

সন্দেহপূর্ণ নেত্রে গাছের চারিদিকে আলো দেখতে-দেখতে বিমল কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মানিকবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "কি দেখচেন বলুন দেখি?"

—"দেখচি ও-গাছের ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কি না?"

—"ও বাবা, সে কি কথা! ও-সব দেখে-শুনে দরকার নেই মশাই, চলুন, আমরা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে বসে থাকিগে।"

—"কিন্তু ওরা যদি ঐ গাছ থেকে লাফিয়ে বাড়ির ছাতে গিয়ে ওঠে, তাহলে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে করবেন কি?"

—"গাছ থেকে লাফিয়ে ছাতে গিয়ে উঠবে? অসম্ভব!"

—"কেন?"

—"গাছ থেকে আমার বাড়ির ছাত হচ্ছে এগারো-বারো হাত তফাতে। মানুষ অত লম্বা লাফ মারতে পারে না!"

বিমল এগিয়ে গিয়ে গাছ আর বাড়ির ব্যবধান দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, "না, আপনার কথাই সত্যি বটে। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, তবে বাইরের লোক আপনার বাড়ির ভেতর গিয়ে কি করে ঢোকে?"

—"আমিও ভেবে কোন কূল-কিনারা পাই না মশাই।"

বিজলী-মশালের আলোটা বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ঘুরিয়ে বিমল বললে, "হয়েচে। ছাত থেকে বৃষ্টির জল বেরুবার ঐ যে তিন-চারটে নল রয়েচে, চোরেরা নিশ্চয়ই ঐ নল বয়ে ওপরে ওঠে।"

—"ও বাবা, বলেন কি? ব্যাটাদের কি পড়ে মরবার ভয় নেই?"

বিমল বললে, "চলুন, এখন আমরা বাড়ির ভেতরে যাই।"

মানিকবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই একজন চাকর ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে।

বাড়ির ভেতর গিয়ে বিমল বললে, "মানিকবাবু, আজ সদর দরজায় ভেতর থেকে একেবারে তালা বন্ধ করে দিন। কেউ যেন আর দরজা না খোলে।"

মানিকবাবু সেই হুকুম দিলেন।

বিমল বললে, "আচ্ছা, আপনার চাকর-বাকরেরা সব বিশ্বাসী তো?"

—"আজ্ঞে, তাদের কারুকে সন্দেহ করবার উপায় নেই। সব পুরানো চাকর। কেবল..."

—"কেবল কি? বলুন, থামলেন কেন?"

—"কেবল একজন নতুন লোক আছে।"

—"নতুন? কতদিন তাকে রেখেচেন?"

—"সবে কাল সে এসেচে।"

—"আপনি তাকে চেনেন না?"

—"না। কিন্তু তাকেও সন্দেহ করবার কারণ দেখি না। দিব্যি ভদ্দর-চেহারা, আর ভারি শান্তশিষ্ট, মুখ তুলে কথাটি কইতে জানে না। বলতে কি, চেহারা দেখেই তাকে রেখেচি।'

—"আচ্ছা, তাকে একবার ডাকুন দেখি?"

যে চাকরটা সদরে তালা বন্ধ করেছিল, তার দিকে ফিরে মানিকবাবু বললেন, "ওরে, রামুকে একবার ডেকে দে তো?"

সে বললে, "আজ্ঞে, রামু বোধহয় বেরিয়ে গেছে।"

—"বেরিয়ে গেছে?"

—"আজ্ঞে, ঠিক বলতে পারচি না, তবে তাকে খানিকক্ষণ আর দেখতে পাচ্ছি না।"

মানিকবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, "আমি না বারণ করেছিলুম, সন্ধ্যের পর কারুকে বাড়ি থেকে বেরুতে?"

বিমল বললে, "থাক্ মানিকবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকাবকি করে কাজ নেই। আমরা এখন আপনার পড়বার ঘরে যেতে চাই।"

মানিকবাবু বললেন, "চলুন।"

কুমার চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "সেই ঘরেই তো আপনার কাকার চিঠি আর ম্যাপখানা আছে?"

—"হ্যাঁ।"

....পড়বার ঘরের দরজার কাছে এসেই মানিকবাবু সচমকে বলে উঠলেন, "এ কি।"

কুমার বললে, "কি হয়েচে মানিকবাবু?"

মানিকবাবু হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "এ-ঘরের তালা খুলল কে?"

বিমল বললে, "আপনি তালা দিয়ে গিয়েছিলেন তো?"

—"আলবৎ! আমি নিজের হাতে ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছি—"

বিমল এক ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল। সর্বাগ্রে ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, "মানিকবাবু, আমি যে ভয় করেছিলুম তাই বুঝি ঠিক হল। দেখুন—দেখুন—ম্যাপ আর চিঠিখানা এখনো আছে কিনা?"

মানিকবাবু তীরের মতন ঘরের ভিতরে ঢুকে আগে গিয়ে একটা আলমারি খুলে ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি একখানা মোটা বই বার করে খানকয়েক পাতা উল্টে হতাশভাবে বললেন, "সর্বনাশ হয়েচে! সে চিঠিও নেই, ম্যাপও নেই।"

কুমার বললে, "না মানিকবাবু, আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েচি!"

মানিকবাবু কপালে করাঘাত করে বললেন, "ঠিক সময়ে এসে পড়েচি না ছাই করেচি। আমার—"

কুমার বাধা দিয়ে বললে, "আগে ঐ টেবিলের তলায় তাকিয়ে দেখুন!"

মানিকবাবু ও বিমল ঘরের কোণে একটা টেবিলের তলার দিকে চেয়ে দেখলে, কে একজন লোক সেখানে হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে আছে।

কুমার বললে, "চুরি করে চোর এখনো পালাতে পারেনি!"

বিমল এগিয়ে গিয়ে লোকটার পা-দুটো দু-হাতে ধরে তাকে হিড্‌ হিড্‌ করে টেনে বার করে আনলে!

তার মুখের পানে তাকিয়ে মানিকবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "রামু!"

বিমল বললে, "এই কি আপনার নতুন চাকর?"

মানিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।....ওরে রাস্কেল, এই জন্যেই তুমি আমার বাড়িতে চাকরি নিয়েছ? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে?"

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ছাতের উপর শব্দ হল ধুপ্‌ ধুপ্‌ ধুপ্‌! মানিকবাবু সেদিন কিছু ভুল বলেননি, ছাতময় যেন একটা হাতি চলে বেড়াচ্ছেই বটে! তার প্রত্যেক পায়ের চাপে ঘরখানা পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে—মানুষের পায়ের শব্দ এমন-ধারা হয় না!

মানিকবাবু ভয়-শুকনো মুখে বললেন, "ঐ শুনুন! নিচে চোর, ওপরে ভূত! আমি এবারে গেলুম!"

কেবল পায়ের শব্দ শুনে ভয় পাবার ছেলে বিমল ও কুমার নয়। আসামের পাহাড়ে, মঙ্গল-গ্রহে ও মায়া-কাননে গিয়ে তারা যে-সব অমানুষিক বিপদের কবলে পড়েছিল, তার কাছে এ তো তুচ্ছ ব্যাপার! সুতরাং তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, শব্দটা ধীরে ধীরে ছাতের পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিমল বললে, "মানিকবাবু, ছাতের পুব্‌দিকে কি আছে!"

—"নিচে নামবার সিঁড়ি।"

—"তাহলে ছাতে যার পায়ের আওয়াজ শুনচি, সে বোধহয় আমাদের সঙ্গেই আলাপ করতে আস্‌চে।"

মানিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা!"

বিমল বললে, "এস কুমার, আমরা আগে এই লোকটাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি। তারপর যে মহাপুরুষ আসচেন তাঁকে ভালো করেই অভ্যর্থনা করব।" বিমল ও কুমার রামুর হাত-পা বাঁধতে লেগে গেল।

মানিকবাবু দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালের উপর থেকে তাঁর নতুন-কেনা বন্দুকটা পেড়ে নিলেন। তারপর খোলা-জানলার দিকে ফিরে, প্রাণপণে দুই চক্ষু মুদে মুখ সিঁটকে দুম করে একবার বন্দুক ছুঁড়লেন এবং ধপাস্ করে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ থেমে গেল!

কুমার বললে, "ওকি মানিকবাবু, চোখ মুদে আছেন কেন?"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, বন্দুক ছোঁড়া কি সোজা কথা?" বলেই আর একবার বন্দুক ছুঁড়লেন—তেমনি মুখ সিঁটকে ও দুই চক্ষু মুদে।

ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ আবার ধুপ্ ধুপ্ করে ঘর কাঁপিয়ে এবারে এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকে—তারপরেই যে আওয়াজ হল তাতে বোঝা গেল যে, কেউ ছাত থেকে পাশের বটগাছের ওপরে লাফিয়ে পড়ল।

মানিকবাবুর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বিমল বললে, "শীগ্‌গির টোটা দিন—শীগ্‌গির!"

মানিকবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দুটো টোটা এনে বিমলের হাতে দিলেন। বিমল বন্দুকে টোটা ভরতে ভরতে বললে, "কুমার, তুমি টর্চের আলোটা মাঠে ফেলে দেখ, গাছ থেকে কে নামচে?"

কুমার বিজলী-মশাল জ্বেলে জানলার কাছে গেল এবং বিমলও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মশালের আলো অত দূরে ভালো করে পৌঁছলো না—কেবল অস্পষ্টভাবে এইটুকু দেখা গেল যে, চার-পাঁচটা মূর্তি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে এবং তার মধ্যে একটা মূর্তি হচ্ছে মিশমিশে কালো—আকারে প্রকাণ্ড ও তার দেহে একখণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নেই।

মানিকবাবু জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেই 'ভূত ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে এলেন।

কুমার বিস্মিতস্বরে বললে, "কি ও? মানুষের মতন দেখতে অথচ—!"

বিমল মুখ ফিরিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "আর বন্দুক ছোঁড়া মিছে। নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েচে!"

মানিকবাবু বললেন, "কিন্তু কি দেখলুম বিমলবাবু! ভূত আর মানুষ একসঙ্গে ছুটচে?"

বিমল বললে, "ব্যাপারটা আশ্চর্য বটে, আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সেকথা পরে ভাবা যাবে এখন। আপাতত শ্রীমান রামুর সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্। কি বল রামু? তাহলে আজ সন্ধ্যের সময়ে তুমিই বোধহয় আমার বাড়িতে আড়ি পাত্‌তে গিয়েছিলে?"

রামু কোন জবাব দিলে না।

—"কিহে, কথা কইচ না যে বড়? মৌনী-বাবা হয়ে ধ্যান করচ নাকি?"

রামু মুখ খুললে না। কুমার বললে, "ওহে, বিমল, রামু কথা না কইল তো বড় বয়ে গেল! ওর কাছে যে চিঠি আর ম্যাপ আছে তাই নিয়েই আমাদের দরকার।"

—"যা বলেচ!" বলে বিমল রামুর জামা-কাপড় সব হাতড়াতে লাগল! কিন্তু চিঠি ও ম্যাপ পাওয়া গেল না। বিমল তাকে খুব খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "সেই চিঠি আর ম্যাপ কোথায়?"

রামু চুপ।

মানিকবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এসে বললেন, "তোর বোবার নিকুচি করেচে! এখুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব জানিস?"

রামু বললে, "আমার কাছে কিছু নেই।"

—"নেই? চালাকি পেয়েছিস? নেই তো গেল কোথায়?"

—"যারা এসেছিল তারা নিয়ে গেছে!"

মানিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

তিন

দানবের আক্রমণ

চোরেরা গুপ্তধনের ইতিহাস আর ম্যাপখানা নিয়ে গেছে শুনে মানিকবাবুর যে অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। সেই যে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, আর উঠলেন না, কথাও কইলেন না।

দেখে কুমারের বড় দুঃখ হল।

বিমলের মুখ দেখে বোঝা গেল, রামুর কথায় তার বিশ্বাস হয়নি।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে বললে, "মানিকবাবু, আমার বোধ হচ্ছে রামু মিছা কথা বলচে। যারা এসেছিল তারা ম্যাপ আর চিঠি নিয়ে যেতে পারেনি।"

মানিকবাবু নিরাশ-মুখে বললেন, "কি করে জানলেন, আপনি?"

—"ম্যাপ আর চিঠি তারা যদি নিয়েই যাবে, তাহলে রামুও তাদের সঙ্গে

পালায়নি কেন? রামু তো ঐ দুটো জিনিসই চুরি করবার জন্যে আপনার বাড়িতে চাকর সেজে আছে? তবে কাজ হাসিল হবার পরেও সে এ-ঘরের ভেতর কি করছিল?"

রামু বললে, "আপনারা হঠাৎ এসে পড়লেন যে! কেমন করে আমি পালাব?"

বিমল বললে, "কিন্তু আমরা আসবার পরেও ম্যাপ আর চিঠি পেয়েও তোমার দলের লোকেরা ছাতের ওপরে অপেক্ষা করছিল কেন?...না মানিকবাবু, আপনার চিঠি আর ম্যাপ বোধহয় এইখানেই কোথাও আছে! আসুন, আমরা আর একবার ভালো করে খুঁজে দেখি।"

তন্ন তন্ন করে প্রায় একঘণ্টা ধরে তারা ঘরের চারিদিক খুঁজল, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তাদের দিকে তাকিয়ে রামু ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল।

মানিকবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "পোড়ার মুখে আবার হাসি হচ্ছে! দেব ঠাস্ করে গালে এক চড়, হাসি একেবারে বেরিয়ে যাবে!"

বিমল বললে, "রামু, ভালো চাও তো এখনো বল, ম্যাপ আর চিঠি কোথায় গেল?"

—"যারা নিতে এসেছিল তারা নিয়ে গেছে।"

—"কে তারা? কোথায় থাকে?"...রামু জবাব দিলে না।

মানিকবাবু বললেন, "সহজে তুমি জবাব দেবে না—নয়? দেখবে তার মজাটা?"

রামু বললে, "আমাকে মেরে ফেললেও আমার পেট থেকে আর কোন কথা বেরুবে না।"

বিমল বললে, "মানিকবাবু, ওকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। আজকের মতো ওকে থানায় পাঠিয়ে দিন। তারপরে ও মুখ খোলে কি না দেখা যাবে!"

মানিকবাবু তাই করলেন, দু'জন লোকের সঙ্গে রামুকে থানাতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিমল বললে, "আজ বৈকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল। আমি আসবার সময়েই দেখেচি মাঠের মাটি এখনো ভিজে আছে।"

কুমার বললে, "তুমি এ কথা বলচ কেন?"

—"বটগাছের আশেপাশে ভিজে মাটির ওপরে চোরেদের পায়ের দাগ

নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। সেগুলো আর একবার পরীক্ষা করতে চাই।"

মানিকবাবু হতাশভাবে বললেন, "তাতে আর আমাদের কি সুবিধে হবে?"

বিমল বললে, "সুবিধে হয়তো কিছুই হবে না। তবে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? অন্তত এটা বুঝতে পারব তো, চোরদের দলে ক'জন লোক ছিল!"

বিমল এগুল, তার সঙ্গে সঙ্গে কুমারও অগ্রসর হলো। মানিকবাবুও নিতান্ত নাচারের মতন তাদের পিছনে পিছনে নিচে নেমে এলেন। সদর-দরজা পার হয়ে মাঠের উপর পড়েই বিমল বিজলী-মশালের আলো চারিদিকে ফেলতে ফেলতে বললে, "মানিকবাবু, এতক্ষণ আমরা কি ঐ ঘরে ছিলুম?"

—"হ্যাঁ।"

—"কুমার, ঐ ঘরের ঠিক নিচেই মাঠের ওপর সাদা কি-একটা পড়ে আছে দেখ তো?"

কুমার এগিয়ে গিয়ে বললে, "কাগজের একটা মোড়ক।"

মানিকবাবু এক লাফ মেরে বললেন, "কাগজের মোড়ক? কাগজের মোড়ক? কৈ, দেখি—দেখি!" কুমার মোড়কটা নিয়ে এল।

মানিকবাবু মোড়কটা সাগ্রহে টেনে নিয়ে মহা-উল্লাসে বলে উঠলেন, "এই যে আমার হারানিধি! এরই ভেতরে সেই চিঠি আর ম্যাপ আছে।"

বিমল বললে, "যা ভেবেচি তাই! আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, চিঠি আর ম্যাপ চোরেরা নিয়ে যেতে পারেনি! আমরা এসে পড়াতে পালাবার পথ না-পেয়ে রামু ঐ কাগজের মোড়কটা জানলা গলিয়ে মাঠে ফেলে দিয়েচে।"

মানিকবাবু কাগজের মোড়কটা ভিতরকার জামার পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "উঃ! বিমলবাবু আপনার কি বুদ্ধি!"

বিমল বললে, "বুদ্ধি সকলেরই আছে মানিকবাবু! তবে কেউ তা খেলাতে পারে, আর কেউ তা খেলাতে পারে না।...যাক্, আপনার জিনিস তো ফিরিয়ে পেলেন, এখন ঐ গাছের কাছে গিয়ে পায়ের দাগগুলো দেখে আসি চলুন।"

বটগাছের কাছে গিয়ে বিজলী-মশালের আলোতে দেখা গেল, ভিজে কাদার ওপরে নানা আকারের অনেকগুলো পায়ের দাগ! বিমল সেইখানে বসে কাগজ আর পেন্সিল বার করে একে একে দাগগুলোর মাপ নিলে। তারপর বললে, "চোরেদের দলে লোক ছিল পাঁচজন। কিন্তু সেই পাঁচজনের ভেতর একজন হচ্চে অসাধারণ লোক!"

কুমার বললে, "অসাধারণ লোক?"

মানিকবাবু বললেন, "অসাধারণ লোক! সে আবার কি?"

বিমল বললে, "এই দাগটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। যার পায়ের এই দাগ, তার পা হচ্ছে সাধারণ মানুষের পায়ের চেয়ে প্রায় দু-গুণ বড়। তার পায়ের বুড়ো-আঙুল অন্য আঙুলগুলোর চেয়ে অনেকটা তফাতে। সে মাটির ওপরে সমানভাবে পা ফেলে চলতে পারে না। তারপর অন্য অন্য পায়ের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, এ-দাগটা তাদের চেয়ে কত বেশি গভীর। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে, এ-একটা খুব লম্বা-চওড়া আর ভারি লোকের পায়ের দাগ। এক একটা দাগ যেন এক-একটা গর্ত! কে জানে তার দেহের ওজন কত মণ!...সেইজন্যেই ছাতের ওপরে তার পায়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, যেন একটা মত্ত হাতি ছাতময় চলে বেড়াচ্ছে।"

কুমার বিস্ফারিত চক্ষে বললে, "একি মানুষের পায়ের দাগ, না দানবের?"

মানিকবাবু ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "ও বাবা, চোরেরা কি একটা পোষা দৈত্য নিয়ে চুরি করতে এসেচে?"

কুমার বললে, "আমরা তো দূর থেকে ছায়ার মতন তাকে একবার দেখেচি! প্রকাণ্ড তার কালো চেহারা—সর্বাঙ্গ উলঙ্গ!"

মানিকবাবু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে শুষ্কস্বরে বললেন, "ও বাবা, আমার বুক যে ধুক্‌ধুক্ করচে। যদি সে আবার ফিরে আসে!"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হাঁ, দানবেরই মতো বটে! সে যে কি, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতেও পেরেচি, কিন্তু ব্যাপারটা আরো ভালো করে তলিয়ে না বুঝে এখন কিছু বলতে চাই না...তবে এইটুকু জেনে রাখুন, মানিকবাবু, আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা সামনা-সামনি পড়লে এই দানবের হাত থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারব না। আমরা তো দূরের কথা, চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষকেও সে শুধু-হাতে পরাস্ত করতে পারে!"

মানিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা!"

কুমার বললে, "বিমল, তোমার কথা শুনে মনে হয়, ময়নামতীর মায়াকানন থেকে আবার কোন দানব বুঝি আমাদের পিছনে পিছনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েচে।"

বিমল মুখ টিপে একটুখানি হাসলে, কোন কথা বললে না।

মানিকবাবু আচম্বিতে বিমলকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। বিমল সবিস্ময়ে বললে, "কি হল মানিকবাবু কি হল—হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কেন?"

মানিকবাবু বললেন, "ঐ তারা আবার আসচে!"

বিমল সচমকে দেখলে, মাঠে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দুটো ছায়া তীরের মতন ছুটতে ছুটতে প্রায় তাদের কাছে এসে পড়েছে।

এক ঝট্‌কান মেরে বিমল তখনি মানিকবাবুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। তারপর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

তাদের দেখেই মূর্তিদুটো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাপরে, গেলুম! ভূতে ধরলে।"

—"কে এরা?"

তাদের মুখের ওপরে আলো ফেলেই বিমল চিনতে পারলে, যাদের সঙ্গে রামুকে থানায় পাঠানো হয়েছিল এরা হচ্ছে তারাই।

মানিকবাবুর ধড়ে এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। তিনি বলে উঠলেন, "কে সতীশ? সুরেন? এমন করে ছুটে আসচ কেন? কি হয়েছে?"

—"বাবু? আপনারা এখানে আছেন? বাঁচলুম। আমরা ভেবেছিলুম সেই ভূতটা এখানে হাজির হয়েছে।"

—"কি বলচ সতীশ, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ভূত কি?"

—"ভয়ানক ব্যাপার বাবু, ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এইটুকুই আশ্চর্য।"

বিমল বললে, "রামু কোথায়?"

—"হয় পালিয়েচে, নয় ভূতের হাতে পড়েচে।"

—"বেশি বাজে বোকো না। আগে আসল কথা খুলে বল।"

—"বললে হয়তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তবু না বলেও উপায় নেই। রামুকে নিয়ে আমরা থানায় যাচ্ছিলুম। এত রাত্রে পথে লোকজন ছিল না। আগে ছিল সুরেন, মাঝখানে রামু, আর পিছনে আমি। তারপর শীতলা-মন্দিরের সামনে সেই ঝুপ্‌সি অশ্বত্থ-গাছের তলায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন—আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলুম—হঠাৎ মস্ত-বড় একখানা কালো হাত গাছের উপর থেকে সাঁ করে নেমে এসে সুরেনের গলা ধরে তাকে টেনে নিলে। তারপর ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ওপর থেকে একখানা হাত নেমে এসে আমাকেও ঠিক তেমনি করেই টেনে নিলে। মিনিট-খানেক আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেই হাতখানা আবার আমাকে ছেড়ে দিলে—কিন্তু মাটির ওপরে পড়ে রামুকে আর দেখতে পেলুম না। তারপর আমরা ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসছি।"

বিমল বললে, "রামু তাহলে পালিয়েচে? মানিকবাবু, রামুর মুখে চোরেরা

এতক্ষণে তাহলে শুনেচে যে কাগজের মোড়কটা কোথায় আছে! নিশ্চয়ই তারা আবার এখানে আসবে,—শীগ্‌গির বাড়ির ভেতরে চলুন!"

মানিকবাবু তীরের মতন বাড়ির দিকে ছুটলেন। ভিতরে ঢুকেই তিনি বললেন, "তারা আসচে! দরজা বন্ধ করে দাও—দরজা বন্ধ করে দাও!"

বিমল হেসে বললে, "সেই দানবের সামনে দরজা বন্ধ করে কোনই লাভ হবে না। সে যদি আপনার দরজায় এক ধাক্কা মারে তাহলে আপনার দরজা এখনি তাসের বাড়ির মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে!"

মানিকবাবু ভীত মুখে বললেন, "ও বাবা, তার গায়ে এত জোর! তাহলে কি হবে?"

বিমল বললে, "হবে আর কি! আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে, এই যা ভরসা! তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি!"

মানিকবাবু বললেন, "না মশাই, আমি মোটেই প্রস্তুত নই! মানুষ হয়ে দানবের সঙ্গে দেখা করব কি! আজ যদি বাঁচি, কালকেই আমি দেশে পালাব।"

চার

ঘটোৎকচের অন্তর্ধান

সবাই আবার উপরের ঘরে এসে উঠলেন। বিমল আগে ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে রেখে বললে, "কুমার, তুমি এইখানে চোখ দিয়ে বসে থাকো। তারা এলেই খবর দেবে। ততক্ষণে আমি মানিকবাবুর কাকার চিঠিখানা পড়ে ফেলি।"

চিঠিখানা হচ্ছে এই ঃ

"স্নেহাস্পদেষু,

মানিক, আমি এখন মৃত্যুমুখে, আমার আর বাঁচবার কোন আশা নেই। আত্মীয়-স্বজন-হীন এই সুদূর অসভ্যের দেশে থেকে, তোমাদের মুখ না দেখেই আমাকে পরলোকে যেতে হবে, এ কথা কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। এ সময়ে তোমার ছোট কাকাও যদি কাছে থাকত, তাহলে অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। কিন্তু সে হতভাগা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে গেছে। হয়তো আমারি মতো আফ্রিকার কোন জঙ্গলের ভিতরে তাকেও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক্!

যুদ্ধের সময় ইস্ট-আফ্রিকায় এসে কি ভাবে আমি দিন কাটিয়েছি, সে-সব কথা এখন বলবার দরকারও নেই, সময়ও নেই। আর বেশিক্ষণ আমি বাঁচব

না—এখনি চোখে ঝাপসা দেখছি, লিখতে হাত কাঁপছে। নিতান্ত দরকারী কথা ছাড়া আর কিছুই বলবার সময় হবে না।

ইস্ট-আফ্রিকার যে জায়গাটায় আমি এখন আছি, তার নাম হচ্ছে উজিজি। এটা হচ্ছে আরবদের এক উপনিবেশ। এখানে বেশির ভাগই আরব ও সোহাহিলি জাতের লোক বাস করে। অন্যান্য জাতের লোকও কিছু কিছু আছে। উজিজি ঠিক শহর নয়, একটা মস্ত গ্রাম মাত্র। এই গ্রামটির কাছে আছে মস্ত একটি হ্রদ, তার নাম টাঙ্গানিকা। এদেশী ভাষায় 'টাঙ্গানিকা' অর্থে বোঝায়, মেলা-মেশার স্থান! টাঙ্গানিকাকে দেখলে সমুদ্র বলেই ভ্রম হয়, কারণ তার এপার থেকে ওপারে নজর চলে না—যেন অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে টাঙ্গানিকা আগে সমুদ্রেরই অংশ-বিশেষ ছিল। পৃথিবীতে টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ আর দুটি নেই। লম্বায় তা চারশো মাইলেরও বেশি এবং চওড়ায় কোথাও পঁয়তাল্লিশ আর কোথাও ত্রিশ মাইল।

এই বিশাল হ্রদের তীরে এক বুড়ো-আরবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তুমি জানো, দেশে থাকতেই আমার শখ ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা। এখানে এসেও আমি সে শখ ভুলতে পারিনি। অসুখ-বিসুখ হলে স্থানীয় লোকেরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সূত্রেই এই বুড়ো আরবের সঙ্গে আমার আলাপ। বছর তিন আগে বুড়ো আমার ওষুধের গুণে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকেই সে আমার অনুগত। কেবল অনুগত কেন, আমি তাকে আমার বন্ধু বলেই মনে করতুম।

বুড়োর নাম হচ্ছে টিপ্যু টিব। পাঁচ-ছয় মাস আগে সে-বেচারী মারা পড়েছে। তার একমাত্র ছেলে ছিল, গেল বছরে তারও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ গেছে। বুড়োর মৃত্যুকালে কেবল আমি তার কাছে ছিলুম। মৃত্যুর অল্পক্ষণ আগে বুড়ো আমাকে বললে, "বাবু তুমিই এখন আমার মা-বাপ, তুমিই আমার ছেলে। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই আজ আমি তোমাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।"

জ্বরের ঘোরে বুড়ো প্রলাপ বকছে ভেবে আমি বললুম, "থাক্, থাক্, ওসব কথা এখন থাক্।"

বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, "বাবু, আমার কথা মিথ্যা বলে মনে কোরো না। সত্যি-সত্যিই আমি এমন গুপ্তধনের সন্ধান জানি, যা পেলে তুমি সম্রাটের চেয়েও ধনী হবে।"

আমি বললুম, "এমন গুপ্তধনের সন্ধান সত্য-সত্যই যদি তোমার জানা থাকে, তবে তুমি এত গরীবের মতন আছ কেন?"

—"গরীবের মতো আছি কি সাধে? সে গুপ্তধন যেখানে আছে, সে বড় সহজ ঠাঁই নয়। সেখানে যেতে গেলেও লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই! সে-সব কিছুই আমার নেই। কে আমার সঙ্গে যাবে? কাকে বিশ্বাস করব? হয়তো বন্ধু বলে যাদের সাহায্য চাইব, টাকার লোভে তারা আমারই গলায় ছুরি বসাবে। এমনি সাত-পাঁচ ভেবে এতদিন এই গুপ্তধনের ইতিহাস আর কারুর কাছে প্রকাশ করতে বা নিজেও সেখানে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ খোদাতালা আমায় ডাক দিয়েছেন, আজ সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যও আমার কোন কাজে লাগবে না। তাই তোমাকেই আমি এই গুপ্তধনের ঠিকানা দিয়ে যেতে চাই।"

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ গুপ্তধন কোথায় আছে?"

—"টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে উজিজির দক্ষিণ দিকে কাবেগো পাহাড়ের নাম শুনেচ তো? এই গুপ্তধন আছে তার কাছেই।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমি তার খোঁজ পাব কেমন করে।"

বুড়ো নিজের আলখাল্লার ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে একখানা কাগজ বের করে বললে, "এই নাও একখানা ম্যাপ। এই ম্যাপ দেখলেই তুমি সমস্ত বুঝতে পারবে।"

ম্যাপখানা নিয়ে তার ভিতরে ইংরেজি লেখা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "এ ম্যাপ তুমি কোথায় পেলে?"

বুড়ো আমার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চোখ কপালে তুলে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল! অনেক চেষ্টা করেও আর তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলুম না। এবং সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল।

...মানিক, তারপর থেকেই সেই গুপ্তধন ভূতে-পাওয়ার মতন আমাকে পেয়ে বসল। দিন-রাত খালি সেই চিন্তা। শেষটা আর থাকতে না পেরে, জন-পনেরো অসভ্য কুলি নিয়ে আমি সেই গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করলুম। কিন্তু পথেই রোগ, বন্য-জন্তু আর অসভ্য বুনোদের কবলে পড়ে আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের অধিকাংশই মারা পড়ল। যথাস্থানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলুম, তখন আমার দলে লোক ছিল মাত্র দুজন এবং আমিও পড়লুম জ্বরে। তার ওপরে প্রায় পাঁচ-ছয়শো অসভ্য লোক আমাদের আক্রমণ করতে এল। কাজেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে কোন গতিকে পালিয়ে এসে আমরা প্রাণরক্ষা করলুম।

অসভ্যদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালুম বটে, কিন্তু সেই জ্বর হল আমার কাল।

আমার ভাগ্যে গুপ্তধন লাভ হল না! কিন্তু গুপ্তধন যে সেখানে আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনে জেনেছি, ঐ গুপ্তধনের কাহিনী সেখানে লোকের মুখে মুখে ফেরে। অনেককাল আগে কোন রাজা নাকি সেখানে ঐ গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় তা আছে এ-কথা কেউ জানে না। অনেকে সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেছে, কিন্তু কেউ তা পায়নি। এবং পাছে কেউ তার খোঁজ পায়, সেই ভয়ে সেখানকার অসভ্য জাতিরা সর্বদাই সজাগ হয়ে থাকে এবং কোন বিদেশীকেই সেখানে অগ্রসর হতে দেয় না।

মানিক, এই গুপ্তধনের সন্ধান আমি তোমাকে দিয়ে গেলুম। সঙ্গের ম্যাপখানি দেখলেই তুমি সমস্ত সন্ধান জানতে পারবে। আমার তো আপন বলতে আর কেউ নেই। তুমি আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী। কাজেই আমার অবর্তমানে তুমিই এই গুপ্তধনের অধিকারী হতে পারবে।

কিন্তু সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এই গুপ্তধনের লোভে তুমি হয়তো কোনদিনই এখানে আসবে না। তবে যদি কখনো আসো, প্রস্তুত হয়ে আসতে ভুলো না। মনে রেখ, এখানে আসতে গেলে লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই। এখানকার বনে-জঙ্গলে সিংহ আছে, চিতা বাঘ আছে, গরিলা, গণ্ডার, বিষাক্ত সাপ, অসভ্য শত্রু ও সাংঘাতিক রোগের ভয় আছে এবং তার ওপরে আছে বিষম পথকষ্ট।

ম্যাপখানি খুব যত্ন করে লুকিয়ে রেখো। আমি ছাড়া আর একজন এই ম্যাপের কথা জানে। সে যে কে, তা আর তোমাকে বলতে চাই না। তবে এর মধ্যেই সে ঐ ম্যাপখানা চুরি করবার চেষ্টা করেছিল। অতএব খুব সাবধান! মনে রেখো, ঐ ম্যাপ হারালে তুমি গুপ্তধনও হারাবে।

আর আমার কিছু বলবার নেই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি— আশীর্বাদক—তোমার কাকা

পুঃ। হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমরা যদি উজিজিতে আসো, তাহলে এখানে গাটুলা বলে এক বুড়ো সর্দার আছে, তার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিও। গাটুলা খুব বিশ্বাসী, আর আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। আমি যখন গুপ্তধন আনতে গিয়েছিলুম, তখন সেও আমার সঙ্গে ছিল। পথের খবর সে সব জানে। তাকে সঙ্গে নিলে তোমার অনেক উপকার হবে।”

চিঠিখানা পড়ে বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, “মানিকবাবু, কালকেই আপনার বাড়ির সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিন। তারপর এ-বাড়িতে তালা বন্ধ করে আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন চলুন।”

মানিকবাবু বললেন, "আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকব? কেন বলুন দেখি?"

—"তাহলে আপনি অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারবেন। আমরা তো আর রোজ এখানে এসে পাহারা দিতে পারব না।"

—"কিন্তু বিমলবাবু, মাথার ওপরে এ-রকম বিপদ নিয়ে আর ক'দিন এমন করে চলবে?"

—"আর বেশি দিন নয়, সাত দিন। তারপরেই আমরা আফ্রিকায় যাত্রা করব।"

মানিকবাবু চমকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা? আফ্রিকায় যাব কি!"

বিমল বললে, "আফ্রিকায় না গেলে গুপ্তধন পাবেন কি করে?"

মানিকবাবু শুক্‌নো মুখে বললেন, "কাকার চিঠিখানা পড়লেন তো? সেখানে সিঙ্গি আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, গরিলা আছে—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, পৃথিবীর যত বিপদ সব সেখানে আছে। তা আমি জানি। আর জানি বলেই তো সেখানে যেতে চাচ্ছি। আপনার জন্যে সেখানে গুপ্তধন আছে, আর আমাদের জন্যে আছে বিপদ—কেবল বিপদ। আপনার গুপ্তধনের ওপরে আমাদের কোন লোভ নেই, আমরা চাই খালি বিপদকে! সে বিপদ হবে যত ভয়ানক, আমাদের আনন্দ হবে তত বেশি।"

মানিকবাবু হতভম্বের মতন বললেন, "বলেন কি মশাই?"

কুমার জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললে, "হ্যাঁ, মানিকবাবু, বিপদকে আমরা ভালোবাসি। বিপদ না থাকলে মানুষের জীবনটা হয় আলুনি আলুভাতের মতন! সে-রকম জীবনকে আমরা ঘৃণা করি। বিপদকে আমরা ভালবাসি।"

মানিকবাবু বললেন, "আমি কিন্তু বিপদ-আপদ মোটেই পছন্দ করি না।"

কুমার হেসে বললে, "কিন্তু পছন্দ না করলেও, বিপদ এসে আপনারই দরজায় অপেক্ষা করছে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখুন, নিচে কারা দাঁড়িয়ে আছে।"

বিমল বললে, "অ্যাঁ! তারা এসেচে নাকি?"

কুমার বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু অন্ধকারে তাদের দেখাচ্ছে আবছায়ার মতো। বিশেষ কিছুই বোঝবার যো নেই।"

মানিকবাবু ধপাস্ করে একখানা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন। বিমল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে এত অন্ধকার যে, চোখ প্রায় চলে না। নিচে জমির ওপরে কারা চলাফেরা করছে—ঠিক যেন কতকগুলো ছায়া নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছায়া

খুব প্রকাণ্ড এবং অন্ধকারের চেয়েও কালো! কেবল সেই ছায়াটা চলাফেরা করছিল না—সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খালি দুলছে আর দুলছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে তার দুটো চোখ দু-টুকরো কয়লার মতন জ্বলে উঠছে। সে চোখ কি মানুষের চোখ?

হঠাৎ নিচে থেকে চাপা-গলায় কে বললে, "না, সে কাগজের মোড়কটা এখানে নেই।"

আর-একজন বললে, "ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্।"

—"আর খোঁজা মিছে! সেটা নিশ্চয়ই কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

—"নিয়ে আর যাবে কোথায়? দেখচি আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে। ঘটোৎকচ!"

প্রকাণ্ড ছায়াটা দুলতে-দুলতে এগিয়ে এল।

—"ঘটোৎকচ! আমাদের সঙ্গে আয়, আবার আমাদের গাছে চড়তে হবে।"

বিমল ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "এস বন্ধুগণ, আমরাও তোমাদের আদর করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।...কুমার, বন্দুকটা এগিয়ে দাও তো!"

এক মুহূর্তের ভিতরে মাঠের ওপর থেকে ছায়াগুলো স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করে সরে গেল।

বিমল মুখ ফিরিয়ে বললে, "মানিকবাবু, চাঙ্গা হয়ে উঠুন। ঘটোৎকচ আজ আর যুদ্ধ করবে না।"

পাঁচ

এই কি ঘটোৎকচ

ডেক্-চেয়ারের ওপরে বসে এবং রেলিং-এর ওপরে হাত ও মুখ রেখে মানিকবাবু অত্যন্ত ম্রিয়মাণের মতন সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কুমার তাঁর কাঁধের ওপরে একখানা হাত রেখে বললে, "মানিকবাবু, কি ভাবচেন?"

—"ভাবচি আমার মাথা আর মুণ্ডু, আকাশ আর পাতাল!"

—"ভেবেও কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না বুঝি?"

—"কূল-কিনারা? অকূলে ভেসে কূল-কিনারা খুঁজে লাভ? আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেচি—একদম্ মরিয়া! এখন আমি মানুষ খুন করতে পারি।"

—"ভাল কথাই তো! তাহলে এখন আপনার আর কোন দুঃখ নেই তো?"

মানিকবাবু আবার কেমন মুষড়ে পড়লেন। কাঁচুমাঁচু মুখে বললেন, "ও

বাবা, দুঃখ আবার নেই? কোথায় যাচ্ছি ভগবান জানেন; কাঁধের ওপরে মাথা নিয়ে আর কি কখনো দেশে ফিরতে পারব?"

এমন সময়ে বিমল, পুরাতন ভৃত্য রামহরি এবং তাদের পিছনে পিছনে বাঘা-কুকুর সেখানে এসে হাজির হল।

বিমল বললে, "মানিকবাবুর সঙ্গে কি কথা হচ্ছে কুমার?"

কুমার বললে, "দেশ ছেড়ে মানিকবাবুর বড় দুঃখ হয়েচে।"

বিমল বললে, "তা তো হবেই কুমার! তাই হওয়াই তো উচিত! দেশ ছাড়তে যার মনে দুঃখ হয় না, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে-দেশের মাটি আমাকে শয়নের শয্যা পেতে দিয়েচে, ক্ষুধায় ফল-ফসল জুগিয়েচে, তেষ্টায় অমৃতের মতন মিষ্টি জল দান করেচে—যে-দেশের বাতাস আমার নিঃশ্বাস হয়েচে, যে-দেশের আকাশ সূর্য-চাঁদের আলো জ্বেলে আমার চোখে দৃষ্টি দিয়েচে, সে-দেশকে ছাড়তে প্রাণ যে না কেঁদে পারে না! মানুষ-মায়ের চেয়েও যে এই দেশ-মা বড়! মানুষ-মা তো চিরদিন তাঁর সন্তানকে লালন-পালন করতে পারেন না! কিন্তু দেশ-মা যে চিরদিন তাঁর নিজের মাটি-কোলের ভিতরে ছেলে-মেয়েকে আদরে আগলে রেখে দেন—তাঁর মৃত্যু নেই, শ্রান্তি নেই, অযত্ন নেই! ঐ চেয়ে দেখ, আমাদের সোনার দেশ সোনার সূর্যের সোনার আলোয় ঝল্‌মল্‌ করতে করতে এখনও আমাদের মুখের পানে কত স্নেহ, কত প্রেম নিয়ে তাকিয়ে আছেন!"

জাহাজ তখন আরব-সাগরের সুনীল বক্ষ ভেদ করে সশব্দে অগ্রসর হচ্ছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে মা ভারতবর্ষের রৌদ্রধৌত বিপুল তটভূমি—মাথার উপরে নির্মেঘ নীলাকাশের উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ বুকের উপরে শত উপবনের শ্রীমন্ত শ্যামলতা আর সহস্র মন্দির-প্রাসাদের উচ্চ চূড়া এবং চরণের উপরে আরতিমত্ত মহাসমুদ্রের ফেনশুভ্র লক্ষ চঞ্চল বাহুর প্রণাম-আগ্রহ!....ভারতবর্ষ! ভীমার্জুনের জন্মক্ষেত্র! আর্য-জাতির স্বদেশ!

সকলে নীরবে সেই দিকে চেয়ে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

তারপর রামহরি বললে, "দেশকে যদি অতই ভালবাস, তাহলে দেশ ছেড়ে আবার বিদেশে যাওয়া কেন বাপু? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছিল বুঝি?"

বিমল হেসে বললে, "হ্যাঁ রামহরি, ঠিক তাই। তুমি তো জানই আমাদের ঘাড়ে সর্বদাই একটা ভূত চেপে থাকে, যেই দু'দণ্ড চুপ করে বসি, অমনি সেই ভূতটা এসে পিঠে কিল মারে, আর ভূতের কিল হজম করতে না পেরে আমরাও তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়ি।"

রামহরি রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, "ঐ ভূতই একদিন তোমাদের ঘাড় মট্‌কাবে!"

কুমার বললে, "আচ্ছা রামহরি, ময়নামতীর মায়াকাননে তুমিই প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, আর কখনো আমাদের সঙ্গে আসবে না। তবে এবারেও আবার এলে কেন?"

রামহরি বললে, "আসি কি আর সাধে রে বাপু? চিলে যখন চড়ুয়ের ছানাকে ছোঁ মারে তখন চড়ুই-মা চিলের পিছনে ছুটে যায় কি শখ করে? তোমাদের সঙ্গে আসতে হয়, না এসে উপায় নেই বলে। এখনো আমার এই বুড়ো হাড়ে ঘুণ ধরেনি, এখনো চার-পাঁচটা জোয়ান মরদের সঙ্গে আমি খালি-হাতে লড়তে পারি—আর আমি থাকতে তোমরা কোন্ বিদেশে বিঘোরে প্রাণ হারাবে, তাও কি কখনো হয়! আয়রে বাঘা, এখান থেকে চলে আয়, পাগলদের সঙ্গে বকাবকি করে লাভ নেই"—এই বলে বাঘাকে নিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু যেতে-যেতে হঠাৎ একদিকে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমলকে বললে, "দেখ খোকাবাবু, জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখচি, ঐ বেয়াড়া-চেহারা লোকটা সব জায়গাতেই খালি আমাদের পিছনে-পিছনে ঘুরচে।"

একটু তফাতেই একটা লোক বুকের উপরে দুই হাত রেখে রেলিঙে ঠ্যাসান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এবং তার চেহারা কেবল বেয়াড়া নয়, ভয়ানকও বটে! লোকটা মাথায় অন্তত সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু, চওড়াতেও প্রকাণ্ড—এমন লম্বা-চওড়া লোক যে থাকতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সব-চেয়ে ভীষণ হচ্ছে তার মুখ! তার রং আবলুস কাঠের মতন কালো-কুচ্‌কুচে ও তার চোখ দুটো আশ্চর্য-রকম জ্বলজ্বলে ও জন্তুর মতন হিংস্র। তার নাকটা বাঁদরের মতন থ্যাবড়া। আর মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁতগুলো যেমন বেরিয়ে থাকে, তারও দু-পাটি দাঁত তেমনিভাবে ছরকুটে বাইরে বেরিয়ে আছে—কারণ, তার ওপরের ও নিচের দুই ঠোঁটই না-জানি কোন দুর্ঘটনায় কেমন করে উড়ে গেছে। তার মাথায় লাল রঙের একটা তুর্কী 'ফেজ্' টুপি, পরনে খাকি কোর্তা ও 'প্যান্ট' এবং হাতে এমন একগাছা লাঠি, যার এক ঘায়ে যে-কোন মানুষের মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে।

এ-রকম খাপ্‌সুরৎ চেহারা রাতের বেলায় সুমুখে দেখলে রাম-নাম জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, দিনের বেলাতেই তাকে দেখে মানিকবাবু চক্ষু ছানাবড়া করে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন।

বিমল অবাক হয়ে তার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই সে আস্তে-আস্তে

অন্যদিকে চলে গেল এবং যাবার সময়েও কুৎকুতে চোখের কোণ দিয়ে চোরাচাহনিতে বার-বার তাদের পানে তাকাতে লাগল।

তার চলার ধরন দেখে বিমলের দৃষ্টি তার পায়ের দিকে আকৃষ্ট হল। লোকটার ডান-পায়ে মাত্র কড়ে-আঙুল ছাড়া আর কোন আঙুল নেই!

কুমার বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কে ও? আর আমাদের পিছুই-বা নিয়েচে কেন?"

বিমল বললে, "ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা জাতে কাফ্রি—আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই আফ্রিকারই বাসিন্দা। ওর ফেজটুপি দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা ধর্মে মুসলমান। ওর ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা যেই-ই হোক্, আমাদের বন্ধু নয়।"

কুমার বললে, "বন্ধু নয়! শত্রু? তবে কি বুঝতে হবে, শত্রুরাও আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এই জাহাজে চড়ে আফ্রিকায় যাচ্চে?"

বিমল বললে, "আমার তো সেই সন্দেহ-ই হচ্চে।"

—"কিন্তু তারা কারা?"

—"কি করে বলব? রামু ছাড়া তাদের দলের আর কারুকে আমরা দেখিনি। রামু যদি জাহাজে উঠে থাকে, তবে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। অন্য কোন শত্রুকে আমরা চিনি না, আর এই কাফ্রিটা সত্য-সত্যই আমাদের শত্রু কিনা তাও ঠিক করে বলা যায় না। কিন্তু সন্দেহ যখন হচ্চে, তখন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

মানিকবাবু বললেন, "ও কাফ্রিটা যে কে, আমি বলতে পারি।"

বিমল সবিস্ময়ে বললে, "আপনি বলতে পারেন?"

—"হ্যাঁ। ঐ লোকটা হচ্ছে আপনার সেই ঘটোৎকচ!"

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, "না মানিকবাবু, না। ঘটোৎকচের চেহারা এতটা ভদ্র হতে পারে না।"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, ঐ কাফ্রিটার চেহারা হল আপনার কাছে ভদ্র?"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "না, আমার কাছে নয়—কিন্তু ঘটোৎকচের কাছে ওর চেহারা ভদ্র বৈকি। ঘটোৎকচকে সামনে দেখলে আপনি এখনি মূর্ছা যেতেন।"

—"কি করে জানলেন আপনি?"

—"আমার কাছে প্রমাণ আছে। আর সে প্রমাণ আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন।"

—"ও বাবা, সে আবার কি?"

—"হ্যাঁ। পরে সব জানতে পারবেন।"

ছয়

ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার

সেদিন বৈকালে বিমল, কুমার ও রামহরি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইছিল। মানিকবাবু আজ কেবিন থেকে বাইরে বেরুতে পারেননি। তিনি সামুদ্রিক-পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন—ক্রমাগত বমন করছেন।

চারিদিকে নীল জল থৈ থৈ করছে—অগাধ সমুদ্র যেন নিজের সীমা হারিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে গিলে ফেলে, আকাশের প্রান্তে ছুটে গিয়ে তাকেও ধরে টেনে পাতালে চুবিয়ে দিতে চাইছে। এবং সূর্য শূন্য-পথে পশ্চিমে এগুতে-এগুতে মহাসাগরের অনন্ত বুক জুড়ে যেন লক্ষ-কোটি হীরের প্রদীপ জ্বালছে আর নেবাচ্ছে—জ্বালছে আর নেবাচ্ছে! সে আলো-খেলার দিকে তাকালেও চোখ অন্ধ হয়ে যায়!

রামহরি বলছিল, "খোকাবাবু, তোমরা মিছে ভয় পেয়েছ। শত্রুরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমরা টের পেতুম।"

বিমল বললে "হ্যাঁ, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। আমরা বোধহয় তাদের ফাঁকি দিয়েছি।"

কুমার বললে, "একটা বিপদ কমল বটে, কিন্তু আমাদের সামনে এখনো লক্ষ বিপদ আছে।...আচ্ছা বিমল, আমাদের সমুদ্রযাত্রা কবে শেষ হবে বলতে পারো? আর ভালো—"

কুমারের মুখের কথা ফুরুবার আগেই বিমল তাকে ও রামহরিকে এক-এক হাতে প্রচণ্ড এক-একটা ধাক্কা মেরে নিজেও বিদ্যুতের মতন সাঁৎ-করে এক পাশে সরে গেল। ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে কুমার ও রামহরি দু-দিকে ঠিকরে পড়ে গেল এবং পড়তে-পড়তে শুনতে পেলে, তাদের পাশেই দমাস্ করে বিষম এক শব্দ আর ওপর থেকে হো হো করে অট্টহাসির আওয়াজ।

দু'জনে উঠে দেখে, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেইখানটায় মস্ত-একটা পিপে পড়ে ভেঙে গেছে এবং তার ভিতর থেকে একরাশ লোহা-লক্কড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিমল হাস্যমুখে বললে, "কুমার, ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম! নইলে

এই লোহা-বোঝাই পিপেটা মাথায় পড়লে আমাদের সমুদ্রযাত্রা আজকেই শেষ হয়ে যেত!"

কুমার বিবর্ণমুখে বললে, "কে এ কাজ করলে?"

—"ওপরের ডেক থেকে এই পিপেটা পড়েচে। সেই সময়েই পিপেটার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায়। আমি আর কিছু দেখতে পাইনি—দেখবার সময়ও ছিল না। কিন্তু আমাদের বধ করবার জন্যেই যে এই পিপেটাকে ফেলা হয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

রামহরি বললে, "আমি একটা বিচ্ছিরি হাসি শুনেছি।"

কুমার বললে, "আমিও শুনেছি। চল, ওপরে গিয়ে একবার খোঁজ করে আসা যাক্। যদি তাকে পাই তাহলে এবারে সে নিশ্চয়ই আর হাসবে না।"

তিনজনে ওপর-ডেকে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তখন জাহাজের কাপ্তেন-সাহেবকে ডেকে এনে বিমল সব কথা বললে ও ভাঙা পিপেটাকে দেখালে। কাপ্তেন জাহাজের কর্মচারী ও লস্করদের ডেকে আনিয়ে অনেক প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেউ কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

* * * * *

পরের রাত্রে—জাহাজ মোম্বাসায় পৌঁছবার আগের রাত্রেই, আবার এক ঘটনা!

বিমলরা একটা গোটা কেবিন 'রিজার্ভ' করে সবাই এক ঘরে থাকত।

মানিকবাবু, কুমার ও রামহরি ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিমল একখানা বই নিয়ে জেগে রইল। তারপর রাত যখন একটা বাজল, তখন সে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। জাহাজের ওপরে আছড়ে সমুদ্রের জল কেঁদে উঠেছে; তাই শুনতে-শুনতে তার চোখ ঘুমে এলিয়ে এল।

...হঠাৎ বাঘার গোঁ-গোঁ গর্জন তারপরই তার আর্তনাদ শুনে চট্ করে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে বসতেই সে শুনলে, বাঘা আবার গর্জন করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করে তাদের কেবিনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল! আলোর চাবি টিপে বিমল দেখলে, বাঘা চ্যাচাতে চ্যাচাতে কেবিনের বন্ধ দরজার ওপরে বার-বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে! ততক্ষণে আর-সকলেও জেগে উঠল।

বিমল বললে, "অন্ধকারে ঘরের ভিতর কে ঢুকেছিল, বাঘার সঙ্গে লড়াই করে সে আবার দরজা বন্ধ করে চম্পট দিয়েছে!"—বলেই সে নিচে নেমে মেঝে থেকে কি তুলে নিলে।

কুমার বললে, "কি ও?"

—"একরাশ লোম।"

—"লোম!"

—"হ্যাঁ।" বিমল পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজের ছোট মোড়ক বার করে বললে, "মানিকবাবু, দেখে যান।"

মানিকবাবু ভয়ে-ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বিমল বললে, "মানিকবাবু, আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে যান, সেই দিন এই কাগজের মোড়কটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, মনে আছে?"

—"হ্যাঁ, ওর ভেতরে একথোকা লোম আছে। শত্রুরা আমার বাড়ি আক্রমণ করে চলে যাবার সময়ে আমার মরা-কুকুরের মুখে ঐ লোমগুলো লেগেছিল।"

—"আর কেবিনে যে ঢুকেছিল, তারও গা থেকে বাঘা কামড়ে লোমগুলো তুলে নিয়েছে। দেখুন, এই লোম আর আপনার মোড়কের লোম এক কিনা।"

সকলে আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখলে, সব লোমই এক-রকমের। মানিকবাবু ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। রামহরি তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, তার কোথাও চোট লেগেছে কিনা!

কুমার বাঘার মাথা চাপড়ে বললে, "সাবাস বাঘা! মানিকবাবুর কুকুর যুদ্ধে মারা পড়েছিল, তুই কিন্তু লড়াই ফতে করেছিস্! আমাদের বাঘা কি যে-সে জীব, জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্র সে জয়ী হয়েছে!"

এমন সময়ে বাইরে গোলমাল শোনা গেল—চারিদিকে যেন অনেক লোকজন ছুটোছুটি করছে! বিমল, কুমার ও রামহরি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। মানিকবাবু কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন, "প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব না দেখছি!"

ডেকের ওপরে লোকারণ্য! কাপ্তেন-সাহেব দাঁড়িয়ে আছে এবং নিচে দু'হাতে ভর দিয়ে বসে একজন পূর্ববঙ্গীয় লস্কর ক্ষীণস্বরে বলছে—"না, না, আমি ভুল দেখিনি! ভূত—একটা ভূত আমাকে মেরেছে!"

একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বিমল ব্যাপারটা সব শুনলে। খানিক আগে ঐ লস্করটা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় হঠাৎ সে দেখতে পায় কে যেন চোরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে তার সামনে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। লস্করটা তাকে ধরতে যায়, অমনি সেও তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। লস্কর বলছে, মানুষের মতন তার হাত-পা আছে বটে, কিন্তু সে মানুষ নয়, ভূত! কাপ্তেন তার কথায় বিশ্বাস করছে না।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বিমল কাপ্তেনের কাছে সেই অজ্ঞাত শত্রুর সঙ্গে বাঘার যুদ্ধের কথা খুলে বললে। কাপ্তেন বিস্মিত-স্বরে বললে, "তুমি বলতে চাও, যে তোমাদের কেবিনে ঢুকেছিল তার গায়ে লোম আছে?"

—"হ্যাঁ, এই দেখ।" বিমল মোড়কটা কাপ্তেনের সামনে খুলে ধরলে।

কাপ্তেন হতভম্বের মতন মাথা চুল্‌কোতে-চুল্‌কোতে বলল, "জানি না, এ কি ব্যাপার। ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।"

কে একজন অস্ফুটকণ্ঠে হেসে উঠল। বিমল চমকে মুখ তুলে দেখলে, ভিড়ের ভিতরে সকলের মাথার ওপরে মাথা তুলে সেই সাড়ে-ছয়-ফুট-উঁচু-লম্বা-চওড়া কাফ্রিটা ওষ্ঠহীন মড়ার মতন দাঁত-বার-করা ভয়ানক মুখে হাসছে, কি যে হাসছে, না ভয় দেখাচ্ছে?

* * * * *

পরদিন জাহাজ ইস্ট-আফ্রিকার মোম্বাসা-বন্দরে এসে থামল। সঙ্গে-সঙ্গে অগণ্য ছোট নৌকা এসে পঙ্গপালের মতন জাহাজখানিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে; এবং তাদের ওপরে বসে 'সোয়াহিলি' জাতের মাঝি-মাল্লারা দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে, নানারকম ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আপন-আপন নৌকায় আসবার জন্যে যাত্রীদের ডাকতে লাগল।

বিমল, কুমার, মানিকবাবু ও রামহরি নিজেদের মালপত্তর ডেকের ওপরে এনে রাখছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ দেখলে, সেই মড়াদেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটা ও তার দু'জন স্বদেশী লোক একটা মস্ত সিন্দুক ধরাধরি করে বাইরে বয়ে নিয়ে এবং সেটাকে খুব সাবধানে ডেকের ওপরে নামিয়ে রেখে আবার কেবিনের দিকে গেল—খুব সম্ভব, অন্যান্য মোট বাইরে আনবার জন্যে।

সিন্দুকের আকার দেখে বিমলের মনে কেমন সন্দেহ হল! সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকটা পরখ করতে লাগল। সিন্দুকটা কাঠের। বিমল টেনে দেখলে, ডালা বন্ধ। তারপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলে, সিন্দুকের ওপরে গায়ে সর্বত্রই অগুন্তি লোম লেগে রয়েছে! মোড়কটা আবার বার করে সিন্দুকের লোমের সঙ্গে মিলিয়ে সে বুঝলে, এ সবই সেই অজ্ঞাত শত্রুর গায়ের লোম। কিন্তু তার লোম এই সিন্দুকের গায়ে কেন? এই লম্বা-চওড়া সিন্দুক, এর মধ্যে অনায়াসেই একজন মানুষের ঠাঁই হতে পারে। তবে কি...

কাফ্রিরা তখনো আসেনি। বিমল তাড়াতাড়ি নিজেদের দলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বললে, "মানিকবাবু, কুমার! আমি এক অপূর্ব আবিষ্কার করেচি!"

—"কি, কি?"

—"ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ ঐ সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে আছে।"

মানিকবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁ!"

—"চুপ? গোল করবেন না। চললুম আমি কাপ্তেনের কাছে,—আজ ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার হবে।"—বিমল তীরবেগে কাপ্তেনের খোঁজে ছুটল।

মানিকবাবু দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও বাবা! আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য বেরিয়েছিল কলসীর ভেতর থেকে। আর আজ এই সিন্দুকের ভেতর থেকে বেরুবে, ঘটোৎকচ? এখন আমার উপায়?...ও কুমারবাবু, আমাকে এখানে একলা ফেলে আপনিও বিমলবাবুর সঙ্গে কোথায় চললেন? ও রামহরি! তুমিও যাও যে! বাঘা, বাঘা! আরে, বাঘাও নেই! ঐ সিন্দুকে ঘটোৎকচ, আর আমি এখানে একা। যদি সে ফস্ করে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পড়ে? ও বাবা!"—মানিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, ভয়ে ভয়ে দুই চোখ মুদে ফেললেন।

সাত

সিন্দুকের রহস্য

বিমল জাহাজের ডেকের ওপর খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করেও কাপ্তেনের দেখা পেলে না; তারপর খবর পেলে, কি কাজের জন্যে কাপ্তেন জাহাজের ইঞ্জিন-ঘরে গিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। কাপ্তেন ইঞ্জিন-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, এমন সময়ে বিমল তাকে গিয়ে ধরলে।

বিমলকে অমন হন্ত-দন্ত হয়ে আসতে দেখে কাপ্তেন বললে, "ব্যাপার কি?"

বিমল খুব সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললে। কাপ্তেন এক লাফ মেরে ইংরাজীতে একটা শপথ করে বললে, "অ্যাঁ, বল কি? সিন্দুকের ভেতর শত্রু! সে মানুষ, না, ভূত?"

বিমল বললে, "সেটা এখনি জানতে পারা যাবে। সায়েব, তোমার লোকজনদের ডাকো!" বলেই পিছন ফিরে কুমার আর রামহরিকে দেখে বলে উঠল, "একি, তোমরাও এখানে এসেচ কেন? যাও যাও, সেখানে পাহারা দাও গে। ছি ছি, তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই?"

কুমার আর রামহরি অপ্রস্তুত হয়ে আগে-আগে ছুটল, কাপ্তেনও চেঁচিয়ে লোকজনদের ডাকতে-ডাকতে তাদের পিছনে পিছনে চলল!

কাপ্তেনের হাঁক-ডাক শুনে অনেক লোক এসে জুটল। তারপর দলে খুব

ভারি হয়ে সবাই যখন যথাস্থানে গিয়ে হাজির হল, তখন সিন্দুকও দেখা গেল না, কাফ্রি তিনজনও অদৃশ্য!

বিমল হতাশভাবে বললে, "ঘটোৎকচ আবার আমাদের কলা দেখালে! কুমার, রামহরি, তোমাদের বোকামিতেই এবারে সে পালাতে পারলে!"

কুমার দোষীর মতন সঙ্কুচিত-স্বরে বললে, "আমাদের দোষ আমরা মানচি। কিন্তু মানিকবাবু কোথায় গেলেন? তিনি তো এইখানেই ছিলেন।"

বিমল বললে, "তাইতো! মানিকবাবু কোন বিপদে পড়লেন না তো? মানিকবাবু, মানিকবাবু!"

ডেকের ওপরে একটা মস্ত কেঠো বা কাঠের বালতি উপুড় হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল। কাঠের বালতিকে জীবনলাভ করতে দেখে বাঘা ভয়ানক অবাক্ হয়ে গেল এবং বালতির চারিদিক সাবধানে শুঁকে চিৎকার শুরু করে দিলে।

বালতির একপাশ একটু উঁচু হল এবং ফাঁক দিয়ে আওয়াজ এল, "ও বিমলবাবু, আপনাদের বাঘাকে সাম্‌লান, দম বন্ধ হয়ে আমি হাঁপিয়ে মারা যেতে বসেচি যে!'

বাঘা বালতির ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "গরর্‌র্‌র্ গরর্‌র্‌র্।" ফাঁকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কুমার বাঘার কান ধরে টেনে আনলে, বিমল কেঠোটা টেনে তুলে ধরলে এবং ভিতর থেকে হাপরের মতন হাঁপাতে-হাঁপাতে গলদঘর্ম মানিকবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

কুমার বললে, "মানিকবাবু, ওর মধ্যে ঢুকে কি করছিলেন?"

মানিকবাবু গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম মশাই, প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম! বাইরে থাকলে ঘটোৎকচ কি আর আমাকে ছেড়ে কথা কইত?"

কাপ্তেন-সায়েব এতক্ষণ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে কি দেখছিল, হঠাৎ দূরবীণ নামিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়েচি পেয়েচি,— তাদের দেখা পেয়েচি!" বিমল ও কুমার একদৌড়ে কাপ্তেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একদিকে আঙুল তুলে দেখালে, একখানা নৌকা তীরের দিকে বয়ে চলেছে, তার ওপরে মাঝি-মাল্লার সঙ্গে তিনজন কাফ্রি আর সেই সিন্দুকটা রয়েছে!

কাপ্তেনের হুকুমে তখনি জাহাজের দু'খানা বোট নামিয়ে জলে ভাসানো

হল এবং কয়েকজন খালাসী, জাহাজী গোরার সঙ্গে কাপ্তেন, বিমল ও কুমার গিয়ে সেই বোটের উপর চড়ে বসল। বোট দুটো এগুতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে বিমল বললে, "ঐ সেই ঠোঁটকাটা ঢ্যাঙা কাফ্রিটা সিন্দুকের ওপরে বসে আমাদের পানে তাকিয়ে হাসচে। ওরা কি বুঝতে পেরেচে যে, আমরা ওদেরই পিছনে যাচ্ছি?"

কুমার বললে, "কিন্তু ওদের ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না যে আমাদের দেখে ওরা কিছু ভয় পেয়েছে!"

কাপ্তেন তার রিভলভারটা নাড়তে-নাড়তে বললে, "ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রিটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়। ওদের অপরাধের প্রমাণ পেলে কারুকে আমি ছাড়ব না—সব পুলিশের কাছে চালান করে দেব!"

জাহাজের বোট দু'খানা কাফ্রিদের নৌকার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। একটা কাফ্রি সেই মড়া-দেঁতো কাফ্রির কানের কাছে মুখ এনে কি বললে। কিন্তু মড়া-দেঁতো কোন জবাব দিলে না, বিশাল বুকে দু'খানা বিপুল বাহু রেখে কালো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন স্থিরভাবে সিন্দুকের ওপরে বসে রইল।

বিমলের গা টিপে কুমার বললে, "বিমল, দেখ—দেখ।"

—"কি?"

—"ঐ যে আর একখানা নৌকা যাচ্ছে, তার ওপরে তিনজন লোক,—ঠিক যেন বাঙালীর মতন দেখতে!"

বিমল অল্পক্ষণ তাদের দেখে কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ নৌকার লোকগুলোও কি আমাদের জাহাজে ছিল?"

কাপ্তেন দূরবীণ কষে ভালো করে তাদের দেখে বললে, "হ্যাঁ, ওরাও বাঙালী।"

—"কিন্তু জাহাজে তো ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি!"

—"না হওয়ারই কথা। ওদের ব্যবহার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত। ওরা কেবিনের বাইরে বড়-একটা আসত না, কারুর সঙ্গে মেলামেশা করত না। ওরা নাকি ইস্ট-আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যাচ্ছে।...হ্যাঁ, আর-একটা কথা মনে হচ্ছে বটে। একদিন ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রি-শয়তানটাকে ওদের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম!"

বিমল মৃদুস্বরে বললে, "কুমার, আমার বিশ্বাস ঐ বাঙালী তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের মানিকবাবুর গুণধর ছোট কাকা। মানিকবাবু আমাদের সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারতেন!"

কুমার বললে, "আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে ওকে দেখলে আর চিনতে পারব না—এত দূর থেকে ভালো করে নজরই চলচে না! দেখ—দেখ, ওরা নৌকার বেগ বাড়িয়ে দিলে! ওরা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা ওদের লক্ষ্য করচি!"

কিন্তু আর সেদিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ ছিল না, কারণ জাহাজের বোট দু'খানা তখন কাফ্রিদের নৌকার দু'পাশে এসে পড়েছে!

কাপ্তেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এই! নৌকা থামাও!"

কাফ্রিদের নৌকা থেমে গেল। কাপ্তেন, বিমল ও কুমার এক এক লাফে নৌকার উপরে গিয়ে উঠল, কাফ্রিদের কেউ কোন আপত্তি করলে না!

মড়া-দেঁতো তেমনি অটলভাবেই সিন্দুকের ওপরে বসে ছিল।

কাপ্তেন হুকুম দিলে, "তুমি উঠে দাঁড়াও।"

মড়া-দেঁতোর চোখ বাঘের চোখের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল—কিন্তু পরমুহূর্তেই কাপ্তেনের হাতে চক্‌চকে রিভলভার দেখে তার জ্বল্‌জ্বলে চোখের আগুন নিবে গেল। যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই সে সিন্দুকের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একটানে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলে মহা-আগ্রহে তার ভিতরটা দেখতে লাগল, তারপর হতাশভাবে বিমলের দিকে মুখ ফেরালে।

বিমল হেঁট হয়ে দেখলে, সিন্দুকের ভিতরে কেউ নেই।

কাপ্তেন বললে, "কিন্তু সিন্দুকের ভিতরে এত লোম কেন? এ কিসের লোম? এর ভিতরে কি ছিল?"

মড়া-দেঁতো কোন জবাব দিলে না। মুখটা একবার খিঁচিয়ে নৌকার এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

কাপ্তেন বিমলের দিকে ফিরে বললে, "তোমার মোড়কে যে লোমগুলি দেখেছিলুম, এগুলোও ঠিক সেইরকম দেখতে। এ সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, জেব্রা, হরিণ কি বানরের গায়ের লোম নয়। তবে এ কোন্ জীবের লোম?"

বিমল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে চুপ মেরে গেল।

কাপ্তেন হতাশকণ্ঠে বললে, "রহস্যের কোন কিনারা হল না। এই কাফ্রি-শয়তানরা আগেই সাবধান হয়ে সিন্দুকে যে ছিল তাকে সরিয়ে ফেলেচে। চল, আর এখানে থেকে লাভ নেই!"

কুমার চারিদিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু যে-নৌকায় তিনজন বাঙালী ছিল তাদের আর কোথাও দেখতে পেলে না।

আট

ঘটোৎকচের উৎকোচ লাভ

আফ্রিকার পূর্বদিকে, ভারত-সাগরের মধ্যে মোম্বাসা হচ্ছে একটি ছোট দ্বীপ। তার বাসিন্দার সংখ্যা চল্লিশ হাজার। হাতির দাঁত, চামড়া ও রবারের ব্যবসার জন্যে এ দ্বীপে অনেক লোক আনাগোনা করে।

এই দ্বীপটি ইতিহাসে অনেক দিন থেকেই বিখ্যাত। ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডা গামা এখানে এসেছিলেন। সেই সময়ে একজন আরবী, জাহাজ-সুদ্ধ তাঁকে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করে। ভাস্কো ডা গামা কোনগতিকে সেটা জানতে পেরে মহাখাপ্পা হয়ে মোম্বাসা শহরকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হন, কিন্তু স্থানীয় সুলতান পায়ে-হাতে ধরে তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। মোম্বাসার প্রধান রাজপথ—ভাস্কো ডা গামা স্ট্রীট আজও এই অমর নাবিকের স্মৃতি বহন করছে।

মোম্বাসা শহর প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় হাজার বছর আগে। কিন্তু এ শহরটি যে আরো পুরানো, এখানে আবিষ্কৃত প্রাচীন চীন, মিশর ও পারস্য দেশের অনেক জিনিস দেখে তা বোঝা যায়। ১৫০৫ থেকে ১৭২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল পর্তুগীজদের অধিকারে। আরবদের সঙ্গে পর্তুগীজদের কয়েকবার যুদ্ধবিগ্রহও হয়ে গেছে। ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে মার্চ মাস থেকে সুদীর্ঘ তিন বছর তিন মাস ধরে পর্তুগীজরা আরবদের দ্বারা এই দ্বীপে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পর্তুগাল থেকে সাহায্য পাবার আশায় অবরুদ্ধ পর্তুগীজরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু তাদের আশা সফল হয় না। আরবদের তরবারির মুখে শেষটা পর্তুগীজদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ যায় এবং নিয়তির এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, সেই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু'দিন পরেই পর্তুগাল থেকে সাহায্য এসে উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পরে মোম্বাসা আবার পর্তুগীজদের হাতে যায় বটে, কিন্তু তাদের সে প্রাধান্য স্থায়ী হয় না। মোম্বাসা এখন জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীনে। এবং দ্বীপের "যীশু কেল্লা" আজও প্রাচীন পর্তুগীজ প্রাধান্যের নিদর্শনের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মোম্বাসা শহরটি বেশ। আফ্রিকার বিশাল বুকের ভিতর যে গভীর জঙ্গল, দুরারোহ পর্বতমালা ও বিজন মরুভূমি লুকিয়ে আছে, মোম্বাসাকে দেখলে তা মনে হয় না। এই শহরটিতে আধুনিক-সভ্যতার কোন চিহ্নেরই অভাব নেই। বাষ্পীয়-পোত, মটর গাড়ি, রেলগাড়ি, দোতলা-তেতলা বাড়ি ও বড়-বড় হোটেল সবই দেখা যায়। বাসিন্দাদের ভিতরে আরবদের সংখ্যাই বেশি হলেও অন্যান্য

অনেক জাতীয়—এমনকি, ভারতীয় লোকের সঙ্গেও পথে-ঘাটে সাক্ষাৎ হয়। রাজপথের প্রধান গাড়ি হচ্ছে একরকম "ট্রলি", সরু রেল-লাইনের উপর দিয়ে আনাগোনা করে এবং তাকে ঠেলে নিয়ে যায় সোয়াহিলি জাতের দু'জন করে কুলি।

শহরের বাইরেই সুন্দর সবুজ বন। সে বন বাওবাব্ (আর এক নাম, বাঁদুরে-রুটি-গাছ) কলা, আম, খেজুর ও নারিকেল প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট পাহাড়! উজ্জ্বল রোদের সোনার জল দিয়ে ধোয়া মোম্বাসা নগরী যখন নিস্তরঙ্গ ভারত-সাগরের স্থির নীলদর্পণে নিজেই নিজের ছায়া দেখতে পায়, তখন তার কী শোভাই যে হয় তা আর বলবার নয়।

হোটেলের বারান্দায় বসে বিমল, কুমার ও মানিকবাবু চুপি-চুপি কথা কইছিলেন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রামহরি চা তৈরি করছে এবং তার সামনে বসে বাঘা মুখ উঁচু করে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে—একটু-আধটু চিনি বা দু-এক টুক্‌রো রুটি বখ্‌শিস পাবার লোভে!

মানিকবাবু বললেন, "তাহলে এখান থেকে আমাদের যেতে হবে উজিজিতে?"

কুমার বললে, "হুঁ, বুড়ো সর্দার গাটুলার খোঁজে!"

—"যদি সে মরে গিয়ে থাকে, কি তার দেখা না পাই, তাহলে আমরা কি করব?"

বিমল বললে, "সে কথা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাইনি.....আচ্ছা কুমার, আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তুমি কত লোক ঠিক করেছ?"

—"ঠিক একশো চব্বিশ জন।"

—"তাদের জন্যে মাসে কত খরচ পড়বে?"

—"প্রায় সাতশো টাকা।"

—"আস্কারি নিয়েচ ক'জন?"

—"চব্বিশ জন।"

মানিকবাবু শুধোলেন, "আস্কারি কি?"

—"সশস্ত্র কুলি।"

—"ও বাবা! অত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কি হবে? আমাদের যুদ্ধ করতে হবে নাকি?"

বিমল গম্ভীরভাবে বললে, "হতে পারে।"

রামহরি চা দিয়ে গেল। সকলে নীরবে চা পান করতে লাগল।

কুমার বললে, "আচ্ছা বিমল, মানিকবাবুর মেজো কাকা যে ম্যাপ দিয়েচেন, সেখানা তুমি কোথায় রেখেচ?"

বিমল অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললে, "ম্যাপখানা আমার কোটের ভিতরকার পকেটে আছে।"

কুমার বললে, "আঃ, অত চেঁচিয়ে কথা কইচ কেন, কেউ যদি শুনতে পায়!"

বিমল খুব নিচু গলায় হাসতে-হাসতে বললে, "শুনতে পায় কি, শুনতে পেয়েচে!"

—"তার মানে?"

—"আমাদের পিছনে ঐ যে থামটা রয়েছে, ওর আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লোক এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল।"

সভয়ে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বিমলের কাছে সরে এসে মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা! বলেন কি মশাই? আপনি কি করে জানলেন?"

—"আমার সামনে টেবিলের ওপরে এই যে কামরার আর্সিখানা আছে, এর ভেতর দিয়েই সেই লোকটার ওপরে আমি নজর রেখেছিলুম!'

—"কে সে?"

—"বোধ হয় সে বাঙালী!"

—"অ্যাঁ! বাঙালী!"

—"হ্যাঁ, ঐ দেখুন মানিকবাবু, হোটেল থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে পড়েচে!" বলেই বিমল পকেট থেকে একটা ছোট দূরবীণ বার করে লোকটাকে দেখতে লাগল।

মানিকবাবু হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, বারান্দায় ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, "ছোট কাকা! অ ছোট কাকা! ছোট কাকা!"

লোকটা যেন শুনতেই পেলে না, আপন মনে এগিয়ে গিয়ে একখানা চলন্ত ট্রলি গাড়িতে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল!

চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বিমল ধীরে-ধীরে বললে, "উনিই আপনার ছোট কাকা? ওঁরই নাম মাখনবাবু?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমি এত চেঁচিয়ে ডাকলুম, তবু উনি শুনতে পেলেন না!"

—"মাখনবাবু আপনার ডাক শুনতে রাজি নন।"

—"রাজি নন! কেন?"

—"কেন? তাও বুঝতে পারচেন না? উনিই যে ঘটোৎকচের প্রভু!"

অতিরিক্ত বিস্ময়ে মানিকবাবু অবাক হয়ে বিমলের মুখের দিকে মূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইলেন।

বিমল দুলতে-দুলতে বললে, "আমার মনের ক্যামেরায় আমি মাখনবাবুর ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েচি। ওর মুখ আর ভুলব না।"

কুমার বললে, "বিমল, মাখনবাবু টের পেয়েছেন, ম্যাপখানা কোথায় আছে। ম্যাপখানা তুমি অন্য কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখো।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বিমল ফিরে বললে, "রামহরি, আজ রাত্রে তুমি বাঘাকে ঘরের ভেতর থেকে বার করে দিও।"

* * * * *

অনেক রাত্রে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের ভিতরে খুস্-খুস্ করে শব্দ হচ্ছে—যেন কে আস্তে-আস্তে চলে বেড়াচ্ছে।

বিমলের মনে হল যেন তার মুখের উপরে কার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ল। সে অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল, রিভলভারটা জোরে চেপে ধরে।

পায়ের দিকে একটা খোলা জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশের বুকে চাঁদের মুখ নেই,—খালি হাজার হাজার তারা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, স্থির জোনাকির মতন।

হঠাৎ জানলার আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেল—একটা চলন্ত অন্ধকার এগিয়ে এসে যেন জানলার ফাঁকাটা একেবারে বুঁজিয়ে দিলে।

আচম্বিতে অন্ধকার অদৃশ্য হল এবং তারা-ভরা আকাশ আবার দেখা যেতে লাগল।

বিমলও শান্তভাবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

* * * * *

সকাল বেলায় চোখ মেলেই কুমার দেখলে, বিমল একটা জানলার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কুমার বললে, "ওখানে কি করচ?"

—"ঘটোৎকচ কোন স্মরণ-চিহ্ন রেখে গেছে কিনা দেখচি।"

কুমার ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, "তার মানে?"

—"এই জানলার গরাদ ভেঙে কাল রাতে ঘটোৎকচ ঘরের ভেতরে এসেছিল।"

—"ম্যাপ, ম্যাপ—তোমার পকেটে ম্যাপখানা আছে তো?"

—"না।"

—"সর্বনাশ!"

—"ঘটোৎকচ ম্যাপখানা নিয়ে লম্বা দিয়েচে। আমার হাতে রিভলভার ছিল, ইচ্ছা করলেই আমি তাকে গুলি করতে পারতুম, কিন্তু আমি তা করিনি। আমি তাকে পালাতে দিয়েচি।"

—"বিমল, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

—"শোনো। ম্যাপখানা কোথায় আছে, সে খোঁজ কাল বৈকালে আমি তো শত্রুপক্ষকে দিয়েছিলুম! শত্রু যে আসবে সেটা তো আমি আগে থাকতেই জানতুম! ধরতে গেলে, ঘটোৎকচকে আমি একরকম নিমন্ত্রণ করেই এখানে আনিয়েছিলুম। বাঘাকে পর্যন্ত ঘরের ভেতরে রাখিনি, পাছে সে ঘটোৎকচকে পছন্দ না করে।"

—"বিমল, তোমার কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারচি না!"

বিমল জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললে, "কুমার, ঘটোৎকচ যে ম্যাপখানা নিয়ে গেছে, সেখানা হচ্ছে নকল। আসল ম্যাপ আমার কাছে!"

কুমার আনন্দে এক লাফ মেরে বলে উঠল, "ওহো বুঝেছি—বুঝেচি!"

বিমল বললে, ঐ নকল ম্যাপ দেখে যে গুপ্তধন আনতে যাবে তাকে ভুল পথে ঘুরে-ঘুরে মরতে হবে। নকল ম্যাপখানা অনেক কষ্টে আমি তৈরি করেচি।"

নয়

ভীষণ অরণ্যে

আসল পথ-চলা শুরু হয়েছে। সকলে দল বেঁধে চলেছে—কখনো বনের ভিতরে, কখনো পাহাড়ের কোলে, কখনো নদীর ধারে, কখনো মাঠের উপরে! মাঝে-মাঝে এক-একখানা নোংরা গ্রাম, তার কুঁড়েঘরগুলো যেমন নড়বড়ে আর ভাঙাচোরা, তার বাসিন্দারাও তেমনি গরীব ও শ্রীহীন। মাঝে-মাঝে ধান ও আখ প্রভৃতির ক্ষেতও চোখে পড়ে। অনেক জায়গা দেখেই ভারতবর্ষকে মনে পড়ে।

পথে যেতে-যেতে কতরকম জানোয়ারই দেখা যায়! কোথাও উঠপাখির দল ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা পা ফেলে ছুটোছুটি করছে, কোথাও একদল জেব্রা মানুষ দেখেই দৌড় দিচ্ছে, কোথাও বেঢপ জিরাফ তার অদ্ভুত গলা বাড়িয়ে গাছের আগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, তারপর মানুষের সাড়া পেয়েই ছুটে পালাচ্ছে!...এই জিরাফদের ছুটে পালাবার ভঙ্গি এমন বেয়াড়া যে, দেখলে গোম্‌ড়া-মুখো প্যাঁচারা পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারবে না। এখানে গাছের উপর বসে বেকুন-বাঁদরের

দল মানুষকে মুখ ভ্যাংচায়, নদীর জলে হিপোপটেমাসের দল সাঁতার কাটে ও বড়-বড় কুমীর কিলবিল করে এবং মানুষের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে যেন বলতে চায়—"তোমরা দয়া করে একবার জলে নামো, আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।" এখানে পায়ের তলায় ঘাসের ভিতর থেকে সাপ ফোঁস করে ওঠে, রাত্রিবেলায় চারিদিকে হায়েনারা হা-হা করে হাসে, চিতেবাঘেরা তাঁবুর ভিতরেও বেড়াতে আসে এবং সিংহের দল কাছ ও দূর থেকে মেঘের ডাকের মতন এমন গম্ভীর গর্জন করে যে, অন্ধকার অরণ্য যেন শিউরে ওঠে এবং পৃথিবীর মাটি যেন থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে!

মানিকবাবুর অশান্তির আর সীমা নেই! তাঁর মতে, এখানকার প্রত্যেক ঝোপই হচ্ছে কোন-না-কোন ভয়ঙ্কর জানোয়ারের বৈঠকখানা এবং প্রত্যেক গাছই হচ্ছে ভূত-প্রেতের আড্ডা! সন্ধ্যা হলেই তিনি রাম-নাম জপ করতে আরম্ভ করেন এবং পাছে কোন বদমেজাজী জন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে একবারও বাইরে উঁকি মারেন না।

মাঝে-মাঝে কাতরমুখে বলেন, "বিমলবাবু, আমি তো আপনাদের কাছে কোন দোষই করিনি, তবে দেশ থেকে এখান টেনে এনে কেন আপনারা আমাকে অপঘাতে মারতে চান?"

বিমল বললে, "মানিকবাবু, জানেন তো, কাপুরুষ মরে দিনে একশো বার করে, কিন্তু সাহসী মরে জীবনে একবার মাত্র!"

মানিকবাবু বললেন, "সাহসেরও একটা সীমা আছে তো? মরণকে যখন সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অষ্টপ্রহর দেখতে পাচ্ছি তখন ভয় না পেয়ে কি করি বলুন তো?"

—"মরণকে নিয়ে খেলা করুন, মরণকে দেখলে তাহলে আর ভয় পাবেন না!"

—"পাগলের সঙ্গে কথা কয়েও লাভ নেই," এই বলে মানিকবাবু মুখভার করে সেখান থেকে চলে যান।

সেদিন বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা কাফ্রিজাতীয় স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার দেহের নিচের অংশ নেই, উপর অংশও ভীষণরূপে ক্ষতবিক্ষত এবং তার মরা চোখ দুটো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে!

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেই মানিকবাবু "আঁ" বলে আঁৎকে উঠে উন্মত্তের মতন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বনের ভিতরে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কুমার মৃতদেহের দিকে চেয়ে বললে, "সিংহের কীর্তি।"

বিমল বললে, "হুঁ। সিংহটা বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়ে শিকার ছেড়ে বনের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েচে।"

রামহরি বললে, "কিন্তু মানিকবাবু যে ঐ বনের ভেতরেই গিয়ে ঢুকলেন।"

—"ওঁকে ডেকে নিয়ে এস রামহরি, নইলে বিপদ—"

বিমলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল, বনের ভিতর থেকে মানিকবাবু চিৎকার করে বলছেন, "গেলুম, গেলুম—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।"

বিমল, কুমার, রামহরি ও 'আস্কারি' বা সশস্ত্র কুলির দল তখনি বনের ভিতরে ছুটে গেল এবং খানিক পরেই যে দৃশ্য দেখা গেল তা হচ্ছে এই ঃ—মানিকবাবু একটা গাছের মাঝ-বরাবর উঠে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছেন এবং ঠিক তাঁর মাথার উপরকার ডালে বসে একটা মস্ত-বড় বেবুন বাঁদর মুখ খিঁচিয়ে তাঁকে ক্রমাগত ধমক দিচ্ছে এবং নিচে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার গাছের গুঁড়ির উপরে বারবার খড়্গাঘাত করছে। মানিকবাবুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—তিনি না পারছেন উপরে উঠতে, না পারছেন নিচেয় নামতে!

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের গুলি খেয়ে গণ্ডারটা তখনি মাটির উপরে পড়ে গেল এবং বেবুনটাও একলাফে অন্য গাছে গিয়ে প্রাণ বাঁচালে। তারপর সকলে মিলে মানিকবাবুকে প্রায় মরো-মরো অবস্থায় গাছের উপর থেকে নামিয়ে আনলে।

এবং সেই রাত্রেই আর-এক ব্যাপার! সেদিন আহারের ব্যবস্থা ছিল কিছু গুরুতর। কুমার মেরেছিল দুটো বুনো হাঁস এবং বিমল মেরেছিল একটা হরিণ। কাজেই সারাদিনই আজ রামহরির হাতজোড়া। কি আমিষ আর কি নিরামিষ রন্ধনে সে ছিল অদ্বিতীয় এবং যত বেশি রান্নাবান্নায় সময় পাওয়া যেত, সে হত তত বেশি খুশি।

রাত্রিবেলায় রামহরি এসে যখন শুধোলে, "খোকাবাবু, খাবার দেব কি?" বিমল তখন জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আজকের রান্নার ফর্দটা কি শুনি?"

রামহরি বললে, "চপ্, কাট্‌লেট, কোপ্তা, রোস্ট্, আলু-মাকাল্লা আর লুচি! একটা চাট্‌নিও আছে।"

কুমার খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে বললে, "রামহরি, তুমি অমর হও! তোমার দয়ায় আমরা বনবাস করতে এসেও স্বর্গ খুঁজে পেয়েছি।"

মানিকবাবুর জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগল! লম্বা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "আহা, রামহরি, কি মধুর কথাই শোনালে! আজ দিনের

বেলাটায় বেবুনের মুখ-খিঁচুনি আর গণ্ডারের তাড়া খেয়ে প্রায় মরো-মরো হয়ে আছি, এখন দেখা যাক্, রাতের বেলায় তোমার হাতের অমৃত খেয়ে আবার ভালো করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি কি না!"

বিমল বললে, "রক্ষে করুন মানিকবাবু, আপনি আরো ভালো করে চাঙ্গা আর হবেন না! আফ্রিকায় এসে আপনার ভুঁড়ির বহর দুগুণ বেড়ে গিয়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছেন কি?"

মানিকবাবু মুখ ভার করে বললেন, "আপনারা যখন-তখন আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দেন। এটা আমি পছন্দ করি না।"

বিমল হেসে বললে, "কিন্তু আপনার ভুঁড়ি যদি এইভাবে বাড়তেই থাকে, তাহলে আফ্রিকার প্রত্যেক সিংহের নজর আপনার ওপরে পড়বে, সেটা আপনি দেখছেন কি?"

মানিকবাবু চমকে উঠে বললেন, "ও বাবা, বলেন কি?"

—"হ্যাঁ। মানুষরা যখন মোটা পাঁঠা খোঁজে, তখন সিংহরাও নধর চেহারার মানুষ খুঁজবে না কেন?"

মানিকবাবু ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, "খাওয়ার কথা শুনে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছিল, আপনার কথা শুনে সে আনন্দ কর্পূরের মতন উবে গেল...বিমলবাবু, আফ্রিকায় আমাদের আরো কতদিন থাকতে হবে?"

বিমল বললে, "এই তো সবে কলির সন্ধ্যে! আপাতত আমরা যেখানে আছি, এ-জায়গাটার নাম হচ্ছে, ট্যাবোরা। এখান থেকে উজিজি আরো কিছুদিনের পথ। পথের বিপদ এড়িয়ে আগে উজিজিতে গিয়ে পৌঁছোই, তারপর অন্য কথা। আমাদের আসল 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' শুরু হবে উজিজি থেকেই।"

—"আসল 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' মানে তো আসল বিপদ? অর্থাৎ আপনি বলতে চান তো, যে, উজিজিতে গিয়ে পৌঁছোবার পরে প্রতিক্ষণেই আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে?"

—"হ্যাঁ!"

—"কেন? ঘটোৎকচ তো আর আমাদের পিছনে নেই!"

কুমার বললে, "এখন নেই বটে, কিন্তু দু'দিন পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেই আবার সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসবে।"

মানিকবাবুর মুখের ভাব যেরকম হল, সেটা আর বর্ণনা না করাই ভালো।

* * * * *

আচমকা কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোর কাটবার আগেই সে বেশ

বুঝতে পারলে, তার মুখের উপরে কার উত্তপ্ত শ্বাস পড়ছে। সে শ্বাসে কি দুর্গন্ধ!

খুব সন্তর্পণে আড়-চোখে চেয়ে দেখলে, অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে কার দুটো বড়-বড় চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

উত্তপ্ত নিঃশ্বাসটা তার মুখের উপর থেকে সরে গেল।

কুমার অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল—কারণ, একটু নড়লেই মৃত্যু নিশ্চয়। জ্বলন্ত চোখ দুটো যে তার পানেই তাকিয়ে আছে, এটাও সে বেশ বুঝতে পারলে।

বাইরে বনভূমি তখন ঘন-ঘন সিংহের গর্জনে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চারিদিক থেকে আরো যে কতরকম চিৎকার শোনা যাচ্ছে তা বলবার নয়। মানুষেরা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তাদের শত্রুরা এখন জাগরিত।

এ তাঁবুর ভিতরে বিমল আর মানিকবাবুও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন,—কিন্তু এখন কারুকে সাবধান করবারও সময় নেই।

তাঁবুর ভিতরে এই অসময়ে কার আবির্ভাব হল? এ মানুষ না কোন হিংস্র জন্তু?

এ ঘটোৎকচ নয় তো? সে কি এখনি তার ভ্রম বুঝতে পেরেছে?

কিছুই বুঝবার উপায় নেই। যে-শত্রু তাদের গ্রাস করতে এসেছে অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে। কেবল দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে আর আসছে,—যাচ্ছে আর আসছে। সে যেন অন্ধকারের চক্ষু। মায়াহীন উপবাসী চক্ষু, তারা যেন বিশ্বকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চায়!

আচম্বিতে কি একটা শব্দ হল। একটা কি ভারি জিনিস পড়ার শব্দ...

কুমার আর থাকতে পারলে না, এক লাফে উঠে বসে, পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বিমল, বিমল!"

সঙ্গে-সঙ্গে বিমলের গলা পাওয়া গেল—"কি হয়েছে কুমার, কি হয়েছে?"

—"ঘরের ভেতরে কে এসেছে?"

পরমুহূর্তে বিমলের 'টর্চ' জ্বলে উঠল। কিন্তু কৈ, ঘরের ভেতরে তো কেউ নেই!

বিমল বললে, "এ কি! মানিকবাবু কোথায় গেলেন?"

কুমার বিস্মিত চক্ষে দেখল, তাঁবুর ভিতরে মানিকবাবুও নেই, তাঁর বিছানাও নেই!

দশ

গভীরতর অরণ্য

বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে বিমল চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মানিকবাবু! মানিকবাবু!"

মানিকবাবুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না!

কুমার বললে, "মানিকবাবু তো এই রাত্রে একলা বাইরে বেরুবার পাত্র নন!"

—"তুমি না বললে, ঘরের ভেতরে কে ঢুকেছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"কে সে? মানুষ না জন্তু?"

—"জানি না!"

—"দেখ, মানিকবাবুর বিছানায় তাঁর লেপখানাও নেই! লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ বাইরে বেরোয় না! লেপসুদ্ধ নিশ্চয় কেউ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে!"

—"কে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে? কোন জন্তু?"

—"ঘটোৎকচ যে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে?"

বাহির থেকে কে কাতর-কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!"

—"ঐ মানিকবাবুর গলা! এস কুমার, আমার সঙ্গে এস!" বলতে-বলতে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

সে-রাত্রে আকাশ থেকে চাঁদ আলোর ধারা ঢালছিল বটে, কিন্তু সে-আলো যেন আরো বেশি করে প্রকাশ করে দিচ্ছিল নিবিড় অরণ্যের ভীষণ বিজনতাকে!

গাছের পর গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে যেন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কেঁপে-কেঁপে শিউরে-শিউরে উঠছে—তারা এইমাত্র কি একটা ভয়ানক কাণ্ড দেখতে পেয়েছে!

বন এত ঘন যে, চাঁদের আলোতেও তার ভিতরে নজর চলে না।

বনের বাইরেই একটুখানি পথের রেখা, তারপরেই ছোট একটি মাঠ। সেইখানেই আজ তাঁবু খাটানো হয়েছে।

এদিকে-ওদিকে চারিদিকে তাকিয়েও বিমল ও কুমার কোন জীবজন্তু বা মানিকবাবুকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

—"মানিকবাবু! মানিকবাবু!"

দূর থেকে সাড়া দিলে কেবল প্রতিধ্বনি। তারপরেই আরো অনেক দূর

থেকে অনেকগুলো সিংহ একসঙ্গে ঘন-ঘন গর্জন করতে লাগল! কি-একটা অজানা জানোয়ারের মৃত্যু-আর্তনাদ শোনা গেল। একদল শেয়াল চেঁচিয়ে জানতে চাইলে—কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?

কুমার কাতরভাবে বললে, "মানিকবাবু বোধহয় আর বেঁচে নেই।"

বিমল কান পেতে কি শুনছিল। সে বললে, "মানিকবাবু বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিন্তু যে-শত্রু আজ আমাদের তাঁবুতে এসেছিল, বোধহয় ঐখানটা দিয়ে সে বনের ভেতর ঢুকেছে"—বলে সে বনের এক জায়গায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখাল!

কুমার বললে, "কি করে জানলে তুমি?"

—"শুনছ না, ঐখানটার গাছের ওপরে পাখি আর বাঁদররা কিচির-মিচির করচে? যেন কোন অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর ঘুমোতে পারছে না।"

—"তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?"

—"এখনি ঐ বনের ভিতর ঢুকব।"

—"লোকজনদের ডাকব না?"

—"সে সময় কোথায়?" বলেই বন্দুকটা বগলদাবা করে বিমল অগ্রসর হল।

—"ঠিক বলেছ" বলে কুমারও তার পিছন ধরল।

ভীষণ বন! ভালো করে ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কাঁটা-ঝোপের আক্রমণে বিমলের ও কুমারের কাপড়-জামা গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এমন অসময়ে, এই দুর্গম অরণ্যে মানুষকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত বানর ও পাখির দল আরো জোরে কলরব করে উঠল।

কুমার বললে, "বিমল, এদিক দিয়ে আর এগুবার চেষ্টা করা বৃথা। এখান দিয়ে কোন জীব যেতে পারে না—আমাদের শত্রু নিশ্চয় ও পথ দিয়ে যায়নি।"

টর্চের আলো একটা ঝোপের উপর ফেলে বিমল বললে, "দেখ।"

কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, একটা কাঁটাগাছে সাদা একখানা কাপড় ঝুলছে। সে বললে, "কি ও?"

—"মানিকবাবুর বিছানার চাদর। এখন বুঝছ তো, শত্রু কোন্ পথে গেছে?"

বিমল চাদরখানা নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখে বললে, "এখন পর্যন্ত মানিকবাবু যে আহত হয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ পেলুম না! কুমার, দেখ, চাদরে রক্তের দাগ নেই।"

কুমার বললে, "ভগবান্ তাঁকে বাচিয়ে রাখুন। নইলে তাঁর জন্যে দায়ী হব আমরাই। কারণ, আমরাই তাঁকে জোর করে এই বিপদের ভেতর টেনে এনেছি। আহা, বেচারা...."

"শুধু বেচারা নয়, গো-বেচারা। এইরকম সব গো-বেচারা সন্তান প্রসব করছেন বলেই বাংলা-মায়ের আজ এমন দশা। আমাদের বঙ্গ-জননীকে ব্যাঘ্রবাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু কোথায় সে ব্যাঘ্র?"

কুমার বললে, "আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়ে হালুম-হুলুম করছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু যেদিন খাঁচা ভেঙে বেরুবে, মায়ের ভক্ত এই গো-বেচারার দল কি করবে?"

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কুমার বললে, "বিমল, দেখ—দেখ!"

কুমারের টর্চের আলো একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় গিয়ে পড়েছে। সেখানে পড়ে আছে একটা চিতাবাঘের দেহকে জড়িয়ে ধরে মস্ত-বড় একটা অজগর সাপ। অজগরের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন। বাঘ আর সাপ, কেউ নড়ছে না।

বিমল খুব সাবধানে কয় পা এগিয়ে গিয়ে বললে, "হুঁ ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সর্পরাজ ভুল শিকার ধরেছিল। যদিও তার আলিঙ্গনে পড়ে ব্যাঘ্রমশাইকে স্বর্গ দেখতে হয়েছে, তবু চোখ বোজবার আগে আঁচ্‌ড়ে-কাম্‌ড়ে আদর করে সর্পরাজকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

বিমল বন্দুকের নল্‌চে দিয়ে সাপ আর বাঘের দেহকে দু-চারবার নাড়া দিল। তারা মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

একটু তফাতে ঝোপের ভিতর থেকে তিন-চারটে হায়েনার মাথা দেখা গেল।

কুমার বললে, "চল বিমল, হায়েনার দল আসন্ন ভোজের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেখে ওরা এদিকে আসছে না—ওকি বিমল, তোমার মুখ হঠাৎ ওরকমধারা হয়ে গেল কেন?" বিমল যেদিকে তাকিয়েছিল, সেইদিকে তাকিয়ে কুমারও যা দেখলে, তাতে তার গায়ের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

সাম্‌নের ঝোপের ভিতরে প্রকাণ্ড একখানা কালো মুখ জেগে উঠেছে! সে মুখ মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষের মুখ নয়!

ঠিক তার পাশের ঝোপ দুলে উঠল এবং সেখানেও দেখা দিলে আর-একখানা তেমনি কালো, কুৎসিত, নিষ্ঠুর,—মানুষের মতন, অথচ অমানুষিক ভীষণ মুখ!

আর-একটা ঝোপ দুলিয়ে আবার আর-একখানা ভয়ঙ্কর মুখ বাইরে বেরিয়ে এল!

তারপরেই একটা গাছের উপর থেকে দুম্ দুম্ দুম্ করে মাটি কাঁপিয়ে আবির্ভূত হল দানবের মতন মস্ত আরো চার-পাঁচটা মূর্তি!

কুমার শুকনো গলায় অস্ফুট-স্বরে বললে, "বিমল, আর রক্ষে নেই—আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত!"

বিমল কিছু বললে না, তার মুখ স্থির। প্রথম যে-মূর্তিটা মুখ বাড়িয়েছিল, ঝোপের আড়াল থেকে ধীরে-ধীরে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বিমল বললে, "কুমার, এরা আমাদের আক্রমণ করবে। এরা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বলিষ্ঠ,—বনের হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত ভয়ে এদের ছায়া মাড়ায় না। এরা কি জীব, তা জানো তো?"

—"হুঁ, গরিলা।"

—"তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

এগারো
শৃঙ্গী হস্তী

বিমল এমন শান্তস্বরে বললে যে, "তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও,"—কুমার সমস্ত বিপদের কথা ভুলে তার মুখের পানে আর একবার না তাকিয়ে থাকতে পারলে না। অবশ্য এ অভিজ্ঞতাও তার পক্ষে নূতন নয়। কারণ, কুমার বরাবরই দেখে এসেছে, বিপদ যত গুরুতর হয়, বিমলের মাথাও হয়ে ওঠে তত-বেশি শান্ত। বিপদকে সে খুব সহজ ভাবেই গ্রহণ করত বলে তার বিরুদ্ধে অটল পদে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত যুঝতেও পারত।

কুমারের কাছেও বিপদ অপরিচিত নয়। আসামের জঙ্গলে যখের ধন আনতে গিয়ে, মঙ্গলগ্রহের বামনদের হাতে বন্দী হয়ে এবং ময়নামতীর মায়াকাননে পথ হারিয়ে যতরকম মহাবিপদ থাকতে পারে, সে-সমস্তেরই সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হয়েছে, সুতরাং আজকের এই মস্ত বিপদ দেখেও কুমারের মনের ভাব যেরকম হল, তা কাপুরুষের মনের ভাব নয়।

এত দেশ বেড়িয়েও বিমল ও কুমার আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে জ্যান্ত গরিলা দেখেনি! আজ তাদের প্রথম দেখে তারা বুঝতে পারলে যে, পশুরাজ সিংহ পর্যন্ত গরিলা দেখে কেন মানে-মানে পথ ছেড়ে দেয়! এরা যেন শক্তি সাহস ভীষণতা ও নিষ্ঠুরতার জীবন্ত মূর্তি! তাদের হিংস্র চক্ষু, দাঁতওয়ালা মুখ আর মস্ত

বুকের পাটা দেখলে প্রাণমন আঁৎকে ওঠে। আকারে তারা অন্য-সব জীবের চেয়ে মানুষেরই কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু তবু তাদের চেহারার সঙ্গে স্যান্ডোর মতন কোন মহাবলবান মানুষেরও তুলনা হয় না! তাদের হাতের এক চড় খেলে স্যান্ডোর কাঁধ থেকেও মাথা বোধহয় উড়ে যেত!

সর্বপ্রথমে যে গরিলাটা ছিল, সেই-ই বোধহয় দলের সর্দার। হঠাৎ সে দু-হাতে বুক চাপড়ে গর্জন করে উঠল!

বিমল বললে, "বন্দুক ছোঁড়ো কুমার। ওরা এইবারে আমাদের আক্রমণ করবে! ওরা বেশি কাছে এলে আমরা আর কিছুই করতে পারব না।"

বিমলের কথাই ঠিক! সর্দারের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্যান্য গরিলাগুলোও দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে-চাপ্‌ড়াতে ও গজ্‌রাতে-গজ্‌রাতে অগ্রসর হতে লাগল।

প্রায় একসঙ্গেই বিমল ও কুমারের বন্দুক সশব্দে অগ্নি উদ্গার করলে! সর্দার-গরিলার গায়ে বোধহয় গুলি লাগল! চিৎকার করে বসে পড়েই সে আবার উঠে দাঁড়াল!

কিন্তু উপরি-উপরি দু-দুটো বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই আর এক কাণ্ড! বিমল ও কুমারের পিছন দিকের বামপাশের বনের ভিতর থেকে আচম্বিতে যেন একদল দানব ঘুম থেকে জেগে উঠল! তারপর সে কী মাতামাতি আর দাপাদাপির শব্দ! মাটি কাঁপতে লাগল থর্‌থর্ করে, তিন-চারটে গাছ ভেঙে পড়ল মড়্-মড়্ করে! কারা যেন দ্রুতপদে ধেয়ে আসছে।

গরিলাগুলো এক মুহূর্তের মধ্যে কে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না!

দুটো সিংহ কোথা থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের মতন আর-এক দিকে দৌড়ে গেল—বিমল ও কুমারের পানে ফিরেও তাকালে না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "ওরা কারা আসছে,—ওদের দেখে গরিলারা আর সিংহেরাও ভয়ে পালিয়ে গেল?"

কুমারকে টেনে নিয়ে বিমল একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল!

তারপর বনের ভিতর থেকে বেরুল, একে-একে বারো-তেরোটা চলন্ত পাহাড়ের মতন মূর্তি,—চারিদিকে ধুলো ও শব্দে ঝড় বহিয়ে তারা বেগে আর-একটা জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল!

বিমল বললে, "হাতির দল। আমাদের বন্দুকের আওয়াজে ভয় পেয়েছে।"

কুমার বললে, "হাতি! হাতির মাথায় কি শিং থাকে?"

বিমল বললে, "কুমার, অন্তত তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আর কোন মানুষেরা চোখে যা দেখেনি, ময়নামতী মায়াকাননে গিয়ে সেই-সব অদ্ভুত জীবও তুমি তা দেখে এসেছ?"

কুমার বললে, "ময়নামতীর মায়াকানন হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া দেশ—আর এ হচ্ছে আফ্রিকা। এখানে যে শৃঙ্গী হস্তী পাওয়া যায়, এমন কথা আমি কোনদিন শুনিনি।"

বিমল বললে, "কিন্তু এই শৃঙ্গী হস্তীর কথা সম্প্রতি আমি একখানা ইংরেজি কেতাবে পড়েছি। এরা দুর্লভ জীব,—খুব কম লোকই দেখেছে। এখনো অনেকে এদের কথা বিশ্বাস করে না।...যাক্, এখন আর এ-সব আলোচনায় দরকার নেই। চাঁদ পশ্চিম আকাশে নেমে গেছে। গরিলারা আবার দেখা দিতে পারে। আশেপাশে সিংহরা গর্জন করছে। অন্ধকার শেষ হবার আগেই আমাদের তাঁবুতে ফিরে যেতে হবে।"

কুমার কাতরকণ্ঠে বললে, "সবই তো বুঝছি, কিন্তু মানিকবাবুর কোন খোঁজই তো পাওয়া গেল না।"

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "সেটা আমাদের দোষ নয়। আজ আর খোঁজাখুঁজি বৃথা। কাল সকালে আবার সে চেষ্টা করা যাবে।"

কুমার বললে, "মানিকবাবু আর বেঁচে নেই।"

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বললে, "ওঠ কুমার!"

দু'জনে আবার জঙ্গল ভেঙে পথ খুঁজতে লাগল—কিন্তু পথ কোথায়? যেখানেই টর্চের আলো পড়ে, সেখানেই ছোট-বড় ঝোপঝাপ বা নিবিড় অরণ্য ছাড়া অপর কিছুই দেখা যায় না।

বিমল বললে, "আমরা যেদিক দিয়ে এসেছি, সেদিক দিয়ে ফিরতে গেলেই আবার গরিলাদের কবলে গিয়ে পড়ব। এখন কি করা যায়? এই বনে বসেই কি রাত কাটাতে হবে?"

কুমার মাটির উপরে টর্চের আলো ফেলে বললে, "দেখ, এখানে কতরকম জন্তুর পায়ের দাগ। মাটিও যেন স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে। এর কারণ কি?"

বিমল হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ দেখে বললে, "হ্যাঁ। গণ্ডার, হিপো, হাতি, সিংহ, হরিণ—নানারকম জীবেরই পায়ের দাগ দেখছি বটে! মাটিও খুব নরম। নিশ্চয়ই কাছে কোন জলাশয় আছে—এইখান দিয়ে জানোয়ারেরা জল খেতে যায়। কুমার, আর কোন ভয় নেই—কাছেই একটা-না-একটা পথ আছেই—যদিও সেটা তাঁবুতে ফেরবার পথ নয়, তবু পথ তো!"

বিমলের কথাই সত্য। সামনের একটা বড় ঝোপের আড়ালেই জানোয়ারদের পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল। অদূরে আকাশ কাঁপিয়ে কি-একটা বড় জন্তু চিৎকার করে উঠল।

বিমল বললে, "হিপোর চিৎকার। জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে হিপোর দল মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে মনের আরাম জানায়।"

পথ দিয়ে এগুতে-এগুতে বিমল বললে, "কুমার, চারিদিকে চোখ রেখে সাবধানে চল। এই পথে নানা জীব জল পান করতে যায়। তাই শিকার ধরবার জন্যে বাঘ আর সিংহেরা আশেপাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকে।"

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র বা সিংহ কারুর সঙ্গেই শুভদৃষ্টি হল না। পথ শেষ হতেই সামনে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক জলাশয়। তার একদিকে কালো বনের আড়ালে অদৃশ্য হবার আগে চাঁদ ম্লান-চোখে পৃথিবীকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে। জলের ভিতরে অনেকগুলো জীব ডুব দিচ্ছে বা সাঁতার কাটছে—দূর থেকে তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

বিমল বললে, "হিপোপটেমাস।"

কুমার বললে, "আঃ, জল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হল। যা তেষ্টা পেয়েছে!" বলেই সে একদৌড়ে জলের ধারে গিয়ে তীরের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে অঞ্জলি করে জলপান করতে যাবে, অমনি জলের ভিতর থেকে বিদকুটে দুঃস্বপ্নের মতন একখানা প্রকাণ্ড ও ভীষণ মুখ ঠিক তার মুখের সুমুখেই হঠাৎ জেগে উঠল—এবং সেইসঙ্গে পিছন থেকে বন্দুকের শব্দ এবং জলের ভিতরে ভয়ানক তোলপাড়!

এক টানে কুমারকে জলের ধার থেকে সরিয়ে এনে বিমল বললে, "বন্ধু, সাত-তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে এখনি কুমীরের জলখাবার হয়েছিলে যে! যাক্, তুমি ঠাণ্ডা না হও, কুমীরের পোকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।...আরে, ও আবার কি?"

খানিক তফাতেই একটা মস্ত জানোয়ার দাঁড়িয়ে বন্দুকের শব্দে খাপ্পা হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

—"বোধহয় গণ্ডার! পালিয়ে এস কুমার, পালিয়ে এস!"

বিমল ও কুমার যত জোরে-পারে দৌড় দিয়ে আবার নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে—ধুপ্ ধুপ্ শব্দ শুনে বুঝলে গণ্ডারটাও তাদের পিছনে-পিছনে ছুটে আসছে।

জঙ্গলের ভিতর আর দৌড়োবার উপায় নেই—চারিদিকেই অন্ধকার আর

গাছপালা, দৌড়োবার চেষ্টা করলে কোন গাছের ধাক্কা লেগে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিমল বললে, "কুমার শুয়ে পড়!"

তারা শুয়ে-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনের মতো বেগে ছুটে এসে, গণ্ডারটা ঠিক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল—সামনের জঙ্গল ছত্রভঙ্গ করে গাছপালা কাঁটাঝোপ ভেঙে-চুরে।

খানিক পরে বিমল উঠে বসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "ভাগ্যে গণ্ডারদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, আর তারা একরোখা হয়ে ঠিক সোজা পথে ছোটে, তাই এ-যাত্রাও বেঁচে যাওয়া গেল।"

কুমার বললে, "এ কি কঠিন ঠাঁই বাবা! প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই প্রাণ তো যায়-যায় হয়ে উঠল!—উঃ!"

জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে চোখ চালিয়ে বিমল বললে, "ঐ চাঁদ অস্ত গেল। ব্যস্, আজকের রাতের মতো বনবাস ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঐ যাঃ! কুমীরটাকে গুলি করবার সময় টর্চটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, গণ্ডারের তাড়া খেয়ে সেটা আর তুলে আনবার সময় পাইনি!"

কুমার বললে, "আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। জল খাবার সময়ে টর্চ আর বন্দুক দুইটি পাশে রেখেছিলুম। সে দুটো সেখানেই আছে।"

বিমল বললে, "কি সু-খবর! এই অন্ধকারেই আমার নৃত্য করতে ইচ্ছে করছে!"

কুমার গুম্ হয়ে রইল!...

বিরাট অন্ধকার নিয়ে বিপুল অরণ্য তাদের বুকের উপর ক্রমেই যেন চেপে বসতে লাগল। দূরে-দূরে আশে-পাশে কাদের সব আনাগোনার শব্দ—কখনো থেমে-থেমে, কখনো তাড়াতাড়ি, কখনো ধীরে-ধীরে! চারিদিকে কারা যেন নিঃশব্দে পরামর্শ আর ষড়যন্ত্র করছে—চারিদিকে কারা যেন চক্ষুহীন চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে—চারিদিকে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত আর্তনাদ, গাছের পাতায়-পাতায় বাতাসের কান্না।

আলো যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদ হারালে পৃথিবীর রূপ বদলে যেতে বিলম্ব হয় না।

পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে কেবল অন্ধকারের মহাবন্যা বইছে। বিমলের মনে হল, এমন অন্ধকার সে ভারতবর্ষে কখনো দেখেনি,—এ অসম্ভব শব্দময় অন্ধকারের গর্ভে বন্দী হওয়ার চেয়ে সিংহ, গণ্ডার বা গরিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোও ভালো,—এ অন্ধকার তাকে যেন অন্ধ আর দম বন্ধ করে হত্যা

করতে চায়! বিমলের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল—নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে সে ভাবতে লাগল, আজ কেন তার এ-রকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে?

হঠাৎ খুব কাছেই কতকগুলো শুকনো পাতা মড়্-মড়্ করে উঠল, তারপরেই সব চুপচাপ!

কোন অদৃশ্য শত্রু কি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? কোন হিংস্র জন্তু কি আবার তাদের আক্রমণ করতে চায়? তার আত্মা কি আগে-থাকতে সেটা জানতে পেরে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে? এই অজ্ঞাত ভয় কি তাহলে অমূলক নয়? বিমল প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না।

সে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে চুপি-চুপি ডাকলে, "কুমার!"

—"কি বলছ?"

—"কাছেই একটা শব্দ শুনলে? পায়ের শব্দের মতো?"

—"হুঁ। একটু আগে আমার মনে হল, কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে।"

—"ওটা তোমার শোনবার ভুল। কিন্তু শুকনো পাতার উপরে একটা শব্দ হয়েছে। হয়তো কোন জীবজন্তু!"

—"সম্ভব।"

—"কিন্তু দেখবার কোন উপায় নেই। অন্ধকারে আমরা এখন অন্ধ।"

—"আমার কাছে একটা দেশলাই আছে। জ্বালব নাকি?"

বিমল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আচম্বিতে কারা তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কোনরকম আত্মরক্ষার চেষ্টা করার আগেই মাথার উপরে সে ভীষণ এক আঘাত অনুভব করলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

বারো

শত্রুর কবলে

যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলে বিমল দেখলে যে, ভোরের আলোয় চারিদিক ঝল্‌মল্ করছে।

প্রথমে তার কিছুই স্মরণ হল না; তার মনে হল সে সবে ঘুম থেকে জেগে উঠল। কিন্তু হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে সে মাথায় হাত দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত ভিজে গেল। চম্‌কে হাতখানা চোখের সামনে এনে সে দেখলে, হাতময় রক্ত!....তখন তার সব কথা মনে পড়ল।

সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর যে-দৃশ্য দেখলে, তাতে তার বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তার চারিদিকে গোল হয়ে প্রায় ৩০/৪০ জন লোক বসে আছে। প্রত্যেকেরি চেহারা কালো যেন কষ্টিপাথর, দেহ প্রায় উলঙ্গ, কেবল কোমরে লেংটির মতো একখানা করে ন্যাকড়া জড়ানো। তাদের প্রত্যেকেরি হাতে একটি করে বর্শা, সকালের রোদে বর্শার ফলাগুলো জ্বলে-জ্বলে উঠছে আগুনের ফুল্‌কির মতো। লোকগুলো যে আফ্রিকারই বুনোমানুষ, বিমলের তা বুঝতে বিলম্ব হল না। তারপরে হঠাৎ বাংলা কথা শুনে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে বসল এবং সবিস্ময়ে দেখলে, খাকি পোশাক-পরা তিনজন লোক সেখানে বসে আছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কইছে;—সুতরাং তারা যে বাঙালী সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না।

আর-একটু লক্ষ্য করে দেখে, সেই তিনজনের ভিতরে দুজনকে সে চিনতেও পারলে, তাদের একজনকে সে মোম্বাসার হোটেলের ভিতরে দেখেছিল এবং তিনি হচ্ছেন মানিকবাবুর ছোট কাকা সেই মাখনবাবু।

আর-একজন হচ্ছে সেই রামু, কলকাতায় মানিকবাবুর বাড়িতে ম্যাপ চুরি করবার জন্যে যে চাকর সেজে কাজ নিয়েছিল।

বিমলকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মাখনবাবু গাত্রোত্থান করে তার কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর হাস্যমুখে বললেন, "কি বিমলবাবু, এখন কেমন আছেন?"

বিমল কোন জবাব দিলে না।

—"আমার সঙ্গের লোকগুলোকে দেখে কি আপনার ভয় করছে? ভয়েই কি আপনার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না?"

মাখনবাবুর চোখের উপরে চোখ রেখে শান্তস্বরে বিমল বললে, "ভয়ের সঙ্গে এ জীবনে কোন দিনও পরিচয় হয়নি—এ জগতে কারুকে আমি ভয় করি না।"

মাখনবাবু হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আপনি যে খুব একজন সাহসী ব্যক্তি সেটা জেনে খুশি হলুম। কিন্তু আপনার এ সাহস আজ কোন কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।"

বিমল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে, "আপনাকে আমি চিনি। আপনি মানিকবাবুর কাকা মাখনবাবু। কিন্তু আমাকে আপনারা ধরে এনেছেন কেন?"

মাখনবাবু বললেন, "ধরে এনেছি কেন? নিমন্ত্রণ করলে আপনি আসতেন না বলে।"

—"কিন্তু আমি আসি না আসি, তাতে আপনার কি আসে যায়?"

—"আসে-যায় অনেকখানি। বেশি কথায় দরকার নেই, একবারেই আসল কথা শুনুন। আপনার কাছ থেকে আমি একখানা ম্যাপ চাই।"

বিমল বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ম্যাপ? কিসের ম্যাপ?"

—"ম্যাপখানা যে কিসের, তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। তা নিয়ে আর লুকোচুরি করা বৃথা। সে ম্যাপখানা আমার হাতে দিন, সমস্ত গোলমাল এখুনি মিটে যাবে।"

—"একখানা ম্যাপ আমার কাছে ছিল বটে, কিন্তু মোম্বাসার হোটেলে সেটা চুরি গেছে, একথা আপনি জানেন বোধহয়?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সেখানা যে জাল ম্যাপ তাও আমার অজানা নেই! বিমলবাবু, আপনার চালাকিকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ও-চালাকির চাল আজ আর চলবে না। আপনি বুদ্ধিমান, ম্যাপখানা যে এখন আমাকে দেওয়াই উচিত একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন!"

বিমল চুপ করে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা তুলে বললে, "সে ম্যাপ এখন আপনাকে আমি কি করে দেবো? সেখানা তো আমার কাছে নেই।"

মাখনবাবু বললেন, "ম্যাপখানা যে আপনার কাছে নেই তা আমরা জানি, কারণ, আমরা আপনার কাপড়-চোপড় খুঁজে দেখেছি। কিন্তু সেখানা আপনাদের তাঁবুর ভেতরে নিশ্চয় আছে। কোথায় আছে এখন কেবল সেইটেই আমরা জানতে চাই। একবার তার খোঁজ পেলে সেখানা হস্তগত করতে আমাদের বেশি বিলম্ব হবে না।"

বিমল বললে, "ম্যাপের ঠিকানা পেলেই আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?"

মাখনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনি খুব মূল্যবান জীব নন। ম্যাপখানা পেলে পরেও আপনাকে ধরে রেখে আমাদের কোনই লাভ নেই!"

বিমল বললে, "আর ম্যাপের ঠিকানা যদি না বলি?"

—"তাহলে বিনা বাক্যব্যয়ে পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন!"

বিমল আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমি পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত, আপনারা কি করতে চান, করুন।"

মাখনবাবু কর্কশকণ্ঠে বললেন, "তাহলে ম্যাপের ঠিকানা আপনি বলবেন

না? দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন।"

বিমল বললে, "এর মধ্যে ভাববার কিছুই নেই। ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।"

—"বলবেন না? বলবেন না?"—বলতে-বলতে দারুণ ক্রোধে মাখনবাবুর সমস্ত মুখখানা লাল-টক্‌টকে হয়ে উঠল। একেবারে বিমলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন, "বিমলবাবু, আপনার সঙ্গে বেশি কথা কইবার সময় আমাদের নেই। আমাকে যারা চেনে তারা সবাই জানে, বেশি কথার মানুষ আমি নই। আমি হাসতে-হাসতে মানুষকে আলিঙ্গন করতে পারি। আবার পরমুহূর্তে তেমনি হাসতে-হাসতেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি। আর একবার মাত্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আপনি দেবেন কিনা বলুন।"

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, "আপনারা অনেক লোক আর আমি একলা। আপনাদের বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন—ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।"

মাখনবাবু হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—"রামু!"

রামু তখনি উঠে মাখনবাবুর কাছে দাঁড়াল।

মাখনবাবু বললেন, "এই হতভাগাকে এখনি ঐ গাছের ডালে লট্‌কে দে।"

সামনেই একটা মস্তবড় গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ছেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারি একটা লম্বা ডালে দড়ি ঝুলিয়ে রামু মহা-উৎসাহে ফাঁসির আয়োজনে লেগে গেল।

বিমল আর-একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। সেই প্রায়-উলঙ্গ অসভ্য লোকগুলো এক-একটা কালো পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল। কিন্তু তাদের চোখগুলো তখন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে ঠিক যেন সব নিষ্ঠুর হিংস্র পশুর মতো।

নিজের অসাধারণ শক্তির কথা বিমল জানত। এবং ইচ্ছা করলে সে যে এখনি মরবার আগে অন্তত পাঁচ-ছয় জন শত্রুকে বধ করে যেতে পারে এটাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু অকারণে নরহত্যা করতে তার সাধ হল না। কারণ, পাঁচ-ছজন শত্রুকে বধ করলেও তার মৃত্যু যে নিশ্চিত এটা সে বুঝতে পারলে। কাজেই সে আর কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে বিমলের দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রাখলে। মুখ ফেরাতেই বিমলের চোখে পড়ল সেই প্রকাণ্ড লম্বা মড়া-দেঁতো কাফ্রিটার কদাকার মুখখানা। এও যে ভিড়ের ভিতরে ছিল এতক্ষণ বিমল তা দেখতে পায়নি।

মাখনবাবু হাঁকলেন, "রামু! ফাঁস ঠিক হয়েছে তো?"

রামু বললে, "আজ্ঞে, সব তৈরি।"

মাখনবাবু বললেন, "তাহলে ওকে ঐখানে নিয়ে যাও।"

মড়া-দেঁতো বিমলের একখানা হাত ধরে টেনে বাওয়াব গাছের দিকে অগ্রসর হল, বিমলও কোন বাধা না দিয়ে আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে গাছের তলায় এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। রামু একমুখ হাসি নিয়ে বিমলের গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলে।

মড়া-দেঁতো দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরে বিমলকে টেনে শূন্যে তোলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

মাখনবাবু বললেন, "ছোকরা, এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আমাকে বলবে কি?"

বিমল অটল স্বরে বললে, "না।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাখনবাবু হুকুম দিলেন, "তাহলে ওকে টেনে তোল।"

চারপাশের লোকগুলো মহা আনন্দে অজানা-ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। মড়া-দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধরে টান মারতে উদ্যত হল—

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উপর-উপরি ছয়-সাতটা বন্দুকের আওয়াজ! পরমুহূর্তেই ভিড়ের ভিতর থেকে তিনজন লোক আর্তনাদ করে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল!

আবার অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ—আবার আরো—কয়েকজন লোক মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

তেরো

ম্যাপের সন্ধান

ফট্ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ, তারপরেই গোঁ-গোঁ শব্দ! কুমার বেশ বুঝলে, কার মাথায় লাঠি পড়ল।

জঙ্গলের ভিতরে স্যাঁৎসেঁতে ভিজে জমির উপরে সে নিজের ক্লান্ত দেহটাকে বিছিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার অদৃষ্টে আজ বিশ্রাম নেই। শত্রুরা তাদের আক্রমণ করেছে এবং বিমল নিশ্চয়ই তাদের কবলে গিয়ে পড়েছে। কাদের ফিস্-ফিস্ করে কথাও তার কানে গেল। সে একা। এখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে মাটির উপর দিয়ে খুব সাবধানে গড়িয়ে-গড়িয়ে সে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু শত্রুরা যে কারা, সেটা দেখবারও সময় সে পেলে না, সড়াৎ করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়েই কুমার গুঁড়ি মেরে যতটা-জোরে-পারা-যায় এগিয়ে যেতে শুরু করলে।...মিনিট পনেরো পরে যখন সে থামল, তখন কাঁটা-ঝোপে তার গা বয়ে রক্ত ঝরছে এবং গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে তার সারা দেহ থেঁতো হয়ে গেছে।

মাটির উপরে পড়ে খানিকক্ষণ কুমার কান পেতে রইল—কিন্তু শত্রুর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সে শুয়ে-শুয়ে হাঁপাতে লাগল—

আর ভাবতে লাগল!...

বিমলের কি হল? সে বেঁচে আছে, না নেই? যদি এখনো বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করবার উপায় কি?...

আচম্বিতে কুমারের মনে হলো, তার পাশেই কে যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছে! একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে আরো ভালো করে সে শোনবার চেষ্টা করলে।

হ্যাঁ, নিশ্বাস যে পড়ছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু কে এ? মানুষ না জন্তু? অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না!

সন্তর্পণের সঙ্গে কুমার আবার গড়িয়ে সরে যেতে গেল এবং একেবারে গিয়ে পড়ল একটা জ্যান্তো দেহের ওপরে!—সঙ্গে-সঙ্গে "আঁ আঁ' করে একটা বিকট চিৎকার এবং সঙ্গে-সঙ্গে কুমার মাটিতে শুয়ে শুয়েই সেই দেহটার উপরে জোড়া-পায়ে লাথি মারলে!

আবার চিৎকার হল—"ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, ওরে বাবা রে।"

এ যে মানিকবাবুর গলা!

ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসে কুমার সবিস্ময়ে বললে, "অ্যাঁ, মানিকবাবু নাকি?"

—"ওরে বাবা রে, গেছি রে! ওরে বাবা রে, এই রাত আঁধারে বন-বাদাড়ে নাম ধরে কে ডাকে রে! ওরে বাবা রে, শেষটা ভূতের হাতে পড়লুম রে!"

—"মানিকবাবু, মানিকবাবু—শুনুন, আমি ভূত নই, আমি কুমার"—এই বলেই সে পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বাললে।

জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে মানিকবাবু তখন মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, এখন কুমারের নাম শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন এবং চেঁচিয়ে

বলে উঠলেন, "অ্যাঁ কুমারবাবু? আপনি?"—বলতে বলতে মনের আবেগে তিনি কেঁদে ফেললেন!

কুমার অনেক কষ্টে মানিকবাবুকে শান্ত করে বললে, "আমরা তো আপনার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেমন করে?"

মানিকবাবু বললেন, "আরে মশাই, সে অনেক কথা, ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—উঃ!"

কুমার বললে, "ভালো করে সব পরে শুনব অখন। এখন খুব সংক্ষেপে দু-কথায় বলুন দেখি, ব্যাপারটা কি হয়েছিল?"

মানিকবাবু বললেন, "আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই শুনুন।.....কাল রাত্রে তাঁবুর ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়ে তো দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছিলুম—হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে! সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, আমার বিছানা যেন চলে বেড়াচ্ছে! প্রথমে ভাবলুম, আমি একটা বিদকুটে স্বপ্ন দেখছি—কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, এ তো স্বপ্ন নয়, এ যে সত্যি! লেপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই দেখলুম, চাঁদের আলোয় বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমি চলেছি! আমি একটু নড়তেই গরর্-গরর্ করে একটা গর্জন হল, আমিও একেবারে আড়ষ্ট! ও বাবা, ও যেন বুনো জন্তুর আওয়াজ! তোশক আর লেপ-সুদ্ধ সে আমাকে মুখে করে নিয়ে চলেছে, আর আমার দেহ তার মধ্যে কোনরকমে জড়িয়ে বন্দী হয়ে আছে! এখন উপায়? জানোয়ারটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, লেপ আর তোশক ফুঁড়ে তার দাঁতও আমার গায়ে বেঁধেনি।...হঠাৎ জানোয়ারটা একটা লাফ মারলে, কতকগুলো ঝোপঝাড় দুলে উঠল আর আমিও ভয়ে না চেঁচিয়ে পারলুম না—সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বিছানার ভিতর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়লুম। তাকিয়ে দেখি, মস্ত একটা সিংহ আমার বিছানা মুখে করে লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি যে আর বিছানার ভিতরে নেই, সেটা সে টেরই পেলে না। তারপর আর বেশি কথা কি বলব, সিংহটা পাছে আবার আমাকে খুঁজতে আসে, সেই ভয়ে আমি তো তখনি উঠে চম্পট দিলুম—কিন্তু কোথায়, কোন্‌দিকে যাচ্ছি সে কথাটা একবারও ভেবে দেখলুম না। তার ফল হল এই যে, কাল রাত থেকেই পথ হারিয়ে, পদে-পদে খাবি খেয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না—"

মানিকবাবুকে বাধা দিয়ে কুমার বললে, "তারপর কি হল আর তা বলতে হবে না; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

মানিকবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি একলা কেন? বিমলবাবু কোথায়?"

কুমার ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, "বিমল এখন ইহলোকে না পরলোকে, একমাত্র ভগবানই তা জানেন।"

মানিকবাবু সচমকে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা?"

"চুপ"—বলেই কুমার মানিকবাবুর হাত চেপে ধরলে। খানিক তফাতেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো আলো দেখা গেল।

মানিকবাবু চুপি চুপি বললেন, "ও কিসের আলো?"

—"আলোগুলো এইদিকেই আসছে। নিশ্চয়ই শত্রুরা আমাদের খুঁজছে!"

—"শত্রু? শত্রু আবার কারা?"

—"বোধহয় ঘটোৎকচের দল।"

—"ও বাবা, বলেন কি! এই বিপদের ওপরে আবার ঘটোৎকচ! গোদের ওপরে বিষফোড়া! তাহলেই আমরা গেছি!"—মানিকবাবু একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন।

আলোগুলো নাচতে-নাচতে ক্রমেই কাছে এসে পড়ল—অনেক লোকের গলাও শোনা যেতে লাগল! তারপর একটা কুকুরের চিৎকার—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে বললে, "এ যে আমার বাঘার গলা? মানিকবাবু, আর ভয় নেই—রামহরি নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। রামহরি, রামহরি! আমরা এখানে আছি! রামহরি!"—বলতে-বলতে সে আলোগুলোর দিকে ছুটে এগিয়ে গেল এবং বলা বাহুল্য যে, মানিকবাবুও কুমারের পিছনে-পিছনে ছুটতে একটুও দেরি করলেন না।

কুমারের আন্দাজ মিথ্যা নয়। সকলের আগে-আগে আসছে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে বাঘা, তারপর একদল 'আস্কারি' বা বন্দুকধারী রক্ষী। 'পোর্টার' বা কুলির দল লণ্ঠন হাতে করে তাদের পথ দেখিয়ে আনছে।

কুমারকে দেখেই বাঘা বিপুল আনন্দে ছুটে এসে, পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলে। রামহরিও মহা-আহ্লাদে বলে উঠল—"জয়, বাবা তারকনাথের জয়! এই যে কুমারবাবু, এই যে মানিকবাবু। কিন্তু আমার খোকাবাবু কোথায়?"

কুমার বিমর্ষমুখে বললে, "রামহরি, বিমল আর বেঁচে আছে কিনা জানি না।"

রামহরি ধপাস্ করে বসে পড়ে বললে, "অ্যাঃ! বল কি!"

কুমার অল্প দুচার কথায় তাদের বিপদের কথা বর্ণনা করলে।

রামহরি তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তাহলে আর এখানে দেরি করা নয়! হয়তো এখনো গেলে খোকাবাবুকে বাঁচাতে পারব!"

*　　*　　*　　*　　*

ভোরের আলো যখন গাছের সবুজ পাতায়-পাতায় শিশুর মতন খেলা করে বেড়াচ্ছে, কুমার ও তার দলবল তখন একটা ঢিপির মতন ছোট পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেই ছোট পাহাড়টার উপরে উঠতে তাদের মিনিট-তিনেকের বেশি লাগল না। তারপরেই কুমারের চোখে যে-ভীষণ দৃশ্য জেগে উঠল, আমরা আগের পরিচ্ছেদেই তা বর্ণনা করেছি। কুমার এবং আর সকলে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।...প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে, বাওয়াব-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রামু তখন মহা উৎসাহে বিমলের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে ব্যস্ত।

আর অপেক্ষা করার সময় নেই! রক্ষী দলকে ইঙ্গিত করে কুমার নিজেও একটা বন্দুক নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

মড়া-দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধরে বিমলকে শূন্যে টেনে তুলতে উদ্যত হল, সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে কুমারের, তারপর রক্ষীদের বন্দুক ঘন-ঘন অগ্নিবর্ষণ শুরু করলে।

দেখতে-দেখতে শত্রুরা যে যেদিকে পারলে, প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে; ঘটনাস্থলে রইল খালি বিমল আর জনকয়েক হত ও আহত জলু আর কাফ্রি-জাতের লোক। কুমার ও রামহরি একছুটে নিচে নেমে গিয়ে বিমলের গলার বাঁধন খুলে দিলে।

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, "মানিকবাবুর কাকার অনুগ্রহে দিব্য স্বর্গে যাচ্ছিলুম, তোমরা এসে আমার স্বর্গ-যাত্রায় বাধা দিলে কেন?"

পুরাতন ভৃত্য রামহরি ধমক দিয়ে বললে, "জ্যাঠামি করতে হবে না, ঢের হয়েছে!"

কুমার বললে, "ওরা তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিচ্ছিল কেন বিমল?"

—"গুপ্তধনের ম্যাপ কোথায় আছে বলিনি বলে।"

কুমার তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "সর্বনাশ! তাঁবুতে এখন বেশি লোকজন তো নেই? ওরা যদি এখন গিয়ে ম্যাপের লোভে আবার আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে?"

বিমল নিশ্চিন্তভাবেই বললে, "তাহলে তাঁবুতে তারা ম্যাপ খুঁজে পাবে না!"

—"খুঁজে পাবে না?"

—"না"—বলেই বিমল বসে পড়ল এবং নিজের জুতোর গোড়ালির একপাশ ধরে বিশেষ এক কায়দায় টান মারলে। অমনি গোড়ালির খানিকটা বাইরে বেরিয়ে এল এবং তার ভিতর থেকে সে একখণ্ড কাগজ বার করে কুমারকে দেখালে।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "ও কি ব্যাপার?"

বিমল বললে, "ম্যাপ। আমি অর্ডার দিয়ে কৌশলে এই জুতো তৈরি করিয়েছি। আমার জুতোর গোড়ালির একপাশ ফাঁপা।...গুপ্তধনের ম্যাপ ওর মধ্যেই পরম আরামে বিশ্রাম করে!"

রামহরি বললে, "ছি ছি, খোকাবাবু! ওটা তো তোমার কাছেই ছিল, তবু ওটা তাদের হাতে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করনি? তুচ্ছ গুপ্তধনের জন্যে—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "না রামহরি, না! সে শয়তানদের তুমি চেনো না,—আমি ম্যাপখানা দিলেও তারা আমাকে রেহাই দিত না! তাই আমি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করিনি, বুঝেছ?....যাক্ ও-কথা। এখন তাঁবুতে ফেরা যাক্। কাল সকালেই আমরা উজিজি যাত্রা করব।"

চৌদ্দ

সিংহদমন গাটুলা

এই তো টাঙ্গানিকা হ্রদ! কিন্তু এ কি হ্রদ, না, সমুদ্র?

চোখের সামনে আকাশের কোল জুড়ে থৈ-থৈ করছে শুধু জল আর জল,—কোথায় তার ওপার, আর কোথায় তার তল!

এপারে তীরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর শ্যাম বনানী এবং আকাশের নীল-মাখানো জল-আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখে বনের গাছপালারা যেন মনের আনন্দে মর্মর-গান গেয়ে-গেয়ে উঠছে।

বিমল, কুমার, মানিকবাবু ও রামহরি হ্রদের ধারে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ, যদিও মানিকবাবুর মেজো কাকার পত্রে তারা জেনেছিল যে, টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই এবং স্থানে-স্থানে তা পঁয়তাল্লিশ মাইল চওড়া, তবু টাঙ্গানিকাকে স্বচক্ষে দেখবার আগে তারা এর বিপুলতার স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি।

বনের ভিতরে Mvule নামে এক জাতের গাছ দেখা গেল, তাদের বিপুলতা

দেখলেও আশ্চর্য হতে হয়। তাদেরই গুঁড়ি কেটে নিয়ে এদেশী লোকেরা যে-সব নৌকা তৈরি করেছে, হ্রদের উপরে সেগুলি সারে-সারে নেচে-নেচে ভেসে যাচ্ছে। কূল দিয়ে একখানা বড় স্টিমারও হ্রদের বুক দুলিয়ে চলে গেল, স্টিমারে তার নাম লেখা রয়েছে, Hedwig von Wissmann !

কুমার বললে, "নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখানা জার্মান স্টিমার।"

বিমল বললে, "হুঁ, উজিজি যখন জার্মানদের স্টেশন তখন এখানে তাদেরই স্টিমার থাকা স্বাভাবিক।" তারপর পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে তারা জানতে পারলে যে, টাঙ্গানিকার পূর্ব তীরে জার্মানদের, দক্ষিণ তীরে ইংরেজদের ও পশ্চিম তীরে বেলজিয়ানদের প্রভুত্ব এবং তার জলে স্টিমারও ভাসে অনেকগুলো।

উজিজি নামে যে বড় গ্রামখানি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা জার্মান স্টেশন হলেও দলে-দলে আরব এসে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং সোয়াহিলি জাতের লোকেরাও এখানে দলে বেশ ভারি। "সোয়াহিলি" কথাটির সৃষ্টি হয়েছে "সোয়া হিলি" শব্দ থেকে। "সোয়াহিলি"র (swahili) মানে হচ্ছে, "যারা শত্রু-মিত্র সবাইকে সমান ঠকায়!" চমৎকার নাম!

গ্রামের ঠিক বাইরেই, টাঙ্গানিকার তীরে বিমলদের তাঁবু পড়ল।

রামহরি আঁজলা করে টাঙ্গানিকার জল মুখে দিয়ে বললে, "ও খোকাবাবু, সমুদ্দুরের জলের মতন অতটা না হোক, এ-জলও যে বেশ একটু নোন্তা! এ-জল তো খেতে ভালো লাগে না?"

বিমল বললে, "তাহলে খাবার জল অন্য জায়গা থেকে আনতে হবে। কিন্তু রামহরি, তোমাকে এখন অন্য কাজ করতে হবে। জনকয়েক লোক নিয়ে একবার গাঁয়ের ভেতরে যাও। দেখে এস, এখানে হাট-বাজার কিছু আছে কিনা। আর গাটুলা বলে কোন বুড়ো সর্দার এই গাঁয়ে বাস করে কিনা, সে খোঁজটাও নিয়ে এস!"

রামহরি বললে, "গাটুলা? সে আবার কে?"

—"মানিকবাবুর মেজো কাকা সুরেনবাবুর চিঠিতে তার পরিচয় পেয়েছি! সুরেনবাবুর সঙ্গে গাটুলাও গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল, আমরাও তাকে সঙ্গে নেব। পথের খবর সে সব জানে।"

রামহরি বললে, "পারি তো, গাটুলাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব কি?"

—"হ্যাঁ।"

রামহরি চলে গেল। মানিকবাবু এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে বললেন, "বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

—"বলুন।"

—"আপনারা তাহলে গুপ্তধন না নিয়ে ফিরবেন না?"

—"এই রকমই তো আমাদের মনের ইচ্ছে!"

—"মেজো কাকার চিঠি পড়ে যা বুঝেছি, আমরা গুপ্তধন আনতে গেলে সেখানকার অসভ্য লোকদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে—অর্থাৎ এখন যে-সব বিপদের বোঝা আমাদের ঘাড়ের ওপরে চেপে রয়েছে, তার ওপরেও এই নতুন বিপদ নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে?"

—"হুঁ।"

—"মশাই, তাহলে আপনারাই গুপ্তধন আনতে যান। আমি লিখে দিচ্ছি, তার বখ্‌রা আমার চাই না!"

—"আপনি কি করবেন?"

—"দেশে যাব।"

—"বেশ, আগে তো গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়া যাক, তারপর আপনার কথামতো কাজ করা যাবে"—গম্ভীর ভাবে এই কথাগুলো বলে বিমল একটা গাছতলায় গিয়ে বসে পড়ল।

মানিকবাবু খানিকক্ষণ নিরাশমুখে সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ফোঁস করে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন এবং এ-যাত্রা প্রাণটা নিতান্তই বাজে খরচ হবে বুঝে বিছানাকে আশ্রয় করে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

হ্রদে খুব মাছ পাওয়া যায় শুনে কুমার মাছ ধরবার আয়োজন করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

তাঁবু থেকে খানিক তফাতে একটা সঙ্গীহীন একানিয়া-গাছের উপরে চড়ে একটা বানর ভারি বিপদে পড়েছে। তাকে দেখেই সুযোগ বুঝে বাঘা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং থাবা পেতে গাছতলায় বসে এক দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় যেন বলছে,—আর তো পালাবার পথ নেই স্যাঙাত্! কাজেই সুড়্-সুড়্ করে নেমে এসে দেখ, আমি কেমন চমৎকার কামড়ে দিতে শিখেছি!

ঘণ্টাখানেক পরে রামহরি একদল আরবের সঙ্গে ফিরে এল। আরবদের ভিতর থেকে একটা লোক দূর হতেই বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার মুণ্ডটা প্রকাণ্ড এক ফুটবলের মতন গোলাকার, তার বক্ষদেশ প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের কাণ্ডের মতন চওড়া, তার ভুঁড়িটি প্রকাণ্ড এক পোঁট্‌লার মতন, যেন কোমরে বাঁধা থেকে ঝুলছে ও দুলছে এবং তার প্রকাণ্ড পা দুটো পৃথিবীর উপর দিয়ে চলছে,

আর মনে হচ্ছে, দু'দুখানা কোদাল যেন মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে এগিয়ে আসছে! এ-লোকটার আগাগোড়া সমস্তই প্রকাণ্ড!

রামহরি এসে বললে, "খোকাবাবু, তুমি যাকে খুঁজছিলে তাকে এনেছি!"

বিমল বললে, "গাটুলা?"

সেই প্রকাণ্ড-মুণ্ড-বুক-ভুঁড়ি-পা-ওয়ালা লোকটি প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে হা হা স্বরে হেসে বললে, "হ্যাঁ হুজুর! আমারই নাম গাটুলা—লোকে আমাকে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার বলে ডাকে—আজ পর্যন্ত সতেরোটা সিংহকে আমি যমের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।"

বিমল বিস্মিত হয়ে বললে, "গাটুলা, তুমি বাংলা জানো?"

—"হ্যাঁ জানি বৈকি,—বাংলা জানি, ফার্সী জানি, ইংলিশ জানি, জার্মান জানি! আমি বাংলা শিখেছি সুরেনবাবু-হুজুরের—তাঁর আত্মা স্বর্গবাস করুক—কাছ থেকে।"

—"আমরাও সুরেনবাবুর চিঠিতেই তোমার পরিচয় পেয়েছি। সুরেনবাবুর ভাইপোর সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ থেকে তোমার কাছেই এসেছি।"

গাটুলা আগ্রহভরে বললে, "কোথায় সুরেনবাবুর ভাইপো? আমি তাঁকে আলিঙ্গন করে ভালোবাসা জানাতে চাই।"

—"তিনি তাঁবুর ভেতরে বিশ্রাম করছেন, একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

গাটুলা মাটির উপরে বসে পড়ে দুলতে দুলতে বললে, "হুঁ, আপনারা কেন এসেছেন, তা আমি জানি। আপনারা যে শীঘ্রই আমার কাছে আসবেন, তাও আমি কাল রাতেই টের পেয়েছিলাম।"

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কাল রাতেই টের পেয়েছিলে? কেমন করে?"

—"শুনুন হুজুর, বলি। আমি বেশি কথার মানুষ নই, যা বলব দু-চার কথায় বলব। যারা বেশি কথা কয়, তারা বাজে কথা কয়। যারা বাজে কথা কয়, তারা সিঙ্গী মারতে পারে না। যারা সিঙ্গী মারতে পারে না, তারা বীরপুরুষ নয়। আর যারা বীরপুরুষ নয়, সিংহদমন গাটুলা-সর্দার তাদের মুখে থুতু দেয়"—এই বলে গাটুলা ভূমিতলে থু থু করে থুতু ফেললে।

মনে-মনে হেসে বিমল গম্ভীর মুখে বললে, "হ্যাঁ, তুমি যে বেশি কথার মানুষ নও, তোমার কথা শুনেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা যে শীঘ্রই এখানে আসব, কাল রাতেই তুমি কেমন করে তা টের পেয়েছিলে?"

—"সেই কথা জানতে চান তো শুনুন হুজুর, বলি। সাধু লোক রাত্রে

ঘুমোয়। গাটুলা-সর্দার সাধু লোক, কাজেই অন্য রাত্রের মতো কাল রাত্রেও সে ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ঘুমোলে অতি বড় জ্ঞানবান লোকও অজ্ঞান হয়ে যায়। কাজেই কে এক অসাধু ব্যক্তি কাল রাত্রে কখন যে আমাকে চুরি করতে এসেছিল, আমি তা মোটেই জানতে পারিনি।"

আশ্চর্য স্বরে বিমল বললে, "তোমাকে চুরি করতে এসেছিল? বল কি?"

—"হ্যাঁ হুজুর, হ্যাঁ। চোরের আস্পর্ধাটা বুঝুন একবার! আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমি কি মেয়েদের কানের মাক্‌ড়ি, নাকের নথ বা হাতের চুড়ি, যে বেমালুম আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে?...কিন্তু হুজুর, এ বড় সোজা চোর নয়—হয় তো এ মানুষই নয়—"

বিমল বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "অ্যাঁ, মানুষই নয়!"

—"উহুঁ, মানুষ তো নয়ই, তবে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কিনা জানি না, তা, আচ্ছা হুজুর, ভূত-প্রেতের গায়ে কি লোম থাকে?"

—"তার গায়ে কি লোম ছিল?"

—"সে যখন আমাকে কোলে করে নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কারুকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার গায়ে হাত বুলিয়ে পেলুম খালি রাশি-রাশি লোম!"

বিমল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর—তারপর?"

—"তারপর আর কি গাটুলা-সর্দারের সিংহগর্জন—সিংহের কাছ থেকেই আমি গর্জন করতে শিখেছি, শুনে—চারিদিক থেকে লোকজন এসে পড়ল, চোরটাও তখন আমাকে ফেলে অদৃশ্য হল!"

—"কেউ তাকে দেখতে পায়নি?"

—"না!"

—"কিন্তু আমরা যে আসব, সেটা তুমি জানলে কি করে?"

—"জানব না কেন? গাটুলা-সর্দার আজ পঁয়ষট্টি বৎসর এ-অঞ্চলে বিচরণ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে, কিন্তু তাকে চুরি করতে পারে এমন মানুষ সে দেখেনি। আর, তাকে চুরি করে কার লাভ? তাকে চুরি করবেই বা কেন? নিশ্চয় গুপ্তধনের লোভে। সম্রাট লেনানার গুপ্তধনের ভাণ্ডার কোথায়, আমার তা জানা আছে। আর এ-কথা এখন জানেন কেবল সুরেনবাবুর ভাই আর ভাইপো। কাজেই আমি আন্দাজে বুঝেছিলাম যে, এ অঞ্চল হয়তো আপনাদের কারুর-না-কারুর শুভাগমন হয়েছে!...কিন্তু হুঁশিয়ার।" এই বলে চিৎকার করেই গাটুলা বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল—এবং পরমুহূর্তে

দেখা গেল তার দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির ভিতরে এক সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ বর্শার আবির্ভাব হয়েছে। এ যেন এক ভেল্কিবাজি!

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, এ বর্শা তোমাকে টিপ করে ছোঁড়া হয়েছে! কিন্তু, কে এটা ছুঁড়লে!"

বিমল বললে, "যেই ছুঁড়ুক কিন্তু গাটুলা-সর্দার বর্শাটাকে ধরে না ফেললে এতক্ষণে আমাকে মাটিতে লোটাতে হত।...নিশ্চয় এ বিষাক্ত বর্শা! সর্দার, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। এ-কথা আমি ভুলব না।"

গাটুলা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আরে—আরে, শীগ্‌গির গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ান, দেখছেন না, আরো বর্শা আসছে?"

আরো পাঁচ-ছয়টা বর্শা বিদ্যুৎশিখার মতন এদিক-ওদিক দিয়ে সাঁৎ-সাঁৎ করে চলে গেল,—সকলে তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। নিজের হাতের বর্শাটাকে ক্ষণকাল পরীক্ষা করে গাটুলা বললে, "ওয়া-কিকুউ জাতের যোদ্ধারাই এ রকম বর্শা ব্যবহার করে! কিন্তু তারা আমাদের আক্রমণ করলে কেন?"

পনেরো

যক্ষপুরীর কথা

বিমল বললে, "সর্দার, ওয়া-কিকুউ কাদের বলে?"

গাটুলা বললে, "তারা অসভ্য জাতের লোক, কেনিয়া জেলার কেডং নদীর ধারে তাদের বাস। তারা লড়াই করতে খুব ভালোবাসে, আর ভারি নিষ্ঠুর। কিন্তু তারা এ মুল্লুকে এল কেন, আর আমাদেরই বা আক্রমণ করলে কেন, এটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমাকেও তারা ধাঁধায় ফেললে দেখছি!"

বিমল বললে, "কোন ভাবনা নেই সর্দার, তোমার ধাঁধার জবাব এখনি পাবে", বলেই সে পকেট থেকে একটা ছোট বাঁশী বার করে খুব জোরে বাজালে।

পরমুহূর্তেই তাঁবুর ভিতর থেকে আস্কারি—অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীর দল বেগে বেরিয়ে এল।

বিমল হুকুম দিলে, "ঐ জঙ্গলের ভিতর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে কারা বর্শা ছুঁড়ছে। তাদের তাড়িয়ে দাও, আর পারো তো তাদের এখানে ধরে নিয়ে এস!"

রক্ষীর দল বন্দুক কাঁধে করে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে জঙ্গলের দিকে ছুটল।

গাটুলা বললে, "বা, বাবু-সাহেব, বা! আপনারা লোকজন নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছেন দেখচি। তাহলে গুপ্তধন না নিয়ে আর ফিরবেন না?"

বিমল বললে, "এই রকম তো আমাদের মনের ইচ্ছে। আর এই জন্যেই তো আমরা তোমার সাহায্য চাই।"

গাটুলা বললে, "সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো যখন আপনাদের দলে, তখন গাটুলা-সর্দার আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্রাট লেনানার গুপ্তধন তো ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে আব্দার ধরলেই পাওয়া যাবে? যার প্রাণের মায়া আছে, সেখানে সে যেতে পারে না।"

বিমল বললে, "আমরা হাসতে-হাসতে প্রাণ দিতেও পারি, নিতেও পারি সর্দার! কিন্তু একটা প্রাণ দেবার আগে দশটা প্রাণ নিয়ে মরব, এটা তুমি জেনে রেখ।"

গাটুলা বললে, "সাবাস বাবু-সাহেব! আপনার কথা শুনে সিংহ-দমন গাটুলা-সর্দার পরম তুষ্ট হল। কিন্তু—"

এমন সময় রক্ষীরা ফিরে এসে খবর দিলে, জঙ্গলের ভিতরে কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমল বললে, "তাহলে তারা পালিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা যাও।" তারপর গাটুলার দিকে ফিরে বললে, "কিন্তু কি বলছিলে সর্দার?"

গাটুলা বললে, "কিন্তু হুজুর, সম্রাট লেনানার গুপ্তধন যেখানে আছে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না।"

বিমল বললে, "তুমি কি বলছ সর্দার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সে গুপ্তধন কি শূন্যে আছে, না পাতালে আছে, যে, মানুষ সেখানে যেতে পারবে না?"

গাটুলা বললে, "হুজুর, এখন তো আকাশেও মানুষ যাচ্ছে, পাতালেও মানুষ যাচ্ছে; সুতরাং আকাশ-পাতালের কথা কি বলছেন? আকাশে কি পাতালে এ-গুপ্তধন থাকলে এতদিনে মানুষ নিশ্চয়ই তা লুটে আনত,—কিন্তু এ আকাশও নয়, আর পাতালও নয়, আর সেইটেই তো হচ্ছে দুঃখের কথা।"

বিমল কিঞ্চিৎ অধীর-স্বরে বললে, "সর্দার, তুমি তো বেশি কথার মানুষ নও, যা বলতে চাও, অল্প কথায় গুছিয়ে বল।"

গাটুলা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রহস্যময় ভাবে অস্ফুটস্বরে থেমে-থেমে বললে, "সম্রাট লেনানার সে-গুপ্তধন হচ্ছে, যখের ধন।"

—"যখের ধন?"

—"হ্যাঁ হুজুর, যখের ধন। কিন্তু এ এক-আধ জন যখ নয়,—হাজার-দু'হাজার যখ!"

—"কী তুমি বলছ, গাটুলা?"

গাটুলা তার ভয়-মাখানো দৃষ্টি দূরে—বহু দূরে—স্থাপন করে, কেমন যেন আচ্ছন্নভাবে বললে, "হাজার-দু'হাজার যখ—কতকাল, কত যুগ আগে থেকে কাবাগো-পাহাড়ের বিপুল সেই অন্ধকার গুহার ভেতরে বসে-বসে এই গুপ্তধনের উপরে কড়া পাহারা দিয়ে আসছে, তার ঠিক হিসেব কেউ জানে না! মানুষ তো ছার, বোধকরি দেবতা-দানবও সেখানে পা বাড়াতে ভরসা পায় না। তার ভেতরে তো দূরের কথা, কোন মানুষ তার আশ-পাশ দিয়েও হাঁটতে চায় না!...কতবার কত লোক গুপ্তধনের লোভে সেখানে গিয়েছে—কিন্তু যারা গিয়েছে, তারা গিয়েছেই, প্রাণ নিয়ে তাদের কেউ আর ফিরে আসেনি! এই তিরিশ বছর আগেই আট-দশ জন সায়েব অনেক তোড়-জোড় করে গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল। শোনা যায়, গুপ্তধনের সন্ধানও তারা পেয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! তারপর যে তাদের কি হল, কর্পূরের মতন তারা যে কোথায় উবে গেল কেউ তা বলতে পারে না। কেবল একজন সায়েবকে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা গিয়েছিল কিন্তু পাগল অবস্থায়।....যুগ-যুগ ধরে এই যে শত-শত লোভী মানুষ গুপ্তধন আনতে গিয়ে প্রাণ খুইয়েছে, গুহার বাইরে, চারিদিকের নিবিড় অরণ্যে-অরণ্যে, আজও তাদের অশান্ত আত্মা নাকি হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়! প্রতি রাত্রে নাকি তাদের অমানুষিক কান্না শুনে বাঘ-সিঙ্গীরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গর্জন ভুলে যায়—"

বিমলের পাশ থেকে হঠাৎ কে বলে উঠল, "বাবা, বল কি!"

বিমল ফিরে দেখে বললে, "এই যে, মানিকবাবু যে! আপনি কখন এলেন এখানে?"

—"আমি কখন এসেছি, আপনারা দেখতে পাননি, গল্প শুনতেই মত্ত হয়ে আছেন।...কিন্তু এ-লোকটি কে? এ যা বলেছে, তা কি সত্যি? সত্যি হলে তো ভারি সমস্যার বিষয়!"

—"কিছুই সমস্যার বিষয় নয়। কারণ আমি ভূত মানি না। আর যখের নাম শুনলেও ভয় পাবার ছেলে আমি নই।"

—"কিন্তু বিমলবাবু, আমি ভূতও মানি, যখেও বিশ্বাস করি।"

—"তাতে আমার কিছু এসে যায় না!"

—"কিন্তু আমার বিলক্ষণই এসে যায়। গুপ্তধনের লোভে ভূত-প্রেতের হাতে প্রাণ খোয়াতে আমি রাজি নই।"

—"কিন্তু মানিকবাবু, সে-সমস্যার সমাধান তো আমি আগেই করে দিয়েছি! আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে, আপনি তো অনায়াসেই দেশে চলে যেতে পারেন।"

—"ধন্যবাদ। কথাটা আপনি যত সহজে বলছেন, কাজে সেটা ততটা সহজ হবে না বোধহয়। এ তো মামার বাড়ির থেকে বাপের বাড়ি যাওয়া নয়, এ সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়া। তার ওপর বনের বাঘ-সিঙ্গীর কথা ছেড়ে দি, পথে যদি ঘটোৎকচের দলের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়, তাহলে—বাপ্‌রে—"

—"হুঁ, তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াবে, আন্দাজেই আমি সেটা বুঝতে পারছি। সুতরাং বেশি আর গোল করবেন না, সুড়্-সুড়্ করে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আমাদের সঙ্গে চলুন।"

মানিকবাবু কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "হা অদৃষ্ট, আমার কপালে শেষটা এই ছিল গা! সিঙ্গীর মুখ থেকেও বেঁচে ফিরেছি, কিন্তু এবারে ভূতের হাতে পড়েই আমার বুঝি দফা রফা হল!"

রামহরি এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিল। এতক্ষণে সে-ও এগিয়ে এসে বললে, "খোকাবাবু, মানিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, আর এ নতুন বিপদের ভেতরে তুমি যেয়ো না, লক্ষ্মীটি।"

গাটুলা মানিকবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এ ভদ্দরলোকটি কে, হুজুর?"

বিমল বললে, "ইনিই তোমার সেই সুরেনবাবুর ভাইপো।"

গাটুলা প্রকাণ্ড মুখে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে সবিস্ময়ে বললে, "সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো! অমন সাহসী লোকের এমন ভীতু ভাইপো! আমি বিশ্বাস করি না!"

বিমল বললে, "না সর্দার, বাঙালী কখনো ভীতু হয় না। মানিকবাবুও ভীতু নন, তবে দেশের জন্যে ওঁর মন কেমন করছে বলেই উনি এমনি সব নানান মিথ্যে ওজর তুলছেন।"

গাটুলা বললে, "ও, বুঝিছি! আমারও অমন হয়। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে গেলে বলব কি হুজুর, বৌ-এর জন্যে আমারও মন কেমন করে।" এই বলেই সে তার প্রকাণ্ড হাত দুখানা নিয়ে মানিকবাবুকে নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললে, "আপনি হচ্ছেন আমার প্রভু সুরেনবাবু-

হুজুরের—তাঁর আত্মা স্বর্গলাভ করুক—ভাইপো! আসুন, আপনাকে আমি আলিঙ্গন করি।"

বিমল বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাহলে গাটুলা-সর্দার, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি হবে না, বোধহয়? যে-সব বিপদ-আপদের কথা বললে, আমি বাঙালীর ছেলে, সে-সব বিপদ-আপদকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। বিপদকে আমি ভালবাসি, ছুটে গিয়ে বিপদের ভেতরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই! বিপদের কথা নিয়ে যারা বেশি মাথা ঘামায়, বিপদ আগে আক্রমণ করে তাদেরই!"

গাটুলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "সাবাস, সাবাস! এই তো মরদকা বাত্! আমি সাহসীর গোলাম, আপনারা যেখানে যাবেন, আমি সেইখানেই আপনাদের সঙ্গে যাব।"

বিমল বললে, "তাহলে কালকেই আমরা কাবাগো-পাহাড়ের দিকে যাত্রা করব। ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যে যেখানে আছে সকলকেই আমি আমন্ত্রণ করছি, তারা পারে তো আমাদের বাধা দিয়ে দেখুক!"

মানিকবাবু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "ও বাবা, বলেন কি!"

ষোলো

যক্ষপুরীর রক্ষী

চলেছে সকলে দল বেঁধে যক্ষপুরীর দিকে—যেখানে যুগ-যুগান্তরের গুপ্তধন ভাগ্যবানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে হাজার-হাজার যক্ষ সেই ধন-রত্নের উপরে বুক পেতে বসে আছে, যেখানে শত-শত অভিশপ্ত অশান্ত আত্মা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাসকে কাতর করে তুলেছে।

টাঙ্গানিকা হ্রদের ধার দিয়ে বিমলদের এই মস্ত দলটি কোলাহল করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছে! সর্বাগ্রে চলেছে গাটুলা-সর্দারের নিজের লোকজন,—গুনতিতে তারা পঁচাত্তরের কম-নয়! তারপর যাচ্ছে বিমলদের দল, সংখ্যায় তারাও একশো-চব্বিশ জন। আস্কারি বা বন্দুকধারী রক্ষীরা দলের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, কারণ কখন কোন্‌দিক থেকে বিপদ এসে হাজির হয় কেউ তা বলতে পারে না। আস্কারি ছাড়া অন্য সকলের কাছে বন্দুক নেই বটে, কিন্তু দলের সামান্য কুলিরা পর্যন্ত সশস্ত্র,—কারুর কাছে খালি বর্শা, কারুর কাছে বর্শা ও তীর-ধনুক দুই-ই। এ হচ্ছে আফ্রিকার বনপথ, এখানে অস্ত্র ছাড়া কেউ এক পা হাঁটতে ভরসা করে না।

মাঝে-মাঝে পাহাড়, মাঝে-মাঝে অরণ্য এবং মাঝে-মাঝে ধান, আখ, আলু বা অন্যান্য শাক-সব্জী ও শস্যের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা নদী এসে টাঙ্গানিকার বিপুল বুকের ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে। সে-সব জায়গায় আকাশে উড়ে পালাচ্ছে জল-মুর্গীর দল এবং জলে খেলা করছে কিম্ভূতকিমাকার হিপোপটেমাসের দল আর ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মস্ত-মস্ত কুমীর!

কিন্তু বন, পাহাড়, নদী ও শস্যক্ষেত পেরিয়ে অশ্রান্ত দেহে চলেছে এই দুই শতাধিক মনুষ্য,—পথের নেশা আজ যেন তাদের মনকে মাতিয়ে তুলেছে এবং কোথায় গিয়ে যে তাদের নেশার ঘোর কাটবে, দলের সেরা-সেরা দু-চারজন লোক ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

দলের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ফাঁপরে পড়েছেন বেচারা মানিকবাবু। তাঁর আরামের শরীর, কলকাতায় থাকতে মোটর ছাড়া তিনি এক পাও চলতে পারতেন না, আর হাঁটতে-হাঁটতে আজ তাঁর ননীর দেহের দুর্গতির সীমা নেই! মাঝে-মাঝে "ও বাবা, গেলুম যে" বলে তিনি ধপাস করে বসে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাতে থাকেন, কিন্তু হায় রে, আশ্ মিটিয়ে বেশিক্ষণ কি হাঁপাবারও যো আছে? দলের লোকগুলো এমন নিষ্ঠুর যে, তাঁর মুখ চেয়ে কেউ একটুও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না! কাজেই দলছাড়া হবার ভয়ে আবার তাঁকে উঠে হাঁসফাঁস করতে-করতে ছুটতে হয়। মনের ব্যথা কারুর কাছে প্রকাশ করেও লাভ নেই, কারণ তাঁর কথা শুনে বিমল ও কুমার খালি হা-হা করে হাসতে থাকে!

তবে টাঙ্গানিকার জলে যে-সব মাছ ও নদীর মুখে-মুখে যে-সব জল-মুর্গী পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মাংস যে অতীব উপাদেয়, এত দুঃখেও মানিকবাবুকে হাসিমুখে সে-কথা বারবার স্বীকার করতে হচ্ছে।

সেদিন তিনটে জল-মুর্গীর 'রোস্ট্' উদরস্থ করে মানিকবাবু প্রসন্ন মুখে ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে বললেন, "হ্যাঁ, এ পৃথিবীতে নিছক্ দুঃখ বলে যে কিছুই নেই, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

কুমার বললে, "এত-বড় সত্যি কথাটা ফস্ করে বুঝে ফেললেন কেমন করে মানিকবাবু?"

মানিকবাবু ভুঁড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "ও বাবা, তা আর বুঝব না? এই হাড়ভাঙা হাঁটুনিতে আর খাটুনিতে এতদিনে নিশ্চয়ই আমি অক্কা লাভ করতুম, কিন্তু বেঁচে আছি এই চপ্, কাট্‌লেট, রোস্টের জোরে। এমনি পেট-ভরা খানা যদি জোটে—"

—"তাহলে কাবাগো-পাহাড়ের ভূতের দলও আপনার কিছুই করতে পারবে না, কেমন মানিকবাবু, আপনি এই কথাটি বলতে চান তো?"

মানিকবাবু অমনি মুখ ম্লান করে বললেন, "ঐ তো! ঐ তো আপনাদের দোষ! সুখের সময়ে ও-সব ভূত-প্রেতের কথা মনে করিয়ে দেন কেন, বদ্‌হজম হবে যে!"

—"যাদের নামেই আপনার বদ্‌হজম হয়, তাদের কাছে গেলে আপনি কি করবেন?"

—"ও বাবা, বলেন কি! আমি যাব তাদের কাছে? আমার বয়ে গেছে! পাতে দু-চারখানা কাট্‌লেট্‌-টাট্‌লেট্‌ দিয়ে আপনারা যদি আমাকে আড়ালে কোন নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে রাখেন, তাহলেই আমি খুশি থাকব! ভূত-প্রেতের সঙ্গে আলাপ করবার শখ আমার মোটেই নেই।"

* * * * *

কাবাগো-পাহাড়ের কালো চুড়ো দেখা গেল, সন্ধ্যা তখন হয়-হয়!

সূর্য অস্ত যাবার পরেই পশ্চিম আকাশের রক্তাক্ত বুকের উপরে নিবিড় কাজলের প্রলেপের মতন একখানা প্রকাণ্ড মেঘের কালো আবরণ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

গাটুলা বললে, "বিমলবাবু, এইবারে আপনারা এমন একটা দৃশ্য দেখবেন, জীবনে যা কখনও দেখেননি। টাঙ্গানিকার ওপরে মেঘের খেলা দেখলে সায়েবরা ভারি সুখ্যাতি করে। আমি সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমিও বলচি, সত্যিই সে এক আশ্চর্য দৃশ্য!"

বিমল বললে, "কিন্তু গাটুলা, ঝড়-বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের ছাউনি পাততে হবে যে!"

গাটুলা বললে, "আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমার কাজে আজ পর্যন্ত কেউ খুঁৎ ধরতে পারেনি। ছাউনি পাতবার ব্যবস্থা না করেই কি মেঘের খেলা দেখে আশ্চর্য হতে এসেছি?"

ঘন-ঘন-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘখানা ক্রমেই এগিয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে একটা বিরাট কৃষ্ণদৈত্য যেন অগ্নিময় দন্ত বিকাশ করতে করতে সারা-আকাশকে গিলে ফেলতে চাইছে!...অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আকাশ মেঘে চাপা পড়ে গেল, টাঙ্গানিকার নীলিমা দেখতে-দেখতে কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গুরুগুরু বাজের আওয়াজে সৃষ্টির আর-সব শব্দ যেন বোবা হয়ে পড়ল এবং বাজের ডাক শুনে যেই ঝড়ের ঘুম ভাঙল, অমনি অরণ্যের যত গাছপালা পাগল হয়ে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে।

অশান্ত টাঙ্গানিকার জলে সে কী তোলপাড়! পাতাল-কারাগারের ভিতর থেকে যেন কোন্ অতিকায় দানব জলের ঢাকা ঠেলে উপরে উঠতে চায়।

মেঘের পটে বিদ্যুৎ-লতার ডালপালাগুলো থেকে-থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেখা দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে, তারা কোন অশরীরীর অদৃশ্য দেহের জ্বলন্ত সব শিরা-উপশিরা।

গাটুলা ঠিক বলেছে, মেঘের যে এমন ঘনকাজল রং হতে পারে, বিদ্যুতের তীব্র খেলা যে এত দ্রুত হতে পারে এবং বজ্রের গর্জন যে এত ভীষণ ও উচ্চ হতে পারে, বিমল বা কুমার আগে তা জানত না! কিন্তু এ ভয়াবহ সৌন্দর্য তারা বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলে না, বিষম ঝড়ের ঝাপ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তারা বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের তলায় যেখানে ছাউনি পাতা হয়েছে, সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত হল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি শুরু হল।

তাঁবুর ভিতরে তখন পরামর্শ-সভা বসেছে।

বিমল বলছিল, "এই তো আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। এখন—"

বাধা দিয়ে গাটুলা বললে, "আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি বটে, কিন্তু গুপ্তধন যত তফাতে ছিল, ঠিক তত তফাতেই আছে!"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, কাবাগো-পাহাড়ে উঠতে গেলেই গুপ্তধনের রক্ষীরা আমাদের আক্রমণ করবে। কোন বিদেশীর সে পাহাড়ে ওঠবার অধিকার নেই, কারণ, সে হচ্ছে পবিত্র পাহাড়।"

—"এই রক্ষীরা কোন্ জাতের লোক?"

—"তাদের দেহে জুলু-রক্ত আছে বটে, কিন্তু তারা খাঁটি জুলু নয়।"

—"তারা কি দলে বেশ ভারি?"

—"তা হাজার-দুয়েক হবে। তবে ভরসা এই, তাদের অস্ত্র কেবল ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, যুদ্ধ-কুঠার আর তীর-ধনুক। তাদের দলে দু'একটার বেশি বন্দুক নেই—তাও সেকেলে বন্দুক।"

—"এ খুব ভালো কথা। তোমার আর আমাদের দলে বন্দুক আছে চল্লিশটা। তবে আর ভয় কিসের?"

—"তারা যদি পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর আর বর্শা ছোঁড়ে, তাহলে কি করবেন?"

—"তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

—"মানলুম। কিন্তু রক্ষীদের হাত থেকে পার পেলেও রক্ষে নেই, তারপর আছে যক্ষের দল, তারা পাহারা দেয় গুহার ভিতরে। সেই গুহাকে খালি গুহা বললে ভুল হবে, সে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক গুহা-নগর। সে গুহা-নগরে কি আছে আর কি নেই, আমি তা জানি না—কেউ তা জানে না। আমি সেই গুহা-নগরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি। গুহার রক্ষীরাও ভিতরে ঢুকতে পায় না, ঢুকতে সাহসও করে না। কারণ ভিতরে আছে যক্ষের দল!"

বিমল অধীর স্বরে বললে, "সর্দার, আমি বার-বার বলছি, ও-সব যখ-টক আমি বিশ্বাস করি না, সুতরাং ও-সব বাজে কথা শুনতেও আমি রাজি নই। আজ তুমি বিশ্রাম কর-গে যাও, কাল সকালে আমরা কাবাগো-পাহাড়ে গিয়ে উঠব,—কারুর বাধা মানব না!"

গাটুলা-সর্দার আর কোন কথা না বলে বাইরে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

রাত্রে হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল—তার গা ধরে কে নাড়া দিচ্ছে।

চোখ মেলে দেখে, একটা লণ্ঠন হাতে করে গাটুলা-সর্দার তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

—"কি ব্যাপার সর্দার? এমন সময়ে ডাকাডাকি কেন?"

—"একবার বাইরে আসুন!"

বিমল বিছানা ছেড়ে গাটুলার সঙ্গে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত। তখনো অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছে ও মাঝে-মাঝে বাজ ডাকছে।

গাটুলা বললে, "কিছু শুনতে পাচ্ছেন?"

—"হ্যাঁ, বাজ ডাকছে!"

—"বাজ নয়, বাজ নয়! ভালো করে শুনুন।"

বিমল কান-পেতে শুনতে লাগল। দূরে,—খুব দূরে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে!

—"হুঁ, একটা শব্দ শুনছি বটে। ও কিসের শব্দ, সর্দার?"

—"অসংখ্য ঢাক-ঢোলের আওয়াজ!"

—"ঢাক-ঢোল! এই নিবিড় বনে ঢাক-ঢোল বাজায় কারা?"

—"কাবাগো-পাহাড়ের রক্ষীরা। তারা যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে।"

—"কেন?"

—"যুদ্ধের বাজনা বাজাতে-বাজাতে তারা আমাদের দিকেই আসছে। তারা

নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে যে, গুপ্তধনের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্যে আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি।"

দূরের ঢাকের আওয়াজ ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল,—ক্রমে আরো, আরো স্পষ্ট!

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্! যেন চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোল বাজাতে-বাজাতে তালে-তালে পা ফেলে কারা এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে!

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্! ক্রমে সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট কোলাহলও শোনা গেল। খানিক পরে বোঝা গেল, তা কোলাহল নয়—বহুকণ্ঠের সঙ্গীত! যেন হাজার-হাজার কণ্ঠ দামামার তালে-তালে সুগম্ভীর যুদ্ধসঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীত গাইছে।

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দম্! ঢাক-ঢোলের শব্দে আর ঐকতান-সঙ্গীতে ক্রমে সারা বনভূমি গম্-গম্ করতে লাগল! তারপর আবার আর-এক শব্দ! ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুক যেন কাঁপতে লাগল—টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্! মাটির উপরে তালে-তালে পড়ছে হাজার-হাজার সৈনিকের পা!

গাটুলা হাসতে-হাসতে বললে, "এখন বুঝছেন বিমলবাবু, গুপ্তধনের আশা কত-বড় দুরাশা?"

বিমল চুপ করে দেখতে লাগল, অন্ধকারে আবছায়ার মতো দলে-দলে হাতি, গণ্ডার, হিপো, সিংহ, হায়েনা, হরিণ, জিরাফ ও শৃগালেরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে। বনের ভিতরে কত-বড় বিরাট বাহিনী দেখে যে তারা এতটা ভয় পেয়েছে, সে-কথা বুঝতে বিমলেরও বিলম্ব হল না!

তারপরে বন-জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক দূরে দেখা গেল চার-পাঁচশো মশালের আলো।

গাটুলা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "বিমলবাবু, এখনো প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় আছে!"

বিমল প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে গাটুলার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাঙালীর ছেলে প্রাণ নিয়ে পালাতে শেখেনি, সর্দার! আমরা যুদ্ধ করব!"

গাটুলা বিমলকে জড়িয়ে ধরে বললে, "বাহাদুর মরদের বাচ্চা, তোমার সঙ্গে মরেও আমোদ পাওয়া যাবে!"

বিমল বিপদ জানাবার জন্যে বাঁশী বার করে খুব জোরে ফুঁ দিলে—

এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর ভিতরে দুশো লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

সতেরো
ভুঁইফোঁড় বিপদ

ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ পা পড়ে মাটির উপরে তালে-তালে,—আর টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ কাঁপতে থাকে পৃথিবীর বুক! আর সঙ্গে-সঙ্গে বেজে ওঠে শত-শত ঢাকের বাদ্যি!

বিমলের সঙ্গের দুই শত লোক বিছানার ওপরে সচকিতে জেগে বসে দুরু-দুরু প্রাণে কান পেতে শুনতে লাগল, সেই দুই হাজার অসভ্য বন্য-সৈনিকের চার হাজার পায়ের শব্দ ও চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোলের বিষম গণ্ডগোল!

আবার বিমলের বাঁশী বেজে উঠল! দুই শত লোক তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল!

শত্রুদের অসংখ্য মশালের সামনে থেকে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার ক্রমেই পিছু হটে আসতে লাগল।

খুব চিৎকার করে বিমল বললে, "কেউ আলো জ্বেলো না! বন-জঙ্গলের আড়ালে গা ঢেকে সবাই ছড়িয়ে পড়ে দাঁড়াও! প্রত্যেক দু-তিনজন লোকের পরে এক-একজন করে বন্দুকধারী আস্কারি থাক্! আর গাটুলা-সর্দার! তুমি দেখ আমার হুকুম মতো কাজ করা হয় কিনা।"

দূরে-দূরে বনের আলোকিত অংশে দলে-দলে কালো-কালো প্রায়-ল্যাংটো মূর্তি দেখা গেল। তাদের হাতের চক্‌চকে বর্শা ও তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্র ক্রমাগত বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে! মূর্তির পরে মূর্তির সারি—শত্রুদের যেন অন্ত নেই! তারা ঢোল বাজাচ্ছে আর নৃত্য করছে, প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে আর গান গাইছে। সারা পৃথিবীর শ্মশান-মশানকে ভূতশূন্য করে আজ যেন সমস্ত ভূত এই জঙ্গলে এসে একজোট হয়েছে।

গাটুলা একদৃষ্টিতে শত্রুদের দিকে তাকিয়ে একমনে কি ভাবছিল।

বিমল তার গা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, "সর্দার, এখন আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই,—যা বললুম কর।"

গাটুলা সহাস্যে বললে, "বিমলবাবু, তুমি তাহলে সত্যিই যুদ্ধ করবে?"

বিমল বললে, "যুদ্ধ করব না তো কি করব? এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরতেও পারব না, আর কাপুরুষের মতন পালাতেও পারব না!"

গাটুলা বললে, "আচ্ছা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, আর আমি কি করি

দেখ!"—এই বলে সে ফিরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে, "বন্ধুগণ! তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁবু তুলে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। তারপর আলোগুলো জ্বেলে ফেলো। তারপর খুব চিৎকার করতে-করতে যে-দিক দিয়ে আমরা এসেছি সেইদিকেই ছুটতে শুরু কর।"

বিমল বললে, "সর্দার, সর্দার! এ তুমি কী বলছ? আমরা পালাবার জন্যে এতদূর আসিনি!"

গাটুলা কঠিন স্বরে বললে, "বিমলবাবু, চুপ কর, আমাকে বাধা দিও না!...খামিসি, খামিসি!"

একজন আরবী-লোক ছুটে গাটুলার সামনে এসে দাঁড়াল।

গাটুলা বললে, "খামিসি, তুমি আমার ডান হাত, সিংহদমন গাটুলা-সর্দারের কথা মতো কাজ করতে তুমি পারবে। এই সমস্ত লোকের ভার আমি তোমাকেই দিলুম। এদের দিয়ে তুমি খুব সোরগোল করতে-করতে পিছিয়ে পড়ো আর মাঝে-মাঝে বন্দুক ছোঁড়ো—কিন্তু খবর্দার, দাঁড়িয়ে কোথাও লড়াই করো না। হিপো-নদীর ধারে সেই যে গুপ্তস্থান, তার কথা তুমিও জানো। একেবারে সদলবলে সেইখানে গিয়ে হাজির হও,—সেখানে গেলে শত্রুরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। সেইখানে গিয়ে তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।"

খামিসি বললে, "যো হুকুম।"

কুমার এগিয়ে এসে বললে, "সর্দার, আমি কিন্তু পালানো-দলে নেই, পালাতে কোনদিন শিখিনি।"

রামহরি বললে, "কে পালাবে, আর কে পালাবে না, আমি তা জানতে চাই না। আমি কেবল খোকাবাবুর সঙ্গে থাকতে চাই।" এই বলে সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গাটুলা হেসে বললে, "আমি যা করব, তোমরাও তাই করবে। তোমরা যে পালাতে চাইবে না, সে কথা আমিও জানি!"

ইতিমধ্যে বনের ভিতর থেকে তাঁবুগুলো অদৃশ্য হয়েছে, এবং পেট্রোলের উজ্জ্বল লণ্ঠনগুলো চতুর্দিক আলোকিত করে তুলেছে!

শত্রুরা ততক্ষণে আরো কাছে এসে পড়েছে!

আলো দেখে তাদের চিৎকার, নৃত্য, আস্ফালন ও ঢাকের বাদ্যি দ্বিগুণ হয়ে উঠল, দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল।

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, "সর্দার, তোমার উদ্দেশ্য কি, আগে আমাকে বল।"

গাটুলা বললে, "আমাকে কিছুই বলতে হবে না। এখুনি যা হবে, চোখের সামনেই তুমি তা দেখতে পাবে।"

খামিসি তখন তার লোকজনদের নিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছুটতে শুরু করেছে এবং আস্কারিরা মাঝে মাঝে শত্রুদের লক্ষ্য করে বন্দুকও ছুঁড়ছে!

গাটুলা বললে, "বিমলবাবু, এখন আমাদের এক-একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে পড়া উচিত। শত্রুরা আমাদের দেখতে পেলে সব কৌশলই ব্যর্থ হবে।"

বিমল, কুমার, রামহরি ও গাটুলা এক-একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। বাঘাও কুমারের সঙ্গ ছাড়লে না।

ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে বিমল দেখতে লাগল, খামিসির সঙ্গে তাদের নিজেদের লোকজনেরা যেই উল্টোদিকে পলায়ন শুরু করলে, শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে অমনি একটা গগনভেদী জয়ধ্বনি জেগে সেই বিশাল অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুললে। সঙ্গে-সঙ্গে শত্রুপক্ষের গতি গেল বদ্‌লে। খামিসির লোকজনেরা যে-দিকে পালাচ্ছে, তারাও সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করলে!

এতক্ষণে বিমল গাটুলার চাতুরি বুঝতে পারলে! গাটুলা বিনাযুদ্ধে ও রক্তপাতে কাবাগো-পাহাড়ে যাবার পথ পরিষ্কার করতে চায়। শত্রুপক্ষ এখন খামিসির দলের পিছনেই লেগে থাকবে এবং এই অবকাশে তারাও নিরাপদে— বিনা বাধায় কাবাগোর রক্ষিহীন রত্নগুহার দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।

গাটুলার এই আশ্চর্য চালাকি দেখে বিমল একেবারে অবাক্ হয়ে গেল! এবং এই বৃদ্ধ সর্দারের জন্যে তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঞ্চার হল।

রত্ন-গুহার যাত্রা-পথ পরিষ্কার হল বটে, কিন্তু গাটুলার কথা যদি সত্য হয়, তবে সেই গুহার ভিতরে কোন-একটা অলৌকিক বিপদ নিশ্চয়ই তাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! কী যে সেই বিপদ এবং কি করে যে সেই বিপদ এড়িয়ে কেল্লা ফতে করে আবার তারা ফিরে আসবে এবং কেমন করে তখন আবার তারা দুই হাজার উন্মত্ত রক্ষী-সৈন্যকে বাধা দান করবে, বিমল বসে বসে সেই কথাই খালি ভাবতে লাগল।

এ দিকে অরণ্য আবার ধীরে-ধীরে নীরবতায় ও অন্ধকারের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে!

বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল কেবল একটা অস্পষ্ট গোলমাল ও মাঝে-মাঝে বন্দুকের শব্দ এবং একটা সুদীর্ঘ আলোক-রেখার আভাস। শত্রুরা খামিসির দলের পিছনে বোকার মতন ছুটছে এবং কালকেও হয়তো এ ছোটাছুটি শেষ হবে না!

বিমল একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছনেও কে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে!

সচমকে পিছনে ফিরে বিমল কিছুই দেখতে পেলে না, অন্ধকার শুধু কালো কষ্টিপাথরের মতন জমাট হয়ে আছে!

তার ডান পাশে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হল—বিমলও চট্ করে পাশ ফিরে বসল। চারিদিকে হাত বড়িয়ে একবার হাতড়ে দেখলে, কিন্তু হাতে তার কিছুই ঠেকল না!

ঝোপের বাহির থেকে গাটুলার গলা শোনা গেল—"সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ্!"

বিমল উঠে দাঁড়াল এবং সেই সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটা দেহ বিপুল বেগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অতর্কিত আক্রমণের টাল সামলাবার আগে বজ্রের মতন দু'খানা হাত তার টুঁটি টিপে ধরলে এবং প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিমল সেই অদৃশ্য বাহুপাশ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারলে না,—দেখতে-দেখতে তার দম বন্ধ হয়ে এল, তার দুই চোখ কপালে উঠল!

কিন্তু সেই অবস্থাতেও বিমল বুঝতে পারলে, যে তাকে ধরেছে সে জন্তুও নয়, মানুষও নয়, অথচ তার গায়ে ও হাতে জানোয়ারের মতন লম্বা-লম্বা লোম আছে।

ধীরে-ধীরে এই অমানুষিক শত্রুর সাংঘাতিক আলিঙ্গনের মধ্যে বিমলের সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে গেল।

আঠারো

রত্ন-গুহার বিভীষিকা

গাটুলা চেঁচিয়ে ডাকলে, "সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ্!"

কুমার, রামহরি ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ঝোপ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তারপরেই "ওরে বাপ্‌রে" বলে বিকট এক আর্তনাদ করে একটা গাছের উপর থেকে কে মাটির উপরে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, মানিকবাবু।

কুমার বললে, "একি মানিকবাবু, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

মানিকবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ঐ গাছের ওপরে!"

—"গাছের ওপরে! কেন?"

—"শত্রুদের আসতে দেখে আমি ঐ গাছের ওপরে উঠে লুকিয়েছিলুম।... কিন্তু—"

—"কিন্তু কি?"

মানিকবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কিন্তু তখন কি আমি জানতুম যে, গাছের পাশের ঝোপেই ভূতের বাসা আছে?"

কুমার বললে, "কি আপনি বলছেন মানিকবাবু, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?"

মানিকবাবু বললেন, "পাগল এখনো হইনি বটে, তবে আপনাদের পাল্লায় পড়ে আমার পাগল হতেও আর বেশি দেরি নেই বোধ হয়। আমি দেখলুম স্বচক্ষে ভূত, আর আপনি আমাকে বলছেন, পাগল?"

—"যাক বাজে কথা। আপনি কি দেখেছেন আগে তাই বলুন!"

—"একটু আগেই মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ফুটেছিল। সেই আলোতে দেখলুম, ঐ ঝোপের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কালো ভূত বেরিয়ে এক দৌড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!"

গাটুলা সেই ঝোপের ভিতরে ছুটে গেল এবং বিমলের মূর্ছিত দেহ কোলে নিয়ে তখনি আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

* * * * *

সকলের সেবা-শুশ্রূষায় জ্ঞান লাভ করে বিমল সব কথা খুলে বললে।

গাটুলা বললে, "জন্তুও নয় মানুষও নয়—আর তার গায়ে জানোয়ারের মত লম্বা লম্বা লোম। বুঝেছি, এ হচ্ছে সেই জীবটা—সিংহদমন গাটুলা-সর্দারকে যে চুরি করতে এসেছিল।"

মানিকবাবু বললেন, "ভূত, ভূত,—আস্ত ভূত, মস্ত ভূত! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

রামহরি আড়ষ্টভাবে বললে, "রাম, রাম, রাম, রাম!"

কুমার বললে, "এ আর কেউ নয়, সেই ঘটোৎকচ আবার আমাদের পিছনে লেগেছে!"

বিমল বললে, "কুমার, তুমি ঠিক বলেছ, এ নিশ্চয়ই সেই ঘটোৎকচ! এবারে আমি হেরেছি। সে এসেছিল গুপ্তধনের ম্যাপ নিতে—"

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, "তারপর?"

—"এবারে ম্যাপ সে নিয়েও গেছে!"

—"সর্বনাশ!"

সকলে খানিকক্ষণ নীরবে হতাশভাবে বসে রইল।

গাটুলা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে, "ভেবেছিলুম

আমরাই খুব চালাক! কিন্তু তা নয়, আমাদের আসল শত্রুরাও চালাকিতে বড় কম যায় না দেখছি। তারা গুপ্তধনের রক্ষীদের আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের দলবলকে এখান থেকে সরিয়েছে! তারপর ম্যাপ চুরি করে নির্বিবাদে গুপ্তধনের দিকে ছুটেছে।"

মানিকবাবু বললেন, "আর আমাদের এখন কাদা ঘেঁটে, দেহ মাটি আর মুখ চুন করে খালি-হাতেই ফিরতে হবে! আলেয়ার পিছনে ছুটলে এমনিই হয়!"

গাটুলা বললে, "কিন্তু বাবুজী, আমি এখনো হাল ছাড়িনি। গুহার ভেতরে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো কি আছে আমি তা জানি না, গুপ্তধন কোন্‌খানে লুকানো আছে তাও আমি বলতে পারি না, কিন্তু সেই গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছবার এমন একটি গুপ্তপথ আমি জানি, যে-পথ দিয়ে গেলে শত্রুদের অনেক আগেই আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারব!"

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তবে তাই চল সর্দার, আর এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয়!"

* * * * *

অন্ধকারের সঙ্গে অস্পষ্ট চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে গিয়ে বনের চারিদিকে তখন অদ্ভুত রহস্যের আবছায়া সৃষ্টি করেছে। বিমলরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের পথ দিয়ে ছুটছে আর ছুটছে।

কাবাগো-পাহাড়ের উঁচু-নিচু কালো কালো চুড়োগুলো ক্রমেই চোখের খুব কাছেই এগিয়ে এল।

গাটুলা একটা ঘন বনের ভিতরে ঢুকে বললে, "এখন আমাদের এই বনের ভেতর দিয়ে আধ-মাইল পার হতে হবে। তার পরেই সামনে গুহায় ওঠবার পাহাড়ে-পথ পাব।" তারপর চুপি-চুপি আবার বললে, "এ বনকে সবাই এখানে 'ভূতের বন' বলে থাকে, এর মধ্যে ভয়ে কেউ ঢোকে না।"

টর্চের আলো জ্বেলেও পদে পদে হোঁচট খেয়ে খুব কষ্টে সকলে সেই জঙ্গলাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো—সে পথ কোন দিন চাঁদ-সূর্যের মুখ দেখেনি। সে পথের একমাত্র আত্মীয় হচ্ছে নিবিড় অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে বাস করে যে-সব অজ্ঞাত জীব, আচম্বিতে আজ এখানে মানুষের আবির্ভাব দেখে তারা সবাই মিলে অজানা ভাষায় কি যেন কানাকানি করতে লাগল! হঠাৎ বিমলের পায়ে শক্ত কি একটা ঠেক্‌ল, হেঁট হয়ে দেখলে, একটা নরকঙ্কাল!

কুমার বললে, "কিন্তু ওর মুণ্ডটা কে কেটে নিয়ে গেছে?"

যেন তার প্রশ্নের উত্তরেই কাছ থেকে কে বিকট স্বরে হেসে উঠল—হা হা হা হা হা হা হা—সে হা হা অট্টহাসি যেন আর থামবে না!

টর্চের আলোতে দেখা গেল, একটা কঙ্কালসার উলঙ্গ ভীষণ মূর্তি ক্রমাগত হাসতে হাসতে যে দিক দিয়ে বিমলরা এসেছে, সেই দিকে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে। সে মূর্তি এতক্ষণ এই গভীর নিশীথে, এই ভয়ানক স্থানে কি যে করছিল, কেউ তা বুঝতে পারলে না—বুঝতে চেষ্টাও করলে না।

গাটুলা বিকৃত স্বরে তাড়াতাড়ি বললে, "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

সবাই এগিয়ে চলল এবং পিছনে অনবরত উঠতে লাগল সেই বিশ্রী অট্টহাস্য!

*　　*　　*　　*　　*

হঠাৎ একটা ফর্সা জায়গায় বেরিয়ে এসে গাটুলা বলে উঠল, "ভূতের বন শেষ হল, ঐ হচ্ছে গুহায় ওঠবার পথ!"

সবাই দেখলে পঁচিশ-ত্রিশ হাত তফাতে দৃষ্টিপথ রোধ করে মস্ত একটা পাহাড়, তার নিচে অন্ধকার আর উপরে ম্লান চাঁদের আলো!

খোলা হাওয়ায় হাঁপ ছাড়বার জন্যে মানিকবাবু ধপাস্ করে বসে পড়লেন, কিন্তু বিমল একটানে তাঁকে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বললে, "এখন জিরুবার সময় নয় মানিকবাবু! আসুন আমাদের সঙ্গে!"

গাটুলার পিছনে পিছনে সবাই পাহাড়-পথ ধরে উপরে উঠতে শুরু করলে।

কুমার শুধোলে, "আমাদের কতটা উপরে উঠতে হবে?"

গাটুলা বললে, "প্রায় হাজার ফুট। কিন্তু কথা কয়ো না, চুপি-চুপি ওঠ!"

খানিকক্ষণ সকলে নিঃশব্দে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

তারপর একটা বাঁকের মুখে এসে গাটুলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চুপি-চুপি বললে, "ঐ দেখ রত্ন-গুহার মুখ।...গেলবারে সুরেনবাবুর সঙ্গে ঐ পর্যন্ত আসতে গিয়ে আমাদের দলের অনেক লোক মারা পড়েছিল—কিন্তু তবু আমরা এর বেশি আর এগুতে পারিনি। এবারে গুহার রক্ষীরা বোকার মতো খামিসির দলের পিছনে ছুটছে বলেই আমরা নিরাপদে এতটা আসতে পেরেছি,—নইলে দেখতে, গুহায় ওঠবার পথে দলে দলে লোক পাহারা দিচ্ছে! এখনও একজন রক্ষী সামনে বসে আছে, দাঁড়াও, আগে ওকে শেষ করি!" এই বলেই গাটুলা তার বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল!

বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে, "সর্দার, অকারণ নরহত্যা কোরো না।

লোকটা তো দেখছি বসে-বসেই ঘুমে ঢুলছে, ওর ব্যবস্থা করতে আমার দেরি লাগবে না।”

পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে বিমল নিঃশব্দে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল, তারপর বাঘের মতন লাফ মেরে গুহার রক্ষীর উপর গিয়ে পড়ল এবং দেখতে-দেখতে তার মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে, তারপর তাকে তুলে আড়ালে সরিয়ে রেখে এল।

গুহার মুখ থেকেই দেখা গেল, ভিতরে ঘুট্-ঘুট্ করছে অন্ধকার ও থম্-থম্ করছে নিস্তব্ধতা।

এই সেই রত্ন-গুহা! যার সন্ধানে ঘরমুখো বাঙালীর ছেলে পদে-পদে বিপদকে আলিঙ্গন করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে! এই সেই রত্ন-গুহা! যার মৃত্যু-ভরা অন্ধকার বুকের নিচে জ্বলছে সাত-রাজার ধন হীরা-মানিক। এই সেই রত্ন-গুহা। খানিকক্ষণ আগেও যার কাছে এসে দাঁড়াবার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না, তারই দ্বার আজ অরক্ষিত অবস্থায় সামনে খোলা রয়েছে!

—“ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন” বলে গাটুলা-সর্দার সেই জমাট অন্ধকারের গর্ভে সর্বপ্রথম প্রবেশ করলে।

তারপরে পরে-পরে ঢুকল বিমল, কুমার, রামহরি ও মানিকবাবু। তাদের প্রত্যেকের বাঁ-হাতে টর্চ ও ডান হাতে রিভলভার। বাঘাও অবশ্য তাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

গুহার মুখে পথ এত সরু যে, একজনের বেশি লোক পাশাপাশি যেতে পারে না। বিমল বুঝলে, এখানে একজন লোক দাঁড়ালে বাইরের অসংখ্য লোকের সঙ্গে একলাই যুঝতে পারে।

হঠাৎ তারা খুব একটা চওড়া জায়গায় এসে হাজির হল। উপরে টর্চের আলো ফেলে তারা দেখলে, ছাদ যে কত দূরে চলে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই! তারপর টর্চের আলো সামনে—নিচের দিকে ফেলেই সকলে আঁৎকে ও চমকে উঠল!

সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি-সারি অগণ্য লোক। তাদের পরনে যোদ্ধার বেশ,—কোমরে তরবারি, এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে চক্‌চকে বর্শা!

সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে—যেদিকেই আলো পড়ে, সেই দিকেই যোদ্ধার পর যোদ্ধা, সংখ্যায় তারা কত হাজার, তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়!

এত লোক এখানে গায়ে-গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে, তবু একটি টুঁ শব্দ

পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে, চোখে পলকও নেই, কোন ভাবও নেই এবং দেহও একেবারে পাথরের মূর্তির মতো স্থির ও নিশ্চল! ঊর্ধ্বে হস্ত তুলে, ডান-পা বাড়িয়ে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বর্শা নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—কিন্তু কারুর হাত একটুও কাঁপছে না, বর্শার ডগাটুকু পর্যন্ত নড়ছে না।

সে এক বিভীষিকাময় অস্বাভাবিক দৃশ্য! তার সামনে দাঁড়ালে অতি বড় সাহসীর বুকও ভয়ে নেতিয়ে পড়বে!

উনিশ

রত্ন-গুহার জাগরণ

টর্চের আলো নিবিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করলে,—কিন্তু গুহার ভিতরে কোনরকম শব্দ শোনা গেল না।

তারা প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল, শত-শত তীক্ষ্ণ বর্শা বা তরবারির তীব্র আঘাত; কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কেউ তাদের আক্রমণ করলে না!

চারিদিক এত নিঃশব্দ যে, কেউ সন্দেহই করতে পারবে না, রণসাজে সজ্জিত হাজার-হাজার যোদ্ধা এই বিরাট গুহার মধ্যে শত্রুসংহারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! অস্বাভাবিক সেই নিঃশব্দতা!

সে অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পেরে বিমল আবার টর্চ জ্বেলে তার আলো চতুর্দিকে নিক্ষেপ করলে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! শত্রুরা কেউ এক পদও অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হয়নি, তাদের মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গিও একটুও বদলায়নি—ঠিক তেমনি করেই বর্শা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো!

এও কি সম্ভব! অবাক্ ও হতভম্ব হয়ে সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল!

বিমল রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দু'পা এগিয়ে গেল,—শত্রুদের জনপ্রাণীর দেহে তবু এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না!

তবে?...তবে কি এরা মানুষ নয়? তবে কি সত্যিই এরা যখ....রত্ন-গুহার প্রেত-রক্ষী, গাটুলা-সর্দারের মুখে যাদের কথা তারা শুনেছিল?

হঠাৎ গাটুলা-সর্দার বলে উঠল, "হয়েছে! এতক্ষণে মনে পড়েছে! ওরে আমার পোড়া মন, বুড়ো হয়ে তুই সব ভুলে যাস্?"

—"কি মনে পড়েছে, সর্দার?"

—"এদেশের এক অদ্ভুত রীতি আছে। গুহার বাইরে যে-সব রক্ষী-সৈন্য পাহারা দেয়, বেঁচে থাকতে তারা এই গুহার ভেতরে ঢুকতে পায় না। কিন্তু তাদের মৃত্যু হলে পর তাদের দেহকে গুহার ভেতরে নিয়ে আসা হয়। তারপর প্রাচীন মিশরে যে উপায়ে 'মমি' তৈরি করা হত, তেমনি কোন উপায়ে তাদের চিরদিনের জন্যে রক্ষা করা হয়।...এ রীতির কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলুম, কিন্তু এতক্ষণ সে-কথা আমার মনে পড়েনি। ওরে আমার পোড়া মন, হ্যাঁক থুঃ, তোর গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!"

মানিকবাবু এতক্ষণ আতঙ্কে দুই চোখ মুদে, অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে মনে-মনে ইষ্টদেবতার নাম জপছিলেন; এখন গাটুলার কথা শুনে সহসা চোখ খুলে বললেন, "তাহলে সামনে যাদের দেখছি, তারা জ্যান্ত মানুষ নয়,—'মমি'?"

রামহরির দুই চোখ তখনো কপালে উঠেই আছে! সে বললে, "মামী? জ্যান্ত মানুষ নয়, মামী! ওরে বাবা, মামী আবার কোন্‌দেশী ভূত গো?"

মানিকবাবু সগর্বে বললেন, "আহা, মামী নয়, মামী নয়,—'মমি'! বাঘ-সিঙ্গীর দেহকে 'জিইয়ে' বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখা হয় দেখেছ তো? 'মমি'ও তেমনি মরা-মানুষের 'জিয়ানো' দেহ! তোমার কিছু ভয় নেই রামহরি, তুমি শান্ত হও! আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি কি একটুও ভয় পেয়েছি?"

রামহরি বললে, "ভয়? ভয় আমি আর কারুকে করি না, ভয় করি খালি ভূতকে! খোকাবাবু জানে, আমার এই বুড়ো হাড়ে এখনো ভেল্কি খেলাতে পারি,—দু-চারটে জোয়ান পাটাকে এখনো কুপোকাৎ করবার জোর আমার আছে। কিন্তু ভূতের কাছে তো আর গায়ের জোর খাটে না, কাজেই সেইখানেই আমি বেজায় কাবু!"

কুমার বললে, "ও-সব বাজে কথা যেতে দাও। এ গুহা তো দেখছি, প্রকাণ্ড ব্যাপার, এর কোথায় কি আছে তা বুঝে ওঠা কঠিন। এখন আমাদের কর্তব্য কি?"

গাটুলা বললে, "আগেই বলেছি, গুহার ভেতরের কথা আমিও কিছুই জানি না! তবে শুনেছি, এ গুহা নাকি অনন্ত গুহা, এর শেষ নেই! এর মধ্যে নাকি মন্দির আছে, ঘরবাড়ি আছে, রত্নভাণ্ডার আছে, পথ-বিপথ আছে, আর এখানে বাস করে যারা, তারা মানুষ না যক্ষ না রক্ষ, তাও আমি বলতে পারি না। গুহায় ঢুকেই তো এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম—মৃত যোদ্ধার বিভীষিকা! এমন আরো কত বিভীষিকা যে এইবারে সিংহদমন গাটুলা-সর্দারকে ভয় দেখাবে তা কে বলতে পারে?"

বিমল বললে, "তাইতো, এবারে কোন্ দিকে যাব,—এ ভীষণ আঁধার-পুরীতে পথের সন্ধান দেবে কে? হায় হায়, এই সময়ে ম্যাপখানা যদি কাছে থাকত!"

বিমলের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাহির থেকে গুহামুখের গলিপথে অনেকগুলো টর্চের আলো এসে পড়ল!

গাটুলা বললে, "নিশ্চয় আমাদের শত্রুরা এইবারে আসছে—"

—"শত্রুরা?"

—"হাঁ, যারা ম্যাপ চুরি করেছে তারা! এখন আমরা লুকোই কোথায়?"

বিমল টপ্ করে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "এস, আমরা ঐ মরা যোদ্ধাদের দলে ঢুকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকিগে!"

সকলে তাড়াতাড়ি সেই মৃত যোদ্ধাদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ল এবং তাদের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই বাহির থেকে যে-লোকগুলো ভিতরে এসে ঢুকল, আন্দাজে বোঝা গেল, সংখ্যায় তারা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম হবে না। তাদের দলে দশ-বারোটা টর্চ আছে, কিন্তু তাদের আলো পড়ছে সামনের দিকে, কাজেই কারুর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কুমার চুপি-চুপি বললে, "ও-দলে খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই মানিকবাবুর গুণধর কাকা মাখনবাবুকে, তাঁর বন্ধু ঘটোৎকচকে, আর সেই রামু-রাস্কেলকে দেখতে পাওয়া যাবে।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস!"

শত্রুদল ভিতরে ঢুকেই সেই সহস্র সহস্র আক্রমণোদ্যত যোদ্ধার মূর্তি দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে; তারপরেই বামদিকে মোড় ফিরে সকলে মিলে এগিয়ে চলল।

বিমল বললে, "দেখছ, ওরা এ মূর্তিগুলোকে দেখে ভয় পেলে না? নিশ্চয়ই ওরা আগে থাকতে সব সন্ধান নিয়ে এসেছে। তারপর দেখ, সকলের আগে টর্চ হাতে করে একটা লোক যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ও লোকটাই হচ্ছে দলের সর্দার মাখনবাবু! ওর কাছেই ম্যাপ আছে, তাই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!...দেব নাকি গুলি করে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে?"

কুমার বললে, "না না, ওরা দলে খুব ভারি, একজনকে মেরে লাভ কি? তার চেয়ে চল, তফাতে থেকে আমরাও ওদের পিছনে-পিছনে যাই, তাহলে আর আমাদের ভাবনা থাকবে না, ওরাই আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে!"

বিমল কুমারের পিঠ চাপড়ে বললে, "তুমি ঠিক বলেছ। সর্দারের মত কি?"

গাটুলাও কুমারের প্রস্তাবে সায় দিলে।

মানিকবাবু বললেন, "বাপ্‌রে ঘটোৎকচ যদি দেখতে পায়?"

বিমল বললে, "তাহলে আপনি এইখানে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন!"

মানিকবাবু বললেন, "একলা? ও বাবা, বলেন কি? তার চেয়ে আপনাদের সঙ্গে যাওয়াই ভালো! আর আমি কারুকে ভয় করব না—এবার আমিও মরিয়া হয়ে উঠব! প্রাণ যখন যাবেই, তখন আর ভয় পেয়ে লাভ কি? চলুন, কোথায় যাবেন চলুন!"

সকলে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রবর্তী দলের টর্চের আলো লক্ষ্য করে অগ্রসর হল।

প্রায় দশ মিনিট এইভাবে অগ্রসর হবার পর দেখা গেল, শত্রুদলের টর্চের আলো একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গাটুলা বললে, "বোধ হচ্ছে ওরা যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে!"

শত্রুদের আলোর চিহ্ন যখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিমল তখন নিজের টর্চের আলো মাটির উপরে ফেলে আবার এগুতে লাগল।

খানিক এগিয়েই দেখা গেল, পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদা সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির সার প্রায় চারতলা নিচে নেমে গেছে। কিন্তু সেখানে শত্রুদের কোন সাড়াশব্দই নেই।

ধীরে-ধীরে অন্ধকারেই তারা সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে লাগল, সিঁড়ির নিচে গিয়েও শত্রুদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। চারিদিকে বিদ্যুতের মতো টর্চের আলোক-রেখাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বিমল দেখলে, তারা প্রকাণ্ড এক লম্বা-চওড়া উঠানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। উঠানের পরেই দালান ও সারবন্দী ঘর ও মাঝে-মাঝে এক-একটা পথ। কিন্তু শত্রুরা কোন্ পথে গেছে?

তারা হতাশভাবে সেইখানেই মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইল—চুপি-চুপি অনেক পরামর্শের পরও স্থির করতে পারলে না, তারা কোন্ দিকে যাবে এবং শত্রুরা কোন্ দিকে গেছে!

আচম্বিতে সেই বিরাট রত্ন-গুহার নিদ্রা-স্তব্ধতা ভেঙে গেল!

প্রথমেই শোনা গেল আট-দশটা বন্দুকের অগ্নি-উদ্গারের শব্দ এবং তারপরেই হঠাৎ শত-শত সিংহের প্রাণ-চমকানো গম্ভীর গর্জন! সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য ঘণ্টার ধ্বনি, অগণ্য মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদ! সারা গুহা থর্ থর্ করে কাঁপতে

লাগল—অন্ধকারের ভিতরেই প্রাঙ্গণের চারিদিককার দরজা খোলার শব্দ হতে লাগল,—এদিকে ওদিকে সেদিকে দলে-দলে মানুষের—না কাদের পদশব্দ শোনা যেতে লাগল!

গাটুলা-সর্দার বলে উঠল—"আর নয়, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! গুহার যখেরা জেগে উঠেছে; ঐ শোন, শত-শত সিংহ চিৎকার করতে-করতে এদিকে এগিয়ে আসছে, যারা ভেতরে গেছে তারা আর ফিরবে না—আমরাও ভেতরে থাকলে আর বাইরের আলো দেখতে পাব না,....এস, এস, পালিয়ে এস!"

গাটুলার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠল এবং মাঝে-মাঝে—আলো জ্বেলে যে-পথ দিয়ে এসেছে সেই পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল...খানিক পরেই বুঝতে পারলে, অনেক তফাতে তাদের পিছনেও আরো কারা বেগে ছুটে আসছে! তারা কারা?

শত-শত সিংহের গর্জন, হাজার-হাজার মানুষের কোলাহল, অসংখ্য ঘণ্টাধ্বনি সেই রহস্যময় রত্ন-গুহাকে তখনো তোলপাড় করে তুলছে—কিন্তু বন্দুকের শব্দ ও বহুকণ্ঠের আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না!

এই তো গুহার মুখ! তারপরেই বাহিরের মুক্ত আকাশ! কিন্তু চাঁদের আলো তখন নিবে গেছে এবং শেষ-রাতের পাতলা অন্ধকারের ভিতরে আসন্ন ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে!

বিমল বললে, "ঐ বড় পাথরখানার আড়ালে সবাই লুকিয়ে পড়ি এস! পিছনের পায়ের শব্দ খুব কাছেই এসে পড়েছে!"

তারা পাথরখানার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে গুহার ভিতর থেকে পর-পর তিনটি মূর্তি বেরিয়ে এল, ঝড়ের মতো! বাইরে এসে তারা এক মুহূর্তও থামল না—সোজা গিয়ে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে!

পাতলা অন্ধকারে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সর্বশেষে যে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে, তার চেহারার অস্বাভাবিকতা সকলেরই চোখে পড়ে গেল! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া তার দেহ, গায়ের রং তার যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে এবং তার সর্বাঙ্গে এক-টুকরো কাপড়ও নেই! সেই অদ্ভুত মূর্তির কাঁধের উপরে বড় বাক্সের মতো কি একটা যেন রয়েছে!

বিমল বললে, "কুমার! কুমার! ঐ দেখ ঘটোৎকচ যাচ্ছে! কাঁধে ও কী নিয়ে যাচ্ছে?—গুপ্তধন?—কুমার, কুমার! আজ ঘটোৎকচের একদিন কি আমারই একদিন!"—বলতে-বলতে বিমল একলাফে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল!

বিশ

পাপের ফল

বিমল পাহাড় থেকে নামবার উপক্রম করতেই গাটুলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে তার দুই কাঁধ চেপে ধরে বললে, "না বাবু, এখনও রত্ন-গুহার সীমানা আমরা ছাড়াইনি, এখানে গোলমাল করা আর যেচে গলায় ফাঁসি দেওয়া—একই কথা।"

বিমল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উত্তপ্ত স্বরে বললে, "না সর্দার! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও! তুমি জানো না, ঐ ঘটোৎকচ কতবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! ও যেন আলেয়া, ওকে দেখা যায়, ধরা যায় না। ও যে কি, মানুষ, না জন্তু, না প্রেত—তাও আমরা জানি না! আজ ওকে আমি ধরবই ধরব,—সকল রহস্য ভেদ করব।"

হঠাৎ নিচ থেকে একাধিক কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠল!

কুমার ও রামহরি চমকে একসঙ্গে বলে উঠল, "ও কী—ও কী!"

খানিকটা নেমেই দেখে, ভীষণ ব্যাপার! রক্তগঙ্গার মাঝখানে দুটো দেহ পড়ে রয়েছে, একটা দেহ একেবারে স্থির এবং একটা দেহ তখনো ছট্‌ফট্ করছে!

যে ছট্‌ফট্ করছিল তাকে দেখেই মানিকবাবু কাতরস্বরে বলে উঠলেন, "অ্যাঁ, ছোট কাকা! ছোট কাকা!"

আহত লোকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে গাটুলা বললে, "হুঁ, চিনতে পেরেছি! এ যে দেখছি সুরেনবাবু-হুজুরের ভাই মাখনবাবু!"

মাখনবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে অতি কষ্টে বললেন, "আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না,—রক্তে আমার দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমরা কে! তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, তার ফলে নিজেও মরতে বসেছি,—তোমরা আমাকে ক্ষমা কর!"

মাখনবাবুকে জড়িয়ে ধরে মানিকবাবু বললেন, "আপনার এ দশা কে করলে, ছোট কাকা?"

—"ঘটোৎকচ। আমাকে আর রামুকে সে ছোরা মেরেছে।"

—"ছোরা মেরেছে! কেন?"

—"গুপ্তরত্ন সে একলাই ভোগ করতে চায়।"

বিমল সাগ্রহে বিজ্ঞাসা করলে, "গুপ্তধন! আপনারা কি গুপ্তধন পেয়েছেন?"

—"পেয়েছি, কিন্তু গুহায় যা আছে, তার তুলনায় যা পেয়েছি তা যৎসামান্য!

সে গুহায় যা আছে, কুবেরের ভাণ্ডারেও বোধহয় তা নেই! কিন্তু সে হচ্ছে ভুতুড়ে-গুহা! আমার সঙ্গীরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে! একটা বাক্স নিয়ে কোন গতিকে আমি, রামু আর ঘটোৎকচ প্রাণ নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়েছি বটে, কিন্তু এখন রামুও মরেছে—আমারও মরতে দেরি নেই। ঘটোৎকচ! বিশ্বাসঘাতক ঘটোৎকচ! রত্নের বাক্স নিয়ে আমাদের মেরে সে পালিয়েছে। উঃ, সে বাক্সে যা আছে, তা দিয়েও একটা রাজ্য কেনা যায়! কিন্তু সে পাপের ফল আমার ভোগে এল না—আমাকেই নরকে যেতে হচ্ছে। উঃ, উঃ! গেলুম—গেলুম! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—মানিক—মানিক—" বলতে-বলতে মাখনবাবু ধনুকের মতো বেঁকে গেলেন,—তারপরেই মাটিতে সিধে হয়ে আছড়ে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইলেন!

রামহরি মাখনবাবুর বুকে হাত দিয়ে বললে, "সব শেষ হয়ে গেছে।"

এই পাষণ্ড ও পাপিষ্ঠ গুরুজনের মৃত্যুতেও মানিকবাবুর দু-চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল!

বিমল মাথায় করাঘাত করে বললে, "হায়রে অদৃষ্ট! এবারেও ঘটোৎকচ আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাল! এতক্ষণে সে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে ধরতে পারব না!"

কুমার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু, সর্দার? গাটুলা সর্দার কোথায় গেল?"

বিমল বলে উঠল, "হুঁশিয়ার গাটুলা-সর্দার! নিশ্চয় সে ঘটোৎকচের পিছু নিয়েছে, চল চল, দৌড়ে চল!"

মানিকবাবু করুণ স্বরে বললেন, "কিন্তু আমার কাকার মৃতদেহ? তার সৎকারের কি হবে?"

বিমল দ্রুতপদে পাহাড় থেকে নামতে-নামতে বললে, "শয়তানের মড়ার সৎকার করবে শেয়াল-কুকুরেরা! চলে আসুন!"

একুশ

ঘটোৎকচ-রহস্য

পাহাড় থেকে নেমেই দেখা গেল, আর এক ভয়ানক দৃশ্য!

তখন ভোরের আলো এসে ঊষার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে এবং বনের গাছে-গাছে পাখিদের গানের আসর বসেছে।

কিন্তু এমন সুন্দর প্রভাতকেও বিশ্রী করে দিলে সামনের সেই বীভৎস দৃশ্য!

ভূমিতলে চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে যুঝছে গাটুলা-সর্দার এবং তার বুকের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বিপুলদেহ দানবের মতো প্রকাণ্ড একটা গরিলা।

কুমার চেঁচিয়ে উঠল,—"গরিলা, গরিলা! সর্দারকে গরিলায় আক্রমণ করেছে—গুলি কর!"

চিৎকার শুনেই গরিলাটা গাটুলাকে ছেড়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সামনেই বিমলকে দেখে ভীষণ এক চিৎকার করে মহাবিক্রমে তাকে আক্রমণ করলে!

এখন, যাঁরা "যখের ধন" পড়েছেন তাঁরাই জানেন বিমলের শারীরিক ক্ষমতার কথা। সে কুস্তি, যুযুৎসু ও বক্সিংয়ে সুদক্ষ,—সে অসুরের মতো বলবান। যদিও সে জানত গরিলার গায়ের অমানুষিক শক্তির সামনে পৃথিবীর কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না, তবুও সে কিছুমাত্র ভয় পেলে না। কারণ, ভয় তার ধাতে নেই।

এই বৃহৎ গরিলাটার অতর্কিত আক্রমণে বিমল প্রথমেই মাটির উপরে ঠিক্‌রে পড়ে গেল; কিন্তু শত্রু তাকে দ্বিতীয়বার ধরবার আগেই বিমল ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে গরিলার মুখের উপরে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল।

কিন্তু ঘুষি খেয়েও গরিলাটা একটুও দমল না, দু-হাত বাড়িয়ে বিমলকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হল। এবারে বিমল যুযুৎসর এক প্যাঁচ কষলে এবং চোখের নিমেষে যেন কোন মন্ত্রশক্তিতেই গরিলাটার সেই বিরাট দেহ, গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো ভূমিসাৎ হল।

আহত গাটুলা-সর্দার রক্তাক্ত দেহে মাটির উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বললে, "সাবাস বাবুজী! বহুৎ আচ্ছা মরদ-কা-বাচ্চা!"

কুমার রিভলভার তুলে গরিলাটাকে গুলি করতে উদ্যত হল।

বিমল বললে, "এখন মেরো না কুমার! আগে দেখা যাক্ মানুষ জেতে, না, গরিলা জেতে? এ এক অদ্ভুত লড়াই!"

ভূপতিত গরিলাটা মাটির উপরে শুয়ে-শুয়েই বিদ্যুতের মতন সড়াৎ করে খানিকটা সরে গিয়ে হঠাৎ বিমলের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে,—সঙ্গে-সঙ্গে বিমলকে ধরাশায়ী হতে হল। তারপরে শুরু হল এক বিষম ঝটাপটি,—কখনো বিমল উপরে আর গরিলা নিচে, কখনো বিমল নিচে আর গরিলা উপরে, কখনো দু'জনেই জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়—এবং ওরই মধ্যে ঘুষি, চড়, কিল, লাথি কিছুই বাদ গেল না!

সকলে অবাক্ ও স্তম্ভিত হয়ে সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে লাগল, তখন গরিলাটাকে আর গুলি করবারও উপায় ছিল না—কারণ, সে গুলি গরিলার গায়ে না লেগে বিমলেরই গায়ে লাগবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট! কেবল বাঘা ঘেউ-ঘেউ করে বকতে-বকতে ছুটে গিয়ে গরিলাটাকে কাম্‌ড়ে দিতে লাগল।

সবাই কি করবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ কি কৌশলে সেই মস্ত বড় গরিলার দেহটা পিঠের উপরে নিয়ে 'স্প্রিং-টেপা' পুতুলের মতো টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং কারুর চোখে পলক পড়বার আগেই গরিলাটাকে ছুঁড়ে প্রায় সাত-হাত তফাতে ফেলে দিলে!

গাটুলা চেঁচিয়ে উঠল, "বাহবা বাবুজী, বাহবা বাবুজী, বাহবা বাবুজী!"

মাটির উপরে দু'হাত ছড়িয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ে গরিলাটা আর নড়ল না। বাঘার ঘন-ঘন কামড়েও তার সাড় হল না, সবাই বুঝলে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে!

বিমল অবসন্নের মতো মাটির উপরে বসে পড়ল—তার মুখ ও গা দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। রামহরি তাড়াতাড়ি তার সেবায় লেগে গেল। কুমার বললে, "সর্দার, এ গরিলাটা কোত্থেকে তোমাকে আক্রমণ করলে?"

বিমল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "গরিলা তো সর্দারকে আক্রমণ করেনি, সর্দারই গরিলাকে আক্রমণ করেছিল।"

গাটুলা সবিস্ময়ে বললে, "তুমি কি করে জানলে বাবু?"

বিমল বললে, "কারণ, আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করছি, ঘটোৎকচ হচ্ছে একটা পোষা গরিলা। ঐ দেখ, গুপ্তধনের বাক্স—যা নিয়ে ঘটোৎকচ পালাচ্ছিল।"

কুমার বললে, "কিন্তু আমি তো শুনেচি গরিলা পোষ মানে না।"

বিমল বললে, "আমিও তাই জানতুম। এখন দেখছি সে-কথা ঠিক না।"

কুমার খুঁৎ-খুঁৎ করতে-করতে বললে, "বিমলের এক আছাড়ে গরিলার মতো বলবান্ বুনো জন্তু কখনো মরতে পারে? আর হাজারই পোষ মানুক গরিলা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, ধনরত্নের লোভে গরিলা কি মানুষ খুন করে?" বলতে-বলতে সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গরিলার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল! সচকিত বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহের পানে তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, "শীগ্‌গির এস। তোমরা সবাই দেখে যাও!"

সকলে কৌতূহলী হয়ে ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলে, গরিলার কাঁধের

উপর থেকে গরিলার মুখের চামড়া সরে গিয়েছে এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে কালো কুৎসিত মরা-মানুষের মুখখানা,—মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁতগুলো যেমন বেরিয়ে থাকে, তারও দু'পাটি দাঁত তেম্‌নিভাবে ছরকুটে বাইরে বেরিয়ে আছে—কারণ, তার উপরের ও নিচের দুই ঠোঁটই না জানি কবে কোন্ দুর্ঘটনায় কেমন করে উড়ে গিয়েছে।

বিমল বললে, "অ্যাঁঃ—কি আশ্চর্য! এ যে দেখছি জাহাজের সেই মড়া-দেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটার মুখ!"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, এই ব্যাটাই তাহলে গরিলার চামড়া মুড়ি দিয়ে ঘটোৎকচ সেজে এতদিন আমাদের ভয় দেখিয়ে আসছে!"

*　　*　　*　　*　　*

বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরটা রাশি-রাশি হীরা চুনি পান্না ও মুক্তার জেল্লায় ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করছে—এত মূল্যবান্ ঐশ্বর্য তারা কেউ-কোনদিন একসঙ্গে দেখবার কল্পনাও করেনি।

বিমল বললে, "কিন্তু মাখনবাবুর মুখে শুনেছ তো, গুহায় যা আছে তার তুলনায় এ ঐশ্বর্য যৎসামান্য মাত্র! আমরা শুধু-হাতে ফিরছি না বটে, কিন্তু সে গুহার কোন গুপ্তকথাই জানা হল না। সেই ঘুমন্ত গুহার অন্ধকার থেকে অমন হাজার হাজার কণ্ঠের চিৎকার জাগল কোত্থেকে, কেনই-বা শত-শত সিংহ গর্জন করছিল আর অত ঘণ্টা বাজছিল, আর কেনই বা মাখনবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন, আর কেনই বা সে গুহাকে ভুতুড়ে-গুহা বললেন, সে-সব কিছুরই তো কিনারা করা হল না!"

রামহরি বললে, "থাক্-থাক্, যা জেনেছ তাই-ই যথেষ্ট, আর বেশি কিছু জানতে হবে না। এখন প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল!"

বিমল হেসে বললে, "না রামহরি, এ-যাত্রায় আর বেশি-কিছু জানা চলবে না—গুহার যখেরা এখন সজাগ হয়ে আছে! কিন্তু এক বৎসর পরে হোক্, আর দু'বৎসর পরেই হোক্, এই গুহার রহস্যভেদ করবার জন্যে আবার আমরা নিশ্চয়ই আসব,—কি বল কুমার?"

কুমার বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

মানিকবাবু বললেন, "ও বাবা, বলেন কি! এই আমি নাক মলছি, কান মলছি—এ জীবনে এ-মুখো আর কখনো হব না! দয়া করে আর আমাকে ডাকবেন না, কারণ, ডাকলেও আর আমার সাড়া পাবেন না।"

গাটুলা বললে, "বাবুজী! আবার যদি আপনারা এখানে আসেন আর

সিংহদমন গাটুলা-সর্দারকে যম যদি চুরি করে না নিয়ে যায়, তাহলে ঠিক তাকে আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবেন। আমি সাহসীর গোলাম!”

* * * * *

আচম্বিতে সকলের কান গেল আর-একদিকে।

দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্ দুম্-দুম্! যেন চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোল বাজাতে-বাজাতে তালে-তালে পা ফেলে কারা এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে! ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ! সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবী যেন কাঁপতে লাগল—টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্ টিপ্-টিপ্! পৃথিবীর বুকের উপরে পড়ছে হাজার-হাজার সৈনিকের পা!

গাটুলা-সর্দার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আর এখানে নয়! রত্ন-গুহার রক্ষীরা ফিরে আসছে।”

মেঘদূতের মর্তে আগমন

অলৌকিক রহস্য

সেদিন সকালবেলায় কমল যখন নিজের পড়বার ঘরে সবে এসে বসেছে, হঠাৎ তার চাকর ঘরে ঢুকে খবর দিলে, 'বাবু, একটা লোক আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।'

কমল চিঠিখানা খুলে পড়লে, তাতে শুধু লেখা আছে—

'প্রিয় কমল,

শীঘ্র আমার বাড়িতে এসো। সাক্ষাতে সমস্ত বলব। ইতি—

বিনয় মজুমদার।'

বিনয়বাবুর সঙ্গে কমলের আলাপ হয় মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে। কমলের বয়স উনিশ বৎসর, সে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিনয়বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বয়সে এতখানি তফাত হলেও, দুজনের মধ্যে আলাপ খুব জমে উঠেছিল। বিনয়বাবুর স্বভাবটা ছিল এমন সরল যে, বয়সের তফাতের জন্যে কারুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের কিছুমাত্র তফাত হত না।

কমলের সঙ্গে বিনয়বাবুর আলাপ এত ঘনিষ্ঠ হবার আরও একটা কারণ ছিল। বিনয়বাবু সরল হলেও তাঁর প্রকৃতি ঠিক সাধারণ লোকের মতন নয়। দিনরাত তিনি পুথিপত্র আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, সংসারের আর কোনও ধার বড়ো একটা ধারেন না। তাঁর বাড়ির ছাদের উপরে আকাশ-পরিদর্শনের নানারকম দূরবীন ও যন্ত্র আছে,—গ্রহ-নক্ষত্রের খবর রাখা তাঁর একটা মস্ত বাতিক। এ সম্বন্ধে তিনি এমন সব আশ্চর্য গল্প বলতেন, তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা যা গাঁজাখুরি বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন, এমন কি অনেকে তাঁকে পাগল বলতেও ছাড়তেন না।

কমল কিন্তু তাঁর কথা খুব মন দিয়ে শুনত। কমলের মতো শ্রোতাকে পেয়ে বিনয়বাবুও ভারি খুশি হয়েছিলেন এবং এইজন্যেই কমলকে তাঁর ভারি ভালো লাগত। নিজের নতুন নতুন জ্ঞানের কথা কমলের কাছে তিনি খুলে বলতেন, কমলও তা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

আজ সকালে বিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে কমল বুঝল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ কথা তাকে বলতে চান। সে তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।....

বিনয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে উপরে উঠে কমল দেখলে, তিনি তাঁর লাইব্রেরিঘরের ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিনয়বাবু দেখতে ফরসা এবং মাথায় মাঝারি হলেও তাঁর দেহখানি এমন বিষম চওড়া যে, দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর গায়ে জোর আছে অত্যন্ত। তাঁর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল,—সে চুলে কখনও চিরুনি-বুরুশ পড়েছে বলে সন্দেহও হয় না। মুখেও কাঁচা-পাকা গোঁফ ও লম্বা দাড়ি।

কমলকে দেখেই বিনয়বাবু বললেন, 'এই যে ভায়া, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি!'

কমল বললে, 'কেন বিনয়বাবু, আপনি কোনও নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন নাকি?'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে, না, তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার!'

'তার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার! তবে কি ধূমকেতু আবার পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে?'

'তাও নয়।'

'তাও নয়? কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বড়োই ভয় পেয়েছেন!'

'ভয় পাইনি, তবে চিন্তিত হয়েছি বটে!...আচ্ছা, আগে এই খবরের কাগজখানা পড়ে দ্যাখো,—এই, এই নীল পেনসিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা'!—এই বলে বিনয়বাবু কমলের হাতে একখানা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন।

কাগজের একটা কলমের চারপাশে নীল পেনসিলের মোটা দাগ টানা রয়েছে। কমল পড়তে লাগল—

অলৌকিক কাণ্ড!

ভূত, না, মানুষের অত্যাচার?

কলিকাতার অদূরবর্তী বিলাসপুর গ্রামে সম্প্রতি নানারূপ আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে, পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আজ ঠিক একমাস আগে প্রথম ঘটনা ঘটে। বিলাসপুরের জমিদারের একখানি ছোটো স্টিমার গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, স্টিমারখানি অদৃশ্য হইয়াছে। স্টিমারে কয়েকজন খালাসি ছিল, তাহারাও নিরুদ্দেশ। পুলিশের বহু অনুসন্ধানেও স্টিমারের কোনও সন্ধান মিলে নাই।

তার পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। বিলাসপুরের শীতলাদেবীর মন্দিরের সামনে একটি বহু পুরাতন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, বটগাছটির বয়স দেড়শত বৎসরের চেয়েও বেশি। এতবড়ো বটগাছ এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না। গত ৩রা কার্তিক সোমবার সন্ধ্যাকালে এই বটগাছের তলায় কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, সমগ্র বটগাছটি রাত্রের ডাল-পালা-শিকড় সুদ্ধ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। বটগাছের চিহ্নমাত্রও সেখানে নাই, গাছের উপরে একদল বানর বাস করিত, তাহাদেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যেখানে বটগাছ ছিল, সেখানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত হাঁ-হাঁ করিতেছে, দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট-দেহ দানব বটগাছটিকে শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় ঘটনাটিও কম আশ্চর্যের নয়। বিলাসপুর স্টেশনে একখানা রেলগাড়ির ইঞ্জিন লাইনের উপর দাঁড় করানো ছিল। গত ১৩ই কার্তিক তারিখে রাত্রি বারোটার সময় স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং ইঞ্জিনখানাকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রি একটার পর হইতে ইঞ্জিনখানাকে আর পাওয়া যাইতেছে না। ইঞ্জিনে আগুন ছিল না, সুতরাং তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তার উপরে সমস্ত লাইন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইঞ্জিনের কোনও সন্ধান মিলে নাই।

এসব কোনও বদমাশ বা চোরের দলের কাজ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্টিমার বা বটগাছ বা ইঞ্জিনের কোনও না কোনও খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত। অতএব অতবড়ো একটা বটগাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে যে কত লোকের দরকার, তা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই—মোট কথা, সেটা একেবারেই অসম্ভব। এসব কাজ এতটা চুপি চুপি, এত শীঘ্র করাও চলে না। অথচ এমনি সব কাণ্ড ঘটিতেছে। এর কারণ কী?

বিলাসপুরের বাসিন্দারা এইসব অলৌকিক ব্যাপারে যে যার-পর-নাই ভয় পাইয়াছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যার পর গ্রামের কেউ আর বাহির হয় না। চৌকিদারও পাহারা দিতে চাহিতেছে না—সকলেই বলিতেছে, এসব দৈত্য-দানবের কাজ। রাত্রে অনেকেই নাকি একরকম অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পায়—সে শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। কোনও কোনও সাহসী লোক জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তবে তাহারা সকলেই এক আশ্চর্য কথা বলিয়াছে শব্দটা যখন খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন চারিদিকে নাকি বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে। এ শব্দ কিসের এবং এ ঠাণ্ডা বাতাসের গুপ্ত রহস্যই বা কী?

আমরা অনেক রকম আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কখনও শুনি নাই। এ ঘটনাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না, তাঁহারাও নিজেরা দেখিয়া আসিতে পারেন।'

শব্দ ও ঠাণ্ডা বাতাস

খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে কমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

বিনয়বাবু তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, 'সমস্ত পড়লে তো?'

কমল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'কী বুঝলে?'

'ঘটনাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে এসব ভূতুড়ে ব্যাপার বলে মানতে হবে বইকি!'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'প্রথমত, আমি ভূত মানি না। দ্বিতীয়ত, ভূতে যে একদল খালাসি সমেত স্টিমার, ইঞ্জিন আর একদল বানরসুদ্ধু বটগাছ একেবারে বেমালুম হজম করে ফেলতে পারে এমন গল্প কখনও গাঁজাখোরের মুখেও শোনা যায় না।'

কমল বললে, 'তবে কি এ সমস্ত আপনি মানুষের কাজ বলে মনে করেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'মানুষ! মানুষের সাধ্য নেই যে ঘাসের গোছার মতো দেড়শো বছরের বটগাছ উপড়ে ফেলবে, খেলার পুতুলের মতন স্টিমার বা ইঞ্জিন তুলে নিয়ে যাবে! বিশেষ, তাহলে ওই বটগাছ, স্টিমার বা ইঞ্জিনের কোনও-না-কোনও খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। এই ইংরেজ রাজত্বে একখানা ছোটো গয়না কেউ চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আর অত বড়ো বড়ো মালের যে কোনও পাত্তাই মিলছে না, তাও কি কখনও সম্ভব হয়? স্টিমারের খালাসিরা আর গাছের বানরগুলোই বা কোথায় যাবে? তারপর, এই শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাস। এরই বা হদিশ কী? কেন শব্দ হয়, কেন ঠাণ্ডা বাতাস বয়?'

কমল বললে, 'তাহলে আপনি কী মনে করেন? এসব যদি ভূত বা মানুষের কাজ না হয়—'

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'কমল, ভূত কি মানুষের কথা এ সম্পর্কে একেবারে ভুলে যাও! এ এক এমন অজ্ঞাত শক্তির কাজ, আমাদের পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর

বৈজ্ঞানিকরা যে শক্তির সন্ধানের জন্যে এতকাল ধরে চেষ্টা করছেন, আমাদের বাংলাদেশেই তার প্রথম লীলা প্রকাশ পেয়েছে।....কমল, তুমি জান না, আমার মনে কী আনন্দ হচ্ছে!'

কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনি কী বলতে চান?'

বিনয়বাবু কয় পা এগিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কমল, আজ বৈকালেই আমি বিলাসপুরে রওনা হব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?'

কমল বললে, 'আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখতে পারে না। বিলাসপুরে যেসব ঘটনা ঘটছে তা এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সূচনা মাত্র! শীঘ্রই এর চেয়ে বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটবে, আর তা ঘটবার আগেই আমি ঘটনাক্ষেত্রে হাজির থাকতে চাই।'

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, আমি ভয় পাইনি। আমি খালি বলতে চাই যে, পুলিশ যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'পুলিশ তো বিফল হবেই, এ রহস্যের কিনারা করবার সাধ্য তো পুলিশের নেই। বাংলাদেশে এখন একমাত্র আমিই এ ব্যাপারের গুপ্ত কথা জানি—আমার এতদিনের আলোচনা কি ব্যর্থ হতে পারে? এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার সঙ্গে আজ কি তুমি বিলাসপুরে যাবে?'

কমল বললে, 'যাব।'

নতুন পরিচয়

বিনয়বাবু আর কমল যখন বিলাসপুরে গিয়ে হাজির হলেন, তখন বিকালবেলা।

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলে পরে তিনি আমাদের খুব আদরযত্ন করবেন বটে, কিন্তু কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তাঁর অসুবিধে হতে পারে।'

কমল বললে, 'কিন্তু সেখানে না গিয়েও তো উপায় নেই। রাত্রে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো দরকার?'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমরা কি আর মাঠে শুয়ে রাত কাটাব? এখানে ডাকবাংলো আছে; সেখানে আজকের রাত কাটাতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

কমল বললে, 'কিছু না। বরং অচেনা লোকের বাড়ির চেয়ে ডাকবাংলোই ভালো।'

স্টেশনের কাছেই ডাকবাংলো। দুজনে ডাকবাংলোর হাতার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই সেখানকার চাকর এসে তাঁদের সেলাম করলে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ বাংলো কি তোমার জিম্মায় আছে?'

সে বললে, 'হ্যাঁ, কর্তাবাবু।'

'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, অছিমুদ্দি।'

'দ্যাখো অছিমুদ্দি, আজ আমরা এখানে থাকব। এই ব্যাগটা তোমার কাছে রাখো, আর আমাদের দুজনের জন্যে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করো—মুরগির ঝোল চাই, বুঝলে? এই নাও টাকা। আমরা ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।'

বিনয়বাবু কমলের হাত ধরে বাংলোর হাতা থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

কমল বললে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'শীতলার মন্দিরে। বটগাছের ব্যাপারটা সত্যি কি না, আগে দেখে আসা দরকার।'

বিনয়বাবু বিলাসপুরে আগেও বারকয়েক এসেছিলেন, কাজেই পথঘাট তাঁর জানা ছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই তাঁরা শীতলার মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল, সত্যিই তো বটগাছটা নেই দেখছি! সে গাছটা আগেও আমি দেখেছি,—প্রকাণ্ড গাছ। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছ দেখেছ তো? এ গাছটি তার চেয়ে কিছু ছোটো হলেও এত বড়ো গাছ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথচ দ্যাখো, সেই গাছের বদলে এখন শুধু একটা গর্ত রয়েছে।'

কমল অবাক হয়ে দেখলে, তার সামনে মস্তবড়ো একটা গর্ত তার ভিতরে অনায়াসে শতাধিক মানুষকে কবর দেওয়া যায়। বটগাছটা যে কত বড়ো ছিল কমল এতক্ষণে তা আন্দাজ করতে পারলে। অথচ এত বড়ো একটা গাছকেই সকলের অজান্তে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে! মানুষের পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব!

মন্দিরের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল।

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করে বললেন, 'আপনি বোধহয় এই শীতলা-দেবীর সেবাইত?'

'হ্যাঁ বাবা!'

'এখানে নানারকম আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা হচ্ছে শুনে আমরা কলকাতা থেকে দেখতে এসেছি। আচ্ছা, যে রাতে বটগাছটি অদৃশ্য হয়, সে রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এই মন্দিরের পাশেই আমার ঘর। আমি এইখানেই ছিলুম।'

'অথচ কিছুই টের পাননি?'

'টের যে পাইনি, তা নয়; তবে আসল ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি।'

'কী রকম?'

'অনেক রাতে হঠাৎ কিরকম একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তার পরেই ঝড়ে গাছ দোলার মতো আওয়াজ শুনলুম—সঙ্গে সঙ্গে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল, আর বটগাছের বাঁদরগুলো কাতরে চ্যাঁচাতে লাগল। ঝড় উঠেছে ভেবে তাড়াতাড়ি আমি জানলা বন্ধ করে দিলুম—তার পরেই সব চুপচাপ। সকালে উঠে দেখি, বটগাছটা আর নেই।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, ঝড় এসেই বটগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?'

'না, না, তা কী করে হবে? এত বড়ো বটগাছ উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে গাঁয়ের ভিতরে নিশ্চয়ই আরও অনেক গাছপালা তছনছ হত, অনেক ঘরবাড়ি পড়ে যেত। কিন্তু আর কোথাও কিছু হল না, উড়ে গেল শুধু এই বটগাছটা?'

'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে—'

লোকটি বাধা দিয়ে বললে, 'আমি আর কিছু বলতে চাই না বাবা, এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও আমার ভয় হয়,'—বলতে বলতে সে আবার মন্দিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়বাবু ফিরে বললেন, 'চলো কমল, আমরা একবার গাঁয়ের ভিতরটা ঘুরে আসি।'

দুজনে আবার অগ্রসর হলেন। বিলাসপুর গ্রামখানি বেশ বড়ো—তাকে শহর বললেও চলে। পথে পথে ঘুরে, নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেও বিনয়বাবু আর কোনও নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল, খবরের কাগজের কোনও কথাই মিথ্যা নয়।

সন্ধ্যার মুখে তাঁরা যখন আবার ডাকবাংলোর দিকে ফিরলেন, তখন বিনয়বাবু লক্ষ্য করলেন যে গ্রামখানি এর মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পথে আর মানুষ নেই, অধিকাংশ ঘর-বাড়িরই দরজা-জানলা বন্ধ। এখানকার বাসিন্দারা যে খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই।

বাংলোর বারান্দায় উঠে বিনয়বাবু দেখলেন, সেখানে দুটি যুবক দুখানা চেয়ারের উপর বসে আছে। তার মধ্যে একটি যুবকের দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, তার দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।

তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেই লম্বা-চওড়া যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করে বললে, 'আজ বৈকালে আপনারাই কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমরাও আজ এখানে আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'না, না, আপত্তি আবার কিসের? বেশ তো একসঙ্গে সবাই মিলে থাকা যাবে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। খবরের কাগজে একটা ব্যাপার পড়ে দেখতে এসেছি।'

'ও, তাহলে আপনারাও আমাদেরই দলে? আমরাও ওই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। আপনাদের নাম জানতে পারি কি?'

'আমার নাম শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, আর আমার বন্ধুটির নাম শ্রীকুমারনাথ সেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমলবাবু, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তো?'

বিমল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চাকর রামহরিকে বাজারে পাঠিয়েছি, ওই যে, সে ফিরছে।' চ্যাঙারি হাতে করে একটি লোক বাগান থেকে বারান্দায় এসে উঠল, তার সঙ্গে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে প্রকাণ্ড একটা কুকুর।

বিনয়বাবু বললেন, 'ও কুকুরটা কার? কামড়াবে না তো?'

কুমার বললে, 'না, না, কামড়াবে না, বাঘা বড়ো ভালো কুকুর।'

কমল এতক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। এখন সে বললে, 'বিমলবাবু, আপনাদের নাম আর ওই কুকুরের নাম শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, 'কী কথা?'

কমল একটু ইতস্তত করে বললে, ' 'যকের ধন' বলে আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলুম, তাতেও বিমল, কুমার, রামহরি আর বাঘা কুকুরের নাম আছে। কী আশ্চর্য মিল!'

বিমল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, 'মিল দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা সেই লোকই বটে।'

বিস্ময়ে হতভম্বের মতো কমল হাঁ করে খানিকক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর বলে উঠল, 'তাও কি সম্ভব?'

কমল বললে, 'তারা হচ্ছে উপন্যাসের লোক, আর আপনারা যে সত্যিকারের মানুষ!'

বিমল বললে, ' 'যকের ধন' যে সত্যিকারের ঘটনা; তা মিথ্যা বলে ভাবছেন কেন?'

'সত্যি ঘটনা! তাহলে আপনারা কি সত্যি-সত্যিই খাসিয়া পাহাড়ের বৌদ্ধমঠে গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়! কিন্তু সে আজ পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কথা, সেসব বিপদের কথা এখন আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়!'

পুকুর চুরি

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়বাবু 'যকের ধন'-এর গল্পটি বিমলের মুখ থেকে আগাগোড়া শ্রবণ করলেন। তারপর আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'আপনারা এই বয়সেই এমন-সব বিপদের মধ্যে পড়েও বেঁচে আছেন! ধন্য!'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, বিপদ আমি ভালবাসি, বিপদকে আমি খুঁজে বেড়াই; আর আজ এই বিলাসপুরেও আমরা এসেছি নতুন কোনও বিপদেরই সন্ধানে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আপনারা সাহসী লোক বটে!'

কুমার বললে, 'কিন্তু এখানে এই যেসব ঘটনা ঘটছে, আমরা তো তার কোনও হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। এসব কি ভূতুড়ে কাণ্ড?'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। তবে, আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে—'

বিমল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি কী সন্দেহ করেন বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'এখন বলব না, আরও দু-চারটে প্রমাণ দরকার, নইলে আপনারাই হয়তো বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাত হল, আসুন—এবারে নিদ্রালোকে গমন করা যাক।'

গভীর রাত্রে হঠাৎ একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

কমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'উঃ, কী শীত!'

কুমার বললে, 'জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া আসছে—বাইরে ঝড় উঠেছে,'—বলেই সে উঠে পড়ে জানলা বন্ধ করে দিতে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, 'দাঁড়ান কুমারবাবু, জানলা বন্ধ করবেন না।'

'ঝড় উঠেছে যে!'

'না, ঝড় ওঠেনি, দেখছেন না, বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো!'

'তবে ও শব্দ কিসের?'

সকলে কান পেতে শুনলে বাইরে থেকে একটা অদ্ভুত-রকম শব্দ আসছে—যেন কারা লক্ষ-লক্ষ পেনসিল ঘর্ষণ করছে।

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ও ঝড়ের শব্দ নয়।'

বিমল বললে, 'তবে?'

'সেই রহস্যই তো জানতে চাই,' বলেই বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ঘরের ভিতর থেকে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে পরিষ্কার চাঁদের আলো, আকাশে মেঘের নামমাত্র নেই। তবে ঝড়ের মতন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছেই বা কেন, আর ওই রহস্যময় শব্দটাই বা আসছে কোত্থেকে?

বিনয়বাবু বললেন, 'শব্দটা হচ্ছে উপর দিকে।' তাঁর কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই খানিক তফাত থেকে মানুষের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল—তার পরেই কুকুরের চিৎকার।

কুমার বললে, 'এ যে বাঘার গলা!'

রামহরি বললে, 'বাঘা বোধহয় কারুকে কামড়ে ধরেছে।'

মানুষ আর কুকুরের চিৎকার আরও বেড়ে উঠল।

কুমার বললে, 'না রামহরি, বাঘা কারুকে কামড়ায়নি,—তার চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে!'

বিমল বললে, 'চলো, চলো, এগিয়ে দেখা যাক!'

যেদিক থেকে সেই মানুষ আর কুকুরের আর্তনাদ আসছে, সকলে বেগে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু কই, কোথাও তো কিছুই নেই!

আর্তনাদ তখনও হচ্ছে, কিন্তু অতি অস্পষ্ট—যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে—'বাঘা, বাঘা, বাঘা! কোথায় বাঘা?'

বিনয়বাবু উপর-পানে হাত তুলে বললেন, 'আকাশে!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! আকাশ থেকেই তো আর্তনাদ আসছে, এ কী কাণ্ড।'

রামহরি বললে, 'রাম, রাম, রাম, রাম! বাঘাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে!'

কুমার কাতরভাবে বললে, 'আমার এতদিনের কুকুর।'

সকলে সভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবু বললেন, 'ওই যেন কী দেখা যাচ্ছে না?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক যেন দুটো কালো ফোঁটা....ওই যাঃ, মিলিয়ে গেল!'

বিনয়বাবু আরও আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন,—আকাশের বুকে ছায়ার মতো অস্পষ্ট কি-একটা প্রকাণ্ড জিনিস। কিন্তু সে ব্যাপার আর প্রকাশ না করে তিনি শুধু বললেন, 'আর সেই শব্দ নেই, আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে না—ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে না।'

কমল বললে, 'এমন ব্যাপারের কথাও তো কখনও শুনিনি! এর মানে কী বিনয়বাবু? আপনি কি এখনও বলতে চান যে, এসব ভৌতিক কাণ্ড নয়?'

বিনয়বাবু কোনও জবাব দিলেন না, ঘাড় হেঁট করে কি ভাবতে লাগলেন।....খানিকক্ষণ পরে পথের পাশে তাকিয়ে সচমকে তিনি বললেন, 'ও কী ও!'

সকলেই সেদিকে তাকালে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। পথের পাশে খালি পুকুর রয়েছে, কিন্তু তার জল প্রায় সমস্তই শুকিয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবুকে তখনও বিস্ফারিত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কী দেখছেন বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওই পুকুরটা!'

বিমল কিছুই বুঝতে না পেরে বললে, 'হ্যাঁ, পুকুরে জল নেই; তাতে কী হয়েছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু আজ বৈকালে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে পুকুরটায় কানায় কানায় জল টলমল করছে!'

বিমল বললে, 'আপনি ভুল দেখেছেন!'

'না, অমি ঠিক দেখেছি।'

'তাহলে এর মধ্যে এক-পুকুর জল কোথায় গেল?'

'ওই আকাশে!'

এই অদ্ভুত উত্তরে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বিমল বললে, 'এক-পুকুর জল আকাশে উড়ে গেছে? না, না, এটা একেবারেই অসম্ভব!'

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাল সকালে আমি সব কথা খুলে বলব। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন, এর মধ্যে কিছুই অসম্ভব নেই। এখন ডাকবাংলোয় ফিরে যাওয়া যাক।'

কুমার মলিন মুখে বললে, 'কিন্তু আমার বাঘা?'

বিনয়বাবু বললেন, 'সে আর ফিরবে না। শুধু বাঘা নয়, আমরা মানুষের আর্তনাদও শুনেছি, একজন মানুষও নিশ্চয় বাঘার সঙ্গী হয়েছে।'

বিনয়বাবুর কথাই সত্য। পরদিন শোনা গেল, বিলাসপুরের একজন রাতের চৌকিদারের কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিমল বললে, 'দেখুন বিনয়বাবু, আপনি আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়ো। কাজেই এবার থেকে 'তুমি' বলেই ডাকবেন।'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা বিমল, তাই হবে।'

বিমল বললে, 'তাহলে এইবারে এখানকার আশ্চর্য ব্যাপারের গুপ্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বলুন।'

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'দ্যাখো আমি যা বলব, তা শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে কি না, জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করো আর নাই করো, এটুকু নিশ্চয়ই জেনো যে, আমি একটিও মনগড়া বাজে কথা বলব না, কারণ আমার প্রত্যেকটি কথাই বিজ্ঞানের মতে সত্য বলে প্রমাণ করা শক্ত হবে না। এমন কি, ইউরোপ-আমেরিকার বড়ো বড়ো পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয় নিয়ে এখন যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। আমিও এই বিষয় নিয়ে আজ অনেক বৎসর ধরে আলোচনা করে আসছি—'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এখানকার এইসব অলৌকিক কাণ্ডের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, 'বিমল ভায়া, এত অল্পেই ব্যস্ত হয়ে উঠো না। আগে মন দিয়ে আমার কথা শোনো...তোমরা জান তো, সোম, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি অনেক গ্রহ আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর এও জানি যে, আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে, তার নাম মঙ্গল বা মার্স।'

'হুঁ। ইউরোপ-আমেরিকার বড়ো বড়ো মানমন্দিরে আজকাল এমন সব প্রকাণ্ড দূরবীন ব্যবহার করা হয় যে, ওইসব গ্রহ-উপগ্রহ হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও, আমাদের চোখের সামনে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্তত কোনও কোনও গ্রহে পৃথিবীর মতো জীব বাস করে। এই সিদ্ধান্তের কারণও আছে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে বলে, দূরবীন দিয়ে তার ভিতরটাই বেশি করে দেখবার সুবিধে হয়েছে। পণ্ডিতেরা দেখেছেন যে, মঙ্গল গ্রহের ভিতরটা প্রায় মরুভূমির মতো। হয়তো প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে আর জলাভাবে সেখানে উদ্ভিদ জন্মানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে। মঙ্গল গ্রহের মধ্যে শত শত ক্রোশব্যাপী এমন প্রকাণ্ড খাল আছে, যার তুলনা পৃথিবীতেও নেই। সে খাল আবার এমন সোজাসুজি কাটা যে, তা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না।

বিমল অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বললে, 'অর্থাৎ সে খাল কৃত্রিম?'

'হ্যাঁ, আর এইখানেই একটা মস্ত আবিষ্কারের সূত্রপাত। আরও দেখা গেছে, সে খাল যত দূর অগ্রসর হয়েছে ততদূর পর্যন্ত দু-পাশের জমি সবুজ—অর্থাৎ গাছপালায় ভরা। এখন বুঝে দ্যাখো, কৃত্রিম খাল কখনও আপনা-আপনি প্রকাশ পায় না। নিশ্চয়ই তা মানুষ বা মানুষের মতো কোনও জীবের হাতে কাটা। আর এমন এক মরুভূমির মতন দেশে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শত শত ক্রোশব্যাপী কৃত্রিম খাল কেটে, চাষ-আবাদ করে যে জীব বেঁচে আছে, তারা যে খুব চালাক ও সভ্য, তাতেও আর কোনোই সন্দেহ নেই।'

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, এসব কথা আপনার মুখে আমি আরও অনেকবার শুনেছি। কিন্তু

বিলাসপুরের এই ভুতুড়ে কাণ্ডের সঙ্গে আপনি মঙ্গল গ্রহকে টেনে আনছেন কেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ক্রমে বুঝবে, আগে সব শোন। বৎসরের একটা ঠিক সময়ে, মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অনেকটা কাছে আসে। কিছুদিন আগে কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে পৃথিবীর বড়ো বড়ো বেতার-বার্তা পাঠাবার স্টেশনে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বেতারযন্ত্রে এমন সব অদ্ভুত বার্তার সঙ্কেত এসেছিল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি। সেসব সঙ্কেত কোথা থেকে আসছে, তাও জানা যায়নি। ঠিক সেই সময়েই কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এসেছিল পৃথিবীর খুব কাছেই। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা স্থির করতে বাধ্য হলেন যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারাই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে বেতার-বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তাদের বার্তার সঙ্কেত আলাদা বলেই আমরা তা বুঝতে পারি না।'

বিমল বললে, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে বটে, কিছুদিন আগে এমনি একটা ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজে মহা আন্দোলন চলেছিল।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে সংবাদপত্রে আরও একটা খবর তোমরা পড়েছ বোধহয়? আমেরিকার একজন সাহসী বৈজ্ঞানিক রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।'

কুমার আশ্চর্য স্বরে বললে, 'রকেটে চড়ে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ তোমাদের সাধারণ বাজিওয়ালার হাতে তৈরি ছেলেখেলার রকেট নয়—তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়ো। তার মধ্যে মস্ত এক ধাতু-তৈরি ঘর থাকবে, সে ঘরে থাকবেন সেই সাহসী বৈজ্ঞানিক। উপরের ঘরের তলায় থাকবে বারুদের ঘর। মঙ্গল গ্রহ যে সময়ে পৃথিবীর কাছে আসবে, সেই সময়ে এই রকেট ছোড়া হবে। বায়োস্কোপের এক অভিনেতা একটি মাঝারি আকারের রকেটে চড়ে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিরাপদে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব নয়।'

বিমল বললে, 'কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণিত হচ্ছে?'

'এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মঙ্গল গ্রহ আর পৃথিবীর বাসিন্দারা পরস্পরের পরিচয় জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন যদি আমি বলি যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা আমাদের চেয়ে আরও কিছু বেশি অগ্রসর হয়েছে, অর্থাৎ তারা ইতিমধ্যেই পৃথিবী থেকে নমুনা নিয়ে যেতে শুরু করেছে, তাহলে কি অত্যন্ত অবাক হবে?'

বিমল, কুমার আর কমল একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, বলেন কী,—বলেন কী?'

বিনয়বাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বিলাসপুরে এই যেসব অলৌকিক কাণ্ড হচ্ছে তা মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের কীর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর যা কিছু দেখেছে, পরীক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'কিন্তু কী উপায়ে?'

'উপায়ের কথা আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না বটে, তবে আমি যা আন্দাজ করেছি, সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে।....আমাদের জানা আছে যে পৃথিবীর উপরে মাইল-কয়েক পর্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব, তার পরে আর বাতাস নেই, আছে কেবল শূন্য। এই শূন্যের মধ্যে অন্য যেসব

গ্রহ ঘুরছে, তাদের মধ্যে হয়তো পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে, কিংবা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যেতে আসতে হলে বায়ুহীন শূন্য পার হতে হবে। আমার বিশ্বাস মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা ডুবোজাহাজের মতো এয়ার-টাইট বা ছিদ্রহীন এমন কোনও ব্যোমযান তৈরি করেছে, যার ভিতরে দরকার-মতো বাতাসের কিংবা অক্সিজেন বাষ্পের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যোমযানে চড়ে শূন্য পার হয়ে তারা পৃথিবীর আবহাওয়াতে এসে হাজির হয়েছে। ....কাল রাত্রে যখন এখানকার চৌকিদার আর বাঘা আর্তনাদ করেছিল আকাশের দিকে চেয়ে তখন আমি লক্ষ্য করেছিলুম,—অনেক উঁচুতে চাঁদের আলোর মাঝখানে প্রকাণ্ড কি একটা ছায়ার মতো ভাসছে—খানিক পরেই আবার তা মিলিয়ে গেল। আমার বিশ্বাস সে ছায়া আর কিছু নয়—মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান।'

খানিকক্ষণ সকলেই অভিভূতের মতন স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। বিনয়বাবু যা বললেন, কেউ তা স্বপ্নেও কোনওদিন কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা মঙ্গল গ্রহের কোনও লোককে তো দেখতে পাইনি! তবে বিলাসপুর থেকে স্টিমার, ইঞ্জিন, বটগাছ, পুকুরের জল আর জীবজন্তু কেমন করে অদৃশ্য হচ্ছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'এ প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেওয়া শক্ত; তবে ওই রহস্যময় ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রবাহের জন্য আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। তোমরা Vacuum Cleaner কেউ দেখেছ?'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ শিয়ালদহ স্টেশনে দেখেছি। একটি যন্ত্রের সঙ্গে লম্বা নল আছে। সেই নলের মুখ ধুলোর উপরে ধরে যন্ত্র চালালেই ভিতর থেকে হু-হু করে হাওয়া বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধুলো নলের ভিতর ঢুকে পড়ে। এই উপায়ে খুব সহজেই ধুলো সাফ করা যায়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'খুব সম্ভব মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা এইরকম কোনও যন্ত্রের সাহায্যেই পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করছে। তবে তাদের এই Vacuum যন্ত্রটি এত বড়ো ও শক্তিশালী যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্টিমার, ট্রেন ও বটগাছ, এমন কি এক-পুকুর জল পর্যন্ত তা অনায়াসে শুষে গিলে ফেলতে পারে! আচমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বইবার আর কোনও কারণ তো আমার মাথায় আসছে না। যন্ত্রটি যখন বায়ুশূন্য হয়, সেই সময়েই চারিদিকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগে। এই আমার মত।'

কুমার শোকাচ্ছন্ন স্বরে বললে, 'তাহলে আমার বাঘাকে আর কখনও ফিরে পাব না?'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।'

বিমল চিন্তিতভাবে বললে, 'বিনয়বাবু, জানি না আপনার কথা সত্য কিনা! কিন্তু আপনার যুক্তি শুনলে এসব ব্যাপার অবিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। আচ্ছা, এ বিষয় নিয়ে আপনি যখন এত আলোচনা করছেন, তখন বলতে পারেন কি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা কি রকম? তারা কি মানুষেরই মতো দেখতে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'তা কী করে বলব? তবে তাদের মস্তিষ্ক যে খুব উন্নত, তারা যে যথেষ্ট সভ্য, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানেও খাটো নয়, তাদের কাজ দেখে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অবস্থা, জল-মাটি আবহাওয়া আর জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী অনুসারেই আমাদের চেহারা

এ-রকম হয়েছে; মঙ্গল গ্রহের ভিতরকার অবস্থা যদি অন্যরকম হয়, তবে সেখানকার জীবেরা মানুষের চেয়ে বেশি সভ্য আর বুদ্ধিমান হলেও, তাদের চেহারা অন্যরকম হওয়াই সম্ভব।'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, 'এবার থেকে এখানে বন্দুক না নিয়ে আমি পথে বেরুব না।'

'কেন?'

দাঁতে দাঁতে চেপে বিমল বললে, 'যদি সুবিধে পাই, বুঝিয়ে দেব যে, মানুষ বড়ো নিরীহ জীব নয়!'

আকাশ থেকে মাংস বৃষ্টি

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বিনয়বাবুর সঙ্গে সকলে বেড়িয়ে বাংলোর দিকে ফিরছিল। গেল রাতের সেই প্রায় শুকনো পুকুরটার কাছে এসে বিনয়বাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুকুরের দুদিকে বাঁধা-ঘাট,—কিন্তু জল নেমে যাওয়াতে ঘাটের সব-নিচের শেওলামাখা সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুকুরের তলায় এখনও অল্প একটু জল চিকচিক করছে।

বিনয়বাবু যেন আপনা আপনি বললেন, 'যে যন্ত্র দিয়ে এত অল্প সময়ে অতখানি জল শুষে নেওয়া যায়, সে যন্ত্রটা না-জানি কী প্রকাণ্ড! খালি ঠাণ্ডা হাওয়া নয়, এই পুকুর-চুরি দেখেও আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে যে, যন্ত্রটি নিশ্চয়ই Vacuum! বিশেষ, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা যে এয়ার-টাইট ব্যোমযানে করে এসেছে, তার আকারও নিশ্চয় সামান্য নয়! নইলে তার ভিতরে স্টিমার, ইঞ্জিন, বটগাছ আর প্রায় এক পুকুর জল থাকবার ঠাঁই হত না!'

হঠাৎ উপর থেকে কি কতকগুলো জিনিস ঝপাং করে পুকুরের ভিতরে এসে পড়ল এবং কতকগুলো পড়ল পুকুরের পাড়ের উপরে। সকলে বিস্মিত চোখে উপরদিকে তাকিয়ে দেখলে—কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। কেবল অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে ছায়ার মতো কি যেন একটা জেগে রয়েছে,—কিন্তু সেটা এত অস্পষ্ট যে, তার বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না!

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হায়, হায়, কলকাতা থেকে আসবার সময় একটা ভাল দূরবীন যদি সঙ্গে করে আনতুম, তাহলে এখনই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যেত!'

কমল বললে, 'কিন্তু আকাশ থেকে ওগুলো কী এসে পড়ল?'

বিমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, খানিক তফাতেই রাঙা পিণ্ডের মতন কি একটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়েই সে সভয়ে আবার পিছিয়ে এসে বলে উঠল, বিনয়বাবু!'

'কী বিমল, ব্যাপার কী?'

'এ যে মানুষের দেহ!'

'অ্যাঁ, বলো কি!'

সকলেই সেই রাঙা পিণ্ডটার দিকে বেগে ছুটে গেল...সামনে সত্যই একটা রক্তমাখা মাংসের স্তূপ পড়ে রয়েছে, অনেক উঁচু থেকে পড়ার দরুন সেটা এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে যে

সহজে তা মানুষের দেহ বলে চেনাই যায় না। তবে দেহের কোনও কোনও অংশ এখনও তার মনুষ্যত্বের অল্প-স্বল্প পরিচয় দিচ্ছে।...

কমল বললে, 'লোকটা বোধহয় মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে লাফিয়ে পড়েছিল!'

কুমার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আহা বেচারা!...আমার বাঘাও সেখানে আছে, না জানি সে কী করছে!'

কিন্তু বিনয়বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই মাংস-পিণ্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'না, এই দেহ যার, সে নিজে উপর থেকে লাফিয়ে পড়েনি।'

বিমল বললে, 'তবে?'

'লাফিয়ে পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল!'

'কী করে জানলেন আপনি?'

বিনয়বাবু মাংস-পিণ্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, এই মড়াটার একটা হাত আর বুকের একটা পাশ এখনও থেতলে গুঁড়ো হয়ে যায়নি। ভালো করে চেয়ে দ্যাখো দেখি,—কী দেখছ?'

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে দেখতে লাগল। তারপর বললে, 'একি, এর দেহের উপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে!'

খালি তাই নয়, বুকের আর হাতের উপরকার মাংস ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।'

'কেন বিনয়বাবু?'

'ভালো করে দেখলে তাও বুঝতে পারবে। দ্যাখো না, মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা ঠিক যেভাবে মড়া কাটে, এই দেহটার উপরেও ঠিক সেইভাবে ছুরি চালানো হয়েছে। বিমল, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করে দেখেছে।'

'তার মানে?'

'তারা দেখতে চায়, মানুষ কোন শ্রেণীর জীব। হুঁ, এখন বুঝতে পারছি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা নিশ্চয়ই মানুষের মতো নয়, কারণ তা যদি হত তাহলে মানুষের দেহ নিয়ে এভাবে পরীক্ষা করবার আগ্রহ তাদের নিশ্চয়ই থাকত না।...বিমল, কুমার, পৃথিবীতে সত্যই যে মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান এসেছে, আর বিলাসপুরের স্টিমার ইঞ্জিন যে আকাশেই অদৃশ্য হয়েছে, উপর থেকে এই মড়ার আবির্ভাবে তোমরা বোধহয় সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছ?'

বিমল, কুমার ও কমল কেউ কোনও জবাব দিলে না; আজ এই চাক্ষুষ প্রমাণের উপর আর কোনও সন্দেহ চলে না।

রামহরি বললে, 'কিন্তু বাবু, পুকুরের ভেতরেও যে এইসঙ্গে কি কতকগুলো এসে পড়েছে! সেগুলো কী, দেখবেন না?'

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'না রামহরি, আর দেখবার দরকার নেই। সেগুলোও হয়তো আর কোনও অভাগার দেহ! মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা নিশ্চয় এদের হত্যা করেছে, তারপর পরীক্ষা শেষ করে দেহগুলোকে আবার পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছে।'

রামহরি বললে, 'আপনার কথা শুনে তো বাবু আমি কিছুই ঠাউরে উঠতে পারছি না! আকাশে তো দেবতারা থাকেন, তবে কি দেবতারাই পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন?'—বলেই সে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল।

বিমল রেগে বললে, 'রামহরি, এখান থেকে তুই বিদায় হ! এ সময়ে তোর বোকামি আর ভালো লাগে না।'

'রামহরি বললে, 'চটো কেন খোকাবাবু? আমি তো আর তোমাদের মতো ক্রিশ্চান নই, রামপাখির ঝোলও খাই না। ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করা আমি বোকামি বলে মনে করি না।'

বিমল আরও চটে বললে, 'বেশ, এবারে দেবতাদের সাড়া পেলেই তোকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব, আপাতত তুই মুখ বন্ধ কর।'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিনয়বাবু, এ যে বড়ো ভয়ানক কথা! আপনার ওই মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবী থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করবে, আর আমরা চুপ করে বসে তাই দেখব? তাদের বাধা দেবার কি কোনও উপায় নেই?'

বিনয়বাবু বললেন, 'উপায় একটা করতেই হবে বইকি! মানুষ এখনও টের পায়নি, তাদের মাথায় উপরে কী বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। আজ যে অত্যাচার খালি বিলাসপুরে হচ্ছে, দু-দিন পরে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু কী উপায় আপনি করবেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'তা আমি এখন বলতে পারি না। তবে আজকেই আমি আমার মতো একটি প্রবন্ধে খুলে লিখব, আর কাল তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করব। সকলকে আগে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া দরকার,—কারণ আমাদের মতো দু-একজনের চেষ্টায় কোনোই সুবিধা হবে না, এখন সকলকে একসঙ্গে মিলেমিশে করতে হবে।'

কমল বললে, 'কিন্তু বিনয়বাবু, দেশের লোকে যদি আপনার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়?'

'তাহলে তারা নিজেরাই মরবে। আমার যুক্তি আর এমন সব চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলে আমি নাচার। তবু আমার কর্তব্য আমি করে খালাস হব। এখন চলো।' সকলে বাংলোর দিকে ফিরল। যেতে যেতে মুখ তুলে বিমল দেখলে, আকাশের গায়ে সেই অদ্ভুত ছায়াটা এখনও জেগে আছে,—তবে আরও ছোটো আরও অস্পষ্ট।

বিমল অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল—না জানি এমন কী গভীর রহস্য ওই বিচিত্র ছায়ার আড়ালে লুকানো আছে, যা শুনলে সারা পৃথিবীর বুক ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

বিখ্যাত হওয়ার বিপদ

পরদিনের সকালে খবরের কাগজ আসবামাত্র বিমল তাড়াতাড়ি সেখানি নিয়ে পড়তে বসল,—কারণ আজকেই বিনয়বাবুর প্রবন্ধটা প্রকাশ হবার কথা।

খবরের কাগজ খুলেই বিমল সর্বপ্রথমে দেখলে, বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে—

বিলাসপুরের নূতন রহস্য!
আকাশ হইতে মানুষের মৃতদেহ পতন!

তারপর গতকল্য বিলাসপুরে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং আমরা আগেই যার ইতিহাস দিয়েছি, তার বর্ণনা। তার পরেই আবার বড়ো বড়ো অক্ষরে—

বিশেষজ্ঞের বিচিত্র আবিষ্কার
মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা!
পৃথিবীর ভীষণ বিপদ।

শিরোনামার তলায় বিনয়বাবুর প্রবন্ধ। বিনয়বাবু কিছুমাত্র অত্যুক্তি না করে বেশ সরল ও সহজ ভাষায় আপনার মত ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর মতও আমরা আগেই প্রকাশ করেছি, সুতরাং এখানে আর তা উল্লেখ করবার দরকার নেই। প্রবন্ধের শেষে সম্পাদক লিখেছেন—বিনয়বাবু যে আশ্চর্য ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সহজে কল্পনায় আসে না। হয়তো অনেকেই তাঁহার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমরা আপাতত তাঁহার মত সমর্থন করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছি না। কারণ বিনয়বাবু বহু বৎসর আলোচনা চিন্তা ও বিচারের পর এবং চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব যে বিনয়বাবুর মন-গড়া কথা, তাহাও নহে! ইউরোপ আমেরিকার অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত এ ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়াই মানিয়া থাকেন। এমন কি বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারক মার্কনি সাহেবও একবার মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিনয়বাবুর মত যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া বিলাসপুরের আশ্চর্য রহস্যের কিনারা করিবার আর কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। আসল কথা, এই গুরুতর ব্যাপার লইয়া এখন রীতিমতো চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ বিনয়বাবু পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর মাথার উপরে বিষম এক বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে,—সময় থাকিতে সাবধান না হইলে এ বিপদ আরও ভয়ানকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, সম্পাদক আপনারই মত সমর্থন করেছেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যার মাথায় এতটুকু যুক্তি আছে, তাকে আমার মত মানতেই হবে।' —এই বলে খবরের কাগজখানা নিয়ে তিনি পড়তে বসলেন।

বৈকালে ডাকবাংলোতে লোক আর ধরে না! স্থানীয় জমিদার, মোড়ল ও মাতব্বর ব্যক্তিরা বিলাসপুরের এবং আশেপাশের গাঁয়ের লোকজনে ডাকবাংলোর ঘর থেকে বারান্দা পর্যন্ত ভরে গেল। কলকাতার অনেক খবরের কাগজের অফিস থেকেও সাহেব ও বাঙালি প্রতিনিধিরা এলেন। এ অঞ্চলের পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ও দারোগা প্রভৃতি এসেও ঘরের একপাশে আসন সংগ্রহ করলেন। সকলেরই ইচ্ছা, বিনয়বাবুর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আলোচনা করা।

বিনয়বাবুর প্রথমটা ভয় ছিল, লোকে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে কি না। কিন্তু এখন দেখলেন, তাঁর উল্টো বিপদ উপস্থিত। সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তাঁর প্রাণ যায় আর কি?

পুলিসসাহেব খানিকক্ষণ বিনয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, 'আচ্ছা বিনয়বাবু, আপনার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?'

সাহেব বললেন, 'রাত্রে গাঁয়ে সশস্ত্র সেপাই বসিয়ে রাখব কি?'

'কেন?'

'মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ কাছে এলেই সিপাইরা বন্দুক ছুড়বে।'

বিনয়বাবু একটু ভেবে বললেন, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু এই উড়োজাহাজ কিরকম পদার্থ দিয়ে তৈরি তা তো আমি বলতে পারি না। বন্দুকের গুলিতে তার ক্ষতি হতেও পারে, না হতেও পারে।'

সন্ধ্যার পরে একে একে সবাই যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, বিনয়বাবু শ্রান্তভাবে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লেন।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু, একদিনেই আপনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন!'

বিনয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, 'বিখ্যাত হওয়ার এত জ্বালা! আমার কী মনে হচ্ছে জানো বিমল? ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!'

বিমল বললে, 'ওরা আপনাকে ছেড়ে দিলে তো কেঁদে বাঁচবেন! কিন্তু ওরা যে আপনাকে ছাড়বেই না। আপনি এখন যেখানে যাবেন ওরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।'

'কেন, কেন?'

'কারণ আপনি এখন বিখ্যাত হয়েছেন।'

'বটে, বটে, তাই নাকি? তাহলে আমি অজ্ঞাতবাস করব।'

'ওরা আবার আপনাকে খুঁজে বার করবে।'

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বললেন, 'তাহলে আমাকে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করতে হবে। বিমল, এই একদিনেই কথা কয়ে কয়ে আমার মুখে ব্যথা ধরে গেছে, আজ সারাদিন আমি একটুও জিরুতে পারিনি।'

শূন্যে

আজ সকাল থেকে ডাকবাংলোয় লোকের পর লোক আসছে—সারা দিনের মধ্যে বিনয়বাবু একটু হাঁপ ছাড়বারও ছুটি পেলেন না।

বৈকালে তিনি মরিয়া হয়ে বাংলো ছেড়ে পলায়ন করলেন—সঙ্গীদের কোনও খবর না দিয়েই।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি চারিদিকে খুঁজতে বেরুল, কিন্তু বিনয়বাবুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাইতো, সত্যি-সত্যিই তিনি দেশত্যাগী হয়ে গেলেন নাকি?'

রামহরি বললে, 'হয়তো এতক্ষণে তিনি নিজেই বাসায় ফিরেছেন।'

বিনয়বাবু প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেও রক্ষা পেলেন না, শূন্যের সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কি একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে তুচ্ছ ছেঁড়া পাতার মতো তিনি তীরের চেয়েও বেগে আকাশের দিকে উঠে গেলেন—কানের কাছে বাজতে লাগল কেবল একটা ঝড়ের শনশনানি এবং দুম-দুম করে অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ।...তার পরেই বিষম একটা ধাক্কা—সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণায় তিনি কেমন যেন আচ্ছন্নের মতন হয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে বিনয়বাবু প্রথমেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে যেন একটা নীল রঙের স্রোত। হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝলেন, তিনি আর শূন্যে নেই, একটা শীতল পদার্থের উপরে শয়ন করে আছেন।

আস্তে আস্তে উঠে বসে দেখলেন, যার উপরে তিনি শুয়ে ছিলেন সেটা কাচের মতো স্বচ্ছ এবং তার রঙ আকাশের মতোই নীল। কেবল তাই নয়—তার ভিতর দিয়ে অনেক নিচে পৃথিবীর গাছপালা ও আলো দেখা যাচ্ছে।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বিনয়বাবু ভালো করে গৃহতলটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, তা নীল রঙের কাচের মতন এমন কোনও স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী, পৃথিবীতে যা পাওয়া যায় না। বিনয়বাবুর এটা বুঝতেও দেরি হল না যে, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজের সমস্তটাই ঠিক এই একই পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত। মেঝের উপরে বারকয়েক সজোরে করাঘাত করে তিনি আরও বুঝলেন, যে জিনিসে এটা তৈরি তা স্বচ্ছ ও পাতলা হলেও, রীতিমতো কঠিন ও হালকা।

তারপরেই বিনয়বাবুর মনে পড়ল তাঁর সঙ্গীদের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনতে পেলেন, বিমল অত্যন্ত বিহ্বল স্বরে ডাকছে, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!'

বিনয়বাবু চেয়ে দেখলেন খানিক তফাতেই বিমল দুই হাতে ভর দিয়ে বসে আছে।...আরও

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!

খানিক তফাতে রামহরি উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার কাছেই কমল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে এবং আর একটু দূরে দুই হাঁটুর ভিতরে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে কুমার।

দলের সবাইকে একত্রে অক্ষত দেহে দেখতে পেয়ে, এত বিপদের মধ্যেও বিনয়বাবুর মনটা খুশি হয়ে উঠল।

বিমল আবার ডাকলে, 'বিনয়বাবু!'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললেন, 'কী ভাই বিমল, কী বলছ?'

'এসব আমরা কোথায় এলুম?'

'বুঝতে পারছ না? মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে।'

'তাহলে আপনার সন্দেহই সত্য?'—বলেই বিমল বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, এ উড়োজাহাজ কী আশ্চর্য জিনিস দিয়ে তৈরি, সেটা কিন্তু

ধরতে পারছি না। এ জিনিসটা নীল-রঙা কাচের মতো, অথচ কাচ নয়। উপরে চেয়ে দেখো, দেয়ালের ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু এ উড়োজাহাজ চালাচ্ছে কারা?'

'এখনও তাদের কারুর দেখাই পাইনি।...বিমল, বিমল, মনে আছে তো, আমি বলেছিলুম যে কোনও Vacuum যন্ত্র দিয়ে এই উড়োজাহাজ পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে? ওই দ্যাখো!'

বিমল হেঁট হয়ে স্বচ্ছ গৃহতলের ভিতর দিয়ে দেখলে, তাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে, একটা বিরাট ঘণ্টার মতন জিনিস নিচের দিকে নেমে গেছে—তার দীর্ঘতা প্রায় তিনশো ফুট ও বেড় প্রায় একশো ফুটের কম হবে না।

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, 'অত বড়ো একটা যন্ত্র যখন এই উড়োজাহাজের গায়ে লাগানো আছে, তখন এর আকার না জানি কী প্রকাণ্ড!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এত বড়ো উড়োজাহাজের কল্পনা বোধহয় পৃথিবীতে এখনও কেউ করতে পারেনি। যে উড়োজাহাজে আমরা আছি, এটা নিশ্চয়ই একটা ছোটোখাটো শহরের মতন বড়ো!'

'কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো বিমল? আমরা ওই Vacuum যন্ত্র দিয়ে এখানে কী করে এলুম? চেয়ে দ্যাখো, আমরা এখন যেখানে আছি, এর চারদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কে বা কারা আমাদের এখানে নিয়ে এল? আর কোনও পথ যখন নেই, তখন আমরা এখানে এলুমই বা কেমন করে?'

বিমল বললে, 'কেমন একটা ধাক্কা লাগতে আমি আচ্ছন্নের মতন হয়ে পড়েছিলুম, কোথা দিয়ে কী যে ঘটল কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'আমারও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটেছিল। কিন্তু ওই দেওয়ালগুলোর পিছনে কী আছে? জানবার জন্যে আমার কেমন কৌতূহল হচ্ছে।'

কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির কোনও উপায়ও নেই। কারণ বিনয়বাবুরা যে কামরায় আছেন, তার ছাদ, মেঝে ও এক পাশের দেওয়াল ছাড়া আর তিনদিকের দেওয়াল কালো রঙের পর্দা দিয়ে ঘেরা—স্বচ্ছ দেওয়ালের ও-পাশে পর্দার ভাঁজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

বিমল বললে, 'এ কামরায় যে আলো জ্বলছে, তা লক্ষ্য করে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে নিশ্চয়ই রেডিয়ামের সাহায্যে।'

'রেডিয়ামের সাহায্যে?'

'হ্যাঁ। রাত্রের অন্ধকারে রেডিয়ামের ঘড়ি দেখেছ তো? এখানে সেই উপায়ে, অর্থাৎ ঘড়ির বদলে ঘর আলোকিত করা হয়েছে। বিমল, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে আসতে বাধ্য হয়ে তুমি ভয় পাওনি তো?'

'না, বিনয়বাবু, ভয় আমি মোটেই পাইনি, কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছি।'

'চিন্তিত হয়েছ? কেন?'

'আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।'

'ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও বিমল, ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও; এখন খালি বর্তমানের কথা ভাবো। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। আমাদের চোখের সামনে এখন এক নতুন জ্ঞানের রাজ্য খোলা রয়েছে—এক নতুন জগৎ, নতুন দৃশ্যের পর নতুন দৃশ্য! এমন সৌভাগ্য যে আমার হবে, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি!'

পিছন থেকে এতক্ষণ পরে কুমার বললে, 'আপনার এ আনন্দ বেশিক্ষণ থাকবে না বিনয়বাবু! ভেবে দেখেছেন কি, আমরা আর কখনও পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব না?'

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু সে কথা ভেবে মন খারাপ করে কোনও লাভ নেই তো ভাই! পুরানো পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে নতুনভাবে জীবনযাপন করব? মন্দ কী?'

কমল বললে, 'কিন্তু এটাও ভুলবেন না বিনয়বাবু, যারা আমাদের ধরে এনেছে, তারা মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদ করে।'

রামহরি বললে, 'আমরা যে ভূত-প্রেতের হাতে পড়িনি, তাই-বা কে বলতে পারে!'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'প্রাণ আমি সহজে দেব না! বাংলো থেকে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলুম, সে বন্দুকও আমার সঙ্গে এখানে এসেছে।'

কুমার বললে, 'বন্দুক আমারও আছে। প্রথমে ঝোড়ো হাওয়ার টানে বন্দুকটা আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও উপরে এসে হাজির হয়েছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, কুমার, তোমরা ছেলেমানুষি করো না। যারা আমাদের ধরে এনেছে, তাদের বুদ্ধি আর শক্তির কিছু কিছু পরিচয় তো এর মধ্যেই পেয়েছ। দুটো বন্দুক নিয়ে এদের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে? তার চেয়ে—'

বিনয়বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে একদিকের দেওয়ালটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'সাবধান! দেওয়ালটা এরা নিশ্চয় কোনও কল টিপে সরিয়ে ফেলেছে! এতক্ষণে বুঝলুম, এ কামরায় দরজা নেই কেন।'

দেওয়ালটা যখন একেবারে সরে গেল, তখন সামনেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সকলেই সবিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

রামহরি তাড়াতাড়ি দুই হাতে চোখ চেপে ফেলে বললে, 'এরা যমদূত, এরা যমদূত! আমাদের নরকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে!'

এমন কি বিনয়বাবু পর্যন্ত কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—তাঁর মনে হল, তিনি যেন এক ভয়ানক উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন!

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিনয়বাবু দেখলেন, দেওয়ালটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত জীব তাঁদের সামনে এসে আবির্ভূত হল।

তার মাথাটা প্রকাণ্ড, এবং বিশেষ করে বড়ো কপাল থেকে খুলির দিকটা। মুখখানা অবিকল ত্রিকোণের মতন দেখতে। চোখ দুটো ঠিক গোল ভাঁটার মতন—তাদের ভিতরে রক্তজবার মতো রাঙা দুটো তারা। কান দুটো শিঙের মতো। নাকের কাছে গোল একটা ছ্যাঁদা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠোঁট ধনুকের মতন বাঁকা।

তার দেহ ও হাত-পা মানুষের মতন বটে, কিন্তু আকারে সমস্ত দেহটাই মাথা ও মুখের চেয়ে বড়ো হবে না। বিশেষ, তার দেহ আর হাত-পা অসম্ভব রকম রোগা ও অমানুষিক! তার উচ্চতা হবে বড়োজোর তিন ফুট—এর মধ্যে মাথা ও মুখের মাপই বোধহয় দেড় ফুট!

এই অপরূপ মূর্তির রঙ ঠিক শ্লেটের মতন, কিন্তু তার মাথায় বা মুখে একটিমাত্র চুলের চিহ্নও নেই।

মূর্তির পরনে লাল রঙের খাটো কোট,—কিন্তু কোটের হাতা কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। কোটের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শাদা রঙের ইজের বা হাফপ্যান্ট। পায়ে খড়মের মতো কাষ্ঠপাদুকা। খড়মের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, আঙুলের ও গোড়ালির দিকে দুটো করে চামড়ার ফিতে দিয়ে জুতো-জোড়া পায়ে লাগানো আছে। মূর্তির কোমরে একখানা তরবারি ঝুলছে, লম্বায় সেখানা পৃথিবীতে ব্যবহৃত ছোরার চেয়ে বড়ো নয়—চওড়ায় আরও ছোটো পেনসিল-কাটা ছুরির মতো।

মূর্তি তার ভয়ানক। চোখ মেলে বন্দীদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর বাজখাঁই গলায় কি একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তখনই আর একদল ঠিক সেইরকম মূর্তি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। এই নতুন দলের সকলের হাতেই একগাছা করে বর্শা।

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এরাই কি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা?'

বিনয়বাবু বললে, 'তাই তো দেখছি!'

বিমল বললে, 'এই তুচ্ছ জীবগুলো এসেছে পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করতে।'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বিমল, চেহারা এদের যেমনই হোক, কিন্তু এদের তুচ্ছ বলে ভেবো না। কারণ যারা এমন আশ্চর্য উড়োজাহাজ তৈরি করেছে তাদের তুচ্ছ বলে ভাবলে ভুল করা হবে। ওই প্রকাণ্ড মাথাই ওদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। পণ্ডিতদের মতে, হাজার হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মানুষদেরও হাত-পা আর দেহ ছোটো হয়ে গিয়ে মাথা বড়ো হয়ে উঠবে। যারা যে অঙ্গ যত বেশি ব্যবহার করে তাদের সেই অঙ্গ তত বেশি প্রধান হয়ে ওঠে। দিনে দিনে মানুষের মস্তিষ্কের চর্চা বাড়ছে, দেহের চর্চা কমছে; কাজেই তাদের মাথা স্বাভাবিক নিয়মে বড়ো হয়ে উঠবেই।'

কুমার বললে, 'ওদের বর্শার ফলাগুলো কী দিয়ে তৈরি? ও যে ঠিক সোনার মতো দেখাচ্ছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমারও সন্দেহ হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহে হয় লোহা পাওয়া যায় না, নয় সেখানে সোনা এত সস্তা যে, তার কোনও দাম নেই।'

বিমল বললে, 'প্রথম জীবটা বোধহয় ওদের দলপতি। ওই দেখুন, এইবারে ওরা আমাদের কাছে আসছে।'

মূর্তিগুলো এগিয়ে এসে বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর দলের ভিতর থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে শিকল।

প্রথমেই একজন এসে বিমলের হাত ধরে টানলে, তারপর তার হাতে শিকল পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। চকিতে হাত সরিয়ে বিমল ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী! এত বড়ো আস্পর্ধা!' চোখের পলক না ফেলতে বিমলের চারপাশে পঁচিশ-ত্রিশটা বর্শার ফলা চমকে উঠল।

বিনয়বাবু বললেন, 'দোহাই তোমার, ওদের বাধা দিয়ো না, আমাদের প্রাণ এখন ওদেরই হাতে!'

বিমলের চারপাশে পঁচিশ-ত্রিশটা বর্শার ফলা চমকে উঠল।

বিমল বললে, 'তা বলে আমি আমার হাত বাঁধতে দিচ্ছি না। এই হেঁড়ে-মাথা তালপাতার সেপাইগুলোকে আমরা এখনই টিপে মেরে ফেলতে পারি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'এ দলের পিছনে আরও কত দল আছে কে জানে? ছেলেমানুষি করলে আমরা সকলে মারা পড়ব!'

বিমল অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে।....একে একে সকলেরই হাত তারা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললে।

রামহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'এইবারে আমাদের নিয়ে গিয়ে এরা বলি দেবে!'

কুমার বললে, 'একটু পরে যখন মরতেই হবে, তখন যেচে ধরা দেওয়াটা ঠিক হল কি?'

কমল কিছু বললে না, নিজের বাড়ির কথা আর বাপ-মায়ের মুখ মনে করে তার তখন কান্না আসছিল।

বিনয়বাবু এক মনে হাতের শিকল পরখ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বললেন, 'বিমল, হাতের শিকল ভালো করে দেখেছ?'

'কেন?'

'এ শিকল খাঁটি সোনার!'

রামহরি বিস্ফারিত চক্ষে হাতের শৃঙ্খলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাহলে এ শিকল আর আমি ফিরিয়ে দেব না।' সোনার মায়া এমনই আশ্চর্য যে, বন্দী হয়েও রামহরির মন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল।

এদিকে সেই সশস্ত্র জীবগুলো একদিকে সার গেঁথে দাঁড়াল। তাদের দলপতি বন্দীদের সামনে এসে, হাতের ইশারায় অগ্রসর হতে বললে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এসো, সকলে মিলে এগুনো যাক। এই বারে এখানে আরও কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে, সমস্তই দেখতে পাওয়া যাবে।'

চৌবাচ্চায় পুষ্করিণী

সব আগে বিনয়বাবু, তারপর যথাক্রমে বিমল, কুমার, কমল আর রামহরি এবং তারপর মঙ্গল গ্রহের হেঁড়েমাথা বামন সেপাইরা পরে পরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

বিনয়বাবু দেখলেন, তাঁরা একটি খুব লম্বা পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন—সে পথের উপরে দীর্ঘতা অন্তত হাজার ফুটের কম হবে না। বলাবাহুল্য, পথটাও সেই নীল রঙা কাচের মতো জিনিস দিয়ে তৈরি। পথে দুপাশে সারি-বাঁধা ঘর এবং সব ঘরের দেওয়ালই কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা।

খানিক দূরে যেতে-না-যেতেই সেপাইদের দলপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে, ঝকঝকে সোনার তরোয়াল খুলে বন্দীদের দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলে। তারপর এক পাশের পর্দা সরিয়ে একটা অব্যক্ত তীব্র শব্দ করে সামনের দরজায় তিনবার ধাক্কা মারলে। অমনি দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল এবং আর-একটি বামনমূর্তি বাইরে এসে দাঁড়াল।

এ মূর্তির আকারও আগেকার মূর্তিগুলিরই মতো, কিন্তু তার পোশাক অন্যরকম। তার গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা সবুজ রঙের কোর্তা, মাথায় একটা লাল রঙের টুপি—দেখতে অনেকটা গাধার টুনির মতো। কোর্তার উপরে একছড়া মালা—তাতে অনেকগুলো পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, 'বিমল, পাথরগুলো বোধহয় হীরে!'

বিমল বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে!...কিন্তু এর কাছে আমাদের নিয়ে এল কেন?'

'বোধহয় এই জীবটাই এখানকার কর্তা। দেখছ না, সেপাইদের দলপতি ওকে হেঁট হয়ে

অভিবাদন করলে। ওর পোশাকও সেপাইদের চেয়ে ঢের বেশি জমকালো!'

নতুন মূর্তিটা খানিকক্ষণ বন্দীদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলে; তারপর সেপাইদের দলপতির দিকে ফিরে মঙ্গল গ্রহের ভাষায় কি বলতে লাগল। বিনয়বাবু খুব মন দিয়ে শুনেও সে ভাষার কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু কতকগুলো বিষয় তিনি লক্ষ্য করলেন। প্রথমত, তাদের ভাষায় বর্ণমালা খুব কম, কারণ কথা কইতে কইতে তারা একই বর্ণ ক্রমাগত উচ্চারণ করে। দ্বিতীয়ত, চীনেদের মতো তাদের ভাষায় অনুঃস্বরের বিশেষ বাড়াবাড়ি।

কথাবার্তা শেষ করে সেপাইদের দলপতি বন্দীদের কাছে আবার ফিরে এল। তারপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে আবার সকলকে অগ্রসর হতে বললে।

বন্দীরা আবার অগ্রসর হল, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হয়েই সকলে বিস্মিতভাবে শুনতে পেলে, কেমন একটা কিচির-মিচির শব্দ হচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ যে একদল বানরের চিৎকার!'

কমল বললে, 'মঙ্গল গ্রহেও বানর আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'না, আমার বোধহয় এ সেই বানরের দল—বিলাসপুরের বটগাছের উপরে যারা বাসা বেঁধে থাকত!'

আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার এক অভাবিত ব্যাপার! পথের এক পাশে মস্ত বড়ো একটা খোলা জায়গা, আর সেইখানে বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে খাড়া হয়ে আছে—প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। এতবড়ো গাছ চোখে দেখা যায় না!

বিনয়বাবু বললেন, 'বিলাসপুরের বিখ্যাত বটগাছ!'

মস্ত একটা মাটির ঢিবি তৈরি করে তার উপরে বটগাছটি পোঁতা রয়েছে এবং তার নিচেকার ডালে ডালে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা অনেকগুলো বানর। বিনয়বাবু প্রভৃতিকে দেখে বানরগুলো আরও জোরে কিচির-মিচির করে চেঁচিয়ে উঠল—অমানুষের আড্ডায় পরিচিত মানুষের দেখা পেয়ে এ যেন বানরদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ!

বটগাছের পাশেই আর এক আশ্চর্য দৃশ্য! সেই নীলরঙা কাচের মতো স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি পুকুরের মতো বড়ো একটা চৌবাচ্চা এবং তার মধ্যে টল-টল করছে এক চৌবাচ্চা জল! খালি তাই নয়, জলে যে দলে দলে মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, স্বচ্ছ চৌবাচ্চার পাশ থেকে তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু এ জল বিলাসপুরের সেই পুকুর থেকে চুরি করে আনা হয়নি তো?'

বিনয়বাবু বললেন, 'নিশ্চয় তাই হয়েছে!'

কমল বললে, 'কিন্তু এসব নিয়ে এরা করছে কী?'

বিনয়বাবু বললেন, 'সে কথা তো আগেই বলেছি। এরা পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে।

বিমল বললে, 'ওই নগণ্য বামন-জানোয়ারগুলো যে এমন সব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা তো আমার বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'বিমল, পৃথিবীর মানুষের মতো চেহারা না হলেই কোনও

জীবকে যে মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর বলে মানতে হবে, তার কোনও মানে নেই। অথচ তুমি বারবার সেই ভ্রম করছ। আকাশে পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়ো শত শত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে—হয়তো তার অনেকের মধ্যেই এমন সব সভ্য জীবের অস্তিত্ব আছে যারা মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়। তাদের চেহারা দেখলে আমরা যেমন অবাক হব, আমাদের চেহারা দেখলে তারাও তেমনি অবাক হতে পারে। তারাও আমাদের দেখে হয়তো নিচুদরের জানোয়ার বলেই ধরে নেবে। ভবিষ্যতে এমন ভ্রম আর কোরো না। কারণ মঙ্গল গ্রহের জীবরা যে নগণ্য নয়, তার অসংখ্য প্রমাণ তো চোখের উপরে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ! এরা দেহের জোরে আমাদের সমকক্ষ না হলেও বুদ্ধির জোরে আমাদের চেয়েও যে অনেক এগিয়ে গেছে, এটা আমি মানতে বাধ্য।'

কমল বললে, 'কিন্তু একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের মতো এরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে এরা আমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব। দরকার হলেই কোনও জিনিসের আবিষ্কার হয়। এটা হচ্ছে সভ্যতার নিয়ম। এদের বন্দুক-কামানের দরকার হয়নি, তাই এরা তার জন্যে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখানে আগে থাকতে এক বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে রাখছি। বিমল, কুমার, তোমাদের বন্দুক আছে বলে তোমরা যেন তার অপব্যবহার কোরো না।'

রামহরি বললে, 'আমাদের তো হাত বাঁধা, ইচ্ছে করলেও বন্দুক ছুড়তে পারব না। সুতরাং আমাদের কাছে বন্দুক থাকা না-থাকা দুই-ই সমান।'

বিমল হেসে বললে, 'এই পাতলা সোনার শিকল আমি এক টানে এখনি ছিঁড়ে ফেলতে পারি,—আমি কি মঙ্গল গ্রহের বামন যে এই শিকলে বাঁধা থাকব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, যদিও আমার বয়েস হয়েছে, তবু এই সোনার শিকল ছেঁড়বার শক্তি এখনও আছে। তবে, আমাদের এ শক্তিও আপাতত ব্যবহার না করাই ভালো।'

সামনে মরণ

সেপাইদের দলপতির ইঙ্গিতে আবার সকলকে দাঁড়াতে হল। সেখানেও পথের দুই ধারেই কালো-পর্দা-ঢাকা দেওয়াল।

হঠাৎ সেই দেওয়ালের ওপাশ থেকে একটা শব্দ শুনে সকলেই চমকে উঠল। কে যেন মানুষের গলায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করছে!

দলপতি এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপরে একটা সোনার হাতল ধরে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের লম্বা দেওয়ালটা অমনি একপাশে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কান্নার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু কালো পর্দাটা তখনও সকলের দৃষ্টি রোধ করে ছিল বলে কে কাঁদছে তা দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বামনসেপাইরা একসঙ্গে একটা চিৎকার করে উঠল—চিৎকারটা শোনাল অনেকটা এই রকম—'ঘং ঘং ঘং!'—অমনি পথের আর-এক পাশের দেওয়াল সরে গেল এবং

পর্দা ঠেলে দলে দলে বেরিয়ে এল পঙ্গপালের মতো শত শত বামনসেপাই। তাদের সকলেরই হাতে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচু একগাছা করে সোনারফলাওয়ালা বর্শা।

বিনয়বাবু বললেন, 'দেখছ তো বিমল, এখানে জোর খাটিয়ে লাভ নেই! আমরা এদের বিশ-পঁচিশ জনকে বধ করলেও শেষকালে আমাদেরই মরতে হবে।'

নতুন সেপাইয়ের দল আসার সঙ্গে সঙ্গেই দলপতি ওধারকার দেওয়ালের পর্দায় ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানলে, সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা সরে গেল এবং সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠল এক বিচিত্র দৃশ্য!

খুব লম্বা একখানা ঘর এবং কাচের মতো মেঝের উপরে শুয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ। তাদের সকলেরই মুখ বিমর্ষ, কেউ চাপা গলায়, কেউ বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছে। দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো সোনার রিঙ বসানো এবং এক-একটা রিঙ থেকে এক-এক গাছা লম্বা সোনার শিকল ঝুলছে—প্রত্যেক বন্দীর হাত খোলা থাকলেও ডান পা সেই শিকলে বাঁধা।

বিমল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'দেখুন, বিনয়বাবু, এই হতভাগা বামনরা পৃথিবী থেকে কত মানুষ ধরে এনেছে!'

বিনয়বাবু দুঃখিতভাবে শুধু বললেন 'হুঁ!'

রামহরি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, আমাদেরও এখুনি ওই দশা হবে, হা অদৃষ্ট!'

বিমলের কপালের শির ফুলে উঠল, রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল।

এমন সময়ে সেপাইদের দলপতি কি একটা হুকুম দিলে—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেপাই বিমল ও কুমারের কাছে এসে তাদের বন্দুক দুটো কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে।

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'খবরদার কুমার, বন্দুক ছেড়ো না। বন্দুক গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকবে না!'

বিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বিমল, বিমল, ওদের বাধা দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনো না!'

বিমল দৃঢ় স্বরে বললে, 'আসুক বিপদ। এখানে শেয়াল-কুকুরের মতো সারাজীবন বাঁধা থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো!'

বামনসেপাইরা নাছোড়বান্দা দেখে বিমল তাদের উপরে বারকয়েক পদাঘাত করলে,—তিনজন বামন বিকট আর্তনাদ করে মেঝের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল—তারপর তারা চ্যাঁচালও না, একটু নড়লও না।

সেপাইদের দলপতি তাঁর গোল গোল ভাঁটার মতো চোখ আরও বিস্ফারিত করে বললে, 'ভং ভং—ভংকা!'

চোখের পলক না ফেলতে সেই শত শত বামনসেপাই তাদের হাতের বর্শাগুলো মাথার উপরে তুলে ধরলে।

বিমল পিছু হটে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে হাতের শিকল ছিঁড়ে ফেললে। তারপর বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, 'বিদায় বিনয়বাবু, আমি মরব, তবু আর বন্দী হব না! কিন্তু মরবার আগে এই মর্কটগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যে, এরা জীবনে তা আর ভুলবে না!'

রামহরিও একলাফে বিমলের সামনে এসে, তার দেহ ঢেকে দাঁড়িয়ে বললে, 'না, না! আগে আমাকে না মেরে এরা আমার খোকাবাবুকে মারতে পারবে না!'

বর্শা উঁচিয়ে বামনসেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল।

বন্দুকের শক্তি

বর্শা উঁচিয়ে বামনসেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল।

কিন্তু রামহরি হঠাৎ বিমলের দেহ ঢেকে দাঁড়াল দেখে তারা একটু থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেপাইদের দলপতি আবার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে,—'ভং ভং—ভংকা!'

বামনরা আবার অগ্রসর হল।

রামহরিকে এক ধাক্কা মেরে বিমল বললে, 'সরে যাও রামহরি, আমার সামনেটা আড়াল করে দাঁড়িও না!'

বিমলের ঠিক সুমুখে এসে বামনরা তাকে বর্শার খোঁচা মারতে উদ্যত হল।

বিমল এক লাফে এক পাশে সরে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বন্দুকটা ভীষণ গর্জন করে অগ্নিশিখা উদগার করলে।

পরমুহূর্তে দুজন বামন চিৎকার করে গৃহতলে লুটিয়ে পড়ল,—বন্দুকের গুলি নিশ্চয় প্রথম বামনের দেহ ভেদ করে দ্বিতীয় বামনকেও আঘাত করেছে।

বিমল আবার বন্দুক ছুড়লে—আবার আর একজন বামনের পতন হল।

ব্যাপার দেখে আর সব বামনসেপাই তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল,—তাদের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ভয়ানক স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বন্দুক যে কী সাংঘাতিক জিনিস, তারা তো তা জানে না!

এদিকে বিনয়বাবুও ততক্ষণে নিজের হাতের শিকল ভেঙে ফেলে কুমার আর কমলের শৃঙ্খলও খুলে দিয়েছেন এবং রামহরিও অল্প চেষ্টাতেই নিজের সোনার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে।

সেপাইদের দলপতি পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে আবার বললে, 'ভং ভং—ভংকা!'

বিমলকে বন্দুকে নতুন টোটা পুরতে ব্যস্ত দেখে কুমার এগিয়ে এসে দলপতিকে লক্ষ্য করে আবার বন্দুক ছুড়লে।

শূন্যে দু-হাত ছড়িয়ে দলপতিও ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

কুমার ফের বন্দুক ছুড়লে,—পরমুহূর্তে বামনসেপাইরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে সেখান থেকে অদৃশ্য হল;—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণভেদী তীব্র শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল—ঠিক যেন দশ-বারোটা রেলের ইঞ্জিন একসঙ্গে 'কু' দিচ্ছে।

বিনয়বাবু চমকে বললেন, 'ও কিসের শব্দ!'

বিমল বললে, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘন-ঘন ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল—সেই 'কু' শব্দ তখনও থামল না।

সকলে সবিস্ময়ে দেখতে পেলে, দলে দলে বামন উড়োজাহাজের এক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে, তাদের সকলের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে কি-এক অজ্ঞাত ভয়ের রেখা।

কমল বললে, 'ওদের দেখে মনে হচ্ছে, ওরা যেন হঠাৎ কি একটা বিপদে পড়েছে!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, সেই ভয়ে ওরা এতটা ভেবড়ে পড়েছে যে, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।'

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'বিমল, ব্যাপার যা হয়েছে আমি তা বোধহয় বলতে পারি। উড়োজাহাজের দেওয়াল আমাদের বন্দুকের গুলিতে ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। ঐ যে 'কু' শব্দ হচ্ছে, ওটা বাইরে থেকে বাতাস ঢোকার শব্দ। বামনরা সেই ছ্যাঁদা মেরামত করছে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এই উড়োজাহাজের দেওয়াল কি এমন পলকা যে, সামান্য বন্দুকের গুলিতে ভেঙে গেল?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বোধহয় দৈবগতিকে কোনও জোড়ের মুখে বা অস্থানে বন্দুকের গুলি লেগেছে।'

বিমল বললে, 'ভারী ভারী জিনিসের ভার বইতে পারলেও হয়তো এই উড়োজাহাজ বন্দুকের গুলির চোট সইতে পারে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাও অসম্ভব নয়,—কি রকম উপাদানে এই উড়োজাহাজ তৈরি তা তো আমরা জানি না।'

কুমার বললে, 'এখন আমাদের কর্তব্য কী? আমরা বামনদের হত্যা করেছি, ওরাও নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নিতে আসবে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওরা কী করবে তা আমি জানি না। তবে, যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন আর নরম হওয়াও চলবে না, কারণ এখন আত্মসমর্পণ করলেও ওরা বোধহয় আমাদের ক্ষমা করবে না।'

বিমল বললে, 'আমার মনে হয় ওরা আর সহজে ঘেঁষবে না, কারণ ওরা আমাদের বন্দুকের শক্তি বুঝে গেছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবা যাবে। আমাদের এখন সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে মানুষগুলি বন্দী হয়ে আছে তাদের স্বাধীন করে দেওয়া। তাহলে আমরা দলেও রীতিমতো পুরু হব, আর ওদের আক্রমণেও বেশ বাধা দিতে পারব।'

রক্ত-তারকার রহস্য

বন্দীদের ভিতরে ভদ্রশ্রেণীর লোক কেউ ছিল না—বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের মুসলমান খালাসি, বিলাসপুর থেকে যারা স্টীমারের সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল। বন্দীরা মুক্তিলাভ করে বিনয়বাবুদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে জয়ধ্বনি করে উঠল।

বিনয়বাবু সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'দ্যাখো, এ জয়ধ্বনি করবার সময় নয়। আমি

যা বলি, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো। আমরা সকলেই এক ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে আছি। যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের প্রাণ যেতে পারে। বিপদে পড়লে বাঘে-গোরুতেও একসঙ্গে জল খায়, সুতরাং বড়ো-ছোটো নির্বিচারে আমাদেরও এখন এক মন, এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। কাজেই এটা আমি অনায়াসেই আশা করতে পারি যে তোমরা কেউ আমার কথার অবাধ্য হবে না।'

তারা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আপনার কথায় আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যাদের আশ্রয়ে আমরা থাকতে বাধ্য হয়েছি তারা এখন আমাদের পরম শত্রু। অথচ তারা অন্ন-জল না দিলে আমরা প্রাণে বাঁচব না। অতএব এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, অন্ন-জলের ব্যবস্থা করা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু কী করে সে ব্যবস্থা হবে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওই দ্যাখো, বামনরা সবাই দূর থেকে আমাদের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের বন্দুকের মহিমা দেখে ওরা বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে, আর সেইজন্যেই এদিকে এগুতে সাহস করছে না। কিন্তু প্রবাদে যখন বলে যে, পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদই পর্বতের কাছে যেতে পারেন তখন আমরাই বা ওদের কাছে যেতে পারব না কেন? তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এসো। ভালো কথায় ওরা যদি আমাদের খাবার না দেয়, তাহলে আমরা আবার যুদ্ধ ঘোষণা করব।'

সব-আগে বিনয়বাবু, তাঁর পিছনে বন্দুক বাগিয়ে বিমল আর কুমার, তার পরে বাকি সবাই দলে দলে অগ্রসর হল।

বামনরাও দলবদ্ধ হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে ভয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে সমস্ত দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু দল ছেড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে, পেটে ও মুখে হাত দিয়ে আহারের অভিনয় করে ইশারায় জানালেন যে তাঁরা সবাই ক্ষুধার্ত, অবিলম্বেই খাদ্যদ্রব্য আনতে হবে। বামনরা খানিকক্ষণ ধরে পরস্পরের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। তারপর একজন বামন এগিয়ে এসে তেমনি ইশারায় বুঝিয়ে দিল যে, তারা শীঘ্রই সকলের জন্যে খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দেবে।

বিনয়বাবু আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'যাক, খাবার চাইতে এসে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, বামনরা আমাদের আর ঘাঁটাতে চায় না। এ-অবস্থায় ওদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে না...হুঁ, সকলেই শক্তের ভক্ত! এসো বিমল, আমরা সেই পুকুর চৌবাচ্চার ধারে, বটগাছের তলায় গিয়ে বিশ্রাম করি গে।'

সকলে আবার অগ্রসর হলেন। খানিক দূরে যেতেই বিলাসপুরের বটগাছ পাওয়া গেল। —তার ডালে বসে বানররা মানুষ দেখে আবার আনন্দে কলরব করে উঠল।

বিনয়বাবু চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর উড়োজাহাজের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে একবার নিচের দিকে ও একবার উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিমল, দ্যাখো!'

'কী বিনয়বাবু?'

'নিচের দিকে কী দেখছ?'

'ধূ-ধূ শূন্য!'

'এই শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারছ কি? পৃথিবী আর দেখা যাচ্ছে না,—আমরা এখন অন্য গ্রহে যাচ্ছি। উড়োজাহাজ স্বদেশে ফিরছে।'

বিমল স্তম্ভিত ও স্তব্ধভাবে নিচের সেই বিরাট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রইল—যে শূন্যতার মাঝখানে তাদের সকলকার মা, পৃথিবীর শ্যামল মুখ হারিয়ে গেছে, হয়তো এ-জীবনের মতো!

বিনয়বাবু আবার বললেন, 'উপর-পানে তাকিয়ে দ্যাখো!'

বিমল মাথা তুলে দেখে বললে, 'উপরেও তো দেখছি শুধুই শূন্যতা!...না, না, একটা রাঙা বড়ো তারা জ্বলজ্বল করছে!'

'হ্যাঁ, ওই হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। ওর ওই রাঙা রঙ দেখেই ইউরোপে সেকালের লোকেরা মঙ্গলকে যুদ্ধ-দেবতার পদে অভিষিক্ত করেছিল। মঙ্গল গ্রহ আকারে খুব ছোটো, পণ্ডিতেরা হিসাব করে বলেছেন, মঙ্গলের আড়াআড়ি মাপ চার হাজার আটশো মাইলের বেশি নয়, ওর উপরটা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশি মাত্রা।'

অনেক ঊর্ধ্বে সীমাহীন রহস্যের মায়ারাজ্যে সেই রক্ত-তারকা এক বিপুল দানবের ক্রুদ্ধ নেত্রের মতো জ্বলতে লাগল—সকলে বিস্মিতভাবে তার পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবুর ডায়েরি

কদিন কেটে গেল,—ঠিক কয় দিন, তার কোনও হিসাব আমি রাখিনি। এই কদিন ধরে উড়োজাহাজের একটু বিশ্রাম নেই—সে হু-হু করে শূন্যের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত ভেসে চলেছে—মিনিটে কত মাইল করে তাও জানবার কোনও উপায় নেই। তবে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মঙ্গল গ্রহের এই বিচিত্র উড়োজাহাজের গতি পৃথিবীর যে-কোনও উড়োজাহাজের চেয়ে ঢের বেশি—কারণ মাথার উপরকার ঐ রক্ত-তারাটি ক্রমেই দেখতে বড়ো হয়ে উঠছে।

বামনরা আমাদের সঙ্গে আর কোনও গোলমাল করেনি, তারা রোজ খাবারের যোগান দিয়ে যাচ্ছে এবং আমরাও নির্বিবাদে তার সদ্ব্যবহার করছি। তবে, তারা আর আমাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, খাবারের পাত্রগুলো খুব তফাতে রেখেই আস্তে আস্তে সরে পড়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বন্দুকের শক্তি দেখে তারা রীতিমতো শায়েস্তা হয়ে গেছে। তারা আমাদের উপরে পাহারা দেয় বটে, কিন্তু তাও খুব দূর থেকে, লুকিয়ে-লুকিয়ে।

এরা যে এত শীঘ্র পৃথিবীর আবহাওয়া ছেড়ে পিঠটান দিচ্ছে, তারও কারণ বোধহয় আমাদের বিদ্রোহ। আমাদের বন্দুকের গুলিতে উড়োজাহাজ ফুটো হয়ে যাওয়াতেই নিশ্চয় তারা এতটা ভয় পেয়েছে। পাছে আমরা কোনও নতুন বিপদ ঘটাই, সেই ভয়েই বামনরা আজকাল চুপচাপ আছে বটে, কিন্তু মঙ্গল গ্রহে ফিরে যাবার পর এরা যে আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে, তা ভগবানই জানেন!

এ-জীবনে হয়তো আর পৃথিবীতে ফিরতে পারব না! সেইজন্যেই এই ডায়েরি লিখতে শুরু

করেছি। আমাদের জীবনের উপর দিয়ে কী আশ্চর্য ঘটনার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তার একটা লিখিত ইতিহাস থাকা নিতান্ত দরকার। যদিও সেটা সম্ভব নয়,—তবুও আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনওগতিকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে, তাহলে আমার এই ইতিহাস মানুষের অনেক উপকারে লাগবে।

কিন্তু এত বিপদেও আমার মনে আনন্দ হচ্ছে। যে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আমি আজীবন আলোচনা করে আসছি, যার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র কত তর্ক, কত সন্দেহ, কত জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে আমি সশরীরে তারই মধ্যে গিয়ে বিচরণ করতে পারব! আমি কী ভাগ্যবান!

খুব শীঘ্রই আমরা যে-গ্রহে গিয়ে অবতীর্ণ হব, তার পরিচয় জানি বলেই আমার বিশেষ কিছু ভয় হচ্ছে না। কিন্তু বিমল, কুমার ও কমল বোধহয় অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়েছে। আর রামহরির তো কথাই নেই, সে সর্বদাই জড়ভরতের মতো এক কোণে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইতে চায় না।

তাদের আশ্বস্ত করবার জন্যে সেদিন বললুম, 'আচ্ছা, তোমরা এতটা বিমর্ষ হয়ে আছ কেন বলো দেখি? তোমাদের বিশেষ ভয় পাবার কোনও কারণ তো দেখি না!'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আমাদের মতো অবস্থায় পড়লে পাগল ছাড়া আর কেউ খুশি হতে পারে না। জলের মাছকে ডাঙায় তোলবার সময়ে মাছেরা কি খুশি হতে পারে? আমাদেরও অবস্থা কি অনেকটা সেইরকম হয়নি? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি, কোনও সৃষ্টিছাড়া বিপদের রাজ্যে, কে তা বলতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমরা যে মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছি সে কথা তো আগেই তোমাদের বলেছি। মঙ্গল গ্রহে যখন জীবের বসতি আছে, তখন তোমাদের এতটা চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই। মঙ্গল গ্রহের ভিতরের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীরই মতন। সেখানেও যে পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল আছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মঙ্গল গ্রহে কুয়াশা আর মেঘ যখন আছে তখন পৃথিবীর জীবদের সবআগে যা দরকার সেই বায়ুমণ্ডলও নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং জলের মাছের ডাঙায় পড়ার মতো অবস্থা আমাদের কখনই হবে না, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থাকো।'

কমল বললে, 'কিন্তু মঙ্গল গ্রহের রঙ অমন রাঙা কেন?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিতরা দেখেছেন মঙ্গলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে মরুভূমি—সেখানে জল বা ফল-ফসল কিছুই নেই, খালি ধু ধু করছে লাল বালি আর লাল বালি। এই লাল বালির মরুভূমির জন্যেই মঙ্গলকে অমন রাঙা দেখায়।'

আরও কতগুলো দিন একইভাবেই কেটে গেল।

এখন আমরা পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যেও নেই—এখন কেবল মঙ্গল আমাদের টানছে। মঙ্গলের আকারও মস্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, আর এখন তাকে দেখতে হলে উপর দিকে নয়, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

সেদিন রাত্রে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম! দূরে, বহু দূরে—মাথার উপরে জেগে উঠল উজ্জ্বল পৃথিবী, যেন চাঁদের মতন! আমার মনে হল, মা যেমন কোলের ছেলের মুখের উপরে মুখ এনে

নত নেত্রে চেয়ে রাত জেগে বসে থাকেন, পৃথিবীও আমাদের পানে ঠিক সেইভাবেই স্নেহমাখা দরদভরা চোখে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

উড়োজাহাজের সমস্ত বন্দীদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখালুম। সকলেই দুঃখিতভাবে কাতর আগ্রহের সঙ্গে অথচ গভীর বিস্ময়ে মা পৃথিবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল, কেউ কেউ আবার চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে—আমারও মনটা যেন কেমন কেমন করতে লাগল। ....হায়, আর কি ওই মায়ের কোলে গিয়ে উঠতে পারব?

জোড়া চাঁদের মুল্লুকে

ওই মঙ্গল গ্রহ! আগেকার চেয়ে অনেক কাছে, কিন্তু এখনও বহু দূরে!

বামনরা এখনও আমাদের কাছে ঘেঁষে না,—আমরা তাদের সঙ্গে মেলামেশার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাদের দিকে এগুলেই তারা পালিয়ে গিয়ে কোনও একটা কামরায় ঢুকে পড়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অথচ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখন দূরে দূরে চারদিকে সশস্ত্র পাহারারও অভাব নেই।

বিমল সেদিন দৈবগতিকে একটা বামনকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ধরবামাত্র বামনটা মহা আতঙ্কে বিকট এক চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বিমল তখন বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল।

আজ আমাদের এক পরামর্শসভা বসেছিল। বিমল, কুমার, কমল, রামহরি এবং অন্যান্য বন্দীদের ডেকে আমি বললাম, 'দেখ, শীঘ্রই আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হব। বামনরা এখন ভয়ে আমাদের কিছু বলছে না বটে, কিন্তু স্বদেশে গিয়ে তারা যে আমাদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তখন তারা দলে ভারী হবে, কেবলমাত্র দুটো বন্দুক দেখিয়ে আমরা বেশিদিন তাদের ভয় দেখাতেও পারব না। কাজেই তখন আমাদের প্রতি পদেই সাবধান হয়ে থাকতে হবে। মঙ্গল গ্রহে গিয়ে তোমরা কেউ যেন দলছাড়া হয়ো না,—সকলে সর্বদাই একসঙ্গে থেকো, একসঙ্গে ওঠা-বসা-চলা-ফেরা কোরো। যা করবে সকলকে জানিয়ে করবে। এ ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় নেই।'

আরও কয়েকদিন গেল।

মঙ্গল গ্রহ এখন আমাদের চোখের উপরে বিরাট একখানা থালার মতন ভেসে উঠেছে। সেখানে পৌঁছতে বোধহয় আর একদিনও লাগবে না।

আজ সকালে উঠে দেখলুম, ঘন মেঘ ও কুয়াশার ঘোমটায় মঙ্গল গ্রহের মুখ ঢাকা। মাঝে মাঝে সে ঘোমটা সরে যাচ্ছে, আর ভিতর থেকে লাল, সবুজ বা সাদা রঙের আভা ফুটে উঠছে। ওই লাল রঙ নিশ্চয় মরুভূমির, এবং সবুজ ও সাদা রঙ আসছে বোধহয় মঙ্গলের চাষ-ক্ষেত, অরণ্য ও মেরুদেশের তুষার-রাশি থেকে।

মঙ্গলের বয়স পৃথিবীর চেয়ে ঢের বেশি। তার ভিতরে যেসব নদ-নদী সমুদ্র ছিল, তা এখন শুকিয়ে গেছে। পণ্ডিতদের মতে, একদিন পৃথিবীরও এই দশা হবে। জলের অভাবে জীব বাঁচতে

পারে না—সৃষ্টির প্রথম জীবের জন্ম হয়েছে জলের ভিতরেই। কাজেই মঙ্গলের বামনরা আত্মরক্ষার জন্যে শেষ একমাত্র উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলেরও মেরুপ্রদেশে পৃথিবীর মতো তুষারের রাজ্য আছে। মঙ্গলেরও বাসিন্দারা শত শত ক্রোশ ব্যাপী খাল কেটে সেই বরফ-গলা জল নিয়ে এসে চাষ-আবাদ করে। এমন খাল তারা দুটো-একটা নয়—কেটেছে অসংখ্য।

পৃথিবীর মতো মঙ্গলও সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং ঘোরা শেষ করতে সে পৃথিবীর চেয়ে দু-গুণ সময় নেয়,—অর্থাৎ ৬৮৭ দিন। সুতরাং আমাদের প্রায় দুই বৎসরে হয় তার এক বৎসর। এর দ্বারা আরও বোঝা যাবে, মঙ্গল প্রতি দুই বৎসর দুই মাস অন্তরে একবার করে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছে আসে। সে সময়ে প্রায় ছয় মাস কাল সে পৃথিবীর চোখের সামনে থাকে, তারপর আবার হাজার হাজার ক্রোশ দূরে, সূর্যের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়। মঙ্গলের দিন আমাদের দিনের থেকে সাঁইত্রিশ মিনিটের চেয়ে কিছু বেশি।

কাল একটা ব্যাপার দেখে বিমল, কুমার আর কমল ভারি অবাক হয়ে গেছে। আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি, কারণ ব্যাপারটা আমার আগে থেকেই জানা ছিল।

ব্যাপারটা এই—মঙ্গল গ্রহে একজোড়া চাঁদ আছে। একটির নাম 'ফোবোস'—মঙ্গলের ঠিক মাঝখান থেকে সে ৫,৮০০ মাইল দূরে থাকে। প্রতি সাত ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে—অর্থাৎ প্রতিদিনে তিনবার করে। ফোবোসের উদয় হয় পূর্বদিকে নয়, মঙ্গলের পশ্চিম দিকে এবং চার ঘণ্টা পরে পূর্বদিকে সে অস্ত যায়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে খণ্ড থেকে পূর্ণ বা পূর্ণ থেকে খণ্ড চাঁদের রূপ ধারণ করে।

আর এক চাঁদের নাম 'ডিমোস'—মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব আরও বেশি—১৪,৬০০ মাইল। প্রতি ত্রিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে। প্রতি তিন দিন অন্তর সে অস্ত যায় এবং এরই মধ্যে তার আকার খণ্ড থেকে পূর্ণ চাঁদের মতো হয়ে ওঠে। এর উদয় হয় পূর্বদিকেই।

ফোবাস আর ডিমোস আকারে পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে ঢের বেশি ছোটো। ডিমোসের চেয়ে ফোবোসের আকার কিছু বড়ো—তার আড়াআড়ি মাপ প্রায় সাত মাইল। ডিমোসের আড়াআড়ি মাপ পাঁচ কি ছয় মাইল। এই জোড়া চাঁদ কিন্তু মঙ্গলের রাত্রের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। কারণ আমাদের পৃথিবীর পূর্ণ চাঁদের ষাট ভাগের এক ভাগ আলো নিয়ে ফোবোসের কারবার, আর ডিমোস দেয় তার বারোশো ভাগের এক ভাগ মাত্র আলো।

মঙ্গলের মেঘরাজ্য পার হয়ে আমরা আরও নিচে নেমে এসেছি—আমাদের চোখের উপরে জেগে উঠেছে এক কল্পনাতীত দৃশ্য।

পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে ধু ধু মরুভূমি এবং তার উপর দিয়ে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে রোদের তপ্ত রাঙা বালির ঝড়। সে ঝটিকাময়ী মরুভূমির যেন আদি-অন্ত নেই। মরুভূমির বুক ভেদ করে সারি-সারি খাল, তাদের সংখ্যা গণনায় আসে না। স্থানে স্থানে যেন খালের জাল বোনা রয়েছে, কোথাও একটা খালের উপর দিয়ে আর একটা খাল আড়াআড়িভাবে কাটা হয়েছে, আবার কোথাও বা জোড়া খাল পাশাপাশি চলে গেছে—আকার দেখলে বেশ অনুমান করা যায় যে, লম্বায় কোনও কোনও খাল তিন-চার হাজার মাইলের কম নয়। সোজাসুজিভাবে এতগুলো

সুদীর্ঘ খাল কাটা যে কিরকম পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। আর এ কাজ হচ্ছে ওই বামন জীবদের। ধন্য তাদের বুদ্ধি, ধন্য তাদের শক্তি!

যেখানে দিয়েই খাল গিয়েছে, সেইখানেই তার দুই পাশে শ্যামল বনের রেখা। উড়োজাহাজ আরও নিচে নামলে পর দেখলুম, স্থানে স্থানে অনেক ঘরবাড়ি রয়েছে, নিশ্চয়ই সেগুলো নগর। মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো পাহাড়ও চোখে পড়ল।

খানিক পরেই উড়োজাহাজ একটা বড়ো শহরের উপরে এসে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। নিচের শহর থেকে ঘন ঘন ঘণ্টা ও ভেরির ধ্বনি ও বহু কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলুম,—চেয়ে দেখলুম, শহরের প্রত্যেক বাড়ির ছাদের উপরে ও পথে পথে বামনদের জনতা। হঠাৎ শহর থেকে আরও কুড়ি-পঁচিশখানা ছোটো ছোটো উড়োজাহাজ আমাদের দিকে উড়ে এল,—আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

আমি ফিরে বললুম, 'বিমল, তোমরা সব প্রস্তুত হও, এইবারে আমাদের নামতে হবে।'

বিমল বন্দুকটা একবার নেড়ে-চেড়ে পরখ করে, কাঁধের উপরে রেখে বললে, 'আমি প্রস্তুত।'*

এক লাফে সাগর পার

উড়োজাহাজ একটা শহরের প্রান্তে এসে নামল।

সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বামন এসে উড়োজাহাজের চারিদিক ঘিরে ফেললে। তাদের গোল-গোল ভাঁটার মতো চোখগুলো আগ্রহে ও বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং তাদের সকলেরই মুখে একই জয়ধ্বনি—'হংচা হং—হংচা হং!'

উড়োজাহাজের একদিককার প্রধান দেওয়ালটা অনেকখানি সরে গেল এবং সেইখানে একদল বামনসেপাই বর্শা তুলে দুইধারে সার বেঁধে দাঁড়াল—যাতে বাইরের বামনরা হুড়মুড় করে ভিতরে না ঢুকে পড়তে পারে।

কেবল একজন বামন—বোধহয় সে উড়োজাহাজের কর্তা—এগিয়ে গিয়ে নিচে নেমে পড়ল। বাইরের জনতার ভিতর থেকেও তিনজন জমকালো পোশাকপরা বামন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল।

আমরা সবাই এক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে বামনদের কাণ্ড দেখতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'দেখুন বিনয়বাবু, ওরা কথা কইতে কইতে ক্রমাগত আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে!'

আমি বললুম, 'বোধহয় আমাদেরই কথা হচ্ছে। তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ো না—শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দ্যাখো, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

---

* বিনয়বাবু স্বয়ং মঙ্গল গ্রহের যে বর্ণনা লিখেছেন, আমাদের কথার চেয়ে তা বেশি চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমরা এবার থেকে তাঁর ডায়েরির লেখাই তুলে দেব। বিনয়বাবুর ডায়েরিতে মঙ্গল গ্রহের যেসব অদ্ভুত তথ্য আছে, তার অধিকাংশই প্রমাণিত সত্য; যাঁদের বিশ্বাস হবে না, তাঁরা ওই-সম্বন্ধে সিয়াপ্যারেলি, লাওয়েল, গান, স্ট্যানলি উইলিয়মস ও শ্লামেরিয়ন প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত পড়ে দেখতে পারেন। —ইতি লেখক।

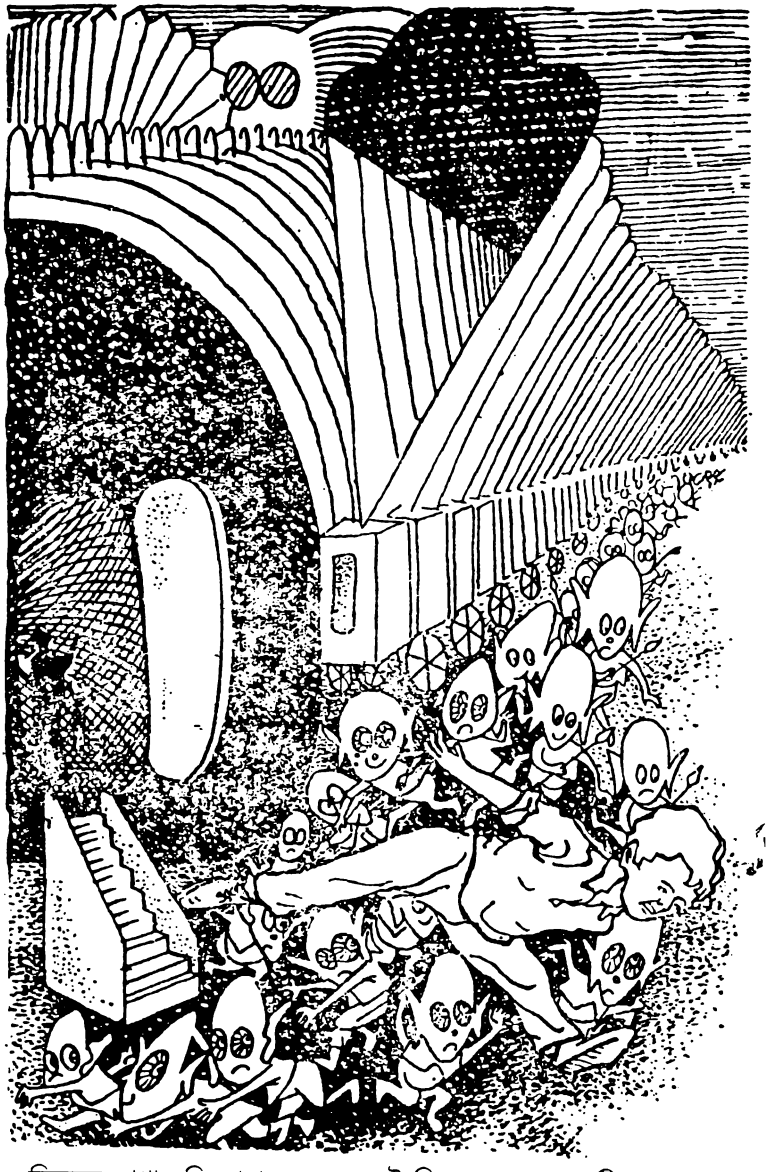

বিমলের মাথায় কি খেয়াল হল, সে মই দিয়ে না নেমে, একটি লাফ মেরে নামতে গেল।

উড়োজাহাজের কর্তা হঠাৎ একটা ভেরীতে জোরে ফুঁ দিলে এবং বোধহয় তার উত্তরেই শহরের ভিতর থেকেও আর একটা ভেরীর তীব্র আওয়াজ হল। তার একটু পরেই দেখা গেল শহর থেকে পঙ্গপালের মতন দলে দলে বামনসেপাই বেগে বেরিয়ে আসছে।

কুমার সভয়ে বলে উঠলে, 'এইবারে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে!'

আমি বললুম, 'আমরা যদি ওদের কথা শুনি, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে না।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, দেখুন—দেখুন! সেপাইদের সঙ্গে প্রকাণ্ড কি-একটা যন্ত্র আসছে! ওটা কি এদেশী কামান?'

তাই তো, মস্তবড়ো একটা ঘণ্টার মতো কী ওটা? উঁচুতে সেটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট ও চওড়ায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয় এবং যন্ত্রটা টেনে আনছে কতকগুলো অদ্ভুত আকারের জন্তু। এ জন্তুগুলোকে দেখতে অনেকটা উটের মতো, তবে উটদের শিঙ থাকে না, কিন্তু এদের প্রত্যেকের মাথায় একটা করে খুব লম্বা শিঙ আছে। আর এদের আকারও উটের চেয়ে অনেক ছোটো এবং গায়ের বর্ণও মিশমিশে কালো। এগুলো মঙ্গল গ্রহের গোরু, না ঘোড়া?

উড়োজাহাজের কাছে এনে যন্ত্রটা দাঁড় করানো হল। দেখলুম তার তলায় চারখানা বড়ো বড়ো চাকা রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে একজন বামন কি-একটা কল টিপে দিলে, অমনি সেই ঘণ্টার মতন যন্ত্রটা উপরপানে উঠে এমনভাবে কাত হয়ে রইল যে, তার গর্তের দিকটা এল উড়োজাহাজের দিকে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল। যেরকম শোষক-যন্ত্রের সাহায্যে বামনরা আমাদের পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে, এটাও তারই রূপান্তর নয় তো?....নিশ্চয়ই তাই!

বিমলকে বললুম, 'বিমল, তোমার বন্দুকের জারিজুরি আর খাটছে না। এরা আবার একটা নতুন রকম শোষক-যন্ত্র এনেছে!'

বিমল বললে, 'কেন, কী মতলবে?'

'আমরা যদি ওদের কথামতো কাজ না করি, তাহলে ওরা ওই যন্ত্র দিয়ে আবার আমাদের শুষে নেবে। ও যন্ত্রের শক্তি দেখেছ তো?'

বিমল বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'তাহলে আপাতত বামনদের কথামতোই কাজ করা যাক—কী বলেন?'

'নিশ্চয়ই। ওদের কথা শুনলে আমাদের লাভ বই লোকসানও তো নেই!'

'কিন্তু ওরা যদি আবার কুকুর-বিড়ালের মতো আমাদের বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করে?'

'উপায় নেই।'

বিমল ম্লান মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। ইতিমধ্যে একদল বামনসেপাই ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে খানিক এগিয়ে এল, তারপর তফাত থেকেই ইশারা করে আমাদের উড়োজাহাজ ছেড়ে নামতে বললে।

সকলের আগেই সুবোধ বালকের মতো বিমল অগ্রসর হল। বাইরে হাজার হাজার বামন-সেপাই হাজার হাজার বর্শা তুলে প্রস্তুত হয়ে রইল—একটু বেগতিক দেখলেই আমাদের আক্রমণ করবে।

উড়োজাহাজ থেকে নামবার জন্যে এক জায়গায় প্রায় তিনফুট উঁচু একখানা মই লাগানো ছিল। বিমলের মাথায় কি খেয়াল হল, সে মই দিয়ে না নেমে, একটি লাফ মেরে নামতে গেল—কিন্তু পরমুহূর্তেই তার দেহ মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে গিয়ে পড়ল এবং তারপর প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে, বামনসিপাইদের মাঝখানে ধুপ করে গিয়ে পড়ল।

বামনরা সবাই মহাবিস্ময়ে ও আতঙ্কে চিৎকার করে বিমলের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এমন ব্যাপার বোধহয় তারা জীবনে কখনও দেখেনি।

আমরাও সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলুম—এ কী অমানুষিক কাণ্ড!

পলায়ন

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যাবার পরেই একটা মস্ত কথা আমার মনে পড়ে গেল—মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের একশো ভাগের আটত্রিশ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার ওজন হবে একশো সের, মঙ্গলে তার ওজন আটত্রিশ সেরের চেয়ে বেশি হবে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপও পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।

বিমলের এই আশ্চর্য লম্ফত্যাগের গুপ্ত রহস্য আমি অল্প কথায় যারা বুঝতে পারলে তাদের বুঝিয়ে দিলুম।

এদিকে বামনরা সবাই মনে করলে, বিমল তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তখনই একদল বামন বিমলের দিকে বেগে ছুটে গেল, আর একদল এগিয়ে এল ভীষণ শোষক-যন্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে।

মনে মনে আমি প্রমাদ গুণলুম। আবার ওই ভয়ানক যন্ত্র যদি আমাদের গ্রাস করে, তাহলে আমরা বাঁচব না। বাঁচলেও চিরকাল শিকল-বাঁধা জন্তুর মতো কারাগারে বাস করতে হবে।

কুমার তার বন্দুক তুললে।

আমি বললুম, 'রাখো তোমার বন্দুক! যদি বাঁচতে চাও, পালাও।'

'পালাব? কোথায় পালাব?'

'বাইরে লাফ মারো।'

'বামনরাও তো আমাদের পিছনে আসবে।'

'এলেও ওরা আমাদের মতো লাফ মারতে পারবে না। দেখলে না, বিমলের লাফ মারবার ক্ষমতা দেখে ওরা কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল! আর কথা নয়—দাও লাফ!'

এই বলেই বাইরের দিকে আমি দিলুম এক লাফ। সেই এক লাফেই আমি একেবারে তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে প্রায় চল্লিশ হাত জমি পার হয়ে গেলুম। নামবার সময় ভাবলুম, এত উঁচু থেকে পড়ে হয়তো আমার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ফের মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম, তখন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলুম বটে, কিন্তু দেহের কোথাও একটুও চোট লাগল না। আমি মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই আমার চারপাশে ধপাধপ করে আমার অন্যান্য সঙ্গীরা ঠিক ল্যাজকাটা হনুমানের মতন একে একে মাটির উপরে এসে পড়ে

গড়াগড়ি দিতে লাগল। সে এক অবাক কাণ্ড!....আমাদের কাছাকাছি যত বামন ছিল, তারা তো ভয়ে কোথায় চম্পট দিলে তার কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

আমরা উঠে আবার এক-এক লাফ মারলুম—আবার অনেকটা তফাতে গিয়ে পড়লুম। তার পরেই দেখি, সামনে একটা চওড়া খাল—যার জল আসছে সুদূর মেরুর তুষার-সাগর থেকে! পৃথিবীতে থাকলে এ খাল পার হতে গেলে সাঁতার দিতে হত, আজ কিন্তু এক-এক লাফে খুব সহজেই আমরা খাল পার হয়ে গেলুম।

বিমল যাচ্ছিল আমাদের আগে, লাফের পর লাফ দিতে দিতে।...এইভাবে অতি শীঘ্রই আমরা শত্রুদের কাছ থেকে প্রায় তিন মাইল তফাতে গিয়ে পড়লুম। তারপর লাফ মারা বন্ধ করে বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এইবার বিশ্রাম করা যাক, বড়ো হাঁপ ধরছে।'

পিছনে চেয়ে দেখলুম, কোনওদিকে শত্রুর চিহ্ন নেই—কেবল আমাদের সঙ্গীরা মস্ত মস্ত লাফ মেরে এগিয়ে আসছে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বিমল ভায়া, এখনই বিশ্রাম করলে তো চলবে ন! বামনরা যদি উড়োজাহাজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এই খোলা জায়গায় কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারব না।

বিমল হতাশভাবে বললে, 'তাহলে উপায়?'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, খানিক তফাতে ওই একটা ছোটো পাহাড় রয়েছে, ওখানে হয়তো লুকোবার ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে।'

রামহরি বড়ো মন্দ কথা বলেনি। আমরা আবার কয় লাফে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। রামহরি মানুষ-ক্যাঙারুর মতন লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট-পাঁচেক পর ফিরে এসে সে জানালে, পাহাড়ের ভিতরে খুব বড়ো একটা গুহা আছে—সেখানে আমাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে।

ঠিক সেই সময়েই আকাশে কিসের একটা শব্দ উঠল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, বামনদের উড়োজাহাজ। একখানা নয়, দু-খানা নয়, একেবারে বিশ-পঁচিশখানা!

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'চলো চলো, গুহায় চলো।'

আবার উড়োজাহাজ

পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়—বড়ো-জোর দুশো ফুট। তার গায়ে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। আমরা সকলে সেই কালো, ন্যাড়া পাহাড়ের অলিগলি পথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে একটা জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সামনেই একটা মস্ত গুহা।

সবআগে আমি ভিতরে ঢুকলুম। গুহাটির মুখ ছোটো বটে, কিন্তু ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া—সেখানে অন্তত একশো জন লোক অনায়াসেই হাত-পা ছড়িয়ে বাস করতে পারে।

গুহার ভিতর থেকে সবাইকে আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম।

সকলে একে-একে গুহার ভিতরে এসে ঢুকল।

আমি বললুম, 'এখন আমরা কতকটা নিরাপদ হলুম।'

কমল বললে, 'কিন্তু আমরা খাব কী? মানুষ তো আর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না!'

আমি বললুম, 'আগে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তারপর পেটের কথা ভাবা যাবে-অখন।'

বামনদের উড়োজাহাজগুলোর শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। গুহার মুখ থেকে আকাশের দিকে উঁকি মেরে আমি দেখলুম, অধিকাংশ উড়োজাহাজ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দু-খানা উড়োজাহাজ এই পাহাড়ের ঠিক উপরেই ঘুরছে, ফিরছে—দানব-দেশের বিপুল দুটো ডানা-ছড়ানো চিলের মতো। এরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, আমরা এই পাহাড়ের ভিতরেই লুকিয়ে আছি।

হঠাৎ আবার সেই ভীষণ শব্দ জেগে উঠল—যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেনসিল ঘর্ষণ করছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'সাবধান, কেউ গুহার বাইরে যেয়ো না! বামনরা আবার শোষক-অস্ত্র ব্যবহার করছে!'

একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা গুহার ভিতরে ঢুকে সকলকে কাঁপিয়ে দিলে। আমি গুহার মুখ ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালুম—কী জানি বলা তো যায় না!

শব্দ আরও বেড়ে উঠল। গুহার ভিতর থেকেই দেখা গেল, পাহাড়ের গা থেকে একরাশি নুড়ি ও কতকগুলো ছোটো-বড়ো পাথর সেই শোষক-যন্ত্রের বিষম টানে হু-হু করে শূন্যে উঠে গেল।

বিমল সভয়ে বললে, 'বাইরে থাকলে এতক্ষণে আমাদেরও ওই দশা হত।'

আচম্বিতে শব্দটা আবার থেমে গেল—ঠাণ্ডা হাওয়াও আর বইছে না।

আমি আবার ধীরে ধীরে গুহার মুখে এগিয়ে গেলুম। মাথা বাড়িয়ে উপরপানে তাকাতেই দেখলুম, উড়োজাহাজ দু-খানা ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের দিকে নেমে আসছে।

সকলেই তখন গুহাতলে শুয়ে বা বসে বিশ্রাম করছিল, আমার কথা শুনে সকলেই আবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, 'আসুক ওরা! আমরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেব, তবু ওদের হাতে আর বন্দী হব না।'

অন্য সকলে উচ্চ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত!'

আমি বললুম, 'তোমরা ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শোনো। আপাতত বোধহয় কারুকে প্রাণ দিতে হবে না। তোমাদের মনে আছে তো, এদের উড়োজাহাজ এমন জিনিস দিয়ে তৈরি, যা বন্দুকের গুলি সইতে পারে না। বিমল আর কুমার বন্দুক ছুড়লেই উড়োজাহাজ দু-খানা নিশ্চয়ই জখম হয়ে পালিয়ে যাবে।'

বিমল বললে, 'ঠিক কথা! কুমার, শিগগির বাইরে এসো!'

বিমল আর কুমার বন্দুক নিয়ে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'তোমরা কিন্তু গুহার মুখ ছেড়ে এগিয়ে যেয়ো না—ওরা আবার শোষক-যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'

আমিও গুহার মুখে গিয়ে দেখলুম, উড়োজাহাজ দু-খানা খুব কাছে নেমে এসেছে। বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে না-আসা পর্যন্ত বিমল ও কুমার অপেক্ষা করতে লাগল।

উড়োজাহাজ আরও নিচে নেমে এল—ক্রমে আরও, আরও নিচে।

বিমল লক্ষ্য স্থির করতে করতে বললে, 'কুমার, সময় হয়েছে। যে উড়োজাহাজখানা বেশি নিচে নেমেছে, ওরই ওপর গুলি চালাও।'

দুজনেই পরে পরে বন্দুক ছুড়লে। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে দুটো উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল—ইঞ্জিনের 'কু' দেওয়ার মতো।

আমি সানন্দে বললুম, 'তোমরা লক্ষ্য ভেদ করেছ—শাবাশ, শাবাশ! ওই শোনো, উড়োজাহাজের বায়ুহীন কামরার ভিতরে বাতাস ঢোকার শব্দ হচ্ছে।'

বিমল ও কুমার উৎসাহিত হয়ে আবার বন্দুক ছুড়লে এবং বন্দুকের ধ্বনির প্রতিধ্বনি থামতে না থামতে আরো দুটো তীব্র 'কু' শব্দ যেন আকাশের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

উড়োজাহাজ দু-খানা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে তীরবেগে পলায়ন করলে।

বিমল আনন্দে লম্ফ ত্যাগ করে বললে, 'জয়, বন্দুকের জয়!'

চতুস্পদ পক্ষী

সূর্য অস্ত গেছে।

চারিধারে মরুভূমির রাঙা বালি, তারই মাঝখানে এই ছোটো পাহাড়টি। ভাগ্যে মঙ্গলের আবহাওয়া পৃথিবীর চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা, নইলে আজ সারা দিনে আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই বিষম শোচনীয় হয়ে উঠত। তবুও তাপ যা পাচ্ছি, তাও বড়ো সামান্য নয়।

মঙ্গলের এই মরুভূমির আর এক বিশেষত্ব, এখানে জলের জন্যে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। কারণ মরুভূমির বুক চিরে খালের পর খাল চলে গেছে, তাদের কানায় কানায় পরিষ্কার স্বচ্ছ জল টলমল করছে। পাহাড় থেকে প্রায় আধ মাইল তফাতেই একটি খাল,—আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে জলপান করে আসছি। আমাদের সঙ্গে জল রাখবার পাত্র থাকলে বারবার আনাগোনা করতেও হত না। তবে, এখানে আধ মাইল পথ যেতে বেশিক্ষণ লাগে না, কারণ এখন আমরা এক-এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি কিনা!

খালের ধারে ধারে বন-জঙ্গল আর শস্যখেতের পর শস্যখেত। কিন্তু এখানকার গাছপালা সব ছোটো ছোটো—বোধহয় মাটির গুণ। একরকম গাছ এখানে খুব বেশি রয়েছে—দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মতো এবং এইগুলোই এখানে সবচেয়ে বড়ো জাতের গাছ। বন-জঙ্গলের মধ্যে তিন-চার রকম পাখিও দেখলুম, কিন্তু পৃথিবীর কোনও পাখির সঙ্গেই তাদের চেহারা মেলে না। একরকম পাখির আকার বড়ো অদ্ভুত। তাদের দেহ চিলের মতো বড়ো, কিন্তু

গায়ের রঙ একেবারে বেগুনি। তাদের পা চারটে করে, আর ল্যাজও পাখির মতো নয়—হনুমানের মতো লম্বা, ডগায় তেমনি লোমের গোছা। এই আশ্চর্য চতুষ্পদ পাখিগুলো আমাদের দেখেই তাড়াতাড়ি উড়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

রাত্রি এল। আকাশে উঠল চাঁদ—কিন্তু তাদের আলো এত কম যে, অন্ধকার দূর হয় না বললেই চলে।

আজ সারা দিন অনাহারে কেটে গেল। কালও যে খেতে পাব, তার কোনও আশা দেখছি না। গুহার ভিতরে প্রায় সকলেই শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি, বিমল, কুমার আর কমল অন্ধকারে জেগে বসে আছি।

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু—, এখন উপায় কী? খালি জল আর হাওয়া খেয়ে তো প্রাণ বাঁচবে না!'

আমি বললুম, 'এক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না। এখন মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে আমরা ভালো করিনি।'

কুমার বললে, 'আর আত্মসমর্পণ করাও চলে না। এখন আমাদের হাতে পেলে বামনরা আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ভালো ব্যবহার করবে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখানে থাকলেও আমাদের তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে হবে!'

সকলেই স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

বাইরে রাত তখন থমথম করছে।

আচম্বিতে আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করে, মরুভূমির বুক থেকে এক বিকট চিৎকার জেগে উঠল—'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!' তারপরেই আবার সব চুপচাপ।

বিমল সচকিত স্বরে বললে, 'কে এখানে মানুষের ভাষায় আর্তনাদ করছে?'

কুমার বললে, 'বামনরা কি কোনও মানুষকে হত্যা করছে?'

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—এ আবার কী ব্যাপার!

ফের সেই বিকট আর্তনাদ ঃ 'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!—আবার সব চুপ।

বিমল বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। আমি তার হাত চেপে ধরে বললুম, 'যেয়ো না!'

বিমল বললে, 'কেন?'

'বুঝতে পারছ না, এ মানুষের গলার আওয়াজ নয়।'

'তবে এ কী?'

'কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমল আবার বসে পড়ল।

বাইরে, মরুভূমির ভয়-মাখানো আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম;—গভীর রাত্রে এমন নির্জন স্থানে এই রহস্যময় আর্তনাদের কারণ কী? এ আমাদের

চির-চেনা পৃথিবীর নয়, এখানকার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্ব, প্রত্যেক পদেই নব নব বিস্ময় আর বিপরীত কাণ্ড, কাজেই কোনও হদিস না পেয়ে সে-রাত্রের মতো আমি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করলুম। ঘুমোবার আগে আর সেই নিশীথ রাতের ভীষণ আর্তনাদ শুনতে পাইনি।

পরদিন প্রভাতে বাইরে বেরিয়ে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় বসে পরামর্শ করছি, এমন সময় কমল চেঁচিয়ে উঠল—'দেখুন, কারা সব যাচ্ছে!'

তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখলুম, নিচ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন বামন সারি সারি অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অনেকেরই মাথার উপরে এক-একটা ঝাঁকা বা মোট বা বড়ো বড়ো পাত্র, কেউ কেউ পৃথিবীর মতো বাঁকও বহন করছে। ঝাঁকাগুলো নানারকম ফল-ফসলে পরিপূর্ণ। বোধহয় এরা দূর গ্রাম থেকে শহরের বাজারে মাল বিক্রি করতে চলেছে। আমাদের খবর নিশ্চয়ই এরা জানে না, তাহলে কখনই এ-পথ মাড়াবার ভরসা করত না!

বিমল মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'ভাইসব, সামনেই খানা তৈরি! এসো আমরা ওদের আক্রমণ করি।' বলেই তো সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

পাহাড় থেকে নিচে নামবামাত্রই বামনরা বিমলকে দেখতে পেল। জীবনে এই প্রথম মানুষের চেহারা দেখে প্রথমটা তারা ভয়ানক হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বিমলের পিছনে আবার আমাদের সবাইকে দেখে তারা বিষম এক আর্তনাদ করে পালাবার উপক্রম করলে, অমনি বিমল দিলে এক তিন-তলা উঁচু লম্ফ,—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাফ মারলুম।....চোখের নিমেষে আমরা তাদের মোটমাট সমস্তই কেড়ে নিলুম, তারা কোনোই বাধা দিলে না, প্রাণ নিয়ে প্রাণপণে তারা যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে।

রামহরি এক গাল হেসে বললে, 'খোকাবাবু, তোমরা একেলে ছেলে, ভগবান মান না, কিন্তু এই দ্যাখো, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিলেন তিনি!'

অবাক কারখানা

আহারাদির পরে সবাইকে ডেকে আমি বললুম, 'দ্যাখো, এরকম করে তো আর বেশিদিন চলবে না, এখন আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হবে। নইলে কাল থেকে আবার অনাহার ছাড়া আর কোনও উপায় তো আমি দেখছি না।'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, এ-পথ দিয়ে ভবিষ্যতে আর যে বামনদের দল ফল-ফসল নিয়ে যাতায়াত করবে, তাও তো আমার মনে হয় না।'

বিমল একটু ভেবে বললে, 'আজ রাত্রে একবার শহরের দিকে লুকিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, 'কেন?'

বিমল বললে, 'বামনরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই, আমাদের বন্দী করবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই কোনও উদ্যোগ-আয়োজন করছে। তারা কী করছে আগে থাকতে জানতে না পারলে পরে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না।'

আমি বললুম, 'তোমার পরামর্শ মন্দ নয়। সুবিধে পেলে শহর থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্যও লুঠ করে আনা যাবে,—কী বলো?'

বিমল হেসে বললে, 'নিশ্চয়! দলে আমরাও তো কম ভারী নই, আমরা প্রত্যেকেই শুধু হাতে আট-দশ জন বামনকে অনায়াসে বধ করতে পারি। বামনরা আমাদের মতো লাফাতেও পারে না, বেগতিক দেখলে লাফিয়ে লম্বা দিলেই চলবে।'

হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ এল—'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!'

এ সেই কালকের রাতের আর্তনাদ।

আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেলুম, কিন্তু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে মরুভূমির চারিধারে চেয়েও কোথাও জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না।

রামহরি বললে, 'ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা,—খোকাবাবু এসব ভূতুড়ে ব্যাপার!' তারপরেই দূর থেকে আর এক চিৎকার শোনা গেল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।

এ আবার কি, এ যে কুকুরের চিৎকার!

রামহরি চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ ভূত না হয়ে যায় না—কখনও মানুষের মতো, কখনও কুকুরের মতো চেঁচাচ্ছে। এসো বাবুরা, পালিয়ে এসো।'

দূর থেকে কুকুরের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছে, একেবারে আমাদের মাথার উপর থেকে আবার সেই আর্তনাদ শোনা গেল—বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!

চমকে উপরে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের টঙে হনুমানের মতো ল্যাজওয়ালা সেই আশ্চর্য চতুষ্পদ পক্ষী বসে আছে। সেই পাখিটাই অমন বিকট স্বরে ডাকছে।

কমল বললে, 'পাখির ডাক মানুষের শব্দের মতো। অবাক কারখানা!'

কিন্তু দূরে কুকুরের চিৎকার তখনও থামেনি। আমরা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখলুম, খালের জল থেকে ডাঙায় উঠে একটা মিশমিশে কালো মস্ত জানোয়ার বেগে ছুটতে শুরু করলে। খানিক পরেই জানোয়ারটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল—সেটা কুকুরই বটে!

কুমার বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই আমার বাঘা!' বলেই সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

কুমার চেঁচিয়ে ডাক দিলে, 'বাঘা, বাঘা, বাঘা!'

কুকুর পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘেঁষে অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের ডাক শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে খুব জোরে চিৎকার করতে করতে তীরের মতন বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। হ্যাঁ, এ যে বাঘা, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

বাঘা ছুটে এসে একেবারে কুমারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, কুমার মহানন্দে তাকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলে।

আমি দেখলুম, বাঘার গলা থেকে একগাছা সোনার শিকলের আধখানা ঝুলছে। বাঘা নিশ্চয়ই শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে।

বাঘা তারপর বিমল, রামহরি, কমল ও আমার কাছেও এসে ল্যাজ নেড়ে মনের খুশি জানালে ও আমাদের গা চেটে দিয়ে বা পায়ের কাছে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার নূতন আর পুরাতন কোনও বন্ধুকেই সে ভুলে যায়নি।

বাঘাকে ফিরে পেয়ে আমাদেরও কম আনন্দ হল না। এই নূতন জগতে এসে পৃথিবীর সমস্তই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে, কুকুর বলে বাঘাকে আর ছোটো ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না। উড়োজাহাজে যে বানরদের দেখেছিলুম, তারাও যদি কোনও গতিকে আসতে পারে, তাহলে তাদের আমি আদর করে আশ্রয় দিতে নারাজ হই না! তারাও যে পৃথিবীর জীব, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তাদেরও যে যোগ আছে!

বামনদের আস্তানায়

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। আকাশের দুই চাঁদ যেন পরস্পরকে দেখে হাসতে শুরু করে দিয়েছে—যদিও তাদের হাসির ক্ষীণ আলো চারিদিকের আবছায়া দূর করতে পারছে না।

আমরা একে একে পাহাড় থেকে মরুভূমিতে এসে নামলুম, তারপর সকলে মিলে যাত্রা করলুম বামনদের শহরের দিকে। সবআগে রইল বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার, তারপর আমি, কমল ও রামহরি, তারপর আর সকলে। বিমল ও কুমারের পকেটে দু-খানা বড়ো ছোরা ছিল, আমি আর কমল সে দু-খানা চেয়ে নিলুম। অন্য সকলে বন থেকে গাছের এক-একটা মোটা ডাল ভেঙে নিলে—দরকার হলে তা দিয়ে বামন বধ করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। মানুষের হাতের অমন লম্বা ও মোটা ডালগুলোর কাছে বামনদের ক্ষুদে তরোয়ালগুলো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এক-এক লাফে আমরা খাল পার হয়ে গেলুম। আমাদের দেখাদেখি বাঘাও লাফিয়ে খাল পার হল—মঙ্গলে এসে তারও লাফ মারবার ক্ষমতা আশ্চর্যরকম বেড়ে গেছে।

বার বার লাফ মেরে অগ্রসর হলে পাছে হাঁপিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই এগুতে লাগলুম। আর বেশি তাড়া করবারই বা দরকার কী, আমাদের সামনে এখন সারা রাত্রিটাই পড়ে রয়েছে।

ঘণ্টা-আড়াই পরে দূর থেকে বামনদের শহর আবছায়ার মতো দেখা গেল। শহরটা দেখেই বাঘা রেগে গরর-গরর করে উঠল, কিন্তু কুমার তখনই তার মাথায় এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, 'খবরদার বাঘা চুপ করে থাক!' বাঘা একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর একবারও সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। আশ্চর্য কুকুর!

শহরের ভিতরে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বামনরা বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচম্বিতে বিমল ও কুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললুম, 'ব্যাপার কী?'

বিমল সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

তাই তো, প্রকাণ্ড একটা ছায়ার মতো, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী ওটা পড়ে রয়েছে?

বিমল চুপি চুপি বললে, 'বিনয়বাবু, উড়োজাহাজ!'

কুমার বললে, 'বোধহয় এইখানাই আমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, এর আকার দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। এখানা নিশ্চয় পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে বলে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল, কারণ মঙ্গলের আর যত উড়োজাহাজ দেখেছি সবই ছোটো ছোটো। কিন্তু এখানা এমন খোলা জায়গায় পড়ে কেন?'

বিমল বললে, 'বোধহয় শহরের ভিতরে এতবড়ো উড়োজাহাজ রাখবার জায়গা নেই।'

বিমলের অনুমান সত্য বলেই মনে হল। ....আমি নীরবে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'এখন আমাদের কী করা কর্তব্য?'

ধাঁ করে আমার মাথায় এক ফন্দি জুটে গেল। —এর আগে এমন ফন্দি আমার মাথায় ঢোকেনি কেন, পরে তাই ভেবে আমি নিজের বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়েছি, কারণ তাহলে আজ আমাদের মঙ্গল গ্রহে হয়তো আসতেই হত না। আমি বিমলকে বললুম 'দ্যাখো এই উড়োজাহাজখানা আমরা যদি আক্রমণ করি তাহলে কী হয়?'

বিমল বললে, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। উড়োজাহাজের ভিতরে হয়তো অনেক রসদ আছে। তাতে আমাদের পেটের ভাবনা দূর হতে পারে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু খুব চুপি চুপি কাজ সারতে হবে। কারণ শহরের লোক জানতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠবে।'

বিমল বললে, 'দাঁড়ান, আগে আমি দেখে আসি।'

বিমল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে বললে, 'আক্রমণের কোনও বাধা নেই। উড়োজাহাজের প্রধান দরজাটা খোলা রয়েছে। সিঁড়ির উপরে বসে একজন বামনসেপাই ঢুলছে, আমি এখনই এমনভাবে চেপে ধরব, যাতে সে কোনও গোলমাল করতে পারবে না। আপনারা চুপি চুপি আমার পিছনে আসুন।'

বিমল আবার হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হল, আমরা সকলেও ঠিক সেইভাবেই তার পিছু নিলুম।

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখলুম, উড়োজাহাজের ভিতর থেকে খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দরজার তলাতেই নিচে নামবার জন্যে সিঁড়ি, ঠিক তার উপর-ধাপে পা ঝুলিয়ে এবং উড়োজাহাজের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছে এক বামনসেপাই।

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বিমল বুকে হেঁটে আরও খানিক এগিয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে সে মারলে এক লাফ এবং সিঁড়ি টপকে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই বামনসেপাইয়ের বুকের উপরে। তারপর কী হল তা জানি না, কিন্তু বামনটার মুখ থেকে কোনওরকম আর্তনাদই আমাদের কানে বাজল না। অল্পক্ষণ পরেই বিমল উঠে দাঁড়াল এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে বললে।

জয়, জয়, জয়

বামনদের বাগে আনতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হল না। একেই তো তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার উপরে তারা অস্ত্র ধরবার সময় পর্যন্ত পেলে না। অস্ত্রগুলো আমরা আগেই কেড়ে নিলুম, তারপর তাদের সবাইকে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে একটা ঘরের ভিতরে পুরে ফেললুম এবং ইশারায় জানিয়ে দিলুম যে, দুষ্টুমি করলে তারা কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

বামনদের দলে লোক ছিল মোট আশি জন। মানুষের তুলনায় তারা এত দুর্বল যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের সবাইকে টিপে মেরে ফেলতে পারতুম।

একটা বামন চেঁচিয়ে গোলমাল করে উঠেছিল। কিন্তু কুমার তখনই তাকে খেলার পুতুলের মতো মাটি থেকে তুলে মারলে এক আছাড়। তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কুমারের মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই এক আছাড়েই বেচারির ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে গেল একেবারে। লঘুপাপে গুরু দণ্ড।

আমরা দুঃখিত হলুম, কিন্তু হাতে হাতে এই কঠোর শাস্তি দেখে অন্যান্য বামনরা টিট হয়ে গেল—সবাই বোবার মতো চুপ করে রইল।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, এইবার এদের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে রসদ-টসদ যা আছে লুটপাট করে নেওয়া যাক।'

আমি বললুম, 'না, এইবারে আবার পৃথিবীর দিকে যাত্রা করা যাক।'

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বললে—'পৃথিবীর দিকে যাত্রা!'

রামহরি এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমার মুখের পানে শুধু তাকিয়ে রইল—একটা কথা পর্যন্ত কইতে পারলে না।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এইবারে আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হবে, নইলে শীঘ্র আর ফেরবার সময় পাওয়া যাবে না; কারণ এখনও মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছেই রয়েছে—যতই দেরি করব, ততই সে দূরে চলে যাবে।'

কমল বললে, 'কিন্তু যাব কী করে? আমাদের তো ডানা নেই!'

আমি বললুম, 'যেমন করে এসেছি, তেমনি করেই যাব—অর্থাৎ এই উড়োজাহাজে চড়ে।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি বোধহয় মনের খুশিতে ভুলে গেছেন যে আমরা কেউই এ উড়োজাহাজ চালাতে জানি না।'

আমি বললুম, 'না, আমি কিছুই ভুলিনি! উড়োজাহাজখানা দেখেই আমার মাথায় এই নতুন ফন্দি জুটেছে। আমরা পৃথিবীতেই যাব, আর এই উড়োজাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ওই বামনরাই।'

বিমল সানন্দে এক লম্ফ ত্যাগ করে বললে, 'ঠিক, ঠিক! এতক্ষণে আমি বুঝেছি। বামনদের আমরা জোর করে আমাদের সারথি করব—কেমন, এই তো?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। বামনরা এখন দলে হালকা হয়ে পড়েছে, সেপাইরা সব শহরে আছে। এই হচ্ছে শুভ মুহূর্ত, প্রাণের ভয়ে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে।'

বিমল আনন্দে অধীর হয়ে বলল, 'জয়, বিনয়বাবুর বুদ্ধির জয়!'

কুমার আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, তাহলে আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরতে পারব?'

কমল আর রামহরি পরস্পরের হাত ধরে অপূর্ব এক নৃত্য শুরু করে দিলে। তাদের দেখাদেখি বাঘারও স্ফূর্তি বেড়ে উঠল, সেও লাফিয়ে লাফিয়ে হরেকরকম নাচের কায়দা দেখাতে লাগল, আর এত জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল যে, আমার মনে হল ল্যাজটা বুঝি এখনি ছিঁড়ে ঠিকরে পড়বে!

বিমলের ইশারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল।

অন্যান্য সকলেও নানাভাবে ও নানা ভঙ্গিতে আপন আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

আমি বললুম, 'এখনই এতটা আহ্লাদ করে কোনও লাভ নেই। আগে দ্যাখো আমরা সত্যিই পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি কি না। তার উপরে বামনরা উড়োজাহাজ চালাতে রাজি হবে কি না, এখনও তাও আমরা জানি না।'

বিমল চোখ পাকিয়ে বললে, 'কী! রাজি হবে না? তাহলে ওদের কারুকেই আমি আর আস্ত রাখব না! —বলেই বন্দুক বাগিয়ে সে বামনদের দিকে অগ্রসর হল। আমরাও সদলবলে তার পিছনে পিছনে চললুম।

যে-কয়জন বামন উড়োজাহাজের কলঘরে থাকত, পৃথিবী থেকে আসবার সময়ে আমরা তাদের অনেকবার দেখেছিলুম। তাদের পোশাক সেপাইদের পোশাকের মতন নয়। সেই পোশাক দেখেই বিমল তাদের একে-একে দল থেকে টেনে বার করলে। তারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

উড়োজাহাজের কলঘর আমরা আগে থাকতেই জানতুম। বিমল ইঙ্গিতে তাদের সেদিকে অগ্রসর হতে বলল। তারা সুড়-সুড় করে বিমলের আগে আগে চলতে লাগল!

কুমার ও আরও জন পনেরো লোককে বাকি বামনদের কাছে পাহারায় নিযুক্ত রেখে আমিও কলঘরের দিকে চললুম। উড়োজাহাজের প্রধান দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সবাই কলঘরে গিয়ে ঢুকলুম। মস্ত ঘর। চারিদিকে নানান রকম যন্ত্র রয়েছে—ছোটো, বড়ো, মাঝারি। সমস্ত যন্ত্রই পাকা সোনার তৈরি।

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, এই উড়োজাহাজে এত সোনা আছে যে, আমরা সবাই বড়োলোক হয়ে যেতে পারি!'

আমি বললুম, 'রও, আগে প্রাণে বেঁচে মানে মানে পৃথিবীতে ফিরে যাই, তারপর সোনাদানার কথা ভাবা যাবে-অখন! এখন এ সোনার কোনোই দাম নেই।'

বিমল কলের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারায় বামনদের কল চালাতে বললে। বিমলের ইশারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিমল ক্রুদ্ধভাবে আবার ইশারা করলে।

কিন্তু বামনরা তবুও যন্ত্রের দিকে এগুলো না।

বিমল তখন বন্দুকটা তুলে বামনদের দিকে এগিয়ে গেল।

বন্দুক দেখেই তারা আঁতকে উঠল, তারপর তীরের মতো ছুটে গেল—যন্ত্রপাতির দিকে। আর কারুকে কিছু বলতে হল না। এমনি বন্দুকের মহিমা!

উড়োজাহাজ উপরে উঠতে লাগল—ধীরে, ধীরে, ধীরে।

বিপুল পুলকে আমিও আর চুপ করে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলুম,—'জয়, পৃথিবীর জয়!'—আমার জয়নাদে অন্য সকলেও যোগ দিলে। সে যে কী আনন্দ, লিখে তা জানানো যায় না।

উড়োজাহাজ আরও উপরে উঠল—আরও—আরও উপরে।

স্বচ্ছ কক্ষতলে দিয়ে দেখতে পেলুম, নিচে শহরের চারিদিকে বড়ো বড়ো আলো জ্বলে উঠেছে। নিশ্চয়ই উড়োজাহাজের শব্দে শহরের ঘুম ভেঙে গেছে। হয়তো এখনই শত শত উড়োজাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসবে।

বিমল ইশারায় বারংবার শাসিয়ে বলতে লাগল, উড়োজাহাজের গতি বাড়াবার জন্যে। বামনরা কল টিপে উড়োজাহাজখানাকে ঠিক উল্কার মতো বেগে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে

শহরের আলোগুলো ঝাপসা হয়ে এল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম, কারণ শহরের উড়োজাহাজগুলো প্রস্তুত হবার আগেই আমরা বোধহয় নাগালের বাইরে চলে যেতে পারব। বিশেষ, আমাদের উড়োজাহাজের আকার যে-রকম বিশাল, তাতে এর সঙ্গে আর কোনও উড়োজাহাজ পাল্লা দিতে পারবে বলে মনে হয় না!

শহরের খুব অস্পষ্ট আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে আমি বললুম—বিদায় মঙ্গল গ্রহ, তোমার কাছ থেকে চির-বিদায়! তোমার রক্ত-মরুভূমির কাছ থেকে, তোমার যুগল চন্দ্রের কাছ থেকে, তোমার অপূর্ব জীবরাজ্যের কাছ থেকে আজ আমরা চির-বিদায় গ্রহণ করলুম। তোমার অনেক রহস্যই হয়তো জানা হল না, কিন্তু যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এ জীবনের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে ভালো করে জানবার জন্যে আর আমার কোনোই আগ্রহ নেই। পৃথিবীর ডাক আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে—বিদায় মঙ্গল গ্রহ, চির-বিদায়!

আবার পৃথিবীতে

সব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও ক্ষতি নেই কারণ আসবার মুখে আজ পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

বামনদের উপরে আমরা পালা করে দিনরাত পাহারা দিয়েছি, কাজেই তারাও বাধ্য হয়ে বরাবর উড়োজাহাজ চালিয়ে এসেছে।

সোনার পৃথিবী এখন আমাদের চোখের উপরে ছবির মতন ভাসছে। দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমরা পৃথিবীর কোন দেশে গিয়ে নামব, তা জানি না। কিন্তু যেখানেই নামি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে যে সারা পৃথিবীতে একটা মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই আমাদের মুখের কথায় নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করত না; কিন্তু এই অদ্ভুত উড়োজাহাজ আর বামনদের স্বচক্ষে দেখলে আর কেউ সন্দেহ করবার ওজরটুকু পর্যন্ত তুলতে পারবে না।

বামনরা এসেছিল পৃথিবী থেকে নমুনা জোগাড় করতে। আমরাও আজ মঙ্গল থেকে অনেক বিচিত্র নমুনা নিয়ে ফিরে আসছি। শুধু নমুনা সংগ্রহ নয়,—আমরা ফিরছি মঙ্গলকে জয় করে। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে মঙ্গলে নেই, আমরা তা প্রমাণিত করেছি।

কিন্তু এ কী মুসকিল! শেষটা কি ঘাটে এসে নৌকা ডুববে?

আমরা যখন পৃথিবীর খুব কাছে, আমাদের সকলেরই মুখে যখন নিশ্চিত হাসির লীলা, চোখে যখন নির্ভয় শান্তির আভাস, তখন চারিদিক আঁধার করে আচম্বিতে ঝড়ের এক ভৈরব মূর্তি জেগে উঠল।

তেমন ঝড় আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমাদের এমন যে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ, ঠিক যেন ছেঁড়াপাতার টুকরোর মতন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলল। কোনও রকমেই সে বাগ মানলে না। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু যেন আমাদের চোখের উপরে নৃত্য করতে লাগল।...

প্রায় চার ঘন্টা ধরে আমাদের উড়োজাহাজ নিয়ে দিকে দিকে ছোড়াছুড়ি করে ঝড়ের শখ যেন মিটল। ধীরে ধীরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস থেমে আসতে লাগল, কিন্তু চারিদিকের নিবিড় অন্ধকার তখনও একটুও কমল না, এ অন্ধকারে পৃথিবীতে নামাও নিরাপদ নয়।

অথচ আমরা নামতে না চাইলে, উড়োজাহাজ যে ধীরে ধীরে নামছে, সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। বামনরা চেষ্টা করেও তাকে আর উপরে তুলতে পারছে না—নিশ্চয়ই ঝড়ের দাপটে কোনও কলকব্জা বিগড়ে গেছে।

তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উড়োজাহাজখানা আস্তে আস্তে নামছে। নইলে পৃথিবীর উপরে আছড়ে পড়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, আমাদেরও আর কিছু আশা-ভরসা থাকত না।

কিন্তু কোথায় আমরা নামছি—জলে, না স্থলে? অন্ধকারে কিছুই বোঝবার জো নেই।

আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

যেখানেই নামি, এ যে আমাদের নিজেদের পৃথিবী, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। এ একটা মস্ত সান্ত্বনা। মা-পৃথিবীর সবুজ বুক স্পর্শ করবার জন্যে প্রাণ আমার আনচান করতে লাগল।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উড়োজাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল।

আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি!

আমরা সকলে মিলে জয়ধ্বনি করে উঠলুম এবং তাই শুনে বামনরা যেন আরও মুষড়ে পড়ল।

উড়োজাহাজের দরজা খুলে আমি বাইরের দিকে তাকালুম। একে রাত্রি, তায় আকাশ মেঘে ঢাকা। কাজেই দেখলুম, খালি অন্ধকার আর অন্ধকার আর অন্ধকার।

রাত না পোয়ালে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমরা সাগ্রহে প্রভাতের অপেক্ষায় বসে রইলুম। খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে

যাচ্ছিল। এ বাতাসকে আমি চিনি। এ আমাদের পৃথিবীর বাতাস। তাকে কি ভোলা যায়?...

ওই ফুটে উঠেছে ভোরের আলো—পুব আকাশের তলায় আশার একটি সাদা রেখার মতো। আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সামনের দৃশ্য তখনও অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ারা মতন,—এখনও গাছপালার সবুজ রঙ চোখের উপরে ভেসে ওঠেনি।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনই উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নিচে নামলুম—বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

আঃ, কী আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ, সে যে কি মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি।

কমল তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, 'হ্যাঁ, এ পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিন তলার সমান উঁচু হতে পারলুম না তো!'

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হল—দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম! যেন ভীষণ ভারী পায়ের শব্দ।

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম, অন্ধকারের আবরণ তখনও সরে যায়নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মতো কি যেন চলে যাচ্ছে বলে মনে হল।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমরা সবাই স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিজের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে বলতে পারি, আমাদের সুমুখ দিয়ে যে জীবটা চলে যাচ্ছে সেটা তালগাছের চেয়ে কম উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে, দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন-ঘন কেঁপে উঠছে।...

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনও শোনা যেতে লাগল—দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু!'

'অ্যাঁ?'

'ওটা কী?'

'অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না।'

'কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাই-ই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?'

'পৃথিবীতে।'

'কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর জীব?'

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল।

ময়নামতির মায়াকানন

ময়নামতীর মায়াকানন

পূর্ব কথা

বিনয়বাবুর ডায়রিতে যে অতি আশ্চর্য ঘটনাটি তোলা আছে, তা পড়বার আগে একটুখানি পূর্ব-ইতিহাস জানা দরকার।

ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতরা যে আজকাল 'মার্স' বা মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা করছেন, এ খবর এখন বোধ হয় পৃথিবীর কারুর কাছেই অজানা নেই।

পণ্ডিতদের মতে, মঙ্গল গ্রহে একরকম জীবের বসতি আছে তাদের চেহারা মানুষের মত না হলেও মানুষের চেয়ে তারা কম বুদ্ধিমান নয়। অনেকের মতে তাদের বুদ্ধি মানুষেরও চেয়ে বেশি। কিন্তু পণ্ডিতদের কথা এখন থাক।

.....মঙ্গল গ্রহ থেকে আশ্চর্য এক উড়োজাহাজে চড়ে একদল বেয়াড়া বামন জীব একবার আমাদের পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিল।

যাবার সময়ে অদ্ভুত উপায়ে তারা অনেক মানুষকে মঙ্গলগ্রহে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বন্দীদের ভিতরে ছিল বিমল, কুমার ও রামহরি— —যাঁরা "যকের ধন" উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের কাছে ওরা অপরিচিত নয়! বিনয়বাবু ও কমল বন্দী হয়েছিল—এবং সঙ্গে ছিল কুমারের বড় আদরের বাঘা কুকুর।

বিনয়বাবু বয়সে প্রৌঢ়—নানা বিষয়ে জ্ঞান তাঁর অগাধ। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর নখদর্পণে! দলের সকলেই তাঁকে মানত ও শ্রদ্ধা করত।

বিমল, কুমার ও কমল বয়সে যুবক। বিমলের সাহস ও বাহুবল অসাধারণ।

রামহরি হচ্ছে বিমলের পুরান চাকর।

অন্যান্য বন্দীদের পরিচয় আপাতত অনাবশ্যক।

মঙ্গলগ্রহে যেসব রোমহর্ষক ও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, বিনয়বাবুর ডায়রিতে তা লেখা আছে। ডায়রির সেই কাহিনী "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" নামে উপন্যাসে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

"ময়নামতীর মায়াকানন" যদিও সম্পূর্ণ নূতন এক উপন্যাস, তবু এর আরম্ভ হয়েছে "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমনের" শেষ পরিচ্ছদের শেষ অংশ থেকে।

বুদ্ধি ও শক্তিতে পরাস্ত হয়ে মঙ্গলগ্রহের বামনরা শেষটা বন্দী মানুষদের হাতেই বন্দী অবস্থায়, উড়োজাহাজ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

বিনয়বাবুর ডায়রির সেই স্থানটি "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" থেকে আমি এখানে উদ্ধার করে দিলুম।—

ঐ ফুটে উঠছে ভোরের আলো, —পূর্ব-আকাশের তলায় আশার একটা সাদা রেখার মত। আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সামনের দৃশ্য তখনও অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মত, —এখনও গাছপালার সবুজ রং চোখের উপরে ভেসে ওঠেনি!

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনি উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নিচে নামলুম —বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না!

আঃ, কি আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ সে যে কি মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি!

কমল তড়াক করে এক লাফ মেরে বলল, 'হাঁ এ আমাদের পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিনতলার সমান উঁচু হতে পারলুম না তো।"

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হল—দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম যেন ভীষণ ভারি পায়ের শব্দ!

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম! অন্ধকারের আবরণ তখনও সরে যায়নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মত কি-যেন চলে যাচ্ছে বলে মনে হল।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমাদের সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিজেদের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বলতে পারি আমাদের সমুখ দিয়ে যে-জীবটা চলে যাচ্ছে সেটা তালগাছের চেয়ে কম উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন ঘন কেঁপে উঠছে.....

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনও শোনা যেতে লাগল— —দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, "বিনয়বাবু"।

—'অ্যাঁ'?

—'ওটা কি?'

—'অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না।'

—'কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাইই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?

—'পৃথিবীতে!'

—'কিন্তু এই মাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর?'

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল।

(বিনয়বাবুর ডায়রি)

অপূর্ব পৃথিবী

উষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠছে!.....কিন্তু পৃথিবী তখনও আপনার বুকের উপর থেকে আবছায়ার চাদরখানি খুলে রেখে দেয়নি।

যেদিকে সেই মহাকায় জীবটা চলে গেল, সেই দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে আমরা কয়জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

আচম্বিতে আর এক অপরিচিত শব্দে আমরা সকলেই চমকে উঠলুম! যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল টানছে আর টানছে!

এক লহমায় আমাদের আড়ষ্টভাব ঘুচে গেল।

কুমার সর্বাগ্রে চেঁচিয়ে উঠল, "বামনদের উড়োজাহাজ!"

বিমল বললে, "সে কি কথা । উড়োজাহাজ তো বিকল হয়ে পৃথিবীতে এসে নেমেছে, মেরামত না করলে আর উড়তে পারবে না!"

রামহরি আকাশের দিকে হাত তুলে বললে, "ঐ দেখ খোকাবাবু!"

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বিপুল একটা কালো ছায়া ঠিক বিদ্যুতের মত বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে!—হ্যাঁ, এ মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজই বটে!

কুমার বললে, "কি সর্বনাশ! অনেক মানুষ যে ওর মধ্যে আছে!"

কমল তাড়াতাড়ি বললে, "কুমারবাবু, বন্দুক ছুড়ুন, বন্দুক ছুড়ুন!"

বিমল হতাশভাবে বললে, "আর মিছে চেষ্টা! বামনরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে, উড়োজাহাজ বন্দুকের সীমানার বাইরে চলে গেছে!

এরই মধ্যে উড়োজাহাজখানা আকাশের গায়ে প্রায় মিলিয়ে যাবার মত হয়েছে—না জানি কতই বেগে সে উড়ে চলেছে!

ভোরের আলো তখন মাটির বুকেও নেমে এসেছে এবং অন্ধকার সরে যাচ্ছে বনজঙ্গলের ভিতর দিকে!

আমি বললুম, "বামনরা যে কি করে চম্পট দিলে কিছুই তো বুঝতে পারছি না, এতগুলো লোককে আমরা তো তাদের উপরে পাহারায় রেখে এসেছি!"

বিমল বললে, "বোধ হয় বন্দুক নিয়ে আমরা চলে আসতেই বামনদের সাহস বেড়েছে, তারা মানুষদের আক্রমণ করেছে!"

—"সম্ভব। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। চল, যেখানে উড়োজাহাজ এসে নেমেছিল, সেখানটা একবার দেখে আসি!"

জায়গাটা বেশি দূরে নয়। আমরা যে দিক থেকে এসেছিলুম আবার সেই দিকেই এগিয়ে চললুম!

তখন চারদিক দিব্য ফরসা হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখের সুমুখে যে সব দৃশ্য দেখছি তা একেবারে অভাবিত ও অপূর্ব!

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভোরের আলোতে প্রাতস্নান করছে। পাহাড়গুলোর উপরে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু তাদের তলাতেই অনাদিকালের নীল অরণ্য!

পূর্বদিকে মস্ত-একটি প্রান্তর ধূ-ধূ করছে—মাঝে মাঝে এক-একটা গাছের কুঞ্জ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অত-বড় মাঠের কোথাও একগাছা ঘাসের নামগন্ধও নেই? মাঠের একপাশ দিয়ে একটা চিকচিকে রেখা এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গেছে—নিশ্চয়ই নদী।

উত্তরদিকেও বনজঙ্গল আর গাছপালা, অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট, এবং তাদের আকার এমন অদ্ভুত যে, পৃথিবীর কোন গাছের সঙ্গেই মেলে না।

দক্ষিণদিকের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে জলের উপরে সূর্য কিরণের ঝিকিমিকি। জলের নীল রং দেখে আন্দাজ করলুম সমুদ্র।

আমাদের পায়ের তলাতে যে জমি রয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় পাথর বললেই চলে—সেখানেও ঘাসের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে এক একটা ঝোপের ভিতরে অজানা নানারকম আশ্চর্য ফুল ফুটে আছে সেসব ফুলের কোনটারই আকার ছোট নয়। আর তাদের সকলেরই বোঁটায় বড় বড় কাঁটা!

বিমল কৌতূহলী চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে বললে, "কি আশ্চর্য বিনয়বাবু, এ আমরা কোন দেশে এলুম? এমন ভোরের বেলা, অথচ একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না!"

কুমার বললে, "এমন বনজঙ্গল, অথচ একটা ফড়িং কি প্রজাপতি পর্যন্ত উড়ছে না!"

বাস্তবিক, এ বড় অসম্ভব ব্যাপার! চারিদিকে কোথাও কোন জীবের সাড়া বা চিহ্ন নেই।

আমি বললুম, "এ যেন ময়নামতীর মায়াকানন!"

কমল বললে, "সে আবার কি?"

—"প্রাচীনকালে বাংলা দেশে মানিকচন্দ্র বলে এক রাজা ছিলেন। ময়নামতী তাঁর রানী। প্রবাদ আছে ময়নামতী ডাকিনী বিদ্যা শিখে গুরুর বরে অমর হয়েছে। এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, এ যেন সেই ময়নামতীর মায়াপুরী—কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী পর্যন্ত ভয়ে এখানে দেখা দেয় না।"

রামহরি এতক্ষণ সকলের আগে আগে পথ চলছিল, আমার কথা শুনেই সে মুখ শুকিয়ে সকলের পিছনে এসে দাঁড়াল।

আমি হেসে বললুম, "কি হল হে রামহরি হঠাৎ পিছিয়ে পড়লে কেন?"

—"আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে।"

—"কেন, কি কথা?"

—"ঐ যে বললেন এ বন হচ্ছে ময়নামতীর মায়াকানন। বুড়ি ময়নার গল্প আমিও জানি বাবু! সে বনকে শহর করত, শহরকে বন করত, ভেড়াকে মানুষ আর মানুষকে ভেড়া বানাত! যত ভূত-প্রেত আর ডাকিনী-যোগিনী তার কথায় উঠতবসত।"

—"রামহরি, এত সহজে তুমি ভয় পাও কেন? আমি যা বললুম তা কথার কথা মাত্র!"

—"ভয় কি পাই সাধে? যে বিপদ থেকে সবে পার পেয়েছি, আমি আর কিছুই অসম্ভব মনে করি না। কে জানে এ আবার কোন মুল্লুকে এলুম—পৃথিবীর সঙ্গে এর তো কিছুই মিলছে না। যেখানে পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, ফড়িং নেই, সে কি পৃথিবী? এই শেষরাতে চোখের সমুখ দিয়ে পাহাড়ের মত কি-একটা চলে গেল, পৃথিবীতে কি সেরকম কোন জীব থাকে।"

আমি আর কোন জবাব দিলুম না। রামহরির ভয় হাস্যকর বটে, কিন্তু তার যুক্তি অসঙ্গত নয়। বিমল বললে, "বিনয়বাবু আমাদের উড়োজাহাজ কোথায় এসে নেমেছিল, আমরা বোধ হয় তা আর ঠিক করতে পারব না।"

আমি বললুম, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। অন্ধকারে আমরা কোথায় নেমেছিলুম এখন তা আর বোঝা শক্ত!"

রামহরি দরদ-ভরা গলায় বললে, "আহা, উড়োজাহাজের ভেতরে যে মানুষগুলো ছিল, তাদের দশা কি হবে?"

কমল বললে, "যার অদৃষ্টে যা আছে! তাদের আবার মঙ্গল গ্রহে ফিরে যেতে হবে, —আর কি!"

কুমার বললে, "এখন ও-সব বাজে কথা রেখে নিজেদের কথা ভাব। আমাদের অদৃষ্টও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ওকি! বিমল, বিমল!"

আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, অল্পদূরেই বনের এক অংশ উপর থেকে তলা পর্যন্ত দুলছে। তার পরেই দেখা গেল, বনের উপরে চূড়ার মত খুব-উঁচু একটা গাছ বার-দুয়েক দুলেই মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বিস্মিতভাবে বলল, "অতখানি জায়গা জুড়ে বন দুলছে —কে ওখানে আছে।"

কুমার বললে, "এখন ঝড়ও নেই জোরে হাওয়াও বইছে না। তবে অত-বড় গাছ এত সহজে ভাঙলে কে?"

বাঘা একবার ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল, তারপর ছুটে সেই বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

আমার গা কেমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। আমি বিজ্ঞানকে মানি এবং বিজ্ঞান যে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছে তাও আমি জানি—কিন্তু এখানে এসে যেসব কাণ্ড দেখছি তার তো কোনই হদিস পাচ্ছি না। এ আমাদের চোখের ভ্রম, মনের ভ্রম,—না সত্যিই কোন অলৌকিক ব্যাপার?

হঠাৎ দেখলুম বাঘা তীরের মত বেগে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল! তার ল্যাজ পেটের তলায় গুটান আর তার চোখ দুটো বিষম ভয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে! সে এসেই বিমলের পায়ের তলায় মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল!

বিমল তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, "বাঘা তো কখনও ভয় পায় না। সে এমন কী দেখেছে?"

আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, "বিমল, এ জায়গা বড় সুবিধের নয়। এস, এখান থেকে আমরা চলে যাই—একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজতে হবে তো!"

বিমল একবার বাঘা, আর একবার বনের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললে, "কিন্তু বনের ভিতরে কী আছে, —বাঘা কী দেখে এত ভয় পেয়েছে?"

বোম্বাই ফড়িং

আমরা সেই ভয়াবহ অরণ্য থেকে পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে লাগলুম!

চলতে চলতে বার বার পিছনে তাকিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখলুম—বনের এক জায়গায় গাছপালা অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে দুলছে আর দুলছে! কেন দুলছে, কে দোলাচ্ছে?

বাঘা আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলতে লাগল কিন্তু ভয়ে সে তখনও জড়সড় হয়ে আছে।

বনের ভিতরে কী যে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে এবং বাঘা যে কী দেখে ভয়ে মুষড়ে পড়েছে, অনেক ভেবেও তার কোনও হদিস পেলুম না।

কুমার বললে, "আমার বাঘা বাঘ দেখেও ভয় পায় না। কিন্তু এর অবস্থাই যখন এমন কাহিল হয়ে পড়েছে, তখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড আছে!"

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "চুপিচুপি ওখানে গিয়ে আমি একবার দেখে আসব কি?"

আমি তাড়াতাড়ি ডানপিটে বিমলের হাত চেপে ধরে বললুম, "তুমি কি পাগল হলে বিমল? বিপদকে যেচে ডেকে আনবার কোন দরকার নেই?"

বিমল বললে, "আচ্ছা আপনি যখন মানা করছেন তখন আর যাব না।"

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। আশে পাশে আরও অনেক ঝোঁপ জঙ্গল আর বন রয়েছে। কেন জানি না, সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠতে লাগল! প্রতি পদেই মনে হতে লাগল ওই সব বন জঙ্গলের মাঝখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আমাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে! এক জায়গায় শুনতে পেলুম, বনের ভেতরে আবার সেই রকম ধপাস ধপাস করে শব্দ হচ্ছে এবং প্রতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুক কেঁপে—কেঁপে উঠছে—বনের ভিতরে যেন কোন পর্বতপ্রমাণ দানব আপন মনে এধারে ওধারে ঘুরে ফিরে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। যার পায়ের শব্দেই পৃথিবী কাঁপে, না জানি তার আকার কি ভয়ানক! একবার সে যদি মানুষের গন্ধ পায়, তাহলে আর কি আমাদের রক্ষা আছে?

আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার এক দৈত্যের কবলে গিয়ে পড়েছিল। গালিভার সাহেবের ভ্রমণ-কাহিনীতেও দৈত্য-মুল্লুকের কথা আছে। তবে কি সে সব গল্প কাল্পনিক নয়, আমরা কি সত্যই কোন দৈত্যদের দেশে এসে পড়েছি? কিন্তু এ কথায় আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলে না। বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমরা তো কেউ এখানকার কিছুই চিনিনা। কোন দিক নিরাপদ কি করে আমরা তা জানতে পারব?"

বিমলের কথা সত্য। কিন্তু খানিকক্ষণ ভেবে বুঝলুম দক্ষিণ দিক অর্থাৎ যেদিকে সমুদ্র আছে, সেদিকটা বেশ ফাঁকা, —সেদিকে জঙ্গল নেই, কাজেই কোন লুকান বিপদেরও ভয় নেই। তার উপরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে খুব বড় একটা পাহাড়ও রয়েছে। মঙ্গলগ্রহের মত এখানেও আমরা ঐ পাহাড়ের ভিতরে আশ্রয় নিতে পারব। সকলকে আমি সেই কথা বললুম। সকলেই আমার প্রস্তাবে রাজি হল। আমরা তখনই সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলুম।

পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, মানুষের সাড়া নেই, চারিদিকে খালি বন আর পাহাড় আর সমুদ্র! আমার মনে হল, আমরা যেন বৈজ্ঞানিকদের পৃথিবীর সেই বাল্যকালে ফিরে এসেছি—যখন মানুষের নামও কেউ শোনে নি, যখন পৃথিবীতে বাস করত শুধু প্রকাণ্ড কিম্ভুত-কিমাকার আশ্চর্য সব জানোয়ার!

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অনেক— অনেক উঁচুতে একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে! তাহলে এদেশেও পাখি আছে! তাড়াতাড়ি আমি সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলুম।

বিমল বললে, "কিন্তু ওগুলো কি পাখি?"

কুমার বললে, "চিল।"

কমল বলল, "ঈগল।"

আমি বললুম, "কিন্তু চিল কি ঈগলের ডানা তো অত বড় হয় না।"

রামহরি বললে, "ওদের ল্যাজ কি-রকম দেখুন!"

তাইত ওদের ল্যাজগুলো চতুস্পদ জীবের মত যে! কি পাখি ওগুলো?

ভাল করে দেখবার আগেই পাখির ঝাঁক ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ পিছন থেকে কমল আর্তনাদ করে উঠল। চকিতে ফিরে দেখি কমলের পিঠের উপরে একটা অদ্ভুত আকারের জীব এসে বসেছে আর কমল প্রাণপণে সেটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

আমরা সকলে মিলে জীবটাকে মেরে ফেললুম। অদ্ভুত জীব? দেখতে মস্ত বড় একটা ফড়িংয়ের মত—প্রায় একহাত লম্বা! কিন্তু তার মুখে সাঁড়াশির মত দুখানা বড় বড় দাড়া রয়েছে আর তার দেহের দুইধারেও রয়েছে দুখানা করে চারখানা হাত-দেড়েক লম্বা ডানা।

রামহরি বললে, "ও বাবা এ যে বোম্বাইফড়িং!"

কমলের দিকে চেয়ে দেখলুম তার ঘাড়ের পিছনে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে একদিকে আঙুল তুলে বললে, "দেখ, দেখ!"

সেই দিকে তাকাতেই দেখি গাছপালার ভিতর থেকে পালে পালে বোম্বাই ফড়িং বেরিয়ে আসছে।

আমি বললুম, "পালাও, পালাও। ওরা আমাদের দেখতে পেলে আমরা কেউ বাঁচব না।"

সবাই বেগে দৌড়তে লাগলুম—ফড়িং দেখে এর আগে মানুষ বোধ হয় আর কখনও পালায়নি।

পেটের ভাবনা

এই তো সমুদ্রতীর! উপরে নীলপদ্মের রং মাখান অনন্ত আকাশ, নিচে পৃথিবী দেবীর পরনের নীলাম্বরীর মত অনন্ত নীল সায়রের লীলা!

সমুদ্রের বুকের উপরে বসে সূর্যের আলো হাজার হাজার হীরা মাণিক নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে, আমরা বসে বসে খানিকক্ষণ তাই দেখতে লাগলুম।

বিমল প্রথমে কথা কইলে। বললে, "বিনয়বাবু, এখন উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আমরা যে পৃথিবীতেই এসেছি, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কোন দেশ, এখান থেকে কোন দিকে, কতদূরে মানুষের বসতি আছে, তা আমরা জানি না। এখানে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ কি খেয়ে বেঁচে থাকব?"

আমি বললুম, "চেষ্টা করলে বনের ভেতরে শিকার মিলতে পারে!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, মিলতে পারে, কিন্তু তাও বন্দুকের টোটা না ফুরান পর্যন্ত।"

—"বিমল, টোটা ফুরোবার আগেই আমরা যে এ দেশ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাব না, এমন মনে করবার কোনই কারণ নেই।"

—"কিন্তু শিকার পেলেও আমরা রাঁধব কি করে? আমাদের সঙ্গে দেশলাই নেই, আগুন জ্বালতে পারব না।"

—"তা হলে আমাদের কাঁচা মাংস খাওয়াই অভ্যাস করতে হবে। মন্দ কি, সেও এক নূতনত্ব!"

রামহরি বললে, "বাবু ভয় নেই, আপনাদের কাঁচা মাংস খেতে হবে না, আমি আপনাদের রেঁধে খাওয়াব!"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "তুমি কোথা থেকে আগুন পাবে?"

রামহরি বললে, "কেন ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে আসতে আসতে আপনারা কি দেখেন নি কত ছোটবড় চকমকি পাথর পড়ে রয়েচে!"

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললুম, "যাক তাহলে আমাদের একটা বড় ভাবনা দূর হল। ইস্পাতের জন্যে ভাবতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ছোরাছুরি আছে, তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।"

বিমল পেটের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "ও বিনয়বাবু, শুনেই যে আমার ক্ষিধে পেয়ে গেল! এখন খাই কি?"

আমি হেসে বললুম, "শিকার না পেলে আমাদের হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে।"

কুমার বললে, "কেন বিনয়বাবু, খাবার তো আমাদের সামনে রয়েছে, হাত বাড়িয়ে নিলেই হয়!"

বিমল বললে, "সামনে! কোথায়?"

কুমার বললে, "ঐ দেখ!"

চেয়ে দেখলুম আমাদের সুমুখে বালির উপরে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাজার হাজার গর্ত আর প্রত্যেক গর্তের সামনে বসে রয়েছে এক একটা লাল রঙের কাঁকড়া।

বিমল মহা উল্লাসে এক লাফ মেরে বললে, "কি আশ্চর্য, এতক্ষণ আমি দেখতে পাইনি!"

আমরা সকলেই কাঁকড়া ধরতে ছুটলুম। কিন্তু খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করেই বুঝলুম, কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাদের কাছে যেতে না যেতেই তারা বিদ্যুতের মত গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিছুতেই ধরা দেয় না। তারা কেউ আত্মসমর্পণে রাজি নয় দেখে আমরা শেষটা গর্ত খুঁড়ে তাদের গোটাকতককে অনেক কষ্টে বন্দী করলুম। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে কমল হঠাৎ একরাশ ডিম আবিষ্কার করলে। মোট একশটা ডিম।

আমি সানন্দে বললুম, "ব্যস আর আমাদের খাবারের ভাবনা নেই! এগুলো কাছিমের ডিম।"

কমল বললে, "কাছিমের ডিম কি মানুষে খায়?"

—"নিশ্চয়ই খায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্থানে কাছিমের ডিম আর মাংসই হচ্ছে মানুষের প্রধান খাবার! এখানে যখন কাছিমের ডিম পাওয়া গেছে, তখন আজ রাত্রে আমরা কাছিমও ধরতে পারব।"

বিমল বললে, "তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাগ্যদেবী এখনও আমাদের উপরে একেবারে বিমুখ হননি!"

কুমার বললে, "আর তো তর সইছে না—আগুন জ্বাল আগুন জ্বাল।"

সাগর-দানবের পাল্লায়

পাহাড়ের উপরে এখানেও একটা গুহা খুঁজে নিতে আমাদের বেশি দেরি লাগল না। এ গুহাটির সবচেয়ে সুবিধা এই যে, এর ভিতরটা বেশ লম্বা চওড়া হলেও মুখটা এমন ছোট যে হামাগুড়ি না দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই। কাজেই আত্মরক্ষার পক্ষে গুহাটি খুবই উপযোগী।

সমুদ্রতীরে যেখানে কাছিমের ডিম পাওয়া গিয়েছিল, সন্ধ্যার পর আমরা আবার সেইখানে গিয়ে একখানা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম—কাছিম ধরবার জন্যে।

দক্ষিণ আমেরিকায় যেভাবে কচ্ছপ শিকার করা হয়, আমি কেতাবে তা পড়েছি। কচ্ছপদের স্বভাব হচ্ছে, ডাঙায় উঠে বালির ভিতরে ডিম পাড়া। রাত্রে দলে দলে তারা ডাঙায় ওঠে। স্ত্রীকচ্ছপ ডিম পেড়ে বালির ভিতর লুকিয়ে রাখে। এক একটা কচ্ছপ একসঙ্গে আশি থেকে একশ-বিশটা পর্যন্ত ডিম পাড়ে তারপর ভোর হবার আগেই আবার তারা জলে ফিরে যায়।

শিকারীদের কাজ হচ্ছে কচ্ছপদের ধরে উল্টে দেওয়া! তা হলে আর তারা পালাতে পারে না। উল্টে দেবার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার যাতে কাছিমের ডানা বা মুখের কাছে শিকারীর হাত না পড়ে। কচ্ছপের কামড় বড় সুখের নয়, আর তার ডানার আঘাতও এমন জোরাল যে এক আঘাতে মানুষের পায়ের হাড় মট করে ভেঙ্গে যায়।.... এই সব কথা আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে লাগলুম।

আকাশের তখন একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার আলো এত ক্ষীণ যে, অন্ধকার দূর হচ্ছে না। যে ভয়ানক বন থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি অনেক দূরে একটা জমাট কালো ছায়ার মত তাকে দেখা যাচ্ছে। তার দিকে যতবার তাকাই আমাদের বুক অমনি দুরুদুরু করে উঠে। ও বনে যে কী আছে ভগবান তা জানেন!

এমন সময়ে সাদা বালির উপরে একটা কালো রেখা টেনে, প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ আমাদের খুব কাছে এসে চারিদিকে একপাক ঘুরে এল।

বিমল তাকে তখনই ধরতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে চুপিচুপি বললুম, "থাম থাম! ওটা হচ্ছে কাছিমদের কর্তা। ও আগে এসে চারিদিকে গণ্ডী কেটে রেখে যাচ্ছে। কর্তা গিয়ে খবর দিলে পর আর সব কাছিম এসে এই গণ্ডীর ভেতরে আড্ডা গাড়বে। তারপর আমরা আক্রমণ করব।"

রামহরি বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে কাছিম-ভায়া ফিরে যাচ্ছেই তো বটে।"

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কাছিমকর্তা ফিরে যাবার পরেই দলে দলে ছোটবড় কচ্ছপ ডাঙার উপরে এসে উঠল।

তারপরেই আমাদের আক্রমণ! আমরা বেগে গিয়ে তাদের এক একটাকে ধরে বালির উপরে চিৎ করে ফেলে দিলুম। কাজটা অবশ্য খুব সহজ নয়, কারণ তাদের অনেকেই ওজনে প্রায় একমণ, কি আরও বেশি!

আমরা প্রায় গোটা দশেক কচ্ছপ বন্দী করলুম— বাকিগুলো জলে পালিয়ে গেল। আগেই কতকগুলো শুকনো লতা সংগ্রহ করে এনেছিলুম—বন্দীদের বাঁধবার জন্যে। সেই লতা দিয়ে আমরা তখনি তাদের বেঁধে ফেললুম।

বিমল বললে, "যাক এখন কিছুদিনের জন্যে আমাদের পেটের ভাবনা আর রইল না। এইবারে এ দেশ থেকে পালাবার কথা ভাবতে হবে।"

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই ভীষণ এক বিকট চিৎকারে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! উঃ তেমন উচ্চ চিৎকার আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি—যেন হাজারটা সিংহ একসঙ্গে একস্বরে গর্জন করে উঠল।

সে অমানুষিক চিৎকারে আমাদের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ল, কেউ আমাদের আক্রমণ করলেও তখন আমরা সেখান থেকে এক পা নড়তে পারতুম না।

আবার—আবার—আবার—সেই আকাশ-ফাটান গর্জন, একবার, দুইবার, তিনবার।

সমুদ্রের জল থেকে কী ওটা উঠে আসছে—কী ওটা কী ওটা?

অস্পষ্ট আলোয় তাকে ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না —কিন্তু তার মাথা প্রায় তালগাছের সমান উঁচু, আর তার দেহের তুলনায় হাতির দেহও বিড়ালের সামনে নেংটি ইঁদুরের মত নগন্য। সেই ভয়ানক সমুদ্র দানবের চোখ দুটো আলো আঁধারির মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বলে জ্বলে উঠছে।

আমি সভয়ে বললুম, "পালাও, পালাও।"

বিমল কাতর স্বরে বললে, "আমার পা-দুটো যে অসাড় হয়ে গেছে, পালাবার যে উপায় নেই!"

রামহরি একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কুমার আর কমল দুই হাতে কান চেপে বালির উপরে বসে পড়ল।

আমার দুই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল!

এখন উপায়?

ডিটপ্লোডোকাস?

জলের ভিতর থেকে সেই সৃষ্টিছাড়া জীবটা যখন প্রথম মাথা তুললে, তখন তাকে মনে হল একটা বিষম মোটা অজগর সাপের মত। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই আবছায়ার মত দেখা গেল তার বিরাট দেহ। তার চারটে পা এবং পাগুলো তার দেহের তুলনায় খুব ছোট হলেও প্রত্যেক পাখানা অন্তত ছয়-সাত ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না।

আমরা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম সেই সাগর দানব ডাঙায় উঠে তার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা ল্যাজ বার কতক বালির উপরে আছড়ালে, তারপর হঠাৎ নিজের হাতির চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা, চওড়া ও উঁচু দেহের উপরে একটা বিশফুট লম্বা অজগরের মত গলা শূন্যে তুলে আবার তেমনি বাজের মত চিৎকার করতে লাগল। সে সময় তার মাথাটা এত উর্দ্ধে উঠল যে পাশে কোন তিনতালা বাড়ি থাকলেও তার ছাদের উপর থেকে সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারত।

তার ভীষণ চিৎকারে রামহরির মূর্ছা আপনি ছুটে গেল। সে চিৎকারে মৃতের চিরনিদ্রাও বোধ হয় ভেঙে যায়। রামহরির মূর্ছা তো সামান্য কথা!

তবু আমরা কেউ পালাতে পারলুম না—যেন এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দেখে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপরেই আচম্বিতে চিৎকার থামিয়ে সেই ভীষণ জীবটা ঝপাং করে আবার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে দেহের সমস্তটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, জলের উপরে জেগে রইল শুধু তার অজগরের মত মাথা এবং গলার খানিকটা। ওই মাথা ও গলার তলায় যে কি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত দেহ আছে তাকে তখন দেখলে কেউ তা কল্পনা করতে পারত না।

এতক্ষণে আমাদের সাড় হল। আমি বললুম, "জীবটা বোধকরি আমাদের দেখতে পায়নি, —এইবেলা পালাই চল।"

তারপরেই আমরা সবাই একসঙ্গে তীরের মত পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম—একেবারে গুহার সামনে না গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা করলুম না। বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, "বিনয়বাবু একি দেখলুম!"

—"আমিও তাই ভাবচি।"

রামহরি দুইহাত কপালে চাপড়ে বললে, "আর ভেবে কি হবে, এখানে আর আমাদের নিস্তার নেই।"

কুমার হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, "বিনয়বাবু মঙ্গল ছাড়া আর কোন গ্রহে কি জীবের বসতি আছে?"

আমি বললুম, "থাকতেও পারে।"

—"আমরা তাহলে অন্য কোন গ্রহে এসে পড়েছি।"

—"কেন তুমি এ অনুমান করছ?"

—পৃথিবীতে এ রকম জীবের কথা কেউ কখন শুনেছে?"

কমল বললে, "উঃ! ভাবতেও আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।"

আমি বললুম, "আমরা যে পৃথিবীতে এসেছি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এ রকম সাগর দানবের কথা আমরা আর কখনও শুনিনি বটে, কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবীর কোথায় কি আছে, মানুষ তার সব রহস্য তো জানে না। তবে যে-জীবটাকে আমরা এখনি দেখলুম, এটি নিশ্চয়ই 'প্রাগৈতিহাসিক' জীব। প্রাগৈতিহাসিক কি জান তো? যে-যুগের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই-যুগকে ইংরাজিতে Prehistoric যুগ বলে। এই Pre-historic কথাটিকে বাংলায় বলে 'প্রাগৈতিহাসিক'।"

বিমল বললে, হ্যাঁ, সে যুগের কথা আমি কেতাবে পড়েছি। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, যখন মানুষেরও জন্ম হয়নি, তখন জলে, স্থলে, আকাশের নানান অদ্ভুত আকারের জীবজন্তু বিচরণ করত। তখনকার অনেক জলচর আর স্থলচর জীবের আকার ছিল ছোটখাট পাহাড়েরই মত বড়। তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঙ্কাল এখনও মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। কিন্তু বিনয়বাবু, সেসব জীব তো মানুষ জন্মাবার আগেই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে?"

আমি বললুম, "এ কথা জোর করে বলা যায় না। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক স্থান আছে, মানুষ যেখানকার কথা কিছুই জানে না। সেসব জায়গায় কি আছে আর কি না আছে, কে তা বলতে পারে? মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় পড়া যায়, পৃথিবীর স্থানে স্থানে কেউ কেউ সেকেলে জানোয়ারদের মত অসম্ভব আকারের জানোয়ার স্বচক্ষে দর্শন করেছে। সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা এমন প্রমাণও তো নেই। এই যে আমরা আজ একটা অদ্ভুত জীব দেখলুম, এটাকে তো চোখের ভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। প্রাগৈতিহাসিক বা সেকেলে জীবদের অনেক কাহিনী আমি পড়েছি। সেকালে "ডিপ্লোডোকাস" বলে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। আজ যে সাগর-দানবকে আমরা দেখেছি তার সঙ্গে ঐ "ডিপ্লোডোকাসের" চেহারা আশ্চর্যরকম মিলে যায়। কিন্তু আজ অনেক রাত হয়েছে, এসব কথা এখন থাক। ভেবেচিন্তে এসম্বন্ধে আমার যা ধারণা পরে তা তোমাদের কাছে জানাব। এখন এস, ঘুমের চেষ্টা করে দেখা যাক গে।"

আবার বিপদ

পরদিন সকাল বেলায় আমরা ভয়ে ভয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলুম—বন্দী কচ্ছপগুলোকে ধরে আনবার জন্যে।

সৌভাগ্যের কথা, সাগর দানবের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কেবল যে স্থানে দাঁড়িয়ে সে লাঙ্গুল আস্ফালন করেছিল সেখানটায় দেখা গেল বালির ভিতরে মস্ত একটা গর্ত হয়েছে! সেই গর্তের ভিতরে অনায়াসেই

দশ বারজন লোককে কবর দেওয়া যায়। যার ল্যাজেই এত জোর, তার গায়ের জোর যে কত, আমরা তা কল্পনাও করতে পারলুম না।

বালির উপরে সাগর দানবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের দাগও আমাদের চোখে পড়ল।

হঠাৎ কমল বলে উঠল, "একি! মোটে তিনটে কচ্ছপ রয়েছে! অন্যগুলো গেল কোথায়?"

মোটে তিনটে কচ্ছপ! বেশ মনে আছে আমরা দশটা কচ্ছপ ধরে ছিলুম। তারা যে বাঁধন খুলে সমুদ্রে পালায় নি তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তাদের পিঠের শক্ত খোলগুলো ভাঙা-চোরা অবস্থায় সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে ছিল কোন জীব এসে যে তাদের মাংস খেয়ে গেছে, এটা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না।

আমি ভাবলুম নিশ্চয়ই এ সাগর দানবের কীর্তি।

কিন্তু বিমল চেঁচিয়ে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু দেখে যান।"

বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে নিচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। চেয়ে দেখলুম বালির উপরে বড় বড় পায়ের দাগ।

বিমল বললে, "দেখছেন, এগুলো সাগর দানবের পায়ের দাগ নয়!"

হ্যাঁ এ পায়ের দাগ একেবারে অন্য রকম। তবে এও নিশ্চয় আর একটা বিরাট দেহ দানবের পদচিহ্ন কারণ প্রত্যেকটি পায়ের দাগ লম্বায় অন্তত তিন ফুটের চেয়ে কম নয়। উঃ, না জানি এ জীবটার আকার কী প্রকাণ্ড। প্রতি চারটে করে পায়ের দাগের মাঝখানে আবার আর একটা করে লম্বা চওড়া অদ্ভুত দাগ রয়েছে! ভালো করে দেখে বুঝলুম এটা সেই অজানা দানবেরই বিপুল লাঙ্গুলের চিহ্ন!

বিমল সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে অগ্রসর হল। রামহরি, কুমার আর কমলকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে আমিও বিমলের পিছনে পিছনে চললুম।

যেতে যেতে বিমল বললে, "বিনয়বাবু যার পায়ের দাগ আমরা দেখছি সেইই নিশ্চয় কচ্ছপগুলোকে খেয়ে ফেলেছে।"

—"আমারও তাই বিশ্বাস।"

—"কিন্তু অত বড় বড় সাত-সাতটা কচ্ছপ একসঙ্গে খাওয়া তো যে সে জীবের কর্ম নয়!"

—"তা তো নয়ই। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ বিমল?"

—"জীবটা কোথায় থাকে তাই দেখতে। কোন দিক থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা সেটা জেনে রাখা ভাল।"

আমি আর কিছু না বলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলুম।

আমরা প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এলুম! পায়ের দাগের রেখা তখনও ঠিক সমানই চলেছে! খানিক তফাতেই একটা ছোটখাট বন রয়েছে, পায়ের দাগ গেছে সেই দিকেই।

আমি বললুম, "বিমল, জন্তুটা যে ঐ বনের ভেতরেই থাকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের আর অগ্রসর হবার দরকার নেই।"

বিমল কি একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল, তারপর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে রইল।

একটু দূরেই হাড়গোড় ভাঙা 'দ'য়ের মত একটা গাছ একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারই তলায় বসে বিচিত্র এক জানোয়ার তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই।

চোখের সামনে দেখলুম যেন ভীষণতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি! এ জীব যেন ভগবানের সৃষ্টির বাইরেকার! তার মুখখানা অনেকটা কুমীরের মত, সামনের পা দুটো ছোট, পিছনের পা দুটো বড়, আর তার মোটাসোটা ল্যাজটা দেখতে কাঙ্গারুর মত।

তার দেহ অন্তত ত্রিশ হাতের চেয়ে কম হবে না!

হঠাৎ সে ল্যাজ আর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর বিকট এক অপার্থিব চিৎকার করে ঠিক কাঙ্গারুর মতই মারলে এক লাফ! অতবড় দেহ নিয়ে কোন জীব যে অমন করে লাফ মারতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারতুম না।

বিমল সভয়ে বলে উঠল, "ও যে আমাদের দিকেই আসছে। পালান—পালান!"

আমরা দুজনে প্রাণপণে ছুটলুম—আর সেই কুমীর-কাঙ্গারুও ঠিক তেমনি করেই শূন্যে লাফ মারতে মারতে

আমাদের অনুসরণ করলে। মাঝে মাঝে তার ভীষণ চিৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যেতে লাগল।

বিমলের বীরত্ব

আমরা দুজনেই ছুটছি, আর ছুটছি!

আমাদের পিছনে লাফাতে লাফাতে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত সেই ভয়ানক জানোয়ারটা!

প্রতি লম্ফেই সে আমাদের বেশি কাছে এসে পড়ছে!

ছুটতে ছুটতে চেয়ে দেখলুম, তার সেই কুমীরের মত প্রকাণ্ড মুখখানা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে এবং তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, লাল টকটকে হলহলে একখানা জিভ ও দুইসার দাঁত! অত বড় দেহের পক্ষে তার চোখ দুটো খুব ছোট বটে, কিন্তু কি ক্রূর, কি নিষ্ঠুর সেই চোখের দৃষ্টি!

—হঠাৎ কিসে হোঁচট খেয়ে আমি ঘুরে পড়ে গেলুম। দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে তখনি আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম বটে, —কিন্তু ছুটতে গিয়ে আর ছুটতে পারলুম না।

বিমলও দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "ওকি বিনয়বাবু হল কি?"

যাতনায় মুখ বিকৃতি করে আমি বললুম, "আমি আর ছুটতে পারছি না বিমল! আমার ডান পা মুচড়ে একেবারে এলিয়ে পড়েছে।"

বিমল সভয়ে বললে, "তা হলে উপায়?"

আমি আবার পিছনে চেয়ে দেখলুম। সেই দানবটা তখন একেবারে আমাদের কাছে এসে পড়েছে, আর কয়েকটা লাফ মারলেই সে একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে।

আমি প্রাণের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বললুম, "বিমল, শিগগির পালাও।"

বিমল বললে, "আপনাকে এখানে ফেলে? এমন কাপুরুষ আমি নই।"

—"বিমল, বিমল, আমার জন্যে তুমি মরবে কেন? এখনও সময় আছে, এখনও পালাও।"

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, "মরতে হয়ত দুজনেই এক সঙ্গে মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে কিছুতেই আমি পালাতে পারব না" —এই বলেই সে বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

তার অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি বললুম, "কিন্তু বিমল, তোমার ঐ সামান্য বন্দুকের গুলিতে এতবড় ভীষণ জন্তুর কোন ক্ষতি হবে না, —এখনও পালাও, নইলে আমরা দুজনেই একসঙ্গে মরব।"

—"দেখা যাক" বলে সে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

সেই ভয়াবহ কুমীর-কাঙ্গারু তার পিছনের দুই পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে লাফের পর লাফ মারতে মারতে তখনও এগিয়ে আসছে! সেই অতি বিপুল দেহের উপরে একটা পাহাড় ভেঙে পড়লেও তার কোন আঘাত লাগে কিনা সন্দেহ, বিমলের এতটুকু বন্দুকের গুলিতে তার আর কি অনিষ্ট হবে?

এ যাত্রা আর বোধ হয় রক্ষা নেই—আমি তো মরবই, আমার জন্যে বিমলকেও প্রাণ দিতে হবে!

ভাবছি, এমন সময়ে বিমলের বন্দুক গর্জন ও অগ্নি উদ্গার করলে।

—সঙ্গে সঙ্গে দানবটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমল আবার বন্দুক ছুঁড়লে।

দানবটা আকাশের দিকে মুখ তুলে বজ্রনাদের মত দুইবার গর্জন করলে, তারপর লাফাতে লাফাতে আবার যে পথে এসেছিল সেইদিকেই বেগে পলায়ন করতে লাগল।

বিমল মহা উল্লাসে বলে উঠল, "বিনয়বাবু, আর আমাদের ভয় নেই।"

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, "বিমল, তোমার সাহসেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হল।"

বিমল বললে, "কিন্তু দুটো গুলি খেয়ে ঐ জানোয়ারটা যদি ভয় পেয়ে না পালাত তাহলে আমরা কেউই বাঁচতুম না। আপনি ঠিক কথাই বলছেন, বন্দুকের গুলিতে ওর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হবে না।"

আমি বললুম, "কিন্তু ওকে দেখে বুঝতে পারছ কি, ও একালের জীব নয়! প্রাগৈতিহাসিক কালের যে যুগকে পণ্ডিতরা সরীসৃপ-যুগ বলেন, ওর আকার সেই যুগের জীবের সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে। বিমল, আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, আমরা পৃথিবীর এমন কোন স্থানে এসে পড়েছি, যেখানে কোনও অজানা কারণে পৃথিবীর সেকালের জীবরা এখনও বর্তমান আছে। এ এক অভাবিত আবিষ্কার! এ সংবাদ জানতে পারলে সারা পৃথিবীতে মহা আন্দোলন জেগে উঠবে!"

বিমল বললে, "কিন্তু এই আবিষ্কারের বার্তা নিয়ে আমরা কি আবার সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারব?"

আমি বললুম, "আজ যে জীবটার বিরুদ্ধে তুমি একাই দাঁড়াতে ভরসা করলে, ও-জীবটা যদি হঠাৎ পৃথিবীর কোন শহরে গিয়ে হাজির হয় তবে ওর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শহরশুদ্ধ লোক নিশ্চয়ই সহর ছেড়ে পলায়ন করবে। তোমার মত বীর যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন আমরা এদেশ থেকে বিজয়ীর মত ফিরতে পারব না কেন বিমল?"

বিমল সলজ্জ কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু আপনি বার বার ঐ কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। দেখি আপনার পায়ের কোনখানটা মুচকে গেছে?"

গরুড় পাখি

সেদিন গুহায় ফিরে এসে দেখলুম, কুমার, কমল আর রামহরি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে আছে।

রামহরি ভিজে মাটির তাল দিয়ে কতকগুলি ছোটবড় পাত্র তৈরি করে সেগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়েছিল। উনুন তৈরি করতেও ভোলে নি। সমুদ্রের জল যখন আছে, তখন লবণেরও অভাব হয়নি। কাজেই অন্য কোন মশলা না থাকলেও এত বিপদের পরে কচ্ছপের সিদ্ধ মাংস আর ডিম আজ বোধ হয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না!...

সত্যিই মন্দ লাগল না। বেশি আর কি বলব, রামহরির রান্না আজ এত ভাল লাগল যে আমার মনে হল শহরে নিশ্চিন্ত ভাবে বসেও এর চেয়ে ভাল সুস্বাদু খাবার আর কখনও খাইনি।...

দিনতিনেক আমরা কেউ আর পাহাড় থেকে নিচে নামলুম না, বেশির ভাগ সময়েই গুহার ভিতর বসে বসে গল্পগুজবে আর পরামর্শেই কাটিয়ে দিলুম।

আজ বৈকালে আমরা ঠিক করলুম, পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরে উঠে দেখে আসব, যে দেশে আমরা এসে পড়েছি তার চারিদিকের দৃশ্য কিরকম দেখতে!

যথাসময়ে উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে শুরু করলুম। তখনও আমার পায়ের ব্যথা সারে নি, কাজেই বেশ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু সে কষ্ট মুখে প্রকাশ করলুম না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, উপত্যকার গর্ভ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের একটা উঁচু শিখরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সমস্ত দেশটা আমাদের পায়ের তলায় ঠিক যেন 'রিলিফ' ম্যাপের মত পড়ে রয়েছে!

সর্বপ্রথমই একটি সত্য আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠল। আমরা যেখানে এসে পড়েছি, সেটি একটি দ্বীপ। কারণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, —আমাদের সব দিকেই আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত অনন্ত সাগরের নীল জল খেলা করছে!

দ্বীপের প্রায় পূর্বদিকে সেই বিশাল ও নিবিড় বন—যেখানে এসে আমরা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলুম। আমরা বেশ বুঝলুম, দ্বীপের সমস্ত বিভীষিকা ঐ নিবিড় অরণ্যের ভিতরেই লুকান আছে, কিন্তু এখান থেকে তার সুন্দর শ্যামলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না।

অরণ্যের এক পাশে মস্ত একটা হ্রদ! তার তীরে তীরে নানাজাতীয় পাখি বিচরণ করছে। দূর থেকে সেগুলো কি পাখি, তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বিমল উৎসাহভরে বললে, "কালকেই আমি বন্দুক নিয়ে ওখানে গিয়ে দুএকটা পাখি শিকার করে আনব।"

কুমার হেঁট হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, "দেখ দেখ, এখানে আবার কি একটা বিটকেল জীব বসে আছে!"

পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি, আমাদের ঠিক নিচেই চারটে অদ্ভুত আকারের জীব পাথরের মূর্তির মত নিথর

হয়ে চুপ করে পাশাপাশি বসে আছে! তাদের গায়ের রং ধূসর, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল, রক্তবর্ণ। তাদের আকার প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা এবং তাদের দেহের দুপাশে দুখানা করে ডানা ও তলার দিকে একটা দড়ির মত ল্যাজ ঝুলছে! মুখ দেখলে তাদের পাখি বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু কারুর গায়েই পালকের চিহ্নমাত্র নেই। তাদের দেখতে এমন বীভৎস যে, আমার বুকের কাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তারাও আমাদের দেখতে পেলে। বিশ্রী এক চিৎকার করে তারা তখনি ডানা ছড়িয়ে উড়তে শুরু করলে। তাদের দুই ডানার বিস্তার অন্তত পনের হাতের কম হবে না—আমার মনে হতে লাগল, যেন এক একটা চতুষ্পদ প্রকাণ্ড জন্তু চার পায়ে ডানা বেঁধে শূন্যে উড়ছে! তাদের দীর্ঘ চঞ্চুর ভিতর থেকে ধারাল ও বড় বড় দাঁতের সারিও আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

রামহরি বলে উঠল, "এ কি গরুড় পাখি?"

রামহরির নাম দেবার শক্তি আছে বটে! এই কিম্ভুতকিমাকার উড়ন্ত জীবগুলোকে সত্যসত্যই অনেকটা গরুড়ের মতই দেখাচ্ছিল।

প্রথমটা তারা আমাদের মাথার উপর চক্র দিয়ে একবার ঘুরে গেল, —তারপর হঠাৎ তাদের একটা তীরের মত নিচের দিকে ঝাঁপ দিলে।

আমরা সাবধান হবার আগেই সে হুস করে বিমলের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাণ্ড ডানা ও দেহের ধাক্কায় বিমল পাহাড়ের একদিকে ঠিকরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

কাছেই কুমার ছিল, সে তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সেই জীবটার গায়ের উপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে। জন্তুটা কর্কশ চিৎকারে চারিদিক কাঁপিয়ে সেই মুহূর্তে ফিরে তাকে আক্রমণ করলে, —কুমার আবার তাকে মারবার জন্যে বন্দুক তুললে, সে কিন্তু তার আগেই কুমারের একখানা হাত কামড়ে ধরলে এবং চোখের পলক না ফেলতেই কুমারকে মাটি থেকে টেনে তুলে শূন্যের দিকে উঠল।

এত শীঘ্র ব্যাপারটা ঘটল যে, আমরা সাহায্য করবার জন্যে একখানা হাত পর্যন্ত তোলবার সময় পেলুম না।

কুমার আর্তনাদ করে উঠল, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

উড়ন্ত সরীসৃপ

ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই কুমারের দেহটা শূন্যে উঠে যেতে লাগল!

কুমার আবার আর্তস্বরে চিৎকার করলে, "বাঁচাও বাঁচাও!"

আমার বিস্ময়ের চমকটা ভেঙে গেল। তখনও কুমারের দেহ নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েনি—সামনের দিকে একলাফে এগিয়ে হাত বাড়াতেই আমি কুমারের পা দুটো মুঠোর ভিতরে পেলুম এবং প্রাণপণে তাই ধরে টানতে লাগলুম।

কিন্তু এই গরুড়পাখির গায়ে কি ভয়ানক জোর! সে কুমারের সঙ্গে আমাকেও প্রায় উপরে টেনে তোলবার উপক্রম করলে ভাগ্যে আমি বাম হাতে পাহাড়ের একটা গাছের ডাল চেপে ধরে আর ডান হাতে কুমারের পা ধরে দেহের সমস্ত শক্তি এক করে টানতে লাগলুম, নইলে আমাকেও কম মুস্কিলে পড়তে হত না।

এদিকে আবার বিপদের উপর নূতন বিপদ! আমি যখন কুমারকে আর নিজেকে নিয়ে এমনি বিব্রত হয়ে আছি, তখন আর একটা গরুড় পাখি হঠাৎ তীরের মত আমার উপরে ছোঁ মেরে পড়ল। সে তার প্রকাণ্ড ডানা দিয়ে আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ঝাপটা মারলে যে, কুমারের পা তো আমার হাত থেকে ফসকে গেল বটেই, তার উপরে আমি নিজেও দুই চোখে সর্ষেফুল দেখে তিন চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লুম।

সেই সঙ্গেই গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি খানিক তফাতেই একটা গরুড়পাখি দুই ডানা ছড়িয়ে পাহাড়ের উপরে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং তার পাশেই রয়েছে কুমারের দেহ। সে দেহ মড়ার মত স্থির।

বিমল আর রামহরি তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে ছুটে গেল। বিমল তাকে পরীক্ষা করে বললে, "না, কোন ভয় নেই। কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

মাথার উপরে তাকিয়ে দেখলুম, বাকি তিনটে গরুড়পাখি তখনও শূন্যে চক্র দিয়ে আমাদের কাছে কাছেই ঘুরছে ফিরছে।

কুমারের বন্দুকটা আমার সামনেই পড়েছিল আমি তখনি সেটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপলুম। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না! আর একটা পাখি ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ে পাহাড়ের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি পাখি দুটো ভয় পেয়ে বিশ্রী চিৎকার করতে করতে ক্রমেই উপরে উঠে যেতে লাগল!

খানিক পরেই কুমারের জ্ঞান হল। গরুড় পাখির কামড়ে তার বাম হাতখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এ ছাড়া তার আর বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয়নি।

বিমল মরা গরুড় পাখিটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, "কি আশ্চর্য জীব!"

আশ্চর্য জীবটা! অতি বড় দুঃস্বপ্নেও এমন কিম্ভুত কিমাকার চেহারা দেখা যায় না!

কুমার বললে, "এটা কি জীব বিনয়বাবু? এর ডানা আছে বটে, কিন্তু দেহের আর কোন জায়গাই পাখির মত নয়! এর চঞ্চুতে কত বড় বড় দাঁত দেখুন। দেহটা গিরগিটির মত, যার গায়ের কোথাও পালকের চিহ্নমাত্র নেই।"

বিমল বললে, "আকারেও এ জীবগুলো প্রায় মানুষের মতই বড় আর ডানা দুখানা প্রায় পনের হাত লম্বা। সিন্দবাদের গল্পে রকপাখির কথা পড়েছি, সেও মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারত। এটা রকপাখি নয় তো?"

আমি বললুম, "না। আসলে এটা পাখিই নয়। এদের উপরে দুখানা হাত আর নিচে দুখানা পা আছে। প্রত্যেক হাতে চারটি করে আঙুল। চতুর্থ আঙুলটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তাতেই জালের মত ডানাখানা ঝুলছে। পাখির ডানার গড়ন এরকম হয় না!"

কুমার বললে, "পাখি নয় তো এটা কি।"

আমি বললুম, "উড়ন্ত সরীসৃপ! এও একরকম সেকেলে জীব। পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন Pterodactyl । কিন্তু আমরা একে গরুড় পাখি বলেই ডাকব।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারের কম্প দিয়ে জ্বর এল। গরুড় পাখির দাঁতে নিশ্চয়ই কোন রকম বিষ আছে! তার হাতখানাও বিষম ফুলে উঠল। একে এই অজানা দেশ, তাই সঙ্গে কোন ঔষধ নেই, কাজেই কুমারের জন্যে প্রথমটা আমাদের মনে বড় ভাবনা হল।

যা হোক, প্রায় দিন-পনের ভুগে কুমার সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল, আমরাও আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ডাইনসরের পাল

গুহার বাইরে একখানা পাথরের উপরে আমি আর বিমল চুপ করে বসেছিলুম।

সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিমের মেঘে মেঘে থরে থরে আবির সাজিয়ে সূর্যদেব আজকের মত ছুটি নিয়েছেন এবং সেই রঙিন মেঘগুলির ছায়া সমুদ্রের নীলপটের উপরে দেখাচ্ছিল যেন ঠিক জল ছবির মত।

চারিদিকের স্তব্ধতার ভিতরে আমার মন আজ কেমন কেমন করতে লাগল। কোথায় আমাদের শ্যামলা বাংলা দেশ, আর কোথায় আমরা পড়ে আছি। এমন শান্ত সন্ধ্যার সময়ে বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কত শঙ্খের সাড়া জেগে উঠেছে, বধূরা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে, ছেলের দল ঠাকুরঘরে ভিড় করে আরতির কাঁসর বাজাবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে!

এমন সময়ে বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "বিনয়বাবু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি?"

আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি বিমল?"

—"কাছিমের ডিম আর মাংস দুই-ই ফুরিয়ে গেছে। এবার কি খেয়ে আমরা বাঁচব?"

—"আবার কাছিম ধরতে হবে।"

বিমল খানিকক্ষণ পূর্বদিকে তাকিয়ে রইল। সেখানকার নিবিড় অরণ্য তখনও অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। বিমল আঙুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে বললে, "তার চেয়ে ঐ দিকে চলুন।"

—"কেন?"

—"ওখানে কোন নতুন শিকার মেলে কিনা দেখা যাক। রোজ রোজ কাছিমের মাংস আর ভাল লাগে না। সেদিন পাহাড়ে উঠে দেখেছিলেন তো, ঐ বনের পাশে মস্ত একটা হ্রদ আছে? ঐ হ্রদের আশেপাশে নিশ্চয়ই নতুন কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

— "সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোন বিপদেরও সন্ধান মিলতে পারে!"

—"বিনয়বাবু, বিপদ এ দ্বীপের কোথায় নেই? কাছিম ধরতে গেলেও তো আবার সাগর-দানবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে! বিশেষ, এ দ্বীপের কোথায় কি আছে না আছে, সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। নইলে এখানে আমাদের বেঁচে থাকা সহজ হবে না!"

বিমলের কথা যুক্তিসঙ্গত বটে! কাজেই আমি সায় দিয়ে বললুম, "আচ্ছা বিমল, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।"

পরদিন সূর্য ওঠবার আগেই আমি, বিমল আর রামহরি গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কুমার তখনও ভাল করে সেরে ওঠেনি বলে তাকে কমলের তত্ত্বাবধানে গুহাতেই রেখে গেলুম। বাঘা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। কুমারের বন্দুকটা নিলুম আমি।

সমুদ্রের জলে স্নান করে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া সেই নিস্তব্ধ মাঠের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, সে হাওয়া আমার বড়ই মিষ্টি লাগল। খানিক পরেই সুদূরের সবুজ বনের মাথায় স্বর্গীয় মুকুটের মত সূর্যের মুখ জেগে উঠল।

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি কি আবার ঐ ময়নামতীর মায়াকাননে যেতে চাও?"

বিমল হেসে বললে, "যদি যাই, তাহলে কি হবে রামহরি?"

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "এবারে ওখানে গেলে তুমি আর প্রাণে বাঁচবে না।"

—"কেন রামহরি, তুমি থাকতে আমাকে প্রাণে মারে কে?"

—"আমি বেঁচে থাকলে তবে তো তোমাকে বাঁচাব? ও বনে ঢুকলে আমরা কেউ আর জ্যান্ত ফিরব না।"

—"ভয় নেই রামহরি আজ আমরা বনের ভেতরে আর ঢুকব না। বনের পাশে একটা হ্রদ আছে, আমরা সেইখানেই যাচ্ছি।"

এমনি নানান কথা কইতে খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখলুম হ্রদের জল সূর্যের কিরণে ইস্পাতের মত চকচক করে উঠছে!

আর কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলুম, সেই হ্রদের আকার কি বিপুল! তার এপার থেকে ওপারের বিস্তার অন্তত কয়েক মাইলের কম হবে না। তার জলের ভিতরে মাঝে মাঝে কতকগুলো ছোট বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই পাহাড়গুলোর উপরে সাদা সাদা পাখির মত কি যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে!

তারপর আমরা যখন একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে পড়লুম তখন দেখা গেল, সেগুলো হাঁস ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কিন্তু এ কি রকম হাঁস? এদের একটারও যে ডানা নেই।"

আমি বললুম, "বিমল, এ দ্বীপের কোন জীব দেখেই তুমি আর আশ্চর্য হয়ো না! কারণ তোমাকে আগেই বলেছি যে এ হচ্ছে সেকেলে জীবের রাজ্য।"

—"সেকেলে হাঁসের কি ডানা ছিল না?"

—"না। দরকার হয়নি বলে সেকেলে হাঁসের ডানা গজায়নি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে এই, দরকার না থাকলে কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। বিশেষ, প্রকৃতির পরীক্ষা-কার্য তখনও ভাল করে জমে উঠেনি, কোন জীবের কি আবশ্যক আর কি অনাবশ্যক প্রকৃতি তখনও তা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে নি, তাই সেকেলে জীবজন্তুদের দেহে অনেক বাহুল্য, আবার অনেক অভাব আর অপূর্ণতাও থেকে গিয়েছিল। এই, মানুষের কথা ধর না কেন। সেকেলে মানুষদের মস্তিষ্ক, চোখ, মুখ, নাক, দাঁত, ঘাড়, বুক, হাত, পা—কিছুই একেলে মানুষদের মত ছিল না,—সেকালে—"

হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে বাঘার গর্জনের সঙ্গে রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—"ও কি ও!"

ফিরে দেখি, খানিক তফাতে মহিষের চেয়েও উঁচু একটা জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে।

আমি বলে উঠলুম —"এন্টেলোডন্ট, এন্টেলোডন্ট!"

বিমল বললে, "এন্টেলোডন্ট! সে আবার কি?"

—"সেকেলে দানব-শূকর!"

বিমল তখনি বন্দুক ছুঁড়লে এবং পর মুহূর্তেই শূকরটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

আমরা সবাই তার দিকে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু শূকরটা মরেনি, আহত হয়েছিল মাত্র। কারণ আমরা তার কাছে যাবার আগেই সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সামনের জঙ্গলের দিকে ছুটল।

সব আগে বাঘা, তারপর বিমল, তারপর আমি আর রামহরি—এই ভাবে আমরা শূকরটার পিছনে ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শূকরটা বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, "বনের ভেতরে ঢুকোনা খোকাবাবু, বনের ভেতরে ঢুকোনা।"

কিন্তু বিমলের মাথায় তখন শিকারীর গোঁ চেপেছে— হুঁস্যিদিব্য জ্ঞান হারিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে সে প্রবেশ করলে। কাজেই তার পিছনে যাওয়া ছাড়া আমাদেরও আর উপায়ান্তর রইল না।

বন যখন ক্রমে অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল, তখন আমিও বলতে বাধ্য হলুম, "বিমল আর নয়, এইবারে আমাদের ফেরা উচিত।"

বিমল বললে, "এই যে, শূওরের রক্তের দাগ এখনও দেখা যাচ্ছে।"

এমনি করে ঘণ্টা-দুয়েক ছুটাছুটির পর রক্তের দাগও আর পাওয়া গেল না। বিমল হতাশ ভাবে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। আমরাও বিষম হাঁপিয়ে পড়েছিলুম, সেখানেই এক-একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "চল, এইবারে ফেরা যাক।"

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "কাজেই।"

খানিকদূর অগ্রসর হয়ে বুঝলুম, আমরা ভুল পথ ধরে চলেছি। সেদিকে থেকে ফিরে এসে আবার অন্য পথ ধরলুম, কিন্তু তবু বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেলুম না।

তখন বেলা দুপুর হবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে উপরে, নিচে, চার পাশে এমন বিষম জঙ্গল আর গাছপালা যে, দুপুরের সূর্যালোকও সে বনের ভিতরে ঢুকতে সাহস করেনি!

আমি দমে গিয়ে বললুম, "বিমল আমরা পথ হারিয়েছি।"

বিমল বললে, "পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। এইদিকে আসুন।"

বিমলের পিছনে পিছনে আবার চললুম। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই হঠাৎ চমকে বিমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি শুধোলুম, "কি হল বিমল, হঠাৎ দাঁড়ালে কেন?"

কোন জবাব না দিয়ে, বিমল শুধু হাত তুলে ইসারায় বললে, "চুপ।"

আমি পা টিপে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার পাদুটো যেন অসাড় হয়ে মাটির ভিতরে বসে গেল! তেমন অভাবিত দৃশ্য জীবনে আর কখনও আমি দেখিনি!

পথের পাশেই জঙ্গলের ভিতর থেকে খানিকটা খোলা জমি দেখা যাচ্ছে, সেই জমির ভিতরে দলে দলে ভীষণ দর্শন জীব বিচরণ করছে—তাদের অধিকাংশই মাথায় প্রায় ষাট-সত্তর ফুট—অর্থাৎ তালগাছের সমান উঁচু।

সেদিন যে কুমীর-কাঙ্গারু আমাদের তাড়া করেছিল, এ জানোয়ারগুলোকে দেখতে প্রায় তারই মত; তফাৎ খালি এই যে, এগুলো লম্বা চওড়ায় তার চেয়েও প্রায় দুগুণ বড়।

আমি তাড়াতাড়ি গুণে দেখলুম, দলের ভিতরে প্রায় নব্বইটা জানোয়ার রয়েছে। কোন কোনটা ল্যাজ ও পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, মস্তউঁচু গাছের আগডাল সামনের দুই পা বা হাত দিয়ে ভেঙে নিয়ে চর্বণ করছে। কোন কোনটা কাঙ্গারুর মত লাফিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে আসছে। আবার কোন কোনটা চুপ করে বসে আছে। কতকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট জীব পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে—নিশ্চয়ই সেগুলো বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও মাথায় তারা প্রায় হাতির মত উঁচু।

আমি চুপি চুপি বললুম, "বিমল, এগুলো ডাইনসর।"

বিমল বললে, "বন থেকে বেরুতে গেলে এদের সমুখ দিয়ে যেতে হয়, এখন উপায় কি?"

—"যতক্ষণ না এরা বিদায় হয়, ততক্ষণ আমাদের বনের ভেতরেই বসে থাকতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় তো দেখি না।"

বাঘা এতক্ষণ ভয়ে বোবা হয়ে পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে জীবগুলোকে দেখছিল—হঠাৎ বনের ভিতর

দিকে ফিরে গোঁ গোঁ করে উঠল। আমরাও পিছন ফিরে দেখলুম বনের অন্ধকারের ভিতর থেকে বড় বড় গাছ দুলিয়ে আর একটা প্রকাণ্ড কি জানোয়ার আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

রামহরি মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখে বললে, "খোকাবাবু, এবার আর আমাদের রক্ষা নেই।"

সত্য কথা বনের ভিতরে আর বাইরে —দুদিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে, পালাবার কোন পথই আর খোলা নেই। এবারে বন্দুকের সাহায্যেও আত্মরক্ষা করতে পারব না, কারণ বন্দুকের শব্দে সমস্ত জীবগুলোই ক্ষেপে গিয়ে একসঙ্গে আমাদের আক্রমণ করতে পারে।

হতাশ হয়ে মরণের অপেক্ষায় আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের মূর্তির মত।

অরণ্যের বিভীষিকা

বনের ভিতর থেকে যে শব্দটা আসছিল, হঠাৎ তা থেমে গেল। তারপর খানিকক্ষণ আর কোন সাড়া নেই।

আমরা তখনও তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে রইলুম প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে।

রামহরি হঠাৎ আমার গা টিপলে। তার দিকে ফিরতেই সে বনের উপর পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

মাথা তুলে যা দেখলুম, তাতে আমার দেহের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত-পনের তফাতেই বনের ফাঁকে একখানা ভয়ঙ্কর বিশ্রী এবং প্রকাণ্ড মুখ জেগে আছে।

আমরা তিনজনেই আস্তে আস্তে সেইখানে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম।

বিমল চুপিচুপি বললে, "আবার সেই কুমীর-কাঙ্গারু!"

রামহরি বললে, "কিন্তু ও আমাদের দিকে তো তাকিয়ে নেই।"

—হ্যাঁ, সে তাকিয়ে আছে বনের বাইরের দিকে।

বিমল বললে, "ডাইনসরের দিকে চেয়ে আছে —আমাদের দেখতে পায়নি।"

ডাইনসরগুলো তখনও নিশ্চিন্ত মনে মাঠের ভিতরে বিচরণ করছিল।

সেই ভীষণ মুখখানা আবার গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই দেখলুম, তার বিরাট দেহ গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

কী যে তার অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে না পেরে মনে মনে আমরা ভগবানকে ডাকতে লাগলুম।

কিন্তু একটু পরেই তার অভিপ্রায় বেশ বোঝা গেল। সে তেমনি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে বন থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতর গিয়ে পড়ল, তারপর ডাইনসরের দলের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগল।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, "বিমল, এখনই আমরা সেকেলে বিয়োগান্ত নাটকের একটা আধুনিক অভিনয় দেখতে পাব। এই কুমীর-কাঙ্গারু যাচ্ছে ঐ ডাইনসরদের আক্রমণ করতে!"

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, "ডাইনসরদের আক্রমণ করতে! কিন্তু কুমীর-কাঙ্গারু পারবে কেন? একে ডাইনসররা আকারে ওর চেয়ে দুগুণ বড়, তার ওপরে গুণতিতেও তারা নব্বইটার কম নয়!"

আমি বললুম, "বাঘের চেয়ে ঘোড়া বা জিরাফ তো ঢের বড় কিন্তু ঘোড়া বা জিরাফের দলে যদি বাঘ পড়ে, তাহলে তাদের কি অবস্থা হয় জান তো? কুমীর-কাঙ্গারু মাংসাশী আর হিংস্র, নিরামিষভক্ত ডাইনসরের চেয়ে আকারে ছোট হলেও তার গায়ের জোরও ঢের বেশি।"

রামহরি উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "দেখুন, দেখুন!"

চেয়ে দেখলুম কুমীর-কাঙ্গারুটা তখন ডাইনসরদের খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ডাইনসররাও তাকে দেখতে পেলে এবং পর-মুহূর্তেই আর্তনাদে সারা বন কাঁপিয়ে লাফাতে লাফাতে বেগে পিছতে লাগল। কুমীর-কাঙ্গারুও ভীষণ এক গর্জন করে তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করলে এবং দেখতে দেখতে একটা ডাইনসরকে ধরে ফেললে।

তারপর যে ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হল তা আর বর্ণনীয় নয়। মানুষের চোখ এমন দৃশ্য বোধ হয় আর কখনও দেখেনি। ডাইনসরটা যদিও আকারে অনেক বড়, তবু কুমীর-কাঙ্গারুটা মস্ত এক লাফ মেরে বিষম বিক্রমে তার গলার তলাটা কামড়ে ধরে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তাদের গর্জনে ও আর্তনাদে আমাদের কান

যেন কালা হয়ে গেল, লাঙ্গুল আস্ফালনে এবং লাফালাফির চোটে চারদিকে রাশি রাশি ধুলো উড়তে লাগল ও পৃথিবীর বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল,—এদিকে ওদিকে তিন-চারটে প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ সমাপ্ত হল। তখন দেখা গেল, ডাইনসরের বিপুল দেহ মাঠের উপরে স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং কুমীর-কাঙ্গারু পিছনের দুই পা ও ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে এবং তার মুখের দুই পাশ ও দেহ দিয়ে হু হু করে রক্তের স্রোত ছুটছে। খানিক বিশ্রামের পর মাটির উপরে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে সে আকাশপানে মুখ তুলে কয়েকবার গগনভেদী জয়নাদ করলে, তারপর মৃত ডাইনসরের দেহটা ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হল। সে এক বীভৎস দৃশ্য এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের ভীত চক্ষের সামনে সেই দৃশ্যের অভিনয় চলল!

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আমরা কিন্তু তখনও বাইরে পা বাড়াতে সাহস করলুম না।

বিমল উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "কি হবে বিনয়বাবু। খাবারের খোঁজে এসে এদিকে অনাহারে প্রাণ যে যায়!"

আমি মনের দুশ্চিন্তা গোপন করে বললুম, "কোনই উপায় নেই! আজকের রাত এই বনের ভেতরে আমাদের কাটাতে হবে। এখন বন থেকে বেরুলেই মৃত্যু!"

রামহরি বললে, "কিন্তু কালও হয় তো আমরা পথ খুঁজে পাব না।"

আমি বললুম, "আমরা এসেছি পূর্বদিকে। কাল সূর্য উঠলে পর আমরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হব। তা হলে আমরা যে পথে এসেছি সে পথ না পেলেও খুব সম্ভব হ্রদের ধারে গিয়ে পড়তে পারব!"

বনের ভিতরে রাত ঘনিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিভীষিকার সূত্রপাত হল! এতক্ষণ যে বিশাল অরণ্যে কেবল পত্রমর্মর ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না, এখন তার চারিদিকেই নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যেতে লাগল! নিবিড় অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না ; শোনা যাচ্ছে খালি শব্দ! গাছের উপরে শব্দ, জঙ্গলের ভিতরে শব্দ, আমাদের আশেপাশে শব্দ! কোন শব্দ গাছের উপরে উঠানামা করছে, কোন শব্দ চারিদিকে আনাগোনা করছে, কোন শব্দ যেন এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারলুম আমাদের খুব কাছ দিয়েই অনেকগুলো অতিকায় জীব আসা যাওয়া করছে, কারণ তাদের পায়ের চাপে পৃথিবীর মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে! সেইসব জীবের আকার যে কত ভয়ানক, তা ভগবানই জানেন! আমরা তিনজনে আতঙ্কে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রায় মরমর হয়ে চুপ করে সেইখানেই বসে রইলুম জড় পাষানের মত!

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই কে এক ধাক্কা মেরে আমাকে মাটির উপরে ফেলে দিলে এবং আমি উঠে বসবার আগেই একটা প্রকাণ্ড ভারি দেহ আমার বুকের উপর চেপে বসল! কে যে আমাকে এমন অতর্কিতে আক্রমণ করলে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার দেহের চাপে আমার দেহের হাড়গুলো যেন ভেঙে যাবার মত হল। সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখন আমার হাতেই ছিল, কোন রকমে বন্দুকের নলটা আক্রমণকারীর দেহে লাগিয়ে এক হাতেই আমি ঘোড়া টিপে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তনাদ করে সে জীবটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল এবং তার পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, সে বেগে পলায়ন করছে!

হঠাৎ রামহরিও আর্তনাদ করে উঠল।

বিমল বললে, "কি হল, কি হল রামহরি?"

রামহরি বললে, "কে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল!"

আমি উঠে বসে বললুম, "কি একটা জানোয়ার আমার বুকের উপরে চেপে বসেছিল, কিন্তু আমার বন্দুকের গুলি খেয়ে সে পালিয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু এখনই যে বিরাট আর্তনাদ শুনলুম সে তো জানোয়ারের চিৎকার নয় সে যে মানুষের চিৎকার!"

আমি বললুম, "আমারও তাই মনে হল। কিন্তু বন্দুকের বিদ্যুতের মত আলোতে আমি এক পলকের জন্যে যে জ্বলন্ত চোখ আর যে ধারাল দাঁতগুলো দেখতে পেয়েছি, তা তো মানুষের নয়! তার গায়ে যে জানোয়ারের মত বড় বড় লোম ছিল তাও আমি জানতে পেরেছি, কিন্তু আর কিছু জানবার সময় আমি পাইনি—সে জীবটা এসেছে আর পালিয়েছে দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই।"

সেই মুহূর্তেই অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে আবার এক তীব্র আর্তস্বর জেগে উঠল। ঠিক যেন কোন মানুষ মর্মভেদী যাতনায় চিৎকার—স্বরে ক্রন্দন করছে!

সেই আর্তনাদ! কিছুতেই আমরা তা ভুলতে পারলুম না, তার প্রতিধ্বনি যেন আরও ভীষণ হয়ে আমাদের বুকের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই সেকেলে জীবের রাজ্যে, অমন মানুষের মত স্বরে কেঁদে উঠল কে? আমি এখানে একলা থাকলে ভাবতুম, এ আমার কানের ভ্রম। কিন্তু আমাদের তিন জনেরই তো শোনবার ভুল হতে পারে না। অথচ এ বনে মানুষ থাকা সম্ভব নয়, কারণ এই দ্বীপের কোথাও আজ পর্যন্ত আমরা মানুষের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি।

অন্ধকারে অবাক হয়ে বসে বসে আমি ভাবতে লাগলুম—আর ওদিকে বনের মধ্যে তেমনি নানা রকম অদ্ভুত শব্দ ক্রমাগত শোনা যেতে লাগল। ভয়ে আমরা কেউ আর কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইতে সাহস করলুম না—কি জানি, আবার যদি কোন ভয়ানক জীব শুনতে পেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে!

বনের ভিতরে সেই সব অজানা শব্দ শুনে আমার মনে হতে লাগল যে, অন্ধকারে যেন আমাদের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে। ধুপ ধুপ, দুম দুম, খস খস, মর মর সোঁ সোঁ, সর সর। শব্দগুলো যেন চারিদিক থেকে ক্রমাগত বলছে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব! নিবিড় অন্ধকারে দেহ ঢেকে চারিদিকে কারা যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে, তাদের রক্তলোলুপ জ্বলন্ত দৃষ্টি আমরা যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। —মাঝে মাঝে কাদের আনাগোনার পায়ের শব্দ শুনি আর মনে হয় ঐ ওরা এসে পড়ল—ঐ ওরা এসে পড়ল।.....ওঃ, রাত যেন আর পোয়াতেই চায় না।

আমরা যেন চির-অন্ধকারের কারাগারের মধ্যে আজীবনের জন্যে বন্দী হয়ে আছি আর চারিদিক থেকে শুধু সেই একই শব্দ শোনা যাচ্ছে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব।

আর একটা মারাত্মক বিপদ থেকে কোন গতিকে বেঁচে গেলুম।.....হঠাৎ কার মাটি-কাঁপান পায়ের শব্দ শুনলুম, তারপরেই মনে হল, এক জায়গায় অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই জ্বলন্ত ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বাতাবি লেবুর মত বড় দুটো আগুনের ভাঁটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—মাটি থেকে অনেক—অনেক উঁচুতে। নিশ্চয় সে দুটো কোন অতিকায় জীবের চোখ। জীবটা যে কোন জাতের তা বোঝা গেল না বটে, তবে তার নিশ্বাসের হু-হু শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলুম। তারপরেই মড়মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের ভাঁটা দুটো ও জ্বলন্ত অন্ধকারটা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোমাঞ্চিত দেহে একেবারে মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে মড়ার মত স্তব্ধ হয়ে আমরা শুয়ে রইলুম। আর চারিদিক থেকে যেন সেই একই শাসানি শুনতে লাগলুম—হত্যা, হত্যা আমরা তোমাদের হত্যা করব!.....

দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে আমরা যখন পাগলের মত হয়ে উঠেছি, পূর্ব-আকাশে তখন ঊষার ভোরের প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের মধ্যে অন্ধকারের জীবদের আনাগোনার শব্দ আশ্চর্যরূপে থেমে গেল। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে বসলুম।

বিমল বললে, "কাল যে জীবটা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, এই দেখুন তার রক্তের দাগ। এতক্ষণে নিশ্চয় সে মরে গেছে। আসুন বিনয়বাবু, এইবারে দেখা যাক, সেটা কি জীব।"

আমি আপত্তি করে বললুম, "না না, ক্ষুধাতৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমরা মর-মর হয়ে পড়েছি, এখন কেবল বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনদিকেই যাওয়া উচিত নয়—কি জানি, আবার যদি কোন নূতন বিপদে পড়ি!"

বিমল আমার আপত্তি শুনলে না, সে মাটির উপর শুকনো রক্তের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে বললে, 'না বিনয়বাবু, মানুষের মত কাঁদে কোন জীব, সেটা দেখতেই হবে। সে তো আর বেঁচে নেই, তবে আর কিসের ভয়!'

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই বনের ভিতরে ভয়ানক এক গর্জন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে বিমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রামহরি বললে, "এ যে বাঘের ডাক!"

আবার সেই গর্জন—এবারে আরও কাছে! তার পরেই ভারি ভারি পায়ের শব্দ—যেন মস্তবড় একটা জীব দৌড়ে আসছে!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "সাবধান, বিমল সাবধান।"

হাতির মত প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার বনের ভিতর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল, তারপরেই চোখের নিমেষে পাশের জঙ্গলের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল! জীবটা হাতির মত বড় বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক ষাঁড়ের মত।

বিমল আর রামহরির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে আমি বললুম, "ও হচ্ছে সেকালের ষাঁড়।"

বিমল বিস্ফারিত চোখে বললে, "হাতির মত বড়!"

—"হ্যাঁ। হাজার দুই বছর আগেও রোমানরা ঐরকম ষাঁড় জার্মান দেশে দেখেছিল।"

রামহরি বললে, "কিন্তু ওই ষাঁড় কি বাঘের মত ডাকে?"

—"না, বাঘের ডাক শুনেই ষাঁড়টা পালিয়ে গেল। এ বনে সেকেলে বাঘ আছে। সেকেলে বাঘের গায়ে এখনকার বাঘের মত দাগ নেই, আকারেও তারা অনেক বড়, আর তাদের মুখের উপর-চোয়ালে ছোরার মত লম্বা দুটো দাঁত আছে। বিমল, এ বাঘের বিক্রম কিরকম বুঝেছ তো! এতবড় একটা ষাঁড় তার ভয়ে প্রাণপণে পালিয়ে গেল, আমাদের এখনি এ বন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।"

বিমল বললে, "আপনার কথাই ঠিক! কালকে আমাদের কে আক্রমণ করেছিল, তা আর দেখবার দরকার নেই, এ সর্বনেশে বন থেকে এখন প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে বাঁচি!"

পূর্বদিকে বনের মাথায় সূর্যকে দেখা গেল, প্রদীপ্ত কাঁচা সোনার অপূর্ব মুকুটের মত! কিন্তু এখানের বনের পাখি তাঁর আবাহন-গান গাইলে না। সূর্য শুধু নিরানন্দ নীরবতার মাঝে পৃথিবীর বুকে সোনার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমরা এসেছি পশ্চিম দিক থেকে, তাই সেই দিকেই যাত্রা শুরু করে দিলুম।

নূতন বিপদের সূচনা

ক্ষুধার জন্যে যত না হোক, তৃষ্ণার তাড়নায় চলতে চলতে আমাদের প্রাণ হয়ে উঠল ওষ্ঠাগত। জলের অভাব যে কি ভয়ানক অভাব, জীবনে আজ প্রথম তা কল্পনা করতে পারলুম। চলতে চলতে প্রতি পদেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায়, এই বুঝি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম। মাথার মধ্যে যেন আগুনের আংরা জ্বলছে, মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর মন চাইছে পথ চলা বন্ধ করে সেইখানেই শুয়ে জীবনের সব লীলা সাঙ্গ করতে।

সেই ভোর থেকে হাঁটছি আর হাঁটছি সূর্য এখন মাঝ আকাশে, তবু এই অভিশপ্ত অরণ্য যেন আর আমাদের মুক্তি দিতে চায় না। এ অরণ্য যেন অনন্ত—এ অরণ্য যেন এক রাত্রের মধ্যে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে।

রামহরি ঠিক মাতালের মত টলতে টলতে চলেছে, তার চোখ দুটো ঠিক পাগলের মত হয়ে উঠেছে, আমারও প্রায় সেই অবস্থা—কিন্তু ধন্য বটে বিমল ছেলেটি, সেও যে ভিতরে ভিতরে আমাদেরই মত কষ্ট পাচ্ছে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুখে চোখে বা ভাবভঙ্গিতে সে কষ্টের কোন লক্ষণই ফুটে ওঠে নি, ধীর প্রশান্তভাবে হাসিমুখে সে আমাদের আগে আগে অগ্রসর হচ্ছে।

শেষটা রামহরি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল।

বিমল বললে, "ওকি রামহরি বসলে কেন?"

রামহরি কাতর ভাবে বললে, "খোকাবাবু, জল না খেলে আমি আর চলতে পারব না।"

—"আর একটু পরেই জল পাব, ওঠ রামহরি, ওঠ!"

—"না খোকাবাবু, না—এ রাজ্যের সব জল শুকিয়ে গেছে, জল আর পাব না। জল না পাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। তোমরা চলে যাও, আমার জন্যে ভেব না।"

বিমল আর কিছু বললে না, হেঁট হয়ে রামহরিকে ঠিক শিশুর মত নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে অনায়াসেই আবার হাঁটতে শুরু করলে। আমি তো দেখে শুনে অবাক। বলবান বলে আমার নিজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ দুদিনের অনাহার, পথশ্রম ও তৃষ্ণার তাড়না সহ্য করবার পর রামহরির মত একজন বৃহৎ লোককে ঘাড়ে করে পথ চলার শক্তি যে কতখানি বল ও বিক্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাজ, তা বুঝতে পেরে মনে মনে বিমলকে আমি বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম।

তারপর যখন নিরাশার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং প্রাণের আশা ছেড়ে আমিও রামহরির মত শুয়ে পড়ব বলে মনে করছি তখন আচম্বিতে বনের ফাঁকে জেগে উঠল, ও কি কল্পনাতীত দৃশ্য!

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, বিশাল হ্রদের নীল জল অদূরেই টলটল ঢলঢল করছে—সূর্যকিরণে বিদ্যুতের মত চমকে চমকে উঠছে।

কিন্তু এ চোখের ভ্রম নয় তো? সত্যিই কি বন শেষ হয়েছে, আমরা আবার হ্রদের তীরে এসে পড়েছি?

বিমলের হাত ছাড়িয়ে রামহরি মাটির উপর লাফিয়ে পড়ল, তারপর পাগলের মত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হ্রদের দিকে দৌড় দিলে, আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলুম —তারই মত আনন্দে উদভ্রান্ত হয়ে।...আমরা তিনজন মিলে যতক্ষণ পারলুম প্রাণ ভরে জল পান করলুম। আহা, সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কেমন করে তা বর্ণনা করব? শেষটা পেটে যখন আর ধরল না, তখন আমরা বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হলুম।

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, "আঃ, আর আমার কোন কষ্ট নেই, এখন আবার আমি একশ ক্রোশ হাঁটতে পারি।"

আমারও সমস্ত শক্তি আবার ফিরে পেলুম।

বিমল ইতিমধ্যে গোটাকয়েক সেকেলে ডানাহীন হাঁস শিকার করে ফেললে, আমরা সাঁতার দিয়ে তাদের দেহগুলো জল থেকে ডাঙায় এনে তুললুম।

রামহরি মুখ চোকলাতে চোকলাতে বললে, "খোকাবাবু, আমার আর দেরি সইবে না, চল, চল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে রান্না শুরু করে দি।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ বিমল, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, কুমার আর কমল এতক্ষণে আমাদের জন্যে ভেবে হয়ত আকুল হয়ে উঠেছে।"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, চলুন এইবার! আমরা তো বাসায় প্রায় এসে পড়েছি—ঐ যে আমাদের পাহাড় দেখা যাচ্ছে!"

সবাই আবার অগ্রসর হলুম। একবার জলপানের পরে আমাদের দেহে আবার নূতন শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, তাই এবারে পথ চলতে কোনই কষ্ট হল না। কিন্তু এ দ্বীপে বিপদ দেখছি পদে পদে! আমরা যখন পাহাড়ের খুব কাছেই এসে পড়েছি মাথার উপরে তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম এক বিশ্রী চিৎকার! উপরে চেয়ে দেখি দুটো হাড়-কুৎসিত গরুড়পাখি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দিকে নেমে আসছে!

তাদের উদ্দেশ্য যে ভাল নয়, তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। বিমলের বন্দুক তখনই গর্জন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখি গুলি খেয়ে মাটির উপর এসে পড়ল। পাখিটা সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই করাতের মত দাঁত-ওয়ালা চঞ্চু তুলে সে আমাদের আক্রমণ করতে এল। বিমল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রবল এক আঘাতে তার মাথাটা চূর্ণ করে দিলে! ততক্ষণে আমার বন্দুকের গুলিতে দ্বিতীয় পাখিটারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সৃষ্টিছাড়া জীব দুটোকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। বৈজ্ঞানিকরা যে কি দেখে এদের পাখি বলে স্থির করেছেন তা শুধু তাঁরাই জানেন, কারণ পাখিদের সঙ্গে এই বীভৎস জীবগুলোর কিছুই মেলে না. তাদের দেহ পালকহীন ও সরীসৃপের মত, দাঁতওয়ালা চঞ্চু আর পা হচ্ছে চারখানা ও লেজ হচ্ছে দড়ির মত। কিম্ভূতকিমাকার!

এমন সময় বাঘার চিৎকার শুনলুম—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ। মুখ তুলে দেখলুম, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সে আমাদের দিকেই বেগে ছুটে আসছে।

সত্যিই তো! বাঘা ছুটে আসছে বটে, কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে, পিছনের একখানা পা তুলে! তার চিৎকারেও আজ যেন কেমন কাতরতা মাখানো!

বাঘা ছুটে এসে একেবারে আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু দেখুন! বাঘার গায়ে রক্ত।"

হ্যাঁ, বাঘার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত!

বিমল পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "শিগগির আসুন, কুমার আর কমল বোধ হয় কোন বিপদে পড়েছে।"

আমি আর রামহরিও পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম।

পাহাড়ের উপরে উঠেও কোন গোলমাল শুনতে পেলুম না। কিন্তু গুহার সামনে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের পাথর রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।

বিমল ঝড়ের মত গুহার ভিতরে ঢুকে, আবার বেরিয়ে এসে বললে, "গুহার ভিতরে তো কেউ নেই। কুমার, কুমার।"

কেউ সাড়া দিলে না।

আমিও চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কুমার। কমল।"

কোন সাড়া পেলুম না!

বিমল করুণস্বরে বললে, "এত রক্ত কিসের বিনয়বাবু, এত রক্ত কিসের? তবে কি তারা আর বেঁচে নেই?"

আমি বললুম, "হয়ত তারা সমুদ্রের ধারে গিয়েছে! এস পাহাড় থেকে নেমে খুঁজে দেখি গে।"

সকলে আবার পাহাড় থেকে নেমে গেলুম। কিন্তু নিচে গিয়ে দেখলুম, সমুদ্রের ধারে জনমানব নেই?

বিমল মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল, রামহরি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, বাঘাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদতে লাগল, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

হঠাৎ বালির উপর আমার চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি বিমলকে ডেকে আমি বললুম, "দেখ এ আবার কি ব্যাপার?"

—"কি বিনয়বাবু, কি?"

—"পায়ের দাগ।"

—"পায়ের দাগ। কার পায়ের দাগ?"

—"মানুষের।"

—"তাই তো, একটা দুটো নয়, এ যে অনেকগুলো। এ আবার কি রহস্য বিনয়বাবু?"

—"বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানে একদল মানুষ এসেছিল।"

—"কিন্তু আমরা ছাড়া এ দ্বীপে তো আর মানুষ নেই।"

"নিশ্চয় আছে, নইলে মানুষের পায়ের দাগ এখানে এল কেমন করে? বিমল কাল রাত্রে আমরা ভুল শুনিনি, বনের ভিতরে কাল নিশ্চয়ই মানুষ আর্তনাদ করেছিল।"

বিমল নিষ্পলক নেত্রে বালির উপরে আঁকা সেই পদচিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের মায়া

এ দ্বীপেও তাহলে মানুষ আছে!

কাল রাত্রেই, সেই ভয়ানক বনের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে বসে এই সন্দেহটা প্রথমে আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল। তারপর আজকে বালির উপরে এই পায়ের দাগ! এ দাগগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!

এতদিন যে দ্বীপকে জনহীন বলে মনে করতুম আজ সেখানে মানুষ আছে জেনে প্রথমটা আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল! কিন্তু তার পরেই মনে হল এখানে মানুষ থাকলেও তারা কি আমাদের বন্ধু হবে? তারা কি আমাদেরই মত সভ্য? এই যে কমল আর কুমারের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এ ব্যাপারের সঙ্গে কি তাদের কোনই সম্বন্ধ নেই?

কুমার আর কমল কোথায় গেল? বাঘার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, গুহার সামনেটা রক্তে ভেসে গেছে, এখানে অজানা মানুষের পায়ের দাগ, এসব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার মানুষরা হয় তাদের বন্দী, নয় হত্যা করেছে!

রামহরি আকুল কণ্ঠে বললে, "বাবু বাবু! নিশ্চয় কোন রাক্ষুসে জানোয়ার এসে কুমার আর কমল বাবুকে খেয়ে ফেলেছে!"

বিমল এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে আর কোন কথাই কইতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির উপরে হেঁটে হয়ে বসে রইল।

আমি তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললুম, "বিমল, ওঠ, ওঠ!"

বিমল মুখ তুলে হতাশ ভাবে বললে, "উঠে কি করব বিনয়বাবু?"

আমি বললুম, "কুমার আর কমলকে খুঁজতে যেতে হবে যে!"

অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিমল বললে, "আর কি তারা বেঁচে আছে!"

আমি বললুম, "আমার বিশ্বাস তারা মরে নি, এই বালির ওপরে যাদের পায়ের দাগ রয়েছে, তারাই তাদের ধরে নিয়ে গেছে।"

শুনেই বিমলের হতাশ ভাব চলে গেল। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, "এ কথা তো এতক্ষণ আমার মনে হয়নি! চলুন তবে! তারা যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তাদের উদ্ধার করতেই হবে!"

আমি বললুম, "দাঁড়াও বিমল এতটা ব্যস্ত হলে চলবে কেন? আগে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে নি?"

বিমল বললে, "বন্ধুরা শত্রুর হাতে এখন আমরা পেটের ভাবনা ভাবব!"

আমি বললুম, "না ভাবলে তো উপায় নেই ভাই! কাল থেকে অনাহারে আছি, আজ কিছু না খেলে শরীর আমাদের ভার বইতে রাজি হবে কেন? কুমার আর কমলের খোঁজে পথে পথে এখন কদিন কাটবে কে বলতে পারে?"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমল আমাদের সঙ্গে আবার গুহার ভিতরে ফিরে এল। রামহরি সেকেলে ডানাহীন হাঁসগুলোর পালক ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিলে.....

যেমন তেমন করে খানিকটা সিদ্ধ মাংস খেয়ে এবং পথে খাবার জন্যে আর খানিকটা মাংস সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে যখন আবার বেরিয়ে পড়লুম —সূর্য তখন পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে।

আমার ইচ্ছা ছিল আজ বিশ্রাম করে কাল ভোরবেলায় কুমার আর কমলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু এটুকু দেরিও বিমলের সইল না। অথচ সে একবারও ভেবে দেখলে না যে, ঘণ্টা-কয় পরে রাত হতেই আমাদের পথের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে—কারণ বেলা থাকতে থাকতে এই অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কুমার আর কমলের কোন খোঁজই পাব না!

সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালির উপরে সেই পদচিহ্নগুলো দেখে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। বাঘা কিছুতেই একলা গুহার ভিতরে থাকতে রাজি হল না, কাজেই তাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছে। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের আগে আগে চলল।

পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে বালির উপরে অসংখ্য পায়ের দাগ বরাবর চলে গেছে। দাগগুলো এত স্পষ্ট যে অনুসরণ করতে আমাদের কোনই কষ্ট হল না। দ্বীপের যে দিকে যাচ্ছি এদিকে আমরা আগে আর কখনও আসিনি, এদিকটায় যতদূর চোখ চলে দেখতে পাচ্ছি খালি পাহাড়ের পর পাহাড়! অধিকাংশ পাহাড়ই ছোট ছোট—নব্বই কি একশ ফুটের বেশি উঁচু নয়। সেই সব পাহাড়ের মাঝেমাঝে ছোটবড় বনজঙ্গল। চলতে চলতে আমার মনে হতে লাগল দ্বীপের এই অজানা অংশে হয়ত সেকালের আরো কত রকমের ভীষণ জীব বাস করে! আজ রাত্রেই হয়ত তাদের অনেকের সঙ্গে দেখাশুনো হয়ে যাবে, কালকের মত আজ রাত্রেও হয়ত প্রতিমুহূর্তেই চোখের সামনে মৃত্যু এসে মূর্তি ধরে দাঁড়াবে! এ সব কথা ভাবতেও মন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল—এমন নিত্য নব বিপদের সঙ্গে যুঝে যুঝে বেঁচে থাকাও আমার কাছে যেন মিথ্যা বলে মনে হল—না আছে আনন্দ, না আছে শান্তি, না আছে দুদণ্ড বিশ্রাম—একে কি আর জীবন বলে? এই তো আমাদের দুজনকে আর দেখতে পাচ্ছি না, আর দেখতে পাব কিনা তাও জানি না, এমনি বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একে একে আমাদেরও লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে—দেশের কেউ আমাদের কথা জানতেও পারবে না, মরবার সময়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাব না!

ভাবতে ভাবতে পথ চলছি। বিমল আর রামহরির মুখেও কোন কথা নেই, তারাও বোধ হয় আমারই মত ভাবনা ভাবছে! ঘণ্টা-দুই পরে সূর্য পশ্চিম আকাশের মেঘের দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল, সমুদ্রের নীলজলের উপরে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরও খানিকক্ষণ চলবার পরে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়ালুম তার দুদিকে দুটো পাহাড় আর মাঝখানে অরণ্য। পায়ের দাগ বেঁকে সেই বনের ভিতরে চলে গেছে।

আমি বললুম, "বিমল সামনেই রাত্রি এখন এ বনের ভিতরে যাওয়া কি উচিত?"

বিমল বললে, "না গেলেও তো চলবে না।"

আমি বললুম, "কিন্তু গিয়েও তো কোন লাভ নেই। অন্ধকারে পায়ের দাগ দেখা যাবে না, আমরা যদি নিজেরাই কালকের মত আবার পথ হারিয়ে ফেলি, তা হলে কুমার আর কমলকে উদ্ধার করবে কে?

বিমল বললে, "তাহলে উপায়?"

—"আমার মতে আজকের রাতটা এই পাহাড়ের উপরে উঠে কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। তারপর কাল ভোরে বনের ভিতরে ঢুকলেই চলবে।"

রামহরিও আমার মতে সায় দিলে।

বিমল একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা।"

ঠিক সেই সময়ে বাঘা হঠাৎ গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠল। আমি সচমকে চারিদিকে তাকালুম কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। বাঘার মাথায় একটা চাপড় মেরে আমি বললুম, "চুপ কর বাঘা, চুপ কর।"

সে কিন্তু চুপ করলে না, আরও কয় পা এগিয়ে গিয়ে তেমনি গজরাতে লাগল।

রামহরি বললে, "বাঘা নিশ্চয় কিছু দেখেছে, ওতো মিথ্যে চ্যাঁচায় না।"

কিন্তু কি দেখেছে বাঘা? এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ জঙ্গলের এক জায়গায় আমার নজর পড়ল—কারণ সেখানকার গাছপালা অল্প অল্প কাঁপছিল।

দু পা এগিয়েই আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সভয়ে দেখলুম গাছের পাতার ফাঁকে অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ভীষণ চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে ক্রূর চোখের দৃষ্টি কী নিষ্ঠুর—কী তীব্র—তার মধ্যে লেশমাত্র দয়ামায়ার ভাব নেই! কে ওখানে গাছের আড়ালে বসে অমন লোলুপ নেত্রে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে—সে কি জানোয়ার, মানুষ, না পিশাচ?

সে চোখ দুটোর মধ্যে কি সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল জানি না, কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম। শুনেছি সাপেরা কেবল চোখের চাউনি দিয়ে গাছের ডাল থেকে পাখিদের মাটির উপরে টেনে এনে ফেলে—আমারও সেই অবস্থা হল নাকি?

সেই ভয়ানক চোখের আকর্ষণে আচ্ছন্নের মত এগিয়ে যাচ্ছি,—হঠাৎ পিছনে থেকে বিমল ডাকলে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!"

রামহরির মহাদেব বন্দনা

বিমলের চিৎকারে আমার সাড় হল আমার চমক ভেঙে গেল, শিউরে উঠে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। বুঝতে পারলুম সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

বিমল তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "অমন করে বনের ভেতরে ঢুকেছিলেন কেন?"

—"বনের ভেতরে, গাছের ফাঁকে দুটো ভয়ানক চোখ দেখছি। তোমরা কি কিছুই দেখতে পাওনি?"

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, "চোখ। কৈ, কোথায়?"

—"ঐ যে ঐখানে!" আঙুল তুলে বিমলকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সেই নিষ্ঠুর চোখদুটো আর সেখানে নেই। কিন্তু বাঘা তখনও জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিল।

—"আচ্ছা, আমি জঙ্গলের ভেতরটা একবার দেখে আসি!" বলেই বিমল অগ্রসর হল, কিন্তু রামহরি তাড়াতাড়ি বিমলের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, "না না, সে কিছুতেই হবে না! জঙ্গলের ভেতরে নিশ্চয়ই ভূত আছে!"

বিমল বললে, "ভূত কি তোমার ঘাড় থেকে কখনও নামবে না, রামহরি। পথ ছাড়, আমাকে দেখতে দাও।"

আমি বললুম, "বিমল, এই ভরসন্ধেবেলায় তুমি আর গোঁয়ার্তুমি কোরো না। জঙ্গলের ভেতরে কি আছে, আজ আর তা দেখবার দরকার নেই। এস, এইবেলা আলো থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপরে উঠে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি!"

অগত্যা বিমলকে আমার প্রস্তাবে রাজি হতে হল! আমরা সকলে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলুম। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, তার মাথায় উঠতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। উপরে গিয়ে একটা জায়গায় শ্রান্ত দেহে আমরা বসে পড়লুম। পৃথিবীর বুকের উপরে সন্ধ্যা তখন তার আঁধারঅঞ্চল ধীরে ধীরে বিছিয়ে দিতে শুরু করেছে—অদূরে সমুদ্রের নীল রং ছায়ার মায়ায় ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। আকাশ এখানে ঠিক আমাদের দেশের মতই সুন্দর—এই দ্বীপের কোন বিভীষিকার আভাস তার নীলিমাকে ম্লান করে দেয়নি। তবে বাংলাদেশে সন্ধ্যার

সাড়া পেয়ে বকের দল তেমন নীলসায়রে শ্বেত পদ্মের মালার মত দুলতে দুলতে ভেসে যায়, সে ছবি এখানে কেউ দেখতে পায় না।

পাহাড়ের পাশের বনের দিকে তাকিয়ে একটি নূতনত্ব চোখে পড়ল। এই বনের যেমন বড় বড় গাছ আছে, দ্বীপের আর কোথাও তা নেই। অনেক গাছ আমাদের পাহাড়েরও মাথা ছাড়িয়ে চারিদিকে ডাল-পাতা বিস্তার করে শূন্যের দিকে উঠে গেছে—গাছ যে এত উঁচু হতে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না। এ সব গাছের নাম বা জাতও আমার জানা নেই।.....

রাতটা নিরাপদেই কেটে গেল জলাভাব ছাড়া আর কোন কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হল না।

সকালবেলায় পূর্বাকাশের নীলমুখ সবে যখন রাঙা হয়ে উঠেছে আমরা তখন পাহাড় থেকে আবার নিচে নেমে এসে দাঁড়ালুম।

কাল যে জঙ্গলের ভিতরে সেই চোখ দুটো দেখেছিলুম, আগেই বাঘা তার কাছে ছুটে গেল! তারপর জঙ্গলের আশপাশ খুব সন্তপর্ণে গলা বাড়িয়ে দেখে এবং ভাল করে শুঁকে আবার সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাদের কাছে শান্ত ভাবে ফিরে এল—বাঘার হাবভাব দেখেই আমরা বুঝতে পারলুম যে, জঙ্গলের ভিতরে আজ আর কোন শত্রু লুকিয়ে নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমরা সেই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলুম। সে অরণ্য গভীর বটে কিন্তু খুব নিবিড় নয় তার উপরে দুধারের বড় বড় গাছের মাঝখান দিয়ে, সুন্দর একটি পায়ে-চলা পথের রেখা এঁকে বেঁকে বরাবর চলে গেছে। কারা এই বনের ভিতরে এমন পথের সৃষ্টি করেছে? নিয়মিত ভাবে আনাগোনা না করলে এমন পথ কখন তৈরি হতে পারে না, কিন্তু কারা এখান দিয়ে আনাগোনা করে? আমাদের মনের ভিতরে কেবলই এই প্রশ্ন উঠতে লাগল, কিন্তু এ বিচিত্র রহস্যের কোনই কিনারা করে উঠতে পারলুম না!

সেই পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলুম। চারিদিকে গাছপালা আর বনজঙ্গল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মাঝে মাঝে অল্প হাওয়ায় ভোরের আলোতে চিকণ গাছের পাতাগুলো অস্ফুট আর্তনাদের মত অস্পষ্ট আওয়াজ করে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাত্র, তা ছাড়া আর কোন দিকেই কোন জীবনের লক্ষণ নেই! এ নিস্তব্ধতা কেমন যেন অস্বাভাবিক। বনের আশেপাশে রোদের সোনালি আভা দেখে আমাদের মনে হতে লাগল, গভীর রাত্রির নীরবতার মাঝখানে সে যেন চোরের মত চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে। তার উপর আর এক অসোয়াস্তি। সেই অতিকায় সেকেলে জীবের অরণ্যের মধ্যে ঢুকে আমাদের মনে যে অমানুষিক বিভীষিকার ভাব জেগে উঠেছিল, এখানেও বুকের ভিতরে তেমনি একটা আতঙ্কের আভাস জাগতে লাগল। কে যেন লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কারা যেন আড়াল থেকে আমাদের সর্বাঙ্গে ক্ষুধিত চোখের চাউনি বুলিয়ে দিচ্ছে। সামনে, পিছনে ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে নিচে—সব দিকেই তাকিয়ে দেখি, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না, —অথচ ভয় যায় না, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, থেকে থেকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। এ যে আমাদের মনের মিথ্যে ভ্রম তাও তো বলতে পারি না কারণ অবোধ পশু বাঘা, সেও চলতে চলতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কান পেতে কি যেন শুনছে আর মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করে গজরে উঠছে! স্পষ্ট দিনের আলোতেও যে এমন একটা অজানা আতঙ্ক মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, আগে আমার সে বিশ্বাস মোটেই ছিল না।

এমনি ভয়ে ভয়ে প্রায় ক্রোশখানেক পথ পার হয়ে একটা খোলা মাঠের ধারে এসে পড়লুম! সামনে থেকে গাছপালার সবুজ পর্দা সরে গিয়ে দেখা দিলে এক অপূর্ব কল্পনাতীত দৃশ্য।

মাঠের একপাশে আবার এক বিশাল হ্রদ—প্রভাত-সূর্যের মায়াকিরণে তার অগাধ জলরাশি তরলিত মণিমাণিক্যের মত বিচিত্র হয়ে উঠেছে। হ্রদের মাঝখানে ঠিক যেন ছবিতে-আঁকা, তরুলতা দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটি ছায়া-মাখা দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের শ্যামলতা ভেদ করে মাথা তুলে জেগে আছে পিরামিডের মত একটি পাহাড়! সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই যে, পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অসংখ্য আগুনের লকলকে শিখা হু হু করে বাইরে বেরিয়ে আসছে—ঠিক যেন রাশি রাশি অগ্নিময় সর্প মহাক্রোধে কোন এক অদৃশ্য শত্রুকে থেকে থেকে ছোবল মেরে আবার গর্তের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। হ্রদের জলে সেই অগ্নিলীলার ছায়া পড়ে দৃশ্যটাকে করে তুলছে আরও চমকপ্রদ।

আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর কখনও চোখে দেখিনি—এ দৃশ্য যেমন আশ্চর্য, তেমনি সুন্দর, তেমনি গম্ভীর।

রামহরি হঠাৎ সেইখানে শুয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলে!

আমি বললুম, "ওকি রামহরি, প্রণাম করলে কাকে?"

রামহরি উঠে বসে বললে, "আজ্ঞে, দেবতাকে!"

—"দেবতা। কোথায় দেবতা?"

সম্ভ্রমের সঙ্গে পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে রামহরি বললে, "ঐ যে, দেবতা ঐখানে আছেন!"

আমি হেসে ফেলে বললুম, "ওটা তো আগ্নেয়গিরি। তোমার প্রণামটা যে বাজে খরচ হল রামহরি।"

কিন্তু রামহরি আমার কথায় বিশ্বাস করলে না। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললে, "ছি ছি, অমন কথা বলবেন না বাবু!" ইংরিজি কেতাব পড়ে আপনারা সব ক্রিশ্চান হয়ে গেছেন, দেবতা টেবতা মানেন না, সেই পাপেই তো এত বিপদে পড়ছেন। ওখানে, মহাদেব আছেন, ও আগুন যে তাঁরই চোখের আগুন—ঐ আগুনেই তো মদন ভস্ম হয়েছিল। "হে বাবা মহাদেব, তুমি আমার বাবুদের অপরাধ নিও না বাবা।" বলেই আবার সে মাটির উপরে ভক্তিভরে কপাল ঠুকতে লাগল।

বিমলের কিন্তু এ সব কিছুই ভাল লাগছিল না, সে অস্থির ভাবে বারকয়েক এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে আমার কাছে এসে বললে; "এখনও তো কুমার আর কমলের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না।"

আমি বললুম না, "না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই বনের ভেতরেই আছে।"

বিমল নিরাশ কণ্ঠে বললে, "আমার বিশ্বাস, তারা আর বেঁচে নেই। বিনয়বাবু, তাদের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে আমরাই দায়ী। গুহার ভেতরে নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের যদি ফেলে না রেখে যেতুম, তাহলে কখনওই এমন দুর্ঘটনা ঘটত না—"

আচম্বিতে বাঘা চেঁচিয়ে উঠল, আমি চোখের পলকে ফিরে দাঁড়ালুম। ও আবার কি দৃশ্য? প্রকাণ্ড এক গাছের তলায় সারি সারি ওরা কারা এসে দাঁড়িয়েছে? মানুষের মত তারা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মতই তাদের হাত-পা দেহ—কিন্তু তারা মানুষ নয়। যাদুঘরে আমি গরিলার মূর্তি দেখেছি, এদেরও দেখতে অনেকটা সেই রকম, কিন্তু এরা গরিলাও নয়! এদের রং কালো, পায়ে বড় বড় লোম, হাতগুলো এত লম্বা যে প্রায় হাঁটুর কাছে এসে পড়েছে। দেহের তুলনায় এদের মাথাগুলো ছোট ছোট, মুখশ্রী প্রায় মানুষের মত বটে, কিন্তু ভয়ানক কুৎসিত, নাক চ্যাপ্টা, আর মুখের আধখানা দাড়ি গোঁপে ঢাকা। এদের চেহারা মানুষ আর বনমানুষের মাঝামাঝি। পণ্ডিতেরা যে বানরমানুষের কথা লিখেছেন, তবে কি এরা তাই?

পাশের আর-একটা গাছের ডালপাতার ভিতর থেকে ঝুপঝুপ করে আরও অনেকগুলো বানরমানুষ পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হল—প্রত্যেকেরই হাতে এক একগাছা মোটা লাঠি। তারপর আর একটা গাছ থেকে আরও কতকগুলো জীব মাটির উপরে এসে দাঁড়াল—এমনি করে তারা ক্রমেই দলে ভারি হয়ে উঠতে লাগল।

আমি বললুম, "বিমল, এরাই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। কিন্তু এরা বোধ হয় আমাদের আক্রমণ করতে চায়।"

বিমল কোন জবাব না দিয়ে বন্দুকটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে বেশ করে বাগিয়ে ধরলে।

অতিকায় শ্লথ

এই বানরমানুষরা যে আমাদের আক্রমণ করতে চায় সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না। ক্রমে ক্রমে দলে ভারি হয়ে তারা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলে। তারা নানান রকম অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করে কি-সব বলতে লাগল, —সেগুলো অর্থহীন শব্দ, অথবা তাদের ভাষা, তাও বুঝতে পারলুম না।

আমি বললুম, "বিমল যদি বাঁচতে চাও, দৌড়ে ঐ হ্রদের ধারে চল। নইলে এরা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেললে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।"

বিমল বললে, "হুঁ।"

কিন্তু বানরমানুষরাও বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেললে। কারণ আমরা হ্রদের দিকে ফিরতে না ফিরতেই ভয়ানক চিৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে তারা আমাদের আক্রমণ করলে।

সঙ্গে সঙ্গে বিমলও কিছু মাত্র ইতস্তত না করে বন্দুক ছুঁড়লে, আমিও আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো জীব তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে হাত পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

বন্দুকের গর্জনে আর সঙ্গী দুজনের অবস্থা দেখে বাকি বানবমানুষগুলো হতভম্ব ও মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জীবনে তারা আগ্নেয় অস্ত্র কখনও তো চোখে দেখেনি, কোন মায়ামন্ত্রে আমরা যে তাদের দুই সঙ্গীর অমন দুরবস্থা করলুম এটা বুঝতে না পেরে ভয়ে ও বিস্ময়ে নিশ্চয় তারা অবাক হয়ে গেল।

সেই ফাঁকে আমরা হ্রদের দিকে ছুট দিলুম।..... প্রায় যখন জলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, তখন আবার আর এক বিপদ। .....হ্রদের উপরে কয়েকখানা ছিপের মত লম্বা নৌকো ভাসছে এবং প্রত্যেক নৌকোর মধ্যে মানুষের মত দেখতে অনেকগুলো করে লোক!

নৌকোগুলো তীরের বেগে—অর্থাৎ আমাদের—দিকে ছুটে আসছে। নিশ্চয় আরও একদল বানরমানুষ জলপথ আগলে আছে। ভেবেছিলুম সাঁতরে হ্রদের ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন তো দেখছি সে পথও বন্ধ।

পিছনে ফিরে দেখি মাঠের উপরের বানরমানুষদের দল আরও পুরু হয়ে উঠেছে। আহত সঙ্গী দুজনের চারপাশ ঘিরে তাদের অনেকে উত্তেজিত ভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে, —অনেকে আবার আমাদের লক্ষ্য করে বিকট স্বরে চিৎকার ও লাঠি আস্ফালন করতেও ছাড়ছে না।

আমাদের তরফ থেকে বাঘাও লাঙ্গুল আস্ফালন করে তাদের চিৎকারের উত্তর দিতে লাগল।

রামহরি বললে, "বাবু, এখন আমরা কোন দিকে যাই?"

বিমল বললে, "আবার বনের ভেতর চল। সেখানে হয়ত লুকোবার একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে।"

তা ছাড়া আর উপায়ও নেই। বিশেষত বনের ভিতরে আত্মরক্ষারও সুবিধা বেশি। বন খুব কাছেই ছিল, আমরা আবার ছুটে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম—মাঠ ও নৌকা থেকে শত্রুরা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল।

একটা কোন গোপন স্থান খোঁজবার জন্যে আমরা বনের চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে আবার এক নূতন আতঙ্ক! লুকোবার ঠাঁই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বনের এক জায়গায় দেখি, দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু একটা অতিকায় ভীষণ জানোয়ার দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে এবং দুই হাত বাড়িয়ে মস্ত একটা গাছ অতি অনায়াসে মড় মড় করে ভেঙ্গে ফেলেছে। দেখতে তাকে অনেকটা ভাল্লুক ও বনমানুষের মাঝামাঝি!

বিস্ময়ে-স্তম্ভিত নেত্রে বিমল বললে, "ওকি সর্বনেশে জন্তু?"

আমি বললুম, "অতিকায় শ্লথ!"

—"ও যদি আমাদের দেখতে পায়, তাহলে যে আর রক্ষা থাকবে না!"

—"এর চেয়ে যে বানরমানুষদের সঙ্গে লড়াই করা ভাল! এস, এস, পালিয়ে এস!"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম!

রামহরি বললে, "যে দিকে যাই সেই দিকেই বিপদ এবারে সত্যি বুঝি প্রাণটা গেল।"

বিমল হেসে বললে, "কই রামহরি, তোমার মহাদেবকে আর ডাকছ না কেন? আর একবার ডেকে দেখ, যদি তিনি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন।"

রামহরি রেগে বললে, "মরতে বসেছ খোকাবাবু এখনও দেবতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা! হে বাবা মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার অপরাধ ক্ষমা কর" —বলেই হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালে।

বিমল বললে, "কিন্তু কি আশ্চর্য, বানরমানুষগুলো অবাক হয়ে কি দেখছে? ওরা যে এখনও আমাদের আর আক্রমণ করলে না? ওরা কি আমাদের বন্দুকের ভয়েই আর এগুচ্ছে না?"

আমি বললুম, "ওরা সবাই হ্রদের নৌকাগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে! বোধ হয় ওরা নৌকাগুলো ডাঙায় আসার জন্যে অপেক্ষা করছে! নৌকা ডাঙায় এলেই ওরা একসঙ্গে দুই দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করবে!"

বিমল বললে, "নৌকোর ওপরেও গুলি চালাব নাকি?"

—"না, নৌকোগুলো এখনও দূরে আছে, বন্দুক ছুঁড়লে হয়ত ফল হবে না। বন্দুক যদি ছুঁড়তে হয় তো মাঠের দিকেই ছুড়ো, আরও দু একজন মরলে বাকি বানরমানুষগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে!"

—"তাই ভাল।"

আমরা দুজনেই শত্রুদের লক্ষ্য করে বার কয়েক বন্দুক ছুড়লুম। যা ভেবেছি তাই! বন্দুকের মারাত্মক শক্তি দেখে অনেকগুলো বানরমানুষ লাফ মেরে আবার গাছের উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, অনেকে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল, মাঠের উপরে রইল খালি পাঁচ-ছয়টা আহত বা মৃত দেহ। কিন্তু শত্রুদের

ঘন ঘন চিৎকার শুনেই বুঝলুম, তারা আমাদের আশা একেবারে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়নি—আড়ালে আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে।

হ্রদের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, "এইবারে এদের ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"কিন্তু বিমল, নৌকোর ওপরে ওরা কারা রয়েছে ওদের তো বানরমানুষ বলে মনে হচ্ছে না!"

—হ্যাঁ, তাইত! ওরা তো বানরমানুষদের মত ল্যাংটো নয়—ওদের পরনে জামাকাপড়ের মত কি যেন রয়েছে না?"

—"হ্যাঁ ! বোধ হয় ওরা আমাদেরই মত মানুষ।"

—"সংখ্যায় তো দেখছি ওরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম নয়! তাহলে এখানে আমরা ছাড়া আরো মানুষ আছে! কিন্তু কি মতলবে ওরা আমাদের কাছে আসছে? ওরা শত্রু না মিত্র?"

"—কিছুই তো বুঝতে পারছি না! হয়ত ওরা অসভ্য মানুষ, হ্রদের ঐ দ্বীপে থাকে।"

নৌকোগুলো ডাঙার খুব কাছে এসে পড়ল। একখানা নৌকোর উপরে হঠাৎ দুজন লোক দাঁড়িয়ে উঠল এবং দুহাত তুলে চিৎকার করে ডাকল— "বিমল! রামহরি! বিনয়বাবু! বাঘা!"

শুনেই বাঘা তীরের মত হ্রদের দিকে ছুটে গেল! আনন্দে আমাদেরও বুক যেন নেচে উঠল—এ যে কুমার আর কমলের গলা!

আমরাও এক দৌড়ে হ্রদের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে একখানা নৌকা থেকে কুমার আর কমল ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল এবং বাকি নৌকোগুলো থেকেও উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ চিৎকার শুনলুম—"বিনয়বাবু বিনয়বাবু!"

আনন্দের প্রথম আবেগ সামলে দেখি, আমাদের চারপাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে যারা তারা কেউই অচেনা লোক নয়! তারা হচ্ছে আমাদেরই দেশের লোক, মঙ্গলগ্রহের বামনরা বিলাসপুর থেকে তাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই দ্বীপে এসেই তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হয়! পাঠকরাও নিশ্চয়ই তাদের কথা ভুলে যান নি?

মনের আনন্দে আমরা যখন কথাবার্তায় বিভোর হয়ে আছি, আচম্বিতে মাঠের দিক থেকে বিষম একটা গোলমাল শোনা গেল। ফিরে দেখি, বনের নানাদিক থেকে পিলপিল করে দলে দলে বানরমানুষ বেরিয়ে আসছে! দেখতে দেখতে হাজার হাজার বানরমানুষে মাঠের একদিক একেবারে ভরে গেল! হঠাৎ ভীষণ হল্লা করে তারা একসঙ্গে আবার আমাদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হল।

বিমল আবার বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

কুমার বললে, "মিছে গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই বিমল! এস, আমরা নৌকোয় গিয়ে চড়িগে! ওরা সাঁতার জানে না, জলকে বড় ভয় করে!"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমাদের কেউ মারা পড়ে, তাহলে আজকের এই মিলনের আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে।"

আমরা সকলে মিলে তাড়াতাড়ি নৌকোর উপরে গিয়ে উঠে বসলুম। বানরমানুষরা যখন হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল, আমাদের নৌকোগুলো তখন তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের লক্ষ্য করে তারা কতকগুলো বড় বড় পাথর বৃষ্টি করলে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না। উত্তরে আমরাও বন্দুক ছুড়লে বানরমানুষদের আরও কিছু শিক্ষা হত বটে, কিন্তু আমাদের আর বন্দুকের টোটা নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না!

নৌকোগুলো হ্রদের সেই দ্বীপের দিকে ভেসে চলল।

আমি বললুম, "কুমার, তোমরা কি করে এখানে এলে সে কথা তো কিছুই বললে না?"

কুমার বললে, "আচ্ছা শুনুন, খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি।....আপনারা যেদিন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন, সেইদিন রাত্রেই ঐ বনমানুষগুলো আমাদের আক্রমণ করে। ওরা যে কি করে আমাদের খোঁজ পেলে তা আমি জানি না। তাদের সেই হঠাৎ আক্রমণে আমরা একেবারে কাবু হয়ে পড়লুম। লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ফেটে গেল, বাঘাও রীতিমত জখম হল। তারপরে তারা আমাকে আর কমলকে নিয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে এল। আমাদের নিয়ে ওরা যে কি করত তাও বলতে পারি না। হাত-পা, বাঁধা অবস্থায় একটা পুরো দিন আমরা এক গাছতলায় পড়ে রইলুম। বনমানুষগুলো বড় বড় গাছের উপরে লতাপাতা ডাল দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর

বানিয়ে বাস করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে যখন তারা গাছের উপরে ঘুমে অচেতন, আমি তখন কোন রকমে পকেট থেকে আমার ছুরিখানা বার করলুম। তারপর ছুরিখানা দাঁতে চেপে ধরে আগেই কমলের বাঁধন কেটে দিলুম, তারপর কমল আমাকে মুক্ত করলে। শত্রুরা টের পাবার আগেই আমরা পালিয়ে এই হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হলুম, তারপর সাঁতার দিয়ে একেবারে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠলুম। ওখানে এই পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কিন্তু ওরা কি করে ওখানে এল?"

কুমার বললে, "সে অনেক কথা। দ্বীপে গিয়ে শুনবেন। আজ বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমাদের খোঁজে আপনারা এখানে এসেছেন!"

কে যেন আকাশের নীলিমাকে নিংড়ে হ্রদের জলে গুলে দিয়েছে, —কী স্বচ্ছ নীল তার রং! তার তলা পর্যন্ত আলো করে সূর্যদেবের কিরণ-প্রদীপ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে এবং কত রকমের মাছ যে সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে, তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

আগ্নেয়গিরির আগুন-জিভগুলো এখন আমাদের চোখের খুব কাছেই লকলক করে উঠছে গাছের পর গাছের সবুজ আঁচলঢাকা সেই ছায়া-নাচানো দ্বীপটিও একেবারে আমাদের কোলের সামনে এসে পড়েছে!....তার পরেই আমাদের নৌকোগুলো একে একে তীরে গিয়ে ভিড়ল।

দ্বীপে যে লোকগুলি আশ্রয় নিয়েছে তাদের সর্দার ছিল সোনাউল্লা। দ্বীপে নেমে আমাকে সেলাম ঠুকে সে বললে, "বাবুজী, আজ আগেই আপনাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো?"

—"হ্যাঁ" সোনাউল্লা, তাহলে বড় ভাল হয়—আমাদের ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু রেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও!"

—"কিন্তু বাবুজী, আমরা যে মুসলমান!"

"ভাই সোনাউল্লা, আমরা এখন ভগবানের নিজের রাজত্বে বাস করছি... হয়ত এইখানেই আমাদের চিরকাল বাস করতে হবে। এখানে কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়—এখানে শুধু এক জাত আছে, সে হচ্ছে মানুষ-জাত! দলাদলিতে মানুষ যেসব জাতের সৃষ্টি করছে এখানে আমরা তা মানব না। তুমি যাও সোনাউল্লা, আগে তোমার হাতের রান্না খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করি, তারপর তোমাদের কাহিনী শুনব।"

খাঁড়া-দেঁতো বাঘ

আহারাদির পর একটা গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে সোনাউল্লার কাহিনী শুনতে লাগলুম ঃ—

"বাবুজী, বামনদের উড়োজাহাজ যেদিন আবার পৃথিবীতে এসে নামল, আমাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাই আপনারা উড়োজাহাজ ছেড়ে যখন নেমে গেলেন, তখন আমরাও আর থাকতে না পেরে নিচে নেমে পড়লুম। এই ফাঁকে বামনরা যে পালাতে পারে, মনের আনন্দে কারুরই আর সে কথা মনে রইল না।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। মনের খুশিতে নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমরা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটল। আধাআলোয় আধাআঁধারে জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ প্রকাণ্ড কি একটা বেরিয়ে এল—আমদের মনে হল হল যেন একটা পাহাড় লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে।

প্রথমটা আমরা আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে পাগলের মত সকলে মিলে ছুটতে লাগলুম। সেই রাক্ষসটাও যে আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে, তার পৃথিবী কাঁপান পায়ের শব্দ শুনেই সেটা বেশ বুঝতে পারলুম। মাঝে মাঝে মানুষের কাতরানিও শোনা যেতে লাগল—নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ কেউ তার কবলে পড়েছে।

আরও বেশি ভয় পেয়ে আমরা আরও বেশি বেগে দৌড়াতে লাগলুম। কিন্তু পিছনের সেই বিষম পায়ের শব্দ আর কিছুতেই যেন থামতে চায় না! এমনি ছুটতে ছুটতে বনবাদাড় ভেঙে আমরা যখন এই হ্রদের ওদিককার তীরে এসে পড়লুম, তখন আমাদের দম প্রায় আঁটকে যাবার মত হয়েছে। আমরা সেইখানেই কেউ বসে আর কেউ শুয়ে পড়ে জিরুতে লাগলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ জিরুতে হল না, হঠাৎ বাজের মত এক ভীষণ চিৎকার শুনে ফিরে দেখি, সেই পাহাড়ের মত উঁচু রাক্ষসটা বনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসছে! আমরা সকলে তখন হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলুম।

আমাদের ভিতর তিন চার জন লোক সাঁতার জানত না, সে বেচারীরা একেবারে তলিয়ে গেল!

সেই সর্বনেশে জীবটা লাফাতে লাফাতে জলের ধার পর্যন্ত এল। তারপর এতগুলো শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে, মনের দুঃখে আকাশপানে মুখ তুলে ভয়ানক চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল!

অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে আমরা শেষে এই দ্বীপে এসে উঠলুম।

এখানে এসে প্রথম কদিন আমরা বনের ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন একরকম আশ্চর্য হাঁসের বাসার খোঁজ পেলুম—সে হাঁসদের ডানা নেই। তারপর থেকে ফলমূলের সঙ্গে সেই হাঁসের মাংস আর ডিম পেয়ে এখন আর আমাদের পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না।

কি বলছেন? আগুন কোথায় পেলুম? সেও বড় অবাক কারখানা, বাবুজী! ঐ যে পাহাড় দেখছেন, দিনরাত ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে। আমরা ঐখান থেকেই আগুন আনি!

আবার এই দেখুন, পাথর ঘষে ঘষে আমরা কেমন সব বর্ষার ফলা, তীর আর ছুরি-ছোরা-কুড়ুল তৈরি করেছি। অস্ত্রগুলোতে কেমন ধার হয়েছে, দেখছেন তো? এই সব ছুরি আর কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে কখানা ছিপও বানিয়ে ফেলেছি, এখন দরকার হলে জলের উপরেও আনাগোনা করতে পারি! খোদাতালার দয়ায় আমাদের আর অন্য কোন কষ্ট নেই বটে, কিন্তু আজ কদিন থেকে নতুন এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে!

রোজ রাত্রে কি একটা অদ্ভুত জন্তু আমাদের সন্ধান পেয়ে বেজায় উৎপাত শুরু করেছে! এরমধ্যেই সে আমাদের দল থেকে পাঁচজন লোককে ধরে নিয়ে গেছে,—আমরা কিছুতেই তার হাত থেকে ছাড়ান পাচ্ছি না। এক রাত্রে চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে আমি দেখেছি। দেখতে তাকে বাঘের মত বটে, কিন্তু সে বাঘ নয়। কারণ বাঘের চেয়েও সে ঢের বেশি বড়, আর তার মুখের দুদিকে হাতির মত দুটো দাঁত আছে।

কি বললেন বাবুজী? সেকেলে খাঁড়া-দেঁতো বাঘ! সে আবার কি রকম বাঘ?

"তা সে বাঘই হোক আর যাইই হোক, আমাদের আর এ দ্বীপে থাকা পোষাবে না। এই বেলা প্রাণ নিয়ে এখান থেকে না পালালে একে একে সবাইকেই মরতে হবে! এখান থেকে কোথায় যাই, বলতে পারেন?"

জাহাজ ! জাহাজ

সোনাউল্লার গল্প শেষ হলে বিমল বললে, "সোনাউল্লা, তোমাদের বাহাদুরি আছে বটে। এই সৃষ্টিছাড়া মুল্লুকে তোমরা এমন করে সংসার পেতে নিয়েছ।"

সোনাউল্লা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে "কিন্তু বাবুজী, এ সংসার আবার তুলতে হবে। নইলে ঐ খাঁড়াদেতো বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের ফলার করে ফেলবে।"

আমি বললুম, "আচ্ছা সোনাউল্লা, তোমরা এক কাজ কর না কেন? আমরা যে গুহায় এতদিন ছিলুম, সে গুহাটা খুব বড় আর নিরাপদ। তার ভেতরে অনায়াসে একশ জনের ঠাঁই দিতে পারে। চল, আমরা সকলে মিলে সেইখানে আবার ফিরে যাই?"

"সোনাউল্লা বললে, সে ঠাঁই এখান থেকে কত দূরে বাবুজী?"

আমি বললুম, "তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমরা যে পাহাড়ে থাকি, তার উপরে চড়ে দেখেছি এখানে এই একটি বৈ দ্বীপ নেই। তা যদি হয় তাহলে আমরা নৌকোয় চড়ে পূর্বদিকেই ঐ জঙ্গলের কাছে গিয়ে নামলেই পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে পড়ব।"

সোনাউল্লা বললে, "তাহলে সেই কথাই ভাল! আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাব। সকলকে খবরটা দিয়ে আসি" —এই বলে সে উঠে গেল।

রামহরি মুখ ভার করে বললে, "এদের দলে মোছলমানই বেশি। গুহার ভেতরে এতগুলো মোছলমানের সঙ্গে থাকলে আমাদের যে জাত যাবে বাবু!"

আমি বললুম, "এতই যদি জাতের ভয়, তাহলে আজ এদের হাতের রান্না মাংস কি করে খেলে রামহরি?"

—"কে বললে আমি মাংস খেয়েছি? সব আমি লুকিয়ে বাঘাকে দিয়েছি। আমি খালি ফলমূল খেয়ে আছি!"

বিমল হাসতে হাসতে বলল, "তাহলে তুমি এই কাজ কর রামহরি! আমরা আমাদের গুহায় ফিরে যাই, আর তুমি একলা এখানে বাস কর। এই দ্বীপে তোমার যে মহাদেব আছেন, তুমি রোজ প্রাণ ভরে তাঁর পূজা করতে পারবে আর তোমার জাতও রক্ষা পাবে।"

—"কি যে বল খোকাবাবু, সব ব্যাপারে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।" —বলতে বলতে রামহরি রাগে গস গস করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেল!

পরদিন সকালেই আমরা ছিপে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে আমরা যেখানে গিয়ে থামলুম, ঠিক তার সামনেই সেই ভয়াবহ অরণ্য, যাঁর ভিতরে পথ হারিয়ে আমাদের প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠেছিল।

সেইখানে আমরা ছিপ ছেড়ে নেমে পড়লুম। ডাঙায় উঠে বালুকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়েই আমি দেখতে পেলুম, দূরে সমুদ্রের ধারে আমাদের আশ্রয়স্থান সেই সুপরিচিত পাহাড়টি আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার আমাদের সেই পুরাতন গুহার মধ্যে ফিরে এলুম।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়ে ভীষণ এক ঝড় উঠল—তেমনি ঝড় আগে কখনও দেখিনি। সাগরের অনন্ত বুক থেকে তরঙ্গের এমন এক অশ্রান্ত কান্না ভেসে এল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। ঝড়ের দাপটে আমাদের পাহাড়টা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললুম, "বিমল, এমন এক ঝড়ই আমাদের এই দ্বীপের দিকে টেনে নিয়ে এসেছিল, মনে আছে কি!"

বিমল বললে, "মনে আছে বৈকি। সেদিনের কথা কি এ জীবনে আর ভুলতে পারব?"

কুমার বললে, "আজকের এই ঝড়টা যদি দ্বীপটাকে আমাদের দেশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারত!"

এমনি গল্প করতে করতে আর ঝড়ের হাহাকার শুনতে শুনতে আমরা একে একে ঘুমিয়ে পড়লুম।....

হঠাৎ অনেকের চিৎকারে আর টানাটানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল—শুনলুম কমল চিৎকার করে বলছে, "বিনয়বাবু জাহাজ, জাহাজ!"

তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি, গুহার ভিতরে ভোরের আলো এসে পড়েছে আর আমার পাশে অত্যন্ত উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি, তোমরা এত গোলমাল করছ কেন?"

বিমল বললে, "শিগগির উঠে আসুন বিনয়বাবু, দ্বীপের কাছে একখানা জাহাজ এসে নঙর ফেলেচে।"

শুনেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর ছুটে গুহার বাইরে গিয়ে পুলকিত নেত্রে দেখলুম, আকাশে বাতাসে কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন নেই এবং নীলসমুদ্রের উপরে একখানি লালরঙের প্রকাণ্ড জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখের সামনে, সেই জাহাজের গায়ের উপরে ফুটে উঠল—গঙ্গা-ধোয়া, আম-কাঁঠালের বন-দিয়ে-ঘেরা, কোকিল-পাপিয়া-ডাকা আমাদের বাংলা দেশের আসল ছবি!

ট্রাইশেয়াটপস

আনন্দের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে পর সবাইকে ডেকে বললুম—"ভাই সব! আজ এতদিন পরে ভগবান আমাদের ওপরে মুখ তুলে চেয়েছেন। এতদিন পরে আবার আমাদের দেশে ফেরবার সুযোগ ঘটেছে, এমন সুযোগ গেলে আর পাব না! তোমরা সবাই মিলে চিৎকার কর, আমি আর বিমল সেই সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করি। তাহলেই জাহাজের লোকেরা শুনতে পাবে।"

আমাদের দল এখন খুব ভারি। কাজেই সকলে মিলে যখন চিৎকার করতে লাগল, সারা আকাশটা যেন কেঁপে উঠল। তার উপরে আমার আর বিমলের বন্দুকের আওয়াজ।

হঠাৎ জাহাজ থেকেও বার-দুয়েক বন্দুকের শব্দ হল।

কমল আনন্দে লাফাতে-লাফাতে বললে, "শুনতে পেয়েছে! শুনতে পেয়েছ! জাহাজের লোকেরা আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছে।"

কুমার বললে, "ঐ যে জাহাজ থেকে দুখানা নৌকা নিচে নামিয়ে দিচ্ছে! ঐ যে, জনকয়েক লোকও দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে।"

রামহরি বললে, "দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জাহাজী গোরা!"

দুখানা নৌকো তীরের দিকে আসতে লাগল।

রামহরি কথাই সত্য। নৌকোর উপরে যারা রয়েছে, তারা সকলেই নীল পোষাক-পরা বিলাতি খালাসী!

নৌকো তীরের কাছে আসবামাত্র আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেলুম। আজ কতদিন পরে পৃথিবীর নূতন লোকের সঙ্গে দেখা! সাহেব হলেও তাদের যেন ভাই বলে মনে হতে লাগল।

একজন সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর পোষাক দেখেই বুঝলুম নিশ্চয়ই তিনি জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারি।

তিনি ইংরাজিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দেখে তো ভারতবর্ষের লোক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের এই অজানা দ্বীপে তোমরা এলে কেমন করে? আমাদের জাহাজ ঝড়ের তোড়েই এদিকে এসে পড়েচে, নইলে এ দ্বীপে তো কখনও কোন জাহাজ থামে না!"

আমি বললুম, "সাহেব, আমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলুম, সেখানকার উড়োজাহাজে চড়ে এখানে এসেছি?"

—"কি বললে? তোমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলে?"

—"হ্যাঁ, সায়েব।"

—"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

—"না সাহেব! বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করুন।"

—"তা হলে তোমরা সবাই পাগল!"

—"হ্যাঁ সায়েব, প্রথমে আমাদের কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে বটে। কিন্তু পরে আমাদের সব কথা শুনলেই বুঝবেন আমরা সত্যি বলছি কিনা। আপাতত আমরা আর কিছু চাই না, এই ভয়ানক দ্বীপ থেকে আগে আমাদের উদ্ধার করুন।"

—"এ দ্বীপকে ভয়ানক বলছ কেন?"

—"সায়েব, এখানে যেসব ভীষণ জীবজন্তু আছে, তুমি স্বপ্নেও কখনও তাদের দেখনি।"

—"সে আবার কি?"

—"এ দ্বীপের বাসিন্দা কারা জান? পাহাড়ের মত উঁচু ডিপ্লোডোকাস আর ডাইনসর হাতির মত বড় বড় ষাঁড়, উড়ন্ত সরীসৃপ বা টেরোডাকটাইল, খাঁড়াদেঁতো বাঘ, দানব শ্লথ—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "থাম, থাম, আর পাগলামি কোরো না।"

—সেই সঙ্গেই গোরা খালাসীরা চারিদিক কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল।

ফিরে দেখি আমাদের কাছ থেকে খানিক তফাতেই একটা ছোটখাট বনের ভিতর থেকে সাহেবের ব্যঙ্গ-হাসির মূর্তিমান প্রতিবাদের মত কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড এক জানোয়ার বেগে বেরিয়ে আসছে। কেবলমাত্র তার মুখটাই বোধহয় সাতফুটেরও চেয়ে বেশি লম্বা এবং তার মাথার উপরে ত্রিশূলের মত তিনটে ধারাল শিং ও তার মুখখানা দেখতে যেন অনেকটা আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবীর কাল্পনিক সিংহের মত। তার চেহারা দেখে বুঝলুম সে হচ্ছে ট্রাই শেরাটপস।

সাহেব আর গোরা-খালাসীরা চোখের পলক না ফেলতেই এক ছুটে নৌকোর উপরে গিয়ে উঠল এবং বলা-বাহুল্য আমরাও সকলে গিয়ে নৌকোর উপরে আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করলুম না। নৌকো দুখানা জাহাজের দিকে চলল, সাহেব আমার করমর্দন করে বললেন, "তোমার কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম বলে এখন আমি ক্ষমা চাইছি। আজ যা দেখলুম জীবনে আর ভুলব না।"

জাহাজ ছাড়ল,—মানুষের দেশে আবার আমাদের পৌঁছে দেবে বলে। আবার যে স্বদেশে ফিরতে পারব, এই আনন্দে আমাদের সমস্ত মন যেন আকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু ঠিক শেষমুহূর্তেই এই দানব রাজ্যের কয়েকটি সুপরিচিত দূত আকাশপথে আর একবার আমাদের দেখা দিলে। তারা সেই গরুড়পাখি বা টেরোডাকটাইল! বিশ ফুট জুড়ে ডানা ছড়িয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে দলে দলে।

যে দুটো পাখি আমাদের খুব কাছে ছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। কি বিষম তাদের ঝটাপটি কি কর্কশ তাদের চিৎকার?

জাহাজশুদ্ধ লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। অনেক গোরা-খালাসী হাঁটু গেড়ে বসে উপাসনায় প্রবৃত্ত হল। একজন পাদ্রী তাঁর ক্রুশখানা উঁচু করে তুলে ধরলেন—সকলের মুখ দেখে মনে হল নিশ্চয় তারা তাদের উড়ন্ত প্রেতাত্মা বা নরকের দূত বলে ধরে নিয়েছে। স্ত্রীলোকেরা আর শিশুরা তো কেঁদেই অস্থির—কেউ কেউ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল!

এমনি ভয়, বিস্ময়, আর্তনাদের মধ্যে জাহাজ বেগে অগ্রসর হল, গরুড়পাখিরাও ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পাদ্রী-সাহেব বললেন তার পবিত্র ক্রুশ দেখেই শয়তানের দূতেরা ভয় পেয়ে আবার নরকে পালিয়ে গেল!

ময়নামতীর মায়াকানন ক্রমেই আকাশের নীলপটে মিলিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলোকে দূর থেকে দেখাচ্ছে চিত্রে-লেখা মেঘের মত!

রামহরি বললে, "বাবু, দেশে ফিরে এবার আর আমি তোমাদের দলে ভিড়ব না!"

বিমল হেসে বললে, "কেন?"

—"তোমরা সব করতে পার বাবু! কোনদিন হয়ত আবার স্বশরীরে স্বর্গে যাবার বায়না ধরবে তোমাদের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার।"

বাঘার মাথা চাপড়ে কুমার বললে, "হ্যাঁরে বাঘা, তোর কি মত?"

বাঘা ল্যাজ নেড়ে জবাব দিলে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।"

আমাবস্যার রাত

অমাবস্যার রাত

এক

খবরের কাগজের রিপোর্ট

"বঙ্গদেশ" হচ্ছে একখানি সাপ্তাহিক পত্র। তাতে এই খবরটি বেরিয়েছে—

'সুন্দরবনের নিকট মানসপুর। মানসপুরকে একখানি বড়সড়ো গ্রাম বা ছোটখাটো শহর বলা চলে। কারণ সেখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বসবাস।

সম্প্রতি মানসপুরের বাসিন্দারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে সেখানে এক অলৌকিক বিভীষিকার আর্বিভাব হয়।

আসল ব্যাপারটা যে কি, কেহই সেটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে না। পুলিশ প্রাণপণে তদন্ত করিয়াও বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। গ্রামের চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়াছে। বন্দুকধারী সিপাহীরা সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথাপি প্রতি অমাবস্যার রাত্রে মানসপুর হইতে এক-একজন মানুষ অন্তর্হিত হয়।

আজ এক বৎসর কাল ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। গত বারোটি অমাবস্যার রাত্রে বারোজন লোক অদৃশ্য হইয়াছে। প্রতি দুর্ঘটনার রাত্রেই একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা গিয়াছে। মানসপুর সুন্দরবনের কাছাকাছি হইলেও, তাহার ভিতরে এতদিন ব্যাঘ্রের উৎপাত বড়ো-একটা ছিল না। কিন্তু দুর্ঘটনার আগেই এখন ঘটনাস্থলের চারিদিকে ঘন ঘন ব্যাঘ্রের চীৎকার শোনা যায়। ঠিক অমাবস্যার রাত্রি ছাড়া আর কোনোদিনেই এই অদ্ভুত ব্যাঘ্রের সাড়া পাওয়া যায় না! এ ব্যাঘ্র যে কোথা হইতে আসে এবং কোথায় অদৃশ্য হয় কেহই তা জানে না। আজ পর্যন্ত কেহই তাকে চোখে দেখে নাই।

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যারা অদৃশ্য হইয়াছে তাদের মধ্যে একজনও পুরুষ নাই! প্রত্যেকেই স্ত্রীলোক এবং প্রত্যেকেরই গায়ে ছিল অনেক টাকার গহনা।

পুলিশ প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, এ-সমস্ত অনিষ্টরই মূল হইতেছে কোনো নরখাদক ব্যাঘ্র। কিন্তু নানাকারণে পুলিশের মনে এখন অন্যরকম সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সুন্দরবনের ভিতরে আছে ভুলু-ডাকাতের আস্তানা এবং তার দল ও-অঞ্চলে প্রায়ই অত্যাচার করিয়া থাকে। অনেক চেষ্টা ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও পুলিশ আজ পর্যন্ত ভুলু-ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিশের বিশ্বাস, মানসপুরের সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য ঐ ভুলু-ডাকাতই দায়ী।

কে যে দায়ী এবং কে যে দায়ী নয়, এ-কথা আমরা জানি না বটে, কিন্তু এটা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানসপুরের দুর্ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য কোনো রহস্য আছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ না হইলে এ-সব ব্যাপারকে হয়তো ভুতুড়ে কাণ্ড বলিয়া মনে করিতাম। ডাকাত করে ডাকাতি, ঠিক অমাবস্যার রাত্রেই চোরের মতো আসিয়া তারা কেবল এক-একজন স্ত্রীলোককে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে কেন? আর এই ব্যাঘ্র রহস্যটাই বা কি? এ কোন দেশী ব্যাঘ্র। এ কি পাঁজি পড়িতে জানে? পাঁজি-পুঁথি পড়িয়া ঠিক অমাবস্যার রাত্রে মানসপুরের আসরে গর্জন-গান গাহিতে আসে? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?'

দুই

বাঘার বিপদ

খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কুমার নিজের মনেই বললে, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব, আমি।...'বঙ্গদেশ'-এর রিপোর্টার ঠিক আন্দাজ করেছেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে—হ্যাঁ, আশ্চর্য কোনো রহস্য! উপরি-উপরি বারোটি মেয়ে অদৃশ্য, অমাবস্যার রাত, অদ্ভুত বাঘের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, তার ওপরে আবার ভুলু-ডাকাতের দল। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক কাণ্ড। ... এ-সময়ে বিমল যদি কাছে থাকত! কিন্তু আজ সাত আট দিন ধরে রামহরিকে নিয়ে সে যে কোথায় ডুব মেরে আছে, শিবের বাবাও বোধ হয় তা জানেন না!'

একখানা পঞ্জিকা নিয়ে তার ভিতরে চোখ বুলিয়ে কুমার আবার ভাবতে লাগল, 'হুঁ, পরশু আবার অমাবস্যার রাত আসবে, মানসপুর থেকে হয়তো আবার এক অভাগী নারী অদৃশ্য হবে! আমার যে এখনি সেখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! এমন একটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'- এর সুযোগ তো ছেড়ে দিলে চলবে না, বিমলের কপাল খারাপ, তাই নিজের দোষেই এবারে সে ফাঁকে পড়লো, আমি কি করবো?...বাঘা, বাঘা!'

বাঘা তখন ঘরের এককোণে বসে একপাল মাছির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করছিলো। মাছিদের ইচ্ছা, বাঘার গায়ের উপরে তারা মনের আনন্দে খেলা করে বেড়ায়, কিন্তু তার দেহটা যে মাছিদের বেড়াবার জায়গা হবে, এটা ভাবতেও বাঘা রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলো। বড়ো-বড়ো হাঁ-করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে এক-একবারে একাধিক মাছিকে গ্রাস করে ফেলছিলো—কিন্তু মাছিরাও বিষম নাছোড়বান্দা, প্রাণের মায়া ছেড়ে ভন্ ভন্ ভন্ ভন্ করতে করতে বাঘার মাথা থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত বার-বার তারা ছেয়ে ফেলছিলো। যে-বাঘা আজ জলে-স্থলে-শূন্যমার্গে কত

মানব, দানব ও অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে, বিমল ও কুমারের সঙ্গে যার নাম এই বাংলাদেশে বিখ্যাত, তুচ্ছ একদল মক্ষিকার আক্রমণ আজ তাকে যেরকম কাবু করে ফেলেছে তা দেখলে শত্রুরও মায়া হবে! এমনি সময়ে কুমারের ডাক শুনে সে গা ও ল্যাজ ঝাড়তে ঝাড়তে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কুমার বললে, 'বাছা বাঘা! বিমলও নেই রামহরিও নেই—খালি তুমি আর আমি! অমাবস্যার রাত, বাঘের গর্জন, ডাকাতের দল, মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য! শুনে কি তোমার ভয় হচ্ছে?'

বাঘা কান খাড়া করে মনিবের সব কথা মন দিয়ে শুনলে। কি বুঝলে জানি না, কিন্তু বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

—'বাঘা, এ বড়ো যে-সে ব্যাঘ্র নয়, বুঝেছো? এ তোমার চেয়েও চালাক! এ তিথি-নক্ষত্র বিচার করে কাজ করে! এর সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারবো কি?'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

—'তার ওপরে আছে ভুলু-ডাকাতদের দল। পুলিশও তাদের কাছে হার মেনেছে, খালি তোমাকে আর আমাকে তারা গ্রাহ্য করবে কি?'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'—বলেই বাঘা টপ্ করে মুখ ফিরিয়ে ল্যাজের ডগা থেকে একটা মাছিকে ধরে গপ্ করে গিলে ফেললে!

একখানা খাম ও চিঠির কাগজ বার করে কুমার লিখতে বসলো,—

'ভাই বিমল,

একবার এক জায়গা থেকে দলে দলে মানুষ অন্তর্হিত হচ্ছিল শুনে সে ব্যাপারটা আমরা দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেই কৌতূহলের ফলে বন্দী হয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে।

এবারেও মানসপুরে মানুষের পর মানুষ (কিন্তু কেবল স্ত্রীলোক) অদৃশ্য হচ্ছে। শুনেই আমার চড়ুকে পিঠ আবার সড়্ সড়্ করছে। আমি আর বাঘা তাই ঘটনাস্থলে চললুম। জানি না এবারেও আমাদের আবার পৃথিবী ছাড়তে হবে কি না!

খবরের কাগজের রিপোর্টও এই খামের ভিতরে দিলুম। এটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারলুম না। আসছে পরশু অমাবস্যা, আজ যাত্রা না করলে যথাসময়ে মানসপুরে গিয়ে পৌঁছতে পারবো না।

বিমল, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। এবারের 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এ তুমি বেচারি ফাঁকে পড়ে গেলে। কি আর করবে বলো, যদি প্রাণ নিয়ে ফিরি, আমার মুখে সমস্ত গল্প শুনো তখন।

ইতি—
তোমার
কুমার'

তিন

পটলবাবু, চন্দ্রবাবু ও মোহনলাল

পরদিন কুমার মানসপুরে গিয়ে হাজির হলো।

সেখানে তখন ভীষণ রিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

আসছে কাল সেই কাল-অমাবস্যা আসছে এবং সেই অজানা শত্রু কাল আবার কোন পরিবারে গিয়ে হানা দেবে কেউ তা জানে না! সকলে এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে, ধনীরা বাড়ির চারিদিকে ডবল করে পাহারা বসাচ্ছে, সাধারণ গৃহস্থদের কেউ কেউ সপরিবারে স্থানান্তরে পালাচ্ছে এবং কেউ কেউ বাড়ির মেয়েদের গ্রামান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে—কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি কেবল মেয়েদের দিকেই।

শহরের যুবকরা নানা স্থানে "পল্লী-রক্ষা-সমিতি" গঠন করেছে এবং কি করে এই আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তাই নিয়ে তাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা ও তর্কাতর্কির অন্ত নেই।

চারিদিকে এখন থেকেই সরকারী চৌকিদারের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ।

কুমার আগে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মানসপুরের অবস্থাটা ভালো করে দেখে নিলে।

অধিকাংশ স্থানেই একটি লোকের মূর্তি বার বার তার চোখে পড়লো।

সে-লোকটি খুব সপ্রতিভ ও ব্যস্তভাবেই সর্বত্র ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, এবং কোন দিক দিয়ে বিপদ আসবার সম্ভাবনা, সে-সম্বন্ধে "পল্লী-রক্ষা-সমিতি"র যুবকগণকে নানান রকম পরামর্শ দিচ্ছে।

একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে কুমার জানলে যে, তাঁর নাম পটলবাবু। ধনী না হলেও গাঁয়ের একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা মাতব্বর ব্যক্তি এবং "পল্লী-রক্ষা-সমিতি"র প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু পটলবাবুর চোখে কুমার এমন একটি বিশেষত্ব আবিষ্কার করলো, যা সে আর কোনো মানুষের চোখে দেখেনি।

পটলবাবুর গায়ের রং মোষের মতো কালো, তাঁর দেহখানি লম্বায় খুব খাটো কিন্তু আড়ে বেজায় চওড়া, মাথায় ইস্পাতের মতো চক্‌চকে টাক, কিন্তু ঠোঁটের উপরে ও গালে জানোয়ারের মতো বড়ো-বড়ো চুল—যেন তিনি বিপুল দাড়ি-গোঁফের দ্বারা মাথার কেশের অভাবটা পূরণ করে নিতে চান!

কিন্তু পটলবাবুর চেহারার মধ্যে আসল দ্রষ্টব্য হচ্ছে তাঁর দুই চোখ! পটলবাবুর হাত-পা খুব নড়ছে, তাঁর মুখ অনবরত কথা কইছে, কিন্তু তাঁর চোখদুটো ঠিক যেন মরা-মানুষের চোখ! শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিট্‌-মিট্‌ করে তাকিয়ে দেখছে—পটলবাবুর চোখ দেখে এমনি-একটা ভাবই কুমারের মনকে নাড়া দিতে লাগলো।

চারিদিকে দেখে-শুনে কুমার, মানসপুর থানার ইন্‌স্পেক্টর চন্দ্রবাবুর সন্ধানে চললো। কলকাতাতেই সে খবর পেয়েছিলো যে, চন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে সে একসঙ্গে অনেককাল ধরে পড়াশুনা করেছিলো। অশোক এখন কলকাতায়। কিন্তু এখানে আসবার আগে সে বুদ্ধি করে অশোকের কাছ থেকে চন্দ্রবাবুর নামে নিজের একখানি

পরিচয়পত্র আনতে ভোলেনি। কারণ সে বুঝেছিলো যে মানসপুরের রহস্য সমাধান করতে হলে চন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

থানায় গিয়ে সে নিজের পরিচয়-পত্রখানি ভিতরে পাঠিয়ে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই তার ডাক এলো।

চন্দ্রবাবু তখন টেবিলের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর বয়স হবে পঞ্চান্ন, বেশ লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মূর্তি, মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল,—দেখলে পুরাতন পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হয় না।

কুমারকে দেখেই চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে তার একখানি হাত ধরে বললেন, 'তুমিই অশোকের বন্ধু কুমার? এই বয়সে তুমি এত নাম কিনেচো? তোমার আর তোমার বন্ধু বিমলের অদ্ভুত সাহস আর বীরত্বের কথা শুনে আমি তোমাদের গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়েছি। এসো, এসো, ভালো করে বোসো—ওরে চা নিয়ে আয় রে!'

কুমার আসন গ্রহণ করলে পরে চন্দ্রবাবু বললেন, 'তারপর। হঠাৎ এখানে কি মনে করে? নতুন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এর গন্ধ পেয়েছো বুঝি?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

চন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময়, বড়োই আশ্চর্য! জীবনে এমন সমস্যায় কখনো পড়িনি! কে বা কারা এ-রকম ভাবে মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে? বাঘ? না ভুলু-ডাকাতের দল? সবাই সাবধান হয়ে আছে, চারিদিকে কড়া পাহারা, তার ভিতর থেকেই বারো-বারোটি মেয়ে চুরি গেলো, অথচ চোর ধরা পড়া দূরের কথা—তার টিকিটি পর্যন্ত কারুর চোখে পড়লো না। এও কি সম্ভব?—ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়িয়েছে, আমার চাকরি বুঝি আর টেকে না! আসছে কাল অমাবস্যা, আমিও সেজন্যে যতটা-সম্ভব প্রস্তুত হয়ে আছি,—কাল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো! কিন্তু কালও যদি চোর ধরতে না পারি, তা হলে আমার কপালে কি আছে জানি না—উপরওয়ালারা নিশ্চয়ই ভাববেন, আমি একটি প্রকাণ্ড অপদার্থ!'

কুমার শুধোলে, 'অমাবস্যার রাতে ঠিক কোন সময়ে মেয়ে চুরি যায়, তার কি কিছু স্থিরতা আছে?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ-ব্যাপারের সবটাই আজগুবি! বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য বাঘটি শুধু পাজি-পুঁথি পড়তেই শেখেনি,—কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে কাজ করতেও শিখেছে! প্রতিবারেই ঠিক রাত দুপুরের সময়ে তার প্রথম চীৎকার শোনা যায়!'

—'কিন্তু এ বাঘটা কি সত্যিই আসল বাঘ, না, সবাইকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্যে কোনো 'হরবোলা', মানুষ অবিকল বাঘের ডাক নকল করে?'

—'সে-সন্দেহ করবারও কোনো উপায় নেই। প্রতিবারেই বাঘের অগুন্তি পায়ের দাগ আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

কুমারের চা এলো। চা পান করতে করতে নীরবে সে ভাবতে লাগলো।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'রহস্যের উপর রহস্য! আজ দিন-কয় হলো মানসপুরে কে-একজন অচেনা লোক এসে বাসা বেঁধেছে, তাকে সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু সে যে কে, তা কেউ জানে না! লোকটার সমস্ত ব্যবহারই সন্দেহজনক! এখানকার মুরুব্বি পটলবাবু বলেন, নিশ্চয়ই সে ভুলু-ডাকাতের

চর! আপাতত ইচ্ছা থাকলেও আমরা তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ-খবর নিতে পারছি না, কারণ এই মেয়ে-চুরির হাঙ্গামার জন্যে আমার আর কোনো দিকেই ফিরে তাকাবার অবসর নেই। তবে তার ওপরেও কড়া পাহারা রাখতে আমি ভুলিনি।'

কুমার বললে, 'লোকটার নাম কি?'

—'মোহনলাল বসু। শুনলুম, সে কোথাকার জমিদার, এখানে এসেছে বেড়াতে। যদিও এখানে সমুদ্রের হাওয়া বয়, কারণ খানিক তফাতেই সমুদ্র আছে,—কিন্তু এটা কি বেড়াতে আসবার জায়গা, বিশেষ এই বিভীষিকার সময়ে? ...তার পর শুনলুম সে কাল গাঁয়ের অনেকের কাছে গল্প করে বেড়িয়েছে যে, তার বাড়িতে নাকি নগদ অনেক হাজার টাকা আছে ! এমন বোকা লোকের কথা কখনো শুনেছো? আশপাশে প্রায়ই ভুলু-ডাকাত হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা জেনেও এ-কথাটা প্রকাশ করতে কি তার ভয় হলো না?...ভুলু-ডাকাতের কানে এতক্ষণ মোহনলালের টাকার কথা গিয়ে পৌঁচেছে, আর পটলবাবুর সন্দেহ যদি ভুল হয়, অর্থাৎ মোহনলাল যদি ভুলু-ডাকাতের চর না হয়, তাহলে আসছে কাল অমাবস্যার গোলমালে ভুলু যে তার বাড়িতে হানা দেবে, এটা আমি মনে টিক দিয়ে রেখেছি।'

খানিকক্ষণ চিন্তিতভাবে নীরব থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখন বুঝেছো, আমি কিরকম মুশ্‌কিলে ঠেকেছি? একেই এই মেয়ে-চুরির মামলা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, তার ওপরে কাল এ মোহনলালের বাড়ির আনাচে-কানাচেই আমাকে রাত কাটাতে হবে, কারণ শ্রীমান ভুলু-বাবাজী কাল হয়তো দয়া করে ওখানে পায়ের ধুলো দিলেও দিতে পারেন!'

কুমার বললে, 'চন্দ্রবাবু, আপনি আমার একটি কথা রাখবেন?'

—'কি কথা? তুমি যখন অশোকের বন্ধু তখন তুমি আমারও ছেলের মতো। সাধ্যমতো আমাকে তোমার আব্‌দার রাখতে হবে বৈকি!'

কুমার বললে, 'যতদিন-না এই মামলার কোনো নিষ্পত্তি হয়, ততদিন আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবেন কি?'

চন্দ্রবাবু খুব খুশিমুখে বললেন, 'এ কথা আর বলতে? তোমার মতো সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে তো আমি বর্তে যাই! তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তাহলে আমি হয়তো খুব শীঘ্রই এ-মামলাটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারবো।'

চার

আধুনিক ব্যাঘ্র

অমাবস্যার রাত!

নিঝুম রাত করছে ঝাঁ ঝাঁ, নিরেট অন্ধকার করছে ঘুট্ ঘুট্!

তার ওপরে বিভীষিকাকে আরো ভয়ানক করে তোলার জন্যেই যেন কালো আকাশকে মুড়ে আরো-বেশি-কালো মেঘের পর মেঘের সারি দৈত্য-দানবের নিষ্ঠুর সৈন্য-শ্রেণীর মতো শূন্যপথে ধেয়ে চলেছে, দিশেহারা হয়ে!

মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করে বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ জ্বলে জ্বলে উঠেছে—সে যেন জ্বালামুখী প্রেতিনীদের আগুন-হাসি!

বন জঙ্গল, বড়ো-বড়ো গাছপালাকে দুলিয়ে, ধাক্কা মেরে নুইয়ে দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে কারা যেন পৃথিবীময় পাগলের কান্না কেঁদে ছুটে ছুটে আর মাথা কুটে কুটে বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে!

...মানসপুর যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। সেখানে যে ঘরে ঘরে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হাতে করে সজাগ হয়ে বসে আছে, বাইরে থেকে এমন কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না!

...খুব উঁচু একটা বটগাছের ডালে বসে কুমার নিজের রেডিয়মের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে আর মোটে দশ মিনিট দেরি আছে!

বন্দুকটা ভালো করে বাগিয়ে ধরে কুমার গাছের ডালের উপরে যতটা-পারে সোজা হয়ে বসলো। সে নিজেই এই গাছটা পছন্দ করে নিয়েছে। যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, তাই

তার জন্যে চন্দ্রবাবু গাছের নিচেই এক চৌকিদারকে মোতায়েন রেখেছেন। ... এই গাছ থেকে ত্রিশ-পয়ঁত্রিশ ফুট দূরেই সেই নির্বোধ মোহনলালের বাসাবাড়ি। চন্দ্রবাবু নিজেও কাছাকাছি কোনো ঝোপঝাপের ভিতরে সদলবলে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কুমার নিজের মনে মনেই বললে, 'আর আট মিনিট! আঃ, এ মিনিটগুলো যেন ঘড়ির কাঁটাকে জোর করে টেনে রেখেছে—এরা যেন তাকে এগুতে দিতে রাজি নয়। ... আর ছ মিনিট! চন্দ্রবাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে বারোটা বাজলেই সেই আশ্চর্য বাঘের চিৎকার শোনা যাবে। একেলে বাঘগুলোও কি সভ্য হয়ে উঠলো, ঘড়ি না দেখে মানুষের ঘাড় ভাঙতে বেরোয় না? ... হাওয়ার রোখ্ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, গাছটা বেজায় দুলছে—শেষটা ধপাস্ করে পপাত ধরণীতলে না হই! ... আর চার মিনিট! ... আর তিন মিনিট...আর দু মিনিট!'—কুমারের হৃৎপিণ্ডটা বিষম উত্তেজনায় যেন লাফাতে শুরু করলে—ছিদ্রহীন অন্ধকারের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আগ্রহদীপ্ত চোখ দু'টোকে ক্রমাগত বুলিয়ে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল—যে মূর্তিমান আতঙ্ক এখনি এখানে এসে আবির্ভূত হবে! কিন্তু তার কোনো খোঁজই মিললো না!

—'আচ্ছা, বাঘ যদি এদিকে না এসে অন্যদিকে যায়? কিন্তু যেদিকেই যাক, বাঘের ডাক তো আর সেতারের মিন্‌মিনে আওয়াজ নয়, তার গর্জন আমি শুনতে পাবোই! আর বাঘের বদলে যদি এদিকে আসে ভুলু-ডাকাতের দল, তা হলেও বড় মন্দ মজা হবে না!—আর আধ মিনিট!'

গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ করে আচম্বিতে ঝড় জেগে উঠে বটগাছটার উপরে ভীষণ একটা ঝাপ্‌টা মারলে—পড়তে পড়তে কুমার কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলো!

—'ঠিক রাত বারোটা!'

—সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো এক ব্যাঘ্রের গর্জন! বাঘের ডাক যে এমন ভয়ানক আর অস্বাভাবিক হতে পারে, কুমারের সে-ধারণাই ছিলো না—তার সমস্ত শরীর যেন শিউরে শিউরে মূর্ছিত হয়ে পড়বার মতো হলো!

আবার সেই গর্জন—একবার, দুইবার, তিনবার, সে গর্জন শুনে ঝড়ও যেন ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

আকাশের কালো মেঘের বুক ছিঁড়ে ফালাফালা করে সুদীর্ঘ এক বিদ্যুতের লকলকে শিখা জ্বলে উঠলো—

এবং নিচের দিকে তাকিয়ে কুমার স্পষ্ট দেখলে, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র সামনের জঙ্গলের ভিতর থেকে তীরের মতো বেরিয়ে এলো—

এবং অমনি তার বন্দুক ধ্রুম করে অগ্নিবৃষ্টি করলে!

—তার পরেই প্রথমে ব্যাঘ্রের গর্জন এবং সেই সঙ্গে মানুষের করুণ আর্তনাদ।

পাঁচ

মানুষ শিকার

বাঘের ডাক আর মানুষের আর্তনাদ থামতে-না-থামতেই সারি সারি লণ্ঠনের ও বিজলী-মশালের (ইলেক্‌ট্রিক টর্চ) আলোতে চারিদিকের অন্ধকার যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো! ঝোপ্-ঝাপের ভিতর থেকে দলে দলে পুলিশের লোক গোলমাল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

কুমারও তর্ তর্ করে গাছের উপর থেকে নেমে এলো। কিন্তু নেমে এসে গাছের নিচে চৌকিদারকে আর দেখতে পেলে না। নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনেই পৈতৃক প্রাণটি হাতে করে সে চম্পট্ দিয়েছে।

মুখ তুলেই দেখে, চন্দ্রবাবু একহাতে রিভলভার আর এক হাতের বিজলী-মশাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে তার দিকেই আসছেন।

কাছে এসেই চন্দ্রবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'কুমার, তুমিই কি বন্দুক ছুঁড়েছো?'

কুমার বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি, কিন্তু আর্তনাদ করে উঠলে একজন মানুষ!'

'বাঘটাকে তুমি কোনখানে দেখেছ!'

'খুব কাছেই। ঐ যে, ঐখানে!'

চন্দ্রবাবু সেইদিকে বিজলী-মশালের আলো ফেলে বললেন, 'কই, ওখানে তো বাঘের চিহ্নও নেই! কিন্তু মাটির ওপরে ওখানে কে বসে আছে?'—দু-পা এগিয়েই তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'আরে এ যে আমাদের পটলবাবু!'

কুমার এগিয়ে দেখলে পটলবাবু মাটিতে বসে গায়ের চাদরখানা দিয়ে নিজের ডান পা-খানা বাঁধবার চেষ্টা করছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ কি পটলবাবু, আপনি এখানে কেন? আপনার পায়ে কি হয়েছে, চাদর জড়াচ্ছেন যে!'

পটলবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'যে-জন্যে আপনারা এখানে, আমিও সেইজন্যেই এখানে এসে লুকিয়েছিলুম! কিন্তু ঐ ভদ্রলোক যে গুলি করে আমার একখানা পায়ের দফা একেবারে রফা করে দেবেন তা তো জানতুম না! গুলিটা যদি আমার মাথায় কি বুকে লাগত তা হলে কি হতো বলুন?'

কুমার অপ্রস্তুত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি! আপনার পায়ে কেমন করে গুলি লাগলো কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

ক্রুদ্ধস্বরে পটলবাবু বললেন, 'বাঘকে দেখে বন্দুক ছুঁড়েছেন না, ঘোড়ার ডিম করেছেন! কাছেই কোথায় একটা বাঘ ডেকেছিল বটে, কিন্তু এখানটায় কোনো বাঘ আসেনি। এখানে বাঘ এলে আমি কি দেখতে পেতুম না? আপনি স্বপ্নে বাঘ দেখে আঁৎকে উঠেছেন!'

ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছ থেকে কে বলে উঠল, 'না, কুমারবাবু সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছেন—আমিও সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছি! পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বাঘটা ঠিক ঐখানেই এসে দাঁড়িয়েছিলো!'

সকলে আশ্চর্য হয়ে উপর পানে তাকিয়ে দেখলে, গাছের গুঁড়ি ধরে একজন লোক নিচে নেমে আসছে!

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'একি, মোহনলালবাবু যে! গাছের ওপরে চড়ে আপনি এতক্ষণ কী করছিলেন!'

কুমারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মোহনলাল বললে, 'গাছে বসে ঐ ভদ্রলোকও যা করছিলেন, আমিও তাই করছিলুম। অর্থাৎ দেখছিলুম বিপদ কোনদিক দিয়ে আসে!'

মোহনলালের বয়স হবে প্রায় চুয়াল্লিশ, মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি-কাটা চুল, মুখেও কাঁচা-পাকা গোঁফ ও ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, রং শ্যামবর্ণ, দেহখানি খুব লম্বা-চওড়া—দেখলেই বোঝা যায়, বয়সে প্রৌঢ় হলেও তাঁর গায়ে রীতিমতো শক্তি আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি বাঘের কথা কি বলছিলেন না?'

মোহনলাল বললে, 'হ্যাঁ। পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বিদ্যুতের আলোতে ঠিক ঐখানেই আমি একটা মস্তবড় বাঘকে স্বচক্ষে দেখেছি। তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ হল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাঘের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ! তারপরে এখন দেখছি, এখানে বাঘের বদলে রয়েছেন পটলবাবু।'

পটলবাবুর মরা মানুষের-চোখের মতো চোখদুটো হঠাৎ একবার জ্যান্ত হয়ে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তারপর তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'এখানে যে বাঘ-টাঘ কিছু আসেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছি আমি নিজে। বাঘটা এখানে এলে আমি এতক্ষণ জ্যান্ত থাকতুম না।'

চন্দ্রবাবুও সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পটলবাবুর এ যুক্তি মানতে হবে। আপনারা দুজনেই ভুল দেখেছেন!'

পটলবাবু বললেন, 'দুজনে কেন, একশো জনে ভুল দেখলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সত্যি-সত্যি বন্দুক ছোঁড়াটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এঃ, আমার ঠ্যাংখানার দফা একেবারে রফা হয়ে গেছে—উঃ! আমি যে আর উঠতেও পারছি না।'

কুমার বেচারী একদম হতভম্বের মতো হয়ে গেল! সে যে বাঘটাকে দেখেছে এবং তাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছে, এ-বিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, অথচ অন্যের সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যে কোনো প্রমাণই তার হাতে নেই।

মোহনলাল একটা বিজলী-মশাল নিয়ে মাটির উপরে ফেলে বলে উঠল, 'এই দেখুন, চন্দ্রবাবু, বাঘ যে এখানে এসেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখুন! এই দেখুন, কাঁচামাটির ওপরে বাঘের থাবার দাগ! এই দেখুন, ঐ ঝোপটার ভেতর থেকে থাবার দাগগুলো এইখানে এগিয়ে এসেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখুন চন্দ্রবাবু দেখুন!'

চন্দ্রবাবুও বাঘের পায়ের দাগগুলো দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার! পায়ের দাগ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাঘটা এদিক পানেই এসেছে বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে আবার ফিরে গেছে, পায়ের দাগ দেখে সেটা মনে হচ্ছে না তো!'

আশেপাশে যে-লোকগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা প্রত্যেকেই চমকে উঠল এবং সভয়ে বারংবার চারিদিকে তাকাতে লাগল—কি-জানি বাঘটা যদি কাছেই কোনো জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে!

পটলবাবু বললেন, 'বন্দুকের শব্দ শুনেই বাঘটা হয়তো লম্বা একটা লাফ মেরে পাশের কোনো ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়েছে! কিন্তু এখানে কোনো বাঘ এসেছে বলে এখনো আমি মানতে রাজি নই,—কারণ আমি নিজে কোনো বাঘ দেখিনি!'

বাঘের পায়ের দাগগুলো আরো খানিকক্ষণ পরখ করে মোহনলাল বললে, 'না বাঘ যে এখানে এসেছিল, সে-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই! এখান থেকে সবচেয়ে কাছের ঝোপ হচ্ছে অন্তত চল্লিশ হাত তফাতে। কোনো বাঘই এক-লাফে অতদূর গিয়ে পড়তে পারে না! কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘটা তবে গেল কোথায়?'

পটলবাবু বললেন, 'সে-কথা নিয়ে পরে অনেক মাথা ঘামাবার সময় পাবেন। আপাতত আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন দেখি,—আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই! এঃ, ঠ্যাংখানার দফা একেবারে রফা করে দিয়েছে দেখছি! কুমারবাবু, মস্ত শিকারী আপনি! বাঘ মারতে এসে মারলেন কিনা মানুষকে! আর মানুষ বলে মানুষ—একেবারে আমাকেই।'

লজ্জায়, অনুতাপে কুমার মাথা না হেঁট করে পারলে না।

মোহনলাল কোনো দিকেই না চেয়ে আপনমনে তখনো বাঘের পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল।

পটলবাবু টিটকিরি দিয়ে বললেন, 'বাঘের পা থেকে ধুলোয় দাগ হয় বটে, কিন্তু সে দাগ থেকে আর আস্ত বাঘ জন্মায় না মোহনলালবাবু! মিছেই সময় নষ্ট করছেন!'

মোহনলাল মাথা না তুলেই বললে, 'আমার যেন মনে হচ্ছে, এই বাঘের পায়ের ভেতর থেকেই আসল বাঘ আমাদের কাছে ধরা দেবে!'

পটলবাবুর মরা চোখ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্যে—তিনি বললেন, 'বলেন কি মশাই? দাগ থেকে জন্মাবে আস্ত বাঘ, এ কোন যাদুমন্ত্রে?'

মোহনলাল বললে, 'যে-যাদুমন্ত্রে মাটিতে পায়ের দাগ রেখে বাঘ শূন্যে উড়ে যায়!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। চলুন, পটলবাবু, আপনি জখম হয়েছেন, আপনাকে আমরা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি!'

—ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে সুতীক্ষ্ণ ফুটবল-বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল।

চন্দ্রবাবু সচমকে বলে উঠলেন, 'আমার গুপ্তচরের বাঁশি। সবাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়—সবাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়! শিগগির আলো নিবিয়ে দাও!'

কুমার শুধোলে, 'ব্যাপার কি চন্দ্রবাবু? এ বাঁশির আওয়াজের মানে কি?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার গুপ্তচর বাঁশির সঙ্কেতে জানিয়ে দিলে যে, ভুলু-ডাকাতের দল এইদিকেই আসছে! তারা আসছে নিশ্চয় মোহনলালবাবুর বাড়ি লুঠ করতে! .....কিন্তু মোহনলালবাবু কোথায় গেলেন? পটলবাবুই বা কোথায়?'

মোহনলাল ও পটলবাবু একেবারে অদৃশ্য!

কুমার বললে, 'বোধ হয় ভুলু-ডাকাতের নাম শুনেই ভয়ে তাঁরা চম্পট দিয়েছেন।'

—'তাই হবে। এসো কুমার, আমরাও এই ঝোপটার ভেতর গিয়ে অদৃশ্য হই'—বলেই কুমারের হাত ধরে টেনে চন্দ্রবাবু পাশেই একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন!

বিপদের উপরে বিপদ! ঠিক সেই সময়ে আকাশের অন্ধকার মেঘগুলো যেন ছ্যাঁদা হয়ে গেল—ঝুপ-ঝুপ করে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে নিরানন্দের মাত্রা যেন পূর্ণ করে তুললে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার বন্দুকে টোটা পুরে নাও—এবারে আর বাঘ নয়, হয়তো আমাদের মানুষ শিকারই করতে হবে!'

কুমার বললে, 'সে-অভ্যাস আমার আছে। এর আগেও আমাকে মানুষ-শিকার করতে হয়েছে!'

ছয়

কালো কালো হাত

সেকি বৃষ্টি!—ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, অন্ধকার শূন্যের ভিতর থেকে যেন এক বিরাট প্রপাত হুড় হুড় করে জল ঢালছে আর ঢালছে।

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কুমার যে-ঝোপটার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেটা ছিল ঢালু জমির উপরে। অল্পক্ষণ পরেই তাদের প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে কলকল আওয়াজে জলধারা ছুটতে লাগল।

চন্দ্রবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন,—'কপাল যাদের নেহাৎ পোড়া, তারাই পুলিশে চাকরি নেয়!—শ্যাল-কুকুররাও আজ বাইরে নেই, আমরা তাদেরও অধম!'

কুমার তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, 'কি মুশকিল! সাপের মতো কি-একটা আমার গায়ের ওপর দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল!'

—'খুব সাবধান কুমার! বর্ষাকালে সুন্দরবনে সাপের বড় উৎপাত! একটা ছোবল মারলেই ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ!...দেখ, দেখ, ঐ দেখ! মাঝে মাঝে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ জ্বালিয়ে কারা সব এই দিকেই আসছে! নিশ্চয়ই ভুলু-ডাকাতের দল!'

কুমার বললে, 'ভুলু-ডাকাতকে আপনি কখনো দেখেছেন?'

—'কেউ কোনোদিন তাকে দেখেনি। সে নিজে দলের সঙ্গে থাকে না। দলের সঙ্গে থাকে কালু-সর্দার, সে ভুলুর হুকুম-মতো দলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কালু-সর্দারকে আমি দেখেছি, সে যেন এক মাংসের পাহাড়, মানুষের দেহ যে তেমন বিপুল হতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। কালুর গায়ে জোরও তেমনি। শুনেছি, সে নাকি শুধু-হাতে এক আছাড়ে একটা বাঘকে বধ করেছিল। একবার সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রাত্রিবেলায় হাজত-ঘরের দেওয়াল থেকে আস্ত জানলা উপড়ে ফেলে সে চম্পট দেয়।'

চন্দ্রবাবুর কথা শুনতে শুনতে কুমার দেখতে লাগল, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত তফাৎ দিয়ে ডাকাতের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের কারুকে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু বিজলী-মশালগুলোর আলো দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাদের গতি কোন দিকে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দু-একটা আশ্চর্য রহস্যের কোনো কিনারাই আমি করতে পারছি না। ভুলু-ডাকাতের দল ডাকাতি করতে বেরোয় কেবল অমাবস্যার রাত্রে। আর যে-অঞ্চলেই তার দল ডাকাতি করতে যায়, সেইখানেই বাঘের বিষম অত্যাচার হয়! বাঘের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই তারা যেন ডাকাতি করতে যায়! একবার একজন সাহেব-গোয়েন্দা ভুলুকে ধরতে এসেছিল। কিন্তু শেষটা বাঘের কবলেই তার প্রাণ যায়। লোকের মুখে শুনি বাঘই নাকি ভুলুর ইষ্টদেবতা, রোজ সে বাঘ-পুজো করে!'

—'বাঘ-পুজো?'

—'হ্যাঁ। সুন্দরবনে এটা কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই এখানে বাঘকে পুজো করে।'

—'দেখুন, দেখুন! ডাকাতের দল অন্য দিকে যাচ্ছে!'

—'হুঁ, ঐ দিকেই মোহনলালের বাসায় যাবার পথ। ওরা যে মোহনলালের বাসার দিকেই যাবে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। পটলবাবুর সন্দেহ ভুল—মোহনলাল যদি ভুলুর দলের লোক হতো, তাহলে ডাকাতরা কখনোই তার বাড়ি লুঠ করতে আসত না।'

কুমার বললে, 'এখন আপনি কি করবেন?'

পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এইবারে আমি বাঁশি বাজাব। ডাকাতরা জানে না, ওরা আজ কী ফাঁদে পা দিয়েছে! আমি বাঁশি বাজালেই আমার দলের লোকেরা ওদের ঘেরাও করে ফেলবে। কুমার প্রস্তুত হও!'—চন্দ্রবাবু বাঁশি বাজাতে উদ্যত হলেন।

সেই মুহূর্তেই তীব্র স্বরে একটা ফুটবল-বাঁশি বেজে উঠল—কিন্তু সে চন্দ্রবাবুর বাঁশি নয়!...ডাকাতদের বিজলী মশালগুলো এক পলকে নিবে গেল!

চন্দ্রবাবু এক লাফে ঝোপের বাইরে এসে বললেন, 'ও বাঁশি কে বাজালে? ডাকাতদের কে সাবধান করে দিলে?'—বলতে বলতে তিনিও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন—একবার, দুবার, তিনবার!

জঙ্গলের চারিদিকে পুলিশের লণ্ঠন জ্বলে উঠল, চারিধারে ঝোপঝাপ থেকে দলে দলে পুলিশের লোক বেরিয়ে এল—তাদের কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে লাঠি!

চন্দ্রবাবু চীৎকার করে বললেন, 'ডাকাতরা পালাচ্ছে, ওদের আক্রমণ কর! ঐদিকে—ঐদিকে—শিগগির!' চন্দ্রবাবু ও কুমার রিভলভার ও বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতরা যেদিকে ছিল সেইদিকে ছুটতে লাগলেন!

কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রবাবু ডাকাতদের কারুর টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। দারুণ বৃষ্টিতে মাটির উপর দিয়ে যেন বন্যা ছুটছে, এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় বন-জঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে দুলছে, বিজলী-মশালের সীমানার বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে, এর মধ্যে ডাকাতরা যে কোথায়, কোনদিকে গা ঢাকা দিয়েছে তা স্থির করা অসম্ভব বললেই চলে।

চন্দ্রবাবু হতাশ ভাবে বললেন, 'নাঃ, আজও খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল দেখছি। কিন্তু কোন রাস্কেল বাঁশি বাজিয়ে তাদের সাবধান করে দিলে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

কুমার বললে, 'বোধ হয় ডাকাতদের কোনো চর বনের ভেতরে লুকিয়ে থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল!'

—'সম্ভব। কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমরা—' চন্দ্রবাবুর কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ পাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে দু-খানা বড়ো বড়ো কালো হাত বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল এবং পরমুহূর্তে তারা কুমারকে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, কুমার একটা চীৎকার করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কুমার নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মহা-বলবান অজ্ঞাত শত্রু তার দেহ ধরে এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলে যে, তার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সাত

বাঘের গর্তে

নিচে কল কল করে জলের বন্যা ছুটে চলেছে, উপরেও ঝড়ের তোড়ে নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে যেন শব্দের বন্যা ডেকে ডেকে উঠছে এবং এ-সমস্তকেই গ্রাস করে নীরবে বয়ে যাচ্ছে যেন অন্ধকারের বন্যা!

এরই মধ্যে কুমার কখন জ্ঞান ফিরে পেলে।

অনুভবে বুঝলে, তার দেহটা দুমড়ে কার কাঁধের উপরে পড়ে রয়েছে।

সে একটু নড়বার চেষ্টা করতেই একখানা লোহার মতো শক্ত হাতে তাকে টিপে ধরে কে কর্কশ স্বরে বললে, 'চুপ। ছটফট করলেই টুঁটি টিপে মেরে ফেলব!'—তার হাতের চাপেই কুমারের কোমরটা বিষম ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল!

ভীমের মতো গায়ের জোর,—কে এই ব্যক্তি? কাঁধে করে কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কুমারের ইচ্ছা হল, তার মুখখানা একবার দেখে নেয়। কিন্তু যা ঘুটঘুটে অন্ধকার!

পায়ের শব্দে বুঝলে, তার আশে-পাশে আরো অনেক লোক আছে। কে এরা? ভুলু-ডাকাতের দল? কিন্তু এত লোক থাকতে এরা তাকে বন্দী করলে কেন? তাকে নিয়ে এরা কি করতে চায়?

অন্ধকারের ভিতর থেকে কে বললে, 'বাপরে বাপ, এত অন্ধকার তো কখনো দেখি-নি! পথ চলা যে দায় হয়ে উঠল, আলো জ্বালব নাকি?'

যে তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে বললে, 'খবরদার নিশে, আলো জ্বালবার নাম মুখেও আনিস নে! পুলিশের লোক যদি পিছু নিয়ে থাকে, তাহলে আলো জ্বাললেই ধরা পড়বি! তার ওপরে এই ছোকরাকে আমি আমার মুখ দেখাতে চাই না।'

আর একজন বললে, 'ওকে মুখই বা দেখাবে কেন, আর অমন করে বয়েই বা মরছ কেন? দাও না এক আছাড়ে সাবাড় করে।'

—'ভোঁদা ব্যাটার বাপ ছেলের ঠিক নামই রেখেছিল। ভোঁদা নইলে অমন বুদ্ধি হয়! ওরে গাধা, আমি কি শখ করে এ ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে করে বয়ে মরছি?'

—'ওকে নিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে?'

—'ওরে ব্যাটা ভোঁদা, তোর চেয়ে ভোঁদড়ও চালাক দেখছি! এ ছোঁড়াকে নিয়ে কি করব, এতক্ষণে তাও বুঝিস নে? শোন্ তবে! আপাতত এ ছোঁড়া আমাদের আড্ডায় বন্দী থাকবে। আসছে অমাবস্যায় ডাকাতি করতে বেরুবার আগে মা-কালীর সামনে একে বলি দেব। মা বোধহয় আমাদের ওপরে রেগেছেন। তিনি মুখ ফিরিয়েছেন বলেই এ-যাত্রা আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল। এমন তো কখনো হয় না। মা নিশ্চয় নরবলি চান!'

লোকটার মুখের কথা শেষ হতে-না হতেই ভীষণ এক ব্যাঘ্রের গর্জনে আকাশের মেঘ আর অরণ্যের অন্ধকার যেন থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—বার বার তিনবার! তারপরেই সব চুপচাপ।

মহা-আতঙ্কে কম্পিতকণ্ঠে কে বললে, 'সর্দার!'

—'হুঁ।'

—'বাঘ!'

—'না, আমাদের মা বাঘাই-চণ্ডী! বললুম তো, মায়ের ক্ষিদে পেয়েছে, মা নরবলি চান! তোরা তো মাকে খেতে দিলি-নে, মা তাই নিজেই ক্ষিধে মেটাতে এসেছেন!'

—'কিন্তু মা যে আমাদেরই কাকে ধরে নিয়ে গেলেন! এ কি-রকম মা, নিজের পেটের ছেলেকে পেটে পুরবেন?'

—'ক্ষিধের সময়ে আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না রে ভোঁদা, আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না! আর কে-ই বা মায়ের ছেলে নয়,—মা তো জগৎজননী, সবাই তো মায়ের ছেলে!'

কুমার চুপ করে সব কথা শুনে যাচ্ছিল। নিজের পরিণামের কথাও শুনলে। বলির পশুর মতো তাকে মরতে হবে! তার মনটা যে খুব খুশি হয়ে উঠল না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সর্দার বলে যাকে ডাকা হচ্ছে, তাকে যে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে এই লোকটা? কি ভুলু-ডাকাত? না তার প্রধান অনুচর কালু-সর্দার?

বিমলের কথা তার মনে হলো। সে এখন কলকাতায়। তার বন্ধু যে আজ মরণের পথে এগিয়ে চলেছে, এ-কথা সে জানেও না। কুমারের মনে এখন অনুতাপ হতে লাগল, কেন সে বিমলের জন্যে অপেক্ষা করেনি? কেন সে একলা এই বিপদের রাজ্যে এল? বিমল যদি আজ এখানে থাকত, তাহলে নিশ্চয় সে প্রাণপণে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করত—আর খুব-সম্ভব তাকে উদ্ধার করতে পারতও। হয়তো—

আচম্বিতে কি যে হল, কেবল এইটুকুই তার মনে হল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হুস করে সে নিচের দিকে নেমে গেল, তারপরেই ঝপাং করে একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে, সে আর মাটির উপরে নেই, জলের ভিতরে গিয়ে পড়েছে!

—একেবারে এক গলা জল! যে লোকটার কাঁধে চড়ে এতক্ষণ সে যাচ্ছিল, সেও এখন জলের মধ্যে! .....নিজেকে সামলে নিয়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তার সঙ্গের লোকটা একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

উপরপানে তাকিয়ে দেখলে খালি ঘুট্‌ঘুট্ করছে অন্ধকার। তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

আবার চারিদিক হাতড়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তারা একটা গভীর গর্তের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের বাসিন্দারা বাঘ ধরবার জন্যে বনের মাঝে মাঝে গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখটা ঘাস-পাতা-গাছপালা দিয়ে ঢেকে রাখে। এটা নিশ্চয়ই সেই রকম কোনো গর্ত।

কুমার কান পেতে শুনতে লাগল। ডাকাতের কোনো সাড়াশব্দ নেই। তাদের সর্দার যে মা বাঘাই-চণ্ডীর বলি নিয়ে গর্তের মধ্যে কুপোকাৎ, এ-কথা নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে অন্ধ হয়ে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটু পরেই তো তারা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারবে! তখন আবার তারা সদলবলে ফিরে আসবে!

যদি পালাতে হয় তো এই হচ্ছে পালাবার সময়।

কিন্তু চারিদিককার দেওয়ালে হাত বুলিয়ে কুমার বুঝলে, দেওয়াল খাড়াভাবে উপরে উঠেছে—সাপ আর টিক্‌টিকি না হলে তা বেয়ে উপরে ওঠা অসম্ভব।

সে হতাশ হয়ে পড়ল।

...হঠাৎ উপরে কার দ্রুত পায়ের শব্দ হল,—মাত্র একজনের পায়ের শব্দ!

কে এ? ডাকাতরা কি আবার ফিরে এল? কিন্তু তারা এলে তো দল বেঁধে ফিরে আসবে!

তবে কি এ পুলিশের চর? ডাকাতদের পিছু নিয়েছে?

যা থাকে কপালে—এই ভেবে কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে, 'কে যায়? আমি গর্তের ভেতরে পড়ে গেছি, আমাকে বাঁচাও!'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। কুমার আবার চেঁচিয়ে বললে, 'আমি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি—আমাকে বাঁচাও!'

তখনো জবাব নেই।

কিন্তু হঠাৎ কুমারের মুখের উপরে কি একটা এসে পড়ল,—ঠিক একটা সাপের মতো।

কুমার সভয়ে চম্‌কে উঠল—কিন্তু তার পরেই বুঝলে, উপর থেকে গর্তের ভিতরে একগাছা মোটা দড়ি ঝুলছে!

কুমার বিস্মিত হবারও অবকাশ পেলে না—তাড়াতাড়ি দড়িগাছা চেপে ধরতেই উপর থেকে কে তাকে টেনে তুলতে লাগল।

পাতাল ছেড়ে পৃথিবীর উপরে এসে দড়ি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে কুমার উল্লসিত কণ্ঠে বললে, 'কে তুমি ভাই, আমাকে যমের মুখ থেকে বাঁচালে?'

কারুকে দেখা গেল না—খালি অন্ধকার! কোনো জবাব এল না,—খালি শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ। কে যেন সেখান থেকে চলে গেল। যেন ভৌতিক কাণ্ড।

কে এই অজ্ঞাত ব্যক্তি? কেন সে তার সঙ্গে কথা কইলে না, কেন সে পরিচয় দিলে না, কেন সে তাঁকে বাঁচিয়ে এমন করে চলে গেল? এ কী আশ্চর্য রহস্য!

খানিক তফাৎ থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।...ডাকাতরা ফিরে আসছে! তারা বুঝতে পেরেছে, সর্দার আর তাদের দলে নেই!

কুমার বেগে অন্য দিকে দৌড় দিলে।

আট

পটলবাবুর বাড়ি

অমাবস্যার রাতে সেই রোমাঞ্চকর 'অ্যাডভেঞ্চারে'র পর কুমারের গায়ের ব্যথা মরতে গেল এক হপ্তারও বেশি।

সেদিন সকাল-বেলায় থানার সামনের মাঠে পায়চারি করতে করতে কুমার নানান কথা ভাবছিল।

নানান ভাবনার মধ্যে তার সবচেয়ে-বড় ভাবনা হচ্ছে , বাঘের গর্তের ভিতর থেকে যে তাকে সেদিন উদ্ধার করলে, কে সেই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই সে ডাকাতদের দলের কেউ নয়। গাঁয়ের ভিতরও কুমারের এমন কোনো বন্ধু নেই (একমাত্র চন্দ্রবাবু ছাড়া), তার জন্যে যার এতটা মাথাব্যথা হবে! এই রহস্যময় ব্যক্তি তার প্রাণরক্ষা করলে, অথচ তাকে দেখাই বা দিলে না কেন?

সে-রাতের সব ব্যাপারের সঙ্গেই গভীর রহস্যের যোগ আছে! সে স্বচক্ষে বাঘ দেখলে, বন্দুক ছুঁড়লে, অথচ জখম হলেন পটলবাবু! বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে, অথচ পটলবাবু বলেন, সেখানে বাঘ আসেনি!

কুমার মনে মনে এমনি সব নাড়াচাড়া করছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, পথ দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলেছে মোহনলাল।

মোহনলালও তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'এই যে কুমারবাবু, নমস্কার! শুনলাম নাকি আপনি মস্ত বিপদে পড়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ যেমন বিপদে পড়েছিলুম, তেমনি হঠাৎ উদ্ধারও পেয়েছি!'

মোহনলাল বললে, 'আমি বরাবরই দেখে আসছি কুমারবাবু বিপদের যারা তোয়াক্কা রাখে না, বিপদও যেন তাদের এড়িয়ে চলে।'

কুমার একটু হেসে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্তত আমার জীবনে বারবার তাই-ই হয়েছে বটে! ...কিন্তু এত সকালে আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

মোহনলাল বললে, 'একবার পটলবাবুকে দেখতে যাচ্ছি। সেদিন আর একটু হলেই তো পটলবাবু আপনার হাতেই পটল তুলেছিলেন। নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই বেচারী এ-যাত্রা বেঁচে গেলেন। ভদ্রলোক কেমন আছেন সেই খোঁজ নিতেই চলেছি।'

কুমার লজ্জিতভাবে বললে, 'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গী হব। আমার জন্যে তাঁর এই দুর্দশা, তার খবর নেওয়া আমার কর্তব্য।'

মোহনলালের সঙ্গে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে কুমার শুধোলে, 'আচ্ছা মোহনবাবু, সেদিন যে আমি সত্যি-সত্যিই বাঘ দেখে বন্দুক ছুঁড়েছি, এ-বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ আছে কি?'

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে মোহনলাল বললে, 'একটুও না—একটুও না! তার প্রমাণও দেখুন'—বলেই সে পকেট থেকে কাগজের ছোট এক মোড়ক বার করলে।

মোড়কের ভিতরে রয়েছে একগোছা লোম। বাঘের লোম।

কুমার বিস্মিতভাবে বললে, 'এ লোম আপনি কোথায় পেলেন?'

—'আপনার গুলি খেয়ে পটলবাবু যেখানে পড়ে ছটফট করছিলেন, সেইখানে।'

—'লোমগুলোতে এখনো শুকনো রক্তও লেগে রয়েছে দেখছি।'

—'হ্যাঁ, এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার গুলি বাঘের গায়েও লেগেছে!'

কুমার বললে, 'তা না হতেও পারে। হয়তো পটলবাবুর আহত পায়ের রক্তই, লোমগুলোতে লেগে আছে।'

—'না কুমারবাবু, এ মানুষের রক্ত নয়।'

—'কি করে জানলেন আপনি?'

মোহনলাল গম্ভীরস্বরে বললে, 'আমি পরীক্ষা করে দেখেছি!'

—'পরীক্ষা? শুকনো রক্তের দাগে কি লেখা থাকে যে তা মানুষ না পশুর রক্ত?'

—'থাকে কুমারবাবু, থাকে। আপনি কি "Bordet Reaction"-এর কথা শোনেন নি? Bordet সাহেব একরকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে শুকনো রক্তের দাগ পেলেই বলে দেওয়া যায়, তা মানুষ কি পশুর রক্ত!'

—'আর সে পদ্ধতি আপনি জানেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা করে বুঝেছি, এ রক্ত মানুষের রক্ত নয়।'

কুমার বিস্ময়ে ও নিজের অজ্ঞতায় নির্বাক হয়ে রইল। তার চোখে মোহনলাল আজ নূতন রূপে ধরা দিলে! সে বেশ বুঝলে, এ ব্যক্তি তো সাধারণ লোক নয়—নিশ্চয়ই এ অনেক ব্যাপারই জানে এবং বোঝে ; এবং এ যে এখানে এসেছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনো গূঢ় কারণ আছে!

খানিকক্ষণ পরে কুমার বললে, 'বাঘের ডাক শুনলুম, তাকে দেখলুম, গুলি করলুম, সে আহত হল, তার রক্তও পাওয়া গেল,—কিন্তু তার পর? কর্পূরের মতো সে বাঘ কোথায় উবে গেল?'

মোহনলাল চিন্তিত মুখে বললে, 'সেইটেই তো হচ্ছে আসল প্রশ্ন! একটা মস্ত বাঘ তার আস্ত দেহ নিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়?'

—'আর তাঁর সেই খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে পটলবাবুই-বা চোখের নিমিষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কেমন করে?'

হো হো করে হেসে উঠে মোহনলাল বললে, 'প্রাণের দায়ে অসম্ভবও সম্ভব হয়—কচ্ছপও দৌড়ে হরিণকে হারিয়ে দিতে পারে! তবে পটলবাবু হয়তো ডাকাতদের ভয়ে পিটটান দেন নি।'

—'তবে?'

—'আপনার ভয়েই তিনি বোধ হয় একটিমাত্র ঠ্যাঙে ভর দিয়েই লম্বা দিয়েছিলেন।'

—'আমার ভয়ে?'

—'হ্যাঁ। আপনার লক্ষ্যভেদ করবার শক্তির ওপরে হয়তো তাঁর মোটেই বিশ্বাস নেই। একবার বাঘ বধ করতে গিয়ে আপনি তাঁর পা খোঁড়া করে দিয়েছিলেন, তারপর আবার ডাকাত মারতে গিয়ে আপনি যে তাঁরই প্রাণপাখিকে খাঁচাছাড়া করতেন না, সেটা তিনি ভাবতে পারেন নি। কাজে কাজেই 'যঃ পলায়তি স জীবতি'! পটলবাবু বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন।'

কুমার অপ্রতিভ হয়ে মাথা হেঁট করলে।

মোহনলাল তার পর যেন নিজের মনে-মনেই বললে, 'কিন্তু এ কিরকম কথা? বাঘের গায়ে লাগল গুলি, বাঘ হল জখম, তবে পটলবাবুর পা কেমন করে খোঁড়া হল?'

তাই তো, এ কথাটা তো কুমার এতক্ষণ ভেবে দেখেনি! এও বা কেমন করে সম্ভব হয়?

এখানকার সমস্ত কাণ্ডই যেন আজগুবি, এ বিপুল রহস্যের সমুদ্রে যেন কিছুতেই থই পাবার জো নেই!

তারা পটলবাবুর বাড়ির মুখে এসে হাজির হল।

পটলবাবুকে প্রথম দেখে কুমারের যেমন মনে হয়েছিল—শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে দেখছে, তেমনি পটলবাবুর বাড়িখানাকেও দেখে কুমারের মনে হল—এ যেন কার বিজন সমাধিভবন!

চারি ধারে ঝোপঝাপ, ঘন বাঁশঝাড়, পোড়ো জমি; এক-কোণে একটা পচা ডোবা; মাঝখানে একটা পানা-ধরা পুকুর—এক সময়ে তার সব দিকেই বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন তার একটাও টিকে নেই। সেই পুকুরেরই পূর্বদিকে পটলবাবুর জীর্ণ, পুরোনো ও প্রকাণ্ড বাড়িখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভাবছে, এইবারে কবে সে একেবারে হুড়্‌ মুড়্‌ করে ভেঙে পড়বে। এ বাড়িকে কেবল বাড়ি বললেই ঠিক বলা হবে না, একে অট্টালিকা বলাই উচিত—সাত-মহলা অট্টালিকা! কিন্তু তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ চালিয়ে খালি দেখা যায়, নোনা-ধরা, ক্ষয়ে-যাওয়া, বালি-খসা ইটগুলো যেন ছাল-ওঠা ঘায়ের মতন লাল হয়ে আছে! অজগর সাপের মতন শিকড় দিয়ে দেওয়ালকে জড়িয়ে বড়ো-বড়ো সব গাছ হাওয়ার ছোঁয়ায় শিউরে আর্তনাদ করে উঠছে,—এক-একটা গাছ এত বড়ো যে, তার ডাল বেয়ে আট-দশজন মানুষ উঠলেও তারা নুয়ে পড়বে না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'এ তো বাড়ি নয়, এ যে শহর! পটলবাবুর পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় খুব ধনী ছিলেন?'

মোহনলাল বললে, 'জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, এ বাড়ি পটলবাবুর পূর্বপুরুষের নয়। পটলবাবু এ গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছেন মোটে তিন বছর। এই পোড়ো বাড়ি আর জমি তিনি জলের দরে কিনে নিয়েছেন।'

—'বাড়িখানাকে কিনে এর এমন অবস্থা করে রেখেছেন কেন?'

—'এত বড়ো বাড়ি মেরামত করতে গেলেও কত হাজার টাকার দরকার, তা কি বুঝতে পারছেন না? বাড়িখানার একটা মহলই পটলবাবুর পক্ষে যথেষ্ট। সেই অংশটুকু মেরামত করে নিয়ে পটলবাবু সেইখানেই থাকেন।'

—'কিন্তু এ বাড়ি আগে কার ছিল, আপনি কি জানেন?'

—'সে খোঁজও আমি নিয়েছি। বাংলা দেশের অনেক বড়ো-বড়ো জমিদারের পূর্বপুরুষ ডাকাত ছিলেন। প্রায় তিনশো বছর আগে এমনি এক ডাকাত-জমিদার এই বাড়িখানা তৈরি করিয়েছিলেন। এরকম সেকেলে বাড়ির ভেতরে অনেক রহস্য থাকে। আমরা খোঁজ নিলে আজও তার কিছু-কিছু পরিচয় পেতে পারি।'

বাড়ির সদর দরজা এমন মস্ত যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতি ঢুকতে পারে। এতকাল পরেও দরজার লোহার-কিল-মারা পুরু পাল্লা দুখানা একটুও জীর্ণ হয়ে পড়ে নি!

মোহনলালের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে কুমার বললে, 'পটলবাবু কোন অংশে থাকেন, আপনি জানেন তো?'

—'জানি। কিন্তু তার আগে বাড়ির অন্য অন্য মহলগুলো একবার বেড়িয়ে এলে আপনার কষ্ট হবে কি?'

কুমার পরম উৎসাহিত হয়ে বললে, 'কিছু না—কিছু না! বলতে কি, আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। কিন্তু, পটলবাবুকে আগে তো সেটা একবার জানানো দরকার?'

—'কোনো দরকার নেই ; পটলবাবুর মহল একেবারে আলাদা, তার দরজাও অন্য দিকে। এ মহলগুলোয় জনপ্রাণী বাস করে না, এগুলো এমনি খোলাই পড়ে থাকে, এর মধ্যে যে কেউ ঢুকতে পারে—কত শেয়াল-কুকুর আর সাপ যে এর ভেতরে বাসা বেঁধে আছে, কে তা বলতে পারে?'

একে একে তারা তিন-চারটে মহল পার হল—বাড়ির ভেতরের অবস্থাও তথৈবচ! বড়ো-বড়ো উঠান, দালান, চক-মিলানো ঘর, কারুকাজ করা খিলান, কার্নিশ, থাম ও দরজা—কিন্তু বহুকালের অযত্নে আর কোথাও কোনো শ্রী নেই! ঘরে ঘরে বাদুড় দুলছে, চামচিকে উড়ছে, কোলাব্যাঙ লাফাচ্ছে, পথ দিয়ে চলতে গেলে জংলা গাছপালা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা দেয়, ঘুমন্ত সাপ জেগে রেগে ফোঁস্ করে ওঠে, তফাতে তফাতে পলাতক জানোয়ারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়!···মাঝে মাঝে সব অলিগলি, শুঁড়িপথ—তাদের ভেতরে কষ্টিপাথরের মতো জমাট-বাঁধা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, সেই-সব অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে যেন ভীষণ সব চোখের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে—সে হিংসুক, ক্ষুধিত দৃষ্টিগুলো যেন মানুষের রক্তপান করবার জন্যে দিবারাত্র সেখানে জাগ্রত হয়ে আছে!···আর সে কী স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতাকে যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়!

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'দেখুন মোহনবাবু, মাটির দিকে চেয়ে দেখুন!'

মাটির পানে তাকিয়েই একটি লাফ মেরে মোহনলাল বলে উঠল, 'অ্যাঁঃ! আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি যে, এটা দেখতে না পেয়ে বোকার মতো এগিয়ে চলেছি! ভাগ্যিস আপনি দেখতে পেলেন!'—বলেই সে আগ্রহ-ভরে মাটির উপরে হেঁট হয়ে পড়ল!

মাটির উপর দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলেছে বাঘের বড়ো-বড়ো থাবার চিহ্ন!

সেই পায়ের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে মোহনলাল আর কুমার গিয়ে দাঁড়াল একটা শুঁড়িপথের সামনে। সেখানে আবার নূতন ও পুরাতন অসংখ্য পায়ের দাগ—দেখলেই বেশ বোঝা যায়, ব্যাঘ্র মহাশয় সেখানে প্রায়ই বেড়াতে আসেন।

মোহনলাল বললে, 'পটলবাবুর এই রাজপ্রাসাদে যে এত-বেশি বাঘের আনাগোনা, গাঁয়ের কেউ তো সে খবর জানে না।'

চিড়িয়াখানার বাঘের ঘরে যেরকম দুর্গন্ধ হয়, শুঁড়িপথের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠিক সেইরকম একটা বিশ্রী, বোট্‌কা গন্ধ বাইরে বেরিয়ে আসছে!

মোহনলাল একবার সেই ভয়াবহ শুঁড়িপথের ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর ফিরে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমারবাবু, এর ভেতরে ঢোকবার সাহস আপনার আছে?'

কুমার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

—'তা হলে আমার সঙ্গে আসুন'—বলেই মোহনলাল বিনা দ্বিধায় সেই অন্ধকারে অদৃশ্য বিপদ ও রহস্যে পূর্ণ শুঁড়িপথের ভিতরে প্রবেশ করল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এগুল কুমার—অটল পদে, নির্ভীক প্রাণে।

নয়
মরণের সামনে

মোহনলাল যে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান ও রহস্যময় ব্যক্তি, আজকে তার সঙ্গে ভালো করে কথা কয়ে কুমার এটা তো বেশ বুঝতে পারলোই, তার উপরে তার বুকের পাটা দেখে সে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কুমার আর একজন মাত্র লোককে জানে, এরকম মরিয়ার মতো সে এমনই মৃত্যুভয়-ভরা অজানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভালোবাসে। সে হচ্ছে তার বন্ধু বিমল। ছেলেবেলা থেকেই বিপদের পাঠশালায় সে মানুষ।

কিন্তু মোহনলাল কেন যে যেচে এই মৃত্যু খেলায় যোগ দিয়েছে, কুমার সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না। সেও কি তাদেরই মতো সখ করে নিরাপদ বিছানার আরাম ছেড়ে চারিদিকে বিপদকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, না নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অমাবস্যার রাতের এই ভীষণ গুপ্তকথাটা সে জানতে চায়?

কিন্তু এখন এ-সব কথা ভাববার সময় নয়। কী ভয়ানক শুঁড়িপথ-এ? কয়েক পা এগিয়েই কুমার দেখলে, গলির মুখ দিয়ে বাইরের একটুখানি যে আলোর আভা আসছিল, তাও অদৃশ্য হয়ে গেছে! এখন খালি অন্ধকার আর অন্ধকার—সে নিবিড় অন্ধকারের প্রাচীর ঠেলে কোনো মানুষের চোখই কোনো দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

শুঁড়িপথের দু দিকের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল এত বেশি স্যাঁৎসেঁতে যে, হাত দিতেই কুমারের হাত ভিজে গেল! আর সেই জানোয়ারি বোঁটকা গন্ধ! নাকে খুব কষে কাপড়-চাপা দিয়েও কুমারের মনে হতে লাগল, তার পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত আজ বোধ হয় উঠে আসবে!

মোহনলালের হাতে, সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটা ছোটো ইলেক্‌ট্রিক্ লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কুমার বুঝলে, মোহনলাল রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু, আপনার কাছে কোনো অস্ত্র-টস্ত্র আছে?'

—'না।'

—'আপনি দেখচি আমার চেয়েও সাহসী! নিরস্ত্র হয়ে এই ভীষণ স্থানে ঢুকতে ভয় পেলেন না?'

—'আপনিও তো এখানে ঢুকেছেন, আপনিও তো বড়ো কম সাহসী নন!'

—'কিন্তু আমার কাছে রিভলভার আছে।' বলেই মোহনলাল ফস্ করে হাতের আলোটা নিবিয়ে ফেললে।

—'ও কি, আলো নেবালেন কেন?'

—'একবার খালি দেখে নিলুম, পথটা কিরকম। অজানা পথ না হলে এখানে আলো জ্বালতুম না—শত্রুর দৃষ্টির আকর্ষণ করে লাভ কি?'

—'শত্রু?'

—'হ্যাঁ। এই পথের মাটির ওপর আলো ফেলে এই মাত্র দেখলুম যে, এখানে খালি বাঘের পায়ের দাগই নেই, মানুষের পায়ের দাগও রয়েছে!'

—'একসঙ্গে বাঘের আর মানুষের পায়ের দাগ? বলেন কি!'

—'চুপ! আর কথা নয়। হয়তো কেউ আমাদের কথা কান পেতে শুনছে।'

অত্যন্ত সতর্কভাবে পা টিপে টিপে দুজনে এগুতে লাগল—অন্ধকার যেন হাজার হাত বাড়িয়ে ক্রমেই বেশি করে তাদের চেপে ধরছে, বদ্ধ-বাতাস দুর্গন্ধে যেন ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে, কি-একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক যেন তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে! কুমারের মনে হল, সে যেন পৃথিবী ছেড়ে কোনো ভুতুড়ে জগতের ভিতরে প্রবেশ করছে—এ পথ যেন যমালয়ের পথ, প্রেতাত্মা ছাড়া আর কেউ যেন এ পথে কোনোদিন পথিক হয় নি!

আচম্বিতে মাথার উপর দিয়ে বদ্ধ-বাতাসের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার চঞ্চল তরঙ্গ তুলে ঝট্‌পট্ করে কারা সব চলে গেল! সমাধির নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ সেই শব্দ শুনে কুমারের বুকের কাছটা ধড়্‌ফড়িয়ে উঠল,—কিন্তু তার পরেই বুঝলে, এই মৃত জগতে জীবন্তের সাড়া পেয়ে বাদুড়েরা দলে দলে উড়ে পালাচ্ছে!

আরো কিছুদূর এগিয়েই মোহনলাল চুপি চুপি বললে, 'এখানে একটা দরজা আছে বোধ হয়'—বলেই সে আবার এগিয়ে গেল।

অন্ধকারে হাত বুলিয়ে কুমারও বুঝলে, দরজাই বটে! তার পাল্লা দুটো খোলা। সেও চৌকাঠ পার হয়ে গেল। তার পর দুদিকে হাত বাড়িয়েও আর দেওয়াল খুঁজে পেলে না। শুঁড়িপথ তা হলে শেষ হয়েছে!

কিন্তু তারা কোথায় এসেছে? এটা ঘর, না অন্য-কিছু? এখানেও দুর্গন্ধের অভাব নেই, উপর-পানে চাইলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—কিন্তু কুমার অনুভব করলে যে শুঁড়িপথের থমথমে বদ্ধ-বাতাস আর এখানে স্তম্ভিত হয়ে নেই।

তারা দুজনেই সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে খানিকক্ষণ কান পেতে রইল এবং অন্ধকারের মধ্যে দেখবার কোনো-কিছু খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছু দেখাও যায় না, কিছু শোনাও যায় না! যেন দেহশূন্য মৃতের রাজ্য!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মোহনলাল আবার তার ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠনটা জ্বাললে।

এটা প্রকাণ্ড একটা হল-ঘরের মতো, কিন্তু এটা ঘর নয়, কারণ ঘর বলতে যা বোঝায়, এ-জায়গাটাকে তা বলা যায় না। এটা একটা প্রকাণ্ড উঠোনের চেয়েও বড়ো জায়গা, কিন্তু মাথার উপরে রয়েছে ছাদ। মাঝে মাঝে থাম—ছাদের ভার রয়েছে তাদের উপরেই।

হঠাৎ মোহনলাল সবিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে উঠল! তার পরেই কুমারের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'দেখুন কুমারবাবু, দেখুন!'

কী ভয়ানক!··· কুমার রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট নেত্রে দেখলে, তাদের কাছ থেকে হাত-দশেক তফাতেই পড়ে রয়েছে একটা মড়ার মাথা। এবং সেই মাথাটার পাশেই মাটির উপরে এলানো রয়েছে স্ত্রীলোকের মাথার একরাশি কালো চুল!

খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে মোহনলাল বললে, 'ঐ মড়ার মাথা থেকেই ও-চুলগুলো খসে পড়েছে। ও-মাথাটা নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোকের!'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ। এখনো ও-মাথাটার আশে-পাশে কিছু-কিছু চুল লেগে রয়েছে। যার ঐ মাথা, নিশ্চয়ই সে বেশিদিন মরে নি!'

মোহনলাল দুঃখিত স্বরে বললে, 'অভাগীর মৃত্যু হয়েছে হয়তো কোনো অমাবস্যার রাতেই!'

কুমার সচমকে প্রশ্ন করলে, 'কী বলছেন আপনি?'

মোহনলাল বিরক্তভাবে বললে, 'কুমারবাবু, অমাবস্যার রাতের রহস্য বোঝবার জন্যে আপনার এখানে আসা উচিত হয় নি! আপনি নিজের চোখকে যখন ব্যবহার করতে শেখেন নি, তখন এ রহস্যের কিনারা করবার শক্তিও আপনার নেই! আপনি জানেন যে, বাঘের কবলে পড়ে এখানে অনেক স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়েছে। আমাদের সামনে যে মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে, ওটা যে কোনো স্ত্রীলোকের মাথা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।··· তার উপরে, আপনি কি এও দেখতে পাচ্ছেন না যে, এ জায়গাটার নরম মাটির উপরে চারিদিকেই রয়েছে বাঘের থাবার দাগ? দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে কি হয় তা জানেন তো? চার! এ মড়ার মাথাটা হচ্ছে, দুই! আর বাঘের থাবার দাগ হচ্ছে, দুই! এই দুই আর দুইয়ে যোগ করুন, চার ছাড়া আর কিছুই হবে না! অমাবস্যার রাতে এখানে বাঘের উপদ্রব না হলে আমরা আজ ঐ মড়ার মাথাটাকে কখনোই এ-জায়গায় দেখতে পেতুম না!'

অপ্রতিভ কুমার মাথা হেঁট করে মোহনলালের এই বক্তৃতা নীরবে সহ্য করলে। মোহনলালের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে আজ সে হার না মেনে পারলে না।

মোহনলাল লণ্ঠনটা সামনের দিকে এগিয়ে আবার বললে, 'কুমারবাবু, ওদিকটাও দেখেছেন কি?'

খানিক তফাতে দেখা গেল, একরাশ হাড়ের স্তূপ! মানুষের হাতের হাড়, পায়ের হাড়, বুকের হাড়, মাথার খুলি! কত মানুষের হাড় যে ওখানে জড় করা আছে, তা কে জানে!—দেখলেই বুক ধড়াস্ করে ওঠে!—এ যে মড়ার হাড়ের দেশ! যাদের ঐ হাড়, তাদের অশান্ত প্রেতাত্মারাও কি আজ এই অন্ধকার কোটরের আনাচে-কানাচে আনাগোনা করছে, নিজেদের দেহের শুকনো হাড়গুলোকে আবার ফিরে পাবার জন্যে?

কেন সে জানে না, কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠনের আলোক-রেখার ওপারে গাঢ় কালো অন্ধকার যেখানে এই চিররাত্রির আলোকহীন গর্তের মধ্যে থমথম করছে, সেখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মানুষের চোখে অদৃশ্য হয়ে কারা সব প্রেতলোকের নিঃশব্দ ভাষায় ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে!—

—এতক্ষণ ঐ বীভৎস অস্থি-স্তূপের চার পাশে সার বেঁধে বসে যেন তারা নিজেদের মৃতদেহের হাড়গুলো খুঁজে বার করবার জন্যে হাতড়ে দেখছিল, এখন মানুষের হাতের আলোর ছোঁয়া লাগবার ভয়ে তারা সবাই অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে!

কুমার আর থাকতে না পেরে, দুই হাতে মোহনলালের দুই কাঁধ প্রাণপণে চেপে ধরে বললে, 'মোহনবাবু! আর নয়, এখানে আর আমি থাকতে পারছি না—আকাশের আলোর জন্যে প্রাণ আমার ছট্‌ফট্ করছে, চলুন—বাইরে যাই চলুন!'

মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু, আমারও মনটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে! মনে হচ্ছে যেন ভগবানের চোখ কখনো এই অভিশপ্ত অন্ধকারের ভিতরে সদয় দৃষ্টিপাত করে নি, জ্যান্ত মানুষ যেন কখনো এখানে আসতে সাহস করে নি!···আমিও আপনার মতো বাইরে যেতে পারলেই বাঁচি—কিন্তু তার আগে, একবার ওদিকটায় কি আছে, দেখে যেতে চাই।···আসুন!'

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার পর, হাত-ত্রিশ জমি পার হয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুমার আশ্চর্য নেত্রে দেখলে, সেখানেও উপরে ছাদ রয়েছে, কিন্তু সামনের দিকে নিচে আর মাটি নেই, থই থই করছে জল আর জল!

বাঁ দিকে দেওয়াল এবং সামনের দিকেও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট পরে আর-একটা খাড়া দেওয়াল। তারই ভিতরে একটা জলে পরিপূর্ণ দীর্ঘ খাল ডান দিকে সমান চলে গিয়ে অন্ধকারের ভিতরে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনো পাত্তা পাবার জো নেই!

কুমার অবাক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পিছন দিকে কেমন একটা অস্ফুট শব্দ হল।

মোহনলাল বিদ্যুতের মতো ফিরে হাতের লণ্ঠনটা সুমুখে এগিয়ে ধরলে! এবং তার পরেই লণ্ঠনের আলোটা নিবিয়ে দিল!

সে কী দৃশ্য! অনেক দূরে—শুঁড়িপথের যে-দরজা দিয়ে তারা এখানে এসেছে, সেই দরজার ভিতর দিয়ে দলে দলে কারা সব হলঘরের ভিতর এসে ঢুকছে! তাদের অনেকের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, কারুর হাতে বন্দুক এবং কারুর কারুর হাতে চকচক করছে বর্শা বা তরোয়াল! তাদের চেহারা কালো-কালো, গা আদুড় এবং চোখ দিয়ে ঝরছে যেন হিংসার অগ্নিশিখা!

কিন্তু মোহনলাল ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন নিবিয়ে ফেলবার আগেই আগন্তুকরা তাদের দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হাতের সমস্ত আলো নিভে গেল! তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ হল—গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম!

কুমার ও মোহনলালের আশপাশ দিয়ে তিন-চারটে বন্দুকের গুলি সোঁ-সোঁ করে চলে গেল!

মোহনলাল বলে উঠল, 'কুমারবাবু, লাফিয়ে পড়ুন—লাফিয়ে পড়ুন!'

—'কোথায়?'

—'এই খালের জলে! বাঁচতে চান তো লাফিয়ে পড়ুন'—বলেই মোহনলাল লাফ মারলে, সঙ্গে সঙ্গে কুমারও দিলে মস্ত এক লাফ।

ঝপাং, ঝপাং করে দুজনেই জলের ভিতর গিয়ে পড়ল!

মোহনলাল ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠনটা আর একবার জ্বালিয়ে বললে, 'এ জলে দেখছি স্রোতের টান। নিশ্চয়ই কোনো নদীর সঙ্গে এর যোগ আছে! সাঁতার দিয়ে স্রোতের টানের সঙ্গে ভেসে চলুন!'

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই হাত কয়েক তফাতে জল তোলপাড় করে প্রকাণ্ড কি-একটা ভেসে উঠল!

কুমার সভয়ে বললে, 'কুমির, কুমির!'

দশ

রহস্য বাড়ছে

অন্ধকার!

সামনে দপ্ দপ্ করে দু-টুকরো আগুন জ্বলছে! সে দুটো কুমিরের চোখ, না সাক্ষাৎ মৃত্যুর চোখ?

ওপাশ থেকে মোহনলালের স্থির, গম্ভীর অথচ দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুমারবাবু! টপ্ করে ডুব দিন। ডুব-সাঁতার দিয়ে যতটা পারেন ভেসে যান। আবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়ে ডুব দিয়ে অন্য দিকে এগিয়ে যান। এইভাবে একবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলুন!'

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই সামনের আগুন-চোখদুটো নিবে গেল। কুমার বুঝলে, কুমির শিকার ধরবার জন্যে ডুব দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেও দিলে ডুব। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জলের তলা দিয়ে ডান দিকে যতটা পারলে সাঁতরে এগিয়ে গেল। তারপর ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়েই আবার ডুব দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেল। এমনি করেই বারংবার ভেসে এবং বারংবার ডুবে এঁকেবেঁকে কুমার অনেকক্ষণ সাঁতার দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে লাগল, মোহনলাল বিপদেও কী অটল! কী তার স্থির বুদ্ধি। সামনে ভীষণ কুমির দেখে সে যখন ভয়ে ভেবড়ে পড়েছে, মোহনলালের মাথা তখন বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করছে! মোহনলাল যে-কৌশল তাকে শিখিয়ে দিলে সেটা সেও জানত, কিন্তু কুমিরের মুখে পড়ে তার কথা সে স্রেফ ভুলে গিয়েছিল!

কুমিররা লক্ষ্য স্থির করে জলের উপরে ভেসে উঠেই তার পর ডুব দিয়ে ঠিক লক্ষ্য স্থলে গিয়ে শিকার ধরে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাকে সে ধরবে, সে যদি স্থান-পরিবর্তন করে, তা হলে কুমির তাকে আর ধরতে পারে না!

খানিকক্ষণ পরেই কুমার দেখলে যে সামনের দিকে দূরে দিনের ধবধবে আলো দেখা যাচ্ছে! তা হলে ঐটেই হচ্ছে সুড়ঙ্গখালের মুখ?

কিন্তু পিছনে কালো জল তোল্‌পাড় করে যে নির্দয় মৃত্যু তখনো এগিয়ে আসছে, তার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাকে তখনি আবার ডুব দিতে হল, আলো দেখে খুশি হবার বা মোহনলালের খোঁজ নেবার অবসর কুমারের এখন নেই!

সুড়ঙ্গ-খাল শেষ হল, কুমার বাইরের উজ্জ্বল সূর্য কিরণে এসে দেখলে, অদূরেই মোহনলালও নদীর উপরে ভেসে উঠল! ...কুমার বুঝলে, খাল কেটে গাঁয়ের কাজলা-নদীর জলই সেই প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এ-সব হচ্ছে সেকেলে ডাকাতদের কাণ্ড।

পিছনে তাকিয়েই দেখলে, সেই একগুঁয়ে কুমিরটাও জলের উপরে জেগে উঠল, মোহনলালের খুব কাছেই।

মোহনলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'ভারি তো জ্বালালে দেখছি! এ আপদ যে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না!' কুমির ও মোহনলাল আবার জলের তলায় অদৃশ্য হল।

এবারে কুমার আর ডুব দিলে না, কারণ সে বুঝে নিলে, কুমিরের লক্ষ্য এখন মোহনলালের দিকেই।

আবার মোহনলাল খানিকটা তফাতে গিয়ে ভেসে উঠল এবং কুমিরটাও ভেসে উঠল ঠিক সেইখানেই, একটু আগেই মোহনলাল যেখান থেকে ডুব মেরেছিল! আবার শিকার ফস্‌কেছে দেখে কুমিরটা নিষ্ফল আক্রোশে জলের ওপরে ল্যাজ আছড়াতে লাগল—মানুষ খেতে এসে তাকে এমন বিষম পরিশ্রম বোধ হয় আর কখনো করতে হয় নি!

মোহনলাল বললে, 'না, এ লুকোচুরি খেলা আর ভালো লাগছে না—দেখি, এতেও ব্যাটা ভয় পায় কি না!'—বলেই সে কুমিরের চোখ টিপ করে উপরি-উপরি তিনবার রিভলভার ছুঁড়ে সাঁৎ করে জলের তলায় নেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে কুমিরও অদৃশ্য!

রিভলভারের গুলিতে কুমির যে মরবে না, কুমার তা জানত। যত বড়ো জানোয়ারই হোক সাধ করে কেউ রিভলভারের গুলি হজম করতে চায় না। তাই এবার মোহনলাল ভেসে ওঠবার পরেও কুমিরটার ল্যাজের একটুখানি ডগা পর্যন্ত দেখা গেল না।

মোহনলাল বললে, 'মানুষ খাবার চেষ্টা করলে যে সব-সময়ে আরাম পাওয়া যায় না, কুমিরটা বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছে! অন্তত তার একটা চোখ যে কাণা হয়ে যায় নি, তাই-বা কে বলতে পারে?...চলুন, কুমারবাবু, আমরা ডাঙায় গিয়ে উঠি।'

তীরে উঠে মোহনলাল বললে, 'এসেছিলুম পটলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু আপনি কি বলেন কুমারবাবু, এ-অবস্থায় আমাদের কি আর কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত?'

কুমার বললে, 'পটলবাবুর সঙ্গে আর একদিন দেখা করলেই চলবে। আর সত্যিকথা বলতে কি, পটলবাবুর ওপরে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'পটলবাবুর বাড়ির ভেতরে আজ যা দেখলুম, তার সঙ্গে তাঁর যে যোগ নেই—এটা কি বিশ্বাস করা যায়?'

—'না, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু পটলবাবু তো অনায়াসেই বলতে পারেন যে, এই সেকেলে প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভাঙা ইটের রাশির ভেতরে কোনো মানুষ ভরসা করে পা বাড়ায় না। তিনি এর বার-মহলটাই মেরামত করে নিয়েছেন, এর ভেতরে তিনিও কোনোদিন ঢোকেন নি, সুতরাং এর মধ্যে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তা তিনি কেমন করে জানবেন?'

—'তিনি বললেই আমরা কি মেনে নেব?'

—'অগত্যা। না মেনে উপায় কি? আমাদের প্রমাণ কোথায়? বাড়ির ভাঙা মহলগুলো তো দিন রাতই খোলা পড়ে থাকে, বাইরের যে কোনো লোক যখন খুশি তার ভেতরে ঢুকতে পারে—যেমন আজ আমরা ঢুকেছিলুম, অথচ পটলবাবু কিছুই টের পান নি। ডাকাত বা অন্য কোনো বদমাইসের দল কোনো অজানা গুপ্তপথ দিয়ে তার মধ্যে ঢুকে কখন কোথায় আস্তানা পাতে, সে কথা তিনি কি করে জানবেন? ভাঙা বাড়ির ভেতরে যে বাঘের আড্ডা আছে, এটাও তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর বুনো বাঘ যদি মানুষ ধরে খায়, সেজন্যে কেউ পটলবাবুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে না। আর এ হচ্ছে আশ্চর্য বুনো বাঘ—পোড়ো-বাড়িতে থাকে, তিথি-নক্ষত্রের খবর রাখে, অমাবস্যার রাত না হলে তার ক্ষিদে হয় না, গয়না-পরা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কারুকে সে ধরে না, আবার সঙ্গে করে আনে ডাকাতের দল।'

কুমার সন্দেহ পূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'প্রতি অমাবস্যার রাতে এখানে এসে যে দেখা দেয়, সে কি সত্যিসত্যিই বাঘ, না আর কিছু?'

—'আপনি তো স্বচক্ষেই বাঘটাকে দেখেছেন। আমিও দেখেছি। এ যে আসল বাঘই বটে, তারও প্রমাণ আজ পেয়েছি। পোড়োবাড়ির অন্ধকার গহ্বরে মানুষের হাড়ের স্তূপ তো দেখেছেন! যাদের রক্ত-মাংস গেছে বাঘের জঠরে, সেই অভাগাদেরই হাড়ের রাশি সেখানে পড়ে রয়েছে।'

কুমার ভাবতে ভাবতে বললে, 'এ বাঘ কি মায়া-বাঘ, না এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড?'

—'গাঁয়ের লোকরাও বলে, এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ আইনের কাছে ভুতুড়ে কাণ্ড বলে কোনো কাণ্ডই নেই। আমরা একালের সভ্য লোক, ভূত তো কোন ছার, ভগবানকেই আমরা উড়িয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই! কিন্তু যাক সে কথা। এখন আপনি কি করবেন?'

—'থানায় ফিরে যাব?'

—'কিন্তু সাবধান, আজ যা দেখেছেন, থানার কারুর কাছে তা প্রকাশ করবেন না।

অমাবস্যার রাতের রহস্য যদি জানতে চান, তাহলে একেবারে মুখ বন্ধ করে রাখবেন। পুলিশের কাছে এখন কিছু জানালেই তারা বোকার মতো গোলমাল করে সব গুলিয়ে দেবে। আজ যা দেখলুম তাতে মনে হয়, আপনি চুপচাপ থাকলে আসছে অমাবস্যাতেই সব রহস্যের

কিনারা হয়ে যাবে। আজ আর এর বেশি কিছু বলব না। নমস্কার।' মোহনলাল তার বাসার দিকে চলে গেল।

কুমার চিন্তিত মুখে থানার দিকে এগিয়ে চলল। বাসার কাছ বরাবর এসেই সে দেখলে, চন্দ্রবাবু একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে থানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

কুমারকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললেন, 'এই যে কুমার! তোমার জন্যে আমার বড়ো ভাবনা হয়েছিল।'

—'কেন চন্দ্রবাবু?'

—'আমি শুনলুম তুমি আর মোহনলাল নাকি নদীতে কুমিরের মুখে পড়েছ! এখন তোমাকে দেখে আমার সকল ভাবনা দূর হল।—যাক এ যাত্রা তা হলে তুমি বেঁচে গিয়েছ।'

—'এ যাত্রা কেন চন্দ্রবাবু, অনেক যাত্রাই এমনি আমি বেঁচে গেছি। তবে একদিনের যাত্রায় মরণকে যে আর ফাঁকি দিতে পারব না, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

—'কুমিরটা কি মোহনলালের রিভলভারের গুলি খেয়েই পালিয়ে গেছে?

গাঁয়ের চারিদিকেই আমার গুপ্তচর আছে, এ-কথা তো তুমি জানো! ...কিন্তু মোহনলাল কোথায়?'

—'তিনি বাসায় গিয়েছেন।'

—'তুমি থানায় গিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো বদলে ফেল, ততক্ষণে আমি মোহনলালের বাড়িটা একবার ঘুরে আসি।'

—'কেন, সেখানে আবার কি দরকার?'

চন্দ্রবাবু এগুতে এগুতে বললেন, 'আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।'

এগারো

এই কি ভুলু-ডাকাত?

চন্দ্রবাবু যাচ্ছেন মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে! কেন?

থানার ভিতরে গিয়ে এখন ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে কুমারের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কিন্তু চন্দ্রবাবুর কথা শুনে কুমার বিশ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেল; তাড়াতাড়ি চন্দ্রবাবুর পিছনে ছুটে গিয়ে কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'মোহনলালবাবু কি করেছেন? আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন কেন?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তুমি তো জানো কুমার, মোহনলালের ওপরে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ আছে। কে সে, কোথাকার লোক, এত বেড়াবার জায়গা থাকতে মানসপুরেই-বা তার বেড়াতে আসবার শখ হল কেন, এ-সব কিছুই আন্দাজ করবার উপায় নেই। তার সবই যেন রহস্যময়। আমার গুপ্তচর দেখেছে, সে প্রায়ই নিশুতি রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেবে দেখ, মানসপুরে সন্ধে হলে যখন সবাই দরজায় খিল এঁটে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মোহনলাল তখন সুন্দরবনের ঝোপে ঝোপে ঘুরে বেড়ায়! তাই তো পটলবাবু সন্দেহ করেন যে, মোহনলাল হচ্ছে ভুলু-ডাকাতদেরই দলের লোক।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এ-সব তো খালি সন্দেহের কথা! মোহনলালবাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, এমন কোনো প্রমাণ তো আপনি পান নি!'

—'এতদিন তা পাই নি বলেই গ্রেপ্তার করিনি, তবে, মোহনলাল যে সাংঘাতিক লোক এবারে সে-প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

—'প্রমাণ? কি প্রমাণ?'

চন্দ্রবাবু বললেন, ' আমার গুপ্তচর এসে কিছুদিন আগে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, মোহনলালকে সে একটা রিভলভার সাফ করতে দেখেছে। জানো তো, রিভলভার ব্যবহার করলে লাইসেন্স নিতে হয়? আমি কলকাতায় তার করে জেনেছি যে, মোহনলালের নামে কোনো রিভলভারের লাইসেন্স নেই। এ একটা কত-বড়ো অপরাধ, তা কি বুঝতে পারছ কুমার? লাইসেন্স নেই, মোহনলাল তবু রিভলভার ব্যবহার করছে! বিপ্লববাদী কি ডাকাত ছাড়া এমন কাজ আর কেউ করে না। আপাতত এই অপরাধেই আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।'

কুমার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, তবে কি মোহনলাল সত্যিসত্যিই দোষী? সে কি ডাকাত? মানুষ খুন করাই কি তার ব্যবসা? কিন্তু তা হলে অমাবস্যার রাতের রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে তার এত বেশি আগ্রহ কেন? আর মোহনলাল যদি ডাকাতদেরই কেউ হয়, তবে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ডাকাতদের দেখে ভয়ে পালিয়ে এল কেন? এ-সব কি ছলনা? তার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে চন্দ্রবাবু ও পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে কুমার এগিয়ে চলল এবং ক্রমে অশ্বত্থ-বট ও তাল-নারিকেলের ছায়া-খেলানো আঁকাবাঁকা মেটে পথ দিয়ে কুমার মোহনলালের বাসার সুমুখে গিয়ে পড়ল।

খানিকটা খোলা জমি। মাঝখানে একখানা ছোটো তেতলা বাড়ি। ডান পাশে মস্ত একটা বাঁশঝাড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে এবং বাম পাশ দিয়ে বর্ষায়, কাজলা নদীর ঘোলা জল নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে।

চন্দ্রবাবু ও কুমার বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। চন্দ্রবাবু দুজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, 'বাড়ির পেছনে একটা খিড়কির দরজা আছে। তোমরা সেই দরজায় গিয়ে পাহারা দাও।'

পাহারাওয়ালারা তাঁর হুকুম তামিল করতে ছুটল। চন্দ্রবাবু দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন, কিন্তু কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না।

চন্দ্রবাবু কড়া নাড়তে নাড়তে এবারে চিৎকার শুরু করলেন, 'মোহনলালবাবু, ও মোহনলালবাবু!'

সাড়াশব্দ কিছুই নেই। আরো কিছুক্ষণ কড়া নেড়ে ও চিৎকার করে চন্দ্রবাবু শেষটা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'মোহনলালবাবু এ ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইবারে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলব!'

এতক্ষণে দরজাটা খুলে গেল। মস্ত-বড়ো একমুখ পাকা দাড়িগোঁফ নিয়ে একটা খোট্টা চাকর দরজার উপরে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে খোঁজা হচ্ছে?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলালবাবু কোথায়?'

সে জানালে, বাবু তেতলার ছাদের **উপর** আছেন।

তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চারজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে চন্দ্রবাবু বেগে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকলেন, কুমারও পিছনে পিছনে গেল।

সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সকলে দ্রুতপদে একেবারে তেতলার ছাদে গিয়ে উঠল। তেতলার ছাদের উপরে একটা চিলে ছাদ। মোহনলাল পরম নিশ্চিন্ত মুখে সেই ছাদের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল, তবু মশাইয়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না কেন?'

মোহনলাল গম্ভীরভাবে শান্ত স্বরে বললে, 'আমি যে গান গাইছিলুম! গান গাইতে গাইতে সাড়া দেব কেমন করে?'

চন্দ্রবাবু চটে-মটে বললেন, 'আবার ঠাট্টা হচ্ছে? এখন লক্ষ্মীছেলের মতো সুড়সুড় করে ওখান থেকে নেমে এস দেখি, তারপর দেখা যাবে, তুমি কেমন গান গাইতে পার।'

মোহনলাল একগাল হেসে বললে, 'আমাকে এত আদর করে নিচে নামতে বলছেন কেন চন্দ্রবাবু?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমাকে দিল্লীর লাড্ডু খাওয়াব কি না, তাই এত সাধাসাধি করছি!'

মোহনলাল খুব ফুর্তির সঙ্গে দুইহাতে তুড়ি দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে গান ধরে দিলে—

'লাড্ডু যদি এনে থাকো, গিয়ে দাদা দিল্লী
ঢেকেঢুকে রেখো, যেন খায় নাকো বিল্লী!
কিবা তার তুল্য?
শুনে মন ভুল্‌লো!
খেলে যেন বোলো নাকো—কেন সব গিল্‌লি?'

চন্দ্রবাবু রেগে টং হয়ে বললেন, ' আবার আমার সঙ্গে মস্করা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় মজাটা!'

মোহনলাল তেমনি হাসিমুখে বললে, 'মজা দেখাবেন? দেখান না চন্দ্রবাবু! আমি মজা দেখতে ভারি ভালোবাসি!'

—'হ্যাঁ, দু-হাতে যখন লোহার বালা পরবে, মজাটা তখন ভালো করেই টের পাবে বাছাধন!'

বিস্মিত স্বরে মোহনলাল বললে, 'লোহার বালা? সে কি দাদা? আপনাদের দেশে সোনার বালা কেউ পরে না?'

চন্দ্রবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ফের ঠাট্টা? তবে রে পাজি! তবে রে ডাকু! চৌকিদার! যাও, চিলের ছাদে উঠে ও-বদমাইসটাকে কান ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে এস তো।'

পাহারাওয়ালারা অগ্রসর হল, কিন্তু মোহনলাল একটুও দমল না। হো হো করে হেসে উঠে ডানহাতখানা হঠাৎ মাথার উপর তুলে সে বললে, 'আমার ডানহাতে কি রয়েছে, সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো?'

মোহনলালের ডানহাতে কালো রঙের গোলাকার কি-একটা জিনিস রয়েছে বটে! চন্দ্রবাবু সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ওটা?'

'বোমা।'

শুনেই পাহারাওয়ালারা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল! মোহনলাল বললে, 'আমার দিকে কেউ আর এক পা এগিয়ে এলেই আমি এই বোমা ছুঁড়ব—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িখানা উড়ে যাবে!'

চন্দ্রবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'কিন্তু তা হলে তুমিও বাঁচবে না!'

—'না, আমিও বাঁচব না, আপনারাও বাঁচবেন না!'

চন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মোহনলাল, আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি পালাতে পারবে না। কর্তব্যের জন্যে যদি আমাকে মরতে হয়, তা হলে আমি মরতেও রাজি আছি।'

আচম্বিতে ভীষণ চীৎকার করে মোহনলাল বললে, 'তবে মর!'—বলেই হাতের সেই বোমাটা সে সজোরে চন্দ্রবাবুর দিকে নিক্ষেপ করলে!

পর-মুহূর্তে কুমারের মনে হল চোখের সামনে সারা পৃথিবীর আলো দপ্ করে নিবে গেল এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দের সঙ্গে রাশীকৃত ভাঙা ইঁট-কাঠ ধুলো-বালি ও রাবিশের ফোয়ারার মধ্যে তার দেহটা হাড়গোড় ভাঙা দ-এর মতো আকাশের দিকে ঠিক্‌রে উঠে গেল!

—এবং তার পরে বিস্ময় আর আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা সামলে দেখলে,—না, তারা আকাশে উড়ে যায় নি, পৃথিবীতেই বিরাজ করছে এবং চোখের সমুখেই ছাদের উপরে একটা কালো রবারের বল লাফিয়ে খেলা করছে! দু-হাতে মুখ চেপে চন্দ্রবাবু ছাদের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন এবং চারজন পাহারাওয়ালা চার দিকে চিৎপাত বা উপুড় হয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে!

বার বার বিপদে পড়ে কুমারের আত্মসংবরণ করবার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল, তাই সকলের আগে সেই-ই বুঝতে পারলে যে মোহনলাল যেটা ছুঁড়েছিল. সেটা বোমা-টোমা কিছুই নয়, একটা তুচ্ছ রবারের বল মাত্র।

সকৌতুকে হেসে উঠে কুমার বললে, 'চন্দ্রবাবু, ও চন্দ্রবাবু! চোখ খুলে দেখুন, আমরা কেউ এখনো সশরীরে স্বর্গে যাই নাই।'

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে একটা নিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ? আমরা বেঁচে আছি? আমরা মরি নি? বল কি হে! বোমাটা তা হলে ফাটে নি? দুর্গা, দুর্গা—মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল!'

কুমার বললে, 'না বোমা ফাটে নি—ঐ যে, আপনার পায়ের তলাতেই বোমাটা পড়ে রয়েছে।'

ঠিক স্প্রিংওয়ালা পুতুলের মতো মস্ত একটা লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'বল কি হে? চৌকিদার! এই চৌকিদার! বোমাটা শিগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে ফ্যাল—শিগ্‌গির! নইলে এখনো হয়তো ওটা ফাটতে পারে!'

কুমার বললে, 'ঠাণ্ডা হোন, চন্দ্রবাবু ঠাণ্ডা হোন। বোমা ছোঁড়ে নি—ওটা রবারের বল ছাড়া আর কিছুই নয়!'

চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে বলটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গর্জন করে বললেন, 'কী! আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা? তবে রে রাস্কেল'—বলে চিলে ছাদের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়েই তার মুখ যেন সাদা হয়ে গেল! বিদ্যুতের মতো চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি আবার বললেন, 'মোহনলাল? মোহনলাল কোথায় গেল?'

কুমার সচমকে চিলে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই তো, সেখান থেকে মোহনলালের মূর্তি যেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়েছে!

চন্দ্রবাবু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'কোথায় গেল মোহনলাল? কোন দিক দিয়ে সে পালাল?'

কুমার বললে, 'এখান থেকে পালাবার কোনো পথই নেই।'

—'তবে কি সে মরিয়া হয়ে চারতলার ছাদ থেকেই নিচে লাফ মারলে?'—বলেই চন্দ্রবাবু ছুটে ছাদের ধারে গিয়ে নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সেখানেও মোহনলালের চিহ্নমাত্র নেই।

কপালে করাঘাত করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ! একটা বাজে আর বিশ্রী ঠাট্টা করে লোকটা কি-না আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল? উঃ! কী ভয়ানক লোক রে বাবা! এর পরেও আমার চাকরি আর কি-করে বজায় থাকে বল!'

কিন্তু কুমার এত সহজে বোঝ মানবার ছেলে নয়। সে কিছু না বলে বরাবর নেমে এক-তলায় গেল। তার পর বাড়ির বাইরে ঠিক চিলে ছাদের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে যা দেখলে তা হচ্ছে এই ঃ

ঠিক চিলে ছাদের নিচেই, মাটির উপরে প্রায় দু-গাড়ি বালি স্তূপাকার হয়ে আছে। এবং সেই বালি স্তূপের মধ্যে একটা বড়ো গর্ত—অনেক উঁচু থেকে যেন একটা ভারী জিনিস সেখানে এসে পড়েছে! মোহনলাল তা হলে ছাদের উপর থেকে এই নরম বালির গাদায় লাফিয়ে পড়ে অনায়াসেই চম্পট দিয়েছে?

কুমার তখনই চন্দ্রবাবুকে ডেকে এনে ব্যাপারটা দেখালে। দেখে-শুনে চন্দ্রবাবু তো একেবারেই অবাক! খানিক পরে দুই চোখ ছানাবড়ার মতো বড়ো করে তিনি বলে উঠলেন, 'সাবাস বুদ্ধি!

মোহনলাল যে দেখছি পালাবার পথ আগে থাকতেই ঠিক করে, রেখেছিল! কুমার, আমি হলপ্ করে বলতে পারি, এই মোহনলাল বড়ো সহজ লোক নয়, সে এখানে বেড়াতেও আসে নি—এ ভুলু-ডাকাতের চরও নয়—এ হচ্ছে নিজেই ভুলু-ডাকাত!'

থানায় ফিরে আবার নতুন এক বিস্ময়! কুমার নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, মেঝের উপর একখানা খাম পড়ে আছে—যেন জানলা গলিয়ে কেউ সেখানা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

চিঠিখানা এই ঃ

'কুমারবাবু,

আসছে অমাবস্যার রাতে আপনি পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির শুঁড়িপথের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাপে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন। সঙ্গে বন্দুক, রিভলভার আর টর্চ-লাইট নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

আসছে অমাবস্যার রাতেই রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে!'

ইতি—বন্ধু

পুনঃ—'এই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রবাবুর কাছে প্রকাশ করবেন না।'

কুমার চিঠি পড়ে নিজের মনেই বললে, 'কে এই চিঠি লিখেছে? বন্ধু? এখানে কে আমার বন্ধু? মোহনলাল? সে তো পলাতক! তবে কি বনের ভেতরে গর্তের ভিতর থেকে আমাকে যে উদ্ধার করেছিল, এ কি সেই ব্যক্তি? কে সে?'

কুমারের ভাবনায় বাধা পড়ল। আচম্বিতে ঝড়ের মতো চন্দ্রবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন—তাঁরও হাতে একখানা চিঠি!

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দেখ কুমার, এ আবার কি ব্যাপার! আমার শোবার ঘরের ভেতরে বাইরে থেকে এই চিঠিখানা কে ছুঁড়ে-ফেলে দিয়েছে!'

চিঠিখানা নিয়ে কুমার বুঝলে, একই লোক তাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছে। এ পত্রখানায় লেখা ছিল—

'চন্দ্রবাবু,

আসছে অমাবস্যার রাতে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির পিছনে কাজলা নদীর জল যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, ঠিক সেইখানেই অনেক লোকজন আর অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকবেন।

সেই রাত্রেই আপনি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন।' ইতি—বন্ধু।

বারো

আবার সেই রাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অমাবস্যার সেই ভয়ানক রাত আবার এসেছে—কিন্তু বারোটা বাজতে এখনো অনেক দেরি।

কুমার নিজের ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে, চন্দ্রবাবু ধড়া-চুড়ো পরে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই অজানা 'বন্ধু'র কথামতো চন্দ্রবাবু যে আজ পটলবাবুর বাড়ির পিছনে কাজলা-

নদীর সুড়ঙ্গ-খালের মুখে গিয়ে সদলবলে পাহারা দিতে ভুলবেন না, কুমার তা বেশ জানত। এবং এটাও সে জানত যে, যাবার আগে তারও ডাক পড়বে—চন্দ্রবাবু তাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে বলবেন।

কিন্তু সেই অজানা 'বন্ধু' তাকে ভাঙা-বাড়ির শুঁড়িপথের কাছাকাছি কোনো ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। চন্দ্রবাবুর কাছে আবার এ-কথা প্রকাশ করতে বারণও আছে, তাই কুমার তাঁকে কোনো কথাই জানায় নি। কাজে-কাজেই পাছে চন্দ্রবাবু তাকে সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন, সেই ভয়ে কুমার চুপি চুপি থানা থেকে আগে থাকতেই বেরিয়ে পড়ে পটলবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু এই অজানা বন্ধুই-বা কে, আর চন্দ্রবাবুর কাছে এত লুকোচুরির কারণই-বা কি, অনেক মাথা ঘামিয়েও কুমার সেটা আন্দাজ করতে পারে নি। আজও সেই কথাই ভাবতে ভাবতে কুমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

অন্ধকারকে আরো ঘন করে তুলে ঐ তো পটলবাবুর প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দেওয়ালকে শক্ত শিকড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে যে সব বড়ো-বড়ো অশ্বত্থ-বট মাথা খাড়া করে আছে, প্রবল বাতাসে নিজেরা দুলতে দুলতে তারা যেন অন্ধকারকেও দুলিয়ে দিয়ে বলছে—'সর-সর-সর, মর-মর-মর মর!' কুমারের মনে হল, অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর থেকে যেন সজাগ ভুতুড়ে পাহারাওলারা কথা কইছে!

আন্দাজে-আন্দাজে সে সেই মস্ত-বড়ো ভাঙা সিং-দরজার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অন্ধকারে আর তো এগোনো চলে না। কুমার কান পেতে খুব তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু দেখাও যায় না এবং গাছপালার মর্মর-শব্দ ছাড়া আর-কিছু শোনাও যায় না। সে তখন টর্চ-লাইটটা টিপে মাঝে মাঝে আলো জ্বেলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

আবার সেই-সব বিভীষিকা! মাথার উপরে উড়ন্ত প্রেতাত্মার মতো ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করে বাদুড়ের দল যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে,—দু-দুটো গোখরো সাপ ফণা তুলে ফোঁস্‌ করে উঠেই টর্চ-লাইটের তীব্র আলোয় ভয় পেয়ে বিদ্যুতের মতো এঁকেবেঁকে পালিয়ে গেল, চকমিলানো ঘরগুলোর ও দালানের আনাচ-কানাচ থেকে যেন কাদের হিংসুক, ক্ষুধিত ও জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যায়। দিনের বেলাতেই যে নির্জন, বিপদপূর্ণ বাড়ির ভীষণতা মনকে একেবারে কাবু করে দেয়, অমাবস্যার কালো রাতে সে-বাড়ি যে আরো কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, কুমারের আজ সেটা আর বুঝতে বাকি রইল না। তবু সেদিন মোহনলাল সঙ্গে ছিল, আর আজ সে একা! কুমারের প্রাণ খুব কঠিন, তাই এখনো সে অটল পদে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ত!

কুমার ভয় পেলো না বটে, কিন্তু তারও বার বার মনে হতে লাগল, এই প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়িটা হানাবাড়ি না হয়ে যায় না!—এ হচ্ছে নিষ্ঠুর ডাকাত-জমিদারের বাড়ি, কত মানুষ এখানে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে অপঘাতে মারা পড়েছে, কে তা বলতে পারে? নিশ্চয়ই তাদের আত্মার গতি হয় নি—নিশ্চয়ই তারা নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে তাকে দেখছে!

আচম্বিতে কুমার সচমকে শুনলে, ঠিক তার পিছনে কার পায়ের শব্দ! সে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ল। কান পেতে শুনলে। শব্দ-টব্দ কিছুই নেই! তারই শোনবার ভুল—এই ভেবে কুমার আবার এগুলো।—আবার সেই পায়ের শব্দ! আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও থেমে গেল!

না, তার শোনবার ভুল নয়। কেউ তার পিছু নিয়েছে! কিন্তু কে সে? ভূত, না হিংস্র জন্তু?

সন্তর্পণে কুমার অগ্রসর হল, অমনি সেই পায়ের শব্দও জেগে উঠল।

হঠাৎ কুমার তীরবেগে ফিরে দাঁড়ালো—তার একহাতে জ্বলন্ত টর্চ-লাইট আর একহাতে রিভলভার!

কারুকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু উঠানের উপরে একটা মস্ত ঝোপ দুলছে। কেউ কি ওখানে লুকিয়ে আছে? যদি সে তাকে দেখে থাকে, তা হলে তারও আর আত্মগোপন করা বৃথা!

অত্যন্ত সাবধানে, রিভলভারের ঘোড়ার উপরে আঙুল রেখে, টর্চের পূর্ণ আলো ঝোপের উপরে ফেলে কুমার পায়ে পায়ে সেই দিকে ফিরে গেল।

ঝোপের সুমুখে গিয়ে কুমার শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'যদি কেউ এখানে থাকো, তা হলে বেরিয়ে এসো,—নইলে এই আমি গুলি করলুম।'

কোনো সাড়া নেই। ভালো করে সে তখন ঝোপটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না, কেবল খানিক তফাতের আর-একটা ঝোপ থেকে একটা শেয়াল বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

হয়তো ঐ শেয়ালের পায়ের শব্দেই সে ভয় পেয়েছে—এই ভেবে কুমার আবার অগ্রসর হল। দু-পা যায়, থামে, আর শোনে। কিন্তু পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না।

ঐ তো সেই শুঁড়িপথ! সে আর মোহনলাল সেদিন ওরই মধ্যে ঢুকে বিপদে পড়েছিল। আজ এখানেই তার অপেক্ষা করবার কথা।

ঝোপ-ঝাপ এখানে সর্বত্রই। শুঁড়িপথের একপাশে এমন একটা ঝোপ বেছে নিয়ে কুমার গা-ঢাকা দিয়ে বসল—যাতে তার পিছন দিকে থাকে বাড়ির দেওয়াল। অন্তত পিছন দিক থেকে কোনো গুপ্তশত্রুর আক্রমণের ভয় আর রইল না।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কুমার অবাক হয়ে শুনলে, খুব কাছেই অন্তরালে বসে কে যেন সকৌতুকে প্রবল হাসির ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে যেই-ই হোক, কুমারের আর খোঁজাখুঁজি করবার আগ্রহ হল না। সে কেবল বাঁধন খুলে পিঠের বন্দুক হাতে নিলে। যখন তার পিছনে রইল দেওয়াল আর হাতে রইল বন্দুক আর সামনের দিকে জেগে রইল তার সাবধানী দুই চক্ষু, তখন কোনো শত্রুরই তোয়াক্কা সে রাখে না! জন্তু, মানুষ ও অমানুষ, অমন অনেক শত্রুকেই এ-জীবনে সে দেখেছে, শত্রুর ভয়ে তার বুক কোনোদিন কাঁপে নি, আজও কাঁপবে না।

কিন্তু, শত্রু তবু এল! একলা নয়, চুপি-চুপি নয়—দলে দলে, ভীম বিক্রমে কোলাহল করতে করতে! অমন উঁচু দেওয়াল তার পৃষ্ঠরক্ষা করতে পারলে না এবং তার গুলি-ভরা বন্দুক-রিভলভারও তাদের পিছনে হটাতে পারলে না—তাদের কাছে কুমারকে আজ কাপুরুষের মতো পরাজয় স্বীকার করতে হল—হয়তো আজ তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে!

কুমার ভ্রমেও সন্দেহ করে নি যে, ঝোপ-ঝাপের ভিতর এমন অসংখ্য শত্রু এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল! তারা হচ্ছে ডাঁশ-মশা!

উঃ, কী তাদের হুলের জোর, আর তাদের বিজয়-হুঙ্কার, আর কী তাদের অশ্রান্ত আক্রমণ! দেখতে দেখতে কুমারের হাত-পা-মুখ ফুলে উঠতে শুরু করলে, নাকের ডগাটা দেখতে হল যেন দু-গুণ বড়ো একটা টোপাকুলের মতো এবং গাল ও কপাল হয়ে গেল দাগড়া দাগড়া! মুখ ও হাত-পা পেটের ভিতরে যথাসাধ্য গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুমার ঝোপের মধ্যে পড়ে রইল, যেন একটা কুমড়ো! ময়নামতীর মায়াকাননের মাংসের মস্ত পাহাড়ের মতো ডাইনসরও তাকে বোধ হয় এতটা কাবু করে ফেলতে পারত না! কুমার ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল—এ মশার পালের হাজার হাজার হুলের খোঁচার চেয়ে অমাবস্যার রাতের সেই ভয়াবহ ব্যাঘ্রের থাবা তার কাছে এখন ঢের বেশি আরামের বলে মনে হল।

আচম্বিতে চারিদিক কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল! কুমার হাতের রেডিয়াম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে মোটে আর দেড় মিনিট দেরি আছে।

কি-একটা আসন্ন আতঙ্কের সম্ভাবনায় স্তম্ভিত অন্ধকার যেন আরো কালো হয়ে উঠল! অন্ধ রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন ভয়ে ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল—প্যাঁচা, বাদুড় ও চামচিকের মিলিত আর্তনাদে চারিদিকের স্তব্ধতা যেন ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল—পোড়ো-বাড়ির অলি-গলিতে এতক্ষণ যারা নিশ্চিন্ত হয়ে লুকিয়েছিল, সেই-সব অজানা নানা পশুর দল পর্যন্ত কি এক দুরন্ত বিভীষিকা দেখে প্রাণভয়ে বেগে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করলে! এখন এ স্থান যেন—মানুষ তো দূরের কথা—বন্য পশুর পক্ষেও নিরাপদ নয়।

কুমার হাজার হাজার মশার কামড় পর্যন্ত ভুলে গেল—তার বাঁ-হাত ধরে আছে বন্দুকটা এবং তার ডান-হাত স্থির হয়ে আছে বন্দুকের ঘোড়ার উপরে!

হঠাৎ ও কী ও? অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে একটা আঁধারে-লণ্ঠন হাতে নিয়ে আচম্বিতে এক মনুষ্য-মূর্তি আবির্ভূত হল এবং এত তাড়াতাড়ি স্যাঁৎ করে দৌড়ে সেই ভীষণ শুঁড়িপথের ভিতরে মিলিয়ে গেল যে, কুমার তার মুখ পর্যন্ত দেখবার সময় পেলে না! তাকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সত্যিই কি সে মানুষ?

চারিদিকের জীবজন্তুর ছুটোছুটি, প্যাঁচা-বাদুড়, চামচিকের চ্যাঁচামেচি অকস্মাৎ থেমে গেল এবং পর-মুহূর্তে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতার মধ্যে পোড়োবাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এবং তারপরেই সেই অপার্থিব স্তব্ধতা ছুটিয়ে দিল ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন! একবার, দুবার, তিনবার সেই গর্জন জেগে উঠে পৃথিবীর মাটি থরথরিয়ে কাঁপিয়ে আকাশ-বাতাসকে থমথম করে দিলে,—তারপর সব আবার চুপচাপ।

কয়েক মুহূর্ত কাটলো। তারপর কুমারের চোখ দেখলে শুঁড়িপথের সামনে কি একটা ভয়ঙ্কর ছায়া তার দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়াল। পিছন থেকে কে চুপিচুপি বললে, 'ঐ বাঘ! গুলি কর—গুলি কর!'

কে যে এ-কথা বললে, কুমারের তা আর দেখবার অবকাশ রইল না, তাড়াতাড়ি সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন থেকেও কে বন্দুক ছুঁড়লে!

গুড়ুম! গুড়ুম! পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড আর্তনাদের পর আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এও বেশ বোঝা গেল যে খুব ভারী একটা দেহ মাটির উপরে পড়ে ছটফট করছে! অল্পক্ষণ পরে সব শব্দ থেমে গেল।

পিছন থেকে আবার কে বললে, 'শান্তি! অমাবস্যার রাতে আর এখানে বাঘ আসবে না!'

কুমার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে 'টর্চ'টা জ্বেলে ফেললে।

পিছনে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে করে মোহনলাল।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি?'

—'হ্যাঁ আমি। খানিক আগে আমাকেই আপনি ঝোপে-ঝোপে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।'

—'তাহলে আমাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন আপনিই?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সে-কথা এখন থাক, আগে দেখা যাক বাঘটা মরছে কি না।'

কুমার 'টর্চে'র আলো শুঁড়িপথের দিকে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। .....তারপরেই অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে সে বলে উঠল, 'কি সর্বনাশ! বাঘটা কোথায় গেল? ওখানে যে একটা মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে!'

দেহটার কাছে গিয়ে মোহনলাল কিছুই যেন হয় নি, এমন সহজ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এ হচ্ছে ভুলু-ডাকাতের দেহ। এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

যা দেখা গেল, তাও কি সম্ভব? কুমারের মনে হলো সে যেন কি একটা বিষম দুঃস্বপ্ন দেখছে!

মাটির উপরে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পটলবাবুর মৃতদেহ!

কুমার অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, 'অ্যাঃ! এ তো বাঘও নয়, ভুলু-ডাকাতও নয়,—এ যে আবার পটলবাবু।'

মোহনলাল বললে, 'পটলবাবু!'—কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল, হঠাৎ দূর থেকে ঘন ঘন অনেকগুলো বন্দুকের গর্জন শোনা গেল।

কুমার চমকে উঠে বললে, 'ও আবার কি?'

—'ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ হচ্ছে। শীগগির আমার সঙ্গে আসুন'—বলেই কুমারকে হাত ধরে টেনে নিয়ে মোহনলাল দ্রুতপদে ছুটতে আরম্ভ করলে!

তেরো

আশ্চর্য কথা

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল ছুটতে ছুটতে একটা চৌমাথায় এসে পড়ল। বাঁ-হাতি পথটা গেছে কাজলা-নদীর দিকে—যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের সামনে ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের লড়াই বেধেছে।

মোহনলাল সে-পথও ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কুমার বিস্মিত হয়ে বললে, 'একি মোহনলালবাবু! আমরা নদীর দিকে যাব যে।'

—'না।'

—'না। তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'আমার বাসায়।'

—'সেখানে কেন?'

—'দরকার আছে বলেই সেখানে যাচ্ছি। কুমারবাবু, এখন কোনো কথা কইবেন না, চুপ করে আমার সঙ্গে আসুন।' .....বাসার দরজায় এসে ধাক্কা মেরে মোহনলাল বললে, 'ওরে, আমি এসেছি। শীগগির দরজা খোল।'

দরজা খুলে গেল এবং ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই পাকা আমের মতন বুড়ো খোট্টা দরোয়ানটার মুখ।

বাড়ির দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে ধপ করে বসে পড়ে মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু বসুন। একটু হাঁপ ছেড়ে নিন।'

খানিকক্ষণ দু-জনেই নীরব। তারপর প্রথমে কথা কইলে কুমার। বললে, 'মোহনলালবাবু, আপনার উদ্দেশ্য কি? যে-সময়ে আমার উচিত, চন্দ্রবাবুকে সাহায্য করা, ঠিক সেই সময়েই আমাকে আপনি এখানে টেনে আনলেন কেন?'

মোহনলাল বললে, 'আপনার সাহায্য না পেলেও চন্দ্রবাবু হাহাকার করবেন না। আপনি না গেলেও তিনি যে আজ ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই।'

কুমার বললে, 'তবু আমার সেখানে যাওয়া উচিত।'

মোহনলাল সে-কথার জবাব না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'কুমারবাবু আপনি Margaret A, Murray's Witch cult in Western Europe নামে বইখানা পড়েছেন?'

এ-রকম খাপছাড়া প্রশ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে কুমার বললে, 'না।'

—'আপনি ডাইনী বিশ্বাস করেন?'

—'ডাইনীদের অনেক গল্প শুনেছি বটে। সে-সব গল্পে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করছেন কেন?'

মোহনলাল আবার প্রশ্ন করলে, 'কুমারবাবু, hycanthroby কাকে বলে জানেন?'

—'না।'

'য়ুরোপের ডাইনীরা নাকি hycanthroby-র মহিমায় মানুষ হয়েও নেকড়ে-বাঘের আকার ধারণ করতে পারত।'

কুমার বিরক্ত হয়ে বললে, 'পারত তো পারত, তাতে আমাদের কি?'

কুমারের বিরক্তি আমলে না এনে মোহনলাল বললে, 'আমাদের দেশেও অনেকে বলেন, মন্ত্রতন্ত্র বা বিশেষ কোনো ঔষধের গুণে মানুষ নাকি বাঘের আকার ধারণ করতে পারে।'

এতক্ষণে কুমারের মাথায় ঢুকল মোহনলাল কি বলতে চায়! একলাফে উঠে পড়ে কুমার উত্তেজিত স্বরে বললে, 'মোহনলালবাবু, মোহনলালবাবু! তবে কি আপনার মতে, এখানকার অমাবস্যার রাতের বাঘটাও হচ্ছে সেইরকম কোনো অস্বাভাবিক জীব?'

মোহনলাল গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমার কোনো মতামত নেই। মানুষ যে বাঘ হতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিজ্ঞানও তা মানে না। কিন্তু মানসপুরে এই যে-সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল, এর মূলেই বা কি রহস্য আছে? ..... গোড়া থেকে একবার ভেবে দেখুন। বাঘ দেখা দিয়েছে কেবল অমাবস্যার রাতে, ঠিক বারোটার সময়ে। সাধারণ পশুরা এমন তিথিনক্ষত্র বিচার করে ঘড়ি ধরে বেরোয় না। এই অদ্ভুত বুদ্ধিমান বাঘের কবলে যারা পড়েছে, তারা সকলেই স্ত্রীলোক, আর তাদের সকলের গায়েই অনেক টাকার গহনা ছিল। সাধারণ বাঘ কেবল গয়নাপরা স্ত্রীলোক ধরে না। ..... তারপর বুঝুন, আপনি আর আমি দু-জনেই দু-বার বাঘ দেখেছি, আপনি গুলি ছুঁড়েছেন কিন্তু দু-বারেই বাঘের বদলে পাওয়া গেল মানুষকে—অর্থাৎ পটলবাবুকে—প্রথমবারে আহত আর দ্বিতীয়বারে মৃত অবস্থায়। দু-বারই বাঘের আবির্ভাব

আমাদের চোখে পড়েছে, তার পায়ের দাগও দেখা গেছে, তার রক্তমাখা লোমও আমি পেয়েছি, কিন্তু তার দেহ অদৃশ্য হতেও আমরা দেখি-নি, অথচ তা খুঁজেও পাওয়া যায় নি। উপরন্তু দু-দুবারই পটলবাবু যে কখন ঘটনাস্থলে এসেছেন, তা আমরা দেখতে পাইনি। ... ... য়ুরোপে এমনি মায়া-নেকড়ে বাঘের অসংখ্য কাহিনী আছে। সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে যখন তারা মরেছে, তখন আবার মানুষেরই আকার পেয়েছে।'

কুমার রুদ্ধশ্বাসে, অভিভূত স্বরে বলে উঠল, 'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, পটলবাবুই বাঘের আকার ধারণ করে—'

মোহনলাল বাধা দিয়ে বললে, 'আমি ও-রকম কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি দেখাতে চাই যে, সমস্ত প্রমাণ পরে পরে সাজালে ঠিক যেন মনে হবে, কোনো মায়া-ব্যাঘ্রই মানসপুরের এই সব ঘটনার জন্য দায়ী। যাঁরা এটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবেন, তাঁদেরও মতে আমি সায় দিতে রাজী আছি। মানুষ যে ব্যাঘ্র-মূর্তি ধারণ করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না—কারুকে আমি বিশ্বাস করতেও বলি না।'

কুমার বললে, 'তবে—'

মোহনলাল আবার বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। ভুলু-ডাকাত আর পটলবাবু একই লোক। নিজে সকলের সামনে নিরীহ ভালো মানুষটির মতো থেকে পটলবাবু তাঁর ভাঙা বাড়ির অন্ধকূপের মধ্যে ডাকাতের দল পুষতেন। কালু-সর্দার তাঁরই দলের লোক। অমাবস্যার রাতে বাঘের উপদ্রবের সুযোগে, তাঁরই হুকুমে কালু দল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত। নৌকোয় চড়ে সুড়ঙ্গ-খাল দিয়ে ডাকাতেরা দল বেঁধে বাইরে বেরিয়ে আসত—গভীর রাত্রে কাজলা-নদীর বুকে তাদের নৌকা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

কুমার বললে, 'সবই যেন বুঝলুম। কিন্তু আপনি কে?'

খুব সহজ স্বরেই উত্তর হলো, 'আমি? আমি হচ্ছি মোহনলাল। অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির কাছে রিভলভার-বন্দুক থাকে কেন?'

মোহনলাল সহাস্যে বললে, 'সুন্দরবনে খুব নিরীহ ব্যক্তিরও রিভলভার-বন্দুক না হলে চলে না।'

—'মানলুম, কিন্তু তাঁরাও রিভলভার-বন্দুকের জন্যে লাইসেন্স নেয়। আপনার কি লাইসেন্স আছে?'

—'না।'

—'লাইসেন্স না নিয়ে রিভলভার-বন্দুক রাখে কেবল গুণ্ডা, খুনে আর বদমাইসরা।'

—'হুঁ, এ-কথা সত্য বটে।'

—'তবে? কে আপনি বলুন।'

মোহনলাল ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল!

কুমার দৃঢ়স্বরে বললে, 'পুলিশের ভয়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, সে কখনোই ভালো লোক নয়।'

মোহনলাল কৌতুক-ভরে বললে, 'ও আপনার কী বুদ্ধি কুমারবাবু! আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। আমি ভালো লোক নই।'

কুমার বললে, 'বাজে কথায় ভুলিয়ে সেবারে আমাদের চোখে আপনি খুব ধুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে সেটি আর হচ্ছে না।'

মোহনলাল বললে, 'ঐ শুনুন, কারা আসছে!'

নীচের সিঁড়িতে ধুপ-ধুপ করে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন কারা বেগে উপরে উঠছে! এ আবার কোন শত্রুর দল আক্রমণ করতে আসছে? কুমার তাড়াতাড়ি উঠে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল!

ঝড়ের মতো যারা ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল, তারা শত্রু নয়! চন্দ্রবাবু আর তাঁর পাহারাওয়ালারা।

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আরে, এ কী! কুমার, তুমি এখানে!'

কুমার বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মোহনলালবাবুর সঙ্গে আলাপ করছিলুম!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলাল? কোথায় সে দুরাত্মা? আমিও তো তারই খোঁজে এখানে এসেছি! আজ আমি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করেছি, কেবল ভুলুকেই পাইনি। আমার বিশ্বাস, মোহনলাল ভুলু-ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়।'

কুমার ফিরে দেখলে, মোহনলাল আর সে ঘরে নেই!

চৌদ্দ

মোহনলাল গ্রেপ্তার

মোহনলাল যেখানে বসে ছিল, তার পিছনেই একটি বন্ধ দরজা—এ-ঘর থেকে আর একটা ঘরে যাবার জন্যে।

কুমার বললে, 'মোহনলাল নিশ্চয়ই ও-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

বাঘের মতো সেই দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলাল, এবারে আর তোমার বাঁচোয়া নেই! সমস্ত বাড়ি আমি ঘেরাও করে ফেলেছি, একটা মাছি পর্যন্ত এখান থেকে বেরুতে পারবে না। ভালো চাও তো দরজা খোলো।'

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এলো, 'আজ্ঞে, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মোহনলাল তো এ-ঘরে নেই!'

চন্দ্রবাবু রাগে গরগর করতে করতে বললেন, 'সেদিনকার মতো আবার আজ ঠাট্টা করা হচ্ছে! তুমিই তো মোহনলাল! শীগগির বেরিয়ে এস বলছি।'

—'আজ্ঞে, ভুল করছেন! আমি মোহনলাল নই।'

—'আচ্ছা, আগে বেরিয়ে এস তো, তারপর দেখা যাবে তুমি কোন মহাপুরুষ!'

—'আজ্ঞে, আবার ভুল করছেন! আমি মহাপুরুষও নই।'

চন্দ্রবাবু গর্জন করে বললেন, 'তবে রে ছুঁচো! ভাঙলাম তা হলে দরজা!'—বলেই তিনি দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করতে লাগলেন।

—'আজ্ঞে, করেন কি—করেন কি! দরজা ভাঙলে বাড়িওয়ালা বকবে যে! আচ্ছা মশাই, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, এই নিন!'—হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

চন্দ্রবাবু রিভলভার বাগিয়ে ধরে, ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বাধো বাধো স্বরে তিনি বললেন, 'এ কী! কে আপনি?'

কুমারও অবাক! ও-ঘরের দরজার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো মোহনলাল নয়,—সে যে বিমল, যার সঙ্গে কুমার দু-বার যকের ধন আনতে গিয়েছিল, মঙ্গলগ্রহের বামনাবতারদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, ময়নামতীর মায়া-কাননের দানবদের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে খেলা করেছিল। বিমল—বিমল, তার চিরবন্ধু বিমল, মানসপুরে এসে পর্যন্ত যার অভাব কুমার প্রতিদিন প্রতি পদে অনুভব করেছে, এমন হঠাৎ তারই দেখা যে আজ এখানে পাওয়া যাবে, স্বপ্নেও সে তা কল্পনা করতে পারেনি।

কুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বিমল, বিমল, তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি কি আকাশ থেকে খসে পড়লে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে,—'না বন্ধু না! মোহনলাল-রূপে গোড়া থেকেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি!'

চন্দ্রবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'অ্যাঁ, বলেন কি? আপনিই মোহনলাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ! এখন আসুন চন্দ্রবাবু, আমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিন!'

ধাঁ করে কুমারের একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আচ্ছা বিমল, বাঘের গর্তে ডাকাতের কবল থেকে—'

বিমল বললে, 'আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছিলুম। কিন্তু এ-জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই! কুমার, পিছন ফিরে দেখ, ঘরের ভেতরে ও আবার কে এলো!'

কুমার ফিরে দেখে, একমুখ হাসি নিয়ে, দু-পাটি দাঁত বের করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের পুরাতন ভৃত্য রামহরি!

কুমার বললে, 'কি-আশ্চর্য। তুমি আবার কোত্থেকে এলে?'

রামহরি বললে, 'আরে দুয়ো কুমারবাবু, দুয়ো! তুমিও আমাদের চিনতে পার নি। আমি যে নিচে দরোয়ান সেজে থাকতুম! পরচুলোর দাড়ি-গোঁফ ফেলে আবার রামহরি হয়ে, এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম! আরে, দুয়ো কুমারবাবু, দুয়ো! কি ঠকানটাই ঠকে গেলে!'

জোরিনার কণ্ঠহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবলাবিবি নয়, অবলাবাবু

আজকের বিকালবেলাটা বিমলের কাছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। কারণ তার অষ্টপহরের সঙ্গী কুমার বেড়াতে গিয়েছিল মামার বাড়িতে, শান্তিপুরে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল আনমনে।

এমন সময়ে নীচে থেকে মেয়ে-গলায় ডাক এল, 'বিমলবাবু বাড়িতে আছেন?'

বিমল বিস্মিত হল। কারণ আজ পর্যন্ত কোনও মহিলা আগন্তুকই রাস্তা থেকে এভাবে গলাবাজি করে তার নাম ধরে ডাকেননি।

চেঁচিয়ে বললে, 'রামহরি, কে ডাকছেন দ্যাখো! ওঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি এখনই যাচ্ছি।'

রামহরি নিজের মনেই বকবক করতে করতে এগিয়ে গেল—'কালে কালে আরও কতই দেখতে হবে, জানিনে বাপু! রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েরাও বাবুদের মতো নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকে! হল কি!'

গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বিমলও নীচে নেমে গেল।

বৈঠকখানায় ঢুকে সবিস্ময়ে দেখলে, একখানা কৌচ জুড়ে বসে আছে অতিকায় এক পুরুষমূর্তি—মানুষের এত মস্ত চেহারা প্রায় অসম্ভব বললেও চলে! উঠে দাঁড়ালে তার মাথা নিশ্চয়ই সাত ফুটের উপরে যাবে, এবং তার বুকের ঘের সহজ অবস্থাতেই বোধহয় পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না। তার রং শ্যাম, মুখের আধখানা প্রকাণ্ড চাপদাড়িতে সমাচ্ছন্ন এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা উদ্দাম পশুশক্তির উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে। বয়েস তার চল্লিশের ভিতরেই।

বিমল ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'যে মহিলাটি আমায় ডেকেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?'

মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হেসে উঠে আগন্তুক বললে, 'না বিমলবাবু, ডাকছিলুম আমিই। আমায় কি আপনি মেয়েমানুষ বলে মনে করেন?'

বিমল চমৎকৃত হয়ে হেসে বললে, 'সর্বনাশ, আপনার মতো প্রচণ্ড পুরুষকে মহিলা বলে শেষটা কি বিপদে পড়ব?'

আগন্তুক বললে, 'আপনার দোষ নেই, আমার গলা শুনে সকলেই ধাঁধায় পড়ে যান, তারপর আমার চেহারা দেখে চমকে ওঠেন! ভগবানের ভুল মশাই, ভগবানের ভুল! তারপরে বাবাও ভুল করে আমার নাম রেখেছেন অবলাকান্ত!'

বিমল একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বললে, 'তাই বুঝি আপনি কুস্তি-টুস্তি লড়ে ভগবানের আর পিতার ভ্রম-সংশোধনের চেষ্টা করেন?'

অবলাকান্ত আবার নারীকণ্ঠে হাসতে শুরু করে দিলে।

ওই চেহারার ভিতর থেকে মেয়ে-হাসি শুনে বিমল কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল,—এ যেন জয়ঢাক ফুঁড়ে বেরুচ্ছে সেতারের প্রিং-প্রাং!

সে বললে, 'আমার কাছে কি মশাইয়ের কোনও দরকার আছে!' এবং বলেই লক্ষ করলে, অবলাকান্ত কানা। তার একটা চোখ পাথরের।

অবলাকান্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, আপনাকে আমার অত্যন্ত দরকার! আমি এখানে এসেছি একটা গোপনীয় পরামর্শ করতে!'

—'আমার মতো অচেনা লোকের সঙ্গে আপনি গোপনীয় পরামর্শ করতে এসেছেন? আশ্চর্য কথা বটে!'

—'বিলক্ষণ! কে বললে আপনি আমার অচেনা! আপনাদের দুঃসাহসিকতার কাহিনি বাংলাদেশের কে না জানে? খালি কি বাংলাদেশ? মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত আপনাদের চিনে ফেলেছে! তাই তো এসেছি আপনার কাছে!'

বিমল কৌতূহলী স্বরে বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে **বলুন তো**?'—'হ্যাঁ, তাই বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু তার আগে অঙ্গীকার করুন, আমা**র গুপ্তকথা** আর কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না?'

—'বেশ অঙ্গীকার করছি।'

অবলাকান্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আ**পনারা এক**বার অসমে যকের ধন আনতে গিয়েছিলেন তো?'

—'হুঁ।'

—'আমি কিন্তু এই কলকাতাতেই এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।'

বিমল তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে বসে বললে, 'কী রকম?'

—'শুনুন বলি—আমি টালিগঞ্জের পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিটে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি। বাড়িখানা খুব বড়ো আর পুরোনো। শুনেছি কোন সেকালে এখানে নাকি এক রাজা বাস করতেন—এখন তাঁর বংশের কেউ নেই। এই বাড়ির সিঁড়ির তলায় চোর-কুঠরির মতন একখানা ঘর আছে, সে ঘর আমরা ব্যবহার করি না। এই ঘরেরই এক দেয়ালে হঠাৎ আমি একটা গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করেছি।'

বিমল বললে, 'সেকালকার অনেক ধনীর বাড়িতেই এমন গুপ্তদ্বার পাওয়া যায়। এ আর এমন আশ্চর্য কী? আপনি কি সেই গুপ্তদ্বার খুলেছেন?'

—'হ্যাঁ?'

—'খুলে কী দেখলেন?'

—'খালি অন্ধকার।'

—'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন? অমন অনেক গুপ্তদ্বারই আমি দেখেছি। তাদের পিছনে অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু কোনও রহস্য থাকে না।'

—'আগে আমার কথা শুনুন। গুপ্তদ্বার খুলে প্রথমে দেখলুম অন্ধকার। তারপর আলো জ্বেলে দেখলুম, একটা সরু পথ। সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়েই কি হল জানেন?'

—'কী হল?'

বিমল দেখলে, অবলাকান্তের পাথরের চোখে কোনও ভাবান্তর হল না বটে, কিন্তু তার অন্য চোখটি দারুণ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ভীত অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, 'পথটা কতখানি লম্বা জানি না, কারণ, আমার লণ্ঠনের আলো সামনের অন্ধকার ঠেলে বেশিদূর যেতে পারেনি। আমিও হাত পাঁচ-ছয়ের বেশি যেতে না যেতেই শুনতে পেলুম, নিরেট অন্ধকারের ভিতর থেকে বিকট, অমানুষিক স্বরে কে গর্জন করে উঠল। তারপরেই শুনলুম যেন কাদের দ্রুত পদশব্দ--যেন কারা দৌড়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে! ভয়ে পাগলের মতো হয়ে আবার বাইরে পালিয়ে এলুম। সে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়েছি।'

বিষম কৌতূহলে বিমলের দুই চক্ষু জ্বলে উঠল—এতক্ষণ পরে জাগল তার সত্যিকারের আগ্রহ!

অবলাকান্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস সেই গুপ্তদ্বারের পিছনে যকেরা পাহারা দেয়, আর তার ভিতরে আছে গুপ্তধন! কিন্তু গুপ্তধনের লোভে তো আর প্রাণ দিতে পারি না মশাই?'

বিমল বললে, 'ওখানে গুপ্তধন আছে কি না জানি না, কিন্তু যক-টক যে নেই এটা একেবারে নিশ্চিত। ওসব আমি মানি না।'

অবলাকান্ত বললে, 'আমার চেহারাটাই কেবল প্রকাণ্ড, আপনার মতন দুর্জয় সাহস আমার নেই! আর এ-রকম ব্যাপারে আপনার মাথা খুব খেলে জেনেই তো পরামর্শ করতে এসেছি! এখন আমার কী করা কর্তব্য!'

—'সেই গুপ্তদ্বারটা আগে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

—'কেন পারব না? মনে রাখবেন, গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে আপনিও তার অংশ থেকে বঞ্চিত হবেন না!'

বিমল শুষ্কস্বরে বললে, 'গুপ্তধনের কথা এখন থাক। সুড়ঙ্গের রহস্যটা কী আমি কেবল তাই জানতে চাই! আপনি কি এখনই আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন?'

—'অনায়াসে। ট্যাক্সিতে চড়ে সেখানে যেতে আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

—'তাহলে উঠে পড়ুন। আজ আমি জায়গাটা খালি চোখে দেখে আসব। কর্তব্য স্থির করব পরে।'

টালিগঞ্জের যে-জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি থামল সেখানটাকে কলকাতা শহরের এক প্রান্ত না বলে প্রায় নির্জন জঙ্গলের প্রান্ত বলা উচিত। লোকজনের আনাগোনা খুব কম—দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল দু-একজন মানুষের উচ্চ কণ্ঠস্বর বা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। অসিন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়ায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে অবলাকান্তের সঙ্গে বিমল আরও সরু এমন একটি পথে প্রবেশ করল, যেখান দিয়ে গাড়ি চলবার উপায় নেই।

বেশ খানিকটা এগিয়ে পাওয়া গেল একখানা জরাজীর্ণ, কিন্তু প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই নাকি অবলাকান্তের রাজবাড়ি। কত যুগ আগে সে যে রাজার উপযোগী ছিল, তাকে দেখে আজ তা অনুমান করা সহজ নয়। তার চারিদিকের জঙ্গলাকীর্ণ জমি আচ্ছন্ন করেই কেবল মান্ধাতার আমলের বুড়ো বুড়ো গাছ বিরাজ করছে না, নিজের গায়ে অর্থাৎ দেওয়ালের

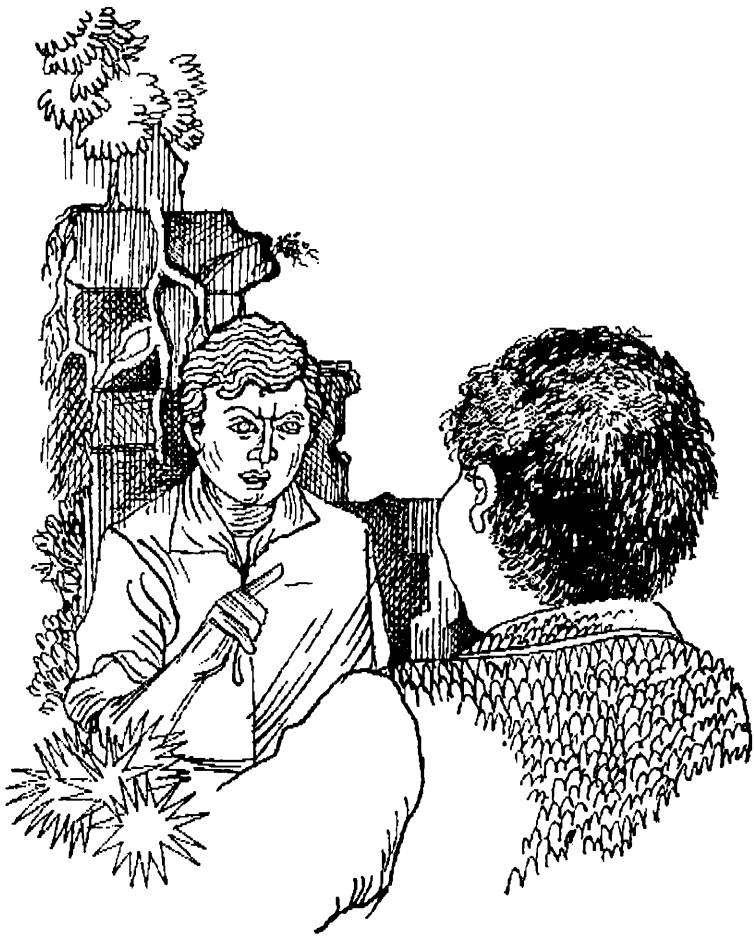

ওপরেও সে আশ্রয় দিয়েছে রীতিমতো হোমরা-চোমরা অশ্বত্থ-বটকে। অনেক জায়গাতেই জানলা-দরজা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বদলে রয়েছে কতকগুলো হাঁ-হাঁ করা গর্ত।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'অবলাকান্তবাবু, এ বাড়িতে থাকেন কী করে?'

অবলাকান্ত বললে, 'বাড়ির বর্তমান মালিকের এমন পয়সা নেই যে এর আগাগোড়া মেরামত করেন। কিন্তু তিনি একটা মহল ভালো করেই সংস্কার করে দিয়েছেন, কাজেই আমার অসুবিধা হয় না। এই যে, এইদিকে আসুন।'

হ্যাঁ, বাড়ির এ অংশটা বাসের উপযোগী বটে। উপরের কোনও কোনও ঘরে আলো জ্বলছে, নীচের সদর-দরজার সামনে বসে এক দারোয়ান।

অবলাকান্ত দারোয়ানের কাছ থেকে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে আগেই সেই চোর-কুঠরিটা দেখিয়ে আনি।'

দু-দিকের কয়েকটা ঘর পার হয়েই তারা একটা উঠানে গিয়ে পড়ল। উঠানের এককোণে সেকেলে সিঁড়ির সার এবং তার তলায় একটা মাঝারি আকারের দরজা, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত—গায়ে তার লোহার কীল মারা।

অবলাকান্ত দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আড়ষ্ট স্বরে বললে, 'ওই দরজাটা খুললেই ওর ভেতরে পাবেন সেই ভয়াবহ গুপ্তদ্বার! সত্যি বলছি বিমলবাবু, আমার কিন্তু এখানে আর দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না!'

বিমল বাইরের দরজা খুলে ফেলে বললে, 'আপনার ভয় দেখে আমার হাসি পাচ্ছে! কই গুপ্তদ্বার কোথায়? আলোটা ভালো করে তুলে ধরুন দেখি!' সে একেবারে চোর-কুঠরির ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল—এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল চোর-কুঠরির দরজা! ঘোর অন্ধকার!

ভিতর থেকে বিস্মিত কণ্ঠে বিমল বললে, 'একি অবলাকান্তবাবু, দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

বাহির থেকে শব্দ শুনে বোঝা গেল, চোর-কুঠরির দরজায় শিকল তুলে দেওয়ার ও তালা-চাবি-লাগানোর শব্দ!

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বিমল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'দরজা খুলে দিন অবলাকান্তবাবু! আমি এ-রকম ঠাট্টা পছন্দ করি না!'

বাহির থেকে নারীকণ্ঠে খিলখিল করে হেসে উঠে অবলাকান্ত বললে, 'ঠাট্টা নয় হে বিমল, ঠাট্টা নয়! আজ তুমি আমার বন্দি!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামহরি যা শোনে, ভোলে না

মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে কুমার প্রথমেই ছুটল বিমলের বাড়িতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এল বাঘা। তখন সকাল।

এ রাস্তায় বিমলদের দু-খানা বাড়ি ছিল। একখানা খুব বড়ো এবং একখানা খুব ছোটো। বড়ো বাড়িখানায় বাস করতেন বিমলের বহু আত্মীয়-স্বজন—যাঁদের সঙ্গে আমাদের গল্পের কোনও যোগ নেই।

ছোটো বাড়িখানায় বাস করত বিমল নিজে। সে বহু লোকের গোলমাল সহ্য করতে পারত না, তাই ফাই-ফরমাস খাটবার পক্ষে রামহরিই ছিল যথেষ্ট। বড়ো বাড়িতে যেত কেবল দু-বেলা দুটি আহার করবার জন্যে। বাকি সময়টা তার কেটে যেত ছোটো বাড়ির ছোট্ট বৈঠকখানায় বা লাইব্রেরিতে বসে কখনও পড়াশুনা করে এবং কখনও কুমারের সঙ্গে বিচিত্র ও অসম্ভব সব স্বপ্ন দেখে। শান্তিপূর্ণ নির্জনতায় বাড়িখানিকে মনে হত যেন আশ্রমের মতো।

এ-বাড়ির আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, পিছনকার বাগান। বিমল ও কুমারের যত্নে এই মাঝারি বাগানখানি সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে এমন অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যে, অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ উদ্যানকেও লজ্জা দিতে পারত অনায়াসেই। তারা যখনই পৃথিবীর যে-কোনও দেশে গিয়েছে, তখনই সেখান থেকে নিয়ে এসেছে নানা-জাতের গাছ-গাছড়া। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশের গাছ ও চারার সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করে এখানে বাংলার নিজস্ব বনভূমির রং, গন্ধ, শ্যামলতা।

আঁকাবাঁকা করে কাটা একটি খাল নদীর অভাব মেটাবার চেষ্টা করে। টলমলে জলে দোলে পদ্মফুল, আশেপাশে বাহারি ঝোপঝাপ, ছোট্ট নকল পাহাড়, কোথাও সুদৃশ্য সেতু চলে গিয়েছে এ-পার থেকে ও-পারে। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর আছে কৃত্রিম ঝরনা। ফুলন্ত লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন এতটুকু একখানি কুঁড়েঘরেরও অভাব নেই। বড়ো বড়ো গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকোনো সব খাঁচায় বসে নানান পাখি মিষ্টি সুরের আলাপে চারিদিক করে তুলেছে সঙ্গীতময়। বাগানে এসে দাঁড়ালেই বিস্ময় জাগে, এত অল্প জায়গার ভিতরে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ সম্ভবপর হল কেমন করে?

কুমার বাড়ির সদর-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বৈঠকখানায় কেউ নেই, লাইব্রেরিও শূন্য। উপরে উঠেও কারুর দেখা পেলে না। একটু আশ্চর্য হয়ে ডাকলে 'বিমল, বিমল! ...রামহরি!'

কারুর সাড়া নেই।

বাঘা ব্যস্তভাবে এ-ঘরে ও-ঘরে ঢুকে ঘেউ-ঘেউ ভাষায় বোধ করি বিমল ও রামহরিকেই ডাকতে লাগল।

কুমার ভাবলে, বিমল তাহলে বাগানের দিকে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে আবার নীচে নামবার উপক্রম করছে, এমন সময় সবিস্ময়ে দেখলে, রেলিং ধরে কাতরভাবে উপরে উঠছে রামহরি—তার মাথার চুল, মুখ ও দেহ রক্তমাখা!

মুহূর্তকাল হতভম্বের মতো থেকে কুমার বললে, 'রামহরি, এ-কী ব্যাপার?'

রামহরি ধপাস করে সিঁড়ির ধাপের উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুণ্ডার হাতে পড়েছিলুম বাবু!'

—'গুণ্ডার হাতে!'

রামহরি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কাল বৈকালে একটা দুশমন চেহারার লোক এসে

খোকাবাবুকে ডেকে নিয়ে যায়! অনেক রাত পর্যন্ত খোকাবাবু ফিরল না বলে আমি যখন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ সদর-দরজায় কড়া-নাড়া শুনে গিয়ে দেখি, একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কি রামহরি?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ।' সে বললে, 'বিমলবাবু তোমাকে ডাকছেন। শিগগির চলো।' সামনেই একখানা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আমি আর দ্বিরুক্তি না-করে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। তারপর আমরা যখন গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পাশ থেকে সেই লোকটা হঠাৎ লাঠি তুলে এমন জোরে আমার মাথার ওপর মারলে যে, আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। জ্ঞান হবার পর দেখলুম, সকাল হয়ে গেছে, আমি একটা গাছতলায় শুয়ে আছি, আর গুণ্ডারা গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে!'

কুমার চমৎকৃত স্বরে বললে, 'রামহরি, তুমি যা বললে তার কোনও মানে হয় না। তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন ভাবে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য কী?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবু! তারা কি পাগল, না আমার শত্রু?'

—'তারা যদি তোমার শত্রু হবে, তবে বিমল কোথায় গেল? সে এখনও ফেরেনি কেন?'

রামহরি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'অ্যাঁঃ, খোকাবাবু এখনও ফেরেনি? বলো কি গো! তবে কি তারা চোর-ডাকাত? ফন্দি খাটিয়ে খোকাবাবু আর আমাকে পথ থেকে সরিয়ে তারা কি এ-বাড়ির সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে?'

কুমার মাথা নেড়ে বললে, 'না, রামহরি, না! এ-বাড়িতে লুট করার মতো কোনও সম্পত্তি থাকে না! এ-বাড়ির সব চেয়ে মূল্যবান নিধি হচ্ছে, বিমল নিজেই।—তাকেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্য কোনও গূঢ় রহস্য আছে।'

হঠাৎ নীচে সদর-দরজার কাছ থেকে উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আরে, আরে! এ বাড়ি যে আমি চিনি! কী আশ্চর্য, এ যে বিমলবাবুর বাড়ি! হুম!'

কুমার তখনই বুঝতে পারলে, এ হচ্ছে পুলিশ ইন্‌স্পেকটার সুন্দরবাবুর গলা! গত বৎসরে তাঁর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে নামতেই দেখলে সুন্দরবাবু দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

—'একি, সুন্দরবাবু যে, নমস্কার! আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন!'

—'ঠিক সময় এসেছি মানে?'

—'কাল এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সুন্দরবাবু!'

—'হুম, সেইজন্যেই তো আমি তদারক করতে এসেছি!'

—'তাহলে বিমলের খোঁজ আপনারা পেয়েছেন?'

—'হুম! আমি বিমলবাবুর খোঁজ করবার জন্যে এখানে আসিনি! আমি এসেছি আপনাদের বাগানে চোরের পায়ের ছাপ খুঁজতে!'

—'আমাদের বাগানে? চোরের পায়ের ছাপ? কী বলছেন!'

—'কিচ্ছু ভুল বলিনি। জানেন, কাল রাতে জেরিনার কণ্ঠহার চুরি গিয়েছে? আগে তার দাম ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, কিন্তু এখন তাকে অমূল্য বলাও চলে!'

—'জেরিনার কণ্ঠহার? সে আবার কী?'

—'শুনুন তবে—রুশিয়ার সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীকে জার আর জেরিনা বলে ডাকা হত, জানেন তো? রুশিয়ার সম্রাজ্ঞীর গলায় ছিল একছড়া মহামূল্য হিরার হার। কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবের সময় জার আর জেরিনাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন এই আশ্চর্য কণ্ঠহার কেমন করে রুশদেশের বাইরে গিয়ে পড়ে। বিজয়পুরের মহারাজা গেল বছরে ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে প্রকাশ্য নীলামে আধকোটি টাকা দিয়ে সেই হার কিনে আনেন।'

—'কিন্তু কোনও নির্বোধ ধনী যদি আধকোটি টাকা খরচ করে কতকগুলো দুর্লভ, অকেজো কাচ কিনে বসেন, তার জন্যে আমাদের মাথা-ব্যথার দরকার কি?'

—'আ-হা-হা শুনুন না! দরকার আছে বইকী! জেরিনার সেই কণ্ঠহার কাল রাতে চুরি গিয়েছে!'

—'আপদ গিয়েছে! এখন তা নিয়ে দুঃখ করবার সময় আমার নেই!'

—'আপনি বয়সে নবীন কিনা, তাই আসল কথা শোনবার আগেই অধীর হয়ে উঠছেন! কুমারবাবু আপনি কি জানেন না, বিজয়পুরের মহারাজা কলকাতায় এসে আপনাদেরই বাগানের পিছনকার মস্ত বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে বাস করছেন?'

—'তা আবার জানি না? রাজকীয় ধুমধামের চোটে এ-পাড়ার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে!'

—'বিজয়পুরের মহারাজা কাল মহারানিকে নিয়ে মোটরে করে কলকাতার বাইরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত্রিবেলায় ফেরবার সময়ে পথে হঠাৎ মোটরের কল বিগড়ে যায়। ফলে মোটরকে আবার কার্যক্ষম করে নিয়ে বাড়িতে আসতে তাঁদের অনেক রাত হয়। ইতিমধ্যে কখন যে মহারাজের শোবার ঘর থেকে জেরিনার কণ্ঠহার চুরি গিয়েছে, সে-কথা কেউ জানে না। আজ সকালে সেই চুরির কথা প্রকাশ পেয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মামলার কিনারা করবার জন্যে ডাক পড়েছে ছাই ফেলতে ভাঙা-কুলো এই সুন্দর চৌধুরির! আমি এসে দেখলুম—'

—'আপনি এসে কী দেখলেন, তা জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই! আমি এখন—'

কুমারকে থামিয়ে দিয়ে সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আপনি কথায় কথায় বড্ড বেশি বাধা দিচ্ছেন কুমারবাবু! আগে আমি কী বলি শুনুন, নইলে পথ ছেড়ে দিন, আমি এই বাড়ির ভিতরটা আর বাগানের চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখে আসি!'

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন?'

—'কারণ আমার মতন ঝানু ইন্‌স্পেকটারের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়! আমি আবিষ্কার করেছি যে, চোরেরা এই বাড়ির পিছনকার বাগানের পাঁচিল টপকে মহারাজার বাড়িতে ঢুকে জেরিনার কণ্ঠহার চুরি করে আবার এই দিক দিয়েই ফিরে এসেছে! রাজবাড়ি থেকে আজ যখন আপনাদের বাগানটাকে দেখলুম তখন বুঝতে পারিনি যে, এটা বিমলবাবুর বাড়ি—কারণ এ-বাড়িতে এসে আমি অনেক চা, টোস্ট, ওমলেট উড়িয়েছি বটে, কিন্তু কোনওদিন ওই বাগানটার দিকে যাইনি। কিন্তু বাড়ির সামনের দিকে এসেই বিমলবাবুর বাড়ি চিনতে পেরেছি। এখন আমি এই বাড়ির সর্বত্র খানাতল্লাশ করতে চাই,—হুম! কী করব বলুন, 'ডিউটি ইজ ডিউটি'!

প্রথমটা কুমারের মন রাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! আরক্ত মুখে সে কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা সত্য আবিষ্কার করে ফেলে নিজেকে সামলে নিলে এবং তারপরেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'বুঝেছি—বুঝেছি, এতক্ষণ পরে বুঝেছি! এই জন্যেই বিমল হয়েছে অদৃশ্য আর রামহরি হয়েছে আহত!'

সুন্দরবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'কুমারবাবু, আপনার এসব কথার অর্থ কী? কে অদৃশ্য, আর কে আহত হয়েছে?'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু এতক্ষণ আমরা দুজনেই অন্ধকারে বাস করছিলুম, তাই কারুর কথা কেউ বুঝতে পারছিলুম না! এইবার আমি এসেছি অন্ধকার থেকে আলোকে!'

—'হুম, তার মানে?'

—'আগে রামহরির গল্প শুনুন,—রামহরি, রামহরি!'

রামহরি ওপর থেকে নীচে নেমে এল। তাকে দেখেই সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, 'এ কী রামহরি, তোমার এমন মূর্তি কেন?'

রামহরি আবার তার গল্প বললে। সুন্দরবাবু সব শুনে মহাবিস্ময়ে বললেন, 'অ্যাঁঃ বলো কী? বিমলবাবু অদৃশ্য!'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমলের অদৃশ্য হওয়ার কারণ অনুমান করতে পারছেন?'

—'হুম, এখনও আমি কারণ-টারণ অনুমান করবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আপনি কি অনুমান করেছেন?'

—'ভেবে দেখুন সুন্দরবাবু! একদল চোর যদি এই বাড়ির ভিতর দিয়ে বিজয়পুরের মহারাজার বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে চায়, তাহলে তারা কি চুরির আগে বিমল আর রামহরিকে যে কোনও কৌশলে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করবে না?'

সুন্দরবাবু বেজায় উৎসাহে লাফ মেরে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন কুমারবাবু!...রামহরি, রামহরি! কাল বিকেলে যে-লোকটা বিমলবাবুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, তার চেহারা কী রকম বলতে পারো?'

—'তা কেন পারব না? তার মতন ঢ্যাঙা আর লম্বা-চওড়া চেহারা আমি আর কখনও দেখিনি, বাবু! মুখে মস্ত গোঁফ-দাড়ি, কিন্তু তার গলার আওয়াজ ঠিক মেয়েমানুষের মতো! তার চেহারা দেখলে ভয় হয়, কিন্তু গলা শুনলে হাসি পায়।'

—'হুম। রাত্রে যে তোমার কাছে এসেছিল, তাকে আবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?'

—'তা আবার পারব না, তাকে আর একবার দেখবার জন্যে আমার মন যে ব্যাকুল হয়ে আছে!'

—'আমরাও কম ব্যাকুল নই হে! আচ্ছা রামহরি, বিমলবাবু কোথায় যাচ্ছেন বেরুবার সময়ে সেকথা তোমাকে বলে যাননি?'

—'না...তবে হ্যাঁ, একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে! আমি একবার ঘরের দরজার কাছ দিয়ে যেতে যেতে শুনেছি বটে, খোকাবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে সেই গুণ্ডার মতন লোকটা বলছে—'আমি টালিগঞ্জের পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি।'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিট! পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিট! ঠিক শুনেছ রামহরি?'

—'হ্যাঁ গো বাবু, হ্যাঁ। আমি একবার যা শুনি তা আর কখনও ভুলি না।'

—'হুম, তোমার এ অভ্যাসটি ভালো বলতে হবে। কুমারবাবু, এখন আমাদের কী কর্তব্য বলুন দেখি?'

—'পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিটের দিকে সবেগে অগ্রসর হওয়া।'

—'ঠিক বলেছেন। এই আমি মহাবেগে অগ্রসর হলুম, হুম।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবলার ছবি

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, এই যে মণিলাল বসু স্ট্রিট।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাব্বাঃ। কোন রসিক এই গলিটার নাম রেখেছে, স্ট্রিট! এটা শহরের রাস্তা, না জঙ্গলের পথ? এই সেপাইরা, হুঁশিয়ার! গলির ভেতর থেকে কারুকে বেরুতে দিয়ো না, খবরদার!'

পানায়-সবুজ পচা জলে ভরা পুকুরের পাশ দিয়ে, দু-ধার থেকে ঝুঁকে-পড়া বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, নড়বড়ে কুঁড়েঘর আর ভাঙা ভাঙা ছোটো ছোটো বাড়ি আর ঝোপঝাপ জঙ্গল, আদ্যিকালের অশথ-বট-আম-কাঁঠাল গাছের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথের সঙ্গে মোড়ের পর মোড় ফিরতে ফিরতে সদলবলে কুমার খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেলে সেই মান্ধাতার আমলের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা। সকালবেলার সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণে তার দীনতা ও জীর্ণতা যেন আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে।

কুমার বললে, 'ওইখানাই পাঁচ নম্বরের বাড়ি বলে বোধ হচ্ছে।'

এগুতে এগুতে সুন্দরবাবু বললেন, 'ও বাড়ির আবার নম্বর আছে নাকি? ও তো মস্ত বড়ো ভাঙা ঢিপি!' কুমার বললে, 'না, না, এদিকে এসে দেখুন। এদিকটাতে দেওয়ালের গায়ে অশথ-বটরা রাজত্ব বিস্তার করতে পারেনি, চুন-বালির প্রলেপ ঠেলে বাড়ির কঙ্কালও বেরিয়ে পড়েনি। ওই দেখুন, সদর-দরজায় একজন দরোয়ানও অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

কিন্তু দারোয়ানের সেই বিস্মিত ভাব স্থায়ী হল না। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল এবং তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বটে, বটে, হুম। পুলিশ দেখেই লোকটা যখন ভড়কে গেল, তখন বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।'

কুমার দৌড়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখে বললে, 'এই তো পাঁচ নম্বরের বাড়ি!'

সুন্দরবাবু বেজায় জোরে দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকলেন, 'দরোয়ান। দরোয়ান। এই বেটা পাজির পা-ঝাড়া।'

কেউ সাড়া দিলে না।

কুমার বললে, 'এত বড়ো বাড়ি ঘিরে ফেলবার মতো লোক আমাদের সঙ্গে নেই। ওদিকে দরওয়ানটা বাড়ির ভেতরে গিয়ে এতক্ষণে খবর দিয়েছে, সময় পেলেই বদমাইশরা কোন দিক দিয়ে পালাবে, কে জানে? সুন্দরবাবু, আসবার সময়ে আপনি তো সার্চ-ওয়ারেন্ট বার করে এনেছেন, দরজাটা ভেঙে ফেলুন না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তা ছাড়া আর উপায় নেই দেখছি।... জমাদার, তোমরা সবাই মিলে দরজাটা লাথি মেরে ভেঙে ফ্যালো তো।'

পাহারাওয়ালাদের দমাদ্দম লাথির আঘাত সেই পুরাতন দরজা বেশিক্ষণ সইতে পারলে না, তার ভিতরকার খিল গেল ভেঙে।

ভিতরে প্রবেশ করল সর্বাগ্রে কুমার, তারপর সুন্দরবাবু, তারপর জমাদার ও জনকয়েক পাহারাওয়ালা। সকলে উঠানের উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওই তো দেখছি ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। কিন্তু রোসো, আগে নীচের ঘরগুলোই খুঁজে দেখি। আরে আরে, ও কী ও?'

দুম, দুম, দুম করে একটা শব্দ শোনা যেতে লাগল।

কুমার এক-ছুটে সিঁড়ির তলাকার সেই লোহার কীল মারা দরজাটার সুমুখে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, ভেতর থেকে কে ওই দরজায় ধাক্কা মারছে!'

দ্বারের ওপাশ থেকে জাগল বিমলের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর—'কুমার, কুমার! আমি অন্ধকূপে বন্দি, আমাকে উদ্ধার করো বন্ধু!'

আনন্দে পাগলের মতো হয়ে কুমার সেই বদ্ধ-দ্বারের উপর মারতে লাগল প্রচণ্ড লাথির পর লাথি!

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠান্ডা হোন কুমারবাবু, ঠান্ডা হোন! হাতি লাথি মারলেও এ দরজা ভাঙবে কি না সন্দেহ। কিন্তু দরজা ভাঙবার দরকার কী? দেখছেন না, ওপরে খালি শেকল লাগানো রয়েছে, তালা পর্যন্ত নেই?'—বলেই তিনি শিকল খুলে দিলেন।

দরজা খুলে বিমল বাইরে আসতেই তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কুমার বলে উঠল, 'বিমল! এত সহজে তোমাকে যে ফিরে পাব স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি!'

বিমল শ্রান্ত স্বরে বললে, 'এতক্ষণ অন্ধকূপে বন্ধ থেকে হঠাৎ বাইরের আলোতে এসে কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না! একটু সবুর করো ভাই, নিজেকে আগে সামলে নি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা এইখানেই থাকুন, ততক্ষণে আমি বাড়ির ভেতরটা খানাতল্লাশ করে আসি। জমাদার, সেপাইদের নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।'

পুলিশের দলবল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। বিমল মিনিট-দুই চুপ করে থেকে বললে, 'এইবারে তোমার কথা বলো, কুমার! কেমন করে তোমরা জানতে পারলে আমি এখানে বন্দি হয়ে আছি?'

কুমার সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণনা করে বললে, 'এখন বলো, তোমার মতন অসাধারণ লোককে এরা বন্দি করেছিল কোন কৌশলে?'

বিমল তিক্তস্বরে বললে, 'ভাই, আমি অসাধারণ লোক নই, কারণ বন্দি হয়েছি তুচ্ছ একটা সাধারণ প্যাঁচে। এ ভাবে তুমি বন্দি হলে তোমাকে আমিও বোকা ছাড়া আর কিছু বলতে পারতুম না। রামহরি যে ঢ্যাঙা লম্বা-চওড়া দুশমন চেহারার লোকটার কথা বলছে, সে কেবল মহাশক্তিশালী নয়, মহাচতুরও বটে; সে জানে আমার দুর্বলতা কোথায় আর সেই হিসাবেই আমাকে ধরবার ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু এতক্ষণ আকাশ-পাতাল ভেবেও আমি ঠাওরাতে পারিনি, আমাকে এভাবে বন্দি করে তার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! এখন তোমার মুখে সমস্ত শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তার নাম অবলাকান্ত, যদিও তার চেহারাটা হচ্ছে নামের মূর্তিমান প্রতিবাদ। আবার অবলার গলার আওয়াজেও পাবে তার চেহারার প্রতিবাদ। সে—' বলতে বলতে বিমলের দুই চোখ উঠল চমকে। সে স্পষ্ট দেখলে, উঠানের পশ্চিম দিকের রৌদ্রোজ্জ্বল দেওয়ালের উপরে পড়েছে একটা আবক্ষ নরমূর্তির কালো ছায়া।

অত্যন্ত আচম্বিতে বিমল উপর-পানে মুখ তুলে তাকালে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলে, প্রকাণ্ড একখানা মুখ ছাদের কার্নিসের ধার থেকে সাঁৎ করে সরে গেল।

বিমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কুমার, কুমার। ওই সেই অবলাকান্ত। ছাদের ধার থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে সূর্যদেব তাকে ধরিয়ে দেবেন। চলো, চলো, ওপরে চলো।'

দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে তারা দুজনে দেখলে তেতলার সিঁড়ির মুখে পাহারাওয়ালাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুন্দরবাবু।

হতাশভাবে তিনি বললেন, 'কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই, সব ব্যাটাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।'

বিমল বললে, 'আপনি তেতলায় এখনও ওঠেননি?'

—'হুম, নিশ্চয় উঠেছি। তেতলায় তো মোটে দুখানা ঘর। কোনও ঘরেই কেউ নেই, সব ভোঁ-ভোঁ।'

—'না সুন্দরবাবু, আমি এইমাত্র স্বচক্ষে দেখেছি, সেই পালের গোদা অবলাকান্ত তেতলার ছাদের ওপর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে।'

—'অবলাকান্ত আবার কে?'

—'যে আমাকে বন্দি করেছিল। আসুন আবার তেতলায়।' —বলেই বিমল তেতলার সিঁড়ি দিয়ে বেগে উপরে উঠতে লাগল।

তেতলার উত্তর দিকে দুখানা বড়ো ঘর, অন্য তিনদিকে খোলা ছাদ। কিন্তু ছাদে কেউ নেই।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, লোকজন নিয়ে আপনি ওই ঘর-দুখানার দিকে যান। এসো কুমার, আগে আমরা ছাদটা দেখে আসি।'

কুমার বললে, 'ছাদ চোখের সামনেই পড়ে আছে, কোথাও একটা চড়াই পাখি পর্যন্ত নেই।'

—'কিন্তু ছাদের তলায় কী আছে সেটা দেখা দরকার—যদি ছাদ থেকে অদৃশ্য হবার কোনও উপায় থাকে।'

ছাদের তলায় পূর্বদিকে রয়েছে প্রায়-দুর্ভেদ্য সবুজ জঙ্গল। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা,

জামরুল, নোনা, ডুমুর, নারিকেল, সুপুরি ও খেজুর প্রভৃতি ফলগাছের বাহুল্য দেখে বোঝা যায় আগে সেখানটা ছিল বাগান। এখনও সেখানে বেঁচে রয়েছে অশোক, রঙ্গন, কৃষ্ণচূড়া, চাঁপা ও বকুল প্রভৃতি পুষ্পতরু। তাদের ভিতর থেকে সাড়া দিচ্ছে কোকিল, বউ-কথা-কও ও শ্যামা প্রভৃতি গীতকারী পাখির দল। ফলের ফসল আর নেই বললেও চলে, ফুলের বাসর ভেঙেছে, কিন্তু পাখিদের গানের আসর আজও বসে আগেকার মতোই।

দক্ষিণদিকে খানিকটা ঝোপঝাপ-ভরা খোলা জমির পর মস্ত বড়ো একটা দিঘি। তার পানায় আচ্ছন্ন বুকের দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করলে সন্দেহ হয়, সেটা যেন একটা তৃণশ্যামল মাঠ। তারপরেই দেখা যায় মাঝে মাঝে পানা ছিঁড়ে গেছে, রোদে জল চকচক করছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, দলবদ্ধ শালুকফুলেরও বাহার।

পশ্চিমদিকে মণিলাল বসু লেন।

বিমল সব ভালো করে দেখে-শুনে বললে, 'না, ছাদের কোনওদিক দিয়ে পালাবার কোনও উপায় নেই। অবলাকান্তকে যদি পাওয়া যায়, উত্তরের ওই দুটো ঘরের ভেতরেই পাওয়া যাবে। চলো কুমার।'

তারা সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'বিমলবাবু, আপনি ভুল দেখেছেন। এ দুটো ঘরেই কেউ নেই।'

—'তবু আমি একবার ঘর দুটো দেখব' বলে বিমল প্রথম যে ঘরখানায় ঢুকল সেখানা একেবারেই খালি—এমনকী আসবাবের মধ্যে রয়েছে মাত্র দুখানা শীতলপাটি বিছানো চৌকি।

কিন্তু অন্য ঘরখানা খুব সাজানো! একদিকে একখানা দামি খাট, তার উপরে ধবধবে চাদরে ঢাকা নরম বিছানা। আর একদিকে সোফা-কোচ টেবিল। আর একদিকে একটি আলমারি ও ড্রেসিংটেবিল এবং আর-একদিকের দেওয়ালে রয়েছে খুব পুরু ফ্রেমে আঁটা একখানা 'অয়েল-কালারে' আঁকা প্রকাণ্ড ছবি, সেখানা প্রায় মেঝের উপরে এসে পড়েছে।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, যে মহাপ্রভুকে আমরা খুঁজছি তার ছবির চেহারা দেখুন!'

সুন্দরবাবু ছবির দিকে খানিকক্ষণ বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হুম, অবলা দেখছি মহা বলবান ব্যক্তি! কিন্তু ছবিতে কি এর চেহারা বেশি বড়ো করে আঁকা হয়েছে?'

—'না, এখানা হচ্ছে অবলার 'লাইফ-সাইজে'র ছবি।'

—'ওরে বাবা, বলেন কি? অবলা কী মাথায় সাত ফুটের চেয়েও লম্বা?'

—'বোধহয় তাই।'

—'কিন্তু অবলাকে যখন পেলুম না, তখন তার ছবি নিয়ে আমাদের আর কী লাভ হবে? চলুন, যাই।'

—'আমি স্বচক্ষে তাকে ছাদের ওপর থেকে উঁকি মারতে দেখেছি। কিন্তু এখন সে ছাদেও নেই, এ-ঘরে ও-ঘরেও নেই। এটা যে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। অবলা কি ডানা মেলে উড়ে গেল?' বলতে বলতে বিমল ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কী পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও কী বিমলবাবু, আপনি কি অবলাকে না পেয়ে তার ছবিখানাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চান?'

বিমল খানিকক্ষণ জবাব দিলে না। তারপর কুমারের দিকে ফিরে বললে, 'দ্যাখো তো কুমার, ছবির ওপরে ডানদিকের ওইখানটায় তাকিয়ে!...কী দেখছ?' কুমার ভালো করে দেখে বললে, 'মাকড়সার একটা বড়ো ছেঁড়া জাল।'

—'জালটার খানিকটা রয়েছে দেওয়ালের ওপরে, আর খানিকটা রয়েছে ছবির ফ্রেমের ওপরে। জালটা নিশ্চয়ই সবে ছিঁড়েছে, কারণ মাকড়সাটা এখনও ব্যস্তভাবে তার জাল মেরামত করবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু জালটা ছিঁড়ল কেন?'

সুন্দরবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কী বিপদ, হুম? আসামি কোথায় চম্পট দিলে, আর আপনারা মাকড়সার জাল নিয়েই মেতে রইলেন যে! আপনাদেরও স্বভাব দেখছি, আমাদের শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত ভায়ার মতো!'

বিমল মুখ টিপে হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমি গোয়েন্দা নই। কিন্তু আপনি পুলিশের পাকা লোক হয়েও কি বুঝতে পারছেন না, অমন অস্থানে ছবির ফ্রেম থেকে দেওয়াল পর্যন্ত ছিল যে মাকড়সার জাল, সে-জাল সদ্য সদ্য ছিঁড়ে যাওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক?'

—'কেন, সন্দেহজনক কেন? আপনার কথার অর্থ কী?'

—'আমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, বড়ো ছবিখানাকে এইমাত্র কেউ দেওয়ালের গা থেকে সরিয়েছিল।'

—'সরিয়েছিল তো সরিয়েছিল, তাতে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন?'

—'আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়তো কিছুই নেই, তবে আমিও ছবিখানাকে আর একবার দেওয়ালের গা থেকে সরিয়ে ফেলতে চাই।' —বলেই বিমল ছবিখানাকে দুই হাতে তুলে ধরে দেওয়ালের উপর থেকে সরিয়ে ফেললে।

ঘরসুদ্ধ সবাই চমৎকৃত হয়ে দেখলে, ছবির পিছনেই দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা বন্ধ দরজা।

সুন্দরবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'হুম। বাহাদুর বিমলবাবু।'

বিমল বললে, 'এর মধ্যে আমার বাহাদুরি একটুও নেই। অবলাকান্ত ভারী চালাক বটে, কিন্তু একটু আগে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যদেব, আর একটু পরে এখন তার পথ নির্দেশ করলে তুচ্ছ এক মাকড়সা। সুন্দরবাবু, এই বন্ধ দরজার পিছনে কী আছে জানি না, কিন্তু অবলাকান্ত অদৃশ্য হয়েছে এই পথেই।'

সুন্দরবাবু প্রায় গর্জন করেই বললেন, 'জমাদার। ডাকো সিপাইদের। ভাঙো এই দরজা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু সবাই সাবধান। অবলাকান্ত খুব শান্ত নিরীহ বালক নয়!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি

বিমল ও কুমার বার করলে রিভলভার। কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জোরে লাথি মারতে লাগল দরজার উপর। দরজার পাল্লা-দুখানা দড়াম করে খুলে যেতে দেরি লাগল না।

হুড়মুড় করে সবাই খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ নেই। ছোট্ট এক ফালি ঘর—চওড়ায় চার হাত আর লম্বায় ছয় হাতের বেশি হবে না। একেবারে আসবাব-শূন্য।

এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে সুন্দরবাবু বললেন, 'কই মশাই, কোথায় আপনার অবলা? ফুস-মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?'

উত্তরদিকের দেওয়ালে রয়েছে গরাদহীন একটা ছোটো জানলা। বিমল সেই দিকে ছুটে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, জানলার বাইরে মস্ত একটা হুক থেকে ঝুলছে, মোটা একগাছা দড়ি। তারপর বুক পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, দড়ির অন্য প্রান্ত প্রায় মাটি পর্যন্ত নেমে গেছে এবং তখনও লটপট করে খুব দুলছে।

দড়িগাছা খানিকটা টেনে তুলে সকলকে দেখিয়ে বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, অবলাকে আবার ভূতলে অবতীর্ণ করেছে এই দড়ি। এটা এখনও যখন দুলছে তখন বুঝতে হবে যে, মাটিতে পা দিয়ে অবলা এইমাত্র একে ত্যাগ করেছে।'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, 'হুম, এ যে একেবারে ডিটেকটিভ উপন্যাসের কাণ্ড! আমরা হচ্ছি সত্যিকারের পুলিশ, এর মধ্যে পড়ে আমাদের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যে বাবা! এখন উপায়?'

কিন্তু বিমল তখন সুন্দরবাবুর কথা শুনছিল না। মুখ বাড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নীচের দিকটা পর্যবেক্ষণ করছিল।

এদিক থেকেই এই পাঁচ নম্বরের বাড়ির বিশাল ধ্বংসস্তূপের আরম্ভ। নীচে সামনেই রয়েছে একটা মহলের উঠান, এক সময়ে তার দুই ধারে ছিল সারি সারি ঘর ও টানা বারান্দা, এখন কিন্তু বেশির ভাগই হয়েছে ভূমিসাৎ। উঠানের উপরে রাশি রাশি ইটের ঢিপি, মাঝে মাঝে বুনো চারাগাছ এবং মাঝে মাঝে গর্ত। দুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল, এখনও তারই জল জমে রয়েছে গর্তগুলোর ভিতরে।

বিমল হঠাৎ জানলার ফাঁকে নিজের দেহটা গলিয়ে দিতে দিতে বললে, 'কুমার, তুমিও আমার সঙ্গে এসো এই পথে।'

সুন্দরবাবু হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন, 'আরে মশাই, করেন কী, করেন কী! পড়লে বাঁচবেন না যে।'

—'পড়লে যে মানুষ বাঁচে না, আমিও সেকথা জানি সুন্দরবাবু। কিন্তু না-পড়বার জন্যে আমি কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করব না। এখন আমার জন্যে মাথা না ঘামিয়ে আপনি সিঁড়ি দিয়েই নীচে নেমে যান। তারপর অন্য পথে বাড়ির ওই ভাঙা অংশটায় ঢুকে পড়তে পারেন কি না দেখুন।' বলেই বিমল বাইরে গিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

সুন্দরবাবু দৌড়ে জানলায় গিয়ে বিস্মিত চোখে দেখলেন, বিমল অত্যন্ত অনায়াসে তড়বড় করে দড়ি ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে। তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'বাপ রে বাপ। সিঁড়ির চওড়া ধাপ দিয়েও আমরা এর চেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে পারতুম না! কুমারবাবু, আপনার বন্ধুর উচিত সার্কাসে যোগ দেওয়া।'

রজ্জুর শেষ-প্রান্তে পৌঁছে বিমল মাথা নামিয়ে দেখলে, তার পা থেকে মাটি রয়েছে হাত-তিনেক তফাতে। রজ্জু ত্যাগ করতেই সে পড়ল গিয়ে ইঞ্চি-দুয়েক জল-ভরা জমির উপরে।

সেইখানেই দাঁড়িয়ে সে ঊর্ধ্বমুখে অপেক্ষা করতে লাগল, কারণ কুমারও করেছে তখন রজ্জুকে অবলম্বন।

অল্পক্ষণ পরেই কুমার হল ভূমিষ্ঠ।

উপর থেকে জাগল সুন্দরবাবুর চিৎকার—'ওইখানেই দাঁড়ান আপনারা, আমি এখুনি নেমে ছুটে যাচ্ছি।'

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি কতক্ষণে এখানে এসে পড়তে পারবে, কেউ তা জানে না। তবু তাঁর দলবলের জন্যে বাধ্য হয়ে আমাদের খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেই—কারণ এটা হচ্ছে শত্রুপুরী, সঙ্গে যতবেশি লোক থাকে ততই ভালো। কিন্তু আপাতত পদযুগল চালনা করতে না পারলেও আমরা মস্তিষ্ক চালনা করতে পারব। অতএব এসো কুমার, আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'ব্লাড-হাউন্ডে'র কাজ আরম্ভ করে দি।'

কুমার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'সব দিকেই তো দেখছি ভেঙে-পড়া দেওয়াল, বড়ো বড়ো রাবিশের স্তূপ, ঝোপঝাপ আর এলোমেলো অলিগলি। খুব সহজেই এখানে লুকোনো বা এখান থেকে পালানো যায়। এখন কোনদিকে আমরা অগ্রসর হব, বিমল?'

বিমল বললে, 'কুমার, তুমিও সাধারণ পুলিশ—অর্থাৎ সুন্দরবাবুর মতন হয়ো না। ভগবান তোমাকে অনুভূতি দিয়েছেন, অনুভব করো। দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, ব্যবহার করো।'

কুমার বললে, 'দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করেই তো দেখছি, চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। আর অনুভূতি? হুঁ, অনুভব করছি বটে, আমার পায়ের তলায় রয়েছে জল আর কাদা।'

—'কিন্তু ভাই কুমার, তুমি অনুভব করছ অন্ধের মতো। আর ব্যবহার করছ কেবল স্থূলদৃষ্টি। বড়ো বড়ো স্পষ্ট জিনিস দেখে অপরাধী আর সাধারণ পুলিশ সহজে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারে। পাছে বড়ো বড়ো সূত্র পিছনে ফেলে যায়, সেই ভয়ে অপরাধীও স্পষ্ট প্রমাণগুলোকে নষ্ট করতে ব্যস্ত হয়। আর সাধারণ পুলিশও খোঁজে কেবল অমনি সব বড়ো ও স্পষ্ট সূত্রকে। ফলে সূক্ষ্ম বা ছোটো প্রমাণগুলো ফাঁকি দেয় দুই পক্ষেরই চোখকে। তুচ্ছ মাকড়সার জাল, অবলা তাই তাকে আমলে আনেনি। সুন্দরবাবুর চোখেও তা যথাসময়ে পড়েনি, পড়লে হয়তো অবলা পালাতে পারত না। আর বর্তমান ক্ষেত্রে জলকাদার উপরে দাঁড়িয়ে থেকেও তুমি চোখ ব্যবহার করে দেখছ না যে, এর জের কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে!...কুমার, কুমার! কে যেন চাপা হাসি হাসলে বলে মনে হল না?'

—'চাপা হাসি? কই, আমি শুনিনি তো। বোধহয় তোমার ভ্রম!'

'ভ্রম? হতেও পারে। কিন্তু আমি যেন কার চাপা হাসির আওয়াজ পেলুম।'

—'ও কিছু নয়! তুমি যা বলছিলে বলো। এই জল-কাদার জের কোনখানে গিয়ে পৌঁছোবে?'

—'ওইখানে কুমার, ওইখানে!' বলেই বিমল হাত-ছয়েক তফাতে মাটির উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

কুমার দেখলে, উঠানের যেখানে জল নেই সেখান থেকে উত্তরদিকে চলে গিয়েছে

অনেকগুলো ভিজে পায়ের ছাপ। নিশ্চয় এইমাত্র কেউ এই রজ্জু-অবলম্বন ত্যাগ করে সরে পড়েছে ওইদিকেই, সুতরাং তার অনুসরণ করাও কঠিন হবে না।

কুমার বললে, 'ওঃ, তাই বলো? এতক্ষণে বুঝলুম।'

বিমল বললে, 'কিন্তু ওইটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল আগেই। দড়ি ছেড়ে যখন আমি অবতীর্ণ হলুম ভূতলে, যখনই আমার পায়ের তলায় অনুভব করলুম জল-কাদাকে, সেই মুহূর্তেই আমার মন বললে, —'অবলা কোনদিকে গিয়েছে তা জানা আর কঠিন হবে না। কারণ তাকেও যখন নামতে হয়েছে এই জল-কাদায়, তখন ধরিত্রীর গায়ে পায়ের ছবি না এঁকে কোনওদিকেই সে আর পালাতে পারবে না।' মনে-মনে মনের কথা শুনেই ফিরে দেখলুম, সত্যই তাই। ফিরে না দেখলেও চলত, কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে, চোখে দেখবার আগেই যাদের বলা যায় অবশ্যম্ভাবী!'

কুমার হেসে ফেলে বললে, 'আমি হার মানছি। তুমি তো জানোই ভাই বিমল, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি ততক্ষণ আমি নিজের মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে আর নিজের বুদ্ধিকে মনের কৌটোয় বন্দি করে রাখি। আমার নিজের অস্তিত্ব কেবল প্রকাশ পায় তোমার অসাক্ষাতেই— যেমন পেয়েছিল আজ সকালে, তোমাকে দেখতে না পেয়ে।'

বিমল হেসে সস্নেহে কুমারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'জানি বন্ধু, জানি,—তোমাকে জানতে আমার বাকি নেই। তখন তোমার নিজের অস্তিত্ব জেগেছিল বলেই এত শীঘ্র আমি মুক্তি পেয়েছি।...কিন্তু চোর পালাবার পর আমাদের বুদ্ধি নিয়ে কী করব? সুন্দরবাবু হচ্ছেন জড়ভরত দি সেকেন্ড, এখনও তাঁর আবির্ভাব হল না, আমাদের আর অপেক্ষা করা চলে না। চলো কুমার, অগ্রসর হই। তোমার রিভলভারটা বার করে হাতে নাও।'

কর্দমাক্ত পদচিহ্ন উঠান পার হয়ে উত্তরদিকের একটা ছাদ-ভাঙা দালানের উপরে গিয়ে উঠেছে। তারপর একটু ডানদিকে এগিয়েই বাঁ-দিকে ফিরে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকেছে।

পদচিহ্নের অনুসরণ করে বিমল ও কুমার সে-ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকল আর এক ঘরে। তারপর পদচিহ্ন এমন ক্ষীণ হয়ে গেল যে আর দেখা যায় না।

বিমল চারিদিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, পদচিহ্নের আয়ু তো ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সে যতটুকু পথ নির্দেশ করেছে আমাদের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট। কারণ আমরা বেশ বুঝতে পারছি, প্রথমত, একটু আগে অবলা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়ত, এ-ঘর থেকে ভিতর দিকে যাবার জন্যে রয়েছে একটিমাত্র দরজা। অবলা এখান থেকে যে-পথে এসেছে সেই পথেই আবার বেরিয়ে যায়নি নিশ্চয়। সুতরাং আমাদের যাত্রা করতে হবে ভিতর দিকেই।'

তারা এবার যে ঘরে ঢুকল তার ছাদ, দেওয়াল ও দরজা জানলা সব অটুট বটে, কিন্তু ভিতরে বাসা বেঁধেছে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিমল ও কুমার সেখান থেকে বেরুবার পথ খুঁজছে, এমন সময় হঠাৎ তাদের পিছনে হল দুম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ।—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হিংস্র অন্ধকার যেন সেখানকার ম্লান আলোটুকুকে গপ করে একেবারে গিলে ফেললে।

বিমল তাড়াতাড়ি ফিরে একলাফে ঘরের বন্ধ-দরজার উপরে গিয়ে পড়ল।

দরজার ওপাশ থেকে জাগল আবার সেই পরিচিত নারী-কণ্ঠস্বর—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বিমল, আবার তুমি আমার বন্দি!'

দারুণ ক্রোধে ও নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বিমল প্রায় অবরুদ্ধ-স্বরে বললে, 'কুমার, কুমার। ধিক আমার নির্বুদ্ধিতা! বিপদের রাজ্যে এসেও বিপদের দিকে নজর রাখিনি!'

বাহির থেকে অবলা আবার খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর তীক্ষ্ণ খনখনে স্বরে বললে, 'ওহে বিমল। এই তোমার বুদ্ধি? এই বুদ্ধি ভাঙিয়ে তুমি দেশ-বিদেশে এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছ? একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত এক ফাঁদে দুবার ধরা পড়ে না—তুমি যে দেখছি নেংটি ইঁদুরেরও চেয়ে অধম। একটু আগে তুমিই আবার মস্ত মুরুব্বির মতন অনুভূতি আর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে কুমারকে যে মস্ত লেকচার দিচ্ছিলে, তাও আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি। শুনে আমি হাসি চাপতে পারিনি আর সে হাসির আওয়াজ পেয়েও তুমি সাবধান হওনি। ওহে নাবালক, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি কেবল তোমারই একচেটে, না? জানো মূর্খ, মাটির ওপরে যে আমার কাদা-মাখা পায়ের ছাপ পড়ছিল, আমারও তা অজানা ছিল না! ইচ্ছা করলেই আমি পায়ের ছাপগুলো মুছে তোমাকে ধাঁধায় ফেলে পালাতে পারতুম। কিন্তু তা আমি করিনি। কেন জানো? তোমার বুদ্ধি নেংটি ইঁদুরেরও চেয়ে মোটা বলে। আমি বেশ জানতুম, পায়ের দাগগুলো দেখেই তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ধেই-ধেই করে নেচে উঠবে! তাই আমি মাটির গায়ে পায়ের ছবি আঁকতে আঁকতে এমন জায়গায় এসে অদৃশ্য হয়েছি যেখানে আমার পক্ষে তোমাকে ফাঁদে ফেলা হবে খুবই সহজ! বুঝলে বোকাচন্দ্র? ঘুমোও এখন অন্ধকারে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে!'

অতিরিক্ত রাগে ফুলতে ফুলতে বিমল আর কোনও কথাই বলতে পারলে না। কিন্তু কুমার চেঁচিয়ে বললে, 'ওরে হতভাগা চোর! আমাদের তুই বন্দি করবি? এতক্ষণে বাড়ির ভেতরে পুলিশ এসে পড়েছে, তা জানিস?'

অবলা আবার হেসে উঠে বললে, 'পুলিশ, না ফুলিশ? ওই ভুঁদো হাঁদা-গঙ্গারাম সুন্দরবাবুকে আমি চিনি না নাকি? সে আমার কী করতে পারে? জানো কি বাপু, এই সাতমহলা সেকেলে বাড়িখানা ভাঙাচোরা বটে, কিন্তু মস্ত এক গোলকধাঁধার মতো? ঠিক এই জায়গাটিতে আসতে আসল পুলিশের এখন একটা দিন লাগতেও পারে! ভেবো না, আমাদের আনাগোনার সাক্ষী হয়ে পায়ের ছাপগুলো এখনও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে! আমার লোকজনেরা সেগুলোকে এখন কেবল নিশ্চিহ্নই করে দিচ্ছে না, পুলিশকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে উলটোদিকে নতুন নতুন পদচিহ্নও রেখে এসেছে! অতএব হে বিমল, হে নেংটি-ইঁদুরাধম! আপাতত আমি বিদায় গ্রহণ করছি! হ্যাঁ, আর একটা কথা শুনে রাখো। ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে মিছে গলা ভেঙো না, কারণ তোমাদের চিৎকার বাইরে গিয়ে পৌঁছোবে না!'

বিমল তখন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে নিয়েছে যে, এ-ঘরের দরজাটা রীতিমতো পুরাতন। কাল সে যেখানে বন্দি হয়েছিল সেখানকার মতন এ-দরজাটাও মজবুত ও লোহার কীল মারা নয়। অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে এ-দরজাও যথেষ্ট দুর্ভেদ্য, কিন্তু অবলা বোধহয় তার প্রায়-অমানুষিক শক্তির সঙ্গে পরিচিত নয়! আর সেই শক্তি এখন প্রচণ্ড ক্রোধে হয়ে উঠেছে ভয়ানক মারাত্মক! বিমল জীবনে আর কখনও এত অপমান বোধ করেনি!

অবলার কথা যখন শেষ হয়নি, বিমল পিছনে হটে গিয়ে নিজের দেহের মাংসপেশীগুলোকে দ্বিগুণ ফুলিয়ে তুললে! তারপর বেগে ছুটে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে প্রাণপণে দরজার উপরে মারলে এক বিষম ধাক্কা! মড়-মড় শব্দে দরজার পাল্লা ভেঙে পড়ল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব লুকোচুরি খেলা

ভাঙা দরজার ভিতর থেকে বিমল বাইরে লাফিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো!

বেরিয়েই দেখতে পেলে একচক্ষু অবলার দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মস্ত বড়ো মুখখানা—ক্ষণিকের জন্যে। এবং সেই এক পলকের মধ্যেই বিমল এও লক্ষ করলে, অবলার মুখে ফুটে উঠেছে বিপুল বিস্ময়ের চিহ্ন—নিশ্চয়ই দরজা ভেঙে তার এমন অতর্কিত আবির্ভাব সে একেবারেই আশা করেনি!

কিন্তু পরমুহূর্তেই অবলার প্রকাণ্ড মূর্তিখানা সে-ঘরের ভিতর থেকে সাঁত করে সরে গেল।

মহা ক্রোধে জ্ঞানশূন্যের মতন বিমল বেগে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ সে-ঘরের দরজার চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে দড়াম করে মাটির উপরে পড়ে গেল! তার দেহ আর পাঁচজনের মতন ছোটো ও হালকা ছিল না, আঘাতটা হল রীতিমতো গুরুতরই।

কুমার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে বললে, 'বিমল, বিমল! কোথায় লাগল?'

নিজেকে তখনই সামলে নিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বিমল বললে, 'না, না, আমার কিছু লাগেনি! চলো, চলো—অবলা বুঝি আবার পালাল!'

ছুটে দুজনেই আর একটা শূন্যঘর পেরিয়ে আবার সেই ছাদভাঙা দালানের উপরে এসে পড়ল। উঠানের উপরে কেউ নেই। কিন্তু ভাঙা দালান দিয়ে খানিক ছুটেই পাওয়া গেল একটা সরু লম্বা পথ—দু-ধারেই তার সারি সারি কয়েকখানা ঘর।

বিমল বললে, 'কুমার, তুমি ও-ধারের ঘরগুলো খোঁজো, আমি খুঁজি এ-ধারের ঘরগুলো!'

প্রথম ঘরটায় উঁকি মেরে বিমল দেখলে, কেউ নেই। আসবাবহীন ঘুপসি ঘর—দেখলেই বোঝা যায়, বহুকাল তার মধ্যে কেউ বাস করেনি—এককোণে পড়ে রয়েছে কেবল একটা বড়ো কুপো।

দু-ধারে পাঁচখানা করে ঘর ছিল—সব ঘরই দুর্দশাগ্রস্ত, বাসের অযোগ্য। কোনও ঘরেই অবলাকে পাওয়া গেল না।

শেষঘর ও গলির পরেই তারা দুজনে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানেও আর একটা ছোট্ট উঠানের মতো আছে বটে, কিন্তু তার সমস্তটাই ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ। সেই পুঞ্জীভূত ইষ্টকের রাশি ও রাবিশের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে নানান রকম আগাছার চারা। সেখান দিয়ে কারুর পক্ষে পালানো অসম্ভব এবং সেখানে সাপ টিকটিকি ছাড়া কোনও বড়ো জীবেরই লুকোবার উপায় নেই।

বিমল হতাশভাবে বললে, 'ফিরে চলো কুমার, আজ আমাদের কপাল খারাপ!'

কুমার বললে, 'উঃ, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে! হতভাগাকে যদি একবার ধরতে পারতুম!'

—'ধরতে তাকে নিশ্চয়ই পারতুম, হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গিয়েই তো সব মাটি করলুম। কিন্তু সে গেল কোনদিকে?...কুমার, কাছেই দুম করে কি একটা শব্দ হল না?'

—'হ্যাঁ, বিমল, আমিও শব্দটা শুনেছি! কী যেন একটা পড়ে গেল!'

—'শব্দটা এসেছে এই গলির দিক থেকেই', বলেই বিমল দৌড়ে আবার সেইদিকে গেল।

কিন্তু গলির ভিতরে কেউ নেই। তারা দুজনে আবার তাড়াতাড়ি দুদিকের ঘরে উঁকি মারতে মারতে এগিয়ে চলল।

গলির প্রান্তে এসে শেষঘরে উঁকি মেরে বিমল চকিত স্বরে বললে, 'এ কী!'

—'কী বিমল?'

—'কুপোটা দেখে গিয়েছিলুম ঘরের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি সেটা মেঝের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে!...কুমার, অবলা ঠিক কথাই বলেছে—আমি হচ্ছি একটি আস্ত গাধা। শতধিক আমাকে, হাতে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিলুম!'

কুমার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'তাহলে সে কি ওই কুপোর ভিতরে ঢুকে বসেছিল?'

—'কুপোর ভিতরে কী তার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু একটু আগে সে নিশ্চয়ই ছিল এই ঘরে! হঠাৎ নিজে নিজেই জ্যান্ত হয়ে ঘরময় গড়াগড়ি দিতে পারে, এমন আশ্চর্য কুপোর কাহিনি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি! কুপোটাকে কেউ ফেলে দিয়েছে, আর অবলা ছাড়া সে অন্য কেউ নয়।'

—'কিন্তু সে—'

কুমারের মুখের কথা মুখেই রইল, খানিক দূর থেকে হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে বিষম আর্তনাদ উঠল—'বাবা রে, মরে গেছি রে, সেপাই! সেপাই!'

—শিগগির এসো কুমার, শিগগির! এ যে সুন্দরবাবুর গলা!'

তারা দ্রুতপদে আবার আগেকার উঠানে এসে পড়ল।

কুমার বললে, 'উঠোনে তো কেউ নেই! সুন্দরবাবু কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন?'

—'সেপাই, সেপাই! জলদি আও—হামকো মার ডালা!'

বিমল একদিকে ছুটতে ছুটতে বললে, 'সুন্দরবাবু চ্যাঁচাচ্ছেন, বাগান থেকে। এই যে, ওদিকে যাবার পথ!'

ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে বুনো গাছের জঙ্গল মাড়িয়ে বিমল ও কুমার উঠান থেকে বেরিয়েই দেখলে, একটা বটগাছের তলায় মাটির উপরে ভুঁড়ি ফুলিয়ে চিত হয়ে পড়ে সুন্দরবাবু ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মতো ক্রমাগত হাত-পা ছুড়ছেন এবং বাগানের নানা দিক থেকে ছুটে আসছে সাত-আটজন পাহারাওয়ালা!

বিমল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে সুন্দরবাবু? অত চ্যাঁচালেন কেন? এত হাত-পা ছুড়ছেন কেন?'

কুমার তাঁকে দু-তিনবার চেষ্টার পর টেনে তুলে বসালে।

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'চ্যাঁচাব না? হাত-পা ছুড়ব না? বলেন কী মশাই? হুম, আমি পেটে খেয়েছি ভয়ানক এক ঘুষি, গালে খেয়েছি বিষম এক চড়। আমার দম বেরিয়ে গেছে, আমি চক্ষে সর্ষেফুল দেখছি!'

—'কে আপনাকে ঘুষি-চড় মারলে? ভালো করে খুলে বলুন।'

—'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান! ভালো করে খুলে বলবার আগে ভালো করে হাঁপ ছেড়ে নি।

...হ্যাঁ, শুনুন এইবার! আপনারা তো দিব্যি দড়ি বেয়ে 'সর্ট-কাট' করে ফেললেন, কিন্তু আপনাদের খোঁজে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে দস্তুরমতো সাত-ঘাটের জল খেয়ে! বাবা রে বাবা, এটা কি বাড়ি না গোলকধাঁধা? আমি—'

বিমল বিরক্ত স্বরে বাধা দিয়ে বললে, 'অত ব্যাখ্যা শোনবার সময় নেই! কে আপনাকে মেরেছে তাই বলুন! সে কোথায় গেল?'

—'আরে মশাই, রাগ করেন কেন? কে আমাকে মেরেছে আমি কি ছাই তাকে চিনি? সে কোথায় গেল তা দেখবার সময় কি আমি পেয়েছি? আমি দেখেছি খালি সর্ষেফুল। আসামিকে খোঁজবার জন্যে সেপাইদের এদিক-ওদিকে পাঠিয়ে আমি নিজে এলুম এইদিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা দৈত্যের মতো লোক ছুটে এসে আমার পেটে মারলে গুম করে ঘুষি আর গালে মারলে ঠাস করে চড়—সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে আমি ধড়াম করে পড়ে গেলুম!'

—'দৈত্যের মতো লোক? তাহলে নিশ্চয় সে অবলাকান্ত!'

—'হুম অবলাকান্ত? কক্ষনও তার নাম অবলাকান্ত নয়—তাহলে প্রবলাকান্ত বলব কাকে?...আরে, আরে—ওই দেখুন মশাই, ওই দেখুন! ও বাবা, বেটা এতক্ষণ ওই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিল নাকি? এই সেপাই, সেপাই! পাকড়ো, আসামি ভাগতা হ্যায়।'

হ্যাঁ, অবলাই বটে! ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই সে আবার বাগান ছেড়ে ছুটল ভাঙাবাড়ির ভিতর দিকে এবং তার অনুসরণ করতে বিমল ও কুমার একটুও দেরি করলে না—যদিও তারা ছিল অনেকটা পিছিয়ে!

আবার সেই পোড়ো উঠান! বিমল ভিতরে ঢুকেই দেখলে, খানিক আগে সে যে দড়ি ধরে উঠানে নেমেছে সেই দড়ি অবলম্বন করেই অবলা আবার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে! অত বড়ো দেহে ক্ষিপ্রতা সত্যসত্যই বিস্ময়জনক!

বিমল বেগে ছুটে গিয়ে নীচে থেকে দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে মারতে চিৎকার করে বললে, 'একটা রিভলভার! একটা রিভলভার! কার কাছে একটা রিভলভার আছে? সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু!'

পাহারাওয়ালারা সবাই এসে পড়ল, কিন্তু তাদের কারুর কাছেই রিভলভার ছিল না! কুমার আর কিছু না পেয়ে ইট কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে লাগল। সুন্দরবাবু যখন হাঁসফাঁস করতে করতে আবির্ভূত হয়ে রিভলভার বার করলেন, অবলা তখন তেতলার জানলার আড়ালে হয়েছে অন্তর্হিত!

বিমল তিক্তস্বরে বললে, 'নাঃ, আর পারা যায় না, এই একঘেয়ে লুকোচুরি খেলা আজকেই শেষ করতে হবে! অবলা আবার তার গর্তে ঢুকল! সুন্দরবাবু, পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিটের সদর দরজায় পাহারাওয়ালা আছে তো?'

—'আছে বইকী, দুজন।'

—'আচ্ছা, আপনি বাকি পাহারাওয়ালাদের নিয়ে আবার পাঁচ নম্বরকে আক্রমণ করুনগে যান!

—'হুম, আচ্ছা ধড়িবাজ আসামির পাল্লায় পড়েছি রে বাবা, প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল!'

—'যান; যান—দেরি করবেন না!'

—'আপনারা?'

—'আমরা আক্রমণ করব এইদিক দিয়ে, নইলে অবলা আবার পালাতে পারে'—বলেই বিমল দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলে!

সুন্দরবাবু পাহারাওয়ালাদের নিয়ে অদৃশ্য হলেন। কুমার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিমল রজ্জুপথে যখন দোতলা পার হয়েছে তখন হঠাৎ জাগল সেই খনখনে গলায় মেয়েলি হাসি! সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—'ওরে হাঁদারাম বিমল, আর তোর রক্ষে নেই—মর, মর, মর!—'

কুমার সভয়ে দেখলে, তেতলার জানলার ভিতর থেকে সড়াৎ করে একখানা হাত বেরিয়ে ধারালো ভোজালি দিয়ে বিমলের অবলম্বন রজ্জুর উপরে আঘাত করলে একবার, দুইবার, তিনবার!

—এবং দড়িটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই যেন দপ করে নিবে গেল কুমারের চোখের আলো!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কচুরির দুর্ভাগ্য

চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নিয়ে কুমার যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আচ্ছন্নের মতো, তখন হঠাৎ ওপর থেকে শোনা গেল আবার সেই চিরপরিচিত, নির্ভীক, আনন্দময় কণ্ঠের উচ্চ হাস্যধ্বনি!

বিমল হাসছে!

কুমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না, কারণ সেই মুহূর্তেই তার দুই কান প্রস্তুত হয়েছিল একটা গুরুভার দেহের বিষম পতনধ্বনি শোনবার জন্যে!

অন্ধকারের আবরণের ভিতর থেকে নিজের চোখ দুটোকে প্রাণপণে মুক্ত করে নিয়ে কুমার প্রথমে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলে।—সেখানে ভোজালি দিয়ে কাটা দড়িগাছা পড়ে আছে বটে, কিন্তু কোনও যন্ত্রণাকর দৃশ্যের বা মানুষের রক্তাক্ত দেহের অস্তিত্ব নেই, আকস্মিক পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পরমুহূর্তেই উপর-পানে চোখ তুলে সে দেখলে, একটা বৃষ্টির জল বেরুবার লোহার মোটা নল ধরে তার বন্ধু বিমল নীচের দিকে নেমে আসছে! তাহলে তার কান ভুল শোনেনি—দুরাত্মা শত্রু এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুকে উপহাস করে এইমাত্র হেসে উঠেছিল তার বন্ধুই?

বিপুল আনন্দে চিৎকার করে কুমার ডেকে উঠল, 'বিমল, ভাই বিমল!'

বিমল নামতে নামতে বললে, 'ভয় নেই কুমার, আমার-আয়ু এখনও ফুরোয়নি।'

কুমার আরও উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে। তেতলার জানালা থেকে অবলা এবং তার ভোজালি অদৃশ্য হয়েছে ঝুলছে খালি কাটা দড়ির খানিকটা। তেতলার ছাদ থেকে জল বেরুবার পাইপটা জানলার পাশ দিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে প্রায় ভূমিতল পর্যন্ত। এটা

কুমার বরাবরই দেখে এসেছে, যত বড়ো বিপদ যত অকস্মাৎই দেখা দিক, বিমল উপস্থিত বুদ্ধি হারায় না কখনও। অবলার অস্ত্রাঘাতে দড়ি ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা ঠিক তার পূর্ব-মুহূর্তেই বিমল খপ করে হাত বাড়িয়ে তার পাশের পাইপটা চেপে ধরে খুব সহজেই আত্মরক্ষা করেছে।

নল ত্যাগ করে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে বিমল হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে, 'ভাই কুমার, মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করলে না। বোধহয় এত সহজে মরবার জন্যে ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেননি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু পাইপটা ওখানে না থাকলে কী যে হত, তাই ভেবেই আমার গা এখনও শিউরে উঠছে। বিমল, তুমি আজ বেঁচে গেছ দৈবগতিকে।'

বিমল বললে, 'বন্ধু, পাইপটা না পেলেও আমি বোধহয় মরতুম না। দড়ি ছেঁড়বার আগেই দড়ি ছেড়ে দোতলার কার্নিশ ধরে ঝুলতে পারতুম। আর দৈবের কথা বলছ? দৈবের সুযোগ তারাই নিতে পারে, বুদ্ধি যাদের অন্ধ নয় আর সাহস যাদের সর্বদাই সজাগ। দ্যাখো, অবলা যে দুরাত্মা সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র সাহসী আর বুদ্ধিমান বলেই বারবার বেঁচে যাচ্ছে সে দৈবের মহিমায়।...যাক, এখন আর এসব আলোচনার সময় নেই। তুমি এখন এক কাজ করো কুমার। দৌড়ে এই বাড়ির সদর দিয়ে ভিতরে ঢুকে দ্যাখোগে যাও, সুন্দরবাবুরা অবলাকে ধরতে পারলেন কি না। যে-জানলা দিয়ে অবলা তেতলার ঘরে ঢুকেছে, ওই জানলা থেকেই তুমি আমাকে সব খবর দিয়ো।'

কুমার বললে, 'খবর দেব মানে? তুমি কি এইখানেই থাকবে?'

—'নিশ্চয়। নইলে অবলা যদি আবার ওই জানলা দিয়ে বেরিয়ে চম্পট দেয়?'

—'কিন্তু তার পালাবার উপায় তো আর নেই। দড়ি তো সে নিজের হাতেই কেটে দিয়েছে।'

বিমল একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'আঃ, কুমার! যা বলি, শোনো। ওটা হচ্ছে অবলার নিজের বাসা। আর একগাছা নতুন দড়ি সংগ্রহ করতে তার বেশিক্ষণ লাগবে না। যাও, আর দেরি কোরো না, আমি এখানে পাহারায় রইলুম।'

কুমারের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, তবু আর কিছু না-বলে সে অগ্রসর হল।

উঠান থেকে বেরিয়ে জঙ্গলময় বাগানের ভিতরে গিয়ে দেখলে, বড়ো বড়ো গাছের ছায়া হেলে পড়েছে পূর্বদিকে। আন্দাজে বুঝলে, বেলা হয়েছে প্রায় দুটোর কাছাকাছি। কোন সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, পেটে এখনও অন্ন-জল পড়েনি। বিশেষ, তার এত তৃষ্ণা পেয়েছিল যে বাগানের সেই পানায় সবুজ পুকুরের দিকেই সে কয়েক পা এগিয়ে না গিয়ে পারলে না। কিন্তু তারপরেই তার মনে হল বিমলের কথা। কাল থেকে সে অন্ন-জলের স্পর্শ পায়নি, তবু এখনও সমস্ত কষ্ট সহ্য করে আছে অম্লান মুখে! নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে কুমার আবার ফিরে এসে পাঁচ নম্বরের বাড়ির খিড়কির দরজা খুঁজতে লাগল।

সুন্দরবাবু ঠিক বলেছেন। এটা কি বাড়ি না গোলকধাঁধা! রাবিশের পাহাড়, ঝোপঝাপ, জঙ্গল ও কাঁটাবনের ভিতর থেকে আসল পথটি বার করে নিতে তার বেশ কিছুক্ষণ লাগত, কিন্তু একজন পাহারাওয়ালা তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকবার পথ বাতলে দিলে।

ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সে দেখলে, দোতলার বারান্দায় সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে শুকনো মুখে চুপ করে বসে আছেন এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতন জন-চারেক পাহারাওয়ালা।

কুমার শুধোলে, 'কী খবর সুন্দরবাবু? এখানে বসে কেন?'

সুন্দরবাবু হাসবার জন্যে বিফল চেষ্টা করে বললেন, 'আপনাদের পথ চেয়ে বসে আছি আর কি!'

—'তার মানে?'

—'আমি জানি সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো দড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে আপনারা আবার নীচে নেমে আসবেন। তারপর আপনাদের নামতে দেরি হচ্ছে দেখে চারজন সেপাইকে ওপরে পাঠিয়ে আমি এইখানেই বসে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আপনি একলা এদিক দিয়ে এলেন কেন?'

—'সে কথা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, আপনি কি এখনও অবলার খোঁজ করেননি?'

সুন্দরবাবু শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'হুম, করেছি বইকী কুমারবাবু, করেছি বইকী! দোতলা একতলা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি—কোথাও অবলা হতভাগা নেই! সদর-দরজার সেপাইদের মুখে শুনলুম, এ-বাড়ি থেকে জনপ্রাণী বাইরে বেরোয়নি। কিন্তু বিমলবাবু কোথায়? তিনি তো এতক্ষণে তেতলায় উঠেছেন?'

কুমার খুব সংক্ষেপে বিমলের খবর জানালে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'হুম। এমন ত্যাঁদোড় আসামির কথা তো আমি জীবনে কখনও শুনিনি। এই একখানা বাড়ির ভিতরেই বসে এতগুলো মানুষকে নিয়ে সে যা-ইচ্ছে-তাই করছে? কী দুর্দান্ত লোক রে বাবা! যান কুমারবাবু, শিগগির তেতলায় যান, ওপরে চারজন সেপাই আছে—আপনার কোনও ভয় নেই। আমি এইখানেই ঘাঁটি আগলে বসে রইলুম!'

—'আপনিও আমার সঙ্গে এলে ভালো হত না?'

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মাপ করুন ভায়া, একে খিদের জ্বালায় ছটফট করে মরছি, তার ওপরে তেষ্টার চোটে প্রাণ করছে টা-টা! এখন উঠে দাঁড়ালে আমি হয়তো মাথা ঘুরেই পড়ে যাব। এক ঠোঙা খাবার আনতে পাঠিয়েছি, কিঞ্চিৎ জলযোগ না করলে আমি তো আর নড়তে পারছি না!'

এমন কাঁচুমাচু মুখে সুন্দরবাবু কথাগুলো বললেন যে, কুমার কোনও প্রতিবাদ করতে পারলে না। কেবল বললে, 'আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনার রিভলভারটা একবার আমাকে দেবেন কি?'

সুন্দরবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে 'বেল্ট' থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে কুমারের হাতে সমর্পণ করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গিয়ে দেখে, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারজন পাহারাওয়ালা।

জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কি ওই ঘরগুলো খুঁজে দেখেছ?'

তারা জানালে, খুঁজে দেখেছে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

কুমার বললে, 'অসম্ভব। আসামি তেতলাতেই লুকিয়ে আছে।'

সে ছুটে গিয়ে আগেই চোর-কুঠরির ভিতরে ঢুকল। ঘরে কেউ নেই।

তারপর এগিয়ে গিয়ে গরাদহীন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই সচমকে দেখলে, বাইরের হুকে ঝুলছে দুইগাছা দড়ি—তার একগাছা ছেঁড়া এবং আর একগাছা নেমে গিয়েছে প্রায় নীচেকার উঠান পর্যন্ত।

তাহলে বিমলের সন্দেহই সত্যে পরিণত হল? নতুন দড়ি ঝুলিয়ে অবলা আবার সরে পড়েছে?

কিন্তু সে পালাবে কেমন করে? উঠানের উপরে পাহারা দিচ্ছে যে বিমল নিজে!

কুমার বুক পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে উঠানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখানে বিমল বা অবলার কারুর কোনও চিহ্নই নেই!

কুমার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, বিমলের সাবধানি চোখকে ফাঁকি দিয়ে অবলা নিশ্চয়ই নামতে পারেনি; আর এ-বিষয়েও একতিল সন্দেহ নেই যে, প্রাণ থাকতে বিমল কখনওই তাকে পালাতে দেবে না! তবে?...তবে কি এরই মধ্যে বিমলের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়ে গেছে? আর জয়ী হয়েছে অবলাই? না, এটাও সম্ভব নয়। বিমলের মতো বলবান লোক বাংলাদেশে বেশি নেই, এত শীঘ্র সে কাবু হবার ছেলে নয়! কিন্তু অবলার সঙ্গে সেও অদৃশ্য কেন? তবে কি বিমল আবার শত্রুর পিছনে পিছনে ছুটেছে?

কুমার চিৎকার করে অনেকবার বিমলের নাম ধরে ডাকলে, কিন্তু কোনও সাড়া পেলে না!

ভীত, চিন্তিত মুখে সে দ্রুতপদে আবার দোতলায় নেমে এসে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু সুন্দরবাবু। অবলা নতুন দড়ি বেয়ে ফের নীচে নেমে অদৃশ্য হয়েছে, বিমলেরও দেখা নেই।'

খাবারের ঠোঙা থেকে একখানা কচুরি নিয়ে সুন্দরবাবু তখন সবে প্রথম কামড় বসাবার জন্যে মুখব্যাদান করেছেন; কিন্তু খবর শুনেই তাঁর পিলে চমকে গেল রীতিমতো! মহা বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী রকম জাঁহাবাজ আসামি রে বাবা! এ যে পারার ফোঁটার মতো হাতের মুঠোর ভেতরে থেকেও ধরা দেয় না! হুম, আমাকে হাল ছাড়তে হল দেখছি।'

কুমার ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'তাহলে হাল ছেড়ে খাবারের ঠোঙা নিয়ে আপনি এইখানেই বসে থাকুন, আমি একলাই চললুম আমার বন্ধুর সন্ধানে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আ হা হা, চটেন কেন মশাই? সব সময়ে কি মুখের কথাই সত্যি কথা হয়? আমার কি কর্তব্যজ্ঞান নেই? এই রইল আমার খাবারের ঠোঙা—আর রইল আমার মুখের কচুরি, কোথায় যেতে হবে চলুন—হুম!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ন্ত ও মানিকের প্রবেশ

আবার সেই পোড়োবাড়ির জঙ্গলভরা উঠান!

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওই অলক্ষুণে পাঁচ নম্বরের বাড়ি আর এই হতচ্ছাড়া উঠান! আমাদের কি আজ এরই মধ্যে লাট্টুর মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরে মরতে হবে?'

কুমার কোনও কথা না বলে একেবারে উঠানের সেইখানে গিয়ে হাজির হল, খানিক আগে সে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বিমলকে।

সেখানে ভিজে মাটির উপরে রয়েছে অনেকগুলো পায়ের দাগ এবং আরও নানারকম চিহ্ন। কুমার সেগুলোর দিকে তাকিয়ে নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, এমন সময়ে উঠানের ভিতরে প্রবেশ করলে আর দুজন নতুন লোক।

কিন্তু নতুন লোক হলেও তারা আমাদের অচেনা নয়। কারণ তাদের একজন হচ্ছে বিখ্যাত শখের ডিটেকটিভ জয়ন্ত এবং আর একজন তার বন্ধু মানিক।

সুন্দরবাবু আনন্দে নেচে উঠে বললেন, 'আরে আরে—হুম। কোথায় ছিলে হে তোমরা? কেমন করে আমাদের খোঁজ পেলে? ভারী আশ্চর্য তো!'

জয়ন্ত বললে, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। আমরা গিয়েছিলুম বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে রামহরির মুখে সব শুনে সিধে এখানে চলে এসেছি। ব্যাপার কী বলুন দেখি? আসামি কি ধরা পড়েছে? বিমলবাবুকে দেখছি না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আসামিরও খোঁজ নেই, বিমলবাবুও অদৃশ্য? ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, সংক্ষেপে আমাকে ব্যাপারটা বলতে পারবেন?'

কুমার খুব অল্প কথায় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো বর্ণনা করলে।

সমস্ত শুনে জয়ন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'বলেন কী কুমারবাবু? কিন্তু আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

—'মাটির ওপরের এই দাগগুলো পরীক্ষা করছি।'

মানিক নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাই তো, এখানে যে অনেক রকম দাগ রয়েছে! জয়ন্ত, তোমাকে সবাই তো পদচিহ্ন-বিশারদ বলে জানে, এখানকার মাটি দেখে কিছু আবিষ্কার করতে পারো কি না দ্যাখো না!'

জয়ন্ত তখনই মাটির উপরে বসে পড়ল। তারপর মিনিট-পাঁচেক ধরে নীরবে সমস্ত পরীক্ষা করে বললে, 'হুঁ, কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে বটে। কুমারবাবু, এই একজোড়া পদচিহ্ন দেখুন। খুব স্পষ্ট, নিখুঁত চিহ্ন, আর বেশ গভীর। কেউ এখানে খানিকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সেই জন্যেই ছাপ এমন স্পষ্ট উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এ পায়ের দাগ হচ্ছে আমাদের বন্ধু বিমলবাবুর।'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, বিমল ওইখানেই ছিল বটে।'

—'তারপরেই দেখছি অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে একটা লম্বা-চওড়া দাগ। আর ওই ভাঙাবাড়ির দিক থেকে দু-জোড়া পায়ের দাগ এই লম্বা-চওড়া দাগের কাছে এসে থেমেছে। ব্যাপারটা বুঝছেন? লম্বা-চওড়া দাগটা দেখে অনুমান করছি, একটা মানুষের দেহ এখানে আছাড় খেয়েছে! আর ওই দু-জোড়া দাগের আকার দেখে বেশ বোঝা যায়, ওগুলো হচ্ছে ছুটন্ত লোকের পায়ের ছাপ। হুঁ, দুজন লোক ভাঙাবাড়ির দিক থেকে ছুটে এসেছে একজন ভূপতিত লোকের কাছে! কেবল তাই নয়, দেখুন কুমারবাবু, দেখুন! ওই ঝুলন্ত দড়ির তলা থেকেও আর একজোড়া পায়ের দাগও এইখানে এসে থেমেছে। আন্দাজ বলতে পারি, এ হচ্ছে অবলার পদচিহ্ন। তাহলে হিসাবে কী পাই? একজন ভূতলশায়ী লোক আর তিনজন দণ্ডায়মান লোক! না, তারা কেবল দাঁড়িয়েই ছিল না, এখানে হাঁটু গেড়ে বসেও পড়েছিল। এই দেখুন, ভিজে মাটির উপরে তিনজোড়া হাঁটুর চিহ্ন! আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিমলবাবু পড়ে গিয়েছিলেন, আর তিনজন লোক এসে তাঁকে মাটির ওপরে চেপে ধরেছিল!'

কুমার রুদ্ধশ্বাসে কাতরভাবে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আর কিছু বুঝতে পারছেন?'

জয়ন্ত ভূতলে দৃষ্টি সংলগ্ন রেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'পারছি বইকী! এই দেখুন, তিনজোড়া পায়ের দাগ চলেছে আবার ওই ভাঙাবাড়ির দিকে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে মাটির ওপর দিয়ে একটা ভারী দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন।.....সবই তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। কুমারবাবু, আপনার বন্ধু বিপদে পড়েছেন! এই দাগ ধরে আমি অগ্রসর হই, আপনারা সবাই আসুন আমার পিছনে পিছনে!'

জয়ন্ত এগুলো। কিন্তু গেল-বারে বিমলের সঙ্গে কুমার ভাঙাবাড়ির ডানদিকে গিয়েছিল, এবারে জয়ন্ত সে দিকে গেল না। বাঁদিকে এগিয়ে ছাদ-ভাঙা দালানে উঠল। পাশাপাশি খানকয় ঘর—একটা ঘর ছাড়া সব ঘরই দরজা খোলা।

বন্ধ-দ্বারের উপরে করাঘাত করে জয়ন্ত বললে, 'এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন?' বলেই সে জীর্ণ দরজার উপরে পদাঘাত করলে সজোরে এবং পরমুহূর্তে অর্গল ভেঙে খুলে গেল দ্বার সশব্দে।

জয়ন্ত, কুমার, মানিক ও সুন্দরবাবুর সঙ্গে পাহারাওয়ালারা বেগে ভিতরে প্রবেশ করলে। ঘর কিন্তু শূন্য।

সে-ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা ঘরে যাবার দরজা এবং সে-দরজাও বন্ধ।

এবারের দরজাটা তেমন জীর্ণ ছিল না বটে, কিন্তু মহা-বলবান জয়ন্তের ঘন ঘন পদাঘাত সহ্য করবার শক্তি তার বেশিক্ষণ হল না। আবার গেল তারও হুড়কো ভেঙে।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য!

প্রায়-অন্ধকার ঘর, প্রথমটা ভালো করে নজরই চলে না। কেবল এইটুকুই আবছা আবছা বোঝা গেল, একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্থিরমূর্তি।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি রিভলভার বার করে বললে, 'কে তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে?'

সাড়া নেই।

—'জবাব দাও, নইলে মরবে!'

তবু সাড়া নেই।

পাহারাওয়ালারা দুটো জানালা খুলে দিলে।

একটা পুরানো তেপায়ার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিমল। তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা।

কুমার দৌড়ে তার কাছে গেল।

জয়ন্ত ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ কী ভয়ানক! দ্যাখো মানিক, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

কড়িকাঠের একটা কড়ায় বাঁধা একগাছা রজ্জু এবং সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত সংলগ্ন রয়েছে বিমলের কণ্ঠদেশে! বিমলের হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা এবং তার দুই পায়েও দড়ির বাঁধন!

কুমার বিভ্রান্তের মতন বলে উঠল, 'বিমল! বন্ধু! তোমার গলায়—'

জয়ন্ত দুই হাতে বিমলের দেহ ধরে নামিয়ে বললে, 'কার পকেটে ছুরি আছে? শিগগির বিমলবাবুর গলার আর হাত-পায়ের দড়ি কেটে দাও।'

সুন্দরবাবু কথামতো কাজ করলেন। মানিক দিলে মুখের বাঁধন খুলে।

জয়ন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'সর্বনাশ! বিমলবাবু, গলায় ফাঁস পরে আপনি যে শূন্যে দোলও খেয়েছেন দেখছি! দেখুন সুন্দরবাবু, গলার চারিদিকে রাঙা টকটকে দড়ির দাগ!'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'হুম!'

বিমল মুখ টিপে একটু হাসলে বটে, কিন্তু তার দুই চোখ তখন অশ্রুসজল।

কুমার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, কারণ বিমলকে সে কাঁদতে দেখেনি কখনও!

বিমল বললে, 'তুমি অবাক হয়ে গেছ কুমার? ভাবছ আমার চোখে কান্নার জল? না বন্ধু, না! এ কান্নার অশ্রু নয়, এ হচ্ছে রুদ্ধ ক্রোধ আর নিষ্ফল আক্রোশের অশ্রু। অবলা ঠিক কলের পুতুলের মতন আমাদের নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে ধরব কি, তার হাতে বারবার ধরা পড়ছি আমি নিজেই! আর এবারে খালি ধরাই পড়িনি—চক্ষের সামনে দেখেছি নিশ্চিত মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার!'

কুমার বললে, 'কিন্তু কী করে তুমি বন্দি হলে? অবলা তো ছিল তেতলায়!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ। অবলা ছিল তেতলায়। আমি দাঁড়িয়েছিলুম উঠোনের ওপরে। আমার দৃষ্টি তেতলার জানলা ছেড়ে আর কোনও দিকে তাকায়নি, কারণ এখানে অবলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও শত্রু থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা আমার মনে জাগেনি!.....দাঁড়িয়ে আছি, আচমকা পিছন থেকে 'ল্যাসো'র মতন দড়ির একটা ফাঁসকল এসে পড়ল আমার গলার ওপর। কিছু বলবার আগেই অদৃশ্য হাতের বিষম এক হ্যাঁচকা টানে পরমুহূর্তেই দড়াম করে মাটির ওপরে পড়ে গেলুম। আঘাত পেয়ে দু-এক মিনিট অজ্ঞানের মতো হয়ে রইলুম।...সাড় হতে দেখি, আমি এই ঘরের ভিতরে রয়েছি—আমার মুখ, হাত, পা সব বাঁধা আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবলার সঙ্গে আরও দুজন লোক। আমি—'

হঠাৎ বাধা দিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বিমলবাবু! এতক্ষণ লক্ষ করে দেখিনি, কিন্তু আপনার গলায় ওটা কী ঝুলছে?'

—'জেরিনার কণ্ঠহার।'

—'জেরিনার কণ্ঠহার?'

—'হ্যাঁ, অবলার উপহার!'

—'বলেন কি মশাই, বলেন কি? যে মহামূল্যবান হিরের হারের জন্যে এত কাণ্ড, অবলা সেইটেই আপনাকে উপহার দিয়েছে?'

—'আমাকে নয়, আপনাদের। কারণ অবলা জানে, কড়িকাঠের দড়িতে এখন আমার মৃতদেহ আড়ষ্ট হয়ে ঝুলছে!'

কুমার অধীর কণ্ঠে বললে, 'বিমল, ও কথা রেখে এখন আসল কথা বলো।'

—'তাই বলি! অবলা খিলখিল করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললে 'এই যে, বাছাধনের যে জ্ঞান হয়েছে দেখছি! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার লোভ করেছিলে, এখন লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হবে বইকী! বড্ড বেশি লেগেছে বুঝি? কি করব খোকাবাবু, আমার যে মোটেই সময় নেই, নইলে আদর করে দু-দণ্ড তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম! যাক, আর বেশিক্ষণ তোমাকে কষ্ট দেব না, এবারে একেবারে সব জ্বালা তোমার জুড়িয়ে দিচ্ছি!.....ওরে ভোঁদা, কড়িকাঠের কড়ায় দড়িটা বাঁধা হল?.....হয়েছে? আচ্ছা।' এই বলে সে নিজের পকেট থেকে একছড়া হিরের হার বার করলে। তারপর হারছড়া আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও ছোকরা জেরিনার কণ্ঠহার পরো। শুনে অবাক হচ্ছ? অবাক হয়ো না। কারণ এটি হচ্ছে নকল জেরিনার কণ্ঠহার। বিজয়পুরের মহারাজা ভারী চালাক, আমাদের জন্যে লোহার সিন্দুকে এই নকল হারছড়া রেখে, আসল জিনিস সরিয়ে রেখেছেন অন্য কোথাও! আর এই কাচের নকল হার বোকার মতো চুরি করে এনে আমরা বিপদ-সাগরে নাকানি-চোবানি খেয়ে মরছি! ও হার তোমার গলায় রইল, এখন পুলিশ এসে ওটাকে উদ্ধার করবে অখন! আমাকে এখন যেতে হবে, কিন্তু তার আগে তোমার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই!.....ওরে ভোঁদা, ওরে উপে! চেয়ারখানা এদিকে টেনে নিয়ে আয় তো! হ্যাঁ, এইবারে ছোকরাকে ওর ওপরে তুলে দাঁড় করিয়ে দে।' তারা হুকুম তামিল করলে। তারপর আমার গলায় পরিয়ে দিলে দড়ির ফাঁস। অবলা বললে, 'বিমলভায়া, চোখে ধোঁয়া দেখবার আগে মনে মনে ভগবানকে ডেকে নাও। যদিও তুমি আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছ, তবু তোমার মতো ক্ষুদ্র জীবকে বধ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু জানো তো, মাঝে মাঝে পিঁপড়ের মতন তুচ্ছ প্রাণীকেও না মারলে চলে না? আমি আবার বিজয়পুরের মহারাজার অনাহুত অতিথি হতে চাই, এবারে আসল জেরিনার কণ্ঠহার না নিয়ে ফিরব না! কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আবার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে! তাই—' ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে আর-একজন লোক ছুটে এসে বললে, 'বাবু, পুলিশের লোক আবার উঠোনের ওপর এসেছে'! অবলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ভোঁদা, যা-যা, শিগগির ছুটে গিয়ে মোটরখানা বার করে 'স্টার্ট' দে, আর এ-বাড়িতে নয়!' তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, 'বিমল, আরও মিনিট তিন-চার তোমার সঙ্গে গল্প করব ভেবেছিলুম, কিন্তু তা আর হল না। শুনেছি তুমি নাকি 'অ্যাডভেঞ্চার' ভালোবাসো—এইবার তোমার চরম অ্যাডভেঞ্চারের পালা! যাও, এখন 'দুর্গা' বলে পরলোকের পথে যাত্রা করো।' সে একটানে চেয়ারখানা আমার পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে বেগে দৌড়ে চলে গেল! ঝপাং করে আমার দেহ ঝুলে পড়ল—গলায় লাগল বিষম হ্যাঁচকা টান। সেই মুহূর্তেই হয়তো আমার দফারফা হয়ে যেত, কিন্তু আমি আগে থাকতেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম, গলার সমস্ত মাংসপেশি ফুলিয়ে শক্ত আর আড়ষ্ট করে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলুম—যদিও ভয়ানক যন্ত্রণায় প্রাণ হল বেরিয়ে যাবার মতো! তুমি জানো কুমার, আমার মতো যারা নিয়মিতভাবে খুব বেশি ব্যায়াম অভ্যাস করে, তারা শরীরের যে কোনও স্থানের মাংসপেশি ইচ্ছা করলেই লোহার মতন কঠিন করে তুলতে পারে, তখন মুগুরের আঘাতও অটলভাবে সহ্য করা অসম্ভব হয় না! কাজেই গলায় দড়ির চাপ কোনও রকমে সামলে নিলুম—যদিও এ উপায়ে বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারতুম না। বেশিক্ষণ এভাবে থাকবারও দরকার হল

না, কারণ আগেই দেখে নিয়েছিলুম ওই তেপায়াটা! পুলিশের ভয়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পালাতে হল বলে অবলা ওর দিকে ফিরে চাইবার সময় পায়নি, নইলে নিশ্চয়ই ওটাকে সরিয়ে ফেলত। বার-দুয়েক ঝাঁকি মেরে দোল খেয়ে আমি কোনওরকমে ওর ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর খানিকক্ষণ যে কী ভাবে কেটেছে, তা জানেন খালি আমার ভগবান! পুরনো, নড়বড়ে তেপায়া, আমার ভারী দেহের ভারে টলমল ও মচমচ শব্দ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হয়—এই বুঝি পটল তুলি! এক এক সেকেন্ডকে মনে হয় এক এক ঘণ্টা! সে যেন মরণাধিক যন্ত্রণা! তারপর—তারপর আর কী, ঘটনাস্থলে তোমাদের আবির্ভাব, যমালয়ের দ্বার থেকে আমার প্রত্যাবর্তন!'

সুন্দরবাবু সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললেন, 'হুম, বিমলবাবু, হুম! না-জানি আপনার কতই লেগেছে! কিন্তু বিজয়পুরের মহারাজাটা তো ভারী বদ লোক দেখছি! চোরে যে নকল হিরের হার চুরি করেছে এ-কথাটা আমাদেরও কাছে প্রকাশ করেনি!'

কুমার বললে, 'ও-সব কথা পরে হবে, এখন আমাদের কী করা উচিত? বিমলের কথায় বোঝা গেল, অবলা তার দলবল নিয়ে মোটরে চড়ে এখান থেকে সরে পড়েছে!'

বিমল বললে, 'এর পর তার দেখা পাব আমরা বিজয়পুরের মহারাজার ওখানেই। জেরিনার কণ্ঠহার ছেড়ে সে অন্য কোথাও নড়বে না। সেইখানেই আর একবার তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করব!.....হ্যাঁ, ভালোকথা! জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু! আপনারাও এখানে যে?'

জয়ন্ত বললে, 'এখন বাড়ির দিকে চলুন! চুম্বক কেন যে লোহাকে টেনেছে, পথে যেতে যেতে সে কথা বলব অখন!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৈশ অভিনয়

বিজয়পুরের মহারাজাবাহাদুর যে বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছেন, ঠিক তার সামনেই একখানা ছোটো তেতলা বাড়ি।

বাড়ির উপর-তলার রাস্তায় ধারে এক ঘরে জানলার কাছে বসেছিল একজন বিপুলবপু পুরুষ। তার দেহখানা এত বড়ো যে দেখলেই মনে হয়, ওই চেয়ারখানা ভার সইতে না পেরে এখনই মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।

এইমাত্র ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করে সে 'স্ট্রপে'র উপরে ক্ষুর ঘষতে ঘষতে ডাকলে, 'উপে!'

দরজা ঠেলে একজন লোক ঘরের ভিতরে ঢুকেই চমকে উঠল।

ক্ষুরখানা খাপের ভিতরে ঢুকিয়ে মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হেসে উঠে প্রথম লোকটি বললে, 'কী রে, আমাকে দেখেই চমকে উঠলি বড়ো যে?'

উপে বললে, 'আজ্ঞে, দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছেন বলে আপনাকে এখন সহজে আর চেনা যাচ্ছে না!'

—'হুঁ, তাই তো আমি চাই! আমাকে দেখে চিনতে পারলে পুলিশ অবলা বলে ছেড়ে

দেবে না। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি আমার এই প্রকাণ্ড দেহখানা নিয়ে। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু বড়ো চেহারা তো ছেঁটেছুটে ছোটো করা যায় না! আমার বেয়াড়া দেহটা দেখলেই যে লোকে ফিরে-ফিরে তাকায়, আর আমার হতচ্ছাড়া মেয়েলি গলার আওয়াজ! এ গলা যে একবার শোনে সে আর ভোলে না। উপে রে, একটু চালাক লোক হলেই আমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে পারবে!'

উপে বললে, 'কর্তা, আপনি রাজবাড়ির এত কাছে এসে ভালো করেননি। পুলিশ এখন ভারী সাবধান, চারিদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

অবলা বললে, 'হ্যাঁ, খুঁজে বেড়াচ্ছে বটে, তবে রাজবাড়ির এত কাছে নয়। ওই ভুঁদো সুন্দর-দারোগাকে আমি খুব চিনি, তার নজর থাকবে এখন টালিগঞ্জের দিকেই। আমরা যে ভরসা করে রাজবাড়ির এত কাছে আসব, এ সন্দেহ কেউ ভুলেও করতে পারবে না। এখানেই আমরা বেশি নিরাপদ। কিন্তু সে কথা এখন থাক। শ্যামা এসে রাজবাড়ির কোনও খবর দিয়ে গেছে?'

—'হ্যাঁ কর্তা! শ্যামা এইমাত্র এসে বলে গেল, আসল কণ্ঠহার আছে রাজার শোবার ঘরে, ড্রেসিংটেবিলের ডানদিকের টানায়।'

—'হুঁ, বিজয়পুরের রাজা দেখছি মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি! তিনি নকল হার রাখেন সিন্দুকে লুকিয়ে, আর আসল জিনিস রাখেন প্রায় প্রকাশ্য জায়গায়! তিনি বেশ জানেন যে, সাধারণ লোকের চোখ আগেই খোঁজে লোহার সিন্দুক। চমৎকার ফন্দি।'

—'শ্যামা আরও বললে, 'রাজার শোবার ঘরের ঠিক সামনে দিনরাত একজন বন্দুকধারী সেপাই মোতায়েন থাকে।'

অবলা বললে, 'ও সেপাই-টেপাইকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তাদের চোখে ধুলো দিতে বেশি দেরি লাগবে না।'

—কিন্তু কর্তা, শ্যামা যে আজই রাজবাড়ির কাজ ছেড়ে দিতে চায়। তাকে নাকি সকলে সন্দেহ করছে।'

—'তা এখন কাজ ছাড়লে আমার কোনও ক্ষতি নেই। যে-কারণে তাকে রাজবাড়িতে কাজ নিতে বলেছিলুম আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তবে আজকের দিনটা সবুর করতে বলিস।

ঠিক এই সময়ে দড়াম শব্দে ঘরের দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকেই উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল, 'কেল্লা ফতে বাবু, কেল্লা ফতে।'

অবলা বললে, 'কী রে ভোঁদা, ব্যাপার কী?'

—'বিমল বেটা পটল তুলেছে!'

—'ঠিক বলছিস তো?'

—'বাবু, বেঠিক কথা বলবার ছেলে আমি নই। একেবারে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে আমি খবর নিয়ে এসেছি। বিমলকে অজ্ঞান অবস্থায় কাল দুপুরে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই তার জ্ঞান হয়নি। আজ ভোরবেলায় সে মারা পড়েছে।'

অবলা তার মস্ত বড়ো মুখে এক-গাল হেসে বললে, 'তাহলে আমার মুখ থেকে বিমল

যেটুকু শুনেছিল, নিশ্চয়ই তার কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি। বহুৎ আচ্ছা, এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ভোঁদা তোড়জোড় সব ঠিক কর। বিমল যখন পরলোকে হাওয়া খেতে গেছে, তখন আজ রাত্রে আবার আমরা তারই বাগান দিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করব।'

—'কিন্তু বাবু, ও-বাড়িতে সেই রামহরি বুড়ো তো এখনও আছে?'

—'সে বেটা আজ বিমলের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, পাঁচিল টপকে কখন আমরা বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকব, এটা জানতেও পারবে না।...এখন কী করতে হবে শোন ভোঁদা।'

—'বলুন কর্তা।'

—'জন-ছয়েক লোক নিয়ে আমরা রাজবাড়িতে ঢুকব। রাজবাড়ির পশ্চিমদিকের রাস্তায় রাত্রে লোকজন বড়ো চলে না, সেইখানে আমাদের একখানা মোটরগাড়ি থাকবে। শ্যামার মুখে খবর পেয়েছি, পূর্বদিকে রাজার শোবার ঘরে আসল কণ্ঠহার আছে। ও-বাড়ির অন্ধি-সন্ধি সব আমার জানা। রাজবাড়িতে ঢুকে তোকে নিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকব। বাকি লোকদের নিয়ে উপে বারান্দা দিয়ে যাবে পশ্চিমদিকে। আগে গাছকয় দড়ি বারান্দা থেকে ঝুলিয়ে দেবে। তারপর এমন আওয়াজ করে কোনও দরজা-টরজা ভাঙবার চেষ্টা করবে, যাতে-করে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর চোর এসেছে বলে সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে পশ্চিমদিকে ছুটে যাবে, আমার লোকেরা দড়ি বেয়ে নীচে নেমে মোটরে চড়ে লম্বা দেবে—বুঝেছিস?'

ভোঁদা আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, 'বুঝেছি কর্তা, বুঝেছি! বাড়ির সবাই যখন চোর ধরতে ছুটবে, তখন আমরা দুজনে ঢুকব রাজার শোবার ঘরে।'

উপে তারিফ করে বললে, 'উঃ, আমার কর্তার কী বুদ্ধির জোর! বলিহারি!'

অবলা বললে, 'ওই বিমলছোকরা কিছু করতে না পারুক, আমাদের বড়োই জ্বালিয়ে মারছিল। পথের কাঁটা এখন সাফ। প্রথমটা আমি তাকে মারতে চাইনি। কিন্তু যে নিজে মরতে চায়, ভগবানও তাকে বাঁচাতে পারে না, আমি কী করব?'

সে-রাত্রির সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক ছিল না—অবশ্য কলকাতা শহরও আজকাল আর চাঁদের মুখাপেক্ষী নয়। গ্যাস ও ইলেকট্রিকের সঙ্গে মিতালি করে কলকাতা আজ চাঁদের গর্ব চূর্ণ করেছে। তবু এখানে চাঁদের আলো জাগে বটে, কিন্তু সে যেন বাহুল্য মাত্র।

রাত তখন দুটো বাজে-বাজে। পথে পথে লোকজন আর চলছে না। পাহারাওয়ালারা রোয়াকে ঘুমিয়ে পড়ে কণ্ঠকে নীরব, কিন্তু নাসিকাকে জাগিয়ে সরব করে তুলেছে। তাদের নাসাগর্জনে ভয় পেয়ে ঝিঁঝিপোকারা একেবারে চুপ মেরে গেছে।

হঠাৎ বিজয়পুরের মহারাজার অট্টালিকার পাশের এক রাস্তার কয়েকটা গ্যাসের আলো যেন অকারণেই নিবে গেল। তারপরই জাগল একখানা মোটরগাড়ির আওয়াজ। গাড়িখানা অন্ধকার রাস্তার ভিতরে ঢুকে খানিক এগিয়েই থেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ সমস্ত চুপচাপ।...মিনিট পনেরো কাটল।

তারপরেই আচম্বিতে চারিদিকের স্তব্ধতাকে যেন টুকরো টুকরো করে দিয়ে চিৎকার

উঠল—'চোর, চোর! ডাকাত! এই সেপাই! এই দরোয়ান!' মুহূর্তের মধ্যে বহু কণ্ঠের কোলাহলে ও বহু লোকের পদশব্দে বেধে গেল এক মহা হুলুস্থূল।

বলা বাহুল্য, এই গোলমালের জন্ম বিজয়পুরের মহারাজার বাড়িতেই। পাড়াসুদ্ধ সকলের ঘুম ভেঙে গেল, এবং ছুটে গেল রোয়াকের পাহারাওয়ালার কত সাধের সুখস্বপ্ন! দেখতে দেখতে রাজপথের উপরে বৃহৎ এক জনতার সৃষ্টি হল।

কোথায় চোর, কারা চিৎকার করছে, সেসব কিছু বোঝবার আগেই সকলে শুনতে পেলে দ্রুতগামী এক মোটরের শব্দ।...

রাজবাড়ির দোতলার একটা ঘুপসি জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ে অবলা চুপিচুপি বললে, 'ভোঁদা, এইবার আমাদের পালা।'

দুজনে দ্রুতপদে, কিন্তু নিঃশব্দে পূর্বদিকে এগিয়ে গেল।

অবলা বললে, 'এই ঘর। যা ভেবেছি তাই। সেপাই গেছে চোর ধরতে। ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে? ভোঁদা, একবার উঁকি মেরে ভেতরটা দেখ তো।'

ভোঁদা উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বললে, 'ঘরের ভেতরে কেউ নেই।'

—'হুঁ, তাহলে রাজাবাহাদুরও চোর-ধরা দেখতে গেছেন। বহুৎ আচ্ছা। চল।'

দুজনে সিধে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝারি ঘর। একদিকে একখানা বড়ো খাট। আর একদিকে দুটো আলমারি এবং আর একদিকে একটা আয়নাওয়ালা ড্রেসিংটেবিল।

অবলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে ডানদিকের একটা টানা জোর করে টেনে খুলে ফেললে। ভিতর থেকে একটা ছোটো বাক্স বার করে তার ডালা খুলেই আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

ইতিমধ্যে একটা আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অভাবিত দুই মূর্তি।

তাদের একজনের হাতে রিভলভার। সে বললে, 'কী দেখছ অবলাকান্ত? জেরিনার কণ্ঠহার?'

অবলা চমকে দুই পা পিছিয়ে গেল। তার মুখের ভাব বর্ণনাতীত।

—'কী অবলা, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন হে? আমাদের চেনো না বুঝি? তাহলে শুনে রাখো, আমার নাম জয়ন্ত আর এর নাম মানিক। আমরা হচ্ছি শখের গোয়েন্দা—অর্থাৎ ঘরের খেয়ে তোমাদের মতন বনের মোষ তাড়াই। আমরা জানতুম, আজ হোক কাল হোক, তোমরা এখানে আসবেই। তাই তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই আমরা এখানে অপেক্ষা করছিলুম।...ওকি, ওকি, তুমি বন্ধুর পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ কেন? আমার রিভলভার দেখে ভয় হচ্ছে বুঝি?'—বলতে বলতে জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

অবলা হঠাৎ পিছন থেকে ভোঁদাকে মারলে প্রচণ্ড এক ধাক্কা। ভোঁদা ঠিকরে একেবারে হুড়মুড় করে জয়ন্তের দেহের উপরে এসে পড়ল। জয়ন্ত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, টাল সামলাতে না পেরে সেও ভোঁদাকে নিয়ে পড়ে গেল মাটির উপরে।

মানিক তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে জয়ন্তকে তুলতে গেল। জয়ন্ত নিজেকে ভোঁদার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে করতে বললে, 'আমাকে নয়—আমাকে নয় মানিক, তুমি ধরো অবলাকান্তকে।'

কিন্তু অবলা তখন ঘরের বাইরে। সে চোখের নিমেষে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে

বাইরের দিকে ঝুলে পড়ল। তারপর রেলিং ছেড়ে অবতীর্ণ হল পাশের বাগানের পাঁচিলের উপরে। এবং সেখান থেকে একলাফে বাগানের ভিতরে। সে হচ্ছে বিমলের বাগান।

বাগানের চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। অবলা লাফ মেরে বসে পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখলে, একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে আবার দুই মূর্তি।

মূর্তি দুটো এগিয়ে এল। তাদের দুজনেরই হাতে কী চকচক করছে? রিভলভার!

একটা মূর্তি হেসে উঠে বললে, 'আমাদের চিনতে পারছ অবলা? আমরা হচ্ছি বিমল আর কুমার। হ্যাঁ। তোমার মায়া কাটাতে পারলুম না, তাই আমি যমালয় থেকেই ফিরে এলুম।'

—'হুম। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার বধিব ঘুঘু তোমার পরান। হুম। হুম।' বলতে বলতে আর একদিক থেকে আবির্ভূত হলেন সুন্দরবাবু।

তারপরেই নানা দিক থেকে দেখা দিতে লাগল পাহারাওয়ালার পর পাহারাওয়ালা।

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর পুনরাগমন

মিথ্যা আর পলায়নের চেষ্টা! এটা বুঝে অবলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পাথরের মূর্তির মতো।

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, অবলার মতো ধড়িবাজকে কিছু বিশ্বাস নেই। শিগগির ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন।'

—'ঠিক বলেছেন। এই অবলা, হুম। বার করো হাত, পরো লোহার বালা। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

ইতিমধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনাস্থলে জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হল। অবলাকে বন্দি অবস্থায় দেখে জয়ন্ত আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক, পালের গোদাটা তাহলে পালাতে পারেনি। উঃ, সত্যি বিমলবাবু, এ হচ্ছে ভয়ানক ধড়িবাজ, আর একটু হলে আমারও চোখে ধুলো দিয়েছিল।'

মানিক বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, অবলার সঙ্গের লোকটা কোন ফাঁকে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'উপায় কী, আমরা যে অবলাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ছিলুম।'

হঠাৎ মেয়ে-গলায় খনখন করে হেসে উঠে অবলা বললে, 'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার দিন এখনও তোমাদের ফুরোয়নি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তার মানে?'

—'মানে? মানে-টানে আমি জানি না। বললুম একটা কথার কথা।'

—'চুপ করে থাকো রাসকেল। তোমার ছোটো মুখে অত কথার কথা আমি শুনতে চাই না।'

—'ওহে সুন্দর-দারোগা, কী বলব, আমার হাত বাঁধা, নইলে আমাকে রাসকেল বলার

ফল এখনই পেতে! তোমার মতো ক্ষুদ্র জীবের হাতে ধরা পড়লে এতক্ষণে আমি হয়তো লজ্জাতেই মারা পড়তুম! কিন্তু আমি ধরা পড়েছি বিমলের হাতে, এতে আমার অগৌরব নেই। তার ওপরে দেখছি আমার অজান্তে বিমল আর কুমারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডিটেকটিভ জয়ন্তও। এতগুলো মাথাকে কেমন করে সামলাই বলো! কিন্তু আমি ধরা পড়েছি একটিমাত্র ভুলেই। আগে যদি জানতুম বিমল এখনও বেঁচে আছে, তাহলে তোমরা কেউই আজ আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারতে না।'

বিমল হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ অবলা, তোমার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মরতে হয়েছিল যে তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যেই! তুমি আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছ। সত্যি কথা বলতে কি, এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কেউই আমাকে এত বেশি জ্বালাতন করতে পারেনি। তোমার বুদ্ধির তারিফ করি। কিন্তু এও জেনে রাখো অবলা, শেষ-পর্যন্ত অসাধুতার জয় কখনও হয় না।'

অবলা বললে, 'বৎস বিমল, তোমার হিতোপদেশ বন্ধ করো, ওসব বুলি আমারও অজানা নেই। এখন আমাকে নিয়ে যা করবার হয়, করো।'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, তোমার কাছ থেকে জেরিনার কণ্ঠহার আদায় করা।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ! অবলা-নচ্ছার কণ্ঠহারটা এরই-মধ্যে চুরি করতে পেরেছে নাকি!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ; কণ্ঠহার চুরি করবার পরেই আমরা দেখা দিয়েছি।'

অবলা হাসিমুখে বললে, 'না, কণ্ঠহার আমার কাছে নেই।'

—'নেই?'

—'না। তোমাদের দেখে আমি যখন ভোঁদার পিছনে সরে দাঁড়াই, কণ্ঠহারটা তখনই লুকিয়ে তার পকেটে ফেলে দিয়েছি।'

—'তুমি বলতে চাও, ভোঁদা কণ্ঠহার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে?'

—'হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ধরলেও কণ্ঠহার পাবে না। আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু ও জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে অবলার জামা কাপড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কণ্ঠহার পাওয়া গেল না।

অবলা বললে, 'দেখছ তো, হেরেও আমি জিতে গেলুম?'

সুন্দরবাবু রাগে গসগস করতে করতে বললেন, 'হতভাগার বাদুড়ে মুখখানা থাবড়া মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে!'

অবলা বললে, 'ওহে খুদে দারোগা, আর এখানে দাঁড়িয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কোনওই লাভ নেই। কণ্ঠহারের আশা ছেড়ে এখন আমায় থানায় নিয়ে চলো দেখি! আমার ঘুম পেয়েছে।'

সুন্দরবাবু ধাক্কা মেরে অবলাকে পাহারাওয়ালাদের দিকে ঠেলে দিতে গেলেন, কিন্তু তাকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলেন না।

অবলা খিলখিল করে হেসে বললে, 'ওহে পুঁচকে বীরপুরুষ! তোমার নিজের শক্তি দেখছ তো? এখন যদি আমার হাত খোলা থাকত তোমার কী অবস্থা হত বলো দেখি?'

সুন্দরবাবু রাগে অজ্ঞানের মতো হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'হুম, হুম! এই সেপাই, ছুঁচোটাকে ধাক্কা মারতে মারতে ওখান থেকে নিয়ে চলো দেখি! হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, লোকটা সুবিধের নয়, আমরাও আপনার সঙ্গে থানা পর্যন্ত যাব নাকি?'

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, 'সঙ্গে সেপাই রয়েছে, অবলারও হাত বাঁধা, তোমাদের সাহায্যের দরকার নেই। মোটরে উঠে থানায় পৌঁছোতে ছ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না।'

সুন্দরবাবু অবলাকে নিয়ে চলে গেলেন।

জয়ন্ত ফিরে দেখলে, সামনের দিকে তাকিয়ে বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর হাসিমুখে বললে, 'বিমলবাবু, আপনি কী ভাবছেন হয়তো আমি তা বলতে পারি।'

—'বলুন দেখি।'

—'আপনি ভাবছেন, অবলা এইমাত্র কণ্ঠহারের যে কাহিনি বললে, হয়তো সেটা সত্য নয়।'

—'ঠিক। তারপর?'

—'আপনি আরও ভাবছেন, অবলা এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে অনেক ফুলগাছ আর হাস্নুহানার বড়ো ঝোপ রয়েছে। ওখানটা একবার ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার।'

—'বাহাদুর জয়ন্তবাবু, আপনি আমার মনের কথা ঠিক ধরতে পেরেছেন। অতএব কুমার, বাড়ির ভেতর থেকে তুমি একটা পেট্রলের লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এসো।'

কুমার তাড়াতাড়ি ছুটল এবং পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল।

বিমলের সন্দেহ মিথ্যে নয়। অল্পক্ষণ খোঁজবার পরেই হাস্নুহানার ঝোপের ভিতরেই পাওয়া গেল জেরিনার কণ্ঠহার!

কুমার সানন্দে বললে, 'অবলা গ্রেপ্তার—কণ্ঠহার উদ্ধার! ব্যাস আমরাও নিশ্চিন্ত!'

ঠিক সেই সময়ে মহাবেগে সুন্দরবাবুর দ্বিতীয় আবির্ভাব! বিষম চিৎকার করতে করতে তিনি বলছেন, 'সর্বনাশ হয়েছে! অবলা আবার পালিয়েছে।'

দশম পরিচ্ছেদ

শেষ রাতে

বিমল অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে বললে, 'অবলা আবার পালিয়েছে! বলেন কি সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'আর কিছু বলবার মুখ আমার নেই ভায়া। তোমরা অনায়াসেই আমার এক গালে চুন আর এক গালে কালি মাখিয়ে দিতে পারো। আমি একটুও আপত্তি করব না।'

জয়ন্ত বললে, 'অবলার হাত বাঁধা, আপনার সঙ্গে ছিল সার্জেন্ট আর পাহারাওয়ালা, তবু সে পালাল কেমন করে?'

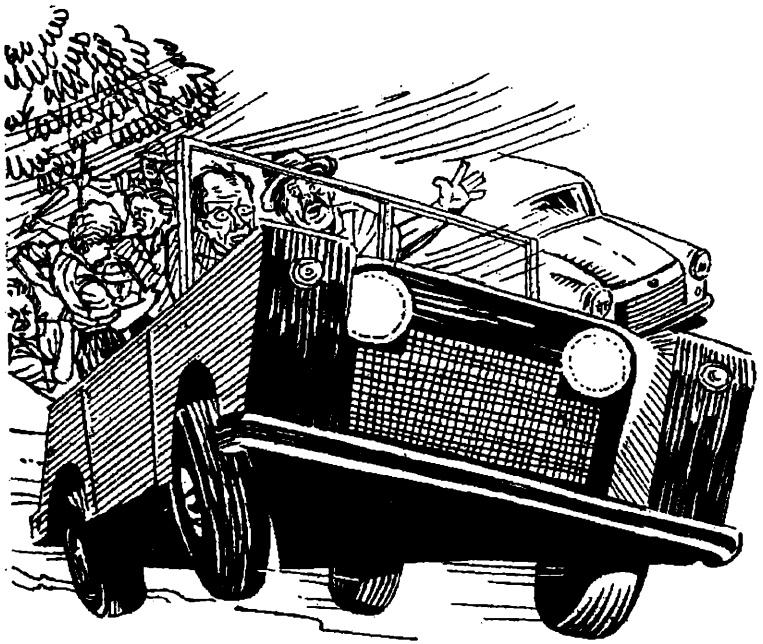

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, কেমন করে? সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ভাই, অদ্ভুত কাণ্ড! পুলিশের ওপর ডাকাতি—অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার!'

—'কী বলছেন আপনি!'

—'তাহলে শোনো। অবলাকে নিয়ে আমরা তো মোটরে উঠে থানার দিকে চললুম—গাড়িতে আমার সঙ্গে ছিল একজন সাব-ইন্‌স্পেকটার, একজন সার্জেন্ট, আর দুজন পাহারাওয়ালা। খানিক দূর এগিয়েই দেখলুম, পথ জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একটা লোক তার মেশিনের ঢাকনা খুলে কী যেন পরীক্ষা করছে। পথ জোড়া দেখে আমার ড্রাইভারও বাধ্য হয়ে গাড়ি থামিয়ে ফেললে, আর তার পরমুহূর্তেই তোমাদের বলব কী ভাই, চোখে-কানে কিছু দেখবার শুনবার আগেই, কোত্থেকে কারা এসে বিপুল বিক্রমে আমাদের এমন আক্রমণ করলে যে, আমরা কেউ একখানা হাত তোলবারও অবকাশ পেলুম না! চারিদিকে দেখলুম সর্ষেফুলে ভরা ঘোর অন্ধকার, সর্বাঙ্গে খেলুম কিল-চড় আর ডান্ডার গুঁতো, তার পরের সেকেন্ডেই অনুভব করলুম আমি চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি রাস্তার ধুলোয়!...একখানা গাড়ি ছুটে চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, অচেনা মোটরখানা অদৃশ্য, আমাদের মোটরখানা দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার সঙ্গীরা রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দিতে আর্তনাদ করছে!'

—'হুঁ, অবলার দলের সবাই দেখছি খুব কাজের লোক, কেউ কম যায় না। এরই মধ্যে

তারা রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে আবার তাদের দলপতিকে উদ্ধার করবার জন্যে চমৎকার এক 'প্ল্যান' ঠিক করে ফেলেছে! বাহাদুর!'

—'হুম, ওদের তো বাহাদুরি দিচ্ছ জয়ন্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হবে বলো দেখি? কালকেই তো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আমাকে নিয়ে যা তা ঠাট্টা শুরু করে দেবে!'

—'আপনিও মোটরে উঠে তাদের পিছনে ছুটলেন না কেন?'

—'সে-চেষ্টাও কি করিনি ভাই? কিন্তু মোটর চালাতে গিয়ে দেখা গেল, তার চাকার 'টায়ার'গুলো হতভাগারা ছ্যাঁদা করে দিয়ে গেছে!'

—'এই ভয়েই তো আপনার সঙ্গে আমরাও যেতে চেয়েছিলুম সুন্দরবাবু!'

— বেঁচে গিয়েছ ভায়া, বেঁচে গিয়েছ—আমার সঙ্গে থাকলে তোমাদেরও চোরের মার খেয়ে মরতে হত!'

মানিক বললে, 'আজ্ঞে না মশাই! আমরা গাড়িতে থাকলে আপনার মতো ঘুমিয়ে পড়তুম না!'

সুন্দরবাবু মহা চটে বললেন, 'হুম, এ হচ্ছে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। মানিক, তুমি কি আমার চাকরিটি খাবার চেষ্টায় আছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মানে?'

—'মানে হচ্ছে এই যে, অত রাত্রে রাস্তা জুড়ে একখানা সন্দেহজনক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আপনি সাবধান হতে পারেননি। তা যে পারবেন না, এ তো জানা কথাই। কারণ যখন কারুর নাক ডাকে তখন কেউ কি সাবধান হতে পারে?'

সুন্দরবাবু অভিযোগ করে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! মানিকের আজকের ঠাট্টা আমি কিন্তু সহ্য করতে পারব না! এ বড়ো 'সিরিয়াস' ঠাট্টা!'

মানিক বললে, 'দাঁড়ান না, আমার ঠাট্টাই আপনার গায়ে লাগছে, কিন্তু কাল কাগজওলারা যখন 'ঘুমন্ত পুলিশের কাণ্ড' শিরোনাম দিয়ে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ রচনা করে ফেলবে, তখন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল!'

সুন্দরবাবু করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'তা যা বলেছ ভাই! তুমি তো ঘরের লোক—ঠাট্টাও করো, ভালোও বাসো। কিন্তু ওই কাগজওলার দল ওদের আমি ঘৃণা করি!'

বিমল সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার এত বেশি মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। যার জন্যে এত গণ্ডগোল সেই আসল জেরিনার কণ্ঠহার আমরা আবার উদ্ধার করতে পেরেছি।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হুম, বলো কি!'

বিমলবাবু সব কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করে বললে, 'কণ্ঠহারটা কি আপনি এখনই নিয়ে যেতে চান?'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, খেপেছ? এই রাত্রে ওই সর্বনেশে কণ্ঠহার নিয়ে পথে বেরুলে কি রক্ষে আছে? যে আশ্চর্য ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়েছি, সে সব করতে পারে।'

বিমল যেন কী ভাবতে ভাবতে বললে, 'হ্যাঁ, অবলা যে অসাধারণ ব্যক্তি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। হয়তো এই মুহূর্তেই সে আমার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে!'

সুন্দরবাবু একবার চমকে উঠেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'নাঃ, এতটা সাহস তার হবে না। কারণ সে বিলক্ষণই জানে, এবারে ধরা পড়লে আমি তার একখানা হাড়ও আস্ত রাখব না। যে কিল-চড়-ডান্ডা খেয়েছি, তার শোধ নিতে হবে তো! হুম, পুলিশকে ধরে ঠ্যাঙানো, এত বড়ো আস্পর্ধা!'

বিমল বললে, 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এইবার রাত থাকতে থাকতে আপনারা যে যার বাসায় ফিরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন গে, যান।' বলে সে বাগানের ঘাস-জমির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

জয়ন্ত বললে, 'ওকি, আপনি ওখানে জমি নিলেন কেন? বাড়ির ভেতরে যাবেন না?'

—'না, আমি আর কুমার, এইখানেই খোলা হাওয়ায় খানিক বিশ্রাম করতে চাই। কী বলো কুমার, রাজি আছ?'

—'আলবত।' বলেই কুমার বিমলের পাশে গিয়ে স্থান গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত হেসে কী বলতে গিয়ে আর বললে না, ফিরে হনহন করে বাগানের ফটকের দিকে এগিয়ে চলল এবং তার পিছু নিলেন মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও।

পথে বিমলের বাড়ি ছাড়িয়ে মিনিট খানেক অগ্রসর হবার পরেই পাওয়া গেল একটি সরকারি পার্ক।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে তো পাহারাওলা রয়েছে, থানায় একলা যেতে হবে না। অতএব আমি আর মানিক এইখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।'

—'এখান থেকে বিদায় নেবে কেন? তোমাদের বাসা তো থানা ছাড়িয়ে!'

—'বিমলবাবুদের মতো আমরাও পার্কের এই খোলা হাওয়ায় খানিক বিশ্রাম করব।'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন ভঙ্গি করে বললেন, 'আমি প্রায় দেখি, তোমাদের আর বিমলবাবুদের মাথায় কেমন একরকম ছিট আছে। বাড়িতে অপেক্ষা করছে বিছানার আরাম, তবু হাটে বাটে যেখানে-সেখানে বিশ্রাম! না, তোমরা যতটা ভাবো আমি ততটা হাঁদা নই! হুম, নিশ্চয়ই এর কোনও মানে আছে!'

—'মানেটা যে কী, বাসায় ফিরে সেইটে আবিষ্কার করে ফেলুন গে'—হাসিমুখে এই কথা বলতে বলতে মানিকের হাত ধরে জয়ন্ত পার্কের ভিতর প্রবেশ করল।

একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে আশ্রয় নিয়ে জয়ন্ত বলল, 'মানিক পথ থেকে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু এখান থেকে আমরা পথের সবাইকেই দেখতে পাব।'

মানিক কৌতূহলী হয়ে বললে, 'এই শেষ-রাতে পথে তুমি কাকে দেখবার আশা করো?'

—'অবলাকে।'

—'কী বলছ হে?'

—'হ্যাঁ। বিমলবাবুও জানেন, অবলা আজ রাত্রেই আবার ঘটনাস্থলে আসতে বাধ্য। সেইজন্যেই তিনি আজ বাগান ছেড়ে নড়তে রাজি নন।'

—'ও, বুঝেছি! তোমরা বলতে চাও, সেই হানুহানার ঝোপের ভেতর থেকে কণ্ঠহারছড়া উদ্ধার করবার জন্যে আবার হবে অবলার আবির্ভাব?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখানে তার পুনরাবির্ভাব যদি হয়, আজ রাত্রেই হবে। কারণ অবলার যুক্তি হবে এই ঃ কণ্ঠহার ওই ঝোপেই আছে, বিমল বা অন্য কেউ এখনও তার সন্ধান পায়নি। কিন্তু আজকের রাতটা পুইয়ে গেলে কাল সকালের আলোয় কণ্ঠহারটা নিশ্চয়ই অন্য কারুর চোখে পড়ে যাবে। অতএব হারছড়াটাকে যদি উদ্ধার করতে হয়, আজ রাত্রেই করতে হবে। ও হারের ওপরে অবলার যে বিষম লোভ, এমন সুযোগ সে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তার বিশ্বাস, আমরা সবাই এখন যে যার বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছি, বাগান একেবারে নিষ্কণ্টক!'

গ্যাসের আলোয় দেখা যাচ্ছে, বিজন রাজপথ—অত্যন্ত স্তব্ধ। পনেরো মিনিটের মধ্যে একজনও পথিকের সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, 'আর একটু পরেই গ্যাসের আলো নিববে, ধীরে ধীরে শহর জেগে উঠবে।'

জয়ন্ত চিন্তিত মুখে বললে, 'তবে কি অবলা প্রাণের ভয়ে কণ্ঠহারের আশা ত্যাগ করলে! উঁহু, সে তো কাপুরুষ নয়!'

মানিক আগ্রহ-ভরে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো। ওই একটা লোক আসছে! লোকটা চোরের মতো ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অগ্রসর হচ্ছে।'

—'কিন্তু মানিক, লোকটাকে চেনবার উপায় নেই। ওর মাথা থেকে নাক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা! তবে লোকটা খুব জোয়ান আর ঢ্যাঙা বটে!'

—'ও যে বিমলবাবুদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে গেল!'

—'এইবারে আমাদেরও পার্কের আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। চলো, কিন্তু সাবধান!'

পার্ক থেকে বেরিয়ে দুজনে উঁকি মেরে দেখলে, লোকটা পথের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে!

জয়ন্ত নস্যদানি বার করে এক টিপ নস্য নিয়ে খুশি-গলায় বললে, 'এত তাড়াতাড়ি যখন অদৃশ্য হয়েছে, লোকটা তখন নিশ্চয়ই বিমলবাবুদের বাগানের ভেতরেই ঢুকেছে!'

—'আমরাও এগুব নাকি?'

—'নিশ্চয়।'

কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই শেষ-রাত্রের স্তব্ধতা ভেঙে গেল উপর-উপরি তিনবার রিভলভারের গর্জনে। জয়ন্ত ও মানিক বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে।

বিমলদের বাড়ির কাছে পৌঁছেই তারা দেখলে, বাগানের পাঁচিল টপকে ঠিক সামনেই লাফিয়ে পড়ল একটা লোক।

জয়ন্তও তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো, লোকটা কোনও বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড দুই ঘুষি খেয়ে মাটির উপরে ঘুরে পড়ে গেল।

মানিক হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

পরমুহূর্তে পাঁচিলের উপর থেকেই পথে অবতীর্ণ হল বিমল ও কুমার।

জয়ন্ত বললে, 'ওই দেখুন বিমলবাবু, আপনার আসামিকে।'

বিমল সচকিত কণ্ঠে বললে, 'আপনারা! তাহলে আপনারাও জানতেন, অবলা আজ আবার আসবে?'

—'নইলে ঘর থাকতে বাবুই ভিজবে কেন? এই রাতে পথ আশ্রয় করব কেন? কিন্তু বিমলবাবু, যাকে ধরেছি সে অবলা নয়, ভোঁদা।'

—'ভোঁদা?' বিমলের মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

—'হ্যাঁ বিমলবাবু। অবলা এত সহজে ধরা পড়বার ছেলে নয়। চালাকের মতন ভোঁদাকে সে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।'

—'যাক, উপায় কী? ভোঁদাও বড়ো কম পাত্র নয়, অবলার ডান হাত।'

—'এখন একে নিয়ে কী করা যাবে?'

—'সে কথা সকালে ভাবব। আজ তো ওকে আমার বাড়িতে বন্দি করে রেখে দি। কি বলেন?'

—'বেশ।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনাহূত অতিথি

কাল শেষ-রাত পর্যন্ত ঘুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আজ সকালে তাই বেলা নটার আগে বিমলের ঘুম ভাঙল না।

সে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলে, কুমারের নাসিকা-বাঁশরি এখনও তান-ছাড়া বন্ধ করেনি।

চেঁচিয়ে ডাকলে, 'বলি কুমার! ওহে কুমার! এখন নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করো। প্রভাতের পরমায়ু ফুরোতে আর দেরি নেই।'

কুমার এপাশ থেকে ওপাশে ফিরল। তারপর দুই চোখ মুদেই বললে, 'নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন তো করব, কিন্তু উপকরণ কই?'

—'অর্থাৎ এক পেয়ালা গরম চা?'

—'নিশ্চয়। আগে চা আসুক, তবে আমি চোখ খুলব।'

বিমল ডাকলে, 'রামহরি! ওগো রামহরি! বলি তুমিও ঘুমচ্ছো নাকি? স্টোভের ওপরে গরম জল ভরা কেটলির সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি না কেন?'

রামহরি বিশেষ চিন্তিত মুখে ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'থামো খোকাবাবু, অত আর চ্যাঁচাতে হবে না। ওদিকে কী কাণ্ডটা হয়েছে শুনলে তোমাদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।'

কুমার চোখ মেলে বললে, 'চক্ষুস্থির হোক আর না হোক, তোমার কথা শুনে এই আমি চক্ষু উন্মীলিত করলুম। কী কাণ্ড হয়েছে রামহরি?'

—'তোমাদের সেই ভোঁদা বেটা লম্বা দিয়েছে।'

বিমল কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললে, 'তাই নাকি?'

কুমার খালি বললে, 'ও।'

—'তোমাদের কি মনে নেই, একতলার যে-ঘরে ভোঁদাকে বন্ধ করে রেখেছিলে, তার একটা জানালার একটা গরাদ ভাঙা? ভোঁদা সেইখান দিয়েই পালিয়েছে!'

বিমল বললে, 'তাই নাকি?'

কুমার বললে, 'ও!'

রামহরি বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমরা দুজনে কাল কি সিদ্ধিটিদ্ধি কিছু খেয়েছ?'

—'কেন?'

—'নইলে অত কষ্ট করে যাকে ধরলে, সে পালিয়েছে শুনেও তোমাদের টনক নড়ছে না কেন?'

বিমল খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুমার বললে, 'আমাদের টনক সহজে নড়ে না। যাও রামহরি চা নিয়ে এসো!'

রামহরি হতভম্বের মতন তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল ও কুমার সমস্বরে গর্জন করে উঠল, 'চা! চা! চা!'

রামহরি নড়ল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলে। তারপর হঠাৎ সমুজ্জ্বল মুখে বললে, 'ওঃ-হো, বুঝেছি!'

—'ঘোড়ার ডিম বুঝেছ!'

—'ঘোড়ার ডিম নয় গো খোকাবাবু, ঠিক বুঝেছি! এতকাল একসঙ্গে ঘর করলুম, তোমাদের মতন মানিক-জোড়কে চিনতে আর পারব না?'

—'বটে?'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ভোঁদাকে তোমরা ইচ্ছে করেই পালাতে দিয়েছ!'

—'কী করে বুঝলে?'

—'ও ঘরে জানলার গরাদ ভাঙা, সেটা তো তোমরা জানতেই! আর জেনে-শুনেই তোমরা যখন ভোঁদাকে ওই ঘরেই বন্ধ করেছিলে, তখন তোমাদের নিশ্চয় মনের বাসনা ছিল, সে যেন এখান থেকে সরে পড়ে!'

বিমল বললে, 'তাই নাকি?'

কুমার বললে, 'ও!'

রামহরি বললে, 'আর ন্যাকামি করতে হবে না, যাও! সত্যি করে বলো দেখি, আমি ঠিক বুঝেছি কি না?'

বিমল বললে, 'আমি স্বীকার করছি রামহরি, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। এখন দয়া করে চটপট চা এনে দাও দেখি!'

রামহরি গোঁ ধরে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু, তা হবে না। আগে বলো, কেন ভোঁদাকে ধরেও ছেড়ে দিলে?'

—'আহা, তুমি জ্বালালে দেখছি! এতটা যখন বুঝেছ তখন এটুকু আর বুঝতে পারছ না যে, ভোঁদাকে ছেড়ে দিয়েছি পালের গোদাকে ধরব বলে!'

—'কেমন করে?'

—'জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু তার পিছনে আছেন। আমরা অবলার এখনকার ঠিকানা জানি না। ভোঁদা পালিয়ে নিজেদের আড্ডা ছাড়া আর কোথাও যাবে না। সেই আড্ডার সর্দার হচ্ছে অবলা।'

—'খোকাবাবু, বুদ্ধি খেলিয়েছ ভালো! কিন্তু ভোঁদা তো জয়ন্তবাবুদের চেনে, তাঁরা পিছু নিলে সে সন্দেহ করবে না?'

—'রামহরি, তুমি আমাকে খোকাবাবু বলে ডাকো বটে, কিন্তু সত্যিই তো আমি আর খোকা নই! ও-কথা কি আমরাও ভাবিনি! জয়ন্তবাবুরা ভোঁদার পিছনে যাবেন না, যাবে তাঁদের চর।'

—'চর?'

—'হ্যাঁ। তুমি তো জানো না, কাজের সুবিধে হবে বলে জয়ন্তবাবু আজকাল একদল চর পুষছেন। তারা হচ্ছে পথের ছেলে—অনেকেই আগে ছিল ভিখারি। বয়সে তারা ছোকরা বটে, কিন্তু জয়ন্তবাবুর হাতে পড়ে সবাই খুব চালাক হয়ে উঠেছে। তাদের দিয়ে জয়ন্তবাবু এখন অনেক কাজ পান—তারা প্রত্যেকেই নাকি এক-একটি ছোট্টখাট্ট গোয়েন্দা! ভোঁদার পিছু নেবে তাদেরই কেউ। আমরা এখন জয়ন্তবাবুর জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির উপরে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কুমার বললে, 'নিশ্চয় জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু আসছেন! রামহরি, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, চায়ের ব্যবস্থা করো-গে যাও।'

—'চা? তা দু-এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না।' বলতে বলতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একমুখ হাসি নিয়ে স্বয়ং অবলা এবং তার পিছনে পিছনে ভোঁদা। তাদের দুজনেরই হাতে রিভলভার।

বিমল, কুমার ও রামহরির মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, তাদের চোখের সামনে যেন প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।

খিলখিল করে মেয়ে-হাসি হেসে অবলা বললে, 'হে গর্দভরাজ বিমল, আমাদের দেখে তুমি কি বড়োই আশ্চর্য হয়েছ? কেন বলো দেখি? তোমরা তো আমাকেই খুঁজছিলে। সেইজন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।'

হতভম্ব বিমলের মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুল না, অবলার দুর্জয় সাহস দেখে বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে গেল।

অবলা রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'ভোঁদা, তুই ওপাশে গিয়ে দাঁড়া। এরা কেউ একটা আঙুল নাড়লেই গুলি করবি।.....বিমল, এখনও তোমার বিশ্বাস বোধহয় যে, সূক্ষ্মবুদ্ধি আর বিচারশক্তিতে তুমি হচ্ছ একটি অদ্বিতীয় জীব? আর আমি হচ্ছি একটি আস্ত হাঁদারাম? যে-ঘরের জানলা ভাঙা সে-ঘরে ভোঁদাকে বন্ধ করার মানেই যে তাকে ছেড়ে দেওয়া, এ-কথাটাও আমি বুঝতে পারব না? তোমরা ভেবেছিলে ভোঁদার পিছু নিলেই আমার ঠিকানা জানতে পারবে? বেশ, এই তো আমি নিজেই এসেছি, আমাকে নিয়ে কী করতে চাও, বলো।'

কুমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'তুমি চোর, তুমি ডাকাত, তুমি খুনে। তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে চাই।'

—'ওরে বাপ রে, কী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই তো আমি হাজির, গ্রেপ্তার করবার হুকুম হোক।'

বিমল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কুমার অত্যন্ত অসহায়ের মতো অবলার ও ভোঁদার রিভলভারের দিকে তাকিয়ে দেখলে। রামহরি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কী বকতে লাগল।

অবলা বললে, 'আমাকে গ্রেপ্তার করবি? আস্পর্ধার কথা শোনো একবার! তোদের মতো চুনোপুঁটির হাতে ধরা পড়বার জন্যে আমার জন্ম হয়নি, বুঝেছিস? পদে পদে আমার কাছে নাকাল হচ্ছিস, তবু তোদের চৈতন্য হল না?'

ভোঁদা বললে, 'কর্তা, মিছে কথা বলে কাজ নেই, যা করতে এসেছেন চটপট সেরে ফেলুন।'

অবলা বললে, 'কেন রে ভোঁদা, তাড়াতাড়ির দরকার কী? জয়ন্ত আর মানিক তাদের চ্যালা-চামুণ্ডা দিয়ে আমাদের খালি-বাসার ওপরে যত খুশি পাহারা দিক না, আমরা তো সেখানে নেই—সেখানে আর ফিরেও যাব না, তবে তোর ভয় কিসের বল দেখি?'

ভোঁদা বললে, 'ওরা যদি পুলিশে খবর দেয়?'

—'যদি নয় রে ভোঁদা, নিশ্চয় এতক্ষণে পুলিশ খবর পেয়েছে। কিন্তু খবর পেয়েই তো মোটকা গোয়েন্দা সুন্দরলাল আমাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসতে পারবে না। ইংরেজদের যতই দোষ থাক, তাদের আইন ভারী চমৎকার রে। সুন্দরকে আগে তার কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, তারপর আমাদের এই নতুন বাসা 'সার্চ' করবার জন্যে আলাদা হুকুম নিতে হবে। কাজে-কাজেই আমি এখন খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বিমলের সঙ্গে গল্প

করতে পারি—কি বলো বিমলভায়া, তাই নয় কি? তুমি বোধ করি ভাবছ যে, জয়ন্তের ঈগল-চক্ষুর পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন করে আমি এখানে এলুম? গুপ্তদ্বার ভায়া, গুপ্তদ্বার! জয়ন্ত জানে না, আমার নতুন বাসার পিছন দিয়ে পালাবার জন্যে একটা লুকানো পথ আছে!'

বিমল এতক্ষণ পরে বললে, 'অবলা, তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

চেয়ারে বসে পা নাচাতে নাচাতে অবলা বললে, 'হুঁ', তোমার বিস্মিত হওয়াই উচিত! সাহস তো আমার আছেই, তার উপরে আছে মৌলিকতা! আমি কাজ করি নতুন পদ্ধতিতে—অন্য লোক যেখানে দেখে অসম্ভব সব বাধা, আমি সেখানে অনায়াসেই সহজ পথ আবিষ্কার করতে পারি। দ্যাখো না, নইলে সোজা লম্বা না দিয়ে আজ কি আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতে পারতুম? কী বিমল, মাঝে মাঝে আড়চোখে ওই টেবিলটার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ বলো দেখি? ওর কোনও টানায় রিভলভার-টিভলভার কিছু আছে বুঝি? ভাবছ, একটু ফাঁক পেলেই ওইদিকে হাত বাড়াবে? কিন্তু ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, ফাঁক তুমি পাবে না—নড়েছ কি গুলি করেছি!...হুঁ, ভালোকথা! ওই টেবিলের টানায় সেই কণ্ঠহারটা তুমি লুকিয়ে রাখোনি তো?'

বিমল বললে, 'কণ্ঠহার আমি সুন্দরবাবুর হাতে দিয়েছি।'

—'কখন? কাল রাত্রে? আমার হাত থেকে ঠ্যাঙানি খাবার পরও সুন্দর এখানে এসে কণ্ঠহার নিয়ে গেছে?'

—'হুঁ।'

—'আমি একথা বিশ্বাস করি না। সে-অবস্থায় কণ্ঠহার নিয়ে যাবার সাহস নিশ্চয় তার হয়নি। আর অত রাত্রে হার-ছড়া হাতছাড়া করবে, তুমিও এমন বোকা নও।.....ভোঁদা, এদের ওপরে আমি নজর রাখছি, তুই টেবিলের টানাগুলো খুলে দেখ তো!'

ভোঁদা হুকুমমতো কাজ করলে। কোনও টানাই চাবি-বন্ধ ছিল না। সেগুলো হাতড়ে একটা রিভলভার বের করে নিয়ে সে বললে, 'এখানে কণ্ঠহার নেই, কিন্তু এটা ছিল।'

—'রিভলভার? আমি আগেই জানতুম, বিমলের হাত ওটা নেবার জন্যে নিশপিশ করছে! কিন্তু বাপু, তুমি কার পাল্লায় পড়েছ, জানো তো? এখন যা চাই, বার করো দেখি! কোথায় সেই কণ্ঠহার?'

—'সুন্দরবাবুর কাছে।'

—'আবার ধাপ্পা? সাবধান বিমল, আগুন নিয়ে খেলা করো না। ওই কণ্ঠহারের জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত পণ করেছি, এখানে আমি এত বিপদ মাথায় নিয়ে ছেলেখেলা করতে আসিনি! যদি দরকার হয়, এখনই তোমাদের তিনজনকে খুন করেও আমি কণ্ঠহার নিয়ে যাব।'

বিমল অবহেলা-ভরে বললে, 'খুন করতে তোমার যে হাত কাঁপে না, তা আমি জানি। এখনও আমার গলায় দড়ির দাগ মিলোয়নি।'

সকৌতুকে অবলা হাসতে লাগল এবং সে হাসির সঙ্গে নীরবে যোগ দিলে যেন তার একটিমাত্র চক্ষুও। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'সেবারে দৈবগতিকে গলার দড়িকে

ফাঁকি দিয়েছ বলে মনে করো না যেন, এবারেও আমার হাতের রিভলভারকে ফাঁকি দিতে পারবে! আমি এখানে এসেছি কণ্ঠহার নিয়ে যাবার জন্যে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমার কথা তো শুনলে। কণ্ঠহার আমার কাছে নেই।'

অবলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভোঁদা, তোর রিভলভারটাও আমাকে দে। এই আমি দুহাতে দুটো রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তুই আগে বিমল আর কুমারের জামাকাপড়গুলো ভালো করে খুঁজে দেখ!'

হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে কে খুব জোরে তিনবার শিস দিলে।

অবলা ও ভোঁদা দুজনেই চমকে উঠল।

ভোঁদা সভয়ে বললে, 'মোনা শিস দিলে! পুলিশ আসছে!'

—'অ্যাঁঃ, আমার হিসেব গুলিয়ে গেল? পুলিশ কী করে এত শীঘ্র খবর পেলে?'—বলতে বলতে অবলা একলাফে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ভোঁদাও। পরমুহূর্তে তারা অদৃশ্য এবং সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ!

বিমলও একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'শীঘ্র এসো কুমার! অবলাকে যদি ধরতে হয় তবে আজকেই ধরতে হবে!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বন্যা

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতেই বিমল ও কুমার শুনতে পেলে, একখানা মোটরগাড়ি ছোটার আওয়াজ।

কুমার বললে, 'অবলা আবার ভাগল!'

বিমল ছুটে সদর দরজা থেকে বেরিয়েই ডানদিকে তাকিয়ে দেখলে, একখানা লাল রঙের মোটর যেন ঝড়ো হাওয়ার আগে উড়ে চলেছে!

বাঁ-দিকেও গাড়ির শব্দ শুনে তারা ফিরে তাকালে। আর একখানা মোটর ঠিক সেইখানেই এসে থামল এবং গাড়ির হুইল ছেড়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত।

তাকে কোনও কথা বলবার সময় না দিয়ে বিমল বললে, 'ওই লালগাড়িতে অবলা পালাচ্ছে!'

আর কিছু বলতে হল না। জয়ন্ত আবার এক লাফে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গে বিমল ও কুমারও গাড়ির ভিতরে উঠে পড়ল। মানিকও সেখানে ছিল। গাড়ি ছুটল তিরবেগে।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কেমন করে অবলার খবর পেলেন?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, 'ভাগ্যিস আমার এক ছোকরাকে এইখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিলুম! সেই-ই আমাকে ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে!'

মানিক বললে, 'উঃ, কী জোরে অবলাদের গাড়ি ছুটছে! অ্যাক্সিডেন্ট হল বলে!'

কিন্তু তাদের, না অবলাদের গাড়ি—কাদের গাড়ি ছুটছে বেশি বেগে? দুখানা গাড়িই যেন পাগলা হয়ে জনাকীর্ণ রাজপথে বিষম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলে। প্রথম গাড়িখানা এড়াতে না এড়াতেই দ্বিতীয় গাড়িখানা পথিকদের উপরে এসে পড়ে হুড়মুড় করে! কেউ পথের উপরে আছাড় খেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কেউ ভয়ে চিৎকার করে, কেউ রেগে গালাগালি দেয়, বিস্মিত কুকুররা ঘেউ-ঘেউ রবে প্রতিবাদ করতে থাকে, অন্যান্য গাড়িগুলো কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে নিজেদের সামলে নেয়। এক জায়গায় একটা পাহারাওয়ালা লাল গাড়িখানাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবামাত্র মোটরের ভিতর থেকে হল রিভলভারের গুলিবৃষ্টি! পাহারাওয়ালা 'বাপ রে বাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠে লম্বা দৌড় মেরে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করলে।

দুখানা গাড়ির মধ্যে ব্যবধান ছিল যথেষ্ট। জয়ন্ত অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যবধান কমাতে পারলে না। সে তিক্তস্বরে বললে, 'ও গাড়িখানাকে যদি আরও একটু কাছে পাই, তাহলে গুলি করে ওর 'টায়ার' ছ্যাঁদা করে দিতে পারি।'

লালগাড়ি একটা তেমাথায় গিয়ে হঠাৎ মোড় ফিরে অদৃশ্য হল।

কয়েক মুহূর্ত পরে জয়ন্তও মোড় ফিরে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'দেখুন বিমলবাবু! মোড় ফিরেই আমরা অবলাদের কত কাছে এসে পড়লুম!'

সকলে দেখলে সত্যি-সত্যিই দুখানা গাড়ির মধ্যে ব্যবধান অনেকটা কমে গিয়েছে।

বিমল উত্তেজিত ভাবে বললে, 'তার মানে হচ্ছে, মোড় ফিরে আমাদের চোখের আড়ালে এসেই অবলাদের গাড়ি নিশ্চয় একবার থেমে দাঁড়িয়েছিল!'

কুমার বললে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে অবলাও গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে। খাসা ফন্দি! আমরা ছুটব লালগাড়ির পিছনে, আর অবলা দেবে সোজা লম্বা!'

বিমল বললে, 'আর বাসায় ফিরে গর্দভরাজ বিমলের কথা ভেবে হেসে লুটিয়ে পড়বে!'

জয়ন্ত বললে, 'অবলা যে পালিয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে গেল কোন দিকে? ডাইনে তো একটা সরু গলি দেখছি!' বলেই সে নিজের গাড়ি থামিয়ে ফেললে।

বিমল গলির মোড়ের একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে হাঁকলে, 'ওহে দোকানি, এখুনি একখানা লালগাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল?'

—'হ্যাঁ বাবু! সর্বনেশে গাড়ি! যেন তুফান মেল! আপনারাও তো কম যান না দেখছি! আজ কি শহরের রাস্তায় মোটরের রেস চলেছে?'

বিমল অধীর স্বরে বললে, 'লালগাড়ি থেকে কেউ এখানে নেমেছে?'

—'হ্যাঁ! মস্ত লম্বা একটা জোয়ান লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ওই গলির ভেতরে ছুটে চলে গেল!'

ততক্ষণে জয়ন্তের গাড়ি থেকেও সবাই নীচে নেমে পড়েছে!

কুমার বললে, 'দোকানি, এ গলিটা দিয়ে বেরুনো যায়?'

—'না বাবু!'

জয়ন্ত গলির দিকে ছুটল।

বিমল বললে, 'সাবধান জয়ন্তবাবু! রিভলভারটা বার করে গলির ভেতরে ঢুকুন। অবলা সশস্ত্র!'

মানিক বললে, 'আমিও রিভলভার এনেছি। আপনারা?'

—'আমরা নিরস্ত্র।'

—'তাহলে আপনারা এইখানেই অপেক্ষা করুন।'

—'বলেন কী! শত্রুর রিভলভারের ভয়ে পশ্চাৎপদ হবার মতন বুদ্ধিমান আমরা নই! চলুন—আর দেরি নয়!'

সকলে অতি সতর্কভাবে আশেপাশে আনাচে-কানাচে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগল। সেই সাপের মতন পাকখাওয়া গলিটা প্রায় দেড়-শো ফুট লম্বা। দু-তিনজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, একজন ঢ্যাঙা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গলির ভিতর দিকে চলে গিয়েছে।

কিন্তু সারা গলি খুঁজেও অবলার কোনও পাত্তাই মিলল না।

মানিক সন্দেহ প্রকাশ করলে, 'এ গলির ভেতরেও হয়তো অবলার কোনও আড্ডা আছে।'

কুমার বললে, 'অসম্ভব নয়। কিংবা সে কোনও অচেনা বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে আছে!'

কুমারের কথা শেষ হতে-না-হতেই একখানা বাড়ির মধ্যে উঠল মেয়ে-পুরুষ নানা কণ্ঠে বিষম গণ্ডগোল ঃ—'ওমা কী হবে গো!' 'পুলিশ, পুলিশ!'—'ডাকাত, গুণ্ডা!'

জয়ন্ত বললে, 'গোলমালটা আসছে ওই বাড়ির ভেতর থেকে! নিশ্চয় ওখানে অবলার আবির্ভাব হয়েছে!'

সকলে দৌড়ে একখানা তেতলা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

উঠানের পাশে একতলার দালানে তিন-চারজন মেয়ে ও দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ভীত, উত্তেজিত স্বরে ক্রমাগত চিৎকার করছে!

বিমল বললে, 'ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?'

একজন উত্তর দিলে, 'গুণ্ডা মশাই, ডাকাত। দু-হাতে তার দুটো পিস্তল!'

—'কোথায় সে?'

'তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপরে উঠেছে।'

'তেতলার সিঁড়ির সার দেখা যাচ্ছিল। সর্বাগ্রে বিমল, তার পিছনে আর সবাই সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে তেতলার ছাদে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

জয়ন্ত গলির দিকে ছাদের শেষে ছুটে গিয়ে মুখ বাড়ালে। এবং সেই মুহূর্তেই দেখলে, ছাদ থেকে বৃষ্টির জল বেরুবার যে লোহার পাইপটা নিচে পর্যন্ত চলে গিয়েছে, তার শেষ-প্রান্ত ত্যাগ করে অবলা আবার নেমে পড়ল গলির মধ্যেই!

গলি ভরে গিয়েছে তখন কৌতূহলী জনতায়। জন-কয় লোক অবলার দিকে এগিয়ে আসতেই সে ফস করে বার করলে রিভলভার! একে তার প্রকাণ্ড মূর্তি দারুণ ক্রোধে ফুলে আরও বড়ো হয়ে উঠেছে, তার উপরে আবার মারাত্মক রিভলভার আবির্ভাবে জনতার সাহস একেবারে উপে গেল—যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। দুই-তিন সেকেন্ডেই পথ সাফ! অবলা আবার বড়ো রাস্তার দিকে দৌড় দিলে।

ততক্ষণে বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক আবার গলিতে নেমে এসেছে।

গলির মুখেই ছিল জয়ন্তের মোটরখানা। অবলা লাফ মেরে তার ভিতরে গিয়ে বসল।

জয়ন্ত চিৎকার করলে, 'পাকড়ো, পাকড়ো!'

আর পাকড়ো! গাড়ি অদৃশ্য!

তারাও বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল, 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!'

ট্যাক্সি নেই! কিন্তু একখানা বড়ো ফোর্ড গাড়ির দেখা পাওয়া গেল।

বিমল রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দুদিকে দুই হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও!'

গাড়ি দাঁড়াল! ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন হোমরা-চোমরা বাবু বিরক্ত স্বরে বললে, 'কে আপনারা? আমার গাড়ি থামালেন কেন?'

তিনি কোনও জবাব পেলেন না। বিমল, কুমার ও মানিক বিনাবাক্যব্যয়ে গাড়ির দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে বসে আসল মালিককে একেবারে কোণ-ঠাসা করে ফেললে।

জয়ন্ত ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করে বললে, 'চালাও গাড়ি! খুব জোরসে!'

ড্রাইভার অসহায় ভাবে ফিরে তার মনিবের মুখের পানে তাকালে!

জয়ন্ত পকেট থেকে রিভলভার বার করে বললে, 'আমার হাতে কী, দেখছ?'

ড্রাইভার দেখেই চমকে উঠল। আর মনিবের হুকুমের দরকার হল না। সে প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

তখন সামনের দিকে অবলার স্বহস্তে চালিত জয়ন্তের গাড়িখানাকে আর দেখাও যাচ্ছিল না।

কুমার বললে, 'বিমল, আর অবলার আশা ছেড়ে দাও। সে খালি দুর্দান্ত সুকৌশলী সুচতুর নয়, ভাগ্যদেবীও তার প্রতি সদয়।'

মানিক বললে, 'এই তো আমরা স্ট্র্যান্ড রোডে এসে পড়লুম। এর পরেই গঙ্গার ধার। অবলা কোন দিকে গিয়েছে জানতে হলে আমাদের নামতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু মোড়ের মাথায় অত ভিড় কেন? একখানা লরির পাশে পড়ে রয়েছে একখানা ভাঙা মোটর! অ্যাক্সিডেন্ট নাকি? আরে, আরে, এ যে আমারই গাড়ি দেখছি! কিন্তু—'

এক এক লাফে সবাই আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

হ্যাঁ, এখানা জয়ন্তেরই গাড়ি বটে! তার এক অংশ লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললে, 'লরির ড্রাইভারের কোনও দোষ নেই মশায়! মোটরখানা যে চালাচ্ছিল নিশ্চয় সে পাগল! কিন্তু খুব তার পরমায়ুর জোর, আশ্চর্য-রকম বেঁচে গিয়েছে! তার মাথা ফেটে গিয়েছে বটে—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'কিন্তু সে গেল কোথায়?'

—'গঙ্গার দিকে তিরের মতো ছুটে পালাল।'

সেখান থেকেই গঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। তারা আর কিছু শোনবার জন্যে দাঁড়াল না—প্রচণ্ড বেগে দৌড় দিলে গঙ্গার দিকে।

এই তো গঙ্গার ধার! কিন্তু কোথায় অবলা? ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়, কিন্তু তাদের মধ্যে অবলা নেই।

তারা সকলকে প্রশ্ন করতে লাগল। একজন বললে, 'হ্যাঁ মশাই, একটা রক্তমাখা লোককে দেখেছি বটে! সে তাড়াতাড়ি ঘাটের সিঁড়ি বয়ে জলে গিয়ে পড়ল...ওই দেখুন, ওই সে সাঁতার কাটছে!'

সকলে আগ্রহ-ভরে দেখলে, তীর থেকে খানিক দূরে একটা লোক সাঁতার কেটে বেগে এগিয়ে চলেছে!

বিমল চিৎকার করে বললে, 'শিগগির একখানা নৌকা ভাড়া করো।'

দুর্ভাগ্যক্রমে ভাড়া যাবার মতো কোনও নৌকাই পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত মালকোঁচা মেরে বললে, 'তাহলে আমাদেরই সাঁতার কাটতে হবে!'

একজন লোক শুনতে পেয়ে বললে, 'এখন সাঁতার কাটবেন কী মশাই? দেখছেন না, জল থেকে সবাই তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছে?'

'কেন?'

—'এখনই বান ডাকবে। আজ খুব জোর বান আসবার কথা। আসবে কী—ওই বান এসেছে।'

চারিদিকে চিৎকার উঠল—'বান, বান!' 'সাবধান!' 'সবাই ওপরে উঠে এসো—সবাই ওপরে উঠে এসো!'

তারপরেই শোনা গেল চতুর্দিক পরিপূর্ণ করে সমুদ্রগর্জনের মতন সুগম্ভীর এক জল-কোলাহল! দেখা গেল, সাগর-তরঙ্গের মতোই উত্তাল এক সুদীর্ঘ তরঙ্গ-রেখা প্রায় সারা গঙ্গা জুড়ে পাকের পর পাক খেতে খেতে ছুটে আসছে—এবং তারই মধ্যে অসংখ্য ক্রুদ্ধ অজগরের মতো ঢেউ-এর দল শূন্যে ছোবল আর ছোবল মারছে! ফেনায়িত গঙ্গা যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল।

বানের কবলে পড়ে অবলা সকলের চোখের আড়ালে চলে গেল।

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক একদৃষ্টিতে বন্যা-তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বান যখন বহু দূরে চলে গেল, বিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কুমার, এত করেও অবলাকে ধরতে পারলুম না—শেষটা বান হল আমাদের প্রতিবাদী! আমার বিশ্বাস, অবলা মরবে না!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, আমারও সেই বিশ্বাস! এই হল আমার প্রথম পরাজয়!'

বিমল ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে বারংবার এত বিপদেও কখনও পড়িনি, আর শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে আমাকে বোকা বানিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাতেও কেউ পারেনি! অদ্ভুত লোক ওই অবলা!'

কুমার বললে, 'অবলা অদ্ভুত লোক হতে পারে, কিন্তু জিতেছি আমরাই। বিমল, ভুলে যেয়ো না, জেরিনার কণ্ঠহার আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি!'

বিমল বললে, 'হুঁ, ওইটুকুই যা সান্ত্বনা!'

ড্রাগনের
দুঃস্বপ্ন

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

উড়ন্ত ছায়ামূর্তি

শখের ডিটেকটিভ জয়ন্ত এবং বন্ধু মানিকলালের নাম-ডাক অল্প নয়! তাদের কৃতিত্ব-কাহিনি বাংলা মাসিকপত্রে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। শুনতে পাই, বাংলার ছেলেমেয়েরা তাদের কথা শুনতে ভালবাসে।

এবং অনেক রকম অসমসাহসিক কার্য করে বিমল আর কুমারও বাংলা দেশে অত্যন্ত নাম কিনেছে, একথাও অত্যুক্তি নয়।

এই জয়ন্ত ও মানিক এবং বিমল ও কুমার একবার একটি অদ্ভুত ঘটনাক্ষেত্রে এসে পড়ে একত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেই আশ্চর্য কাহিনি এখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমরা আজ সেই গল্পই আরম্ভ করলুম।

অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় দু-দুটো ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানান সংবাদপত্রে বিষম আন্দোলন হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যাকারীর খোঁজ পাওয়া যায়নি, কিন্তু মৃতদেহের পাশে পাওয়া গিয়েছে ড্রাগনের ছবি আঁকা ও ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা লেখা একখানা করে কাগজ।

এই সময়েই একটি বৃষ্টিস্নাত সকালে জয়ন্তের নিদ্রাভঙ্গ হল।

জয়ন্তের এক অভ্যাস ছিল। রোজ ভোরবেলায় উঠে অন্তত কিছুক্ষণ বাঁশি বাজাবার সময় না পেলে সারাটা দিন তার মন খুশি থাকত না।

সেদিনও সে বাঁশিতে যখন রামকেলি রাগিণী ধরেছে, তখনও সূর্য ওঠেনি।

হঠাৎ তার ঘরের দরজার উপরে বাইরে থেকে দুম দাম করে জোর ধাক্কা পড়তে লাগল। জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খিল খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল মানিকলাল।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'সূর্যোদয়ের আগে তোমার উদয়!'

মানিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত—জয়ন্ত! কলকাতায় ড্রাগনের তৃতীয় আবির্ভাব হয়েছে!'

জয়ন্ত কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বাঁশিটি মুখে তুলে আবার ফুঁ দিলে।

—'আবার একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড! হত্যাকারী এবারেও পলাতক!'

জয়ন্তের বাঁশি ধরলে রামকেলি রাগিণীর অন্তরা।

—'জয়ন্ত, এবারে আর খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়, আমি হচ্ছি প্রত্যক্ষদর্শী।'

জয়ন্ত বাঁশিটি পাশের টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, 'দেখছি, আজ আর বাঁশি বাজাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি কী বলতে চাও, ভাল করে গুছিয়ে বলো। আমি টুকরো টুকরো খবর শুনতে ভালবাসি না।'

মানিক চেয়ারের উপরে বসল। জয়ন্ত আগে চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডেকে দুজনের জন্যে চা,

পাশের বাড়ির ছাদের উপর থেকে কি-একটা জীবন্ত মূর্তি...

টোস্ট আর এগ-পোচ আনবার হুকুম দিলে, তারপর এসে মানিকের সামনে আসন গ্রহণ করলে।

মানিক বলতে লাগল 'কাল তোমার এখান থেকে যখন গেলুম তখন রাত বারোটা। কালকের রাতে কি রকম গুমোট গেছে, তোমার মনে আছে তো? গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছিল না। সেই গুমোটে বিছানায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। শেষরাতে হঠাৎ বৃষ্টি এলো, ঠান্ডা বাতাস বইলো।

'চোখের পাতায় সবে তন্দ্রার একটু আমেজ লেগেছে, এমন সময়ে বিকট এক চিৎকারে রাত্রির বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল!'

'চিৎকারটা এলো আমার বাড়ির ডান পাশ থেকে। ওদিকে পাড়ার চৌধুরিদের একখানা ভাড়া বাড়ি আছে, মাস ছয়েক আগে নীরদচন্দ্র বসু নামে এক ভদ্রলোক সেই বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলেন।'

'নিশুত রাতে ওরকম বিকট চিৎকার শুনলে বুকের ভিতরটা কেমনধারা হয়, সেটা তুমি আন্দাজ করতে পারবে। আমার সমস্ত তন্দ্রা ছুটে গেল, কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মতো বিছানায় শুয়ে রইলুম।'

'তারপরেই পাশের বাড়িতে বিষম একটা হই চই উঠল। নানা কণ্ঠে শুনলুম—'খুন!' 'ডাকাত!' 'পুলিস!'

'তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে পাশের বাড়িটা দেখা যায়।'

'তখন ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরছিল, আর দমকা হাওয়া গজরে-গজরে উঠছিল গোঁ-গোঁ করে। এবং অন্ধকারে আকাশ-চাতালে বসে কোনও এক অদৃশ্য বিরাট পুরুষ যেন থেকে থেকে বিদ্যুতের চকমকি ঠুকে ঠুকে মেঘে মেঘে আগুন জ্বালবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল!'

'জয়ন্ত! হঠাৎ বিপদে হতবুদ্ধি হলে মানুষের চোখ যে অনেক ভ্রম করে একথা তুমিও জানো, আমিও জানি। তার উপরে আমি যে তখন কেবল হতবুদ্ধি হয়ে ছিলুম তা নয়, অন্ধকারে আমি তখন বিশেষ কিছু দেখতেও পাচ্ছিলুম না। সুতরাং সেই অবস্থায়, পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের মায়াময় ক্ষণিক আলোকে আমি যা দেখলুম, আমার মন কিছুতেই তাকে সত্য বলে স্বীকার করতে চাইছে না!'

'বিদ্যুৎ দপ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তের মধ্যেই আমি দেখলুম বলে মনে হল, পাশের বাড়ির ছাদের উপর থেকে কী-একটা জীবন্ত মূর্তি যেন বেগে শূন্যের দিকে উঠে বা উড়ে যাচ্ছে! সে মূর্তি পুঞ্জীভূত অন্ধকারে গড়া, আর দেখতে যেন মানুষেরই মতো!'

'আমার এই চোখের ভ্রমের কথা উল্লেখ করতুম না, কিন্তু কলকাতায় যখন প্রথম বার ড্রাগনের আবির্ভাব ও হত্যাকাণ্ড হয়, তখনও কেউ কেউ রাত্রের আকাশপটে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন দেখেছিল বলে প্রকাশ পেয়েছে, তাই আমারও চোখের ধাঁধার কথা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। কিন্তু যা অসম্ভব তোমাকে তা বিশ্বাস করতে বলি না।'

'তারপর পাশের বাড়ির গোলমাল আরও বেড়ে উঠল, আমিও তাড়াতাড়ি নেমে পাশের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। প্রতিবেশী হিসাবে নীরদবাবুর সঙ্গে আমার অল্পসল্প পরিচয় হয়েছিল, দুদিন তাঁর বৈঠকখানাতে গিয়ে বসে দুপাত্র চা পানও করেছি।'

'নীরদবাবুর জীবনের কথা অল্প যা জানি, তা হচ্ছে এই

'নীরদবাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। তাঁর স্ত্রী দুটি ছেলে রেখে মারা গেছেন, দুই ছেলেই বিবাহিত। নীরদবাবু মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরি করতেন। গত মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁকে চিন দেশে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বহুকাল রেঙ্গুনে বাস করেন। কিন্তু তারপরে আবার হঠাৎ রেঙ্গুনের বাসা তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। তাঁর চাকরি ছাড়বার ও রেঙ্গুন ত্যাগ করবার কারণ আমি জানি না। ধনবানরা প্রায়ই খেয়ালি হয়, আর নীরদবাবুর যে অর্থের অভাব ছিল না, পাড়ার সকলেই তা টের পেয়েছিল। তিনি দুহাতে টাকা খরচ করতেন।'

'সকলের সঙ্গে দোতলায় উঠে নীরদবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলুম, খুব সংক্ষেপেই তোমাকে তা বলতে চাই।'

'ঘরের মেঝের উপরে নীরদবাবুর মৃতদেহ পড়ে ছিল। তাঁর চোখেমুখে দারুণ ভয়ের

স্থির চিহ্ন এবং কোনও বলিষ্ঠ হস্ত তাঁর গলাটি মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। দেহের উপরে আর কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই।'

'দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে ড্রাগনের চেহারা আঁকা একখানা কাগজ। কেতাবের ছবিতে ড্রাগনের যে রকম কাল্পনিক ছবি দেখি, তার সঙ্গে সে মূর্তিরও বিশেষ তফাত নেই। সুদীর্ঘ দেহ প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো, বীভৎস মুখখানা একেবারেই সৃষ্টিছাড়া, নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরুচ্ছে অনেকগুলো অগ্নিশিখা এবং পৃষ্ঠদেশে রয়েছে অঙ্কের এই চিহ্ন—১, ২, ৩, ৪! কিন্তু প্রথম থেকে তৃতীয় চিহ্ন পর্যন্ত লাল কালি দিয়ে কাটা!'

'ঘরের কোণে ছিল একটা লোহার সিন্দুক। তার উপরের দাগ দেখে বোঝা যায় যে, হত্যাকারী সিন্দুকটা খোলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে চেষ্টা সফল হয়নি।'

'হত্যাকারী ঘরে ঢুকেছিল জানালার লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক করে। তার শক্তি যে অসুরের মতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কী করে যে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে, আর কোন পথ দিয়েই বা পালিয়ে গিয়েছে, কেউ তা ধরতে পারছে না। নীরদবাবুর বাড়ির চারিদিকেই বেশ খানিকটা করে খোলা জমি,—কোনও মানুষ বা কোনও জীবই অন্য বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে নীরদবাবুদের ছাদের উপরে আসতে পারে না। বাড়ির ফটক ও সদর দরজা বন্ধ ছিল এবং কেন জানি না, নীরদবাবুর হুকুমে রাত্রেও সেখানে সজাগ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। দ্বারবান বলে, সে ঘুমোয়নি, —কারুকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। অথচ বাড়িতে শত্রু ঢুকেছে, নরহত্যা করেছে, আর পালিয়েও গিয়েছে!'

'জয়ন্ত, মোটামুটি সব কথাই তোমাকে আমি বললুম। কলকাতায় খুন খারাপি আর চুরি ডাকাতি নিত্যই হচ্ছে, সে হিসাবে এ ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়। সে সব ঘটনাতেও প্রথমে রহস্যের অভাব থাকে না। কিন্তু এবারকার ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নয়, —যেমন আশ্চর্য, তেমনই অলৌকিক! অপরাধী কোন পথে বাড়ির ভিতরে ঢুকল? কোন পথে সে আবার অদৃশ্য হল? বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে ছায়ামূর্তিটাকে শূন্যের দিকে উঠে যেতে দেখলুম, সেটা কি সত্যই আমার চোখের ভুল? তোমার কী মনে হয়?'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ঘরের ভিতরে খানিকটা পায়চারি করলে। তারপর ফিরে মানিকের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'খবরের কাগজের রিপোর্টে আমরা জেনেছি, মাস দেড়েকের মধ্যে কলকাতায় আরও দুটো খুন হয়েছে, আর সেই দুই জায়গাতেই ড্রাগনের ছবি আঁকা কাগজ একখানা করে পাওয়া গিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই তিনটে হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে একই মস্তিষ্ক বা একই ব্যক্তি বা একই দল।'

'প্রথম বারে মারা পড়েছেন অনাথনাথ সেন। দ্বিতীয় বারে হত হয়েছেন চন্দ্রনাথ দত্ত। আর এবারে বলি দেওয়া হয়েছে তোমাদের প্রতিবেশী নীরদচন্দ্র বসুকে। আমি যদি এই

মামলাটাকে হাতে নিই তা হলে প্রথমেই আমাকে দেখতে হবে, মৃত তিন ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের কোনও সম্পর্ক ছিল কি না?'

'তিনটে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কেবল ড্রাগনের ছবি নয়, আরও অনেক বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। যেমন প্রথমত, কারুকেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়নি। হত্যাকারী গলা মুচড়ে তিনজনকেই মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয়ত, তিন জায়গাতেই হত্যাকারী কোন পথে এসেছে আর কোন পথে পালিয়েছে তা জানা যায়নি। প্রত্যেক বারেই সে জানালার লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক করে ঘরে ঢুকে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তৃতীয়ত, অনাথবাবু যখন মারা পড়েন পাড়ার কোনও কোনও লোক তখনও নাকি দেখেছিল যে ছাতের উপর থেকে ছায়ামূর্তির মতো কী একটা শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল! দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে কোনও সাক্ষী পাওয়া যায়নি। কিন্তু এবারে তোমার মুখেও শুনছি, তুমিও নাকি একটা উড়ন্ত মূর্তিকে দেখেছ— আর সে মূর্তি নাকি দেখতে মানুষেরই মতো! প্রথম বারে ছায়ামূর্তির কথা আমরা উড়িয়েই দিয়েছিলুম, কিন্তু এবারে তোমার কথা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না! অবশ্য তোমার নিজের মত হচ্ছে, তোমার চোখের ভ্রম হয়েছে। সেটাও অসম্ভব নয়। এই বিংশ শতাব্দীতে উড়ন্ত ছায়ামূর্তির আবির্ভাব যেমন অসম্ভব তেমনি হাস্যকর। আজকের মানুষ রূপকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ।'

'কিন্তু মানিক, ড্রাগনের ছবি আঁকা কাগজে যে অদূর ভবিষ্যতের আর একটা হত্যাকাণ্ডের ইঙ্গিত আছে, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ কি?'

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কী রকম?'

জয়ন্ত বললে, 'সংবাদপত্রের রিপোর্টে পড়েছি, প্রথম খুনের সময়ে যে ড্রাগন মার্কা কাগজ পাওয়া যায় তারও তলায় ইংরেজি অঙ্কে লেখা ছিল —১, ২, ৩, ৪। সেবারে নাকি কাটা ছিল কেবল একের অঙ্ক। দ্বিতীয় খুনের সময়ও কাগজে ছিল ওই চারটি সংখ্যা, আর কাটা ছিল তার দুই সংখ্যা পর্যন্ত। এবারে অর্থাৎ তৃতীয় বারে আবার ড্রাগন মার্কা চার সংখ্যা লেখা কাগজ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এবারে কেটে দেওয়া হয়েছে তিনের সংখ্যা পর্যন্ত।...এ-থেকে আমার কী মনে হচ্ছে জানো? যে কারণেই হোক, কোনও লোক বা কোনও দল প্রতিজ্ঞা করেছে, নির্দিষ্ট চার ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কাগজের উপরে ঐ চারটি সংখ্যা সেই চিহ্নিত চারজনকেই বোঝাচ্ছে। তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে তাই একে একে তিন সংখ্যা পর্যন্ত কেটে রেখেছে। এখনও চারের অঙ্ক কাটা হয়নি, তার মানে এখনও চতুর্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়নি!'

মানিক শিউরে উঠে বললে, 'কী সর্বনাশ! তাহলে এই হতভাগ্য চতুর্থ ব্যক্তি কে?'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা যদি আমরা তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করতে না পারি, তাহলে তাকেও অকালে হঠাৎ ইহলোক ছাড়তে হবে।'

—'কিন্তু প্রত্যেক কাগজে ড্রাগনের এই ছবি থাকারও কোনও অর্থ হয় না তো!'

—'অর্থ হয় মানিক, খুব অর্থ হয়। সম্ভবত এই : এই ড্রাগনের ছবি হচ্ছে কোনও

গুপ্তদলের সাংকেতিক চিহ্ন। চারজন লোক যে কোনও কারণেই হোক ওই গুপ্তদলের বিরাগভাজন হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো হচ্ছে তাদেরই মুখ বন্ধ করার চেষ্টায়।'

এই সময়ে সিঁড়ির উপরে ধুপ ধাপ করে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের ইন্সপেক্টর বন্ধু সুন্দরবাবু আসছেন।' বলেই টেবিলের উপর থেকে সে আবার বাঁশিটা তুলে নিলে। সে জানত সুন্দরবাবু বাঁশি বাজালেই চটে লাল হন।

পরমুহূর্তেই ঘরের দরজার সামনে আত্মপ্রকাশ করল সুন্দরবাবুর চকচকে টাক ও দোদুল্যমান ভুঁড়ি।

জয়ন্ত সেদিকে দৃকপাত না করেই আবার বাঁশি বাজানো শুরু করে দিলে।

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন,'হুম! মরছি নিজের জ্বালায়, আর তুমি ধরলে বাঁশি! ছোঃ!'

মানিক বললে, 'রাগ করছেন কেন সুন্দরবাবু, আপনার জ্বালা কমাবার জন্যেই তো জয়ন্ত বাঁশি বাজাচ্ছে।'

সুন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা করো না মানিক, তোমার ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। আর এই কি ঠাট্টার সময়?'

জয়ন্ত বাঁশি থামিয়ে বললে, 'কেন সুন্দরবাবু, হয়েছে কী?'

সুন্দরবাবু দুই পা ফাঁক করে নিজের ভুঁড়ির জন্যে জায়গা করে নিয়ে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হতাশভাবে বললেন, 'হবে আর কী, আমারই পোড়া কপাল! যত রাজ্যির ওঁচা মামলা পড়বে কিনা আমারই ঘাড়ে! খুনে বেটারা নীরদ বসুকে যদি অন্য থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলত, তাহলে আমাকে তো আর এই ভুতুড়ে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হত না!'

—'নীরদচন্দ্র বসুর হত্যাকাণ্ডের মামলার ভার কি আপনার ওপরই পড়েছে?'

—'তা নয়ত কী? হুম! ছাই ফেলতে আমিই হচ্ছি ভাঙা কুলো কিনা! কিন্তু বাবা, এটা কি খুনের মামলা না ভৌতিক কাণ্ড!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন সুন্দরবাবু?'

—'খালি ভৌতিক কাণ্ড নয় জয়ন্ত, ভয়ানক কাণ্ড! শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়, পেটের পিলে চমকে যায়! বাপ, এ মামলায় আমি নেই, আজই ছুটির জন্যে দরখাস্ত করব! হুম!'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পোর্সিলেনের পুতুল

সুন্দরবাবুকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জয়ন্ত বললে, 'আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন, এটা মোটেই ভুতুড়ে ব্যাপার নয়। ভূতেরা অশরীরী, তারা লোহার গরাদ দুমড়ে ঘরে ঢোকে না। তারা লোহার সিন্দুক খোলার চেষ্টা করেও বিফল হয় না। ভূতেরা যত দুষ্টই হোক, তারা

চোর নয়। চোরাই মাল নিয়ে তারা কী করবে বলুন, প্রেতলোকে চোরাই মাল তো কেউ কেনে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আ-হা-হা, কে বলছে ভূতেরা চোর? প্রথম আর দ্বিতীয় খুনের সময়েও হত্যাকারী ঘরের আলমারি আর সিন্দুক খুলে ফেলেছিল, কিন্তু কিছুই চুরি করেনি। নীরদ বসুর সিন্দুকও হয়ত সে শখ করেই খুলতে গিয়েছিল, কিন্তু খুলতে পারেনি।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি কি ঠিক জানেন যে, প্রথম আর দ্বিতীয় খুনের পরে হত্যাকারী আলমারি সিন্দুক ঘেঁটেছিল, অথচ কিছুই চুরি করেনি?'

—'পুলিশের রিপোর্ট তো তাই বলে। আলমারি সিন্দুকে গয়না ছিল, টাকা ছিল, কিন্তু হত্যাকারীর কিছুই পছন্দ হয়নি! হয়ত প্রেতলোকে নরলোকের মুদ্রা আর গয়না অচল!'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গয়না বা টাকা নয়, হত্যাকারী খুঁজেছিল অন্য কোনও জিনিস। নইলে এসব খুনের কোনওই অর্থ হয় না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তাই নাকি? তাহলে শোনো জয়ন্ত। নীরদ বসুর যে লোহার সিন্দুকটা হত্যাকারী তাড়াতাড়িতে খুলতে পারেনি, আমি সেটা খুলে দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয়, সিন্দুকের ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না, ছিল কেবল এই বাজে পুতুলটা!' বলেই তিনি পকেট থেকে ফস করে একটা পুতুল বার করলেন।

পুতুলটা পোর্সিলেনের—লম্বায় ছয় ইঞ্চির বেশি নয়। রামছাগলের উপরে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে এক বুড়ো চিনেম্যান।

মূর্তিটাকে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি এটা খুব পুরনো পোর্সিলেনে গড়া। এর কারিকুরিও চমৎকার, একে সেকেলে চিনে শিল্পের অতুলনীয় নমুনাও বলা যেতে পারে। শুনেছি চিন দেশের পুরনো পোর্সিলেনের কোনও কোনও নমুনা সাপের মাথার মণির মতোই দুর্লভ আর অমূল্য। সেইজন্যেই কি নীরদবাবু এই মূর্তিটাকে সযত্নে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন? আর হত্যাকারী এসেছিল কি এরই লোভে?'

মানিক বলল, 'হতে পারে। কিন্তু নীরদবাবুর হত্যাকারী এর আগেই আরও দুজন লোককে খুন করেছে, তাঁদের ঘর খানাতল্লাস করেছে, কিন্তু টাকাকড়ি চুরি করেনি। হত্যাকারী সেখানে কী খুঁজতে গিয়েছিল?'

জয়ন্ত বললে, 'তোমার প্রশ্নটা খুব ভালো। কিন্তু এর উত্তর আপাতত আমার কাছে নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর একটা মজার কথা বলি শোনো। নীরদবাবুর খুনের তদন্ত করছি, হঠাৎ সেখানে দুটি ছোকরা এসে হাজির। সব ব্যাপারেই তাদের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে ভারি সন্দেহ হল আমার। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'কে তোমরা? কী চাও?' তারা হেসে বললে,— 'আমরা চাই অ্যাডভেঞ্চার!' আমি রুখে বললুম—'পুলিসের রুলের গুঁতো তোমাদের কেমন লাগে?' তারা আরও জোরে হেসে উঠে বললে—'মন্দ কী? রুলের গুঁতো

...খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মানিক হঠাৎ...

খেয়ে আমরাও যদি করি গুঁতোগুঁতি আর চড়-চাপড় ঘুষি-বৃষ্টি, সেও তো একটা ছোটোখাটো অ্যাডভেঞ্চার বলে গণ্য হতে পারে!' তারপরেই সিন্দুক থেকে বেরুল এই পুতুলটা। অমনি তাদের একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—'লাউ-ৎজু! লাউ-ৎজু!' আমি রেগে তিনটে হয়ে বললুম, 'পাগলামির জায়গা পাওনি আর? এখুনি বেরোও এখান থেকে!' আমার অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখলে বড় বড় চোর-ডাকাতও ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে, কিন্তু তারা একটুও ভয় পেলে না। উল্টে হেসে গড়িয়ে পড়ে ঘর থেকে হাত ধরাধরি করে হেলে-দুলে বেরিয়ে গেল!'

জয়ন্ত বললে, 'কে তারা?'

—'কে জানে! তাদের নাম তো শুনলুম বিমল আর কুমার! বাজে নিষ্কর্মা লোক আর কী!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'বিমল আর কুমার? যাঁদের অদ্ভুত সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি লোকের মুখে মুখে ফেরে, এঁরা কি সেই বিমলবাবু আর কুমারবাবু?'

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'কে জানে। আমি জানতে চাই না। বুঝলে হে, মানিকজোড়কে দেখে আমার মনে পড়ল তোমাদেরই কথা! হুম, তোমাদেরই মতো বয়সে তারা ছোকরা, তোমাদেরই মতো তাদের কথার কিছু মানে হয় না, আর তোমাদেরই মতো তারা বদ্ধ পাগল। লাউ-ৎজু। লাউ-ৎজু কী রে বাবা ...আমি এখন চললুম!'

সুন্দরবাবু চলে গেলে পর জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'বিমলবাবু আর কুমারবাবুর নাম আমিও শুনেছি। তাঁদের বুদ্ধি আর শক্তি দুই-ই নাকি আশ্চর্য! যেখানে অসাধারণ ঘটনা ঘটে, সেখানেই তাঁদের আবির্ভাব হয়। নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডে তাঁদের টনক যখন নড়েছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা এ ব্যাপারটাকেও অসাধারণ বলে মনে করেন, আর আমাদের চেয়ে তাঁরা বেশি কিছু জানতে পেরেছেন।'

মানিক বললে, 'কিন্তু লাউ-ৎজু কোন দেশি কথা? তার অর্থই বা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না ...আচ্ছা মানিক, এক কাজ করো দেখি! এনসাইক্লোপিডিয়াখানা বার করে আনো। দেখ, তার মধ্যে লাউ-ৎজু-র খোঁজ মেলে কি না!'

তখনই এনসাইক্লোপিডিয়া এলো। তার পাতা উলটে মানিক সানন্দে বলে উঠল, 'পেয়েছি জয়ন্ত, পেয়েছি! এই যে! লাউ-ৎজু বা লাও-জি, চিন দেশের দার্শনিক! 'তাও'ধর্মমতের প্রবর্তক। জন্মকাল—খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু যে পোর্সিলেনের পুতুলটা দেখালেন, তবে কি সেটা ওই লাউ-ৎজুরই প্রতিমূর্তি?'

মানিক বললে, 'কিন্তু আড়াই হাজার বছরেরও আগে যিনি চিন দেশে বিদ্যমান ছিলেন, সেই দার্শনিক লাউ-ৎজুর সঙ্গে বিশ শতাব্দীর বাঙালি কেরানি নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মানিক বুঝলে, জয়ন্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে।

পরদিন চা পানের সঙ্গে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মানিক হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'এ আবার কী ব্যাপার।'

জয়ন্ত চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললে, 'আবার নতুন খুন নাকি?'

—'না। কাগজে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।'

—'পড়ে শোনাও।'

—'শোনো।—অনাথনাথ সেন, চন্দ্রনাথ দত্ত ও নীরদচন্দ্র বসুকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। ইহারা তিনজনেই রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ইহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন আর এক ভদ্রলোক, তিনি এখনও জীবিত আছেন। লাউ-ৎজুর ভক্তরা তাঁহাকে খুঁজিতেছে, শীঘ্রই তাঁহাকেও হত্যা করিবে। যদি তিনি আত্মরক্ষা করিতে চান তাহা হইলে অবিলম্বে ৪০ নং শ্যামাকান্ত বসু স্ট্রিটে বিমলবাবু ও কুমারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। বিলম্ব করিলে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।'

জয়ন্ত অভিভূত স্বরে বললে, 'মানিক, আমরা হচ্ছি আহাম্মক—পয়লা নম্বরের আহাম্মক। ওই বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল আমাদেরই, আর আজকে আমি বিজ্ঞাপন দিতুমও! কারণ চতুর্থ যে ব্যক্তির খুন হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁকে তাড়াতাড়ি সাবধান আর আবিষ্কার করবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। কিন্তু বিমলবাবু আর কুমারবাবু দেখছি আমাদের চেয়েও চটপটে! কেবল তাই নয়, তাঁরা আমাদেরও আগে আসল রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছেন! মানিক, আমরা হেরে গেছি। এ মামলা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, নইলে মান বাঁচানো দায় হয়ে উঠবে।'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত, সব কাজেই হার জিত আছে, তার জন্যে নিজেকে এতটা ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভাই, বিজ্ঞাপনে লাউ-ৎজুর ভক্তদের হত্যাকারী বলা হয়েছে। তারা আবার কারা?'

—'নিশ্চয়ই তারা চিনেম্যান।'

—'কিন্তু লাউ-ৎজুর চিনে-ভক্তদের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক কী?'

—'মানিক, তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ গাধা! তোমার মুখেই তো আমি শুনেছি, মৃত নীরদবাবু গেল মহাযুদ্ধের সময়ে মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসের কেরানিরূপে চিন দেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী করেছিলেন তা কে জানে? আমার বিশ্বাস, আরও যে দুজন লোক খুন হয়েছেন তাঁরাও নীরদবাবুর সঙ্গে চিন দেশে গিয়েছিলেন।'

মানিক বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম, প্রত্যেক হত্যার পর ড্রাগনের ছবি আঁকা কাগজ কেন পাওয়া যায়। খ্রিস্টানদের যেমন ক্রুশ, মুসলমানদের যেমন অর্ধচন্দ্র, হিন্দুদের যেমন পদ্ম, তেমনি চিন দেশেরও নিদর্শন হচ্ছে ড্রাগন!'

জয়ন্ত বললে, 'ড্রাগনের অন্য অর্থ থাকাও অসম্ভব নয়।'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ি জাগিয়ে, সিঁড়ি কাঁপিয়ে হস্তদন্তের মতো সুন্দরবাবু হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েই বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে!'

—'কী হয়েছে সুন্দরবাবু, কী হয়েছে?'

সুন্দরবাবু ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আগে এক কাপ চা! হুম, আমার গলা মরুভূমির মতো শুকিয়ে গেছে, এক কাপে ভিজবে না হে, —শিগগির দু কাপ চা চাই।'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে চা আনবার হুকুম দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সেই পোর্সিলেনের পুতুলটা চুরি গেছে!'

জয়ন্ত ও মানিক এক সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'থানা থেকে চুরি!'

—'হ্যাঁ জয়ন্ত, হ্যাঁ মানিক, থানা থেকে চুরি! হুম, শুধু কি চুরি? ভূতুড়ে চুরি!'

—'ভাল করে সব কথা বলুন সুন্দরবাবু!'

—'সেই পুতুলটা আমি আমার শোবার ঘরের টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলুম, রাত্রে ভাল করে পরীক্ষা করব বলে। তোমরা জানো, থানার উপরে তেতলায় আমি থাকি।

একতলায় অফিসঘরে বসে রাত দশটা পর্যন্ত আমি একটা বড়ো চুরির মামলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। তারপর উপরে উঠে খেয়ে দেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি রাত এগারোটার সময়ে। তখন বেশ জোরে একপশলা বৃষ্টি এসেছে। ঘরে ঢুকেই দেখি, টেবিলের উপরে সেই পোর্সিলেনের পুতুলটা আর নেই! তারপরেই খট খট করে একটা লাঠির শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি, দরজার বাইরে বারান্দার উপর থেকে জমাট ধোঁয়ার মতো কী একটা ভয়ানক ব্যাপার হুস করে আকাশের দিকে উঠে গেল! তাই না দেখেই ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমি ঘর থেকে আবার পালিয়ে এলুম।'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'ওই উড়ন্ত ছায়া আর ধোঁয়ার নিকুচি করেছে! আমি জানতে চাই পুতুলটার কী হল?'

—'কী আবার হবে, আর পাওয়া গেল না। থানার চারিদিকে ইয়া জোয়ান জোয়ান পাহারাওয়ালা, অফিসে আমি, স্বয়ং থানার কর্তা স্বশরীরে বর্তমান, দোতলায় থাকে লালমুখো সার্জেন্ট আর সাব ইনস্পেকটাররা, তেতলায় আমার পরিবারবর্গ, —তাদের এড়িয়ে চোর কিছুতেই আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারে না। অথচ সে এসেছে আর চুরি করে পালিয়েছে। এটা ভোজবাজি না ভৌতিক কাণ্ড!'

—'চোর কি কোনও চিহ্নই রেখে যায়নি?'

—'হ্যাঁ, দুটো চিহ্ন! একটা হচ্ছে ড্রাগনের ছবি আঁকা কাগজ, কিন্তু তাতে কোনও সংখ্যা লেখা নেই। আর একটা চিহ্ন রেখে গেছে বটে, কিন্তু এখন আর তা বর্তমান নেই।'

—'তার মানে?'

—'বলেছি, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরের মেঝেতে কতকগুলো জলমাখা পায়ের ছাপ দেখেছিলুম, কিন্তু দেখতে দেখতেই সেগুলো মিলিয়ে গেল!'

—'পায়ের দাগের মাপ নিয়েছিলেন?'

—'না ভায়া, গোলমালে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করতে ভুলিনি। ঘরের ভিতরে কেবল একখানা পায়ের ছাপ ছিল, সব ছাপ ডান পায়ের! হুম, চোর বেটা বোধহয় এক পায়ে ভর দিয়ে ঘরময় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছিল!'

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে একটু খুশি হয়ে বললে, 'এতক্ষণ পরে এই চোর বা হত্যাকারীর একটা কিছু হদিস পাওয়া গেল। সুন্দরবাবু, আপনার ঘরে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, তার একখানা পা নেই!'

—'হেঃ, কী প্রমাণে তুমি একথা বলছ?'

—'আপনিই না বললেন যে ঘরের মধ্যে ঢুকেই লাঠির খটখট শব্দ শুনেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে।'

—'চোরের বাঁ পায়ে কাঠের খোঁটা বাঁধা ছিল—খোঁড়াদের পায়ে যেমন থাকে।'

—'অসম্ভব! তুমি কী বলতে চাও, চোর যদি এই কাঠের খোঁটা বাজিয়ে খটখটিয়ে তেতলায় উঠত, তাহলে থানার কেউ তা শুনতে পেত না? থানাসুদ্ধ সবাই আমরা কি চোখ

বুজে আর কানে তুলো গুঁজে বসেছিলাম—কিছু দেখতেও পাইনি, শুনতেও পাইনি? হুম, কী যে বলো তুমি!'

—'তাহলে আপনার মত কী?'

—'আমার ঘরে ঢুকেছিল এক বেটা এক-ঠেঙো ভূত! আমাকে দেখেই ভয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল আর কী! পুলিশকে কে না ভয় করে?'

জয়ন্ত গেঞ্জির উপরে জামা পরতে পরতে বললে, 'চলো মানিক, আমরা এখন বিমলবাবু আর কুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, 'সেই বদ্ধ পাগল দুটোর সঙ্গে? কেন হে?'

—'এই রহস্যের অনেক খবর তাঁরা জানেন। আপনিও যদি আসতে চান, আসুন।'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ল্যাসো

তখন বিমল ও কুমারের চা পান শেষ হয়ে গেছে। বাংলা দেশের প্রায় সব ছেলেমেয়েই বিমল ও কুমারকে চেনে, কাজেই তাদের পরিচয় আর নতুন করে দিলুম না।

রামহরি টেবিলের উপর থেকে প্রাতরাশের বাসনগুলো সরাচ্ছিল এবং তাদের আদরের কুকুর বাঘা টেবিলের তলায় বসে দুধের বাটি চেটেপুটে সাফ করে ফেলছিল। বাঘা চায়ের ভক্ত নয় বলে রোজ সকালে তার বরাদ্দ ছিল কুকুর-বিস্কুট ও এক বাটি করে গরম দুধ।

কুমার খবরের কাগজখানা নিয়ে পাতা উলটে বললে, 'আমাদের বিজ্ঞাপনটা বেশ ভাল জায়গায় বেরিয়েছে, পাতা ওলটালেই চোখে পড়ে।'

বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিমল বললে, 'যার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া, হয়ত এতক্ষণে তার চোখে পড়েছেও। হয়ত এতক্ষণে সে ভয়ে পাগলের মতো আমাদের ঠিকানায় ছুটে আসছে!'

কুমার বললে, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, এ লোকটি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আসবে?'

—'নিশ্চয়ই আসবে। ওই তিনটে হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য সে জানে। এইবারে যে তার পালা, এটাও সে বুঝেছে। সে এখন কী করবে বুঝতে না পেরে ভয়ে মরো-মরো হয়ে আছে। আমাদের বিজ্ঞাপন পড়লে সে এখানে না এসে কিছুতেই থাকতে পারবে না।'

রামহরি মন দিয়ে বিমলের কথাগুলো শুনছিল। সে বললে, 'খোকাবাবু, কোথায় কারা খুন হয়েছে তা নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো দেখি? কাশীধামে কাক মরেছে, কামরূপেতে হাহাকার! আবার কোনও নতুন হুলুস্থুল কাণ্ড নিয়ে হই চই করবার ইচ্ছে আছে বুঝি!'

বিমল হেসে বললে, 'তুমি তো জানোই রামহরি, দুদিন সুখে থাকলেই আমাদের ভূতে

কিলোয়! মাতাল যেমন মদ চায়, আমরাও চাই তেমনই হানাহানি আর মাতামাতি!'

রামহরি বিরক্ত মুখে অস্ফুট স্বরে বকবক করতে করতে বেরিয়ে গেল।

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, এব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলত। পুলিশের সুন্দরবাবুর হাতে যখন নীরদ বসুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার পড়েছে, তখন তাঁর বন্ধু বিখ্যাত ডিটেকটিভ জয়ন্তের সাহায্য তিনি নেবেনই। সকলেই জানে, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে সুন্দরবাবু কোনও কাজই করেন না। আমার বিশ্বাস, জয়ন্তবাবুর পরামর্শে পুলিশ এ মামলাটার কিনারা করতে পারবে।'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবুকে কখনও চোখে দেখিনি, যদিও গোয়েন্দাগিরিতে তাঁর বাহাদুরির অনেক কথাই জানি। ড্রাগনমার্কা কাগজে আমরা যে সূত্র পেয়েছি, সেই সূত্র ধরে জয়ন্তবাবুও হয়ত অনেক কিছুই অনুমান করতে পেরেছেন। নীরদবাবুর আত্মীয়দের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমাদের মতো তাঁরাও হয়ত আরও কিছু খবর পেয়েছেন। কিন্তু কুমার, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাও সবজান্তা নন। জয়ন্তবাবু গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের ওপর টেক্কা মারতে পারেন, কিন্তু 'তাও' ধর্মের গুপ্তকথা আর লাউ-ৎজুর নাম হয়ত তিনি জানেন না। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে ওসব বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা করেছি বলেই লাউ-ৎজুর মূর্তি দেখেই চিনেছি আর বুঝেছি যে নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অদ্ভুত কোনও ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। গোয়েন্দারা খুনির খোঁজ করুন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না, আমরা ছুটতে চাই কেবল ওই অদ্ভুত রহস্যের পিছনে। ...কুমার, ওই শোনো, কে সদর দরজায় কড়া নাড়ছে! যার অপেক্ষায় বসে আছি, এইবারে বোধহয় তার দেখা পাবো!'

রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, 'তিনটি বাবু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

—'তিনটি বাবু?'

—'হ্যাঁ। নাম বললে, জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু ও সুন্দরবাবু।'

—'তাঁদের নিয়ে এসো। ...কুমার, এঁরা আমাদের কাছে কেন?'

—'হয়ত আমাদের বিজ্ঞাপন ওঁদেরও চোখে পড়েছে। ওঁদের সন্দেহ হয়েছে, আমরা কিছু খবর দিতে পারব।'

সর্বপ্রথমে এসে দাঁড়াল জয়ন্তের প্রায় সাত ফুট লম্বা বিশাল দেহ। তারপর দেখা গেল মানিক এবং বিপুল ভুঁড়ি ও টাকের অধিকারী সুন্দরবাবুকে।

বিমল হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে, 'আসতে আজ্ঞা হোক। নাম শুনেই বুঝেছি মশাইরা কে! বসতে আজ্ঞা হোক।'

জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করে বললে, 'আপনাদের পরিচয়ও আমাদের অজানা নেই, আপনাদের সঙ্গে আলাপ থাকাও সৌভাগ্য।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু সুন্দরবাবু হয়ত ওকথা স্বীকার করবেন না। কাল সকালেই হতভাগ্য নীরদবাবুর বাড়ি থেকে উনি আমাদের পাগল বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

সুন্দরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'ও কথা যেতে দিন, আমি ভুল করেছি। আপনাদের চিনতুম না, আজ পথে আসতে আসতে মানিকের মুখে আপনাদের ইতিহাস কিছু কিছু শুনেছি। হুম, আপনাদের উপর আমার দস্তুরমত শ্রদ্ধা হয়েছে। বাপরে, আপনারা নাকি সশরীরে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলেন?'

জয়ন্ত বললে, 'সে সব কথা পরে হবে সুন্দরবাবু! এখন যে জন্যে এখানে এসেছি সেই কথাই হোক!'

ইতিমধ্যে বাঘা টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে মাটির উপরে হাত পা ছড়িয়ে একটা ডন দিতে উদ্যত হল এবং সুন্দরবাবু তাকে দেখেই আঁতকে উঠে একলাফে জয়ন্তের পিছনে গিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবা! বাঘের মতো মস্ত নেড়ি কুকুর!'

বিমল বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু! আমাদের বাঘা সাধু মানুষকে কিছু বলে না, বড়জোর ও আপনার গা শুঁকে পরীক্ষা করবে!'

সুন্দরবাবু আরও পিছনে হটে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'না, না! ওকে আমি কিছুতেই আমার গা শুঁকতে দেব না। হুম, চতুষ্পদ জীবেদের আমি ভয় করি।'

মানিক বললে, 'তাহলে আপনি ভেড়াকেও ভয় করেন সুন্দরবাবু?'

—'দেখ মানিক, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। হ্যাঁ, ভেড়াও আমার চোখের বালি। জানো, একটা ভেড়া একবার আমাকে ঢুঁ মেরেছিল। ...বিমলবাবু, আমাকে যদি ঘর থেকে তাড়াতে না চান, তাহলে ওই নেড়ি কুকুরটাকে এখান থেকে পত্রপাঠ বিদায় করুন। পাজি কুকুর! ছুঁচো কুকুর! দেখুন, এত লোক থাকতে ওর দৃষ্টি আমার দিকেই! হুম, ওর মতলব ভালো নয়!'

কুমার বললে, 'বাঘা, তুই বাইরে যা! সুন্দরবাবু আজ তোর সঙ্গে ভাব করবেন না।'

বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাইরে চলে গেল এবং ঠিক সেই সঙ্গেই রামহরি আবার এসে খবর দিলে, 'একটি বাবু দেখা করতে চান।'

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, 'তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও। —কুমার, যাঁর অপেক্ষায় আছি, ইনিই বুঝি তিনি!'

জয়ন্ত আর মানিকও আগন্তুকের স্বরূপ আন্দাজ করতে পারলে, তারাও উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

দরজা দিয়ে যিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, তিনি হচ্ছেন আধা-প্রাচীন মাঝারি আকারের লোক। রঙ শ্যামল, মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশান, বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে কেমন একটা ভয়বিহ্বল ভাব।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সকলের মুখের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি বিমলবাবু আর কুমারবাবুকে খুঁজছি!'

বিমল এগিয়ে বললে, 'আমার নাম বিমল, আর এঁর নাম কুমার। কিন্তু মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?'

—'শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।'

—'বোধহয় আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেই আপনি এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মশাই, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনার সঙ্গে আড়ালে কিছু কথাবার্তা কইতে চাই।'

—'নরেনবাবু, আড়ালে যাবার দরকার নেই। আমার বিশ্বাস, এঁরাও আপনাকে সাহায্য করবেন। ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ জয়ন্তবাবু, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত মানিকবাবু, এঁরই সহকারী। আর ওঁর নাম সুন্দরবাবু—পুলিস ইনস্পেক্টর, নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছেন।'

নরেনবাবু শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে করুণ স্বরে বললেন, 'অনাথকে মেরেছে, চন্দ্রকে মেরেছে, নীরদকে মেরেছে, এইবারে আমার পালা। তারা যখন তিনজনের নাগাল ধরতে পেরেছে, তখন আমারও আর রক্ষা নেই! হা ভগবান, কেন মরতে সান-কুয়ান মন্দিরে গিয়েছিলুম!'

—'সান-কুয়ান মন্দির! নিশ্চয়ই চিন দেশের মন্দির?'

—'হ্যাঁ বিমলবাবু! আপনি কি সেখানে গিয়েছিলেন?'

—'না। তবে আমি জানি যে, হিন্দুদের ত্রিমূর্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর চিন দেশে গিয়ে সান-কুয়ান নাম পেয়েছেন, আর তাও-ধর্মাবলম্বীরা চিনে পোশাক পরিয়ে সেই ত্রিমূর্তির পূজা করে।'

—'আপনি আর কী জানেন?'

—'খুব সম্ভব, তাওদের আদিগুরু লাউ-ৎজুর একটি প্রতিমূর্তি আপনার কাছে আছে, আর সেইজন্যেই আপনার এত ভয়!'

—'ঠিক বলেছেন! সেই মূর্তিই হয়েছে এখন আমার অভিশাপের মতো! তাকেও আমি সঙ্গে করে এনেছি, এই দেখুন।' বলেই নরেনবাবু ভিতরকার জামার পকেট থেকে একটি সবুজ রঙের পুতুল বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি যে মূর্তিটাকে পেয়েছিলুম এটাও যে ঠিক তারই মতো দেখতে! সেই রামছাগল, সেই বুড়ো চিনেম্যান! কিন্তু এ মূর্তিটা তো পোর্সিলেনের নয়!'

নরেনবাবু বললেন, 'না, এটি হচ্ছে জেড পাথরে গড়া। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, এই বিচিত্র মূর্তির মাথা থেকে বুক পর্যন্ত গরম, কিন্তু বুকের তলা থেকে পা পর্যন্ত ঠান্ডা!'

সকলে একে একে ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করে বুঝলে, নরেনবাবুর কথা মিথ্যা নয়!

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'এই ভুতুড়ে মূর্তিটা রাত্রে হয়ত চলে বেড়ায়, বাপরে!'

বিমল বললে, 'জার্মান সাহেব রিচার্ড উইলহেলমের লেখা দি সাউল অফ চায়না (The Soul of China) নামে বইয়ে পড়েছি, চিনেদের পবিত্র পাহাড় থাইসানের তলায় থাইয়ানফু মন্দিরেও একখানি আশ্চর্য জেড পাথর আছে, তারও একদিক গরম আর একদিক ঠান্ডা! এই মূর্তিটিও হয়ত সেই রকম কোনও পাথরে গড়া!'

নরেনবাবু বললেন, 'অতশত আমি জানি না, আমি খালি জানি যে, চিনেরা বলে লাউ-ৎজুর এই মূর্তির ভিতরে দৈবশক্তি আছে। একে পাবার জন্যে অনেক চিনে প্রাণ দিয়েছে, একে পেয়েও আমার তিন বন্ধু প্রাণ দিয়েছেন, আর আমার প্রাণ যায় যায় হয়েছে!'

বিমল বললে, 'ভয় নেই নরেনবাবু, আমরা আপনাকে রক্ষা করব।'

নরেনবাবু বিষণ্ণমুখে একটু হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বাঁচবার আশা আর রাখি না। জানেন বিমলবাবু, আজ ক'দিন ধরে দেখছি, আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে এক একটা চিনেম্যানের মূর্তি হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ অদৃশ্য হয়! আজই যখন এখানে আসছিলুম,

...সদাসতর্ক জয়ন্ত একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মূর্তিসুদ্ধ দড়িগাছা সজোরে চেপে ধরলে।

দুটো চিনেম্যান দূর থেকে আমায় অনুসরণ করছিল! তারপর এই রাস্তায় এসে আর তাদের দেখতে পেলুম না!'

বিমল কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছা দড়ি রাস্তার জানালার ভিতর দিয়ে একটা লিকলিকে লম্বা সাপের মতো সপাং করে টেবিলের উপরে এসে পড়ল এবং চোখের পলক পড়বার আগেই লাউৎজুর মূর্তিটাকে বেঁধে ফেলে তীরবেগে আবার জানালার দিকে টেনে নিয়ে গেল—কিন্তু পরমুহূর্তেই সদাসতর্ক জয়ন্ত একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মূর্তিসুদ্ধ দড়িগাছা সজোরে চেপে ধরলে।

বিমল বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে দেখলে, দুজন চিনেম্যান প্রাণপণে দৌড়ে একখানা ট্যাক্সিগাড়ির উপরে গিয়ে উঠল এবং গাড়িখানা ঝড়ের মতো ছুটে মোড় ফিরে হয়ে গেল অদৃশ্য।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে সে ক্ষুব্ধস্বরে বললে, 'ধরতে পারলুম না, ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়ে গেল! সুন্দরবাবু, ট্যাক্সির নম্বর হচ্ছে ৪৪৪৪।'

সুন্দরবাবু নোটবুক বার করে নম্বরটা টুকে নিয়ে বললেন, 'কী গাড়ি? কী রং?'

—'সাদা রঙের ফোর্ড। সিডান বডি। শিখ ড্রাইভার।'

'আচ্ছা, আজই খোঁজ নেব, বেটারা পালাবে কোথায়? ...কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, দড়ি ছুড়ে পুতুলটা টেনে নিলে কী করে বলো দেখি?'

কুমার বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি অদ্ভুত চটপটে! আপনি না থাকলে মূর্তিটা তো খোয়াই গিয়েছিল!'

জয়ন্ত একমনে দড়িগাছা পরীক্ষা করতে করতে বললে, ' এ তো দেখছি 'ল্যাসো'! আমি জানতুম 'ল্যাসো' ব্যবহার করতে পারে খালি আমেরিকার 'কাউবয়'রাই।'

বিমল বললে, 'আমেরিকায় চিনেদের মস্ত উপনিবেশ আছে। হয়ত সেইখানে থেকেই কোনও কোনও চিনে ল্যাসোর ব্যবহার শিখেছে।'

মানিক বললে, 'আমি শুনেছি সাইবেরিয়ারও স্থানে স্থানে একরকম ছোটো ল্যাসোর চলন আছে। সাইবেরিয়া চিন দেশ থেকে বেশি দূরে নয়।'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'হুম, ল্যাসো আবার কী ব্যাপার?'

কুমার বললে, 'বাংলায় ল্যাসোকে বলা চলে পাশবন্ধ। দড়ির মুখে থাকে একটা ফাঁসকল, সেই দড়ি ছুড়ে কাউবয়রা বড়ো বড়ো বন্য জন্তু ধরে। সময়ে সময়ে ল্যাসো একশো ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, 'এতও আছে বাবা!'

নরেনবাবু ভীত গম্ভীর মুখে চুপ করে বসেছিলেন। এতক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'আমার শত্রুদের বিক্রম দেখলেন তো? এখন আমার কী উপায় হবে?'

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইল। তারপর বললে, 'নরেনবাবু, কোন্ বিচিত্র শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যুঝতে হবে, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। নিজেদের শক্তির বড়াই করি না, তবে লাউ-ৎজুর এই মূর্তিটা যদি আমার কাছে রাখতে রাজি হন, তাহলে আপনার শত্রুদের শক্তি হয়ত পরীক্ষা করবার সুযোগ পাবো।'

নরেনবাবু বললেন, 'ও আপদ এখন বিদায় করতে পারলেই বাঁচি, ওটা আপনার কাছেই থাকুক!'

বিমল উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'তাহলে লাউ-ৎজুর ভক্তরা খুব সম্ভব আজ রাত্রেই আমাকে আক্রমণ করবে। হয়ত সেই সময়ে আমরা কোনও অলৌকিক দৃশ্যও দেখতে পাব!'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অলৌকিক দৃশ্য কী মশাই? ভূত প্রেত নাকি?'

—'সে যে কী রহস্য, যথা সময়েই তা প্রকাশ পাবে। কিন্তু নরেনবাবুর কাহিনি এখনও আমাদের শোনা হয়নি। আগে সেটা শোনা দরকার।'

—'নরেনবাবু, লাউৎজুর এই মূর্তিটা কী করে আপনার কাছে এলো?'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

নরেনবাবুর কাহিনি

নরেনবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, 'বিমলবাবু, আমার কথা শুনতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমার কথা হয়ত আপনারা কেউ বিশ্বাসই করবেন না। অবশ্য এটাও স্বীকার করছি যে, আমি যা বলব, তার সবটা বিশ্বাস করাও হয়ত অসম্ভব। আমার এই কাহিনির খানিকটা আশ্চর্য হলেও, অলৌকিক। স্বচক্ষে যা দেখেছি আর স্বকর্ণে যা শুনেছি তার সমস্ত রহস্য আমরা নিজেরাই বুঝতে পারিনি। হাতে যদি কতকগুলো নিরেট প্রমাণ না থাকত, তাহলে আমরাও সমস্ত ব্যাপারটা আজগুবি দুঃস্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতুম।

'কিন্তু থাক, আপাতত গৌরচন্দ্রিকার সময় নেই। কেবল এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমি খুব সংক্ষেপেই বলব।'

'অনাথবাবু, চন্দ্রবাবু আর নীরদবাবুর সঙ্গে আমি যে সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে চিন দেশে গিয়েছিলুম, এই কথা আপনারা জানেন। ওঁরা তিনজন ছিলেন কেরানি, আর আমি ছিলুম ডাক্তার।'

'হংকং শহরের একটি বাসার দোতলায় আমরা চারজনে বাস করতুম। নিচের তলায় থাকত একজন চিনেম্যান, তার নাম ইয়ন মঙ। বয়স তার পঁচাত্তরের কম নয়, দেহখানি বেঁকে পড়েছে কুমড়োর ফালির মতো।'

'মঙের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ জানাশোনার সুযোগ হয়েছিল। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, প্রায়ই সে অসুখে পড়ত, আর অসুখ হলেই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসত। মঙ অল্পস্বল্প ইংরেজি বলতে পারত।'

'একদিন রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না, বিছানায় শুয়ে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করছিলুম। হঠাৎ নিশুত রাত কাঁপিয়ে বিকট এক চিৎকারে কে আমার সর্বাঙ্গ অভিভূত করে দিলে! চিৎকারটা এলো আমাদের নিচের তলা থেকে।'

'ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আমি তিন বন্ধুরই ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম। তারপর আলো জ্বেলে, বন্দুক নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শুনলুম, কারা যেন দ্রুতপদে বাড়ির বাইরে ছুটে পালিয়ে গেল! তাদের ভয় দেখাবার জন্যে একবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলুম।'

'নিচের তলায় নেমে দেখলুম, মঙের শয়নগৃহের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর থেকে একটা অবরুদ্ধ আর্তনাদও শোনা গেল।'

'তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে আমরা সভয়ে দেখলুম, ঘরের মেঝেয় পড়ে মঙ বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর তার দেহের চারিদিকে রক্তের ধারা!'

'অল্পক্ষণ পরীক্ষা করেই বুঝলুম, পৃথিবীতে মঙ আর কালকের সূর্যোদয় দেখতে পাবে না।'

'মঙ নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিল। অত যাতনার মধ্যেও একটুখানি ম্লান হাসি হেসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'বাবু, আমার দিন ফুরিয়েছে। আপনার ওষুধও আর কোনও কাজে লাগবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবি না, জন্মালেই মরতে হয়।'

'আমি বললুম, 'মিঃ মঙ, কারা আপনার এ দশা করলে?'

—'লাউ-ৎজুর ভক্তরা।'

—'তারা আবার কারা?'

—'অত কথা বলবার সময় নেই। অসুখ বিসুখে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। মরবার আগে আমিও আপনার একটি উপকার করে যেতে চাই। বাবু, আপনি 'সিয়েন' হবেন?'

'ভাবলুম, মরবার সময়ে মঙের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ চিনেভাষায় 'সিয়েন' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'অমর'!'

'আমার মুখ দেখে মঙও বুঝতে পারলে যে, আমি তার কথায় অবিশ্বাস করছি। সে আবার একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'বাবু, আমি পাগল হইনি। কিন্তু এখন আপনাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময়ও আমার নেই, এখনই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে আগে এক গেলাস জল দিন, তারপর আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন।'

'আমি তাড়াতাড়ি জল এনে দিলুম। জলপান করে মঙ বলতে লাগল 'আমার বিছানার উপরে, মাথার বালিশের সেলাই কাটলেই ভিতরে দুখানা কাগজ পাবেন। সে কাগজ দুখানি হচ্ছে ম্যাপ। একখানি ম্যাপে য়ুঅনকাংয়ের গুহা-মন্দিরের কাছে সান-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যাবার অজানা পথ আঁকা আছে দেখবেন। ওই গুপ্তমন্দিরে অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে। আর একখানা ম্যাপ হচ্ছে অমরদের দ্বীপে যাবার ম্যাপ। সে দ্বীপকে লোকে বলে, পৃথিবীর স্বর্গ। যারা 'তাও' ধর্ম গ্রহণ করে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেই দ্বীপে যাওয়া। সেখানে যারা বাস করে তারা অমর। জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের অবাধ গতি, আর জল-স্থল-শূন্যের সমস্ত জীব তাদের বশীভূত। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে লাউ-ৎজুর মৃত্তিকা প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকা চাই। নইলে সে দ্বীপে গিয়ে নামবার উপায় নেই। ওই প্রতিমূর্তি আছে সান-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে। এই ম্যাপ দুখানা আমি পেয়েছি সারাজীবনের চেষ্টার পর, গেল বছরে। আরও কিছুকাল আগে পেলে আমি নিশ্চয়ই সানকুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যেতে পারতুম, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দরজার কাছে এসে, পঙ্গু, ভগ্নদেহে সেখানে যাবার শক্তি আর সাহস আমার হয়নি। অথচ অমন মূল্যবান জিনিস হাতছাড়া করতেও পারিনি। বাবু, সেই লোভই আমার কাল হল। 'তাও' দলের লোকেরা সেই ম্যাপের খোঁজে এখানে এসে আমার বুকে ছুরি মেরেছে। আপনারা না এসে পড়লে তারা নিশ্চয়ই ম্যাপ দুখানা নিয়ে পালিয়ে যেত।'

'এই পর্যন্ত বলে মঙ অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল। আবার একবার জলপান করে অনেক কষ্টে সে বললে, 'বাবু, যদি ধনরত্ন চান তাহলে সানকুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যেতে বিলম্ব করবেন না। শত্রুরা যখন ম্যাপের সন্ধান পেয়েছে, তখন দেরি করলে ম্যাপ দুখানা আবার আপনাদের হাতছাড়া হবেই। কিন্তু আর একটা কথা জেনে রাখবেন। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে লাউৎজুর মূর্তি পাবার পর আর সেখানে একটুও অপেক্ষা করবেন না। কারণ তারপরেই সেখানে অজানা এক বিপদের উৎপত্তি হবে। সে বিপদ যে কী তা আমি জানি না, কিন্তু শুনেছি সে নাকি ভয়ংকর! মন্দিরের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলে তখনকার মতো নিষ্কৃতি লাভ করবেন বটে, কিন্তু যারা আজ আমাকে আক্রমণ করেছে, 'তাও' দলের সেই হত্যাকারীদেরও সাবধান। লাউ ৎজুর মূর্তিকে অমরদের দ্বীপে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারাও আপনাদের পিছনে পিছনে ফিরবে—কারণ ওই মূর্তি হস্তগত করবার জন্যে তারা যে কোনও পাপ কাজ করতেও কুণ্ঠিত হবে না।'

'এই পর্যন্ত বলেই হতভাগ্য মঙের কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই হল তার মৃত্যু।'

'মঙের বালিশ ছিঁড়ে আমরা সত্য সত্যই দুখানা ম্যাপ পেলুম। সেই ম্যাপে চিনে ভাষার কথা ছিল বটে, কিন্তু অল্পস্বল্প চিনে ভাষা জানতুম বলে অর্থ বুঝতে আমার কষ্ট হল না।'

'তারপর তিন চারদিন ধরে আমরা চারজনে কর্তব্য স্থির করবার জন্যে অনেক আলোচনা করলুম। অমরদের দ্বীপের কথা আমরা গাঁজাখুরি রূপকথা বলে উড়িয়ে দিলুম, কিন্তু সান-কুয়ানের গুপ্তধনের লোভ অবিরাম জ্বরের মতো আমাদের যেন পেয়ে বসল। শেষটা সকলে মিলে স্থির করলুম, চিনের য়ুঅনকাং প্রদেশ যখন এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তখন মঙের কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখলে দোষ নেই। আর কিছু না হোক, অন্তত, য়ুঅনকাংয়ের পৃথিবীবিখ্যাত গুহামন্দিরগুলো তো স্বচক্ষে দেখা হবে! আপনারা বোধহয় জানেন না, সুদূর অতীতে চিন দেশের উপরে ভারতবর্ষের কতটা প্রভাব পড়েছিল, য়ুঅনকাংয়ের গুহামন্দিরগুলিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। দেড় হাজার বছরেরও আগে ওখানকার গুহামন্দিরের ভিতরে যেসব অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল, আজও তারা মৌন ভাষায় ভারত-শিল্পের জয় ঘোষণা করছে! কিন্তু সে কথা এখন থাক!'

'তারপর কেমন করে আমরা য়ুঅনকাংয়ের গুহামন্দিরের কাছে গিয়ে ম্যাপ দেখে পাহাড়ের ভিতর সান-কুয়ান বা ভারতের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের গুপ্তমন্দির খুঁজে বার করলুম, তা চিত্তাকর্ষক হলেও এখন বলবার দরকার নেই।'

'আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করলুম। নির্জন পাহাড়ের উপরে যখন দিনের কোলাহল থামিয়ে রাতের নীরব অন্ধকার নেমে এলো, তখন আমরা পেট্রোলের লণ্ঠন জ্বেলে একে একে পাহাড়ের বুকের মধ্যে লুকানো সেই আশ্চর্য গুহামন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।'

'সেই গুহার মধ্যে ঢুকেই মনে হল, আমরা যেন পৃথিবীর বাইরে কোনও এক রহস্যময়

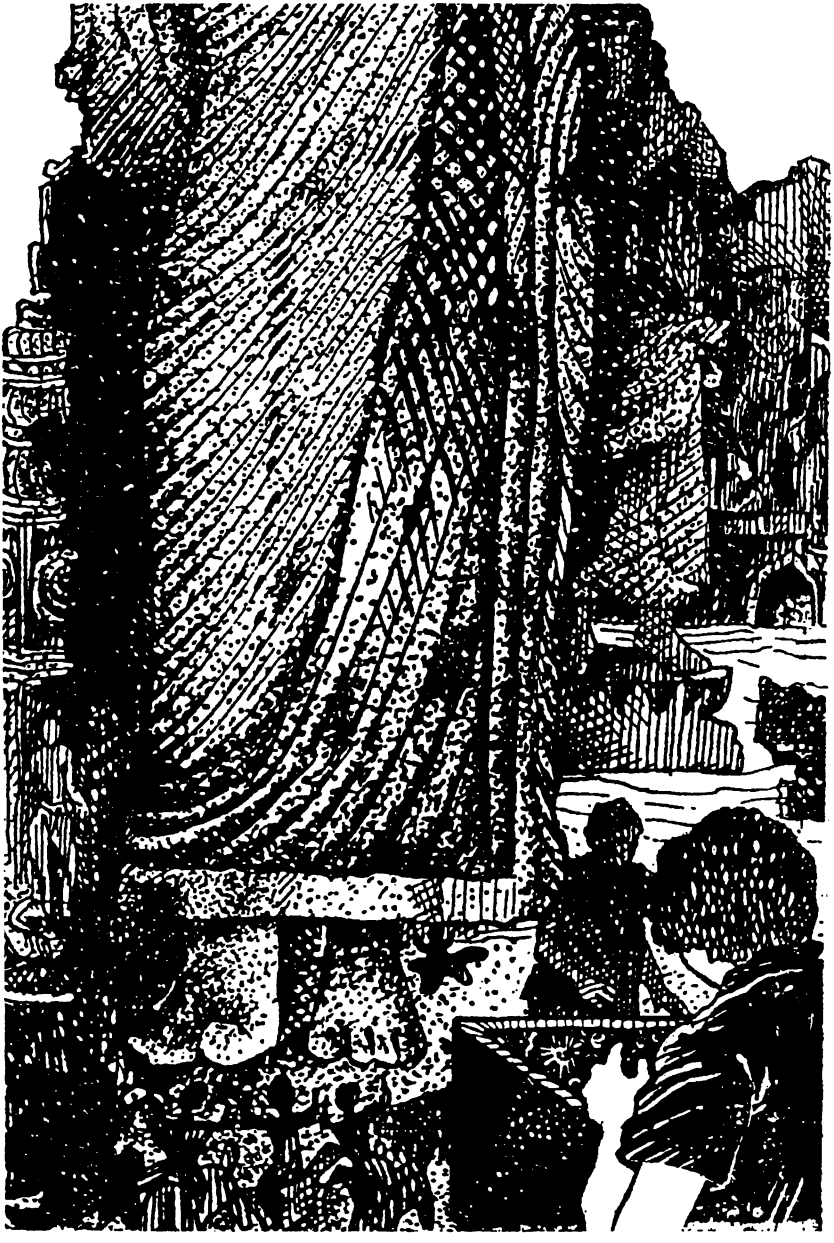

সিন্দুকের ভিতর জ্বল-জ্বল করছে রাশি রাশি হিরা, চুনি, মরকত

স্থানে এসে পড়েছি! কত শতাব্দীর বদ্ধ বাতাস সেখানে যেন বন্দি হয়ে আছে, এতকাল পরে মানুষের অভাবিত পদশব্দ শুনে তারা যেন সবিস্ময়ে চমকে উঠল! আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দগুলো শোনাতে লাগল সদ্যজাগ্রত নিস্তব্ধতার অস্ফুট ভীত আর্তনাদের মতো! সমুজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু গুহাগর্ভের চারিদিকেই কী যেন এক অজানিত, অদৃশ্য ও জীবন্ত বিভীষিকা ক্রমাগত আমাদের আশপাশ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল, —আমরা দেখতে না পেয়েও তাকে অনুভব করতে পারলুম!'

নীরদবাবু সভয়ে চুপিচুপি বললেন, 'নরেনবাবু, আমার বুক কেমন করছে! চলুন, এখান থেকে পালিয়ে যাই!'

'চন্দ্রবাবু এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ওই দেখুন ত্রিমূর্তির বিগ্রহ!'

'পাথরের বেদির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিপুলবপু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, কিন্তু চিনা শিল্পীর হাতে পড়ে তাঁদের চেহারা আর সাজ পোশাক রীতিমত বদলে গিয়েছে!'

'ত্রিমূর্তির ঠিক পায়ের তলায় সাজানো রয়েছে সারি সারি লাউ-ৎজুর মূর্তি! প্রত্যেক মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দিয়ে গড়া,—কোনওটি পোর্সিলেনের, কোনওটি য়্যাম্বারের, কোনওটি জেড পাথরের! আমরা প্রত্যেকে এক একটি মূর্তি তুলে নিয়ে পকেটে ফেললুম।'

'অনাথবাবু বললেন, 'কিন্তু লাউ-ৎজুর মূর্তির লোভে তো আমরা এখানে আসিনি। মঙ গুপ্তধনের কথা বলেছিল, মনে আছে তো?'

'বেদির ঠিক নিচেই চমৎকার কারুকার্য করা তালাবন্ধ প্রকাণ্ড একটা ল্যাকারের সিন্দুক ছিল। তার উপরে বার কয়েক কুড়ুলের ঘা মারতেই ডালা গেল ভেঙে, তারপর ডালা তুলে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল।'

'সিন্দুকের ভিতর জ্বলজ্বল করছে রাশি রাশি হিরা, চুনি, মরকত প্রভৃতি রকম রকম পাথর, তাদের আর সংখ্যা হয় না, বড়ো বড়ো রাজাও কখনও অত ঐশ্বর্য এক জায়গায় চোখে দেখেননি! আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবাক ও আচ্ছন্ন হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর পাগলের মতো সিন্দুকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেই সব রত্ন মুঠো মুঠো তুলে নিতে লাগলুম!'

'আচম্বিতে সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে জেগে উঠল গভীর এক গর্জন! তেমন অমানুষিক গর্জন আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। এক মুহূর্তেই আমার সর্বশরীর এলিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইলে!'

'গুহার দক্ষিণ দিকটা অন্ধকারের ভিতর কত দূর এগিয়ে গিয়েছে আমরা তা পরীক্ষা করবার সময় পাইনি। গর্জনটা জেগেছে সেই দিকেই। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না!'

'কয়েক মুহূর্ত চারিদিক মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপরই শুনতে পেলুম আর এক ভয়াবহ শব্দ! যেন কোনও অতিকায় মূর্তি, বিপুল পায়ের চাপে গুহাতল কম্পিত করে অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকের দিকে এগিয়ে আসছে!'

'অনাথবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমি দুটো চোখ দেখতে পেয়েছি! আগুনভরা বড়ো বড়ো চোখ!'

'সর্বাগ্রে নীরদবাবু গুহার দরজার দিকে ছুটলেন। বলা বাহুল্য, সিন্দুকভরা ধনরত্ন ফেলে আমরাও নীরদবাবুর পিছনে ছুটতে এক মুহূর্তও দেরি করলুম না।'

'তারপর আর বেশি কিছু বলবার নেই। হংকং-এ নিরাপদে ফিরে এলুম বটে, কিন্তু লাউ-ৎজুর ভক্তদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলুম। আমাদের উপরে সর্বদাই যে একদল সাংঘাতিক শত্রুর দৃষ্টি কড়া পাহারা দিচ্ছে, দিনরাত তার প্রমাণ পেতে লাগলুম। দুতিনবার প্রাণে মারা যেতে যেতেও বেঁচে গেলুম। গুহা থেকে যে রত্নগুলি আনতে পেরেছিলুম, তারই মহিমায় আমরা ধনীর মতো জীবন কাটাতে লাগলুম।'

'কিন্তু কিছুকাল পরে শত্রুরা বর্মাতেও আমাদের ঠিকানা আবিষ্কার করে ফেললে। আবার আমাদের জীবন পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন আমরা কলকাতায় পালিয়ে এলুম। এখানেও কিছু দিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। তারপর কী হয়েছে, আপনারা সকলেই জানেন। আমার তিন বন্ধুই হত্যাকারীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন, বাকি আছি খালি আমি। কিন্তু বিমলবাবু, আমিও আর বেশিদিন নেই, লাউ-ৎজুর শিষ্যরা আবার নরবলি দেবেই।'

নরেনবাবুর কাহিনি শেষ হবার পর সকলেই খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। তিনি বললেন, 'হুম! বেশ বোঝা যাচ্ছে, যকের ধনে হাত দিয়ে আপনারা যকের খপ্পরে পড়েছেন!'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, পাগলের মতো বাজে বকবেন না! যক কখনও ল্যাসো ছোঁড়ে না, কলকাতার রাস্তায় দিনের বেলায় ট্যাক্সি চড়ে পালায় না।'

—'আচ্ছা, তা যেন মানলুম। কিন্তু গুহার মধ্যে অমন ভয়ানক গর্জন করে নরেনবাবুদের তেড়ে এসেছিল কে?'

—'গুহার মধ্যে হয়তো কোনও বন্যজন্তুর বাসা ছিল।'

—'বেশ, তাও আমি মানলুম। কিন্তু প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের পর আকাশে ছায়ামূর্তির মতো হুস করে উড়ে যায় কারা? তোমরা তো জানো, আমি নিজেই স্বচক্ষে ওই রকম একটা বিচ্ছিরি ছায়ামূর্তি দেখেছি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, ওসব রহস্য আজ রাত্রেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লাউ-ৎজুর মূর্তি আজ তো আমার বাড়িতে থাকবে, দেখি, আমার কাছ থেকে সেটা কেউ কেড়ে নিতে আসে কি না! ...হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা নরেনবাবু, সেই ম্যাপ দুখানা কোথায়?'

নরেনবাবু বললেন, 'একখানা ম্যাপ আমরা তাড়াতাড়িতে সান-কুয়ান মন্দিরেই ফেলে পালিয়ে এসেছি, পথ চিনে সেখানে যাওয়ার কোনও উপায় আর নেই। তবে অমরদের দ্বীপে যাবার ম্যাপখানা এখনও আমার কাছে আছে, এই নিন। কিন্তু এই ছেলেখেলা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই বোধ হয়।'

বিমল ম্যাপখানা সাগ্রহে হস্তগত করে বললে, 'নরেনবাবু, আমার বিশ্বাস এই ম্যাপের মধ্যে ছেলেখেলার চেয়ে গুরুতর কোনও রহস্য আছে! আপনারা সকলে শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সত্য সত্যই অমরদের দ্বীপের উল্লেখ দেখেছি। তার কথা আমি আপনাদের বলতে পারি।'

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

উড়ন্ত কালোছায়া

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, তাওদের সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলতে পারেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। অন্তত আমার কথা যদি ধরেন, এবিষয়ে আমি কিছুই জানি না— অর্থাৎ যাকে বলে ডাহা মূর্খ।'

বিমল বললে, 'আপনারা আমাকে মস্ত বড়ো জ্ঞানী বলে ভাববেন না। নতুন নতুন 'অ্যাডভেঞ্চারের' খোঁজে মাঝে মাঝে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'তে আমি যাই নানান রকম বই ঘাঁটতে! এই ভাবেই আমি চিন দেশের তাও ধর্মের ইতিহাস জানতে পেরেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু চিনেম্যানদের ধর্মের সঙ্গে বাংলা দেশের এইসব খুন-খারাপির সম্পর্ক কী! কাশীধামে মরল কাক, আর কামরূপে উঠল হাহাকার! হুম!'

—'আচ্ছা, আগে আপনারা আমার কথা শুনুন। ...যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার ছয়শ চার বছর আগে চিন দেশে লাউ-ৎজু জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি চিনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ হন। বহুকাল ধ্যানধারণার পর লাউ-ৎজু স্থির করলেন, এই সংসারে তিনি আর বাস করবেন না। সংসার ত্যাগ করবার সময়ে তিনি যে বই লিখে যান তার নাম হচ্ছে 'তাও তে কিং' —অর্থাৎ তাও আর তের গ্রন্থ। 'তাও' বলতে 'পথ'ও বোঝায়, 'পথিক'ও বোঝায়। এই পুঁথিতে লাউৎজুর সমস্ত ধর্মমত লেখা আছে। মোটামুটি তাঁর মত হচ্ছে, এই পৃথিবীতে মানুষের বাস করা উচিত ঠিক শিশুর মতোই। গাছপালা যেমন কোনও চিন্তা করে না, অথচ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, মানুষও তেমনই নিশ্চিতভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করবে। সাহিত্য, আর্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই মিথ্যা। এসমস্ত ছেড়ে দিয়ে মানুষকে 'তাও' বা পথিক হতে হবে। মানুষ তার আকার পায় পৃথিবী থেকে, পৃথিবী তার আকার পায় স্বর্গ থেকে, আর স্বর্গ তার আকার পায় 'তাও' থেকে! 'তাও' হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। 'তাও' ধর্মের সমস্ত খুঁটিনাটির কথা বলবার সময় এখন হবে না, তবে এইটুকু জেনে রাখুন যে, প্রাচীন 'তাও' ধর্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্মের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্মের মতো 'তাও' ধর্মও পরে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে ক্রমেই ভূত প্রেত, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুক আর হরেক রকম ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। লাউ-ৎজুর মতামতের ভিতর থেকে নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হতে থাকে। পরের যুগের

তাও সাধকরা অমরত্বেরও দাবি করে। তাওদের সিদ্ধপুরুষরা কেবল অমরই হয় না, জলে স্থলে শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ!—'

সুন্দরবাবু হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'হুম! তাও সাধকরা নিশ্চয়ই গাঁজার কলকেতে দম মারত?'

বিমল বললে, 'সে কথা ইতিহাসে লেখে না। তবে চিনেদের পবিত্র পাহাড় থাইসানের তলায় থাইআনফু নামে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের কাছে একজন অমর তাও সাধকের সমাধিস্থ দেহ কত কাল থেকে বিদ্যমান আছে কেউ তার হিসাব জানে না। আপনারা ইচ্ছা করলেই সেখানে গিয়ে তাঁকে সশরীরে দেখে আসতে পারেন, কারণ ইউরোপ-আমেরিকার শত শত অবিশ্বাসী সাহেব তাঁকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছে। রিচার্ড উইলহেলম সাহেব তাঁর কেতাবে লিখেছেন, 'এই সমাধিস্থ তাও সাধক মৌনব্রতী। তিনি কত কাল খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করেননি। বাইরের কোনও কিছুই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। তাঁর দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, দেখতেও তাঁকে মৃতের মতো, কিন্তু তাঁর দেহ একটুও পচে যায়নি। প্রতিদিন দলে দলে ভক্ত এই তাও সাধুকে দেখে প্রণাম করে পুণ্য সঞ্চয় করতে যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু বিমলবাবু, বিজ্ঞান তো এসব কথা মানবে না!'

—'বিজ্ঞান হয়ত মানবে না, কিন্তু ভারতবর্ষেও তো অনেক সাধু পুরুষ বার বার প্রমাণিত করেছেন যে সমাধিস্থ দেহ মাটির ভিতর বহুকাল পুঁতে রাখলেও মারা পড়ে না বা পচে যায় না। কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী কত শত বৎসর বেঁচে ছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। সময়ে সময়ে তাঁর দেহ মড়ার মতো বৎসরের পর বৎসর ধরে গঙ্গাজলে ভাসত, তবু তাঁর কোনও ক্ষতি হত না! এসব রহস্যের কারণ আমি জানি না বটে, তবু এদের স্বীকার করতে বাধ্য হই। কিন্তু তর্ক রেখে এখন যা বলছিলুম তাই বলি। ...তাওধর্মে যেদিন থেকে ভূত প্রেত ম্যাজিকের বাড়াবাড়ি হল, সেইদিন থেকেই চিন দেশে তার প্রভাব বেড়ে উঠল অত্যন্ত। এমন কি শিক্ষিত চিনেম্যানরাও তাও সাধুদের ভক্তি আর ভয় না করে পারত না। চিন দেশের কোনও কোনও সম্রাটও তাও ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার মানমর্যাদা আরও বাড়িয়ে তুললেন।'...

'তাওসাধুদের আর একটা বিশ্বাসের কথা এখনও বলা হয়নি। তারা বলেন, পূর্ব মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে, তার নাম 'অমৃতের দ্বীপ।' সেখানে 'সিয়েন' অর্থাৎ অমররা বাস করে। সেখানে অমর লতা জন্মায়, তার অমৃত ফল ভক্ষণ করলে মানুষও অমর হয়। সেখানে জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-শোক নেই, অমৃত দ্বীপের বাসিন্দারা দিনরাত আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা, পান-ভোজন নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন কাটায়। চিনে চিত্রকররা এই অমৃতের দ্বীপের অনেক চমৎকার ছবি এঁকেছে, দুই একখানা ছবি আমিও সংগ্রহ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার ওই অমৃতের দ্বীপে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, কিন্তু এতদিন কিছুতেই তার ঠিকানা জানতে পারিনি। আজ নরেনবাবুর

ম্যাপে প্রথম তার ঠিকানা পেলুম। এখন দেখতে হবে, এই ঠিকানা নির্ভুল কি না!'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'বিমলবাবু, আপনার পথ আর আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার মতো আমিও রূপকথার দেশে যাবার জন্যে ব্যস্ত নই। আমি চাই হত্যাকারীর সন্ধান করতে। অমৃতের দ্বীপের সঙ্গে এইসব হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্ক নেই।'

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমার মতে, যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।'

—'কীরকম?'

—'সেই বুড়ো চিনেম্যান মঙ, নরেনবাবুর কাছে যাবার সময়ে কী বলে গিয়েছিল, স্মরণ করুন। সে বলেছিল, —'যারা তাওধর্ম অবলম্বন করে, তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, অমৃতের দ্বীপে যাওয়া। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে লাউ-ৎজুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকা চাই।' সম্প্রতি পরে পরে যে তিনটে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, তাদের মূলে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই, নরেনবাবুরা চার বন্ধুতে মিলে চিন দেশে গিয়ে দৈবগতিকে লাউ-ৎজুর চারটি দুর্লভ মূর্তি সংগ্রহ করে পালিয়ে এসেছেন। ওই মূর্তিগুলো পাবার পর থেকেই তাঁদের পিছনে লেগেছে শত্রু। শত্রুরা তিনবার নরহত্যা করে তিনটে মূর্তি হস্তগত করেছে, কিন্তু তবু তারা তৃপ্ত হয় নি, বাকি মূর্তিটাও হস্তগত করতে চায়। এই শত্রুরা যে চিনেম্যান, আজ আমরা তার চাক্ষুষ প্রমাণও পেয়েছি। তারা যে তাওধর্মের ভক্ত, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব, কেবল লাউ-ৎজুর মূর্তি নয়, নরেনবাবুর কাছ থেকে ম্যাপ দুখানাও কেড়ে না নিয়ে তারা ক্ষান্ত হবে না—যদিও একখানা ম্যাপ যে হারিয়ে গেছে একথা তাদের জানা নেই। আমাদের মতো তারাও অমৃতের দ্বীপে যেতে চায়, আর সেইজন্যেই তারা হত্যার পর হত্যা করে পথের কাঁটা তুলে ফেলছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এই হত্যাকাণ্ডগুলো হচ্ছে, অমৃত দ্বীপে যাবারই প্রাণপণ চেষ্টা!'

জয়ন্ত বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম। বিমলবাবু, আপনার ধারণা এখন সত্য বলেই মনে হচ্ছে।'

বিমল উঠে ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আজ রাত্রেই হয়ত শত্রুদের আবার দেখা পাব। সুন্দরবাবু, আজ আমি আপনাদের সাহায্য পেলে সুখী হব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! এসব তো দেখছি আজগুবি ব্যাপার! মন্ত্রতন্ত্র, ভূতপ্রেত, ভোজবাজি! আকাশে ছায়ামূর্তিও দেখা যায়! জয়ন্ত বলে, যে ভূতটা মানুষ খুন করে পুতুল নিয়ে পালায়, তার নাকি একখানা ঠ্যাং আবার কাঠে বাঁধানো! আমরা হচ্ছি পুলিশের লোক, মানুষ খুনিকে ধরতে পারি, কিন্তু ভূত খুনিকে গ্রেপ্তার করবার মন্ত্রতন্ত্র তো আমরা জানি না!'

কুমার হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমরা ভূত ধরবার মন্ত্র জানি, সুতরাং আপনার ভয় নেই। আপনি খালি দয়া করে একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে পারবেন তো?'

—'তা পারব না কেন? কিন্তু জয়ন্ত আর মানিককেও আমার সঙ্গে রাখতে চাই।'

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই! ভূত ধরবার ফাঁদ পেতে কুমার আর নরেনবাবুকে নিয়ে আমি বাড়ির ভেতরে পাহারা দেব। আর লাউ-ৎজুর মূর্তিটা থাকবে আমার তেতলার ঘরে, আর আপনারা লোকজন নিয়ে বাড়ির চারিধারে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর আমি যথাসময়ে নেচে বা গান গেয়ে নয়, কেবল বাঁশি বাজিয়ে আপনাদের আহ্বান করব। কেমন, এ ব্যবস্থা মন্দ কী?'

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'বেশ, তাহলে এই কথাই রইল।'

সে রাত্রে সন্ধ্যার খানিক পরেই চাঁদের ফালি আকাশের গা থেকে মিলিয়ে গেল।

রাত এগারোটার পরে শহরের গোলমাল ক্ষীণ হয়ে এল এবং দুটোর পর থেকে মনে হতে লাগল, সারাদিন পরিশ্রম করে কলকাতা যেন মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে!

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু একটা বেসরকারি অন্ধকার গলির ভিতরে লুকিয়ে আছেন, অন্যান্য জায়গায় আনাচে-কানাচে একদল পাহারাওয়ালাও চোখের আড়ালে অপেক্ষা করছে।

অনেকদূর থেকে একটা বড়ো ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং করে তিনটে বাজল। সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, আজ আর কেউ আসবে না। আমরা ভূতদের দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ভূতরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! এত মানুষ দেখে তারা বোধ হয় ভয় পেয়েছে।'

জয়ন্ত গলি থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, 'চুপ! একটা লোক এই দিকেই আসছে!'

মানিকও উঁকি মেরে বললে, 'লোকটা যে চিনেম্যান!'

—'হ্যাঁ। ভেতরে সরে এসো। লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আসছে। কিছু সন্দেহ করলেই সরে পড়বে!'

সকলে গলির আরও ভিতরে সরে এসে দাঁড়াল, এবং সেইখান থেকেই শুনতে পেলে, নিস্তব্ধ রাজপথের উপরে জেগে উঠছে আগন্তুকের পায়ের শব্দ। খানিক পরেই পায়ের শব্দ একবার থামল। তারপর শব্দটা আবার জাগল, আবার থামল।

সুন্দরবাবু চুপি চুপি বললেন, 'লোকটা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন বলো দেখি? রাস্তার ওদিকের আলোও ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে! ব্যাপার কী?'

জয়ন্ত খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে আবার মুখ বাড়িয়ে দেখে ফিরে এল। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'চিনেম্যানটা গ্যাসপোস্টে উঠে একে একে আলো নিবিয়ে দিচ্ছে!'

মানিক বললে, 'অন্ধকারেই ওদের লীলাখেলা শুরু হবে।'

আকাশে চাঁদ নেই, রাস্তায় আলো নেই। তারপরেই নিবিড় অন্ধকারের নীরবতা ভেঙে দিলে একখানা মোটরগাড়ির শব্দ।

জয়ন্ত উৎসাহিত স্বরে বললে, 'অন্ধকারের আসর তৈরি দেখে এইবারে বোধ হয় আমাদের বন্ধুরা আসছেন! মানিক, বিমলবাবুর বাঁশি শোনবার জন্যে প্রস্তুত হও।'

মোটরের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। খানিকক্ষণ আর কারুর সাড়া নেই। মৌন নিশীথ

রিমরিম করতে লাগল—কেমন একটা ভয়ের ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। অনেকদূর থেকে একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠল যেন কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে। কালিমাখা আকাশের বুকের ভিতর থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল একটা ভীত প্যাঁচা।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'চারিদিক কেমনধারা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে! রাস্তার ওই ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার মন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করছে। কারুর কোনও সাড়াশব্দ নেই, এমন নিঃসাড়ে ওরা ওখানে কী করছে?'

জয়ন্ত আবার এগিয়ে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ...না, না, একটা কী যেন দেখা যাচ্ছে!'

মিনিটখানেক জয়ন্ত আর কোনও কথা কইলে না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, 'মানিক একবার এগিয়ে এসো তো!'

মানিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী জয়ন্ত?'

—'বিমলবাবুদের বাড়ির উপর দিকে তাকিয়ে দেখ। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

মানিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য! কালো আকাশের গায়ে অন্ধকারের চেয়েও কালো কী যেন একটা নড়ে নড়ে দুলে দুলে উঠছে!'

সুন্দরবাবু দেখবার জন্য সাগ্রহে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলেন।

কিন্তু মানিকের কথা শুনেই তিনি শিউরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'হুম! সেই ছায়ামূর্তি!'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত! নীরদবাবু যে রাতে খুন হন, সেদিনও আমি তাঁর বাড়ির উপর থেকে ওই রকম ধোঁয়ার মতো কী একটাকে শূন্যের দিকে উঠে যেতে দেখেছিলুম!'

জয়ন্ত বোবার মতো নীরবে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবতে লাগল, তাহলে এই সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কি সত্যসত্যই কোনও অলৌকিক ব্যাপারের সম্পর্ক আছে? ওটা যে জীবন্ত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ওই নিবিড়তর অন্ধকারের রহস্য বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'জয়ন্ত, আমাদের আর এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়! আমার বোধ হয় বিমলবাবুদের বাড়ির ভেতরে এতক্ষণে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে! চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

জয়ন্ত বললে, 'না! বিমলবাবুর কথামত বাঁশি না বাজা পর্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভারি তোমার বুদ্ধি! বিমলবাবু বেঁচে না থাকলে বাঁশি কেমন করে বাজবে?'

জয়ন্তের মনে মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ জাগছিল। যদি বাঁশি না বাজে? যদি হত্যাকারীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মানুষ মেরে কাজ সেরে পালিয়ে যায়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়ে বিকট একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে

তীব্র বাঁশির আওয়াজে নৈশ স্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপরেই সে কী গোলমাল, কী ছুটোছুটি! এখানে ওখানে আড়ালে আড়ালে যত কনস্টেবল এতক্ষণ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চারদিক থেকে তারা ঘটনাস্থলে দৌড়ে এল ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুতবেগে!

অন্ধকারে জাগল এক মোটরের শব্দ। মুহূর্ত মধ্যেই শব্দটা অনেক দূর চলে গেল।

সুন্দরবাবু গর্জন করে বললেন, 'এই সেপাই! ধর-ধর! যাঃ, ব্যাটারা আমাদের চোখে ধুলো দিলে!'

জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে শূন্যে মুখ তুলে দেখলে। আকাশের গায়ে সেই জ্যান্ত কালো ছায়াটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ উপরের বারান্দা থেকে বিমলের চিৎকার শোনা গেল—'জয়ন্তবাবু! সুন্দরবাবু! শিগগির আসুন! আসামি গ্রেপ্তার!'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

জয়ন্তের আবিষ্কার

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'হুম! আসামি গ্রেপ্তার, না ঘোড়ার ডিম গ্রেপ্তার! আসামিরা মোটরে চড়ে চম্পট দিয়েছে, আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!'

জয়ন্ত ও মানিক কোনও জবাব না দিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝড়ের মতো বেগে বিমলদের বাড়ির দিকে ছুটে চলল। অগত্যা সুন্দরবাবুকেও তাদের পিছনে পিছনে ছুটতে হল—যদিও বেশি দৌড়াদৌড়ি করে তিনি তাঁর গুরুভার ভুঁড়িটিকে বেশি কষ্ট দিতে মোটেই ভালবাসেন না। আরও একটু হেতু আছে। এখানে একলা যদি কিছু দেখা দেয়? বাপরে! হুম!

গ্যাসের আলোগুলো শত্রুরা নিবিয়ে দিয়েছিল বলে আশপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিমলের চিৎকার, কনস্টেবলদের দাপাদাপি ও সম্মিলিত কণ্ঠের কোলাহল এবং সকলের দ্রুত পদধ্বনি রাত্রের স্তব্ধ অন্ধকারকে করে তুললে বিচিত্র শব্দের জগৎ!

রাস্তার দুপাশের বাড়িতে বাড়িতে জানালা দরজাগুলো দুম-দাম করে খুলে যেতে লাগল এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আলোকের পর আলোকরেখা ও গৃহস্থদের কৌতূহলী মুখের পর মুখ!

আচম্বিতে খানিক তফাত থেকে সমস্ত শব্দ ডুবিয়ে জেগে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন এবং বিষম এক আর্তনাদ!

মানিক চমকে বলে উঠল, 'কে রিভলবার ছুড়লে? কে আর্তনাদ করলে?'

দুপাশের বাড়ি থেকে মজা দেখবে বলে যারা তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়েছিল, রিভলবারের গর্জন ও মানুষের আর্তনাদ শুনেই তাদের সমস্ত কৌতূহল ঠান্ডা হয়ে গেল—সকলে মহা

আতঙ্কে জানালা দরজাগুলো দুম-দাম করে আবার বন্ধ করে দিলে। চারিদিক আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার!

জয়ন্ত ইলেকট্রিক টর্চ বার করে আলো জ্বেলে পথের উপর ফেললে এবং তীব্র আলোকরেখার মধ্যে দেখা গেল, একটি লোক ছুটতে ছুটতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!

সুন্দরবাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে শান্তরাম! ব্যাপার কী! কে রিভলবার ছুড়লে? কে গুলি খেয়ে চ্যাঁচালে? তুমি পালিয়ে আসছ কেন?'

—'পালিয়ে আসছি না হুজুর, আপনাকে খবর দিতে আসছি। আসামিরা মোটরে করে পালাচ্ছিল, কনস্টেবল পূরণ সিং তাদের গাড়ির পাদানির উপরে উঠে পড়েছিল। আসামিরা গুলি করে তাকে পথে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

বারান্দার উপর থেকে আবার বিমলের গলা শোনা গেল, 'সুন্দরবাবু! যারা পালিয়েছে তাদের নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আসল আসামি আমার শোবার ঘরে বন্দি হয়েছে! লোকজন নিয়ে শিগগির আসুন।'

ততক্ষণে কুমার নিচে নেমে সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তিনতলার বারান্দায় নরেনবাবুকে পাশে নিয়ে বিমল দাঁড়িয়ে ছিল—তার হাতে রিভলবার।

জয়ন্ত বললে, 'বাহাদুর বিমলবাবু, বাহাদুর! আজ আপনারই বুদ্ধির জয়! কিন্তু আসামিকে কী করে আপনি বন্দি করলেন?'

বিমল বললে, 'আজ বৈকালে আমার দাসী বাজার থেকে ফিরে এসে বললে, একটা অচেনা লোক তাকে জিজ্ঞাসা করছিল, বাড়ির কোন ঘরে কে শোয়! আমি তিনতলায় শুই শুনেই সে চলে যায়। বুঝলাম, শত্রুরা চর পাঠিয়ে আমার শোবার ঘরের সন্ধান নিতে চায়। তখন ওই ঘরেই আমি শত্রুধরা ফাঁদ পাতলুম। প্রথমে লাউ-ৎজুর মূর্তিটা একটা ছোট্ট টেবিলের উপরে বসিয়ে রাখলুম—চোর যাতে সহজেই সেটা দেখতে পায়। তারপর ঘরের আলো না নিবিয়েই দরজাটা ভেজিয়ে আমরা পাশের এই ঘরটায় বসে কান খাড়া করে পাহারা দিতে লাগলুম।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'কেবল কান খাড়া করে পাহারা দিয়ে কাঁচা কাজ করেছেন। চোর যদি চুপি চুপি কাজ সেরে লম্বা দিত?'

বিমল হেসে বললে, 'অসম্ভব। সুন্দরবাবু, আমার শোবার ঘরের দরজা পাহারাওলার কাজ করে। যত আস্তেই তাকে ঠেলুন, সে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করবেই! ...কিন্তু যাক সে কথা। তারপর কী হল শুনুন। রাত তিনটে পর্যন্ত পাহারা দেবার পর শুনলুম রাস্তায় একখানা মোটরের শব্দ। শব্দটা যে আমার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এসে থেমে গেল, তাও বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ! তারপর আশ্চর্য হয়ে শুনলুম, বারান্দার উপরে পায়ের শব্দ হল!'

মানিক বললে, 'বারান্দার সামনে শূন্যে কোনও কালো ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন?'

—'কালো ছায়া! সে আবার কী?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেবল কান খাড়া না করে বাইরে একবার উঁকি মারলেই তাকে দেখতে পেতেন! আমরা সবাই দেখেছি!'

—'না, আমরা ছায়া-টায়া কিছুই দেখিনি, অন্তত দেখবার সময় পাইনি। কারণ পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিশ্বস্ত দরজা ক্যাঁচ ক্যাঁচ চিৎকার করে জানিয়ে দিলে যে শিকার ফাঁদের ভিতরে ঢুকেছে! আমি তীরের মতো ছুটে গিয়ে দরজার পাল্লা টেনে বন্ধ করে বাহির থেকে শিকল তুলে দিলুম, আর সেই সময়েই চকিতের মধ্যে দেখে নিলুম, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা খুব লম্বা চওড়া চিনেম্যানের মূর্তি!'

জয়ন্ত কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলে, 'নিশ্চয়ই তার বাঁ পা নেই? পায়ের বদলে সে কাঠের খোঁটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল?'

—'অত বেশি দেখবার সময় পাইনি জয়ন্তবাবু! কিন্তু আর হাতে-পাঁজি মঙ্গলবারের দরকার কী? চোর তো পাশের ঘরেই আছে, সবাই মিলে এইবারে তার উপরে জোড়া জোড়া দৃষ্টিবাণ ত্যাগ করা যাক না কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! সবাই হাতে রিভলবার নাও। এ শুধু চুরি করে না, খুনও করে!'

বিমল সব আগে অগ্রসর হল, তারপর জয়ন্ত, কুমার ও মানিক এবং সবশেষে সুন্দরবাবু। কেবল নরেনবাবু অর্ধমৃতের মতো সেইখানেই বসে রইলেন এবং সভয়ে বারংবার বলতে লাগলেন, 'দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি!'

বিমল ডানহাতে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে বাঁহাতে দরজার শিকলটা নামালে। তারপর এক পদাঘাতে খুলে ফেললে পাল্লা দুটো সশব্দে।

উজ্জ্বল আলোকে ঘর ধবধব করছে। ভিতরে জনপ্রাণী নেই!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ মূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে সুন্দরবাবু নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'হুম! এমন যে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। ছায়ামূর্তিকে কেউ দরজা বন্ধ করে ধরে রাখতে পারে?'

কুমার তিক্তস্বরে বললে, 'এ ছায়া নয় সুন্দরবাবু, নিরেট কায়া। টেবিলের উপরে ছিল লাউৎজুর মূর্তি, ওই দেখুন, চোরের নিরেট হাত সেটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!'

জয়ন্ত নির্বাক ভাবে একবার সারা ঘরখানার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর ভিতরমুখো একটা জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। জানালার দুটো লোহার গরাদে বেঁকিয়ে ফাঁক করা!

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতো পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বাপরে বাপ! চোর ব্যাটার গায়ে কী অসম্ভব জোর!'

বিমল জানালার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর দুই হাত দিয়ে টেনে সেই দুমড়ানো গরাদে দুটো রীতিমত অবলীলাক্রমে আবার সিধে করে দিয়ে বললে, 'এ কাজ অসম্ভব নয়

সুন্দরবাবু! জয়ন্তবাবুর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এ কাজ ওঁরও পক্ষে শক্ত নয়! কিন্তু আমার কাছে কী অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে জানেন? চোর পালালো কেমন করে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ তো রসগোল্লা খাওয়ার চেয়েও সোজা! আপনারা যখন বারান্দায় গিয়ে আমাদের ডাকাডাকি করছিলেন, চোর তখন জানালা দিয়ে নিচে নেমে সদর দরজা খুলে সরে পড়েছে আর কী!'

কুমার বললে, 'তা হয় না মশাই! নিচে নামবার একটি মাত্র সিঁড়ি। দোতলায় কি দেখেননি সিঁড়ির মুখে বাঘাকে নিয়ে রামহরি পাহারা দিচ্ছে? আপনি হয়ত যমকে ফাঁকি দিতে পারবেন, কিন্তু আমার কুকুর বাঘাকে পারবেন না। আর সদর দরজার খিল ভিতর থেকে খুলেছি আমি নিজের হাতে।'

বিমল ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'সিঁড়ির আর এক মুখ গেছে তিনতলার ছাদে। এইবারে ছাদটা দেখতে হবে।'

তেতলার ছাদে কেউ নেই। জয়ন্ত ধারে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে আন্দাজ করে দেখলে, রাস্তা থেকে ছাদটা প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না। অত উঁচু থেকে লাফ মেরে কোনও মানুষেরই পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

মানিক বললে, 'চোর কোনও ঘরে ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?'

কুমার বললে, 'দোতলার সিঁড়ির আগলে আছে বাঘা আর রামহরি তেতলায় মোটে দুখানা ঘর। দুখানাই তো আমরা দেখেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, এসব হয় ভুতুড়ে কাণ্ড, নয় ভোজবাজি! ভূতপ্রেত কি যাদুকররা যদি এমনি চুরিটুরি করতে শুরু করে, তাহলে পুলিশকে হয় মরে ভূত হতে, নয় ভোজবাজি শিখতে হয়!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, বুড়ো বয়সে ভোজবাজি শিখতে গেলে আপনার অনেকদিন কেটে যাবে! কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে এখনই মরে খুব সহজেই ভূত হতে পারবেন! একগাছা দড়ি সংগ্রহ করে আনব নাকি?'

সুন্দরবাবু রাগে লাল হয়ে বললেন, 'মানিক, পিছু লেগে লেগে তুমিই আমাকে দেশছাড়া করবে দেখছি!'

মানিক একগাল হেসে সুন্দরবাবুর একখানা হাত ধরে বললে, 'তা কি আর হয় দাদা? পিছু যখন নিয়েছি তখন আপনি দেশ ছাড়লেও আমি আপনাকে ছাড়ব কেন?'

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'চোর যে আমার দর্পচূর্ণ করেছে সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। নিচে চলুন জয়ন্তবাবু, আজকের শেষরাতটা আপনারা এইখানেই কাটিয়ে দিয়ে যান।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি থানায় চললুম, আমাকে আবার রিপোর্ট লিখতে হবে।'

মানিক বললে, 'রিপোর্ট লেখবার পর পলাতক ভূতের নামে একখানা ওয়ারেন্টও বার করতে ভুলবেন না যেন!'

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'মানিক, আবার!'

সকাল আটটা। গোল টেবিলটা ঘিরে বসে আছে বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মানিক ও নরেনবাবু এবং গৃহতলে থাবা পেতে বসে বাঘা মুখ তুলে সতৃষ্ণনয়নে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ল্যাজ নাড়ছে আর নাড়ছেই! তার এমন সতৃষ্ণনয়ন ও লাঙুল আন্দোলনের কারণ হচ্ছে, নূতন অতিথিদের জন্যে আজকের ব্রেকফাস্টের আয়োজনটা হয়েছে রীতিমত গুরুতর!

বিমল বললে, 'চোর পালিয়েছে বলে আমি তত দুঃখিত নই, কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে লাউ-ৎজুর ওই দুর্লভ মূর্তিটা হারিয়ে। হায় হায়, ওই মূর্তি নিয়েই যে আমি অমৃতদ্বীপে যাত্রা করব ভেবেছিলুম!'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আপনি খুঁজছেন খালি 'অ্যাডভেঞ্চার', তাই ওই মূর্তিটার জন্যে শোক করছেন। কিন্তু আমরা হচ্ছি গোয়েন্দা, আমাদের দৃষ্টি কেবল অপরাধীদের দিকেই। আমাদের এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে অপরাধী গেল পালিয়ে, এটা কি কম লজ্জা আর কলঙ্কের কথা?'

কুমার বললে, 'ও লজ্জা কলঙ্কের কালি আমাদেরও মুখকে কালো করে দেবে জয়ন্তবাবু।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনাদের কোনই লজ্জা নেই, গোয়েন্দাগিরি তো আপনাদের কাজ নয়! আপনারা ব্যাপারটা আর একবার ভালো করে বুঝে দেখুন। এই বাড়িখানার চারিদিকে আর কোনও বাড়ি নেই—অন্য ছাদ থেকে কেউ এখানে লাফিয়ে আসতে পারবে না। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল, দোতলায় রামহরি আর তেতলায় আপনারা ছিলেন সজাগ হয়ে। তার উপরে রাস্তায় আশেপাশে লুকিয়েছিলুম আমরা অনেক লোক। তবু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তেতলায় চোরের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান হল কেমন করে? যদিও এর কোনও সদুত্তর পাচ্ছি না, তবু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, চোর যে উপায়ে তেতলায় উঠেছে, পালিয়েছেও ঠিক সেই উপায়ে। কিন্তু সেই উপায়টা কী? চোরের সহকারীরা যদি পথের গ্যাসগুলো নিবিয়ে না দিত, তাহলে সমস্ত রহস্যই হয়ত পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু অন্ধকারেও আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি। চোরের আবির্ভাবের সময়ে আমরা সকলেই দেখেছি, এই বাড়ির কাছে শূন্যে দুলছে একটা কালো ছায়া। গোলমাল হবার পরেই কিন্তু সেই আশ্চর্য কালো ছায়াটা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম নয়, প্রত্যেক বার চোরের আবির্ভাবের সময়েই ওই কালো ছায়ার আবির্ভাব হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা চোরের ছায়া নয়, তার আবির্ভাব অন্তর্ধানের সঙ্গে ওই ছায়ার একটা যোগ আছে। বিমলবাবু, ওই ছায়াটাকে আপনার কী বলে মনে হয়?'

বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু সে সন্দেহও যদি সত্য না হয়, তাহলে এ মামলাটাকে অলৌকিক বলে মানতেই হবে।'

হঠাৎ ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। বিমল রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে দিয়েই বললে, 'জয়ন্তবাবু, থানা থেকে সুন্দরবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আপনাকে ডাকছেন।'

জয়ন্ত রিসিভারটা ধরেই শুনলে, সুন্দরবাবু ব্যস্তভাবে বলছেন, 'কে, জয়ন্ত? হুম, ভয়ানক ব্যাপার!'

—'কী ব্যাপার সুন্দরবাবু?'

—'সেই জুজুর মূর্তিটা আমি পেয়েছি!'

—'জুজুর মূর্তি কী আবার?'

—'ওই জুজু আর লাউ-ৎজু একই কথা। বিদঘুটে নাম, উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়! মূর্তিটা আবার পেয়েছি—সেই যার মাথার দিক গরম আর পায়ের দিক ঠান্ডা!'

—'কী আশ্চর্য, কোথায় পেলেন?'

—'বিমলবাবুদের বাড়ির উত্তর দিকের একটা মাঠে। কিন্তু আমি তার চেয়েও অদ্ভুত আরও একটা মস্ত আবিষ্কার করেছি! হুঁ-হুঁ বাবা, আমি তো তোমাদের মতো শখের গোয়েন্দা নই, চোর ব্যাটা আমার চোখে আর কতদিন ধুলো দিতে পারবে? জয়ন্ত ভায়া, এবারে আমারই জিত!'

—'বেশ, আমি না-হয় হার মানছি। কিন্তু আপনার মস্ত আবিষ্কারটা কী শুনি?'

—'তাহলে ভায়া, তোমাদের সশরীরে থানায় এসে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে হবে। শিগগির এসো, এ একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার, নাটক-নভেলেও এমন কথা পড়া যায় না! কী কাণ্ড!'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কলিকালের দুর্যোধন

জয়ন্ত টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ফিরে বললে, 'বিমলবাবু, আশ্চর্য খবর! লাউ-ৎজুর যে মূর্তি আজ চুরি গেছে, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু এখান থেকে উত্তর দিকের কোনও মাঠে এরই মধ্যে সেটা আবার কুড়িয়ে পেয়েছেন!'

বিমল এবং আর সকলেই বিস্ময়ে নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইল।

—'কেবল তাই নয়, সুন্দরবাবু আরও কী একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন, আর তাই দেখবার জন্যে আমাদের সকলকে ডাকছেন।'

বিমল সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন, আমরা সবাই তাহলে এখনই সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই।'

পথে বেরিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে নীরব হয়ে রইল। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, 'এখান থেকে উত্তর দিকে! ...হুঁ, কাল রাতে বাতাস কোন দিকে বয়েছিল, আপনারা কেউ কি তা লক্ষ করেছিলেন?'

কুমার বললে, 'দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। কালকে বাতাসের জোরও ছিল খুব বেশি।'

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মানিক জানত, এটা হচ্ছে জয়ন্তের অতিরিক্ত খুশির লক্ষণ। নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেই ঘন ঘন নস্য না নিয়ে সে তৃপ্ত হত না।

মানিক চুপি চুপি শুধোলে, 'কী হে, বাতাসে আবার কীসের গন্ধ পেলে?'

জয়ন্ত এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে যেন সে মানিকের প্রশ্ন শুনতেই পায়নি।

থানার ভিতরে ঢুকে তারা দেখলে, ঘরের মধ্যে সুন্দরবাবু বীরবিক্রমে পদচারণা করছেন। সকলের সাড়া পেয়েই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির মতো বুক ফুলিয়ে টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

টেবিলে একখানা রঙিন রুমালের উপরে শোয়ানো ছিল জেডপাথরে গড়া সেই লাউৎজুর মূর্তিটি।

মানিক খিলখিল করে কৌতুক হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলে।

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'হাসলে বড়ো যে?'

মানিক বললে, 'আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন এই মাত্র সূর্যলোক চন্দ্রলোক জয় করে ফিরে আসছেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, সূর্যলোক চন্দ্রলোক জয় করি আর না করি, তোমরা কেউ যা পারনি, আমি তাই করেছি তো বটে! আমি চোরাই মাল উদ্ধার করেছি—বুঝলে হে, এটা বড়ো যে সে কথা নয়! তার উপরেও আরও এমন গুপ্ত রহস্য জানতে পেরেছি—'

হঠাৎ জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'গুপ্ত রহস্যের কথা পরে শুনব। আগে বলুন দেখি, এই মূর্তিটাকে আপনি কোথায়, কেমন করে কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'অবিশ্যি, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ওই জুজুর মূর্তিটাকে ঠিক আমি কুড়িয়ে পাইনি। বিমলবাবুদের বাড়ি থেকে খানিক তফাতে উত্তর দিকে আছে একটা মাঠ। সেই মাঠে একটা খুব উঁচু নারকেল গাছের তলায় লাল রুমালে জড়ানো এই পুতুলটা পড়েছিল। কনস্টেবল সুন্দর সিং দেখতে পেয়ে এটাকে তুলে এনেছে।'

জয়ন্ত রুমালখানা টেবিলের উপরে ভালো করে বিছিয়ে রেখে পরীক্ষা করতে লাগল। হালকা লাল রঙা রেশমের রুমাল, আর তার এক কোণে একটি ড্রাগনের ছবি আঁকা। এর চেয়ে বেশি কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে সে হতাশভাবে বললে, 'নাঃ, এ রুমাল আমাদের কোনও কাজেই লাগবে না।'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, এখন বলুন দেখি, আপনি আর কী গুপ্ত রহস্য জানতে পেরেছেন?'

সুন্দরবাবু ভারিক্কে চালে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হুম, বাবা! যেখানেই আঁধার রাতে খুন হয় কি জুজুর মূর্তি চুরি যায়, সেইখানেই সবাই দেখে আকাশ দিয়ে হুস করে

কালো ছায়া উড়ে গেল! কেউ ভাবে তাকে ভূত, কেউ ভাবে চোখের ভ্রম! কিন্তু আসলে সেটা যে কী, তোমাদের বড়ো বড়ো ভারী ভারী মাথা আজও তা ধরতে পারেনি। কনস্টেবল সুন্দর সিং আজ সকালে মাঠের এক নারকেল গাছের তলায় প্রথমে এই জুজুর মূর্তিটা কুড়িয়ে পায়। তারপর উপর পানে তাকিয়ে দেখে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'সে কী দেখেছিল, হয়ত আমি তা বলতে পারি।'

সুন্দরবাবু অবহেলার হাসি হেসে বললেন, 'হুম, অসম্ভব! বলবার মিছে চেষ্টা করো না জয়ন্ত, বলতে তুমি পারবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'কনস্টেবল সুন্দর সিং উপর পানে তাকিয়ে দেখলে নারকেল গাছে রয়েছে একটা বেলুন!'

ঘরের মধ্যে যারা ছিল সকলেই মহা বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়েই বলে উঠলেন, 'ও বুঝেছি! আর কারুর মুখ থেকে আগেই সব কথা শুনে নিয়ে এখন বাহাদুরি ফলানো হচ্ছে।'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'মোটেই নয়। আমি আন্দাজে বলেছি।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আন্দাজ? তুমি প্রায়ই আন্দাজ করে অসম্ভব সব কথা বল। হুম, তোমার আন্দাজের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে উঠলুম!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমার আন্দাজি অসম্ভব কথাগুলো তো প্রায়ই সত্য হয় সুন্দরবাবু! এর কারণ কি জানেন? আপনি অসম্ভব ভেবে যা উড়িয়ে দেন, আমি তাকেই নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাই। অপরাধীরা হয়ত বেলুন ব্যবহার করছে, এই সন্দেহটা খানিক আগেই বিমলবাবুর কাছে প্রকাশ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আপনি ফোন করাতে আমি আর বলবার সময় পাইনি। গোড়া থেকেই বারবার আমার সন্দেহ হয়েছে যে এই সব ঘটনার সঙ্গে অলৌকিক নয়, অসাধারণ কোনও কিছুর সম্পর্ক আছে। তখন নিজেকে অপরাধীদের সর্দারের আসনে বসিয়ে এইভাবে আমি উপায় স্থির করতে লাগলুম। ধরুন, রামবাবুর বাড়িতে আমি চুরি করব। প্রথমে রামবাবুর বাড়ির ভিতরকার 'প্ল্যান' সংগ্রহ করলুম। তারপর যে রাস্তায় রামবাবুর বাস, সেই রাস্তায় বা তার কাছাকাছি কোথাও একটা মাঠ বা বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে দুচার দিনের জন্যে একটা কারখানা স্থাপন করলুম। কারখানায় লুকিয়ে রাখলুম একটা বেলুন। বড়ো বেলুন নয়, বিশেষভাবে তৈরি এমন একটা ছোটো বেলুন, যা মাত্র একজন মানুষকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারপর বেলুনটাকে ব্যবহার করবার জন্যে এমন একটা রাত বেছে নিলুম, যে রাতে আকাশে চাঁদ নেই, কিংবা মেঘে ঢাকা পড়েছে। গভীর রাতে আমার কারখানায় 'হাইড্রোজেন গ্যাসে'র সাহায্যে বেলুনকে ফুলিয়ে জ্যান্ত করে তোলা হল। তারপর বেলুনকে বাইরে এনে তার ভিতরে লোক বসিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলুম বটে, কিন্তু মিলিটারি 'বন্দি' বেলুনের মতো তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলুম। এইভাবে ছোটো একটা দড়ি বাঁধা বেলুনকে আঁধার রাতে আকাশে উড়িয়ে কলকাতার রাস্তাতেও সকলের অগোচরে মোটরে চড়ে বেশ খানিকটা দূর

আনা যায়। বেলুনের দড়ি মোটরের লোকের হাতে থাকবে বটে, কিন্তু পথে লোক থাকলেও কেউ তা দেখবার সময় বা সুবিধা পাবে না। কারণ একে রাত, তায় চলন্ত মোটর, তায় একগাছা সরু লিকলিকে ম্যানিলা দড়ি, যা তিরিশ চল্লিশ মণ মালের টান সহ্য করতে পারলেও সময় বিশেষে লোকের চোখে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার দিন, নির্জন গভীর রাতে মোটরে চেপে দলবল আর বেলুন নিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। একজন লোক আমাদেরও আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তার অনেকগুলো গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে রাতের আঁধারকে আরও ঘোরালো করে তুললে। তারপর আমরা অন্ধকারের মধ্যে আরও নিবিড় অন্ধকারের ছায়ার মতো বেলুনটাকে শূন্যে টেনে যে বাড়িতে ঘটনা ঘটবে তার কাছে নামিয়ে আনলুম। বেলুনের ভিতরের লোক বাড়ির উপরে নামল, কাজ হাসিল করে আবার বেলুনে চড়ে শূন্যে উঠল, আমরাও দড়িবাঁধা উড়ন্ত বেলুন নিয়ে আবার কারখানায় ফিরে এলুম। ...সুন্দরবাবু, এই হচ্ছে আমার অনুমান। কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ আমাদের আবির্ভাবে অপরাধীদের 'প্ল্যান' ওলটপালট হয়ে যায়। ফলে কী হয়েছে, অনুমানে তাও কিছু কিছু বলতে পারি। শত্রু যেই ঘরে ঢুকল, বিমলবাবু অমনি দরজা বন্ধ করে বাঁশি বাজালেন। কিন্তু এই শত্রু কেবল শক্তিমান নয়, বিষম চটপটেও বটে! সে বিপদে পড়বামাত্র জানালা ভেঙে বাইরে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে বেলুনে চড়ে অদৃশ্য হয়েছে যে তার তৎপরতার কথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়! মোটরের মধ্যে যারা বেলুনের দড়ি ধরে অপেক্ষা করছিল,আচমকা পুলিশের আবির্ভাব দেখে দড়ি ছেড়ে তারা দিলে চম্পট, আর ওদিকে একজন শত্রুকে নিয়ে বেলুনটা শূন্যে উড়ে চলল স্বাধীনভাবে। কিন্তু বেলুনবাসী শত্রু তখনও বিপদে পড়ে বুদ্ধি হারায়নি, বেলুন তাকে নিয়ে পাছে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি 'সেফটি ভালভ' বা গ্যাস বেরুবার ছ্যাঁদাটা খুলে দিলে। তখন বাতাস বইছিল উত্তর দিকে, বেলুনটাও 'ভালভ' খুলে দেওয়ার দরুন নিচের দিকে নামতে নামতে উত্তরের মাঠের একটা নারকেল গাছের টঙে আটকে গেল। তারপর শত্রু গাছ থেকে মাটিতে নেমে পালিয়ে গিয়েছে। আর সেই সময়েই কোনও গতিকে লাউ-ৎজুর মূর্তিটা হারিয়ে ফেলেছে। সুন্দরবাবু, আমার বিশ্বাস, বেলুনটা যখন আপনাদের হাতে পড়ে, তখন সে খুব চুপসে গিয়েছিল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একেবারে। বেলুনের লম্বা দড়ি গিয়েছিল নারকেল গাছের ডালে জড়িয়ে, আর চুপসে গিয়ে সেটা পড়েছিল ঝুলে। তার ভিতরে গ্যাস ট্যাস কিছুই ছিল না।'

বিমল হঠাৎ জয়ন্তের হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললে, 'ধন্য জয়ন্তবাবু! আপনার সঠিক অনুমানশক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখনও আমার সব কথা বলা হয়নি। জানো জয়ন্ত, খবর পেয়ে মাঠে ছুটে গিয়ে কী দেখলুম জানো? নারকেল গাছের তলাকার ঘাস টাটকা রক্তে তখনও ভিজে রয়েছে! রক্তের পরিমাণ দেখে বুঝলুম, নামবার সময়ে অপরাধী নারকেল গাছ থেকে

পড়ে গিয়ে বিষম জখম হয়েছে। মনে খুব আহ্লাদ হল, ভাবলুম তাহলে অপরাধীকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হবে না। ঘাসের আর মাটির উপর দিয়ে রক্তের দাগ সমানে চলে গিয়েছে মাঠের মাঝখানকার একটা পুরানো আর ভাঙা কূপের দিকে। কূপের ভিতরে জল অল্প, কিন্তু সেখানে শত্রুর কোনও চিহ্নই নেই!'

বিমল বললে, 'রক্তের রেখা কি কূপের কাছে গিয়েই শেষ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অপরাধী যদি কূপের কাছ থেকে ফিরে আসে, তাহলে রক্তের দুটো রেখা দেখা যাবে।'

—'না, রক্তের রেখা ছিল একটাই।'

—'মাঠের বাইরে রাস্তায় কোনও রক্তের দাগ দেখেছেন?'

—'এক ফোঁটাও নয়।'

জয়ন্ত ও বিমল দুজনেই একসঙ্গে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, অপরাধী তাহলে পালাতে পারেনি। আপনি সেখানে কোনও পাহারাওলাকে রেখে এসেছেন কি?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু আমি বলছি, অপরাধী সেখান থেকে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'তবু আমরা সে-জায়গাটা একবার দেখতে চাই।'

আর সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও অগ্রসর হতে হতে অভিমানভরে বললেন, 'হুম, ওই জন্যেই তো আমার দুঃখু হয়! তোমরা আমাকে ভারি বোকা ভাব! অপরাধী কি মাছি না মশা, যে আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?'

মাঠটার আকার হবে প্রায় পনেরো-ষোল বিঘে। তার চারিদিকে গোটাকয়েক তাল, নারিকেল, অশ্বত্থ, বট ও আম, জাম প্রভৃতি গাছ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এক জায়গায় একটা ভাঙা কূপও দেখা যাচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, 'নারকেল গাছের তলাটা পরে দেখব। আগে ওই কূপের দিকেই যাওয়া যাক।'

কূপের কাছে গিয়েই কুমার বলে উঠল, 'এই যে, কুয়োর পাড়ে ইটের ওপরেও শুকনো রক্তের দাগ! অপরাধী তাহলে কুয়োর পাড়েও উঠেছিল।'

কূপের ভিতরে উঁকি মেরে নজরে পড়ল, অনেক নিচে কালো জল টলমল করে নড়ছে!

বিমল বললে, 'কুয়োর অত নিচে জল এমন নড়ে কেন? যেন আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে কেউ ওখানে সবে ডুব দিয়েছে!'

কূপের চারিপাশ ঘিরে সবাই তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে প্রায় সাত আট মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কারুকে দেখা গেল না, চঞ্চল জল ক্রমে স্থির হয়ে এলো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখছো জয়ন্ত, এর মধ্যে কেউ নেই? আট মিনিট ধরে পৃথিবীর কোনও মানুষই জলের তলায় দম বন্ধ করে থাকতে পারে না।'

খানিক তফাতেই একগাদা পাঁকাটির উপর কতকগুলো চড়াই পাখি কিচির মিচির করে ডাকতে ডাকতে ও নাচতে নাচতে খেলা করছিল। সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, জলের তলায় থেকে নিশ্বাস ফেলবার কোনও উপায়ই কি নেই?'

বিমলও যেখানে চড়াই পাখি খেলা করছিল সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তিন চারটে বড়ো বাঁশ আর খানিকটা দড়ি চাই। যাও, শিগগির কেউ নিয়ে এসো!'

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাওলারা বাঁশ ও দড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

বিমলের কথামত সবাই মিলে তখনই আর একটা বাঁশ বেঁধে খুব লম্বা এক লগি তৈরি করে ফেললে। তারপরে সেই লগি গাছা কূপের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

বিমল বললে, 'জলের তলায় জোরসে মার খোঁচা। দেখি ওখানে কেউ আছে কি না!'

একটা, দুটো, তিনটে খোঁচা মারবার পরেই, লগি চেপে ধরে জলের উপরে হুস করে ভেসে উঠল মস্ত বড়ো এক চিনেম্যানের মূর্তি—তার কুৎসিত মুখে দুটো কুতকুতে ক্রুদ্ধ চোখ দু টুকরো আগুনের মতো জ্বলছে!

পরমুহূর্তেই ঘটল আর এক কাণ্ড। সেই চিনেম্যানটা হঠাৎ কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ছোরা বার করে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ আবার ডুবে গিয়ে কূপের সমস্ত জল তোলপাড় ও রক্তে রাঙা করে তুললে!

চিনেম্যানের বিপুল মৃতদেহটা তখন তুলে এনে মাঠে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'দেখ মানিক, যা ভেবেছি তাই! ওর একটা পা কাঠের!

মানিক আশ্চর্য স্বরে বলল, 'বাবা, খোঁড়া পায়ের এত বিক্রম!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু ঊরুভঙ্গের পর দুর্যোধনের মতো এ ব্যাটা জলের তলায় লুকিয়ে ছিল কী করে?'

জয়ন্ত বললে, 'গাছের উপর থেকে পড়ে গিয়ে লোকটার সর্বাঙ্গ কী রকম ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, দেখছেন তো? কেবল এই জন্যেই ও এখান থেকে পালাতে পারেনি। কিন্তু লোকটার উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্ট। যখনই দেখলে পালানো সম্ভব নয়, তখনই অদৃশ্য হবার একটা উপায় বার করে ফেললে! ওই পাঁকাটির গাদা থেকে তাড়াতাড়ি একটা পাঁকাটি টেনে নিয়ে সে জলের ভিতর গিয়ে নামে। তারপর যখনই কারুর সাড়া পেয়েছে, তখনই কুয়োর ধার ধরে জলের তলায় ডুব মেরে, ওই ফাঁপা পাঁকাটির সামান্য অংশ জলের উপরে জাগিয়ে রেখে, মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালিয়েছে!'

কুমার বললে, 'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করে আমাদের ভারি ফাঁকি দিলে! এখন ড্রাগন মার্কা দলের বাকি লোকগুলোর সন্ধান পাওয়া আর সহজ হবে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, হয়ত এই লোকটাই হচ্ছে ড্রাগন মার্কা দলের সর্দার! অন্তত

এই লোকটাই যে কলকাতায় তিন-তিনটে নরহত্যা করেছে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন শেষ হল বটে, কিন্তু আমার আশা এখনও সফল হয়নি। পূর্ব মহাসাগরে জাহাজ ভাসিয়ে আমি এখন যেতে চাই সেই অমরদের দ্বীপে, যেখানে শত শত অপূর্ব বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে বাঁ হাত রেখে, মাথার টাকের উপরে ডান হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হুম! আমি সেখানে যেতে রাজি নই।'

অমৃত-দ্বীপ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

শত্রুর উপরে শত্রু

জাহাজ ভেসেছে নীল জলে। এ জাহাজ একেবারেই তাদের নিজস্ব। অমৃত দ্বীপে যাবার জন্য জলপথটাই তাদের ম্যাপে আঁকা ছিল। সেই ম্যাপ দেখেই বোঝা যায়, কোনও বাণিজ্য-তরি বা যাত্রীজাহাজই ওই দ্বীপে গিয়ে লাগে না, 'চার্টে' ওই দ্বীপের কোনও উল্লেখই নেই।

কাজেই বিমল ও কুমারের প্রস্তাবে একখানা গোটা জাহাজই 'চার্টার' বা ভাড়া করা হয়েছে। এটাও তাদের পক্ষে নতুন নয়। কারণ এইরকম একখানা গোটা জাহাজ ভাড়া করেই তারা আর একবার 'লস্ট আটলান্টিস'কে পুনরাবিষ্কার করেছিল।

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার একরকম জোর করেই তাদের সঙ্গে টেনে এনেছে।

কাজে কাজেই তাদের পুরাতন ভৃত্য ও দস্তুরমত অভিভাবক রামহরি যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেও অন্যান্য বারের মতো এবারেও শেষ পর্যন্ত সঙ্গ নিতে ছাড়েনি এবং এমন ক্ষেত্রে তাদের চির অনুগত চতুষ্পদ যোদ্ধা বাঘাও যে সঙ্গে সঙ্গে লাঙুল আস্ফালন করে আসতে ছাড়বে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাদের পুরনো দলের মধ্যে কেবল বিনয়বাবু আর কমলকে এবারে সঙ্গীরূপে পাওয়া গেল না। বিনয়বাবু এখন ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কুইনিন ও আদার কুচির সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং কমল দেবে এবার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা।

জাহাজখানির নাম 'লিটল ম্যাজেস্টিক'। আকারে ছোটো হলেও যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এর মধ্যে চমৎকার সাজানো-গুছানো 'লাউঞ্জ', 'ডাইনিং সেলুন', 'প্রমেনেড ডেক' ও 'পাম কোট' প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। এরকম জাহাজ 'চার্টার' করা বহু ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বিমল ও কুমার যে অত্যন্ত ধনবান একথা সকলেই জানেন। তার উপরে জয়ন্তও বিনা পয়সায় অতিথি হতে রাজি হয়নি এবং সেও রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

জাহাজ তখন টুংহাই বা পূর্বসাগর প্রায় পার হয়ে রিউ-কিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উপরে, নিচে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অনন্ত নীলিমা—কাছে চঞ্চল, দূরে প্রশান্ত।

এই নীলিমা জগতে এখন নূতন বর্ণ সৃষ্টি করছে নিম্নে শুধু শুভ্র ফেনার মালা এবং শূন্যে শুভ্র সাগর-বিহঙ্গের দল। প্রকৃতির রঙের ডালায় এখন আর কোনও রং নেই।

প্রাকৃতিক সঙ্গীতেও এখানে নব নব রাগিণীর ঝঙ্কার নেই। না আছে উচ্ছ্বসিত শ্যামলতার মর্মর, না আছে গীতকারী পাখিদের সুরের খেলা, বইছে কেবল হু হু শব্দে দুরন্ত বাতাস এবং জাগছে কেবল আদিম সাগরের উচ্ছল কল কল মন্ত্র—এ দুই ধ্বনিরই সৃষ্টি পৃথিবীর প্রথম যুগে, যখন সবুজ গাছ আর গানের পাখির জন্মই হয়নি।

খোলা 'প্রমেনেড ডেকে'-র উপরে পায়চারি করতে করতে মানিক বললে, 'আমাদের সমুদ্র যাত্রা শেষ হতে আরও কত দেরি বিমলবাবু?'

বিমল বললে, 'আর বেশি দেরি নেই। চার ভাগ পথের তিন ভাগই আমরা পার হয়ে এসেছি। ম্যাপখানা আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। আরও কিছু দূর এগুলেই বোনিন দ্বীপপুঞ্জের কাছে গিয়ে পড়ব। তাদের বাঁয়ে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে প্রায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। তারপরই অমৃত দ্বীপ।

মানিক বললে, 'দ্বীপটি নিশ্চয়ই বড়ো নয়! কারণ তাহলে নাবিকদের 'চার্টে' তার উল্লেখ থাকত! এখানকার সমুদ্রে এমন অজানা ছোটো ছোটো দ্বীপ দেখছি তো অসংখ্য। অমৃত দ্বীপকে আপনি চিনবেন কেমন করে?'

—'ম্যাপে অমৃত দ্বীপের ছোট্ট একটা নকশা আছে, আপনি কি ভালো করে দেখেননি? সে দ্বীপের প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চারিপাশই পাহাড় দিয়ে ঘেরা—পাহাড় কোথাও কোথাও দেড় দুই হাজার ফুট উঁচু। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দ্বীপের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের উপরে আছে ঠিক পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। সবচেয়ে উঁচু শিখরের উচ্চতা দু'হাজার তিনশ ফুট। এরকম দ্বীপ দূর থেকে দেখলেও চেনা শক্ত হবে না।'—বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল চোখে দূরবিন লাগিয়ে সমুদ্রের পশ্চিমদিকে তাকিয়ে কী দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আচ্ছা বিমলবাবু, আমরা যাচ্ছি তো পূর্বদিকে! অথচ আজ ক'দিন ধরেই আমি লক্ষ করছি, আপনি যখন তখন চোখে দূরবিন লাগিয়ে পশ্চিমদিকে কী যেন দেখবার চেষ্টা করছেন? এর মানে কী?'

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে মুখ খুললে, 'এর মানে আমি আপনাকে বলতে পারি। বিমলবাবু দেখছেন আমাদের পিছনে কোনও শত্রু জাহাজ আসছে কিনা!'

—'এখানে আবার শত্রু আসবে কে?'

—'কেন, কলকাতাকে যারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছিল, আপনি এরই মধ্যে তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?'

—'কী যে বলো তার ঠিক নেই! সে দল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।'

—'কেমন করে জানলেন?'

—'পালের গোদা কুপোকাত হলে দল কি আর থাকে?'

দূরবিন নামিয়ে বিমল বললে,'আমার বিশ্বাস অন্যরকম। সে দলের প্রত্যেক লোকই মরিয়া, তারা সকলেই অমৃত দ্বীপে যাবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ওই দ্বীপের ঠিকানা তারা জানে না, কারণ ম্যাপখানা আছে আমাদের হাতে। আমরা যে তাদের দেশের কাছ দিয়ে অমৃত দ্বীপে যাত্রা করেছি, নিশ্চয়ই এ সন্ধান তারা রাখে। যারা লাউ-ৎজুর মূর্তি আর ওই ম্যাপের লোভে সুদূর চিন থেকে বাংলা দেশে হানা দিতে পেরেছিল, তারা যে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না, একথা আমার মনে হয় না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, শেষ চেষ্টা মানে? আপনি কি বলতে চান, তাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জলযুদ্ধ হবে?'

—'আশ্চর্য নয়।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য নয় মানে? জলযুদ্ধ অমনি হলেই হল? আমাদের সেপাই কোথায়? কামান কোথায়? আমরা ঘুঁষি ছুড়ে লড়াই করব নাকি?'

কুমার হেসে বললে, 'কামান নাই বা রইল, আমাদের সকলের হাতে আছে অটোমেটিক বন্দুক। আর আমাদের সেপাই হচ্ছি আমরাই।'

সুন্দরবাবু অধিকতর উত্তেজিত হয়ে আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিকট স্বরে 'হুম' শব্দ করে মস্ত এক লাফ মেরে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে পড়লেন।

মানিক বললে, 'কী হল সুন্দরবাবু, কী হল? আপনার ভুঁড়িটা কি ফট করে ফেটে গেল?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'যাও, যাও! দেখতে যেন পাওনি, আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে! কুমারবাবু, আপনার ওই হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে এবার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আমাকে দেখলেই ও ব্যাটা কোত্থেকে ছুটে এসে ফোঁস করে আমার পায়ের ওপরে নিশ্বাস ফেলে কী শোঁকে, বলতে পারেন মশাই?'

মানিক বললে, 'আপনার পাদপদ্মের গন্ধ বাঘার বোধহয় ভালো লাগে।'—

—'ইয়ার্কি কোরো না মানিক, তোমার ইয়ার্কি বাঘার ব্যবহারের চেয়েও অভদ্র। ওই নেড়ে কুত্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, চললুম আমি এখান থেকে।'

সুন্দরবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হলেন, বাঘা বিলক্ষণ অপ্রতিভভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এ লোকটি যে তাকে দু চোখে দেখতে পারে না, এটা সে খুবই বোঝে। তাই বাঘার কৌতূহল হয়, সুন্দরবাবুকে কাছে পেলেই সে তাঁর পা শুঁকে দেখে। মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করবার এর চেয়ে ভদ্র উপায় পৃথিবীর কোনও কুকুরই জানে না।

পরদিন প্রভাতে 'ব্রেকফাস্টে'র পর বিমল ও কুমার জাহাজের ডেকে উঠে গেল। জয়ন্ত লেব্‌লাঁকের লেখা একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস নিয়ে 'লাউঞ্জে' গিয়ে আরাম করে বসল, মানিকও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্তি ভরে বললেন, 'জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখছি, বিমলবাবু আর কুমারবাবু অদৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক ছায়া দেখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, আর তোমরা গাঁজাখুরি ডিটেকটিভের গল্প নিয়েই বিভোর! কারুর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবার ফাঁক নেই!'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। মানিক বললে, 'আচ্ছা, এই রইল আমার বই! এখন প্রকাশ করুন আপনার প্রাণের কথা।'

সুন্দরবাবু নিম্নস্বরে বললেন, 'কথাটা কি জানো? এই অমৃত দ্বীপ, অমর লতা, জলে স্থলে চিরজীবী মানুষের অবাধ গতি, এসব কি তুমি বিশ্বাস করো ভায়া?'

—'আমার কথা ছেড়ে দিন। আগে বলুন, আপনার কী মত?'

—'হুম, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিমল আর কুমারবাবুর মাথায় তোমাদের চেয়েও বোধহয় বেশি ছিট আছে!'—বলেই সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—'হঠাৎ অমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?'

—'কী জানো ভায়া, প্রথমটা আমার কিঞ্চিৎ লোভ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সবই ভুয়ো! যা নয় তাই!'

—'কীসের লোভ সুন্দরবাবু?'

—'ওই অমর লতার লোভ আর কী! ভেবেছিলুম দু-একটা অমৃতফল খেয়ে যমকে কলা দেখাব। কিন্তু এখন যতই ভেবে দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমরা ছুটেছি মরীচিকার পিছনে, কেবল কাদা ঘেঁটেই ফিরে আসতে হবে।'

—'তাহলে আপনি কেবল অমর হবার লোভেই বিমলবাবুদের অতিথি হয়েছেন?'

—'না বলি আর কেমন করে? অমর হতে কে না চায়?'

—'অমর হওয়ার বিপদ কত জানেন?'

—'বিপদ?'

—'হাঁ। দু-একটার কথা বলি শুনুন। ধরুন, আপনি অমর হয়েছেন। তারপর কুমারবাবুর কুকুর বাঘা হঠাৎ পাগল হয়ে আপনাকে কামড়ে দিলে। তখন কী হবে?'

—'হুম, কী আবার হবে? আমি হাইড্রোফোবিয়া রোগের চিকিৎসা করাব!'

—'চিকিৎসায় রোগ যদি না সারে, তাহলে? আপনি অমর, সুতরাং মরবেন না। কিন্তু সারাজীবন—অর্থাৎ অনন্তকাল আপনাকে ওই বিষম রোগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।—অর্থাৎ সারা জীবন চেঁচিয়ে মরতে হবে পাগলা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে!'

—'তাই তো হে, এসব কথা তো আমি ভেবে দেখিনি!'

—'তারপর শুনুন। আপনি অমর হলেও দেহ বোধ করি অস্ত্রে অকাট্য হবে না। কেউ যদি খাঁড়া দিয়ে আপনার গলায় এক কোপ বসিয়ে দেয়, তাহলে কী মুশকিল হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি? আপনি অমর। অতএব হয় আপনার মুণ্ড, নয় আপনার দেহ, নয়ত ওদুটোই চিরকাল বেঁচে থাকবে! কিন্তু সেই কন্ধকাটা দেহ আর দেহহীন মুণ্ড নিয়ে আপনি অমরতার কী সুখ ভোগ করবেন?'

—'মানিক, তুমি কি ঠাট্টা করছ?'

—'মোটেই নয়! অমর হওয়ার আরও সব বিপদের কথা শুনতে চান?'

—'না, শুনতে চাই না। তুমি বড্ড মন খারাপ করে দাও। অমৃতফল পেলেও আমি আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ।'

জয়ন্ত এতক্ষণ কেতাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। এখন কেতাব সরিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, অমৃত দ্বীপের কথা হয়ত রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের শুকনো বৈজ্ঞানিক জগতে সরস রূপকথার বড়োই অভাব হয়েছে। সেই অভাব পূরণের কৌতূহলেই আমরা বেরিয়েছি অমৃত দ্বীপের সন্ধানে। সতুরাং অমরলতা না পেলেও আমরা

দুঃখিত হব না। অন্তত যে ক'দিন পারি রূপকথার রঙিন কল্পনায় মনকে স্নিগ্ধ করে তোলার অবকাশ তো পাব! আর ওরই মধ্যে থাকবে যেটুকু অ্যাডভেঞ্চার, সেইটুকুকে মস্ত বলেই মনে করব!'

এমন সময়ে একজন নাবিক এসে খবর দিলে, বিমল সবাইকে এখনই ডেকের উপরে যেতে বলেছে।

সকলে উপরে গিয়ে দেখলে, ডেকের রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে দূরবিন।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'বিমলবাবু কি আমাদের ডেকেছেন?'

বিমল ফিরে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখুন।'

পশ্চিমদিকে চেয়েই জয়ন্ত দেখতে পেলে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে এগিয়ে আসছে।

বিমল বললে, 'আমি খুব ভোরবেলা থেকেই ও জাহাজখানাকে লক্ষ করছি। প্রথমটা ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তারপরে বেশ বুঝলুম, ও আসছে আমাদেরই পিছনে। জানেন তো, এখানকার সমুদ্রে চিনে বোম্বেটেদের কী রকম উৎপাত! খুব সম্ভব, আমাদের শত্রুরা কোনও বোম্বেটে জাহাজের আশ্রয় নিয়েছে। দূরবিন দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও-জাহাজখানায় লোক আছে অনেক—আর অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে আমি আর কুমার পরামর্শ করেছি। কাপ্তেন সাহেব বললেন, জলে ওরা আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে না।'

—'তাহলে উপায়?'

—'দক্ষিণদিকে তাকিয়ে দেখুন।'

দক্ষিণদিকে মাইল দুয়েক তফাতে রয়েছে ছোট্ট একটি তরুশ্যামল দ্বীপ।

—'আমরা আপাতত ওই দ্বীপের দিকেই যাচ্ছি। আশা করি শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করবার আগেই আমরা ওই দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব। তারপর পায়ের তলায় থাকে যদি মাটি, আর একটা জুতসই স্থান যদি নির্বাচন করতে পারি, তাহলে এক হাজার শত্রুকেও আমি ভয় করি না। আপনার কী মত?'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি, আমরা আপনার সহচর মাত্র। আপনার মতই আমাদের মত।'

সুন্দরবাবু নীরস স্বরে বললেন, 'তাহলে সত্যি-সত্যিই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে?'

কুমার বললে, 'তাছাড়া আর উপায় কী? বিনাযুদ্ধে ওরা আমাদের মুক্তি দেবে বলে বোধ হয় না। তবে আশার কথা এই যে, আমরা ওদের আগেই ডাঙায় গিয়ে নামতে পারব।'

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, 'এর মধ্যে আশা করবার মতো কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই চিনে বোম্বেটে ব্যাটারাও তো দলে দলে ডাঙায় গিয়ে নামবে?'

—'ভুলে যাবেন না, আমরা থাকব ডাঙায়, গাছপালা বা ঢিপিঢাপা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আমাদের এই অটোমেটিক বন্দুকগুলোর সমুখ দিয়েই নৌকোয় করে ওদের ডাঙার উপরে উঠতে হবে। আমাদের এক একটা অটোমেটিক বন্দুক প্রতি মিনিটে কতগুলি বৃষ্টি করতে পারে জানেন তো? সাতশো! আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মারণাস্ত্র!'

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু এভাবে মানুষ খুন করে শেষটা আইনের পাকে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে না তো?'

কুমার হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, এ জায়গা হচ্ছে অরাজক। এই বোম্বেটেদের জলরাজ্যে একমাত্র আইন হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো।'

সুন্দরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম!'

বিমল তখন আবার চোখে দূরবিন লাগিয়ে শত্রুজাহাজের গতিবিধি লক্ষ করছিল। কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবিনের দরকার হয় না। খালি চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ডেকের উপরে দলে দলে চিনেম্যান ব্যস্ত, উত্তেজিত ভাবে এদিকে ওদিকে আনাগোনা বা ছুটোছুটি করছে!

হঠাৎ বিমল দূরবিন নামিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভয়চকিত।

বিমলের মুখ চোখে ভয়ের চিহ্ন! এটা যে অসম্ভব! কুমার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, 'কী হল বিমলবাবু, আপনার মুখ চোখ অমনধারা কেন?'

বিমল দূরবিনটা জয়ন্তের হাতে দিয়ে গম্ভীরস্বরে বললে, 'শত্রু জাহাজের পিছনে চেয়ে দেখুন, বোম্বেটেদের চেয়েও ভয়াবহ এক শত্রু আমাদের গ্রাস করতে আসছে! আমি এখন 'ব্রিজের' ওপরে কাপ্তেনের কাছে চললুম, আরও তাড়াতাড়ি ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই!'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'বোম্বেটের চেয়েও ভয়াবহ শত্রু? ও বাবা, বলেন কী?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরবাবু! এমন আর এক শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, যার নামে ভয়ে কাঁপে সারা দুনিয়া! তার সামনে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকও কোনও কাজে লাগবে না!'—এই বলেই বিমল জাহাজের 'ব্রিজে'র দিকে ছুটল দ্রুতপদে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সুন্দরবাবুর সাগরস্নান

চোখে দূরবিন লাগিয়ে জয়ন্ত যা দেখলে তা ভয়াবহই বটে!

বোম্বেটেদের জাহাজেরও অনেক পিছনে—বহু দূরে, আকাশ ও সমুদ্রের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। নিচে বিপুল মাথানাড়া দিয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, উন্মত্ত, বৃহৎ তরঙ্গের পর

তরঙ্গ—বলা চলে তাদের পর্বতপ্রমাণ! তারা লাফিয়ে উপরে উঠছে, আবার নামছে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে ফেনায় ফেনায় সেখানকার নীলিমাকে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে এগিয়ে আসছে উল্কার মতো তীব্রগতিতে! উপরে আকাশেরও রঙ হয়ে গেছে কালো মেঘে মেঘে ঘোর রাত্রির মতো অন্ধকার! বেশ বোঝা যায় জেগে উঠেছে সেখানে সর্বধ্বংসী আকস্মিক ঝঞ্ঝাবায়ু—যার মস্তকান্দোলনে দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে বাঁধনহারা নিকষ কালো মেঘের জটা এবং ঘনঘন পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে উথলে উঠছে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র!

ফিরে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে জয়ন্ত বললে, 'টাইফুন?'

কুমার খালি চোখেই সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ঘূর্ণাবর্ত।'

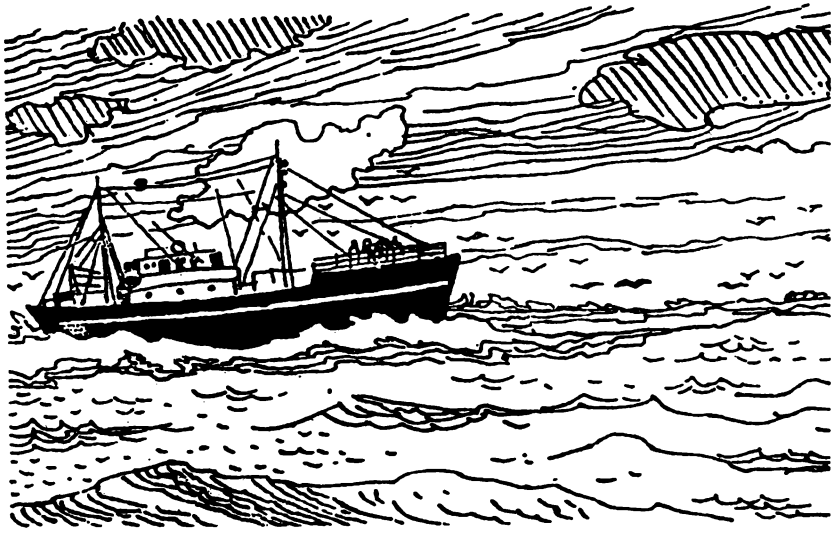

মানিক বললে, 'কিন্তু আমাদের এখানে তো একটুও বাতাস নেই, অসহ্য উত্তাপে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে!'

কুমার বললে, 'ওসব টাইফুনের পূর্বলক্ষণ। এ অঞ্চলে টাইফুন জাগবার সম্ভাবনা ওই লক্ষণ থেকেই জানা যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, সমুদ্রযাত্রা আমার এই প্রথম, এর আগে টাইফুন কখনও দেখিনি। কিন্তু শুনেছি চিনা-সমুদ্রে টাইফুনের পাল্লায় পড়ে ফি বৎসরেই অনেক জাহাজ অতলে তলিয়ে যায়।'

—'সেইজন্যই তো ওকে আমরা বোম্বেটেদের চেয়েও ভয়ানক বলে মনে করছি! বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এখন আমাদের একমাত্র আশা ওই দ্বীপ। যদি টাইফুনের আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি! হয়ত পারবও,

কারণ আমরা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই দেখুন, আমাদের জাহাজের গতি আরও বেড়ে উঠেছে!'

এতক্ষণ সুন্দরবাবু ছিলেন ভয়ে হতভম্বের মতো। এইবারে মুখ খুলে তিনি বলে উঠলেন, 'হুম! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজ এখনও দূরে রয়েছে, সে কি টাইফুনকে ফাঁকি দিতে পারবে?'

কুমার বললে, 'ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

মানিক বললে, 'কী আশ্চর্য দৃশ্য! সমুদ্রের আর সব দিক শান্ত, কেবল একদিকেই জেগেছে নটরাজের প্রলয়-নাচন!'

কুমার বললে, 'সাধারণ 'সাইক্লোনে'র মতো টাইফুন বহু দূর ব্যাপে ছোটে না, এইটেই তার বিশেষত্ব! কিন্তু ছোটো হলেও তার জোর ঢের বেশি—যেটুকু জায়গা জুড়ে আসে, তার ভিতরে পড়লে আর রক্ষে নেই!'

দূর থেকে 'মেগাফোনে' বিমলের উচ্চ কণ্ঠস্বর জাগল—'কুমার, সবাইকে নিয়ে তুমি ডাঙায় নামবার জন্যে প্রস্তুত হও! কেবল নিতান্ত দরকারি জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও।'

সবাই কেবিনের দিকে ছুটল। তারপর তাড়াতাড়ি কতকগুলো ব্যাগ ভর্তি করে আবার তারা যখন ডেকের উপরে এসে দাঁড়াল, দ্বীপ তখন একেবারে তাদের সামনে।

মানিক বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'সমুদ্র যে এখানে প্রকাণ্ড এক নদীর মতো হয়ে দ্বীপের ভিতর ঢুকে গিয়েছে! এ যে এক অস্বাভাবিক বন্দর!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, আমাদের জাহাজও এই বন্দরে ঢুকছে!'

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'জয় মা কালী! আমরা বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি!'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, আরও ভালো করে মা কালীকে ডাকুন সুন্দরবাবু! কারণ তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবী, আর বোম্বেটেরাও এই বন্দরে আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই।'

সুন্দরবাবু দুই হাত জোড় করে মা কালীর উদ্দেশে চক্ষু মুদে তিনবার প্রণাম করে বললেন, 'মানিক, এ সময়ে আর ভয় দেখিও না, মা জগদম্বাকে একবার প্রাণভরে ডাকতে দাও।'

কুমার ফিরে দেখলে, শত্রুরাও দ্বীপ লক্ষ করে প্রাণপণে জাহাজ চালিয়েছে এবং দূরে তার দিকে বেগে তাড়া করে আসছে সাগরতরঙ্গ তোলপাড় করে মূর্তিমান মহাকালের মতো সুভীষণ ঘূর্ণাবর্ত!

দ্বীপের ভিতরে ঢুকে সমুদ্রের জল আবার মোড় ফিরে গেছে, কাজেই জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে মোড় ফিরল। তখন দ্বীপের বনজঙ্গল ঠিক যবনিকার মতোই বাহির-সমুদ্র, ঘূর্ণাবর্ত ও বোম্বেটে-জাহাজের সমস্ত দৃশ্য একেবারে ঢেকে দিলে।

এমন সময়ে বিমল দৌড়ে সকলের কাছে এসে বললে, 'জয়ন্তবাবু, কাপ্তেন সাহেব

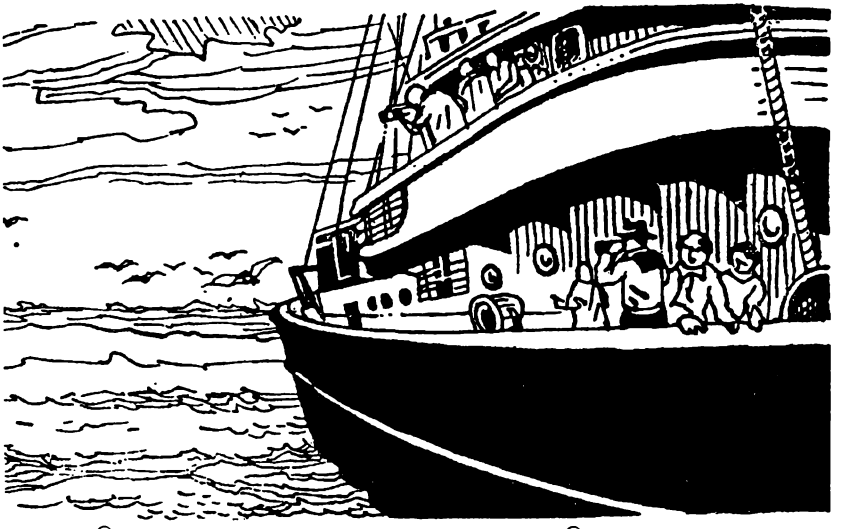

কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবিনের দরকার হয় না।

বললেন এখানকার জল গভীর নয়, জাহাজ আর চলবে না। নাবিকরা নৌকাগুলো নামাচ্ছে, আমাদেরও জাহাজ থেকে নামতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন?'

—'বোম্বেটেরাও এখানে আসছে, তারা আমাদের চেয়ে দলে ঢের ভারী। আমরা ডাঙায় না নামলে তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারব না।'

সুন্দরবাবু আবার মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তাহলে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে?'

—'নিশ্চয়ই। টাইফুন আর বোম্বেটে—আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হবে দুই শত্রুর সঙ্গে! ওই দেখুন, 'সেলর'রা এরই মধ্যে 'লাইফবোট' ভাসিয়ে ফেলেছে। ওই শুনুন, 'মেগাফোনে' কাপ্তেন সাহেবের গলা। তিনি আমাদের নৌকায় তাড়াতাড়ি নামতে বলছেন—নইলে ঝোড়ো ঢেউ এখানেও এসে পড়তে পারে! চলুন, আর দেরি নয়। রামহরি, তুমি বাঘাকে সামলাও!'

লাইফবোট যেখানে থামল, সেখানে জলের ধার থেকেই একটি ছোট্ট পাহাড় প্রায় একশ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

বিমল বললে, 'এইখানেই বন্দুক নিয়ে আমরা সবাই পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করব। বোম্বেটেরা আমাদের বন্দুক এড়িয়ে নিতান্তই যদি ডাঙায় এসে নামে তাহলে অবস্থা বুঝে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত এই পাহাড়টাই হবে আমাদের দুর্গ। কী বলো কুমার, কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত বললে, 'সাধু প্রস্তাব। কিন্তু বিমলবাবু, একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন?'

—'হুঁ, ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ, সমুদ্রের হু-হু হুংকার!'

কুমার বললে, 'কেবল তাই নয়—দূর থেকে যেন অনেক মানুষের কোলাহলও ভেসে আসছে!'

রামহরি বললে, 'এতক্ষণ চারিদিক গুমোট করে ছিল, এখন জোর হাওয়ায় এখানকার গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে! ঝড় বোধহয় এল!'

মানিক বললে, 'ঝড় এল, কিন্তু বোম্বেটে-জাহাজ কোথায়?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম!'

বাঘা বললে, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

বিমল বললে, 'তবে কি বোম্বেটেগুলো ঝড়ের খপ্পরেই পড়ল? দাঁড়াও, দেখে আসি'—বলেই সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

রামহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'ওপরে উঠো না খোকাবাবু, ওপরে উঠো না! বেশি ঝড় এলে উড়ে যাবে!'

কিন্তু বিমল মানা মানলে না। পাহাড়ের প্রায় মাঝ বরাবর উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে একদিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত স্বরে বললে, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! কুমার, কুমার শিগগির দেখে যাও।'

বিপুল কৌতূহলে সবাই দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল—একমাত্র সুন্দরবাবু ছাড়া। তাঁর বিপুল ভুঁড়ি উর্ধ্বমার্গের উপযোগী নয়।

বাস্তবিকই সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। যে বিষম টাইফুনের ভয়ে তারা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে ভয়ঙ্কর দ্বীপের দিকে না এসে যেন পাশ কাটিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে অন্যদিকে হু হু করে! দ্বীপের দিকে এসেছে খানিকটা উদ্দাম হাওয়ার ঝটকা মাত্র, কিন্তু টাইফুন নিজে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার শূন্যে দুলছে নিরন্ধ্র অন্ধকার—নিচে কেবল অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গদলের হিন্দোল! আর ভেসে ভেসে আসছে প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্তের বিকট চিৎকার, গম্ভীর জল-কল্লোল, বহু মানব-কণ্ঠের আর্তনাদ!

কুমার অভিভূত স্বরে বললে, 'এমন বিচিত্র ঝড় আর কখনও দেখিনি! কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজখানা কোথায় গেল?'

বিমল বললে, 'ওখানকার অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দেখবার উপায় নেই! তবে মানুষের গোলমাল শুনে বোধ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও কোথায় ছুটে চলেছে, হয়ত সমুদ্র এখনই তাকে গিলে ফেলবে!'

রামহরি সানন্দে বললে, 'জয় বাবা পবনদেব! আজ তুমিই আমাদের সহায়!'

খানিকক্ষণ পরেই চারিদিক আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—শূন্যে নেই অন্ধ মেঘের কালিমা, সমুদ্রে নেই বিভীষণের তাণ্ডবলীলা। একটু আগে কিছুই যেন হয়নি, এমনিভাবেই মুখর নীলসাগর আবার বোবা নীলাকাশের কাছে আদিম যুগের জীবহীনা ধরিত্রীর পুরাতন গল্প বলা শুরু করলে।

সূর্য সাগর-স্নানে নেমে অদৃশ্য হল, কিন্তু আকাশ আর পৃথিবীতে এখনও আলো যেন ধরছে না! দূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি ফিরে আসছে দ্বীপের দিকে।

পাহাড়ের উপরে বসে সবাই বিশ্রাম করছিল। সেখান থেকে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার পরিস্থানের মতো। নানাজাতের গাছেরা সেখানে সঙ্গীতময় সবুজ উৎসবে মেতে আছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাম জাতীয় গাছেরাই।

কোথাও পাহাড়ের আনন্দাশ্রুধারার মতো ঝরে পড়ছে ঠিক যেন একটি খেলাঘরের ঝরনা। রূপালি ফিতার মতো শীর্ণ। সকৌতুকে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে নিচেকার সুন্দরশ্যাম জমির উপরে—যেখানে শ্যামলতাকে সচিত্র করে তুলেছে রং বেরঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের দল। খানিক পরেই রাত হবে, তারার সভায় চাঁদ হাসবে, আর নতুন জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো মেখে স্বপ্নবালারা আসবে যেন সেই ফুলদার ঘাস-গালিচার উপরে বসে ঝরনার কলগান শুনতে।

বিমল এইসব দেখতে দেখতে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'শহর আর সভ্যতা ছেড়ে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই দেখি, রেখায় রেখায় লেখা আছে সৌন্দর্যের কবিতা। শহরে বসে হাজার টাকা খরচ করে যতই ড্রয়িংরুম সাজাও, কখনই জাগবে না সেখানে রূপের এমন ঐশ্বর্য, লাবণ্যের এত ছন্দ! শহরে বসে আমরা যা করি তা হচ্ছে আসলে সৌন্দর্যের 'ক্যারিকেচার' মাত্র, কাগজের ফুলের মতো অসার! তাই তো আমি যখন তখন কুৎসিত শহর আর কপট সভ্যতাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চাই সৌন্দর্যময় অজানা বিজনতার ভিতরে। রামহরি জানে, আমরা দুরন্ত, ডানপিটে, খুঁজি খালি অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তুমি জানো কুমার, এ কথা সত্য নয়! চোখের সামনে রয়েছে যে অপরূপের নাট্যশালা, আমাদের কল্পনা কি এখানে অভিনয় করতে ভালোবাসে না? আমরা কি কেবল ঘুষোঘুষি করতে আর বন্দুক ছুড়তেই জানি, কবিতা পড়তে পারি না?'

কুমার বললে, 'আমার কী মনে হচ্ছে জানো বিমল! ওই ফুলের বনে, ওই ঝরনার ধারে একখানি পাতার কুঁড়েঘর গড়ে সত্যিকার কবির জীবন যাপন করি! চারিদিকে বনের গান, পাখির তান, বাতাসের ঝঙ্কার, মৌমাছির গুঞ্জন, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির রঙের খেলা, দিনে মাঠে মাঠে রোদের কাঁচা সোনা, রাতে গাছে গাছে চাঁদনির ঝিলিমিলি, আর এরই মধ্য থেকে সর্বক্ষণ শোনা যায় অনন্ত সমুদ্রের মুখে মহাকাব্যের আবৃত্তি! কলকাতার পায়রার খোপে আর আমার ফিরতে ইচ্ছে করে না!'

জয়ন্ত বললে, 'পৃথিবীকে আমার যখন বড়ো ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশি বাজাতে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সঙ্গে আছে বাঁশির বদলে বন্দুক। বন্দুকের নল থেকে তো গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।'

মানিক বললে, 'কেন জয়ন্ত খুশি হলেই তো তুমি আর একটি জিনিস ব্যবহার করো! নস্যির ডিবেটাও কি তুমি সঙ্গে আননি?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মানিক, নস্যির ডিবেটা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কবিতা

কোনওদিন ডিবের ভেতরে নস্যির সঙ্গে বাস করে না। আজ আমাদের সামনে দেখছি যে মূর্তিমান সঙ্গীতকে, তার নাচের ছন্দ জাগতে পারে কেবল আমার বাঁশির মধ্যেই।'

সুন্দরবাবু ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে দোদুল্যমান ভুঁড়ির বিদ্রোহতাকে আমলে না এনেই পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের কবিত্ব চর্চা আর তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিরক্ত স্বরে বললেন, 'হুম! পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গাছগুলো নড়ে-চড়ে শব্দ করছে, কতকগুলো পাখি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে, আর মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, এসব নিয়ে এত বড়ো বড়ো কথার কিচ্ছু মানে হয় না। চলো হে রামহরি, আমরা সরে পড়ি!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু যাবেন কোথায়? জাহাজে?'

—'না। গরমে ছুটোছুটি করে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়েছে, এখানকার পাহাড়ের তলায় সমুদ্রের ঠান্ডা জলে বেশি ঢেউ নেই দেখছি। একটু সমুদ্রস্নান করবার ইচ্ছে হয়েছে। রামহরি কী বলো?'

রামহরি বললে, 'বেশ তো, চলুন না! আমিও একবার চান করে নেই গে। আয় রে বাঘা!'

—'কিন্তু তোমার বাঘাকে আগে আগে যেতে বলো রামহরি, নইলে ও আবার হয়ত আমার পা শুঁকতে আসবে।'

রামহরি বললে, 'বাঘা, সাবধান! আবার যেন আমাদের সুন্দরবাবুর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে যেও না। যাও, এগিয়ে যাও।'

বাঘার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, সুন্দরবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে তার মনে আর কিছুমাত্র বাসনা আছে। কিন্তু সে রামহরির কথা বুঝে ল্যাজ উঁচু করে আগের দিকে দিলে লম্বা এক দৌড়।

রামহরির সঙ্গে সুন্দরবাবু যখন পাহাড় থেকে নেমে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে।

রামহরি বললে, 'শিগগির দুটো ডুব দিয়ে নিন, আলো থাকতে থাকতেই আমাদের আবার জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে।'

—'কিছু ভয় নেই রামহরি, আজ পূর্ণিমা। আজ অন্ধকার জব্দ!'

—'ওই শুনুন, কু দিয়ে জাহাজ আমাদের ডাকছে! ওই দেখুন, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁরা সবাই নেমে আসছেন!'

সুন্দরবাবু জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, 'বাঃ, তোমাদের বাঘা দেখছি যে দিব্যি সাঁতার কাটছে। আমিও একটু সাঁতার দিয়ে নিই! কী চমৎকার ঠান্ডা জল! দেহ যেন জুড়িয়ে গেল!'

জল কেবল ঠান্ডা নয়, নীলিমা-মাখানো সুন্দর, স্বচ্ছ। তলাকার প্রত্যেক বালুকণাটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এখানকার জলের মধ্যে কোনও অজানা রহস্য নেই। কাজেই সুন্দরবাবু মনের সুখে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

দূর থেকে মানিক চিৎকার করে বললে, 'উঠে আসুন সুন্দরবাবু, অত আর সাঁতার কাটতে হবে না! এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে!'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'হুম, কী বললে? হাঙর? তাই তো হে, একথা তো এতক্ষণ মনে হয়নি! বাব্বাঃ! দরকার নেই আমার সাঁতার কেটে!'—তিনি তীরের দিকে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলেন জলের ভিতর থেকে প্রাণপণে কে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলে!

—'ওরে বাবা রে, হুম—হুম। হাঙর, হাঙর। জয়ন্ত, মানিক, রামহরি! আমাকে হাঙরে ধরেছে—হু-হু-হু-হু-হুম!'

রামহরি একটু তফাতে ছিল। কিন্তু সেইখান থেকেই সে স্তম্ভিত নেত্রে দেখতে পেলে যে সুন্দরবাবুর দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, সুদীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি!

সুন্দরবাবু পরিত্রাহি চিৎকার করে বললেন, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! হাঙর নয়, এ যে একটা মানুষ! এ যে মড়া! ওরে বাবা, এ যে ভূত! এ যে আমাকে জলের ভিতরে টানছে—ও জয়ন্ত, ও মানিক!'

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক তীরের মতো পাহাড় থেকে নেমে এলো। ভূতের নামে রামহরি একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু তখন সে দুর্বলতা সামলে নিয়ে বেগে সাঁতার কেটে সুন্দরবাবুর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সর্বাগ্রে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল বাঘা—তার দুই চক্ষু জ্বলছে তখন তীব্র উত্তেজনায়!

—'আর পারছি না, একটা জ্যান্ত মড়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাঁচাও!'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

জীবন্ত মৃতদেহ

—'ডুবে মলুম, ডুবে মলুম, বাঁচাও!'—সুন্দরবাবু আবার একবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি বেশ অনুভব করলেন, দুখানা অস্থিচর্মসার, কিন্তু লোহার মতো কঠিন এবং বরফের মতো ঠান্ডা কনকনে বাহু তাঁকে জড়িয়ে ধরে পাতালের দিকে টানছে, ক্রমাগত টানছে!

দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারলেন না বটে, কিন্তু আবছা আবছা যেটুকু দেখতে পেলেন তাই-ই হল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সে হচ্ছে একটা মৃত মানুষের জীবন্ত মূর্তি, আর তার চোখ দুটো হচ্ছে মরা মাছের মতো।

রামহরি দুহাতে জল কেটে এগুতে এগুতে সভয়ে দেখলে, 'হুম' বলে বিকট এক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবু হুস করে ডুবে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে বাঘাও দিলে জলের তলায় ডুব।

ওদিকে বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিকও ততক্ষণে জলে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তাদের আর বেশিদূর এগিয়ে আসতে হল না, হঠাৎ দেখা গেল সুন্দরবাবু আবার ভেসে উঠে প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে আসছেন। বাঘাও আবার ভেসে উঠেছে!

রামহরি খুব কাছে ছিল। সে দেখতে পেলে, জলের উপরে খানিকটা রক্তের দাগ এবং বাঘার মুখও রক্তাক্ত।

ব্যাপারটা বুঝে তারিফ করে সে বললে, 'বাহাদুর বাঘা, বাহাদুর।'

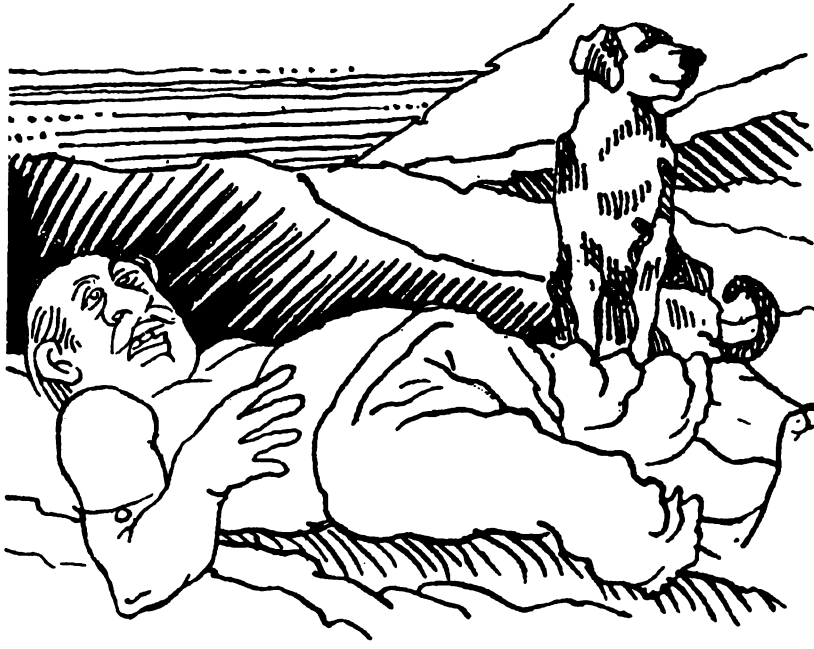

বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো

কিন্তু সেই আশ্চর্য ও অসম্ভব মূর্তিটার আর কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সকলে ডাঙার উপরে উঠল। সুন্দরবাবু আর রামহরি ও বাঘা ছাড়া সে বিকট মূর্তিটাকে আর কেউ দেখেনি সুতরাং আসল ব্যাপারটাও কেউ বুঝতে পারলে না।

বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'সুন্দরবাবু, আপনাকে কি হাঙরে ধরেছিল?'

কুমার বললে, 'না বিমল, তা হতে পারে না। হাঙরে ধরলে উনি অমন অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন না।'

বিমল বললে, 'হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু তবে কে ওঁকে জলের ভেতর আক্রমণ করতে পারে?'

সুন্দরবাবু বেদম হয়ে খালি হাঁপান। এখন তাঁর একটা 'হুম' পর্যন্ত বলবার শক্তি নেই। বাঘা গম্ভীর মুখে এসে সুন্দরবাবুর সর্বাঙ্গ শুঁকে বোধহয় পরীক্ষা করে দেখলে যে, তাঁর দেহ অটুট আছে কিনা! পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হল, কারণ ঘনঘন ল্যাজ নেড়ে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'এখানে জলের ভেতরে অক্টোপাস থাকে না তো?'

রামহরি বললে, 'কী বললেন?'

—'অক্টোপাস।'

—'তাকে কি মানুষের মতো দেখতে?'

—'মোটেই নয়। তোমাকে কতকটা বোঝাবার জন্যে বরং বলা যায়, তাকে দেখতে অনেকটা বিরাট ও অদ্ভুত মাকড়সার মতো। সমুদ্রের জলে তারা লুকিয়ে থাকে আর আটখানা পা দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধরে মাংস-রক্ত শুষে খায়!'

—'না বাবু, না! আপনি যে কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ারের কথা বললেন নিশ্চয়ই সেটা ভয়ানক, কিন্তু সুন্দরবাবুকে যে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে দেখতে মানুষের মতো!'

বিমল হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'কী যে বলো রামহরি! মানুষ কি জলচর জীব? জলের ভিতর থেকে আক্রমণ করে সে কি এতক্ষণ ধরে জলের তলাতেই ডুব মেরে বসে থাকতে পারে?'

মানিক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই বিশাল হ্রদের মতো জলরাশি একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজ আর লাইফবোট ছাড়া তার উপরে আর কোনও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। বিমল ঠিক কথাই বলেছে। সুন্দরবাবুকে যে আক্রমণ করেছিল নিশ্চয় সে মানুষ নয়!

রামহরি দৃঢ়স্বরে বললে, 'না খোকাবাবু, আমি মিছে কথা বলিনি। সে মানুষ কিনা জানি না, কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতো। সুন্দরবাবুর কোমর সে নিচে থেকে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিল। কাচের মতো পরিষ্কার জলে তার হাত, পা, মুখ, দেহ বেশ দেখা যাচ্ছিল।'

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ-ছাড়া হল সমাপ্ত। দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসে তিনি বললেন, 'হুম। রামহরি কিচ্ছু ভুল বলছে না। আমাকে ধরেছিল একটা জ্যান্ত মরা-মানুষ!'

—'জ্যান্ত মরা-মানুষ?'

—'হ্যাঁ, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি—একেবারে আসল মড়া! আমি তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছি—একেবারে কনকনে অস্বাভাবিক ঠান্ডা! কিন্তু সে জ্যান্ত, তার হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মরা মাছের মতো স্থির দুই চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল—বাপ রে, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!'

রামহরি বললে, 'জ্যান্ত মড়া মানেই হচ্ছে, পিশাচ। সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই কোনও পিশাচের

পাল্লায় পড়েছিলেন! ভাগ্যে আমাদের বাঘা ছিল, তাই এ যাত্রা কোনওগতিকে বেঁচে গেলেন! বাঘার কাছে পিশাচও জব্দ।'

সুন্দরবাবু কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুম। বাঘা, আয় রে, আমার কাছে আয়! তুই যে কী রত্ন, এতদিনে আমি চিনতে পারিনি। এবার থেকে আর তোকে আমি কিছু বলব না, তোকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেব। খাসা কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি নিশ্চয় মৎস্যনারী আর নাগকন্যার গল্প শুনেছেন?'

সুন্দরবাবু বেশ বুঝলেন মানিকের মাথায় কোনও নতুন দুষ্টু বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাঁর পিছনে লাগা হচ্ছে তার চিরকেলে স্বভাব। বললেন, 'হু, শুনেছি। কী হয়েছে তা?'

—'আমার বোধহয় কোনও মৎস্যনারী কি নাগকন্যা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

একটু গরম হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে কী করত?'

—'বিয়ে করত। আপনাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল কিনা।'

একেবারে মারমুখো হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'চোপরাও মানিক, চোপরাও! তোমার মতো ত্যাঁদোড় আমি জীবনে আর দেখিনি, আমার হাতে একদিন তুমি মার খাবে জেনো।'

বিমল গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

—'কিছু না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, সুন্দরবাবুর চোখের ভ্রম হয়েছে।'

—'সুন্দরবাবুর আর রামহরির—দুজনেরই একসঙ্গে চোখের ভ্রম হল?'

—'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার ফলেই আজ আমরা এখানে এসেছি। সেই মামলাটার কথা ভেবে দেখুন। লোকের পর লোক দেখতে লাগল, শূন্যপথে ছায়ামূর্তির মতো কে উড়ে যায়। তারা সকলেই কি ভুল দেখেনি?... হুঃ, জ্যান্ত মড়া। পিশাচ! সে আবার বাস করে জলের তলায়! বলেন কী মশাই, এসব কি বিশ্বাস করবার কথা?'

—'বিশ্বাস আপনাকে কিছুই করতে বলছি না জয়ন্তবাবু! কিন্তু আমার মত হচ্ছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে কোনও অলৌকিক বা অসাধারণ রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। জীবনে অনেকবারই আমাকে আর কুমারকে এমন সব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতে কি, অলৌকিক ব্যাপার দেখে দেখে এখন আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। আর এটাও ভুলবেন না যে, আমরা সকলেই চলেছি কোনও এক অজানা দেশে, অলৌকিক দৃশ্য দেখবারই আশায়। এখন আমরা সেই অমৃত দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। আজ হয়ত এইখান থেকেই অলৌকিক রহস্যের আরম্ভ হল! ওই শুনুন, জাহাজ থেকে আবার আমাদের ডাকছে, সন্ধ্যাও হয়েছে, আর এখানে নয়।'

'পাম' জাতীয় একদল গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদের মুখ উঁকি মারছিল সকৌতুকে। জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্রই জ্যোৎস্নার রূপলেখা পড়েছে ছড়িয়ে এবং দিনের সঙ্গে রাতের ভাব হয়েছে দেখে অন্ধকার আজ যেন ভয়ে নিজ-মূর্তি ধারণ করতে পারছে না।

সকলে একে একে 'লাইফবোটে' গিয়ে উঠল। হ্রদের স্বচ্ছ জল ভেদ করে চাঁদের আলো

নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেখানে যাকে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেলে না। তবু একটা ভয়াবহ অসম্ভবের সম্ভাবনা হ্রদের নীলিমাকে করে রেখেছিল রহস্যময়।

চাঁদের বাতি নিবিয়ে দিয়ে এল অরুণ প্রভাত। মহাসাগরকে আলোময় করে সে পূর্বাকাশে এঁকে দিল তরুণ সূর্যের রক্ততিলক। জাহাজ বেগে ছুটেছে অমৃত দ্বীপের উদ্দেশে।

ডেকের উপরে 'মর্নিং ওয়াক' করতে করতে সুন্দরবাবু জাহাজের রেলিং ধরে একবার দাঁড়ালেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখ দুটো উঠল বেজায় চমকে। উত্তেজিত স্বরে তিনি ডাকলেন, 'জয়ন্ত! মানিক! বিমলবাবু! কুমারবাবু!'

সবাই এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সুন্দরবাবুর জোর তলবে সেখানে ছুটে এল।

সুন্দরবাবু বিবর্ণমুখে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

জাহাজের পাশেই নীলজলে ভাসছে মানুষের একটা রক্তহীন সাদা মৃতদেহ। তার ভাবহীন, নিষ্পলক, বিস্ফারিত দুটো চোখ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাহাজের দিকে। তার আড়ষ্ট দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু কী আশ্চর্য, স্রোতের বিরুদ্ধে বেগবান জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেসে চলেছে সোঁ সোঁ করে।

হতভম্ব মুখে জয়ন্ত বললে, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

বিমল কিছু বললে না, রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে আরও ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু তিক্তস্বরে বললেন, 'ওই কি তোমার মৎস্যনারী? দেখেছো, ওটা একটা বুড়ো চিনেম্যানের মড়া? ওই-ই কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল!'

মানিক বললে, 'নিশ্চয় ও বোম্বেটে জাহাজের যাত্রী ছিল, কালকের 'টাইফুনে' জলে ডুবে মারা পড়েছে।'

—'হুম, মারা পড়েছেই বটে। তাই স্রোতের উলটোমুখে এগিয়ে চলেছে কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে।'

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'সকলে রাম নাম করো, রাম নাম করো—রাম নাম করো। ও পিশাচ, আমাদের রক্ত খেতে চায়!'

কুমার বললে, 'বিমল, 'তাও' সাধুদের কথা স্মরণ কর। যারা 'সিয়েন' বা অমর হয়, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ! আমরা হয়ত অমৃত দ্বীপের কোনও 'সিয়েন'কেই আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি।'

জয়ন্ত বললে', আজকের যুগে ওসব আজগুবি কথা মানি কী করে?'

বিমল বললে, 'না মেনেও তো উপায় নেই জয়ন্তবাবু। ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার সময়েই আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিইনি যে কাশীর ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী কত শত বৎসর বেঁচেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। সময়ে সময়ে তাঁরও দেহ বৎসরের পর বৎসর ধরে গঙ্গাজলে ভেসে ভেসে বেড়াত। ত্রৈলঙ্গ্য স্বামীর কথা তো পৌরাণিক কথা নয়, আধুনিক যুগেরই কথা।'

—'বিমলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, আর চোখের

সামনে যা স্পষ্ট দেখছি তাকে উড়িয়ে দেবার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছি! এও কি সম্ভব! বেগবান অথচ আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ ছোটে আধুনিক কালের জাহাজের সঙ্গে! এরপরেও আর অবিশ্বাস করব কীসে? এখন অচল পাহাড়কেও চলতে দেখলে আমি বিস্মিত হব না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওসব তর্ক থ্রো করুন মশাই, থ্রো করুন। আমার কথা হচ্ছে, 'সিয়েন'রা কি মানুষের মাংস খায়? নইলে ও কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল কেন?'

বিমল বললে, 'বোধহয় ও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। ও তাই বাধা দিতে চায়, আমাদের আক্রমণ করতে চায়!'

—'তাই নাকি? হুম!'—বলেই সুন্দরবাবু এক ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন।

কুমার বললে, 'আপনি কী করতে চান সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি দেখতে চাই, অমৃত দ্বীপে যারা থাকে তারা কেমন ধারা অমর? আমি দেখতে চাই, ওই জ্যান্ত মড়াটা বন্দুকের গরমাগরম বুলেট হজম করতে পারে কিনা?'

রামহরি সভয়ে বললে, 'পিশাচকে ঘাঁটাবেন না বাবু, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না। কীসে কী হয় বলা তো যায় না!'

—'আরে, রেখে দাও তোমার পিশাচ-ফিশাচ! পুলিশের কাজই হচ্ছে যত নরপিশাচ বধ করা।'—এই বলেই সুন্দরবাবু বন্দুক তুলে সেই ভাসন্ত দেহটার দিকে লক্ষ স্থির করলেন।

ফল কী হয় দেখবার জন্যে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল, সাগ্রহে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

দ্বীপে

সুন্দরবাবু তাঁর 'অটোমেটিক' বন্দুক ছুড়লেন—এক সেকেন্ডের মধ্যে সেই সাংঘাতিক আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হুড়-হুড় করে বয়ে গেল অনেকগুলো গুলির ঝড়।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের বুকে ভাসন্ত সেই আশ্চর্য জীবিত বা মৃত দেহটা জলের তলায় অদৃশ্য হল!

সুন্দরবাবু বন্দুক নামিয়ে বললেন, 'হুম। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। ব্যাটার গা নিশ্চয় ঝাঁজরা হয়ে গেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনে হয় গুলি লাগবার আগেই ও আপদটা সমুদ্রে ডুব মেরেছে!'

বিমল বললে, 'আমারও সেই বিশ্বাস।'

কুমার বললে, 'মড়াটা খালি জ্যান্ত নয়, বেজায় ধূর্ত!'

মানিক বললে, 'ও হয়ত এখন ডুব-সাঁতার দিচ্ছে!'

রামহরি বললে, 'রাম, রাম, রাম, রাম। পিশাচকে ঘাঁটিয়ে ভালো কাজ হল না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'অমরই বলো, জ্যান্ত মড়াই বলো, আর পিশাচই বলো, অটোমেটিক বন্দুকের কাছে কোনও বাবাজির কোনওই ওস্তাদি খাটবে না। এতক্ষণে ব্যাটার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে অতলে তলিয়ে গেছে।'

কিন্তু সুন্দরবাবুর মুখের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই সেই রক্তশূন্য সাদা দেহটা হুস করে আবার ভেসে উঠল। তার মুখে ভয়ের বা রাগের কোনও চিহ্নই নেই এবং তার ভাবহীন ও পলকহীন চোখ দুটো আগেকার মতো বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে।

রামহরি আর সে দৃশ্য সইতে পারলে না, ওঠে-কি-পড়ে এমনই বেগে ছুটে আড়ালে পালিয়ে গেল।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'ও সুন্দরবাবু, এখন আপনার মত কী? দেখছেন, মড়াটা এখনও অটুট দেহে বেঁচে আছে?'

প্রথমটা সুন্দরবাবু রীতিমত হতভম্ব হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই সে ভাব সামলে নিয়ে বললেন, 'তবে আমার টিপ ঠিক হয়নি। রোসো, এইবারে দেখাচ্ছি মজাটা!...আরে, আরে, বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই ব্যাটা যে আবার ডুব মারলে হে! এমন ধড়িবাজ মড়া তো কখনো দেখিনি! হুম, কিন্তু যাবে কোথায়? এই আমি বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, উঠেছে কি গুলি করেছি। আমার সঙ্গে কোনও চালাকিই খাটবে না বাবা!'

কিন্তু দেহটা আর ভেসে উঠল না। সুন্দরবাবু তাঁর প্রস্তুত বন্দুক নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন, 'নাঃ! হতভাগা গুলি খেতে রাজি নয়, সরে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে!'

জয়ন্তের মুখ গম্ভীর। সে চিন্তিতভাবে বললে, 'আজ যা দেখলুম, লোকের কাছে বললে আমাদের পাগল বলে ঠাট্টা করবে। বিমলবাবু, জানি না অমৃত দ্বীপ কেমন ঠাঁই! কিন্তু সেখানে যারা বাস করে, তাদের চেহারা কি ওই ভাসন্ত দেহটার মতো?'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'আমিও জানি না।'

মানিক বললে, 'আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করছে!'

কুমার বললে, 'ভয়! ভয়কে আমরা চিনি না। ভয় আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়।'

মানিক একটু হেসে বললে, 'ভয় নেই কুমারবাবু, আমিও ভীরু নই। এমন আজগুবি ভূতুড়ে দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করছে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মানুষের সংস্কারের দোষ। আমাকে কাপুরুষ ভাববেন না, দরকার হলে আমি ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবেরও সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজি আছি। আমি—'

কুমার বাধা দিয়ে মানিকের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'আমি মাপ চাইছি মানিকবাবু! আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা কুমারবাবু, আপনি আমাকে ভীতুই ভাবুন আর কাপুরুষই ভাবুন, আমি কিন্তু একটা স্পষ্ট কথা বলতে চাই—হুম!'

—'বলুন। স্পষ্ট কথা শুনতে আমি ভালোবাসি।'

—আমি আর অমৃত দ্বীপে গিয়ে অমর লতার খোঁজ-টোজ করব না।'

—'করবেন না?'

—'না, না, না, নিশ্চয়ই না। আমি অমর হতে চাই না। অমর লতার খোঁজ করা তো দূরের কথা, আপনাদের দ্বীপের মাটি পর্যন্ত মাড়াতে রাজি নই।'

—'কেন?'

—'জয়ন্তের কথাটা আমারও মনে লাগছে। অমৃত দ্বীপে যারা থাকে নিশ্চয় তারাও হচ্ছে জ্যান্ত মড়া! মড়া যেখানে জ্যান্ত হয়, সে দেশকে আমি ঘেন্না করি। থুঃ থুঃ—হুম! আমি জাহাজ থেকে নামব না।'

—'কিন্তু তারা যদি জাহাজে উঠে আপনার সঙ্গে ভাব করতে আসে?'

—'কী! আমার সঙ্গে ভাব করতে আসবে? ইস, তা আসতে হয় না, আমার হাতে বন্দুক আছে কী জন্যে? ...কিন্তু যেতে দিন ওসব ছাই কথা, এখন কেবিনের ভেতরে চলুন, খিদের চোটে আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

মানিক বললে, 'এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবাবুর মস্ত বিশেষত্ব। হাজার ভয় পেলেও উনি খিদে ভোলেন না! হয়ত মৃত্যুকালেও উনি অন্তত এক ডজন লুচি, আর একটা গোটা ফাউল রোস্ট খেতে চাইবেন!'

সুন্দরবাবু খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, 'মানিক, ফের তুমি ফ্যাচফ্যাচ করছ! ফাজিল ছোকরা কোথাকার!'

'লিটল ম্যাজেস্টিক' জল কেটে সমুদ্রের নীল বুকে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মেঘশূন্য নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে পরিপূর্ণ রৌদ্র।

ক্রমে রোদের আঁচ কমে এল, সূর্যের রাঙা মুখ পশ্চিম আকাশ দিয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে।

কুমার ডেকের উপরে এসে দেখলে, পূর্বদিকে তাকিয়ে বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বললে, 'কী শুনছ বিমল? মহাসাগরের চিরন্তন সঙ্গীত?'

—'আমি কিছুই শুনছি না ভাই! আমি এখন পূর্বদিকে একটা দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করছি।'

—'সূর্যাস্তের দেরি নেই। এখন তো রঙিন দৃশ্যপট খুলবে পশ্চিম আকাশে। আজ প্রতিপদ, চাঁদও আসবে খানিক পরে। তবে পূর্বদিকে এখন তুমি কী দেখবার আশা করো?'

—'যে আশায় এতদূর এসেছি!'

—'মানে?'

—'কুমার, এইমাত্র দূরবিনে দেখলুম পূর্বদিকে একটি পাহাড়ে ঘেরা দ্বীপকে—তার একদিকে রয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। আমি সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। খালিচোখেও ওকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভালো করে দেখতে চাও তো এই নাও দূরবিন।'

কুমার বিপুল আগ্রহে দূরবিনটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে তুলে অবাক হয়ে দেখলে, বিমলের কথা সত্য।

ছোট্ট একটি দ্বীপ। তার পায়ে উছলে পড়ে নমস্কার করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ এবং তার মাথার উপরে উড়ছে আকাশের পটে চলচ্চিত্রের মতো সাগর-কপোতরা। পশ্চিম আকাশের রক্তসূর্য যেন নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে সমস্ত কিরণমালা জড়িয়ে দিয়েছে ওই দ্বীপবাসী শ্যামল শৈলশ্রেণীর শিখরে! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও যেন মায়াদ্বীপ, চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও যেন এখনই ডুব মারতে পারে অতল নীলসাগরে!

ততক্ষণে জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং রামহরির সঙ্গে এসেছে বাঘাও। দ্বীপটিকে খালিচোখেও দেখা যাচ্ছিল, সকলে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কুমার বললে, 'ওহে বিমল, দ্বীপটি তো দেখছি এক রকম পাহাড়ে মোড়া বললেই হয়! পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে উপর দিকে অনেকখানি। ও দ্বীপ যেন পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল তুলে সমস্ত বাইরের জগৎকে আলাদা করে দিয়েছে, ওর ভিতরে যেন বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ! ও দ্বীপে ঢোকবার পথ কোনদিকে?'

বিমল পকেট থেকে অমৃত দ্বীপের নকশা বার করে বললে, 'এই দ্যাখো। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরওয়ালা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দ্বীপের ভিতর থেকে একটি নদী পাহাড় ভেদ করে সমুদ্রের উপর এসে পড়েছে। আমাদের দ্বীপে ঢুকতে হবে ওই নদীতেই নৌকো বেয়ে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, আমায় যেন জাহাজ থেকে নামতে বলা না হয়!...কেমন রামহরি, তুমিও তো আমার দলেই?'

রামহরি প্রথমটা চুপ করে রইল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তা হয় না মশাই! খোকাবাবুরা যদি নামেন, আমাকেও নামতে হবে।'

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'সে কী হে রামহরি, ও দ্বীপ যে পিশাচদের দ্বীপ! ওখানে যারা মরে যায় তারাও চলে বেড়ায়!'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবুদের জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।'

সূর্য অস্ত গেল। জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে। ঘনিয়ে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার। জাহাজ শৈলদ্বীপের পঞ্চশিখরের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্রের পাখিরা তখন নীরব। আকাশ-আসরেও লক্ষ লক্ষ তারা প্রতিপদের চন্দ্রের জন্যে রয়েছে মৌন অপেক্ষায়। দ্বীপের ভিতর থেকেও কোনওরকম জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র কিন্তু সেখানেও বোবা নয়, তার কল্লোলকে শোনাচ্ছে স্তব্ধতার বীণায় অপূর্ব এক গীতিধ্বনির মতো।

তারপর ধীরে ধীরে উঠল চাঁদ, অন্ধকারের কালো নিকষে রুপোলি আলোর ঢেউ খেলিয়ে।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, দ্বীপে ঢোকবার নদীর মুখেই আমাদের জাহাজ নোঙর করেছে। এখন যদি বোটে করে আমরা একবার দ্বীপের ভিতরটা ঘুরে আসি?'

মানিক বললে, 'কী সর্বনাশ, এই রাত্রে?'

জয়ন্ত বললে, 'লুকিয়ে খবরাখবর নেবার পক্ষে রাত্রিই তো ভালো সময়, মানিক! চাঁদের ধবধবে আলো রয়েছে, আমাদের কোনওই অসুবিধা হবে না।'

বিমল বললে, 'আজ আমরা দ্বীপের খানিকটা দেখেই ফিরে আসব। আমি, কুমার আর জয়ন্তবাবু ছাড়া আজ আর কারুর যাবার দরকার নেই। ফিরে আসবার পর কাল সকালে আমাদের আসল অভিযান শুরু হবে।'

মানিক নারাজের মতো মুখের ভাব করে বললে, 'কিন্তু যদি আপনারা কোনও বিপদে পড়েন?'

—'বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সরে পড়ব। নয়ত একসঙ্গে তিনজনেই বন্দুক ছুড়ে সঙ্কেত করব। উত্তরে আপনারাও বন্দুক ছুড়ে আমাদের জানিয়ে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে সদলবলে দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করবেন।'

চন্দ্রালোকের স্বপ্নজাল ভেদ করে তাদের নৌকো ভেসে চলল দ্বীপের নদীতে নাচতে নাচতে। নৌকোর দাঁড় টানছে বিমল ও জয়ন্ত, হাল ধরেছে কুমার। চুপিচুপি কাজ সারবে বলে তারা নাবিকদেরও সাহায্য নেয়নি।

খানিকক্ষণ নদীর দুই তীরেই দেখা গেল, পাহাড়রা দাঁড়িয়ে আছে চিরস্তব্ধ প্রহরীর মতো। ঘণ্টাখানেক পরে তারা পাহাড়ের এলাকা পার হয়ে গেল।

দুই তীর তখন চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো জঙ্গল ও অরণ্য। চাঁদের আলো দিকে দিকে নানা রূপের কত মাধুরীর ছবি এঁকে রেখেছে, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হল না তখন তাদের দৃষ্টি।

দ্বীপের কোথাও যে কোনও মানুষের চোখ এই সৌন্দর্য উপভোগ করছে, এমন প্রমাণও তারা পেলে না। এ দ্বীপ যেন একেবারে জনহীন—এ যেন সবুজ ক্ষেত্র, বৃহৎ বনস্পতি ও আকাশ ছোঁয়া পাহাড়দের নিজস্ব রাজত্ব।

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, এই যদি আপনার অমৃত দ্বীপ হয়, তাহলে বলতে হবে যে এখানকার অমররা হচ্ছে অশরীরী!'

বিমল হঠাৎ বললে, 'কুমার, নৌকোর মুখ তীরের দিকে ফেরাও।'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'ডাঙায় নেমে দ্বীপের ভিতরটা ভালো করে দেখতে চাই।'

—'কিন্তু নৌকো থেকে বেশি দূরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

বিমল কী জবাব দিতে গিয়েই চমকে থেমে পড়ল। আচম্বিতে অনেক দূর থেকে জেগে উঠল বহুকণ্ঠে এক আশ্চর্য সঙ্গীত! সে গানে পুরুষের গলাও আছে, মেয়ের গলাও আছে! গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিচিত্র তার সুর—অপূর্ব মিষ্টতায় মধুময়।

কুমার চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, 'ও কারা গান গাইছে? ও গান আসছে কোথা থেকে?'

বিমল নদীর বাম তীরের দিকে চেয়ে দেখলে। প্রথমটা খোলা জমি, তারপর অরণ্য। সে বললে, 'মনে হচ্ছে গান আসছে ওই বনের ভিতর থেকে। নৌকো তীরের দিকে নিয়ে চলো কুমার! কারা ও গান গাইছে সেটা না জেনে ফেরা হবে না।'

খানিক পরেই নৌকো তীরে গিয়ে লাগল। বিমল, কুমার ও জয়ন্ত নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল। বিমল বললে, 'খুব সাবধানে, চারিদিকে নজর রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হল নরম ঘাসে ঢাকা এক মাঠের উপর দিয়ে। সেই অদ্ভুত সম্মিলিত সঙ্গীতের স্বর স্তরে স্তরে উপরে—আরও উপরে উঠছে এবং তার ধ্বনি জাগিয়ে দিচ্ছে বহুদূরের প্রতিধ্বনিকে! সে যেন এক অপার্থিব সঙ্গীত, ভেসে আসছে নিশীথ রাতের রহস্যময় বুকের ভিতর থেকে!

যখন তারা বনের কাছে এসে পড়েছে, কুমার হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকিয়ে চকিত স্বরে বললে, 'বিমল, বিমল! পিছনে কারা আসছে দ্যাখো!'

বিমল ও জয়ন্ত একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে নদীর দিক থেকে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে বহু—বহু মূর্তি! সংখ্যায় তারা পাঁচ ছয়শো'র কম হবে না!

বিমল মহাবিস্ময়ে বললে, 'নদীর ধারে তো জনপ্রাণী ছিল না! কোত্থেকে ওরা আবির্ভূত হল?'

যেন আকাশ থেকে সদ্য পতিত এই জনতার দিকে তারা তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট নেত্রে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মূর্তিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের মনে হল মূর্তিগুলো মানুষের মূর্তি হলেও, প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি হচ্ছে অত্যন্ত অমানুষিক!

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

যে দল এগিয়ে আসছে তার ভিতরকার প্রত্যেক মূর্তিটাই যেন মানুষের মতো—দেখতে কলের পুতুলের মতো। কেবল চলছে তাদের পাগুলো, কিন্তু উপর দেহের অংশ একেবারেই কাঠের মতো আড়ষ্ট! তাদের হাত দুলছে না, মাথাগুলোও এদিকে ওদিকে কোনওদিকেই ফিরছে না! আশ্চর্য!

দূর থেকে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল, আর দেখা গেল খালি শত শত চোখে স্থির আগুনের মতো উজ্জ্বল দৃষ্টি!

কিন্তু অগ্নি-উজ্জ্বল এই সব দৃষ্টি এবং এই সব আড়ষ্ট দেহের চলন্ত পদের চেয়েও অস্বাভাবিক কেমন একটা অজানা অজানা ভাব মূর্তিগুলোর চারিদিকে কী যেন এক ভূতুড়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে!

কুমার শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুক তুললে।

বিমল বললে, 'বন্ধু, অকারণ নরহত্যা করে লাভ নেই।'

কুমার বললে, 'নরহত্যা নয় বিমল, আমি প্রেতহত্যা করব। রামহরি ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে পিশাচের দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না।'

—'কুমার, পাগলামি কোরো না।'

—'পাগলামি? ওরা কারা? এইমাত্র দেখে এলুম নদীর ধারে জনপ্রাণী নেই, তবু ওরা কোত্থেকে আবির্ভূত হল? ওরা মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল, না আকাশ থেকে খসে পড়ল? ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, বন্দুক ছোড়ো বিমল, বন্দুক ছোড়ো।'

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'কী হবে বন্দুক ছুড়ে? ওরা যদি একসঙ্গে আক্রমণ করে তাহলে বন্দুক ছুড়েও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না, উলটে বন্দুকের শব্দে সজাগ হয়ে দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা এদিকে ছুটে আসতে পারে!'

জয়ন্ত চমৎকৃত স্বরে বললে, 'বিমলবাবু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! প্রায় পাঁচশো লোক মাটির উপরে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তবু কোনওরকম পায়ের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না? এও কি সম্ভব? না, আমরা কি কালা হয়ে গেছি?'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! তবে কি বিনা বাধায় আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? না বন্ধু, এতে রাজি নই।'

বিমল বললে, 'না, আত্মসমর্পণ করব কেন? আমরা ছুটে ওই বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকব।'

—'তবে ছোটো! ওরা যে এসে পড়ল!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু যারা গান গাইছে তারা ওই বনের ভিতরেই আছে। শেষকালে যদি আমরা দু-দিক থেকে আক্রান্ত হই?'

বিমল চটপট চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'মূর্তিগুলো আসছে পশ্চিমদিক থেকে, আর গানের আওয়াজ আসছে পূর্বদিক থেকে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রয়েছে বন। চলুন, আমরা ওই দিকেই দৌড় দিই।'

পূর্ব-দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য করে তিনজনেই বেগে দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বন ও মাঠের সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা আর একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল।

সেই বিচিত্র মূর্তির বৃহৎ দল দ্রুতবেগে তাদের অনুসরণ করেনি, তাদের গতি একটুও বাড়েনি! তারা যেমনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এখনও ঠিক সেইভাবেই এগিয়ে আসছে—যেন তাদের কোনওই তাড়া নেই! তফাতের মধ্যে খালি এই, এখন তারাও আসছে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে।

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওরা যে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কী বলো দেখি কুমার? ওরা তো একটুও তাড়াহুড়ো করছে না,—রাহু যেমন নিশ্চয় চাঁদকে গ্রাস করতে পারবে জেনে এগুতে থাকে ধীরে ধীরে,

ওরাও অগ্রসর হচ্ছে সেইভাবেই! যেন ওরা জানে, যত জোরেই পা চালাই ওদের কবল থেকে কিছুতেই আমরা পালাতে পারব না!'

কুমার বললে, 'ওদের ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দল মূর্তি ধারণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!'

জয়ন্ত বললে, 'ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।'

বিমল বললে, 'এখন দেখছি সঙ্গীদের জাহাজে রেখে এসে ভালো কাজ করিনি। এই রহস্যময় দ্বীপে অদৃষ্টে কী আছে জানি না, কিন্তু চলুন, আমরা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি।'

আর এক দৌড়ে তারা মাঠ ছেড়ে বনের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

বন সেখানে খুব ঘন নয়, গাছগুলোর তলায় তলায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে খানিক কালো আর খানিক আলোর খেলা। ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়েও ফুটে উঠেছে আলো-কালো মাখা পথের রেখা। এবং দূর থেকে তখনও ভেসে আসছিল সেই বিচিত্র সঙ্গীতের তান।

কুমার বললে, 'এখন আমরা কোনদিকে যাব?'

বিমল বললে, 'পূর্ব-দক্ষিণদিকে আরও খানিক এগিয়ে তারপর আবার আমরা নদীর দিকে ফেরবার চেষ্টা করব।'

বিমলের মুখের কথা শেষ হতেই সারা অরণ্য যেন চমকে উঠল কী এক পৈশাচিক হো-হো অট্টহাস্যে! তাদের আশপাশ, সুমুখ পিছন থেকে ছুটল হাসির হররার পর হাসির হররা! সে বিকট হাসির স্রোত বইছে যেন পায়ের তলা দিয়ে, সে হাসি যেন ঝরে ঝরে পড়ছে শূন্যতল থেকে, সে হাসির ধাক্কায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল বনব্যাপী আলোর লেখা, কালোর রেখা!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত বিভ্রান্তের মতো চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে তাকাতে লাগল কিন্তু কোনওদিকেই দেখা গেল না জনপ্রাণীকে।

জয়ন্ত বললে, 'কারা হাসে? কোথা থেকে হাসে? কেন হাসে?'

কুমার ও বিমল কখনও পাগলের মতো এ-গাছের ও-গাছের দিকে ছুটে যায়—কখনও ডাইনের কখনও বাঁয়ের ঝোপঝাড়ের উপরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বারবার আঘাত করে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই—অথচ অট্টহাসির তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে প্রতি ঝোপের ভিতর থেকে প্রতি গাছের আড়াল থেকে। এ অদ্ভুত হাসির জন্ম যেন সর্বত্রই।

যেমন আচম্বিতে জেগেছিল, তেমনই হঠাৎ আবার থেমে গেল হাসির হুল্লোড়! কেবল শোনা যেতে লাগল সুদূরের সঙ্গীতলহরী।

বিমল কান পেতে শুনে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এবারে কেবল গান নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ। বনময় ছড়ানো শুকনো পাতার উপরে পড়ছে যেন তালে তালে শত শত পা! বোধহয় মাঠের বন্ধুরা বনে ঢুকছে, কিন্তু এবারে তারা আর নিঃশব্দে আসছে না।'

বিমল বললে, 'ছোটো কুমার, যত জোরে পার ছোটো।'

আবার জাগ্রত হল বহুকণ্ঠে সেই ভীষণ অট্টহাস্য!

কুমার বললে, 'কিন্তু কোনদিকে ছুটব বিমল? দূরে শত্রুদের পদশব্দ, আশেপাশে শত্রুদের পাগলা হাসির ধূম। চারিদিকে অদৃশ্য শত্রু, কোনদিকে যাব ভাই?'

—'সামনের দিকে—সামনের দিকে। শত্রুরা দৃশ্যমান হলেই বন্দুক ছুড়বে।'

তিনজনে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল এবং তাদের সঙ্গেসঙ্গেই ছুটতে লাগল যেন সেই বেয়াড়া হাসির আওয়াজ! এইটুকুই কেবল বোঝা গেল যে তাদের এপাশে ওপাশে পিছনে জাগ্রত অট্টহাসি থাকলেও সামনের দিকে হাসি এখন একেবারেই নীরব। যেন সেই অপার্থিব হাসি তাদের সুমুখের পথ রোধ করতে চায় না! যেন কারা তাদের ওইদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রায় বারো-তেরো মিনিট ধরে তারা ছুটে চলল এইভাবেই এবং এর মধ্যে সেই হাসির স্রোত বন্ধ হল না একবারও।

তারপরেই থেমে গেল হাসি, শেষ হয়ে গেল বনের পথ এবং সামনেই দেখা গেল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু একটা প্রাচীর।

কুমার হতাশভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'সামনের পথ বন্ধ! এখন আমরা কী করব?'

বিমল ও জয়ন্ত উপায়হীনের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভিতরে জাগল আবার শত শত পায়ের আঘাতে শুকনো পাতার আর্তনাদ!

জয়ন্ত বললে, 'এবারে পায়ের শব্দ আসছে আমাদের দুপাশ আর পিছন থেকে। আমাদের সুমুখে রয়েছে খাড়া দেওয়াল। আর আমাদের পালাবার উপায় নেই।'

বিমল ম্লান হাসি হেসে বললে, 'আমরা পালাচ্ছি না—রিট্রিট করছি।'

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'বেশ, মানলুম এসব হচ্ছে আমাদের ট্যাকটিক্যাল মুভমেন্টস। কিন্তু এবার আমরা কোনদিকে যাত্রা করব?'

বিমল বললে, 'সামনের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন, আমাদের সুমুখের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা ছোটো দরজা! ওর পাল্লাও বন্ধ নেই।'

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে ভালো করে দেখে বুঝলে, বিমলের কথা সত্য! তারপর বললে, 'দেখছি, অন্ধকারে আপনার চোখ আমাদের চেয়ে ভালো চলে! কিন্তু ওর ভিতরে ঢুকলে কি আর আমরা বেরিয়ে আসতে পারব? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই পাশের আর পিছনের অদৃশ্য শত্রুরা অট্টহাস্য আর পায়ের শব্দ করে আমাদের এই দিকে তাড়িয়ে আনতে চায়। শিকারিরা বাঘ-সিংহকে যেমনভাবে নির্দিষ্ট পথে চালনা করে ফাঁদে ফেলে, শত্রুরাও সেই কৌশল অবলম্বন করেছে।'

বিমল বললে, 'ঠিক। তাদের উদ্দেশ্য আমিও বুঝতে পেরেছি। আর আমাদের ঢোকবার

সুবিধা হবে বলে দয়া করে তারা দরজার পাল্লা দুখানাও খুলে রেখেছে! অতএব তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের দরজার ফাঁকেই মাথা গলাতে হবে, কারণ পায়ের শব্দ আর দূরে নেই।'

কুমার বললে, 'দরজার ওপাশে যদি নতুন বিপদ থাকে?'

—'অকুতোভয়ে সেই বিপদকে আমরা বরণ করব'—বলেই বিমল বন্দুক উদ্যত করে সর্বাগ্রে দরজার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পিছনে পিছনে গেল কুমার ও জয়ন্ত!

ভিতরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে দেখলে, একটা বৃক্ষহীন তৃণহীন ছোটোখাটো ময়দানের মতো জায়গা এবং তার চারিদিকেই প্রায় চারতলার সমান উঁচু-প্রাচীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সর্বহারা মরুভূমির খাঁ-খাঁ-করা ভয়াল স্তব্ধতাকে সেখানে কেউ প্রাচীর তুলে কয়েদ করে রেখেছে!

জয়ন্ত বললে, 'এর মানে কী? একটা মাঠকে এমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন?'

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'অনেকদিন আগে আমরা গিয়েছিলুম ময়নামতীর মায়াকাননে। কুমার, আজকের এই গর্জন শুনে কি সেখানকার কোনও কোনও জীবের কথা মনে পড়ে না?'

কুমার বললে, 'এরা কি এখানে আমাদের বন্দি করে রাখতে চায়?'

যেন তার জিজ্ঞাসার উত্তরেই তাদের পিছনকার দরজার পাল্লা দুখানা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিমল দৌড়ে গিয়ে দরজা ধরে টানাটানি করে বললে, 'হ্যাঁ কুমার, অমৃত দ্বীপে এসে আমাদের ভাগ্যে উঠবে বোধহয় নিছক গরলই। এ দরজা এমন মজবুত যে মত্ত হস্তীও এর কিছুই করতে পারবে না! এতক্ষণ লক্ষ করে দেখিনি, কিন্তু এ হচ্ছে পুরু লোহার দরজা। আর এই পাঁচিল হচ্ছে পাথরের। এই দরজা আর পাঁচিল ভাঙতে হলে কামানের দরকার!'

অকস্মাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল ভয়াবহ গর্জনের পর গর্জনে! সে কী বিকট, কী বীভৎস, কী ভৈরব হুংকার, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃথিবীর মাটি, আকাশের চাঁদ-তারা, নিশীথ রাতের বুক সে হুংকার শুনে যেন কেঁপে কেঁপে উঠল! যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে বহুদিনের উপবাসী কোনও অতিকায় দানব হিংস্র, বিষাক্ত চিৎকারের পর চিৎকার করে হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত। কম্পিতস্বরে সে বললে, 'এ কোনও জীবের গর্জন বিমলবাবু? চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিংহও যে একসঙ্গে এত জোরে গর্জন করতে পারে না! এরকম ভয়ানক গর্জন করবার শক্তি কি পৃথিবীর কোনও জীবের আছে?'

কুমার বললে, 'মনে মনে আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম!'

বিমল বললে, 'কিন্তু আন্দাজ করতে পারছ কি এ-জীবটা কোত্থেকে গর্জন করছে? মনে

হচ্ছে যেন সে আছে আমাদের খুব কাছেই। অথচ এই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে চাঁদের আলোয় কোনও জীবের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু পূর্বদিকে খানিক' দূরে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে চাঁদের আলোয় জলের মতো কি চকচক করছে না?'

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ওখানে একটা জলাশয়ের মতো কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে!'

কুমার বললে, 'একটু এগিয়ে দেখব নাকি?'

বিমল খপ করে কুমারের হাত চেপে ধরে বললে, 'খবরদার কুমার, ওদিকে যাবার নামও কোরো না।'

—'কেন বিমল, ওদিকে তো কেউ নেই।'

'হ্যাঁ, চোখে কারুকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগে এখানকার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দ্যাখো। প্রথমে ধরো, রীতিমত মাঠের মতো এমন একটা জায়গা অকারণে কেউ এত উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখে না। এখানটা ঘিরে রাখবার কারণ কী? দ্বিতীয়ত, পাঁচিলের ওই দরজা পুরু লোহা দিয়ে তৈরি কেন? এই ফর্দা জায়গায় এমন কী বিভীষিকা আছে যাকে এখানে ধরে রাখবার জন্যে মজবুত দরজার দরকার হয়? তৃতীয়ত, পাঁচিল ঘেরা এতখানি জায়গার ভিতর দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই—না গাছপালা, না ঘরবাড়ি, না জীবনের চিহ্ন! আছে কেবল একটা জলাশয়! কেন ওখানে জলাশয় খোঁড়া হয়েছে, ওর ভিতরে কী আছে? আমাদের খুব কাছে এখনই যে দানব-জানোয়ারটা বিষম গর্জন করলে, কে বলতে পারে সে ওই জলাশয়ে বাস করে কিনা? হয়ত সে উভচর—জলে স্থলে তার অবাধ গতি! ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় কুমার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।'

জয়ন্ত শিউরে বললে, 'তবে কি ওই দানবের খোরাক হবার জন্যেই আমাদের তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে?'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

কুমার বললে, 'ওই বিভীষিকা যদি স্থলচর হয়, তাহলে আমরা তো এখানে থেকেও বাঁচতে পারব না! সে তো আমাদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে! তখন কী হবে?'

—'তখন ভরসা আমাদের এই তিনটে অটোম্যাটিক বন্দুক! কিন্তু এই বন্দুক তিনটে যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে একথা জোর করে বলা যায় না! ময়নামতীর মায়াকাননে আমরা এমন সব জীবও স্বচক্ষে দেখেছি যাদের কাছে বন্দুকও হচ্ছে তুচ্ছ অস্ত্র।'

জয়ন্ত কিছু না বলে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'দেখছি পাঁচিলের গা তেলা নয়, রীতিমত এবড়ো খেবড়ো। ভালো লক্ষণ।'

বিমল বললে, 'পাঁচিলের গা অসমতল হলে আমাদের কী সুবিধা হবে জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'বিমলবাবু, যদি একগাছা হাত চল্লিশ-পঞ্চাশ লম্বা দড়ি পেতুম, তাহলে আমাদের আর কোনওই ভাবনা ছিল না।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'দড়ি? দড়ি নিয়ে কী করবেন? দড়ি তো আমার কাছেই আছে! জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার হচ্ছি পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, পথে পা বাড়ালেই সবকিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আমাদের দুজনের পাশে ঝুলছে এই যে দুটো ব্যাগ, এর মধ্যে আছে দস্তুরমত সংসারের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার ব্যাগে আছে ষাট হাত ম্যানিলা দড়ি। জানেন তো, দেখতে সরু হলেও ম্যানিলা দড়ি দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায়?'

জয়ন্ত বললে, 'উত্তম। আর চাই একটা হাতুড়ি আর একগাছা হুক।'

—'ও দুটি জিনিস আছে কুমারের ব্যাগে।'

—'চমৎকার! তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আমি চাই চার পাঁচিলের একটা কোণ বেছে নিতে, সেখানে গেলে হাত বাড়িয়ে পাব দুদিকের দেওয়াল।'

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুলো। কিছুই বুঝতে না পেরে বিমল আর কুমারও চলল তার পিছনে পিছনে।

প্রাচীরের পূর্ব-উত্তরকোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, 'এইবারে দড়ি আর হুক আর হাতুড়ি নিয়ে আমি উঠব পাঁচিলের ওপরে। তারপর টঙে গিয়ে দুখানা পাথরের জোড়ের মুখে হুক বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দেব। তারপর আপনারা দু'জনেও একে একে দড়ি ধরে ওপরে গিয়ে উঠবেন। তারপর সেই দড়ি বেয়েই পাঁচিলের ওপারে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

বিমল খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'বাঃ, সবই তো জলের মতো বেশ বোঝা গেল! কিন্তু জয়ন্তবাবু, প্রথমেই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অর্থাৎ পাঁচিলের টঙে গিয়ে চড়বে কে? আপনি, না আমি, না কুমার? দুঃখের বিষয় আমরা কেউই টিকটিকির মূর্তি ধারণ করতে পারি না।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আমি ঠাট্টা বা আকাশ কুসুম চয়ন করছি না। কিছুকাল আগে 'নিউইয়র্ক টাইমসে' আমি কারাগার থেকে পলায়নের এক আশ্চর্য খবর পড়েছিলুম। কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য কাহিনি। আমেরিকার এক নামজাদা খুনে ডাকাতকে সেখানকার সবচেয়ে সুরক্ষিত জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়। সে জেল ভেঙে কোনও বন্দি কখনও পালাতে পারেনি, তার চারিদিকে ছিল অত্যন্ত উঁচু পাঁচিল। কিন্তু ওই ডাকাতটা এক অদ্ভুত উপায়ে সেই পাঁচিলও পার হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপায়টা যে কি, মুখে বললে আপনারা তা অসম্ভব বলে মনে করবেন—আর খবরটা প্রথমে পড়ে আমিও অসম্ভব বলেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন ধরে অভ্যাস করবার পর আমিও দেখলুম, উপায়টা চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকবে বটে, কারণ এ উপায় যে অবলম্বন করবে তার পক্ষে দরকার কেবল হাত পায়ের কৌশল নয়—অসাধারণ দেহের শক্তিও।'

বিমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে বললে, 'জয়ন্তবাবু, শিগগির বলুন, সে উপায়টা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'উপায়টা এমন ধারণাতীত যে মুখে বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

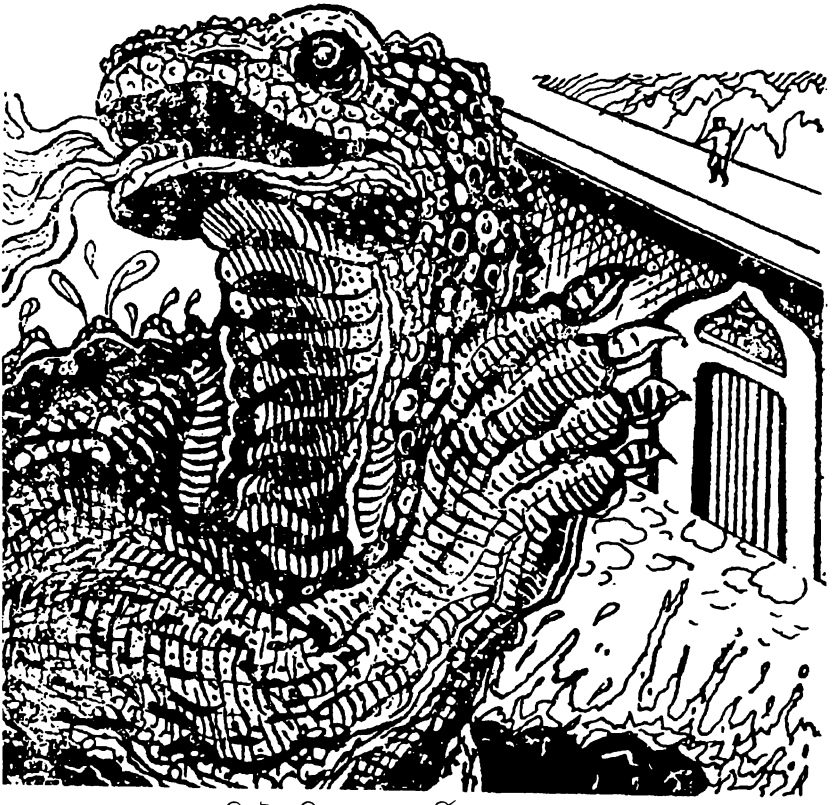

বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো

তার চেয়ে এই দেখুন, আপনাদের চোখের সুমুখে আমি নিজেই সেই উপায়টা অবলম্বন করছি—বলেই সে দুই দিকের প্রাচীর যেখানে মিলেছে সেই কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর বিমল ও কুমার যে অবাক-করা ব্যাপারটা দেখলে কোনওদিনই সেটা তারা সম্ভবপর বলে মনে করেনি! জয়ন্ত কোণে গিয়ে দুই দিকের প্রাচীরে দুই হাত ও দুই পা রেখে কেবল হাত ও পায়ের উপরে প্রবল চাপ দিয়ে উপর দিকে উঠে যেতে লাগল, প্রায় অনায়াসেই! বিপুল বিস্ময়ে নির্বাক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা বিস্ফারিত চোখে উপরপানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত যখন প্রাচীরের উপর পর্যন্ত পৌঁছল, বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারিফ করে বললে, 'সাধু! জয়ন্তবাবু, সাধু! আপনি আজ সত্য করে তুললেন ধারণাতীত স্বপ্নকে!'

ঠিক সেই সময়েই জাগল আবার চারিদিক কাঁপিয়ে ও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে কোনও অজ্ঞাত দানবের ভীষণ হুংকার। সে যেন সমস্ত জীবজগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ—সে যেন বিরাট বিশ্বের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত যুদ্ধ ঘোষণা!

জয়ন্ত তখন প্রাচীরের উপরে উঠে বসে হাঁপ নিচ্ছে। কিন্তু এমন ভয়ানক সেই চিৎকার যে চমকে উঠে সে আর একটু হলেই টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দুই হাতে প্রাচীর চেপে ধরে সরোবরের দিকে তাকিয়ে দেখলে।...হ্যাঁ, বিমলের অনুমানই ঠিক। একটু আগে যারা আজগুবি হাসি হাসছিল তারা দেখা দেয়নি বটে কিন্তু এখন যে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সে আর অদৃশ্য হয়ে নেই।

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। এবং পশ্চিমদিকের উঁচু প্রাচীরের কালো ছায়া এসে পড়ে সরোবরের আধাআধি অংশ করে তুলেছে অন্ধকারময়। এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারেরই একটা জীবন্ত অংশের মতো কী যে সে কিম্ভুতকিমাকার বিপুল মূর্তি খানিকটা আত্মপ্রকাশ করেছে, দূর হতে স্পষ্ট করে তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার দেহটা সরোবরের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল অংশের উপর ক্রমেই আরও প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে লাগল!...তবে কি সে তাদের দেখতে পেয়েছে? সে কি এগিয়ে আসছে জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠবার জন্যে?

জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে প্রাচীরের পাথরের ফাঁকে হুক বসিয়ে ঠকাঠক হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল।

নিচে থেকে বিমল অধীর স্বরে চিৎকার করে বলল, 'ও আমাদের দেখতে পেয়েছে—ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! জয়ন্তবাবু, দড়ি—দড়ি।'

কুমার ফিরে সচকিত চোখে দেখলে, প্রায় আশি ফুট লম্বা ও পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু একটা বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সরোবরের তীরে উঠে বসে সশব্দে প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিচ্ছে!

উপর থেকে ঝপাং করে একগাছা দড়ি নিচে এসে পড়ল।

কুমার ত্রস্তস্বরে বললে, 'লাউ-ৎজুর ভক্তরা কি একেই ড্রাগন বলে ডাকে?'

বিমল দড়ি চেপে ধরে বললে, 'চুলোয় যাক লাউৎজুর ভক্তরা! এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গেই দড়ি ধরে ওপরে উঠে এসো।'

তারা একে একে প্রাচীরের ওপারে মাটির উপরে গিয়ে নেমে আড়ষ্টভাবে শুনলে, ওধার থেকে ঘন ঘন জাগছে মহাক্রুদ্ধ দানবের হতাশ হুংকার! সে নিশ্চয়ই চারিদিকে মুখের গ্রাস খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেন না তার বিপুল দেহের বিষম দাপাদাপির চোটে প্রাচীরের এ পাশের মাটিও কেঁপে উঠছে থরথর করে।

কুমার শ্রান্তের মতো কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'উঃ, দানবটা আর এক মিনিট আগে আমাদের দেখতে পেলে আর আমরা বাঁচতুম না!'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখনও আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই কুমার! ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে চেয়ে দ্যাখো!'

সর্বনাশ! আবার সেই অপার্থিব দৃশ্য। তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মতো একটা স্থানে এবং সেই প্রান্তরের যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই চোখে পড়ে কলে-চলা পুতুলের

মতো দলে দলে মানুষ-মূর্তি অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এগিয়ে আসছে! নীরব, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সব মূর্তি!

পিছনে প্রাচীর এবং সামনে ও দুই পাশে রয়েছে এই অমানুষিক মানুষের দল। এবারে আর পালাবার কোনও পথই খোলা নেই।

জয়ন্ত অবসন্নের মতো বসে পড়ে বললে, 'আর কোনও চেষ্টা করা বৃথা।'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

দ্বীপের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সেই ভয়ানক অর্ধচন্দ্রব্যূহ এমনভাবে তিনদিক আগলে এগিয়ে আসছে যে মুক্তি লাভের কোনও পথই আর খোলা রইল না।

ব্যূহ যারা গঠন করেছে তাদের দিকে তাকালেও বুক করতে থাকে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ! তারা মানুষ, না অমানুষ? তারা যখন মাটির উপরে পদ সঞ্চালন করে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের জ্যান্ত মানুষ বলে না মেনে উপায় নেই। কিন্তু দেখলে মনে হয়, যেন দলে দলে কবরের মড়া হঠাৎ কোনও মোহিনী মন্ত্রে পদচালনা করবার শক্তি অর্জন করেছে। এবং এবারেও সবাই লক্ষ করলে যে কেবল দুই পা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক যেন মৃত্যু আড়ষ্ট হয়ে আছে!

অর্ধচন্দ্রব্যূহের দুই প্রান্ত বিমলদের পিছনকার প্রাচীরের দুইদিকে সংলগ্ন হল, মাঝে থাকল একটুখানি মাত্র ফাঁক, যেখানে অবাক ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিনজনে।

এদের উদ্দেশ্য কী? এরা তাদের বন্দি করতে, না বধ করতে চায়? ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা অসম্ভব, কারণ মড়ার মুখের মতো কোনও মুখই কোনও ভাব প্রকাশ করছে না—কেবল তাদের অপলক চোখে চোখে জ্বলছে যেন নিষ্কম্প অগ্নিশিখা—যা দেখলে হয় হৃৎকম্প!

কুমার মরিয়ার মতো চিৎকার করে বললে, 'কপালে যা আছে বুঝতেই পারছি, আমি কিন্তু পোকার মতো ওদের পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই—যতক্ষণ শক্তি আছে বিমল, বন্দুক ছোড়ো, বন্দুক ছোড়ো!'

সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে আবার জাগল অট্টহাস্যের পর অট্টহাস্যের উচ্ছ্বাস!

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের ওপার থেকেও ভীষণ হুংকার করে সাড়া দিতে লাগল সেই শিকার-বঞ্চিত হতাশ দানব জন্তুটা!

সেই সমান ভয়াবহ হাস্য ও গর্জনের প্রচণ্ডতায় চতুর্দিক হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত!

ও দানবটা যেন চ্যাঁচাচ্ছে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, কিন্তু এই মূর্তিমান প্রেতগুলো এত হাসে কেন?

বিমল বললে, 'জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে যে মূর্তিটা ভেসে আসছিল তাকেও দেখতে ঠিক এদের মতো। সেও হয়ত এই দলেই আছে।'

কুমার তখন তার বন্দুক তুলে নিল। কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে বন্দুক নামিয়ে বললে, 'বিমল, বিমল, একটা কথা মনে হচ্ছে!'

—'কী কথা?'

—'লাউ-ৎজুর মূর্তিটা আমার সঙ্গেই আছে। জানো তো, 'তাও' সাধুরা বলে সে মূর্তি মন্ত্রপূত, আর তাকে সঙ্গে না আনলে এ দ্বীপে আসা যায় না!'

বিমল কতকটা আশ্বস্ত স্বরে বললে, 'ঠিক বলেছ কুমার, এতক্ষণ ওকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম! ওই মূর্তির লোভেই কলকাতায় মানুষের পর মানুষ খুন হয়েছে! তার এত মহিমা কীসের এইবারে হয়ত বুঝতে পারা যাবে! বার করো তো একবার মূর্তিটাকে, দেখি সেটা দেখে এই ভূতগুলো কী করে?'

কুমার তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর থেকে জেড পাথরে গড়া, রামছাগলে চড়া সাধক লাউ-ৎজুর সেই অর্ধতপ্ত অর্ধশীতল মূর্তিটা বার করে ফেললে এবং ডানহাতে করে এমনভাবে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরলে যে সকলেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

ফল হল কল্পনাতীত!

মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল অট্টহাস্য এবং আচম্বিতে যেন কোনও অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি ধাক্কা খেয়ে সেই শত শত আড়ষ্টমূর্তি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে যেতে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল!

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার—তিনজনেই অত্যন্ত বিস্মিতের মতো একবার এ ওর মুখের দিকে এবং একবার সেই পশ্চাৎপদ বীভৎস মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল বারংবার।

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে জয়ন্ত বললে, 'এতটুকু মূর্তির এত বড়ো গুণ, একথা যে বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!'

বিমল বললে, 'এতক্ষণে বোঝা গেল, এই দ্বীপে ওই পবিত্র মূর্তিই হবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো। ওকে সঙ্গে করে এখন আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'না বিমলবাবু, না! এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপ আমাদের মতো মানুষের জন্য তৈরি হয়নি! এখানে পদে পদে যত সব অস্বাভাবিক বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, এরপর হয়ত লাউৎজুর মূর্তিও আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না! আমি চাই নদীর ধারে যেতে, যেখানে বাঁধা আছে আমাদের নৌকো!'

কুমার বললে, 'আপাতত আমিও জয়ন্তবাবুর কথায় সায় দিই। আবার যদি এখানে আসি, দলে ভারী হয়েই আসব। কিন্তু নদী কোনদিকে?'

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই পশ্চিমদিকে! ওই দ্যাখো, চাঁদের আলো নিভে আসছে, পূর্বের আকাশ ফর্সা হচ্ছে!'

যেন সমুজ্জ্বল স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধতার মধ্যে দেখা গেল, প্রান্তরের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালজাতীয় তরুকুঞ্জ ও ছোটো ছোটো বন। এতক্ষণ যারা এসে এখানে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল সেই অপার্থিব মূর্তিগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে চোখের আড়ালে, কোথায়!

বিমল সব দিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'আর বোধহয় ওরা আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না। চলো কুমার, আমরা ওই বনের দিকে যাই। খুব সম্ভব, ওই বনের পরেই পাব নদী।'

তারা বন লক্ষ্য করে অগ্রসর হল এবং চলতে চলতে বার বার শুনতে লাগল, সেই অজানা অতিকায় জানোয়ারটা তখনও আকাশ কাঁপিয়ে দারুণ ক্রোধে চিৎকার করছে ক্রমাগত!

প্রায় সিকি মাইল পথ চলবার পর বনের কাছে এসে তারা শুনতে পেলে, গাছে গাছে জেগে উঠে ভোরের পাখিরা গাইছে নতুন ঊষার প্রথম জয়গীতি। আঁধার তখন নিঃশেষে পালিয়ে গেছে কোথায় কোনও দুঃস্বপ্নলোকের অন্তঃপুরে।

দানবের চিৎকারও থেমে গেল। হয়ত সেও ফিরে গেল হতাশ হয়ে তার পাতালপুরে। হয়ত রাত্রির জীব সে, সূর্যালোক তার চোখের বালি।

বাতাসও এতক্ষণ ছিল যেন শ্বাসরোধ করে। এখন ফিরে এল নিয়ে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ। বনে বনে সবুজ গাছের পাতায় পাতায় জাগল নির্ভীক আনন্দের বিচিত্র শিহরণ।

জয়ন্ত বললে, 'এই তো আমার চিরপরিচিত প্রিয় পৃথিবী! জানি এর আলোছায়ার মিলন-লীলাকে, এর শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মাধুর্যকে, এর ফুল-ফোটানো শ্যামলতাকে, আমি বাঁচতে চাই এদেরই মাঝখানে! কালকের মতো যুক্তিহীন আজগুবি রাত আর আমার জীবনে কখনও যেন না আসে! এ রাতের কাহিনি কারুর কাছে মুখ ফুটে বললেও সে আমাকে পাগল বলে মনে করবে!'

ঠিক সেই সময়ে কী এক অভাবনীয় ভাবে সকলের মন অভিভূত হয়ে গেল!

প্রথমটা সবিস্ময়ে কারণ বোঝবার চেষ্টা করেও কেউ কিছুই বুঝতে পারলে না।

তারপরেই কুমার বললে, 'একী বিমল, একী! ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?'

চারিদিকে একবার চেয়ে বিমল বললে, 'এ তো ঠিক ভূমিকম্পের মতো মনে হচ্ছে না কুমার! মনে হচ্ছে, আমরা আছি টলমলে জলে নৌকোর ওপরে! একী আশ্চর্য!'

জয়ন্ত বললে, 'দেখুন দেখুন, ওই দিকে তাকিয়ে দেখুন! যে মাঠ দিয়ে আমরা এসেছি, সেখানে হঠাৎ এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে! অ্যাঁ, এও কি সম্ভব?'

বিপরীত দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, 'ওদিকেও যে ওই ব্যাপার! আমরা যে জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি তার দুইদিকেই নদীর আবির্ভাব হয়েছে!'

দুই হাতে চোখ কচলে চমৎকৃত কণ্ঠে বিমল বললে, 'এ তো দৃষ্টিবিভ্রম নয়! কুমার, আমাদের সামনের দিকেও খানিক তফাতে চেয়ে দ্যাখো। ওখানেও জল! পিছন দিকে বন ভেদ করে চোখ চলছে না, খুব সম্ভব ওদিকেও আছে জল! কারণ এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি এখন দ্বীপের মতো একটা জমির উপরে, আর এই দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে ঠিক নৌকোর মতোই! না, এইবারে আমি হার মানলুম! দ্বীপ হল নৌকো! না এটাকে বলব ভাসন্ত দ্বীপ?'

সত্য! জলের ওপরে প্রান্তরের বনজঙ্গল দেখতে দেখতে পিছনে সরে যাচ্ছে—যেমন সরে যেতে দেখা যায় রেলগাড়ির ভিতরে, বা নৌকো-জাহাজের উপরে গিয়ে বসলে! গঙ্গা সাঁতার কাটছে জলে!

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি হ্যামার্টনের 'ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্লড' পড়েছেন?'

—'রেখে দিন মশাই, হিস্ট্রি-ফিস্ট্রি! আমার মাথা এমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! নিজেকে আর জয়ন্ত বলেই মনে হচ্ছে না!'

—'শুনুন। ওই হিস্ট্রির ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৫২২ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখবেন! চার-পাঁচশো বছর আগে চিন দেশে সিং-রাজবংশের সময়ে একজন চিনা পটুয়া অমৃত দ্বীপের যে চিত্র এঁকেছিলেন, ওখানি হচ্ছে তারই প্রতিলিপি। তাতে দেখা যায়, জনকয় তাও ধর্মাবলম্বী লোক একটি ভাসন্ত দ্বীপে বসে পানভোজন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর একটি মেয়ে হাল ধরে দ্বীপটিকে করছে নির্দিষ্ট পথে চালনা!'

—'আরে মশাই, কবি আর চিত্রকররা উদ্ভট কল্পনায় যা দেখে, তাই কি আমাদেরও বিশ্বাস করতে হবে?'

—'জয়ন্তবাবু, সময়-বিশেষে কল্পনাও যে হয় সত্যের মতো, আর সত্যও হয় কল্পনার মতো, আজ স্বচক্ষেও তা দেখে আপনি তাকে স্বীকার করবেন না?'

—'পাগলের কাছে সবই সত্য হতে পারে। আমাদের সকলেরই মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।'

—'না জয়ন্তবাবু, শিশুর কাছেও সবই সত্য হতে পারে। এই লক্ষ-কোটি বৎসরের অতিবৃদ্ধ পৃথিবীর কোলে ক্ষুদ্র মানুষ হচ্ছে শিশুর চেয়েও শিশু। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও যে অসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে, ভালো করে তা জানতে পারবার আগেই ক্ষণজীবী মানুষের মৃত্যু হয়। আজ লোহা জলে ভাসে, ধাতু আকাশে ওড়ে, বন্দি বিদ্যুৎ গোলামি করে, শূন্য দিয়ে সাত সাগর পেরিয়ে বেতারে মানুষের চেহারা আর কণ্ঠস্বর ছোটাছুটি করে, ছবি জ্যান্ত হয়ে কথা কয়, রসায়নাগারে নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। কিছুকাল আগেও এসব ছিল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, আজগুবি কল্পনার মতো। তবু আমরা কতটুকুই বা দেখতে আর জানতে পেরেছি? পৃথিবীতে যা কিছু আমরা দেখিনি, শুনিনি, তা-ই অসম্ভব না হতেও পারে!'

—'আপনার বক্তৃতাটি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপাতত বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমরা কী করব সেইটেই ভাবা উচিত। এ দ্বীপ আমাদের নিয়ে জলপথে হয়ত নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চায়, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

কুমার বললে, 'আমাদের উচিত, জলে ঝাঁপ দেওয়া।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তরল জল আবার কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাহলেও আমি আর অবাক হব না!'

বিমল বললে, 'কিংবা জলের ভিতরে আবার দেখা দিতে পারে দলে দলে জ্যান্ত মড়া।'

কুমার শিউরে উঠে ব্যাগটা টিপে-টুপে অনুভব করে দেখলে, লাউ-ৎজুর মূর্তিটা যথাস্থানে আছে কিনা।

তারপর এগিয়ে ধারে গিয়ে তারা দেখলে, দ্বীপ তখন ছুটে চলেছে রীতিমত বেগে এবং তটের তলায় উচ্ছল স্রোত ডাকছে কলকল করে। নদীর আকার তখন চওড়া হয়ে উঠেছে এবং খণ্ডদ্বীপের দুই তীর সরে গেছে অনেক দূরে।

জয়ন্ত আবার বললে, 'এখন উপায় কী বিমলবাবু, আমরা কী করব?'

বিমল বললে, 'এখানে জল-স্থল দুই-ই বিপদজ্জনক। বাকি আছে শূন্যপথ, কিন্তু আমাদের ডানা নেই!'

কুমার বললে, 'নদীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। হয়ত অমৃত দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের মতো অনাহূত অতিথিদের বাহির-সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে চায়।'

—ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউৎজুর দেশে এসেছ কেন?

জয়ন্ত আশান্বিত হয়ে বললে, 'তাহলে তো সেটা হবে আমাদের পক্ষে শাপে বর। নদীর মুখেই আছে আমাদের জাহাজ।'

বিমল বললে, 'কিন্তু জাহাজ-সুদ্ধ লোক আমাদের এই অতুলনীয় দ্বীপ-নৌকো দেখে, কী মনে করবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই আমার হাসি পাচ্ছে।'

কিন্তু বিমলের মুখে হাসির আভাস ফোটার আগেই হাসি ফুটল আর এক নতুন কণ্ঠে। দস্তুরমত কৌতুক-হাসি।

সকলে চমকে পিছন ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, একটু তফাতে বনের সামনে গাছতলায় বসে আছে আবার এক অমানুষিক মূর্তি! কিন্তু এবারে তার মুখ আর ভাবহীন নয়, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল।

জয়ন্ত বললে, 'এ মূর্তি আবার কোথা থেকে এলো?'

বিমল বললে, 'যেখান থেকেই আসুক, এর চোখেমুখে বিভীষিকার চিহ্ন নেই, এ হয়ত আমাদের ভয় দেখাতে আসেনি।'

মূর্তি পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় বললে, 'কে তোমরা? পরেছ ইংরেজি পোশাক, কিন্তু দেখছি তোমরা ইংরেজ নও!'

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, 'তুমি যেমন চিনা হয়েও ইংরেজি বলছ, আমরাও তেমনই ইংরেজি পোশাক পরেও জাতে ভারতীয়।'

—'ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউ-ৎজুর দেশে এসেছ কেন? তোমরা কি জানো না, এ দেশ হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে বাস করে আমার মতো অমরেরা—জলে-স্থলে-শূন্যে যাদের অবাধ গতি? এখানে নশ্বর মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ!'

বিমল হেসে বললে, 'অমর হবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই!'

মূর্তি উপেক্ষার হাসি হেসে বললে, 'মুর্খ! আমাদের দেহের মর্যাদা তোমরা বুঝবে না। দেহ তো একটা তুচ্ছ খোলস মাত্র। মানুষ বলতে আসলে বোঝায় মানুষের মনকে! আমাদের দেহ নামে মাত্র আছে, কিন্তু আমরা করি কেবল মনের সাধনা। আমাদের আড়ষ্ট দেহে কর্মশীল কেবল আমাদের মন। কিন্তু থাক ওসব কথা। কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? 'সিয়েন' হতে?'

—'না তোমাদের দেখবার পর আর অমর হবার সাধ নেই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।'

—'বেড়াতে! এটা নশ্বর মানুষের বেড়াবার জায়গা নয়! জানো তোমাদের মতো আরও কত কৌতূহলী এখানে বেড়াতে এসে মারা পড়েছে আমাদের হাতে?'

—'সেটা তোমাদের অভ্যর্থনার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কেবল আমাদের মারতে পারনি, কারণ সে শক্তি তোমাদের নেই!'

—'মূর্খ! তোমাদের বধ করতে পারি এই মুহূর্তেই! কেবল প্রভু লাউ-ৎজুর পবিত্র মূর্তি তোমাদের সঙ্গে আছে বলেই এখনও তোমরা বেঁচে আছ। ও মূর্তি কোথায় পেলে?'

—'সে খবর তোমাকে দেব না।'

—'তোমরা কি 'তাও'ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ?'

—'না। আমরা হিন্দু। তবে সাধক বলে লাউ-ৎজুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।'

—'কেবল মুখের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, তোমাদের মন অপবিত্র। প্রভু লাউ-ৎজুর মূর্তির মহিমায় তোমাদের প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু এখানে আর তোমাদের ঠাঁই নেই। শীঘ্র চলে যাও এখান থেকে!'

—'খুব লম্বা হুকুম তো দিলে, এই জ্যান্ত মড়ার মুল্লুক থেকে চলেও তো যেতে চাই, কিন্তু যাই কেমন করে?'

—'কেন?'

—'আগে ছিলুম মাঠে। তারপর মাঠ হল জলে ঘেরা দ্বীপ। তারপর দ্বীপ হল আশ্চর্য এক নৌকো। খুব মজার ম্যাজিক দেখিয়ে আরব্য উপন্যাসকেও তো লজ্জা দিলে বাবা! এখন দয়া করে দ্বীপ-নৌকোকে আবার স্থলের সঙ্গে জুড়ে দাও দেখি, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

—'তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুশি হলুম। দ্বীপের পূর্বদিকে চেয়ে দ্যাখো।'

সকলে বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন যে দ্বীপের পূর্বপ্রান্ত আবার মাঠের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে গেছে তারা কেউ জানতেও পারেনি। স্থির মাটি, পায়ের তলায় আর টলমল করছে না।

এতক্ষণ পরে বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বললে, 'তোমাকে শতশত ধন্যবাদ।'

—'এখান থেকে সোজা পশ্চিমদিকে গেলেই দেখবে, নদীর ধারে তোমাদের নৌকো বাঁধা আছে। যাও!'

পরমুহূর্তেই আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! সেই উপবিষ্ট মূর্তি আচম্বিতে বিনা অবলম্বনেই শূন্যে ঊর্ধ্বদিকে উঠল এবং তারপর ধনুক থেকে ছোড়া তীরের মতো বেগে বনের উপর দিয়ে কোথায় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

কুমার হতভম্বের মতো বললে, 'এ কী দেখলুম বিমল, এ কী দেখলুম!'

বিমল বললে, 'আমি কিন্তু এই শেষ ম্যাজিকটা দেখে আশ্চর্য বলে মনে করছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, তাহলে আপনার কাছে আশ্চর্য বলে কোনও কিছু নেই!'

—'জয়ন্তবাবু, আপনি কি সেই অদ্ভুত ইংরেজের কথা শোনেন নি—টলস্টয়, থ্যাকারের সঙ্গে আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোক স্বচক্ষে দেখে যাঁরা বর্ণনা করে গেছেন? তিনি সাধকও নন, যাদুকরও নন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর দেহ শূন্যে উঠে এক জানালা দিয়ে শূন্য পথেই আবার ঘরের ভিতরে ফিরে আসত।'

—'দোহাই মশাই, দোহাই! আর নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে অসম্ভবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করবেন না! আপনাদের 'অ্যাডভেঞ্চার' আমার ধারণার বাইরে। এখানকার মাটিতে আর পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাঠ আবার দ্বীপ হবার আগেই ছুটে চলুন নৌকোর খোঁজে।'

সকলে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হল। পূর্বাকাশের রঙমহলে প্রবেশ করেছে তখন নবীন সূর্য। নদীর জল যেন গলানো সোনার ধারা। নৌকো যথাস্থানেই বাঁধা আছে।

অমৃত দ্বীপের আরও কত রহস্য অমৃত দ্বীপের ভিতরেই রেখে তারা খুলে দিলে নৌকোর বাঁধন।

সোনার পাহাড়ের যাত্রী

প্রথম পর্ব

বৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি

কী বৃষ্টি! আকাশ বলে, ভেঙ্গে পড়ি।

ছুটেছে কালো কালো জলভরা মেঘের দল এবং তাদেরই আড়ালে কোথায় বেধে গিয়েছে যেন দেবতাদের সঙ্গে দানবের মহাযুদ্ধ, তাই বজ্রগুলো করছে ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ ও ক্রুদ্ধগর্জন।

সুগন্ধি দখিনা বাতাসকে খেদিয়ে দিয়ে ধেয়ে এসেছে ঝাপটা মেরে পাগলা ঝড় এবং তার প্রচণ্ড ফুৎকারে গড়ের মাঠে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বড় বড় গাছের পর গাছ। ধুন্ধুমার!

থই থই করছে হাঁটুভোর জল, পথ আর মাঠ হয়ে গিয়েছে একশা। পথে পথে ঢেউ খেলিয়ে বেগে ছুটে চলেছে জলরাশি কল্-কল্ শব্দে অনর্গল। চৌরঙ্গীর মোড়ে ট্রামগাড়িগুলো নিশ্চল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও নেই অন্য কোন যানবাহন।

কালো আকাশের তলায় আলোয় আলোময় হয়ে আছে অভিজাতদের আদরের চৌরঙ্গী অঞ্চল, কিন্তু সে আলোর মালার বাহার দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছে না একজনমাত্র পথচারী ভিক্ষুকও, যেন জনমানবশূন্য অলৌকিক জগৎ।

সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে অনেকক্ষণ, গভীর হয়ে আসছে রাত্রি।

কুমার বললে, "বিমল, আর তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলে না ভাই! ঐ দেখ, 'বয়'রা পাততাড়ি গুটোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—হোটেল এইবার দরজা বন্ধ করবে।"

বিমল গা তুলে দু পা এগিয়ে বাইরেটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, "বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না। বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। রাস্তা-নদী দিয়ে দাঁড়-সাঁতার কেটে আজ বাড়ির দিকে এগুতে হবে।"

কুমার দাঁড়িয়ে উঠে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে নিলে। বললে, "তাই চল। আমি প্রস্তুত।"

চৌরঙ্গীর এক বিলাতী হোটেলে সন্ধ্যার পর তারা ডানহাতের ব্যাপার সারতে এসেছিল। তারপর এই অভাবিত দুর্যোগ।

রাস্তার অবস্থা দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল বটে, কিন্তু তারা আর কোন মতামত প্রকাশ

করলে না, অগ্রসর হল বিনাবাক্যব্যয়ে। ক্রমে তারা ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে ঢুকল বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ভিতরে।

তারপরেই এক বিচিত্র অঘটন।

আচম্বিতে ঝড়বৃষ্টির শব্দের উপরে জেগে উঠল তীব্র ও আর্ত কণ্ঠস্বর "মার্ডার! মার্ডার! হেল্প্!" (খুন! খুন! সাহায্য কর!)

বিমল ও কুমার সচমকে দেখতে পেলে, অদূরে রাস্তার উপরে ধস্তাধস্তি করছে তিনটে সাহেবের মূর্তি।

তারা তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ বেগে ছুটে গেল যুদ্ধমান মূর্তিগুলির দিকে।

কিন্তু তারা কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই একটি মূর্তি জলমগ্ন পথের উপরে ঝপাং করে পড়ে গেল এবং বাকি লোকদুটো বেগে দৌড়ে পাশের একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

ভূপতিত মূর্তিটা পথ দিয়ে ছুটন্ত জলস্রোতের মধ্যে অর্ধমগ্ন হয়ে ছটফট করছিল, বিমল তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তাকে তুলে ধরলে।

সে শ্বেতাঙ্গ যুবক, তার মাথার উপরে ও বুকের পাশে মারাত্মক অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, ক্ষতমুখ থেকে ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হয়ে উঠছে টক্‌টকে রক্তধারা এবং যন্ত্রণাবিকৃত মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কাতর কান্নার মত মর্মভেদী শব্দ।

বিমল বললে, "কুমার, শীগ্‌গির অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেবার ব্যবস্থা কর।"

ভদ্রলোক এতক্ষণ অর্ধচেতনের মত ছিলেন, এখন হঠাৎ চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণস্বরে বললেন, "আমার শেষ-মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে—আর কোন আশা নেই। আমার বক্তব্য ভালো করে শুনে রাখুন।"

"আপনার পরিচয় কি?"

"অনাবশ্যক কথা জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট করবেন না। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, আমার নাম ফুলব্রাইট, আমেরিকান, আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। উঃ! ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমি—" হঠাৎ থেমে পড়ে চোখ মুদে তিনি আরো জোরে হাঁপাতে লাগলেন—বিমল ভাবলে এখনি তিনি মারা পড়বেন।

প্রায় মিনিটখানেক এইভাবে থেকে হঠাৎ আবার চোখ খুলে ফুলব্রাইট ঝাঁকানি দিয়ে কুপিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "না না, এ হতে পারে না। কৃতঘ্ন শয়তান! এই লোভেই তোরা আমার মোসাহেবি করতিস? আমাকে খুন করে মায়াকবচ দখল করবি? না, না, তা কিছুতেই হবে না। মায়াকবচ যখন আমার নিজের ভোগে লাগল না, তখন আমি নিজের হাতে যাকে খুশি বিলিয়ে দেব, তবু তোদের স্পর্শ করতে দেব না—" বলতে বলতে ঝিমিয়ে পড়ে আবার তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল।

বিমল বুঝল ভদ্রলোকের মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। কিন্তু তখন তার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। মায়াকবচ কি? কারা তা দখল করতে চায়?

সে বললে, "মিঃ ফুলব্রাইট, মিঃ ফুলব্রাইট! আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?"

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে হঠাৎ চমকে উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে ফুলব্রাইট বললেন, "হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসছে। শুনুন! আমার বুকপকেটে ডায়েরী আর ঘড়ির পকেটে একটা কৌটো আছে—ও-দুটো জিনিস আপনাকে দিলুম, কিন্তু সাবধানে লুকিয়ে রাখবেন—যেন শয়তান স্মিথ আর হ্যারিস জানতে না পারে! সাবধান, খুব সাবধান, এ গুপ্তকথা আর কারুর কাছেও প্রকাশ করবেন না—কারণ ডায়েরী পড়লেই জানতে পারবেন।"

এমন সময়ে কুমার এসে খবর দিলে—অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করে দেওয়া হয়েছে।

ফুলব্রাইট আর কোন কথা বলবার চেষ্টা করলেন না, কেবল কম্পমান হাত তুলে নিজের বুকপকেটের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন এবং পর-মুহূর্তেই তাঁর দুই চোখ মুদে গেল এবং হাতখানা অবশ হয়ে পাশের দিকে ঝুলে পড়ল।

বুকপকেট ও ঘড়ির পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে বিমল বার করলে একখানা ডায়েরী ও একটি ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি ও লোকজন এসে পড়ল এবং সকলে মিলে ধরাধরি করে বেহুঁশ ফুলব্রাইটের নিস্পন্দ দেহ যখন গাড়ির ভিতরে তুলে দিলে, তখন মনে হচ্ছিল সেটা একটা মৃতদেহ।

দ্বিতীয় পর্ব

মায়াকবচের ম্যাজিক

বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় বদলে বিমল সর্বাগ্রে খুলে ফেললে সেই অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোটা।

ভিতরে ছিল তুলোয় মোড়া একটা টুকরো পদার্থ।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "কী ওটা? হঠাৎ দেখলে মনে হয় এক টুকরো সবুজ রঙের পাথর। কিন্তু ওটা থেকে কি রকম একটা আগুনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না?"

বিমলও কম বিস্মিত নয়। তীক্ষ্ণনেত্রে দেখতে দেখতে বললে, "হ্যাঁ। এমন একশো বাতির সমুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতেও এর মধ্যে জ্যোতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাক। কুমার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও তো।"

কুমার আলো নিভিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরোটা দীপশিখার মতই রীতিমত দীপ্তিমান হয়ে উঠল। একেবারে যাকে বলে নিবাত নিষ্কম্প অগ্নিময় শিখা।

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, "এ কী ব্যাপার! জ্বলন্ত পাথর! ইলেকট্রিকের মত স্থির আলো দেয়!"

হাতঘড়ির সামনে পাথরটা নিয়ে গিয়ে বিমল স্পষ্ট দেখতে পেলে ঘড়িতে রাত একটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে, বললে, "কি আশ্চর্য!"

তারা দুজনে অবাক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরের আলো জ্বালতেই পাথরের টুকরোটা নিষ্প্রভ হল না বটে, কিন্তু তার দীপ্তি অনেকটা ম্লান হয়ে গেল।

কৌতূহলী হয়ে জিনিসটা আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, "এটা খনিজ পদার্থ বা রত্ন নয়, কোন বড় পাথর থেকে কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, অত্যন্ত কঠিন পাথর, সহজে অস্ত্রের দাগ বসে না।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে রামহরির বিরক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"রাত একটার সময়ে কি ঘ্যান্-ঘ্যান্ করা হচ্ছে শুনি? মানুষকে কি ঘুমোতেও দেবে না?"

কুমার বললে, "মায়াকবচ! মায়াকবচ! রামহরি, দেখলে ঘুমোবে কি, মাথা তোমার ঘুরে যাবে!"

—"মাথা তো ঘুরিয়ে দিয়েছ অনেক বার, ও আমার সয়ে গেছে, নতুন করে আর ঘোরাতে পারবে না"—বলতে বলতে ও চোখ রগড়াতে রগড়াতে রামহরি যেই এ ঘরে এসে ঢুকল, কুমার অমনি আবার আলো নিভিয়ে দিলে।

—"আলো নিভিয়ে এ আবার কি রঙ্গ করা হচ্ছে শুনি?"

—"রঙ্গ নয় গো রামহরি, টেবিলের উপর চেয়ে দেখ।"

—"দেখব আবার কি বাপু? ওখানে তো টিম্ টিম্ করে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে।"

কুমার বললে, "উঁহু, ঠকে গেলে! এ আলো নয়, এ হচ্ছে পাথরের ঝলকানি।"

রামহরি রাগত কণ্ঠে বললে, "বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না কুমারবাবু, আমায় কি কানা না বোকা পেয়েছ? পাথর কখনো ঝলক মারে?"

কুমার খেলাচ্ছলে পাথরখানা যেই রামহরির দিকে নিক্ষেপ করলে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কৌতূহলী বাঘাও খবরদারি করবার জন্যে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। ফলে হল কি, রামহরি হাঁউমাঁউ করে সভয়ে চেঁচিয়ে সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল, আর সেই জ্বলন্ত পাথরের টুকরোটা পড়ল গিয়ে বাঘার ঠিক নাকের ডগায় এবং সে-ও তৎক্ষণাৎ কেঁউ করে ভীত চিৎকার তুলে

পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে সেই বিপদজনক ঘর ছেড়ে চট্‌পট্‌ সরে পড়ল। বাঘা অতিশয় সাহসী বটে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। তার সারমেয়-শাস্ত্রের অলিখিত বিধান হচ্ছে, আগুন নিয়ে খেলা দস্তুরমত মারাত্মক।

কুমার খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠে বললে, "রামহরি হে, আমরা ভানুমতীর খেল্‌ শিখেছি। এ আগুন জ্বালে, কিন্তু পোড়ায় না। এই দেখ, আগুনে আমার হাত পুড়বে না"—বলেই হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে আগুনের টুকরোটা মেঝের ওপর থেকে তুলে নিলে।

রামহরি আগে ঘরের আলোটা জ্বাললে। তারপর চক্ষু ছানাবড়ার মত করে দেখলে, কুমারের

হাতের চেটোর উপরে রয়েছে সবুজ রঙের একখণ্ড পাথর—এখন তা আর অগ্নিময় নয়—যদিও তার মধ্যে পাওয়া যায় মিন্‌মিনে আলোর আভা।

রামহরি হতভম্বের মত বললে, "কী ওটা? সবুজ হীরে?"

বিমল বললে, "না রামহরি, হীরায় খানিকটা দীপ্তি থাকে বটে, কিন্তু অন্ধকারে তা আলোর শিখার মত জ্বলে না।"

—"তবে ওটা কী?"

—"সেইটেই তো আমরা জানতে চাই, এস কুমার, ফুলব্রাইটের ডায়েরী এ সম্বন্ধে কি বলে দেখা যাক্।"

তৃতীয় পর্ব

ফুলব্রাইটের ডায়েরী

[ফুলব্রাইট ডায়েরী লিখেছিলেন বিভিন্ন তারিখে বিচ্ছিন্ন ভাবে। কোথাও দুই লাইন, কোথাও দশ লাইন, কোথাও বা পনেরো লাইন। মাঝে মাঝে ছিল এই কাহিনীর পক্ষে অবান্তর কথাও। কাজেই যথাক্রমে ডায়েরীর লেখা উদ্ধৃত করলে পাঠকদের যথেষ্ট অসুবিধা হবে এবং সেটা চিত্তাকর্ষক হওয়াও সম্ভবপর নয়। তাই এখানে অবান্তর বিষয় প্রভৃতি ত্যাগ করে কেবল মূল কথাগুলির সংক্ষিপ্তসার একসঙ্গে দেওয়া হলো—ইতি লেখক।]

আমরা তিনজন—অর্থাৎ স্মিথ, হ্যারিস ও আমি মিলে একসঙ্গে ওলন্দাজদের দ্বারা অধিকৃত নিউগিনি দ্বীপে উপস্থিত হলুম। জাতে আমি আমেরিকান, স্মিথ ইংরেজ এবং হ্যারিস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান। কাজেই তিন-দেশের লোক হলেও আমরা কথা বলি একই ভাষায়, সুতরাং কোন অসুবিধাই হয়নি।

ওলন্দাজদের নিউগিনির সমুদ্রতীরবর্তী কতকগুলি স্থানে আধুনিক সভ্যতার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভিতর দিকটা হচ্ছে একেবারে রহস্যময়, বিপদজনক ও অজ্ঞাত প্রদেশ—সভ্যতার কোন ছাপই সেখানে পড়েনি। সেখানকার মানুষরা হচ্ছে বনমানুষ, অর্ধনগ্ন বা পূর্ণনগ্ন দেহে বনে পাহাড়ে বিচরণ করে। তারা নরমুণ্ড-শিকারী, নরমাংস তাদের কাছে উপাদেয় খাদ্য। নরহত্যায় তাদের বিপুল আনন্দ। নিজেদের মধ্যেই তারা সর্বদাই মারামারি কাটাকাটি করে,—তাদের হাতে পড়লে বিদেশীদের বাঁচার কোন আশাই নেই। এই জন্যে দ্বীপ অধিকার করেও ওলন্দাজরা তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহস করে না।

নিউগিনির পার্বত্য অঞ্চল সোনার জন্য বিখ্যাত। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা থেকে দলে দলে লোক সেখানে গিয়েছে সোনার সন্ধানে এবং তাল তাল সোনার অধিকারী হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছে এমন লোকের সংখ্যাও অল্প নয়। সেই সোনার লোভেই আমরাও এসেছি এই বিপদজনক দেশে। এমন অজানা ও বিপদজনক দেশে একলা আসা উচিত নয় বলে স্মিথ ও হ্যারিসকেও আমার সঙ্গে নিয়েছি অংশীদার রূপে।

সমুদ্রের কাছে একটি ছোট্ট শহর আছে তার নাম হচ্ছে 'মেরকী'। তারপর সমতল ভূমির উপর দিয়ে বেশ কতদূর অগ্রসর হলে পাওয়া যায় বহুদূরব্যাপী পার্বত্য অঞ্চল। একটা পাহাড়ের নাম 'উইলহেলমিনা'—আকাশচুম্বী তার তুষারশুভ্র মুকুট। আর একটা পাহাড়ের নাম 'স্টেরেন'। এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে আছে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। তারই মধ্যে একটা পাহাড়ের উপরে দেখা যায় তিন তিনটে শিখর। মাঝের শিখরটা আর দুটোর চেয়ে আকারে ছোট—উচ্চতায়

বড় জোর হাজার ফুট। সেখানে এক উপত্যকায় অফুরন্ত সোনা পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোক তার নাম রেখেছে—'সোনার পাহাড়'।

এই পাহাড়টার নাম এখনো বাইরের লোকেরা জানতে পারেনি। আমি জানতে পেরেছি এক বিশেষ সুযোগে। এক আমেরিকান ভদ্রলোক ঐ অঞ্চলে অভিযানে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে শুনতে পান সোনার পাহাড়ের অস্তিত্বের কথা। স্থানীয় লোকেরা রীতিমত বন্য, জীবন কাটায় প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়। তারা সোনা চেনে বটে, কিন্তু তার জন্যে তাদের কোনই মাথাব্যথা নেই। আমি ঐ আমেরিকার বন্ধুর মুখে সোনার পাহাড়ে যাবার পথঘাটের বর্ণনা শুনে একখানি ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি।

কার্যোপলক্ষে আসতে হয়েছিল মেরকী শহরে। সেখানে এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত অসভ্য (ভূতের ওঝা বা) 'উইচ ডাক্তার'কে দেখতে পাই। কিছুকাল আমি ডাক্তারি পড়েছিলুম, প্রাথমিক চিকিৎসাও জানতুম। অসভ্য ও বৃদ্ধ লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে আমার মনে করুণার সঞ্চার হল। সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধের বাক্স ছিল। রোগীকে আমার বাসায় এনে সে প্রাণে বাঁচবে না জেনেও তাকে কিছু ঔষধ দিলুম এবং তার যাতনা কমাবার জন্যে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশনেরও ব্যবস্থা করলুম। দ্বিতীয় দিনেই তার অবস্থা চরমে উঠল। সে নিজেও বুঝতে পারলে তার অন্তিম মুহূর্তের আর বিলম্ব নেই।

তখন সে আমাকে ডেকে ক্ষীণস্বরে বললে, "আপনাকে আমি একটি অমূল্য জিনিস উপহার দিতে ইচ্ছা করি। কাছে আসুন।"

কার্যসূত্রে এ অঞ্চলে যেতে আসতে হত বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা অল্প-স্বল্প বুঝতে পারতুম।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তার কাছে সরে গিয়ে বসলুম।

সে সশব্দে শ্বাস টানতে টানতে বললে, "আমার গলায় কি ঝুলছে দেখছেন?"

দেখলুম তোবড়ানো পিতলের একখানা পদকের মাঝখানে বসানো একখণ্ড সমুজ্জ্বল সবুজ পাথর।

ওঝা বললে, "এ হচ্ছে মায়াকবচ। অন্ধকারে আগুনের মত জ্বলে। 'নারীদের উপত্যকা'য় এক পাহাড়ের বিরাট গুহায় এই আগুন-পাথরের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। আমি লুকিয়ে একখণ্ড কেটে এনেছি। এই মায়াকবচ দেখিয়ে সবাইকে আমি বশ করি। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। আমার অন্তিমকালে আপনি বন্ধুর মত সেবা করেছেন। তাই এই মায়াকবচ আপনার হাতেই দিয়ে যাব।"

আমি সবিস্ময়ে বললুম, "নারীদের উপত্যকা! সে আবার কোথায় আছে?"

—"উইলহেলমিনা পাহাড়ে। সেখানে গ্রামের রাস্তায় সারি সারি থামের উপরে এই আগুন-পাথরের মস্ত মস্ত গোলক বসিয়ে রাতের অন্ধকার তাড়ানো হয়। কবচখানা আপনি লুকিয়ে রাখুন, নইলে চুরি যাবে।"

ওঝাকে আরো অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না। তার অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপ হয়ে এল। সেই দিনেই শেষরাত্রের দিকে সে মারা পড়ল।

ব্যাপারটা স্মিথ ও হ্যারিসের চোখ এড়ায়নি। তাদের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে সব কথা আমি খুলে বলতে বাধ্য হলুম।

তারা কৌতূহলী হয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে—অন্ধকারে মায়াকবচের গুণ পরীক্ষা করবার জন্যে। তারপর সেই শীতল অথচ অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড দেখে তাদের দুই চক্ষু বিস্ময়ে

বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

স্মিথ বললে, "ওঝাটা কি বললে ফুলব্রাইট? রাতের অন্ধকার দূর করবার জন্যে এই পাথরের বড় বড় গোলক ব্যবহার করা হয়?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর রাস্তার ধারে সেই গোলকের তলায় থাকে ল্যাম্পপোস্টের মত সারি সারি থাম?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর একটা প্রকাণ্ড গুহায় ঐ আজব পাথরের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে?"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, "যা একবার শুনেছ, তা আরো কতবার শুনবে?"

হ্যারিস অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "ফুলব্রাইট, এর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে।"

—"কিসের সম্ভাবনা?"

—"আমরা যদি এই স্বাভাবিক আগুন-পাথরের গুহার মালিক হতে পারি, তাহলে কেবল দুনিয়াজোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করব না, ধনকুবের হয়ে উঠব। পৃথিবীতে আর কৃত্রিম আলোর দরকার হবে না, সর্বত্র ঘরে-বাইরে বিরাজ করবে এই চিরস্থায়ী স্বাভাবিক আলো।"

তখনও পর্যন্ত এই আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা আমার মনে উদয় হয়নি, এখন হ্যারিসের ভাষণ শুনে আমার মনটা চমকে উঠল। হ্যাঁ, এই আগুন-পাথর সোনার চেয়ে মূল্যবান বটে! ঐ গুহাটা আবিষ্কার করতে পারলে সারা পৃথিবী হৈ-হৈ করে উঠবে।

আপাতত স্মিথ ও হ্যারিসের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আবিষ্কার করলুম দারুণ লোভ ও দুর্দান্ত হিংসা।

আমার ভালো লাগলো না। তারা চোখের আড়ালে যেতেই আলো-পাথরের টুকরোটা পিতলের পদক থেকে খুলে নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর মধ্যে রেখে নিজের জামার ঘড়ির পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রাখলুম, সাবধানের মার নেই!

দিনতিনেক পরেই দেখলুম, সেই মূল্যহীন পিতলের পদকখানা আর আমার ঘরের ভিতরে নেই, বাইরে ঘাসজমির উপরে পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝলুম, চোর প্রস্তরশূন্য তুচ্ছ পদকখানা কোনই কাজে লাগবে না বুঝে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

চোর যে কারা তাও বুঝতে কষ্ট হল না, মুখে কিছু ভাঙলুম না বটে, তবে আরো সাবধান হলুম, পাথরখানা সরিয়ে ফেললুম ঘড়ির পকেটের চেয়েও গোপনীয় স্থানে।

তারপর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে হাজির হয়েছি, তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। আগে তো সোনার পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হই, তারপর আলো-পাথর নিয়ে মাথা ঘামাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আর বলতে কি, ভূতের ওঝার সব কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহও ছিল যথেষ্ট। অফুরন্ত আলো-পাথরের গুহা এবং আলো-পাথরের দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত করা প্রভৃতি কেমন যেন অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল, চোখে না দেখলে এ-সব ব্যাপার সত্য বলে মানা যাবে না।

তারপরেও স্মিথ ও হ্যারিস আমার আলো-পাথরের কথা তুলেছে।

আমি অবহেলা ভরে বলেছি, "পাথর আর আমার কাছে নেই, পকেট থেকে কখন কেমন করে পড়ে গিয়েছে।"

মুখ দেখে বোঝা গেল, তারা আমার কথায় বিশ্বাস করেনি।

অভিযানের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের

ভিতর থেকে প্রায় পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ লোক বেছে নিলুম। এই বৃহৎ দলের মধ্যে ছিল রক্ষী, পাচক, ভৃত্য, কুলি এবং কুলিসর্দার প্রভৃতি।

মেরকী থেকে আমরা যাত্রা করলুম প্রথমে দিগন্তব্যাপী শ্যামলতায় সমাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রের

উপর দিয়ে, যেখানে বিশেষ পথকষ্টের বালাই নেই। তারপর এল জলাভূমির পর জলাভূমি, তারপর আরো জলাভূমি, সূর্যালোকে তাদের জল ইস্পাতের মত চক্‌চক্ করে, পথচলা হয়ে উঠল বিশেষ কষ্টকর। সেই স্যাঁৎসেতে জায়গায়, যখন-তখন চোখে পড়ে প্রায় তিনহাত লম্বা-লম্বা কেঁচো, তাদের দেহের বেড় দুই ইঞ্চির কম হবে না। তারা বিস্ময়কর হলেও ভীতিকর নয়, কারণ মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পড়লুম সমূহ বিপদে।

জায়গাটা ছিল জঙ্গলে আচ্ছন্ন। পথের উপর নিদ্রিত হয়েছিল একটা বৃহৎ জীব, যাকে অনায়াসেই বলা চলে রাক্ষুসে গিরগিটি। তার দৈর্ঘ্য অন্তত দশ ফুট বা তারই কাছাকাছি। গিরগিটি না বলে তাকে স্থলচর কুমির বললে নিতান্ত ভুল বলা হবে না। পায়ে তার বড় বড় ধারালো নখ।

দেখেই তো আমাদের চক্ষুস্থির। চমকে উঠে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

কিন্তু আমাদের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে তৎক্ষণাৎ দন্তভীষণ মুখব্যাদান করে ভাল্লুকের মত পিছনের দুইপায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই পা বাড়িয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল, বোঝা গেল পরমুহূর্তেই আমাদের আক্রমণ করবে।

প্রথমটা আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তারপরেই সে ভাবটা সামলে নিলুম। স্মিথ, হ্যারিস ও আমি তিনজনেই একসঙ্গে বন্দুক তুলে বুলেট-বৃষ্টি করলুম। রাক্ষুসে গিরগিটি বা বৃহৎ কুমিরের মত দেখতে সেই ভয়ানক জানোয়ারটা তিন-তিনটে বন্দুকের দারুণ অগ্নিবৃষ্টি হজম করতে পারলে না, ধপাস করে হল পপাতধরণীতলে এবং মাটির উপরে দুইবার প্রকাণ্ড লাঙ্গুলটা সশব্দে আছড়ে একেবারে স্থির আড়ষ্ট হয়ে গেল। ড্রাগন নামক কল্পিত জীবের অসংখ্য ছবি এঁকেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিত্রকররা, এই জীবটাকে দেখলে সেই ছবি স্মরণে আসে। এর দাঁতালো মুখবিবর, ক্ষুরধার নখরই কেবল মারাত্মক নয়, ঐ স্থূল লাঙ্গুলের এক ঝাপটাতেই যে কোন মানুষের প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হতে পারে।

পাছে আবার কোন সাংঘাতিক কিম্ভূতকিমাকারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়ে আমরা দিকে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে পথ চলতে লাগলুম।

কেবল কি রাক্ষুসে গিরগিটি? বিপদ এখানে পদে পদে, একরকম বহুপদবিশিষ্ট কেন্নোর মত জীব দেখলুম, তাদের দংশন বিষাক্ত; বিচ্ছুরাও দেখা দেয় চারিদিকে; তাড়া করে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতারা; তারপর পালে পালে ম্যালেরিয়ার মশা, তাদের বিষ মারবার জন্য প্রচুর কুইনাইন খেয়ে মাথা করতে লাগল ভোঁ-ভোঁ; এবং এদেশী মাছিদেরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার জো নেই, কারণ তারাও কটাস্ কটাস্ কামড় মেরে প্রাণ করে তোলে ওষ্ঠাগত।

জীবন যখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং সকলেই যখন হাল ছাড়ি-ছাড়ি করছি, তখন দূরে দূরে আত্মপ্রকাশ করলে ছোট ছোট পাহাড়ের পিছনে দিগন্তরেখাকে আড়াল করে এবং আকাশের অনেকখানি ঢেকে মেঘচুম্বিত শৈলশ্রেণী।

পার্বত্য প্রদেশের কাছাকাছি এসেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলুম, অন্তরে জাগ্রত হল নবজীবনের আনন্দ। ঐ পর্বতমালারই কোন এক জায়গায় আছে এই সুদীর্ঘ পথের শেষ,—এবং যেখানে বিরাজ করছে আমাদের কামনার স্বপ্ন সোনার পাহাড়ের তিন শিখর।

ম্যাপখানা বার করে একবার দেখে নিলুম ঠিক পথে চলেছি কিনা। না, কোন ভুল হয়নি।

স্মিথ বিপুল পুলকে বলে উঠল, "তাল তাল সোনা। লক্ষ লক্ষ টাকা!"

হ্যারিস বললে, "দুর বোকা, তোর নজর ভারি নীচু! লক্ষ লক্ষ কি রে, বল কোটি কোটি টাকা!"

আমরা এখন থেকেই মেঘের প্রাসাদ গড়তে শুরু করেছি। কিন্তু এই বিপদবহুল দুস্তর পথের শেষে কি আছে তা কে জানে?

আশ্চর্য! আমার সন্দেহই সত্যে পরিণত হল সেই রাত্রেই।

প্রতি সন্ধ্যাতেই আমরা পদচালনা বন্ধ করে তাঁবু খাটিয়ে ফেলি। পাচক যখন রান্নাবান্না নিয়ে নিযুক্ত থাকে, আমরা তখন বিশ্রাম করি এবং গল্প-গুজবে সময় কাটাই, তারপর আহার ও নিদ্রাদেবীর আরাধনা। পরদিন প্রভাতে উঠে আবার যাত্রা আরম্ভ হয়।

সেদিনও তিনজনে তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে গল্প করতে করতে তাস খেলছি। আকাশে প্রায়-পুরন্ত প্রতিপদের চাঁদ। জলাভূমির জলে স্নান করতে নেমেছে রুপোলী জ্যোৎস্না। জলার ওপারে দেখা যাচ্ছে আলোমাখা কালো বন, চারিদিকের নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভেঙে দিচ্ছে অজানা পাখির ডাক।

আচম্বিতে নির্মেঘ আকাশে বজ্রগর্জনের মত সেই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ভয়াল করে তুললে কি এক প্রচণ্ড হুঙ্কার ! পৃথিবীর কোন জীবের কণ্ঠ থেকে যে এমন অপার্থিব, অত্যুগ্র ও কান-ফাটানো হুঙ্কার বেরুতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। আমরা তিনজনেই তাস ফেলে সচমকে উঠে দাঁড়ালুম।

আমাদের নজর ছুটে গেল জলার ওপারে। ওখানে জঙ্গলের উপরে দুলে দুলে উঠছে একটা বিরাট ও জমাট কালো অপচ্ছায়া—তার শীর্ষদেশটা রয়েছে মাটি থেকে অন্তত বিশ-বাইশ ফুট উপরে, আর তার নিচের দিকটা রয়েছে যে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে, সেটা আমি আমলেই আনতে পারলেম না। পঞ্চাশ-ষাট ফুট হওয়াও অসম্ভব নয়।

স্মিথ সভয়ে বললে, "ওটা কোন্ জানোয়ার? ওর তুলনায় হাতিও যে পুঁচকে ইঁদুরের মত!"

হ্যারিস অভিভূত স্বরে বললে, "এ দ্বীপে হাতির অস্তিত্ব নেই।"

আমি বললুম, "এমন বিশাল জানোয়ার পৃথিবীতে আছে বলে কেউ জানে না।"

আবার—আবার তার বুক-স্তম্ভিত করা বীভৎস গর্জন ছড়িয়ে পড়ল আকাশের দিকে দিকে। বার বার তিনবার, তারপর সে জলার পার্শ্ববর্তী পথের দিকে লম্ফত্যাগ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরে হল ভূমিকম্প!

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে স্মিথ বললে, "কি ভয়ানক! ওটা যে এই দিকেই আসছে!"

হ্যারিস বললে, "বন্দুক নাও বন্দুক নাও!"

আমি মাথা নেড়ে বললুম, "বন্দুকে কোন কাজ হবে না। ওকে থামাতে গেলে কামান দরকার।"

লাফে লাফে এগিয়ে আসতে লাগল সেই অদ্ভুত দুঃস্বপ্নটা। প্রত্যেক লাফের পর খালি পৃথিবীর মাটি নয়, আমাদের বুকের ভিতরটাও ওঠে থর্ থর্ করে কেঁপে কেঁপে।

এমন সময় বেগে ছুটে এল আমাদের কুলি সর্দার, তার হাবভাব উদ্‌ভ্রান্তের মত।

—"ওটা কি, সর্দার?"

—"কাছিমমুখো শয়তান!"

—"কাছিমমুখো শয়তান! সে আবার কি?"

—"বলবার সময় নেই। আমাদের লোকজনরা এর মধ্যেই পালিয়ে গেছে, আমিও পালালুম—বাঁচতে চান তো আপনারাও আসুন হুজুর!"

কুলিসর্দার অদৃশ্য হল। আমি ডাকলুম, সে কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

স্মিথ ত্রস্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ!"

সবিস্ময়ে দেখলুম, চার-চারটে রাক্ষুসে গিরগিটি বা স্থলচর কুমির তীরবেগে একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আর একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ওরাও পালাচ্ছে প্রাণে বাঁচবার জন্যে। কাছিমমুখো শয়তান কি এতই হিংস্র?

কিন্তু কাছিমমুখো শয়তান আবার কি? তা সে যাই-ই হোক, কাল্পনিক কিছু যে নয়, চোখের সামনে সেটা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণে পদভারে ভূমিতল বারবার কাঁপিয়ে সেই বিরাট, জীবন্ত ও ঘনীভূত অন্ধকারটা আমাদের আরো কাছে এসে পড়েছে। ঘন ঘন কর্ণপটকে আঘাত করছে তার ক্ষুধার্ত হুঙ্কার। সে হুঙ্কার শুনলে মনে হয় যেন অনেকগুলো সিংহ সমস্বরে গর্জন করছে।

আমরা আর সহ্য করতে পারলুম না—বেগে পলায়ন করলুম প্রেত ভয়গ্রস্তের মত। হায় রে সোনার পাহাড়ের সোনার স্বপ্ন! ভেঙে গেল এক মুহূর্তেই!

কয়েকদিন পরেই জনকয়েক নারাজ কুলিকে কোনরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে আবার সেখানে গিয়ে ভয়ে ভয়ে হাজির হয়েছিলুম।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। যেন ভীষণ ঝঞ্ঝাবর্তে আমাদের তাঁবুগুলো কোথায় উড়ে গিয়েছে এবং তছনছ হয়ে গেছে সমস্ত রসদ ও আর যা কিছু। কে যেন জ্যান্ত শিকার না পেয়ে সমস্ত ধ্বংস করে ফেলেছে বিষম আক্রোশে।

আমি দুঃখে ভেঙে পড়ে হতাশভাবে বললুম, "আমি দুহাতে টাকা ঢেলে এতবড় আয়োজন করেছিলুম। এখন আমি প্রায় ফতুর, এ যাত্রায় আর কোন নতুন আয়োজন করা সম্ভব নয়।"

স্মিথ গম্ভীর ভাবে বলল, "তাহলে আর সোনার পাহাড়ে যাওয়া হবে না?"

—"বললুম তো, এ যাত্রায় নয়। তোমরা যেখানে খুশি চলে যাও।"

তারা মুখ কালো করে তখনকার মত সেখান থেকে প্রস্থান করলে বটে, কিন্তু দুদিন পরেই বেশ বুঝতে পারলুম যে, তারা অদৃশ্য হলেও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

একরাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঘরের ভিতরে যেন পায়ের শব্দ শুনলুম। স্বপ্নের ভ্রম ভেবে আর জেগে উঠলুম না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি শিয়রের কাছ থেকে হাতব্যাগটা অদৃশ্য হয়েছে। তার মধ্যে আমার দরকারী খুচরো জিনিসপত্র থাকত বলে ব্যাগটাকে কাছছাড়া করতুম না। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহলে ভুল শুনিনি? রাত্রে ঘরে চোর ঢুকেছিল?

কিন্তু তার খানিক পরেই ব্যাগটা আবিষ্কৃত হল বাসার সঙ্গে সংলগ্ন পোড়ো ঘাসজমির উপরে। ব্যাগটা খোলা। ভিতরের জিনিসপত্র জমির উপরে ছড়ানো, কিছুই চুরি যায়নি। চোর এল, ব্যাগ সরালে, অথচ কিছুই চুরি করলে না—এ কেমন ব্যাপার? আসলে চোর যার লোভে এসেছিল, সেটা খুঁজে পায়নি—অর্থাৎ, তারা সাধারণ চোর নয়।

এই অসাধারণ চোর কিসের লোভে এসেছিল, সেটা বুঝতে দেরি হল না। বুঝলুম এবার আমার জীবন বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ এবার তারা সংহার-মূর্তি ধারণ করে আসতে পারে। মেরকী থেকে সরে পড়লুম, গিয়ে একেবারে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন নগরে।

কিন্তু তবু শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়া চলল না। একদিন একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা পান করছি, হঠাৎ দুই মূর্তি ভিতরে এসে ঢুকল—স্মিথ ও হ্যারিস। খুব সম্ভব তারা তখনও আমায় দেখতে পায়নি, আমি তখন মুখের সামনে একখানা খবরের কাগজ তুলে ধরে তার আড়ালে আত্মগোপন করলুম। খানিক পরেই তারা চা পান করে বাইরে চলে গেল।

এখানেও শনির দৃষ্টি ফিরছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। ছলে-বলে কৌশলে যেমন করে হোক ওরা আলো-পাথর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়! কিন্তু আমারও সুদৃঢ় পণ এ দুর্লভ জিনিস কারো

হাতে তুলে দেব না, নিজেই আলো-পাথরের গুহা আবিষ্কার করব। তার ফলে আমি ধনকুবের তো হব বটেই, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অমরত্বও অর্জন করতে পারব।

শত্রুদের ফাঁকি দেবার জন্যে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলুম। এবারে এসেছি কলকাতায়। পনেরো দিন হতে চলল, এখনও স্মিথ ও হ্যারিসকে চোখে দেখতে পাইনি। বোধহয় আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হতভাগারা নাগাল ধরতে পারেনি।

—এইখানেই ডায়েরীর শেষ।

কুমার শুধোলে, "এখন আমাদের কর্তব্য?"

বিমল বললে, "সকালে প্রথমেই হাসপাতালে গিয়ে ফুলব্রাইটের খবর নিতে হবে। এ-যাত্রা তিনি যদি রক্ষা পান, তাহলে তাঁর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে হবে।"

—"কিসের ব্যবস্থা?"

—"নিউগিনি যাত্রার।"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "তাহলে তোমার আগ্রহ জেগেছে?"

—"নিশ্চয়ই ! তোমার কি জাগেনি?"

—"সে কথা আর বলতে। আমি পা বাড়িয়েই বসে আছি।"

—"জানি কুমার, জানি। যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, সেখানেই তোমার আমার আগ্রহ জাগ্রত। আগুনের মত জ্বলে ওঠে। আমাদের রক্তে, আমাদের শিরায় শিরায়, আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে আছে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, ঘরমুখো বাঙালীর ঘরে জন্মেও আমরা হতে চাই বিশ্বমানবের আত্মীয়, আমরা ধন-মান-খ্যাতি কিছুই প্রার্থনা করি না, আমরা চাই শুধু ঘটনার আবর্তে ঝাঁপ দিতে, উত্তেজনার পর উত্তেজনা উপভোগ করতে, নব নব দৃশ্য আর সৌন্দর্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে। সক্রিয় জীবন চাই, গতির বন্যা চাই, বিপদের মহোৎসব চাই।"

পরদিনের প্রভাতে চা-পানের পালা সেরেই ছুটল তারা হাসপাতালে। ভালো খবর পাবে বলে তারা আশা করেনি, পেলেও না। শেষরাত্রেই ফুলব্রাইট অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

কুমার দুঃখিত ভাবে বললে, "তাহলে উপায়?"

—"কিসের উপায়?"

—"আলো-পাথরের কি ব্যবস্থা হবে?"

—"এখন তো আলো-পাথরের মালিক হচ্ছি আমরাই। ফুলব্রাইট নিজে ও-জিনিস আমাদের দান করে গিয়েছেন। কিন্তু আপাতত আর একটা কথা ভেবে দেখ, খুব সম্ভব আজকেই পুলিসের তরফ থেকে আমাদের ডাক আসবে।"

—"হ্যাঁ, আমিও তা আন্দাজ করছি। এটা খুনের মামলা হয়ে দাঁড়ালো, আর প্রধান সাক্ষী হচ্ছি আমরা দুজনই।"

—"কিন্তু খুব হুঁশিয়ার থেকো কুমার, ঘুণাক্ষরেও আলো-পাথরের কথা প্রকাশ করে ফেলো না, তাহলে বড়ই জানাজানি হয়ে যাবে—এমনকি ও জিনিসটা আমাদের হাতছাড়াও হতে পারে। এখন চল, আমাদের মূর্তিমান এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসি।"

—"কেন?"

—"নিউগিনি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি অনেক জানবার কথা বলতে পারবেন।"

চতুর্থ পর্ব

মূর্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া

যাঁরা বিমল ও কুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁদের কাছে প্রায় বিনয়বাবু ও তাঁর প্রিয়পাত্র তরুণ কমলেরও নাম নিশ্চয়ই অজানা নয়। বিমল ও কুমারের কয়েকটি প্রধান ও স্মরণীয় অভিযানে তাঁরাও সঙ্গী হয়ে যাত্রা করেছিলেন, দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছেন বিনয়বাবু ও সবচেয়ে ছোট কমল।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিনয়বাবু অসাধারণ মানুষ, এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি কিছু-না-কিছু বলতে পারেন, এই জন্যেই বিমল তাঁকে বলে মূর্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া। কোন অজানা তথ্য জানতে হলে সে সোজা গিয়ে হাজির হত বিনয়বাবুর কাছে।

সেদিন সকালে বিনয়বাবু তাঁর পড়বার ঘরে বসে খবরের কাগজ পাঠ করছিলেন। মাথায় কিছু খাটো, দোহারা চেহারা, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর শরীর বেশ বলিষ্ঠ আছে, সৌম্য মুখের নিচের দিকে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। পড়বার প্রকাণ্ড কক্ষের চারিদিকেই দেখা যায় মস্ত মস্ত আলমারি, সেগুলোর তাকে তাকে সযত্নে সাজানো এবং সোনার জলে নাম-লেখা মোটা মোটা কেতাব। সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে এই দেওয়াল-ঢাকা আলমারির সারি এবং ঝক্‌ঝকে কেতাবের পর কেতাব।

সেই ঘরে প্রবেশ করল বিমল ও কুমার।

তাদের দেখেই বিনয়বাবু একগাল হেসে হাতের কাগজ সামনের টেবিলের উপরে রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে মৃণু, ও কমল। বিমল আর কুমার এসেছে—তাড়াতাড়ি চা, টোস্ট আর ওমলেট না পেলে বড়ই রেগে যেতে পারে।"

হাসিমুখে কমল তখনি দৌড়ে এল। মৃণু নেপথ্য থেকে উচ্চস্বরে বললে, "ওদের রাগ করতে মানা কর, আমি চটপট চা-টা করে এখনি ছুটে যাচ্ছি।"

বিমলও গলা তুলে বলল, "ভেবো না মৃণু-দিদি, তোমার উপর রাগ করতে আমি ভয় পাই, সুতরাং তুমি আশ্বস্ত হতে পারো।"

বিমলের পরিচিত লোকেরা সবাই এই মৃণু মেয়েটিকেও খুব ভাল করেই চেনে। মেয়ে তো নয়—যেন বারুদভরা তুবড়ি! সর্বদাই আগুনের ফুলকি ছড়াবার জন্যে প্রস্তুত। আবার আর একদিক দিয়ে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেও সে শিশুর মত সরল ও ছটফটে। কথার খই ফোটে তার নাকে-মুখে অনর্গল। মাঝে মাঝে সে-ও বিমলদের অভিযানের মধ্যে জোর করে অংশ নিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' ও 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' প্রভৃতি পুস্তক যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরাই জানেন গেছো মেয়ে মৃণুর দুঃসাহসের কথা।

চোখ থেকে চশমাখানা খুলে নিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "তারপর? তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, একটা কোন গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। কেমন? তাই নয় কি?"

বিমল হেসে ফেলে বললে, "ঠিক ধরেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য অন্তত প্রশান্ত মহাসাগরের মতই গভীর।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিনয়বাবু বললেন, "ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মত হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের নাম করলে কেন?"

—"কারণ, আমাদের দৃষ্টি এখন প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে।"

—"ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়! আবার কোন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে চাও বুঝি?"

কমল তড়াক্ করে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "নতুন অ্যাডভেঞ্চার? ওহো কি মজা! বিমলদা, আমিও যাব!"

এক ধমকে তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বিনয়বাবু বললেন, "চোপরও কমল! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! বিমল, কুমার, তোমাদের শাকরেদি করে ছোকরা অসম্ভব ডানপিটে হয়ে উঠেছে।"

কুমার বললে, "গোবরগণেশ না হয়ে কমল যে ডানপিটে হয়ে উঠেছে এ সৌভাগ্যের কথা। গোবরগণেশরা থাকে লোকের পায়ের তলায়, আর ডানপিটেরা মাথার উপরে। ডানপিটেদের সর্দার ছিলেন আলেকজান্ডার, চেঙ্গীজ খাঁন, তৈমুর লং, নেপোলিয়ন, নেলসন।"

বিনয়বাবু বললেন, "দোহাই কুমার, আগুনে আর ঘৃতাহুতি দিও না।"

এমন সময়ে চা ও খাবারের ট্রে হাতে করে মৃণু এসে ঢুকল ঘরের ভিতরে। বললে, "আসতে আসতে শুনতে পেলুম আগুন ও ঘৃতাহুতির কথা। আগুন কোথায় বাবা, ঘৃতাহুতি দিচ্ছেই বা কে?"

বিনয়বাবু অধীর স্বরে বললেন, "আগুন আছে আজকালকার তরুণদের মগজে, আর ঘৃতাহুতি দিচ্ছে তাদেরই হাতগুলো।"

মৃণু বললে, "বাজারে ঘিয়ের দাম জানো তো বিমলদা, উনুনের আগুনে না ঢেলে ঘি ঢালা উচিত কড়ার ভিতরে।"

বিনয়বাবু বললেন, "বাছা মৃণু, এখানে বাজে সময় নষ্ট না করে তুমি ঘর-সংসারের কাজ দেখ গে যাও।"

মৃণু জোরে মাথা নেড়ে বললে, "মোটেই না। বিমলদা, কুমারদার সঙ্গে কথা কইলে বাজে সময় নষ্ট করা হয় না। আগুনে ঘৃতাহুতির গুপ্তকথাটা না শুনে এখান থেকে এক পা নড়তে রাজী নই।" একখানা চেয়ার টেনে সোজা সে বসে পড়ল।

মৃণু একে মা-হারা, তায় বাপের একমাত্র সন্তান। সেইজন্যে বিনয়বাবুকে তার আবদার সর্বদাই রক্ষা করতে হয়। তিনি বুঝলেন মৃণু একটা কিছু সন্দেহ করেছে, সব কথা না শুনে সে কিছুতেই যাবে না। কাজেই হাল ছেড়ে তিনি নাচারের মত বললেন, "প্রশান্ত মহাসাগরের কথা কি জিজ্ঞাসা করছিলে বিমল?"

—"প্রশান্ত মহাসাগরে একটা দ্বীপ আছে তার নাম নিউগিনি।"

—"হ্যাঁ। সে দ্বীপের অধিকাংশ জুড়ে বাস করে নররাক্ষসের দল!"

—"নররাক্ষসের দল?"

—"হ্যাঁ। তাদের সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে মানুষের মাংস।"

—"এই দ্বীপের কথা আপনি জানেন?"

—"জানি কিছু কিছু।"

—"আমরা জানতে চাই।"

—"কিন্তু কেন?"

—"আগে শুনি, তারপর সব কথা বলব।"

—"বুঝেছি, ওখানে গিয়েও গোলমাল করবার সাধ হয়েছে বুঝি? কিন্তু গোড়াতেই বলে

রাখছি অমন মারাত্মক বাসনা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। সে হচ্ছে সর্বনেশে দ্বীপ, শ্বেতাঙ্গরাও তার ভিতরে ঢুকতে পারেনি।"

—"প্রথম থেকেই আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন কেন বিনয়বাবু? আগে দ্বীপের কথাই বলুন না কেন?"

বিনয়বাবু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "হুঁ। নিয়তি কেন বাধ্যতে—নিয়তিকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে শোন।"

পঞ্চম পর্ব

মহাকায় জীব ও সোনার খনি

"প্রচণ্ড লোভী শ্বেতাঙ্গ জাতিরা পৃথিবীর কোন দেশেই তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বাকী রাখেনি। কী খুঁজেছে তারা? হীরা, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি এবং অন্যান্য নানা জাতীয় খনিজ দ্রব্যাদি; তার উপরে আছে বাণিজ্য ও রাজ্যলোভ। এই সব লোভের নেশায় মাতাল হয়ে তারা আজ পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দিকে দিকে অশ্বেত জাতিদের উপরে যে-সব অমানুষিক ও পাশবিক অত্যাচার করেছে, তার অগুন্তি রক্তাক্ত উদাহরণ ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যায় না। ইতিহাসের বিপুল গর্ভেও অত বেশি কু-কাণ্ডের স্থান-সংকুলান হয় না।

কিন্তু নিউগিনির বিরাট ভাণ্ডারে বিভিন্ন ঐশ্বর্য ঠাসা থাকলেও শ্বেতাঙ্গ দুরাত্মারা তার অধিকাংশেরই উপরে লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপে রাজী হয়নি—লোভের অভাবে নয়, ভয়ের প্রভাবে। পৃথিবীতে আজ এই একটি মাত্র দেশ আছে, যার অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি শ্বেতাঙ্গদের সর্বদর্শী 'সার্চলাইট'। সেখানে বাসা বেঁধে আছে বহু অভাবিত রহস্য, বহু রোমাঞ্চকর বিভীষিকা ও বহু রক্তপাগল বন্য মানুষের দল—তাদের কেউ পরে মাত্র কৌপীন, কেউ কোমরে ঝুলিয়ে রাখে লজ্জারক্ষার জন্যে এক টুকরো ন্যাকড়া এবং কেউ বা থাকে নাগা সন্ন্যাসীদের মতন সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

তবু কিছু কিছু কানাঘুষায় শোনা গেছে। কিছু কিছু দেখা গেছে আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে। তার কতক-কতক সত্য বা অর্ধসত্য। বাকী বাজে গুজব বা কল্পনা-জল্পনা। সে-সব কথাও অল্প-স্বল্প বলব। তোমরা বিশ্বাস করতেও পার, গাঁজার ধোঁয়া বলে উড়িয়েও দিতে পার।

আপাতত মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বলছি, তোমরা শুনে রাখ।

অস্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে বলতে হবে, নিউগিনি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বীপ। তার অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বদিকে।

চারিদিকে তার বিস্তার হচ্ছে প্রায় তিনলক্ষ বারো হাজার বর্গ মাইল। দ্বীপটি লম্বায় প্রায় এক হাজার তিনশো মাইল এবং তার সবচেয়ে চওড়া অংশ প্রায় পাঁচশো মাইলের কম নয়।

দ্বীপটি নদীবহুল। প্রত্যেক নদীর নাম আমি জানি না এবং উল্লেখ করবারও দরকার নেই, তবে ওদের মধ্যে বৃহত্তম নদীগুলির নাম হচ্ছে ফ্লাই, সেপিক, পুরারি, মার্কহাম, ডিয়োগেল, রামু ও মেম্‌বার‍্যানো।

দ্বীপের পূর্ব অংশের চেয়ে পশ্চিম অংশ হচ্ছে শৈলসংকুল। অনেক পাহাড়ের অনেক নাম। মেঘচুম্বী পাহাড়েরও অভাব নেই—তাদের উপরে পনেরো হাজার ফুট উঠলেই চিরতুষারের রাজ্য পাওয়া যায়। সেই বিজনতায় ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, শ্যামলতা নিশ্চিহ্ন।

দ্বীপের দিকে দিকে দেখা যায় গভীর জঙ্গল ও ঝোপঝাপ। তার মধ্যে সর্বত্রই সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারিকেল গাছ, কলাগাছ ও 'ম্যাংগ্রোভ' বা গরান কাঠের গাছ প্রভৃতি। সেই বনরাজ্যে বাস করে জানা-অজানা কত জাতের পাখি। তাদের মধ্যে 'বার্ড অফ প্যারাডাইস' বা স্বর্গের পাখির নাম তো পৃথিবীবিখ্যাত।

দ্বীপের বাসিন্দারা পুরোপুরি কাফ্রী না হলেও তাদের কাফ্রীজাতীয় বলা চলে, দেখতে অনেকটা আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীদের মত। পশ্চিম অংশে যাদের দেখা যায় তাদের গায়ের রঙ খুব কালো নয় এবং তাদের দেখলে মনে পড়ে মালয়ের বাসিন্দাদের কথা। পশ্চিম নিউগিনির পার্বত্য উপত্যকায় আর এক শ্রেণীর কাফ্রী জাতীয় লোক আছে তারা প্রায় বামনের মত মাথায় খাটো। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় বাস করে নিগ্রোরা, তারা দীর্ঘকায় এবং সভ্যতার দিক দিয়েও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। নিউগিনির লোক-সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভবপর হয়নি—কারণ, তার অধিকাংশই কেবল দুর্গম না, রীতিমত বিপদজনক। তবে আন্দাজ করা হয় সেখানে দশ লক্ষের বেশি লোক বাস করে না।

নিউগিনির পূর্বাঞ্চল ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত এবং এই অংশে কিছু কিছু সভ্যতার ছায়াপাত হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ওলন্দাজরা। তারা এই অংশের নাম দিয়েছে হল্যান্ডিয়া। কিন্তু স্বাধীন হবার পর ইন্দোনেশিয়া তাদের এই দাবি মানতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো সুমাত্রা, জাভা ও বালি প্রভৃতি দ্বীপের মত পশ্চিম-নিউগিনিও ওলন্দাজদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ওলন্দাজদের অধিকৃত নিউগিনির মধ্যবর্তী অংশকে প্রায় অজ্ঞাত প্রদেশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। নির্বাসিত সেখানে সভ্যতার আলোক—বিরাজ করছে ঘোরতর অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দৈবগতিকে বাইরে ছিটকে এসে পড়ে দুই-একজন পথভ্রান্ত, বন্য, উটকো মানুষ। কিন্তু তাদের মুখ থেকে যে-সব কথা শোনা যায়, তা উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা বলে—বনে, উপত্যকায় ও জলাভূমির বাসিন্দা হচ্ছে এমন সব দানবের মত ভয়াবহ মহাকায় জীব, যারা মাটির উপরে পা গুটিয়ে বসে গাছের উঁচু ডাল থেকে স্বচ্ছন্দে মুখ বাড়িয়ে ফল পেড়ে খেতে পারে।

তবে এক বিষয়ে অত্যুক্তি নেই। লোক-সংখ্যা দশ লক্ষের বেশি না হলেও সেখানকার বাসিন্দারা শত শত জাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে রক্তপিপাসা হচ্ছে অত্যন্ত প্রবল। যে ল্যাংটো হয়ে বেড়ায় আর যে কেবল কপ্‌নি পরে,— তারা সবাই থাকে সর্বদাই যুদ্ধসাজে সজ্জিত। তাদের এক-একজনের এক-এক রকম অস্ত্র—ধনুক, বর্শা বা কাঁটাওয়ালা গদা প্রভৃতি। তারা মাথায় পরে 'স্বর্গের পাখি'র রঙ্গিন পালক, তাদের নাকে বেঁধানো থাকে হাড়ের টুকরো এবং গলায় দোলে সামুদ্রিক ঝিনুক বা কড়ি প্রভৃতির মালা।

বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেও এক বিষয়ে তাদের মধ্যে মতান্তর নেই। তাদের সকলেরই শখের খেলা হচ্ছে, যুদ্ধবিগ্রহ। হাতে কাজ না থাকলেই তারা হৈ-চৈ রবে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে। দুই জাতের লোক এক জায়গায় জড় হলেই শুরু হবে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি। তারপর বিজিতদের মৃতদেহগুলো নিয়ে বিজেতারা ঢোল বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে ও জয়নাদ করতে করতে ফিরে আসবে। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন, উনুনে চড়বে বড় বড় হাঁড়ি, তাদের মধ্যে সিদ্ধ হবে শত্রু-মানুষের দেহ থেকে নেওয়া মাংস এবং তারপর সকলে মিলে মহা আনন্দে গোগ্রাসে করবে সেই মাংস ভক্ষণ।

আবার এও শোনা যায়—নিউগিনির কোন কোন অঞ্চলের মানুষ সভ্যতায় বেশ অগ্রসর হয়েছে। তারা ছোট ছোট শহরে বাস করে, চাষ-আবাদ করে, কাঠ ও গাছের পাতা দিয়ে কারুকার্য-করা ঘরবাড়ি তৈরি করে। জলপথে তারা লম্বা লম্বা বাহারি নৌকা চালায়, বড় বড় বেগবতী নদীর উপর দিয়ে এপার-ওপার করবার জন্যে দেড়শো ফুট লম্বা সেতু বানায়।

আর একটা অবিশ্বাস্য গল্প শোনা যায়, পার্বত্য প্রদেশে একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 'নারীদের উপত্যকা' বলে কথিত হয়, সে নাকি নারীরাজ্য—বাস করে খালি নারীরাই, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গ্রীক পুরাণে নারীরাজ্যের কথা আছে, সেখানকার নারীরা ছিল রীতিমত রণরঙ্গিনী, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত পুরুষদের সঙ্গে। প্রাচীন গ্রীকদের বিখ্যাত দেবমন্দির পার্থেননের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত সেই রণরঙ্গিনীদের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বাংলায় যে রায়বাঘিনী বলে কথা শোনা যায়, নিউগিনির এই উগ্রচণ্ডার দলও সেই উপাধি পেতে পারে, কারণ পুরুষরা তাদের ছায়া মাড়াতেও ভরসা করে না।

আর একটা লোভনীয় ব্যাপার, উপকথা নয়, একেবারে সত্য কথা। নিউগিনির মাটির তলায় কি কি খনিজ পদার্থ আছে, এখনো তা ভালো করে জানবার সুযোগ পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু তার পার্বত্য প্রদেশের কোন কোন জায়গায় প্রচুর সোনার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। পদে পদে প্রাণের ভয় থাকলেও এবং 'লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু' জেনেও অনেকের প্রবল লোভ কোন বাধা মানেনি, তারা রহস্যময় কান্তার-প্রান্তর পার হয়ে পার্বত্য প্রদেশের দিকে ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তারপর আর সভ্যতার আলোকে ফিরে আসেনি—খুব সম্ভব তাদের খণ্ড-বিখণ্ড দেহগুলো নরমাংসাশী অসভ্যদের জঠরজ্বালা নিবারণ করেছে, কিংবা তারা প্রাণ হারিয়েছে কোন হিংস্র জানোয়ারের কবলে পড়ে। নিউগিনির কতক অংশ ছিল জার্মানের দ্বারা অধিকৃত। সেই সময় থেকেই অনেক দুঃসাহসী অস্ট্রেলিয়ান সোনার লোভে পড়ে চুপিচুপি এই দ্বীপের নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অনেকে দস্তুরমত তোড়জোড় করে এবং বড় বড় দল বেঁধে একেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সোনার ঢালাও কারবার করে। প্রতি বৎসর তাদের লাভ হতে থাকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা এবং উড়োজাহাজে করে তারা সেই সুবর্ণ-সম্ভার নিয়মিত ভাবে স্থানান্তরিত করত। যুদ্ধ বাধার পর সেই ব্যবসা বন্ধ হয়েছে।

বিমল, কুমার, সংক্ষেপে এই হচ্ছে নিউগিনির বিবরণ। দরকার হলে আরো কথা পরে বলব।"

ষষ্ঠ পর্ব

মৃণুর চোখে বিদ্যুৎ

বিমল চিন্তান্বিতের মত বললে, "নিউগিনি যে বিপদজনক দ্বীপ, সম্প্রতি আমরাও সে-কথা জানতে পেরেছি।"

কুমার বললে, "সেখানে নাকি বনে বনে ঘুরে বেড়ায় স্থলচর কুমির?"

—"জলের কুমির মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে বিশ্রাম বা জীবজন্তু আক্রমণ করে বটে, কিন্তু স্থলচর কুমির বলে কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। তবে কুমিরের মতন বা আট-দশ ফুট লম্বা গিরগিটির মতন দেখতে আর আকারে প্রকাণ্ড একরকম জানোয়ার আছে বটে। এই শতাব্দীর

গোড়ার দিকে কোমোডো দ্বীপে তারা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কাল্পনিক ড্রাগনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।"

—"না বিনয়বাবু, শোনা যাচ্ছে নিউগিনি দ্বীপেও তাদের বাসা আছে।"

—"হতে পারে।"

বিমল বললে, "সেখানে নাকি দোতালা বাড়ির মত উঁচু আর এক মহাকায় জীব দেখা গেছে, তার মস্ত মাথাটা দেখতে কাছিমের মত।"

—"ডিপ্লোডোকাস্?" বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বরে গভীর অবিশ্বাস।

—"ডিপ্লোডোকাস্ কি?"

—"প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, ডিপ্লোডোকাস্‌রা তখন পদভারে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে ইতস্ততঃ যাতায়াত করত। তাদের মুখ ছিল বিরাট কাছিমের মত, মাথা ছিল প্রায় বিশ-বাইশ ফুট উঁচু, আর দেহ ছিল প্রায় আশিফুট লম্বা। কিন্তু আধুনিক নিউগিনি দ্বীপে ডিপ্লোডোকাস্? অসম্ভব! একেবারে আজগুবি কথা! লক্ষ বৎসরেরও আগে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

বিমল বলে, "তাহলে আগে শুনুন আমাদের কাহিনী।"

বিনয়বাবু গম্ভীর ভাবে বিমলের মুখে ফুলব্রাইটের ডায়েরীর কাহিনী এবং তার পরের ঘটনাবলীও শ্রবণ করলেন।

বিনয়বাবুর মুখে ফুটল বিপুল বিস্ময়ের ভাব। তিনি সাগ্রহে বললেন, "তোমার ঐ আলো-পাথর সঙ্গে এনেছ?"

—"নিশ্চয়! কুমার, আগে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও তো!"

কুমার কথামত কাজ করলে। ঘর অন্ধকার এবং চোখের সামনে জ্বলতে লাগল নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত সেই জ্যোতির্ময় প্রস্তর-খণ্ড।

বিনয়বাবু বিস্ফারিত নেত্রে অভিভূত-কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আশ্চর্য, আশ্চর্য!"

কমলও দুই চোখ পাকিয়ে বললে, "ও বাবা! পাথর হল আলো, আলো হল পাথর!"

মৃণু বললে, 'ইস্! ঐ-রকম পাথরের কতগুলো টুকরো যদি পাই!"

কুমার হেসে বললে, "তাহলে তুমি কি কর মৃণুদিদি?"

—"গয়নায় বসিয়ে রাতে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে সকলের চোখে তাক্ লাগিয়ে দি।"

বিমল বললে, "মৃণু ঠিক মেয়েদের মতই কথা বলছে। কিন্তু আমরা তো গয়না পরব না, আমরা কি করব?"

বিনয়বাবু দ্বিধাভরে বললেন, "আমরা কি করব? আমরা কি করব? ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে যাই ঐ দ্বীপে। কিন্তু—কিন্তু" হঠাৎ থেমে মাথা নেড়ে আবার বলে উঠলেন, "উঁহু, অসম্ভব।"

—"কি অসম্ভব বিনয়বাবু?"

—"ঐ দ্বীপে যাওয়া।"

—"কেন?"

—"ভয়ঙ্কর বিপদজনক দ্বীপ, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না।"

—"স্বর্ণলোভীরা সেখানে দলে দলে গিয়ে ফিরে এসেছে, আমরাই বা পারব না কেন?"

—"তারা প্রকাণ্ড দল গড়ে বিপুল আয়োজন করে তবে যেতে পেরেছে।"

—"আমরাও তাই করব।"

—"কি রকম?"

—"টাকায় কি না হয়? গভর্নমেন্টের অনুমতি নেব। তারপর যারা ফৌজ থেকে অবসর নিয়েছে অথচ এখনো কার্যক্ষম এমন ডজনখানেক সেপাইকে মাইনে দিয়ে রাখব। দলে পাচক, বেয়ারা, দ্বারবান প্রভৃতি থাকবে। ভারবাহী লোকজন নিযুক্ত করব দ্বীপে গিয়ে। এমন সব আয়োজন আমাদের পক্ষে নতুন নয়। সে-কথা আপনিও জানেন বিনয়বাবু।"

—"কিন্তু কিসের জন্যে আমরা যাব? আমাদের লক্ষ্য কি? সোনার পাহাড়?"

—"ওটা উপলক্ষ মাত্র। আমরা সুবর্ণ-গর্দভ হব না, কারণ, মা-লক্ষ্মীর কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত নই। যা পেয়েছি তা যথেষ্টরও বেশি, তারও উপরে অতিরিক্ত সম্পদের ভার বাড়িয়ে আমরা পিষে মরতে চাই না। কেমন কুমার! তোমারও কি এই মত নয়?"

কুমার উচ্ছসিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! যে আগ্রহ নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাত্রীরা বন্ধুর পথে পদে পদে প্রকৃতির বাধা, দৈব-দুর্ঘটনা, মৃত্যু তুচ্ছ করে যায় সুমেরু-কুমেরু এভারেস্টের দিকে, অসীম শূন্যে গ্রহে-উপগ্রহে বিচরণ করবার স্বপ্ন দেখে, মহাসাগরের অতল তলে নেমে অদৃশ্য রত্ন আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, আমাদেরও বুকের মধ্যে অহরহ জাগ্রত হয়ে আছে সেই অসামান্য আগ্রহ—তুচ্ছ তার কাছে সোনার পাহাড়, হীরার খনি, কুবেরের ভাণ্ডার! যা কিছু অসাধারণ, তাই-ই আমরা স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

কমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমিও আপনাদের দলে।"

বিনয়বাবু চোখ রাঙ্গিয়ে কুপিত কণ্ঠে বললেন, "চোপরাও, চোপরাও। ঢাল নেই, খাঁড়া নেই, নিধিরাম সর্দার!"

মৃণু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "আমার কথা শুনলে তুমি আমাকে কি বলবে?"

—"তোমার আবার কি কথা?"

—"ঐ এক কথাই।"

—"আমাদের সঙ্গে যাবে?"

—"নিশ্চয়!"

—"নিশ্চয়ই নয়। আমি গেলে তবে তো তোমার যাওয়া সম্ভব হতে পারে? কিন্তু আমি যাব না।"

বিমল করুণস্বরে বললে, "সেকি বিনয়বাবু?"

উত্তপ্ত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাই। তোমাদের কাছে আশকারা পেয়ে পেয়ে মৃণু দস্তুরমত 'টম-বয়' অর্থাৎ গেছো মেয়ে হয়ে উঠেছে। দু-দুবার মারাত্মক বিপদে পড়েও ওর আক্কেল হল না। ওকে নিয়ে যাব ঐ ভয়ানক দ্বীপে! আমি পাগল! ওকে নিয়ে আর আমি কোথাও যাব না।"

বিমল অনুনয়ভরা কণ্ঠে ডাকলে, "মৃণু!"

—"কি?"

—"লক্ষ্মী বোনটি আমার!"

—"গেছো মেয়েকে আবার লক্ষ্মী বলে ডাকা কেন?"

—"আমার ওপর রাগ করছ কেন মৃণু? তার চেয়ে বাবার ওপরে রাগ করে আজ তুমি ভাত খেয়ো না।"

—"আমি উপোস করলে তোমাদের কি সুবিধা হবে শুনি?"

—"তোমার উপোসে আমাদের কিছুই সুবিধা হবে না, কিন্তু তুমি যদি এবারের মত আমাদের

সঙ্গে যাবার আবদারটা ত্যাগ কর, তাহলে—"

বিমলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, "তাহলে কি হবে জানতেও চাই না, আর তোমাদের সঙ্গে কোথাও যেতেও চাই না—ব্যস্!" দুই চক্ষে বিদ্যুৎবৃষ্টি করে সে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, "এবার আমি বিলক্ষণ শক্ত হব, মৃণুর রাগ কি চোখের জল দেখেও আমার সংকল্প ত্যাগ করব না।"

বিমল বললে, "কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো?"

—"যাব বৈকি ভায়া, যাব বৈকি! মাথার চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু আমার বুকের রক্ত এখনও ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল।

কমল রিসিভার ধরে বললে, "হ্যালো!"

তারপর ফিরে বললে, "বিমলদা, রামহরি আপনাকে ডাকছে।"

বিমল রিসিভার নিয়ে বললে, "কি খবর রামহরি?"

রামহরির কণ্ঠে শোনা গেল, "খোকাবাবু, তোমরা চলে যাওয়ার একটু পরেই দু-জন সাহেব তোমাদের খুঁজতে আসে। আমি বাইরের ঘর খুলে দিয়ে তাদের অপেক্ষা করতে বলে ফোন করছি।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "সাহেব? দু-জন সাহেব? বেশ, তাদের বসিয়ে রাখো, আমরা এখনি যাচ্ছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কি ব্যাপার বিমল?"

—"ব্যাপার বোধ করি সুবিধার নয়। দু-জন সাহেব আমার বাড়িতে এসেছে। কি চায় তারা? কাল রাতে দু-জন সাহেবই ফুলব্রাইটকে আক্রমণ করেছিল, এরা তারা নয় তো?"

বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু তারা তো এখন পলাতক আসামী—তোমার কাছে আসবে কোন্ প্রয়োজনে?"

কুমার বললে, "বিমল, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো?"

—"কি?"

—"কাল হয়তো তারা আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখেছিল, তুমি ফুলব্রাইটের পকেটের জিনিস বার করে নিয়েছ। তারপর থেকেই তারা আমাদের বাড়ির উপরে নজর রেখেছিল, এখন আমরা বাইরে আসবার পরেই তাদের আবির্ভাব হয়েছে।"

বিমল ব্যঙ্গভরে বললে, "তোমার সন্দেহ সত্য বলেই মনে হচ্ছে। শীগ্‌গির চল বাড়ির দিকে—তারা হত্যাকারী, রামহরিকেও আক্রমণ করতে পারে।"

সপ্তম পর্ব

যুগল মূর্তির কাণ্ড

বাড়ির কাছে এসে মোটর থেকে বেরিয়ে বিমল ও কুমার থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেখানে দেখা গেল রীতিমত এক জনতা।

ব্যাপার কি?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে ভিড় ঠেলে তারা বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তারপরই তারা দেখলে, বাড়ির ফটকের সামনে একজন পুলিসের ইন্সপেক্টর ও রামহরি। তাহলে রামহরির কোন বিপদ হয়নি? তারা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

কিন্তু ও আবার কি? ফটকের ভিতরে খোলা জমির ওপর দুইজন শ্বেতাঙ্গকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল পাহারাওয়ালা।

হতভম্বের মত বিমল শুধালে, "রামহরি, এখানে গোলমাল কিসের?"

রামহরি ফিরে দাঁড়িয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বললে, "খোকাবাবু এসেছ? বাঁচলুম!"

—"কিন্তু কি হয়েছে?"

—"ভালো করে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ সাহেবদুটো তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তোমরা নেই শুনেও ওরা অপেক্ষা করতে চাইলে। তখন ওদের বাইরের ঘরে বসিয়ে আমি ভেতরে গেরস্থালীর কাজ করতে গেলুম। একটু পরেই বিষম চ্যাঁচানি শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখি, সাহেব দুটো তীরের মত দোতলা থেকে সিঁড়ি বয়ে নিচে নামছে আর পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে বাঘা। বুঝলুম, ওরা চোরের মত চুপিচুপি দোতলায় উঠেছিল কিন্তু জানত না যে সেখানে মোতায়েন আছে পাহারাওয়ালা বাঘা।"

—"তারপর?"

—"তারপর ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চম্পট দিচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ধরা পড়ল পুলিসের হাতে।"

কুমার চমৎকৃত স্বরে বললে, "কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সেখানে পুলিস হাজির ছিল কেন?"

পুলিসের ইন্সপেক্টর সামনে এসে বললে, "মশাই, এ হচ্ছে দৈবের খেলা। মিঃ ফুলব্রাইটের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবার জন্যে আপনাদের কাছে আসছিলুম। হঠাৎ দুটো সাহেবকে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে দেখে আমরা সন্দেহক্রমে ওদের গ্রেপ্তার করি। ওদের চেনেন?"

—"না।"

—"হাসপাতালের ডাক্তারের মুখে শুনলুম, আপনারা বলেছেন, মিঃ ফুলব্রাইটকে আক্রমণ করেছিল দু-জন সাহেব।"

—"এখনো তাই বলছি। কিন্তু তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, রাতের আবছায়ায় দূর থেকে তাদের দেখেছি। মুখ চিনব কেমন করে?"

কুমার বললে, "তবে মিঃ ফুলব্রাইটের মুখে শুনেছি, তাঁকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নাম স্মিথ ও হ্যারিস।"

ইন্সপেক্টর বললে, "কিন্তু ওরা বলে ওদের নাম হচ্ছে ফিলিপ সিমন্স আর ক্লার্ক চ্যাপম্যান।"

বিমল বললে, "হয়তো ও-দুটো ছদ্মনাম।"

—"হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আপনারা আর একবার ভালো করে ওদের দেখুন। অন্তত হত্যাকারীদের সঙ্গে ওদের চেহারার কোনো না কোনো মিল থাকতে পারে।"

বিমল বন্দীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এবং তারাও অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে তার সঙ্গে করলে দৃষ্টি-বিনিময়। মুখ দেখলে তাদের কারুকেই মহাত্মা বলে ভ্রম হয় না—দুজনেরই কাঠখোট্টার মত চোয়াড়ে চেহারা বটে, কিন্তু দুজনেরই মধ্যে একটা বড়রকম পার্থক্য আছে এই যে, তাদের একজন হচ্ছে দোহারা ও বেঁটে এবং আর একজন একহারা ও প্রায় সাড়ে ছয়ফুট লম্বা।

বিমল সেই বিশেষত্বের উল্লেখ করলে।

ইন্সপেক্টর বললে, "এ কথা আমাদের কাজে লাগবে যদিও এইটুকুর উপর নির্ভর করে কারুকে খুনী আসামী বলে চালান দেওয়া যায় না।"

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে এখন কি ওদের ছেড়ে দেবেন?"

—"পাগল! আপাততঃ 'ট্রেসপাসে'র চার্জে ওদের লক-আপে আটক রাখব, ওদিকে খুনের তদন্ত চলবে। দেখা যাক, কতদূর কি হয়! আমার তো মনে হয় ওরাই হচ্ছে হত্যাকারী।"

পরের দিনই খবরের কাগজে প্রকাশ পেলে, সিমন্স ও চ্যাপম্যান নামে পরিচিত দুই ব্যক্তির ডায়েরী ও চিঠিপত্র দেখে জানা গেছে যে, তাদের আসল নাম হচ্ছে স্মিথ ও হ্যারিস।

তাদের হোটেলের বাসায় খানাতল্লাশের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তাক্ত ছোরা ও পোশাক। মিঃ ফুলব্রাইটের রক্তের টাইপের সঙ্গে মেলে কিনা দেখবার জন্যে সেই রক্তাক্ত ছোরা ও পোশাক রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিমল বললে, "এ যাত্রা স্মিথ ও হ্যারিস রক্ষা পাবে বলে মনে হয় না।"

কুমার বললে, "কিন্তু স্মিথ আর হ্যারিস যে এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ল তার মূলে আছে আমাদের সারমেয়-চূড়ামণি বাঘা। রামহরি তো ওদের আদর করে নিচের বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছিল। দোতলায় হুঁশিয়ার বাঘা না সজাগ থাকলে ওরা সকলকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয়ই আবার লম্বা দিত। আয় রে বাঘা, কাছে আয়।"

বাঘা তখন কয়েকটা মাছির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে ব্যস্ত হয়ে ছিল। ডাক শুনে একবার ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কুমারের কাছে ছুটে এসে আবার গিয়ে যুদ্ধে নিযুক্ত হল এবং দুই গ্রাসে দুটো দুষ্ট মক্ষিকাকে গলাধঃকরণ করে ফেলল।

এদিকে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলতে লাগল এবং ওদিকে বিমলদের নিউগিনি যাত্রার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেল।

ওরা স্থির করেছে এবারে জলপথে নয়, এরোপ্লেনে চেপে শূন্যপথে যাত্রা করবে নিউগিনির দিকে। একেবারে নিউগিনির পশ্চিম অংশে গিয়ে উপস্থিত হলেই সকল দিক দিয়ে সুবিধা হত, কিন্তু ভারতে থেকে শূন্যপথে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য লোকজন রসদ প্রভৃতি নিয়ে কয়েকদিন আগে জাহাজে আরোহণ করবে এবং তাদের পরিচালক রূপে সঙ্গে থাকবে বহুদর্শী রামহরি।

কিন্তু মিঃ ফুলব্রাইটের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষ হতে না হতেই সংবাদপত্রে আর এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হল—স্মিথ ও হ্যারিস পুলিসের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে অদৃশ্য হয়েছে।

কিছু কাল পরেও তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। মামলা আপাততঃ ধামাচাপা পড়ে গেল।

তখন সাক্ষ্য দেবার দায় থেকে নিস্তার পেয়ে বিমল ও কুমার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে বিনয়বাবু ও কমলকে নিয়ে বিমানে চেপে শূন্যে গিয়ে উঠল।

অষ্টম পর্ব

জো

আকাশ পথে হু-হু করে উড়ে চলেছে বিমানপোত, অশ্রান্ত গর্জনে তার কানে লেগে যায় তালা, পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে হয় সচিৎকারে।

এই তো গেল কণ্ঠ আর কানের বিপদ, বাকী রইল চোখ, কিন্তু তারও বিস্তর অসুবিধা। বিমান

থেকে পৃথিবীর কতটুকুই বা নজরে পড়ে? বহু নিম্নে পৃথিবীকে রিলিফ ম্যাপের মত দেখেই খুশি থাকতে হয়—তাও মাঝে মাঝে, কারণ যখন তখন দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে মেঘের পর্দা।

বিনয়বাবুর এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তিনি ভাবতে লাগলেন, মানুষ কী সুখে এরোপ্লেনে চড়ে? তবে হ্যাঁ, আছে বটে অদ্ভুত অনুভূতির আনন্দ!

স্থলচর জীব, বিপুল শূন্যে ভেসে যাচ্ছি উদ্দাম গতির বেগে ধূমকেতুর মত, কখনো উঠছি মেঘের উপরে নীলাতপের তলায়, কখনো নামছি মেঘের ছায়ায়-ছায়ায়, কখনো আমার নিচের দিকে হচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টিপাত, আবার কখনো বা নতনেত্রে সামনে বিছানো রয়েছে ধোঁয়া-ধোঁয়া পৃথিবীর পট—অপরিচিত কোনো গ্রহের ঝাপসা দৃশ্যের মত।

কিন্তু যতই অপূর্ব বা বিচিত্র হোক, এই অনুভূতির জন্যে পৃথিবীর স্থলযান ও জলযানকে বর্জন করা চলে না।

স্থলে ও জলে ছোটে রেলগাড়ি ও জাহাজ—স্টেশনে স্টেশনে বা বন্দরে বন্দরে থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে। চোখে পড়ে যেন বিচিত্র দৃশ্যসৌন্দর্যের নব নব মহোৎসব। কত পাহাড়—পর্বত-নির্ঝর, কত কান্তার-প্রান্তর নদ-নদী, কত দেশের কত জাতের মানুষের জনতা, কত নগর, গ্রাম, মঠ ও মন্দির। মাঝে মাঝে নেমে ভ্রমণ কর, বিভিন্ন জাতীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান কর, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানা নিদর্শন দর্শন কর এবং করতে পার আরো কত কি! রীতিমত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয় হয়।

বিমানের একমাত্র গুণ তার দ্রুতগতি। মাত্র তিন-চার দিনে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে গিয়ে সে হাজিরা দিতে পারে। আজ কলকাতায় সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাম্বর, তিনদিন পরে লণ্ডনের রৌদ্রহারা কুজ্‌ঝটিকাময় আচ্ছন্ন নিরানন্দ আকাশ। এমন আকস্মিক পরিবর্তন সহসা ধারণায় আনা যায় না।

বিমলদের বিমান ভারত ছাড়িয়ে বুলেটের মত তীব্রবেগে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরকে পিছনে ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়তে লাগল। পথের বর্ণনা দেব না, কারণ বর্ণনা করবার মত বিশেষ কিছুই নেই।

বিমান নামল গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বারা শাসিত দক্ষিণ নিউগিনির মোরেসবি বন্দরে। সেখানে হাজির ছিল বাঘাকে নিয়ে স্বয়ং রামহরি।

ভূমিতলে পদার্পণ করে প্রথমেই বিমল শুধোলে, "খবর ভালো, রামহরি?"

—"সব ভালো।"

—"আমাদের কাজ কিছু এগিয়ে রাখতে পেরেছ?"

—"তা হয়তো পেরেছি।"

—"যথা?"

—"কারুর যাতে অসুবিধে না হয়, সেইজন্যে হোটেল ঠিক করে রেখেছি।"

—"খুব সুখবর। তারপর?"

—"মালপত্র নিয়ে যাবে বলে একশো জন কুলি নিযুক্ত করেছি।"

—"বাহাদুর!"

—"কিন্তু খোকাবাবু, তাদের বাঁদুরে চেহারা দেখলে তোমাদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে, আর গায়ের বুনো বুনো গন্ধ নাকে গেলে তোমরা ওয়াক করে বমি করে ফেলবে।"

—"আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, ও-সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।"

—"হোটেলের সামনে একটা প্রকাণ্ড মাঠ পাওয়া গেছে, সেখানে তাঁবু খাটিয়ে আছে আমাদের সেপাইয়ের দল আর অন্য অন্য লোকজন।"

—"আরে রামহরি, বাঘাকে বেঁধে ফ্যালো, ও যে আমাদের গায়ের উপরে খালি খালি ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বালিয়ে মারলে!"

—"ঝাঁপাঝাঁপি করছে মনের আনন্দে, বাঘা আজ কদিন প্রায় উপোস করে আছে, রাতে ঘুমোয়নি, কুঁই-কুঁই করে কেঁদেছে।"

কুমার বাঘার মাথা চাপড়ে বললে, "হ্যাঁরে, আমাদের জন্যে তোর মন-কেমন করেছিল?"

উত্তরে বাঘা কুমারের চারপাশে চক্কর দিয়ে বোঁ বোঁ করে একপাক ঘুরে এল। তার আধখানা জিভ বার করা মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন কুকুর-হাসি হাসছে বিপুল পুলকে।

তারপরে সকলে হোটেলে গিয়ে উঠল। এরোপ্লেনের একটানা গুরুগর্জনের পর এখানকার স্তব্ধ ও শান্ত পরিস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য বলে মনে হল।

বিমল ও কুমার নিজেদের যাত্রার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রইল, কমল ঘুরতে লাগল রামহরির পিছনে অতিরিক্ত টুকিটাকি খাবারের লোভে এবং বিনয়বাবু আলাপ জমিয়ে ফেললেন তাঁরই সমবয়স্ক হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে।

দ্বিতীয় দিনেই তাঁদের এখানে আসার উদ্দেশ্য শুনে ম্যানেজার সবিস্ময়ে বললে, "আপনারা পশ্চিম নিউগিনিতে বেড়াতে যাবেন? সে যে ভয়ানক দেশ!"

—"হ্যাঁ, আমরা জেনে-শুনেই এসেছি। আমাদের সঙ্গে দুটি যুবক আছে, বিপদ নিয়ে খেলা করতে তারা ভালোবাসে—পৃথিবীর দেশে দেশে এই খেলায় মেতে তারা ছুটোছুটি করে।"

—"আপনাদের দলে একজন পথ-প্রদর্শক আছে তো?"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন—"না।"

—"সেকি, তাহলে পথ চিনবেন কেমন করে?"

—"আপনি কোনো পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থা করতে পারেন?"

একটু চিন্তা করে ম্যানেজার বললে, "তা হয়তো পারি।"

—"বিশ্বাসী লোক তো?"

—"অত্যন্ত বিশ্বাসী। আগে তার কি নাম ছিল জানি না, খ্রীস্টান হবার পর তার নাম হয়েছে জোসেফ—সকলে সংক্ষেপে 'জো' বলে ডাকে। সে পশ্চিম নিউগিনির নিগ্রোজাতের লোক। ঐ জাতের লোকেরা কতকটা সভ্য, বাস করে প্রায় সমুদ্রের ধারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জো অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খ্রীস্টান হয় আর ফৌজের রসদ বিভাগে কাজ করে, তারপর আর দেশে ফিরে যায়নি। কিছু কিছু ইংরেজীও শিখেছে।"

—"বনে-পাহাড়ে ঠিক পথে সে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?"

—"আমার বিশ্বাস, পারবে। তার মুখে আমরা পশ্চিম নিউগিনির বন-পাহাড়ের অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছি। সব কথা আমরা বিশ্বাস করিনি, কারণ, তার বাড়িয়ে বলার অভ্যাস আছে। তবে মনে হয়, পথঘাট তার নখদর্পণে, আর কোন পথে গেলে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা, তাও তার অজানা নেই।"

—"সে কোথায়?"

—"আপাততঃ এক কারখানায় ঠিকা কাজ করে।"

—"তার সঙ্গে আমরা কথা কইবার সুযোগ পেলে সুখী হব।"

—"বেশ তো, কালই তার দেখা পাবেন। ভারী মজার লোক এই জো, চেহারাখানাও জমকালো।"

পরদিনের প্রভাতী চায়ের আসরে এক প্রায় অসম্ভব মূর্তির আবির্ভাব।

মাথায় অন্ততঃ ছয় ফুট দশ ইঞ্চি উঁচু, বুকের বেড়ও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না। দেহের ওজন হবে অন্ততঃ তিন মণ। প্রকাণ্ড তেহারা দেহ—কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে চর্বির বাহুল্য নেই, আছে লৌহকঠিন মাংসপেশী। গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো। পরনে বুশশার্ট ও হাফপ্যান্ট। পায়ে জুতো নেই।

হ্যাঁ, একখানা চেহারার মত চেহারা বটে! বিমল তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রশংসাভরা চক্ষে।

কুমার শুধোল, "তুমি আবার কোন গগনের কালোচাঁদ?"

বিরাটমূর্তি দন্তকৌমুদী প্রকাশ করে একগাল হেসে বললে, "আমি? ছেলেবেলায় আমার নাম ছিল নাগোগা, তারপর পাদরি সাহেব আমার নাম দেয় জোসেফ। তারপর এখানকার সকলে আমাকে জো বলে ডাকতে আরম্ভ করে, এ নামটা কি আপনাদের পছন্দ হবে না? তাহলে আমাকে যে কোন নামে ডাকুন—আমি ঠিক সাড়া দেব।"

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার জো নামটি আমাদের পছন্দ হয়েছে।"

জো প্রবল মস্তকান্দোলন করে বললে, "না কর্তা, না! জো নামটা আমার নিজেরই পছন্দ নয়। আমার এই হাতির মত চেহারায় অত পুচকে নাম মানাবে কেন? আমি কি নেংটি ইঁদুর?"

বিমল বললে, "না জো তুমি আর যাই-ই হও, নেংটি ইঁদুর নও! তবে আপাতত নাম বদলে কাজ নেই। তোমাকে আমরা জো বলেই ডাকব।"

—"তাই ডাকুন! যত বার ডাকবেন, ততবারই সাড়া দেব।"

বিনয়বাবু বললেন, "তোমাকে কি হোটেলের ম্যানেজার পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ কর্তা ! শুনলুম আপনারা পশ্চিমে যাবেন। আমাকে গাইড করতে চান।"

—"হ্যাঁ।"

—"তা আমি খুব রাজী। পথঘাট তো আমার নখদর্পণে। আমার সঙ্গে আপনারা অনায়াসেই চোখ বুজে যেতে পারবেন। কিন্তু আপনারা কোন্ দিকে যাবেন আগে সেটা আমার জানা চাই।"

—"তুমি উইলহেলমিনা পর্বতের নাম শুনেছ তো?"

—"খালি কি শুনেছি কর্তা, কতবার তাকে দেখেছি—তার উপর দিকটা বরফে সাদা ধব্ ধব্ করে। একবার তার কাছ পর্যন্ত গিয়েও ছিলুম, কিন্তু তারপর চোরের মত পালিয়ে আসবার পথ পাই না।"

—"সে কি হে, তোমার মত মদ্দ মানুষও পালিয়ে আসে নাকি?"

—"কর্তা গো, আপনি হলে আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতেন।"

—"কিসের এত ভয়?"

—"মদ্দানীদের ভয়।"

—"সে আবার কি?"

—"সেখানে যেতে গেলে পথে পড়ে মেয়েদের মুলুক।"

—"মেয়েদের মুলুক কি?"

—"মেয়েদের দেশ কর্তা, মেয়েদের রাজ্য। সেখানে সিংহাসনে বসে রানী, আর প্রজারাও সব মেয়ে। হাজার হাজার মেয়ে সেখানে রাজ্যের সব কাজ করে যাচ্ছে।"

—"মেয়েদের দেখে আবার ভয় কিসের?"

—"বাপ রে, জানেন না তো সেখানকার মেয়েরা কী চিজ! পুরুষ দেখলেই তারা দলে দলে বর্শা আর ধনুক-বাণ নিয়ে তাড়া করে আসে। যারা পালাতে পারে তারাই বাঁচে, আর যারা পালাতে পারে না, তারা ধরা পড়ে বিরাট এক গুহায় বন্দী হয়ে থাকে।"

—"সেই ভয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ?"

—"পালাব না, বলেন কি? তিন-চারশো মেয়ের সঙ্গে কি একলা লড়াই করা যায়?"

—"হুঁ, বুঝলুম। পথে আর কোনো বিপদে পড়নি তো?"

—"বিপদে পড়ব কেন কর্তা, সাবধানের মার নেই, আমি বিপদ এড়িয়ে চলতে জানি। গুজবে শুনেছি, গহন-বনে আর জলাভূমির মধ্যে চলন্ত পাহাড়ের মত বিরাট বিরাট জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা দয়া করে আমাকে দেখা দেয়নি।"

—"আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। পরে তোমার সঙ্গে সব কথা কইব।"

নবম পর্ব

দুই স্যাঙাত—জো ও বাঘা

সেই রাত্রের ঘটনা।

জ্যোৎস্না যেন দুধালো। শুক্লধারায় পৃথিবী নয়নাভিরাম।

বিমল ও কুমার খানিকক্ষণ নীরবে বসে দেখলে সেই জ্যোৎস্নাময় দৃশ্য! কিন্তু বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলে না। বিমানে কেটেছে প্রায় বিনিদ্র রাত্রি। গত দু-দিনও তোড়জোড়ে ও নানা ব্যবস্থা করবার জন্যে অনেক ছুটোছুটি ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। আজও সারা দিনটা গেছে সেই ভাবে। কাজেই অল্পক্ষণ যেতে না-যেতেই তাদের চোখ জড়িয়ে এল তন্দ্রাঘোরে। তারপরই নিদ্রা এসে সব চেতনা লুপ্ত করে দিলে অস্থায়ী মৃত্যুর মত।

ঘরের কোণে বাঘাও কম্বলের উপরে শুয়ে ঘুমের আরাম ভোগ করছিল। পাশের ঘরে বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি।

মানুষ যখন অচেতন, রাত হয় সচেতন। যারা ঘুমোয়, রাতের বাণী তারা শুনতে পায় না। রাতের বাণীর ভাষা নেই, কিংবা তার ভাষা হচ্ছে আলাদা। রিম্-রিম্ ঝিম্-ঝিম্, রিম্-রিম্ ঝিম্-ঝিম্—মানুষের কানে শোনা যায় কি না-যায়! নিঝুম-নিরালায় এই অতি মৃদু ভাষায় নিশুতি রাত গল্প করে গহনবনের সঙ্গে, নীল আকাশের সঙ্গে, ফুলের বাতাসের সঙ্গে, আকাশের চাঁদ তারার সঙ্গে।

আচম্বিতে বাঘা জেগে উঠল সচমকে। অন্ধকার ঘরে দুটো অচেনা মূর্তি। পর-মুহূর্তে তার গর্জন ও আক্রমণ।

কিন্তু কারুকেই ধরতে পারলে না। মূর্তিদুটো খোলা দ্বারপথ দিয়ে অদৃশ্য হলো দুঃস্বপ্নের মত।

—"কি হল, কি হল? বাঘা চেঁচায় কেন?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "ঘরে চোর ঢুকেছিল।"

—"কোথায় চোর?"

—"পালিয়েছে। চোরদের আত্মরক্ষার চিরকেলে নিয়ম হচ্ছে পলায়ন।"

—"কিছু চুরি করতে পারে নি তো?"

—"পেরেছে। সেই আলো-পাথরের কৌটো। জামার পকেটে রেখেছিলুম।"

—"সর্বনাশ!"

—"মা ভৈঃ! আলো-পাথর আর ম্যাপ আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, কেউ তা আন্দাজ করতে পারবে না। চোর নিয়ে গেছে খালি তুলো-ভরা কৌটোটা।"

—"কিন্তু এ যে সন্ধানী চোর, আমাদের গুপ্তকথা জানে।"

—"নিশ্চয়! আর সে হোটেলের বাহির থেকেও আসেনি।"

—"কি করে বুঝলে?"

—"দেখুন না, ভিতর দিকের দরজা খোলা। পাকা পুরাতন পাপী। বাহির থেকে দরজা খোলার কৌশল জানে। আবার ঐ পথেই লম্বা দিয়েছে।"

—"তাহলে তো হোটেলের ভিতরের লোকও হতে পারে।"

—"হতে পারে।"

এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার ঘুমোবার পোশাকের উপরে একটা ওভারকোট চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

—"গোলমাল কেন? দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?"

—"চোর এসেছিল। খুব সম্ভব এই হোটেলেই থাকে।"

—"আমার হোটেলে চোরের বাসা? অসম্ভব!"

—"তাহলে ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে সে গেল কোথায়?"

—"কি আশ্চর্য!"

—"আমরা আসবার পর এই হোটেলে কেউ এসেছে?"

—"হ্যাঁ, কাল এসেছে। দু-জন।"

—"তাদের নাম কি স্মিথ আর হ্যারিস?"

—"না।"

—"তবে তাদের নাম কি?"

—"একজনের নাম ফিলিপ সিমন্স, আর একজনের ক্লার্ক চ্যাপম্যান।"

—"ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না। মিঃ ম্যানেজার, ও দুটো হচ্ছে স্মিথ আর হ্যারিসেরই ছদ্মনাম। তাহলে তারা এখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি?"

—"এ-সব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কে তারা?"

—"তারা খালি চোর নয় হত্যাকারী। পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। এখন পলাতক আসামী।"

—"এমন লোক আমার হোটেলে! এখুনি চলুন আমার সঙ্গে তাদের ঘরে।"

—"কি হবে মিছে ছুটোছুটি করে? আপনি একলাই যান। গিয়ে দেখবেন পাখি উড়ে গেছে।"

সেই কথাই সত্য হল। ম্যানেজার তাদের ঘরে গিয়ে জনপ্রাণীর দেখা পেলে না। এত সহজে তারা ধরা দেবার পাত্র নয়।

পরদিন সকালে উঠেই বিমল বললে, "কুমার, পিছনে ফেউ লেগেছে, আর অপেক্ষা করা নয়। আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ, কালকেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে।"

এমন সময় বাঘাকে বগলদাবা করে বিপুলবপু জো আত্মপ্রকাশ করলে। বাঘা যে জো-র কোলে চড়বার সুযোগ পেয়ে পরম আপ্যায়িত হয়েছে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে তার প্রশান্ত মুখ ও অশ্রান্ত লাঙ্গুল-আন্দোলন।

বিনয়বাবু বললেন, "আরে জো! তুমি এরই মধ্যে বাঘাকে বশ করে ফেলেছ দেখছি যে!"

জো হাসবার জন্যে প্রায় আকর্ণবিশ্রান্ত মুখব্যাদান করে বললে, "কর্তা গো! আমি ওকে বশ করব কি, বাঘাই আমাকে বশ করে ফেলেছে!"

বিমল বললে, "জো প্রস্তুত হও! কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব।"

—"আমি প্রস্তুত। তাহলে উইলহেলমিনা পর্বতেই তো আমাদের পথের শেষ?"

—"নিশ্চয়!"

—"পথে কিন্তু নানা বিপদ-আপদ আছে। সেটা আগে থাকতেই আর একবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই!"

—"বিপদ-আপদকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। দেখছ তো আমাদের সঙ্গে আছে এক ডজন বন্দুকধারী সেপাই। সেই সঙ্গে আমরা পাঁচজনও বন্দুক আর রিভলবার নিয়ে যাচ্ছি। তার ওপরে আছে একটা মেশিনগান আর অনেকগুলো 'হ্যাণ্ড-গ্রেনেড' বা হাত-বোমা। বিপদকে তাড়াবার জন্যে এই-ই কি যথেষ্ট নয়?"

একটা বেশ উঁচু লাফ মেরে জো বলে উঠল, "যথেষ্ট নয় কি কর্তা! যথেষ্টরও বেশি! অভাবনীয় আয়োজন! আমরা অনায়াসেই নারীদের উপত্যকা জয় করতে পারব।"

বিনয়বাবু বললেন, "জো, নারীদের উপত্যকা জয় করবার জন্যে তোমার অত আগ্রহ কেন?"

সবিস্ময়ে দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত করে তুলে জো বললে, "আগ্রহ হবে না? বলেন কি! সেই দজ্জাল দস্যি মেয়েগুলো কিনা আমাকে ধরবার জন্যে তেড়ে এসেছিল! আমাকে ধরবে? আমি কি পতঙ্গ? আমি কি উচ্চিংড়ে?"

—"পাগল! তোমাকে উচ্চিংড়ে বলবে এত বড় বুকের পাটা কার?"

—"তার ওপরে কর্তা, আমার এক বাসনা আছে।"

—"তোমার বাসনা আছে? নিশ্চয়ই সেটা কিছু ছোটখাটো ব্যাপার নয়।"

—"না কর্তা, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

—"শুনি তোমার কি বাসনা?"

—"আমি চাঁদ ধরব।"

—"চাঁদ থাকে আকাশে, তাকে ধরবে কি হে?"

—"সে চাঁদ নয় কর্তা, সে চাঁদ নয়!"

—"তবে আবার কোন্ চাঁদ?"

—"নারীদের উপত্যকার চাঁদ।"

—"সেখানে আবার নতুন এক চাঁদ আছে নাকি?"

—"একটা নয় কর্তা, অনেকগুলো।"

—"বল কি হে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ওদের চাঁদ আমাদের চাঁদের চেয়েও উঁচুদরের। আমাদের চাঁদ ক্ষয়রোগে ভুগে ক্রমে ছোট হয়ে শেষটা একেবারেই পটল তোলে, আবার বাঁচে বটে, কিন্তু রাত ফুরুলেই পালিয়ে যায়, আর ওদের চাঁদ কোনদিন ছোট হয় না বা কামাই করে না—প্রতি রাত্রেই জ্বল্-জ্বল্ করে সমানে জ্বলতে থাকে।"

—"এত খবর তুমি পেলে কোত্থেকে?"

—"মিশনারীদের কাছেও শুনেছি, আর একজন পর্তুগীজ সাহেব স্বচক্ষে দেখে এসে বলেছে।"

—"স্বচক্ষে দেখেছে? তাহলে সে কি সশরীরে নারীদের উপত্যকায় গিয়েছিল?"

—"না কর্তা, একটা উঁচু পাহাড় থেকে ঝোপে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অনেকগুলো জ্বলন্ত চাঁদকে দেখতে পেয়েছিল।"

কুমার বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "মঙ্গলগ্রহে গিয়ে আমরা দু-দুটো চাঁদ দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম* আর জো বলে কি, অনেকগুলো চাঁদ!"

—"আমি 'কো-কো' জাতের লোকদের মুখেও অনেকগুলো চাঁদের কথা শুনেছি। তাদের জনকয় লোক চাঁদ দেখবার জন্যে নারীদের উপত্যকায় ঢুকেছিল, কিন্তু দুজন ছাড়া বাকি সবাই সেই লড়ায়ে মেয়েগুলোর পাল্লায় পড়ে গ্রেপ্তার হয়।"

বিমল কথা ঘুরিয়ে দিয়ে শুধোলে, "আচ্ছা জো, তুমি একটা খবর দিতে পারো?"

—"হুকুম করুন।"

—"পাহাড়ে-অঞ্চলে এমন কোনো পাহাড় আছে যার তিন-তিনটে চুড়ো?"

—"আছে।"

—"কোথায়?"

—"উইলহেলমিনা পর্বতের তলার দিকে একটা তিন-চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আছে, তার উপরে দেখা যায় পাশাপাশি তিনটে চুড়ো। শুনেছি সেখানে গেলে নাকি অঢেল সোনা পাওয়া যায়।"

—"সোনার লোভে তুমি কোন দিন সেখানে যাওনি?"

সভয়ে দুই চক্ষু যতটা-পারা যায় বিস্ফারিত করে ত্রস্তকণ্ঠে জো বললে, "ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! বস্তা বস্তা সোনার লোভেও জো-বাবাজী কোনদিন সেমুখো হবেন না!"

—"কেন জো, কেন?"

—"ওরে বাপরে বাপ, সেখানে যেতে পথে পড়ে কচ্ছপমুখো শয়তানদের রাজ্যি! তাদের কাছে মানুষরা হচ্ছে পিঁপড়ের মত পুঁচকে! এক এক গ্রাসে তারা একসঙ্গে চার-পাঁচজন মানুষকে গপ্ গপ্ করে গিলে ফেলতে পারে।"

—"বল কি হে? জায়গাটা কোন্‌দিকে?"

—"নারীদের উপত্যকার পরেই একটা প্রকাণ্ড ধূ-ধূ করা জলাভূমি। তারই আশপাশের বন জঙ্গলেই নাকি সেই ভয়ঙ্কর শয়তানদের বাসা। তিনচুড়ো পাহাড়ে যেতে গেলে সেই জলাটা পার না হয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু সেখানকার কথা জানতে চাইছেন কেন?"

—"ভাবছি ওদিকটাতেও বেড়াতে যাব।"

—"সোনার জন্যে?"

—"না জো, আমাদের সোনার লোভ নেই। আমরা অসাধারণ দৃশ্য, নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসি। তাই সোনার পাহাড়ের দিকে যেতে চাই।"

—"তাহলে কর্তা, গোড়াতেই আমার কথা শুনে রাখুন। আপনারা অনেকগুলো বন্দুকের মালিক, তার ওপরে দলেও ভারী, তাই আপনাদের সঙ্গে আমি নারীদের উপত্যকা পর্যন্ত যেতে পারি। কিন্তু তারপর আমি আর কিছুতেই এগুবো না—আমার বাপ-ঠাকুরদার দিব্যি—কিছুতেই না, কিছুতেই না! কচ্ছপমুখো দানবরা যদি ফলারের গন্ধ পেয়ে ধুমধুমিয়ে দলে দলে তেড়ে আসে, তাহলে বন্দুকগুলোও আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না!"

---

* "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" দ্রষ্টব্য

—"জো, এখনি তোমার এতটা ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা এখানে মরতে আসিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

—"কিন্তু আমার শর্ত ভুলবেন না।"

—"ভুলব না।"

দশম পর্ব

আশ্চর্য কদলী

ফ্লাই নদী।

দুনিয়ায় বড় বড় নদীর সঙ্গে কেউ বিলাতের টেম্‌স্‌ নদীর নাম উল্লেখ করে না। কিন্তু যারা মুখের কথায় ও কলমের লেখায় টেম্‌স্‌কে পৃথিবীবিখ্যাত করে তুলেছে, তাদের চক্ষে ফ্লাই হচ্ছে বৃহৎ নদীই বটে।

যারা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও পদ্মা প্রভৃতি নদীর দেশ থেকে এসেছে, ফ্লাই নদী বিশেষ ভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

তবে ব্রহ্মপুত্র বা পদ্মা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ফ্লাইকে বড় নদী বলে স্বীকার করা চলে। ইংরেজদের নিউগিনি থেকে এই নদীটি প্রবেশ করেছে ওলন্দাজের পশ্চিম নিউগিনির মধ্যে।

প্রথমটা স্থলপথে মোটরযানে যাত্রা করে বিমল ও কুমার প্রভৃতি ফ্লাই নদীর তীরে এসে স্টীমারে গিয়ে উঠল। ক্রমে নদী গিয়ে পড়ল পশ্চিম নিউগিনির ভিতরে। এ নদীতে স্টীমার যেতে পারে পাঁচশো মাইল পর্যন্ত। তারপর জলের ধারা এত সংকীর্ণ হয়ে আসে যে, স্টীমার আর চলে না। তখন বাধ্য হয়েই স্থানীয় নৌকার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

একদিন তাদের মনে নদীজলে অবগাহন-স্নানের আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা জাগল।

কিন্তু জো বললে, "কর্তা, জলে কুমিররা আছে!"

তাদের স্নানের ইচ্ছা বিলুপ্ত হল।

তারপর পদব্রজে। আরো একটা নদীর পরে পাওয়া যায় ডিঘোগোয়েল নদী। সেখানে স্থানীয় নৌকা ছাড়া জলপথে আর কিছু চলে না।

নৌকাগুলোও ডোঙা বা শালতি জাতীয়। বড় বড় মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ভিতরটা কুঁদে তৈরি করা। অনেক নৌকা চওড়ায় না হলেও লম্বায় বড় কম নয়। সেগুলোকে আবার নানা নক্সা কেটে অলঙ্কৃত করবার চেষ্টা হয়। বিমলদের সঙ্গে লটবহর তো অল্প ছিল না, তাই নৌকার দরকার হল অনেকগুলো।

নদীপথে যেতে পাহাড় ও অরণ্য ছাড়া আর একটা দৃশ্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। নদীতীর থেকে খানিক তফাতে জলের ভিতরে খুঁটি পুঁতে তার উপরে পাটাতন এবং সেই পাটাতনের উপরে পাশাপাশি কয়েকখানা কুটির নিয়ে এক-একখানি গ্রাম নজরে পড়তে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, "হিংস্র জন্তু আর মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এইসব গ্রামের সৃষ্টি। য়ুরোপেও এই শ্রেণীর আদিম বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

জলপথের পর সকলকে মাটিতে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হতে হল। পূর্ব নিউগিনি ছাড়বার পর থেকেই সভ্যতার অল্প-স্বল্প চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল। খালি বনজঙ্গল। মাঝে মাঝে যে-সব মানুষের দল আত্মপ্রকাশ করে, তাদের ভাবভঙ্গি বন্ধুজনোচিত বলে ভ্রম হয় না। নধর পাঁঠা দেখলে আমাদের চোখমুখ খুশি হয়ে ওঠে যে রকম, আমাদের দেখে তাদেরও চোখমুখ সেইরকম হয়ে

ওঠে। তাদের অনেকের মাথায় শোভা পায় 'স্বর্গের পাখি'র রঙিন পালক, আর সকলেরই হাতে থাকে মারাত্মক সব অস্ত্র। পরনে কোন দলের তলার দিকে ঝল্‌ঝলে শুকনো পাতার পোশাক, কোন দলের সম্বল খালি কপ্‌নি।

দলে ভারী না হলে এবং সঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক না থাকলে এই অসভ্য বন্য মানুষগুলো যে আদর করে অতিথিসৎকার করত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা নিষ্পলকনেত্রে গভীর লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত এই হাতে-পাওয়া অথচ হাতছাড়া শিকারগুলোর দিকে।

একদিন এমনি কতকগুলো কপ্‌নি-পরা কালো কালো ভূতের মত লোককে বনের ভিতর থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসতে দেখে বাঘা খাপ্পা হয়ে ধমক দিতে দিতে তাদের দিকে দৌড়ে গেল।

কিন্তু জো মস্ত এক লাফ মেরে বাঘাকে ধরে ফেলে কোলে তুলে নিয়ে বললে, "আরে বাঘা, তুই মরতে চাস্ নাকি?"

জো-র মুখের কথা শেষ না হতে হতেই একটা চক্‌চকে ফলাওয়ালা বর্শাদণ্ড বাঘার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে মাটি কামড়ে ধরলে।

কুমার দেখলে আরো অনেকে ধনুকে তীর বসিয়ে ছিলা টেনে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে টিপ না করেই ঘোড়া টিপে দিলে।

কেউ হত বা আহত হল না বটে, কিন্তু বন্দুকের এক গুড়ুম শব্দেই তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই তারা হাউমাউ করে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝাঁপ খেয়ে জঙ্গলের আড়ালে।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের ছেড়ে বাঘার ওপরে ওদের অত রাগ কেন?"

জো বললে, "রাগ নয় কর্তা, লোভ।"

—"লোভ! ওরা বুঝি কুকুরের মাংসের ভক্ত?"

—"মাংসের নয়, ওরা কুকুরের দাঁতের ভক্ত।"

—"সে আবার কি?"

—"কর্তা, এখানকার লোকদের বিশ্বাস, কুকুরের দাঁতে কপাল ভালো হয়। সাহেবরা যেমন ঘোড়ার নাল কাছে রাখে, এরাও তেমনি কুকুরের দাঁত সঙ্গে রাখতে চায়। যে পর্তুগীজ সাহেবের কাছে আমি নারীদের উপত্যকার কথা শুনেছি, তার পেশাই ছিল লোহা-পাথর, লবণ আর হরেকরকম ছোট ছোট গয়নার সঙ্গে কুকুরের দাঁতও ফেরি করা। ফি বছর আটমাস সে এখানেই থাকে। এদেশে তো কুকুর পাওয়া যায় না, তাই তাদের দাঁতগুলো বিকিয়ে যায় খুব চড়া দরে।"

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "রামহরি, এখনি বাঘাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো।"

বাঘা যে বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেল, তার রকমসকম দেখেই সেটা বোঝা যায়। তার মনে বোধকরি প্রশ্ন জেগেছে সে তো কোন অন্যায় করেনি, তবে কেন এই আপত্তিকর বন্ধনদশা?

বিনয়বাবু চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, "এখানকার অরণ্যে দেখছি অনাহারে মরবার কোন ভয়ই নেই।"

—"কেন?"

—"বনে-জঙ্গলে নারকেল গাছের সংখ্যাই হয় না। তেমনি অসংখ্য কলাগাছের ঝাড়। পেট ভরে কত খাবে খাও না!"

কমল লাফ মেরে একটা কলাগাছ থেকে কলা পেড়ে নিয়ে বললে, "খালি কি তাই? এদেশী

কলার ওপরে খোসা নেই গাছ—থেকে পাড়ো আর মুখে পুরে দাও।"

রামহরিও সায় দিয়ে বললে, "ভূভারতে কে কবে এ-কথা শুনেছে—কলা আছে, খোসা নেই?"

কেবল নারকেল গাছ ও কলাগাছ নয়, বনে বনে আরো কত জাতের গাছই নজরে পড়ল—কার্পাস গাছ, চন্দনকাঠের গাছ, তামাক গাছ প্রভৃতি।

রন্ধনকলার অদ্বিতীয় শিল্পী রামহরি গাছের নারকেল আর খোসাহীন কলার উপরে নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। যে তাকে চেনে সেই-ই এ কথা আন্দাজ করতে পারবে। সেইজন্যেই বিনয়বাবু প্রায়ই বলতেন যে, "পঞ্চাশোর্ধে যদি বনবাসী হই, তাহলে রামহরিকে নিশ্চয়ই সাথে সাথী করব।"

উটকো দেশের অজানা বনে এসেছে, তবু রামহরি সঙ্গে আনেনি কি? ঘি-মাখনের টিন তো আছেই—সেই সঙ্গে আছে বিলাতী টিনে ভরা কত রকমের ফল ফসল, নানাবিধ মাছ মাংস ও চাটনী এবং নির্জল আলু ও কপি প্রভৃতি প্রভৃতি। বিমল ও কুমার মানা করলেও নিষেধবাক্য কানে তোলেনি। তার উপরে আছে এখানকার আকাশে উড্ডীন পক্ষী এবং নদীতে সলিলসঞ্চারী মৎস্য প্রভৃতি টাটকা খাবার। আরো ভালো হত যদি নিউগিনির বনে হরিণ পাওয়া যেত। তাই প্রায়ই গহনবনেও রামহরি রীতিমত ভোজের আয়োজন করত। অনেকে উনুনের আঁচে বসে হাতাখুন্তি নাড়া বিরক্তিকর মনে করে, কিন্তু রামহরির কাছে রন্ধন ছিল সব আনন্দের সেরা আনন্দ। প্রায় নেশার মত।

ক্রমে তারা এমন গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়ল, যা রীতিমত ভয়াবহ। জঙ্গল যেন তাদের গ্রাস করে ফেললে—ভাগ্যে জো সঙ্গে ছিল, নইলে নিশ্চয়ই পথ হারাতে হত। জো হচ্ছে বনরাজ্যের প্রজা, বনের কোলেই প্রথম আলো দেখেছে, আর বনজঙ্গলেই কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন—বনবাসী জীবজন্তুর মত সে-ও সহজাত প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত নয়। সকলকে নিয়ে যথাস্থান দিয়ে সে এগিয়ে আর এগিয়ে চলল।

এ যেন রাক্ষুসে বন—নৃশংস ও হিংস্র। ছোট-বড় বিষাক্ত সাপ, মোটা মোটা অজগর এবং দলে দলে ডিঙ্গো—অর্থাৎ হিংস্র বন্য কুকুর প্রভৃতি। তারপর পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে লতাজালে আবদ্ধ বড় বড় ঝাঁকড়া-মাথা গাছেরা দিনের বেলাতেও সূর্যালোক মুছে ফেলে পথিকদের চক্ষু অন্ধ করে দিতে চায় এবং রাত্রে ক্ষণে ক্ষণে শব্দময় ও শব্দহীন নানা বিভীষিকায় সকলের দেহের ধমনী ও শিরা-উপশিরায় ছুটিয়ে দেয় মৃত্যুশীতল তুষারস্রোত। নীরন্ধ্র অন্ধকারে গাছে গাছে বাতাসের ছোঁয়ায় লক্ষ লক্ষ পাতা নড়ে আর সন্দেহ হয় যেন রক্তলোভী চক্রান্তকারীরা চুপিচুপি কানাকানি করছে। রাত্রির সেই নিজস্ব রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম্ বাণী তো আছেই, তার উপরে কানে আসে আরো কতরকম অস্বস্তিকর শব্দ। আচম্বিতে কোন আঁতকে ওঠা অজ্ঞাত পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠের আর্তচিৎকার, দমকা হাওয়ায় মাটির উপরে ছড়ানো শুকনো পাতার মড়্-মড়্ শব্দ, বুকের ভিতরে অমনি শিহরণ জাগে—সন্দেহ হয়, যেন রাতের মানসপুত্র কোনো ভয়ঙ্কর মূর্তিমান হয়ে তাঁবুর ভিতর এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। তার উপরে আছে সেই স্থলচর কুমিরদের আগমন সম্ভাবনা। রামহরি তো নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো করে ঘুমোতেই পারে না—যখন-তখন বলে, "এ-কী জ্বালা বাপু! জলের হাঙর-কুমিরগুলো যদি ডাঙায় উঠে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে, তাহলে মানুষ কী সুখে আর বেঁচে থাকবে?"

রামহরির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাদের কারুরই জানতে বাকি নেই যে, অসমসাহসী

হলেও রাতে সে শিশুর মতই ভূতের ভয়ে নেতিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা উতরে গেলেই ভূতের দেখা পাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

এখানে এসে সেদিন কিন্তু সে সন্ধ্যা হতে না হতেই একটা আস্ত ভূত দেখে ফেললে।

সেদিন তারা ছাউনি ফেলেছিল জঙ্গলের প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত একটি ছোট্ট নদীর ধারে। তাদের পিছনে খাটানো রয়েছে সারি সারি তাঁবু। সেপাইরা বন্দুক কাঁধে করে পাহারা দিচ্ছে—যে বিপদসংকুল দেশে এসেছে কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না, সতর্ক হয়ে থাকতে হয় অষ্টপ্রহর।

রাত্রের আহারটা অধিকতর লোভনীয় করে তোলবার জন্যে বিমল ও কুমার বৈকাল থেকেই ছিপ নিয়ে মৎস্য শিকার করতে নদীর ধারে গিয়ে বসেছিল। রোদ যখন গাছের টঙে চড়েছে, তখনও পর্যন্ত একটিমাত্র মৎস্যও তাদের রসনা তৃপ্ত করবার জন্য টোপ গিলতে রাজী হল না।

বর্শা নিয়ে হঠাৎ জো হাঁটুজলে গিয়ে নামল।

বিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "তুমি আবার কাকে বধ করতে চাও?"

—"মাছকে।"

—"এ নদীতে মাছ নেই।"

—"দেখা যাক।"

আধঘণ্টার মধ্যে সত্যসত্যই দেখা গেল, বর্শায় বিঁধে জো একে একে সাত-সাতটি মাছ ডাঙায় তুলে ফেললে। নাম-না-জানা নতুন জাতের মাছ। সবাই অবাক।

দূর থেকে নতুন এক ব্যাপারও দেখা গেল।

জো বললে, "কর্তা, গেছো কাঙ্গারু দেখেছেন?"

সবাই নেতিসূচক মস্তকান্দোলন করলে।

বিনয়বাবু বললেন, "চিরকাল তো শুনে আসছি কাঙ্গারুরা মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।"

জো ওপারের একটা গাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, "না। পশ্চিম নিউগিনিতে গেছো কাঙ্গারুও আছে। ঐ দেখুন।"

দূর থেকে ভালো করে দেখা গেল না, তবে গাছের ডালে একটা কাঙ্গারুর মতই দেখতে বড় জীব বসেছিল বটে।

সূর্য তখন আর পৃথিবীতে রৌদ্র-বিতরণ করছে না। আগত গোধূলিকাল—ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিকের দৃশ্য। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে দেরি নেই।

আচম্‌কা রামহরি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ভূত! ভূত! মস্ত ভূত!"

সকলে সচমকে দেখলে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

তার মাথায় রয়েছে ছড়িয়ে পড়া আনারসের পাতার মতন দেখতে চুড়ো, মুখের উপরে চোখের বদলে রয়েছে কেবল দুটো ছ্যাঁদা, সর্বাঙ্গ ঢেকে রয়েছে কেবল দুটো ছ্যাঁদা, সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে পায়ের উপর পর্যন্ত ঝুলে-পড়া গাছের পাতার পোশাক এবং হাতে রয়েছে একটা মুগুর।

বিমল ও কুমার ভয় পেলে না বটে, কিন্তু চমৎকৃত হল অত্যন্ত।

জো বলে উঠল, "কাইভা কুকু, কাইভা কুকু!"

—"কাইভা কুকু কি আবার?"

—"এদেশী পাহারাওয়ালা। ওকে সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে হয়, গাঁয়ের সর্দার ছাড়া আর কারুর কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। ওহে কাইভা কুকু! শুনছ? সরে পড় ভায়া, চটপট সরে পড়—এখানে ঘুষ-টুষ কিছু মিলবে না! দেখছো তো, কতগুলো বন্দুক তোমার জন্যে তৈরি হয়ে আছে?"

কাইভা কুকু বন্দুকগুলো দেখলে এবং বিনাবাক্যব্যয়ে গা ঢাকা দিলে ঝোপের অন্তরালে। চালাক লোক।

একাদশ পর্ব

বুনোদের খুনোখুনি-হানাহানি

তাদের মনে হচ্ছিল, এই অমঙ্গলময় জঙ্গলের বুঝি শেষ নেই—এর আধা-আলো আর আধা-আঁধারের মধ্যেই তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত। অবশেষে দিনের পর দিন চলতে চলতে যখন তারা প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ছে, তখন খুঁজে পেলে সেই দূরবিস্তৃত বনরাজ্যের

সীমানা। অনেকগুলো আশ্বস্তির নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে।

ধূ-ধূ করা সবুজ প্রান্তর এবং তাকে সরস করে মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সঙ্গীতমুখরা স্রোতস্বতী।

প্রান্তর ও কান্তার পার হয়ে শূন্যপথ দিয়ে তাদের অনাহত দৃষ্টি ছুটে গেল দূরে—বহু দূরে, যেখানে আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখাকে আড়াল করে বিরাট এক তুষারধবল পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে—তার শিখরে শিখরে উড়ছে হালকা মেঘের পতাকার পর পতাকা।

বিনয়বাবু শুধোলেন, "ও পর্বতটার নাম কি?"

জো বললে, "কার্সেন্টস্‌জ্‌ উপ্লেন।"

—"কেতাবে পড়েছি ওর উচ্চতা ষোলো হাজার ফিট।"

রামহরি গড় হয়ে প্রণাম করে ভক্তিভরে বললে, "এখানেও বাবা মহাদেবের হিমালয়! জয় বাবা, খোকাবাবুদের মঙ্গল কোরো।"

জো হেসে বললে, "আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেও আর একটা হিমালয় আছে।"

রামহরি ভুরু তুলে বললে, "বল কি গো! এ যে দেখছি হিমালয়ের ছড়াছড়ি।"

কুমার বললে, "রামহরি, ধনী মানুষরা অবসরকাল কাটাবার জন্যে এক-এক জায়গায় নতুন বাড়ি বা বাংলো তৈরি করিয়ে রাখে। আর তোমার মহাদেব কি যে-সে দেবতা? তিনি হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব! একটা হিমালয় নিয়ে তাঁর চলবে কেন?"

বিমল বললে, "ওসব বাজে কথা রাখো। আজ এখানেই ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করব। আর রামহরি, তুমিও কিছু কিছু নতুন খাবার রেঁধে আমাদের পথশ্রম লাঘব কর।"

রামহরি মাথা নেড়ে বললে, "হায়রে আমাদের পোড়াকপাল! একি কলকাতা শহর যে মনের মত নয়া নয়া খাবার রাঁধব?"

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, "তুমি হচ্ছ রন্ধনশিল্পের যাদুকর, তুমি ইচ্ছা করলে অসাধ্যসাধন করতে পারো।"

প্রশংসাতুষ্ট রামহরি বললে, "দেখি, কতদূর কি করতে পারি!"

কমলের জিভে এখনি জল আসছিল। সে অনুনয়ের স্বরে বললে, "তবু কি রাঁধবে একটু আঁচ দাও না ভাই রামহরি।"

—"বেশী কিছু রাঁধবার মালমশলা কোথায় পাব? তবে কাল তিনটে বুনো পায়রা হাঁস পাওয়া গেছে, তাই দিয়ে কারি হতে পারে।"

—"আর?"

—"আর হতে পারে মটরকলাইয়ের সুপ।"

—"আর?"

—"ভাবছি কিছু মাছের প্যাটি বানাব।"

—"আর কিছু হবে না তো?"

—"তবু খাই-খাই? বেশ, 'পোট্যাটো স্যালাড'ও হবে। আর বৈকালে চায়ের সঙ্গেও দিতে পারি 'টি কেক'।"

—"রামহরি ভাই, চিরজীবন আমি তোমার মোসাহেব হয়ে থাকব। এই নিবিড় জঙ্গলে রান্নার এতগুলো পদ? ধন্য ধন্য—দলে তুমিই অগ্রগণ্য।"

বাংলা ভাষায় কথাবার্তা চলছিল, তাই কিছুই বুঝতে না পেরে জো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল

বোকার মত। এখন ফাঁক পেয়ে মুখ খুলে বললে, "এ-সব কী কথা হচ্ছে? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয় তো?"

বিনয়বাবু তার পিঠ চাপড়ে হাস্যমুখে ইংরেজীতে বললেন, "না জো, ষড়যন্ত্র নয়—তোমার পাকযন্ত্রকে আরো ভালো করে চালাবার জন্য রামহরি আজ নতুন নতুন রান্না তৈরি করবে।"

জো আহ্লাদে আটখান হয়ে হাঃ হাঃ রবে অট্টহাস্য করে নিজের পেটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, "রামহরি-ভায়া, আমার এই উদরপ্রদেশটি দেখছ তো? এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে একটা গোটা হাতির খোরাক—সে কথা যেন ভুলো না!"

রামহরি ভাষা না বুঝেও তার ভাবভঙ্গির তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললে, "জানি গো জানি, আর আধিখ্যেতা করে ভুঁড়ি দেখাতে হবে না। তোমার পূর্বপুরুষেরা তো জন্মেছিল লঙ্কার রাক্ষসের ঘরে!"

এই সব কথা হচ্ছে, এমন সময়ে দূরে, আচম্বিতে বেজে উঠল অনেকগুলো দামামা।

বিমল চমকে বললে, "ও আবার কি?"

জো ভীতচক্ষে বললে, "যুদ্ধের ঢাক বাজছে। ঢাকের বোল হচ্ছে—'আক্রমণ কর, আক্রমণ কর'!"

—"আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে নাকি?"

—"সবুর করুন কর্তা! আগে ভালো করে শুনি।"

বন্যদের দামামার নিজস্ব ভাষা আছে—প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের বাসিন্দারা ছাড়া তা আর কেউ বুঝতে পারে না। আনন্দে, নিরানন্দে, নৃত্যে, শোকে, বিবাহে, যুদ্ধবিগ্রহে দামামায় জাগে বিভিন্ন বোল। আবার অসভ্যদের ঢাক রীতিমত টেলিগ্রাফের কাজ করে। বিশেষ বিশেষ বোলে ঢক্কানিনাদের দ্বারা বনবাসীরা যে-কোনো সংবাদ এক রাত্রের মধ্যেই একশো মাইল দূরেও প্রেরণ করতে পারে। গহন বনে ঢাক হচ্ছে অসভ্যদের সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র। ঢাকের সাফল্য দেখে য়ুরোপীয় পর্যটকরাও প্রচুর বিস্ময় প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি।

অল্পক্ষণ দামামার বাজনা শুনেই জো বললে, "না কর্তা, আমাদের বিরুদ্ধে বুনোরা হামলা করতে আসছে না—এ হচ্ছে ঘরোয়া মারামারি। এক গোত্রীয় লোকের সঙ্গে আর-এক গোত্রীয় লোকের যুদ্ধ—যা এখানে হামেশাই হয়।"

দামামাধ্বনি ক্রমেই নিকটস্থ হল।

—"দেখুন কর্তা, ঐ দেখুন!"

অরণ্য-প্রাচীর ভেদ করে লোকের পর লোক খোলা জমির উপরে ছুটতে ছুটতে আসতে লাগল—ক্রমে দেখা গেল প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে। সামনেই নদীর বাধা দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি সেইখানেই অর্ধচক্রাকার ব্যূহ রচনা করে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের অস্ত্র তীরধনুক ও বর্শা এবং পরনে কৌপীন।

তারপরই আত্মপ্রকাশ করলে আর একদল যোদ্ধা—সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ এবং তারাই আক্রমণকারী। তাদের অস্ত্র তীরধনুকের ও বর্শার সঙ্গে কাঁটাওয়ালা মুগুর, আবার কারুর কারুর হাতে তরবারিও আছে। তাদের নিম্নার্ধ ঢাকা শুকনো ঘাসের পোশাকে।

কি বিশ্রী মুখভঙ্গি! কী প্রচণ্ড লম্ফঝম্প! কী বিরাট চীৎকার? বৃক্ষবাসী পক্ষীরা আর্তনাদ করে শূন্যে উড়ে গেল—জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বড় বড় ভীত ও সচকিত জানোয়ার।

কমল ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "দেখ রামহরি, দেখ—দেখ!"

রামহরি আঁতকে উঠে বললে, "ও বাবা স্থলচর কুমির গো!"

তারা দেখতে অনেকটা কুমিরের মতই এবং আকারেও তেমনি বৃহৎ বটে, কিন্তু তাদের বিশাল গিরগিটি বললেও ভুল বলা হবে না। বাইরে বেরিয়ে এই হুলস্থূল কাণ্ড দেখে তারা তাড়াতাড়ি আবার বুকে হেঁটে অন্য একটা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলে।

সকলে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে, এদিকে এর মধ্যেই থেমে গেল যুদ্ধ-হাঙ্গামা।

যারা আক্রান্ত হয়েছিল, তারা যখন দেখলে দলে দ্বিগুণ ভারী শত্রুদের বাধা দেওয়া অসম্ভব, তখন তাড়াতাড়ি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলে, কয়েকজন পদযুগল ভরসা করে ইতস্ততঃ দৌড় মারলে স্থলপথেই, বাকি কয়েকজন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কেউ কেউ সাঁতার কেটে ভেসে চলল এবং কেউ কেউ সাঁতার জানে না বলে তলিয়ে গেল।

কিন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই সাত-আটজন হত বা আহত হয়ে শয়ন করেছিল ধরাশয্যায়। তারপর আরম্ভ হল এক রক্তাক্ত পাশবিক দৃশ্যের অভিনয়।

যারা মৃত এবং যারা তখনও জীবিত, বিজেতারা কচ্ কচ্ করে তাদের মুণ্ড কেটে নিয়ে উৎকট আনন্দে উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে। এর পরে এই সব মুণ্ডই হবে তাদের বীরত্বের ও পুরুষত্বের অভিজ্ঞান। তারপর সবাই মিলে মুণ্ডহীন দেহগুলোর পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এবং জোরে জয়দামামা বাজাতে বাজাতে আবার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে—যেন দেখেও দেখলে না এপারে সমবেত এতগুলো বিদেশীলোকের জনতার দিকে। অদূর ভবিষ্যতে যে বিপুল ভোজের আসর জমজমাট হয়ে উঠবে, তারা তখন থেকেই সে আনন্দেই বিভোর হয়ে ছিল।

জো বললে, "আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে কি, ওরা এখন যুদ্ধজয়ের আর মাংস খাবার আনন্দেই মত্ত হয়ে উঠেছে। এই সাত-আটটা দেহের মাংসই আজ ওরা গিলে হজম করে ফেলবে।"

কমল শিউড়ে উঠে বললে, 'ইস্, কী কাণ্ড!"

রামহরি থপ্ করে বসে পড়ে বললে, "আমার বমি আসছে! ওয়াক্, ওয়াক্!"

বিনয়বাবু বললেন, "আজ আমরা সভ্য হয়ে নরমাংস দেখে লোভ জাহির করি না বটে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও যে নরমাংসভোজী ছিলেন না এ-কথা জোর করে বলা যায় না। আজও শুনতে পাই, ভারতেও নাগাদের দেশে কোনো কোনো জায়গায় নরমুণ্ড শিকারের প্রথা প্রচলিত আছে—তবে তারা নরমাংসভোজী কিনা জানি না।"

বিমল বললে, "টলস্টয়ের জীবনীতে পড়েছি, তিনি যে কোনো জীবের মাংস খাওয়া নরভুক হওয়া একই ব্যাপার বলে মনে করতেন।"

বিনয়বাবু বললেন, "আমিষ খাওয়াতেও সংযম, নির্বাচন আর সুরুচি থাকা চাই। বাড়াবাড়ি মানুষকে রাক্ষস করে তোলে। শ্বেতাঙ্গরা হাতির মাংস খেতেও ছাড়ে না।"

কুমার বললে, "আজকের ব্যাপার দেখে আমারও গা ঘিন্-ঘিন্ করছে। আজ আমি আমিষ খাব না।"

দ্বাদশ পর্ব

কমলের জন্যে নতুন রান্না

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা যায়, পথ আর ফুরোতে চায় না।

শুকনো বন-জঙ্গলের পরে এল অশ্রান্ত বৃষ্টি-ঝরা অরণ্য। সেখানকার সূর্যহারা আকাশ সর্বদাই মেঘে মেঘে মেঘময়। সেই সঙ্গে বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি! দিন নেই, রাত নেই, বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই।

মাইলের পর মাইল—কত মাইল পথ চলা হল কেউ তার হিসাব রাখতে পারে না। বামে অরণ্যের প্রাচীর, ডাইনেও অরণ্যের প্রাচীর, সামনেও বাধা দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন নিরেট অরণ্য। তার মধ্যেই পথ করে নিয়ে জো যে কেমন করে অগ্রসর হচ্ছে, সে রহস্য কেউ বুঝতে পারে না। দিনের বেলাও যেন সন্ধ্যাবেলা। এবং সেই আবছায়ায় বৃষ্টি ঝরে একটানা। জামা-কাপড় ভিজে স্যাঁৎসেতে, শুকোবার ফাঁক নেই। উপর পানে তাকালে দেখা যায় খালি কালো কালো মেঘের পর মেঘ ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝোপঝাপের ভিতর থেকে বালকের মত ছোট ছোট ছায়ামূর্তি দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যায় আবার অপচ্ছায়ার মতই।

জো বলে, "বাদুলে বনের বামনরা।"

তারপর পিছনে পড়ে থাকে সেই ভয়াবহ বর্ষাস্নাত রৌদ্রহারা বন্য জগৎ এবং সামনে জাগে আবার মুক্ত প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃশ্য।

পার্বত্য প্রদেশ।

জমি ক্রমেই কঠিন ও উঁচু হয়ে উঠছে, অরণ্য ক্রমেই ছোট ছোট ঝোপে পরিণত হচ্ছে, ফাঁক পেয়ে সূর্যালোক স্বাধীন হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালী আভা।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। কোন কোন গ্রামে জমি থেকে উঁচু কাঠের পাটাতনের উপরে এক-একখানা বাড়ি—তাও চেরা-চেরা কাঠে তৈরি এবং ছাদ শুকনো ঘাসে ছাওয়া। বাড়িগুলোর উপর দিক ত্রিকোণ। গায়ে বেশ চমৎকার কারুকার্য। খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখতে হয়।

জো বললে, "ওগুলো হচ্ছে সর্দারদের বাড়ি।"

একখানা বাড়ির সামনে বেঞ্চির উপরে ভারিক্কি চালে বসে আছে দুজন প্রৌঢ় লোক—স্ত্রী ও পুরুষ। দেহ, হাত, পা তাদের অনাবৃত, কেবল কোমরে সংলগ্ন প্রায় কৌপীনের মত বস্ত্রখণ্ড।

জো বললে, "সর্দার আর সর্দারনী।"

এইসব গাঁয়ের বাসিন্দারা শত্রুতা বা মিত্রতা কিছুই প্রকাশ করে না, খালি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিমল বললে, "এখানকার বন্যদের মুখে তো হিংসার ভাব নেই।"

জো বললে, "বনবাসী হলেও এরা খানিকটা সভ্য হয়েছে। বাইরের সঙ্গে এদের অল্প-স্বল্প সম্পর্ক আছে।"

পরদিন আবার পাওয়া গেল একটা জঙ্গল। ছোট এবং অনিবিড়। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা পায়ে-চলা পথ।

সর্বাগ্রে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল বিমল ও কুমার।

আচমকা একটা ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকটা বলিষ্ঠ কাফ্রী, নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিমল ও কুমার কিছু বোঝবার আগেই পিছন থেকে করলে তাদের মাথার উপরে মুগুরের প্রচণ্ড আঘাত। তারা জ্ঞান হারিয়ে তখনি ভূতলশায়ী হল।

ছুটে এল দুজন শ্বেতাঙ্গ—স্মিথ ও হ্যারিস।

তারা চটপট বসে পড়ে বিমল ও কুমারের জামা আর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে কি খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই পেলে না।

স্মিথ তাড়াতাড়ি বললে, "ভালো করে খোঁজবার সময় নেই—এখনি সবাই এসে পড়বে।"

হ্যারিস কাফ্রীগুলোকে ডেকে বললে, "এই আপদ দুটোকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল। সেই পাথরের টুকরোটা নিশ্চয়ই এদের কারুর কাছে আছে।"

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না—দূর থেকে কমলের সজাগ তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাদের আবিষ্কার করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল তার হাতের বন্দুক—একবার, দুইবার।

—"জো, জো! শত্রু! শীঘ্র এস—সেপাই, সেপাই!"

সবাই বেগে ছুটে এল—কিন্তু ভূতলে বিমল ও কুমারের অচেতন দেহ ছাড়া শত্রুদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলে না। একটা ঝোপ খালি নড়ে নড়ে উঠছিল।

ছুটে গিয়ে ঝোপ ফাঁক করে জো অবাক হয়ে দেখলে, মাটিতে পড়ে সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে ছটফট করছে এক শ্বেতাঙ্গের দেহ।

সে হচ্ছে হ্যারিস। কমলের বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হয়েছে তার বক্ষে। মিনিটখানেক পরেই সে মারা পড়ল।

বিমল ও কুমারের রক্তাক্ত মাথায় রামহরি জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

বিনয়বাবু ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বললেন, "ভয় নেই। বেশি চোট লাগেনি। ব্যাণ্ডেজ করে দিলে দু-দিনেই সেরে যাবে।"

একটু পরেই বিমল ও কুমার চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসল।

কিন্তু সেদিনকার মত পথ চলা বন্ধ হল সেইখানেই।

রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "চুলোয় যাক্ আলোপাথর! তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।"

বিমল হাসিমুখে বললে, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?"

—"কিন্তু এক বেটাকে কৃষ্ণ রক্ষা করেননি। ঐ ঝোপের ভেতরেই মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে।"

—"কে?"

—"হ্যারিস। সেই ঢ্যাঙ্গা শয়তানটা।"

—"মারলে কে?"

—"কমলবাবু।"

—"সাধু, সাধু! ধন্য তুমি, হে যুদ্ধজয়ী বীর!"

বিমলের মুখের প্রশংসা পেয়ে কমলের মনে আনন্দ আর ধরে না।

বিনয়বাবু বললেন, "এটা হল কমলের প্রথম নরহত্যা। তবে দুরাত্মাকে মেরেছে বলে ওকে এ-যাত্রা ক্ষমা করলুম।"

রামহরি বললে, "কমলবাবু কি শুধু দুরাত্মাকে মেরেছে? খোকাবাবুদেরও প্রাণরক্ষা করেছে। কেবল ওকে খাওয়াবার জন্যেই আজ আমি একটা নতুন রান্না রাঁধব।"

ত্রয়োদশ পর্ব

অনেকগুলো চাঁদের দেশ

চড়াই। খুব খাড়া নয়, তাই তাকে মাড়িয়ে চলতে বেশি হাঁপ ধরে না।

ধীরে ধীরে সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ ক্রমেই উপরদিকে উঠে গিয়েছে। বিমল, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি—প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছিল একটা করে দূরবীন, তাইতে চোখ লাগিয়ে দেখা গেল দূরে দূরে সেই ঢালু জায়গায় গা বেয়ে নীচের সমতল ক্ষেত্রের দিকে নেমে গিয়েছে শস্যক্ষেতের পর শস্যক্ষেত ; ধাপে ধাপে সোপানশ্রেণীর মত। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল, সেই সব ক্ষেতে কাজ করছে কৃষাণদের দল।

বিনয়বাবু বললেন, "বোঝা যাচ্ছে সভ্যতার আলো এসেছে। প্রথম যুগে মানুষ যখন সভ্যতার ক-খ জানত না, তখন তারা আগুন জ্বালাতেও শেখেনি, পাথরের ফলাবসানো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনে বনে ঘুরে শিকারীজীবন যাপন করত, জীবজন্তু বধ করে তাদের কাঁচা মাংস খেত। এই শ্রেণীর বন্য মানুষ খুঁজলে আজও পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে। দ্বিতীয় যুগে মানুষ করলে অগ্নি আবিষ্কার। এবং আগুন জ্বালাবার কৌশলও তার অজানা রইল না—মানুষের জীবনে এল এক আশ্চর্য অভাবিত পরিবর্তন। তারপর ধাতু আবিষ্কার। ধাতব অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুদমন সহজ হয়ে উঠল। তারপর সে যখন চাষবাস করতে শিখলে, তখনই পদার্পণ করলে সভ্যজগতে। নখদর্পণে এই হচ্ছে মানবসভ্যতার রেখাচিত্র।"

রামহরি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "আপনি কি যে হিজিবিজি বললেন, কিছুই বুঝলুম না গো বাবু।"

বিনয়বাবু হেসে ফেলে বললেন, "তুমি বই-টই কিছু পড়েছ?"

—"হুঁ, পড়েছি বৈকি! বিদ্যেসাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ।"

—"তাহলে রামহরি, আজ থাক্। পরে তোমাকে ভালো করে সভ্যতার কথা বুঝিয়ে দেব।"

চড়াই বেয়ে তারা উঠছে আর উঠছে উপরদিকে—ক্রমে আরো উপরে, আরো উপরে।

অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে অরণ্য আর সমতল ক্ষেত্র, আর চলমান সাপের মত আঁকাবাঁকা নদী আর পিপীলিকার মত ছোট ছোট মানুষ।

আর চারিধারে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়—অগণ্য পাহাড়, কোনটা ছোট, কোনটা বড়। তারপর সে সব পাহাড়কে নগণ্য করে দিয়ে যেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে আর একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পর্বত—ঊর্ধ্বাংশে তার চিরতুষারের শুভ্র সাম্রাজ্য।

কমল বললে, "রামহরি, ঐ দেখ তোমার বাবা মহাদেবের আর একটা হিমালয়!"

রামহরি মাটিতে দণ্ডবৎ উপুড় হয়ে আবার প্রণাম ঠুকতে ভুললে না।

বিমল শুধোলে, "ওর নাম কি?"

জো বললে, "উইলহেলমিনা পর্বত।"

কুমার সানন্দে বলে উঠল, "তাহলে আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি?"

—"প্রায়।"

—"প্রায় মানে?"

—"উইলহেলমিনা পর্বতে যেতে গেলে এখান থেকে আরো কয়েক দিনের পথ পার হতে হবে।"

—"কিন্তু আমরা তো উইলহেলমিনা পর্বতে যাবার জন্যে আসিনি।"

—"জানি। আপনারা শেষ পর্যন্ত যাবেন সোনার পাহাড়ে।"

—"অন্তত সেই রকমই তো ইচ্ছা আছে।"

—"কিন্তু আগেই বলেছি, আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে নেই।"

—"তাহলে কি এইখান থেকেই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও?"

—"না কর্তা! আমি নারীদের উপত্যকা পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকব।"

বিমল বললে, "তথাস্তু! তারপরে তোমাকে আর দরকার হবে না। আমরা অনায়াসেই পথ চিনে যেতে পারব।"

—"আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন! কেমন করে পথ চিনবেন?"

—"আমাদের সঙ্গে ও-অঞ্চলের ম্যাপ আছে।"

—"বটে! কিন্তু যেতে যেতে যদি কচ্ছপমুখো শয়তানের সঙ্গে দেখা হয়?"

—"তার ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারব।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটল জো-র কালো মুখে। কিন্তু সে আর কিছু বাক্যব্যয় করলে না।

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, জো অকারণে ভয় পায়নি। তার এই কচ্ছপমুখো শয়তান যদি সত্যসত্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিপ্লোডোকাসের বংশধর হয়, তাহলে তাকে রীতিমত ভয়ঙ্কর বলে স্বীকার না করে উপায় নেই।"

কমল বললে, "আমরাও তো ভয়ঙ্কর সাজসজ্জা করে এসেছি। সতেরোটা বন্দুক, একটা মেশিনগান, তার ওপরে একগাদা হাতবোমা আর ডিনামাইটের স্টিক। তাও কি যথেষ্ট নয়?"

বিনয়বাবু রাগত স্বরে বললেন, "কমল, তুমি মহা ফাজিল হয়ে উঠেছ। আমাদের কথার মাঝখানে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে আসো কেন?"

কুমার বললে, "কমল তো অন্যায় কথা বলেনি বিনয়বাবু! ডিনামাইটের স্টিকের সাহায্যে পাহাড়ও উড়িয়ে দেওয়া যায়।"

—"হ্যাঁ, সময় পেলে। কিন্তু ডিপ্লোডোকাস কখন, কোথায় হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে গপ্ গপ্ করে এক এক গ্রাসে আমাদের গিলে ফেলবে, আমরা হয়তো বন্দুক ছোঁড়বার ফাঁক পাব না!"

বিমল বললে, "জানোয়ারটার বর্ণনা আরো ভালো করে দিতে পারেন?"

—"আমেরিকার কার্নেগী মিউজিয়মে ডিপ্লোডোকাসের যে নমুনাটা রক্ষিত আছে, তার চেয়ে লম্বা জীবের দেহ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ইংলন্ডের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মে রক্ষিত ডিপ্লোডোকাসের দেহটা বিশফুট উঁচু আর প্রায় আশীফুট লম্বা। তার ওজন চারশো পাঁচ মনেরও বেশি। তার মুখটা দেখতে কচ্ছপের মতই, কিন্তু দেহের তুলনায় উল্লেখযোগ্যই নয়। অজগরের দেহের মত দেখতে গলাটা অসম্ভব লম্বা এবং দেহটাও এমন বিরাট যে, তার কাছে হাতির দেহও অকিঞ্চিৎকর। সারা দেহের উপরে আছে গণ্ডারের চামড়ার মত কঠিন বর্ম। গোদা গোদা পা, বিপুল লাঙ্গুল। সরীসৃপ জাতীয় অতিকায় জীব। বিখ্যাত ডাইনোসরদেরই আর এক শ্রেণী। জীবতত্ত্ববিদদের মতে মানুষ-সৃষ্টিরও অনেক বৎসর আগে ডিপ্লোডোকাসরা জীবনযুদ্ধে হেরে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "তাহলে কি আপনার বিশ্বাস যে নিউগিনির আধুনিক ডিপ্লোডোকাস হচ্ছে অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়?"

—"তাই বা কি করে বলি? সেকালের যে-সব বিলুপ্ত জীব একালে আর জ্যান্ত দেখা যাবে না বলে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, আধুনিক যুগে তাদের কোন কোন বংশধরকে আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ঐ যে তোমাদের তথাকথিত স্থলচর কুমির,—ইংরেজীতে যাদের মনিটর বলে—তাদের অস্তিত্বও তো অল্পদিন আগেও জানা ছিল না। সম্প্রতি সিংহল দ্বীপেও ঐরকম একটা মনিটরকে বন্দী করা হয়েছে।"

বিমল বললে, "আমিও না হয় নিউগিনির এই কূর্মাবতারকে অত্যন্ত জ্যান্ত, অত্যন্ত প্রাণান্তকর বলে ধরে নিচ্ছি। বিশেষ বেগতিক বুঝলে সঙ্গের এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন করে সোনার পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হব না, কারণ, সোনার পাহাড়ের দিকে আমি যেতে চাই কেবলমাত্র আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যেই! এতগুলো মানুষের জীবনের তুলনায় আমার কৌতূহলের সীমা কতটুকু? তবে সোনার পাহাড়ের ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই মগজকে ভারাক্রান্ত করবার দরকার

নেই, কারণ আগে যাচ্ছি আমরা নারীদের উপত্যকায়।"

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, "জো, সোনার পাহাড়ে তুমি যেতে নারাজ, কিন্তু আর কি তোমার চাঁদ ধরবার আগ্রহও নেই?"

জো বললে, "বলেন কি কর্তা, নেই আবার? আমি রোজ নারীদের উপত্যকার স্বপ্ন দেখি।"

—"জায়গাটা আরো কতদূরে?"

—"বেশি দূরে নয়, আর একটু তাড়াতাড়ি পা চালালে বোধহয় কালকেই পৌঁছে যাব।"

—"তবে তাড়াতাড়ি চালাও পা।"

জো পরম উৎসাহিত হয়ে কুলিদের ডাক দিয়ে বললে, "জল্‌দি চল! আমরা অনেকগুলো চাঁদের দেশে যাচ্ছি!"

চতুর্দশ পর্ব

নারীদের উপত্যকা

পরদিন প্রাতঃকাল। আগুনের উপরে রামহরি চায়ের জল গরম করবার জন্যে কেটলি চড়িয়ে দিয়েছে।

সহসা জো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললে, "কর্তা, কর্তা! বড়ই বিপদ!"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "হঠাৎ আবার বিপদ কিসের?"

—"আমাদের দলের প্রায় পঞ্চাশজন কুলিকে আর দেখতে পাচ্ছি না।"

—"কেন, তারা কোথায় গেল?"

—"বোধহয় শত্রুদলে যোগ দিয়েছে।"

—"কি বলছ তুমি! শত্রু? কে শত্রু?"

—"কমল-কর্তা যাকে মারতে পারেননি, খুব সম্ভব সেই ঢ্যাঙা সাহেবটা।"

—"স্মিথ? কিন্তু সে তো প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে! তার সঙ্গে আমাদের কুলিদের যোগাযোগ হবে কেমন করে?"

—"শুনুন তবে বলি। কাল কো-কো জাতের দুজন লোক আমাদের কুলিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বনের পথে চলতে চলতে হামেশাই এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কাজেই তাদের সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। তাদের আমি কুলিদের সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌গুজ্‌ করতে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু তবু আমি সন্দেহ করিনি, আমি ভেবেছিলুম তারা নিজের নিজের গাঁয়ের আর ঘরবাড়ির কথা নিয়ে আলোচনা করছে। এখন শুনছি তারা অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের কুলিদের স্মিথ সাহেবের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছিল। পঞ্চাশজন বিশ্বাসী কুলি রাজী হয়নি, বাকি পঞ্চাশজন কাল রাতে কখন দল ছেড়ে সরে পড়েছিল কেউ জানতে পারেনি। এখন উপায় কি?"

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "উপায়? যুদ্ধের জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কুমার, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে জোয়েরও বুকে পরিয়ে দাও ইস্পাতের সাঁজোয়া পাটা, আর মাথাতেও স্টীল হেল্‌মেট। রামহরি, বন্দুকগুলো আর মেশিনগানটাও গাঁটরি থেকে বার করে ফেলো।"

জো বললে, "কিন্তু শত্রুরা এবারে দলে ভারি হয়ে আসবে।"

—"আসুক—আমরা তাদের উচিতমত অভ্যর্থনার ত্রুটি করব না। এর ওপরেও ভাণ্ডারে

জমা রইল হাত বোমা আর ডিনামাইটের স্টীক—কিন্তু বোধ করি, সে-সবের আর দরকার হবে না।"

বিনয়বাবু দুঃখিতভাবে মস্তকান্দোলন করতে করতে ক্লিষ্ট স্বরে বললেন, "তাইতো, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে দেখছি।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে বিমল বললে, "কুছপরোয়া নেহি বিনয়বাবু! শত্রুরা আমাদের শক্তির কথা কিছুই জানে না—তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

—"কিন্তু যে পক্ষেরই হোক, কতকগুলো মানুষের প্রাণ যাবে তো!"

—"তাহলে কি আপনি বলতে চান আমরা বিনাযুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা পড়ব?"

—"না, না, আমি তা বলতে চাই না। কিন্তু—"

বিমল বললে, "এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই। আপাতত শত্রুদের জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে চলবে না—সবাই অগ্রসর হও। আরো তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও নারীদের উপত্যকার দিকে।"

জো বিপুল আগ্রহে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "নারীদের উপত্যকা, নারীদের উপত্যকা! গণ্ডা গণ্ডা চাঁদ দেখতে চাও তো দৌড়ে চল—নারীদের উপত্যকা আর বেশি দেরী নেই।"

তিন-চার চুমুকে চায়ের পেয়ালা খালি করে এবং কয়েক টুকরো খাবার চটপট মুখে ফেলে দিয়ে বিমল ও কুমার প্রভৃতি চলমান দলের সঙ্গে এগিয়ে চলল দ্রুতপদে।

চারিদিকে পাহাড়—কোথাও একেবারে সুমুখে, কোথাও দূরে, কোথাও একেবারে মেঘের মত, কোনটা সবুজে ছাওয়া, কোনটা ন্যাড়া ন্যাড়া, কোনটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ছাইরঙা। শিখরের পর শিখরের ভিড়, তারা যেন শূন্যে উঠে আকাশকে খোঁচা মারতে যায়।

কখনো দেখা যায় ছোট ছোট রুপোলী ঝরনারা মিষ্টি গান গাইতে গাইতে ঝর্ঝর তালে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে ঝরে পড়ছে, কোথাও বা ঝকমকে আলোকণা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিপুল জলপ্রপাতের বনভূমির ঘুমভাঙানো প্রতিধ্বনি-জাগানো কলকল্লোল।

পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অনিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট ঝোপঝাপের এপাশ-ওপাশ দিয়ে তাদের একটানা গতি হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। পাছে দেরি হয়ে যায়, সেই ভয়ে একরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানকয় করে স্যান্ডউইচ গলাধঃকরণ করে তারা আবার করেছে দ্রুত পদচালনা।

চলতে চলতে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারিদিকে, পাছে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করে। কিন্তু কোথাও শত্রুদের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি তাদের মত পরিবর্তিত হয়েছে? অন্তরাল থেকে তাদের যুদ্ধসজ্জা দেখে ভয় পেয়েছে?

কমলের তাই বিশ্বাস।

বিমলের বিশ্বাস অন্যরকম। মরিয়া হলে দুর্জনরা কোন-কিছুকে আমলে আনে না। বিশেষ, সোনার পাহাড়ের লোভ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। তার চোখ সজাগ থাকে।

বাঘার রকম-সকম দেখে কুমারও আশ্বস্ত হতে পারে না।

বাঘা যেন হাওয়ায় কাদের সন্দেহজনক গন্ধ আবিষ্কার করেছে। বারে বারে দুই কান খাড়া করে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে আর চাপা গর্জন করে গুম্‌রে ওঠে এবং পিছন দিকে করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সঞ্চালন!

রামহরি বলে, "আমার বাঘাকে আমি চিনি। শত্রুরা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসছে।"

বিনয়বাবু মুখে বলেন না, মাঝে মাঝে শুধু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

অপরাহ্ন কাল। রোদের ঝাঁজ কমে এসেছে।

জো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সানন্দে বললে, "ব্যস্, আমরা পথের শেষে এসে পড়েছি। ঐ দেখুন নারীদের উপত্যকা।"

সকলে দেখলে নীচের দিকে তাদের চোখের সামনে জেগে উঠেছে প্রকাণ্ড এক উপত্যকা—ঘন শ্যামল, নদী-সজল। তার সীমানা সুদূরে বনজঙ্গলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, আন্দাজ করা যায় না।

দিকে দিকে ফসলভরা শস্যক্ষেত, মাঝে মাঝে গ্রাম,—কিন্তু ক্ষেতের চাষীদের, গ্রামের বাসিন্দাদের, জনপ্রাণীর দেখা নেই। নির্জন। স্তব্ধ। চারদিকেই কেমন একটা থমথমে ভাব। অস্বাভাবিক।

একটা শহরের মত জায়গা দেখা গেল। কতকগুলো ছোট-বড় রাস্তা তার বুক চিরে এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েছে। তার ধারে ধারে সারি সারি ঘরবাড়ি, কিন্তু তাও যেন জনশূন্য জনপদ। বিমল ডাকলে, "জো!"

—"কর্তা!"

—"এখানে লোকজন নেই কেন?"

জো মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না তো কর্তা! আমি তো দেখেছিলুম এখানে লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে। শুনেছি উপত্যকায় স্ত্রীলোক আছে হাজার হাজার। তারা গেল কোথায়?"

—"আর, কোথায় তোমার অনেকগুলো চাঁদ? একটাও তো নজরে পড়ছে না।"

—"এখন তো নজরে পড়বে না কর্তা, এখনো যে দিনের আলা আছে। কিন্তু ঐ থামগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

একটা বড় রাস্তার ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাথরে-গড়া থামের পরে থাম। আর সেগুলোর প্রত্যেকটার উপরে বসানো মস্ত মস্ত সবুজ পাথরের গোলক—তাদের এক-একটার বেড় বারো ফুটের কম হবে না।

জো বললে, "ঐ গোলকগুলোই তো চাঁদ।"

বিস্মিত, স্থির অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা সেই গোলকগুলোর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গোলকগুলো প্রদীপ্ত নয় বটে, কিন্তু বেলাশেষের ঝিমিয়ে-পড়া আলোয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের ভিতর থেকে কেমন যেন একটা আভা।

সবাই যেন সম্মোহিত।

জো ভাবতে ভাবতে বললে, "আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কিসের সন্দেহ।"

—"শত্রুরা বোধহয় উপত্যকার নারীদের কাছে চর পাঠিয়েছে।"

—"কেন?"

—"আমরা যে উপত্যকায় যাব সে খবরটা ওদের জানিয়ে দেবার জন্যে।"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "জো, কোথায় কোন্ পাহাড়ের উপর পাশাপাশি তিনটে শিখর আছে?"

—"কর্তা, বাঁ দিকে চেয়ে দেখুন।"

বামে নীচের দিকে বিশাল একটা জলাভূমির বুকে জল ছলছল করছে। সে যেন আকাশ-নীলিমার আরশি। তার পরপার হারিয়ে গিয়েছে সুদূরের ধূমল আবছায়ায়। সেখানে বিরাট উইলহেলমিনা পর্বতের কোলে ছোট ছোট শিশুর মত নানা আকারের কয়েকটা পাহাড় এবং তারই একটার মাথার উপরে ত্রিমুকুটের মত তিনটে শিখর।

জলার আর-একদিকে প্রকাণ্ড এক অরণ্য যেন পাহাড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার চেষ্টায় আকাশের পানে সবুজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এবং প্রবহমান প্রবল পবনের পথরোধ করে রয়েছে শত শত মহা মহীরুহ। অরণ্যের তলার দিকে অন্ধকার।

জো বললে, "শুনেছি ঐ বনেই নাকি কচ্ছপমুখো শয়তানদের বাসা।"

—"শুনেছ? চোখে দেখনি?"

—"বর্ণনা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে—তাদের আমি চোখে দেখতে চাই না।"

আচম্বিতে বাঘা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে গর্জন এবং বারংবার পাহাড়ের নীচের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

নীচের দিকে তাকিয়ে বিমলের চোখ চমকে উঠল, অঙ্গুলিনির্দেশ করে সে ব্যস্তভাবে বললে, "দেখ কুমার, দেখ!"

কুমারের সঙ্গে আর সকলেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করলে তা সম্পূর্ণরূপেই কল্পনাতীত।

প্রায় পোয়া মাইল তফাতেই পাহাড়ের গড়ানে পথের পাশের জঙ্গল ভেদ করে ধনুকবাণ ও বল্লম প্রভৃতি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে শ্রেণীবদ্ধ নারীর দল—তাদের রক্তের সঙ্গে কালো কেশমালা মিলে এক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের কারুর দেহেই একখণ্ড বস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কুমোরপাড়ার রণরঙ্গিনী কালী ঠাকুরের মূর্তিগুলো যেন সহসা জ্যান্ত হয়ে মহাদেবের বুক থেকে নেমে এখানে ছুটে এসেছে।

সকলে প্রথমটা বাক্যহীন হয়ে রইল মহাবিস্ময়ে—এ যে অপ্রত্যাশিত!

তারপর বিমল শুষ্ক হাস্য করে বললে, "এইবারে বোঝা গেছে বীরাঙ্গনাদের যুদ্ধকৌশল। ওরা ভেবেছিল, জনশূন্য নগর দেখে নির্ভয়ে আমরা উপত্যকার ভেতরে নেমে গিয়ে কিছু বোঝবার আগেই খুব সহজেই ওদের হাতে বন্দী হব।"

জো বললে, "হ্যাঁ কর্তা, শুনেছি ওরা পারতপক্ষে পুরুষদের বধ করে না, বন্দী করে গোলামের মত রাখে।"

বিমল বললে, "কিন্তু আমরা জনশূন্য নগর দেখেও তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলুম না, তাই ওরা অধীর হয়ে নিজেরাই আক্রমণ করতে এসেছে।"

কুমার বললে, "ওদের দল দেখছি বেজায় ভারি! প্রায় হাজার খানেক মেয়ে বাইরে এসেছে, এখনো জঙ্গলের ভিতর থেকে মেয়ের দল পিল্-পিল্ করে বেরিয়ে আসছে।"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আসতে দাও, আমরাও অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। বীরাঙ্গনারা বোধহয় এখনো আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা জানতে পারেনি!"

বিনয়বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বললেন, "বিমল, বিমল! তুমি কি বন্দুক ছুঁড়ে এই নির্বোধ, অসভ্য মেয়েগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? নারীহত্যা!"

বিমল সকৌতুকে খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন বিনয়বাবু! আমি নারীহত্যা করব না।"

—"তবে কি করবে তুমি?"

—"আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখুন। আমি একটা কিছু করবই!"

রামহরি বললে, "যা কর তা কর খোকাবাবু, তবে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে আমি তোমাকে ছেড়ে দেশে চলে যাব।"

কমল বললে, "রামহরিদা, ওরা কি মেয়েমানুষ? ওরা পুরুষের বাবা!"

বাঘার মাথায় আস্তে একটা চড় মেরে কুমার বললে, "তোর কি মত রে বাঘা!"

বাঘা সামনের দিকে একটা লাফ মেরে শিকলি ছেঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করে গজ্‌রে গজ্‌রে উঠল, তার অর্থ বোধহয়—একবার ছেড়ে দিয়েই দেখ না বাবু, আমি কত জোরে কামড়ে দিতে পারি!

বিমল বললে, "কুমার! কমল! তোমরা গোটাকয় হাতবোমা আর ডিনামাইটের স্টিক্ চট্ করে নিয়ে এস তো!"

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হাতবোমা! ডিনামাইট! কি সর্বনাশ!"

হঠাৎ জো একদিকে হাত দেখিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "কর্তা, কর্তা! ওদিকে তাকিয়ে দেখুন!"

সকলে ফিরে সচমকে দেখলে, আর-একদিকে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে দলে দলে কালো কালো বন্য লোক। সেই কালোদের দলে সবচেয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে একটা অতিদীর্ঘ শ্বেতাঙ্গের মূর্তি—স্মিথ!

বিমল হাসতে হাসতে খুব সহজ স্বরেই বললে, "বুঝেছি স্মিথ বাবাজীর রণকৌশল! একদিক দিয়ে সে মেয়েদের লেলিয়ে দিয়েছে, আর-এক দিক দিয়ে সদলবলে নিজেই ছুটে আসছে—যাকে বলে দুমুখো আক্রমণ, ভেবেছে মাঝখানে পড়ে আমরা একেবারে পিষে মরব।"

কুমার বললে, "ওদের কাছে একটিমাত্র বন্দুক আছে স্মিথের হাতে। বাকি সকলেই তো দেখছি তীরধনুক, বর্শা আর মুগুর নিয়েই আস্ফালন করছে।"

জো বললে, "কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের দলে লোক আছে প্রায় দেড়শো।"

—"সতেরোটা বন্দুক, আর একটিমাত্র মেশিনগান ছুঁড়লেই চোখে ওরা অন্ধকার দেখবে—বোমা আর ডিনামাইটের দরকার হবে না।"

একঝাঁক তীর তাদের দিকে ছুঁড়ে শত্রুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল কয়েকটা রণদামামা।

কিন্তু তীরগুলো তাদের কাছ পর্যন্ত আসতে পারলে না।

বিমল বললে, "শত্রুদের আর এগুতে দেওয়া উচিত হয়। ওদের তীরগুলো হয়তো বিষাক্ত।"

এদিকে রণরঙ্গিনীরাও একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল খন্‌খনে তীব্র-তীক্ষ্ণ স্বরে।

তারপরেই খলখল করে অট্টহাস্য।

বিমল বললে, "কমল মেয়েদের দিকে তুমি হাতবোমাগুলো নিক্ষেপ কর! কুমার, তুমি ছোঁড়ো ডিনামাইটের স্টিকগুলো!

বিনয়বাবু অভিযোগভরা কণ্ঠে বললেন, "বিমল!"

বিরক্ত স্বরে বিমল বললে, "আপনি চুপ করুন বিনয়বাবু! দেখছেন না ঐ যুদ্ধপাগলী স্ত্রীলোকগুলো এখনো কতদূরে আছে? বোমা আর ডিনামাইটের স্টিক তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে না।"

—"তাহলে ওগুলো ছুঁড়ে লাভ কি?"

—"একটু পরেই বুঝবেন। সেপাইরা! ঠিক কুমার আর কমলের সঙ্গে তোমরাও উপরকার

শত্রুদের দিকে গুলিবৃষ্টি কর। মেশিনগানের ভার আমি নিজেই গ্রহণ করছি।"

বিমল মেশিনগান নিয়ে বসে চেঁচিয়ে বললে—"এক, দুই, তিন! ছোঁড়ো বোমা, ডিনামাইট আর বন্দুক!"

সৃষ্ট হল আকাশ-ফাটানো এক দারুণ শব্দায়মান ভয়ংকর বিভীষিকা! গড়ানো পাহাড়ের উপরে ফটাফট্ ফেটে গেল বোমা এবং ডিনামাইট—ধসে ধসে পড়ল পাহাড়ের খানিক অংশ, অনেক পাথরের চাঙর ভীষণ শব্দে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নামতে লাগল।

একসঙ্গে বোমা, ডিনামাইট এবং অনেকগুলো বন্দুকের ও কলের কামানের ভৈরব শব্দ শ্রবণ, অগ্নির জ্বলৎ-শিখা দর্শন করে রণরঙ্গিণীদের হুঙ্কার ও অট্টহাস্য একেবারে থেমে গেল—তারা স্তম্ভিত হয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তের জন্যে। তারপর সভয়ে আর্তনাদ তুলে বেগে পলায়ন করতে লাগল—এমন অসম্ভব ব্যাপর তারা কখনো দেখেওনি, শোনেওনি। বোধহয় তারা ভাবলে, যারা হাতের বজ্র ছুঁড়ে পাহাড় ভেঙে খান্ খান্ করে দেয় তাদের সামনে যাওয়া আর নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা।

ওদিকের বন্দুকের বুলেটগুলো শত্রুদলের জন পাঁচেক লোককে পেড়ে ফেললে।

বিমলের মেশিনগানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল স্মিথের সুদীর্ঘ বৃহৎ বপু। অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে সে-ও বিকট চিৎকার করে শূন্যে দুই বাহু ছড়িয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পড়ল।

দলপতির মৃত্যু দেখে বাকি শত্রুরা যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।

বিমল হা হা করে হেসে উঠে বললে, "ঠিক যা যা ভেবেছিলুম তাই হল! দেখলেন তো বিনয়বাবু, আমাদের নারীহত্যা করতে হল না!"

কুমার বললে "আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে কখনো যাদের কোনই পরিচয় হয়নি, তাদের পক্ষে তো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক কথা। ওরা ভাবলে আমরা হচ্ছি মহা মহা জাদুকর, মন্ত্রগুণে আকাশের বজ্রকে বশ করে ফেলেছি।"

বিমল বললে, "স্মিথ-রাস্কেল ভেবেছিল, ধারে না পারলেও আমাদের দফা রফা করে ফেলবে, —তাই দুমুখো আক্রমণের আয়োজন।"

সূর্য খানিক আগেই পাটে বসেছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দৃশ্য ঢাকা পড়বে রাত্রির আঁচলে।

এতক্ষণ ঘটনার পর পর আবর্তে পড়ে তারা আর কোনদিকে তাকাবার সময় পায়নি, এখন নীচের উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের চোখগুলো হয়ে উঠল বিস্ফারিত, নিষ্পলক ও চমৎকৃত।

উপত্যকার সারবাঁধা থামগুলোর দিকে প্রত্যেকটার শীর্ষদেশে দেখা যাচ্ছে বড় বড় আলোক-গোলক। পথে নেই অন্ধকার।

জো উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "চাঁদমালা কর্তা, চাঁদমালা! আমার নয়ন সার্থক!"

বিনয়বাবু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "মেয়েগুলো খালি রায়বাঘিনী নয়। কাপড় পরে না বটে, কিন্তু সভ্যতার অনেক-কিছুই জানে। পুরুষের সাহায্য না নিয়েই ক্ষেতে চাষ করে ফসল ফলায়, পথ কাটে, ঘরবাড়ি বানায়, শহর বসায়, তার উপরে আবিষ্কার করেছে অনির্বাণ আলোক রহস্য—সভ্যতাগর্বিত এশিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকার আর কেউ যা পারেনি! ধন্য, ধন্য!"

কমল বললে, "কিন্তু লড়ায়ে মেয়েগুলো গেল কোথায়? শহরে তো তাদের দেখতে পাচ্ছি না।"

কুমার বললে, "আমাদের ভয়ে বনেজঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

প্রলুব্ধ মুখে জো বললে, "একবার শহরটা বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?"

—"কেন?"

—"গোটাছয়েক চাঁদ মাথায় তুলে নিয়ে আসি।"

—"পাগল! ওগুলো নিরেট পাথরের গোলক—বেড় প্রায় বারো ফুট হবে। ভীষণ ভারী, বয়ে নিয়ে যাবে কেমন করে?"

—"কর্তা, হাতে চাঁদ পেলে আমার গায়ে হবে মত্তমাতঙ্গের মত শক্তি।"

—"না হে জো, এই অন্ধকারে বনেজঙ্গলে পাহাড়ের উত্‌রাই বয়ে নীচে নামা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা কাল সকালে উপত্যকায় নামব। যেমন করে হোক জানতে হবে তো আলো-পাথর পাওয়া যায় কোন পাহাড়ে! আজ এখন বিশ্রাম। জো, ছাউনি ফেলবার আয়োজন কর। সেপাই সাবধানে পাহাড়া দিক।"

কমল বললে, "রামহরিদা, তুমি তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও। আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

পঞ্চদশ পর্ব

প্রলয়

আচম্বিতে কিসের একটা বিষম ঝাপট খেয়ে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বুঝতে পারলে সে সটান হয়ে পাহাড়ের কন্‌কনে পাথরের উপরে। ঘুমের ঘোরে তার মনে হল, দূরে যেন কারা আকাশ কাঁপিয়ে কামান ছুঁড়ছে।

কিন্তু আকাশের বুকে আগুন জ্বলে কেন?

চোখ কচ্‌লে ভালো করে দেখে বুঝলে, ও হচ্ছে বিদ্যুৎ-শিখা, এবং গর্জন করছে কামান নয় বজ্র।

তারপর অনুভব করলে তুমুল ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কার পর ধাক্কা। শুনতে পেলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবর্তের হুঙ্কারের পর হুঙ্কার। মাথার উপর থেকে কোথায় উড়ে গিয়েছে তাঁবুর আচ্ছাদন। প্রভাত হয়েছে—ছাইমাখা বিষণ্ণ প্রভাত।

আরো সব শব্দ কানে আসে। বড় বড় গাছের পর গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ। সঙ্গের লোকজনদের হৈ-হৈ রবে চিৎকার! কুমারের উচ্চকণ্ঠের ডাক—"বিমল, বিমল!"

—"কুমার, এই যে আমি!"

—"কাছে এস। সাইক্লোন!"

—"আর সবাই?"

—"আমরা সবাই একজায়গায় এসে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। নইলে ঝড়ে উড়ে যাব—উঃ, বাতাসের কি ভয়ানক জোর। তুমিও তাড়াতাড়ি এসে লম্বমান হও।"

সেই মুহূর্তেই বিমল উপলব্ধি করলে, পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহও দুলছে, দুলছে, দুলছে—পাহাড় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পাহাড় দোদুল্যমান? সে দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি?

বিনয়বাবু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!"

তারপর সে সব কি অনির্বচনীয় ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, শুনলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ—বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে কী অজ্ঞাত অভাবিত আতঙ্কে।

শব্দ বাড়তে বাড়তে শেষে যেন কর্ণভেদী হয়ে উঠল—যেন আকাশ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ

করে তুলল—হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল পর্বতের বৃহৎ বৃহৎ অংশ—কোথাও পর্বতপৃষ্ঠ দু-ফাঁক হয়ে গিয়ে ভিতর থেকে বেরুতে লাগল গন্ধকের গন্ধপূর্ণ দম-বন্ধ করা পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া আর আগুনের লক্‌লকে ক্রুদ্ধ শিখা। দুলছে, দুলছে, পর্বতমালাকে বুকে নিয়ে পৃথিবী এখনও দুলছে। তার এই সর্বনেশে দোললীলায় সৃষ্টির অস্তিত্ব বুঝি লুপ্ত হবে!

প্রতি মুহূর্তে বিমলের ভয় হতে লাগল এই বুঝি তার মাথার উপরে পাহাড়ের চাঙড় ভেঙে পড়ে, এই বুঝি তার পিঠের তলায় রাক্ষুসে হাঁ করে পাহাড় তাকে গপ্ করে গিলে ফেলে!

উপত্যকা থেকে শোনা গেল হাজার হাজার নারী সভয়ে কাতর চিৎকার করছে সমস্বরে।

শায়িত অবস্থাতেই ঊর্ধ্বদেহ খানিকটা তুলে বিনয়বাবু বললেন, "কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! দেখ, দেখ!"

সকলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, ত্রিমুকুট সোনার পাহাড়ের দুটো শিখর টলটলায়মান হয়ে ভীষণ শব্দে দিকবিদিক পরিপূর্ণ করে ভেঙে পড়ে গেল নীচের দিকে।

তারপরে আর এক রোমাঞ্চকর আকাশ-কাঁপানো শব্দ শোনা গেল। তখনই অগভীর জলাভূমি হয়ে উঠেছিল ঝটিকাতাড়িত বিক্ষুব্ধ সুগভীর হ্রদের মত—তার উপরে সেখানে কোথা থেকে তীব্র বেগে ধেয়ে এল ভীম নাদে লক্ষ লক্ষ ফেনায়িত তরঙ্গ-বাহু তুলে উন্মাদিনীর মত নাচতে নাচতে দুকূলপ্লাবী ভয়ঙ্করী বন্যা।

তারপরে সেই প্রচণ্ড শব্দজগতের মধ্যেও আবার কাদের বুকের রক্ত-জল-করা গর্জনময় বিকট অথচ আর্ত চিৎকার। ও-রকম অমানুষিক চিৎকার তারা কেউ শ্রবণ করেনি।

রামহরি ভয়ে কেঁদে উঠল—কমলের দেহ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

বিপুল বিস্ময়ে জড়ীভূত দেহে সকলে দেখলে, বন্যার প্রখর টানে ডালপালার মত বেগে ভেসে যাচ্ছে এমন তিনটে মহাকায় অবিশ্বাস্য কালো কালো জীব—যাদের এক-একটার জঠরে অনেকগুলো হাতির স্থান সংকুলান হতে পারে। তাদের অতি-দীর্ঘ গ্রীবাদেশের সঙ্গে মাথাটা একবার জলের ভিতরে ডুবে যাচ্ছে, আবার ছটফটিয়ে ভেসে উঠছে এবং তাদের সুবিশাল লাঙ্গুলের আছাড়ে আছাড়ে শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে যেন জলস্তম্ভের পর জলস্তম্ভ। ভাসতে ভাসতে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! রুদ্ধশ্বাসে জো বললে, "কচ্ছপমুখো শয়তান!"

অভিভূত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "ডিপ্লোডোকাস!"

ভূমিকম্প থেমেছে। ঝড়ের বিক্রম কমেছে।

বিমল শুধোলে, "আমাদের লোকজন?"

জো বললে, "সব ভয়ে পালিয়েছে।"

—"আমাদের রসদ?"

—"সব তছনছ হয়ে গেছে।"

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বললে, "বিনয়বাবু, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

—"ফিরে যাওয়া।"

—"ঠিক বলেছেন। তাই চলুন। আমাদের হাতে বন্দুক আছে, বনে পশুপক্ষী আছে। অনাহারে মরবার ভয় নেই। বেশ অ্যাডভেঞ্চার তো হল, এইবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

জো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল। তারপর রুক্ষস্বরে বললে, "আপনারা ফিরে যাবেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"যান। কিন্তু আমি যাব না।"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "তুমি কি করতে চাও?"

তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সে বললে, "আমি ঐ উপত্যকায় নামব।"

—"একলা।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একলা!"

—"ওখানে কেন যাবে?"

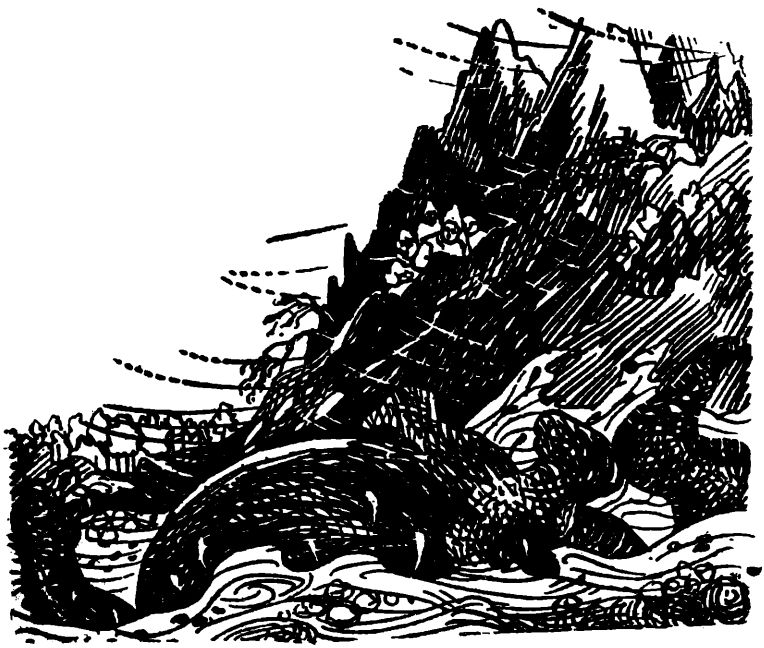

—"আমার চাঁদ না পেলে চলবে না।"

—"কি বলছ তুমি?"

হো-হো রবে অট্টহাস্য করে জো বললে, "আমার চাঁদ চাই—আমার চাঁদ চাই! একটা নয়, অনেকগুলো চাঁদ!" সে হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে গেল পাহাড়ের প্রান্তদেশে। কমল দৌড়ে গিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে।

—"তফাত যাও—তফাত যাও!" উগ্রস্বরে এই কথা বলে সে নিজের পেশীবদ্ধ বলিষ্ঠ বাহু মুক্ত করে নিলে প্রবল টান মেরে এবং তার পর গড়ানে পর্বতপৃষ্ঠ দিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেল দ্রুতপদে।

তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনবার জন্য বিমলও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পাহাড়ের ধারে—কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না, তখনও সমস্ত দৃশ্য আড়াল করে রেখেছে গন্ধকের দুর্গন্ধে

পরিপূর্ণ ধূম্রধূসর নিবিড় ধূলিপটল। এবং তারই ভিতর থেকে শোনা গেল জো-র উচ্চকণ্ঠের চিৎকার—"অনেকগুলো চাঁদ! অনেকগুলো চাঁদ!"

দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বিনয়বাবু বললেন, "ঘোর উন্মাদের লক্ষণ। বনের ছেলে জো-র আদিম মস্তিষ্ক এত বেশি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে পারলে না।"

বিমল বললে, "আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাদেরও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। রামহরি, তাড়াতাড়ি, তল্‌পিতল্‌পা গুছিয়ে নাও।"

রামহরি কপালে করাঘাত করে বললে, "তল্‌পিতল্‌পা কিছু কি আছে যে গুছিয়ে নেব? নেহাৎ বাবা মহাদেবের করুণা, তাই প্রাণপাখি এখনো খাঁচাছাড়া হয়নি।"

কুমার বললে, "বিদায় সোনার পাহাড়! বিদায় আলো-পাথরের গুহা!"

কমল বলতে যাচ্ছিল, "কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার"—তৎক্ষণাৎ কট্‌মট্‌ করে কমলের দিকে তাকিয়ে বিনয়বাবু তার মুখবন্ধ করে দিলেন।

বাঘা সারমেয়-ভাষায় কিছুই বলবার চেষ্টা করলে না। এই প্রাকৃতিক মহাবিপ্লব তাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছে। তার ঊর্ধ্বে উত্থিত জয়পতাকার মত লাঙ্গুল আজ গুটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পেটের তলায়।

নীল সায়রের অচিনপুরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝড়

ঢং!

বড়ো ঘড়িতে বাজল সাড়ে-সাতটা! এই হল বিমল ও কুমারের চা-পানের সময়। রামহরি চায়ের 'ট্রে' হাতে করে ঘরে ঢুকেই দেখলে, তারা দুজনে একখানা খবরের কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, আগ্রহ ভরে।

এই খবরের কাগজ ও এই আগ্রহ রামহরির মোটেই ভালো লাগল না। কারণ সে জানে, রীতিমতো একটা জবর খবর না থাকলে বিমল ও কুমার খবরের কাগজের উপরে অমন করে ঝুঁকে পড়ে না। এবং তাদের কাছে জবর খবর মানে সাংঘাতিক বিপদের খবর! এই খবর পড়েই হয়তো ওরা বলে বসবে, 'ওঠো রামহরি! বাঁধো তল্পিতল্পা! আজকেই আমরা কলকাতা ছাড়ব!' কতবার যে এমনি ব্যাপার হয়েছে, তার আর হিসাব নেই।

অতএব রামহরি ওই খবরের-কাগজগুলোকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। তার মতে, ওগুলো হচ্ছে মানুষের শত্রু ও বিপদের অগ্রদূত!

রামহরি চায়ের ট্রে-খানা সশব্দে টেবিলের উপরে রাখলে—কিন্তু তবু ওরা কাগজ থেকে মুখ তুললে না!

রামহরি বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'কী, চা-টা খাবে, না আজ কাগজ পড়েই পেট ভরবে?'

বিমল ফিরে বসে বললে, 'কী ব্যাপার রামহরি, সক্কালবেলায় তোমার গলাটা এমন বেসুরো বলছে কেন?'

—'বলি, খবরের কাগজ পড়বে, না চা খাবে?'

কুমার হেসে বললে, 'খবরের কাগজের ওপরে তোমার অত রাগ কেন?'

—'রাগ হবে না? ওই হতচ্ছাড়া কাগজগুলোই তো তোমাদের যত ছিষ্টিছাড়া খবর দেয়, তোমরা পাগলের মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাও!'

বিমল হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'নাঃ—রামহরি আমাদের বড্ড বেশি চিনে ফেলেছে, কুমার!'

—'না, তোমাদের ছেলেবেলা থেকে দেখছি, তোমাদের চিনব কেন? ওসব কাগজ-টাগজ পড়া ছেড়ে দাও!'

—'হ্যাঁ, রামহরি, এইবার সত্যিসত্যিই কিছুকালের জন্য আমরা কাগজ-টাগজ পড়া একেবারে ছেড়ে দেব!'

রামহরি ভারী খুশি হয়ে বললে, 'তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক! আমি তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!'

—'বাঁচবে কী মরবে জানি না রামহরি, তবে আমরা যে ইচ্ছা করলেও আর কাগজ পড়তে পারব না, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কারণ এবারে যে-দেশে যাচ্ছি সেখানে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না।'

রামহরির মুখে এল অন্ধকার ঘনিয়ে। বললে, 'তার মানে?'

—'আমরা যে শিগগিরই সমুদ্রযাত্রায় বেরুব।'

'ওরে বাবা, সুমুদ্দরে? এবারে আবার কোন চুলোয়? পাতালে নয়তো?'

—'হতে পারে। তবে, আপাতত আগে যাব সাহেবদের দেশে—অর্থাৎ বিলাতে। সেখান থেকে একখানা গোটা জাহাজ রিজার্ভ করে যাব আফ্রিকা আর আমেরিকার মাঝখানে, আটলান্টিক মহাসাগরের এমন কোনও দ্বীপে, যার নাম কেউ জানে না।'

—'সঙ্গে যাচ্ছে কে কে?'

—'আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল, বাঘা আর তুমি—অর্থাৎ আমাদের পুরো দল। এবারের ব্যাপার গুরুতর, তাই দু-ডজন শিখ, গুর্খা আর পাঠানকেও ভাড়া করতে হবে।'

রামহরি গম্ভীর মুখে বললে, 'বেশ, তোমরা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু এবার আর আমি তোমাদের সঙ্গে নেই'—বলেই সে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল চায়ের 'ট্রে' টেনে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, 'রামহরি নাকি এবারে আমাদের সঙ্গে যাবে না! কিন্তু যাত্রার দিন দেখা যাবে সেইই হন হন করে আমাদের আগে আগে যাচ্ছে! .....যাক, নাও কুমার চা নাও! চা খেতে খেতে কাগজখানা আর একবার গোড়া থেকে পড়ো তো শুনি! বার বার শুনে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে ফেলতে হবে।'

কুমার খবরের কাগজখানা আবার তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল।

'আটলান্টিক মহাসাগরে এক বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বলেন, এই বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীতে আর নতুন বিস্ময়ের ঠাঁই নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। ধরণী বিপুলা, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-রহস্যের কতটুকু ধরা পড়িয়াছে? প্রতি যুগেই সভ্যতা মনে করিয়াছে, জ্ঞানের চরম সীমা তাহার হস্তগত, তাহার পক্ষে আর নতুন শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগেই তাহার সে-গর্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গ্রিকরা নাকি সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাহারা ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু আজিকার কলেজের ছাত্ররাও প্লেটো ও সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর! গ্রিক সভ্যতা বিলুপ্ত হইল, পৃথিবীকে বিজয়-চিৎকারে পরিপূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইল রোমীয় সভ্যতা! তাহার বিশ্বাস ছিল ভূমণ্ডলকে দেখিতে পায় সে নিজের নখ-দর্পণে! কিন্তু, রোমানদের অঙ্কিত পুরাতন মানচিত্রে আধুনিক পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের পরেও এই সেদিন পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এবং আরও কত বড়ো বড়ো দ্বীপের অস্তিত্ব পর্যন্ত কাহারও জানা ছিল না! অন্যান্য গ্রহের কথা ছাড়িয়া দি, আজও পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত নব নব দেশ নাই, এমন কথা কেহ কি জোর করিয়া বলিতে পারে? দক্ষিণ আমেরিকায় ও আফ্রিকায় এখনও এমন একাধিক দুর্গম দেশ ও দুরারোহ পর্বত আছে, এ যুগের কোনও সভ্য মানুষ সেখানে পদার্পণ করে নাই! ওইসব স্থানে অতীতের কত গভীর রহস্য নিদ্রিত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো কত নতুন জাতি, কত অজানা জীব সেখানে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র এক সমাজ বা বসতি গড়িয়া বসবাস করিতেছে, আমরা তাহাদের কোনও সংবাদই রাখি না!

অতঃপর আগে যে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছি তাহার কথাই বলিব।

সম্প্রতি এস এস বোহিমিয়া নামক একখানি জাহাজ ইউরোপ হইতে আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছিল।

কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে আচম্বিতে এক ভীষণ ঝড় উঠিল। এই স্মরণীয় দৈব-দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের কাগজে গত সপ্তাহেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং সকলেই এখন জানেন যে, ও-রকম ভূমিকম্পের সঙ্গে ঝড় আটলান্টিক মহাসাগরে গত এক শতাব্দীর মধ্যে কেহ দেখে নাই। উক্ত দৈব-দুর্বিপাকে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী বহু দ্বীপে ও তীরবর্তী বহু দেশে অগণ্য লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় হইয়াছে। কোনও কোনও ছোটো ছোটো দ্বীপের চিহ্ন পর্যন্ত সমুদ্রের উপর হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! বহু বাণিজ্যপোত ও যাত্রীপোত অদ্যাবধি কোনও বন্দরে ফিরিয়া আসে নাই এবং হয়তো আর আসিবেও না।

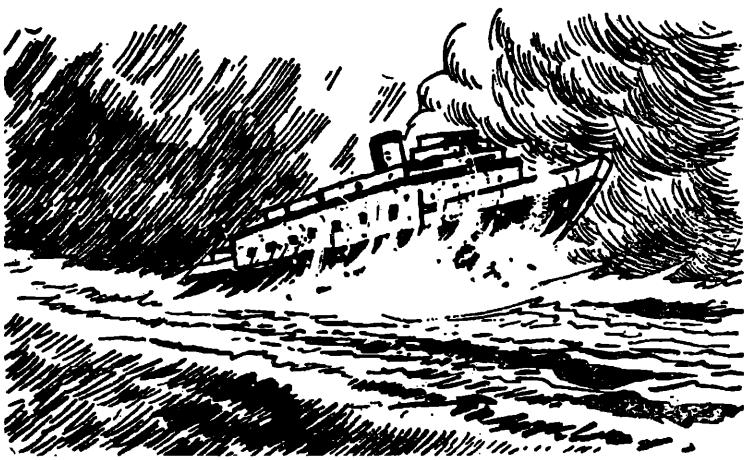

'বোহিমিয়া'ও পড়িয়াছিল এই সর্বগ্রাসী প্রলয়ঝটিকার মুখেই! কিন্তু ঝটিকা দয়া করিয়া যাহাদের গ্রহণ করে নাই, 'বোহিমিয়া' সৌভাগ্যবশত তাহাদেরই দলভুক্ত হইতে পারিয়াছে। গত আঠারোই তারিখে সে ক্ষতবিক্ষত দেহে আবার স্বদেশের বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং তাহার যাত্রীরা বহন করিয়া আনিয়াছে এক বিস্ময়কর কাহিনী! জনৈক যাত্রী যে বর্ণনা দিয়াছে আমরা এখানে তাহাই প্রকাশ করিলাম!

অপার সাগরে ঝটিকা জাগিয়া 'বোহিমিয়া'র অবস্থা করিয়া তুলিয়াছিল ভয়াবহ! ঝড়ের ঝাপটে প্রথমেই তাহার ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যায়। সমুদ্রের তরঙ্গ বিরাট আকার ধারণ করিয়া উন্মত্ত আনন্দে জাহাজের ডেকের উপর ক্রমাগত ভাঙিয়া পড়িতে থাকে,—সেই তরঙ্গের আঘাতে দুইজন আরোহী জাহাজের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। জাহাজের চারিদিকে বহুক্ষণ পর্যন্ত উত্তাল তরঙ্গের প্রাচীর ছাড়া আর কোনও দৃশ্যই দেখা যায় নাই। প্রলয়-ঝটিকার হুহুঙ্কার এবং মহাসাগরের গর্জন সেই অসীমতার সাম্রাজ্যকে ধ্বনিময় ও ভয়ানক করিয়া তোলে! আকাশব্যাপী নিবিড় অন্ধকার অশ্রান্ত বিদ্যুৎবিকাশে অগ্নিময় হইয়া উঠে। প্রকাশ, এত

ঘন ঘন বিদ্যুতের সমারোহ এবং বজ্রের কোলাহল নাকি কেউ কখনও দেখেও নাই শোনেও নাই! এই মহা হুলুস্থুলুর মধ্যে, এই শত শত শব্দ-দানবের প্রবল আস্ফালনের মধ্যে, প্রাকৃতিক বিপ্লবের এই সর্বনাশা আয়োজনের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট গতিশক্তি হারাইয়া 'বোহিমিয়া' একান্ত অসহায়ভাবে বিশাল সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোতে এবং ক্রুদ্ধ ঝটিকার দুর্নিবার টানে দিগ্বিদিক ভুলিয়া কোথায় ছুটিতে থাকে, তাহা বুঝিবার কোনও উপায়ই ছিল না। জাহাজের 'ইলেকট্রিসিটি' জোগান দিবার যন্ত্রও বিগড়াইয়া যায়। ভিতরে বাহিরে অন্ধকার, আকাশে ঝড়, সমুদ্রে বন্যা ও তাণ্ডবের বিপ্লব, জাহাজের কামরায় কামরায় শিশু ও নারীদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি, কাপ্তেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নাবিকেরা ভীতিব্যাকুল,—এই কল্পনাতীত দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া 'বোহিমিয়া' ভাসিয়া আর ভাসিয়া চলিয়াছে—কোন অদৃশ্য মহাশক্তির তাড়নায়—কোন অদৃশ্য নিয়তির নিষ্ঠুর আকর্ষণে! প্রতিমুহূর্তে তার নরক-যন্ত্রণাময় অনন্ত মুহূর্তের মতো—পাতালের অতলতা কখন তাকে গ্রাস করে, সকলে তখন যেন কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল!

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে ঝড় যখন শান্ত হইয়া আসিল, ভগবানের অনুগ্রহে 'বোহিমিয়া' তখনও ভাসিয়া রহিল। এ যাত্রা রক্ষা পাইল বুঝিয়া ধর্মভীরু যাত্রীরা প্রার্থনা করিতে বসিল।

কিন্তু জাহাজ এখন কোথায়? তখন শেষ-রাত্রি, চন্দ্রহীন শূন্যতা, চতুর্দিকে আঁধার-প্রপাতের বাঁধ খুলিয়া দিয়াছে। জাহাজের ভিতরেও আলোর আশীর্বাদ নাই। কাপ্তেন ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আটলান্টিক মহাসাগর তখনও যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করিতেছে, তাহার বিদ্রোহী তরঙ্গদল তখনও মৃত্যুসংগীতের ছন্দে রুদ্রতাল বাজাইয়া ছুটিয়া যাইতেছে; জাহাজ তখনও তাহাদের কবলে অসহায় ক্রীড়নক!

অনেকক্ষণ পরে কাপ্তেন সবিস্ময়ে দেখিলেন বহুদূরে অনেকগুলো আলোকশিখা জমাট অন্ধকার-পটে যেন সুবর্ণরেখা টানিয়া দিতেছে!

'বোহিমিয়া' সেইদিকেই অগ্রসর হইতেছিল।

আলোক-শিখাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল! দূরবিনের সাহায্যে কাপ্তেন দেখিলেন, সেগুলো মশালের আলো এবং তাহারা রাত্রিচর আলেয়ার মতো এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করিতেছে!

কাপ্তেন বুঝিলেন, 'বোহিমিয়া' স্রোতের টানে কোনও দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং দ্বীপের বাসিন্দারা মশাল জ্বালিয়া যে-কারণেই হউক সমুদ্র-তীরে বিচরণ করিতেছে। সাগরতীরবর্তী দ্বীপের বাসিন্দারা ঝড়ের পরে প্রায়ই এইরকম বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করে, বিপদগ্রস্ত জাহাজ বা নরনারীদের সাহায্য করিবার শুভ-ইচ্ছায়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ আলোগুলো অদৃশ্য হইয়া গেল। নিকটেই কোনও দ্বীপে আছে জানিয়া কাপ্তেন ভগবানকে বারংবার ধন্যবাদ দিলেন।

তাহার পর পূর্ব আকাশে কুমারী ঊষা যখন তার লাল-চেলির ঝলমলে আঁচল উড়াইয়া দিল, সাগরবাসী রূপসি নীলিমা যখন শান্ত স্বরে প্রভাতী স্তব পাঠ করিতে লাগিল, সকলের চোখের সামনে তখন ভাসিয়া উঠিল—স্বপ্নরঙ্গমঞ্চের অর্ধস্ফুট দৃশ্যপটের মতো এক অভিনব দ্বীপের ছবি!

সে দ্বীপটি বড়ো নয়—আকারে হয়তো চার পাঁচ মাইলের বেশি হইবে না। কিন্তু তাহাকে সাধারণ দ্বীপের পর্যায়ে ফেলা যায় না। সে দ্বীপকে একটি পাহাড় বলাই উচিত!

তাহার ঢালু গা ধীরে ধীরে উপর-দিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের দিকটা কম-ঢালু, সেখান দিয়া অনয়াসে চলা-ফেরা করা যায়, কিন্তু তাহার শিখর দিকটা শূন্যে উঠিয়াছে প্রায় সমান খাড়াভাবে। সাগরগর্ভ হইতে তাহার শিখরের উচ্চতা দেড় হাজার ফুটের কম হইবে না।

দূরবিন দিয়া কাপ্তেন দেখিলেন, সেই পাহাড়-দ্বীপের কোথাও কোনও গাছপালা—এমনকী সবুজের আভাসটুকু পর্যন্ত নাই! আর-একটি অভাবিত আশ্চর্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, দ্বীপের গায়ে নানাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে মস্ত মস্ত প্রস্তরমূর্তি,—এক-একটি মূর্তি এত প্রকাণ্ড যে, উচ্চতায় দেড়শত বা দুইশত ফুটের কম নয়! পাহাড়ের গা হইতে সেই বিচিত্র মূর্তিগুলিকে কাটিয়া-খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে! দূর হইতে দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন প্রাচীন মিশরি ভাস্করের গড়া মূর্তি!

কিন্তু গতকল্য যাহারা এই গিরি-দ্বীপে মশাল জ্বালিয়া চলা-ফেরা করিতেছিল, তাহাদের কাহাকেও আজ সকালে দেখা গেল না। এই দ্বীপের পাথুরে গায়ে যেমন শ্যামলতাও নাই, তেমনি কোনও জীবের বা মানুষের বসতির চিহ্নমাত্রও নাই! এমনকী, সেখানে একটা পাখি পর্যন্ত উড়িতেছে না!

তিনি বহুকাল কাপ্তেনি করিতেছেন, আটলান্টিক মহাসাগরের প্রত্যেক তরঙ্গটি তাঁহার নিকটে সুপরিচিত, নাবিক-ব্যবসায়ে তিনি চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু এই দ্বীপটিকে কখনও দেখেন নাই, বা তাহার অস্তিত্বের কথা কাহারও মুখে শ্রবণও করেন নাই।.....অথবা এই দ্বীপের কথা শুনিয়াও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার এমন ভ্রম কি হইতে পারে? দ্বীপের খুব কাছে আসিয়া নোঙর ফেলিয়া কাপ্তেন তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ছুটিয়া গেলেন। 'চার্ট' বাহির করিয়া অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু তাহাতে এই শৈলদ্বীপের নাম-গন্ধও পাইলেন না! তবে এখানে এই দ্বীপটি কোথা হইতে আসিল?

অনেক ভাবিয়াও এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না পাইয়া কাপ্তেন আবার বাহিরে আসিলেন। এবং তাহার পর জন-আষ্টেক নাবিককে বোটে চড়িয়া দ্বীপটি পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন।

নাবিকরা বোট লইয়া চলিয়া গেল। দ্বীপের তলায় বোট বাঁধিয়া নাবিকরা উপরে গিয়া উঠিল—জাহাজ হইতে সেটাও স্পষ্ট দেখা গেল। তারপর তাহারা সকলের চোখের আড়ালে গিয়া পাহাড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল।

দুই ঘণ্টার ভিতরে নাবিকদের ফিরিয়া আসিবার কথা। কিন্তু তিন—চার—পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু কাহারও দেখা নাই! কাপ্তেন চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! আরও দুই ঘণ্টা গেল! বেলা ছয়টায় নাবিকেরা গিয়াছে, এখন বেলা একটা—তাহারা কোথায় গেল?

এবারে কাপ্তেন নিজেই সদলবলে নতুন বোটে নামিলেন। এবারে সকলেই সশস্ত্র! কারণ কাপ্তেনের সন্দেহ হইল, দ্বীপের ভিতরে গিয়া নাবিকেরা হয়তো বিপদে পড়িয়াছে! কল্য রাত্রে যাহাদের হাতে মশাল ছিল তাহারা কাহারা? বোম্বেটে নয়তো, হয়তো এই নির্জন দ্বীপে আসিয়া তাহারা গোপনে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে!

দ্বিতীয় দল দ্বীপে গিয়া উঠিল। মহাসাগরের অশ্রান্ত গম্ভীর কোলাহলের মাঝখানে সেই

অজ্ঞাত দ্বীপ বিজন ও একান্ত স্তব্ধ সমাধির মতো দাঁড়াইয়া আছে। অতিকায় প্রস্তরমূর্তিগুলো পর্বতেরই অংশবিশেষের মতো অচল হইয়া আছে, তাহাদের দৃষ্টিহীন চক্ষুগুলো অনন্ত সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। মানুষ-ভাস্কর তাহাদের গড়া মূর্তির মুখের ভাবে ফুটায় মানুষেরই মৌখিক ভাবের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই দানবমূর্তিগুলোর মুখের ভাব কী কঠিন!

কোনও মূর্তির মুখেই মানুষি দয়া মায়া স্নেহ প্রেমের কোমল ও মধুর ভাবের এতটুকু চিহ্ন নাই! তাহাদের দেখিলে প্রাণে ভয় জাগে, হৃদয় স্তম্ভিত হয়! প্রত্যেকেরই অমানুষিক মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে হিংস্র কঠোরতার তীব্র আভাস! বেশ বুঝা যায়, যাহারা এই সকল মূর্তি গড়িয়াছে তাহারা দয়া-মায়ার সঙ্গে পরিচিত নয়। তাহারা অতুলনীয় শিল্পী বটে, কিন্তু প্রচণ্ড নিষ্ঠুর!

কাপ্তেন সারাদিন ধরিয়া সেই দ্বীপের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া যতদূর উপরে উঠা যায়, উঠিলেন। তাহার পরেই খাড়া শিখরের মূলদেশ। সরীসৃপ ভিন্ন কোনও দ্বিপদ বা চতুষ্পদ ভূচর জীবের পক্ষেই সেই শিখরের উপরে উঠা সম্ভবপর নয়। প্রায় হাজার ফুট উপর হইতে কাপ্তেন ও তাঁহার সঙ্গীরা চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও নাবিকদের দেখা নাই। তাহাদের সচেতন করিবার জন্য বারংবার বন্দুক ছোড়া হইল, সে শব্দে নীরবতার ঘুম ভাঙিয়া গেল, কিন্তু নাবিকদের কোনওই সাড়া নাই।

সন্ধ্যার সময়ে কাপ্তেন সঙ্গীদের সহিত শ্রান্ত দেহে হতাশ মনে জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন আবার দ্বীপে গিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু হইল। সেদিনও সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু হারা-নাবিকদের সন্ধান মিলিল না।

এই দুই দিনের অন্বেষণে আরও কোনও কোনও অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

ঝড়ের রাত্রে দ্বীপে মশাল লইয়া যাহারা চলা-ফেরা করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল?

আলো লইয়া পৃথিবীর একমাত্র জীব চলা-ফেরা করিতে পারে এবং সেই জীব হইতেছে মনুষ্য! কিন্তু দ্বীপে মানুষের বসতির কোনও চিহ্নই নাই! তবে কি সেগুলো আলেয়ার আলো? কিন্তু আলেয়ার জন্ম হয় জলাভূমিতে, এই পাষাণের শুষ্ক রাজ্যে আলেয়ার কল্পনাও উদ্ভট, মরুর বুকে আলোকলতার মতোই অসম্ভব।

মানুষ যেখানে থাকে, সেখানে জলও থাকে। কিন্তু সারা দ্বীপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ঝরনা, নদী বা জলাশয় আবিষ্কার করা যায় নাই।

কিন্তু যাহারা মশাল জ্বালিয়াছিল, তাহারা তো মানুষ? যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহারা কোথাও কোনও গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আছে, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে, কী পান করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? জল কোথায়? নদী বা নির্ঝর তো ধন-রত্নের মতো লুকাইয়া রাখা যায় না! অন্তত তাহার শব্দও শোনা যায়! এবং এই পাহাড়-দ্বীপে কৃত্রিম উপায়ে জলাশয় খনন করাও অসম্ভব! সমুদ্রের লোনা জলেও জীবের প্রাণ বাঁচে না! তবে?

দ্বীপে যাহারা এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি বহু বৎসর ধরিয়া গড়িয়াছে, তাহারাও তো মানুষ? তাহারা কোথা হইতে জলপান করিত?

আর এমন সব বিচিত্র মূর্তি, ইহাদের পিছনে রহিয়াছে বিরাট এক সভ্যতার ইতিহাস! কিন্তু সমগ্র দ্বীপে কোথায় সেই সভ্যতার চিহ্ন? এতবড়ো একটা সভ্যতা তো কোনও গুপ্ত-

সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে লুকাইয়া রাখা যায় না! এবং 'চার্টে' পাওয়া যায় না, এমন একটা দ্বীপ সুপরিচিত আটলান্টিক মহাসাগরে কোথা হইতে আসিল, সেটাও একটা মস্ত সমস্যা!

জাহাজের আট-আটজন নাবিক কি কর্পূরের মতন উবিয়া গেল?

'বোহিমিয়া'র প্রত্যেক আরোহীর বিশ্বাস, এ-সমস্তই ভৌতিক কাণ্ড!

তৃতীয় দিনেও কাপ্তেন আবার দ্বীপে গিয়া নাবিকদের খুঁজিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূতের ভয়ে কেহই আর তাঁহার সঙ্গে যাইতে রাজি হয় নাই। কাজেই জাহাজের ইঞ্জিন মেরামত করিয়া তাঁহাকে আবার দেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ ও কেনারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে এই নূতন গিরি-দ্বীপের অবস্থান।

কিন্তু এই দ্বীপের বিচিত্র রহস্যের কিনারা করিবে কে?

কুমার পড়া শেষ করে কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে দিলে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিমল বললে, 'কুমার, জীবনে অনেক রহস্যেরই গোড়া খুঁজে বার করেছি আমরা। এবারেও এ-রহস্যের কিনারা আমরা করতে পারব, কি বলো?

কুমার বললে, 'ওসব কিনারা-টিনারা আমি বুঝি না! সফলই হই আর বিফলই হই, জীবনে আবার একটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া গেল, এইটুকুতেই আমি তুষ্ট!'

বিমল সজোরে টেবিল চাপড়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'ঠিক বলেছ!' হাতে হাত দাও!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্ল্যাক স্নেক

কলকাতা থেকে বোম্বে এবং বোম্বে থেকে ভারতসাগরে!

দেখতে দেখতে বোম্বাই শহর ছোটো হয়ে আসছে এবং বড়ো বড়ো প্রাসাদগুলোর চুড়ো নিয়ে বোম্বাই যত দূরে সরে যাচ্ছে, তার দুই দিকে ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে জেগে উঠেছে ভারতবর্ষের তরুশ্যামল বিপুল তটরেখা!

ক্রমে সে-রেখাও ক্ষীণতর হয়ে এল এবং তার শেষ-চিহ্নকে গ্রাস করে ফেললে মহাসাগরের অনন্ত ক্ষুধা! তারপর থেকে সামনে চলতে লাগল নীলকমলের রংমাখানো অসীমতার নৃত্যচাঞ্চল্য—নীল আকাশ আর নীল জল ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত রূপ চোখের আড়ালে গেল একেবারে হারিয়ে।

ডেকের উপরে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'কুমার, ভারতকে এই প্রথম ছেড়ে যাচ্ছি না, কিন্তু তবু কেন জানি না, যতবারই ভারতকে ছেড়ে যাই ততবারই মনে হয়, আমার সমস্ত জীবনকে যেন ভারতের সোনার মতো সুন্দর ধুলোয় ফেলে রেখে, আত্মার অশ্রু-ভেজা মৃতদেহ নিয়ে কোন অন্ধকারে যাত্রা করছি!'

কুমার নিষ্পলক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত তটরেখার উদ্দেশে তাকিয়ে ভারী ভারী গলায় বললে, 'ভাই, স্বদেশের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া কখনও হয়তো পুরানো হয় না! যে-ভারতের শিয়রে নির্ভীক প্রহরীর মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে তুষারমুকুট অমর হিমাচল, যে-ভারতের চরণতলে ভৃত্যের মতো ছুটোছুটি করছে অনন্ত পাদোদক নিয়ে রত্নাকর সমুদ্র, যে-ভারতের পবিত্র মাটি, জল, তাপ, বাতাস আর আকাশ আজ যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের দেহ গড়ে আসছে লক্ষ লক্ষ রূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার আদি-পুরোহিত, যে অপূর্ব মহিমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজ আমরা ভারতবাসী বলে গর্বে সব জাতির উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, আমাদের এমন গৌরবের দেশ ছেড়ে যেতে যার মন কেমন করে না, নিশ্চয়ই সে ভারতের ছেলে নয়!'

বিমল বললে, 'যারা ভারতের ছেলে নয় তারাও তো ভারতকে ভুলতে পারে না, কুমার! অতীতের পর্দা ঠেলে তাকিয়ে দ্যাখো! ভারতকে শত্রুর মতো আক্রমণ করতে এল যুগে যুগে শক, হুন, তাতার আর মোগল, কিন্তু আর ফিরে গেল না! কেউ গেল ভারতের মহামানবের সাগরের অতলে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে, কেউ ডাকলে পরম শ্রদ্ধায় ভারতকেই স্বদেশ বলে! অমন যে আপন সভ্যতায় গর্বিত গ্রিকগণ, তাদেরও অসংখ্য লোক আলেকজান্ডারের দল ছেড়ে স্বদেশ ভুলে উত্তর ভারতেই বংশানুক্রমে বাসা বেঁধে রয়ে গেল! আমাদের এই ভারতকে স্বদেশের মতো ভালো না বেসে কেউ যে থাকতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

বিমল যা ভেবেছিল, তাই। বুড়ো রামহরির পুরানো অভ্যাসই হচ্ছে মুখে 'না' বলা, কিন্তু কাজের সময়ে দেখা যায়, তারই পা চলছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!

প্রৌঢ় বিনয়বাবু নিজের কেতাব আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে ঘরের চার-দেওয়ালের মাঝখানেই বন্দী থাকতে ভালোবাসেন, কিন্তু বিমল ও কুমার সারা পৃথিবীতে ছুটাছুটি করতে বেরুবার সময়ে তাঁকে ডাক দিলে তিনিও দলে যোগ না দিয়ে পারেন না! আর তিনি এলে কমলও যে আসবে, এটাও তো জানা কথা!

আর ওই বিখ্যাত দিশি কুকুর, বাঘের মতন মস্ত বাঘা! ঠিকভাবে পালন করলে বাংলার নিজস্ব কুকুরও যে কত তেজী, কত বলী আর কত সাহসী হয়, বিমল ও কুমারের নানা অভিযানে বহুবারই বাঘা সেটা প্রমাণিত করেছে। এবারেও আবার নতুন বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পাবে ভেবে সে তার উৎসাহী ল্যাজের ঘন ঘন আন্দোলন আর বন্ধ করতে পারছে না।

এবারে দলের সঙ্গে চলেছে বারোজন শিখ, ছয়জন গুর্খা, আর ছয়জন পাঠান। এরা সকলেই আগে ফৌজে ছিল। অনেকেই ভারতের সীমান্তে বা মহাযুদ্ধে ফ্রান্সে ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে লড়াই করে এসেছে। পাকা ও অভিজ্ঞ বলেই তারা তাদের নিযুক্ত করেছে এবং সকলকে বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতেও ত্রুটি করা হয়নি। এতগুলি সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে নতুন অভিযানে যাবার জন্যে সরকারি আদেশও গ্রহণ করা হয়েছে।

জাহাজ এখন এডেন বন্দরের দিকে চলেছে। তারপর ইউরোপের নানা দেশের নানা বন্দরে 'বুড়ি ছুঁয়ে' ফরাসিদেশের মারসেয়্য-এ গিয়ে থামবে। সেখানে নেমে সকলে যাবে রেলপথে পারি নগরে।...আধুনিক আর্ট ও সাহিত্যের পীঠস্থান পারি নগরীকে ভালো করে

দেখবার জন্যে বিমল ও কুমারের মনে অনেকদিন থেকেই একটা লোভ ছিল। এই সুযোগে তারা সেই লোভ মিটিয়ে নিতে চায়।

পথের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। কারণ আমরা ভ্রমণকাহিনী লিখছি না।

পারি শহরে গিয়ে প্রথম যেদিন তারা হোটেলে বাসা নিলে, সেইদিনই খবরের কাগজে এক দুঃসংবাদ পেলে। খবরটি হচ্ছে এই

মিঃ টমাস মর্টন গত উনিশে নভেম্বর রাত্রে রহস্যময় ও অদ্ভুতভাবে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পড়েছেন। এখনও বিস্তৃত কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি, তবে এইটুকু জানা গিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর কারণ 'ব্ল্যাক স্নেকে'র দংশন। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, সম্প্রতি যে এস. এস. বোহিমিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের নতুন দ্বীপের সংবাদ এনে সভ্য জগতে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, মিঃ টমাস মর্টন ছিলেন তারই কাপ্তেন।

বিমল দুঃখিত কণ্ঠে বললে, 'কুমার, ভেবেছিলুম প্রথমে লন্ডনে নেমেই আগে মিঃ মর্টনের দ্বারস্থ হব। তাঁকে আমাদের সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ করব। কারণ ওই দ্বীপে যেতে গেলে পথ দেখাবার জন্যে বোহিমিয়ার কোনও পদস্থ কর্মচারীর সাহায্য না নিলে আমাদের চলবে না, আর এ-ব্যাপারে মিঃ মর্টনের চেয়ে বেশি সাহায্য অন্য কেউ করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের প্রথম আশায় ছাই পড়ল।'

কুমার বললে, 'ভগবানের মার, উপায় কী? আমাদের এখন বোহিমিয়ার অন্য কোনও কর্মচারীকে খুঁজে বার করতে হবে।'

'কাজেই।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু বিমল, হতভাগ্য মিঃ মর্টনের মৃত্যুর ব্যাপারে যে একটা অসম্ভব সত্য রয়েছে, সেটা তোমরা লক্ষ করেছ কি?'

—'কীরকম!' —বলেই বিমল খবরের কাগজখানা আবার তুলে নিলে। তারপর যেন আপন মনেই বিড় বিড় করে বললে 'ব্ল্যাক স্নেক—অর্থাৎ কেউটে সাপ!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। ব্ল্যাক স্নেক। আমরা যাকে বলি কেউটে সাপ। ব্ল্যাক স্নেক পাওয়া যায় কেবল ভারতে, আর আফ্রিকায়। ইংলন্ডে অ্যাডার ছাড়া আর কোনওরকম বিষধর সাপ নেই।'

কুমার বললে, 'এই ডিসেম্বর মাসের দুর্জয় বিলিতি শীতে ইংলন্ডে এ্যাডার সাপও নিশ্চয় বাসার বাইরে বেরোয় না। ভারতের কেউটে সাপও এখানে এলে এখন নির্জীব হয়ে থাকতে বাধ্য।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যথার্থ অনুমান করেছ। এমন অসম্ভব সত্যকে মানি কেমন করে? এ-খবরে নিশ্চয় কোনও গলদ আছে।'

বিমল গম্ভীরভাবে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মর্টনের মৃত্যুসংবাদের মধ্যে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে বটে।

তিন দিন পরে তারা ফরাসিদের বিখ্যাত শিল্পশালা দেখে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে শুনলে রাস্তা দিয়ে একটা কাগজওয়ালা ছোকরা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটছে—'লন্ডনে আবার ব্ল্যাক স্নেক, লন্ডনে আবার ব্ল্যাক স্নেক!'

কমল তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে একখানা কাগজ কিনে আনলে।

পথের ধারেই ছিল একটা রেস্তোরাঁ। বিমল সকলকে নিয়ে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর, এক কোণের একটি টেবিল বেছে নিয়ে বসে বিনয়বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বললে, 'আপনি ফরাসি ভাষা জানেন, কাগজখানা অনুগ্রহ করে আমাদের পড়ে শোনান। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আজকেও এতে এমন কোনও খবর আছে যা আমাদের জানা উচিত।'

বিনয়বাবু কাগজের মধ্যে খুঁজে একটি জায়গা বার করে পড়তে লাগলেন

লন্ডনে আবার ব্ল্যাক স্নেক!

লন্ডন কি ভারত ও আফ্রিকার জঙ্গলে পরিণত হতে চলল? লন্ডনে ব্ল্যাক স্নেকের আবির্ভাব কি স্বপ্নেরও অগোচর নয়?

তিনদিন আগে আমরা হঠাৎ-বিখ্যাত এস. এস. বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টনের ব্ল্যাক স্নেকের দংশনে মৃত্যুর খবর দিয়েছি। কাল রাত্রে ওই জাহাজেরই দ্বিতীয় অফিসার মিঃ চার্লস মরিস আবার হঠাৎ মারা পড়েছেন। এবং তাঁরও মৃত্যুর কারণ ওই ভয়াবহ ব্ল্যাক স্নেক।

এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহরই কারণ নেই। ইংলন্ডে সর্প-বিষ সম্বন্ধে সর্ব-প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, মিঃ মরিসের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখেছেন। লাশের কণ্ঠদেশে সর্প-দংশনের স্পষ্ট দাগ আছে। শবদেহ ব্যবচ্ছেদের পরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যে, ব্ল্যাক স্নেকের বিষেই হতভাগ্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

এবং এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে মিঃ মরিসের শয্যার তলায় একটি মৃত ব্ল্যাক স্নেকও পাওয়া গিয়াছে। এজাতের ব্ল্যাক স্নেক নাকি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাপটার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত! খুব সম্ভব মিঃ মরিস মৃত্যুর আগে নিজেই ওই সাপটাকে হত্যা করেছিলেন।

পুলিশ এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করছে

ক॥ লন্ডনে কেমন করে ব্ল্যাক স্নেকের আগমন হল?

খ॥ এস. এস. বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টনের বাসা থেকে দ্বিতীয় অফিসার মিঃ চার্লস মরিসের বাসার দূরত্ব সাত মাইল। মিঃ মর্টনকে যে-সাপটা কামড়েছিল, লন্ডনের মতো শহরের সাত মাইল পার হয়ে তার পক্ষে মিঃ মরিসকে দংশন করা সম্ভবপর নয়। তবে কি ধরতে হবে যে লন্ডনে একাধিক ব্ল্যাক স্নেকের আবির্ভাব হয়েছে? কেমন করে তারা এল? কেন এল?

গ॥ অধিকতর আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই : মিঃ মর্টন ও মিঃ মরিস দুজনেই এস. এস. বোহিমিয়ার লোক। ব্ল্যাক স্নেক কি বেছে বেছে বোহিমিয়ার লোকদেরই দংশন করছে, না দৈবক্রমে এমন অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে?

সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, বোহিমিয়ার আটজন নাবিক নিরুদ্দেশ হবার পর যে দ্বিতীয় নৌকাখানা শৈলদ্বীপে গিয়েছিল, তার মধ্যে কেবল তিনজন লোক পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের

তলদেশে গিয়ে উঠেছিলেন। বাকি সবাই অত উঁচুতে উঠতে রাজি হননি। পূর্বোক্ত তিনজন হচ্ছেন কাপ্তেন মিঃ মর্টন, দ্বিতীয় অফিসার মিঃ মরিস ও তৃতীয় অফিসার মিঃ জর্জ ম্যাকলিয়ড। এখন তিনজনের মধ্যে কেবল মিঃ ম্যাকলিয়ডই জীবিত আছেন।

বোহিমিয়ার প্রত্যেক যাত্রীর—বিশেষত যাঁরা ওই শৈলদ্বীপে গিয়ে নেমেছিলেন তাঁদের—মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের ধারণা তাঁরা ওই দ্বীপ থেকে কোনও অজ্ঞাত অভিশাপ বহন করে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু আমরা এই অদ্ভুত রহস্যের কোনওই হদিস পাচ্ছি না। কোথায় আটলান্টিক মহাসাগরের নব-আবিষ্কৃত এক অসম্ভব বিজন দ্বীপ, কোথায় আধুনিক সভ্যতার লীলাস্থল লন্ডন নগর, আর কোথায় সুদূর এশিয়ার ভারতবাসী ব্ল্যাক স্নেক! এই তিনের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করতে পারে, পৃথিবীতে এমন মস্তিষ্ক বোধহয় নেই। লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড়ো বড়ো ডিটেকটিভদের মাথাও গুলিয়ে গিয়েছে।

প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যে যে কার্য ও কারণের সম্পর্ক থাকে, এখানে তার একান্ত অভাব।

মিঃ মর্টন ও মিঃ মরিস—দুজনেই রাত্রিবেলায় শয্যায় শায়িত বা নিদ্রিত অবস্থায় সর্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সাপ বিনা কারণে কেন তাদের আক্রমণ করলে? যদি ধরে নেওয়া যায়, এর মধ্যে এমন কোনও দুষ্ট ব্যক্তির হাত আছে, সে সাপ লেলিয়ে দিয়েছিল, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে—কেন লেলিয়ে দিয়েছিল? ওই দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে তার কী লাভ? অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, মৃত ব্যক্তিদের কারুর কোনও শত্রু নেই।

রহস্যময় শৈলদ্বীপ, রহস্যময় আটজন নাবিকের অন্তর্ধান, রহস্যময় এই কাপ্তেন ও দ্বিতীয় অফিসারের মৃত্যু এবং সবচেয়ে রহস্যময় হচ্ছে লন্ডনে ভারতবর্ষীয় ব্ল্যাক স্নেকের আবির্ভাব। এডগার অ্যালেনপো, গেবোরিও এবং কন্যান ডইলের উপন্যাসেও এমন যুক্তিহীন বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাগজ-পড়া শেষ করে বিনয়বাবু বললেন, 'ব্যাপারটা ছিল একরকম, হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর-একরকম। আমরা যাচ্ছিলুম কোনও নতুন দ্বীপের রহস্য আবিষ্কার করতে, কিন্তু এখন যে সমস্ত ব্যাপারটা গোয়েন্দাকাহিনীর মতো হয়ে উঠছে।'

কুমার বললে, 'আমার বিশ্বাস, আসল ব্যাপার ঠিকই আছে, এই নতুন ঘটনাগুলো তার শাখা-প্রশাখা ছাড়া আর কিছুই নয়!'

বিমল বললে, 'আমারও তাই মত। কিন্তু বিনয়বাবু, আজকের কাগজে আর একটা নতুন তথ্য পাওয়া গেল। শৈলদ্বীপের পাহাড়ে, সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন কেবল তিনজন লোক। তাঁদের মধ্যে বেঁচে আছেন খালি মিঃ জর্জ ম্যাকলিয়ড। আমাদের এখন সর্বাগ্রে তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে, কারণ আপাতত দ্বীপের কথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

—'কিন্তু কেউটে সাপের কামড়ে বোহিমিয়ার এই যে দু-জন লোকের মৃত্যু, এ-সম্বন্ধে তোমার কী মত?'

বিমল ওয়েটারকে ডেকে খাবারের 'অর্ডার' দিয়ে বললে, 'আপাতত আমি শুধু বিস্মিত হয়েছি। মিঃ ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে দেখা না করে ওসব বিষয় নিয়ে ভেবে-চিন্তে কোনওই লাভ নেই।'

কুমার বললে, 'কিন্তু, ঘটনা ক্রমেই যে-রকম গুরুতর হয়ে উঠেছে, আমাদের বোধহয় আর পারিতে বসে থাকা উচিত নয়।'

বিমল প্রবল পরাক্রমে 'ওয়েটারে'র আনা খাবারের একখানা ডিশ আক্রমণ করে বললে, 'এসো কুমার, এসো কমল, আসুন বিনয়বাবু। পেটে যখন আগুন জ্বলে তখন ডিশের খাবার ঠান্ডা হতে দেওয়া উচিত নয়!...আমাদের স্বদেশের কেউটে সাপ কেন বিলাতে বেড়াতে এসেছে, সেটা জানবার জন্যে আমরা কালকেই লন্ডনে যাত্রা করব।'

বিমলরা সদলবলে যখন লন্ডনে এসে হাজির হল তখন দিনের বেলাতেও কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার এবং ঝুর ঝুর করে ঝরছে বরফের গুঁড়ো। পথে পথে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে যে জনতা-প্রবাহ ছুটছে, তাদের কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টি নেই। যেন তারা কুয়াশা ও তুষারেরই নিজস্ব জীব!

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিনয়বাবু ওভারকোটের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'বিমলভায়া, বুঝতে পারছ কি, আমাদের ভারতীয় 'নেটিভ' আত্মার ভিতরে এখন খাঁটি বিলিতি জনবুলের আত্মা ধীরে ধীরে ঢুকছে? অনেক ভারতবাসী আজকাল এইটে অনুভব করার পর দেশে গিয়ে নিজেদের আর 'নেটিভ' বলে মনে করে না।'

কুমার দাঁতের ঠকঠকানি কোনওরকমে বন্ধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, 'আত্মার উপরে যারা বিলিতি তুষারপাত সহ্য করে, যম তাদের গ্রহণ করুক! যে দেশের উপরে সূর্য আর চন্দ্রের দয়া এত কম, আমি তাকে ভালো দেশ বলে মনে করি না! বেঁচে থাক ভারতের নীলাকাশ, সোনালি রোদ রুপোলি জ্যোৎস্না আর মলয় হাওয়া, তাদের ছেড়ে এখানে এসে কে থাকতে চায়?'

এমনকী বাঘার ল্যাজ পর্যন্ত থেকে থেকে কুঁকড়ে না পড়ে পারছে না।

সেদিন সকলে মিলে হোটেলের 'ফায়ার-প্লেসে'র সামনে বসে বসে বিলাতি শীতের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করলে!

পরদিনেও সূর্যের দেখা নেই, উলটে গোদের উপরে বিষ-ফোড়ার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারই ভিতরে বিমল, কুমার ও বিনয়বাবু রেন-কোট চড়িয়ে এস. এস. বোহিমিয়ার লন্ডনের আপিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

বিনয়বাবু বললেন, 'স্বদেশ কী মিষ্টি! এমন দেশ ছেড়ে ভারতে যেতেও সায়েবদের নাকি মন কেমন করে!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, সাহারার অগ্নিকুণ্ডকেও বেদুইনরা স্বর্গ বলেই ভাবে।'

এমনি সব কথা কইতে কইতে সকলে গন্তব্যস্থলে এসে উপস্থিত হল! সেখান থেকে খবর পাওয়া গেল যে, মিঃ জর্জ ম্যাকলিয়ডের ঠিকানা হচ্ছে,—নং হোয়াইটহল কোর্ট।

তারা একখানা ট্যাক্সি নিলে। তারপর চারিদিকের বৃষ্টিস্নাত কুয়াশার প্রাচীর ঠেলে ঠেলে ট্যাক্সি হোয়াইটহল কোর্টের এক জায়গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমলরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বাড়ির নম্বর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গেল।

কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একখানা বাড়ির সামনে অনেক লোক ভিড় করে

দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক লোকের মুখেই ভয়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে এবং ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

পথের মাঝখানে একখানা বড়ো মোটরগাড়ি, তার উপরে বসে আছে দুজন কনস্টেবল। ভিড়ের ভিতরেও কয়েকজন কনস্টেবল রয়েছে, তারা বেশি-কৌতূহলী লোকদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

জনতার অধিকাংশ লোকই কিছুই জানে না, তাদের জিজ্ঞাসা করেও বিমলরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

বিনয়বাবু বললেন, 'জনতার ধর্ম সব দেশেই সমান, পথের লোক ভিড় দেখলে ভিড় আরও বাড়িয়েই তোলে! বিমল, কিছু জানতে চাও তো ওই কনস্টেবলদের কাছে যাবার চেষ্টা করো!'

বিমল উত্তেজিত জনতার ভিতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে অনেক কষ্টে অগ্রসর হল। বাড়ির নম্বর দেখে বুঝলে, তারা সেই নম্বরই খুঁজছে। একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মি জর্জ ম্যাকলিয়ড কি এই বাড়িতে থাকেন?'

—'হ্যাঁ! কিন্তু কাল রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর শুধোলে, 'কী করে তাঁর মৃত্যু হল?'

কনস্টেবল তার দিকে সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললে, 'আপনি কি ভারতবাসী?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে শুনুন। আপনাদেরই দেশের ব্ল্যাক স্নেক এসে মিঃ ম্যাকলিয়ডকে দংশন করেছে। ভারতবর্ষ তার ব্ল্যাক স্নেককে নিয়ে নরকে গমন করুক!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোমেজের প্রবেশ

তিনদিন পরের কথা। ঘড়ি দেখে বলা যায় এখন বৈকালী চা পানের সময়; কিন্তু লন্ডনের অন্ধকার-মাখা আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, এদেশে ঘড়ি তার কর্তব্যপালন করে না।

একখানা নিচু ও বড়ো 'চেস্টারফিল্ডের' উপরে বসে বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার চা ও স্যান্ডউইচের সদ্ব্যবহার করছিল। কমল শীতে কাবু হয়ে 'রাগ' মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে আছে চা ও স্যান্ডউইচ দেখেও সে গরম বিছানা ছাড়তে রাজি হয়নি।

বিনয়বাবু একবার উঠলেন। 'ফ্রেঞ্চ-উইন্ডোর' ভিতর দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে হতাশভাবে বললেন, 'লন্ডনে এসে পর্যন্ত সূর্যদেবের মুখ দেখলুম না, বিলিতি চন্দ্রকিরণ কী-রকম তাও জানলুম না, অথচ বিলিতি কবিতায় চন্দ্র-সূর্যের গুণগান পড়া যায় কত! কবিরা সব দেশেই মিথ্যাবাদী বটে, কিন্তু বিলিতি কবিরা এ-বিষয়ে দস্তুরমতো টেক্কা মেরেছেন।'

কুমার তৃতীয় 'স্যান্ডউইচ' খানা ধ্বংস করে বললে, 'যে দেশে যার অভাব, তারই কদর হয় বেশি!'

বিনয়বাবু আবার আসন গ্রহণ করে বললেন, 'কিন্তু বিমল এখনও ফিরে এল না! সেই কোন সকালে সে বেরিয়েছে, সন্ধ্যা হতে চলল, এখনও তার দেখা নেই!'

কুমার নিশ্চিন্তভাবে চতুর্থ 'স্যান্ডউইচে' মস্ত এক কামড় বসিয়ে বললে, 'বিমল যখন ফেরেনি তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে তার যাত্রা সফল হয়েছে! হবে না কেন? কলকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব যে-রকম উচ্চপ্রশংসা করে তাকে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, তা পড়ে এখানকার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তারা নিশ্চয়ই বিমলকে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত হবেন!'

বলতে বলতে কুমার আবার পঞ্চম 'স্যান্ডউইচে'র দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু বিনয়বাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'থামো কুমার, থামো! তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখনও 'ডিনারে'র সময় হয়নি!' অনেকে মনে করে বেশি খাওয়া বাহাদুরি, কিন্তু আমি মনে করি বেশি খাওয়া অসভ্যতা! সামনে যতক্ষণ খাবার থাকবে ততক্ষণই মুখ চলবে, এটা হচ্ছে পশুত্বের লক্ষণ!

কুমার অপ্রস্তুত স্বরে বললে, 'কী করব বিনয়বাবু, বরফমাখা বিলিতি শীত যে আমার জঠরে রাক্ষুসে খিদে এনে দিয়েছে!'

বিনয়বাবু ডাকলেন, 'আয় রে বাঘা আয়!'

পশমি জামা গায়ে দিয়ে বাঘা তখন খাটের তলার সবচেয়ে অন্ধকার কোণে কুঁকড়ে পিছনের পায়ের তলায় মুখ গুঁজে দিব্য আরামে ঘুম দিচ্ছিল। হঠাৎ কেন তার ডাক পড়ল বুঝতে না পেরে বাঘা মুখ তুলে অত্যন্ত নারাজের মতো বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কুমারের লোভী চোখের সামনে ডিশের উপর তখনও দুখানা 'স্যান্ডউইচ' অক্ষত অবস্থায় আক্রান্ত হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেইদুখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বিনয়বাবু বললেন, 'বাঘা, আমার হাতে কী, দেখছিস?'

বাঘা দেখতে ভুল করলে না। শীতের চেয়ে খাবার বড়ো বুঝে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা ডন দিলে, এবং তারপর দুইলাফে একেবারে বিনয়বাবুর কাছে এসে হাজির হল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমারের মুখের গ্রাস বাঘার মুখের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমার জুল-জুল করে খানিকক্ষণ বাঘার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'নিরেট খাবার যখন অদৃশ্য হল, তখন তরল জিনিসই উদরস্থ করা যাক'—এই বলে সে পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢালতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'কুমার, আমাদের সঙ্গে সেই দ্বীপে যাবার জন্যে, পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রোজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তবু তো 'বোহিমিয়া'র কোনও নাবিক-ই আজ পর্যন্ত দেখা দিলে না।'

কুমার বললে, 'তার জন্যে দায়ী ওই তিনটি লোকের মৃত্যু। 'বোহিমিয়া'র প্রত্যেক নাবিক-ই এখন ব্ল্যাক স্নেকের ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।'

এমন সময়ে দরজার পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে বিমল।

কুমার বলে উঠল, 'এই যে বিমল! এতক্ষণ কোথায় ছিলে, কী করছিলে?'

বিমল তার ওভারকোটটা খুলতে খুলতে বললে, 'কী করছিলুম? স্কটল্যান্ডইয়ার্ডের ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেকটার ব্রাউনের সঙ্গে শার্লক হোমসের ভূমিকা অভিনয় করছিলুম!'

—'তোমার হাসি-হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছে অভিনয়ে তুমি সফল হয়েছ!'

—'খানিকটা হয়েছি বইকী। সেই 'অমাবস্যার রাতে'র ব্যাপারেই তো তুমি জানো, গোয়েন্দাগিরিতেও আমি খুব-বেশি কাঁচা নই!..... কিন্তু আপাতত তুমি হোটেলের চাকরকে ডাকো। ঘটনা-প্রবাহে পড়ে সকাল থেকে দাঁতে কিছু কাটবার সময় পাইনি, উদরে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা হই হই করছে! চা, গরম 'টোস্ট' আর 'আসপারাগোস ওমলেটের' অর্ডার দাও!'

কুমার ভয়ে ভয়ে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'কেবলই কি তোমার জন্যে ভাই? না, আমাদের জন্যেও ছিটেফোঁটা কিছু আসবে?'

বিনয়বাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আমাদের মানে? আমি আর কিছু চাই না,—আমি তোমার মতো রাক্ষস নই!'

কুমার নির্লজ্জের মতো বললে, 'আমিও রাক্ষসত্বের দাবি করি না, তবু আরও কিছু খেতে চাই!'

বিনয়বাবু বললেন, 'খাও, খাও—যত পারো খাও! তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে গপ করে গিলে ফেললেও আমি আর টুঁ শব্দ করব না!'

কুমার হাসতে হাসতে খাবারের 'অর্ডার' দিয়ে এল।

বিমল একখানা ইজিচেয়ারের উপরে শুয়ে পড়ে বললে, 'বিনয়বাবু, এই ব্ল্যাক স্নেকের ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। গোড়া থেকেই আমরা লক্ষ করেছি, এই তিনটে ঘটনার মধ্যে কতকগুলো অসম্ভব বিশেষত্ব আছে। এক : তিনজন মৃত ব্যক্তিই এস. এস. বোহিমিয়ার লোক। দুই যে তিন ব্যক্তি সেই অজানা দ্বীপের পাহাড়ে সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন, মারা পড়েছেন কেবল তাঁরাই। তিন : ভারতের কেউটে সাপ বিলাতে। চার ইংলন্ডের প্রচণ্ড শীতেও কেউটে সাপের দৌরাত্ম্য। পাঁচ : যাঁরা মারা পড়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ি পরস্পরের কাছ থেকে অনেক মাইল তফাতে আছে, অথচ সবাই মরেছেন কেউটের বিষে। সুতরাং এসব কীর্তি একটা সাপের নয়। ছয় : কেউটের আবির্ভাব সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ নেই, কারণ মিঃ চার্লস মরিসের শয়নগৃহে একটা মৃত সাপও পাওয়া গিয়েছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ঘটনাগুলো এমন অসম্ভব যে, মনে সত্যি সত্যি কুসংস্কারের উদয় হয়! কোনও রহস্যময় হিংস্র অপার্থিব শক্তিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। সেই শক্তি যেন অজানা দ্বীপে মানুষের পদক্ষেপ পছন্দ করে না। যারাই সেখানে গিয়েছে, সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ অদৃশ্য শক্তির অভিশাপ বহন করে ফিরে এসেছে।'

বিমল একখানা 'টোস্ট' ভাঙতে ভাঙতে বললে, 'আমি কিন্তু গোড়া থেকেই কোনও অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করিনি।'

—'তবে কি তুমি এগুলোকে দৈব-দুর্ঘটনা বলে মনে করো?'

কুমার বললে, 'দৈব-দুর্ঘটনার মধ্যে এমন একটা ধারা থাকে না। এখানে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে যেন কোনও কুচক্রীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করছে।'

বিমল বলল, 'ঠিক বলেছ। আমিও ওই সূত্র ধরেই সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছি। ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেকটার ব্রাউনের সঙ্গে আমি আজ তিনটে মৃত দেহই পরীক্ষা করেছি, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কয়েছি, এমনকী যে ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করেছেন তাঁর মতামত নিতেও ভুলিনি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে তুমি নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ?'

—'হ্যাঁ। এর মধ্যে কোনও অদৃশ্য শক্তির অভিশাপও নেই, এগুলো দৈব-দুর্ঘটনাও নয়!'

—'তবে?'

—'শুনুন, একে একে বলি। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রত্যেক মৃতব্যক্তির দেহে সাপের বিষ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের দেহে সর্পদংশনের স্পষ্ট চিহ্ন আছে। কিন্তু মিঃ চার্লস মরিসের বাড়িতে গিয়ে আমি এক বিচিত্র আবিষ্কার করেছি। ওঁরই খাটের তলায় একটা ক্ষতবিক্ষত মৃত কেউটে সাপ পাওয়া গিয়েছিল। ডিটেকটিভ ব্রাউনের মতে, মিঃ মরিস নিজে মরবার আগে সাপটাকে হত্যা করেছিলেন। অসঙ্গত এ মত নয়। কিন্তু আমার প্রশ্নে প্রকাশ পেল যে, ক্ষত-বিক্ষত সাপটা খাটের তলায় মরে পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘরের কোথাও একফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি! সাপের দেহের রক্ত কোথায় গেল? ডিটেকটিভ ব্রাউন আমার এই আবিষ্কারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখনই মৃত সাপটাকে শবব্যবচ্ছেদাগারে মিঃ মরিসের লাশের কাছে নিয়ে যাওয়া হল! লাশের গলায় সাপের দাঁতের দাগ ছিল। মরা সাপের দাঁতের সঙ্গে সেই দাগ মিলিয়ে দেখা গেল, মিঃ মরিস মোটেই সাপটার কামড়ে মারা পড়েননি. তাঁকে অন্য কোনও সাপ কামড়েছে!....এখন বুঝে দেখুন বিনয়বাবু, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে! প্রথমত: মিঃ মরিসের ঘরে কি তবে একসঙ্গে দুটো কেউটে সাপ ঢুকেছিল? একটা তাঁকে কামড়ে পালিয়েছে, আর একটাকে তিনি নিজেই হত্যা করেছেন? কিন্তু লন্ডনে একসঙ্গে দুটো কেউটের উদয় একেবারেই আজগুবি ব্যাপার! উপরন্তু, মিঃ মরিস সাপটাকে মারলে ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই তার রক্ত পাওয়া যেত। দ্বিতীয়ত: সাপটাকে তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আগে বাইরে কোথাও বধ করে ঘটনাস্থলে তার দেহটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল। কেন? পুলিশের মনে ভ্রম বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে! তাহলেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই তিন তিনটে হত্যার মূলে আছে এক বা একাধিক মানুষ! আমার এই অভাবিত আবিষ্কারে স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডে মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওখানকার প্রধান কর্তা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "ধন্য আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি। আমাদের শিক্ষিত ডিটেকটিভরা এতদিন গোলকধাঁধায় পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, আপনিই তাদের পথ বাৎলে দিলেন। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে কোনও সুচতুর মানুষই কেউটে সাপের সাহায্যে এই তিনটে নরহত্যা করেছে!"—এখন বলুন বিনয়বাবু, আমার অনুসন্ধান সফল হয়েছে কি না?'

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমিও বলি, ধন্য বিমল। বাঙালির মস্তিষ্ক যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও মুগ্ধ করবে, এটা আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি।'

বিমল ভুরু কুঁচকে বললে, 'কল্পনা করতে পারেননি! কেন? সামান্য ওই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, বাঙালির মস্তিষ্ক যে বারবার বিশ্বকেও অভিভূত করেছে! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, ধর্মে বিবেকানন্দ আধুনিক পৃথিবীতে বাঙালির নাম যে সমুজ্জল করে তুলেছেন! এই সেদিনও বাংলার আঠারো বছরের মেয়ে তরু দত্ত বিলিতি সাহিত্যেও চিরস্মরণীয় কিরণ বিতরণ করে গেছেন! আগেকার কথা না-হয় আর তুললুম না। তবে শ্রীচৈতন্যের মতন ধর্মবীর পৃথিবীর যে কোনও দেশকে অমর করতে পারতেন! এমনকী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বুদ্ধদেবকে নিয়েও আমরা গর্ব করতে পারি, কারণ বুদ্ধদেবও জন্মেছিলেন বাংলারই সীমান্তে!'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'বিমল, তুমি শান্ত হও,— আমি অপরাধ স্বীকার করছি! হ্যাঁ, আমিও মানি, বাঙালি হয়ে জন্মেছি বলে আমরা সারা পৃথিবীতে গর্ব করতে পারি!'

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে চা পান করতে লাগল। তারপর বললে, 'বিনয়বাবু, আমি আর একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি।'

—'কী?'

—'খবরের কাগজের রিপোর্টেই দেখেছেন তো, বোহিমিয়ার কাপ্তেন মিঃ টমাস মর্টন সেই অজানা দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে রাজি ছিলেন না! জাহাজের লোকেরাই তাঁকে দেশে ফিরতে বাধ্য করেছিল? মর্টন সাহেবের পুরাতন ভৃত্যকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, তিনি নাকি আবার সেই দ্বীপে যাবার বন্দোবস্ত করছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে যেতেন মিঃ চার্লস মরিস আর মিঃ জর্জ ম্যাকলিয়ড।'

—'কেন?'

—'সেইটেই তো হচ্ছে প্রশ্ন। ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে কেবল সেই আটজন নিরুদ্দেশ নাবিকের খোঁজ করা, আমার তা মনে হয় না। আরও দেখা যাচ্ছে, কেবল যে তিনজন লোক দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু শৈলশিখরে গিয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয়বার দ্বীপে যাচ্ছিলেন তাঁরাই। এর মানে কী?'

কুমার বললে, 'আরও একটা প্রশ্ন আছে। কেউটের কামড়ে মৃত্যুও হয়েছে কেবল ওই তিনজন লোকের। এরই বা অর্থ কী? বিমল প্রমাণিত করেছে যে, এইসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মানুষের হাত আছে। কিন্তু সে মানুষ কে? বোহিমিয়ার যে-তিনজন কর্মচারী আবার দ্বীপে যাবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের হত্যা করে তার কী স্বার্থসিদ্ধি হবে?'

বিমল বললে, 'কুমার তুমি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ। আজ হাইড পার্কে বসে পুরো দু ঘণ্টা ধরে আমিও এইসব প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজবার চেষ্টা করেছি। গোয়েন্দার কাজ সত্য তথ্য নিয়ে বটে, কিন্তু সব কাজের মতো গোয়েন্দাগিরির ভিতরেও কল্পনা-শক্তির দরকার আছে যথেষ্ট।.....ধরো, তুমি আমি আর বিনয়বাবু বোহিমিয়ার কাপ্তেন মর্টন, প্রথম 'মেট' মরিস আর দ্বিতীয় 'মেট' ম্যাকলিয়ডের স্থান গ্রহণ করলুম। ঝড়ের পরদিন নিরুদ্দেশ নাবিকদের খুঁজতে খুঁজতে আমরা দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু শৈলশিখরে উঠছি। জাহাজের অন্যান্য লোকেরা নীচে অপেক্ষা করছে। আমরা নাবিকদের কোথাও খুঁজে পাইনি। দ্বীপে কাল রাত্রে যারা আলো জ্বেলেছিল তারাও অদৃশ্য। সুতরাং মনে মনে বেশ বুঝতে পারছি যে, এই দ্বীপের মধ্যে কোনও একটা গভীর রহস্য আছে। কারণ পৃথিবীর হঠাৎ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে এতগুলো লোককে গিলে ফেলেনি। হয়তো এই দ্বীপে বোম্বেটের গোপনীয় রত্নগুহা আছে। হয়তো আমরা তিনজনে তারই কোনও প্রমাণ দেখতে পেলুম। তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলুম, এ-কথা জাহাজের আর কারুর কাছে প্রকাশ করা হবে না। পরে কোনও সুযোগে দ্বীপে আবার এসে সমস্ত গুহা লুণ্ঠন করে টাকাকড়ি ভাগ করে নিলেই চলবে। এইভাবে আমরা সেদিনের মতো ফিরে এলুম। কিন্তু জাহাজের কুসংস্কার-ভীত নাবিক আর যাত্রীদের বিরুদ্ধতায় সে-যাত্রায় আর কোনও-সুযোগ পাওয়া গেল না। তাই বিলাতে এসে আবার নতুন জাহাজ নিয়ে অদৃশ্য নাবিকদের খুঁজতে যাবার অছিলায় আমরা সেই দ্বীপে যাত্রা

করবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম! ইতিমধ্যে যে উপায়েই হোক আর এক ব্যক্তি আমাদের গুপ্তকথা জানতে পারলে। খুব সম্ভব, এ ব্যক্তিও বোহিমিয়া জাহাজের কোনও নাবিক বা যাত্রী। হয়তো জাহাজে বসে আমরা কোনওদিন যখন পরামর্শ করছিলুম, আড়াল থেকে সে কিছু-কিছু শুনতে পেয়েছিল। এখন তার প্রধান কাজ কী হবে? তার পথ থেকে জন্মের মতো আমাদের তিনজনকে সরিয়ে দেওয়া নয় কি?'

কুমার খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'বিমল, তুমি মনে মনে যে কল্পনা করেছ, তার ভিতরে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় বটে! তবু বলতে হবে, এ তো কল্পনা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু স্বাভাবিক কল্পনা। আসল ব্যাপারের সঙ্গে আমার কল্পনা হয়তো হুবহু মিলবে না, কিন্তু আমার হাতে যদি সময় থাকত তা হলে নিশ্চয়ই প্রমাণিত করতে পারতুম যে, এই কল্পনার মধ্যে অনেকখানি সত্যই আছে।.....কিন্তু আমি গোয়েন্দাগিরি করতে বিলাতে আসিনি, এসব ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। হ্যাঁ, ভালো কথা। আজকেও দ্বীপে যাবার জন্যে 'বোহিমিয়া'র কোনও নাবিক আমাদের বিজ্ঞাপনের আহ্বানে উত্তর দেয়নি?'

কুমার মাথা নেড়ে জানালে, না।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, তাহলে তোমার মতে, 'বোহিমিয়ার কোনও লোকই এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী?'

বিমল বললে, 'হতেও পারে, না হতেও পারে। সবই আমার অনুমান। আর এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এটাও ঠিক জানবেন যে, সে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না।'

—'কেন?'

—'তার পথ থেকে সব কাঁটা সরে গেছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন, সেই দ্বীপে যাওয়া। কিন্তু সে দ্বীপে জাহাজ লাগে না। সুতরাং আমাদের জাহাজ সেখানে যাচ্ছে শুনলে সে কখনও এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না।'

এমন সময়ে রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, 'খোকাবাবু, একটা সায়েব তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সায়েব বটে, কিন্তু রং খুব ফরসা নয়!'

—'তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

একটু পরেই যে-লোকটি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল, সত্যসত্যই তার গায়ের রং শ্যামল। লোকটি মাথায় লম্বা নয় বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহ অসাধারণ— এত চওড়া লোক অসম্ভব বললেও চলে। দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে অসুরের শক্তি আছে। লোকটির মাথায় একগাছা চুলও নেই, ছোটো ছোটো তীক্ষ্ণ চোখ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপরে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ।

ঘরে ঢুকেই সে বললে, 'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে এসেছি।'

বিমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি সেই অজানাদ্বীপে যেতে চান?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনার নাম?'

—'বার্তোলোমিও গোমেজ। আমি এস. এস. বোহিমিয়ার কোয়ার্টার মাস্টারের কাজ করতুম।'

বিমল, কুমার ও বিনয়বাবুর দৃষ্টি চমকে উঠল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনাহূত অতিথি

বোহিমিয়া জাহাজের 'কোয়ার্টার মাস্টার' বার্তোলোমিও গোমেজ! বিমলদের সঙ্গে সেই অজানা দ্বীপে যেতে চায়!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ এইরকম একটি লোকের জন্যেই বিমলরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে। এবং এইরকম একটি লোক না পেলে তাদের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হবারই কথা!

কিন্তু বিমল যে-সময়ে বলছিল যে, বোহিমিয়ার তিনটি লোকের মৃত্যুর জন্যে ওই জাহাজেরই কোনও লোক দায়ী এবং হত্যাকারী তাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না, ঠিক সেই সময়েই গোমেজের অভাবিত আবির্ভাবে তাদের পক্ষে না চমকে থাকা অসম্ভব! এমনকী শয্যাশায়ী কমলও 'রাগে'র ভিতর থেকে মুখ বার করে গোমেজকে একবার ভালো করে দেখে নিলে। সে এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বিমলের মতামত শ্রবণ করছিল।

সে-চমকানি গোমেজের চোখেও পড়ল। সে দুই ভুরু কুঁচকে একে একে সকলের মুখের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিপাত করলে। তারপর বললে, 'আমাকে দেখে আপনারা বিস্মিত হলেন নাকি?'

বিমল তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ মিঃ গোমেজ, আমরা একটু বিস্মিত হয়েছি বটে! আপনার নামটি হচ্ছে পর্তুগিজ, কিন্তু আপনার গায়ের রং আমাদের চেয়ে ফর্সা নয়! এটা আমরা আশা করিনি!'

তখন গোমেজের বাঁকা ভুরু আবার সোজা হল। সে হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'ওঃ, এইজন্যে? কিন্তু আমারও জন্ম যে ভারতবর্ষেই! আমি আগে গোয়ায় বাস করতুম।'

—'বটে, বটে? তাহলে আপনি তো আমাদের ঘরের লোক! আরে, এত কথা কি আমরা জানি? বসুন মিঃ গোমেজ, বসুন! এক পিয়ালা চা পান করবেন কি?'

—'না, ধন্যবাদ! আমার হাতে আজ বেশি সময় নেই। আমি একেবারেই কাজের কথা পাড়তে চাই! আপনারা আটলান্টিক মহাসাগরের সেই নির্জন দ্বীপে যেতে চান কেন?'

—'কোথাও কোনও বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পেলে আমরা সেখানে না গিয়ে পারি না। এটা আমাদের অনেকদিনের বদ-অভ্যাস। এই বদঅভ্যাসের জন্যে আমরা একবার মঙ্গল গ্রহেও না গিয়ে পারিনি।'

—'কী বললেন? কোথায়?'

—'মার্স-এ!'

গোমেজ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললে, 'মার্স-এ? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নাকি?'

—'মোটেই নয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আমরা সত্যসত্যই মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলুম। সে কাহিনী পৃথিবীর সব দেশের খবরের কাগজেই বেরিয়েছিল। আপনি কি পড়েননি?'*

—'না। আমরা নাবিক মানুষ, জলের জগতেই আমাদের দিন কেটে যায়, খবরের কাগজের ধার ধারি না। বিশেষ ১৯১৪ হচ্ছে মহাযুদ্ধের বৎসর, তখন যুদ্ধের হই-চই নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলুম।'

—'আচ্ছা, আমাদের কাছে পুরানো খবরের কাগজগুলো এখনও আছে, আপনাকে পড়তে দেব অখন।'

—'দেখছি, আপনারা হচ্ছেন আশ্চর্য, অসাধারণ মানুষ!....তাহলে আপনাদের বিশ্বাস, ওই অজানা দ্বীপে কোনও বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে?'

গোমেজের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে কুমার বললে, 'মিঃ গোমেজ, আপনিও কি বিশ্বাস করেন না যে, সেই দ্বীপে কোনও অদ্ভুত রহস্য আছে?'

গোমেজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'অদ্ভুত রহস্য বলতে আপনারা কী বোঝেন, বলতে পারি না। রহস্য মাত্রই অদ্ভুত নয়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আটলান্টিকের মাঝখানে হঠাৎ ওই দ্বীপের আবির্ভাব কি অদ্ভুত নয়?'

—'মোটেই নয়। আটলান্টিকের মাঝখানে এর আগেও ওই-রকম জলমগ্ন দ্বীপ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। আটলান্টিক ঠান্ডা শান্ত সমুদ্র নয়। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন, আটলান্টিকের পেটের ভিতরে এত ওলট-পালট হচ্ছে যে, যখন-তখন সে ছোটো ছোটো অজানা দ্বীপের জন্ম দিতে পারে।'

—'কিন্তু সেই জনহীন দ্বীপে রাত্রে আলো নিয়ে কারা চলা-ফেরা করছিল?'

—'আমার বিশ্বাস, চোখের ভ্রমেই আমরা আলো দেখেছিলুম।'

—'আপনাদের আটজন নাবিক সেই দ্বীপ থেকে কোথায় অদৃশ্য হল?'

—'কে বলতে পারে যে, তারা কোনও গুপ্ত গহ্বরে পড়ে যায়নি?'

—'সেই দ্বীপে আপনারা অনেক বিরাট প্রস্তরমূর্তি দেখেননি?'

—'দেখেছি। দ্বীপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কেবল সেই মূর্তিগুলোই। তাছাড়া সেখানে দেখবার আর কিছুই নেই। এমনকী একফোঁটা জল পর্যন্ত নেই! সেখানে দু-চারদিনের বেশি বাস করাও সম্ভব নয়!'

—'মিঃ গোমেজ, তাহলে আপনি কি আমাদের সেখানে যেতে মানা করছেন?'

গোমেজ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না,! যেতে আমি কারুকেই মানা করছি না! তবে আমার কথা হচ্ছে, দ্বীপে গিয়ে আপনারা কোনও অদ্ভুত রহস্য দেখবার আশা করবেন না।'

বিমল বললে, 'মিঃ গোমেজ, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বলছেন, দ্বীপে কোনও রহস্য নেই। তবে মর্টন, মরিস আর ম্যাকলিয়ড সাহেব আবার সেই দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কেন?'

---

* মৎপ্রণীত 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে বিমল ও কুমার প্রভৃতির মঙ্গল-গ্রহে যাত্রার আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

সচকিত কণ্ঠে গোমেজ বললে, 'তাই নাকি? কেমন করে জানলেন আপনি?'

—'যেমন করেই হোক, আমি জেনেছি!'

—'কিন্তু আমি জানি না। হয়তো তাঁরা সেই নিরুদ্দেশ নাবিকদের খোঁজেই আবার সেখানে যাচ্ছিলেন।'

—'হতেই পারে মিঃ গোমেজ, হয়তো এটাও আপনার জানা নেই যে, পাছে তাঁরা আবার সেই দ্বীপে যান সেই ভয়ে কেউ তাঁদের খুন করেছে!'

গোমেজ চমকে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি কী বলছেন? সবাই তো জানে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ব্ল্যাক স্নেকের কামড়ে!'

—'হ্যাঁ, ভারতীয় ব্ল্যাক স্নেক! কিন্তু মিঃ গোমেজ, লন্ডনে হঠাৎ এত বেশি ব্ল্যাক স্নেক কেমন করে এল? যদি ধরা যায়, আপনার মতো কোনও ভারতবাসী বিলাতে শখ করে ব্ল্যাক স্নেক নিয়ে এসেছে, তা হলে বরং—'

বিমলকে বাধা দিয়ে গোমেজ সামনের কাঁচা-ঢাকা টেবিলের উপরে জোরে চড় মেরে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, 'মশাই, আমি সাপুড়ে নই! আমি সঙ্গে করে আনব ভারতের সর্বনেশে ব্ল্যাক স্নেক? উঃ, অদ্ভুত কল্পনা!'

বিমল সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'না, না মিঃ গোমেজ! আমি আপনাকে কথার কথা বলছিলুম মাত্র, আপনার উপরে কোনওরকম অভদ্র ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়!'

গোমেজ শান্ত হয়ে বললে, 'দেখুন, পুলিশ কীরকম গাধা জানেন তো? অনুগ্রহ করে এ-রকম কথা আর মুখেও আনবেন না! পুলিশ যদি একবার এই কথা শোনে, তাহলে অকারণেই আমার প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ করে ছাড়বে! ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এখন কাজের কথা বলুন! আপনারা কবে সেই দ্বীপে যাত্রা করবেন?'

—'আমরা তো প্রস্তুত। এতদিন কেবল বোহিমিয়ার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নাবিকের জন্যেই অপেক্ষা করে বসেছিলুম। এখন আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন যে-কোনওদিন যেতে পারি!'

—'আমার কাছ থেকে আপনারা কী সাহায্যের প্রত্যাশা করেন?'

—'প্রথমত, আপনি দ্বীপের সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই সব কথা প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের জাহাজের পথপ্রদর্শক হবেন আপনি। তৃতীয়ত, গেল-বারে দ্বীপের যে যে জায়গায় গিয়ে আপনারা নাবিকদের খোঁজ করেছিলেন আপনাকে সেসব জায়গা আবার আমাদের দেখাতে হবে। বিশেষ করে দেখতে চাই আমি দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরটা।'

—'কিন্তু সেখানটা তো আমি নিজেই দেখিনি। সেখানে উঠেছিলেন খালি মিঃ মর্টন, মিঃ মরিস আর মিঃ ম্যাকলিয়ড।

—'হুঁ। আর সেইজন্যেই হতভাগ্যদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে! এ কথা পুলিশ জানে না, কিন্তু তাঁদের হত্যাকারী জানে, আর আমিও জানি!'

গোমেজ অবাক বিস্ময়ে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বললে, 'আপনার প্রত্যেক কথাই সেই দ্বীপের চেয়েও রহস্যময়।'

বিমল যেন আপন মনেই বললে, 'দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরে গিয়ে উঠলেই সকল রহস্যের কিনারা হবে!'

গোমেজ হাসতে হাসতে বললে, 'যদিও আমি সেখানে উঠিনি, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে উঠে আপনি পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না! হতচ্ছাড়া সেই পাহাড়ে দ্বীপ! একটা জীব, একটা গাছ, একগাছা ঘাস পর্যন্ত সেখানে নেই! সমুদ্রের নীল গায়ে হঠাৎ যেন একটা কালো ফোড়ার মতো সে গজিয়ে উঠেছে! হ্যাঁ, আর একটা অনুমানও মন থেকে মোছবার চেষ্টা করুন। আমার সঙ্গীদের মৃত্যুর সঙ্গে সেই দ্বীপের বা কোনও মানুষ-হত্যাকারীর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, তাঁরা মারা পড়েছেন দৈব-গতিকে, ব্ল্যাক স্নেকের দংশনে!'

—'ও কথায় আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিশ্বাস অন্যরকম।'

এমন সময়ে ল্যাজ দুলিয়ে বাঘার প্রবেশ। গম্ভীরভাবে এগিয়ে এসে গোমেজের পদযুগল বার-কয়েক শুঁকে যে কী পরীক্ষা করলে তা কেবল সেই-ই জানে!

গোমেজ বললে, 'ভারতের ব্ল্যাক স্নেক বিলাতে এসেছে বলে সবাই অবাক হচ্ছে, কিন্তু ভারতের দেশি কুকুরের বিলাত-দর্শনটাও কম আশ্চর্য নয়! আচ্ছা তাহলে উঠতে হয়! আপনাদের সঙ্গে আমার যাওয়ার কথাটা পাকা হয়ে রইল তো?'

—'নিশ্চয়! কাল সকালে অনুগ্রহ করে এসে নিয়োগ-পত্র নিয়ে যাবেন। আজ আমি বড়ো শ্রান্ত।'

—'উত্তম। নমস্কার।'

—'নমস্কার!'

গোমেজ প্রস্থান করল। বিমল একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে দুই চোখ মুদলে।

কুমার বললে, 'কী হে, তুমি এখনই ঘুমোবে নাকি?'

—'না, এখন আমি ভাবব।'

—'কী ভাববে?'

—'অতঃপর আমার কী করা উচিত? আগে এই হত্যারহস্যের কিনারা করব, না আগে দ্বীপের দিকে যাত্রা করব?'

কুমার বললে, 'হত্যারহস্যের কিনারা করার জন্যে রয়েছে বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শত শত ধূর্ত লোক, তা নিয়ে তুমি-আমি ভেবে মরব কেন?'

বিমল বললে, 'ভেবে মরব কেন? তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি যে, হত্যারহস্য আর দ্বীপরহস্য— এ দুটোই হচ্ছে একখানা ঢালের এ-পিঠে আর ও-পিঠে?'

কুমার একখানা চেয়ার টেনে টেবিলের কাছে বসতে গেল, বিমল হঠাৎ চোখ খুলে ব্যস্ত স্বরে বললে, 'তফাত যাও! আজ তোমরা কেউ এদিকে এসো না!

কুমার হতভম্বের মতো বললে, 'এদিকে আসব না? কেন?'

বিমল বিরক্তকণ্ঠে বললে, 'কথায় কথায় জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই!....তারপর আরও শোনো। বাঘা আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে এই ঘরেই থাকবে। আজ যা শীত পড়েছে, বাইরে থাকলে পর ওর কষ্ট হবে।'

লন্ডনের শীতার্ত রাত্রি। পথে জনপ্রাণী পদশব্দ পর্যন্ত নেই— বাতাসও যেন শ্বাস রুদ্ধ করে আড়ষ্ট হয়ে আছে। চারিদিকে ঝর ঝর ঝর ঝর করে যেন তুষারের লাজাঞ্জলি বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার আঁলোগুলোর চোখ ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে— দপ করে যেন নিবে যেতে পারলেই তারা বাঁচে।

গম্ভীর স্তব্ধতার অন্তরাত্মার মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মেরে মেরে 'বিগ বেন' ঘড়ি তার প্রচণ্ড কণ্ঠে তিনবার চিৎকার করে উঠল— ঢং! ঢং! ঢং!

হোটেলে বিমলদের ঘরে এখন প্রধান অতিথি হয়েছে নিরন্ধ্র অন্ধকার। কয়েকটি নিশ্চিন্ত নিদ্রিত প্রাণীর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া সেখানেও আর জীবনের কোনও লক্ষণই নেই, জীবনের সাড়া দেবার চেষ্টা করছে কেবল একটি জড় পদার্থ! টেবিলের ঘড়িটার কোনও ক্লান্তি নেই, নীরবতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে— টিক টিক, টিক টিক, টিক টিক, টিক টিক!

আচম্বিতে আর-একটা শব্দ শোনা গেল। খুব আস্তে আস্তে যেন কোনও জানলার একটা শার্সি খুলে যাচ্ছে! জানলার কাছে অন্ধকারের ভিতরে যেন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে! কেমন একটা খুট খুট শব্দ হচ্ছে!

সে-শব্দ এত-মৃদু যে কোনও ঘুমন্ত মানুষের কানই তা শুনতে পেলে না।

কিন্তু শুনতে পেলে বাঘার কান! হঠাৎ যে গরর গরর করে গর্জে উঠল!

ডান হাতে রিভলভার তুলে বিমল দেখলে, জানলার কাছে শার্সির উপরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট মূর্তি! প্রকাণ্ড ওভারকোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা এবং তার মুখখানাও অদৃশ্য এক কালো মুখোশের আড়ালে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রৌপ্যসর্পমুখ

আকস্মিক বৈদ্যুতিক আলোকের তীব্র প্রবাহে অন্ধ হয়ে মূর্তিটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল— ক্ষণিকের জন্যে। পরমুহূর্তেই জানলার ধার থেকে এক লাফ মেরে সে আলোকরেখার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল তাড়াতাড়ি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার তীক্ষ্ণ চক্ষু বাইরে শীতার্ত অন্ধকারের ভিতর থেকে কোনও দ্রষ্টব্যই আবিষ্কার করতে পারলে না।

ততক্ষণে বাঘার ঘন ঘন উচ্চ চিৎকারে ঘরের আর সকলের ঘুম ভেঙে গেছে।

কুমার বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ব্যাপার কী বিমল?'

বিমল হেসে বললে, 'এমন কিছু নয়। সেই 'ব্ল্যাক স্নেকের' সাপুড়ে আজ আমাদের সঙ্গে গোপনে আলাপ করতে এসেছিল!'

—'বলো কী! কী করে জানলে তুমি?'

—'সে যে আসবে, আমি তা জানতুম। দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শিখরে যে একটা বৃহৎ গুপ্তরহস্য আছে, এটা আমরা টের পেয়েছি। কাজেই 'ব্ল্যাক স্নেকের' অধিকারী যে এখন আমাদের জীবনপ্রদীপের শিখা নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। দুঃখের বিষয় এই যে, তাকে আজ ধরতে পারলুম না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু তার চেহারা দেখেছ?'

—'দেখেছি বটে, তবে তাকে আবার দেখলে চিনতে পারব না। কারণ সে ঘোমটা দিয়ে এসেছিল।'

—'ঘোমটা দিয়ে?'

—'অর্থাৎ মুখোশ পরে। কিন্তু সে তার একটি চিহ্ন পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে।'

—'কী চিহ্ন?'

জানলার শার্সি টেনে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, 'শার্সির এইখানে সে হাত রেখেছিল। কাচের উপরে তার ডান হাতের আঙুলের ছাপ আছে। জানেন তো বিনয়বাবু, কোনও দুজন লোকের আঙুলের ছাপ একরকম হয় না?'

—'জানি। পুলিশও তাই সমস্ত অপরাধীর আঙুলের ছাপ জমা করে রাখে।'

—'কুমার, খানিকটা 'গ্রে পাউডার' আর আঙুলের ছাপ তোলবার অন্যান্য সরঞ্জাম এনে দাও তো।'

কুমার বললে, 'আসামি যখন পলাতক, তখন আঙুলের ছাপ নিয়ে আমাদের কী লাভ হবে?'

—'অন্তত এ ছাপটা 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে' পাঠিয়ে দিলে জানা যাবে যে, 'ব্ল্যাক স্নেকে'র অধিকারী পুরাতন পাপী কি না! পুরাতন পাপী হলে—অর্থাৎ পুলিশের কাছে তার আঙুলের আর-একটা ছাপ পাওয়া গেলে তাকে খুব সহজেই ধরে ফেলা যাবে!'

—'কিন্তু আজ এখানে যে এসেছিল, সে যদি অন্য লোক হয়? হয়তো 'ব্ল্যাক স্নেকে'র সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই—সে একটা সাধারণ চোর মাত্র!'

—'কুমার, তোমার এ অনুমানও সত্য হতে পারে। তবু দেখাই যাক না! জিনিসগুলো এনে দিয়ে আপাতত তোমরা আবার লেপ মুড়ি দিয়ে স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা করো-গে যাও!'

পরদিন সকালে বিনয়বাবুকে নিয়ে কুমার ও কমল যখন বেড়াতে বেরুল, বিমল তাদের সঙ্গে গেল না; সে তখন সেই আঙুলের ছাপের ফটোগ্রাফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে তারা আবার হোটেলে ফিরে এসে দেখলে, ঘরের মাঝখানে বড়ো টেবিলটার ধারে বিমল চুপ করে বসে বসে কী ভাবছে।

কুমার সুধোলে, 'কী হে, আঙুলের ছাপের ফোটো তোলা শেষ হল?'

—'হুঁ। এখানে এসে এই ছবিখানি একবার মিলিয়ে দ্যাখো দেখি।'

কুমার এগিয়ে এসে দেখলে, টেবিলের উপর পাশাপাশি দুখানা ফোটো পড়ে রয়েছে। খানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা করে সে বললে, 'এ তো দেখছি একই আঙুলের দু-রকম দুখানা

ছবি। একখানা ছবি না-হয় তুমিই তুলেছ, কিন্তু আর একখানা ছবি কোথায় পেলে? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আনলে নাকি?'

—'না, দুখানা ছবিই আমার তোলা। এখন বলো দেখি, এই দুটো ছাপের রেখা অবিকল মিলে যাচ্ছে কি না?'

—'হ্যাঁ, অবিকল মিলে যাচ্ছে বটে!'

অত্যন্ত উৎফুল্ল মুখে ছবিখানা পকেটে পুরে বিমল বললে, 'কুমার, কাল সকালেই খবরের কাগজে দেখবে, 'ব্ল্যাক স্নেকে'র অধিকারী গ্রেপ্তার হয়েছে!'

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে 'সে কী হে! তোমার এতটা নিশ্চিত হবার কারণ কী? আঙুলের ছাপই না-হয় পেয়েছ, কিন্তু ওতে তো আর কারুর নাম লেখা নেই!'

বিমল কান পেতে কী শুনলে, তারপর চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসে বললে, 'ওসব কথা পরে হবে অখন! সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে, বোধহয় মিঃ গোমেজ নিয়োগ পত্র নিতে আসছেন! আগে তাঁর মামলা শেষ করে ফেলা যাক—কী বলো?'

গোমেজ ঘরের ভিতরে আসতেই বিমল উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, 'গুড মর্নিং মিঃ গোমেজ, গুড মর্নিং! আমরা আপনারই অপেক্ষায় বসেছিলুম।'

গোমেজ বললে, 'আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু শুনলুম, কাল নাকি আপনাদের ঘরে চোর ঢুকেছিল?'

—'এখনই এ-খবরটা কে আপনাকে দিলে?'

—'আপনাদের ভৃত্য!'

—'ও, রামহরি? হ্যাঁ, কাল রাত্রে একটা লোক এই ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল বটে! কিন্তু আমি জেগে আছি দেখে পালিয়ে গেছে।'

—'বাস্তবিক, আজকাল লন্ডন শহর বড়োই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। চারিদিকে দিন-রাত চোর-ডাকাত-হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে! সবাই বলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশবাহিনীর মতো কর্মী দল পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু আমি এ-কথায় বিশ্বাস করি না। শহরের এত-বড়ো রাস্তার উপরে আপনাদের এই বিখ্যাত হোটেল, অথচ বিলাতি পুলিশ সেখানেও চোরের আনাগোনা বন্ধ করতে পারে না! লজ্জাকর!'

বিনয়বাবু বললেন, 'মিঃ গোমেজ, আমিও আপনার মতে সায় দিই। দেখুন না, 'ব্ল্যাক স্নেকে'র এই অদ্ভুত রহস্যের কোনও কিনারাই এখনও হল না!'

গোমেজ বললে, 'কিন্তু ও-জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে বেশি দোষ দিই না। ও রহস্যের কিনারা হওয়া অসম্ভব!'

বিমল বললে, 'কেন?'

—'জানেন তো, সমুদ্রে আমাদের মতন যারা নাবিকের কাজ করে, তাদের এমন সব সংস্কার থাকে সাধারণের মতে যা কুসংস্কার! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, 'ব্ল্যাক স্নেক'-রহস্যের মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তি কাজ করছে। অলৌকিক শক্তির সামনে পুলিশ কী করবে।'

বিমল হাসত হাসতে বললে, 'কিন্তু এই 'ব্ল্যাক স্নেকে'র রহস্যের সঙ্গে যে-শক্তির সম্পর্ক আছে, তাকে আমি অনায়াসেই দমন করতে পারি।'

—'পারেন? কী করে?'

—'আমার এই একটি মাত্র ঘুষির জোরে!'—বলেই বিমল আচম্বিতে গোমেজের মুখের উপরে এমন প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলে যে, সে তখনই ঘুরে দড়াম করে মাটির উপরে পড়ে গেল! পরমুহূর্তেই সে গোমেজের দেহের উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে, 'কুমার! কমল! শিগগির খানিকটা দড়ি আনো!'

বিনয়বাবু হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, 'বিমল, বিমল! তুমি কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে? মিঃ গোমেজকে খামোকা ঘুষি মারলে কেন?'

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, 'আরে মশাই, আগে দড়ি এনে গোমেজ-বাবাজিকে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলুন, তারপর অন্য কথা!'

কুমার ও কমল যখন দড়ি এনে গোমেজের হাত-পা বাঁধতে নিযুক্ত হল, বিনয়বাবু তখন বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন—'এ বড়োই অন্যায়, এ বড়োই অন্যায়!'

বিমল গোমেজকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কুমার হতভম্বের মতো বললে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

বিমল বললে, 'কাল রাত্রে এই গোমেজই মুখোশ পরে আমাদের ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল!'

ততক্ষণে গোমেজের আচ্ছন্ন-ভাবটা কেটে গিয়েছে। সে একবার ওঠবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা!'

বিমল বললে, 'মিথ্যা কথা নয়। আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

—'কী প্রমাণ?'

বিমল হাসিমুখে বললে, 'বাপু গোমেজ, মনে আছে, কাল যখন আমি বলেছিলুম—'হয়তো তুমিই ভারতীয় 'ব্ল্যাক স্নেক'কে বিলাতে নিয়ে এসেছ, তুমি মহা খাপ্পা হয়ে এই কাচ-ঢাকা টেবিলের উপরে চড় বসিয়ে দিয়েছিলে? কাচের আর পালিস-করা জিনিসের উপরে চড় মারলেই আঙুলের ছাপ পড়ে জানো তো? আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলুম, লন্ডনে যে-ব্যক্তি খুশিমতো 'ব্ল্যাক স্নেক' খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর না দিয়ে পারবে না। এই সন্দেহের কারণ উপস্থিত বন্ধুদের কাছে আগেই বলেছি। বিজ্ঞাপনের ফলে দেখা দিয়েছ তুমি। তাই তোমাকেও আমি সন্দেহ করেছি। কাজেই টেবিলের কাচের উপর থেকে তোমার আঙুলের ছাপের ফটো আমি তুলে রেখেছি। এই দ্যাখো, তোমার সেই আঙুলের ছাপের ফটো! তারপর কাল গভীর রাতে এই ঘরে ঢুকতে এসে তুমি আবার বোকার মতো জানলার শার্সিতে হাত রেখেছিলে—আর, তোমার মরণ হয়েছে সেইখানেই। কারণ শার্সির উপরেও যে আঙুলের ছাপ পেয়েছি তার ফোটোর সঙ্গে আগেকার ফোটো মিলিয়েই আমি তোমাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি—বুঝলে? বোকারাম, এখনও নিজের দোষ স্বীকার করো।'

বিনয়বাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'বিমল, তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি!'

কুমার বললে, 'গোয়েন্দাগিরিতেও যে বিমলের মাথা এত খেলে, আমিও তা জানতুম না!'

কমল এমনভাবে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, যেন সে চোখের সামনে কোনও মহামানবকে নিরীক্ষণ করছে!

এতক্ষণে গোমেজ নিজেকে সামলে নিলে। শুকনো হাসি হেসে মনের ভাব লুকিয়ে সে সংযত স্বরে বললে, 'তোমাদের ওসব তুচ্ছ প্রমাণের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমি এখন কোনও কথা বলতে চাই না। কিন্তু দেখছি, তোমাদের মতে আমিই হচ্ছি 'ব্ল্যাক স্নেকের' মালিক! অর্থাৎ আমিই তিন-তিনটে মানুষ খুন করেছি?'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমার তো তাই বিশ্বাস। অন্তত ওই তিনটে খুনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।'

—'প্রমাণ? বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে এসেছি, এ প্রমাণ দেখে তো বিচারক আমার ফাঁসির হুকুম দেবেন না! আদালতে এটা প্রমাণ বলেই গ্রাহ্য হবে না!'

—'ওহো, গোমেজ! তুমি এখনও ল্যাজে খেলছ? তুমি জেনে নিতে চাও, তোমার বিরুদ্ধে আমরা কী কী প্রমাণ সংগ্রহ করেছি? আচ্ছা, সেসব যথাসময়ে জানতে পারবে! এখন প্রথমে আমি তোমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করব। তারপর তোমার বাসা খানা-তল্লাসের ব্যবস্থা করব।'

—'কেন?'

—'সেখানে আরও কতগুলো 'ব্ল্যাক স্নেক' আছে তা দেখবার জন্যে।'

গোমেজ অট্টহাস্য করে বললে, 'ওহে অতি-বুদ্ধিবান বাঙালি বাবু! আমার বাসা থেকে তুমি যদি আধখানা 'ব্ল্যাক স্নেক'ও খুঁজে বার করতে পারো, তা হলে আমি হাজার টাকা বাজি হারব!'

বিমল গোমেজের দেহের দিকে এগিয়ে বললে, 'কিন্তু তার আগে আমি তোমার জামার পকেটগুলো হাতড়ে দেখতে চাই।'

—'কেন? তুমি কি মনে করো, আমার জামার পকেটগুলো হচ্ছে 'ব্ল্যাক স্নেকে'র বাসা?'

বিমল কোনও জবাব না দিয়ে গোমেজের দেহের দিকে হেঁট হল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গোমেজ হঠাৎ তার বাঁধা পা-দুখানা তুলে বিমলের বুকের উপরে জোড়া-পায়ে বিষম এক লাথি বসিয়ে দিলে! বিমল এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে একেবারে চার পাঁচ হাত দূরে ঠিকরে গিয়ে ভূতলশায়ী হল।

তারপরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, গোমেজের পায়ের বাঁধন কেমন করে খুলে গেল এবং হাত-বাঁধা অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বেগে দরজার দিকে ছুটল!

কিন্তু দরজার কাছে গম্ভীর মুখে বসেছিল বাঘা! সে হঠাৎ গোমেজের কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে মস্ত এক লাফ মারলে!

গোমেজ একপাশে স্যাঁৎ করে সরে গিয়ে বাঘার লক্ষ্য ব্যর্থ করলে বটে, কিন্তু বাঘা মাটিতে পড়েই বিদ্যুৎগতিতে ফিরে তার একখানা পা প্রাণপণে কামড়ে ধরলে এবং কুমার, কমল ও বিনয়বাবু সময় পেয়ে আবার তাকে ধরে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে!

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে,-'শাবাশ গোমেজ! ঘরে আমরা এতগুলো মদ্দ রয়েছি, আর তোমার হাত-পা বাঁধা! তবু তুমি আমাকে কুপোকাত করতে পেরেছ! তোকেও

বাহাদুরি দিই বাঘা! তুই না থাকলে তো এতক্ষণে আমাদের মণিহারা ফণীর মতো ছুটোছুটি করতে হত! বাঁধো কুমার, গোমেজকে এবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফ্যালো!

গোমেজ রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'থাকত যদি হাতদুটো খোলা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু সে দুঃখ করে আর কোনওই লাভ নেই! এখন আর বেশি ছটফট কোরো না! পকেটগুলো দেখাতে তোমার এত আপত্তি কেন? এটা তো দেখছি, রিভলভার। তুমি তাহলে সর্বদাই রিভলভার নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও? আইনে এটা যে সাধুতার লক্ষণ নয়, তা জানো তো? এটা বোধহয় ডায়ারি? হুঁ, পাতায় পাতায় অনেক কথাই লেখা রয়েছে। হয়তো পরে আমাদের কাজে লাগতে পারে—কুমার, ডায়ারিখানা আপাতত তোমার জিম্মায় থাক! এটা কী? কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স! কিন্তু বাক্সটা এত ভারী কেন?'

গোমেজের মুখ সাদা হয়ে গেছে—ভয়ে কী যাতনায় বোঝা গেল না! সে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'ও কিছু নয়! ওতে একটা খেলনা ছাড়া আর কিছু নেই!'

বিমল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'খেলনা? হুঁ, শয়তানের খেলনা হচ্ছে মানুষের প্রাণ, বিড়ালের খেলনা হচ্ছে ইঁদুর! তোমারও খেলনা আছে শুনে ভয় হচ্ছে। দেখা যাক এ আবার কীরকম খেলনা!'

বিমল খুব সাবধানে একটু একটু করে বাক্সের ডালাটা খুললে—কিন্তু তার ভিতর থেকে ভয়াবহ কিছুই বেরুল না। খানিকটা তুলোর মাঝখানে রয়েছে একটা রূপোর জিনিস। সেটাকে বার করে তুলে ধরলে।

গোমেজ বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না, এখন দেখছ তো ওটা একটা খেলনা, আমার এক বন্ধুর মেয়েকে উপহার দেব বলে কিনেছি!'

কুমার জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'রুপো-দিয়ে গড়া একটা সাপের মুখ!'

রুপোয় তৈরি সেই নিখুঁত সর্পমুখের দিকে সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বিমল বললে, 'কুমার গোমেজের এই অদ্ভুত খেলনা দেখে সত্যিই আমার ভয় হচ্ছে! এটা জ্যান্ত নয়, মরা সাপও নয়, কিন্তু এমন জিনিস গোমেজের পকেটে কেন? এটা কোনও অমঙ্গলের নিদর্শন? অনেক ভারতবাসীর মতন গোমেজও কি সাপ-পুজো করে?'

গোমেজ হঠাৎ হা হা করে বিশ্রী হাসি হেসে বলে উঠল, 'না, হিন্দুদের মতন আমি সাপ-পুজো করি না—ওটা হচ্ছে খেলনা, আর আমি হচ্ছি ক্রিশ্চান!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সব কাকেরই এক ডাক

বিমল জানলার কাছে গিয়ে বাইরের আলোতে অনেকক্ষণ ধরে সেই রুপোর সাপের মুখটা উলটে-পালটে পরীক্ষা করলে। এ-রকম অদ্ভুত জিনিস সে আর কখনও দেখেনি।

এটা গড়েছে কোনও অসাধারণ কারিগর। মুখটা অবিকল একটা প্রমাণ কেউটে সাপের মতন দেখতে।

পরীক্ষা শেষ হলে পর বিমল ফিরে ডাকলে, 'বিনয়বাবু, আপনারা এদিকে আসুন।'

সকলে গেলে পরে বিমল বললে, 'এটা কেবল সাপের মুখ নয়, এটা একটা যন্ত্রও বটে!'

—'যন্ত্র?'

—'হুঁ। এই দেখুন, কল টিপলে সাপের মুখটাও হাঁ করে!'

বিমল কল টিপলে, মুখটাও অমনি জ্যান্ত সাপের মতই ফস করে হাঁ করলে!

বিনয়বাবু চমৎকৃত স্বরে বললেন, 'ওর মুখের ভিতরে যে দাঁতও রয়েছে!'

—'হ্যাঁ, কাচের দাঁত। এমনকী বিষ-দাঁত পর্যন্ত বাদ যায়নি।...কুমার, টেবিলের উপর থেকে ওই 'পিন-কুশনটা নিয়ে এসো তো!'

কুমার সেটা নিয়ে এল। বিমল সাপের মুখটা 'পিন-কুশনের উপরে রেখে 'স্প্রিং' ছেড়ে দিতেই দাঁত দিয়ে সেই মুখটা 'কুশন' কামড়ে ধরলে!

'স্প্রিং' টিপে আবার মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিমল 'পিন-কুশনটা আঙ্গুল বুলিয়ে পরীক্ষা করে বললে, 'কুশনটা ভিজে গেছে। তার মানে সাপের মুখ থেকে খানিকটা জলীয় পদার্থ কুশনের উপরে গিয়ে পড়েছে!'

কুমার বললে, 'এই জলীয় পদার্থটি কী হতে পারে?'

বিমল ধীরে ধীরে গোমেজের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'গোমেজের দেহের উপরেই সে পরীক্ষা করা যাক!'

গোমেজের বাঁধা হাতের উপরে সাপের মুখ রেখে বিমল 'স্প্রিং'টা টিপতেই সদা-প্রস্তুত রৌপ্য-সর্প দন্তবিকাশ করলে!

—সঙ্গে সঙ্গে গোমেজের আশ্চর্য ভাবান্তর! সে কোনওরকমে হড়াৎ করে মেঝের উপরে খানিকটা তফাতে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'রক্ষা করো! রক্ষা করো!'

বিমল বললে, 'কেন গোমেজ? তোমার মতে এটা তো খেলনা মাত্র।—এর সঙ্গে তোমাকে খেলা করতেই হবে, নইলে কিছুতেই আমি ছাড়ব না!'

বিমল আবার এগিয়ে গেল, গোমেজ তেমনি করে আবার সরে গেল,—বিষম আতঙ্কে তার দুই চক্ষু ঠিকরে তখন কপালে উঠেছে!

বিমল হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ে বাঁ-হাতে গোমেজকে চেপে ধরে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'বলো তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? নইলে এই রুপোর সাপের কবল থেকে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাবে না!'

গোমেজ বিবর্ণ মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বিষ আছে! ওর ফাঁপা কাচের দাঁতে বিষ আছে।'

'কেউটে সাপের বিষ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেউটে সাপের বিষ। যখন সব ব্যাপারই বুঝতে পেরেছ তখন আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কুমার, 'ব্ল্যাক স্নেকে'র রহস্য এখন বুঝতে পারলে কি? এই সাংঘাতিক যন্ত্রটা একেবারে সাপের মুখের আকারে তৈরি করা হয়েছে—এমনকী এই কলের মুখটা কারুকে কামড়ালে ঠিক সাপে কামড়ানোর মতন দাগ পর্যন্ত হয়! এর ফাঁপা বিষ-দাঁতটা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতে বিষ ঢেলে দেয়! এই জন্যেই মর্টন, মরিস আর ম্যাকলিয়ড ইহলোক থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন।'

বিনয়বাবু বিস্ফারিত নেত্রে সর্পমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ভয়ানক!'

কুমার বললে, 'কিন্তু ঘটনাস্থলে একবার একটা সত্যিকার কেউটে সাপও তো পাওয়া গিয়েছে!'

বিমল শুষ্ক হাস্য করে বললে, 'হ্যাঁ, মরা সাপ! গোমেজ হয়তো তার নকল সাপের মুখের জন্যে আসল বিষ-দাঁত থেকে বিষ সংগ্রহ করেছিল। তারপর তাকে হত্যা করে ঘটনাস্থলে ফেলে গিয়েছিল, পুলিশের চোখে ধাঁধা দেবার জন্যে! আসল সাপ চোখে দেখলে আর নকল সাপের কথা সন্দেহ করবে না কেউ! কেমন গোমেজ, তাই নয় কি?'

গোমেজ রেগে কটমট করে বিমলের দিকে তাকালে, কিন্তু একটাও কথা কইলে না।

বিমল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গোমেজের পাশে গিয়ে বসল। তারপর বলল, 'চুপ করে থাকলে চলবে না। তোমার বক্তব্য কী, বলো।'

গোমেজ বললে, 'আমার কোনও বক্তব্য নেই। আমি কিছু বলব না।'

—'বলবে না? তাহলে তোমার সাপ তোমাকেই কামড়াবে।'

—'তুমি এখন জেনেছ যে, ওর মুখে বিষ আছে। ও সাপ এখন আমাকে কামড়ালে আমাকে হত্যা করার অপরাধে তুমিই ফাঁসিকাঠে ঝুলবে।'

—'বেশ, তাহলে তোমাকে পুলিশের হাতেই সমর্পণ করব। বিচারে তোমার কী হবে, বুঝতে পারছ তো?

গোমেজ হা হা করে হেসে বললে, 'বিচারে আইনের কূটতর্কে আমি খালাস পেলেও পেতে পারি। আমি এখনও অপরাধ স্বীকার করিনি। আমার বিরুদ্ধে কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। ওই রুপোর সাপের বিষেই যে তিনটে লোক মারা পড়েছে, এ-কথা কোনও আইনই জোর করে বলতে পারবে না!'

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'গোমেজ, তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি যে পাষণ্ড হত্যাকারী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আইনের কূটতর্কে তুমি খালাস পেলেও আমি বিস্মিত হব না। যদিও তোমার বিরুদ্ধে আমি যে মামলা খাড়া করেছি, তার ফলে তুমি ফাঁসিকাঠে মরবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তাতে আমার লাভ কী? আমি পুলিশের লোক নই, তোমাকে ধরিয়ে না দিলেও কেউ আমাকে কিছু বলতে পারে না। তবে জেনে-শুনেও তোমার মতন পাপীকে একেবারে ছেড়ে দেওয়াও অপরাধ। অতএব, তোমার সঙ্গে আমি একটা মাঝামাঝি রফা করতে চাই।'

—'কীরকম রফা শুনি?'

—'তুমি কারুকে খুন করেছ কি না সেটা জানবার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমরা কেবল এইটুকুই জানতে চাই, মর্টন, মরিস আর ম্যাকলিয়ড সেই অজ্ঞাত দ্বীপে গিয়ে কোন রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন? আর তাঁদের সেই আবিষ্কারের কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

গোমেজ উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সে দ্বীপে গিয়ে কেউ কোনও রহস্যের সন্ধান পায়নি। কোনও আবিষ্কারের কথা আমি জানি না। এসব তোমার বাজে কল্পনা!'

—'শোনো গোমেজ! যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও, তাহলে তোমার উপরে আমি এইটুকু দয়া করতে পারি—তোমার হাতপায়ের বাঁধন খুলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। তারপর এক মিনিট কাল অপেক্ষা করে 'ফোনে' তোমার কথা পুলিশকে জানাব। ইতিমধ্যে তুমি পারো তো যেখানে খুশি অদৃশ্য হয়ে যেয়ো, আমরা কেউ তোমাকে কোনও বাধা দেব না।'

—'আমি কিছু জানি না।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে, 'গোমেজ তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাও? আমার আপত্তি নেই। আমি এখনই তোমার কথা পুলিশকে জানাচ্ছি।' এই বলে সে টেলিফোনের দিকে অগ্রসর হল!

গোমেজ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো।'

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমাকে আবার ভোলাবার চেষ্টা করলেই আমি পুলিশ ডাকব, পুলিশ তোমার পেট থেকে কথা বার করবার অনেক উপায়ই জানে।'

—'আমার কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েও তুমি যদি আমাকে ছেড়ে না দাও?'

—'আমরা ভদ্রলোক। আমার কথায় এখন বিশ্বাস করা ছাড়া তোমার আর কোনও উপায় নেই।'

—'বেশ, তাহলে আমার অদৃষ্টকেই পরীক্ষা করা যাক। বাবু, এভাবে আমার কথা কওয়ার সুবিধা হবে না, আমাকে তুলে বসিয়ে দাও।'

কুমার তাকে তুলে বসিয়ে দিলে। গোমেজ বলতে লাগল—

'বাবু, আমার বলবার কথা বেশি নেই। তবে আমি যেটুকু জেনেছি, তা সামান্য হলেও তোমরা মাঝে পড়ে বাধা না দিলে সেইটেই হয়তো অসামান্য হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু উপায় কী, আমার বরাত নিতান্তই মন্দ!

কেমন করে আমাদের জাহাজ সেই দ্বীপ গিয়ে পড়ল এবং কেন আমরা সেই দ্বীপে গিয়ে নেমেছিলুম, এসব কথা খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই পাঠ করেছ। সুতরাং সেসব কথা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করব না। দ্বীপের সেই অদ্ভুত পাথরের মূর্তিগুলোর কথাও তোমরা জানো, তাদের নিয়েও কিছু বলবার নেই। কারণ আমরাও তাদের ভালো করে দেখবার সময় পাইনি।

সারাক্ষণই আমরা সেই আটজন হারা সঙ্গীকে খুঁজতেই ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু ওইটুকু একটা ন্যাড়া দ্বীপ তন্ন তন্ন করে দেখেও আমরা একজন সঙ্গীকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, একসঙ্গে আট-আটজন মানুষ কেমন করে অদৃশ্য হল।

খুঁজতে বাকি ছিল কেবল পর্বতদ্বীপের শিখরটা। মিঃ মর্টন, মিঃ মরিস ও ম্যাকলিয়ড আমাদের কিছুক্ষণ আগেই শিখরের উপরদিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা তাঁদের অপেক্ষায় খানিকক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

পনেরো মিনিট কাটল, তবু তাঁদের দেখা নেই! তখন আমরাও উপরে উঠতে শুরু করলুম।

সকলের আগে উঠছিলুম আমিই। খানিক পরেই মিঃ মর্টনের গলা শুনতে পেলুম। তিনি সবিস্ময়ে বলছিলেন, 'এ কীরকম বর্শা! এর ডান্ডাটা যে সোনার বলে মনে হচ্ছে!'

তারপরেই মিঃ মর্টনকে দেখতে পেলুম। মিঃ মরিস আর মিঃ ম্যাকলিয়ডের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর হাতে একটা সুদীর্ঘ বর্শা,—কেবল তার ফলাটা বোধহয় ব্রোঞ্জের।

তাঁরা তিনজনেই আমাকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন! মিঃ মর্টন তাঁর হাতের বর্শাটা মাটির উপরে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'গোমেজ, তোমাদের আর কষ্ট করে উপরে উঠতে হবে না, নাবিকদের কেউ এখানে নেই। চলো, আমরাও নেমে যাই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনার হাতে ওটা কী দেখলুম যে?'

—'একটা ভাঙা পুরানো বর্শা! কবে কে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, কাজে লাগবে না বলে আমিও ফেলে দিলুম! চলো!'

কিন্তু বর্শাটা যে ভাঙা নয়, সেটা আমি স্পষ্টই দেখেছিলুম, তার সুদীর্ঘ দণ্ড সূর্যের আলোতে পালিশ-করা সোনার মতো চকচকিয়ে উঠছিল! কিন্তু মিঃ মর্টন আমাদের উপরওয়ালা, কাজেই তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারলুম না, নীচে নামতে নামতে কৌতূহলী হয়ে ভাবতে লাগলুম, মিঃ মর্টন আমাকে উপরে উঠতে দিলেন না কেন, আর আমার সঙ্গে মিথ্যা কথাই বা কইলেন কেন?

জাহাজে ফিরে এলুম। কিন্তু মনের ভিতরে একটা বিষম কৌতূহল জেগে রইল। বেশ বুঝলুম, ওঁরা একটা এমন কিছু দেখেছেন যা আমার কাছে প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু কেন?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন করেই হোক ভিতরের রহস্যটা জানতেই হবে। জাহাজের কারুর কাছেই কিছু ভাঙলুম না, কিন্তু সর্বক্ষণই ওঁদের গতিবিধির উপর রাখলুম জাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

পরদিনের সন্ধ্যাতেই সুযোগ মিলল। দূর থেকে দেখলুম, মিঃ মরিস ও মিঃ ম্যাকলিয়ডকে নিয়ে মিঃ মর্টন নিজের কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

এদিকে-ওদিকে কেউ নেই দেখে আমি পা টিপে টিপে কামরার কাছে গিয়ে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শুনলুম মিঃ মরিস বলছেন, 'ওটা সোনা না হতেও পারে!'

মিঃ মর্টন দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, বর্শার ডান্ডাটা সোনায় মোড়া না হয়ে যায় না! ওই একটা ডান্ডার যতটা সোনা আছে তার দাম হবে কয়েক হাজার টাকা।'

মিঃ ম্যাকলিয়ড বললেন, 'কিন্তু যদিই বা তাই হয়, তবে ওই সোনার বর্শার সঙ্গে শিখরের সেই আশ্চর্য 'ব্রোঞ্জে'র দরজার আর আমাদের নাবিকদের অদৃশ্য হওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

মিঃ মর্টন বললেন, 'আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যা স্থির করেছি শোনো :—সেই সর্বোচ্চ শিখরের গায়ে আমরা একটা 'ব্রোঞ্জ' ধাতুতে গড়া বিরাট দরজা আবিষ্কার করেছি। সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন? নিশ্চয়ই তার ভিতরে ঘর বা অন্য কোথাও যাবার পথ আছে। সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করলে কারা? নিশ্চয়ই যারা ঝড়ের রাতে আলো জ্বেলে চলাফেরা করছিল তারাই। তারা যে কারা, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না। তবে ওই স্বর্ণময় বর্শা দেখে অনুমান করা যায়, ওটা হচ্ছে তাদেরই অস্ত্র। খুব সম্ভব, তারা আমাদের আটজন নাবিককে আক্রমণ আর বন্দী করেছে। তারপর আমাদের সবাইকে দল বেঁধে দ্বীপের দিকে যেতে দেখে বন্দীদের নিয়ে তারা ওই দরজার পিছনে অদৃশ্য হয়েছে। আর যাবার সময় তাড়াতাড়িতে বর্শাটা ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন ভেবে দ্যাখো, সাধারণ বর্শা যাদের সুবর্ণময় তাদের কাছে সোনা কত সস্তা! দ্বীপে যখন পানীয় জল নেই, তখন ওখানে নিশ্চয়ই কেউ বেশিদিন বাস করে না। তবে সোনার বর্শা নিয়ে কারা ওখানে বিচরণ করে? হয়তো তারা অন্য কোনও দ্বীপের আদিম বাসিন্দা, ওই দ্বীপে তাদের প্রাচীন দেবতার ধন-ভাণ্ডার বা গুপ্তধন আছে, মাঝে মাঝে তারা তা পরিদর্শন করতে আসে। শুনেছি, দক্ষিণ আমেরিকার আদিম বাসিন্দারা দেবতাদের বিপুল ধনভাণ্ডার এমনি করেই লুকিয়ে রাখত, আর তাদের কাছেও সোনারুপো ছিল এমনি সস্তা। হতভাগা কেলে-ভূত গোমেজটার জন্যে ভালো করে কিছু দেখবার সময় পেলুম না, কিন্তু আমাদের আবার সেখানে যেতেই হবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওই দ্বীপে গেলে আমরা ধনকুবের হয়ে ফিরে আসব।'

তারপরেই মরিসের গলা পেলুম—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম কাদের পায়ের শব্দ, কারা যেন আমার দিকেই আসছে। কাজেই আমার আর কিছু শোনা হল না, ধরা পড়বার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম!...বাবু, দ্বীপের আর কোনও কথা আমি জানি না, এইবারে আমাকে ছেড়ে দাও।'

গোমেজের কথা শুনে বিমল কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা গোমেজ, তুমিও বলছ দ্বীপে জল নেই?'

—'না, সে দ্বীপ মরুভূমির চেয়েও শুকনো!'

—'তোমাদের জাহাজ ছাড়া সেখানে আর কোনও জাহাজ বা নৌকা দেখেছিলে?'

—'না।'

—'তাহলে মিঃ মর্টনের অনুমান সত্য নয়। অন্য কোনও দ্বীপের আদিম বাসিন্দারা সেই দ্বীপে এলে তোমরা তাদের জাহাজ বা নৌকা দেখতে পেতে?'

গোমেজ একটু ভেবে বললে, 'হয়তো আগের রাত্রে ঝড়ে তাদের জাহাজ বা নৌকাগুলো দ্বীপ থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

—'হ্যাঁ, তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।'

—'আর কেন, আমাকে মুক্তি দাও।'

—'রোসো, গোমেজ, রোসো। তুমি তো এখনই পাখির মতন উড়ে পালাবে,—তারপর? আমাদের দ্বীপে যাবার পথ বাতলে দেবে কে?'

গোমেজ উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পথ বাতলাবার জন্যে তোমরা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও নাকি?'

—'পাগল। তোমার মতন মূর্তিমান 'ব্ল্যাক স্নেক'কে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব? Longitude আর Latitude-সুদ্ধ একখানা নকশা আমাকে এঁকে দাও।'

গোমেজ হতাশভাবে বললে, 'সেসব আমার পকেট-বুকেই তোমরা পাবে।'

কুমারের হাত থেকে গোমেজের পকেট-বুকখানা নিয়ে বিমল আগে সেখানা পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল হল সন্তোষজনক। তখন সে গোমেজের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, 'পালাও শয়তান, পালাও! মনে রেখো, এক মিনিট পরেই আমি পুলিশকে তোমার কথা জানাব!'

বিমলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই গোমেজ ঝড়ের মতন বেগে ঘরের বাহিরে চলে গেল!

বিমল ঘড়ি ধরে ঠিক এক মিনিট অপেক্ষা করলে। তারপর 'ফোন' ধরে বললে, 'হ্যালো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড? হ্যাঁ, শুনুন! আমি বিমল! মর্টন, মরিস আর ম্যাকলিয়ডকে খুন করেছে 'বোহিমিয়া'র কোয়াটারমাস্টার বার্তোলোমিও গোমেজ! সে একমিনিট আগে আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েছে! প্রমাণ? হ্যাঁ, সব প্রমাণই আমার কাছে আছে—এখানে এলেই সমস্ত পাবেন। গোমেজের অপরাধ সম্বন্ধে একতিল সন্দেহ নেই, শীঘ্র তাকে ধরবার ব্যবস্থা করুন। কী বললেন? পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই লন্ডনের পথে পথে পুলিশের জাল বিস্তৃত হবে? ডানা থাকলেও ওড়বার সময় পাবে না? আশ্চর্য আপনাদের তৎপরতা। আচ্ছা, বিদায়।'

ফোন ছেড়েই বিমল ফিরে বললে, 'ব্যাস, এখানকার কাজে ইতি। ডাকো কুমার, ডাকো রামহরিকে। বাঁধো সব জিনিস-পত্তর। আমরা আজকেই জাহাজে চড়ব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, তোমরা হচ্ছ একে বয়সে যুবা, তার উপরে বিষম ডানপিটে। কিন্তু দ্বীপে যাবার আগে আরও কিছু চিন্তা করা উচিত—এই হচ্ছে আমার মত।'

বিমল বললে, 'আয়োজন করে সর্বদাই চিন্তা করতে বসলে কাজ করবার কোনও ফাঁকই পাওয়া যায় না। যখন চিন্তা করবার সময়, তখন আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি, যার ফলে এত শীঘ্র 'ব্ল্যাক স্নেকে'র রূপকথা বাস্তব উপন্যাসে পরিণত হল। এখন এসেছে কাজ করবার সময়—চুলোয় যাক এখন ভাবনা-চিন্তা।'

কুমার বললে, 'এখন আমরা হচ্ছি সেই আরব বেদুইনের মতো, রবীন্দ্রনাথ যাদের স্বপ্ন

দেখেছেন! এখন আমাদের চারিদিকে 'শূন্যতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন', আর আমাদের মানস-তুরঙ্গ তারই উপর দিয়ে পদাঘাতে বালুকার মেঘ উড়িয়ে ছুটে চলেছে সুদূর বিপদের কোলে বিপুল আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।'

কমল করতালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ডাক দাও এখন ভূমিকম্পকে, ধরে আনো উন্মত্ত ঝটিকাকে, জাগিয়ে তোলো ভিসুভিয়াস-এর অগ্নি-উৎসবকে।'

বাঘাও লাফ মেরে টেবিলে চড়ে ও ল্যাজ নেড়ে উঁচু মুখে বললে, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

বিনয়বাবু ভয়ে ভয়ে রামহরির কাছে গিয়ে বললেন, 'সব কাকেরই এক ডাক। এসো রামহরি, আমরা ও-ঘরে গিয়ে একটু পরামর্শ করিগে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাহাজ দ্বীপে লাগল

আবার সেই অসীম নীলিমার জগতে! নীলিমার জগৎ—সূর্যালোকের অনন্ত ঐশ্বর্য চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, দিনের বেলার ছায়া এখানে কোথাও ঠাঁই পায় না! যেদিকে তাকানো যায় কেবল চোখে পড়ে দিগন্তে নিলীন নীল আকাশ আর নীল সাগর পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছে গভীর প্রেমে।

এত নীল জল এমন অশ্রান্ত বেগে কোথায় ছুটে যায় এবং ফিরে আসে কেউ তা জানে না। শূন্যে হচ্ছে স্থিরতার রাজ্য, মাটি হচ্ছে স্থিরতার রাজ্য, কিন্তু সমুদ্র কোনওদিন স্থির হতে শেখেনি, তার একমাত্র মহামন্ত্র হচ্ছে— ছুটে চলো, ছুটে চলো, ছুটে চলো!

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর প্রথম রাত্রি থেকে চাঁদ উঠে আসছে, জ্ঞানোদয়ের প্রথম দিন থেকে মানুষ চাঁদ-ওঠা দেখে আসছে, কিন্তু চাঁদের মুখ কখনও পুরানো বা একঘেঁয়ে মনে হল না। যে সত্যিকার সুন্দর, সে হয় চিরসুন্দর!

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছে। জাহাজের ডেকে চেয়ারের উপরে বিনয়বাবুকে ঘিরে বসেছিল বিমল, কুমার ও কমল।

সমুদ্রের অনন্ত জলে জ্যোৎস্না যেন দেয়ালী-খেলা খেলছিল লক্ষ লক্ষ ফুলঝুরি নিয়ে এবং সাগরের ধ্বনিকে মনে হচ্ছিল সেই কৌতুকময়ী জ্যোৎস্নারই কলহাস্য।

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, পৃথিবীর জন্ম থেকেই সমুদ্র এ কী গান ধরেছে, এতদিনেও যা ফুরিয়ে গেল না!'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না কুমার, পৃথিবী যখন জন্মায় তখন সে সমুদ্রের গান শোনেনি।'

বিমল কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক, এসব বিষয়ে আপনার জ্ঞান অসাধারণ। সদ্যোজাত পৃথিবীর প্রথম গল্প আপনার কাছে শুনতে চাই।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করি, শোনো।...কোটি কোটি

বৎসর আগেকার কথা। মহাশূন্যে তখন আর কোনও গ্রহ উপগ্রহ বা তারকা ছিল না, আমাদের মাথার উপরকার ওই চাঁদ ছিল না, আমাদের এই জননী পৃথিবীও ছিল না। ছিল কেবল জ্বলন্ত, ঘূর্ণায়মান সুভীষণ সূর্য। তখন সে জ্বলত বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডের মতো, তখন তার আকার ছিল আরও বৃহৎ, আর তখন সে ঘুরত আরও-বেশি জোরে— তেমন দ্রুতগতির ধারণাও আমরা করতে পারব না।

খুব জোরে বড়ো আগুন নিয়ে ঘোরালে দেখবে, চারিদিকে টুকরো টুকরো আগুন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। সূর্যের ঘুরুনির চোটেও মাঝে মাঝে তার কতক কতক অংশ এইভাবে শূন্যে ঠিকরে পড়েছে, আর সেই এক-একটা খণ্ডাংশ হয়েছে এক-একটা গ্রহ। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে তারই একটি।

প্রত্যেক গ্রহও ঘোরে। পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে একদিন দু ভাগ হয়ে গেল। তারই বড়ো অংশে অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন আমরা বাস করি, আর ছোটো অংশটাকে আমরা আজ চাঁদ বলে ডাকি। এই পৃথিবী, আর ওই চাঁদও আগে এখনকার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ঘুরতে পারত।

সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অনেক লক্ষ বৎসর পর পর্যন্ত পৃথিবীও ছিল জ্বলন্ত। তখন তার মধ্যে কোনও জীব বাস করতে পারত না। তখনকার দিন-রাতও ছিল এখনকার চেয়ে ঢের ছোটো। সূর্য আর পৃথিবীর ঘূর্ণির বেগ ক্রমেই কমে আসছে— সঙ্গে সঙ্গে দিন-রাতও ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে। সুদূর ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসবে, যখন সূর্যও ঘুরবে না, পৃথিবীও ঘুরবে না— দিনও থাকবে না রাতও থাকবে না।

অতীতের সেই পৃথিবীর কথা কল্পনা করো। আবহাওয়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ঘন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ প্রায়ই সূর্যকে অস্পষ্ট করে তোলে, ঘন ঘন বিশ্বব্যাপী ঝটিকায় চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে যায়, মাটির গা একেবারে আদুড়— সবুজের আঁচ পর্যন্ত ফোটে না, প্রায় দিবারাত্র ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে।

পৃথিবীর আদিম যুগে সমুদ্রের জন্মই হয়নি, সেই আগুনের মতন গরম পাথুরে পৃথিবীতে জল থাকতে পারত না। জলের বদলে তখন ছিল কেবল বাতাস-মেশানো বাষ্প। খুব গরম কড়ায় খুব অল্প জল ছিটোলে দেখবে, তা তখনই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। শূন্যে তখন যে পুরু মেঘ জমে থাকত, তা থেকে তপ্ত বৃষ্টি ঝরে পড়ত আগুনের মতো গরম পাথুরে পৃথিবীর উপরে, তারপর আবার তা বাষ্প হয়ে শূন্যে উঠে যেত। সেদিনকার পৃথিবীকে অনায়াসেই একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ডরূপে কল্পনা করতে পারো।

ক্রমে পৃথিবী যখন ঠান্ডা হয়ে এল, তখন গরম আবহাওয়ার বাষ্প পৃথিবীর উপরে নেমে এসে তপ্ত নদীর সৃষ্টি করলে। যেখানে সুবৃহৎ গর্ত ছিল সেখানও জমা হয়ে জলরাশি ধরলে সমুদ্রের আকার। তারপর জল ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে দেখা দিলে জীবনের প্রথম আভাস।

আজ এই জলের ভিতরে বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে অধিকাংশ ডাঙার জীবরাই মারা পড়ে। কিন্তু আদিম কালে জীবনের প্রথম উৎপত্তি হয় এই জলের ভিতরেই বা সমুদ্র-জলসিক্ত স্থানেই। তারপর কত জীব জল ছেড়ে ডাঙার জীব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ ডাঙা থেকে

আবার শূন্যে উড়তে শিখেছে, এমনকী কেউ কেউ মাটিকে ছেড়ে পুনর্বার সমুদ্রে ফিরে গিয়েছে, আজ আর তাদের ইতিহাস দেবার সময় হবে না।'

কুমার বললে, 'আশ্চর্য এই পৃথিবীর জন্মকাহিনী, উপন্যাসও এমন বিস্ময়কর নয়! আচ্ছা বিনয়বাবু, তাহলে কি ভবিষ্যতে পৃথিবী আরও ঠান্ডা হলে সমুদ্রের জলও আরও বেড়ে উঠবে?

বিনয়বাবু বললেন, 'তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।'

এমনভাবে প্রতি সন্ধ্যায় গল্পগুজব করে তারা সমুদ্র-যাত্রার একঘেয়েমি নিবারণ করে।

জাহাজে গল্প-বলার ভার নিয়েছিলেন বিনয়বাবু। বিমল প্রভৃতির আবদারে কোনও দিন তিনি বলতেন আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের গল্প, কোনওদিন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, কোনওদিন বা সমুদ্র-তলের রহস্যময় কাহিনী। এই অতল জল-সমুদ্রের উপরে বসে বিনয়বাবুর অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিয়ে বিমলরা নিত্য-নবরত্ন আহরণ করেছে।

একদিন বৈকালে 'চার্ট' দেখে বিমল বললে, 'আমাদের জাহাজ কেনারী দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে পড়েছে। গোমেজের পকেট-বুকের কথা মানলে বলতে হয়, আমরা কালকেই সেই অজানা দ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছোতে পারি।'

কুমার মহা উৎসাহে বললে, 'তাহলে আজ রাত্রে আমার ভালো করে ঘুম হবে না দেখছি।'

সাগরে জলের অভাব নেই, তবু হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে আকাশ ঘন মেঘ জমিয়ে জলের উপর জল ঢালতে লাগল। রামহরি তাড়াতাড়ি জাহাজের পাচকের কাছে ছুটল খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে। কমল বসল দ্বিতীয়বার চায়ের জল চড়াতে। এবং কুমার আবদার ধরলে, 'বিনয়বাবু, আজ আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প নয়, আজ একটা ভূতের গল্প বলুন।'

বিমল বললে, 'কিন্তু এই সামুদ্রিক বাদলায় সামুদ্রিক ভূত না হলে জমবে না।'

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, 'বেশ, তাই সই। আমি একটা ভূতের বিলিতি কাহিনী পড়েছিলুম। সেইটেই সংক্ষেপে তোমাদের বলব—কিন্তু স্থাল-কাল-পাত্রের নাম বদলে ধরে নাও, গল্পের নায়ক হচ্ছি আমি। এবং জাহাজে চড়ে যাচ্ছি কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী।

জাহাজে উঠে 'বয়'কে বললুম, 'আমার মোটঘাট সতেরো নম্বর কামরায় নিয়ে চলো। আমি নীচের বিছানায় থাকব।'

বয় চমকে উঠল। বাধো বাধো গলায় বললে, 'স-তে-রো নম্বর কামরা?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি চমকে উঠলে কেন?'

—'না হুজুর, চমকে উঠিনি! এই দিকে আসুন।'

সতেরো নম্বর কামরায় গিয়ে ঢুকলুম। এসব জাহাজের প্রথম শ্রেণীর কামরা সাধারণত যে-রকম হয়, এটিও তেমনি। উপরে একটি ও নীচে একটি বিছানা। আমি নীচের বিছানা দখল করলুম।

খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভিতরে আর একজন লোক এসে ঢুকল। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, সে আমার সহযাত্রী হবে। অতিরিক্ত লম্বা ও অতিরিক্ত রোগা দেহ, টাক-পড়া মাথা, ঝুলে-পড়া গোঁফ। জাতে ফিরিঙ্গি।

তাকে পছন্দ হল না। যে খুব রোগা আর খুব লম্বা, যার মাথায় টাক-পড়া আর গোঁফ ঝুলে-পড়া, তাকে আমার পছন্দ হয় না। আমি বলে একটা মনুষ্য যে এই কামরায় হাজির আছি, সেটা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। টপ করে লাফ মেরে সে একেবারে উপরের বিছানায় গিয়ে উঠল। স্থির করলুম, এ-রকম লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই ভালো।

সে-ও বোধহয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আমার মতন নেটিভের সঙ্গে কথাবার্তা কইবে না। কারণ সন্ধ্যার পরে একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করেই সে 'রাগ' মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমিও দিলুম লেপ মুড়ি। এবং ঘুম আসতেও দেরি লাগল না।

কতক্ষণ পরে জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেন ঘুম ভাঙল তাই ভাবছি, এমন সময়ে উপরের সাহেব দড়াম করে নীচে লাফিয়ে পড়ল! অন্ধকারে শব্দ শুনে বুঝলুম, সে কামরার দরজা খুলে দ্রুতপদে বাইরে ছুটে গেল! ঠিক মনে হল, যেন কেউ তাকে তাড়া করেছে।

তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝলুম না। কিন্তু এটা অনুভব করলুম যে, আমার কামরার মধ্যে দুর্দান্ত শীতের হাওয়া হু-হু করে প্রবেশ করছে! আর, কীরকম একটা পচা জলের দুর্গন্ধে সমস্ত কামরা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে!

উঠলুম। ইলেকট্রিক টর্চটা বার করে জ্বেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখলুম, জাহাজের পাশের দিকে কামরায় আলো-হাওয়া আসবার জন্যে যে 'পোর্ট-হোল' থাকে, সেটা খোলা রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়েই হু-হু করে জোলো-হাওয়া আসছে!

তখনই পোর্ট-হোল বন্ধ করে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, আমার উপরকার বিছানার যাত্রীটির নাক ডেকে উঠল সশব্দে!

আশ্চর্য! সশব্দে লাফিয়ে পড়ে বাইরে ছুটে গিয়ে আবার কখন সে নিঃশব্দে ফিরে এসে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে? লোকটা পাগলটাগল নয় তো?

আর সেই বদ্ধ, পচা জলের দুর্গন্ধ। সে কী অসহনীয়! এ কামরাটা নিশ্চয়ই খুব-বেশি স্যাঁতসেতে! কালকেই কাপ্তেনের কাছে অভিযোগ করতে হবে.....আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে ঘুম ভাঙবার পরেই সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করলুম যে, খোলা পোর্ট-হোলের ভিতর দিয়ে আবার হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে!

নিশ্চয় ওই সাহেবটার কাজ! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো।

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কামরার মধ্যে সেই বদ্ধ, পচা জলের দুর্গন্ধ আর পাওয়া যাচ্ছে না!

আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রভাতের সূর্যালোক আর স্নিগ্ধ বাতাস ভারী মিষ্ট লাগল।

ডেকের উপরে পায়চারি করতে করতে জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল, তাঁকে আমি অল্পবিস্তর চিনতুম।

ডাক্তার আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সতেরো নম্বর কামরা নিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কালকের রাত কেমন কাটল।'

—'মন্দ নয়। কেবল এক পাগল সায়েব কিছু জ্বালাতন করেছে।'

—'কীরকম?'

—'সে মাঝরাতে লাফালাফি করে পরের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, দুপদুপিয়ে বাইরে ছুটে যায়, কিন্তু পরে পা টিপে টিপে এসে কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে পোর্ট-হোল খুলে দেওয়াও তার আর এক বদ-অভ্যাস!'

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু ও-কামরার পোর্ট-হোল রাত্রে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না!'

—'তার মানে!'

—'তার মানে কী, আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি, ওই কামরায় যারা যাত্রী হয়, তারা প্রায়ই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে!'

—'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছেন?'

—'মোটেই নয়। আমার উপদেশ, ও-কামরা ছেড়ে দিয়ে আপনি আমার কামরায় আসুন।'

—'এত সহজে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। আমি কামরা ছাড়বার কোনও কারণ দেখছি না।'

—'যা ভালো বোঝেন করুন'—এই বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

একটু পরেই 'বয়' এসে জানালে, কাপ্তেন-সাহেব আমাকে জরুরি সেলাম দিয়েছেন।

কাপ্তেনের কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবু, আপনার কামরার সাহেবের কোনও খবর রাখেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'সারা জাহাজ খুঁজেও তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'পাওয়া যাচ্ছে না? কাল রাত্রে তিনি একবার বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তারপর আবার তাঁর নাক-ডাকা শুনেছি তো!'

—'আপনি ভুল শুনেছেন! কামরার ভিতরে বা বাইরে তাঁর কোনও চিহ্নই নেই!'

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। তারপর বললুম, 'শুনছি সতেরো নম্বর কামরার যাত্রীরা নাকি প্রায়ই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে?'

কাপ্তেন থতমত খেয়ে বললেন, 'একথা আপনিও শুনেছেন? দোহাই আপনার, যা শুনেছেন তা আর কারুর কাছে বলবেন না, কারণ তাহলে এ-জাহাজের সর্বনাশ হবে! আপনি বরং এক কাজ করুন। এ-যাত্রা আমার কামরাতেই আপনার মোটঘাট নিয়ে আসুন। সতেরো নম্বরে আজই আমি তালা লাগিয়ে দিচ্ছি!'

—'অকারণে আমার কামরা আমি ছাড়তে রাজি নই। আপনাদের কুসংস্কার আমি মানি না।'

কাপ্তেন খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমারও বিশ্বাস, এসব

কুসংস্কার। আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি নিজে আপনার কামরায় গিয়ে পাহারা দেব। তাতে আপনার আপত্তি আছে?'

—'না।'

সন্ধ্যার পর কাপ্তেন আমার কামরার মধ্যে এসে ঢুকলেন।

সে-রাত্রে কামরার আলো নেবানো হল না। দরজা বন্ধ করে কাপ্তেন আমার সুটকেশটা টেনে নিয়ে তার উপরে চেপে বসে বললেন, 'এই আমি জমি নিলুম! এখন আমাকে ঠেলে না সরিয়ে এখান দিয়ে কেউ যেতে আসতে পারবে না। চারিদিক বন্ধ। একটা মাছি কি মশা ঢোকবারও পথ নেই!'

—'কিন্তু আমি শুনেছি, ওই পোর্ট-হোলটা রাত্রে কেউ নাকি বন্ধ করে রাখতে পারে না!'

'ওই তো ওটা ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে!'—বলতে বলতেই কাপ্তেন-এর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ করে আমিও তাকিয়ে দেখলুম, কামরার পোর্ট-হোলটা ধীরে ধীরে আপনিই খুলে যাচ্ছে!

আমরা দুজনেই লাফ মেরে সেখানে গিয়ে পোর্ট-হোলের আবরণ চেপে ধরলুম—কিন্তু তবু সেটা সজোরে খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামরার আলো নিবে গেল দপ করে!

হু হু করে একটা তীক্ষ্ণ বরফ-মাখা বাতাসের ঝাপটা ভিতরে ছুটে এল এবং তারপরেই নাকে ঢুকল তীব্র, বদ্ধ, পচা জলের বিষম দুর্গন্ধ!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আলো, আলো!'

কাপ্তেন টপ করে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বেলে ফেললেন।

বিদ্যুৎবেগে ফিরে উপরের বিছানার দিকে তাকিয়ে সভয়ে দেখলুম, সেখানে একটা মূর্তি সটান শুয়ে রয়েছে!

পাগলের মতন একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়লুম,—কিন্তু কিসের উপরে? বহুকাল আগে জলে-ডোবা একটা ভিজে ঠান্ডা মৃতদেহ, তার সর্বাঙ্গ মাছের মতন পিচ্ছল, তার মাথায় লম্বা লম্বা জল-মাখা রুক্ষ চুল এবং তার মৃত চোখদুটোর আড়ষ্ট দৃষ্টি আমার দিকে স্থির! আমি তাকে স্পর্শ করবামাত্র সে উঠে বসল এবং পরমুহূর্তেই একটা মত্তহস্তী যেন ভীষণ এক ধাক্কা মেরে আমাকে মেঝের উপর ফেলে দিলে,—তারপরই কাপ্তেনও আর্তনাদ করে আমার উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

মিনিট-দুয়েক পরে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখা গেল, উপরের বিছানা খালি, ঘরের ভিতরেও কেউ নেই এবং কামরার দরজা খোলা!

পরদিনেই সতেরো নম্বর কামরার দরজা পেরেক মেরে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল। আমার কথাও ফুরুল।

রামহরি কখন ফিরে এসে কোণে বসে একমনে গল্প শুনছিল। সে সভয়ে বলে উঠল, 'ওরে বাবা! সুমুদ্দরে কত লোক ডুবে মরে, সবাই যদি ভূত হয়ে মানুষের বিছানায় শুতে চায়, তাহলে তো আর রক্ষে নেই! আমি বাপু আজ রাত্রে একলা শুতে পারব না!'

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো, এইবারে খিচুড়ির সন্ধানে যাত্রা করা যাক!'

বিমলের আন্দাজই সত্য হল। পরদিন খুব ভোরেই দেখা গেল, দূরে সমুদ্রের নীলজলের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যে দ্বীপটি তাকে দ্বীপ না বলে পাহাড় বলাই ঠিক।

দূরবিনে নজরে পড়ল, নৈবেদ্যের চূড়া-সন্দেশের মতো একটি পর্বত যেন সামুদ্রিক নীলিমাকে ফুটো করে মাথা তুলে আকাশের নীলিমাকে ধরবার জন্যে উপরদিকে উঠে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সেই পর্বতের অধিকাংশ লুকিয়ে আছে মহাসাগরের সজল বুকের ভিতরে।

তার শিখর-দেশটা একেবারে খাড়া, কিন্তু নীচের দিকটা ঢালু। এবং সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বিরাট প্রস্তর-মূর্তি। অনেক মূর্তির পদতলের উপরে বিপুল জলধির প্রকাণ্ড তরঙ্গদল রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেনদন্তমালা বিকাশ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারংবার!

সমস্ত পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া—বড়ো বড়ো গাছপালা তো দূরের কথা, ছোটোখাটো ঝোপঝাড়েরও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যেমন সবুজ রঙের অভাব—তেমনি অভাব জীবন্ত গতির। কোথাও একটিমাত্র পাখিও উড়ছে না।'

বিনয়বাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, 'এ হচ্ছে মৃত্যুর দেশ!'

রামহরি বললে, 'যারা জলে ডুবে মরে, তারা রোজ রাতে ঘুমোবার জন্যে ওইখানে গিয়ে ওঠে।'

কুমার বললে, 'এই মৃত্যুর দেশেই এইবারে আমরা জীবন সঞ্চার করব। যদি এখানে মৃত্যুদূত থাকে, আমাদের বন্দুকের গর্জনে এখনই তার নিদ্রাভঙ্গ হবে।'

বিমল বললে, 'যাও কমল, সেপাইদের প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে বলো। এইবারে হয়তো তাদের দরকার হবে।'

কমল খবর দিতে ছুটল। খানিক পরেই ডেকের উপরে চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়াল শিখ, গুর্খা ও পাঠান সেপাইরা। তাদের চব্বিশটা বন্দুকের বেওনেটের উপরে সূর্যকিরণ চমকে চমকে উঠতে লাগল।

বিমল হেসে বললে, 'বিনয়বাবু, ওদের আছে চব্বিশটা বন্দুক আর আমাদের কাছে আছে পাঁচটা বন্দুক, চারটে রিভলভার। তবু কি আমরা দ্বীপ জয় করতে পারব না?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অষ্ট নরমুণ্ড

বোটে চড়ে বিমল সঙ্গীদের ও সেপাইদের নিয়ে দ্বীপে গিয়ে উঠল। জাহাজে রইল কেবল নাবিকরা।

কী ভয়াবহ নির্জন দ্বীপ! সূর্যের সোনালি হাসি যেন তার কালো কর্কশ পাথুরে গায়ে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গর্ভের মধ্যে! নানা আকারের বড়ো বড়ো পাথরগুলো চারিদিক থেকে যেন কঠিন ভ্রূকুটি করে ভয় দেখাচ্ছে! যেদিকে তাকানো যায়, ভৌতিক ছমছমে ভাব ও তৃষ্ণাভরা নির্জীব শুষ্কতা!

এরই মধ্যে দিকে দিকে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরের দানব-রক্ষীর মতন প্রস্তরমূর্তির পর প্রস্তরমূর্তি! একসঙ্গে এতগুলো এত-উঁচু পাথরের মূর্তি বোধহয় আধুনিক পৃথিবীর কোনও মানুষ কখনও চোখে দেখেনি, কারণ তাদের অধিকাংশই কলকাতার অক্টারলনি মনুমেন্টের মতন উঁচু এবং কোনও কোনওটা তাদেরও ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে। মূর্তিগুলোর পায়ের কাছে দাঁড়ালে তাদের মুখ আর দেখা যায় না। পাহাড় কেটে প্রত্যেক মূর্তিকে খুদে বার করা হয়েছে!'

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মূর্তির আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বিমল বললে, 'এই এক-একটা মূর্তি গড়তে শিল্পীদের নিশ্চয়ই পনেরো-বিশ বছরের কম লাগেনি। সব মূর্তি গড়তে হয়তো এক শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছিল! এইটুকু একটা জলশূন্য দ্বীপে এতকাল ধরে এত যত্ন আর কষ্ট করে এই মূর্তিগুলো গড়বার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না!'

কুমার বললে, 'হয়তো মর্টন সাহেবেরই অনুমান সত্য! হয়তো এটা কোনও জাতির দেবতার দ্বীপ! হয়তো যাদের দেবতা তারা এখানে মাঝে মাঝে কেবল ঠাকুর পূজা করতে আসে!'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'এ মূর্তিগুলো কোনও জাতির দেবতার মূর্তি হতে পারে, কিন্তু একটা সবচেয়ে বড়ো কথা তোমরা ভুলে যেয়ো না। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের 'চার্ট' সাহেবরা তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু কোনও 'চার্টে'ই এই দ্বীপের উল্লেখ নেই। তার অর্থ হচ্ছে, এই দ্বীপটাকে এতদিন কেউ সমুদ্রের উপরে দেখেনি। মূর্তিগুলোর গায়ে তাজা শেওলার

চিহ্ন দেখছ? ওই শেওলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিছুদিন আগেও ওরা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে ছিল। এখন ভেবে দ্যাখো, জলের তলায় ডুব মেরে কোনও মানুষ-শিল্পীই কি এমন বড়ো মূর্তি গড়তে পারে?'

রামহরি বললে, 'সমুদ্রের জলে যেসব কারিগর ডুবে মরেছে, এ মূর্তিগুলো গড়েছে তাদেরই প্রেতাত্মা।'

কমল বললে, 'যে দ্বীপ জলের তলায় অদৃশ্য, সেখানে কেউ পূজা করতে আসবেই বা কেন?'

কুমার বললে, 'কিন্তু মর্টন সাহেব এখানে কাদের হাতের আলো দেখেছিলেন? দ্বীপের শিখরের কাছে সেই ব্রোঞ্জের দরজাই বা কে তৈরি করেছে?'

বিনয়বাবু বললেন, দ্বীপটা ভালো করে দেখবার পর হয়তো আমরা ওসব প্রশ্নের সদুত্তর পাব। কিন্তু আপাতত দেখছি, কোনও মূর্তির কোথাও কোনও শিলালিপি বা সাঙ্কেতিক ভাষা খোদাই করাও নেই। ওসব থাকলেও একটা হদিস পাওয়া যেত। কিন্তু মূর্তিগুলোর মুখের ভাব দেখেছ? প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ, চিন, আসিরিয়া, বাবিলন আর গ্রিস দেশের ইতিহাস-পূর্ব যুগের শিল্পীরা আপন আপন জাতির মুখের আদর্শই মূর্তিতে ফুটিয়েছে। সুতরাং ধরতে হবে এখানকার শিল্পীরাও স্বজাতির মুখের আদর্শ রেখেই এসব মূর্তি গড়েছে। কিন্তু সে কোন জাতি? আধুনিক কোনও দেশেই মানুষের মুখের ভাব এমন ভয়ানক হয় না। এদের মুখের ভাব কীরকম হিংস্র পশুর মতো, যেন এরা দয়া-মায়া কাকে বলে জানে না। বিমল, কুমার! তোমরা প্রাচীন যুগের কিছু কিছু ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছ? প্রাচীন যুগটাই ছিল নির্দয়তার যুগ। বাবিলন, আসিরিয়া আর মিশর প্রভৃতি দেশের ইতিহাসই হচ্ছে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। তাদের ঢের পরে জন্মেও রোম দয়ালু হতে পারেনি। খ্রিস্টকে সে ক্রুশে বিঁধে হত্যা করেছিল, বিরাট একটা সভ্যতার জন্মভূমি কার্থেজের সমস্ত মানুষকে দেশসুদ্ধ পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দিয়েছিল। সে যুগের নির্দয়তার লক্ষ লক্ষ কাহিনী শুনলে আধুনিক সভ্যতার হৃৎপিণ্ড মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দ্বীপবাসী মূর্তিগুলোর মুখ অধিকতর নৃশংস। তার একমাত্র কারণ এই হতে পারে, যে-পাশবিক সভ্যতা এখানকার মূর্তিগুলো সৃষ্টি করেছে, তার জন্ম হয়তো মিশরেরও অনেক হাজার বছর আগে—সামাজিক বন্ধন, নীতির শাসন ছিল যখন শিথিল, মানুষ ছিল যখন প্রায় হিংস্র জন্তুরই নামান্তর। ভগবান জানেন, আমরা কাদের প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি!'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার কথাই সত্য বলে মনে হচ্ছে। মূর্তিগুলোর পোশাক দেখুন। এমন সামান্য পোশাক মানুষ সেই যুগেই পরত, যে-যুগে সবে সে কাপড়-চোপড় পরতে শিখেছে।'

এসব আলোচনা রামহরির মাথায় ঢুকছিল না, সে বাঘাকে নিয়ে কিছুদূরে এগিয়ে গেল। এক-জায়গায় প্রায় দুশো ফুট উঁচু একটা মূর্তি ছিল,—তার পদতলে একটা পাথরের বেদী, সেটাও উচ্চতায় দশ-বারো ফুটের কম হবে না। বেদীর গা বেয়ে উঠেছে সিঁড়ির মতন কয়েকটা ধাপ!

এ মূর্তিটা আবার একেবারে বীভৎস। চোখদুটো চাকার মতন গোল, নাসারন্ধ্র স্ফীত, জন্তুর মতন দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে এবং দুই ঠোঁটের দুই কোণে ঝুলছে আধাআধি গিলে-ফেলা দুটো মানুষের মূর্তি!

এই মানুষ-খেকো দেবতা ও দানবের মূর্তি দেখে রামহরির পিলে চমকে গেল।

এমন সময়ে বাঘার চিৎকার শুনে রামহরি চোখ নামিয়ে দেখলে, ইতিমধ্যে সে ধাপ দিয়ে বেদীর উপরে উঠে পড়েছে এবং সেখানে কী দেখে মহা ঘেউ ঘেউ রব তুলেছে।

ব্যাপার কী দেখবার জন্যে রামহরিও কৌতূহলী হয়ে সেই বেদীর উপরে গিয়ে উঠল এবং তারপরেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানে বসে পড়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল—'ওরে বাবা রে, গেছি রে। এ কী কাণ্ড রে।'

চিৎকার শুনে সবাই সেখানে ছুটে এল। বেদীর উপরে উঠে প্রত্যেকেই স্তম্ভিত!

বেদীর উপরে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে কতকগুলো মানুষের মুণ্ডু! মানুষের মাথা কেটে কারা সেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মাংস ও চামড়া পচে হাড় থেকে খসে পড়েনি। সেই পাথুরে দেশে প্রখর সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে সেগুলো মিশরের মমির মতন দেখতে হয়েছে।

বিমল গুনলে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট।'

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'এখানে আটজন নাবিকই হারিয়ে গিয়েছিল!'

বিমল দুঃখিত স্বরে বললে, 'এগুলো সেই বেচারাদেরই শেষ-চিহ্ন।' কুমার, এই রাক্ষুসে দেবতাদের পায়ের তলায় কারা নরবলি দিয়েছে! তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই দ্বীপে এমন সব শত্রু আছে যাদের হাতে পড়লে আমাদেরও এমনি দশাই হবে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'নরবলি দেয়, এমন সভ্য জাতি আর পৃথিবীতে নেই। বিমল, আমরা কোনও অসভ্য জাতিরই কীর্তি দেখছি।'

বিমল নীচে নেমে এল। তারপর সেপাইদের সম্বোধন করে বললে, 'ভাইসব! আমরা সব নিষ্ঠুর শত্রুর দেশে এসে পড়েছি! সকলে খুব হুঁশিয়ার থাকো, কেউ দলছাড়া হয়ো না! এ শত্রু কারুকেই ক্ষমা করবে না, যাকে ধরতে পারবে তাকেই দানব-দেবতার সামনে বলি দেবে, সর্বদাই এই কথা মনে রেখো! এসো আমার সঙ্গে!'—বলে সে আর একবার সেই ভয়ঙ্কর মুণ্ডগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে,—একদিন যারা জীবন্ত মানুষের কাঁধের উপরে আদরে থেকে এই সুন্দরী ধরণীর সৌন্দর্য দেখত, আতর-ভরা বাতাসের গান শুনত, কত হাসি-খুশির গল্প বলত।

রামহরি তাড়াতাড়ি সেপাইদের মাঝখানে গিয়ে বললে, 'বাছারা, তোমরা আমার চারপাশে থাকো, এই বুড়ো-বয়সে আমি আর ভূতুড়ে দেবতার ফলার হতে রাজি নই!'

কমল বললে, 'কিন্তু ওদের ধড়গুলো কোথায় গেল?'

বিনয়বাবু বললেন, 'কোথায় আর, ভক্তদের পেটের ভিতরে!'

সকলে শিউরে উঠল।

বিমল গোমেজের পকেট-বুকখানা বার করে দেখে বললে, 'মর্টন সাহেবরা পশ্চিম দিক দিয়ে শিখরের দিকে উঠেছিলেন। আমরাও এই দিক দিয়েই উঠব। দেখে মনে হচ্ছে, এই দিক দিয়েই উপরে ওঠা সহজ হবে, কারণ এদিকটা অনেকটা সমতল।'

আগে বিমল ও কুমার, তারপর বিনয়বাবু ও কমল এবং তারপর প্রত্যেক সারে দুইজন করে সেপাই পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। সকলেরই বন্দুকে টোটা ভরা এবং দৃষ্টি কাকের মতন সতর্ক।

কিন্তু প্রায় বিশ মিনিট ধরে উপরে উঠেও তারা সতর্ক থাকবার কোনও কারণ খুঁজে পেলে না। গোরস্থানেও গাছের ছায়া নাচে, পাখির তান শোনা যায়, ঘাসের মখমল-বিছানা পাতা থাকে, কিন্তু এই ছায়াশূন্যতা, বর্ণহীনতা ও অসাড়তার দেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের দেখা নেই—একটা ঝিঝি পোকাও বোধহয় এখানে ডাকতে সাহস করে না। এ যেন ঈশ্বরের বিশ্বের বাইরেকার রাজ্য, সর্বত্রই যেন একটা অভিশপ্ত হাহাকার স্তম্ভিত হয়ে অনন্তকাল ধরে নীরবে বিলাপ করছে। কেবল অনেক নীচে সমুদ্রের গম্ভীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সে যেন অন্য কোনও জগতের আর্তনাদ!

কুমার বললে, 'পাহাড়ের শিখর তো আর বেশিদূরে নেই, কোথায় সেই সোনার বর্শা আর কোথায় সেই ব্রোঞ্জের দরজা?'

বিমল বললে, 'সোনার বর্শাটা আর দেখবার আশা কোরো না, কারণ খুব সম্ভব সেটা যাদের জিনিস তাদের হাতেই ফিরে গেছে! আমাদের খুঁজতে হবে কেবল সেই দরজাটা!'

কুমার বললে, 'আর শ-খানেক ফুট উঠলে আমরা শিখরের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছোব। তারপর দেখছ তো? শিখরের গা একেবারে দেয়ালের মতো খাড়া, টিকটিকি না হলে আমরা আর ওখান দিয়ে ওপরে উঠতে পারব না!'

বিমল বললে, 'তাহলে দরজা পাব আরও নীচেই। কারণ মর্টন সাহেবরা যে এই পথ দিয়েই এসেছিলেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই দ্যাখো তার প্রমাণ।'—বলেই সে হেঁট হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে একটা খালি টোটা কুড়িয়ে নিয়ে তুলে ধরলে।

কুমার বললে, 'বুঝেছি। সাহেবরা হারানো নাবিকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে বন্দুক ছুড়েছিল, এটা তারই নিদর্শন।

বিমল উৎসাহ-ভরে বললে, 'সুতরাং 'আগে চলো, আগে চলো ভাই'!'

বিনয়বাবু তখন চোখে দূরবিন লাগিয়ে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'অনেক দূরে একখানা জাহাজ!'

বিমল দূরবিনটা নিয়ে দেখল, বহু দূরে—সমুদ্র ও আকাশের সীমারেখায় একটা কালো ফোঁটার মতো একখানা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন,—'লন্ডনে থাকতে শুনেছিলুম, এ-পথ দিয়ে জাহাজ আনাগোনা করে না, তবে ও-জাহাজখানা এখানে কেন?'

বিমল বললে, 'জাহাজখানা এখনও অনেক তফাতে আছে, দেখছেন না এত ভালো দূরবিনেও কতটুকু দেখাচ্ছে? সম্ভবত ওখানা অন্য পথেই চলে। ...কিন্তু ওসব কথা নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই—'আগে চলো, আগে চলো ভাই'।'

সব আগে চলেছিল বাঘা। তাকে এখন দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার সচকিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল।

বিমল চিৎকার করে বললে, 'হুঁশিয়ার, সবাই হুঁশিয়ার! বাঘা অকারণে গর্জন করে না।'

তারপরেই দেখা গেল, বাঘা ঝড়ের বেগে নীচের দিকে নেমে আসছে। সে বিমলদের কাছে এসেই আবার ফিরে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

বিমল ও কুমার বন্দুকের মুখ সামনের দিকে নামিয়ে অগ্রসর হল। আচম্বিতে খুব কাছেই

উপর থেকে একটা শব্দ এল—যেন প্রকাণ্ড কোনও দরজার কপাট দুড়ুম করে বন্ধ হয়ে গেল।

বিমল ও কুমার এবার ফিরে পিছনদিকে তাকালে। দেখলে, সেপাইরা প্রত্যেকেই বন্দুক প্রস্তুত রেখে সারে সারে উপরে উঠে আসছে—তাদের প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে উদ্দীপনার আভাস।

বিমল ও কুমার তখন বেগে শিখরের দিকে উঠতে লাগল।

কিন্তু আর বেশিদূর উঠতে হল না। হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সুমুখেই মস্তবড়ো একটা বন্ধ দরজা এবং আশেপাশে জনপ্রাণীর সাড়া বা দেখা নেই।

তারা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে দরজাটা দেখতে লাগল। এ-রকম গড়নের দরজা তারা আর কখনও দেখেনি—উচ্চতা বেশি না হলেও চওড়ায় তা অসামান্য। খোলা থাকলে তার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি ছয়জন লোক একসঙ্গে বাইরে বেরুতে বা ভিতরে ঢুকতে পারে। এবং তার আগাগোড়াই ব্রোঞ্জ ধাতুতে তৈরি।

বিমল এগিয়ে গিয়ে দরজায় সজোরে বারকয়েক ধাক্কা মেরে বললে, 'কী ভীষণ কঠিন দরজা! আমার এমন ধাক্কায় একটুও কাঁপল না!'

কুমার বললে, 'কারিগরিও অদ্ভুত। দেখছ, দুই পাল্লার মাঝখানে একটা ছুঁচ গলাবারও ফাঁক নেই।'

বিনয়বাবু বললেন, 'দরজার গায়ে আর তার চারপাশে শেওলার দাগ দ্যাখো! এর মানে হচ্ছে, এই দরজাটাও এতদিন ছিল সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য। এটা এমন মজবুত আর ছিদ্রহীন করে গড়া হয়েছে যে, সমুদ্রের শক্তিও এর কাছে হার মানে!'

কমল হতাশ ভরে বললে, 'এখন উপায়? হাতিও তো এ দরজা ভাঙতে পারবে না!'

বিমল বললে, 'কুমার, নিয়ে এসো তো সেপাইয়ের কাছ থেকে আমাদের ডাইনামাইটের বাক্স। দেখি এ-দরজার শক্তি কত!'

কুমার সিপাইদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, 'ডাইনামাইট! ডাইনামাইট!'

তখনই ডাইনামাইটের বাক্স এল। দরজার তলায় সেই ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ সাজিয়ে একটা পলিতায় আগুন দিয়ে বিমল সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার নীচের দিকে নেমে গেল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খানিক পরেই একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বজ্র গর্জন করে উঠে সমস্ত পাহাড়টা থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিলে!

বিমল হাত তুলে চিৎকার করে বললে, 'পথ সাফ! সবাই অগ্রসর হও।'

নবম পরিচ্ছেদ

সত্যিকার প্রথম মানুষ

সবাই বেগে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলে, কুণ্ডলীকৃত ধূম্রপুঞ্জের মধ্যে পাহাড়ের

শিখরটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেই পুরু ব্রোঞ্জের দরজার একখানা পাল্লা ভেঙে একপাশে ঝুলছে ও একখানা পাল্লা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে।

দরজার হাত দশেক পরেই দেখা যাচ্ছে একটা দেওয়াল বা পাহাড়ের গা। ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার জন্যে বিমল ও কুমার আরও কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলে। তারপর বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল।

দরজার পরেই খুব মস্তবড়ো ইঁদারার মতো একটা গহ্বর নীচের দিকে নেমে গিয়েছে এবং তারই গা বয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সংকীর্ণ পাথরের সিঁড়ির ধাপ!

বিমল হুকুম দিলে, 'গোটাকয়েক পেট্রোলের লণ্ঠন জ্বালো! নইলে এত অন্ধকারে নীচে নামা যাবে না!'

কুমার কান পেতে শুনে বললে, 'নীচে থেকে কীরকম একটা আওয়াজ আসছে, শুনছ? যেন অনেক দূরে কোথায় মস্ত একটা মেলা বসেছে, হাজার হাজার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে!'

সত্যই তাই। নীচে—অনেক দূর থেকে আসছে এমন বিচিত্র ও গম্ভীর সমুদ্রগর্জনের মতন ধ্বনি, যে শুনলে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বিমল সবিস্ময়ে বললে, 'নির্জন, নির্জন এই পাহাড়-দ্বীপ, কিন্তু এর লুকানো গর্ভে, চন্দ্র-সূর্যের চোখের আড়ালে কি নতুন একটা মানুষ-জাতি বাস করে? পৃথিবীতে কি কোনও পাতালরাজ্য আছে? তাও কি সম্ভব?'

কুমার বললে, 'পাতালরাজ্য থাক আর না থাক, কিন্তু আমরা যে হাজার হাজার লোকের গলায় অস্পষ্ট কোলাহল শুনছি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হাজার হাজার কণ্ঠ মানে হাজার হাজার শত্রু। তারা নিশ্চয়ই ডাইনামাইটে দরজা ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছে—তাই চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে আসছে আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।'

রামহরি কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'ও খোকাবাবু! ওরা আমাদের টিপে মেরে ফেলবে না গো, টিপে মেরে ফেলবে না। ওরা খাঁড়া তুলে নরবলি দেবে। আমাদের মুণ্ডুগুলো রেঁধে গপ গপ করে খেয়ে ফেলবে। জাহাজে চলো খোকাবাবু, জাহাজে চলো।'

বিমল কোনওদিকে কর্ণপাত না করে বললে, 'চলো কুমার। আগে তো সিঁড়ি দিয়ে দুর্গা বলে নেমে পড়ি, তারপর যা থাকে কপালে।'

কুমার সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়ে বললে, 'জলে-স্থলে-শূন্যে বহুবার উড়েছে আমাদের বিজয়-পতাকা। বাকি ছিল পাতাল এইবার হয়তো তার সঙ্গেও পরিচয় হবে! আজ আমাদের—'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।' ওহো, কী আনন্দ!'

কমল হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

'স্বর্গকথা ঢের শুনেছি,
ঘর তো মোদের মর্ত্যে,
কী আছে ভাই দেখতে হবে
আজ পাতালের গর্তে।'

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো কমল, থামো। এদের সঙ্গে থেকে তুমিও একটা ক্ষুদ্র দস্যু হয়ে উঠেছ।'

ততক্ষণে কুমার ও বিমলের মূর্তি সিঁড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দেখেই রামহরি সব ভয় ভাবনা ভুলে গেল! উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, খোকাবাবু নেমে গেছে? আর কি আমরা জাহাজে যেতে পারি—তাহলে খোকাবাবুকে দেখবে কে?'—বলেই সে-ও সিঁড়ির দিকে ছুটল তিরবেগে।

বিনয়বাবু ফিরে সেপাইদের আসবার জন্যে ইঙ্গিত করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

পাহাড়ের গা কেটে এই সিঁড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপের মাপ উচ্চতায় একহাত, চওড়ায় আধহাত ও লম্বায় কিছু কম, দেড় হাত। এ সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি দুজন লোক নামতে গেলে কষ্ট হয়। বিশেষ সিঁড়ির রেলিং নেই—একদিকে একটা ঘুটঘুটে কালো গর্ত জীবন্ত শিকার ধরবার জন্যে যেন হাঁ করে আছে—একটিবার পা ফসকালেই কোথায় কত নীচে গিয়ে পড়তে হবে তা কেউ জানে না।

বিনয়বাবু বললেন, 'সকলে একে একে দেওয়াল ঘেঁষে নামো। এ হচ্ছে একেবারে সেকেলে সিঁড়ি। একে সিঁড়ি না বলে পাথরের মই বলাই উচিত।'

ততক্ষণে কুমার ও বিমল গুনে গুনে পঞ্চাশটা ধাপ পার হয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে, অসম্ভব বিস্ময়ে তাদের মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল কেমনধারা। এ-রকম কোনও দৃশ্য দেখবার জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না—পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য এ-যুগে আর কেউ কখনও দেখেনি।

চতুর্দিকে মাইল-কয়েকব্যাপী একটা উনুনের মতন জায়গা কেউ কল্পনা করতে পারেন? এমনি একটা উনুনেরই মতন জায়গার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিমল ও কুমার হতভম্বের মতন চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

উপর-দিকটা ডোমের খিলানের মতন ক্রমেই সরু হয়ে উঠে গেছে—কিন্তু পুরো ডোম নয়, কারণ তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ফাঁক। সেই গোলাকার ফাঁকটার বেড় অন্তত কয়েক হাজার ফুটের কম নয়। তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের নীলিমার অনেকখানি এবং তার ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ছে এই অত্যাশ্চর্য উনুনের বিপুল জঠরে সমুজ্জ্বল সূর্য-কিরণ-প্রপাত!

পাহাড়ের গা থেকে একটা পনেরো-বিশ ফুট চওড়া জায়গা 'ব্রাকেটে'র মতন বেরিয়ে পড়েছে, বিমল ও কুমার তারই উপরে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁয়ে সেই স্বাভাবিক 'ব্যাকেটটা' অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং যে-সিঁড়ি দিয়ে তারা নেমেছে সোপানের সার এইখানেই শেষ হয়ে যায়নি, 'ব্রাকেট'টা ভেদ করে নেমে গিয়েছে সামনে আরও নীচের দিকে।

বিমল বললে, 'কুমার! অদ্ভুত কাণ্ড! এই দ্বীপের মতন পাহাড়টা ফাঁপা—শিখরটাও কেবল ফাঁপা নয়, ছ্যাঁদা। তাই 'স্কাইলাইটে'র কাজ করছে! এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছ—পাহাড়ের পেটের ভিতরে মাইলের পর মাইল ধরে গুহা-দেশ।'

কুমার বললে, 'নীচে জনতার গোলমাল আর চারিদিকে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ক্রমেই বেড়ে উঠছে! উপরের মস্ত ছ্যাঁদা দিয়ে প্রখর আলো আসছে—কিন্তু আলো-ধারার বাইরে

দূরে ছায়ার ভিতরে নীচে ঝাপসা ঝাপসা নানা আকারের কী ওগুলো দেখা যাচ্ছে বলো দেখি?'—বলতে বলতে সে দুই-এক পা এগুবার পরেই হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন প্রকাণ্ড একটা মূর্তি যেন শূন্য থেকেই আবির্ভূত হয়ে একেবারে তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কুমার কিছু বোঝবার আগেই তাকে ঠিক একটি ছোট্ট খোকার মতো দু-হাতে অতি সহজে তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছাড় মারবার উপক্রম করলে।

কিন্তু বিমলের সতর্ক দুই বাহু চোখের পলক পড়বার আগেই প্রস্তুত হয়ে শূন্যে উঠল, সে একলাফে তার কাছে গিয়ে পড়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মূর্তিটার মাথায় করলে প্রচণ্ড এক আঘাত।

সে-আঘাতে সাধারণ কোনও মানুষের মাথার খুলি ফেটে নিশ্চয়ই চৌচির হয়ে যেত, কিন্তু মূর্তিটা চিৎকার করে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে একবার কেবল টলে পড়ল, তারপরেই টাল সামলে নিয়ে বেগে বিমলকে তেড়ে এল!

বিমল আবার তার মাথা টিপ করে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করতে গেল।

কিন্তু সেই মূর্তিটার গায়ের জোর ও তৎপরতা যে বিমলের চেয়েও বেশি, তৎক্ষণাৎ তার প্রমাণ মিলল!

সে চট করে একপাশে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটানে বন্দুকটা বিমলের হাত থেকে কেড়ে নিলে। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষই কেবল গায়ের জোরে অসম্ভব বলবান বিমলের হাত থেকে এমন সহজে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারেনি।

পরমুহূর্তে বিমলের হাল কী যে হত বলা যায় না, কিন্তু ততক্ষণে তাদের দলের আরও কেউ কেউ সেখানে এসে পড়েছে এবং গর্জন করে উঠেছে রামহরির হাতের বন্দুক।

বিকট আর্তনাদ করে মূর্তিটা শূন্যে বিদ্যুৎ-বেগে দুই বাহু ছড়িয়ে সেইখানে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর নড়ল না!

কুমার তখন মাটির উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে বসে অত্যন্ত হাঁপাচ্ছে!

বিমল আগে তার কাছে দৌড়ে গিয়ে ব্যস্তস্বরে সুধোলে, 'ভাই, তোমার কি খুব লেগেছে?'

কুমার মাথা নেড়ে বললে, 'লেগেছে সামান্য, কিন্তু চমকে গেছি বেজায়! ও যেন আকাশ ফুঁড়ে আমার মাথায় লাফিয়ে পড়ল!'

বিমল মুখ তুলে দেখে বললে, আকাশ ফুঁড়ে নয় বন্ধু! ওই দ্যাখো, সিঁড়ির এপাশেই একটা গুহা রয়েছে! ওটা নিশ্চয়ই ওইখানে লুকিয়ে ছিল!'

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু কী ভয়ানক ওর চেহারা আর কী ভয়ানক ওর গায়ের জোর! ওকে মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু ও কি মানুষ?'

বিমল বললে, 'এখনও ওকে ভালো করে দেখবার সময় পাইনি। এসো, এইবারে ওর চেহারা পরীক্ষা করা যাক!'

তারা যখন সেই ভূপতিত মৃত শত্রুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন বিনয়বাবু হাঁটু গেড়ে মূর্তিটার পাশে বসে দুই হাতে তার মাথাটি ধরে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

মূর্তিটা লম্বায় ছয়ফুটের কম হবে না—দেখতেও সে সাধারণ মানুষের মতন, আবার মানুষের মতন নয়-ও! কারণ তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়ো ও

অধিকতর পেশিবদ্ধ। তার গায়ের রং ফর্সাও নয়, কালোও নয় এবং সর্বাঙ্গে বড়ো বড়ো চুল! তার মুখ 'মঙ্গোলিয়ান' না হলেও, খানিকটা সেই রকম বলেই মনে হয়, আবার তার মধ্যে আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ান' মুখেরও আদল পাওয়া যায়। সারা মুখখানায় পশুত্বের বিশ্রী ভাব মাখানো। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় দীর্ঘ কেশ, গায়ে উলকি এবং পরনে কেবল একটি চামড়ার জাঙ্গিয়া!

বিমল বললে, 'কুমার, এ নিশ্চয়ই মানুষ, তবু একে মানুষের স্বগোত্র বলে তো মনে হচ্ছে না! এর দেহ আর মানুষের দেহের মাঝখানে কোথায় যেন একটা বড়ো ফাঁক আছে!'

বিনয়বাবু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ এ মানুষ! পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ!'

বিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ? তার অর্থ?'

—'তার অর্থ? 'অ্যানথ্রপলজি' জানা থাকলে আমার কথার অর্থ বুঝতে তোমার কোনওই কষ্ট হত না! প্রথম সত্যিকার মানুষের নাম কি জানো? 'ক্রো-ম্যাগনন'! আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে আন্দাজ বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা ইউরোপে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আমাদের সামনে মরে পড়ে আছে, সেই জাতেরই একটি মানুষ। আমি একে খুব ভালো করে পরীক্ষা করেছি, আমার মনে আর কোনও সন্দেহই নেই।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার কথা যতই শুনছি ততই আমার বিস্ময় বেড়ে উঠছে। আমরা তো আপনার মতন পণ্ডিত কী বৈজ্ঞানিক নই, আমাদের আর একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আচ্ছা, তাই বলছি। আগে ইউরোপে সত্যিকার মানুষ আসবার আগে শেষ যে জাতের মানুষ বাস করত তার নাম হচ্ছে 'নিয়ানডের্টাল' মানুষ—তাদের চেহারা বানরের মতো না হলেও তাদের দেখলে গরিলার মূর্তি মনে পড়ে। তাদের স্বভাব ছিল বনমানুষের মতো, চলাফেরার ভঙ্গিও ছিল বনমানুষের মতো, সেই ভীষণ বন্য হিংস্র প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমাদের কিছুই মেলে না। তাদের সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। ইউরোপে তারা রাজত্ব করেছিল দুই লক্ষ বৎসর ধরে। তারপর ইউরোপে সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব হয়—ক্রো-ম্যাগনন মানুষ হচ্ছে সত্যকার মানুষদের একটি জাত। ক্রো-ম্যাগনন মানুষদের গড়ন ছিল মোটামুটি আমাদেরই মতো। তারা সব উন্নত, তাই নিয়ানডের্টাল মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা না করে ইউরোপ থেকে তারা তাদের বিতাড়িত বা লুপ্ত করে। মনুষ্যোচিত অনেক গুণই যে তাদের ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তারা জামা-কাপড় পরত, ঘোড়া পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়তে জানত, মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে গোর দিত, বড়শি গেঁথে মাছ ধরত, ছুরি, ছুঁচ, প্রদীপ, বর্শা, তির-ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করত। ক্রমশ তারা যে খুব সভ্য হয়ে উঠেছিল এমন অনুমানও করা যায়। কারণ ফ্রান্স ও স্পেনের একাধিক গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে তারা অসংখ্য জীবজন্তুর যেসব ছবি এঁকেছিল, তা এখনও বর্তমান আছে। এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকররাও তাদের চেয়ে ভালো ছবি আঁকতে পারেন না—সেসব ছবির লাইন যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জোরালো। তাদের মূর্তিশিল্পের—অর্থাৎ ভাস্কর্যেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যাদের আর্ট এমন উন্নত তাদের স্বভাবও যে 'নিয়ানডের্টাল' যুগের তুলনায় অনেকটা উন্নত ছিল

এমন কল্পনা করলে দোষ হবে না। পরে উত্তর এশিয়া থেকে আর্যজাতির কোনও দল যায় ভারতে, কোনও দল যায় পারস্যে এবং কোনও দল যাত্রা করে ইউরোপে। আর্যরা ভারতের অনার্যদের দাক্ষিণাত্যের দিকে তাড়িয়ে দেন। ইউরোপীয় আর্যজাতির দ্বারা ক্রো-ম্যাগনন প্রভৃতি ইউরোপীয় অনার্য বা আদিম জাতিরাও বিতাড়িত হয়। হয়তো নানাস্থানে ভারতের মতো ইউরোপেও আর্যের সঙ্গে অনার্যের মিলন হয়েছিল। ভারতের অনার্যরা যে অসভ্য ছিল না, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাই তার প্রমাণ। সুতরাং ইউরোপের আদিম অধিবাসী এই ক্রো-ম্যাগননরাও খুব সম্ভব অসভ্য ছিল না, তাই তারা ওখানকার আর্যদের সঙ্গে হয়তো অল্পবিস্তর মিশে যেতে পেরেছিল। মোটকথা, ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষ আজও এখনও দেখা যায়—যদিও সেখানে 'ক্রো-ম্যাগনন' মানুষের জাত লুপ্ত হয়েছে। বিমল, আমি এই বিপজ্জনক দেশে এসে পড়ে পদে পদে ভয় পাচ্ছি বটে, কিন্তু আজ এখানে এসে যে অভাবিত আবিষ্কার করলুম, তার মহিমায় আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা সার্থক হয়ে উঠল। খাঁটি ক্রো-ম্যাগনন জাতের মানুষ আজও যে পৃথিবীতে আছে, এ খবর নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে আমাদের নাম অমর হবে।'

বিমল, কুমার ও কমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত চোখ মেলে সেই সুপ্রাচীন জাতের আধুনিক বংশধরের আড়ষ্ট মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার খাঁটি ক্রো-ম্যাগননরা কত বড়ো সভ্য ছিল জানি না, কিন্তু সে-জাতের একটি মাত্র নমুনা দেখেই আমার পিলে চমকে যাচ্ছে। উঃ, মানুষ হলেও এ বোধহয় গরিলার সঙ্গে কুস্তি লড়তে পারত! এ জাতের সঙ্গে ভবিষ্যতে দূর থেকেই কারবার করতে হবে।'

কুমার বললে, 'এদিকে আমরা যে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। জনতার কোলাহল ভয়ানক বেড়ে উঠছে, ব্যাপার কী দেখা দরকার।'

কমল সেই সুদীর্ঘ 'ব্র্যাকেট' বা বারান্দার মতো জায়গাটার ধারে গিয়ে নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখলে। পরমুহূর্তেই অভিভূত স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! এ কী ব্যাপার!'

বিমল ও কুমার তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। নীচের দৃশ্য দেখে তাদেরও চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

হারা মহাদেশ

এবারে তাদের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত ও বিশাল দৃশ্যপটের মতন পরিপূর্ণ মহিমায় যা জেগে উঠল, আগেকার বিস্ময়ের চেয়েও তা কল্পনাতীত। সে দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে গেলে পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই কুলোবে না।

উপর থেকে সমস্ত দৃশ্যটাকে মনে হচ্ছে ঠিক একখানা 'রিলিফ ম্যাপে'র মতো। শিখরের

সেই বিরাট ফাঁকের ভিতর দিয়ে তখন দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল। ফাঁকের মধ্যাগত উজ্জ্বল রৌদ্র নীচের দৃশ্যের উপরে গিয়ে যেখানে বায়োস্কোপের মেশিনের মতো একটা প্রকাণ্ড আলোকমণ্ডল সৃষ্টি করেছে সেখানে সর্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশাল এক সরোবর! তাকে সাগরের একটা ছোটোখাটো সংস্করণও বলা চলে—কারণ সেই চতুষ্কোণ সরোবরের এপার থেকে ওপারের মাপ হয়তো মাইল দেড়েকের কম হবে না!

সরোবরটিকে দেখলেই মনে প্রশ্ন জাগে, এমন অদ্ভুত স্থানে কী করে এই অসম্ভব জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে? এর মধ্যে শিল্পী মানুষের দক্ষ হাত যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওখানে জল সরবরাহ হয় কোন উপায়ে? তার তলদেশে কি কোনও গুপ্ত উৎস আছে? না উন্মুক্ত শিখরপথ দিয়ে বৃষ্টির যে ধারা ঝরে, তাকেই ধরে রাখবার জন্যে এইখানে সরোবর খনন করা হয়েছে? এই সরোবরই বোধহয় এখানকার সমস্ত জলাভাব নিবারণ করে। কারণ তার চারিদিক থেকে চারটি বেশ চওড়া খাল আলোকমণ্ডল পার হয়ে আলো-আঁধারির ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক খালটি যে কত মাইল লম্বা, তা ধারণা করবার উপায় নেই!

খালের মাঝে মাঝে রয়েছে স্বর্ণবর্ণ সেতু! সোনার সাঁকো! শুনতে আজগুবি বলে মনে হয় বটে, কিন্তু এ অতি সত্য কথা। তবে রং দেখে মনে হয়, এ যেন খাদ-মেশানো সোনার মতো! হয়তো এদেশে লোহা মেলে না, কিংবা সোনার চেয়ে লোহাই এখানে বেশি দুর্লভ। হয়তো এখানে এত অতিরিক্ত পরিমাণে সোনা পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের লোহার দরে বিক্রি হয়। আগে আমেরিকাতেও অনেক দামি ধাতুরও কোনও দাম ছিল না। ইউরোপের লোকেরা সেই লোভে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাতি হিরার চেয়ে কাচকে বেশি দামি মনে করে।

সরোবরের চারিধারে প্রথমে রয়েছে শস্যখেতের পর শস্যখেত। কিছু কিছু বনজঙ্গলও আছে, তবে বেশি নয়। সূর্যের আলো না পেলে ফসল ফলে না, উন্মুক্ত শিখরের তলায় যেখানে রোদ আনাগোনা করে সেইখানেই খেতে ফসল উৎপাদন করা হয়। দূরের যেসব জায়গায় রোদ পৌঁছায় না, সেখানে রোদের আভায় দেখা গেল গাছপালা বা শ্যামলতার চিহ্ন নেই বললেই হয়।

আলোকমণ্ডলের বাইরে, শস্যখেতের পর খুব স্পষ্টভাবে চোখে কিছু পড়ে না বটে, কিন্তু এটুকু দেখা যায় যে, বাড়ির পর বাড়ির সারি কোথায় কত দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছে। কোনও বাড়ি দোতলা, কোনও বাড়ি তেতলা বা চারতলা! তাদের গড়নও অদ্ভুত—পৃথিবীর কোনও দেশেরই স্থাপত্যের সঙ্গে একটুও মেলে না।

অনেক সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাজপথ—প্রত্যেকটিই দূর থেকে সরলভাবে সরোবরের ধারে এসে পড়েছে। প্রত্যেক রাজপথে বিষম জনতা। দলে দলে লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ও ছুটাছুটি করছে! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা! প্রত্যেক পুরুষের হাতে বর্শা ও ঢাল এবং পৃষ্ঠে সংলগ্ন ধনুক! বর্শা ও ধনুকের দণ্ড চকচক করছে, সোনায় তৈরি বা স্বর্ণমণ্ডিত বলে! মেয়েদের পরনে ঘাঘরা ও জামা, কিন্তু পুরুষদের পরনে কেবল জাঙ্গিয়া, গা আদুড়! স্ত্রী ও পুরুষ—সকলেরই দেহ আশ্চর্যরূপে বলিষ্ঠ, বৃহৎ

ও মাংসপেশিবহুল। তাদের সকলেরই দীর্ঘতা প্রায় ছয় ফুট! সংখ্যায় তারা হয়তো আট-দশ হাজারের কম হবে না, বরং বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। কারণ সূর্যকরে সমুজ্জ্বল সরোবরের তীরবর্তী স্থান, তারপর আলো আঁধারির লীলাক্ষেত্র—এসব জায়গায় আর তিলধারণের ঠাঁই নেই, তারপর রয়েছে যে অন্ধকারময় সুদূর প্রদেশ, সেখানেও ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মশাল।

সরোবরের পূর্বে ও পশ্চিমে কেবলমাত্র দুইখানি প্রকাণ্ড অট্টালিকা রয়েছে। দুইখানি অট্টালিকার উপরেই রয়েছে দুটি বিশাল ও অপূর্ব গম্বুজ। দেখলেই বোঝা যায় একটি তার সোনার ও আর একটি রুপোর। প্রত্যেক অট্টালিকার উচ্চতা একশো ফুটের কম হবে না। খুব সম্ভব এর একটি রাজপ্রাসাদ এবং আর একটি দেবমন্দির। কারণ প্রথমোক্ত অট্টালিকার সুমুখের প্রাঙ্গণে দলবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুই হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা এবং শেষোক্ত অট্টালিকার চারিদিকে ভিড় করে রয়েছে শত শত মুণ্ডিত-মস্তক ব্যক্তি—হয়তো তারা পুরোহিত। এবং তাদের আশেপাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে দলে দলে হৃষ্টপুষ্ট গোরু। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই রাজবাড়ি থেকে ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত, সেই প্রায় দেড়মাইলব্যাপী সরোবরের উপরে স্থাপন করা হয়েছে অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র এক সেতু। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও মহাকাব্যেও এমন সেতুর কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি! স্বর্ণময় সেতু এবং তার রৌপ্যময় রেলিং। সমস্ত সেতুর উপর দিয়ে রবির কিরণ যেন ঝকমকিয়ে পিছলে পড়ছে—তাকালেও চোখ ঝলসে যায়। এই একটিমাত্র সাঁকো তৈরি করতে যত সোনা ও যত রুপো লেগেছে, তার বিনিময়ে অনায়াসে মস্ত এক রাজ্য কেনা যায়।

অবাক হয়ে এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে বিমলের মনে হল, সে যেন মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোনও অলৌকিক স্বপ্নলোকে গিয়ে পড়েছে—সেখানে সমস্তই অভাবিত অভিনব, সেখানে কিছুই বাস্তব নয়, সেখানে প্রত্যেক ধূলিকণাও পৃথিবীর কোটিপতির কাছে লোভনীয়!

কুমার আচ্ছন্ন স্বরে বলে উঠল, 'রূপকথায় এক দেশের কথা শুনেছি যেখানে সোনার গাছে ফোটে হিরারফুল। আমরা কি সেই দেশেই এসে পড়েছি?'

রামহরি কিছুমাত্র বিস্মিত হবার সময় পায়নি, সে যতই অসম্ভব ব্যাপার দেখছে ততই বেশি ভীত হয়ে উঠছে। সে দুই চোখ পাকিয়ে বললে, 'এসব হচ্ছে মায়া—ডাইনি-মায়া, ময়নামতীর ভেলকি! রূপকথা যে-দেশের কথা বলে, সেখানে বুঝি খালি সোনার গাছে হিরের ফুল ফোটে? সেখানে যেসব ভূত-পেতনি, শাঁকচুন্নি, কন্ধকাটা, রাক্ষস-খোক্ষসও থাকে, তাদের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

কুমার মৃদু হেসে বললে, 'তাদের কথা ভুলে যাইনি, রামহরি! এখনই তো তাদের একজনের পাল্লায় পড়েছিলুম, তুমিই তো আমাদের বাঁচালে।'

—'আবার তাদের পাল্লায় পড়লে শিবের বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচতে চাও তো এখনও পালিয়ে চলো।'

—'তোমার এই শিবের বাবাটি কে রামহরি? নিশ্চয়ই তিনি বড়ো যে-সে ব্যক্তি নন, আর তাঁকে শিবের চেয়েও ভক্তি করা উচিত। তাঁর নাম কী? যদি তাঁর নাম বলতে পারো, তাহলে এখনই এই সোনার দেশ ছেড়ে আমরা তোমার সঙ্গে লোহার জাহাজে চড়ে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হব।'

—'এ ঠাট্টার কথা নয় গো বাপু। শাস্তরে বলেছে, সুমুদ্দরের তলায় আছে রাক্ষসদের সুবর্ণ-লঙ্কা। আমরা নিশ্চয় সেইখানে এসে পড়েছি। শ্রীরামচন্দর না হয় রাবণ আর কুম্ভকর্ণকেই বধ করেছেন। ধরলুম রাবণের বেটা মেঘনাদও পটল তুলেছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের বেটাকে তো কেউ আর বধ করতে পারেনি। বাপের মতন হয়তো তার ছ-মাস ধরে ঘুমনোর বদ-অভ্যাস নেই, সে যদি এখন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে 'রে রে' শব্দে তেড়ে আসে—তাহলে আর কি আমাদের রক্ষে থাকবে?'

কমল বললে, 'দেখুন বিমলবাবু। এখানে মানুষ আছে, চতুষ্পদ জীবও আছে, ওই সরোবরের জলে হয়তো জলচরও আছে, কিন্তু কোথাও একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছ কমল। আমি এতক্ষণ ওটা লক্ষ্য করিনি। এটা পুরোদস্তুর পাতাল-রাজ্যই বটে। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? সকলেরই মতে, এই দ্বীপটা এতদিন সমুদ্রের তলায় ডুবে ছিল, আজ হঠাৎ ভেসে উঠেছে, তাই নাবিকদের কোনও 'চার্টে'ই এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দ্বীপের উপরকার পাথরের মূর্তিগুলোয় আর 'ব্রোঞ্জে'র দরজার গায়ে সামুদ্রিক শেওলা দেখে সেই কথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি, এই দ্বীপ-পাহাড়ের গর্ভটা হচ্ছে বিরাট একটা গুহার মতো,—এমনকী এর সবচেয়ে উঁচু-শিখরটাও ফাঁপা, তার ভিতর দিয়ে অবাধে আলো আর বাতাস আসে। দ্বীপটা যখন সমুদ্রের তলায় ছিল, তখন ব্রোঞ্জের দরজা ভেদ করে সমুদ্রের জল না-হয় ভিতরে ঢুকতে পারত না। কিন্তু শিখরের অত-বড়ো ফাঁকটা তো কোনওরকমেই বন্ধ করা সম্ভব নয়, ওখানে সমুদ্রকে বাধা দেওয়া হত কোন উপায়ে?'

খানিকক্ষণ উপরের ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে থেকে কুমার বললে, 'তোমার প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে—সম্ভবত কেবল পাহাড়ের শিখরের অংশটুকু বরাবরই জলের উপরে জেগে থাকত। এটা নিয়মিত জাহাজ চলাচলের পথ নয় বলে কোনও 'চার্টে'ই সামান্য একটা জলমগ্ন পাহাড়ের শিখরের উল্লেখ নেই।

বিমল বললে, 'বোধহয় তোমার অনুমানই সত্য।'

বিনয়বাবু এতক্ষণ একটিও কথা উচ্চারণ করেননি। তিনি স্তব্ধভাবে কখনও নীচের সেই অতুলনীয় দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং কখনও বা মাথা হেঁট করে অর্ধনিমীলিত নেত্রে কী যেন চিন্তা করছেন,—ওই দৃশ্য ও নিজের চিন্তা ছাড়া পৃথিবীর আর সব কথাই তিনি যেন এখন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছেন।

হঠাৎ কুমার তাঁকে ডেকে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি একটাও কথা বলছেন না কেন?'

বিনয়বাবু চমকে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ, কী বলছ? হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না।'

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'কোন বিষয়ে কী সন্দেহ থাকতে পারে না?'

বিনয়বাবু বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঠিক যেন নৃত্য করতে করতেই বললেন, 'লস্ট আটলান্টিস! লস্ট আটলান্টিস!'

বিমল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, 'রামহরি, বিনয়বাবুকে ধরো! ওঁর কি ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

বিনয়বাবু আরও চেঁচিয়ে বললে, 'ওহো, লস্ট আটলান্টিস! লস্ট আটলান্টিস! ফাউন্ড অ্যাটলাস্ট!'

কুমার সভয়ে বললে, 'কী সর্বনাশ! বিনয়বাবু কী শেষটা সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন?'

বিমল তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর দুই হাত চেপে ধরে বললে, 'লস্ট আটলান্টিস কী বিনয়বাবু?'

—'লস্ট আটলান্টিস! বিমল, তোমাদের যদি সামান্য কিছু ইতিহাসও পড়া থাকত, আমাকে তাহলে পাগল মনে করতে পারতে না! জানো নির্বোধ ছোকরার দল, আমরা আজ এক অমূল্য আবিষ্কারের পরে আবার আর এক অসম্ভব আবিষ্কার করেছি? ক্রো-ম্যাগনন মানুষ আর লস্ট আটলান্টিস!'

বিমল বললে, 'কী মুশকিল, লস্ট আটলান্টিস পদার্থটা কী, আগে সেইটেই বলুন না!'

'—লস্ট আটলান্টিস মানে 'আটলান্টিস' নামে একটা হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ! যখন সভ্য ভারতবর্ষ ছিল না, সভ্য মিশর ছিল না, বাবিলন ছিল না, গ্রিস-রোম ছিল না, আটলান্টিস উঠেছিল তখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে! আজ সেই আটলান্টিস হারিয়ে গিয়েছে, আর পণ্ডিতেরা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছেন! সেই মহাদেশেরই নাম থেকে নাম পেয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। ওহো কী আনন্দ! আমরা আজ সেই কতকালের হারানো মহাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছি—আমরা তাকে আবার খুঁজে পেয়েছি! আমরা যখন এখান থেকে স্বদেশে ফিরে যাব, তখন সারা পৃথিবীর পণ্ডিতেরা আমাদের মাথায় তুলে নৃত্য করবেন!'

বিমল বললে, 'সেই আনন্দে আপনি কি এখন থেকেই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন? কিন্তু বিনয়বাবু, এই দ্বীপের উপরটা মাইল পাঁচ ছয়ের বেশি নয়, আর ভিতরটা না-হয় ধরলুম আরও-কিছু বড়ো! একেই কি আপনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার মতন একটা মহাদেশ বলতে চান?'

বিনয়বাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বিমল, তুমি হচ্ছ একটা মস্ত-বড়ো আস্ত হস্তীমূর্খ! কেবল গোঁয়ার্তুমি করতেই শিখেছ, তোমাকে বোঝানো আমার সাধ্যের বাইরে।'

কুমার মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখতে দেখতে উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'বিমল প্রস্তুত হও! লস্ট আটলান্টিস চুলোয় যাক। ওদের সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে।'

সেই পাথরের বারান্দার ধারে গিয়ে বিমল দেখল, সংকীর্ণ সিঁড়ির ধাপগুলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় দেড়শো ফুট নীচে নেমে গিয়েছে—সেই ধাপের সার অবলম্বন করে নীচে নামবার কথা মনে হলেও মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু সেই সিঁড়ি বয়েই একে একে লোকের পর লোক উপরে উঠে আসছে এবং সোপান-শ্রেণীর তলাতেও হাজার লোক তাদের পিছনে পিছনে আসবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। শত্রুদের সম্মিলিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায়!

বিমল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বেশ শান্ত ভাবেই বললে, 'কুমার, আমরা এখানে নির্ভয়েই থাকতে পারি। ওরা নিশ্চয়ই বন্দুককে চেনে না। ওরা জানে না, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমরা যদি গোটা-চারেক বন্দুক ছুড়তে থাকি, তাহলে ওদের পাঁচ লক্ষ লোককেও অনায়াসে বাধা দিতে পারি।'

পাতাল-রাজ্যের সৈনিকরা তখন সিঁড়ির দুই-তৃতীয়াংশ পার হয়ে এসেছে—তাদের কেউ করছে সোনার বর্শা আস্ফালন, কেউ ছুড়ছে ধনুক থেকে তির।

বিমল বললে, 'কিন্তু ওরা যদি কোনও গতিকে একবার উপরে উঠতে পারে, তাহলে আমাদের আর বাঁচোয়া নেই। তাহলে কালকেই ওদের দেবতার পায়ের তলায় আমাদের কাটা-মুণ্ডুগুলো ভাঁটার মতো গড়াগড়ি যাবে। সুতরাং ওদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা না দিয়ে উপায় নেই।... সেপাই।'

সেপাইরা বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিনয়বাবু ব্যস্তভাবে দৌড়ে গিয়ে বললেন, 'বিমল, বিমল, তুমি ওদের উপরে গুলি ছুড়বে? বলো কী। ওরা যে অদ্ভুত এক প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা!'

বিমল রুক্ষ স্বরে বললে, 'রাখুন মশাই আপনার প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা! আপনি কি বলতে চান, ওরা নির্বিবাদে এখানে এসে আমাদের এই আধুনিক মানবজাতির নমুনাগুলিকে দুনিয়া থেকে লুপ্ত করে দিক? মাপ করবেন, এতটা উদার হতে পারব না। আটজন নাবিককে ওরা কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, আপনি কি তা শোনেন নি—না—তাদের ছিন্নমুণ্ড দেখেননি?'

বিনয়বাবু ম্লানমুখে নিরুত্তর হলেন।

বিমল বললে, 'সেপাই! তোমরা পাঁচজন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াও। পাঁচজনেই একবার করে বন্দুক ছোড়ো। তারপরেও যদি ওরা উপরে উঠতে চায়, তাহলে আবার পাঁচজন বন্দুক ছুড়বে!'

সেপাইরা যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

আগেই বলেছি, সেই সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি দুজন উঠতে বা নামতে কষ্ট হয়। শত্রুরাও

একসারে একজন করে উপরে উঠে আসছিল। তখন প্রায় একশো-জনেরও বেশি লোক সেই অতি-সংকীর্ণ সুদীর্ঘ সোপানকে অবলম্বন করেছে! বিমলদের ভয় দেখাবার জন্যে তারা কেবল হই-হই শব্দ নয়—অনেক রকম ভীষণ মুখভঙ্গি করতেও ছাড়ছে না।

বিমল দুঃখিতভাবে মৃদু হেসে বললে, 'বোকারা জানে না, মূর্তিমান যমের দলকে ওরা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। আটজন নিরস্ত্র নাবিককে বধ করে ওদের বুক ফুলে গেছে।...নাঃ, আর উঠতে দেওয়া নয়। সেপাই, 'ফায়ার'!'

একসঙ্গে পাঁচটা বন্দুক ভীষণ শব্দে ধমক দিয়ে উঠল।

পরমুহূর্তেই যা ঘটল, তা ভয়াবহ! সব-উপরের তিনজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে নীচের লোকগুলোর উপরে ছিটকে পড়ল এবং তার পরেই দেখা গেল এক অসহনীয় ভীষণ দৃশ্য। হাজার হাজার কণ্ঠের সুদীর্ঘ ভীত আর্তনাদের মধ্যে, সেই অতি-উচ্চ অতি-সংকীর্ণ সোপানশ্রেণী থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ-জন লোক উপরের পড়ন্ত দেহগুলোর ধাক্কা সামলাতে না পেরে সিঁড়ির বাইরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল এবং তারা যখন অনেক নীচের মাটিতে গিয়ে পৌঁছোল, তখন তাদের দেহগুলো পরিণত হল ভয়াবহ রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে। উপরের লোকদের অবস্থা দেখে নীচের সিঁড়ির লোকেরা কোনওরকমে দেওয়াল ধরে বা বেগে নেমে পড়ে এ-যাত্রা আত্মরক্ষা করলে।

বিনয়বাবু মাটিতে বসে পড়ে দুই কানে হাত-চাপা দিয়ে কাতর সুরে বললে, 'আর সইতে পারি না—আর আমি সইতে পারি না! বিমল, থামো, থামো!'

বিমল অটলভাবে বললে, 'এখনও নীচের ভিড় কমেনি, এখনও অনেকে আস্ফালন করছে, এখনও সুবিধে পেলে ওরা উপরে ওঠবার চেষ্টা করতে পারে। ওদের চোখ আর একটু ফুটিয়ে দেওয়া যাক, নরবলি দেওয়ার মজাটা ওরা টের পাক।... শোনো সেপাইরা, তোমরা সবাই মিলে এবার নীচের ওই ভিড়ের উপরে একবার গুলিবৃষ্টি করো তো।'

গর্জে উঠল এবার একসঙ্গে চব্বিশটা বন্দুক সেই প্রকাণ্ড গুহাজগৎকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে। নিম্নে সমবেত ভিড়ের ভিতরে পাঁচ-ছয়জন লোক তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার কণ্ঠের ভয়-বিস্ময়পূর্ণ তীব্র ও উচ্চ আর্তস্বরে চতুর্দিকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মিনিট-পাঁচেক পরে দেখা গেল সেই বিপুল জনতা যেন কোন মায়াবীর মন্ত্রগুণে কোথায় অদৃশ্য!

বিমল বললে, 'ব্যাস। বন্দুক যে কী চীজ, এইবারে ওরা বুঝে নিয়েছে।—সিঁড়ির উপরে বোধহয় কেউ আর পা ফেলতে ভরসা করবে না।'

বিনয়বাবু যন্ত্রণা-ভরা স্বরে বললেন, 'এ তো যুদ্ধ নয়, এ যে হত্যা! আমরা সবাই হত্যাকারী।'

বিমল বললে, 'কী করব বিনয়বাবু, আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম!'

আরক্ত মুখে তীব্র কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, 'হুঁ, আত্মরক্ষাই বটে! চমৎকার আত্মরক্ষা! আমরা হচ্ছি লোভী দস্যু। ওরা কি আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে? আমরাই তো পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছি ওদের সোনার দেশ লুণ্ঠন করতে—একটা প্রাচীন জাতিকে ধ্বংস করতে। ছি, ছি, ঘৃণায় অনুতাপে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে! ধিক আমাদের!

তখন বিমলের খেয়াল হল—সত্যই তো, পরের দেশ আক্রমণ করেছে এসে তারা তো নিজেরাই। সুতরাং তাদের বিদেশি শত্রু বলে বাধা দেবার বা বধ করবার অধিকার যে এই পাতালবাসীদের আছে, সেবিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নেই! তখন সে লজ্জিতভাবে বললে, 'বিনয়বাবু, আমি মাপ চাইছি! লস্ট আটলান্টিস সম্বন্ধে আপনি কী জানেন বলুন। যদি বুঝি ওরা সত্যই কোনও প্রাচীন সভ্য জাতির শেষ বংশধর, তাহলে ওদের বিরুদ্ধে আমি আর একটিমাত্র আঙুলও তুলব না, এখনই এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজে গিয়ে উঠব।'

—'প্রতিজ্ঞা করছ?'

—'প্রতিজ্ঞা করছি।'

তখন শিখরের মুখ থেকে সূর্যালোক ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নীচে থেকে অদৃশ্য হয়েছে পাতাল-রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের চিত্রমালা। বাইরে শূন্যে আলোকোজ্জ্বল নীলিমাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গুহার ভিতরে ঘনিয়ে এসেছে নিশীথের প্রথম অন্ধকার। সে-অন্ধকারের ভিতরে পাতালপুরীর কোনও ভীত হস্ত আজ একটিমাত্র প্রদীপও জ্বাললে না এবং সর্বত্রই থমথম করতে লাগল একটা অস্বাভাবিক বুকচাপা নিস্তব্ধতা।

কুমার বললে, 'সেপাইরা। আজকের রাতটা আমাদের এইখানেই কাটাতে হবে। লণ্ঠনগুলো সব জ্বেলে রাখো, আর সিঁড়ির উপর-ধাপে পালা করে চারজন লোক বসে সকাল পর্যন্ত পাহারা দাও। খুব হুঁশিয়ার থেকো, নইলে সবাইকে মরতে হবে।'

বিমল বিনয়বাবুর সামনে বসে পড়ে বললে, 'এখন বলুন আপনার লস্ট আটলান্টিসের গল্প।'

বিনয়বাবু বললেন, 'শোনো! কিন্তু জেনো, এটা গল্প নয়, একেবারে নিছক ইতিহাস। বড়ো বড়ো পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত যা আবিষ্কার বা প্রমাণ করেছেন, আমি সেই কথাই তোমাদের কাছে বলতে চাই।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

লস্ট আটলান্টিসের ইতিহাস

ধরো, এগারো বা বারো বা তেরো হাজার বছর আগেকার কথা। যা বলব তা এত পুরানো কালের কথা যে, দু-এক হাজার বছরের এদিক-ওদিক হলেও বড়ো-কিছু এসে যায় না। ওই সময়েই আটলান্টিস সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারও কত কাল আগে যে এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে-কথা আর কেউ বলতে পারবে না।

যেসব পুরানো জাতি সভ্য ছিল বলে আজ পুরাণে বা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, সেই মিশরি, ভারতীয়, চৈনিক, বাবিলনীয়, পারসি ও গ্রিক জাতির নাম তখন কেউ জানত না, অনেক জাতির জন্ম পর্যন্ত হয়নি!

ক্রো-ম্যাগনন প্রভৃতি সত্যিকার আদি মানুষজাতেরা যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছে, তখন

পৃথিবীর চেহারা ছিল একেবারে অন্যরকম। আধুনিক খুব ভালো ছাত্ররাও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর ম্যাপ দেখলে কেলাসের 'লাস্ট-বয়ের' মতন বোকা বনে যাবে।

তখন রেলগাড়ি থাকলে একবারও জল না ছুঁয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ডাঙা দিয়ে আনাগোনা করা যেতে পারত। এমনকী মাঝে মাঝে দু-একটা প্রণালী পার হবার জন্যে দু-একবার মাত্র ছোটো ছোটো নৌকায় চড়ে ভারতবাসীরা ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে পদব্রজেই অনায়াসে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হতে পারত। তখন সিংহল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং আমরা—অর্থাৎ বাঙালিরা আজ যেখানে বাস করছি সেই বাংলাদেশের উপর দিয়ে বইত অগাধ সমুদ্রের জলতরঙ্গ। বাঙালি জাতেরও জন্ম হয়নি!

ইউরোপে তখন ভূমধ্যসাগর ছিল না, তার বদলে ছিল দুটি ভূমধ্যবর্তী হ্রদ। ইতালি ছিল আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ আফ্রিকা ও ইউরোপ ছিল পরস্পরের অঙ্গ—একই মহাদেশ। এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর ফ্রান্স ছিল অভিন্ন।

আটলান্টিস সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল আফ্রিকা ও আমেরিকার মাঝখানে। এক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ! গ্রিক পণ্ডিত প্লেটোর মতে, এশিয়া, এশিয়া-মাইনর ও লিবিয়াকে এক করলে যত বড়ো হয় এই দ্বীপটি আকারে তত বড়োই ছিল। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে কিছু ছোটো।

আটলান্টিসের উল্লেখ আধুনিক কোনও ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। তার কারণ, যেখান থেকে আধুনিক ইতিহাসের আসল মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই মিশর ও গ্রিস যখন সভ্য তখনও আটলান্টিসের অস্তিত্ব ছিল না। মিশর ও গ্রিস সভ্য হবার কয়েক হাজার বছর আগেই পৃথিবী থেকে আটলান্টিস হয়েছে অদৃশ্য। কিন্তু তখন আটলান্টিসের বহু বাসিন্দা স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই লোকের মুখে মুখে ও জনপ্রবাদে আটলান্টিসের অনেক কাহিনীই তখন সারা-পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। আজ আমরা তার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছি বটে, কিন্তু প্রাচীন মিশর ও গ্রিসের লোকেরা এই লুপ্ত আটলান্টিসের অনেক খবরই জানত।

গ্রিক পণ্ডিত প্লেটোর বিখ্যাত বর্ণনা থেকে জানা যায়, আটলান্টিস দ্বীপ ছিল অসংখ্য লোকের বাসভূমি। তার নগরে ছিল শত শত অট্টালিকা, বিরাট স্নানাগার, বৃহৎ মন্দির, অপূর্ব উদ্যান, আশ্চর্য সব খাল ও বিচিত্র সব সেতু প্রভৃতি। একটি খাল ছিল তিনশো ফুট চওড়া, একশো ফুট গভীর ও ষাট মাইল লম্বা! তার তীরে তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর এবং তার ভিতর দিয়ে আনাগোনা করত বড়ো বড়ো জাহাজ। একশো ফুট চওড়া সাঁকোরও অভাব ছিল না!

মন্দির ছিল শত শত ফুট উঁচু এবং সেই অনুপাতেই চওড়া। মন্দিরের চুড়ো ছিল সুবর্ণময় এবং বাহিরের দেয়ালগুলো রৌপ্যময়। মন্দিরের ভিতরের অংশও সোনা, রূপা ও হাতির দাঁতে মোড়া ছিল। তাদের মধ্যে ছিল খাঁটি সোনায় গড়া মূর্তির ছড়াছড়ি!

শহরের পথে পথে দেখা যেত গরম জলের উৎস এবং ঠান্ডা জলের ফোয়ারা। রাজপরিবার, সাধারণ, পুরুষ, নারী এমনকী অশ্ব প্রভৃতি পালিত পশুদেরও জন্যে ছিল আলাদা আলাদা স্নানাগার! নানা জায়গায় বড়ো বড়ো ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আটলান্টিসের মধ্যে পবিত্র জীবরূপে গণ্য হত ষণ্ডরা। এবং আটলান্টিসকে রক্ষা করবার জন্যে নিয়মিত মাহিনা দিয়ে পালন করা হত ষাট হাজার সৈন্যকে।

প্লেটো বলেন, কিন্তু আটলান্টিকের অধিবাসীরা নাকি ঐশ্বর্যের ও শক্তির গর্বে অত্যাচারী, অবিচারী ও মহাপাপী হয়ে উঠেছিল— শেষটা আর ধর্মের শাসন মানত না। সেইজন্যে দেবতারাও তাদের উপরে বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে দেবতার ক্রোধে আচম্বিতে সমুদ্র সংহারমূর্তি ধরে এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যেই সমগ্র আটলান্টিসকে গ্রাস করে ফেললে।

এটা হচ্ছে রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হবার নয় হাজার বছর আগেকার ঘটনা।

প্লেটোর বর্ণনা যুগে যুগে বহু লোককে কৌতূহলী করে তুলেছিল বটে, কিন্তু আগে সকলেই ভাবতেন, তাঁর আটলান্টিস হচ্ছে কাল্পনিক দেশ।

মিশর, বাবিলন, গ্রিস ও রোম প্রভৃতি দেশের পুরানো সভ্যতা আজ অতীতের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের অগুনতি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। আটলান্টিসের অস্তিত্বের চিহ্ন কোথায়? এই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের যুক্তি। কিন্তু ওঁরা ভুলেও একবার ভাবেন না যে, ওসব দেশ আটলান্টিসের মতো মহাসাগরের কবলগত হয়নি। কত যুগযুগান্তের আগে সে সভ্যতা অতল জলে ডুবে পড়েছে, আজ তার চিহ্ন পাওয়া যাবে কেমন করে?

কিন্তু এখানকার অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ, প্লেটোর আটলান্টিসকে আর অলস কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন না। তাঁরা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে আটলান্টিসের অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন, এখানে সে-সমস্ত কথা বলবার সময় হবে না। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যদি তোমাদের আগ্রহ থাকে, তাহলে অন্তত Lewis Spence সাহেবের The History of Atlantis নামে বইখানা পড়ে দেখো।

একালের পণ্ডিতদের মতো, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কাছে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কেনারি, অর্জোস ও মেডিরা প্রভৃতি যেসব দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়, ওগুলি হচ্ছে জলমগ্ন আটলান্টিসেরই সর্বোচ্চ অংশবিশেষ।

ফ্রান্সের Pierre Terminer (Director of Science of the Geographical Chart of France) সাহেব বলেন, পূর্বোক্ত দ্বীপগুলির কাছে আটলান্টিক মহাসাগর এখনও অশান্ত হয়ে আছে। ওখানে যে-কোনও সময়ে পৃথিবীর আর সব দেশের আগোচরে ভীষণ জলপ্লাবন বা খণ্ডপ্রলয় হবার সম্ভাবনা এখনও আছে। সুতরাং আটলান্টিস ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে প্লেটো যা যা বলেছেন তা অসম্ভব মনে করা চলে না।

তোমাদের কাছে আমি আগেই বলেছি যে ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইউরোপে গিয়ে হাজির হয়েছিল, আর্যদের বহু সহস্র বৎসর আগে। এ-বিষয়ে সব পণ্ডিতই একমত।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, বারংবার খণ্ডপ্রলয় বা সামুদ্রিক বন্যায় আটলান্টিস যখন ক্রমে ক্রমে পাতাল-প্রবেশ করছিল, তখন সেখানকার অসংখ্য বাসিন্দা আত্মরক্ষা করবার জন্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ও আমেরিকায় পালিয়ে যায়। ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মতন জায়গায় কেমন করে এসে আবির্ভূত হয়েছিল, এ-সম্বন্ধে সদুত্তর পাওয়া যায় না। ওদের উৎপত্তির ইতিহাস আগে ছিল রহস্যময়। কিন্তু এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, তারা আটলান্টিসেরই পলাতক সন্তান। কারণ আটলান্টিস দ্বীপ ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারই প্রতিবেশীর মতো।

Donelly Brasseur be Bourbourg ও Augustas La plongeon সাহেবরা বলেন— 'অতীত যুগে আটলান্টিস তার সন্তানগণকে সারা পৃথিবীর সর্বত্রই পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাদের অনেকেই আজ আমেরিকায় 'রেড ইন্ডিয়ান' নামে বিচরণ করছে। তারা প্রাচীন মিশরে গিয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। তারা উত্তর এশিয়ায় গিয়ে তুরানি ও মঙ্গোলিয়ান নামে পরিচিত হয়েছে।' (Some Notes on the Lost Atlantis : Papyras : March, 1921.)

বিমল, কুমার, কমল! তোমরা সকলেই দেখছ, আজ আমরা যেখানে এসে হাজির হয়েছি, প্লেটো আর অন্যান্য পণ্ডিতদের বর্ণনার সঙ্গে এর কতটা মিল আছে? অদ্ভুত খাল, সেতু, প্রাসাদ, মন্দির, সোনা-রূপার ছড়াছড়ি! এমনকী পবিত্র ষণ্ড ও ক্রো-ম্যাগনন মানুষদেরও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি! হারা আটলান্টিস যে এইখানকার সমুদ্রের ভিতরেই লুকিয়ে আছে, পণ্ডিতরা আগে থাকতেই তা আমাদের বলে রেখেছেন। এখনও কি তোমাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে?

সমগ্র আটলান্টিসের সামান্য অংশই আমরা দেখতে পেয়েছি। আসল দেশটা যখন ডুবে যায়, তখন এই আশ্চর্য আর অসাধারণ গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়ে কয়েক শত লোক প্রাণরক্ষা করেছিল। তাদের বংশধররা আজ হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ক্ষুদ্র পাতাল-রাজ্যের মধ্যে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে, আর প্রাচীন অবিকৃত সভ্যতার প্রদীপ-শিখাটি এতদিন ধরে কোনও রকমে জ্বালিয়ে রেখেছে। দ্বীপের উপরে যেসব বিভীষণ, অতিকায় প্রস্তর-মূর্তি দেখেছ, তাদের বয়স হয়তো পনেরো-বিশ হাজার বৎসর। তারা সেই স্মরণাতীত কাল আগেকার অত্যাচারী নিষ্ঠুর আর এখানকার তুলনায় অর্ধসভ্য মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে— তাদের মৌখিক ভাবের সঙ্গে তাই আধুনিক মানুষের মার্জিত মুখের ছবি মেলে না।

আটলান্টিসের যেসব সন্তান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রস্থান করেছে, বিভিন্ন যুগের মানুষ আর বিভিন্ন সভ্যতার সংশ্রবে এসে তারা এখন নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে তাই আজ তার তাদের চেনা যায় না। কিন্তু এই পাতাল-রাজ্যের বাসিন্দারা সেই প্রাচীন সভ্যতারই খাঁটি নিদর্শন অবিকলভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই বললেও চলে। কেবল মাঝে মাঝে— হয়তো যুগ-যুগান্তর পরে— সমুদ্রের জল সরে গেলে তারা ব্রোঞ্জের দরজা খুলে দ্বীপের উপরে এসে বাইরের জগৎকে বহুকাল পরে ফিরে পাওয়া বন্ধুর মতো এক-একবার চোখ মেলে প্রাণ ভরে দেখে নেয়। এমনভাবে কোনও একটা জাতি যে হাজার হাজার বৎসর ধরে বাঁচতে পারে, সেটা ধারণাই করা যায় না। কিন্তু এই ধারণাতীত ব্যাপারটাও সম্ভবপর হয়েছে। চোখের সামনে যাকে দেখছি তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই!

আমরা ভাগ্যবান, তাই এমন বিচিত্র দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পেলুম—পাতালবাসী অতীতকে পেলুম জীবন্ত রূপে বর্তমানের কোলে! এখানকার মানুষদের উপর আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত—কারণ এদেরই সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত-সভ্যতার অগ্রদূত। এরা আমাদের কোনও অপকার করেনি। তবে এমন-একটা দুর্লভ প্রাচীন জাতির উপর আমরাই বা অত্যাচার করব কেন?

জানি, আমাদের হাতে যে অস্ত্র আছে তার সাহায্যে আমরা এখনই এই বেচারাদের সবংশে ধ্বংস করতে পারি— এখানকার ধনদৌলত লুটে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজারও চোখে তাক লাগিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাহলে আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়

থাকবে? আরশিতে আমরা নিজেদের কাছেই কি আর নিজেদের কালো মুখ দেখাতে পারব?

বিমল! আমাদের উচিত, কাল সকালেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া। দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, আমাদের এমন অসাধারণ আবিষ্কারের খবরও পৃথিবীতে প্রচার করতে পারব না। কারণ তাহলে এই অসহায় সোনার দেশ লুণ্ঠন করবার লোভে পৃথিবীর চারিদিক থেকে দলে দলে দস্যু ছুটে আসবে।

বিনয়বাবু চুপ করবার পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনও কথা কইলে না।

তখন শিখরের ফাঁকে ফুটে উঠেছে রাতের কালো রং মাখানো আকাশের গায়ে তারকাদের আলোর আলপনা। শিখরের মুখের কাছে অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু ভিতরের চারিদিকেই অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে সুকঠিন হয়ে উঠেছে!

কমল একবার উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, নিস্তব্ধ পাতাল-পুরীর এদিকটাও অন্ধকারের ঘেরাটোপে ঢাকা, কেবল দূরে— বহুদূরে মাঝে মাঝে নিবিড় তিমির-পট ফুটো করে এক-একটা মিটমিটে আলোকশিখা দেখা দিচ্ছে। জীবনের কলঝঙ্কার এখানে যেন একান্ত ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। কেউ কোথাও ক্ষীণ স্বরে কাঁদবার প্রয়াসও করছে না!

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার কথাই ঠিক! এই প্রাচীন জাতির উপরে অত্যাচার করা মহাপাপ, আমরা যে ধারণাতীত অপূর্ব দৃশ্য দেখবার আর নূতন জ্ঞানলাভ করবার সৌভাগ্য পেলুম, সেইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার। আমরা দস্যু নই— কাল সকালেই এখান থেকে বিদায় নেব।'

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আলাপ করে এখানকার ভিতরের যা-কিছু জানবার, জেনে নি। কিন্তু এ ইচ্ছা বোধহয় আর সফল হওয়া অসম্ভব, এরা আর আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।'

পরদিন প্রভাতে উঠে বিমল দেখলে, তখনও পাতালপুরীর রাজপথে জনমানবের দেখা নেই। সরোবরের দুইধারে সেই সোনার ও রুপার গম্বুজওয়ালা দুখানা অট্টালিকার প্রত্যেক জানলা-দরজা বন্ধ, কোথাও একজন সৈনিক পর্যন্ত বাইরে এসে দাঁড়ায়নি।

যে অট্টালিকাকে তারা রাজবাড়ি বলে সন্দেহ করছে, তার চারিপাশে প্রায় চল্লিশ-ফুট উঁচু দৃঢ় পাথরের প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরটা এমন চওড়া যে তার উপর দিয়ে পাশাপাশি দুইজন লোক অনায়াসেই হেঁটে চলে যেতে পারে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে এক-একখানা ঘর—বোধহয় সৈনিকদের থাকবার জন্যে। দুটো প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, তার ভিতর দিয়ে হাওদাসুদ্ধ হাতিও ঢুকতে পারে। সিংহদ্বারের পাল্লাও পুরু ব্রোঞ্জে তৈরি।

কুমার বললে, 'এই রাজবাড়িকে কেল্লা বললেও ভুল হয় না। যেখানে বাইরের শত্রুর ভয় নেই, সেখানে রাজবাড়িকে এমনভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে কেন?'

বিমল বললে, 'মানুষ তো কোথাও নিরীহ জীবন যাপন করতে পারে না! বাইরের শত্রু নেই বটে, কিন্তু জাতি-বিরোধ প্রজা-বিদ্রোহ তো থাকতে পারে? রাজা তখন আশ্রয় নেন এই পাঁচিলের পিছনে!'

আচম্বিতে উপরে গুহার বাহির থেকে কারা একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল!

বিমল চমকে মুখ তুলেই শুনলে, কে চেঁচিয়ে ইংরাজিতে বলছে, 'আরে আরে, বাঙালি-বাবুরা যে দরজা ভেঙে আমাদের জন্যে সাফ করে রেখে গেছে!'

প্রথমটা সকলেই ভেবেছিল যে, পাতালবাসীরা হয়তো অন্য কোনও পথ দিয়ে গুহার উপরে উঠে আবার তাদের আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু ওদের স্পষ্ট ও আধুনিক ইংরেজি ভাষা শুনে বেশ বোঝা গেল, ওরা এই পাতালের বাসিন্দা নয়। তবে কি এখানকার খবর বাইরের লোকও জানে?

উপর-অংশের সিঁড়িটার চারিদিকে দেয়ালের আবরণ ছিল বলে কারুকে দেখা গেল না, কিন্তু কারা যে খট খট জুতোর শব্দ করে গুহার স্তব্ধতা ভেঙে নীচে নামছে এটা বেশ স্পষ্টই শোনা গেল!

কে এরা! নীচে নামে কেন?

আর একজন কে চেঁচিয়ে বললে, 'গোমজ, তোমার আলোটা একটু তুলে ধরো! এখানে পা ফসকালে সোজা নরকে গিয়ে হাজির হব!'

গোমেজ.....গোমেজ? এবং তার দলবল? একী অসম্ভব ব্যাপার!— বিমল হতভম্বের মতো কুমারের মুখের পানে মুখ ফেরালে।

গোমেজ তো এখন 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর ডিটেকটিভদের পাল্লায়, কিংবা লন্ডনের জেলখানায়! সে কোন যাদুমন্ত্রে পুলিশ, কারাগার ও আটলান্টিক মহাসাগরকে ফাঁকি দিয়ে এই শৈলদ্বীপে এসে হাজির হয়েছে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খণ্ডপ্রলয়

জুতো-পরা ভারী ভারী পায়ের আওয়াজ ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছে!.

হঠাৎ কুমারের চোখ পড়ল সিঁড়ির পাশের গুহাটার দিকে—কাল যেখান থেকে শত্রু বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'বিমল, মিথ্যে আর রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে লাভ নেই! এসো, আমরা ওই গুহাটার ভিতরে ডুকে পড়ি। বোধ হচ্ছে ওখানে আমাদের সবাইকার জায়গা হবে।'

বিমল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সেপাইদের সেই গুহার ভিতরে ঢুকবার জন্যে ইঙ্গিত করলে। আধ-মিনিটের মধ্যেই জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেল। এমনকী, চালাক বাঘা পর্যন্ত সে ইঙ্গিত বুঝতে একটুও দেরি করলে না!

গুহার মুখে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে বিমল ও কুমার শুনতে পেলে পায়ের শব্দগুলো একে একে বারান্দায় এসে নামছে।

তারপরে চমৎকৃত কণ্ঠে একজন বললে, 'হে ভগবান! এ কী দেখছি!'— এটা হচ্ছে গোমেজের গলা!

আর একজন বললে, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! পৃথিবীতে এমন ঠাঁই থাকতে পারে!'

আর একজন বললে, 'মাথার উপরে আলোর ঝরনা! পাহাড়ের মাঝখানে অনন্ত গুহা! তার মধ্যে বিশাল স্বপ্ন-শহর! সোনার গম্বুজ—রুপোর গম্বুজ—সোনা-রুপোর সাঁকো!'

গোমেজ বললে, কোথাও জনপ্রাণী নেই, কারুর সাড়াও নেই! আমরা কি রূপকথার সেই Sleeping Beauty-র দেশে এসে পড়লুম? এখানেও কি কোনও রাজকন্যা এক শতাব্দীর ঘুমে অচেতন হয়ে আমাদের জন্যে সোনার খাটে শুয়ে আছে?'

আর একজন বললে, 'এখন তোমার কবিত্ব রাখো গোমেজ! এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা আমার ভালো লাগছে না।'

কে একজন হঠাৎ সচকিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী ভয়ানক! কী এটা? ভূত, না মানুষ, না জন্তু?....অ্যাঁ! এ যে দেখছি মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে! বুকে বুলেটের দাগ!'

গোমেজ বললে, 'এ সেই বাঙালি-বাবুদের কাজ! কিন্তু তারা গেল কোথায়, আমি যে তাদের জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাই।'

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো! নীচেও কত মরা লোক পড়ে রয়েছে!'

গোমেজ বললে, 'দেখছি এখানে ছোটোখাট্ট একটা লড়াই হয়ে গেছে! কিন্তু বাবুদের তো কোনওই পাত্তা নেই! আমাকে ফাঁকি দিয়ে তারা আগেই পটল তুলে ফেললে নাকি? না, বন্দুকের বিক্রম দেখিয়ে এখানকার লোকদের তারা বশ করে ফেলেছে?'

অন্য একজন বললে, 'চলো আমরা নীচে নেমে যাই। এ দেশ আমরা দখল করবই। যদি কেউ বাধা দেয় তাকে যমালয়ে পাঠাব। হিপ হিপ হুররে!'

সকলেই একসঙ্গে হিপ হিপ হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠল— তারপরেই আবার নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

বিমল উঁকি মেরে দেখে নিলে, তাদের দলেও চব্বিশ-পঁচিশ জন লোক আছে এবং সকলেরই হাতে বন্দুক।

পায়ের শব্দগুলো যখন মিলিয়ে গেল বিমল তখন আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আর আমি ওদের কেয়ার করি না। ওরা যখন ওই সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেছে, তখন ওদের তো আমাদের হাতের মুঠোর ভেতরেই পেয়েছি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কাল আমরা সমুদ্রে এদেরই জাহাজ দেখেছিলুম।'

কুমার বললে, 'হুঁ'। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গোমেজ বিলাতি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে।'

বিমল বললে, 'আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। গোমেজ অসাধারণ কাজের লোক। এর মধ্যেই সে নতুন দল বেঁধে জাহাজ জোগাড় করে প্রায় আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে হাজির হয়েছে। গোমেজের বাহাদুরি আছে।'

কমল বললে, 'বোধহয় ওদের জাহাজখানা আমাদের চেয়ে দ্রুতগামী।'

—'সম্ভব। কিন্তু তাহলেও গোমেজের বাহাদুরি কম নয়। এখন চলো, বেরিয়ে দেখা যাক, নীচে আবার কী কাণ্ড বাধে। ওদের আর ভয় করবার দরকার নেই— সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ওরা নিজেদেরই মৃত্যু-ফাঁদে পা দিয়েছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু বিমল, আর এখানে হানাহানি করে আমাদের লাভ কী? এই ফাঁকে মানে মানে আমরা সরে পড়ি না কেন?'

বিমল তিরস্কার-ভরা কণ্ঠে বললে, 'সে কী বিনয়বাবু! এই দস্যুদের কবলে সমস্ত দেশটাকে সমর্পণ করে? গোমেজ কী-জন্যে এখানে এসেছে জানেন না? লুঠ করতে, হত্যা করতে, অত্যাচার করতে! আমরা বাধা দেব না,— বলেন কী!'

বিনয়বাবু বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছ। আমার মনে ছিল না। হ্যাঁ, ওদের থেকে এই দেশকে রক্ষা করা চাই-ই!'

সবাই ছুটে বাইরে এল। বারান্দার ধারে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখলে, গোমেজ তার দলবল নিয়ে সরোবরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু তখনও পাতালপুরী তেমনি নিস্তব্ধ, কোথায় একটা প্রাণীরও দেখা নেই। শিখরের মুখে সূর্যের কিরণোৎসবের ঘটা যতই বেড়ে উঠছে, ততই বেশি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাতালপুরের দৃশ্যবৈচিত্র্য।

গোমেজ সদলবলে আগে আগে রাজ-প্রাসাদের দিকে গেল। কিন্তু সমস্ত প্রাসাদ-প্রাচীর প্রদক্ষিণ করেও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পেলে না। তারা তখন একটা বাগানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হল সেই স্বর্ণরৌপ্যময় আশ্চর্য সেতুর দিকে।

আচম্বিতে কোথায় তীব্র সুরে একটা ভেরীর শব্দ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই ঠিক যেন ভোজবাজির মহিমায় গোমেজ প্রভৃতির চারিপাশে শত শত বিপুলদেহ সৈনিকের মূর্তি হল আবির্ভূত! সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র পাতালরাজ্য আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল! কাছে, দূরে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে যেদিকে চোখ ফেরানো যায়, লক্ষে পড়ে কেবল জনতার পর জনতার প্রবাহ— কেবল বিদ্যুৎ-গতির লীলা— কেবল অগ্নিবৎ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ষার নৃত্য। আর মেঘগর্জনের মতন সে কী গম্ভীর অথচ বিকট চিৎকার!

বিমল প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে উল্লাস-ভরে বলে উঠল, 'ধন্য ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা, ধন্য! কুমার, এরা কতটা চালাক, বুঝতে পারছ? এরা বন্দুকের ধর্ম ঠিক ধরে ফেলেছে! এরা এরই-মধ্যে বুঝে নিয়েছে যে, দূর থেকে বন্দুকধারীদের আক্রমণ করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। তাই এরা আমাদের ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আনাচে-কানাচে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল। ওরা ভয়ে কোথায় পালিয়েছে ভেবে আমরা যদি নীচে নামতুম, তাহলে আমাদেরও ঠিক এই দশাই হত। বাহবা বুদ্ধি!'

কুমার উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো! গোমেজের আটদশ জন সঙ্গী একেবারে পপাত ধরণীতলে। গোমেজরা গুলিবৃষ্টি করে একদিকে পথ করে নিলে। ওই দ্যাখো, গোমেজরা সোনার সেতুর উপরে গিয়ে উঠল। ওদের দলে এখন মোটে এগারো জন লোক আছে।'

সেতুর ভিতরে খানিকদূরে বেগে ছুটে গিয়ে গোমেজ ও তার সঙ্গীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুই দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং তারপর দুই দিকেই শিলাবৃষ্টির মতো গুলিবৃষ্টি করতে লাগল।

মুশকিলে পড়ল তখন পাতালবাসীরা। সেই বৃহৎ জনতা স্বল্প-পরিসর সেতুর ভিতর দিয়ে যথেচ্ছভাবে আর এগুতে পারলে না, যারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে তাদেরও অনেকেই হত বা আহত হয়ে সাঁকোর উপরে পড়ে গেল,—বাকি সবাই কেউ ছুটে পালিয়ে এল এবং কেউ বা পড়ল জলে লাফিয়ে।

গোমেজের দল তখন বাইরের জনতার উপরে দুচোখো গুলি চালাতে শুরু করলে,—অধিকাংশ গুলিই ব্যর্থ হল না, লোকের পর লোক মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল এবং আহতদের আর্তনাদে কান পাতা দায় হয়ে উঠল।

কমল বললে, 'পাতালবাসীরা আবার পালিয়ে যাচ্ছে—পাতালবাসীরা আবার পালিয়ে যাচ্ছে।'

কুমার বললে, 'এখন আমাদের কর্তব্য কী?'

বিমল কী বলবার উপক্রম করলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুবার আগেই সকলকার পায়ের তলায় পাথরের বারান্দা দুলে উঠল।

প্রত্যেকেই সবিস্ময়ে নীচের দিকে তাকালে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অদ্ভুত দোল।

তারপরেই সকলে সভয়ে শুনলে, সেই সীমাশূন্য গুহার গর্ত থেকে, সেই মুখ-খোলা শিখরের বাহির থেকে, অনন্ত আকাশ থেকে, সুদূর সমুদ্র থেকে কী এক গম্ভীর ভয়ঙ্কর অনির্বচনীয় শব্দতরঙ্গের পর শব্দতরঙ্গ ছুটে—আর ছুটে—আর ছুটে আসছে! সেই ভৈরব অপার্থিব বিশ্বব্যাপী হুহুঙ্কারের মধ্যে—জলধি-কোলাহলের মধ্যে—ক্ষীণ তটিনীর কলনাদের মতো—কোথায় ডুবে গেল বন্দুকের চিৎকার, আহতদের কান্না, জনতার ভয়ার্ত রব! ঘন ঘন দুলছে পাহাড়, ঘন ঘন দুলছে বিমলদের পায়ের তলায় বারান্দা, ঘন ঘন দুলছে সমগ্র পাতালপুরী এবং উপর থেকে ঝরো-ঝরো ঝরছে ছোটো-বড়ো শিলাখণ্ড।

ভয়ে সাদা মুখে বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প! এ-অঞ্চলের সব দ্বীপ আগ্নেয় দ্বীপ—ভূমিকম্প হচ্ছে। পালাও—পালাও।'

সকলে পাগলের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটল—পাহাড়ের দোলায় সকলেরই পা তখন টলমলিয়ে টলছে। তারপর সেই সংকীর্ণ সিঁড়ি বয়ে হুড়োমুড়ি করে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও দেওয়াল ধরে কখনও হোঁচট খেয়ে এবং কখনও বা পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গিয়ে তারা যে কেমন করে উপরে উঠে গুহার বাহিরে গিয়ে দাঁড়াল, এ-জীবনে সে-রহস্য কেউ বুঝতে পারবে না!

বাইরে বেরিয়ে দেখে, সমুদ্রেরও রুদ্রমূর্তি! তার লক্ষ লক্ষ জলবাহু উর্ধ্বে তুলে বারবার লম্ফের পর লম্ফ ত্যাগ করে জগৎব্যাপী একটা দুর্দান্ত বিভীষিকার মতো সে যেন উপরের বিপুল শূন্যতাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে, তার গর্জনে গর্জনে তালে-বেতালে বাজছে যেন বিশ্বের সমস্ত বজ্রের সম্মিলিত কণ্ঠ এবং ফেনায় ফেনায় তার ফুটন্ত টগবগে জলের নীল রং আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পাহাড় সেখানেও তার জড়তাকে ভুলে জীবন্ত এক অতিকায় দানবের মতো ক্রমাগত মাথানাড়া দিচ্ছে!

বিনয়বাবু চিৎকার করলেন, 'সমুদ্রের জল বেড়ে উঠছে, শীঘ্র পাহাড় থেকে নেমে পড়ো!'

ঠিক যেন একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রায় বাহ্যজ্ঞানহারার মতন তারা যখন কোনওক্রমে জাহাজে এসে উঠল, দ্বীপের উপরে ভূমিকম্প তখন থেমে গেছে বটে, কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে মহাসাগরের তাথৈ-তাথৈ নৃত্য।

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'দেখুন বিনয়বাবু, দেখুন! সমুদ্রের জল দ্বীপের প্রায় শিখরের কাছে উঠেছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কত যুগে কতবার ওই দ্বীপের সঙ্গে সমুদ্র যে এমনি ভয়ানক খেলা খেলেছে, তা কে জানে!'

কুমার বললে, 'গোমেজের জাহাজ এখনও এখানে ছুটোছুটি করছে! কিন্তু গোমেজ তার দলবল নিয়ে আর ফিরে আসবে না!'

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল আকাশ-ফাটানো একটা হাহাকার! যেন হাজার হাজার ভয়ার্ত কণ্ঠ একসঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল তীব্র নিরাশায়!

কমল চমকে বললে, 'ও আবার কাদের কান্না?'

কুমার বললে, 'শব্দটা যেন ওই দ্বীপের দিকে থেকেই আসছে!'

বিনয়বাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দ্বীপের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, 'বিমল, বিমল! সে ব্রোঞ্জের দরজা! সে দরজা আমরা ভেঙে ফেলেছি—তাই এতদিনের পরে যুগযুগান্তরের নিষ্ফল চেষ্টার পর—সমুদ্র প্রবেশ করেছে ওই পথে!'

বিমল অতিকষ্টে কেবল বললে, 'সর্বনাশ!'

—'বিমল, লস্ট আটলান্টিসের শেষচিহ্নও এবারে হারিয়ে গেল! ওই শোনো পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার শেষ আর্তনাদ! আমরা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করলুম—আমরা মহাপাপী!'

কুমার বাষ্পরুদ্ধস্বরে বললে, 'না বিনয়বাবু। আমরা না ভাঙলেও গোমেজ গিয়ে আজ ওই দরজা ভাঙত। আমরা নিমিত্ত মাত্র। আটলান্টিস আবার হারিয়ে গেল মহাকালের অভিশাপে।'

বিনয়বাবু দুই হাতে প্রাণপণে জাহাজের রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল—'লস্ট আটলান্টিস। লস্ট আটলান্টিস।'

সুন্দরবনের রক্তপাগল

প্রথম

সুন্দরবনে সুন্দরবাবু

বিশাল অরণ্য-সাম্রাজ্য! তরঙ্গিত শ্যামলতার মহাসাগর!

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর—তার ভিতর দিয়ে যাতায়াতও করতে পারে না মানুষ। আবার ইচ্ছা থাকলেও মানুষ এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করতে ভরসা করে না, কারণ এ হচ্ছে মহা বিপজ্জনক স্থান। এখানকার প্রধান বাসিন্দা হচ্ছে 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঘ্র এবং তার উপর আছে 'বয়ার' বা বন্য মহিষ—তারাও এমন হিংস্র যে শিকারিরা তাদের বাঘের চেয়ে কম ভয় করে না। আর আছে পাঁচ ফুট লম্বা ও তিন ফুট উঁচু তীক্ষ্ণদন্তধারী ভীষণ বন্য বরাহ। মাঝে মাঝে আজও গণ্ডারের দেখা পাওয়া যায়। প্রতি পদেই এখানে সর্পভয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অজগর তো আছেই এবং সেই সঙ্গে আছে এত জাতের বিষধর সর্প, পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না যাদের তুলনা। তাদের নামও কত-রকম! ধনীরাজ, দুধরাজ, পাতরাজ, মণিরাজ, ভীমরাজ, মণিচূড়, শঙ্খচূড়, শাঁখামুঠি, নাগরচাঁদ, গোখুরা ও কেউটে প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই দংশন হচ্ছে মারাত্মক। কাজেই মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে এই ভয়াবহ অরণ্যের ত্রিসীমানায় আসতে রাজি হয় না।

এই বিপুল অরণ্য ভেদ করে যেখান-সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো নদ আর নদী এবং খাল আর নালা। সাধারণত এই জলপথের সাহায্যেই মানুষ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে আনাগোনা করতে পারে। কিন্তু এই জলপথও কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। কারণ, নৌকো থেকে নত হয়ে হস্ত-প্রক্ষালনের জন্যে তুমি যদি একবার জলস্পর্শ করবার চেষ্টা করো, তাহলে পরমুহূর্তেই হয়তো নৌকার উপর থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে! এখানকার প্রত্যেক নদীতে বাস করে অসংখ্য বড়ো বড়ো কুমির! সর্বদাই তারা সচেতন হয়ে আছে, কখন তোমাকে নিজের কবলগত করবার সুযোগ পাবে বলে।

অরণ্যের মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো মাঠ আর জলাভূমি। সেসব জায়গায় গিয়ে কবিত্ব প্রকাশ করবার কোনও উপায়ই নেই। দেখতে সুন্দর হলেও সেখানকার বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত।

অরণ্যের মধ্যে যেখানে-সেখানে দেখা যায় 'সুন্দরী' গাছের ভিড়। তাদের আকার সুদীর্ঘ, সুকঠিন কাঠের রং লাল! পাতা ছোটো ছোটো, পাতাগুলির উপরদিকে খুব তেলা ও নীচের দিকের রং ধূসর। এ বনে গাছ আছে আরও অনেক জাতের, তাদের অনেকের নামও বেশ বিচিত্র! যথা—ধোন্দল, গেঁয়ো, বাইন, কেওড়া, বলা, গরান, হেন্তাল, গর্জন, গাব ও বনঝাউ। এখানে গোলপাতা ও হোগলাও দেখা যায় যেখানে-সেখানে।

বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীবিখ্যাত অরণ্যের নাম—সুন্দরবন। দক্ষিণবাংলা বলতে বোঝায় এই অতি-ভীষণ সুন্দরবনকেই।

এই অরণ্যের যেখানে সমাপ্তি সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে অনন্ত সাগরের চিরন্তন উচ্ছ্বাস!

এই সুন্দরবনের একটি অবৃহৎ নদীর ভিতর দিয়ে চারিদিকের নীরবতাকে শব্দিত করে ছুটে চলেছে একখানি মোটরবোট। তখন সন্ধ্যাবেলা—যদিও পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে অন্ধকার সেদিন বেরিয়ে আসতে পারেনি বনের ভিতর থেকে। বোটের এখানে-সেখানে বসে রয়েছে কয়েকজন

দীর্ঘাকার বলবান ব্যক্তি, উর্দি না থাকলেও তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তারা পুলিশ-ফৌজের অন্তর্গত।

মোটরবোটের ভিতর বসে আছেন এক ব্যক্তি, তাঁর পরনে ছিল উচ্চতম পুলিশ-কর্মচারীর মার্কা-মারা পোশাক। তিনি টুপিটি খুলে রেখেছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সারা মাথাটি জুড়ে বিরাজ করছে প্রকাণ্ড একটি টাক। এবং তেমনি প্রকাণ্ড তাঁর ভুঁড়িটি, এমন হৃষ্টপুষ্ট দোদুল্যমান ভুঁড়ি কোনও পুলিশ-কর্মচারীর দেহেই শোভা পায় না। বোটের ভিতরে বসে তিনি এদিকের ও ওদিকের গবাক্ষ দিয়ে নদীর দুই তীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করছিলেন বারংবার।

কিন্তু নদীর কোনওদিকেই সন্দেহজনক কিছুই দেখা যায় না। নদীর দুই তীরের বনের গাছপালা করছে সুমধুর মর্মরধ্বনি এবং মাথার উপরকার সমুজ্জ্বল আকাশের গায়ে জেগে আছে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্ময় মুখ। কোথাও মানুষ বা অন্য কোনও জন্তুর সাড়া নেই, এমনকি, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের কণ্ঠেও এখনও জাগ্রত হয়নি বিভীষণ মৃত্যু-ধ্রুপদ!

নদীর জলকে ফেনায়িত করে সমানে ছুটে চলেছে কলের নৌকো। প্রকৃতির আদিম ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে কৃত্রিম ও আধুনিক এই মোটরবোটকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু উপায় নেই, যেখানে হবে আধুনিক সভ্যতার পদার্পণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে সেখানেই হবে ছন্দপাত।

আচম্বিতে হল এক ধারণাতীত ব্যাপার! মোটরবোট বাধা পেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে করে উঠল এক ক্রুদ্ধ গর্জন। কলের নৌকো আর অগ্রসর হতে পারলে না।

বোটের ভিতরকার সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বলে উঠলেন, 'হুম! হল কী? বোটের কল-কবজা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

বোট যে চালাচ্ছিল সে বললে, 'না হুজুর, বোটের সামনে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে দু-গাছা মোটা কাছি।'

—'কাছি কী বাপু? জলের ভিতরে কাছিম থাকতে পারে, কিন্তু জলের ভিতর থেকে কাঁছি ভেসে ওঠে এমন কথাও তো কখনও শুনিনি!'

—'হ্যাঁ হুজুর, জলের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছে দু-গাছা কাছি! চেয়ে দেখুন, কাছি দু-গাছা নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ও কাছি কারা ধরে আছে জানি না, কিন্তু তারা বোধহয় আমাদের বাধা দিতে চায়!'

—'বাধা দিতে চায়? হুম! তাহলে ব্যাপারটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে! যাদের ধরবার জন্যে আমরা এসেছি এ অঞ্চলে, তারাই বোধহয় আমাদের ধরবার ফিকিরে আছে! বোটের মুখ ফেরাও, বোটের মুখ ফেরাও! যেদিক থেকে আসছি আবার সেইদিকে ফিরে চলো!'

বোট কিন্তু মুখ ফিরিয়েও মুক্তিলাভ করতে পারলে না। কারণ ইতিমধ্যে ওদিকেও জেগে উঠেছে আরও দু-গাছা মোটা মোটা কাছি! বোটের এখন এদিক বা ওদিক কোনও দিকেই যাবার উপায় নেই!

হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিটির ললাটদেশ তখন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে এবং হাঁসফাঁস করতে করতে ভিতর থেকে বাইরে এসে তিনি বললেন, 'পঁচিশ বছর পুলিশে চাকরি করছি! এমনভাবে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতন মরতে আমি রাজি নই! আমি এখনই জলে ঝাঁপ খাব!'

এক ব্যক্তি বললে, 'সে কী স্যার! জলে ঝাঁপ খাবেন কী? শুনেছি আপনি তো সাঁতার জানেন না!'

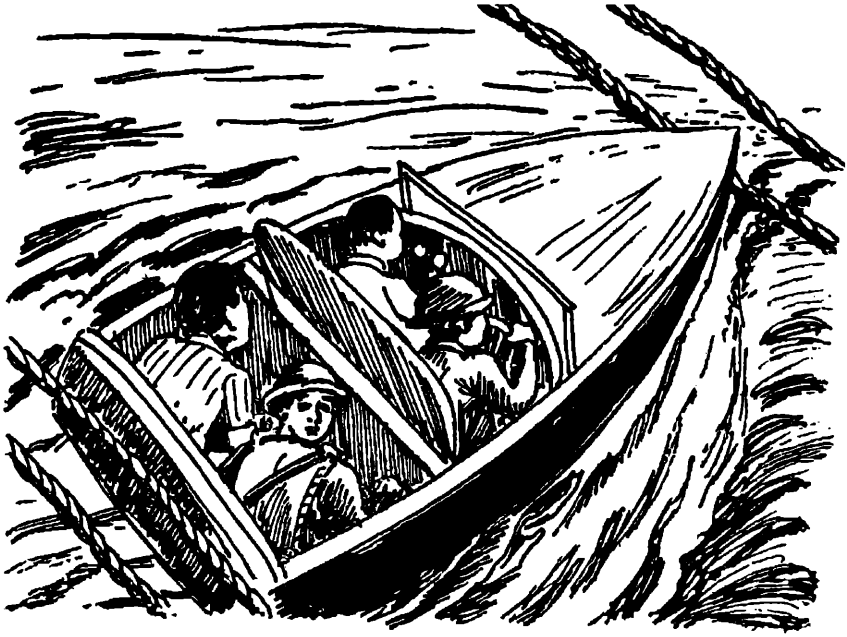

—'হুম! সাঁতার জানি না বটে, কিন্তু তোমরা ভেবেছ কি আমি হচ্ছি নিতান্ত নাবালক? আমার জামার তলায় আছে জলে ভেসে থাকবার পোশাক! স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে অনায়াসেই আমি বিপদের বাইরে গিয়ে পড়তে পারব—কিছুতেই আমি ডুবব না। বাপু হে, জলপথে যখন শত্রুপুরীতে এসেছি, তখন কি আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি মনে করো?'

—'কিন্তু স্যার, এখানকার নদীতে কিলবিল করে কুমিরের দল! তাদের কেউ না কেউ আপনাকে কোঁৎ করে গিলে ফেলবে।'

—'ধ্যাৎ, বোকারাম কোথাকার! তুমি কি জানো না মানুষ যতক্ষণ জলে সাঁতার কাটে, কুমির তাকে ধরতে পারে না? মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই কুমির তার লক্ষ্য স্থির করতে পারে!'

হঠাৎ আর-একজন বলে উঠল, 'হুজুর, নদীর দু-তীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন! ওদিক থেকে দু-খানা আর এদিক থেকে দু-খানা নৌকো তরতর করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!'

—'ওরা আমাদেরই বন্দি করতে আসছে! এইবারে আমি জলে ঝাঁপ খাব!'

—'কিন্তু স্যার, আপনি তো জলে ঝাঁপ খেয়ে হয় পাতালে, নয় কুমিরের পেটে গিয়ে হাজির হবেন! আমরা এখন কী করি।'

—'সাঁতার জানা থাকে তো জলে ঝাঁপ খাও, নয়তো বোম্বেটেদের হাতে ধরা দাও! এসময়ের মূলমন্ত্র কী জানো? চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!'

—'না স্যার, আমরা ওদের হাতে ধরা দেব না, আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করব!'

—'দলে ওরা ভারী, ওদের সঙ্গে লড়াই করে সুবিধে করে উঠতে পারবে কি? বেশ, তোমাদের

যা-খুশি তাই করো, আমি কিন্তু জলে ঝাঁপ খেলুম! জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা! শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়ো মা! হুম!'

দ্বিতীয়
সবচেয়ে বিস্ময়কর

সেদিন এখানে চায়ের আসরে অতিরিক্ত ঘটা। কারণটা হচ্ছে, জয়ন্ত ও মানিক করেছে আজ বিমল ও কুমারকে প্রভাতি-চায়ের নিমন্ত্রণ!

জয়ন্ত জানত বিমল, কুমার, রামহরি ও বাঘা—এরা সবাই হচ্ছে একই পরিবারের অন্তর্গত। কাজেই বিমল ও কুমারের সঙ্গে এসেছিল রামহরি এবং বাঘাও!

এবং রামহরির রন্ধনের হাত অত্যন্ত সুপটু বলে নিমন্ত্রিত হয়েও তাকে ঢুকতে হয়েছিল রন্ধনশালায়, জয়ন্ত ও মানিকের বিশেষ অনুরোধে।

প্রভাতি-চায়ের আসর হলে কী হয়, রামহরি সেদিন প্রস্তুত করেছিল অনেক-রকম খাবার।

ইতিমধ্যে খাবারের ছোটো এক-দফা হয়ে গেল—গরম গরম টোস্ট, এগ-পোচ এবং চা!

চায়ের পেয়ালায় চামচে দিয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, কুমারবাবু, আপনারা তো পৃথিবীর জানা-অজানা বহু দুর্গম দেশে বেড়িয়ে এসেছেন। এমনকি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল-গ্রহে গিয়েও পদার্পণ করতে ছাড়েননি! কিন্তু বলতে পারেন কি, আপনারা সবচেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছেন?'

বিমল একটা চুমুক দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'সবচেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছি? কুমার, তুমি এ প্রশ্নের কী উত্তর দিতে চাও?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'জীবনে আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, আমাদের এই বাঘা!'

মানিক বললে, 'বাঘা? শুনেছি আপনারা ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে আদিম পৃথিবীর অতিকায় জীব ডাইনোসর প্রভৃতির সঙ্গেও আলাপ করে এসেছেন। বাঘা কি তাদের চেয়েও আশ্চর্য?'

বিমল উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! বাঘার চেয়ে আশ্চর্য কোনও কিছু আমিও জীবনে দেখিনি!'

জয়ন্ত বললে, 'বাঘাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই ওকথা বলছেন! লোকে যাকে ভালোবাসে, তাকেই সবচেয়ে বড়ো বলে মনে করে। ওই তো একটা দেশি কুকুর—'

বিমল বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'জয়ন্তবাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকও যদি গোলাম মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হব। সাদা চামড়ারা এই কালো বাংলা দেশ আর এই কালো বাঙালিকে ঘৃণা করে বলে এ-দেশের কুকুর বাঘাও কি হবে ঘৃণ্য জীব? বাঘাকে আপনারা এখনও চেনবার সুযোগ পাননি। কুকুর হলেও সে হচ্ছে অদ্ভুত, বাংলার গৌরব! ইউরোপ-আমেরিকার যে-কোনও 'পেডিগ্রি-ডগের' চেয়েও সে হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণির জীব! বাঘাকে আমরা যদি হুকুম দি, তাহলে সে একলাই সিংহেরও উপরে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। কত বড়ো বড়ো সাংঘাতিক বিপদ থেকে বাঘা আমাদের উদ্ধার করেছে, সে-কথা তো আপনারা জানেন না! বাঘাকে আমরা অধিকাংশ মানুষেরই চেয়ে শ্রদ্ধা করি!'

কুমার বললে, 'শুধু আমরা নই, বাংলার কবি ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত অনেক-কাল আগেই বলে গিয়েছেন

'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি'
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'—

জয়ন্তবাবু, বাঘা হচ্ছে বাংলার কুকুর, কিন্তু তার ভিতরে গোলাম মনোবৃত্তি নেই। ঠিকমতো যত্ন করলে আর পালন করতে পারলে বাংলার নিজস্ব কুকুরও যে কতখানি অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, বাঘা হচ্ছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ!'

ঘরের এক প্রান্ত দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর ল্যাজ তুলে তিরের মতো কোণের ওই আলমারিটার তলায় গিয়ে ঢুকেছিল, বাঘা এতক্ষণ ছিল তাকেই পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু পলাতক ইঁদুরের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাঘা ইঁদুরকে ধরবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু সজাগ কানে বারবার শুনছিল তার নিজেরই নাম! অতএব ইঁদুরকে ত্যাগ করে সে এখন তার মনিবদের কাছে যাওয়াই উচিত মনে করলে।

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কী রে বাঘা, তুই আবার কী বলতে চাস?'

বাঘা প্রবল বেগে লাঙ্গুল আস্ফালন করে একটি লাফ মেরে বললে, 'ঘেউ, ঘেউ!'

বিমল হেসে ফেলে বললে, 'বাঘা রে, তুই দিশি-কুকুর বলে জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু তোকে মানতে রাজি হচ্ছেন না। তুই একবার এঁদের ধমকে দে তো!'

বাঘা তখনই জয়ন্ত আর মানিকের দিকে ফিরে দাঁত-খিঁচিয়ে গম্ভীর স্বরে গর্‌র গর্‌র করে গর্জন করে উঠল!

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'ব্যাস, বিমলবাবু! আপনাকে আর কিছু প্রমাণিত করতে হবে না! বাঘা যে গেল-জন্মে মানুষ ছিল, আর এ-জন্মেও তার কুকুর-দেহের ভিতরে যে মানুষের আত্মা বর্তমান আছে, এ-কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য হচ্ছি! দ্বারপথ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, বারান্দা দিয়ে রামহরি আর মধু আসছে খাবরের 'ট্রে' হাতে করে! অতএব মুখ দিয়ে এখন বাক্য ত্যাগ না করে খাদ্য গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ!'

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল সিঁড়ির উপর দিয়ে ভারী ভারী দ্রুত চলা পায়ের শব্দ!

জয়ন্ত বললে, 'ওপায়ের শব্দ আমি চিনি! সুন্দরবাবু আসছেন! পায়ের শব্দ শুনেই মনে হচ্ছে ব্যাপার বড়ো গুরুতর!'

—বলতে বলতে সুন্দরবাবু এসে হাজির হলেন সেই ঘরের দ্বারদেশে।

মানিক বললে, 'চতুষ্পদ জীবদের নাসিকার শক্তি নাকি মানুষদেরও চেয়ে প্রখর! কিন্তু সুন্দরবাবু, আপনার ঘ্রাণশক্তি তাদেরও হার মানাতে পারে!'

সুন্দরবাবু মাথার টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'একথার মানে কী মানিক?'

—'মানেটা হচ্ছে এই যে, আজ আমাদের এখানে পানাহারের বিশেষ আয়োজন হয়েছে, এ-কথাটা আপনি জানতে পারলেন কেমন করে?'

সুন্দরবাবু ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, 'হুম! পানাহার! পানাহার করতেই আমি এখানে এসেছি বটে! পরপারে যেতে যেতে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আজ

আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি! প্রাণ থাকলে লোকে পেটের কথা ভাবে, আমি এখন পেটের কথা মোটেই ভাবছি না!'

মানিক বললে, 'তাহলে আপনি কি আজ এখানে দয়া করে কিছুই গ্রহণ করবেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি কি তাই বলছি? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। খাবার তৈরি থাকলে যে খেতে রাজি হয় না আমার মতে সে হচ্ছে—নরাধম!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, হাসি-ঠাট্টার কথা থাক, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আপনি আজ এখানে বেড়াতে বেড়াতে খাবার খেতে আসেননি! ব্যাপার কী বলুন তো?'

সুন্দরবাবু সাগ্রহে একখানা 'ফ্রেঞ্চ কাটলেট'কে আক্রমণ করে বললেন, 'বলছি ভায়া, বলছি! এমন ব্যাপার আমি আর কখনও দেখিওনি শুনিওনি! তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কোনও কাজ করি না, জানো তো! ....আরে, হুম! বিমলবাবু? কুমারবাবু? আপনারাও আজ এখানে হাজির? আমার ভাগ্য দেখছি খুব ভালো। ...আরে, সেই বিচ্ছিরি নেড়িকুত্তাটাকেও সঙ্গে করে এনেছেন দেখছি যে! আর ব্যাটা আর-সবাইকে ছেড়ে ঠিক আমার দিকেই কটমট করে তাকিয়ে আছে! মশায়, ওকুকুরটা আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকলে আমি ভারী নার্ভাস হয়ে যাই! ওকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে বলুন।'

কিন্তু বাঘাকে মানা করতে হল না, হঠাৎ নীচে থেকে রামহরির ডাক শুনে এক দৌড় মেরে ঘরের বাইরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ভোজন-পর্ব শেষ হল। সুন্দরবাবু উঠে গিয়ে একখানা আরামপ্রদ সোফার উপর বসে এক পায়ের উপরে আর এক পা তুলে দিয়ে আগে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর একটি চুরোট ধরিয়ে হুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন তাঁর কাহিনি

সুন্দরবনের ভিতরে দেখা দিয়েছে এক আধুনিক দেবী চৌধুরানি! তাকে এখনও কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে কেবল তার কণ্ঠস্বর!

জয়ন্ত, তুমি জানো সুন্দরবনের ভিতরে নানা-শ্রেণির ব্যবসায়ীরা সর্বদাই যাতায়াত করে। আর সুন্দরবনের ভিতরে মানুষের যাতায়াতের প্রধান পথ হচ্ছে জলপথ। এত নদী-নালা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও দেশের কোনও অরণ্যেই নেই। সুন্দরবনের জঙ্গল নানা স্থানেই এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তার ভিতরে মানুষ প্রবেশ করবে কী, দিন-দুপুরে প্রখর সূর্যালোকও প্রবেশ করতে পারে না। জঙ্গল যেখানে পাতলা সেখানেও মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। হয়তো গাছের উপরে দুলতে থাকে মোটা মোটা অজগর এবং গাছের তলায় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল। এবং সেইসঙ্গে আরও অনেক রকম চতুষ্পদ জীব আর বুকেহাঁটা বিষাক্ত সরীসৃপও আছে। তবু মোম, মধুর সংগ্রাহক আর কাঠুরিয়াদের জঙ্গলের ভিতরে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় কিন্তু নেই। যাদের বাধ্য হয়ে পদব্রজে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়, তারা মোবরা-গাজির বংশধর নামে খ্যাত ফকিরদের কাছে গিয়ে আগে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই ফকিররা নাকি মন্ত্রগুণে ব্র্যাঘ্র বা কুমিরের হিংস্র দৃষ্টি মানুষদের উপরে পড়তে দেয় না।

যাক সে কথা। এখন জলপথের কথাই হোক। বলেছি সুন্দরবনের জলপথে নৌকোয় চড়ে নানা-শ্রেণির ব্যবসায়ীরা সর্বদাই আসা-যাওয়া করে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এইসব জলপথ হয়ে উঠেছে বিপজ্জনক—এমনকি সাংঘাতিক।

ধরো, কোনও ধনী-ব্যবসায়ীর নৌকো সুন্দরবনের কোনও একটা নদীর ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। যেতে যেতে নৌকোর আরোহীরা দেখলে দূর থেকে বেগে আর একখানা বড়ো নৌকো (বা সময়ে সময়ে দ্রুতগামী ছিপ) বেগে তাদের কাছে এসে হাজির হল।

সেই বড়ো নৌকো বা ছিপের উপর থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে ব্যবসায়ীদের নৌকোর চালককে ডেকে বললে, 'মাঝি, একটু আগুন কি দেশলাই আছে ভাই? আমাদের আগুন কি দেশলাই নেই, আমরা তামাক খেতে পাচ্ছি না।'

ব্যবসায়ীদের নৌকোর মাঝি আগুন বা দেশলাই দিয়ে নবাগতকে সাহায্য করতে উদ্যত হল।

কিন্তু যেই সে হাত বাড়িয়ে নতুন নৌকোকে আগুন বা দেশলাই দিতে গেল, অমনি অপর নৌকোর উপর থেকে কেউ তার হাত ধরে টান মেরে তাকে একেবারে জলের ভিতরে ফেলে দিলে। মাঝিহীন নৌকো আর অগ্রসর হতে পারলে না। সেই সুযোগে নতুন নৌকোর উপর থেকে যমদূতের মতন দশ-বারো জন লোক বাঘের মতন লাফ মেরে ব্যবসায়ীদের নৌকোর উপরে এসে পড়ল—তারা সকলেই সশস্ত্র। কেবল তরোয়াল বা ছোরা নয়, তাদের সঙ্গে থাকে বন্দুক আর রিভলভার পর্যন্ত।

তারপর তারা ব্যবসায়ীদের নৌকোর সমস্ত আরোহীকে আক্রমণ করে। তারা এমন নির্দয় যে, কারুকেই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেয় না। সকলকেই খুন করে তাদের সঙ্গে টাকাকড়ি বা মূল্যবান যা কিছু থাকে সমস্তই লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এমনকি নৌকোখানাকে পর্যন্ত ছাড়ে না। সেখানাকেও তাদের নৌকোর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায় কোথায়, তা কেউ জানে না।

মাঝে মাঝে আক্রান্ত-ব্যবসায়ীদের নৌকোর ভিতর থেকে দু-একজন লোক কোনও গতিকে জলে ঝাঁপ খেয়ে সাঁতার দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তাদের মুখ থেকেই জানতে পেরেছি বোম্বেটেদের এই আক্রমণ-প্রণালী।

জয়ন্ত, এই আক্রমণের কৌশলটা নতুন নয়। হয়তো তুমি জানো, এদেশে যখন ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ, ডাকাত আর বোম্বেটেদের অত্যাচারে বাংলা দেশ তখন ছিল প্রায় অরাজকের মতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাকাত আর বোম্বেটেদের তখন আলাদা করে ভাবা হত না। বাংলা দেশ নদী-প্রধান বলে স্থলপথের দস্যুরা তখন প্রায়ই সাহায্য গ্রহণ করত জলপথের। সে-সময়কার ডাকাত বা বোম্বেটেরা যখন কোনও নৌকোর উপরে এসে হানা দিত, তখন সুন্দরবনের এই আধুনিক বোম্বোটেদের মতোই প্রথমে গোড়া ফেঁদে বলত, 'মাঝি, একটু আগুন দেবে ভাই?' দেখা যাচ্ছে, এই আধুনিক বোম্বেটেরা আবার সেই পুরাতন কৌশলই অবলম্বন করতে চায়।

কিন্তু আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো? সুন্দরবনে ব্যবসায়ীদের প্রত্যেক নৌকোই যখন আক্রান্ত হয়েছে, তখন শুনতে পাওয়া গেছে এক তীব্র আর তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ! বোম্বেটেরা সকলেই সেই নারীকণ্ঠেরই আদেশ পালন করে।

অথচ সেই নারী যে কে, আজ-পর্যন্ত কেউ তা দেখেনি! আজকাল ছিপের ব্যবহার নেই, কিন্তু এই বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে সেই সেকেলে ছিপ। এ শ্রেণির নৌকো—অর্থাৎ ছিপের উপরে কোনওরকম ছাউনি থাকে না; সকলেই তা জানে। কিন্তু ছিপের উপরে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও স্ত্রীলোককে দেখতে পায়নি। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক দেবী চৌধুরানি হত্যা ও লুণ্ঠন করে পুরুষের ছদ্মবেশের আড়ালেই।

কর্তাদের হুকুম হয়েছিল, যেমন করে হোক আমাকে এই অতিনৃশংস দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতেই

হবে। কারণ সুন্দরবনের জলপথে আজকাল নাকি ব্যবসায়ীদের নৌকোর আনাগোনা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। আজ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে নাকি পাঁচ শতেরও বেশি লোক। কর্তাদের হুকুম অবশ্য আমার ভালো লাগেনি মোটেই। যতসব মারাত্মক মামলার ভার আমার ঘাড়েই-বা পড়বে কেন? কিন্তু উপায় নেই, আমি হচ্ছি মাইনের চাকর। হুম! আর বেশিদিন দেরি নেই। পেনশন নিতে পারলেই বাঁচি!

দলবলসুদ্ধ দেবী চৌধুরানিকে পাকড়াও করবার জন্যে যেতে হল আমাকে। সেপাইদের নিয়ে মোটরবোটে চড়ে দিন-পনেরো ধরে সুন্দরবনের নানা নদী-নালাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। কিন্তু একটা বোম্বেটেরও চুলের টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। এমনকি এ-কয়দিনের ভিতরে কোনও ব্যবসায়ীর নৌকোই বোম্বেটের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দেবী চৌধুরানি-বেটি তার দলবল নিয়ে বোধহয় পুলিশের ভয়ে সুন্দরবন ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

হায় রে কপাল! পরশু রাত্রেই ভালো করেই টের পেয়েছি, আমার সে বিশ্বাস হচ্ছে একেবারেই বাজে বিশ্বাস! হুম! পরশু রাত্রের কথা ভাবতেও আমার পিলে চমকে যাচ্ছে এখনও। উঃ, সে কী ব্যাপার! একেলে দেবী চৌধুরানি-বেটি কী ধড়িবাজ মেয়ে রে বাবা!

মোটরবোটে চেপে ফিরে আসছিলুম কলকাতার দিকে। আকাশে ছিল চাঁদের আলো, বাতাসে ছিল ফুলন্ত সবুজ পাতার গন্ধ। নদীর জল চাঁদের আলোর লক্ষ লক্ষ হিরের টুকরো নিয়ে লোফালুফি করতে করতে তর তর করে বয়ে যাচ্ছিল গান গাইতে গাইতে। জয়ন্ত, তুমি বিশ্বাস করবে না, হঠাৎ আমার প্রাণে জাগল কবিত্ব! হঠাৎ আমি আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলুম, রবিঠাকুরের 'ও আমার চাঁদের আলো' বলে সেই গানটা! কিন্তু পুলিশের পক্ষে কবিত্ব যে কী সাংঘাতিক জিনিস, সেটা টের পেতে বিলম্ব হল না।

কবিত্বের জোয়ারে ভেসে যেই অন্যমনস্ক হয়েছি, আচম্বিতে আমাদের মোটরবোটের আগে আর পিছনে জেগে উঠল দু-গাছা দু-গাছা করে চার গাছা দড়ির বাধা! আমাদের বোটের এগুবার আর পিছোবার দুই পথই বন্ধ। জলের ভেতরে চার গাছা মোটা কাছি ডুবিয়ে দুই তীরে অপেক্ষা করছিল একেলে দেবী চৌধুরানির দল। বোটকে কবলে পেয়েই তারা করে ফেললে সেখানাকে একেবারেই বন্দি!

কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা, আমি হচ্ছি শত শত যুদ্ধজয়ী প্রাচীন পুলিশ কর্মচারী! এত সহজে আমাকে কি হস্তগত করা যায়? জলপথে যাচ্ছি, অথচ আমি সাঁতার জানি না। যদি কোনও অঘটন ঘটে, অগাধ জলের মধ্যে তলিয়ে যাব আড়াই-মন ওজনের নিরেট লোহার জিনিসের মতো। কাজেই সুন্দরবনের নদীতে বেড়াবার সময় আমার ইউনিফরমের তলায় এমন মজার পোশাক পরেছিলুম যে, আড়াই মন তিন মন ওজনের বৃহৎ মানুষকেও তা পাতালের দিকে তলিয়ে যেতে দেয় না কিছুতেই।

অম্লান বদনে খেলুম জলে ঝাঁপ! সেই মোটরবোটের আর আমার দলের লোকদের কী যে হাল হল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি খরস্রোতা নদীর টানে ভেসে চললুম রীতিমতো দ্রুতবেগে! তারপর বোধহয় মাইল-কয়েক পথ পার হয়ে ভাসতে ভাসতে উঠলুম গিয়ে নদীর এক তীরে।

তীরে উঠেই শুনলুম, খানিক তফাত থেকে এক ব্যাঘ্র গাইছে হালুম-হুলুম রাগিণী! বোম্বেটেরা ভালো কি বাঘরা ভালো তা নিয়ে আমি মনে মনে আলোচনা করবার কোনও সুযোগ পেলুম না! আমি প্রাণপণ চেষ্টায় চড়ে বসলুম একটা বড়ো গাছের উঁচু ডালের উপরেই।

সেখানে আবার-এক নতুন বিপদ! বিষম কিচির-মিচির আওয়াজ শুনেই বুঝলুম সেই গাছের

ডালে বাস করে বোধহয় শত শত বাঁদর! মনে হল, গভীর রাত্রে এই অনাহূত মানুষ-অতিথিকে দেখে সেই শত শত বানরের দল যেন আশ্রয় দিতে মোটেই প্রস্তুত নয়! গাছের ডালের উপর শব্দ শুনেই আন্দাজ করলুম, তাদের কেউ কেউ যেন আসছে আমাকে আক্রমণ করতে! জলে স্থলে শূন্যে গাছের ডালেও আমার জন্যে আজ দেখছি অপেক্ষা করে আছে কেবল বিপদের পর বিপদ! মেজাজ ভীষণ গরম হয়ে উঠল! আর কোনও দয়া-মমতা না করে চতুর্দিকে করতে লাগলুম রিভলভারের গুলিবৃষ্টি! রিভলভারের কী মহিমা! অতবড়ো গাছটা হয়ে গেল একদম নিঃশব্দ! কেবল গাছের তলায় মাটির উপরে শুনতে লাগলুম ধূপ-ধাপ শব্দের পর শব্দ! বুঝলুম, বানরের দল এগাছের বাসা ছেড়ে মাটির উপরে লাফ মেরে সরে পড়ছে অন্য কোথাও!

বাঁদরের দল তো গেল ভাই, এল আবার নতুন শত্রুর দল! তারা আবার এমন শত্রু যে, কামান দাগলেও ব্যর্থ হবে গোলা ছোড়া! এই হতভাগ্য সুন্দরবাবুকে আক্রমণ করলে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ভয়াবহ মশারা মনের সুখে পোঁ পোঁ রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে। সে যে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড, কলকাতায় বসে তোমরা তা আন্দাজ করতে পারবে না। আমি বলছি তা যে অত্যুক্তি নয়, এখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তোমরা সেটা কতক আন্দাজ করতে পারবে। বারবার মনে হয়েছিল ডাকুক-গে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ, মারি লাফটা আবার মাটির উপরে! যাক, বুদ্ধিমানের মতো সে ইচ্ছা দমন করে ফেলেছিলুম।

কিন্তু জয়ন্ত, একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। যদিও আমি কোনও নারীকে দেখতে পাইনি, কিন্তু নৌকোর উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে আমি যখন অগাধ জলের উপরে ভাসছি, নদীর এক তীর থেকে তখন শুনতে পেয়েছিলুম, খনখনে মেয়ে-গলায় খল খল অট্টহাসির পর অট্টহাসি! সে যে নারীর কণ্ঠ তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর কোনও নারীর কণ্ঠই যে সে-রকম বীভৎস, নিষ্ঠুর আর হিংস্র অট্টহাসি হাসতে পারে, আমি কখনও স্বপ্নেও তা ধারণায় আনতে পারিনি। ভয়ানক বন্ধু, ভয়ংকর! সেই কুৎসিত হাসির ভিতরে জেগে উঠেছিল যেন দুনিয়ার সমস্ত পাপ আর শয়তানি! হুম!'

তৃতীয়

নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ

জিজ্ঞাসু-চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্তও খানিকক্ষণ মুখ নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'বিমলবাবু, কুমারবাবু, সব তো শুনলেন সুন্দরবাবুর মুখে। আপনাদের কী মনে হয়?'

বিমল বললে, 'বাংলা দেশে মেয়ে-বোম্বেটের কথা এই প্রথম শুনলুম।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে আপনি কি দেবী চৌধুরানির কথা পড়েননি?'

বিমল বললে, 'পড়েছি। যদিও দেবী চৌধুরানির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, তবু ওই নারী-চরিত্রটিকে নিয়ে বঙ্কিমবাবু লিখেছিলেন—কাল্পনিক উপন্যাস। আর ইতিহাসের কি উপন্যাসের দেবী চৌধুরানি মেয়ে-বোম্বেটে ছিলেন না। রংপুর অঞ্চলে যখন একবার চাষারা বিদ্রোহী হয়, দেবী চৌধুরানি আর ভবানী পাঠক প্রভৃতির নাম শোনা গিয়েছিল সেই-সময়ে। ভবানী পাঠক যে-কালীর প্রতিমাকে পুজো করতেন, ও অঞ্চলে এখনও তা বিদ্যমান আছে। আমি আর কুমার সেই প্রতিমাকে স্বচক্ষে দেখে

এসেছি। কিন্তু সুন্দরবাবু, আজ যে মেয়ে-বোম্বেটের কথা বললেন, আমার কাছে তা অত্যন্ত অদ্ভুত বলেই মনে হল।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন, অদ্ভুত বলে মনে হল কেন? আপনি কি জানেন না এই কলকাতা-শহরেই নামাজাদা মেয়ে-গুণ্ডা আছে? মেয়ে-গুণ্ডা যখন থাকতে পারে, মেয়ে-বোম্বেটেই-বা থাকবে না কেন? হুম! এই পৃথিবীটা হচ্ছে এক আজব জায়গা, এখানে অসম্ভব কিছুই নেই।'

বিমল বললে, 'আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি না সুন্দরবাবু। ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে, তাই বললুম।'

কুমার বললে, 'মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, প্রত্যেক বোম্বেটের পিছনে কিছু না কিছু পূর্ব-ইতিহাস থাকেই। পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে, আগে সেই ইতিহাসের খবর নেওয়া। কোনও মেয়ে-বোম্বেটে হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়তে পারে না। বোম্বেটে রূপে দেখা দেবার আগেই নিশ্চয়ই সে অন্য কোনও না কোনও রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পুলিশের খাতায় আপনি ওই মেয়ে-বোম্বেটের কোনও পূর্ব-ইতিহাস পেয়েছেন কি?'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছুই পাইনি। ওই যা বললেন, এই বোম্বেটে-বেটি ঠিক যেন আকাশ থেকেই খসে পড়েছে?'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবন অঞ্চলে কোনও মেয়ে-বোম্বেটের যে আবির্ভাব হয়েছে, সুন্দরবাবুর কাহিনির ভিতরে আমি তার কোনও প্রমাণই পেলুম না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'প্রমাণ পেলে না মানে? তবে এতক্ষণ ধরে আমি কার কথা বললুম?'

সুন্দরবাবুর কথার প্রতিধ্বনি করে জয়ন্ত বললে, 'কার কথা বললেন, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

—'কার কথা আবার, আমি ওই মেয়ে-বোম্বেটের কথাই বলেছি।'

—'তাকে কেউ দেখেছে?'

—'না। কিন্তু সবাই তার গলা শুনেছে। হুকুম দেয় সে, আর দলের পুরুষররা সেই হুকুম-মতো কাজ করে।'

—'বুঝলুম। কিন্তু সকলেই—এমনকি আপনিও শুনেছেন কেবল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। সেই নারীকে কেউ কোনওদিন দেখেনি, এমনকি তার কোনও পূর্ব-ইতিহাস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চোখে না দেখে কেবল কোনও কণ্ঠস্বরের ওপরে নির্ভর করে আমি কোনও কথাই বলতে চাই না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শোনা-কথা মাত্রই কি বাজে হয় বাপু?'

—'কোন কথা বাজে আর কোন কথা কাজের তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। মেয়ে-বোম্বেটের কথা নিয়েও এখন আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি নাড়াচাড়া করছি কেবল ওই ঘটনাগুলো নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে, সুন্দরবন অঞ্চলে একদল নৃশংস জলদস্যুর আবির্ভাব হয়েছে। তারা খালি ডাকাতি করে না, যাদের উপরে হানা দেয় তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করে। আর সব-চেয়ে ভাববার কথা হচ্ছে, ডাকাতরা নৌকোগুলো পর্যন্ত নিয়ে অদৃশ্য হয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এর মধ্যে আর ভাববার কথা কী আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'ভাববার কথা নেই? ডাকাতরা নৌকোগুলো নিয়ে যায় কেন?'

—'কেন আবার, সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দেবে বলে। লুটপাটের পর তারা প্রত্যেক মানুষকে খুন করে ওই কারণেই।'

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, আমার মনে হয় এই নৌকোচুরির ভিতরে অন্য কোনও রহস্যও থাকতে পারে।'

—'কী রহস্য, শুনি?'

—'আমার বিশ্বাস, ওই ডাকাতদের দলপতি এমন একটা বৃহৎ দল গঠন করছে কিংবা করেছে, যার জন্যে দরকার অনেক নৌকোর।'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও বিমলবাবুর কথায় সায় দি।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'ও বাবা, হুম!'

মানিক বললে, 'এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যাপারটা রীতিমতো সাংঘাতিক বলে মানতে হবে। যে ডাকাতরা প্রত্যেক মানুষকেই হত্যা করে, তারা দলে ভারী হলে কি আর রক্ষে আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও সেই কথাই ভাবছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভেবেছি তো আমিও অনেক। খালি ভেবে কী লাভ, একটা উপায় তো করতে হবে?'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করা।'

সুন্দরবাবু মাথার টাকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আরে বাবা, যাত্রা-থিয়েটারের কথা ছেড়ে দাও! যাত্রা তো আমিও করেছিলুম, কিন্তু ফল হল কী? ঘটে বুদ্ধি আছে বলে কোনও-গতিকে পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে এযাত্রা পালিয়ে আসতে পেরেছি!'

জয়ন্ত বললে, 'বোকার মতন কাজ করলেই শাস্তিভোগ করতে হয়।'

—'হুম, বোকার মতন আবার কী কাজ করলুম?'

—'আপনি যে চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে করতে গিয়েছিলেন!'

—'মানে?'

—'প্রকাশ্যে নৌকো-বোঝাই পুলিশ-ফৌজ নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন ডাকাতদের ধরতে। কাজেই আপনাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, তারাই।'

সুন্দরবাবু অনুতপ্তকণ্ঠে বললেন, 'ঠিক ভাই জয়ন্ত, ঠিক! বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি ওঅঞ্চলে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল, ছদ্মবেশে।'

জয়ন্ত বললে, 'তা যাননি বলেই পুলিশের সাড়া পেয়েই ডাকাতরা প্রথমে জাল গুটিয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর চমৎকার ফাঁদ পেতে তারা চেষ্টা করেছিল পুলিশ-বাহিনীকে একেবারে উচ্ছেদ করতে!'

সুন্দরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'উচ্ছেদ তো তারা করেছেই, হয়তো দলের ভিতরে বেঁচে আছি খালি আমিই একলা। শুনছি আমাদের বড়ো-সাহেব নাকি আমার উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখনও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হইনি, কিন্তু কেমন করে যে মুখরক্ষা করব কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। ভাই জয়ন্ত, তুমি একটা সৎপরামর্শ দাও।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মত যদি মানেন, তাহলে সদলবলে আবার ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এবারে তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?'

—'যদি বলেন, থাকব। আমিও থাকব, মানিকও থাকবে। বিমলবাবু, কুমারবাবু, আপনাদের খবর কী? হাতে কোনও নতুন অ্যাডভেঞ্চার আছে-নাকি?'

বিমল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'একটাও না, একটাও না। দুনিয়ায় অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারের অভাব হয়েছে, আমি আর কুমার এখন বেকার বসে আছি।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'তাহলে চলুন না, সকলে মিলে একবার সুন্দরবন ভ্রমণ করে আসি।'

বিমল ও কুমার একসঙ্গেই বললে, 'রাজি!'

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'জয়ন্ত, ক্যাংলাদের তুমি জিজ্ঞাসা করছ ভাত খাবে কি না! নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে তখনই মেতে উঠবেন, 'এটা তো জানা কথাই!'

চতুর্থ

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী

চব্বিশ পরগনার প্রান্তদেশে সমুদ্রের অনেকগুলো বাহু যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারই কাছাকাছি মাঝারি একটি নদীপথ।

সেই নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নোঙরে বাঁধা 'লঞ্চ'। সেখানি হচ্ছে বিখ্যাত জমিদার বিজনবিহারী রায়চৌধুরির বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী।

জমিদারি থেকে বিজনবাবুর বার্ষিক আয় চার লক্ষ টাকার উপর। তার উপরে আছে তাঁর ব্যাংকের খাতা। বয়সে তিনি যুবক এবং জমিদারির একমাত্র মালিক! তাঁর নাম জানে না বাংলা দেশে এমন লোক খুব কমই আছে, কেননা দীনদুঃখীদের জন্যে তিনি অর্থব্যয় করেন অকাতরে। তাঁর একটি শখও আছে এবং সেটি হচ্ছে সংগীতপ্রিয়তা। নিয়মিত মাহিনা দিয়ে তিনি অনেক বিখ্যাত সংগীতশিল্পীকে রীতিমতো লালনপালন করেন।

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাংলা দেশের নানা জলপথে। বিশেষ করে সুন্দরবন হচ্ছে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। এখানে তিনি যখন অবসরযাপন করতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে থাকে কয়েকজন সংগীতপ্রিয় বন্ধু এবং কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক।

সেদিন ছিল, পূর্ণিমার রাত। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে সুন্দরবনের অসীম শ্যামলতা হয়ে উঠেছে বিচিত্র এবং জ্যোতির্ময়! বাতাসের ছন্দে ছন্দে নদীর দুই তীরের নির্জন অরণ্যের মধ্য থেকে ভেসে আর ভেসে আসছে অশ্রান্ত মর্মর-রাগিণী! এবং সেই রাগিণীর সঙ্গে সুর জুড়ে দিয়েছে উচ্ছ্বসিত তটিনীর অপূর্ব কলতান!

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণীও নিস্তব্ধ হয়ে ছিল না। 'লঞ্চে'র উপরকার ছাদের উপরে বসেছে বেশ একটি ছোটোখাটো সভা। সেখানে গায়করা আছেন আর আছেন বিজনবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ। একজন বিখ্যাত গায়ক তখন সন্তবাহারে করছিলেন চমৎকার আলাপ।

এমন সময়ে নদীপথে উঠল একটা বেসুরো শব্দ। একখানা মোটরবোট গর্জন করতে করতে এসে থেমে গেল ঠিক প্রমোদ-তরণীর পাশে।

বিজনবাবু 'লঞ্চে'র ধারেই বসেছিলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, মোটরবোটখানার কোনও কল বোধহয় বিগড়ে গিয়েছে।

মিনিট চার-পাঁচ পরে মোটরবোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি প্রাচীন ভদ্রলোক। উজ্জ্বল

চাঁদের আলোকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, তাঁর মাথার শ্বেত কেশ এবং মুখের ধবধবে লম্বা দাড়ি। ভদ্রলোকের আকারও যে বিশেষ দীর্ঘ সেটাও বেশ বোঝা গেল, কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে তাঁর দেহ।

হঠাৎ জেগে উঠল এক নারী-কণ্ঠস্বর। যেন কোনও নারী বললে, 'এই 'লঞ্চে'র মালিক কে?'

বিজনবাবু বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়েও দেখতে পেলেন না কোনও নারীকেই!

তারপরই তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে উঠল। কারণ সেই বৃদ্ধ তাঁকে সম্বোধন করেই আবার সেই নারী-কণ্ঠেই বললে, 'এই 'লঞ্চে'র মালিকের সঙ্গে একবার আমার দেখা হবে কি?'

নারী-কণ্ঠে কথা কইছেন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক!

বিজনবাবু জীবনে কোনও পুরুষের গলাতেই এমন মেয়েলি-আওয়াজ শোনেননি। নিজের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে তিনি বললেন, 'আমিই এই 'লঞ্চে'র মালিক। আপনি কী বলতে চান, বলুন।'

মোটরবোটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'নমস্কার মশাই, নমস্কার! আমার বোট অচল হয়ে গিয়েছে। বোটের চালক বলছে, তার 'পেট্রলে'র ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়েছে। আপনার কাছ থেকে কিছু 'পেট্রল' আশা করতে পারি কি? বড়োই বিপদে পড়েছি মশাই, যদি এই উপকারটি করতে পারেন তাহলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।'

বিজনবাবু বললেন, 'আমার 'লঞ্চে' তো অতিরিক্ত 'পেট্রল' নেই! আপনাকে যে এই বিপদে সাহায্য করতে পারলুম না, এজন্যে বড়োই দুঃখিত হচ্ছি।'

বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হতাশভাবে বললেন, 'কার মুখ দেখে বেরিয়েছি জানি না, বড়োই বিপদে পড়লুম। বোট হল অচল, সঙ্গে নেই খাবার, আজ সারারাত অনাহারেই কাটাতে হবে দেখছি! আর কাল সকালেই বা এ-বোট চলবে কেমন করে, তাও তো বুঝতে পারছি না!'

বৃদ্ধ আবার যখন বোটের ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলেন বিজনবাবু সেইসময়ে বললেন, 'মশাই, আপনার অতটা চিন্তিত হবার কারণ নেই। বোটখানা আমার 'লঞ্চে'র পিছনে বেঁধে আজ আপনি অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে পারেন।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু আমি তো একলা নই, আমার সঙ্গে রয়েছে যে আরও জন-আষ্টেক লোক। তাদের কী ব্যবস্থা করি বলুন দেখি?'

বিজনবাবু সহাস্যে বললেন, 'তাঁদের ব্যবস্থা করতেও আমার কষ্ট হবে না। সবাইকে সঙ্গে করে আপনি এখন 'লঞ্চে'র উপরে এলেই আমি আনন্দিত হব।'

বৃদ্ধের দেহ বোধহয় অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর সঙ্গের লোকেরা তাঁকে সাহায্য না করলে নিশ্চয়ই তিনি বোট ছেড়ে 'লঞ্চে'র উপরে এসে উঠতে পারতেন না। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে সদলবলে 'লঞ্চে'র ছাদের উপরে এসে দাঁড়ালেন। বিজনবাবু দেখলেন, বৃদ্ধের প্রত্যেক সঙ্গীরই দেহ হচ্ছে রীতিমতো অসাধারণ। সকলেরই মূর্তি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদীর্ঘ এবং সকলেরই হাতে রয়েছে এক-একগাছা করে বড়ো লাঠি! ওই-সব বলবান মূর্তির পাশে বৃদ্ধের দেহকে দেখাচ্ছিল এত অসহায় যে, বর্ণনা করে তা বোঝানো যায় না।

বিজনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার সঙ্গে এত মোটা মোটা লাঠির সমারোহ কেন?'

বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন, 'সুন্দরবন জায়গা তো নিরাপদ নয়! কখন কী হয় বলা যায় না! সেইজন্যে একটু প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়!'

বিজনবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার এই 'লঞ্চে'র উপরে আপনাদের ওই লাঠিগুলি কোনও কাজেই লাগবে না! এখানে হচ্ছে সংগীতচর্চা, যষ্টির সঙ্গে যার কোনওই সম্পর্ক নেই!'

হঠাৎ আসরের ভিতর থেকে বিজনবাবুর এক বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'কী আশ্চর্য! চেয়ে দ্যাখো বিজন, চেয়ে দ্যাখো! চারিদিক থেকে ভেসে আসছে কতগুলো নৌকো! খান-চারেক ছিপও আছে দেখছি! ব্যাপার কী?'

নোঙর বেঁধে 'লঞ্চ' যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার নদীর দুই তীরেই ছিল এখানে-ওখানে কতগুলো ছোটো ছোটো নালার মতো জলপথ। নৌকোগুলো বেরিয়ে আসছে সেইসব নালার ভিতর থেকেই। বিজনবাবু ভালো করে দেখবার জন্যে আবার 'লঞ্চে'র ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় সেই বৃদ্ধ বললেন, 'আপনিই তো বিজনবাবু?'

বিজনবাবু ফিরে বললেন, 'আপনি আমার নামও জানেন দেখছি!'

আচম্বিতে বৃদ্ধের চেহারা গেল একেবারে বদলে! যুবকের মতন সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠে বললেন, 'মশায়ের নাম জানি বলেই তো 'লঞ্চে'র উপরে এসে উঠেছি! সকলের পরিচয় না জানলে কি আমাদের চলে? হা হা হা হা!'

কণ্ঠ—নারীর, কিন্তু কী তীব্র সেই অট্টহাস্য!

বিজনবাবু শান্তকণ্ঠেই বললেন, 'আপনার কথার মানে বুঝতে পারলুম না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'মানে বুঝতে আর বেশি দেরি লাগবে না! আপনি সুন্দরবনের মধুডাকাতের নাম শুনেছেন কি?'

বিজনবাবু বললেন, 'অমন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আবার শুনিনি? মধুডাকাতের অত্যাচারে সুন্দরবনের নদীতে নদীতে আজ ব্যবসায়ীদের নৌকো চলে না বললেই হয়। মধু খালি অর্থ লুণ্ঠনই করে না, তার কবলে যারা পড়ে তাদের সকলকেই হত্যা করে! সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মধুর ব্যবহারও বিশেষ মধুর নয়!' বলতে বলতে তিনি লক্ষ করে দেখলেন, বৃদ্ধের একটা চোখ হচ্ছে পাথরের চোখ। সেই একচক্ষু বৃদ্ধ খনখনে মেয়ে-গলায় আবার অট্টহাস্য করে উঠে বললেন, 'আমিই হচ্ছি সেই মধুডাকাত! এখন আমার বক্তব্যটা আপনি দয়া করে শুনবেন কি?'

বিজনবাবু একথা শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। স্থিরকণ্ঠে বললেন, 'তুমি মধু কি বিষ আমি তা জানতে চাই না, কিন্তু আমার 'লঞ্চে'র উপরে তোমার আবির্ভাব কেন?'

মধু তার লাঠিটা সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি। আপনি একজন দানশীল ব্যক্তি আর বাংলা দেশের একজন প্রসিদ্ধ লোক। আমার নিয়ম হচ্ছে, যাদের ওপরে আমি হানা দি, তাদের সকলকেই করি খুন! কিন্তু আপনাকে আমি খুন করতে চাই না!'

বিজনবাবু বললেন, 'আমার উপরে তোমার এতটা অনুগ্রহের কারণ কী?'

—'কারণ আছে বই কি! আপনাকে আমি এখনই কীটের মতন হত্যা করতে পারি, কিন্তু তা করব না কেন জানেন? ভিমরুলের চাকে খোঁচা না মারাই ভালো!'

—'অর্থাৎ?'

—'আপনার মতো নামজাদা লোককে আজ যদি আমি পরলোকে পাঠিয়ে দি, তাহলে ইহলোকে উঠবে অত্যন্ত অভদ্র কোলাহল! কিন্তু আপনাকে প্রাণে মারব না কেবল একটি শর্তে!'

—'শর্তটা কী শুনি?'

—'আপনার আর আপনার বন্ধুদের কাছে যা কিছু টাকাকড়ি আর মূল্যবান জিনিস আছে, সমস্তই এখনই আমার হাতে ভালো মানুষের মতন সমর্পণ করুন!'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার যে কথা সেই কাজ!'

আচম্বিতে সেই নির্জন অরণ্যবিহারী রাত্রির বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল তীব্র বাঁশির পর বাঁশির শব্দে!

মধুডাকাত সচমকে বলে উঠল, 'ও কীসের শব্দ?'

বিজনবাবু প্রশান্তভাবে হাসতে হাসতে বললেন, 'মধুডাকাত, বেজে উঠেছে পুলিশের বাঁশি! চেয়ে দ্যাখো, চারিদিক থেকে ছুটে আসছে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে পুলিশের মোটরবোটগুলো! আজ তুমি ফাঁদে পা দিয়েছ!'

মধু টপ করে তার মোটা লাঠিগাছা মাথার উপরে তুলে বিকৃত নারী-কণ্ঠে কুৎসিত ভয়াবহ গর্জন করে বললে, 'তাই নাকি? তাহলে আগে তুই-ই মর!'

বিজনবাবু দুই পা পিছিয়ে গিয়ে চকিতে পকেটের ভিতর থেকে একটি চকচকে অটোমেটিক-রিভলভার বার করে বললেন, 'মধু, আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নেই! পুলিশের অনুরোধে তোমার লীলাখেলা সাঙ্গ করবার জন্যেই আজ আমার এখানে আগমন হয়েছে!'

মধুর একটিমাত্র চক্ষু একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেই আবার নিবে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সে তিরবেগে ছুটে গিয়ে 'লঞ্চে'র ছাদের উপর থেকে মারলে এক লাফ!

নদীর জলে ঝপাং করে গুরুদেহ পতনের একটা শব্দ হল। বিজনবাবু ছাদের ধারে গিয়ে দেখলেন, মধু গিয়ে উঠল তার নিজের মোটরবোটের ভিতরে এবং তারপরেই চালকের আসনে বসে বোটখানা চালিয়ে দিলে পূর্ণবেগে!

চারিদিক থেকে যে নৌকো ও ছিপগুলো 'লঞ্চে'র দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল, পুলিশের মোটরবোটগুলো তাদের উপরে গিয়েই পড়ল। তারপরেই সেই চন্দ্রপুলকিত আকাশ যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল উপরি উপরি মনুষ্য-কণ্ঠের চিৎকারে, গর্জনে, আর্তনাদে এবং ঘনঘন বন্দুকের শব্দে!

কিন্তু পুলিশের একখানা মোটরবোট সেই হাঙ্গামায় যোগ দিলে না, সেখানা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল সোজা নদীর পথ ধরে।

সেই বোটের ভিতরে বসে আছে সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত, মানিক, বিমল ও কুমার।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! মধুবেটা দেখছি আমার সেই মোটরবোটখানা নিয়েই লম্বা দেবার চেষ্টায় আছে!'

এ বোটখানা চালাচ্ছিল বিমল স্বয়ং। বোটের গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, 'জয়ন্তবাবু, মধুর বোট 'স্টার্ট' পেয়েছে আমাদের আগেই! ওর নাগাল ধরতে পারব কি না বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'চাঁদের আলোয় কালো রেখার মতো মধুর বোটখানা সামনেই দেখা যাচ্ছে! স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলে কি ওকে ধরতে পারা যাবে না?'

বিমল বললে, 'স্পিড' যা বাড়িয়ে দিয়েছি তাই-ই হচ্ছে বিপজ্জনক! কিন্তু তবু মধু আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান কমছে বলে তো মনে হচ্ছে না!'

নদী এতক্ষণ চলছিল সমান রেখায়। তারপরই খানিক দূরে দেখা গেল একটা বাঁক! মধুর বোটখানা

অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বাঁকের কাছে মোড় ফিরে। মিনিট-দেড়েক পরেই পুলিশের বোটখানাও যখন সেই বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে তখন সবাই দেখতে পেলে, নদী আবার চলে গিয়েছে সরল রেখায় এবং মধুর বোট চাঁদের আলোয় কালো রেখার মতো ছুটে চলেছে তেমনি পূর্ণবেগে!

সুন্দরবাবু উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'বিমলবাবু, আরও 'স্পিড' বাড়ান! মধুব্যাটাকে আজ ধরতে হবেই!'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'এ বোটের 'স্পিড' আর বাড়াবার উপায় নেই! তবে মনে হচ্ছে, আমরা বোধকরি শেষ পর্যন্ত মধুর বোটের নাগাল ধরতে পারব!'

নির্জন ও নিস্তব্ধ সেই বন্যজগতে নদীর দুই পারের বড়ো বড়ো বনস্পতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সবিস্ময়ে দেখতে লাগল, যন্ত্রযুগের মনুষ্যদের হস্তে চালিত দু-খানা কলের নৌকোর উল্কাগতির লীলা!

কুমার উৎসাহিতকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, 'নদী আবার বেঁকে গিয়েছে! কিন্তু বোধ হচ্ছে ওই বাঁকের কাছে গিয়েই আমরা মধুর বোটখানাকে ধরে ফেলতে পারব!'

বিমল প্রাণপণে বোটের যন্ত্র সামলাতে সামলাতে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'মনে তো হচ্ছে পারব! কিন্তু সামনের বোটখানার অবস্থা দেখছ কি?'

সত্যই তাই!

মধুর বোটখানা বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে না, বিদ্যুৎ-বেগে সামনের দিকেই সমানে এগিয়ে চলল!

জয়ন্ত ত্রস্ত-কণ্ঠে বললে, 'কী সর্বনাশ! মধু যে-ভাবে বোট চালাচ্ছে, এখনই যে বিষম দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা! মধু কি আত্মহত্যা করতে চায়?'

—বলতে বলতে বাঁকের কাছে মোড় না ফিরে মধুর বোটখানা তীব্রবেগে গিয়ে পড়ল নদীর পাড়ের উপরে! ভীষণ একটা শব্দ হল এবং তারপরেই বোটের ভিতর থেকে লকলক করে বেরিয়ে পড়ল আরক্ত-অগ্নির সমুজ্জ্বল শিখা!

সুন্দরবাবু বললেন, 'মধুব্যাটা বোট সামলাতে পারলে না, বোধহয় জ্যান্ত অবস্থায় ওকে আর ধরতে পারব না, শেষপর্যন্ত ব্যাটা আমাদের ফাঁকি দিয়েই পালাল!'

বিমল নিজের বোটের গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে বাঁকের কাছে গিয়ে হাজির হল। মধুর বোটের উপরে তখনও চলছে অগ্নিদেবের রক্তাক্ত নৃত্য! ...

কিন্তু সেই অগ্নিময় বোটের আগুন যখন নেবানো হল, তখন তার ভিতরে কোনও দগ্ধবিদগ্ধ মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু মাথার টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'কী আশ্চর্য! এরই মধ্যে মধুর দেহ কি পুড়ে ছাই হয়ে গেল?'

বিমল তিক্তহাসি হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মধু আবার বোধহয় আমাদের ফাঁকি দিলে!'

জয়ন্ত বললে, 'আমারও তাই বিশ্বাস। মধু বাঁকের আড়ালে গিয়েই বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! তারপর সাঁতরে নদীর পারে গিয়ে উঠেছে! আমরা বোকার মতো যখন এই শূন্য বোটের পিছনে ছুটে আসছি তখন সে জঙ্গলের কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে! আজ আর তাকে আবিষ্কার করা অসম্ভব!'

পঞ্চম

অবলাকান্ত

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী সেই নদীপথেই অচল হয়ে রইল।

কেবল শশব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিশের মোটরবোটগুলো, তারা সুন্দরবনের এ অঞ্চলের সমস্ত নদীনালা দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল কয়েক দিন।

সেদিন প্রমোদ-তরণীর একটি কামরার ভিতরে বসে ছিল জয়ন্ত, মানিক, বিমল ও কুমার। সুন্দরবাবু সেখানে ছিলেন না, তিনি চরের মুখে কী খবর পেয়ে মধুডাকাতের খোঁজে মোটরবোটে চড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

মাঝের কয়দিনের ভিতরে কোনও ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। যে রাত্রে মধুডাকাত পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, তারপর থেকে কেউ তার সন্ধান না পেলেও সুন্দরবনের এই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের নৌকো আক্রান্ত হচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু কারা আক্রমণ করছে এবং আক্রমণকারীরা কোথায় যে অদৃশ্য হচ্ছে তার কোনও খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আক্রমণের পদ্ধতি সেই একই রকমের। বোম্বেটেরা অর্থলুণ্ঠন এবং ব্যবসায়ীদের হত্যা করে নৌকো পর্যন্ত নিয়ে পলায়ন করছে। সুতরাং এইসব উপদ্রবের মূলে আছে যে মধুডাকাতই সেটা বুঝতে কারুরই দেরি লাগল না।

সেদিন প্রমোদ-তরণীর কামরায় বসে মানিক বলছিল, 'জয়ন্ত, একটা বিষয় লক্ষ করেছ কি?'

—'কী?'

—'যত ডাকাতি হচ্ছে সব চৌদ্দ-পনেরো মাইলের ভিতরে। অথচ দলে দলে পুলিশকর্মচারী সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কোথাও তন্নতন্ন করে খুঁজতে বাকি রাখেনি। এর মধ্যে হয়তো একটা টেনিস বল পড়লেও তারা খুঁজে বার করতে পারত। এখনও দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে যেসব ডাকাতি হচ্ছে, সবাই বলছে সেসব মধুডাকাতের কীর্তি! কিন্তু একথা সত্য বলে মানি কী করে?'

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে চুপ করে বসে রইল, কোনও জবাবই দিলে না। মনে হল, যেন সে কোনও-একটা বিশেষ কথা দিয়ে নীরবে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময়ে সশব্দে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

কামরায় ঢুকেই মাথার টুপিটা খুলে একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মহা বিরক্তিভরে তিনি বলে উঠলেন, 'হুম! মোধোব্যাটার কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না! যত সব বাজে খবর!'

জয়ন্ত হঠাৎ চোখ খুলে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে নিজের রুপোর নস্যদানি বার করে দু-টিপ নস্য গ্রহণ করলে। তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'বিমলবাবু, সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'*র মামলাটা মনে আছে কি? সে মামলায় আমরা সকলেই তো একসঙ্গে ছিলুম!'

বিমল বসে বসে একখানা ইংরেজি সচিত্র সাময়িকের পাতা ওলটাচ্ছিল। জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, 'সে তো এই গেল-বছরের ব্যাপার! এত শীঘ্র ভুলে যাবার তো কোনও কারণ নেই।'

—'সেই মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল, তার কথাও মনে আছে তো?'

---

* লেখকের 'জেরিণার কণ্ঠহার' দ্রষ্টব্য।

বিমল কোনও জবাব দেবার আগেই সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ও বাবা, সে কথা কি ভোলবার? মাত্র একখানা বাড়ির ভেতরেই সে ব্যাটা আমাদের সকলকে রীতিমতো ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল! আর শেষপর্যন্ত আমরা তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তারও করতে পারিনি!'

কুমার বললে, 'আপনারা কি অবলাকান্তের কথা বলছেন?'

বিমল হঠাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অবলাকান্ত, অবলাকান্ত! জয়ন্তবাবু, আপনি খুব একটা মস্ত প্রশ্ন করেছেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ আর মস্ত প্রশ্ন কী? অবলাকান্তের মামলা তো অনেকদিন আগেই চুকে গিয়েছে! তাকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, সেই অবলাকান্ত! যে প্রথমেই করেছিল আমাকে বন্দি, আপনাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে! আশ্চর্য সেই অবলাকান্ত! অসাধারণ সুদীর্ঘতার অতি কৃষ্ণবর্ণ দেহ, মুখের উপরে জেগে থাকে তার একটিমাত্র চক্ষু, কারণ তার অপর চক্ষুটি পাথরে তৈরি, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড পুরুষালি চেহারার ভিতর দিয়ে নির্গত হয় একেবারেই মেয়েলি-কণ্ঠস্বর!'

জয়ন্ত বললে, 'সেই অবলাকান্ত গঙ্গায় বানের টানে ঝাঁপ দিয়েছিল বটে, কিন্তু অনেক সন্ধান করেও আমরা তার দেহ খুঁজে পাইনি।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ তাঁর সেই গুরুভার দেহ নিয়ে একটি বৃহৎ লম্ফ ত্যাগ করে বললেন, 'হুম! এ সব কথার মানে কী?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মানেটা আপনি নিজে নিজেই বোঝবার চেষ্টা করুন!'

কুমার বললে, 'বিজনবাবুর মুখে শুনলুম, মধুডাকাতেরও রং হচ্ছে কালো, আর তার দেহ হচ্ছে সুদীর্ঘ! তারও একটা চোখ পাথরের আর সে-ও কথা কয় একেবারে মেয়েলি গলায়! মধুডাকাতের সঙ্গে অবলাকান্তের চেহারার বিশেষত্ব বড্ড বেশি মিলে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ একটা আবিষ্কার। মস্তবড়ো আবিষ্কার। সেদিনকার সেই অবলাকান্তই যে আজ মধুডাকাত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ বিষয়ে আমার আর কোনওই সন্দেহ নেই! হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, মধুই বলুন আর অবলাকান্তই বলুন, তার টিকির খোঁজ পর্যন্ত এখনও তো পাওয়া গেল না! আপনারা সুন্দরবনের এ অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই আবিষ্কার করতে পারলেন না! অতএব আমাদের এখন উচিত হচ্ছে, কলকাতায় আবার ফিরে যাওয়া। বুনোহাঁসের পিছনে কত দিন ধরে ছুটব?'

সুন্দরবাবু ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হতাশভাবে বললেন, 'কী করব ভাই, এই মধুব্যাটা হয়তো ভোজবাজি জানে! সে কাছাকাছিই আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও সে এই 'লঞ্চে'র ত্রিসীমানায় আসে না, তবু নৌকোর উপর হানা দিচ্ছে দশ-পনেরো মাইলের ভিতরেই! সে কাছেই আছে অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় সে মায়াবী—ফুসমন্ত্র জানে!'

ঠিক এইসময়েই বিজনবাবুর অনুচররা কামরার ভিতরে এসে ঢুকল কয়েকখানা 'ট্রে' ভরে খাদ্য ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। চমৎকৃত হয়ে গেল যেন সুন্দরবাবুর দেহ ও মুখ! তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এসেছ বাবা! বড়োই ভালো কাজ করেছ। খিদেয় পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে!'

বিজনবাবুর অতিথি-সৎকার হচ্ছে চমৎকার! এটা হচ্ছে সুন্দরবাবুর নিজস্ব মত। কিন্তু বিমল ও কুমার এবং জয়ন্ত ও মানিকের মত হচ্ছে সম্পূর্ণ উলটো! তারা বলে, 'চমৎকার ব্যাপার যে কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, আজ এখানে এসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

প্রভাতি-চায়ের আসরে বিশ-তিরিশ রকম টুকিটাকি খাবার; মধ্যাহ্নের খাদ্যতালিকায় পাওয়া যাবে অন্তত পঞ্চাশ রকম খাবারের নাম; বৈকালি-চায়ের আসরে আবার সেই বিশ-তিরিশ রকম খাবার এবং রাত্রের ভোজের ব্যাপারটা হচ্ছে রীতিমতো গুরুতর! একদিন খাদ্যতালিকায় সেখানে নাম পাওয়া গিয়েছিল, পাঁচাত্তর রকম খাবারের!

কুমার বললে, 'বড়োমানুষ দেখাচ্ছেন বড়োমানুষি। কিন্তু খাবারের ঠ্যালায় আমাদের মতন ছোটো-মানুষের প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে! সত্যি জয়ন্তবাবু, বিজনবাবু আমাদের খাদ্য-পর্বতের তলদেশে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে চাইছেন! আমার মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! কুমারবাবু, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না! খাবারের ভয়ে কেউ যে পালিয়ে যেতে চায় এমন কথা এই প্রথম শুনলুম! কে জানে বাবা, দুনিয়ায় কতরকম লোকই আছে!'

মানিক বললে, 'ঠিক বলেছেন সুন্দরবাবু! আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম!'

সুন্দরবাবু কোনওদিনই মানিকের রসনাকে বিশ্বাস করেন না। তিনি সন্দিগ্ধ-স্বরেই বললেন, 'কী রকম, তুমিও ওই কথাই ভাবছিলে?'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। দুনিয়ার কত রকম লোকই আছে! কোনও মানুষের পক্ষীর আহার, আবার কেউ পেট ভরায় ঠিক গ্লুটনের মতন।'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঞ্চিত করে বললেন, 'গ্লুটন মানে?'

—'তা জানেন না বুঝি? গ্লুটন নামে এক চতুষ্পদ জানোয়ার আছে, সে যত পাবে ততই খাবে! এমনকি, যখন খেতে আর পারবে না তখনও সে গ্রোগ্রাসে উদর পূর্ণ করতে চাইবে!'

—'খিদে মিটে গেলে কেউ আবার খেতে চায় নাকি?'

—গ্লুটনরা চায়। তাদের পেট যখন খেয়ে খেয়ে ফোলা-হাপরের মতন হয়ে উঠেছে, অথচ সামনের খাবার যখন শেষ হয়নি, তখন তারা কী করে জানেন?'

সুন্দরবাবু অধিকতর সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি না, আর জানতেও চাই না!'

—'আহা, তবু শুনে রাখুন না! গ্লুটন তখন করে কী, বনের ভিতরে খুঁজে এমন দুটো বড়ো বড়ো গাছ বেছে নেয় যাদের মধ্যের ফাঁক দিয়ে তার শরীর একেবারেই গলে না। কিন্তু গ্লুটন সেই অল্প ফাঁকটুকুর ভিতরেই নিজের শরীর এমন প্রাণপণে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, দু-দিক থেকে বিষম চাপ খেয়ে তার পেটের খাবার আবার হড় হড় করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারপর পেট যেই খালি হয়ে যায়, তখন সে আবার বাকি খাবারগুলোকে পাঠিয়ে দেয় জোর করে খালি করা পেটের ভিতরে!'

সুন্দরবাবু অত্যন্ত মুখভার করে বললেন, 'এখানে হঠাৎ তোমার ওই গ্লুটনের কথাটা মনে পড়ল কেন বলো দেখি?'

মানিক দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, 'মনে পড়ল, তাই বললুম! কেন মনে পড়ল, সে কথা নাই বা বললুম!'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'তোমার মতন হাড়-বজ্জাত ছোকরা জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি! আমি এত বোকা নই হে, কাকে লক্ষ্য করে তুমি এ কথা বলছ তা বুঝতে পেরেছি! হুম!' তিনি রাগে গস গস করতে করতে উঠে গিয়ে একখানা বড়ো সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন—নিজের প্রচণ্ড হজমশক্তির দ্বারা বৃহৎ উদরের বৃহত্তর ভার খানিকটা কমিয়ে ফেলবার জন্যে।

মানিক আর কুমার দাবাবোড়ে খেলতে বসে গেল। একখানা চেয়ার জানলার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ে জয়ন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, নদীর ওই তীরে সুন্দরবনের কাঁচা শ্যামলতার উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে চঞ্চল বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আলো আর ছায়ার হিন্দোলা!

খানিকক্ষণ কারুর মুখে কোনও কথা নেই।

বিমল হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে ডাকলে, 'জয়ন্তবাবু!'

—'কী বলছেন বিমলবাবু?'

—'আপনি সুন্দরবনের এখানকার প্রাচীন ইতিহাস জানেন?'

—'বিশেষ কিছুই জানি না।'

—'প্রাচীনকালে এখানে একটি মস্ত বড়ো রাজ্য ছিল। তখন কেউ তাকে ডাকত—ব্যাঘ্রতটী বলে, আর কেউ ডাকত—সমতট বলে। এই সমতট রাজ্য এমন বিখ্যাত ছিল যে, সেকালকার চিন দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী য়ুয়ান চুয়াং পর্যন্ত এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সেইসময়ে তিনি এসে দেখেছিলেন, এখানে নানাজাতীয় ধর্মোপাসকরা বাস করেন। তাঁদের কেউ জৈন, কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্দু। এখানে তিনি তিরিশটি বড়ো বড়ো বৌদ্ধ মঠ আর বিহার দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন হিন্দুদের একশোটি মন্দির। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শহরে যা যা থাকে এখানেও সে সমস্তের কোনওই অভাব ছিল না—

অর্থাৎ নাগরিকদের অসংখ্য ঘরবাড়ি, ধনীদের অট্টালিকা, রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদ। কিন্তু সে-সব অতীত ঐশ্বর্যের চিহ্ন এখন পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'তার কারণ?'

—'সুন্দরবনের এখানটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গা। এখানকার মাটি নাকি ক্রমাগত নীচের দিকে বসে যায় আর তার উপরে এসে জায়গা জুড়ে থাকে নতুন মাটি। আজও সুন্দরবনের এই অঞ্চলের অনেক জায়গা খনন করে উপরকার মাটির তলায় পাওয়া গিয়েছে বড়ো বড়ো প্রাসাদ, অট্টালিকা আর ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ। আবার অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখা গিয়েছে, বড়ো বড়ো গাছগুলো মাটি চাপা পড়েও সোজা হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসে সন্ধানী লোক যদি খোঁজ আর চেষ্টা করে, তাহলে পৃথিবীর গর্ভ থেকে আবিষ্কার করতে পারে সেকালকার একাধিক ভূপ্রোথিত অট্টালিকা বা মন্দির প্রভৃতি। অবশ্য আবিষ্কার করবার জন্যে কারুকে বিশেষ সন্ধান করতে হয় না, কারণ পৃথিবীর উপরকার মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনেক সময় বোঝা যায় যে, লোকের চোখের আড়ালে এখানে লুকিয়ে আছে, অতীতের কোনও না কোনও কীর্তি!'

জয়ন্ত হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে বসে আগ্রহভরে বললে, 'তারপর?'

—'তারপর? ভারতে যখন মোগলদের সাম্রাজ্য, বাংলার মহাবীর প্রতাপাদিত্য যখন স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি করছেন, তখনও এখানে আবার নতুন করে মানুষের বসতি—অর্থাৎ শহর বা গ্রাম বসাবার চেষ্টা হয়েছিল। তখনও এখানে সুন্দরবনের কেঁদোবাঘের হুঙ্কারের চেয়ে ঢের বেশি শোনা যেত নাগরিক মানুষদের মিষ্ট কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার পরই এখানে শুরু হয়, পর্তুগিজ-বোম্বেটেদের অমানুষিক অত্যাচার। তারা ডাঙায় নেমে লুটপাটই করত না, সেইসঙ্গে ধরে নিয়ে যেত অগুন্তি মেয়ে, পুরুষ আর বালকদেরও। পাছে সেই বন্দিরা জলদস্যুদের জাহাজ থেকে জলে লাফিয়ে পালিয়ে যায়, সেইজন্যে তাদের অনেককে কীরকম করে ধরে রাখা হত জানেন?'

এতক্ষণে সুন্দরবাবুর প্রায় ঘুমন্ত আগ্রহ সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তিনি ধড়মড় করে সোফার উপরে উঠে পড়ে বললেন, 'বিমলবাবু, আপনার গল্পটি ভারী ইন্টারেস্টিং লাগছে!'

—'এ গল্প নয় সুন্দরবাবু, এসব হচ্ছে, ইতিহাসের কথা।'

—'মানলুম। কিন্তু ওই পাজি পর্তুগিজরা বাঙালি বেচারিদের জাহাজের উপরে নিয়ে গিয়ে কী রকম করে ধরে রাখত?'

—'জাহাজের পাটাতনের তলায় যেখানে দশজন লোক ধরে না সেইখানে ঢুকিয়ে দিত হয়তো একশোজন বাঙালিকে। তারপর তাদের প্রত্যেকের হাত পেরেক বা হুক মেরে জাহাজের কাঠের সঙ্গে সংলগ্ন করে দিত। তাদের বাস করতে হত ঘুটঘুটে অন্ধকারে, তাদের কেউ শুতে পেত না—কারণ পা ছড়াবার মতন ঠাঁই সেখানে থাকত না। কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে না রাখলে চলবে না, কেননা দেশবিদেশে গোলামরূপে তাদের বিক্রি করবার জন্যেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হত। অতএব তাদের মাঝে মাঝে কিছু জল আর কিছু কিছু করে অসিদ্ধ শুকনো চাউল খেতে দেওয়া হত। বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় মানুষ বাঁচতেই পারে না! যাদের নিতান্ত কইমাছের প্রাণ, তারাই বেঁচে থাকত কোনওগতিকে—অর্থাৎ দুই শত জনের মধ্যে হয়তো পঁচিশ কি তিরিশটি প্রাণী।'

কুমার ও মানিক দাবাবোড়ে খেলা ভুলে গিয়ে শিউরে উঠে একসঙ্গে বললে, 'কী ভয়ানক!'

বিমল বললে, 'ওই মহাপাপিষ্ঠ পর্তুগিজ-বোম্বেটেদের অত্যাচারেই শেষটা সুন্দরবন একেবারেই

জনশূন্য হয়ে গেল। মানুষের বদলে এই দেশে শেষটা বেড়ে উঠতে লাগল, ব্যাঘ্র আর বন্য জন্তুদের বংশ।'

জয়ন্ত হঠাৎ নিজের আসন ত্যাগ করে উঠে বিমলের সামনে এসে বসে বললে, 'বিমলবাবু, আজ হঠাৎ আপনি পুরাতন ইতিহাসের কথা তুললেন কেন?'

জয়ন্তের মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'আমি নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ভালোবাসি। আর অবসর পেলে মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রত্নতত্ত্বের চর্চাও করি। আজ আমার কী ইচ্ছা হচ্ছে জানেন?'

—'বলুন!'

—'আপাতত দেখছি সুন্দরবাবুর হাতে কোনওই কাজ নেই। মধুডাকাত অদৃশ্য, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দলে দলে পুলিশের চর। মধু দশ-পনেরো মাইলের ভিতরে ডাকাতি করছে, অথচ এখনও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ইতিমধ্যে মধুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে সুন্দরবাবুই তার জন্যে বিজনবাবুর এই 'লঞ্চে' বসে অপেক্ষা করুন। এই ফাঁকে আমি আর কুমার আর আমাদের বাঘা, আর আমাদের রামহরি যদি সুন্দরবনের খানিকটা ঘোরাঘুরি করে দেখি, তাতে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হঠাৎ এই বিপদভরা বনেজঙ্গলে ছুটোছুটি করে আপনাদের কী লাভ হবে?'

—'লাভ হয়তো কিছুই হবে না। মানুষ বসবার বা দাঁড়াবার বা শুয়ে ঘুমোবার জন্যে ছোটাছুটি করে না। ছোটবার জন্যেই সে ছোটে!'

—'হুম! ছুটে কোথায় যাবেন?'

—'কোথাও না। থাকব এই সুন্দরবনেই। তবে আমার কৌতূহল যখন জেগেছে তখন ছুটোছুটি করে একবার দেখবার চেষ্টা করব, এ অঞ্চলের কোথাও প্রাচীনকীর্তির কোনও চিহ্ন আছে কি না?'

—'চিহ্ন মানে?'

—'চিহ্ন মানে? আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে যে, এখানকার কাছাকাছি কোনও-এক জায়গায় এমন কোনও প্রাচীন বৌদ্ধবিহার বা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে, যা খুঁজে বার করতে পারলে বাংলার অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে।'

—'পাগলের কথা! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যে আমি বাঘ বা অজগরের পেটের ভিতরে ঢুকতে রাজি নই!'

জয়ন্তের দুই চক্ষু জ্বলে উঠল। সে বললে, 'বিমলবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।'

মানিক দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আমিও!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাব্বাঃ! যত পাগলের পাল্লায় এসে পড়েছি! আমি এক পাও নড়ছি না, আমি এইখানেই অচল শিবলিঙ্গের মতন বসে থাকব। 'ডিউটি ইজ ডিউটি'! হুম!'

ষষ্ঠ

অজগরের কুণ্ডলী

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল ঝমঝম করে বৃষ্টি।

তখন বর্ষাকাল নয় বটে, কিন্তু সুন্দরবনের এ অঞ্চলটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের একেবারে পাশেই।

এখানে সমুদ্রের উদ্দাম ঝোড়োহাওয়া কোথা থেকে কখন যে বিদ্যুতাগ্নিভরা জলবর্ষি কালো মেঘকে টেনে আনবে, কেউ তা আন্দাজ করতে পারে না।

প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ধরে হু হু ঝোড়ো বাতাসে এই অরণ্যজগতের চতুর্দিকে প্রলয় হাহাকার জাগিয়ে সেই জলভরা কালো মেঘ চাঁদকে আবার মুক্তি দিয়ে চলে গেল কোথায়!

বিমল ও জয়ন্তের দল পরদিন প্রভাতে যখন ধারালো দৃষ্টি দিয়ে সুন্দরবনের শ্যামল দেহকে ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল, তখনও চারিদিকে থইথই করছে জল আর জল। যেখানে জল নেই সেখানে কর্দমের রাজত্ব।

মানিক বললে, 'বিমলবাবু, অন্তত আজ আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। দেবতা আমাদের ওপরে বিরূপ। বরুণদেবের অভিশাপে পথ আর বিপথ এত বেশি দুর্গম হয়ে উঠেছে যে, আজ আমাদের অভিযান হয়তো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে!'

বিমল হেসে বললে, 'আমার ঘর পালানো মন যখন অজানা পথের ডাক শুনতে পায়, তখন দেবতা বা দানব কারুর বাধাই আমি মানি না!'

জয়ন্ত বললে, 'আমারও মন আজ প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনার মনেরই সঙ্গী হবে। ইচ্ছে প্রবল হলে জল-কাদা-জঙ্গল মানুষকে কোনও বাধাই দিতে পারে না!'

পিছন থেকে রামহরি গজ গজ করতে করতে বললে, 'মানিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন! কিন্তু এই জয়ন্তবাবুটি দেখছি আমাদের খোকাবাবুরই মতন মাথাপাগলা। এক পাগলাকেই সামলাতে পারি না, আজ ডবল পাগলাকে নিয়ে হাড় জ্বালাতন হবে দেখছি! কী গো কুমারবাবু, তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'রামহরি, তুমি কি জানো না যে, বিমলের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা এক?'

রামহরি একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তা জানি না আবার! তবু কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম। কিন্তু বাঘা বেচারিকে এখানে মিছিমিছি টেনে এনে কী লাভ হল? হ্যাঁ রে বাঘা, এই বিচ্ছিরি জল-কাদা-জঙ্গল তোর কি ভালো লাগবে?'

বাঘা যেন রামহরির কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই বিপুল পুলকে ঘনঘন লাঙ্গুল আন্দোলন করতে করতে ঠিক পাশের একটি ছোট্ট নালার জলে ঝম্প প্রদান করে সচিৎকারে বলে উঠল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

রামহরি রেগে টং হয়ে বললে, 'যেমন মনিব, তেমনি কুকুর! নাঃ, এখানে আর আমার কোনও কথা কওয়াই উচিত নয়!'

তারপর আরম্ভ হল যাত্রা! আর সে কী যাত্রা! পদে পদে সে কী বাধা! কোথাও কোমরভোর ঘোলা জল, কোথাও হাঁটুভোর পুরু কাদা, কোথাও সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল দিবসেও অমাবস্যার রাত্রির মতন অন্ধকার জঙ্গলের অন্তঃপুর, কোথাও কাঁটাঝোপের পর কাঁটাঝোপের সুতীক্ষ্ণ দংশন!

তবু তারা অগ্রসর হয়েছে! তারা জলাভূমি মানলে না, জঙ্গলের যত অদৃশ্য বিভীষিকাকে মানলে না, মনুষ্যপদচিহ্নহীন অপথ, বিপথ বা কুপথ কিছুই মানলে না! তারা সঙ্গে করে এনেছিল তিনখানা ছোটো ছোটো অতিশয় হাল্কা রবারের নৌকো, স্থলপথ শেষ হয়ে গিয়ে যেখানে আসে জলপথের পর জলপথ, সেই নৌকোর উপরে আরোহণ করে তারা এই নদীবহুল সুন্দরবনের বাধাকে সরিয়ে দেয়!

একাধিক বিষাক্ত সাপেরও দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তারা গতরাত্রের ঝড়বৃষ্টিতে এমন অসহায় হয়ে পড়েছে যে, ঘৃণ্য মানুষদের দেখেও কোনও রকম আক্রমণ এমনকি পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না। কোনও কোনও জলপথে দু-চারটে কুমিরের প্রলুব্ধ মুখও দেখা গেল, কিন্তু দলের কারুর না কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আবার তারা তলিয়ে গেল অতল তলে!

কিন্তু তাদের সবচেয়ে জ্বালাতন করছিল সুন্দরবনবিহারী অসুন্দর মশকের দল! তারা স্থলে বা জলে যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেইখানেই ওই মশকেরা হতে চাচ্ছে যেন তাদের সহযাত্রী! আর কী যাতনাদায়ক সহযাত্রী তারা! মশকরাজ্যের জাতীয়সংগীত গাইতে গাইতে নিষ্ঠুর আনন্দে তারা বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতির দেহের অনাবৃত অংশের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের দেহকে করে তুললে স্ফীত, রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত!

এমনকি, বাঘা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল! তারা রোমশ দেহও সুন্দরবনের মশাদের হুলগুলোকে ঠেকাতে পারলে না! সে বারংবার ঊর্ধ্বমুখে লম্ফত্যাগ করে এক এক গ্রাসে দলে দলে মশককে গলাধঃকরণ করলে বটে, কিন্তু তবু এই ভয়াবহ পতঙ্গদের অত্যাচার কিছুমাত্র কমল বলে মনে হল না!

সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত এইভাবে পথ আর বিপথের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। কিন্তু প্রায় মাইল পনেরো ঘোরাঘুরি করেও তারা এই অরণ্য জগতের ভিতর থেকে সেকালকার মানুষের হাতেগড়া একখানা পুরাতন ইষ্টক পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলে না। এখানে পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে খালি গাছে গাছে বানর ও নানাজাতের পাখিরা। সুন্দরবন যেসব হিংস্র ও চতুষ্পদ জীবের জন্যে বিখ্যাত, তাদেরও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধহয় গত-রাত্রের ঝড়বৃষ্টির তাল সামলাতে সামলাতে তারাও আজ বিব্রত হয়ে আছে।

বৈকাল যখন কেটে গেল তারা উদরের অতিজাগ্রত অগ্নিদেবকে তুষ্ট করবার জন্যে এক-জায়গায় বসে পড়তে বাধ্য হল। সঙ্গে ছিল স্যান্ড উইচ, সিদ্ধ ডিম, মর্তমান কদলী আর ফ্লাস্ক-ভরা গরম চা।

আহারপর্ব যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জয়ন্ত হঠাৎ সচমকে বলে উঠল, 'একী ব্যাপার বিমলবাবু?'

—'কী?'

—'নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

বিমল কর্দমাক্ত পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে নির্বাক হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্যে। তারপরে বিস্মিতস্বরে বললে, 'এ যে দেখছি নতুন মানুষের পায়ের দাগ! এতক্ষণ পর্যন্ত এই গভীর অরণ্যে একজন মানুষকেও দেখতে পেলুম না, কিন্তু এখানে এই পায়ের দাগ এল কেমন করে? এ পায়ের দাগ তো পুরানো নয়! কাল রাতে উচ্ছল ধারায় যে বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটির উপরকার যে কোনও পুরানো পায়ের দাগ তাতে বিলুপ্ত না হয়ে পারে না! এ হচ্ছে এমন কোনও মানুষের পায়ের দাগ, যে একটু আগেই এখানে ছিল বিরাজমান!'

জয়ন্ত বললে, 'এ পায়ের দাগ যে আমাদের নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। কারণ আমাদের সকলেরই পায়ে আছে জুতো, আর এই পদচিহ্নের অধিকারী এখানে এসেছে পাদুকাহীন শ্রীচরণ নিয়ে! সে যে আমাদের পরে এসেছে, এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, প্রায় সব জায়গাতেই তার পায়ের ছাপ পড়েছে আমাদের পদচিহ্নের উপরেই! কে সে?'

কুমার দু-চারবার এদিকে ওদিকে ঘুরে বললে, 'এই নগ্নপদের মালিক ঢুকেছে পাশের ওই বনের ভিতরে, কারণ পদচিহ্নগুলো হঠাৎ বেঁকে ওই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।'

ইতিমধ্যে বাঘা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সচেতন। সে যেন সকলকার কথা বুঝতে পারলে! এতক্ষণ সে থেবড়ি খেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বসেছিল এই বৈকালি ভোজের স্যান্ড উইচ বা সিদ্ধ ডিমের দু-এক টুকরো লাভ করবার জন্যে। কিন্তু এখন হঠাৎ এই নতুন পদচিহ্নের আঘ্রাণ নিয়ে দুই কান খাড়া করে গরর গরর চাপা গর্জন করে উঠল! তারপর অতিলোভনীয় স্যান্ড উইচ প্রভৃতির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সেই নগ্নপদের চিহ্ন শুঁকতে শুঁকতে ঢুকে গেল পাশের একটা অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে!

কুমারও ছুটল তার পিছনে পিছনে। এবং দলের বাকি সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে বাধ্য হল তারই পশ্চাৎ অনুসরণ করতে।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে কারুকেই পাওয়া গেল না। সেখানে পদচিহ্ন দেখেও অগ্রসর হবার উপায় নেই, কারণ, মাটির উপরটা আচ্ছন্ন করে আছে সুদীর্ঘ আগাছার দল।

সকলে আবার জঙ্গলের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই বনের ভিতরে চোখের সামনে আমরা কোনও মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমাদের পিছনে পিছনে নিশ্চয়ই এসেছে কোনও লোক। নিশ্চয়ই সে আমাদের গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখছিল, কিন্তু হঠাৎ আমরা বৈকালিভোজের জন্যে এইখানে বসে পড়েছি দেখে, ধরা পড়বার ভয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু মাটির উপরে তাকে পা ফেলে আসতে হয়েছে। সে যে কোথা থেকে এসেছে এই মাটির উপরেই তার চিহ্ন লেখা আছে! তাকে যখন পেলুম না তখন দেখা যাক, সে আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে কোন অন্তরাল থেকে!'

জয়ন্ত আগেই দাঁড়িয়ে উঠেছিল। সে বললে, 'বিমলবাবু, ঠিক বলেছেন। আসুন, এইবার সেই চেষ্টাই করা যাক!'

মানিক বললে, 'আমরা এসেছিলুম সুন্দরবনের ভিতর থেকে কোনও পুরাকীর্তির সন্ধান করতে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে এখন গোয়েন্দাকাহিনির মতন!'

জয়ন্ত বিরক্তকণ্ঠে বললে, 'মানিক, তুমি মূর্খের মতন কথা কোয়ো না!'

—'আমি কি মূর্খের মতন কথা কয়েছি? তাহলে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

—'ছিঃ! মানিক, এতকাল আমার সঙ্গে থেকেও তুমি যে এমন বোকার মতো কথা কইবে, তা আমি জানতুম না! বোঝাবুঝির কথা হবে পরে, এখন আগে দেখতে হবে এই নগ্নপদের চিহ্নগুলো এসেছে কোথা থেকে!'

সকলে আবার ফিরতিপথে অগ্রসর হল। পুরু কাদার উপরে পায়ের চিহ্নগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সকলে তাই দেখে এগুতে এগুতে প্রায় দেড় মাইল পথ পার হয়ে গেল। তারপরই দেখা গেল পদচিহ্নগুলো প্রবেশ করেছে এমন এক প্রচণ্ড অরণ্যের মধ্যে, যেখানে কোনও জীবের পক্ষে যাতায়াত করবার কল্পনা করাও অসম্ভব!

কী অন্ধকার অরণ্য! সূর্যের আলোক এখনও নির্বাপিত হয়ে যায়নি, কিন্তু সে-অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টি চালনা করতে গেলেও চক্ষু যেন নিরন্ধ্র-অন্ধকারের নিরেট প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আসতে চায়! তবু সকলেই টর্চের আলো জ্বেলে সেই নিস্তব্ধ ও নির্জন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে।

আশ্চর্য ব্যাপার। অমন যে দুর্গম বন-জঙ্গল, তার ভিতরেও গাছপালা ও কাঁটা-ঝোপ কেটে কারা যেন পথ তৈরি করে নিয়েছে! সুদীর্ঘ তৃণ ও আগাছা-ঢাকা মাটির উপরে আর কারুর পদচিহ্ন দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভুল হবার কোনওই উপায় নেই। কারণ এই গভীর অরণ্যের বাধাকে সরিয়ে দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথের রেখা বরাবরই চলে গিয়েছে সামনের দিকে! সে-পথের এ-পাশে অন্ধকার, ওপাশে অন্ধকার, তার উপরদিকেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! সকলের মনে হল, এই তিমিরাবগুণ্ঠিত অদ্ভুত পথ দিয়ে অগ্রসর হলে একটু পরেই যেন প্রবেশ করা যাবে, রহস্যময় অন্ধকারের নিজস্ব অন্তঃপুরের মধ্যে!

কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পাওয়া গেল একটি ছোটো ময়দানের মতন জায়গা। সেখানে মাথার উপরকার আকাশে তখনও জেগে আছে অস্তোন্মুখ সূর্যের আলোক-আশীর্বাদ!

আচম্বিতে সেই মহা নির্জন ও মহা নিস্তব্ধ অরণ্যভূমির গভীর নিদ্রা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল যেন উপর্যুপরি ভীষণ দুই শব্দে!

—গুড়ুম! গুড়ুম!

গর্জন করে উঠেছে রামহরির বন্দুক! সঙ্গে সঙ্গে রামহরির এক প্রচণ্ড পদাঘাত খেয়ে বিমল পাঁচ-ছয় হাত দূরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল!

ততক্ষণে আর সকলেই সচেতন হয়ে সভয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বিমলের হাত ধরে টেনে তুলে কাতরকণ্ঠে বললে, 'খোকাবাবু, তোমাকে আমি লাথি মেরে যে পাপ করেছি, ভগবান আমাকে তার জন্যে ক্ষমা করুন! ওই গাছটার ওপর থেকে মস্ত-বড়ো একটা অজগর তোমার ওপরে ঝাঁপ খেতে আসছিল! বন্দুকের দু-গুলিতে আমি তার মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছি! অজগরটা ছটফট করতে করতে ওই বড়ো ঝোপটার ভেতরে গিয়ে পড়েছে।'

তখন সেই ঝোপটাও হয়ে উঠেছে আশ্চর্যরূপে জীবন্ত! তার অনেক গাছ-আগাছা তীব্র বেগে ছটকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—যেন তার মধ্যে অভিনীত হচ্ছে এক ভয়াবহ বিরাটের নাটকীয় লীলা!

বাঘা মহা ক্রোধে গর্জন করে ছুটে যাচ্ছিল সেইদিকে! কুমার একলাফে তার উপরে গিয়ে পড়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, 'ওরে বাঘা, তুই কি জানিস না, অজগরের মৃত্যু-যন্ত্রণা? তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলেও তার সর্বাঙ্গ কুণ্ডলিত হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে? সেই মৃত অজগরের জীবন্ত দেহের কুণ্ডলের ভিতরে গিয়ে পড়লে যে-কোনও গণ্ডার বা হাতি পর্যন্ত পরলোকে যাত্রা করতে পারে?'

ইতিমধ্যে বিমল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রামহরির একটা কথাও আমলে না এনে চিৎকার করে সে বললে, 'কোনও কথা না বলে সবাই এখান থেকে পালিয়ে এসো! চলো, আমরা ওপাশের ওই ঝোপটার ভিতরে গিয়ে ঢুকি।'

একটা অতি অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে সবাই যখন আত্মগোপন করলে মানিক তখন শুধোলে, 'বিমলবাবু, অজগরের মাথা তো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, সে তো আমাদের আর তেড়ে এসে আক্রমণ করতে পারত না? তবে তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে পালিয়ে আসতে বললেন কার ভয়ে?'

জয়ন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'মানিক, তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে! তুমি কি এটুকু বুঝতে পারছ না যে, আমরা এক পদচিহ্ন অনুসরণ করে এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের

ভিতরে এসে ঢুকেছি, মানুষের হাতেকাটা এক অভাবিত পথ দিয়ে? নিশ্চয়ই আমরা এসে পড়েছি শত্রুপুরীতে। এখান থেকেই কোনও চর গিয়েছিল আমাদের পিছনে পিছনে! চর যারা পাঠিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই! যদিও বা ঘুমিয়ে থাকল, দু-দুবার বন্দুকের গর্জনে ভেঙে গিয়েছে তাদের ঘুম! এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কোনওদিন কোনও মানুষ আসে না, অথচ এখানে বন্দুক গর্জন করে উঠল দু-দুবার! বন্দুকের গর্জন জানায় মানুষের অস্তিত্ব! তুমি কি মনে করছ যারা আমাদের পিছনে চর পাঠিয়েছিল তারা এখনও অন্ধকার থেকে আলোকে এসে হাজির হয়নি? তারা অজগরেরও চেয়ে ভয়ানক! বিমলবাবু ওইজন্যেই বলছিলেন তোমাদের লুকিয়ে পড়তে!'

কুমার বললে, 'জয়ন্তবাবু, আমি আপনাদের সব শেষে এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছি। কিন্তু ঢোকবার আগেই কী দেখলুম জানেন? ডান দিকে খানিক দূরে জেগে আছে একটা পাহাড়—পাহাড়ই বা বলি কেন, খুব উঁচু ঢিপির মতন একটা জায়গা, আর তারই তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষ! বোধহয় একটা নয়, তারও পিছনে পিছনে যেন দেখলুম আরও দু-চারটে মাথা!'

হঠাৎ মানিক বললে, 'চুপ! জঙ্গলের বাইরে যেন কাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে।'

দু-তিনজন লোকের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল বটে।

কিন্তু তার পরেই জাগ্রত হয়ে উঠল এক ভয়ংকর, বীভৎস আর্তনাদ! রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, কিছু বুঝতে পারছেন কি? অভাবিতরূপে এখানে বন্দুক গর্জন করে উঠল কেন তাই জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে কেউ কেউ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে! তারপর একটা জঙ্গল ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে দেখে তারা ঢুকেছিল ওই জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে। তার ভিতরে পাকসাট খাচ্ছিল মৃত অজগরের দেখতে-জীবন্ত সুদীর্ঘ দেহ! তারই দেহের পাকের ভিতরে গিয়ে পড়ে কোনও নির্বোধ হতভাগ্যকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে!'

সেই জঙ্গলের বাইরে দূর থেকে শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর। তারা যে কী বলছে তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু তারা যে উপকারী বন্ধু নয় এইটুকু বুঝে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। পাছে বাঘা পশুবুদ্ধির উত্তেজনায় আচমকা চিৎকার করে ওঠে, সেই ভয়ে কুমার দুই হাত দিয়ে তার মুখ ভালো করে চেপে রইল।

সকলে অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে! যেন কোনও বিপদ এখনই এসে পড়বে তাদের স্কন্ধের উপরে।

কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে কোনও বিপদেরই সূচনা হল না। বাইরের কণ্ঠস্বরগুলো নীরব হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তারপরে জাগ্রত হয়ে রইল শুধু সুন্দরবনের বনস্পতিদের অনন্ত মর্মর ভাষা এবং চন্দ্রপুলকিত রজনীর ঝর ঝর জ্যোৎস্নাধারা!

সপ্তম

কেউটের জঙ্গলে

জয়ন্ত হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে খুব ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এগিয়ে এল। তারপর একটা ঝোপ একটু ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললে, 'কোনওদিকে কেউ নেই। একটু আগে এখানে যে একটা মস্তবড়ো ট্রাজেডি হয়ে গেছে, সেটাও আর বোঝবার উপায় নেই। কেবল অজগর সাপের জঙ্গলটা এখনও তেমনি ছটফটিয়ে দুলে দুলে উঠছে!'

রামহরি বললে, 'ও বাবা, তাহলে মরাকেও ভয় করতে হয়!'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত আর আমি যখন কাম্বোডিয়ায় ওঙ্কারধামের জঙ্গলে গিয়েছিলুম, তখনও এর চেয়ে দু-গুণ বড়ো একটা ভয়ঙ্কর অজগর আমাদের আক্রমণ করেছিল। সেই অজগরটা মরবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পাকসাট খেতে ছাড়েনি!'*

হঠাৎ পিছন থেকে ফোঁস করে একটা তীব্র গর্জন শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে বিদ্যুৎ-বেগে পিছন ফিরে সকলেই ত্রস্তনেত্রে দেখলে, কুমার ছিটকে একদিকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল এবং বাঘা প্রচণ্ড এক লাফ মেরে আক্রমণ করলে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপকে! এ সাপুড়েদের রুগ্ন, কৃশ, প্রায়-অনাহারী পোষমানা সাপ নয়, এ হচ্ছে একেবারে স্বাধীন সর্প! লম্বায় প্রায় সাত-আট হাত আর তার দেহের বেড়ও প্রায় আট-দশ ইঞ্চি! বাঘা অত্যন্ত জোয়ান ও বৃহৎ কুকুর। সে একেবারে গিয়ে কেউটেটার গলা কামড়ে ধরেছিল বটে, কিন্তু সাপটা ঠিক অজগরের মতোই বাঘার সর্বাঙ্গকে নিজের দেহের পাক দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে যে, সেবেচারি দেখতে দেখতে সাপের

---

* লেখকের 'পদ্মরাগ বুদ্ধ' দ্রষ্টব্য।

গলা কামড়ে ধরেই মাটির উপর শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল! দেখেই বোঝা গেল, কেউটে মরলেও বাঘার বাঁচবার কোনও উপায়ই নেই!

কুমার পাগলের মতো মাটির উপর থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সর্পের মারাত্মক আলিঙ্গনে বদ্ধ তার প্রিয়তম বাঘার দেহের উপরে! তারপর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা বৃহৎ ছুরি বার করে সাপটার দেহকে নানা জায়গায় আঘাত করে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলে!

রামহরি বলে উঠল, 'খবরদার বাঘা, সাপটার মুণ্ডু এখনও ছাড়িসনে! শুনেছি কেউটেদের কাটা মুণ্ডুও লাফ মেরে মানুষদের কামড়ে দেয়!'

বাঘা মানুষ-রামহরির ভাষা হয়তো বুঝলে না, কিন্তু নিম্নশ্রেণির জীবদেহের যে সহজাত বুদ্ধি থাকে বাঘার ঘটে সেটুকুর অভাব ছিল না। কুমার যখন কেউটের দেহের পাক কেটে তাকে মুক্তিদান করলে, তখনও সে সাপের মুণ্ডটাকে ত্যাগ করতে রাজি হল না। এবং সত্যসত্যই সেই দেহহীন মুণ্ডটা তখনও তাকে দংশন করবার চেষ্টা করছিল!

কুমার আবার তার সেই সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে সাপটার মুণ্ডটাকে কুচিকুচি করে প্রায় আট-দশ খণ্ডে বিভক্ত করে দিলে। বাঘা তখন সর্পমুণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করে থেবড়ি খেয়ে বসে রক্তাক্ত জিহ্বা বার করে হা হা করে হাঁপাতে লাগল।

মানিক ত্রস্তকণ্ঠে বললে, 'বাবা, কেউটে আবার এত বড়ো হয়! এ যে প্রায় একটা ময়াল সাপ!'

জয়ন্ত বললে, 'বাঘা দেখছি অদ্ভুত এক সাহসী কুকুর। ও না থাকলে আজ বোধহয় কেউটের বিষে আমাদের দু-তিনজনকে মরতেই হত!'

রামহরি বাঘাকে কোলে করে তুলে নিয়ে বললে, 'খোকাবাবু, এ সর্বনেশে জঙ্গলের ভিতরে আর থাকা নয়! তাড়াতাড়ি খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ি চলো।'

বিমল বললে, 'আমারও সেই মত। অজগর এলেন, কেউটে এলেন, অতঃপর আবার কে আসবেন কিছুই বলা যায় না! মানুষ-শত্রুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু এই বুকেহাঁটা হিলবিলে জীবদের কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায়, ততই ভালো!'

সকলে একে একে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

কুমার একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'জয়ন্তবাবু, ওই দেখুন সেই মস্তবড়ো মাটির স্তূপটা! ওটা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু! প্রায় ছোটোখাটো একটা পাহাড় বললেই চলে!'

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'এমন সমতল জমির উপরে হঠাৎ অত বড়ো একটা মাটির স্তূপের সৃষ্টি হল কেমন করে?'

বিমল বললে, 'এরকম মাটির স্তূপ সুন্দরবনের আরও কোনও কোনও জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। আপনি কি 'ভরত-ভায়নার' স্তূপের নাম শোনেননি?'

—'না।'

—'ওই 'ভরত-ভায়নার' স্তূপ এ অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত। এখনও তা খনন করা হয়নি বটে, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ওখানে খনন করলে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের কোনও সৌধ বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে!'

কুমার বললে, 'জঙ্গলের ভিতরে ঢোকবার আগে দূর থেকে আমি ওখানেই দেখেছিলুম, যেন মাটি ফুঁড়েই উঠে আসছে মনুষ্যমূর্তি!'

বিমল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছিলুম, এইবারে বোধহয় তারই সন্ধান পাওয়া গেল!'

মানিক বললে, 'আমরা তো দেখতে এসেছি এখানে কোনও পুরাকীর্তিচিহ্ন পাওয়া যায় কি না।'

বিমল বললে, 'সেকথা সত্য। কিন্তু আমরা এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদের কর্তব্য পালন করতে আসিনি। আমাদের এই অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য কী জানেন মানিকবাবু?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি জানি। আমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি, তাই এ অঞ্চলের অরণ্যরাজ্যের মধ্যে যে প্রাচীন প্রাসাদ, মঠ আর বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে, এটা আমার একেবারেই অজানা ছিল। বিজনবাবুর লঞ্চে বসে প্রায়ই শুনছিলুম, মধুডাকাতের দল মাত্র দশ-পনেরো মাইলের ভিতরেই বাস করে, এত চেষ্টাতেও তাদের আস্তানা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? রোজ আমি বসে বসে কেবল এই কথাটাই ভাবতুম। তারপর বিমলবাবুর কথা শুনে আমি যেন পেলুম একটা মস্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তিনি বললেন, 'সুন্দরবনের মাটি নাকি যুগে যুগে ক্রমাগতই নীচের দিকে অবনত হয়ে যাচ্ছে, আর সেই মাটি ফুঁড়ে মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে সেকালকার ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।' তৎক্ষণাৎ আমার মন সচকিতে জেগে উঠল। ভাবলুম, মধু কি তাহলে দলবল নিয়ে এই রকম চোখের আড়ালে অদৃশ্য কোনও ধ্বংসাবশেষের ভিতরে গিয়ে আত্মগোপন করে? আরও আন্দাজ করলুম, খুব সম্ভব বিমলবাবুর মনেও জেগেছে সেইরকম কোনও সন্দেহ! তাই তিনি যখন নতুন-কোনও পুরাকীর্তি আবিষ্কারের অছিলায় সুন্দরবনের এ-অঞ্চলটায় বেড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন, আমি তখনই সাগ্রহে তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলুম। কেমন বিমলবাবু, কথাটা কি ঠিক নয়?'

বিমল কোনও জবাব দিলে না, মুখ টিপেটিপে কেবল হাসতে লাগল।

কুমার অধীরকণ্ঠে বললে, 'এসব আলোচনা পরে করলেও ক্ষতি হবে না! আমার এ সর্বনেশে বন মোটেই ভালো লাগছে না, যদি কিছু করবার থাকে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন!'

রামহরি বললে, 'যা বলেছ কুমারবাবু! ওই দ্যাখো না, ওখান দিয়ে আবার একটা মস্ত গোখরো সাপ আমাদের দেখেই ফণা তুলে ভয় দেখিয়ে বোঁ বোঁ করে ছুটে পালিয়ে গেল! আমি ডাকাতের সঙ্গে, বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে, হাতি আর গণ্ডারের সঙ্গেও লড়তে রাজি আছি, কিন্তু ওই সাপটাপের সঙ্গে কিছুতেই আমার পোষাবে না! কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ দিলে ফোঁস করে এক কামড়! তারপরে সঙ্গে-সঙ্গেই হল অক্কালাভ! এমন হতচ্ছাড়া জায়গাকে যত শিগগির ছাড়তে পারি, ততই ভালো!'

জয়ন্ত বললে, 'সত্যি, এ হচ্ছে একটা অভিশপ্ত ঠাঁই! বিমলবাবু, এখানে দেখছি গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধই বেশি। এদিকে আপনি হচ্ছেন বহুদর্শী, আপনিই বলুন, এখন আমাদের কী করা উচিত।'

বিমল বললে, 'আপনার মতন বুদ্ধিমান লোককে আমি আর কী বলব বলুন? তবে এতদূর যখন এসেছি, তখন ওই স্তূপটার কাছে গিয়ে একবার উঁকিঝুঁকি মারলে মন্দ হয় কি?'

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, 'আপনি যে এই কথাই বলবেন, তা আমি আগে থাকতেই জানি। ওই স্তূপটার কাছে যাবার জন্যে আমার মনও আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছে।'

বিমল বললে, 'বেশ, তবে তাই চলুন। কিন্তু সকলকেই বলছি—হুঁশিয়ার! প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দুক আর রিভলভার প্রস্তুত করে রাখো! ওই মৃত্তিকাস্তূপের কাছে গেলে যে-কোনও মুহূর্তেই ছুটতে পারে রক্তনদীর বন্যা! ভগবান জানেন, সে রক্ত হবে কাদের? আমাদের? না শত্রুদের?'

অষ্টম

ফাঁপা কোটরে সুড়ঙ্গপথ

কোন দিকে যেতে হবে এটা আর দেখিয়ে দিতে হল না। কারণ কর্দমাক্ত পৃথিবীর উপরে যে পদচিহ্নগুলোর স্পষ্ট চিত্র লেখা আছে, তারাই মৌনভাষায় যেন চিৎকার করেই বলে দিতে লাগল, কোন দিক থেকে এসেছে এবং কোন দিকে ফিরে গিয়েছে শত্রুর দল!

কুমার বললে, 'বাঘা রে, ওই পায়ের দাগগুলো একবার শুঁকে দেখ! তারপর যে কী করতে হবে তোকে আর নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না! তারপর আজ তোকেই মহাজন করে আমরা করব তোরই পদাঙ্ক অনুসরণ!'

যাঁরা নিয়মিতভাবে কুকুর পোষেন তাঁরা সকলেই জানেন, কুকুর তার মানুষ-মনিবের অনেক ভাষাই বুঝতে পারে। বিশেষত, আমাদের বাঘা জাতে দিশি হলেও শিক্ষা ও লালনপালনের গুণে সে হয়ে উঠেছিল কুকুর-সমাজের মধ্যে রীতিমতো অসাধারণ!

বাঘা থেবড়ি খেয়ে মাটির উপরে বসে পৃথিবীর উপরে পটাপট শব্দে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ঊর্ধ্বমুখে জিভ বার করে কুমারের কথাগুলো সানন্দে শ্রবণ করলে। তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে পদচিহ্ন আঁকা মাটির উপরটা ভালো করে বারকয়েক শুঁকে নিলে।

তারপর সে আর কোনওই ইতস্তত করলে না, মাটির উপরটা শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি!

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি অগ্রসর হল বাঘার পিছনে পিছনে।

চতুর্দিকে যে স্তব্ধতা, তাকে ভয়াবহ বললেও অত্যুক্তি হবে না। শহরের বাসিন্দারা—গভীর রাত্রে নগর যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন যে নীরবতাকে অনুভব করেন, তার সঙ্গে এখানকার নীরবতা কিছুই মেলে না। এ যেন মৃত্যুলোকের একান্ত নিস্তব্ধতা, এর মধ্যে জীবনের এতটুকু শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত নেই। এমনকী বন্যবাতাসেরও যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। সেই সমাধিজগতের মধ্যে মৃতের মতন পাণ্ডুর চাঁদের চোখের আলো পর্যন্ত যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

সকলে সেই স্তূপটার কাছে গিয়ে হাজির হল। সেখানেও জীবনের কোনও চঞ্চলতাই নেই। খানিক আলো আর খানিক কালো মেখে সেই উঁচু মাটির ঢিপিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সেই সমতল জগতে একটা অসম্ভব বিস্ময়ের মতো!

স্তূপের অনেকখানি পর্যন্ত ঢেকে খাড়া হয়ে ছিল একটা বিরাট বটবৃক্ষ। সেই একটিমাত্র বনস্পতিই সেখানে সৃষ্টি করেছে যেন একটি ছোটোখাটো অরণ্য। তার নানা শাখাপ্রশাখার তলা থেকে নেমে এসেছে এমন মোটা মোটা ঝুরি যে দেখলেই মনে হয় সেগুলো কোনও বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি।

বাঘা সেই বিরাট বটগাছের তলায় যেখানে গিয়ে হাজির হল তার চারিদিকেই রয়েছেন এমন ঘন ঝোপঝাপ যে, দলে দলে মানুষও তার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। বিমল পিছন ফিরে ডাকলে, 'রামহরি!'

রামহরি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বললে, 'কী খোকাবাবু?'

—'তোমার মোটঘাটের ভিতরে গোটাতিনেক পেট্রলের লণ্ঠন আছে। চটপট সেগুলো বার করে জ্বালিয়ে ফ্যালো! এই অতিকায় গাছের তলায় যে নিবিড় অন্ধকার, অন্ধের মতো এগিয়ে শেষকালে কি কোনও অজগরের পেটের ভেতরে গিয়ে হাজির হব?'

তিনটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলোকের আঘাতে সেই মস্তবড়ো বটগাছের তলা থেকে সমস্ত অন্ধকার ছুটে পালিয়ে গেল যেন মুহূর্তের মধ্যে।

বাঘা তখন হাজির হয়েছে বটগাছের প্রধান গুঁড়িটার কাছে। তারপরই সে যেন হতভম্বের মতন 'কুঁই কুঁই' শব্দে কেমন একটা করুণ আর্তনাদ করতে লাগল!

জয়ন্ত এদিক ওদিক পরীক্ষা করে বিস্মিতস্বরে বললে, 'একী আশ্চর্য ব্যাপার! পায়ের চিহ্নগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারে এই গাছের গুঁড়ির তলায় এসে!'

পেট্রলের লণ্ঠনগুলোর উজ্জ্বল আলোকের উপরেও উজ্জ্বলতর আলোক সৃষ্টি করে সেখানে জ্বলে উঠল সকলকার হাতে বৈদ্যুতিক টর্চ! সেই ঝুপসিগাছের তলাটা দিনেদুপুরেও নিশ্চয়ই কখনও পায়নি তেমন দীপ্তির আভাস।

বৃহৎ বটগাছটার প্রধান গুঁড়ির বেড় হয়তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাতের কম হবে না!

তারই উপরে হাত বুলিয়ে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! এখানে একটা খুব সূক্ষ্মভাবে কাটা দরজার চিহ্ন রয়েছে! গাছের গুঁড়িতে দরজার চিহ্ন! এমন ব্যাপার কল্পনাতেও আনা যায় না!'

সত্য কথা!

জয়ন্ত একটা ধাক্কা মারলে, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের দেহের খানিকটা ঢুকে গেল ভিতর দিকে—ঠিক যেন একটা দরজার পাল্লার মতো!

তারপর সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। এদিকে, ওদিকে, উপরে ও নীচে টর্চের আলোকপাত করে বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'বিমলবাবু, একী অদ্ভুত ব্যাপার! এই গাছের গুঁড়িটা একেবারে ফাঁপা! তবে এতবড়ো গাছটা জ্যান্ত হয়ে আছে কেমন করে?'

রামহরি বললে, 'আপনারা বাবু শহুরে মানুষ! আপনারা তো দেখেননি, এমন অনেক বড়ো বড়ো বটগাছ আছে যাদের আসল গুঁড়ি মরে গিয়ে একেবারে ফাঁপা হয়ে যায়! তবু সেসব গাছ জ্যান্ত হয়েই থাকে। চারিদিকে এই যেসব ঝুরি দেখছেন, মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে এরাই বাঁচিয়ে রাখে বটগাছদের।'

উজ্জ্বল পেট্রলের আলোকে চারিদিকে তাকিয়ে বোঝা গেল, সেই বৃক্ষকোটরের ভিতরটাকে একখানি বড়োসড়ো ঘর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেবল সেই ঘরের উপরদিকে ছাদের আবরণ নেই, ঊর্ধ্বমুখে তাকালে দেখা যায় চাঁদের আলোমাখা এক টুকরো আকাশ।

ইতিমধ্যে আর একটা নতুন আবিষ্কার করে ফেলেছে জয়ন্ত! কোটরের একপ্রান্তে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে একখানা মাঝারি আকারের দরজার পাল্লা। খুব বড়ো একটা কড়া ধরে উপরদিকে টানবামাত্র দরজাটা বাইরের দিকে খুলে এল বেশ সহজেই।

জয়ন্ত নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখে বললে, 'একসার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে দেখছি। এখন আমাদের কী করা উচিত?'

বিমল বললে, 'এখন আমাদের পাতালপ্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই।'

রামহরি বললে, 'তোমার কি গোঁয়ার্তুমি করবার বয়স এখনও গেল না খোকাবাবু? পাতালে প্রবেশ করব বলছ যে, কিন্তু দলে ভারী ডাকাতরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

—'আমরাও আত্মরক্ষা আর প্রতিআক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে আছে অটোমেটিক বন্দুক আর অটোমেটিক রিভলভার—খুব সম্ভব ডাকাতদের কারুর কাছেই যা নেই। আমরা পাঁচজনে দুশো জন ডাকাতকে বাধা দিলেও দিতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনারা এইখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করুন। আগে আমি একলা চুপি চুপি নীচে নেমে গিয়ে এখানকার হালচালটা কিছু কিছু বোঝবার চেষ্টা করে আসিগে।' বলেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ উপরকার কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। কেবল গাছের কোটরের কোনখান থেকে একটা তক্ষক বিশ্রীকণ্ঠে বারকয়েক ডেকে উঠল।

মিনিট ছয়-সাত পরে জয়ন্ত আবার সিঁড়ির উপরকার ধাপে এসে দাঁড়াল। বললে, 'বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই পেলুম একটা বেশ লম্বা আর চওড়া সুড়ঙ্গপথ। তার চারিদিকটাই বাঁধানো। পরীক্ষা করে বুঝলুম এ সুড়ঙ্গটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, বিরাজ করছে ঠিক সমাধির স্তব্ধতা। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে গিয়ে পেলুম আর একটা দরজা, কিন্তু তার পাল্লাদুটো ওধার থেকে বন্ধ। দরজার উপরে কান পেতেও জীবনের কোনও লক্ষণই আবিষ্কার করতে পারলুম না। ওই দরজার ওধারে কী আছে জানি না, কিন্তু আপাতত আমরা এই সুড়ঙ্গের ভিতরে বোধহয় নিরাপদেই প্রবেশ করতে পারি।'

বিমল বললে, 'বেশ, তাহলে আপনি পথ দেখান।'

জয়ন্ত আগে আগে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলে বিমল, কুমার, মানিক, রামহরি ও বাঘা। সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়ে হাজির হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কুমার বললে, 'বাঃ, এরা যে এখানে বেশ পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে দেখছি। কিন্তু সুড়ঙ্গটার ভিতর দিয়ে এগুলে আমরা কোথায় গিয়ে পড়ব?'

বিমল বললে, 'আমার বিশ্বাস, উপরে যে স্তূপটা দেখে এসেছি, মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গের সাহায্যে আমরা হয়তো তারই ভিতরে প্রবেশ করতে পারি। হয়তো ওই স্তূপের তলায় পুরানো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে। হয়তো ধ্বংসাবশেষের কোনও কোনও জায়গা অল্পবিস্তর মেরামত করে নিলে এখনও সেখানে মানুষ বাস করতে পারে। দৈবগতিকে এটা জানতে পেরেই মধুডাকাত এখানে এসে গেড়েছে তার গোপন আস্তানা!'

মানিক বললে, 'কিন্তু পাতালের ভিতরে ডাকাতরা আলোবাতাস পাবে কেমন করে?'

বিমল বললে, 'যারা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার জন্যে এত আয়োজন করতে পেরেছে, তারা কি আর ওদিকে দৃষ্টি দেয়নি? হয়তো তারা উপর থেকে স্তূপের স্থানে স্থানে খুঁড়ে ভিতরে আলো আর বাতাস যাবার পথ করে নিয়েছে!'

এমনি কথাবার্তা হচ্ছে, হঠাৎ পিছন দিকে একটা উচ্চ শব্দ হল। সবাই একসঙ্গে চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের যেমুখ দিয়ে তারা ভিতরে প্রবেশ করেছে সেই মুখটার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত জুড়ে আছে অনেকগুলো বিষম মোটামোটা লোহার গরাদে! আবার তাদের পিছনদিকে সেইরকম আর একটা শব্দ এবং আবার তারা চমকে ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের অন্যদিকেও মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জুড়ে এসে পড়েছে তেমনি মোটা মোটা কতকগুলো লোহার গরাদে!

তাদের পিছু হঠবার বা সামনে এগুবার দুই পথই বন্ধ! তারা যেন পশুশালার লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দি!

অকস্মাৎ সেই সুড়ঙ্গপথ এক অতি তীব্র, তীক্ষ্ণ ও রোমাঞ্চকর হা-হা-হা-হা অট্টাহাসির রোলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সত্যি কথা বলতে কী, সে-বীভৎস হাসির বর্ণনা তার ওই হা-হা-হা-হা রবের দ্বারা বোঝানো যায় না—কারণ, সে-যেন চামুণ্ডারূপিণী প্রচণ্ড কোনও নারীর খল খল খল খল অট্টহাসি!

তিন-তিনটে প্রদীপ্ত পেট্রলের লণ্ঠন সেই সুড়ঙ্গপথের শেষ প্রান্তকেও দিয়েছিল অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি।

দেখা গেল, সুড়ঙ্গপথের অন্য প্রান্তের বন্ধ দরজাটা খুলে গিয়েছে এবং সেই দরজার সামনে এসে আবির্ভূত হয়েছে পনেরো-কুড়িটা সুদীর্ঘ মূর্তি! এতদূর থেকেও লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতেও তাদের কারুর চেহারা স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু এটা বেশ আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল যে, সেই মূর্তিগুলোর প্রত্যেকটাই রীতিমতো যমদূতের মতোই দেখতে!

কে যে হাসছে বোঝা যাচ্ছিল না তাও। হঠাৎ সেই নারীকণ্ঠের তীব্র হাসি থেমে গিয়ে জেগে উঠল, খনখনে মেয়েগলায় একটা কৌতুকপূর্ণ স্বর—'ওরে পুঁচকে বিমল! আমার গলা শুনে তুই কি আমাকে চিনতে পারছিস?'

বিমল শান্ত অথচ অবিচলিতকণ্ঠে বললে, 'চিনতে পারছি বই কি অবলাকান্ত! অমন বিরাট দেহে অমন কুৎসিত নারীকণ্ঠ ভগবান বোধহয় পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে দান করেননি! তুমি মধুডাকাত বলেই আত্মপরিচয় দাও কিংবা বৃদ্ধের ছদ্মবেশই ধারণ করো, কিন্তু তোমার অস্তিত্ব আমি এখানে আসবার আগেই অনুমান করে নিয়েছি! সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'র মামলায় শেষপর্যন্ত হেরে গিয়েও তুমি আমাদের ফাঁকি দিয়ে লম্বা দিয়েছিলে, একথা কি আমি কোনওদিন ভুলব? আজ যে আবার তোমাকে মুঠোর ভেতরে পেয়েছি, এটা জেনে আমার মন আনন্দে নেচে উঠছে!'

আবার সেই খনখনে গলায় খল খল অট্টহাসি! তারপরই হঠাৎ হাসি থামিয়ে অবলাকান্ত চিৎকার করে বললে, 'বলিস কীরে? তুই আমাকে মুঠোর ভেতর পেয়েছিস? না আমি তোকে আর তোর স্যাঙাতদের বুনো কুকুর-শেয়ালের মতন লোহার খাঁচায় বন্দি করে ফেলেছি? খালি তুই কেন, মস্তবড়ো গোয়েন্দা বলে যে নাম কিনতে চায়, সেই জয়ন্তগাধাকে তোর মতন আগেও আমি একবার নিজের হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েছিলুম, আজও আবার পেয়েছি! এক ঢিলে আজ আমি দুই পাখি মারতে চাই! তোদের দু-জনের সঙ্গে আর যারা আছে তাদের আমি উল্লেখযোগ্য বলে মনেই করি না! তবে এইসঙ্গে সেই হোঁতকা পুলিশকর্মচারী সুন্দরটাকে জালে ফেলতে পারলে আমার প্রতিহিংসা আজ একেবারে সার্থক হত!'

জয়ন্ত বললে, 'অবলাকান্ত, তোমার বাজে তড়পানি শোনবার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই। তুমি কী করতে চাও, তাই বলো।'

—'আমি কী করতে চাই? আমি কী করতে চাই? তা শুনলে তোদের দেহের রক্ত হিম হয়ে যাবে! বিজন জমিদারের 'লঞ্চ' আক্রমণ করবার আগে যদি আমি তোদের খবর জানতে পারতুম, তাহলে আগে থাকতে সেইখানেই ব্যবস্থা করতুম তোদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে! তারপরেই যখন হঠাৎ তোদের দেখা পেলুম, তখনই বুঝলুম যে, তোদের মতন ছিনে-জোঁক শেষপর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তারপর আজ এই বিপথে আমার আড্ডার এত কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই আমার জানতে বাকি রইল না যে, এখানেও হয়েছে তোদেরই অশুভ আবির্ভাব! আমি বুদ্ধিমানের মতন তখন আর কোনও গোলমাল না করে তোদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে রাখলুম। আমি জানতুম, তোরা এখানে আসবি, আসবি, আসবি! হা-হা-হা-হা-হা-হা!'

জয়ন্ত অধীরকণ্ঠে বললে, 'তোমার প্রলাপের উচ্ছ্বাস আর আমাদের ভালো লাগছে না! তুমি এখন কী করতে চাও তাই বলো!'

—'আমি কী করতে চাই? আমি কী করতে চাই? আমি যা করতে চাই, সেটা তোদের কাছে একটুও ভালো লাগবে না! আমার প্রতিহিংসা সর্বদাই দৌড়োয় উলটো পথে! আমি তোদের হাতে মারব না, ভাতে মারব! বুঝেছিস?'

জয়ন্ত বললে, 'ভাতে মারবার কথা কী বলছ? তোমার কাছে আমরা ভাত খেতে আসিনি!'

আবার অট্টহাসি হেসে অবলাকান্ত বললে, 'তাই নাকি? তাহলে সংক্ষেপেই শোন, আমি কী করতে চাই। তোরা ওই লোহার খাঁচাতেই বন্দি হয়ে থাকবি—দিনের পর দিন—যতদিন না পটল তুলিস! তোদের একফোঁটা জল খেতে দেব না, এককণা খাবারও দেব না! ওই খাঁচার ভেতরেই ছটফট করতে করতে অনাহারে তোরা মরে থাকবি! ওখান থেকেই সবাই মিলে তোরা যতখুশি চ্যাঁচাতে পারিস, তোদের গলার আওয়াজ এই পাতাল ফুঁড়ে পৃথিবীর উপরে জেগে ওঠবার কোনও পথই নেই। হা-হা-হা-হা-হা!'

দাঁতে দাঁত চেপে কুমার নিম্নস্বরে বললে, 'বিমল! জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! রামহরি! শয়তানের আস্ফালন আর সহ্য হচ্ছে না! মরতে হয় মরব, কিন্তু এখন শত্রুনিপাত করবার সুযোগ ছেড়ে দেব কেন?'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছ! ছোড়ো সবাই একসঙ্গে অটোমেটিক বন্দুকগুলো!'

পরমুহূর্তেই একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা অটোমেটিক বন্দুক গর্জন করতে লাগল বারংবার! কেবল বন্দুকগুলোর শব্দে নয়, অনেকগুলো মনুষ্যকণ্ঠের ভয়াবহ আর্তনাদে সুড়ঙ্গপথের সেই বদ্ধ আবহাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

জয়ন্ত উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলল, 'তোরা যদি যুদ্ধ করতে চাস, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর! লড়াই করে মরতে আমরা রাজি আছি! আয়, দেখি কাদের বন্দুকের প্রতাপ বেশি?'

মনুষ্যকণ্ঠ থেকে আর কোনও উত্তর শোনা গেল না, অল্পক্ষণ খানিক ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ি শব্দের পর শোনা গেল কেবল একটা দরজা সজোরে বন্ধ করে দেওয়ার আওয়াজ।

জয়ন্ত আবার প্রাণপণে চিৎকার করে বললে, ফের যদি তোরা ওই দরজা খুলিস, আমাদের কাছ থেকে এইরকম অভ্যর্থনাই লাভ করবি! আমরা মরতে-মরতেও তোদের মেরে তবে মরব!'

কিন্তু আর কারুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল না। সেই বন্ধ দরজা বন্ধ হয়েই রইল, কেবল দেখা গেল, দরজার সামনে মাটির উপরে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে চারটে মনুষ্যমূর্তি! নিশ্চয়ই তারা কেউ আর বেঁচে নেই! হয়তো আহত হয়েছে আরও অনেকগুলো মানুষ, কিন্তু তারা কোনওগতিকে আশ্রয় নিয়েছে ওই বন্ধ দরজার নিরাপদ অন্তরালে!

খানিকক্ষণ কেটে গেল নীরবতার মধ্য দিয়ে। হয়তো সকলেই তখন নিজের নিজের ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করছিল।

কেবল রামহরি বিমলকে সম্বোধন করে বললে, 'খোকাবাবু, তুমি যখন সঙ্গে আছ, তখন আমি জানি যে, আমাদের কারুর কোনওই ভয় নেই। এখন কেমন করে এই খাঁচার বাইরে যাই বলো দেখি? এর লোহার ডান্ডাগুলো এত মোটা যে, হাতি এলেও এদের কিছুই করতে পারবে না! হে বাবা বিশ্বনাথ! বুড়ো বয়সে অন্নজল না খেয়ে মরবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই! তুমি আমাদের একটা উপায় করে দাও বাবা!' বলেই সে দুই হাত জোড় করে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণামের পর প্রণাম করতে লাগল।

বিমল হাসতে হাসতে সহজ স্বরেই বললে, 'ভাই রামহরি, বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এখান থেকে পালাবার উপায় আমাদের সঙ্গেই আছে।'

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'কীরকম?'

বিমল বললে, 'খুব সোজা উপায়। কিন্তু সবাইকে আমার কথামতো কাজ করতে হবে।'

—'বলুন।'

—'সকলে মিলে এখানে চিৎকার করে কথা বলতে থাকুন আর মাঝে মাঝে প্রাণপণে গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিন। আর নিবিয়ে দেওয়া হোক পেট্রলের আলোগুলো। আমি এখন চাই খালি অন্ধকার আর কোলাহল!'

—'আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না!'

—'আমি সব জায়গাতেই প্রস্তুত হয়েই যাই। অনেক দেখে দেখে আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে। হঠাৎ কেউ আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। আমার সঙ্গে কী আছে জানেন? একটি অতিসূক্ষ্ম প্রথম শ্রেণির উকো! এই উকো দিয়েই লোহার ডান্ডা কেটে আমি এখান থেকে সকলকার পালাবার পথ আবার খুলে দেব। কিন্তু বলা তো যায় না, এই অদ্ভুত সুড়ঙ্গপথের কোন অজানা রন্ধ্রের পিছনে আছে কোন দুরাত্মার সাবধানী চক্ষু! আর লোহার উপরে উকো ঘষলেই একটা শব্দের সৃষ্টি হবে। সেই শব্দটা ঢাকবার জন্যেই সকলকে গোলমাল করতে অনুরোধ করছি। তারপর যদি সেই শব্দ শুনে অন্ধকারে ওদিককার দরজা খোলার আওয়াজ হয়, তখন কেউ যেন একসঙ্গে বন্দুক ছুড়তে একটুকু ইতস্তত না করেন।'

সেই পাতালপুরীর ভিতরে বসে রাত্রি কি দিন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আসলে তখন হচ্ছে, শেষ রাত্রি।

বিমল তার উকোর সাহায্যে একটা মোটা লোহার ডান্ডা একেবারে কেটে ফেললে। তারপরে মুখ তুলে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এইবারে কিন্তু দয়া করে আমার কয়েকটি উপদেশ শুনতে হবে। অবশ্য এই উপদেশ মানা আর না-মানা, সে হচ্ছে আপনাদের অভিরুচি।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, দেখছি আজকের নাটকের নায়ক হচ্ছেন আপনিই! এখানে হয়তো আমাদের অনাহারেই মরে পড়ে থাকতে হত—যদি আপনাকে আজ সঙ্গে না পেতুম। আপনি আজ যা বলবেন, সেটা হবে আমাদের কাছে আদেশের মতন!'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার এতটা বেশি বিনয় প্রকাশ করবার কোনওই দরকার নেই। আমি যা বলব তা হবে সোজা কথাই! .....দেখুন, পালাবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি, আমরা এখানে এসেছি একদল দুর্ধর্ষ বোম্বেটে গ্রেপ্তার করতে। পালাতে আমরা এখনই পারি, কারণ পথ আমি সাফ করে দিয়েছি। কিন্তু আপনারা এখান থেকে পালাতে চান, না এই দুর্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে চান!'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, ওই অবলাকান্তর ওপরে আমার অনেকদিনের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ও আমাদের বারংবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে! ওকে আর ওর দলকে যদি গ্রেপ্তার করতে পারি, তাহলে সে সুযোগ আমি নিশ্চয়ই ছাড়ব না! তবে ব্যবস্থা যা দেখছি, এখান থেকে আমাদের পালাবার পথ খোলা রয়েছে, কিন্তু অবলাকান্তদের গ্রেপ্তার করবার কোনওই সুযোগ নেই!'

জয়ন্তের কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিমল বললে, 'কুমার, আজ একটুখানি জাগ্রত হতে পারবে?'

কুমার, হাসতে হাসতে সেলাম করে বললে, 'জো-হুকুম, মহারাজ!'

বিমল বললে, 'শোনো কুমার! এখান থেকে বিজনবাবুদের 'লঞ্চ' বোধহয় বেশি দূরে নেই! তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। আমাদের পালাবার পথ খোলা থাকলেও আমরা এইখানেই আপাতত অচল শিবের মতোই বসে রইলুম। এখন হয়তো বাইরে গিয়ে দেখবে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু তোমার কুকুর-বন্ধু বাঘাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও—সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ চিনিয়ে দেবে।'

কুমার বললে, 'আমাকে কী যে করতে হবে এখনও সেটা বুঝতে পারছি না।'

বিমল বললে, 'তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। বাঘাকে ইঙ্গিত করলেই সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, 'লঞ্চ' যেখানে আছে সেইখানেই। 'লঞ্চ'-এর উপরে তিন ডজন বন্দুকধারী পুলিশের সেপাই আছে! তার উপরেও আছে আরও পনেরো-বিশজন লোক। তুমি সমস্ত কথা বলে তাদের সবাইকে সশস্ত্র হয়ে এইখানে আসবার জন্যে অনুরোধ করবে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু বিমলবাবু, পথ যখন খোলা রয়েছে, তখন আপাতত সবাই তো আমরা এখান থেকে সরে পড়তে পারি! তারপর 'লঞ্চ' থেকে লোকজন নিয়ে এসে আবার আমরা চেষ্টা করে দেখব এই শয়তানদের গ্রেপ্তার করতে পারি কি না?'

জয়ন্ত রুক্ষস্বরে বললে, 'মানিক, তোমার আজ হল কী বলো দেখি? তুমি আজ বারবার নির্বোধের মতন কথা কইছ! এখান থেকে আমরা সবাই যদি সরে পড়ি, তাহলে এই পাতালপুরীর বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠবে, সেটা কি আন্দাজ করতে পারছ না? তারপর ফিরে এসে আর কি তাদের কোনও পাত্তা পাবে?'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু! আমি কি চাই জানেন? আমরা এইখানেই বসে থাকব, বেশি বিপদ দেখলেই এখান থেকে সেই মুহূর্তেই সরে পড়ব—কারণ আমাদের পালাবার পথ খোলাই আছে! কিন্তু আমরা তো পালাবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি মধুডাকাত বা অবলাকান্ত আর তার দলবল গ্রেপ্তার করতে! কুমার চলে যাক বাঘাকে নিয়ে! সে লঞ্চের উপরে গিয়ে খবর দিক, আমাদের কী অবস্থা! তারপর কেউ যথাসময়ে আসতে পারে ভালোই, না পারে, আমরা নিজেদের পথ নিজেরাই করে নেব-অখন।'

জয়ন্ত বিমলকে আলিঙ্গন করে বললে, 'দাদা, তুমি তো গোয়েন্দা নও, আমিই হচ্ছি ডিটেকটিভ! কিন্তু তুমি ভাই আজকে আমাকেও হারিয়ে দিলে!'

বিমল বললে, 'কে যে হেরে যাবে আর কে যে হারবে না, সেকথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তুমি হচ্ছ আমার বন্ধু, তুমি যদি হুকুম করো, আমি সবকিছু করতে পারি!'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি যদি হুকুমের কথা বলেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায় হবে। আপনি আমাদের চেয়ে কত বেশি দেখেছেন! যে লোক মঙ্গলগ্রহ গিয়ে ফিরে এসেছে তাকে আমরা কী-ই বা হুকুম করব?'

নবম

তারপর কী হল?

চারিদিকে প্রখর দিবালোক ছড়িয়ে সূর্য তখন উঠেছে আকাশের অনেকখানি উপরে।

কিন্তু সূর্যের আলোকের এককণাও সুড়ঙ্গপথের মধ্যে প্রবেশ করেনি। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তারা উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল একেবারে নীরবে। তাদের প্রত্যেকেরই হাতের বন্দুক যে কোনও মুহূর্তে

অগ্নি উদ্গার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। সুড়ঙ্গপথের ওদিককার দরজাটা যদি কেউ খোলবার চেষ্টা করে কিংবা ওদিকে যদি কোনও সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়, তাহলে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বন্দুক ছুড়তে একটুও বিলম্ব করবে না।

কিন্তু অবলাকান্ত বা তার কোনও অনুচর একবারও দরজা খোলবার বা উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করলে না। দরজা খুললেই যে কীরকম বিপদের সম্ভাবনা, একটু আগেই তারা তার যে নমুনা পেয়েছে তাদের পক্ষে তাই-ই হয়েছে যথেষ্ট। আর একথাও তারা বোধহয় ভাবছে, বন্দিরা যখন লোহার খাঁচার ভিতরে, তাদের পালাবার কোনও উপায়ই যখন নেই এবং অন্ন ও জল থেকে বঞ্চিত করে তাদের যখন হত্যাই করা হবে, তখন আর দরজা খুলে পাহারা দিতে গিয়ে যেচে বিপদকে ডেকে আনবার দরকার কী?

...হঠাৎ সুড়ঙ্গ-পথের মুখে একটা শব্দ শোনা গেল। সাবধানি পায়ের শব্দ! তারপরই একটা চাপা কণ্ঠস্বরে শোনা গেল—'হুম! এ যে বেজায় অন্ধকার বাবা!'

মানিক উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাদের সুন্দরবাবু এসেছেন! পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবাবু একলা আসছেন না!'

ইতিমধ্যে বিমল সুড়ঙ্গের ভিতর দিকে প্রবেশ করবার জন্যে ওদিককারও একটা লোহার ডান্ডা উকো ঘষে কেটে ফেলেছে। সেই পথ দিয়ে বেরুতে বেরুতে বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, এইবারে পেট্রলের লণ্ঠনগুলো জ্বালিয়ে ফেলুন।'

আলোকের ধাক্কায় অন্ধকার যখন অদৃশ্য হল তখন দেখা গেল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন সুন্দরবাবু। তারপর আবির্ভূত হল কুমার ও বাঘা! তারপর পদশব্দের পর পদশব্দ তুলে ভিতরে নেমে আসতে লাগল দলেদলে সশস্ত্র পুলিশের লোক।

খাঁচার ভিতরকার বন্দিরাও তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপাতত কোনও কথা বলবার বা গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না। খাঁচার কাটা-ডান্ডার ফাঁক দিয়ে গলে চুপিচুপি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন!'

জয়ন্ত ও বিমল সর্বাগ্রে অগ্রসর হল। তারপর তারা সুড়ঙ্গপ্রান্তের সেই বন্ধ দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখনও পড়েছিল কতকগুলো মৃতদেহ! সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে দরজার উপরে কান পেতে তারা শুনতে লাগল, কিন্তু দরজার ওদিকে নেই কোনও রকম ধ্বনির অস্তিত্ব।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে ঠেলা দিতে দরজা গেল খুলে।

দেখা গেল একখানা বেশ বড়ো ঘর। ঘরখানা যে বহুকালের পুরাতন প্রথম দৃষ্টিতেই সেটাও অনুমান করা যায়।

কিন্তু ঘরের মধ্যেও জনপ্রাণী নেই।

বিমল ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'জয়ন্তবাবু, ওদিককার দেওয়ালে কী একখানা কাগজ মারা রয়েছে দেখছেন?'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কাগজখানার উপরে টর্চের আলোক নিক্ষেপ করে উত্তেজিত ও উচ্চস্বরে পড়তে লাগল : 'ওহে জয়ন্ত-গাধা, ওরে বিমল-শেয়াল। তোরা কি ভেবেছিস আমি অভিমন্যুর মতন নির্বোধ? এই পাতালপুরীতে ঢোকবার পথ রেখেছি আর পালাবার পথ রাখিনি? এখান থেকে বাইরে বেরুবার খালি একটা নয়, অনেকগুলো পথই আছে! পাহারাওয়ালা খালি তোদেরই নেই,

আমারও আছে! আমার পাহারাওয়ালারা দিনেরাতে বনে বনে পাহারা দিয়ে বেড়ায়! তাদেরই মুখে খবর পেলুম, সুন্দর-ছুঁচো একদল ছাতুখোর লালপাগড়ি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমার এই আড্ডার দিকে ছুটে আসছে। এযাত্রা আবার তোরা আমাকে ফাঁকি দিলি বটে, কিন্তু এত সহজে ধরা পড়বার ছেলে নই আমিও। তোরা যখন এই শূন্য পাতালপুরীতে বসে হাহুতাশ করবি, আমি তখন থাকব বহুদূরে—বহুদূরে। আমার ঠিকানা যদি চাস তাহলে আবার তোরা আমার সঙ্গে দেখা করিস। তখন তোদের আমি খুব ভালো করেই অভ্যর্থনা করবার চেষ্টা করব। আর আমার সঙ্গে আবার আলাপ করবার শখ যদি তোদের মিটে গিয়ে থাকে, তাহলেও জেনে রাখিস, কমলী তোদের ছাড়বে না। আজ থেকে আমি রইলুম তোদের পিছনে পিছনে মূর্তিমান শনির মতো। ইতি অবলাকান্ত।' শেষ-দিকটা পড়তে পড়তে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ!

বিমল সকৌতুকে উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল!

রামহরি বললে, 'কী যে হাসো খোকাবাবু, গা যেন জ্বলে যায়!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, এখন আপনি কী করবেন?'

সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বললেন, 'হুম!'

কুমার বললে, 'বাঘা, তুই কিছু বলবি না?'

বাঘা মুখ তুলে বললে, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

কুমারের
বাঘা গোয়েন্দা

প্রথম

ট্রেনের উপরে হানা

সন্ধ্যা হয়-হয়।

সূর্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু তার সমুজ্জ্বল ও আরক্ত আশীর্বাদের কিছু-কিছু আভাস এখনও দেখা যাচ্ছে আকাশের এখানে-ওখানে, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে।

যাকে বলে তেপান্তরের মাঠ। ধু-ধু-ধু-ধু ময়দানের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে বন্য বাতাস হু-হু-হু-হু! এবং সেই বন্য বাতাসের গতিকে অনুসরণ করবার জন্যেই যেন বাঁধা লাইনের উপর দিয়ে তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে একখানা রেলগাড়ি।

ছুটতে ছুটতে ট্রেনখানা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সম্ভবত ট্রেনের বিপদসূচক ঘণ্টার দড়িতে টান মেরে রেলগাড়িকে কেউ থামাতে বাধ্য করলে।

তারপরেই একটা হই-হই-রই-রই কাণ্ড!

ঠিক যেন কোনও অদৃশ্য জাদুকরের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তিবলে আচম্বিতে প্রায় শতাধিক মনুষ্য-মূর্তি আবির্ভূত হল সেই বিজন তেপান্তর মাঠের উপরে। তারা যে এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল, তা অনুমান করাও অসম্ভব। তাদের প্রত্যেকেই সশস্ত্র। অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক বা রিভলভার এবং যাদের আগ্নেয়াস্ত্র নেই তাদেরও হাতে আছে ভয়াবহ বর্শা, তরবারি, কুঠার বা মোটামোটা লোহা-বাঁধানো বাঘ-মারা লাঠি।

তারা সবাই বেগে ছুটে গেল ট্রেনের দিকে। তারপরই সেই বিজন মাঠের নিদ্রাতুর নিস্তব্ধতা হঠাৎ যেন আর্তনাদ ও ছটফট করে উঠল ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দে, বহু মনুষ্য-কণ্ঠের হুঙ্কারে এবং আর্ত চিৎকারের পর চিৎকারে!

সেই ট্রেনেরই একটি কামরায় বসেছিল বিমল এবং কুমার। কলকাতা ছেড়ে তারা কোনও জমিদার-বন্ধুর নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছে। কিন্তু এই আকস্মিক গোলমাল শুনে তারা দুটো জানালার কাছে এসে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলে। মিনিট-খানেক এদিক-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করে কুমার শুধোলে, 'এ আবার কী কাণ্ড' বিমল?'

বিমল বললে, 'কাণ্ডটা অনুমান করা একটুও কঠিন নয়। একদল ডাকাত লুটপাট করবার জন্যে ট্রেনখানাকে আক্রমণ করেছে! তাদেরই দলের কোনও লোক গাড়ির ভিতরে ছিল, নির্দিষ্ট স্থানে এসে হঠাৎ 'এলার্ম চেন' টেনে গাড়িখানাকে থামিয়ে দিয়েছে।'

দলে-দলে লোক বিকট চিৎকার ও অস্ত্রশস্ত্র আস্ফালন করতে করতে বেগে ছুটে আসছে তাদের কামরার দিকেই!

কুমার বললে, 'এখন আমাদের কী করা উচিত?'

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার অন্যদিকের একটা জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'এদিকটা দেখছি একেবারেই নির্জন। এসো কুমার, জানালা দিয়ে গলে মারো লাফ বাইরের দিকে!'

বিমলও তাই করলে, কুমারও তাই করলে। তারপর তারা দুজনে দ্রুতপদে উঁচু রেলপথ ছেড়ে ঢালু জমির উপর দিয়ে নেমে নীচের মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল।

কুমার বললে, 'ট্রেন তো ছাড়লুম। এখন যাই কোনদিকে?'

বিমল বললে, 'দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে চলো এই মাঠের উপর দিয়ে। এই বিপজ্জনক রেলপথ ছেড়ে যত দূরে গিয়ে পড়তে পারি ততই ভালো!'

সামনেই ছিল একটা মস্ত-বড়ো ঝুপসি অশথগাছ। তারই উপরের কোনও ডাল থেকে হঠাৎ কে পেত্নির মতন রোমাঞ্চকর ও খনখনে কণ্ঠস্বরে খল-খল অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'আরে বিমল, আরে কুমার, পালিয়ে যাবে কোথায়? এত সহজে অবলাকান্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!'

বিমল এবং কুমার সচমকে ও সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের উপরদিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখল! পরমুহূর্তেই সেই বৃহৎ বৃক্ষটা করলে যেন দলে-দলে মনুষ্য বৃষ্টি!

পিছনদিকে উঁচু রেলপথ ও ট্রেন ও দস্যুদল এবং সামনের দিকেও এই আকস্মিকভাবে আবির্ভূত শত্রুর দল! বিমল আর কুমারের পালাবার কোনও পথই আর খোলা রইল না।

একটা কৃষ্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মূর্তি চকচকে রিভলভার হাতে করে বিমলের সামনে এগিয়ে এসে আবার খিলখিল করে হেসে উঠে ব্যঙ্গপূর্ণকণ্ঠে বললে, 'মহামহিমার্ণব বিমলবাবু, অধীনকে চিনতে পারছেন কি?'

বিমল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'চিনতে পারছি বইকী! তুমি হচ্ছ অবলাকান্ত, পৃথিবীর একটা নিতান্ত নিকৃষ্ট কীট।'

অবলাকান্ত তার সেই অস্বাভাবিক নারীকণ্ঠে আবার একবার অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর হাতের রিভলভারটা নাচাতে-নাচাতে বললে, 'কে যে নিকৃষ্ট আর কে যে উৎকৃষ্ট এখনও তার প্রমাণ কি পাওনি বাপু? সেই 'জেরিনার কণ্ঠহারে'র* মামলার সময় থেকেই বারবার তোমরা আমাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছ। কিন্তু কোনও বারেই তোমাদের আক্রমণ সফল হয়নি। উলটে প্রত্যেক বারেই আমি তোমাদের নাজেহাল করে নাকের জলে আর চোখের জলে এক করে ছেড়েছি। কেমন, এ-কথা মানতে রাজি আছ কি?'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'মোটেই নয়। তুমি তোমার ওই ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে বারবার আমাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছ—এইমাত্র! যতবারই তুমি ফাঁদ পেতেছ, ততবারই আমরা সেই ফাঁদ ভেঙে বাইরে আসতে পেরেছি। জেরিনার কণ্ঠহারের কথা বলছ? তোমার হাত থেকে আমরা কি সেটা ছিনিয়ে নিতে পারিনি?'

অবলাকান্তের সেই বৃহৎ দেহ বিপুল ক্রোধে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। নিজের একটিমাত্র চক্ষুর ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ করে সচিৎকারে সে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সেইজন্যেই তো তোদের সকলকার ওপরে আমার এমন জাতক্রোধ! আমার নিজের কথা বলছিস? আমাকে তোরা ধরবি কী রে, আমার যখন খুশি তোদের খোকার মতন ভুলিয়ে ফাঁকি দিতে পারি! কিন্তু জেরিনার কণ্ঠহার—জেরিনার কণ্ঠহার! হ্যাঁ, তোদের জন্যেই আমি হারিয়েছি জেরিনার কণ্ঠহার! সে দারুণ দুঃখ এ-জীবনে আমি আর ভুলব না!'

*আমার লেখা 'জেরিনার কণ্ঠহার' উপন্যাস দেখুন।

বিমল মৃদু-মৃদু হাসি হেসে বললে, 'বেশ, সেই দুঃখ নিয়েই ইহলোকে তুমি তোমার পাপজীবন যাপন করো, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই? কিন্তু আজকের এই ঘনঘটার অর্থটা কী?'

—'অর্থ? হুঁ, অর্থের ভিতরেই আছে অনর্থ! তোদের ওপরে আমি বরাবরই নজর রেখেছি। তোরা যে আজ এই ট্রেনে আসবি সে-খবরও আমি পেয়েছি যথাকালেই! আমি কেবল এই ট্রেনখানাকে আক্রমণ করতে আসিনি, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা!'

কুমার হাসতে-হাসতে বললে, 'আমরা হচ্ছি তুচ্ছ ব্যক্তি। মনে আছে, বিমল তোমাকে প্রথমে আক্রমণ করেনি, প্রথম আক্রমণ করেছিলে তুমিই তাকে? তবে আমাদের ওপরে এতটা সুনজর দেওয়ার কারণটা কী?'

অবলাকান্ত ভুরু নাচিয়ে বললে, 'কারণ? কারণ নিশ্চয়ই আছে! তোরা আর জয়ন্তরা যতদিন বেঁচে থাকবি, ততদিন আমি এই পৃথিবীতে নিরাপদ নই! তোদের আমি তিল-পরিমাণ তুচ্ছ লালপিঁপড়ের মতনই মনে করি। কিন্তু জানিস তো, ক্ষুদ্র লালপিঁপড়েও কামড়ালে মানুষ তাকে বধ না করে পারে না? সেইজন্যেই আগে আমি তোদের কজনকে এই পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে চাই।'

বিমল বললে, 'তুমি তো বারবার নতুন-নতুন উপায়ে আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার চেষ্টা করেছ। কিন্তু পেরেছ কি?'

অবলাকান্ত আবার খলখলে অট্টহাসি হেসে বললে, 'ঠিক বলেছিস! ধরলুম আর মারলুম, এভাবে মানুষ মেরে আমার হাতের সুখ হয় না। যদি শত্রুর মতন শত্রু পাই, নতুন-নতুন উপায়ে তাকে বধ করতে পারলেই সীমা থাকে না আমার আনন্দের!'

কুমার বললে, 'এবারেও একটা নতুন উপায়েই আমাদের হত্যা করবে নাকি?'

—'নিশ্চয়!'

—'উপায়টা কী দাদা?'

—'আগে থাকতে বলবার দরকার কী? একটু পরেই স্বচক্ষে আর স্বকর্ণে সমস্তই দেখতে আর শুনতে পাবি!' অবলাকান্ত হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তার অনুচরদের ডেকে বললে, 'এই! তোরা সঙের মতন দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বন্দুকের পাহারার ভিতরে রেখে এই দুটো ছুঁচোকে আমাদের আড্ডার দিকে নিয়ে চল!'

দ্বিতীয়

সাঁকোর উপরে অভিনয়

বহু—বহুদূর থেকে শোনা গেল একটা বংশীধ্বনি।

তারপর আরও কাছ থেকে শোনা গেল আর একটা বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ!

তারপর খুব নিকটেই জেগে উঠল তীক্ষ্ণতর আর একটা বংশীধ্বনি!

অবলাকান্ত ব্যস্তভাবে বললে, 'এসব বাঁশি বাজাচ্ছে আমাদের চররাই! খুব সম্ভব পরের স্টেশনের কর্তাদের টনক নড়েছে, আর ব্যাপার কী জানবার জন্যে এদিকে ছুটে আসছে রেলওয়ে পুলিশের দল! ব্যাস, আর নয়, এইবারে সময় থাকতে-থাকতে জাল গুটিয়ে ফেল!' বলেই পকেট থেকে নিজে একটা বাঁশি বার করে খুব জোরে উপর-উপরি তিনবার ফুঁ দিলে!

পরমুহূর্তেই ট্রেনের এদিক-ওদিক থেকে দলে দলে সব যমদূতের মতন মূর্তি দ্রুতবেগে অবলাকান্তর কাছে এসে তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল! তাদের হাতে কেবল অস্ত্রশস্ত্র নেই, সেই সঙ্গে অধিকাংশেরই কাঁধ বা পিঠের উপরে রয়েছে পোঁটলা-পুঁটলি, ব্যাগ, সুটকেস বা 'ট্রাঙ্ক' প্রভৃতি। নরহত্যা ও ট্রেন লুণ্ঠন করেই তারা যে হতভাগ্য যাত্রীদের এইসব মালপত্তর হস্তগত করেছে, সে-বিষয়ে নেই কোনওই সন্দেহ।

সকলকার দিকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি-সঞ্চালন করে নিয়ে অবলাকান্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'বাহাদুর, তোরা সবাই বাহাদুর। দেখছি আজ আমাদের এক ঢিলে দুই-পাখি মারা উৎসব ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন হল! আর দেরি নয়! এই দুই ব্যাটা নচ্ছারকে একেবারে সামনের দিকে রেখে গোরু-তাড়ানোর মতন তাড়িয়ে নিয়ে চল! এদের ঠিক পিছনেই দুজন লোক বন্দুক নিয়েই তৈরি হয়ে থাকুক। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করে তাকে মেরে ফেলা হবে। সবাই মনে রাখিস, এরা হচ্ছে পাঁড়ঘুঘু, অসম্ভব রকম সব চালাকি জানে।'

ঠিক অবলাকান্তের হুকুম মতোই ব্যবস্থা হল। মাঠের উপর দিয়ে সর্বাগ্রে অগ্রসর হতে

বাধ্য হল বিমল এবং কুমার। দুজন লোক বন্দুক তুলে চলল তাদের পিছনে-পিছনে। এবং তাদের পরে আসতে লাগল প্রায় শতাধিক ডাকাতের দল, বিপুল আনন্দে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে।

অবলাকান্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'এই সব গাধার দল! সবাই একেবারে চুপ করে থাক! কেউ যদি টুঁ-শব্দটি করবি, আমি তখনই গলা টিপে তাকে মেরে ফেলব! ব্যাটারা ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আর পৃথিবী জাগাতে জাগাতে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে! ওদিকে যে পুলিশের টনক নড়েছে সে-খেয়াল কারুর নেই!'

বিমল বললে, 'অবলাকান্ত, তুমি আগে ছিলে গুণ্ডা আর চোর! তারপর হয়েছিলে সুন্দরবনের নদী-নালার খুনে বোম্বেটে! তারপর আজ তোমাকে দেখছি লুণ্ঠনকারী দস্যুরূপে! এরপর তোমাকে আর কোন মূর্তিতে দেখতে পাব, সেটা আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না!'

নারীকণ্ঠ অবলাকান্ত হো-হো স্বরে হেসে উঠে বললে, 'ওরে বিমল, ভোল না ফেরালে ভিখ মেলে কি? তোদের উৎপাতে কলকাতা শহর ছাড়তে হল! গেলুম সুন্দরবনে জলের বাসিন্দা হতে। সেখানে গিয়েও তোরা নাক গলাতে ছাড়লি না! কাজেই আমি এখন আবার নতুন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি! আমি হচ্ছি পারার মতন পিচ্ছল, ধরি-ধরি করেও তোরা আমাকে কোনওদিনই ধরতে পারবি না!'

তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সন্ধ্যা। প্রান্তরের দিকে দিকে নেমে এসেছে নিবিড় অন্ধকারের কালো যবনিকা। বাসায় ফিরে-যাওয়া পাখিদের কলরব পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে কেবল ঝিল্লিদের কর্কশ কণ্ঠের অবিশ্রান্ত ধ্বনি!

বোধহয় সেদিন আকাশে উঠেছিল অষ্টমীর চাঁদ। তার স্বল্প কিরণে অন্ধকারের নিবিড়তা খানিকটা পাতলা হয়ে গেল। এবং সেই ম্লান আলোকেই দেখা গেল সামনেই রয়েছে একটি সাঁকো এবং তার তলায় শোনা যাচ্ছে কোনও নদীর কলকণ্ঠ স্বর।

বিমল আর কুমার সর্বাগ্রে সাঁকোর উপর গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ বিমল অনুচ্চকণ্ঠে তামিল ভাষায় কুমারকে সম্বোধন করে বললে, 'কুমার, আমি যেই 'পুলিশ' বলে চিৎকার করে উঠব, তুমি তখনই এই সাঁকোর উপর থেকে নদীর উপরে মারবে এক লাফ! তারপর জলের উপরে আর না মাথা জাগিয়ে ডুব-সাঁতার দিয়ে চলে আসবে ঠিক এই সাঁকোর তলায়। আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। তারপর যা করতে হবে যথাসময়েই বলে দেব।'

পিছন থেকে অবলাকান্ত খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, 'তোরা ইন্ডিল-মিন্ডিল করে কী কথা কইছিস রে?'

বিমল বললে. 'আমরা কইছি নিজেদের কথা।'

—'নিজেদের কথা? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন?'

—'সেটা তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির দোষ, আমরা কী করব বলো?'

—'খবরদার! তোরা আর কোনও কথাই কইতে পারবি না!'

—'যো হুকুম, জনাব!'

তারা তখন সাঁকোর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে।

বিমল আচম্বিতে পিছনপানে তাকিয়ে প্রচণ্ড উল্লাস-ভরা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'পুলিশ! পুলিশ! কুমার, আর আমাদের ভয় নেই! পিছনদিকে তাকিয়ে দ্যাখো দলে দলে পুলিশের লোক এইদিকে ছুটে আসছে! জয় ভগ

অপরাধীদের কাছে 'পুলিশ' নামের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই নেই। বিমলের সেই উল্লসিত উক্তি শুনেই দস্যুদলের সবাই সচমকে আত্মহারার মতন পিছনদিকে ফিরে দাঁড়াল!

—এবং সেই সুযোগে বিমল ও কুমার সাঁকো থেকে লাফ মেরে নদীর জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল!

ডুব-সাঁতার দিয়ে তারা দুজনে ঠিক সাঁকোর তলায় গিয়ে আবার জলের উপরে ভেসে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে উপর-উপরি বন্দুকের গর্জন!

বিমল বললে, 'ছুড়ুক ওরা বন্দুক! স্বভাবতই ওরা ভাববে আমরা নদীর এদিক বা ওদিক দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি! কিন্তু কুমার, আমরা তা করব না! আমরা এই সাঁকোর তলা দিয়েই বারংবার ডুব-সাঁতার কেটে যে-দিক থেকে এসেছি, আবার সেই দিকেই চলে যাব! তারপর পায়ের কাছে যখন মাটি পাব, সেইখানেই আমরা গোপনে অপেক্ষা করব কিছুক্ষণ। সাঁকোর তলাটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আর ওরা কল্পনাও করতে পারবে না যে, যেদিক থেকে আমরা এসেছি আমরা আবার সেইদিকেই ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।'

এক-একবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়েই আবার ডুব-সাঁতার দিতে দিতে তারা হাজির হল সাঁকোর প্রান্তদেশে।

সাঁকোর তলায় নদীর জলের উপর বিরাজ করছে কালো ছায়া। সেইখানে তারা জলের উপরে কেবল নাক পর্যন্ত জাগিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে চুপ করে বসে রইল। সেই অবস্থায় থেকে তারা শুনতে পেলে বহু দ্রুতপদের শব্দ, চিৎকার এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ।

তারপরেই শোনা গেল অবলাকান্তের খনখনে কণ্ঠস্বর! সে বলে উঠল, 'ওরে, দরকার নেই আর এখানে গোলমাল করে! ওই হতভাগা ব্যাটাদের নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে বেশি মাথা ঘামাতে গেলে এখনই সত্য-সত্যই পুলিশ-ফৌজ এসে পড়বে! তার চেয়ে হাতে যা পেয়েছিস তাই নিয়েই এখন তাড়াতাড়ি লম্বা দেবার চেষ্টা কর!'

তৃতীয়

ঈশ্বর-প্রেরিত বৃষ্টি

তখন সবে প্রাতরাশ শেষ হয়েছে। সুন্দরবাবু মস্ত বড়ো একটা 'বার্মা-সিগার' ধরালেন। জয়ন্ত আলমারির ভিতর থেকে অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বই নিয়ে আবার নিজের সোফায় এসে বসল। মানিক টেনে নিলে খবরের কাগজখানা।

হঠাৎ সিঁড়ির উপর শোনা গেল একাধিক ব্যক্তির দ্রুত পদশব্দ। জয়ন্ত হাতের বইখানা

সামনের টেবিলের উপর রেখে মানিকের দিকে তাকালে জিজ্ঞাসু চোখে। মানিক তাকিয়ে রইল ঘরে ঢোকবার দরজার দিকে।

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল বিমল এবং কুমার। তাদের দুজনেরই চেহারা ছন্নছাড়ার মতো।

সুন্দরবাবু তাঁর মস্ত চুরোটে একটা জোর টান দিতে-দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিমল এবং কুমারের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম!'

জয়ন্তও তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'বিমলবাবু, কুমারবাবু! আপনাদের এ কী চেহারা? কী হয়েছে? আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

বিমল অত্যন্ত শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'আমরা আসছি যমালয় থেকে।'

—'মানে?'

—'মানে হচ্ছে এই যে, আমরা আবার গিয়ে পড়েছিলুম সেই অবলাকান্তের পাল্লায়।'

সুন্দরবাবু ধড়মড় করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের চুরোটটা দূরে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, 'বলেন কী, আপনারা আবার অবলাকান্তের দেখা পেয়েছেন নাকি?'

—'পেয়েছি বইকী! যথেষ্ট রূপেই পেয়েছি।'

—'হুম!'

—'আর একদিন অবলাকান্তের পাল্লা থেকে মুক্তি পেয়ে আপনি যেমন এইখানে এসেই হাজির হয়েছিলেন, আমরাও আজ এসেছি তেমনি ভগ্নদূতরূপেই।'*

সুন্দরবাবু মুখব্যাদান করে প্রায় দুই-তিন সেকেন্ড অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'অবলাকান্ত আবার সুন্দরবনের নদীতে নদীতে নৌবিহার আরম্ভ করেছে নাকি?'

—'না, এবারে সে সুন্দরবনের বাইরে স্থলপথে আবির্ভূত হয়ে রেলগাড়ি লুণ্ঠন করেছে। সেই গাড়িতেই ছিলুম আমরা, আমাদেরও সে গ্রেপ্তার করেছিল। রেলগাড়ি লুণ্ঠন বা আমাদের গ্রেপ্তার করা, কোনটা ছিল যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেকথা আমরা ঠিক করে বলতে পারি না।'

মানিক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'বলেন কী মশাই? অবলাকান্ত আপনাদেরও গ্রেপ্তার করেছিল? কিন্তু আপনারা মুক্তি পেলেন কেমন করে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে।'

—'কী-রকম?'

—'তাহলে আগে সব কথা শুনুন।'

তারপরে বিমল যে কাহিনি বললে, পাঠকদের কাছে তার অধিকাংশই বলেছি প্রথম পরিচ্ছেদে। কাজেই সেসব কথার আর পুনরুক্তি না করে এখানে কেবল তারপরের ঘটনা বিমলের ভাষাতেই তুলে দেওয়া হল

'সাঁকোর আচ্ছাদন মাথার উপরে রেখে আমি আর কুমার বারংবার ডুব-সাঁতার কাটতে

---

*'সুন্দরবনের রক্তপাগল' দ্রষ্টব্য।

কাটতে, যে-দিক থেকে এসেছিলুম সাঁকোর ঠিক সেই প্রান্তে গিয়ে পায়ের তলায় খুঁজে পেলুম পৃথিবীর মাটি।

'যে-কারণেই হোক, অবলাকান্ত তার দলবল নিয়ে আমাদের আর পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টা করলে না। খুব সম্ভব বেশি খোঁজাখুঁজি করবার সময় তার হাতে ছিল না, কেননা সেখানে রেলওয়ে-পুলিশের এসে পড়বার সম্ভাবনা ছিল যে-কোনও মুহূর্তেই। সাঁকোর উপরে ব্যস্ত পদশব্দ শুনে বুঝতে পারলুম, ডাকাতের দল দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল নদীর অন্য পারের দিকে।

'ঠিক সেই সময়েই নামল ঝমঝম করে প্রবল বৃষ্টির ধারা। সেই বৃষ্টিকে আমার মনে হল স্বর্গের অভাবিত আশীর্বাদের মতন। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, অবলাকান্ত তার দলবল নিয়ে আজ পালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার গুপ্ত আস্তানা আবিষ্কার করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমিও বুঝতে পেরেছি বিমলবাবু। সত্যসত্যই এ বৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বর-প্রেরিত।'

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'এই রে! দুই পাগলে আবার হেঁয়ালি শুরু করলে! বৃষ্টি তো চিরকালই ঈশ্বর-প্রেরিত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অবলাকান্তের আড্ডার সম্পর্কটা কী বাবা? হুম, তোমাদের কথার কিচ্ছু মানে হয় না।'

বিমল ও জয়ন্ত কোনও উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল।

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অবলাকান্তের আস্তানার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শুনেছেন তো, সে তার দলের শতাধিক লোক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তারা পাখি নয়, তারা হচ্ছে মানুষ।'

—'হুম, তারা যে পাখি নয় সেকথা আমিও জানি। আপনি আবার একটা নতুন হেঁয়ালির সৃষ্টি করলেন। এখানে হঠাৎ পাখির কথা উঠল কেন?'

—'অবলাকান্তরা হচ্ছে মানুষ। পাখির মতন তারা শূন্যপথ দিয়ে উড়ে পালাতে পারে না। স্থলপথ দিয়ে তাদের পালাতে হবেই, আর তাদের যেতে হবে এই পৃথিবীর মাটি মাড়িয়েই! এইবারে কিঞ্চিৎ আলোকিত হলেন কি?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! দুই চক্ষে আমি দেখছি গভীর অন্ধকার!'

মানিক সকৌতুকে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি যে অন্ধকারের বন্ধু সেটা আমরা চিরদিনই জানি! কিন্তু দয়া করে আজ একটিবার কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন না কেন?'

—'কী আবার বোঝবার চেষ্টা করব? আমি তোমাদের এসব হেঁয়ালির কোনও ধারই ধারি না। ধাঁধার জবাব দেবার বয়েস আমার নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ঠিক বালকের মতন কথা বলছেন। আপনার মতন পুরাতন পুলিশ-কর্মচারীর বোঝা উচিত যে, বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠ হয় কর্দমাক্ত। আর সেই ভিজে মাটির উপরে যারা পদচালনা করে যাবে, পৃথিবী তাদের সকলেরই পদচিহ্ন রক্ষা করবে সযত্নে। আমরা যদি অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হতে পারি,

তাহলে সেইসব পদচিহ্নের অনুসরণ করে অনায়াসেই খুঁজে বার করতে পারব ডাকাতদের গোপন আস্তানা। এখনও আমাদের কথা হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে কি?'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু ভাঁটার মতন করে তুলে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি ভাই জয়ন্ত, বুঝতে পেরেছি! এইবারে আমি স্বীকার করছি, এতক্ষণ আমি একটা আস্ত গাধার মতন কথা বলছিলুম! ঠিক বলেছ, ওই বৃষ্টিই অবলাকান্তের হাতে পরিয়ে দেবে চকচকে লোহার হাতকড়ি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আমাদের হাতে আর মোটেই সময় নেই। মাঠের উপর দিয়ে কত মানুষ কত জন্তু চলে বেড়ায়। আমরা যেসব পদচিহ্ন অনুসরণ করতে চাই, সেগুলো অদৃশ্য হতে বেশি দেরি লাগবে না। সুতরাং—'

বিমলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুতরাং অবিলম্বেই আমাদের ঘটনাস্থলে যাত্রা করা উচিত।'

'বিমলবাবু, ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোতে আমাদের কত দেরি লাগবে?'

—'ঘণ্টা আড়াই। কিন্তু যে ট্রেন আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, এখনও দেড় ঘণ্টার আগে সে কলকাতার স্টেশন ত্যাগ করবে না। ইতিমধ্যে আপনারাও প্রস্তুত হয়ে নিন, আমি আর কুমারও এই জামা-কাপড় ত্যাগ করে খানিকটা ভদ্রলোক সাজি আর কিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণ করে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠি, কী বলেন?'

জয়ন্ত বললে, 'তথাস্তু। সুন্দরবাবু, আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?'

—'হুম। যাব না আবার? ওই অবলাকান্ত ব্যাটা সুন্দরবনের নদীতে-নদীতে আমাকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। তার আগে আর পরেও সে আমাদের কম জ্বালিয়ে মারেনি। তাকে হাতের কাছে পেলে আমি তার আস্ত মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতে আপত্তি করব না। আমি এখনই বড়োসায়েবের কাছে ছুটলুম, অবলাকান্তরা দলে খুব ভারী শুনছি, সঙ্গে মিলিটারি পুলিশ থাকা দরকার।'

কুমার বললে, 'আর আপনাদের ওই মিলিটারি পুলিশের চেয়েও বেশি কাজ করতে পারবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা। পদচিহ্নের গন্ধ শুঁকতে সে হচ্ছে মস্তবড়ো ওস্তাদ! কী বলো বিমল, তাকেও সঙ্গে নেওয়া উচিত নয় কি?'

বিমল গাত্রোত্থান করে বললে, 'নিশ্চয়, সেকথা আবার বলতে!'

চতুর্থ

ঝরা ঘেসো ফুল

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি সদলবলে যখন আবার সেই নদী এবং সেতুর কাছে এসে দাঁড়াল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে।

সেতু পার হয়ে তারা নদীর অন্য তীরে গিয়ে উপস্থিত হল। সর্বাগ্রে মহা আনন্দে লাফাতে

লাফাতে ছুটে যাচ্ছে বাঘা, বোধহয় সে আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, আজ আবার কোনও একটা নতুন অভিযানের সূত্রপাত হবে।

বাঘার পরেই ছিল বিমল এবং জয়ন্ত। সেতুর অন্য প্রান্তে গিয়ে জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, পুলিশ-ফৌজ এখন সাঁকোর উপরই অপেক্ষা করুক। এখানকার মাটির উপরে আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে যত কম লোকের পদচিহ্ন পড়ে ততই ভালো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আজ সারাদিন ধরে এই সাঁকোর উপর দিয়ে স্থানীয় কত লোক যে আনাগোনা করেছে, তুমি কি সেটা হিসাব করে বলতে পারো?'

জয়ন্ত একবার মাঠের মাটির উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বিমলবাবু, যারা ট্রেন আক্রমণ করেছিল তাদের পায়ে জুতো ছিল কি না বলতে পারেন?'

বিমল বললে, 'আমি যত লোককে দেখেছি তাদের কারুরই পা খালি ছিল না।'

জয়ন্ত বললে, 'এ জায়গাটা দেখছি বেশ নির্জন। এখানে কাদার উপরে যতগুলো পায়ের দাগ রয়েছে, তার অধিকাংশই হচ্ছে খালি পায়ের দাগ। কয়েকটা জুতো-পরা পায়ের দাগও রয়েছে বটে, কিন্তু ওগুলো ডাকাতদের পায়ের দাগ নয় বলেই মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, 'আমারও সেই বিশ্বাস।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ-রকম বিশ্বাসের কারণ কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আসামিদের জুতোর দাগের ওপর কি 'ডাকাত' কথাটা ছাপ-মারা থাকবে?'

জয়ন্ত বললে, 'না সুন্দরবাবু, তা থাকবে না। কিন্তু আমি এখানে ডাকাতদের পায়ের দাগ দেখবার আশাই করি না।'

—'কেন? তারা সাঁকোর ওপর থেকে মাটিতে পা না ফেলে পাখির ঝাঁকের মতন কি হুস করে উড়ে পালিয়েছে?'

—'তাও নয়। কিন্তু আমি বিমলবাবুর মুখে শুনেছি, ডাকাতরা সাঁকো পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। তখনও এখানকার মাটি ভালো করে ভিজতে পারেনি, তাই এখানে ডাকাতদের পায়ের দাগ আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। ডাকাতদের দলে লোক ছিল নাকি শতাধিক। অতগুলো লোক এই মাঠের উপর দিয়ে যখন একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, তখন আর কিছুদূর এগুলে আমরাও তাদের পদচিহ্ন নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারব। এখানে যেসব পথিক পায়ের দাগ রেখে গিয়েছে, বৃষ্টি আসবার অনেক পরেই তাদের আবির্ভাব হয়েছিল।'

মাঠের উপর দিয়ে সকলে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আবার থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে পুরু ঘাস-ভরা জমি। এতক্ষণ কাদার উপরে যেসব পথিকের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছিল, সেগুলো পায়ে-চলা মেটে পথ ধরে সেইখান থেকে বেঁকে ডানদিক ধরে বরাবর চলে গিয়েছে। কিন্তু সে পথের উপরে তখনও কোনও বৃহৎ জনতার পদচালনার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'কী আশ্চর্য, ডাকাতগুলো তবে কি সত্যিসত্যিই মাটিতে পদার্পণ না করেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! কী হে জয়ন্ত, কাল বৃষ্টি

পড়েছিল বলে তোমরা তো খুব খুশি হয়ে উঠেছিলে, কিন্তু এখন কোথায় গেল ডাকাতদের পায়ের দাগ?'

জয়ন্ত বললে, 'আপনারা এখানেই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, মাঠের ঘাসের উপর দিয়ে আমি একবার এদিক-ওদিক ঘুরে আসি।' বলেই সে মুখ নামিয়ে নতদৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে মাঠের উপর দিয়ে নানাদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মাঝে মাঝে সে আবার মাটির উপরে বসে পড়ে এবং কখনও-বা দস্তুরমতন হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! দ্যাখো একবার জয়ন্তের কাণ্ড! মাঠের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে ও কী করছে বলো দেখি মানিক?'

মানিক বললে, 'বোধহয় ঘাস খাবার চেষ্টা করছে।'

হঠাৎ দূর থেকে জয়ন্ত সানন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'পেয়েছি, পেয়েছি! আপনারা সবাই এইখানে আসুন।'

সকলে যখন তার কাছে গিয়ে হাজির হল, জয়ন্ত প্রফুল্লভাবে বললে, 'গোড়াতেই আমি আন্দাজ করেছিলুম যে, কাঁচা মেটে পথ দিয়ে নিরীহ মানুষরা আনাগোনা করে, ডাকাতরা নিশ্চয়ই সে-পথের পথিক হবে না। কারণ, কাছাকাছি কোনও লোকালয়ে নিশ্চয়ই তাদের আস্তানা নেই। অপথ, বিপথ কিংবা কুপথ দিয়ে তারা নিশ্চয়ই যাবে এমন কোনও বিজন নিরালা জায়গায়, যেখানে পৃথিবীর সাধারণলোকের দৃষ্টি থেকে সহজেই নিজেদের আড়ালে রাখা যায়। এই পথহীন মাটের উপরে আমি তাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছি। এই দেখুন!' সে মাঠের উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সুন্দরবাবু এধারে-ওধারে দৃষ্টি চালনা করে বললেন, 'ধ্যাত, যতসব বাজে কথা! কোথা এখানে পায়ের দাগ?'

জয়ন্ত বিমলের দিকে ফিরে বললে, 'আপনি কিছু বুঝতে পারছেন কি?'

বিমল হেসে বললে, 'পারছি বইকী! এখানকার ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে অনেক লোক এগিয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। দেখুন সুন্দরবাবু, মাঠের এই অংশের জমির উপরের ঘাসগুলো কত বেশি নেতিয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, ভারী-ভারী পায়ের চাপে অনেক ঘাসই কাল মাটির উপরে একেবারে শুয়ে পড়েছিল, আজও তারা আর খাড়া হয়ে উঠতে পারেনি। কত ঘেসো ফুল একেবারে পিষে মরে গিয়েছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন কি? অথচ একটু এপাশে আর ওপাশে ঘুরে এসে দেখুন, সেখানকার ঘাসগুলো কেমন সজীব ও সতেজভাবে খাড়া হয়ে হাওয়ায় দুলছে, তাদের একটা ফুলও খসে পড়েনি!'

সুন্দরবাবু লজ্জিত-কণ্ঠে বললেন, 'তাই তো, সত্যিই তো। এসব তো আমারও লক্ষ করা উচিত ছিল!'

মাঠের জমির ঘাস যেখানে নিস্তেজ বা ফুল ঝরিয়ে মাটির উপরে শুয়ে পড়েছে সেইখান দিয়ে সকলে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। জয়ন্তের কথায় সুন্দরবাবু সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীকেও পিছনে পিছনে আসবার জন্যে ইশারা করলেন।

পঞ্চম

ভিজে আর শুকনো পায়ের দাগ

মাঠের প্রান্তে ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নিবিড় এক অরণ্য। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল দিকচক্রবাল-রেখাকে আচ্ছন্ন করে সেই অরণ্যের উপরে পাহারা দিচ্ছে বিপুলদেহ বনস্পতির দল। এক-একটি বৃক্ষ আবার তাল-নারিকেল-কুঞ্জেরও মাথা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পত্রবহুল অসংখ্য বাহুর দ্বারা যেন বন্দি করবার জন্যে শূন্যতাকেই।

সকলে যখন সেই মাঠের প্রান্তদেশে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল সেখানে এমন একটি মেটে পথের রেখা রয়েছে, যার উপরে তৃণদের শ্যামল আবরণ আর নেই।

অরণ্যের বক্ষ ভেদ করে সোজা চলে গিয়েছে সেই পথের রেখা।

কুমার বললে, 'বাঃ, পায়ের দাগগুলো এইবারে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! একজন নয়, দুজন নয়, পথের দুদিক জুড়ে অগুন্তি লোকের পায়ের দাগ!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা, বাঁচা গেল! শুয়ে-পড়া মরা ঘাস আর ঝরা ঘেসো-ফুল দেখে আসামিদের পিছু নেওয়া কী চাট্টিখানেক কথা? এতক্ষণ আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ভাবছিলুম জয়ন্ত আমাদের ধাপ্পা মারছে। কিন্তু আর সন্দেহ করবার কোনও উপায়ই নেই, এই পায়ের দাগগুলো নিশ্চয়ই আমাদের যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। চলো, অগ্রসর হও!'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'ঘাসের উপরে সূক্ষ্ম প্রমাণ দেখে সুন্দরবাবু যে খুশি হচ্ছিলেন না, সেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে টের পাচ্ছিলুম। তা খুশি হবেন কেমন করে? মোটা দেহ আর মোটা বুদ্ধি দিয়ে ভগবান এমন অনেক জীবকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, মোটা প্রমাণ না পেলে যারা মোটামুটি কিছুই বুঝতে পারে না!'

সুন্দরবাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তুমি জানো মানিক, আমরা চলেছি এখন দস্যু-বাহিনীর সঙ্গে জীবন পণ করে যুদ্ধ করতে? এই কি হালকা আর পলকা ঠাট্টা করবার সময়? তোমার স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই?'

মানিক আবার সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে সুন্দরবাবুকে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চলুন, চলুন! এখানে দাঁড়িয়ে এখন কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই। শিগগির এগিয়ে চলুন!'

আবার সবাই হল অগ্রসর। পথের দুই-ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের দল এমনভাবে দুই দিক থেকে শাখা-বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, উপরদিকে তাকালে দেখা যায় না আর সমুজ্জ্বল নীলাকাশকে—দেখা যায় কেবল ছায়া-ভরা মর্মরিত সবুজ পত্রদের চন্দ্রাতপ।

লাঙুলকে পতাকার মতন ঊর্ধ্বে তুলে সর্বাগ্রে সগর্বে এগিয়ে যাচ্ছিল বাঘা এবং তারপরেই জয়ন্ত। সে বললে, 'সবাই চটপট পা চালিয়ে দিন! এখনও দিনের আলো আছে, এখনও বনের ভিতরে নজর চলছে। অন্ধকারে অন্ধ হবার আগেই আমাদের অবলাকান্তের আস্তানায় গিয়ে হাজির হতে হবে।'

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে সবাই এগিয়ে চলল দ্রুতপদে।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখুন বিমলবাবু, দেখুন! পায়ের দাগগুলো এইখানে মোড় ফিরে আরও সরু একটা পথ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে!' তারপর হেঁট হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'কিন্তু একী ব্যাপার, এ কী?'

বিমলও মাটির দিকে হেঁট হয়ে ভালো করে দেখে বললে, 'ব্যাপার কী জয়ন্তবাবু? যে পায়ের দাগগুলো বাঁদিকের ওই সরু পথের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, সেগুলোকে মাড়িয়ে আরও অসংখ্য পায়ের দাগ আবার বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে!'

কুমার বললে, 'পদচিহ্নগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে এসে বাঁদিকে—অর্থাৎ আমরা যে পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছি এই পথ ধরেই সোজা চলে গিয়েছে! এরই বা মানে কী?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ধ্যাত, মানে আবার কী? ডাকাত-ব্যাটারা কাল কোনও কারণে একবার ওই বাঁদিকের পথ ধরে জঙ্গলের ভিতরে গিয়েছিল, তারপর আবার বেরিয়ে এসে আমরা যে বড়ো পথের উপরে দাঁড়িয়ে আছি সেইটে ধরেই আবার এগিয়ে গিয়েছে নিজেদের আড্ডার দিকে।'

জয়ন্ত নীরবে সেইখানে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি যা ভাবছেন, সেটা ঠিক নয়!'

—'কেন, বেঠিকটা কোনখানে?'

—'ভালো করে চেয়ে দেখুন। আমরা এতক্ষণে যে পায়ের দাগগুলো দেখে এগিয়ে আসছিলুম, আর যেগুলো মোড় ফিরে ওই বাঁদিকের সরু পথের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, তাদের অনেকগুলোই ভিজে মাটির ভিতরে চেপে বসে গিয়েছে। এখানে রোদ আসে না বলে ওইসব পদচিহ্নের উপর থেকে এখনও বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়নি। দেখুন, এক-একটা পদচিহ্ন কত গভীরভাবে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে—এর মানে হচ্ছে, এগুলো হৃষ্টপুষ্ট সুবৃহৎ দেহের পায়ের দাগ। এগুলোর মধ্যে এখনও কিছু-কিছু বৃষ্টির জল জমে আছে। কিন্তু যে পায়ের দাগগুলো বাঁদিকের ওই সরু পথটার ভিতর থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে এসে এই বড়ো পথটা ধরে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে জলের কোনও চিহ্নই নেই। এথেকে আমাদের কী বুঝতে হবে বলুন দেখি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! বুঝতে হবে ঘোড়ার ডিম! শুকনো আর ভিজে পায়ের দাগ—খালি হেঁয়ালি, খালি হেঁয়ালি!'

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, হেঁয়ালি বোঝাই হচ্ছে গোয়েন্দার ব্যাবসা। যদি অপরাধ না নেন তো, ব্যাপারটা কী হয়েছে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন, 'হাতি গেল, ঘোড়া গেল, ভেড়া বলে কত জল! আমি হচ্ছি পুরোনো পুলিশের লোক, আর আপনি পুলিশও নন, জয়ন্তের মতন শখের গোয়েন্দাও নন, আপনি আবার আমাকে কী বোঝাতে চান?'

বিমল হাসতে-হাসতে শান্ত স্বরেই বললে, 'না সুন্দরবাবু, আপনার কাছে আমি কিছুই

নই! আপনার মতন মাতঙ্গের কাছে আমি হচ্ছি সামান্য একটা পতঙ্গ মাত্র! তবে কী জানেন, মুনিরও মতিভ্রম হয়।'

সুন্দরবাবু আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার মতিভ্রমটা হল কোথায়, সেইটেই আমি জানতে চাই?'

—'চেয়ে দেখুন সুন্দরবাবু। এতক্ষণ আমরা যে পায়ের দাগগুলো অনুসরণ করছিলুম, তাদের অনেকগুলোর ভিতরে যে বৃষ্টির জল জমে আছে, জয়ন্তবাবু তো সেটা এখনই আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এর অর্থ কী তাও আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাল বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ডাকাতের দল এই পথ ধরে এগিয়ে এসেছিল, তারপর তারা ঢুকেছিল বাঁদিকের পথ ধরে ওই জঙ্গলের ভিতরে। কিন্তু তখনও বৃষ্টি পড়ছিল, তাই ওই পদচিহ্নগুলোর উপরে এখনও অল্প-বিস্তর বৃষ্টির জল জমে আছে। কিন্তু যে পদচিহ্নগুলো ওই বাঁদিকের ছোটো পথ ধরে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার এই বড়ো পথ ধরেই আমাদের সামনের দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে একেবারে শুকনো। এখানকার মাটি ভিজে, তাই এই ভিজে মাটির উপরে পদচিহ্ন পড়েছে বটে, কিন্তু আমাদের এই সামনের দিকের পদচিহ্নগুলোর কোনটার ভিতরেই যখন বৃষ্টির জল জমে নেই, তখন বুঝতে হবে যে, এই পদচিহ্নগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, বৃষ্টি থেমে যাবার পরেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ তো, তাতে হয়েছে কী?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাঁদিকের ওই সরু পথের ভিতর দিয়ে এই যে অসংখ্য শুকনো পদচিহ্ন আবার বাইরে এসে বড়ো পথটা ধরেই সোজা এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটাই কত গভীরভাবে মাটির ভিতরে বসে গিয়েছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, গেলই বা মাটির ভিতরে গভীরভাবে বসে, তা নিয়ে আমাদের এতটা মাথা-ব্যথা হবার কারণ কী?'

জয়ন্ত বিরক্ত-কণ্ঠে বললে, 'কারণ কী জানেন? এই নতুন শুকনো পায়ের দাগগুলো হচ্ছে এমন একদল লোকের, যারা ওই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণপণ বেগে ছুটে আবার এই বড়ো পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে। মানুষ যখন খুব বেগে ছোটে তখন প্রত্যেক পদেই তাকে লাফ মারতে হয়। আর সেইজন্যেই তখন তার পদচিহ্ন গভীরভাবে বসে যায় ভিজে মাটির ভিতরে।'

—'হুম! তোমাদের এই আবিষ্কারে নতুনত্ব আছে। তারপর?'

এইবারে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রীতিমতো ক্রুদ্ধ। সে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি বোঝালেও যদি না বোঝেন, তাহলে আমাদের হার মানতে হয়! আপনাকে বোঝাবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি, আমরা এসেছি এক দুর্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে। এখানকার মাটি ভিজে না হলে আমরাও কিছুই বুঝতে পারতুম না, কারণ তাহলে সামনের দিকের এই নতুন পদচিহ্নগুলো আমাদের কারুরই চোখে পড়ত না। কিন্তু মাটি ভিজে বলেই আন্দাজ করতে পারছি যে, একদল লোক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছুটে চলে গিয়েছে! তাদের এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কী? নিশ্চয়ই তারা কোনও-কিছু বিভীষিকা দেখেছে! কী সেই বিভীষিকা?'

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে বাঁহাতে টুপি খুলে ডানহাতে মাথা চুলকোতে লাগলেন নীরবে।

কুমার বললে, 'বিভীষিকা হচ্ছি আমরা! নতুন ওই পায়ের দাগগুলো যখন সজল নয়, তখন খুব সম্ভব ওগুলোর সৃষ্টি হয়েছে আজকে—হয়তো একটু আগেই!'

মানিক বললে, 'ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! আমরা যে সদলবলে এই বনের ভিতরে এসে ঢুকেছি, কাতরা সেটা আগেই টের পেয়েছে! তারা তাই ওই বাঁদিকের সরু পথ দিয়েই বেরিয়ে এই বড়ো পথটা ধরে ছুটে চম্পট দিয়েছে!'

সুন্দরবাবু ভেঙেও মচকাবার পাত্র নন। বললেন, 'চম্পট দিয়ে যাবে কোথায়? তাদের পায়ের দাগগুলো তো এখনও ওই মাটির উপরেই আঁকা আছে? তারা কালকেই পালাক আর আজকেই পালাক, দাগগুলো তো তারা আর মুছে দিয়ে যেতে পারেনি! সুতরাং তোমাদের এসব গবেষণার কোনও অর্থই হয় না। চলো, আমরা এই শুকনো পায়ের দাগগুলো ধরেই সামনের দিকে এগিয়ে যাই!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি হচ্ছেন অসম্ভব মানুষ! যুক্তির দ্বারা আপনাকে দমাতে পারে এমন পাষণ্ড বোধহয় ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণ করেনি! দাদা, একবার পায়ের ধুলো দিন!'

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'মানিক হে, তুমিই আমাকে চিনতে পেরেছ! যাক, আজ আর তোমার কথায় রাগ করব না!'

মানিক বললে, 'ধন্যবাদ!'

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'বাজে কথায় সময় কাটাবার সময় নেই। আমরা যতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করব, ততক্ষণে ডাকাতরা আরও—আরও দূরে গিয়ে পড়বে! পায়ের দাগ অত্যন্ত স্পষ্ট—এই দাগ দেখেই আমাদের এখন ছুটে এগিয়ে যেতে হবে!'

সর্বাগ্রে বাঘাই যেন বুঝতে পারলে জয়ন্তের কথা। ঘন-ঘন লেজ নাচিয়ে সামনের দিকে মারলে সে এক লম্বা দৌড়।

ষষ্ঠ

খ্রিস্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধ-কৌশল

দুধারে প্রায় যেন নিরেট জঙ্গলের প্রাচীর, তারই মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে তাজা পায়ের-দাগ-আঁকা সেই পথটা।

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি প্রায় মিনিট-দশ ধরে অগ্রসর হয়েও দেখলে, সেখানকার কাঁচা মাটি তখনও পদচিহ্নগুলোর ছাঁচ তুলেছে তেমনি গভীর রূপেই। বোঝা গেল ডাকাতরা এতদূর এগিয়েও তাদের দ্রুতগতি বন্ধ করেনি।

সুন্দরবাবু ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বাপ-রে, আমার এই দেহ নিয়ে এত দৌড়োদৌড়ি কি পোষায় বাবা?'

মানিক ছুটতে ছুটতেই চোখ মটকে বললে, 'কেন পোষাবে না মশাই? আপনি তো হাতির ছোট্ট সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নন। হাতিরা যে তাদের অমন ভারী আর বিরাট দেহ নিয়ে বিলক্ষণ ছোটাছুটি করতে পারে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, এইবারে তুমি ঠকলে! যখন-তখন তুমি আমাকে হাতি বলে গালাগাল দাও। আজ তোমার নিজের কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি মোটেই হাতি নই। কারণ হাতি হলে আমিও খুব ছোটাছুটি করতে পারতুম।'

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, 'সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন! পায়ের দাগগুলো আর সামনের দিকে এগোয়নি, এখান থেকেই বেঁকে ডানপাশের ওই জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। এখন আমাদের কী করা উচিত বিমলবাবু? চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, একটু পরেই আমাদের চোখও অন্ধ হয়ে যাবে।'

বিমলের জবাব দেওয়ার আগেই আচম্বিতে অরণ্য কাঁপিয়ে কোথা থেকে গর্জন করে উঠল কয়েকটা বন্দুক! সকলকার মাথার উপর দিয়ে কতকগুলো বুলেটও যে সশব্দে বাতাস কেটে ছুটে চলে গেল, তা বুঝতেও কারুর দেরি হল না!

জয়ন্ত আবার চিৎকার করে বললে, 'ওই ডানপাশের বনের ভিতর থেকে গুলি ছুটে আসছে! আমাদের বধ করবার জন্যে ডাকাতরা এইখানে ফাঁদ পেতে রেখেছে! সবাই ডান-পাশের বনের দিক মুখ করে মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর হতভাগাদের বুঝিয়ে দিন যে, আমাদেরও বন্দুকের অভাব নেই!'

বিমল তাড়াতাড়ি বললে, 'কুমার, জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু, আসুন আমরা চারজন মাটির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে এই পথটা ধরেই সোজা এগিয়ে যাই!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'কেন বিমলবাবু? ওদিকে তো ডাকাতদের পায়ের দাগ নেই, ও-দিকে গিয়ে আমরা কী করব?'

বিমল বললে, 'এখন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। কেবল জেনে রাখুন, আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে।'

বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে সেই পদচিহ্নহীন পথ ধরে যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু তাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'হুম। বিপদ দেখে কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তোমরাই আবার 'অ্যাডভেঞ্চার' চাও? গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? আরে ছোঃ!'

বিমল, জয়ন্ত ও কুমার হাসতে লাগল, কিন্তু দুষ্টু মানিক সেইভাবে যেতে যেতেই পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'জয়, বীরপুরুষ সুন্দরবাবুর জয়! আপনার মতন বীরপুরুষের কাছে আমাদের মতন কাপুরুষদের থাকা উচিত নয় বলেই তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ছি!'

সুন্দরবাবু বোধ করি কী-একটা খুব কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনই ওদিক থেকে তেড়ে এল আর এক-ঝাঁক উত্তপ্ত বুলেট! একটা বুলেট তাঁর মাথা বাঁচিয়েও টুপির উপর দিকটা ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল। দুই চক্ষে অগণ্য সর্ষেফুল দেখে এবং 'বাপ' বলে চিৎকার করে তিনি তখনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর বিপুল ক্রোধে চিৎকার করে বললেন, 'এই সেপাই! চালাও গুলি, চালাও গুলি! শুয়োরের বাচ্চাদের বুঝিয়ে দাও, আমাদের কাছে ওদের চেয়ে ঢের বেশি বন্দুক আছে!'

সেপাইরা তাঁর আগেই বুদ্ধিমানের মতন ভূমির উপরে লম্বমান হয়েছিল। তারাও অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশে বারংবার বন্দুক ছুড়তে শুরু করলে।

দুই পক্ষে বন্দুকের চিৎকারে সেই বনভূমির শান্তিপূর্ণ আবহ যখন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা।

হঠাৎ বিমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ব্যাস, আর আমাদের চতুষ্পদ জন্তুর মতন পথ চলতে হবে না! শত্রুদের গুলিগুলো ছুটোছুটি করছে এখান থেকে অনেকদূরে। এইবারে আমরাও দুই পদে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা কইতে পারি।'

জয়ন্ত উঠে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'এতক্ষণে আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি।'

বিমলও সহাস্যে বললে, 'কী বুঝতে পেরেছেন বলুন না!'

—'এইবারে আপনি এই ডানদিকের বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চান, তাই নয় কি?'

—'ঠিক! তারপর?'

—'ডানদিকের এই বনের ভিতরে ঢুকে আমরা যদি সোজাসুজি খানিকটা এগিয়ে যাই, তাহলে হয় শত্রুদের পিছনে নয় পাশে গিয়ে পড়তে পারব।'

—'তারপর?'

—'আমরা যে এইভাবে লুকিয়ে তাদের পিছনে বা পাশের দিকে এসে হাজির হয়েছি, শত্রুরা নিশ্চয়ই সে-সন্দেহ করতে পারবে না। ইতিহাসে পড়েছি, এই রকমই একটা উপায়ে গ্রিসের আলেকজান্ডার দি গ্রেট নাকি ভারতের মহারাজা পুরুকে কাবু করে ফেলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে আপনি সেই খ্রিস্ট-পূর্বযুগের যুদ্ধ-কৌশলকে কাজে লাগাতে চান।'

—'কিন্তু এটা যুদ্ধ নয় জয়ন্তবাবু, এটা হচ্ছে তুচ্ছ দাঙ্গারই সামিল।'

—'খ্রিস্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে কী মনে হয় জানেন বিমলবাবু?'

—'কী মনে হয়, বলুন।'

—'এই আণবিক বোমার যুগে পৃথিবীতে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, খ্রিস্ট-পূর্ব যুগের যুদ্ধ ছিল তারও চেয়ে তুচ্ছ!'

—'কিন্তু এ-যুগের বড়ো-বড়ো যুদ্ধেও প্রকাশ পায় কেবল তথাকথিত যোদ্ধাদের কাপুরুষতা। শত্রুদের দেখতে পায় না, তবু গর্তের ভিতরে লুকিয়ে এ-যুগের যোদ্ধারা ছোড়ে খালি বন্দুকের পর বন্দুক—লড়াই করে যেন তারা বাতাসের সঙ্গে। কিংবা বিমানপোত নিয়ে শূন্যে ওড়ে বিপদের সীমানা ছাড়িয়ে, তারপর অশ্রুতপূর্ব নিষ্ঠুরতা আর কাপুরুষতার প্রমাণ দেবার জন্যে অসামরিক, নির্দোষ, আবালবৃদ্ধবনিতার উপরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে বাস করে এমন এক বৃহৎ নগর-কে-নগরকেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করে দেয়! কিংবা তারা ডুবোজাহাজ নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব মেরে সামরিক হোক আর অসামরিক হোক যে-কোনও জাহাজকেই গুপ্ত উপায়ে অতলে তলিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করে! কিন্তু সেকালের যুদ্ধে প্রকাশ পেত মানুষের বীরত্ব আর রণকৌশল। তখনকার যোদ্ধাদের লড়াই করতে হত শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যার শক্তি আর নিপুণতা বেশি, জয়ী হত সেই-ই। এই মধ্যযুগের মহাবীর তৈমুরলংয়ের জীবনচরিত পড়েছেন?'

—'না, কিন্তু বিমলবাবু, এখন—'

বিমল বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'তৈমুরলং গিয়েছেন, এক মস্ত-বড়ো রাজার দুর্ভেদ্য কেল্লা দখল করতে। দুই পক্ষেই সৈন্যসামন্তের সংখ্যা নেই।—বিশেষত তৈমুরের সঙ্গে ছিল এমন-এক বিপুল বাহিনী, সে-যুগের রুশিয়াকে পর্যন্ত যে বাহিনীর মহাবীরেরা অনায়াসেই পায়ের তলায় নত করতে পেরেছিল—উনিশ শতকের নেপোলিয়ন বা বিশ শতকের হিটলার পর্যন্ত যা করতে পারেনি। তবু তৈমুর তাঁর অপরাজেয় বাহিনীর উপর নির্ভর করলেন না, ঘোড়ার পিঠে চড়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চললেন বিপক্ষের দুর্গ-তোরণের দিকে। তাঁর সেনাপতিরা সভয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলেন, 'সুলতান, আমরা যখন এখানে রয়েছি, তখন আমাদের পিছনে রেখে আপনি কেন এগিয়ে যাচ্ছেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে? আপনার যদি কিছু হয়, তাহলে আমরা থাকব কোথায়?' তৈমুর তরবারি কোষমুক্ত করে শূন্যে বিদ্যুৎ নাচিয়ে বললেন, 'তোমরা সরে

দাঁড়াও আমার সুমুখ থেকে! যে আমাকে বাধা দেবে তাকেই আমি হত্যা করব।' তৈমুরের চক্ষে কঠিন প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত দেখে সেনাপতিরা ভীত ভাবে তাঁর নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তৈমুরের ঘোড়া মাটির উপরে খুরের আঘাতে ধূলি উড়িয়ে সিধে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল বিপক্ষদের দুর্গ-তোরণের সামনে। দুর্গ-প্রাকারের উপরে নানান-রকম নিষ্ঠুর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল হাজার হাজার শত্রুসৈন্য। একাল হলে তারা নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তে তৈমুরকে বধ করত। কিন্তু তারা তা করলে না, নির্বাক বিস্ময়ে তৈমুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ মূর্তির মতো। দুর্গ-তোরণের সামনে গিয়ে তৈমুর ঊর্ধ্বমুখে চিৎকার করে বললেন, 'যুদ্ধ এখনই হতে পারে, আর যুদ্ধ হলে দুই পক্ষের অনেক মানুষের প্রাণও যাবে। শেষ পর্যন্ত আমি যে এই কেল্লা ফতে করব সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! কিন্তু অত-বেশি গোলমালে দরকার কী? এই দুর্গ-তোরণ দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলো তোমাদের নায়ককে—আমি এখানে একলা এসেছি, সেও এখানে থাকবে একলাই। লড়াই করুক সে কেবল আমার সঙ্গে। যে হারবে, তার পক্ষকে সেই পরাজয়কেই সকলের পরাজয় বলে স্বীকার করে নিতে হবে!'...জয়ন্তবাবু, আমি একেই বলি বীরত্ব—একালের যুদ্ধ যে-বীরত্বকে স্বীকার করে না।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আপনি চমৎকার প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু আজ এইখানেই এ-প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেওয়াই নিরাপদ! ওদিকে ঘন ঘন বন্দুকের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন না?'

উত্তেজিত হয়ে বিমল সত্য-সত্যই স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়েছিল। জয়ন্ত আজকের কথা মনে করিয়ে দিতেই সে অত্যন্ত লজ্জিত স্বরে বললে, 'মাপ করবেন জয়ন্তবাবু, মাপ করবেন! ছেলেমানুষের মতন আমি গাইছিলুম ধান ভাঙতে শিবের গীত! ছিঃ ছিঃ, আমাকে ধিক!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন নিজেকে ধিক্কৃত করবারও সময় নয়। আপনারই নির্দেশে আমরা এদিকে এসেছি। এখন কী করতে হবে বলুন?'

বিমল তৎক্ষণাৎ অতি-জাগ্রত হয়ে ডানদিকের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে এগুতে এগুতে বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে! আগে খানিকটা এগিয়ে দেখি, তারপরই বুঝতে পারব আমার অনুমান সত্য কি না।'

সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ বলে কোনও-কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ঝোপ-ঝাপ সরিয়ে, কাঁটাগাছে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে, কখনও দাঁড়িয়ে কখনও-বা হামাগুড়ি দিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল কোনওরকমে। ওদিকে তখনও দুইপক্ষের বন্দুক দুই-পক্ষের শত্রুদের দিচ্ছিল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচণ্ড ধমকের পর ধমক!

অবশেষে তারা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াল, যার পরেই আছে সাত-আট-হাত গভীর এবং সাত-আট-হাত চওড়া একটা সুদীর্ঘ খানা। গতকল্যকার বৃষ্টি খানার তলায় জমিয়ে রেখেছে হাত-দেড়েক গভীর জল।

বাঘা তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। খানার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল সে সর্বাগ্রে। তারপরেই বিমল খানার ভিতরে গিয়ে অবতীর্ণ হল। একদিকে তাকিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটতিনেক।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বাকি সবাইকেও খানার ভিতরে নামবার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করলে।

জয়ন্ত, কুমার ও মানিকও খানার ভিতরে গিয়ে নামল। তারপর বিমলের ইঙ্গিতে একদিকে তাকিয়ে যা দেখলে, তা হচ্ছে এই

খানাটা লম্বালম্বি অনেকদূর অগ্রসর হয়ে হারিয়ে গিয়েছে কোথায়, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। খানার দুই তীরেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো-বড়ো গাছের পর গাছ। তাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে সেইসব গাছের উপরে ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছিল অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা!

খানার ভিতরে বড়ো-বড়ো সব আগাছা এখানে-ওখানে তৈরি করেছিল রীতিমতো ঝোপঝাপ। বিমলের দেখাদেখি বাকি তিনজনও সেই-রকম এক-একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলে।

বিমল অনুচ্চ স্বরে বললে, 'ডাকাতরা গাছের উপরে চড়ে পুলিশবাহিনীর উপরে গুলিবৃষ্টি করছে! ওরা আমাদের বন্দুকের সীমানার মধ্যেই আছে। আমরা চারজনেই 'অটোমেটিক' বন্দুক নিয়ে এসেছি—এগুলো ওদের অস্ত্রের চেয়ে ঢের-বেশি শক্তিশালী আর অল্প সময়ের মধ্যেই অশ্রান্তভাবে ঢের-বেশি গুলি বৃষ্টি করতে পারে। সকলে তৈরি হয়ে থাকো। গাছের উপরের শত্রুদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওখানে যখনই বন্দুকের আগুন জ্বলবে তখনই আন্দাজে শত্রুদের উদ্দেশে গুলির পর গুলি চালাও! কেউ একবারও থেমো না, শত্রুরা মনে করুক তাদের পিছনদিক থেকেও অনেক পুলিশের লোক আক্রমণ করতে এসেছে।'

মিনিট-খানেক পরই 'অটোমেটিক' বন্দুকগুলো শত্রুদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল ভয়াবহ ও অশ্রান্ত আগ্নেয় ভাষায়!

উপরি-উপরি জেগে উঠল কয়েকটা বিকট আর্তনাদ! 'অটোমেটিক' বন্দুকদের বুলেট তাহলে অদৃশ্য শত্রুদেরও সন্ধান পেয়েছে!

বিমল উৎসাহ-ভরে বলে উঠল, 'চালাও, আরও তাড়াতাড়ি গুলি চালাও! ওরা ভেবে নিক দলে আমরা দস্তুরমতো ভারী!'

বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক মহা উৎসাহে বন্দুক ছুড়তে আরম্ভ করলে। তাদের আধুনিক বন্দুকগুলো ধূম্র উদ্গীরণ করছিল না, সুতরাং এই নতুন আক্রমণকারীরা যে কোথায় অবস্থান করছে ডাকাতরা সেটাও আন্দাজ করতে পারলে না।

মিনিট তিন-চার পরেই গাছের উপরকার সমস্ত বন্দুক একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। খুব সম্ভব, দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ডাকাতরা গাছের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে যে-যেদিকে পারলে পলায়ন করলে।

বিমলরাও আর বন্দুক ছুড়লে না। সেইখানে চুপ করে বসে রইল প্রায় দশ মিনিট। তখনও দূর থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল পুলিশের বন্দুকগুলোর শব্দ। তারপর পুলিশদের বন্দুকও হয়ে গেল বোবা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও সেখানে রীতিমতো ঘনীভূত হয়নি বটে, কিন্তু আট-দশ হাত দূরে চোখ আর চলছিল না। আট-দশ হাত ভিতরেও যা দেখা যাচ্ছে সবই ঝাপসা ঝাপসা।

মাথার উপরে আকাশের বুকে মাঝে মাঝে তখনও একটু-আধটু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে আলো দূর করতে পারছিল না পৃথিবীর আসন্ন অন্ধতাকে।

জয়ন্ত বললে, 'শত্রুরা পালিয়েছে। বিমলবাবু, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুন, এই নোংরা ঘোলা জল ছেড়ে আপাতত আমরা খানার উপরে গিয়ে ওঠবারই চেষ্টা করি।'

যেদিক থেকে সকলে এসেছিল তারা আবার খানার সেই তীরে গিয়েই উঠল।

জয়ন্ত বললে, 'আর এখানে থেকে লাভ কী? আজ আর ডাকাতদের ধরা অসম্ভব। এখন বোধহয় যেখান থেকে এসেছি সেইখানেই গিয়েই দেখা উচিত, সুন্দরবাবু কতখানি বীরত্ব প্রকাশ করছেন।'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছেন। আজ আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল! চলুন, আমরা যেখানকার মানুষ সেইখানেই ফিরে যাই।'

সকলে যে অপথ বা বিপথ দিয়ে এসেছে, ঘন জঙ্গল ভেদ করে কখনও দাঁড়িয়ে এবং কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে আবার সেই দিকেই চলতে লাগল।

তারা মিনিট-তিনেক এইভাবে অগ্রসর হবার পর আচম্বিতে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা! অন্ধকার ভেদ করে আবির্ভূত হল দলে দলে অস্পষ্ট সব যমদূতের মতন মূর্তি এবং তারা কেউ কিছু বোঝবার আগেই সেই মূর্তিগুলো তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল বিক্রমে! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাদের নিষ্ঠুর বাহুবন্ধনে বন্দি হল বিমল ও জয়ন্ত, কুমার ও মানিক! বিমলরা কেউ একখানা হাত পর্যন্ত তোলবার সুযোগ পেলে না!

তারপরেই খনখনে নারী-কণ্ঠে জেগে উঠল সেই সুপরিচিত তীক্ষ্ণ অট্টহাসি। খিলখিল-খিলখিল করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ একটা তীব্র কণ্ঠস্বর বললে, 'আজ আমার অনেকদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হল! আজ গ্রেপ্তার করেছি একসঙ্গে চারজনকে! আজ আমার সমস্ত বুক নেচে উঠছে উৎকট আনন্দে! কী হে বিমল-গাধা, কী হে জয়ন্ত-ছুঁচো, আমি কে তা বুঝতে পারছ?'

বিমল শান্তকণ্ঠে বললে, 'বিশ্রী অবলাকান্ত, তোমার গলা শুনলে কালা ছাড়া সবাই তোমাকে চিনতে পারবে।'

অবলাকান্ত আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'হ্যাঁ রে গাধা, ঠিক তাই! আমার বাইরে এক রূপ, ভিতরে আর এক রূপ। ভগবান জানতেন দুনিয়ায় এসে আমি কী করব, তাই আমার ভিতরের রূপ ঢাকবার জন্যে আমি পেয়েছি নারীর কণ্ঠস্বর আর মেয়েলি একটা নাম—অবলাকান্ত! কিন্তু আসলে আমার কি নাম হওয়া উচিত তা জানিস? প্রবলাকান্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'তোমার বক্তৃতা তুমি তোমার চ্যালা-চামুণ্ডাদের শুনিয়ো। এখন আমাদের নিয়ে কী করতে চাও, তাই বলো।'

—'কী করতে চাই? তোদের নিয়ে কী করতে চাই? দুনিয়ার খাতা থেকে তোদের নাম একেবারে মুছে দিতে চাই।'

—'সেটা তো অনেকদিন ধরেই করতে চাইছ! কিন্তু পেরেছ কি?'

—'পারব, এবারে ঠিক পারব! এখনই আমার বাসনা চরিতার্থ করতে পারি, কিন্তু আমার আবার কেমন একটা বদ-রোগ আছে জানিস তো? আমি নরবলি দিতে চাই নতুন পদ্ধতিতে।'

—'পদ্ধতিটা কী, শুনতে পাই না?'

—'শুনবি কী, একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাবি! পদ্ধতিটা যে কী আমি নিজেই তা এখনও জানি না, পরে ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে স্থির করব। কিন্তু এটা ভালো করেই মনে করে রাখিস, এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে তোদের আমি পরলোকে পাঠিয়ে দেবই দেব!'

—'বেশ, আমরা তাহলে এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছি।'

আবার অট্টহাস্য করে অবলাকান্ত বললে, 'হ্যাঁ, এখন থেকে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করে দে, কারণ পরলোকে যাত্রা করবার সময় সেইটেই হবে তোদের একমাত্র পাথেয়!'

ঠিক সেই সময়ে যখন অন্যান্য সকলে একমনে এদের কথাবার্তা শুনছিল, কুমার আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা মেরে দুজনের হাত ছাড়িয়ে সামনের দিকের অন্ধকারের ভিতরে বেগে ছুটে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শত্রুদের সকলেই অন্যমনস্ক হয়ে ছিল না, একজন বেগে ছুটে গিয়ে কুমারের মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাত। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে কুমার তৎক্ষণাৎ ঘুরে মাটির উপর পড়ে গিয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল।

কুমারকে হয়তো এরা হত্যা করলে, এই ভেবেই বিমল একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। সেও এক বিষম টান মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আঘাতকারীর উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মহা বলিষ্ঠ দুই বাহু সেই বিপুলবপু দস্যুর দেহটাকে অনায়াসে শিশুর মতন মাথার উপরে তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছড়ে ফেলে দেবার উপক্রম করলে।

কিন্তু ডাকাতরা দল বেঁধে ছুটে গিয়ে আবার তাকে চারিপাশ থেকে চেপে ধরলে প্রাণপণে। যে ডাকাতটাকে সে ধরেছিল, তিন-চারজন লোক এসে আবার তাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করলে।

অবলাকান্ত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বললে, 'মরতে বসেও তোরা চালাকি করবি? ওরে, তোরা হতভাগাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে এখুনই এখান থেকে নিয়ে চল! সেইসঙ্গে ওদের চোখগুলোও বাঁধতে ভুলিসনে! বনে পুলিশ হানা দিয়েছে, আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।'

একজন শুধোলে, 'কর্তা ওদিকে তো পুলিশ আমাদের পথ আগলে আছে, আমরা এখন কোথায় যাব?'

অবলাকান্ত বললে, 'কেন, আমরা এখন বানের জলে ভাসছি নাকি? বনের উত্তরদিকে এখান থেকে মাইল-দশ পরে আমবাগানে আমাদের পোড়োবাড়ির আড্ডা আছে, সেকথা কি ভুলে গেলি? চল সেখানে।'

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'যে-ব্যাটা ওখানে মাটির উপর পড়ে রয়েছে, ওকেও আমাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে নাকি?'

অন্ধকারের ভিতরে হেঁট হয়ে কুমারের ঝাপসা দেহের উপরে ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবলাকান্ত বললে, 'না রে শঙ্কর, এর ভার আর তোদের কারুকে বইতে হবে না। এর মাথা ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে, এ পটল তুলেছে বলেই মনে হচ্ছে! চল, আমরা এখান থেকে অদৃশ্য হই।'

সপ্তম

ভূত না মানুষ?

কুমার কিন্তু মারা পড়েনি, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল মাত্র। গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে অল্পে অল্পে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসছে, আচ্ছন্নভাবের ভিতরে থেকেও এইটে সে অনুভব করতে পারলে, তার মাথার উপরে কী যেন একটা সজল ও সজীব পদার্থের চঞ্চল অস্তিত্ব! সে অন্ধকারেই ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে সেটা যে কী তা বোঝবার চেষ্টা করলে। বুঝতে দেরি লাগল না। তাকে আগলে মাথার কাছে বসে আছে তার প্রিয় কুকুর বাঘা, সেইই স্নেহভরে জিহ্বা দিয়ে তার রক্তাক্ত মস্তককে লেহন করছে বারংবার!

এতক্ষণে কুমারের সব কথা মনে পড়ল। এ-পাশে ও-পাশে ফিরে তাকিয়ে সে শত্রু বা মিত্র কারুরই সাড়া পেলে না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে নির্জন অরণ্যের মর্মর শব্দ এবং অদৃশ্য ঝিল্লিদের ঐকতান ছাড়া সেখানে আর কোনও শব্দই নেই।

অবিরাম রক্তপাতে তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে সে কোনওক্রমে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময়েই বনের একদিকে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল কতকগুলো চঞ্চল আলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষদের কণ্ঠস্বর!

শত্রুরা আবার ফিরে আসছে ভেবে কুমার হামাগুড়ি দিয়ে পাশের একটা ঝোপের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সে শুনতে পেলে উচ্চকণ্ঠের একটা চিৎকার—'বিমলবাবু! কুমারবাবু! জয়ন্ত! মানিক!' সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর!

কুমারও সানন্দে চিৎকার করে ডাকলে, 'সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! এইদিকে আসুন, এইদিকে! আমি কুমার!'

সুন্দরবাবু বিপুল উৎসাহে সচিৎকারে বলে উঠলেন, 'হুম! বাব্বা, বনে বনে ঘুরে আমি হয়রান হচ্ছি, আর আপনারা এখানে মজা করে দিব্যি আরামে লুকিয়ে আছেন? বেড়ে মানুষ তো আপনারা! এইবারে দয়া করে আত্মপ্রকাশ করুন, এইদিকে এগিয়ে আসুন!'

কুমার বললে, 'আপনার কথা রাখতে পারলুম না, ক্ষমা করবেন। আমি আহত! আমার চলবার শক্তি নেই।'

—'কী বললেন? আপনি আহত? আমারও ঠিক ওই দশাই জানবেন। আমার বাঁ-হাতের ভিতর দিয়ে বন্দুকের 'বুলেট' ছোটাছুটি করেছে! কিন্তু আর তিন-মূর্তির সাড়া পাচ্ছি না কেন? তাঁরা কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে লজ্জায় বোবা হয়ে আছেন?'

—'জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু আর বিমলকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমি একলা আহত হয়ে এইখানে পড়ে আছি। সব কথা পরে শুনবেন, আগে এইদিকে আসুন।'

সুন্দরবাবু একেবারে চুপ মেরে গেলেন। তারপরই কুমার দেখলে জঙ্গলের ওপাশ থেকে আলোগুলো তার দিকেই ছুটে আসছে।

মিনিট-তিনেক পরেই ঘটনাক্ষেত্রে হল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। হাতে টর্চের আলো এদিকে এবং ওদিকে নিক্ষেপ করে সুন্দরবাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'কুমারবাবু, আপনি কোথায়?'

কুমার বললে, 'আপনার বাঁদিকে পিছনে তাকিয়ে দেখুন!'

সুন্দরবাবু তখন টর্চের আলোটা মাটির উপরে নিক্ষেপ করে শিউরে উঠে বললেন, 'কী ভয়ানক, এখানে এত রক্ত কেন?'

কুমার বললে, 'ও-রক্ত আমার!'

ততক্ষণে পুলিশের অন্যান্য লোকরা অনেকগুলো আলো নিয়ে সেখানে এসে তাড়িয়ে দিলে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারকে।

সুন্দরবাবু ঝোপের পাশে কুমারকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন, তারপর তার ক্ষতস্থান লক্ষ করে উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বললেন, 'সর্বনাশ, এ-যে মারাত্মক আঘাত!'

কুমার ম্লান হাসি হেসে বললে, 'কিন্তু আমি মরিনি সুন্দরবাবু! আর শীঘ্র মরব বলেও আমার সন্দেহ হচ্ছে না।'

সুন্দরবাবু প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলন করে বললেন, 'না, না, না! আপনাকে যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে নিশ্চয়ই আপনি মারা পড়বেন। ইস, এখনও যে মাথা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। দাঁড়ান, খান-কয় রুমাল দিয়ে আগে আপনার মাথাটা যতটা ভালো করে পারি বেঁধে দি।'

সুন্দরবাবু নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে এবং এর-ওর-তার কাছ থেকে আরও কয়েকখানা রুমাল চেয়ে নিয়ে কুমারের ক্ষতস্থানে 'ব্যান্ডেজ' বাঁধতে নিযুক্ত হলেন। এবং সেই সঙ্গেই বললেন, 'তাহলে বিমলবাবু, জয়ন্ত আর মানিক ডাকাতদের হাতে বন্দি হয়েছে? কেন যে আপনারা ভয়ে পালিয়ে এলেন, আমাদের সঙ্গে থাকলে এমন দুর্ঘটনা তো ঘটত না!'

কুমার মৃদু-হাসি হেসে বললে, 'আমরা পালিয়ে আসিনি সুন্দরবাবু, আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলুম মাত্র! আমরা লুকিয়ে ডাকাতদের পিছনে এসে তাদের আক্রমণ করেছিলুম, আর সেই আক্রমণের ফলেই ডাকাতরা ঘটনাস্থল থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পালাবার সময় তারা আমাদের দেখতে পেয়েছিল।'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কপালের উপর দিকে তুলে বললেন, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে আমি তো ভুল বুঝেছিলুম! কিন্তু বলতে পারেন কুমারবাবু, ডাকাতরা কোনদিকে লম্বা দিয়েছে?'

—'আমি কিছুই বলতে পারব না, কারণ তখন আমার জ্ঞান ছিল না।'

সুন্দরবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ডাকাতরা কোনদিকে গিয়েছে এখন তা আর জেনেই বা লাভ কী? আমি আহত, আপনারও এই সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের পক্ষে এখন ডাকাতদের অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এখন আগে আমাদের লোকালয়ে ফিরে না গেলে কিছুতেই চলবে না। তাড়াতাড়ি ডাক্তার না দেখালে রক্ত বিষিয়ে আমরা দুজনেই মারা পড়তে পারি। খালি আমরা দুজন নই, আমাদের পক্ষে আরও সাতজন লোক আহত আর তিনজন নিহত হয়েছে। ডাকাতদের কী হয়েছে জানি না।'

কুমার বললে, 'আপনাদের গুলিতে ডাকাতদের কী হয়েছে আমিও বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের গুলি খেয়ে কজন ডাকাতকে গাছের উপর থেকে পড়ে যেতে দেখেছি।'

—'হুম! এত দুঃখের মধ্যে এও হচ্ছে একটা সুসংবাদ!.....কিন্তু থাকগে এখন ওসব কথা। এই সেপাইরা, কুমারবাবুকে তোমরা সাবধানে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে চলো। আর এখানে থেকে কোনওই লাভ নেই।'

ঠিক সেই সময়ে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারের ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অদ্ভুত, তীব্র ও ভয়াবহ অট্টহাসি! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা! সেই ভীষণ অট্টহাস্য গভীর অরণ্য এবং নৈশ আকাশকে যেন স্তম্ভিত করে দিলে! সে প্রচণ্ড হাসির যেন আর বিরাম নেই!

কুমার নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল এবং সুন্দরবাবু সচকিত

কণ্ঠে সভয়ে বলে উঠলেন, 'ও কে? ও কে হাসে? ও কেন হাসে? ও কাদের দেখে হাসছে? ও কি মানুষের হাসি?'

তখন কুমারেরও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সেও ও-রকম অস্বাভাবিক হাসি জীবনে কখনও শোনেনি। সে অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, কে-যে হাসছে আমি এখন তা জানতে চাই না। আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে নিয়ে চলুন।'

বাঘা এতক্ষণ কুমারের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ঝোপের এক পাশে চুপ করে বসে ছিল। সেও এখন তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল—তার সর্বাঙ্গে বিস্ময়ের লক্ষণ। হঠাৎ সে এক লাফ মেরে কুমারের দেহকে টপকে বিষম ক্রোধে গর্জন করে কোনদিকে ছুটে যেতে উদ্যত হল, কিন্তু কুমার তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাঘাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুই আমার কাছ থেকে যাসনে বাঘা, যাসনে, এ-বন হচ্ছে অদৃশ্য বিপদে পরিপূর্ণ!'

সুন্দরবাবু বিকৃত স্বরে বললেন, 'এ-বনে প্রেতযোনি আছে, প্রেতযোনি আছে! ও-রকম হাসি মানুষে হাসতে পারে না। ডাকাতদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারি, কিন্তু ভূতের সঙ্গে লড়বার শক্তি মানুষের নেই। এই সেপাইরা, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বলছি না, কুমারবাবুকে তুলে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে?'

হঠাৎ থেমে গেল সেই অট্টহাসির তরঙ্গ। তারপরেই জেগে উঠল একটা প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর! কে যেন কোথা থেকে ভীষণ চিৎকার করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! চলে যা এখান থেকে, আজ তোদের এখান থেকে চলে যেতে হবেই। তোরা চলে যা, কিন্তু আমি এখানে জেগে থাকব দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। প্রতিহিংসা— প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! আমি আজ আর তোদের পৃথিবীর কেউ নই, আজ আমি রক্তলোলুপ, আজ আমি হত্যা করতে চাই, করতে চাই রক্তপাত!.....হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা! জানি, জানি, আজ তোরা চলে গেলেও আবার তোরা এখানে ফিরে আসবি, আবার তোরা এই বনে বনে ঘুরবি শিকার খোঁজবার জন্যে! আজ আর তোদের দেখা দেব না, কিন্তু আবার তোরা, যেদিন এখানে ফিরে আসবি, সেদিন আমি তোদের সাহায্য করব! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা!'

সেই বীভৎস এবং আকাশ-বাতাস-কাঁপানো অট্টহাসি অরণ্যের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর হতে আরও দূরে গিয়ে হঠাৎ আবার থেমে গেল!

সুন্দরবাবু শিউরোতে শিউরোতে আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'একী ব্যাপার কুমারবাবু, কে এমন করে হাসলে, কে ওসব কথা বলে গেল?'

কুমার তখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তপাতের ফলে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল! সেই অবস্থাতেই অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না সুন্দরবাবু, চোখেও আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন।' বলেই সে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ধপাস করে আবার মাটির উপরে শুয়ে পড়ল!'

অষ্টম

একখানা হাত-আয়না

অবলাকান্ত বললে, 'শম্ভু, এইবার ব্যাটাদের চোখ খুলে দে। এরা কোন দিক দিয়ে কোথায় এসেছে কিছুই দেখতে পায়নি। ব্যাটাদের ওই ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে, তোরা ওদের হাত-পা বেঁধে ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখ। আজ ভয়ানক খাটুনি হয়েছে, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি ঘুমুতে চললুম। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে শম্ভু যেন জেগে সারারাত এখানে পাহারা দেয়।'

শম্ভু লণ্ঠন হাতে করে একটা মাঝারি-আকারের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর কয়েকজন লোক বিমল, জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। বিমলদের হাত তো আগেই পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল, ডাকাতরা এখন তাদের মাটির উপরে শুইয়ে সকলকার পা-গুলোও শক্ত দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে বাইরে বেরিয়ে গেল।

শম্ভু তার হাতের লণ্ঠনটা উপরদিকে তুলে বন্দিদের দিকে আলোকপাত করে বললে, 'বাপধনরা, পৃথিবীতে আজই হচ্ছে তোমাদের শেষ রাত। কারণ কাল থেকে তোমরা যে ঘুম ঘুমোবে, সে-ঘুম আর কখনও ভাঙবে না। হা-হা-হা-হা, কর্তা নিজে চললেন ঘুমোতে আর আমাকে বললেন সারারাত জেগে থাকতে। আমার যেন খাটুনি হয়নি! ঘুমে আমারও চোখ ঢুলে আসছে, জেগে থাকব কিসের জন্যে, কার ভয়ে? এ-ঘরের দরজা তো বাইরে থেকে তালা বন্ধ থাকবে, তবে আর ভয়টা কিসের? এ-ব্যাটাদের হাত-পা বাঁধা, আর বাইরের দরজায় তালা বন্ধ! আমার জেগে থেকে লাভ?' বলতে বলতে আলো নিয়ে বাইরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিলে সশব্দে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতরে তিনজন বন্দি আড়ষ্ট হয়ে মাটির উপরে শুয়ে রইল নীরবে। .....মিনিট-পনেরো যেতে-না-যেতেই ঘরের বাইরে দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল খুব সম্ভব পাহারাওয়ালা শম্ভুরই উচ্চ নাসিকাগর্জন!

জয়ন্ত নিম্নকণ্ঠে ডাকলে, 'বিমলবাবু!'

—'বলুন।'

—'আমাদের পাহারাওয়ালার নাক তো ডাকছে! এইবার বোধহয় মরবার আগে আমরা অল্পস্বল্প গল্প করতে পারি, কী বলেন?'

—'কিন্তু, ভায়া, এখন গল্প করে কোনও লাভ আছে কি?'

—'তাছাড়া আর কী করব বলুন? সামনে যখন জাগছে চিরনিদ্রা, তখন পৃথিবীর এই শেষ-রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করা কি উচিত?'

—'আমি চিরনিদ্রার ভক্ত নই জয়ন্তবাবু। আমি বেঁচে এই পৃথিবীতে জেগে থাকতেই চাই।'

—'কিন্তু বাঁচবেন কেমন করে? অজানা শত্রুপুরী, আমাদের হাত-পা বাঁধা, বাইরে দরজার সামনেও প্রহরী, বাঁচবার কোনও উপায় আছে কি?'

—'নিরুপায় আমি কখনও হই না জয়ন্তবাবু! হয়তো আমরা বাঁচলেও বাঁচতে পারি।'

—'আপনি এ কী অসম্ভব কথা বলছেন!'

—'ঘরের ভিতরে যখন আলো ছিল তখন আমি কি দেখেছি জানেন জয়ন্তবাবু?'

—'কী দেখেছেন?'

—'আমি যেখানে শুয়ে আছি, ঠিক এইখানেই আমার উপরে দেয়ালের গায়ে আছে কতকগুলো তাক। আর মাঝের একটা তাকের উপরে আছে একখানা দাঁড়-করানো হাত-আয়না।'

—'কিন্তু ও হাত-আয়না নিয়ে আমাদের কী উপকার হবে?'

—'কিছু উপকার হলেও হতে পারে বইকী!'

—'মানে?'

—'আমার হাত আর পা বাঁধা আছে বটে, কিন্তু এই বাঁধা পা-দুটো আমি উপরদিকে তুলে লাথি মেরে ওই হাত-আয়নাকে মাটির উপরে ফেলে দিতে পারি।'

জয়ন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি!'

মানিকও চমৎকৃত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত, বিমলবাবু আজ তোমাকে হারিয়ে দিলেন।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু চিরদিনই আমাকে হারাতে পারেন, কারণ ওঁর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশি। একদিন পৃথিবীর বাইরে গিয়েও উনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।'

ততক্ষণে বিমল তার বাঁধা পা-দুটো উপরদিকে তুলে আন্দাজ করে আয়নার উপরে এমনভাবে পদাঘাত করলে যে, সেখানা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু সে-শব্দে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন শম্ভুর নাসিকার সঙ্গীত একবারও বন্ধ হল না।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, গড়িয়ে গড়িয়ে আমার কাছে আসুন। আপনি এখনই এই ভাঙা আয়নার একখানা কাচ দাঁত দিয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে নিন। ভাঙা কাচের ধার হচ্ছে ক্ষুরের মতন। কাচখানা দাঁতে চেপে ধরে আপনার হাতের দড়ি কাটতে একটুও বিলম্ব হবে না। তারপরে যা করতে হবে সেটা আপনাকে বলাই বাহুল্য!'

তিন মিনিট পরে জয়ন্তের দুই হস্ত হল মুক্ত! সে অন্ধকারে হাতড়ে আয়নার আর-একখানা ভাঙা কাচ তুলে নিয়ে আগে নিজের পায়ের দড়ি ফেললে কেটে। তারপর সেই কাচখানা নিয়ে শীঘ্রহস্তে বিমলের হাতের দড়িও কেটে ফেললে। তারপর বিমলের পায়ের দড়ি এবং মানিকের হাত ও পায়ের দড়ি কাটতেও আর বেশি দেরি লাগল না। সবাই যদিও ঘরের ভিতরে বন্দি, তবু তারা এখন রজ্জুর বন্ধন থেকে মুক্ত!

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু, আপনারা ঘরের দরজার ওপাশে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ান। আমি দাঁড়াচ্ছি দরজার এপাশে। এইবারে দেখা যাক, কেমন করে শ্রীমান শম্ভুচন্দ্রের নাসিকার সঙ্গীত বন্ধ করা যায়।' সে হেঁট হয়ে মেঝের উপরে হাত বুলিয়ে ভাঙা-আয়নার ফ্রেমখানা কুড়িয়ে নিলে। তারপর সেখানা বারংবার দেয়ালের উপরে ঠুকতে লাগল সজোরে ও সশব্দে!

দরজার ওপাশে শুয়ে শম্ভু ঘুমোচ্ছিল। বিমলকে বেশিক্ষণ শব্দ সৃষ্টি করতে হল না।

প্রথমে থামল শম্ভুর সবাক নাসিকা, তারপর জাগল তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। সে বললে, 'কী রে, কী রে, ঘরের ভেতরে তোরা কী করছিস রে?'

বিমলের হাতের আয়নার ফ্রেম আরও জোরে করলে দেয়ালকে আক্রমণ।

—'বটে, বটে, ভালো কথায়, কান পাতা হচ্ছে না? দেখবি মজাটা?'

শব্দ থামবার নাম করলে না।

—'নাঃ, জ্বালালে দেখছি। ব্যাটারা ভেবেছে আমাকে ঘুমোতে দেবে না! আচ্ছা, পিঠের ওপরে দমাদ্দম লাথি পড়লেই সব ঠান্ডা হয় কি না দেখি!'

একটু পরেই বাহির থেকে দরজার কুলুপ খোলার আওয়াজ হল এবং তারপর খুলে গেল দরজার পাল্লা দুখানা। লণ্ঠন হাতে করে ঘরের ভিতরে শম্ভুর প্রবেশ।

কিন্তু সে চোখে কিছু দেখবার আগেই জয়ন্তের শিক্ষিত মুষ্টি তার চিবুকের উপরে দিলে প্রচণ্ড এক 'নক-আউট ব্লো'! একটিমাত্র টুঁ শব্দ উচ্চারণ না করেই শম্ভু মেঝের উপর লম্বা হয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

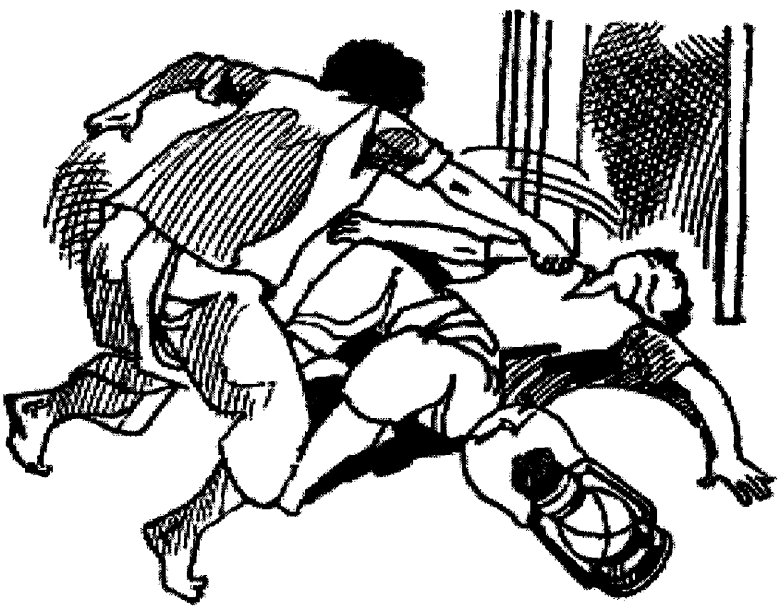

শম্ভুর হাত পা মুখ ভালো করে বাঁধতে বাঁধতে বিমল বললে, 'অবলাকান্ত সুচতুর বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অতি চালাকি করতে গিয়ে সব পণ্ড করে দেয়। সে বারবার আমাদের বন্দি করছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি আমাদের বধ করত তাহলে বহুদিন আগেই তার

মনের বাসনা পূর্ণ হত। কিন্তু তার নিষ্ঠুর মন হচ্ছে বিড়ালের মতো। শিকারকে একেবারে মেরে না ফেলে তাকে নিয়ে সে আগে খেলা করতে চায়! তার এই বুদ্ধির দোষেই আমরা বারবার তাকে ফাঁকি দিতে পারছি।'

মানিক বললে, 'আকাশে আধখানা চাঁদ আছে বটে, কিন্তু বনের ভিতরে অন্ধকারের রাজত্ব। তার উপরে ওরা চোখ বেঁধে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে যদি বাইরে বেরুতে পারি, তাহলে পথ চিনব কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'পথ চেনবার দরকার নেই। আমাদের দক্ষিণদিকে যেতে হবে।'

—'কী করে জানলে?'

—'চোখ বন্ধ থাকলেও আমাদের কানও তো বন্ধ ছিল না! ভুলে যাচ্ছ কেন, এখানে আসবার সময়ে অবলাকান্ত সবাইকে উত্তরদিকে যেতে বলেছিল।'

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, 'আর দেরি করা নয়। আমাদের আগে কুমারের সন্ধান নিতে হবে। তার জন্যে আমার মন ছটফট করছে।'

মানিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, 'কুমারবাবুর যে অবস্থা দেখে এসেছি, জানি না গিয়ে কী দেখব!'

বিমল জোর-গলায় বললে, 'ভালোই দেখব, ভালোই দেখব! এত সহজে মরবার জন্যে আমি আর কুমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিনি! আমার মন বলছে, কুমার জখম হয়েছে বটে, কিন্তু বেঁচে আছে!'

নবম

তিন ভূতের আবির্ভাব

'ব্যান্ডেজ'-বাঁধা হাতখানি বুকের কাছে ঝুলিয়ে সুন্দরবাবু নিজের আপিসে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন অত্যন্ত বিমর্ষের মতো। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একসঙ্গে প্রবেশ করলে, জয়ন্ত, মানিক, বিমল এবং কুমার—তারও মাথায় 'ব্যান্ডেজ' বাঁধা।

সুন্দরবাবু বিপুল বিস্ময়ে ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবলমাত্র বলতে পারলেন—'হুম!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার মুখের পানে তাকালে মনে হয়, আপনি যেন ভূত দেখেছেন!'

—'ঠিক তাই জয়ন্ত, ঠিক তাই। একটা-আধটা নয়, তিন-তিনটে ভূত!'

—'আপনি কি আমাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন?'

—'একেবারেই।'

—'কেন?'

—'অবলাকান্ত মানুষ নয়, দানব। তার কবল থেকে তোমরা যে মুক্তি পাবে, এতটা আশা আমি করতে পারিনি।'

—'কিন্তু দেখছেন তো, মুক্তি আমরা পেয়েছি?'

—'কেমন করে পেলে?'

জয়ন্ত সংক্ষেপে তাদের কাহিনী বর্ণনা করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম। এ-যাত্রায় দেখছি আমাদের উপরে টেক্কা মারলেন বিমলবাবুই।'

বিমল বললে, 'মোটেই নয়, মোটেই নয়! জয়ন্তবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আছি বলেই আমার ভোঁতা বুদ্ধি একটু সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। একেই বলে সঙ্গগুণ!'

জয়ন্ত বললে, 'বিলক্ষণ! বিনয় দেখিয়ে বিমলবাবু লোককে লজ্জা দিতে ভালোবাসেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'অতঃপর আমাদের কী কর্তব্য?'

জয়ন্ত বললে, 'আবার আমরা সদলবলে অবলাকান্তের উদ্দেশে যাত্রা করব।'

—'কবে?'

—'আজকেই।'

—'অসম্ভব!'

—'কেন?'

—'অন্তত এই হাত নিয়ে আমার, আর ওই মাথা নিয়ে কুমারবাবুর পক্ষে আজ যাত্রা করা অসম্ভব। দেখছ না, আমরা দস্তুরমতো আহত?'

কুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না সুন্দরবাবু, যাত্রা করবার জন্যে আমি দস্তুরমতো প্রস্তুত।'

—'আরে, বলেন কী মশাই?'

—'হ্যাঁ। আহত হলেও আমি অক্ষম নই।'

—'আপনারা সকলেই পাগলা-গারদের লোক। আর এতটা তাড়াতাড়ির দরকার কী জয়ন্ত? অবলাকান্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেই আমবাগানের পোড়োবাড়ি ছেড়ে সরে পড়েছে।'

—'আমরাও তা জানি।'

—'তবে তাকে পাবে কোথায়? তোমরা তার ঠিকানা জানো?'

—'হয়তো জানি।'

—'হয়তো মানে?'

—'মনে করে দেখুন সুন্দরবাবু, ট্রেন আক্রমণের পরে লুটের মাল নিয়ে অবলাকান্ত প্রথমেই কোনদিকে গিয়েছিল?'

—'বনের যে পথে পদচিহ্ন দেখে আমরা ডাকাতদের পিছু নিয়েছিলুম, তারা সেই পথের বাঁদিকের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল আরও-সরু একটা পথ ধরে।'

—'তারপর তারা আমাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসেছিল পালিয়ে যাবার জন্যে।'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন সমস্ত ব্যাপারটা একবার তলিয়ে বুঝে দেখুন। লুটের মাল নিয়ে পালিয়ে সর্বপ্রথমেই ডাকাতদের কোথায় যাওয়া উচিত? নিশ্চয়ই নিজেদের প্রধান আস্তানায়।'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার এ-কথা মানি বটে।'

—'তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, ডাকাতদের সব চেয়ে বড়ো আস্তানা আছে ওই বনের ভিতরেই।'

—'তাও মানলুম। কিন্তু ওখানকার অরণ্য তো ছোট্ট নয়—বিশ-পঁচিশ মাইল ছুটোছুটি করলেও আমরা হয়তো তার শেষ খুঁজে পাব না। আর ডাকাতদের আস্তানাও নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তস্থানেই আছে, যা আবিষ্কার করা মোটেই সহজ নয়।'

—'অবলাকান্ত কী-রকম জায়গায় লুকিয়ে আছে সেটাও হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি। যাঁরা অপরাধ-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ তাঁরা জানেন যে, এক-একজন অপরাধীর এক-এক রকম বিশেষ অভ্যাস থাকে। গোয়েন্দা-কাহিনির নয়, পৃথিবীর সত্যিকার গোয়েন্দারা কোনও মামলা হাতে পেলে আগে দেখবার চেষ্টা করেন, তার ভিতরে অপরাধীর কোনও বিশেষ অভ্যাস প্রকাশ পেয়েছে কি না। যে-মামলায় সেই বিশেষ অভ্যাসের প্রমাণ থাকে তার কিনারা করতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না। এই অবলাকান্তের একটা বিশেষ অভ্যাস বরাবরই আমরা লক্ষ করেছি। 'জেরিনার কণ্ঠহার' মামলা স্মরণ করুন। সে মামলায় অবলাকান্তকে আমরা পেয়েছিলুম কলকাতার টালিগঞ্জ-অঞ্চলের একটা বুনো জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে। তারপর 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' মামলাটাতেও অবলাকান্তকে আমরা খুঁজে বার করেছিলুম কোথায়? সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন মৃত্তিকাস্তূপের নীচে প্রোথিত সেকেলে একটা মঠের ভিতরে গিয়ে সে আড্ডা গেড়েছিল। বর্তমান মামলাতেও দেখছি এখানকার বনজঙ্গলেও তার বিভিন্ন আড্ডা আছে, আর সম্প্রতি তার যে আড্ডা থেকে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি তাও আছে একখানা পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভিতরে। অবলাকান্ত ভারী চালাক। সে আড্ডা তৈরি করেছে অনেকগুলো, আর এক আড্ডায় সে বেশিদিন থাকে না। তাই তাকে ধরাও সহজ হয় না। আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে যে, ওই বনের ভিতরে তার আর একটা আস্তানা আছে, আর সেইটেই হচ্ছে তার প্রধান আস্তানা। ওর ওই প্রধান আস্তানাও হয়তো পাওয়া যাবে একখানা মান্ধাতার আমলের ভাঙা-চোরা বাড়ি বা অট্টালিকার ভিতরে। বাংলাদেশের বহুস্থানেই দেখা যায় এমন গভীর অরণ্য, কিন্তু সেইসব অরণ্যের ভিতরে অন্বেষণ করলে আজও পাওয়া যায় অনেক পুরাতন প্রাসাদ বা বাড়ি, পরিত্যক্ত নগর আর গ্রামের চিহ্ন। অবলাকান্তের বিশেষ অভ্যাস হচ্ছে, সে খুঁজে খুঁজে এই রকম সব জায়গাই বাস করবার জন্যে নির্বাচন করে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সবই তো বুঝলুম, কিন্তু আর দুদিন পরে গেলেই কি ভালো হত না?'

—'না। যদিও সেদিনের বৃষ্টিতে-ভেজা মাটি আজ আর নরম নেই, কিন্তু তবু চেষ্টা করলে শুকনো কাদার উপরে এখনও হয়তো তাদের পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারব তারা কোনদিকে গিয়েছে! পায়ের দাগ পাওয়া গেলে অবলাকান্তের আড্ডা খুঁজে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না! এমন সুযোগ হারাতে আমি প্রস্তুত নই।'

বিমল বললে, 'আমারও ওই মত। শুভস্য শীঘ্রম!'

কুমার ও মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'আমরাও জয়ন্তবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করি!'

সুন্দরবাবু মুখের উপরে বিপুল গাম্ভীর্যের বোঝা নামিয়ে বললেন, 'সব বুঝতে পারছি—হুম! অগত্যা ভাঙা হাত নিয়ে আমাকেও যেতে হবে দেখছি—নইলে মানিক চিরদিনই আমাকে কাপুরুষ বলে যখন-তখন ঠাট্টা করতে ছাড়বে না! মানিক হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া। বরাবরই সে ছিনেজোঁকের মতন আমাকে কামড়ে থাকতে ভালোবাসে! আমি যে কেন ওর এমন চোখের বালি হলুম, ভগবানই তা জানেন! হুম!'

দশম

ভয়াবহ বন্ধু

আবার সেই ঘটনাস্থল।

ট্রেন থেকে সদলবলে নেমে পড়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, সেবারে আমরা বৃহৎ একটা দল নিয়ে দস্যুদের পিছনে অনুসরণ করেছিলুম বলে সফল হতে পারিনি। এবারে আর সে-ভ্রম করতে চাই না।'

—'মানে?'

—'আপনি আহত। আপাতত আপনি সেপাইদের নিয়ে স্টেশনেই অপেক্ষা করুন। ইচ্ছা করলে কুমারবাবুও এখানে অপেক্ষা করতে পারেন, কারণ তিনিও আহত হয়েছেন।'

কুমার বললে, 'খুব কথাই বললেন যে দেখছি! আমার উপরে এতটা সদয় না হলেও পারতেন। আপনারা আমাকে অক্ষম ভাবছেন, না? তাহলে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই, সমর্থন করবেন?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'আজ্ঞা করুন!'

—'আপনারা সকলেই খানিকক্ষণের জন্যে এখানে বিশ্রাম করুন। বাঘাকে নিয়ে আমিই ওই বনের দিকে যাত্রা করি। পদচিহ্ন আবিষ্কার করবার শক্তি আমারও আছে—বাঘার তো আছেই! হয়তো এ-বিষয়ে বাঘা আমাদের সকলের চেয়েই শক্তিশালী! আমি একলা গেলে নিশ্চয়ই ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব না।'

কুমারের একখানা হাত চেপে ধরে জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, মাপ করবেন। আপনি অক্ষম বলে কোনও ইঙ্গিতই করছি না। বিমলবাবু আর আপনি হচ্ছেন অসাধারণ লোক—আপনারা সব করতে পারেন তা আমি জানি। বেশ, সুন্দরবাবুই তাহলে সেপাইদের নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন, আর আমরা চারজনে মিলে বনের দিকে যাত্রা করি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বা-রে, আমার কাছে তোমাদের কেউই থাকবে না? তাহলে আমার

সময় কাটবে কেমন করে? ওই সেপাইদের সঙ্গে তো আমি গল্প করতে পারি না? অন্তত মানিককেও আমার কাছে রেখে যাও।'

মানিক বললে, 'পাগল! আমিও জয়ন্তদের সঙ্গে যেতে চাই!'

সুন্দরবাবু মিনতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'না মানিক, তুমি লক্ষ্মীছেলে! তুমি যখন-তখন আমাকে নিয়ে বড়ো বাজে ঠাট্টা করো বটে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভারী ভালোবাসি। প্রায় বুড়ো হতে চলেছি, আমাকে এখানে একলা ফেলে যেয়ো না।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আমারও ইচ্ছা তুমি সুন্দরবাবুর কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকো।'

মানিক নাচারের মতন বললে, 'বেশ, তাহলে আপাতত আমি হুম-বাবুরই পার্শ্বচর হলুম।'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'মানিক, মানিক! আবার তুমি আমাকে হুম-বাবু বলে ডাকছ? ও-নাম আমি পছন্দ করি না! তুমি যদি আবার আমাকে হুম-বাবু বলে ডাকো তাহলে এখনই আমি নিজেই তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব! বয়ে গেল, না-হয় আমি একলাই থাকব, না-হয় আমি সেপাইদের সঙ্গেই গল্প করব, ওরাও মানিকের চেয়ে ভদ্দরলোক! হুম-বাবু! হুম-বাবু আবার একটা নাম নাকি? কোনও ছোটোলোকও ও-নাম ধরে কারুকে ডাকতে পারে না! হুম।'

মানিক দক্ষিণবাহু দিয়ে সুন্দরবাবুকে সাদরে বেষ্টন করে মিষ্ট-কণ্ঠে বললে, 'না সুন্দরবাবু, অন্তত আজ আমি আপনাকে হুম-বাবু বলে ডাকব না! আজ আপনার সঙ্গে খালি ভালো-ভালো গল্প করব, আর যদি ভালো-ভালো খাবার পাওয়া যায় তাহলে দুজনে মিলে বেশ পেট ভরে খাব!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হেঃ, এটা আবার একটা স্টেশন নাকি, এখানে 'প্যাসেঞ্জার' ছাড়া আর কোনও ট্রেনই থামে না। এখানে বসে তুমি খেতে চাও ভালো ভালো খাবার? মরুভূমিতে তুমি খুঁজতে চাও রজনীগন্ধার চারা? সত্যি মানিক, তুমি অত্যন্ত বোকা কিন্তু।'

মানিক সকৌতুকে খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, 'উঁহু, উঁহু! কে বলে আমি অত্যন্ত বোকা? অত্যন্ত বলছেন কী মশাই, আমি অল্প বোকাও নই। ভালো-ভালো খাবারের জন্যে আমি স্টেশনের মুখ চেয়েই বসে আছি নাকি?'

—'হুম! তোমার এ-কথার অর্থ কী?'

—'অর্থ হচ্ছে এই, আমার হাতে এই যে 'টিফিন কেরিয়ার'টি দেখছেন, এর মধ্যে কী কী খাবার আছে জানেন?'

—'তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ! এই 'টিফিন কেরিয়ারে'র ভিতরে আছে 'ফাউল রোস্ট', 'মটন কাটলেট', 'পোলাও', 'চিংড়ি-মাছের মালাইকারি', 'রুই-মাছের কালিয়া', আর 'ভেটকি-মাছের ফ্রাই।'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? হুম, হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার মতন মধুর ছেলে জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি! কিন্তু লক্ষ্মী-ভাইটি আমার, তুমি দয়া করে আমাকে আর হুম-বাবু বলে ডেকো না, ও-নামে ডাকলেই আমার মেজাজ কেমন বিগড়ে যায়। এই সেপাই!

স্টেশনমাস্টারকে গিয়ে বল-গে যা, আমার জন্যে এখনই যেন 'ওয়েটিং রুম' খুলে দেয়। ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, আমরা এখন ওখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করব, কী বলো মানিক?'

মানিক অতিশয় গম্ভীর মুখে বললে, 'নিশ্চয়ই।'

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত হাসতে-হাসতে সেতুর দিকে চলে গেল এবং বিমলের ডাক শুনে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে লাঙ্গুল আন্দোলন করতে-করতে ছুটে গেল বাঘাও।

আবার বনের সেই পথ। সেখানে বড়ো-পথের বাঁ-দিক দিয়ে একটি ছোটো পথ গভীর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

জয়ন্ত নীচের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'দেখুন বিমলবাবু, শুকনো কাদার উপরেও এখনও রয়েছে কত পদচিহ্ন। দুদিন পরে এলে এ-চিহ্ন হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না। চলুন, আমরাও এগিয়ে যাই।' বাঘার মাথার উপরে হাত দিয়ে কুমার তাকে দেখিয়ে দিলে সেই পদচিহ্নগুলো। সুশিক্ষিত সারমেয়-অবতার বাংলার স্বদেশী জীব বাঘা! কুমারের ইঙ্গিত বুঝতে তার একটুও দেরি লাগল না। সে তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে মুখ নামিয়ে মিনিট-খানেক ধরে আঘ্রাণ নিলে, তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কুমারের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করতে লাগল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।'

কুমার আদর করে তার মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে বললে, 'তাহলে বাঘা, তুই আমার কথা বুঝতে পেরেছিস তো? তবে চল ওই পায়ের দাগগুলো ধরে আমাদের আগে-আগে।'

বাঘা সানন্দে লাফ মেরে একবার কুমারের গাল চেটে দেবার চেষ্টা করলে। তারপর নিজের লাঙুলকে জয়নিশানের মতন ঊর্ধ্বে তুলে মৃত্তিকার উপরে নিজের নাসিকাকে প্রায় সংলগ্ন করে অগ্রসর হতে লাগল দ্রুতপদে।

বিমল খুশি-ভরা গলায় বললে, 'ব্যাস, আমাদের আর কোনওই বেগ পেতে হবে না। বাঘা যখন গন্ধ পেয়েছে, তখন মাটির উপরে যেখানে দৃশ্যমান পায়ের দাগ থাকবেও না, সেখানেও সেই অদৃশ্য গন্ধকেই অনুসরণ করে আমাদের যথাস্থানেই নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। বাঘাকে আমি চিনি। আগেও সে এইভাবে আমাদের অনেকবার পথ দেখিয়েছে। কুমার তাকে কী সুন্দর শিক্ষাই দিয়েছে—বাহাদুর কুমার, বাহাদুর! আর আমাদের কোনওই ভাবনা নেই।'

বিমল যে সন্দেহ প্রকাশ করলে, খানিক পরেই দেখা গেল তা মোটেই ভুল নয়। মিনিট-পনেরো অগ্রসর হবার পরেই বনের একটা অংশ শেষ হয়ে গেল। তারপর রয়েছে একটা কাঁকর-ভরা মাঝারি আকারের মাঠ, তার উপরে পায়ের ছাপের বা পথের কোনও চিহ্নই নেই। আসামিরা কোনদিকে গিয়েছে কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিশেষজ্ঞের পক্ষেও আর তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

কিন্তু বাঘা একবারও দাঁড়াল না, একবারও ইতস্তত করলে না। মৃত্তিকার উপরে নাসিকা সংলগ্ন করে সমানে এগিয়ে যেতে লাগল।

কুমার বললে, 'দেখছেন জয়ন্তবাবু, এখানে বাঘা না থাকলে আমাদের কী মুশকিলেই পড়তে হত?'

—'মুশকিল বলে মুশকিল! এখানে কিছুতেই আমরা গন্তব্য পথ খুঁজে পেতুম না। আশ্চর্য কুকুর! শিক্ষাগুণে দেশি কুকুর যে এতটা বুদ্ধিমান হয়, স্বচক্ষে না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতেই পারতুম না।'

মাঠ শেষ। আবার ঘন বনজঙ্গল। ঝোপঝাপের আশপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা আর একটা সংকীর্ণ পথের রেখা—এতটা অস্পষ্ট যে, সহজে সেখানে পথ আছে বলে মনে সন্দেহই হয় না। সেই পথটাই অবলম্বন করলে বাঘা।

অরণ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই বেশি নিবিড়। স্থানে স্থানে মাথার উপরেও এমন পুরু লতাপাতার আচ্ছাদন যে, সূর্যালোক হারিয়ে সেসব ঠাঁই হয়েছে অন্ধকারে রহস্যময়। সেখানে কোনওরকমে চোখ চলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

চলতে চলতে জয়ন্ত হঠাৎ বিমলের গা টিপলে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বিমল সচমকে দেখলে, সুমুখের একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে দুটো তীব্র ও বন্য চক্ষু!

জয়ন্ত একলাফ মেরে সেই ঝোপের উপরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে বিমল ও কুমারও। কিন্তু ঝোপ ফাঁক করে কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। কেবল দেখা গেল যে, এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা চাঞ্চল্যের তরঙ্গ ছুটে চলে যাচ্ছে ক্রমেই দূরের দিকে!

জয়ন্ত বন্দুক তুললে।

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'থাক। ঝোপের ফাঁকে যে অদ্ভুত চোখ দেখলুম তার মধ্যে মানুষী ভাব নেই। জঙ্গল ভেদ করে মানুষও বোধহয় অত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না। হয়তো ওটা কোনও বড়ো-জাতের বন্য জন্তু।'

—'ওটা জন্তু কী মানুষ, বন্দুক ছুড়লেই সে সন্দেহ ভঞ্জন হতে পারে।'

—'সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হতে পারে। এই বনে যদি শত্রুদের আস্তানা থাকে, বন্দুকের শব্দ কি সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে না?'

জয়ন্ত জিব কেটে বললে, 'ঠিক বলেছেন! ঝোঁকের মাথায় ভুলে গিয়েছিলুম! আর-একটু হলেই সমস্ত পণ্ড করেছিলুম আর কী!'

পথ চলতে চলতে কাটল আরও কিছুক্ষণ। অরণ্য হয়ে উঠেছে অধিকতর দুর্ভেদ্য। সরু পথটা চলেছে যেন অজগরের মতন কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে। কোনওদিকেই হাত-কয়েক দূরে আর কিছুই দেখবার জো নেই। মাথার উপরে জ্যান্ত পাতার মর্মরধ্বনি, পায়ের তলায় মরা পাতার আর্তনাদ, চারিদিকে দিবাকালেও যেন চিরসন্ধ্যার আবছায়া, কোথাও কোনও প্রাণীর সাড়া নেই—পাখিরাও যেন কোনও অজানার ভয়ে সেখানে গান গাইতে ভরসা পায় না।

কী যেন একটা বুকচাপা অমঙ্গলের থমথমে ভাব জেগে উঠছে দিকে দিকে—যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকেই! অনন্ত নীলিমার অভিনন্দন এবং সূর্যালোকের সোনালি আশীর্বাদ থেকে চিরবঞ্চিত এ যেন এক অভিশপ্ত অরণ্যজগৎ, হিংসা আর হত্যার দুঃস্বপ্ন এখানে যেন যেখানে-সেখানে ওত পেতে অপেক্ষা করে থাকে, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই হয় ঘন ঘন হৃৎকম্প! তবু এটা দিনের বেলা, অন্ধ নিশীথে চক্ষু যখন হয় একেবারেই দৃষ্টিহীন, তখন এই

অরণ্যানী যে কতখানি বিভীষণা হয়ে ওঠে, সেকথা কল্পনা করলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় প্রাণ-মন।

জায়গায় জায়গায় রয়েছে এক-একটা মহাকায় বনস্পতি, তারা প্রত্যেকেই যেন বহু ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যের অনেকখানি পূর্ণ করে ঘন শাখাপল্লব দিয়ে সৃষ্টি করতে চায় নতুন নতুন অরণ্য! কোনও-কোনও বনস্পতি আবার এমন গাঢ় অন্ধকার মাখা যে, তার সীমারেখা পর্যন্ত আন্দাজ করবার উপায় নেই।

এমনি একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে উপরদিকে মুখ তুলে জয়ন্ত লক্ষ করলে, অরণ্যের ক্ষুদ্রতর সংস্করণের মতো সেই সুবৃহৎ বটগাছের এখানে-ওখানে জমাট অন্ধকার ফুটো করে ফুটে ফুটে উঠছে যেন সব আশ্চর্য আগুনের ফিনকি! সেগুলো জোনাকির মতো জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে! কিন্তু জোনাকিরা মনে জাগায় না ত্রাস, এগুলো দেখলে বুক কেমন ছমছম করে ওঠে, এ-সব অগ্নিকণার মধ্যে আছে যেন কোনও হিংস্র পৈশাচিকতা—এরা যেন বনবাসী ক্ষুধার্ত রক্তলোভীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

জয়ন্ত বিস্মিতভাবে কী বলবে ভাবছে, এমন সময়ে বিমল ও কুমার হেসে উঠল সকৌতুকে! এমন ভয়াবহ স্থানে সেই তরল কৌতুক-হাস্যকেও মনে হল অত্যন্ত অস্বাভাবিক!

—'আপনারা হঠাৎ হাসলেন কেন?'

—'অন্ধকারে গাছের ভিতরে যেগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে ওগুলো বাদুড় কী প্যাঁচার চোখ। খুব সম্ভব বাদুড়ের।'

তারা আবার এগিয়ে চলল—সেই দীপ্তদৃষ্টিময় বটগাছটাকে পিছনে ফেলে।

খানিকদূর এগিয়ে জয়ন্ত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'এ বনে আমরা ছাড়া আর কোনও মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাঘা ভুল পথে যাচ্ছে না তো?' কুমার মাথা নেড়ে বললে, 'বাঘা এমন ভুল কখনও তো করেনি!'

বিমল বললে, 'বনে এখন শত্রুদের অস্তিত্ব আছে কি না বলতে পারি না, কিন্তু এখান দিয়ে যে মানুষ আনাগোনা করে তার প্রমাণ তো এই পথটাই। এখানে মানুষ নিয়মিত কাজে পদার্পণ না করলে এই পথের কোনও চিহ্নই থাকত না, ঘনজঙ্গল নিশ্চয়ই তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলত।'

জয়ন্ত বললে, 'তাও তো বুঝছি। কিন্তু পথ আমাদের আরও কত দূরে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায়?'

—'খুব সম্ভব পথ শেষ হবে অবলাকান্তের আস্তানার কাছে গিয়ে।'

কুমার বললে, 'আস্তানার খোঁজ যদি পাই, আমরা কী করব?'

জয়ন্ত বললে, 'আবার আমাদের স্টেশনে সুন্দরবাবুর কাছে ফিরে যেতে হবে!'

—'তাতে অনেকটা সময় নষ্ট হবে না কি?'

—'নষ্ট হলেও উপায় নেই। শুনেছি এখানে নাকি শতাধিক ডাকাত আছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা তিনজনে কিছুই করতে পারব না।'

—'স্টেশন থেকে আমরা আবার যখন সদলবলে ফিরে আসব, তখন সন্ধ্যা উতরে যাবে।'

—'আসুক রাত্রি, আজ তার অন্ধকার হবে আমাদের বন্ধুর মতো। শত্রুদের চোখের আড়ালে থেকে আবার আমরা বনের ভিতরে ঢুকতে পারব। অন্ধকারেও আমাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়তো হবে না, কারণ চোখ অন্ধ হলেও আমাদের পথ দেখাবে বাঘার নাসিকা।'

চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, বারবার আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানেন? কে যেন আনাচে-কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, আমাদের ভাবভঙ্গি সমানে লক্ষ করছে, আমাদের প্রত্যেক কথা কান পেতে শুনছে।'

—'ওটা বোধহয় আপনার মনের ভ্রম। আমি তো এখানে কারুর সাড়া পাচ্ছি না। বরং মনে হচ্ছে এ বন যেন মনুষ্য-বর্জিত।'

আচম্বিতে যেন জয়ন্তের কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই অরণ্যের একটা অত্যন্ত-অন্ধকার অংশ থেকে ঠিক অপার্থিব স্বরেই খিল খিল করে কে হাসতে লাগল হি হি হি হি হি হি। সেই অদ্ভুত হাস্যধ্বনি রীতিমতো রোমাঞ্চকর!

জয়ন্ত ও বিমল চমকে উঠে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে।

কুমার বললে, 'যেদিন আহত হয়েছিলুম সেদিনও আমি শুনেছিলুম এই বিশ্রী হাসিই।'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু এ কে? এমন করে হাসে কেন?'

বিমল বললে, 'এ যে শত্রুদের চর নয় এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। শত্রুচর হলে লোকটা এমনভাবে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিত না।'

হাসির পর হাসির ধাক্কায় তখনও বন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জয়ন্ত বললে, 'খানিক আগে ঝোপের ফাঁকে আমরা বোধহয় এরই চোখ দেখতে পেয়েছিলুম।'

বিমল বললে, 'তাহলে বলতে হবে এর চোখ দুটো হচ্ছে বন্যজন্তুর চোখের মতো। এ আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসেই-বা কেন, আর দিনে-রাতে বনে বনে থাকেই-বা কেন?'

হাসি থামিয়ে হঠাৎ কে উদ্‌ভ্রান্ত তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'দিন-রাত বনে বনে থাকি কেন? দিন-রাত বনে বনে থাকি কেন? ওরে তোরা বুঝতে পারবিনি রে, বুঝতে পারবিনি, সে কথা বুঝতে পারবিনি!'

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'কে তুমি?'

—'হা হা হা হা! কে আমি? আমি তোদের বন্ধু!'

—'তুমি আমাদের বন্ধু!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোদের বন্ধু! কারণ তোরাও যা চাস, আমিও তাই চাই!'

—'আমরা কী চাই তুমি জানো?'

—'জানি জানি, ভালো করেই জানি! এগিয়ে যা, আরও খানিক এগিয়ে যা, তোরা আজ ঠিক পথই ধরেছিস! এই পথের শেষে আছে জঙ্গলে-ঢাকা ভাঙাবাড়ি। সেইখানেই তোদের মনের বাসনা পূর্ণ হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি তো অনেক কথাই জানো দেখছি! বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছ, একবার বাইরে বেরিয়ে এসো না।'

—'না, না, না। আমাকে দেখলে তোরা ভয় পাবি।'

—'বেশ, দেখা যাক তোমাকে দেখে আমরা ভয় পাই কি না।' বলেই বিমল দুই হাতে ঝোপ ঠেলে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলে।

খানিক দূরের একটা ঝুপসি গাছের তলায় শুকনো পাতার শব্দ জাগল। দেখা গেল যেন একটা বিদ্যুৎগতিতে বিলীয়মান ছায়াকে। তারপর আর কিছুই দেখা বা শোনা গেল না।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বিমল হতাশ কণ্ঠে বললে, 'নাঃ, লোকটার পাত্তা পাওয়া গেল না! সেও দেখছি এই বনের আর একটা মূর্তিমান রহস্য!'

কুমার বললে, 'কিন্তু সে আমাদের উদ্দেশ্য জানলে কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

বিমল বললে, 'কেবল তাই নয়, বললে, তার আর আমাদের মনের বাসনা নাকি এক। এ কথারই বা অর্থ কী?'

—'লোকটা ছদ্মবেশী পুলিশের চর নয় তো?'

—'পুলিশের চর কখনও অমন পাগলের মতন অট্টহাসি হাসে? সে আমাদের দেখা দিতেও প্রস্তুত নয়। বলে কিনা তাকে দেখলে আমরা ভয় পাব। তার মূর্তি কি এমনই ভয়াবহ?' কথা কইতে কইতে সকলে অগ্রসর হচ্ছে। তারপর তারা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে ছিল খানিকটা ঘাসজমি—তার আয়তন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘার বেশি নয়। জমির একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটি নদী, রৌদ্রকিরণে যার জলধারাকে মনে হচ্ছে হীরকধারার মতো। হয়তো এখান থেকে অনেক দূরে এই নদীরই উপরে আছে সেই সেতু, যার সাহায্যে তারা এসেছে এপারে।

ফাঁকা ঘাসজমির উপরটা শুঁকতে শুঁকতে বাঘা চলল ওধারের বনের দিকে। সকলে যখন বনের খুব কাছে এসে পড়েছে তখন হঠাৎ জাগল এক আকাশ-বাতাস-কাঁপানো বিকট চিৎকার 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! সামনেই দুশমন—আর তাকে পালাতে দিয়ো না, দিয়ো না, দিয়ো না!'

বিমলদের কাছে থেকে হাত-বিশ তফাতে, বনের ভিতর থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল একটা সুদীর্ঘ ও বিপুল মূর্তি।

সেই অদ্ভুত চিৎকার শুনে মূর্তিটা চমকে উঠে একবার পিছন ফিরে তাকালে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে চেয়েই সে স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে হচ্ছে অবলাকান্ত স্বয়ং।

একাদশ

জয়, বাঘার জয়

অবলাকান্তের স্তম্ভিত ভাবটা স্থায়ী হল সেকেন্ড দুই মাত্র।

তারপরেই সে আবার পিছন ফিরে মস্ত একলাফ মেরে ঢুকল গিয়ে বনের ভিতরে!

জয়ন্ত, বিমল ও কুমারও চোখের সুমুখে আচম্বিতে অবলাকান্তকে দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যার জন্যে এত হাঙ্গামা, সে যে নিজেই এমন অভাবিত রূপে তাদের কাছে একলা এসে দাঁড়াবে, এতটা আশা করতে পারেনি তারা।

এখন অবলাকান্ত আবার সরে পড়ে দেখে তাদের চটক গেল ভেঙে। তারাও প্রাণপণে ছুটল তার পিছনে পিছনে।

কুমার চিৎকার করে বললে, 'বাঘা, বাঘা! তুই আমাদেরও চেয়ে জোরে ছুটতে পারিস! ধর, ধর, অবলাকান্তের একখানা পা কামড়ে ধর!'

বাঘা এক দৌড়ে স্যাঁত করে বনের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার বনে ঢুকে অবলাকান্ত বা বাঘা কারুকেই দেখতে পেলে না।

অল্পক্ষণ এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করবার পর বিমল বললে, 'এখন কোনদিকে যাই? অবলাকান্ত আবার বুঝি আমাদের কলা দেখালে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু বাঘা এখনও নিশ্চয়ই তার পিছু ছাড়েনি!'

কুমার বললে, 'সেইটেই হচ্ছে ভাবনার কথা। বাঘা যে অবলাকান্তের পিছু ছাড়বে না, আমি তা জানি। কিন্তু বাঘা যদি তার আড্ডার কাছ পর্যন্ত যায়, তাহলে আর কি তাকে ফিরে পাব?'

বিমল বললে, 'আমরা সকলেই সশস্ত্র। যতদূর মনে হল অবলাকান্ত নিরস্ত্র আর একাকী। এসো, আমরা তিনজনে বনের তিনদিকে যাই—কোনও-না-কোনওদিকে নিশ্চয়ই অবলাকান্ত আর বাঘার সন্ধান পাওয়া যাবে। আপনি কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি কি ভাবছি জানেন? কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ কখনও এতক্ষণ দৌড়োতে পারে না। এতক্ষণে বাঘার অবলাকান্তকে ধরে ফেলবার কথা। তবু দুই প্রাণীর কারুরই সাড়া পাচ্ছি না কেন?'

বিমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'ঠিক বলেছেন, এতক্ষণে একথা তো ভেবে দেখিনি! আমরা সকলেই জানি, অবলাকান্ত হচ্ছে অসুরের মতন বলবান। তাহলে সে কি এর মধ্যেই বাঘাকে বধ করে ফেলেছে?'

কুমার করুণ স্বরে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'বাঘা, বাঘা, বাঘা! ওরে বাঘা রে!'

বেশ-খানিকটা তফাত থেকে বাঘার সাড়া ভেসে এল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

কুমার সানন্দে নৃত্য করে বলে উঠল, 'আমার বাঘা বেঁচে আছে—আমার বাঘা বেঁচে আছে! বাঘা! বাঘা!'

—'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

বিমল বললে, 'বাঘা সাড়া দিচ্ছে বনের দক্ষিণদিক থেকে।'

কুমার ব্যস্তভাবে সেইদিকে ছুটতে ছুটতে বললে, 'চলো চলো, দেখে আসি ব্যাপারটা কী?'

কুমার দৌড়োতে দৌড়োতে ক্রমাগত 'বাঘা বাঘা' বলে ডাক দিতে লাগল এবং বাঘাও ক্রমাগত 'ঘেউ ঘেউ' করে দিতে লাগল তার জবাব! বাঘার গলার আওয়াজ শুনেই তারা

তিনজনেই অগ্রসর হতে লাগল। ক্রমেই বাঘার কণ্ঠস্বর এগিয়ে এল তাদের কাছ থেকে আরও কাছে।

তার অল্প পরেই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাঘা চিৎকার করতে করতে উপর-পানে মুখ তুলে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে। এবং গাছের উপরে হচ্ছে ঘন-ঘন-ডাল-পাতা নড়ে ওঠার শব্দ! সে-শব্দ একটা গাছের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নেই, শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের দিকে!

বিমল হেসে ফেলে বললে, 'কুমার, কাণ্ডটা কী বুঝছ তো? তোমার বাঘার দাঁতের আদর থেকে নিস্তার পাবার জন্যে অবলাকান্ত গিয়ে চড়েছে ওই গাছের উপরে! এখানকার গাছগুলো ঠিক যেন দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরকে জড়াজড়ি করে, তাই সুমাত্রাদ্বীপের ওরাং-উটানের মতন অবলাকান্তও পালিয়ে যাচ্ছে ডাল ধরে একগাছ থেকে পাশের গাছের উপরে লাফ মারতে মারতে! অবলাকান্তকে আমি বাহাদুর উপাধি দিতে বাধ্য, কারণ আমিও বোধহয় বানরের ধর্ম এমন ক্ষিপ্রগতিতে পালন করতে পারতুম না! আশ্চর্য মানুষ এই অবলাকান্ত!'

বাঘার সঙ্গে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু এইবারে অবলাকান্ত-বাবাজি যাবেন কোথায়? গাছের সার শেষ হয়ে এসেছে, তারপরই দেখছি ফাঁকা জায়গা, আর তারপরেই সেই নদীটা! এইবারে শ্রীমানকে আমাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়তে হবে! শোনো অবলাকান্ত, এই বেলা ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করো!'

অবলাকান্ত তখন শেষ-গাছের একটা উঁচু ডালের উপরে দাঁড়িয়ে। সে হিংস্র জন্তুর মতন গর্জন করে বললে, 'আত্মসমর্পণ? অবলাকান্ত জীবনে কখনও আত্মসমর্পণ করতে শেখেনি! ওইখানে দাঁড়িয়ে থাক তোরা ছুঁচো-ইঁদুরের দল! আমি এখনই গাছ থেকে নেমে তোদের প্রতি-আক্রমণ করব! মরি তো লড়তে লড়তেই মরব!' বলেই সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে শেষ-গাছের উপর থেকে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল! তার অভাবিত নির্ভীকতা দেখে জয়ন্ত, বিমল ও কুমার হতভম্বের মতো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

অনেকটা নীচে নেমেই অবলাকান্ত এদিকে আসতে আসতে হঠাৎ ফিরে মাথার উপরকার একটা ডাল ধরে এবং পায়ের তলাকার একটা ডালের উপর দিয়ে সেইরকম অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে অন্য দিকে চলে গিয়ে লাফ মেরে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর ঝড়ের মতন ছুটে চলল নদীর দিকে! বাঘা কিন্তু শত্রুর দিকে তার দৃষ্টি রেখেছিল সম্পূর্ণ জাগ্রত। সেও তিরের মতন ছুটল অবলাকান্তের পিছনে পিছনে! তারপর অবলাকান্ত প্রায় যখন নদীর কাছে গিয়ে পড়েছে, বাঘা তখন তার উপরে লাফিয়ে পড়ে শত্রুর একখানা পা প্রাণপণে কামড়ে ধরলে!

বিপুলবপু অবলাকান্ত বাঘাকে কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সে পা-সুদ্ধ বাঘাকে নিয়ে টানতে টানতে এগিয়ে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করলে!

বিমল চিৎকার করে বললে, 'গুলি করো! অবলাকান্তের পা লক্ষ্য করে গুলি করো! 'জেরিনার কণ্ঠহার' মামলায় অবলাকান্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়েছিল! 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' মামলাতেও মোটরবোট থেকে ও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আর একবার সরে পড়েছিল! এবারও সে নদীকেই অবলম্বন করতে চায়! গুলি করো, গুলি করো, গুলি করো!'

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত তখনই বন্দুক তুলে ধরলে। কিন্তু তারপর চোখের নিমেষেই ঘটল এক কল্পনাতীত ঘটনা!

যেন নদী-তীরের মাটি ফুঁড়েই আবির্ভূত হল এক অমানুষিক মূর্তি! উচ্চতায় সে প্রায় সাড়ে ছয়-ফুট, কিন্তু দেহ তার ঠিক মাংসহীন কঙ্কালের মতন শীর্ণ! তার মাথা থেকে লটপট ও ছটফট করতে করতে বিষাক্ত সাপের মতন ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে দীর্ঘ দীর্ঘ তৈলহীন রুক্ষ জটা! এবং দুই-চক্ষে তার জ্বলে জ্বলে উঠছে অসীম নিষ্ঠুরতার অগ্নিশিখা! প্রায়-উলঙ্গ তার দেহ, কোমরে তার ঝুলছে কেবল এক-টুকরো অতি-মলিন ন্যাকড়া! সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে বিমল, কুমার ও জয়ন্ত এমন স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, হাতের বন্দুক হাতেই রেখে তারা বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মতন!

সেই প্রেত-মূর্তিকে দেখেই অবলাকান্ত সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। কারণ ছিনেজোঁক বাঘা তখনও তাকে ত্যাগ করেনি, সে নিজের দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শত্রুর পা ধরে আকর্ষণ করতে লাগল।

প্রেত-মূর্তিটা একটা দুঃস্বপ্নের ঝটকার মতন অবলাকান্তের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বিদ্যুৎ খেলিয়ে তার হাতের ছোরা উপরে উঠল এবং চকিতে অবলাকান্তের বুকের উপরে গিয়ে নামল! এদিকে-ওদিকে বুকের রক্ত ছিটিয়ে বিষম একটা আর্তনাদ করে অবলাকান্ত পড়ল মাটির উপর লুটিয়ে।

তার পাশে গিয়ে সেই প্রেতের মতন মূর্তি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললে, 'আমাকে চিনতে পারছিস অবলাকান্ত? চার বছর আগে তুই তোর ডাকাতের দল নিয়ে আমার বাড়ির উপরে হানা দিয়েছিলি! তুই আমার স্ত্রী, দুই ছেলে আর মেয়েকে খুন করে আমার বংশে বাতি দিতে আর কারুকে রাখিসনি! সেদিন কোনওগতিকে প্রাণ নিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পেরেছিলুম! কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাইনি, আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম প্রতিশোধ নেবার জন্যে বেঁচে থাকব বলে! বন্যজন্তুর মতন তুই বনে বনে থাকিস, আমিও তোর পিছনে-পিছনে ছায়ার মতন ঘুরে হইছি অমানুষ বন্যজন্তুরই মতন! চিনতে পারিস? তুই আজ আমাকে চিনতে পারিস কি? হা-হা-হা-হা-হা-হা! প্রতিশোধ নিয়েছি, আজ আমি প্রতিশোধ নিয়েছি!'

বাঘা তখনও অবলাকান্তের পা ছাড়েনি এবং সে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েও তখনও মরেনি। সেই অবস্থাতেই সে হঠাৎ উঠে বসল এবং প্রাণপণে নিজের দুই বলিষ্ঠ বাহু জড়িয়ে প্রেত-মূর্তিকে ধরে নিজের কাছে টেনে মাটির উপরে আছড়ে ফেললে। এবং তারপর সজোরে চেপে ধরলে তার কণ্ঠদেশ! কিন্তু কণ্ঠ যখন তার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনও সেই মূর্তিটা অবলাকান্তের দেহের উপরে চকচকে ছোরার আঘাত করতে লাগল বারংবার। তারপর দুই মূর্তি নদীতীরে পড়ে রইল একেবারে নিশ্চেষ্ট নির্জীবের মতন।

সর্বাগ্রে কুমার গিয়ে বললে, 'বাঘা, তুই ওর পা ছেড়েদে। তুই কাকে কামড়ে আছিস? তোর শত্রু মরে গেছে!'

বাঘা তার শত্রুকে ত্যাগ করে প্রভুর দিকে রক্তাক্ত মুখ তুলে সানন্দে ও সবেগে লাঙ্গুল আন্দোলন করতে লাগল।

বিমল কাতর কণ্ঠে বললে, 'অবলাকান্তের মতন শরীরী পাপ পৃথিবী থেকে বিদেয় হল বলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইনি। কিন্তু এই হতভাগ্য উন্মত্তের জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অবলাকান্ত মরে গিয়েও দুই হাতে ওর গলা চেপে রয়েছে। বেচারিকে ওর হাত ছাড়িয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো জয়ন্তবাবু, ও এখনও বেঁচে আছে কি না?'

জয়ন্ত সেই শীর্ণ-বিশীর্ণ প্রায়-নগ্ন কঙ্কালমূর্তিকে অবলাকান্তের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'এ আর বেঁচে নেই বিমলবাবু! প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দানবের কবলে এর মৃত্যু হয়েছে! এই আমার খেদ রইল যে, শেষ পর্যন্ত অবলাকান্তকে ফাঁসিকাঠে দোলাতে পারলুম না!'

বিমল বললে, 'মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না জয়ন্তবাবু! কিন্তু অবলাকান্ত আজ যে এই দুনিয়ায় নেই, পৃথিবীর পক্ষে এটা কি একটা সান্ত্বনার কথা নয়?'

কুমার সগর্বে বললে, 'বাঘা, আমার বাঘা! অবলাকান্তকে কে ধরতে পারত আমার বাঘা না থাকলে?'

বিমল হেঁট হয়ে বাঘাকে কোলে করে তুলে নিয়ে বললে, 'ঠিক কথাই তো! বলুন জয়ন্তবাবু—জয়, বাঘার জয়।'

জয়ন্ত সাদরে বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'এ-মামলায় বাঘাকেই তো বাহাদুর বলে মানতে হবে। বাঘা না থাকলে আজ আমরা অবলাকান্তের আস্তানার কাছে আসতেই পারতুম না। বাঘা না থাকলে অবলাকান্ত বৃক্ষের উপরে আরোহণ করে আমাদের চোখের সামনে ধরা দিতে বাধ্য হত না। আর বাঘা অবলাকান্তকে কামড়ে না থাকলে, বোধহয় সে ওই প্রেত-মূর্তিকে ফাঁকি দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগেকার মতো আজকেও আমাদের ফাঁকি দিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যেত! অতএব—জয়, বাঘার জয়! এ-মামলায় সবচেয়ে বড়ো গোয়েন্দার কাজ করেছে এই সারমেয়-অবতার বাঘাই! সুতরাং আবার বলি—জয়, বাঘার জয়!'

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর

এক

কার পা

কুমার সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ ঝড়ের মতন ঘরের ভিতর ঢুকে বলে উঠল, "কুমার, কুমার!—শীগগির, শীগগির কর! ওঠ, জামা-কাপড় ছেড়ে পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নাও!"

কুমার হতভম্বের মতন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপরে রেখে বললে, "ব্যাপার কি বিমল?"

—"বেশি কথা বলবার সময় নেই। বিনয়বাবু তাঁর মেয়ে মৃণুকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছেন, জানো তো? হঠাৎ আজ সকালে তাঁর এক জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাঁর মেয়েকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর এর ভেতরে নাকি গভীর রহস্য আছে। অবিলম্বে আমাদের সাহায্যের দরকার।...এ কথা শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়? দার্জিলিংয়ের ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টা দেরি। আমি প্রস্তুত, আমার মোট-ঘাট নিয়ে রামহরিও প্রস্তুত হয়ে তোমার বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে, এখন তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। ওঠ, ওঠ, আর দেরি নয়!"

কুমার একলাফে চেয়ার ত্যাগ করে বললে, "আমাদের সঙ্গে বাঘাও যাবে তো?"

—"তা আর বলতে! হয়তো তার সাহায্যেরও দরকার হবে!"

জিনিস-পত্তর গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে কুমারের আধঘণ্টাও লাগল না। সবাই শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে ছুটল।

দার্জিলিং। দূরে হিমালয়ের বিপুল দেহ বিরাট এক তুষারদানবের মতন আকাশে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে আছে। কিন্তু তখন এ-সব লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা কারুরই ছিল না।

একটা গোল টেবিলের ধারে বসে আছে বিমল ও কুমার। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রামহরি, এবং ঘরের ভিতরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন বিনয়বাবু।

যাঁরা "যখের ধন" প্রভৃতি উপন্যাস পড়েছেন, বিমল, কুমার ও রামহরিকে তাঁরা নিশ্চয়ই চেনেন। আর যাঁরা "মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন" ও "মায়াকানন" প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সরলপ্রাণ, বিপুলবক্ষ ও শক্তিমান এই বিনয়বাবুর নূতন পরিচয় বোধহয় আর দিতে হবে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর বিনয়বাবু?"

বিনয়বাবু বললেন, "মৃণু বেড়াতে গিয়েছিল বৈকালে। সন্ধ্যে থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে না পেয়ে মনে মনে ভাবলুম, হয়তো এতক্ষণ সে বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাসায় ফিরে দেখি, মৃণু তখনো আসেনি। লোকজন নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম, সারা রাত ধরে তাকে পথে-বিপথে সর্বত্র কোথাও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, তারপর সকাল-বেলায় আধ-মরার মতন আবার শূন্য বাসায় ফিরে এলুম। বিমল! কুমার! তোমরা জান তো, মৃণু আমার একমাত্র সন্তান। তার বয়স হল প্রায় ষোলো বৎসর, কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বলে এখনো তার বিয়ে দিইনি। তার মা বেঁচে নেই, আমিই তার সব। তাকে ছেড়ে আমিও একদণ্ড থাকতে পারি না। আমার এই আদরের মৃণুকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, এখন আমি কেমন করে বেঁচে থাকব?"—বলতে বলতে বিনয়বাবুর দুই চোখ কান্নার জলে ভরে উঠল।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, স্থির হোন। মৃণুকে যে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি এ-রকম সন্দেহ করছেন কেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "সন্দেহের কারণ আছে কুমার। মৃণু হারিয়ে যাবার পরে দু'দিনে এখানকার আরও তিনজন লোক হারিয়ে গেছে।"

বিমল বললে, "তারাও কী স্ত্রীলোক?"

—"না, পুরুষ। একজন হচ্ছে সাহেব, বাকি দুজন পাহাড়ী। তাদের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যজনক। অনেক খোঁজ করেও পুলিশ কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি।"

বিমল ও কুমার একসঙ্গে বলে উঠল, "কি আবিষ্কার করেছেন বিনয়বাবু?"

—"শহরের বাইরে পাহাড়ের এক জঙ্গল-ভরা শুঁড়ি-পথের সামনে মৃণুর একপাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েছি। সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জুতোর অন্য পাটি আর পাইনি। এ থেকে কি বুঝব? জুতোর অন্য পাটি মৃণুর পায়েই আছে। ইচ্ছে করে একপাটি জুতো খুলে আর এক পায়ে জুতো পরে কেউ এই পাহাড়ে-পথে হাঁটে না। মৃণুকে কেউ বা কারা নিশ্চয়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে-হিঁচড়ে বা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে, আর সেই সময়েই ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে তার পা থেকে এক পাটি জুতো খুলে পড়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, যে-জায়গায় আপনি মৃণুর জুতো কুড়িয়ে পেয়েছেন, সে-জায়গাটা আমাদের একবার দেখাতে পারেন?"

—"কেন পারব না? কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনই লাভ নেই! বিশজন

লোক নিয়ে সেখানকার প্রতি-ইঞ্চি জায়গা আমি খুঁজে দেখেছি, আমার পর পুলিশও খুঁজতে বাকি রাখেনি, তবু—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "তবু আমরা আর একবার সে জায়গাটা দেখব। চলুন বিনয়বাবু, এস কুমার!"

বিমলের আগ্রহ দেখে বিনয়বাবু কিছুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু মুখে কিছু না বলে সকলকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাঘাও বাসায় একলাটি শিকলিতে বাঁধা থাকতে রাজি হল না, কাজেই কুমার তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

ঘণ্টা-দুয়েক পথ চলার পর সকলে যেখানে এসে হাজির হল, পাহাড়ের সে-জায়গাটা ভয়ানক নির্জন। একটা শুঁড়ি-পথ জঙ্গলের বুক ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে, তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, "এখানেই মৃণুর একপাটি জুতো পাওয়া যায়।"

বিমল অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করলে, কিন্তু নূতন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

কুমার বললে, "যদি কেউ মৃণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ঐ শুঁড়ি-পথের ভেতর দিয়েই হয়তো সে গেছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ও-পথের সমস্তই আমরা বার বার খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি।"

এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতরে খানিক তফাৎ থেকে বাঘার ঘন ঘন চিৎকার শোনা গেল।

কুমার তার বাঘার ভাষা বুঝত। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, "বাঘা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু দেখেছে! বাঘা! বাঘা!"

তার ডাক শুনে বাঘা একটু পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে উত্তেজিতভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল। তারপর কুমারের মুখের পানে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডাকে, আবার জঙ্গলের ভিতরে ছুটে যায়, আবার বেরিয়ে আসে, ল্যাজ নেড়ে ডাকে, আর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢোকে!

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, বুঝতে পারছেন কি, বাঘা আমাদের জঙ্গলের ভেতরে যেতে বলছে?"

বিমল বললে, "বাঘাকে আমিও জানি, ওকে কুকুর বলে অবহেলা করলে আমরাই হয়তো ঠকব! চল, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যাক।"

জঙ্গলের ঝোপঝাপ ঠেলে সকলেই বাঘার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হল। যেতে যেতে বিমল লক্ষ্য করলে, জঙ্গলের অনেক ঝোপঝাপ যেন কারা দু-হাতে উপ্‌ড়ে ফেলেছে, যেন একদল মত্ত হস্তী এই জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে গিয়েছে। বিমল শুধু লক্ষ্যই করলে, কারুকে কিছু বললে না।

বাঘাকে অনুসরণ করে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একটা ঝোপের পাশে মানুষের এক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে!

সে দেহ এক ভুটিয়ার। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, মাথাটাও ভীষণভাবে ফেটে গিয়েছে আর তার চারিপাশে রক্তের স্রোত জমাট হয়ে রয়েছে!

বিনয়বাবু স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কি আশ্চর্য! জঙ্গলের এখানটাও তো আমরা খুঁজেছি, কিন্তু তখন তো এ দেহটা এখানে ছিল না!"

কুমার বললে, "হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে তার পরে। দেখছেন না, ওর দেহ থেকে এখনো রক্ত ঝরছে!"

হঠাৎ দেহটা একটু নড়ে উঠল!

বিমল তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললে, "এ যে এখনো বেঁচে আছে!"

আহত ব্যক্তি ভুটিয়া ভাষায় যন্ত্রণা-ভরা খুব মৃদু স্বরে বললে, "একটু জল।"

বিমলের 'ফ্লাস্কে' জল ছিল। 'ফ্লাস্কে'র ছিপি খুলতে খুলতে সে শুধোলে, "কে তোমার এমন দশা করলে?"

দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে সে খালি বললে, "ভূত—ভূত! ...জল!"

বিমল তার মুখে জল ঢেলে দিতে গেল, কিন্তু সে জল হতভাগ্যের গলা দিয়ে গলল না, তার আগেই তার মৃত্যু হল।

কুমার হঠাৎ ভীতভাবে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "বিমল! দেখ, দেখ!"

জমাট রক্তের উপরে একটা প্রকাণ্ড পায়ের দাগ! সে দাগ অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতো,—কিন্তু লম্বায় তা প্রায় আড়াই ফুট এবং চওড়াতেও এক ফুটেরও বেশি! মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া কি সম্ভব? যার পা এমন, তার দেহ কেমনধারা?

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই বিষম পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কাঠের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

দুই
বাবা মহাদেবের চ্যালা

সকলের আগে কথা কইলেন বিনয়বাবু। ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "বিমল! কুমার! একি অসম্ভব ব্যাপার! আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?"

রামহরি আড়ষ্টভাবে মত প্রকাশ করলে, এ মস্তবড় একটা বিদ্‌কুটে ভূতের পায়ের দাগ না হয়ে যায় না!

কুমার বললে, "বিমল, আমরা কি আবার কোন ঘটোৎকচের* পাল্লায় পড়লুম? মানুষের পায়ের দাগ তো এত-বড় হতেই পারে না!"

পায়ের দাগটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, "মানুষের পায়ের দাগ এত-বড় হওয়া সম্ভব নয় বটে কিন্তু এ দাগ যে অমানুষের পায়েরও নয়, এটা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কি প্রমাণ দেখে তুমি এ কথা বলছ?"

বিমল মৃত ভুটিয়ার একখানা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে নিয়ে বললে, "এর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে দেখুন!"

সকলে দেখলে, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছে।

বিনয়বাবু চুলগুলো লক্ষ্য করে দেখে বললেন, "এ কার মাথার চুল? এত লম্বা, আর এত মোটা?"

বিমল বললে, "এ চুল যে ঐ ভুটিয়ার মাথার চুল নয়, সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে কেমন করে ও চুলগুলো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে এল?"

কুমার বললে, "যার আক্রমণে ও-বেচারীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, এগুলো নিশ্চয়ই তার মাথার চুল।"

বিমল বললে, "আমারও সেই মত। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে ভুটিয়াটা নিশ্চয়ই তার চুল মুঠো করে ধরেছিল।...দেখুন বিনয়বাবু, চুলগুলো ঠিক মানুষেরই মাথার চুলের মতো, কিন্তু মানুষের মাথার চুল এত মোটা হয় না। এই পায়ের দাগ আর এই মাথার চুল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ভুটিয়াকে যে আক্রমণ করেছিল, লম্বায় সে হয়তো পনেরো-ষোলো ফুট উঁচু!"

কুমার হতভম্বের মতো বললে, "বায়োস্কোপের কিং কঙ কি শেষটা হিমালয়ে এসে দেখা দিল?"

---

* 'আবার যখের ধন' দ্রষ্টব্য।

বিমল বললে, "আরে কিং কঙ তো গাঁজাখুরি গল্পের একটা দানব গরিলা! আর আমরা এখানে সত্যিকারের যে পায়ের দাগ দেখছি, এটা তো গরিলার নয়—কোন দানব বা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড মানুষের পায়ের দাগ!...এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন মানুষ কি থাকতে পারে?"

কুমার বললে, "হিমালয়ের ভিতরে যদি এমন কোন অজানা জন্তু থাকে,—যার পায়ের দাগ আর মাথা বা গায়ের চুল মানুষের মতো?"

বিনয়বাবু বললেন, "হয়তো ও মাথার চুল আর পায়ের দাগ জাল করে কেউ আমাদের ধাঁধায় ফেলবার বা ভয় দেখাবার ফিকিরে আছে।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, এই চুলগুলো আপাতত আমি তো নিয়ে যাই, পরে কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই সব বোঝা যাবে।"

রামহরি বার বার ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, "এ-সব কোন কথার মতো কথাই নয়,—ঐ ভুটিয়াটা মরবার সময়ে যা বলেছিল তাই হচ্ছে আসল কথা! এ সব হচ্ছে ভূতের কাণ্ডকারখানা!"

বিনয়বাবু করুণ স্বরে বললেন, "আমার মৃণু কি আর বেঁচে আছে?"

বিমল তাড়াতাড়ি তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, "চুপ!"

তখন পাহাড়ের বুকের ভিতরে সন্ধ্যা নেমে আসছে,—দূরের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেছে। পাখিরা যে যার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, চারিদিক স্তব্ধ!

সেই স্তব্ধতার মধ্যে অজানা শব্দ হচ্ছে—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। কারা যেন খুব ভারি পা ফেলে এগিয়ে আসছে!

বাঘা কান খাড়া করে সব শুনে রেগে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের এক থাব্‌ড়া খেয়ে একেবারে চুপ মেরে গেল!

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "শীগ্‌গির, লুকিয়ে পড়ুন—কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোথাও।"

বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সবাই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আরো একটু এগিয়েই দেখা গেল, ছোট গুহার মতন একটা অন্ধকার গর্ত,—হামাগুড়ি না দিলে তার মধ্যে ঢোকা যায় না এবং তার মধ্যে অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার থাকাও অসম্ভব নয়! কিন্তু উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে-সব কথা কেউ মনেও আনলে না, কোন রকমে গুড়ি মেরে একে একে সকলেই সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ল!

ভয় পায়নি কেবল বাঘা, তার ঘন ঘন ল্যাজ নাড়া দেখেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল, এ এক মস্ত মজার খেলা!

গর্তের মুখের দিকে মুখ রেখে বিমল হুমড়ি খেয়ে বসে রইল—সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে বিমলের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিলে। কান পেতেও সেই ধুপধুপুনি শব্দ আর কেউ শুনতে পেলে না।

বুনো হাওয়া গাছে গাছে দোল খেয়ে গোলমাল করছিল, তা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া গর্তের ভিতরে ঢুকে সকলের গায়ে যেন বরফের ছুরি মারতে লাগল।

কুমার মৃদুস্বরে বললে, "বোধহয় আর কোন বিপদের ভয় নেই,—এইবারে বাইরে বেরিয়ে পড়া যাক!"

ঠিক যেন তার কথার প্রতিবাদ করেই খানিক তফাৎ থেকে কে অট্টহাসি হেসে উঠল! খুব বড় গ্রামোফোনের হর্নে মুখ রেখে অট্টহাসি করলে যেমন জোর-আওয়াজ হয়, সে-হাসির শব্দ যেন সেই রকম,—কিন্তু তার চেয়েও শুনতে ঢের বেশি ভীষণ!

সে-হাসি থামতে-না-থামতে আরো পাঁচ-ছয়টা বিরাট কণ্ঠে তেমনি ভয়ানক অট্টহাসের স্রোত ছুটে গেল! সে যেন মহা দানবের হাসি, মানুষের কান এমন হাসি কোনদিনই শোনেনি। যাদের হাসি এমন, তাদের চেহারা কেমন?

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে আগুনের আভা এবং মাঝে মাঝে তার শিখাও দেখা গেল।

বিমল চুপিচুপি বললে, "আগুন জ্বেলে কারা ওখানে কি করছে?"

রামহরি বললে, "ভূতেরা আগুন পোয়াচ্ছে!"

বিমল বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?"

রামহরি টপ করে তার হাত ধরে বললে, "থাক, অত শখে আর কাজ নেই।"

মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক কণ্ঠের অদ্ভুত চিৎকার জেগে জেগে উঠে সেই পাহাড়ে-রাত্রির তন্দ্রা ভেঙে দিতে লাগল। সে রহস্যময় চিৎকারের মধ্যে এমন একটা হিংসার ভাব ছিল যে, শুনলেই বুকটা ধড়্ফড়্ করে ওঠে। সে যে কাদের কণ্ঠস্বর তা জানবার বা বোঝবার যো ছিল না বটে, কিন্তু সে-চিৎকার যে মানুষের নয়, এটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

বিমল বললে, "আ-হা-হা-হা, থাকত আমার বন্দুকটা সঙ্গে, তাহলে ওদের চালাকি এখনি বার করে দিতুম।"

কুমার বললে, "আরে রাখো তোমার বন্দুকের কথা। কাল সারারাত কেটেছে ট্রেনে—আমার এখন ক্ষিদে পেয়েছে, আমার এখন ঘুম পেয়েছে!"

বিমল বললে, "ও পেটের আর ঘুমের কথা কালকে ভেবো, আজকের রাতটা দেখছি এখানেই কাটাতে হবে।"

*　　*　　*　　*　　*

সদ্যজাগা সূর্য যখন হিমালয়ের শিখরে শিখরে সোনার মুকুট বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর বিমলদের মোটেই ছিল না।

মাঝ-রাতের পরেই জঙ্গলের আগুন নিবে ও সেই আশ্চর্য চিৎকার থেমে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই গর্ত থেকে বেরুবার জন্যে বিমল ও কুমার ছটফটিয়ে সারা হচ্ছিল, কিন্তু বিনয়বাবু ও রামহরির সজাগ পাহারায় এতক্ষণ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি।

এখন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তারা এক এক লাফে গর্তের বাইরে এসে পড়ল এবং আবার স্বাধীনতা পেয়ে তাদের চেয়েও কম খুশি হল না বাঘা, কারণ যেখানে আগুন জ্বলছে ও চিৎকার হচ্ছে সেখানটায় একবার ঘুরে আসবার জন্যে তারও মন কাল সারা-রাত আনচান করেছে। তাই গর্ত থেকে বেরিয়েই বাঘা সেই জঙ্গলের ভিতরে ছুট দিলে এবং তার পিছনে পিছনে ছুটল বিমল ও কুমার।

কাল যেখান থেকে তারা পালিয়ে এসেছে, আজ তারা প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হাজির হল। দেখেই বোঝা গেল, কাঠ-কাটরা এনে কারা সেখানে সত্যসত্যই আগুন জ্বেলেছিল। ভস্মের স্তূপ থেকে তখনো অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

মাটির উপরেও ইতস্তত ছাই ছড়ানো রয়েছে। সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিমল বললে, "দেখ।"

কুমার অবাক হয়ে দেখলে, সেখানকার ছাইগাদার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেমনি মানুষের-মতন-অমানুষের পায়ের দাগ রয়েছে অনেকগুলো!

বাঘা সেই এক-একটা পায়ের দাগ শোঁকে, আর রেগে গর্‌গর্‌ করে ওঠে! তারও বুঝতে দেরি লাগল না যে, এ-সব পায়ের দাগ রেখে গেছে যারা, তারা তাদের বন্ধু নয়!

ততক্ষণে বিনয়বাবুর সঙ্গে রামহরিও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। বিমলকে ডেকে সে গম্ভীরভাবে বললে, "খোকাবাবু, আমার কথা শোনো। হিমালয় হচ্ছে বাবা মহাদেবের ঠাঁই। বাবা মহাদেব হচ্ছেন ভূতেদের কর্তা। এ-জায়গাটা হচ্ছে ভূতপ্রেতদের আড্ডা। যা দেখবার, সবই তো দেখা হল—আর এখানে গোলমাল কোরো না, লক্ষ্মীছেলের মতো ভালোয় ভালোয় বাসায় ফিরে চল!"

বিনয়বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ কী ব্যাপার! সেই ভুটিয়াটার লাশ কোথায় গেল?"

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুমার বললে, "নিশ্চয় কোন জন্তু-টন্তু টেনে নিয়ে গিয়েছে!"

রামহরি বললে, "ঐ যে, তার জামা আর ইজের ঐখানে পড়ে রয়েছে!"

বিমল একটা গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে ছাইগাদা নাড়তে নাড়তে বললে, "কুমার, কোন জন্তু-টন্তুতে সে লাশ টেনে নিয়ে যায়নি, সে লাশ কোথায় গেছে তা যদি জানতে চাও তবে এই ছাইগাদার দিকে নজর দাও।"

—"ও কি! ছাইয়ের ভেতরে অত হাড়ের টুকরো এল কোথা থেকে?"

—"হ্যাঁ, আমারও কথা হচ্ছে তাই। কুমার, কাল রাতে যারা এখানে এসেছিল, তারা সেই ভুটিয়াটার দেহ আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে!"

রামহরি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

তিন

রামহরির শাস্ত্র-বচন

সকলে স্তম্ভিত ভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেবল বাঘা পায়ের দাগগুলো শুঁকতে শুঁকতে অজ্ঞাত শত্রুদের বিরুদ্ধে তখনো কুক্কুর-ভাষায় গালাগালি বৃষ্টি করছিল।

বিমল তার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটি ক্যামেরা বার করে বললে, "এই আশ্চর্য পায়ের দাগের একটা মাপ আর ফটো নিয়ে রাখা ভালো। পরে দরকার হবে।"

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করবার দরকার নেই। যা দেখছি তাইই যথেষ্ট! আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃণুকে খুঁজে আর কোনই লাভ নেই—নরখাদক রাক্ষসদের কবলে পড়ে সে-অভাগীর প্রাণ—" বলতে বলতে তাঁর গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এল, তিনি আর কথা কইতে পারলেন না।

কুমার বললে, "বিনয়বাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের এত শীঘ্র বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মৃণু যে এই নরখাদকদের পাল্লায় পড়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই! আমার বিশ্বাস, আমরা তাকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারব।"

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "তোমার কথাই সত্য হোক।"

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমরা যখন ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে পড়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম পৃথিবীর আদিম জন্তুদের বিষয়ে আপনার অনেক পড়া-শোনা আছে। আপনি বানর-জাতীয় কোন দানবের কথা বলতে পারেন—আসলে যারা বানরও নয়, মানুষও নয়?"

বিনয়বাবু বললেন, "বানরদের মধ্যে দানব বলা যায় গরিলাদের। কিন্তু তারা বড়-জাতের বানরই। পণ্ডিতরা বহুকাল ধরে বানর আর মানুষের মাঝামাঝি যে-জীবকে অন্বেষণ করছেন, গরিলারা তা নয়। তবে সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় এক অদ্ভুত জীবের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় টারা ("Tarra") নামে এক নদী আছে। সেই নদীর ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দুটো মস্তবড় বানর-জাতীয় জীব হঠাৎ একদল মানুষকে আক্রমণ করে। তাদের একটা মদ্দা, আর একটা মাদী। মানুষের দল আক্রান্ত হয়ে গুলি করে মাদীটাকে মেরে ফেলে, মদ্দাটা পালিয়ে যায়। মাদীটা পাঁচফুটের চেয়েও বেশি লম্বা। সুতরাং আন্দাজ করা যেতে পারে যে, মদ্দাটা হয়তো মাথায় ছয়ফুট উঁচু হবে। আমি মৃত জীবটার ফোটো দেখেছি। তাকে কতকটা বানর আর মানুষের মাঝামাঝি জীব বলা চলে। কিন্তু তুমি এ-সব কথা জানতে চাইছ কেন? তোমার কি সন্দেহ হয়েছে যে, ঐ পায়ের দাগগুলো সেইরকম কোন জীবের?"

বিমল বললে, "সন্দেহ তো অনেক রকমই হচ্ছে, কিন্তু কোনই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ পায়ের দাগ গরিলার মতো কোন বানরেরও নয়, মানুষেরও নয়—এ হচ্ছে বানর আর মানুষের চেয়ে ঢের বেশি বড় কোন জীবের। এরা নরমাংস খায়, কিন্তু বানর-জাতীয় কোন জীবই নরমাংসের ভক্ত নয়। মানুষই বরং অসভ্য অবস্থায় নরমাংস ভক্ষণ করে। কাল আমরা যে অট্টহাসি শুনেছি, বানরের গলা থেকে তেমন অট্টহাস্য কেউ কোনদিন শোনেনি। বানররা বা আর কোন জানোয়াররাই হাসতে পারে না, হাসিও হচ্ছে মানুষেরই নিজস্ব জিনিস। মানুষের মতন পায়ের দাগ, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দীর্ঘতায় বারো-চৌদ্দ ফুট কি আরো বেশি, মানুষেরই মতন হাসতে পারে, এমন জীবের কথা কে শুনেছে, এমন জীবকে কে দেখেছে, তাও আমরা জানি না। কোথায় তাদের ঠিকানা, তাই বা কে বলে দেবে?"

রামহরি বললে, "তাদের ঠিকানা হচ্ছে কৈলাসে। আদ্যিকালে তারাই দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছিল, আর একালে তারাই এসেছে আমাদের মুণ্ডুপাত করতে।...তারা কেমন দেখতে, কি করে, কি খায়, কোথায় থাকে, এ কথা তোমাদের জানবার দরকার কি বাপু?"

রামহরির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিনয়বাবুর মাথার উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ঠিকরে গিয়ে দুম করে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে-না-বুঝতে আরো চার-পাঁচখানা তেমনি বড় বড় পাথর তাঁদের আশে-পাশে, মাঝখানে এসে পড়ল—এক একখানা পাথর ওজনে একমণ-দেড়মণের কম হবে না।

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "পালাও—পালাও! ছোটো!"

দৌড়, দৌড়, দৌড়! প্রত্যেকে ছুটতে লাগল—কাল-বোশেখীর ঝড়ের বেগে! পাথর-বৃষ্টির তোড় দেখে বাঘারও সমস্ত বীরত্ব উপে গেল, তার বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন পলায়নই হচ্ছে প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র ভালো উপায়! ও-রকম প্রকাণ্ড পাথর একখানা মাথায় পড়লে মানুষ তো ছার, হাতি-গণ্ডারকেও কুপোকাৎ হতে হবে!

অনেকদূর এসে সবাই আবার দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ধরে হাঁপ ছাড়বার পর কুমার বললে, "ওঃ, আজ আর একটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আর কি!"

রামহরি বললে, "এ-সব হচ্ছে আমার কথা না-শোনার শাস্তি। জানো না, শাস্তরে আছে—'ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা!'

বিমল বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার শাস্ত্র নিয়ে তুমিই থাকো রামহরি, এ-সময়ে আর তোমার শাস্ত্র আউড়ে আমাদের মাথা গরম করে দিও না।"

বিনয়বাবু বললেন, "আর এখানে দাঁড়ানো নয়, একেবারে বাসায় গিয়ে ওঠা যাক চল।"

চলতে চলতে বিমল বললে, "অমন বড় বড় পাথর যারা ছোট ছোট ঢিলের মতো ছুঁড়তে পারে, তাদের আকার আর জোরের কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়!"

কুমার বললে, "আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমরা ওখানে বসে যখন ওদের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলুম, তখন ওরাও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করছিল।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাদের শক্তির যে পরিচয়টা পাওয়া গেল তাতে তো মনে হয় ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের কড়ে আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে পারত! কিন্তু তা না করে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে এল কেন?"

বিমল বললে, "এও একটা ভাববার কথা বটে। হয়তো তারা আত্মপ্রকাশ

করতে রাজি নয়। হয়তো দিনের আলো তারা পছন্দ করে না। হয়তো পাথর ছোঁড়াটা তাদের খেয়াল।"

কুমার বললে, "কিন্তু বিমল, এ-রহস্যের একটা কিনারা না করে আমরা ছাড়ব না। রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে।"

রামহরি চোখ কপালে তুলে বললে, "এই ভূতের আড্ডায়?"

বিমল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভূতের আড্ডায়! জানো না, আমরা কেন এখানে এসেছি? জানো না, বিনয়বাবু কেন আমাদের সাহায্যে চেয়েছেন?"

রামহরি মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, "না না খোকাবাবু, আমাকে মাপ কর, ভূতের ভয়ে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।"

...এমনি সব কথা কইতে কইতে সকলে রঙ্গিট্ রোড দিয়ে ভুটিয়া-বস্তীর কাছে এসে পড়ল। সেখানে এসে দেখলে, মহা গণ্ডগোল! চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে কাঁদছে, আর তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়ে ভুটিয়া, লিম্বু ও ল্যাপ্‌চা জাতের অনেকগুলো পাহাড়ী লোক উত্তেজিতভাবে গোলমাল করছে!

তাদেরই ভিতর থেকে একজন মাতব্বরগোছের বুড়ো ভুটিয়াকে বেছে নিয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে এত সোরগোলের কারণ কি?"

বুড়ো ভুটিয়াটা বিশৃঙ্খল ভাবে যে সব কথা বললে, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে এইরকম দাঁড়ায়—

আজ কিছুকাল ধরে এখানে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়েছে। বৌদ্ধ গুম্ফায় অনেক পূজা-মানত করেও উপদ্রব কমেনি।

প্রথম প্রথম উপদ্রব বিশেষ গুরুতর হয়নি। পাহাড়ে পাহাড়ে যখন রাতের আঁধার নেমে আসত, মানুষরা যখন বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিত, তখন আশপাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে যেন কাদের চ্যাঁচামেচি শোনা যেত!

তারপর নিশীথ-রাতে মাঝে মাঝে বস্তীর লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। ঘুম ভাঙলেই তারা শুনতে পায় বস্তীর ভিতর দিয়ে যেন দুম দুম করে পা ফেলে মত্ত মাতঙ্গের দল আনাগোনা করছে। তাদের পায়ের দাপে পাহাড়ের বুক যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে শব্দ শুনেই সকলের বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, মায়ের কোলে ছেলেমেয়েরা ককিয়ে ওঠে! পাছে বাইরের তারা সে কান্না শুনতে পায়, সেই ভয়ে মায়েরা ছেলেমেয়ের মুখ প্রাণপণে চেপে ধরে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, খুব সাহসী পুরুষদেরও এমন সাহস হয় না যে, দরজাটা একটু খুলে ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, বাইরে কাদের আগমন হয়েছে!

তারপর বস্তীর ভিতর থেকে পর পর দুজন লোক অদৃশ্য হল। তারা

দুজনেই দুটো বিলিতী হোটেলে কাজ করত—বাসায় আসতে তাদের রাত হত। তারা যে কোথায় গেল, কেউ তা জানে না।

তারপর এক চৌকীদার রাত্রে এক ভয়ানক ব্যাপার দেখলে! একতলা-ছাদ-সমান উঁচু মস্তবড় এক ছায়ামূর্তি বস্তীর একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চৌকীদারের বুকের পাটা ছিল খুব। ছায়ামূর্তিটাকে দেখেও সে ভাবলে, বোধহয় তার চোখের ভ্রম! ভালো করে দেখবার জন্যে সে দু'পা এগিয়ে গেল। অমনি ছায়ামূর্তিটা তাকে লক্ষ্য করে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছুঁড়ে মারলে। ভাগ্যক্রমে পাথরখানা তার গায়ে লাগল না। চৌকীদার তখনি যত-জোরে ছোটা উচিত, তত-জোরেই ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। পরদিনই সে চৌকীদারি কাজ ছেড়ে দিলে।

এইসব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে এক সাহেব কৌতূহলী হয়ে বস্তীর ভিতরে রাত কাটাতে এল। রাত্রে কি ঘটল, কেউ তা জানে না! সকালে দেখা গেল, বস্তীর পথে সাহেবের মাথার টুপী আর হাতের বন্দুক পড়ে রয়েছে, কিন্তু সাহেবের চিহ্নমাত্র নেই!

পরশু আর একজন ভুটিয়া বাসায় ফিরে আসেনি! কিন্তু যাদের বাড়িতে সে কাজ করত তারা বলেছে, রাতে সে বাসার দিকেই এসেছে। এখন পর্যন্ত তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তার মা-বোন-বৌ কাঁদছে।

পুলিশের লোকেরা রোজ আসে। দিনের বেলায় তারা বুদ্ধিমানের মতো অনেক পরামর্শ করে, অনেক উপদেশ দেয় আর রাতে পাহারা দিতেও নাকি কসুর করে না। কিন্তু তারা পাহারা দেয় বোধহয় ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে। কারণ, এখনো গভীর রাতে প্রায়ই বস্তীর পথে মত্তহস্তীর মতো কাদের ভারি ভারি পায়ের শব্দ শোনা যায়। রাত্রে এই দেবতা না অপদেবতাদের অনুগ্রহ, আর দিনের বেলায় পুলিশের জাঁকজমক খানাতল্লাস,—বাবুসাহেব, আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি! বস্তী ছেড়ে দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে!

চার

রাত্রের বিভীষিকা

বিমল ও কুমার বাসায় বসে বসে মাঝে মাঝে 'স্যান্ডউইচে' কামড় ও মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। দুইজনেরই মন খারাপ, কারুর মুখেই কথা নেই। বাঘা অত-শত বোঝে না, কখন 'চিকেন স্যান্ডউইচে'র একটুখানি

প্রসাদ তার মুখের কাছে এসে পড়বে সেই মধুর আশাতেই সে বিমল ও কুমারের মুখের পানে বারংবার লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে!

বিনয়বাবু বাসায় নেই। সুরেনবাবু এখানকার একজন বিখ্যাত লোক—বহুকাল থেকে দার্জিলিংয়েই স্থায়ী। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে বিনয়বাবুর অল্পস্বল্প আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সুরেনবাবু আজ হঠাৎ কি কারণে বিনয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চায়ের পেয়ালার শেষ চুমুক দিয়ে কুমার বললে, "বিনয়বাবুর ফিরতে তো বড় বেশি দেরি হচ্ছে!"

বিমল বললে, "হুঁ। এত দেরি হবার তো কথা নয়! তাঁকে নিয়ে সুরেনবাবুর এমন কি দরকার?"

কুমার বললে, "এদিকে আমাদের বেরুবার সময় হয়ে এল, বন্দুকগুলো সাফ করা হয়েছে কিনা দেখে আসি।"

বিমল বললে, "কেবল বন্দুক নয় কুমার। প্রত্যেকের ব্যাগে কিছু খাবার, ছোরা-ছুরি, ইলেকট্রিক টর্চ, খানিকটা পাকানো দড়ি—অর্থাৎ হঠাৎ কোন বিপদজনক দেশে যেতে হলে আমরা যে-সব জিনিস নিয়ে যাই, তার কিছুই ভুললে চলবে না।"

কুমার বললে, "আমরা তো দূরে কোথাও যাচ্ছি না, তবে মিছিমিছি এমন মোট বয়ে লাভ কি?"

বিমল বললে, "কুমার, তুমিও বোকার মতন কথা কইতে শুরু করলে? ...মঙ্গল-গ্রহে যাবার এক মিনিট আগেও আমরা কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলুম, কোথায় কোথায় যেতে হবে? প্রতিমুহূর্তে যাদের মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে হয়, তাদের কি অসাবধানতার নিশ্চিন্ত আনন্দ ভোগ করবার সময় আছে?"

কুমার কোন জবাব দিতে পারলে না, লজ্জিত হয়ে চলে গেল। এমন সময় বিনয়বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। বিমল কিছু বললে না, বিনয়বাবু কি বলেন তা শোনবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবু প্রথমটা কিছুই বললেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের চারিদিকে খানিকটা ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বিমলের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "বিমল, বিমল! সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যা শুনলুম, তা ভয়ানক—অতি ভয়ানক!"

বিমল বলল, "আপনি কি শুনেছেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "মৃণুর জন্যে আর আমাদের খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ নেই।"

—"তার মানে?"

—"মৃণুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

—"কেন?"

—"সুরেনবাবু বললেন, পঁচিশ বছর আগে দার্জিলিংয়ে আর একবার একটি মেয়ে চুরি গিয়েছিল। সে মেম! সেই সময়ও এখানে নাকি মানুষ-চুরির এইরকম হাঙ্গামা হয়। সেই মেয়ের সঙ্গে নাকি বিশ-পঁচিশজন পুরুষেরও আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

—"আপনি কি মনে করেন, তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস। এই সব কথা বলবার পর সুরেনবাবু এই লেখাটুকু দিলেন। পুরনো ইংরেজি কাগজ 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' থেকে এটি তিনি কেটে রেখেছিলেন!"

বিনয়বাবুর হাত থেকে কাগজখানি নিয়ে বিমল যা পড়লে তার সারমর্ম এই ঃ

হিমালয়ে এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রথম এভারেস্ট অভিযানে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরাও ফিরে এসে এদের কথা বলেছেন। তাঁরা স্বচক্ষে এদের দেখেননি বটে, কিন্তু হিমালয়ের বরফের গায়ে এদের আশ্চর্য পায়ের দাগ দেখে এসেছেন। সে-সব পায়ের দাগ দেখতে মানুষের পদ-চিহ্নের মতন বটে, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষেরও পায়ের দাগ তেমন মস্ত হয় না! স্থানীয় লোকেরা বলে, হিমালয়ের কোন অজানা বিজন স্থানে বিচিত্র ও অমানুষিক সব দানব বাস করে। কখনো কখনো তারা রাত্রে গ্রামের আনাচে-কানাচে এসে বড় বড় পাথর ছোঁড়ে। গভীর রাত্রে কখনো কখনো তাদের গলার আওয়াজও শোনা যায়। তারা মানুষের সামনে বড় একটা আসে না এবং মানুষেরাও তাদের সামনে যেতে নারাজ, কারণ সবাই তাদের যমের চেয়েও ভয় করে। তাদের কথা তুললেই হিমালয়ের গ্রামবাসীরা মহা আতঙ্কে শিউরে ওঠে।*

বিমল বললে, "কাগজে যাদের কথা বেরিয়েছিল, কাল আমরাও বোধহয় তাদেরই কোন কোন জাত-ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছি।"

---

* আমরা যা বললুম, তা মন-গড়া মিথ্যা কথা নয়। অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিকপত্র "ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের" পুরনো ফাইল খুঁজলে সকলেই এর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারবেন। ইতি।—লেখক।

বিনয়বাবু বললেন, "বোধহয় কেন বিমল, নিশ্চয়। হুঁ, আমরা নিশ্চয় তাদেরই কীর্তি দেখে এসেছি।"

—"মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে, অথচ তা অমানুষিক! আর, অমানুষিক সেই মাথার চুল! আর, অমানুষিক সেই অট্টহাসি! এদেরও অভ্যাস, বড় বড় পাথর ছোঁড়া। কে এরা, কে এরা, কে এরা?"—বলতে বলতে বিমল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে—"কুমার! রামহরি! বাঘা!"

কুমার ও রামহরি তখনি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—তাদের পিছনে পিছনে বাঘা! পশু বাঘা, বুদ্ধিমান বাঘা,—সে কুকুর হলে কি হয়, তারও মুখে যেন আজ মানুষের মুখের ভাব ফুটে উঠেছে,—তাকে দেখলেই মনে হয় বিমলের ডাক শুনেই সে যেন বুঝতে পেরেছে যে, আজ তাকে বিশেষ কোন দরকারী কাজ করতে হবে! সোজা বিমলের পায়ের কাছে এসে বাঘা বুক ফুলিয়ে এবং ল্যাজ তুলে দাঁড়াল—যেন সে বলতে চায়,—"কী হুকুম হুজুর! গোলাম প্রস্তুত।"

আদর করে বাঘার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বিমল বললে, "কুমার! আমাদের জিনিস-পত্তর সব তৈরি?"

কুমার বললে, "হ্যাঁ, বিমল!"

বিমল বললে, "আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। কিন্তু তার আগেই আমি ভুটিয়া-বস্তীতে গিয়ে হাজির হতে চাই। আজ সারা রাত সেইখানেই আমরা পাহারা দেব।"

* * * * *

ভুটিয়া-বস্তীর প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব যে-দিক দিয়ে Pandam Tea Estate-এ যাওয়া যায়, সেইখানে এসে বিমল বললে, "আজ সকালে এখানেই ভুটিয়াদের কান্নাকাটি শুনে গিয়েছি। আজ এইখানেই পাহারা দিয়ে দেখা যাক, কী হয়!...কিন্তু সকলে এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে খানিক খানিক তফাতে গিয়ে বসে পাহারা দেব। তাহলে অনেকখানি জায়গাই আমাদের চোখের ভিতরে থাকবে। আজ সারারাত ঘুমের কথা কেউ যেন ভেবো না। দরকার হলেই বন্দুক ছুঁড়বে। রামহরি! বাঘাকে তুমি আমার কাছে দিয়ে যাও!"

সন্ধ্যা গেল তার আবছায়া নিয়ে, রাত্রি এল তার নিরেট অন্ধকার নিয়ে। অন্য সময় হলে কাছে ঐ ভুটিয়া-বস্তী থেকে হয়তো এখন অনেক রকম শব্দ বা গান-বাজনার ধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু আজ সমস্ত পল্লী যেন

গোরস্থানের মতন নিস্তব্ধ,—যেন ওখানে কোন জীবই বাস করে না! শ্মশানে তবু মড়ার চিতা জ্বলে, কিন্তু ওখানে আজ একটিমাত্র আলোক-বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না! যেন ওখানে আজ কোন্ কালো নিষ্ঠুর অভিশাপ অন্ধকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে নীরবে কোন অজানা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন নিয়ে মারাত্মক খেলা করছে!

বিমলের মনে হতে লাগল, এই অন্ধকারে পাহারা দিয়ে কোনই লাভ নেই! যদি এরই ভিতর দিয়ে কোন ভীষণ মূর্তি নিঃশব্দে পা ফেলে চলে যায়, তবে কোন মানুষের চক্ষুই তা দেখতে পাবে না।

নিশুত রাতের বুক যেন ধুকপুক করছে। বরফ-মাখা কনকনে হাওয়া যেন মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা। দূর থেকে ভুটিয়াদের বৌদ্ধ-মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল—এ পবিত্র ঘণ্টা বাজে দুষ্ট প্রেতাত্মাদের তাড়াবার জন্যে। কিন্তু পাহাড়ে রাত্রের প্রেতাত্মারা ঘণ্টাধ্বনি শুনলে সত্যই কি পালিয়ে যায়? তবে আচম্বিতে ওখানে অমন অপার্থিব ধ্বনি জাগছে কেন?...না, এ হচ্ছে গাছের পাতায় বাতাসের আর্তনাদ! রাত্রির আত্মা কি কাঁদছে? রাত্রির প্রাণ কি ছটফট করছে? রাত্রি কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

এমনি-সব অসম্ভব পাগলামি নিয়ে বিমলের মন যখন ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন অকস্মাৎ বাঘা ধড়্‌মড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে গর্‌র গর্‌র করে উঠল!

বিমলও তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল, চারিদিকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলে না,—চতুর্দিকে যে-অন্ধকার সেই-অন্ধকারই! বাঘার গলায় হাত রেখে সে বললে, "কিরে বাঘা, চ্যাঁচালি কেন? আমার মতন তুইও কি দুঃস্বপ্ন দেখছিস?"

বিমলের মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই সেই স্তব্ধ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে কে অতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, "বিমল! কুমার! রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

বিমলের বুক স্তম্ভিত হয়ে গেল,—এ যে বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর!

পাঁচ

অরণ্যের রহস্য

বিনয়বাবুর গলার আওয়াজ! কী ভয়ানক বিপদে পড়ে এত যন্ত্রণায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন? কিন্তু কালো রাত আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল, বিনয়বাবু আর চিৎকার করলেন না।

লুকানো জায়গা থেকে বিমল এক লাফে বেরিয়ে এল—বাঘা তার আগেই দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছে। অন্যদিক থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে বিমল বুঝলে, কুমার আর রামহরিও ছুটে আসছে।

কিন্তু কোন্ দিকে যেতে হবে? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না, বিপদের আবির্ভাব হয়েছে যে ঠিক কোন্ জায়গায়, তা স্থির করা এখন অসম্ভব বললেই চলে।

বিমল তখন বাঘার পশু-শক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝলে, পশু বাঘার যে শক্তি আছে, মানুষের তা নেই। পশুর চোখ অন্ধকারে মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ তো বটেই, তার উপরে ঘ্রাণ-শক্তি তাকে ঠিক পথেই চালনা করে।

রামহরি বিজলী-মশাল জ্বালতেই বিমল বাধা দিয়ে বললে, "না, না,—এখন আলো জ্বেলো না, শত্রু কোন্ দিকে তা জানি না, এখন আলো জ্বাললে আমরাই ধরা পড়ে মরব!"

তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকারের রহস্যের ভিতরে তাকিয়ে তারা তিনজনে অত্যন্ত সজাগ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—তাদের কাছে এখন প্রত্যেক সেকেন্ড যেন এক এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে!

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না—মিনিটখানেক পরেই হঠাৎ বাঘার ঘন ঘন গর্জনে নীরব কালো রাতের ঘুম আবার ভেঙে গেল!

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, "বাঘা খোঁজ পেয়েছে। ঐদিকে—ঐদিকে! রামহরি, 'টর্চ' জ্বেলে আগে-আগে চল। কুমার, আমার সঙ্গে এস!"

রামহরির পিছনে পিছনে বিমল ও কুমার বন্দুক বাগিয়ে ধরে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে! সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, ঝোপের পাশেই একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে।

কুমার বললে, "বিনয়বাবুর বন্দুক! কিন্তু বিনয়বাবু কোথায়?"

রামহরি তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং পর-মুহূর্তেই আকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"ভূত! খোকাবাবু!"

আচম্বিতে এই অপ্রত্যাশিত চিৎকার বিমল ও কুমারকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে। কিন্তু তারপরেই নিজেদের সামলে নিয়ে বিজলী-মশাল জ্বেলে তারাও এক এক লাফে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

দুই হাতে মুখ চেপে রামহরি মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

বাঘা ছুটে জঙ্গলের আরো ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল,—কিন্তু কুমার টপ করে

তার গলার বগলোস্ চেপে ধরলে। বাঘা তবু বশ মানলে না, ছাড়ান পাবার জন্যে পাগলের মতন ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

বিমল চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু বিনয়বাবুর কোন চিহ্ন বা ভয়-পাবার মতো অন্য কিছুই তার নজরে ঠেকল না।

কুমার বললে, "রামহরি! কি হয়েছে তোমার? কী দেখেছ তুমি?"

রামহরি ফ্যালফেলে চোখে বোবার মতো একবার কুমারের মুখের পানে চাইলে এবং তারপরে জঙ্গলের একদিকে আঙুল তুলে দেখালে। তখনো সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

বিমল বললে, "অমন ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে আছ কেন? ওখানে কি আছে?"

রামহরি খালি বললে, "ভূত!"

—"ভূত! তোমার ভূতের নিকুচি করেছে! দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি"—এই বলে বিমল সেইদিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না! খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওদিকে যেও না!"

—"কেন? ওদিকে কি আছে?"

—"ভূত! রাক্ষস! দৈত্য কি দানব! যাকে দেখেছি সে যে কে, তা আমি জানি না—কিন্তু সে মানুষ নয়, খোকাবাবু, মানুষ নয়!"

বিমল খুব বিরক্ত হয়ে বললে, "আর তোমার পাগলামি ভালো লাগে না রামহরি! হয় যা দেখেছ স্পষ্ট করে বল, নয়, এখান থেকে বিদেয় হও!"

রামহরি বললে, "সত্যি বলছি খোকাবাবু, আমার কথায় বিশ্বাস কর। যেই আমি জঙ্গলের ভেতর এলুম, অমনি দেখলুম, জয়ঢাকের চেয়েও একখানা ভয়ানক মুখ সাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে সরে গেল।"

—"খালি মুখ?"

—"হ্যাঁ, খালি মুখ—তার আর কিছু আমি দেখতে পাইনি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর আমার এই হাতের চেটোর মতো বড় বড় আগুন-ভরা চোখ,—বাপ রে, ভাবতেও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

কুমার বললে, "কিন্তু সে মুখের কথা এখন থাক! বিমল, বিনয়বাবু কোথায় গেলেন?"

—"আমিও সেই কথাই ভাবছি। তাঁর চিৎকার আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁর বন্দুকটাও এখানে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?"

হঠাৎ খানিক তফাতে জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত শব্দ উঠল—যেন বিরাট একটা রেল-এঞ্জিনের মতন অসম্ভব দেহ জঙ্গলের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে বেগে এগিয়ে চলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে বাঘার ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ! এবং রামহরির আর্তনাদ—"ঐ শোনো খোকাবাবু, ঐ শোনো!"

গাছপালার মড়মড়ানি ও ভারি ভারি পায়ের ধুপধুপুনি শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। বিমল বললে, "এখানে যে ছিল, সে চলে গেল!"

কুমার বললে, "কিন্তু বিনয়বাবুর কোন সন্ধানই তো পাওয়া গেল না।"

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই অনেক দূর থেকে শোনা গেল—"বিমল! বিমল! কুমার! রক্ষা কর—রক্ষা কর! বিমল! বি—" হঠাৎ আর্তনাদটা আবার থেমে গেল!

কুমার বললে, "বিমল—বিমল! ঐ তো বিনয়বাবুর গলা!"

বিমল বললে, "কুমার, বিনয়বাবু নিশ্চয়ই দানবের হাতে বন্দী হয়েছেন! তারা নিশ্চয়ই তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!"

—"এখন কি হবে বিমল, আমরা কি করব?"

—"আমরা?...আমরা শত্রুর পিছনে পিছনে যাব—বিনয়বাবুকে উদ্ধার করব!"

—"কিন্তু কোন্ দিকে যাব? পৃথিবীতে এক ফোঁটা আলো নেই, আকাশ যেন অন্ধকার বৃষ্টি করছে! কে আমাদের পথ দেখাবে?"

—"বাঘা! শত্রুর পায়ের গন্ধ সে ঠিক চিনতে পারবে—বাঘা যে শিক্ষিত কুকুর! তুমিও ওর গলায় শিকল বেঁধে ওকে আগে আগে যেতে দাও, আমরা ওর পিছনে থাকব। রামহরি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে, না বাসায় ফিরে যাবে?"

রামহরি বললে, "তোমরা যেখানে থাকবে, সেই তো আমার বাসা! তোমাদের সঙ্গে ভূতের বাড়ি কেন, যমের বাড়ি যেতেও আমি নারাজ নই!"

—"হ্যাঁ রামহরি, হয়তো আজ আমরা যমের বাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। মন্দ কি, পারি তো যমের একখানা ফোটো তুলে নিয়ে আসব!"

রামহরি গজগজ করে বললে, "যত সব অনাছিষ্টি কথা!"

বিমলের কথা মিথ্যা নয়। বাঘার নাকই অন্ধকারে তাদের চোখের কাজ করলে। বাঘা কোনদিকে ফিরে তাকালে না, মাটির উপরে নাক রেখে সে বেগে অগ্রসর হতে লাগল। কুমার তার গলার শিকলটা না ধরে রাখলে এতক্ষণে সে হয়তো আরো বেগে তীরের মতো ছুটে নাগালের বাইরে কোথায় চলে যেত!

তিনজনে বাঘার পিছনে পিছনে অতি কষ্টে পথ চলতে লাগল।

কুমার বললে, "বনের ভেতরে রামহরি যাকে দেখেছে, তার বর্ণনা শুনে মনে হল সে এক সাংঘাতিক জীব!"

রামহরি শিউরে উঠে বললে, "তার কথা আর মনে করিয়ে দিও না বাবু, তাহলে হয়তো আমি ভিরমি যাব! উঃ, মুখখানা মানুষের মতো দেখতে বটে, কিন্তু হাতির মুখের চেয়েও বড়!"

—"অমন ভয়ানক যার মুখ, আমাদের দেখেও সে আক্রমণ করলে না কেন?"

বিমল বললে, "হয়তো আমাদের হাতের 'ইলেক্‌ট্রিক টর্চ' দেখে সে ভড়্‌কে গেছে!"

কুমার বললে, "আশ্চর্য নয়। মোটরের 'হেড-লাইট' দেখে অনেক সময়ে বাঘ-ভাল্লুকও হতভম্ব হয়ে যায়।"

আবার তারা নীরবে অগ্রসর হতে লাগল।

এইভাবে ঘণ্টা-তিনেক দ্রুতপদে এগিয়ে তারা যে কোথায়, কোন্‌দিকে, কত দূরে এসে পড়ল, কেউ তা বুঝতে পারলে না। এবং এইভাবে আর বেশিক্ষণ বাঘার সঙ্গে চলা যে তাদের পক্ষে অসম্ভব, এটুকু বুঝতেও তাদের বাকি রইল না। এরই মধ্যে বার বার হোঁচট খেয়ে পাথরের উপরে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গ থেঁতো হয়ে গেছে, গায়ের কত জায়গায় কত কাঁটা বিঁধেছে, ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে জামা-কাপড়ে আর পদার্থ নেই! তাদের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, দম বুঝি আর থাকে না!

এইবারে তারা একটা বড় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করল। সকলে হাঁপাতে হাঁপাতে কোন গতিকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হল। তারপর রামহরি বললে, "খোকাবাবু, আমি তো তোমাদের মতন জোয়ান ছোকরা নই, আমাকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও!"

বিমল বললে, "রামহরি, কেবল তোমারই নয়, আমারও বিশ্রাম দরকার হয়েছে,—আমিও এই ব'সে পড়লুম!"

কুমারের অবস্থাও ভালো নয়, সেও অবশ হয়ে ধুপ করে বসে পড়ল।

কিন্তু বাহাদুর বটে বাঘা! যদিও দারুণ পরিশ্রমে তার জিভ মুখের বাইরে বেরিয়ে পড়ে লক্‌ লক্‌ করে ঝুলছে, তবু এখনো তার এগিয়ে যাবার উৎসাহ একটুও কমেনি।

কুমার চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বললে, "মনে হচ্ছে, আজকের এই অন্ধকারের অন্ধতা কখনো দূর হবে না, আজকের এই অনন্ত রাতের বিভীষিকা কখনো শেষ হবে না!"

রামহরি বললে, "একটা জানোয়ারের ভরসায় এই যে আমরা ক্ষ্যাপার মতো এগিয়ে চলেছি, এটা কি ঠিক হচ্ছে খোকাবাবু?"

বিমল বললে, "সময়ে সময়ে জানোয়ারের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বড় হয় রামহরি। ভগবান মানুষকে বঞ্চিত করে এমন কোন কোন শক্তি পশুকে দিয়েছেন, যা পেলে মানুষের অনেক উপকারই হত!"

আচম্বিতে সেই বোবা অন্ধকার, কালো রাত্রি এবং স্তব্ধ অরণ্য যেন ভীষণ ভাবে জ্যান্ত হয়ে উঠল।—"ও কী খোকাবাবু, ও কী"—বলতে বলতে রামহরি আঁৎকে দাঁড়িয়ে উঠল!

বাঘা চেঁচিয়ে এবং চমকে-চমকে উঠে শিকল ছিঁড়ে ফেলে আর কি!

বিমল ও কুমার সন্ত্রস্ত হয়ে শুনতে লাগল—তাদের সামনে, পিছনে, ডানপাশে, বামপাশে, কাছে, দূরে, চারিদিক থেকে যেন চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় স্টিমার কান ফাটিয়ে প্রাণ দমিয়ে ক্রমাগত 'কু' দিচ্ছে—যেন বনবাসী অন্ধকারের চিৎকার, যেন সদ্যজাগ্রত অরণ্যের হুঙ্কার, যেন বিশ্বব্যাপী ভূত-প্রেতের গর্জন!

ছয়

অজগরের মতন হাত

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাক, তারা জানো বোধ হয়, "নিউ ইয়ার্স ডে"র রাত্রি-দুপুরের সময় গঙ্গানদীর স্টিমারগুলো একসঙ্গে এমন "ভোঁ" দিয়ে ওঠে যে, কান যেন ফেটে যায়!

হিমালয়ের পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে এই ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে বিমল, কুমার ও রামহরির চারিদিক থেকে এখন অনেকটা তেমনিধারা বিকট চিৎকারই জেগে উঠেছে! তবে স্টিমারের "ভোঁ"-দেওয়ার ভিতরে ভয়ের ব্যাপার কিছু নেই, কিন্তু এখানকার এই অস্বাভাবিক কোলাহলে অবর্ণনীয় আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ যেন ছটফট করতে লাগল!

আর,—এ চিৎকার কোন যন্ত্রের চিৎকার নয়, এ ভয়াবহ চিৎকারগুলো বেরিয়ে আসছে অজানা ও অদৃশ্য সব অতিকায় জীবের কণ্ঠ থেকেই! দুশো-আড়াইশো সিংহ একসঙ্গে গর্জন করলেও তা এতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হত না!

প্রথমটা সকলেই কি করবে ভেবে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিক থেকেই সেই বিকট চিৎকার উঠছে, কাজেই কোনদিকেই পালাবার উপায় নেই!

কুমারের মনে হল, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দৈত্য-দানবের মতো কারা যেন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে—ক্রমেই এগিয়ে আসছে—তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই!

হঠাৎ বিমল বলে উঠল, "কুমার উঠে দাঁড়াও! হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে থাকবার সময় নয়। বন্দুক ছোঁড়ো,—যা থাকে কপালে!"

বিমল ও কুমার লক্ষ্যহীন ভাবেই অন্ধকারের ভিতর গুলির পর গুলি চালাতে লাগল,—তাদের দেখাদেখি রামহরিও সব ভয় ভুলে বন্দুক ছুঁড়তে কসুর করলে না।

শত্রুদের বিকট চিৎকারের সঙ্গে তিন-তিনটে বন্দুকের গর্জন মিলে চারিদিকটা যেন শব্দময় নরক করে তুললে—কাজেই বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে কেউ আর্তনাদ করলে কি না, সেটা কিছুই বোঝা গেল না,—কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গোলমাল একেবারে থেমে গেল।

অন্ধকারের ভিতরে আরো কয়েকটা গুলি চালিয়ে বিমল বললে, "আমাদের ভয় দেখাতে এসে হতভাগারা এইবারে নিজেরাই ভয়ে পালিয়েছে। বন্দুকের এমনি মহিমা!"

কুমার বললে, "মিছেই তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। লোকে যা বলে, তাদের চেহারা যদি সেই রকমই হয়, তাহলে তাদের ভয় পাবার কোনই কারণ ছিল না। তারা দল বেঁধে আক্রমণ করলে আমাদের বন্দুক কিছুই করতে পারত না!"

বিমল বললে, "কুমার, কেবল মস্তিষ্কের জোরেই মানুষ আজ জীবরাজ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। আদিমকালে পৃথিবীতে যারা প্রভুত্ব করত, সেই সব ডাইনসরের তুলনায় মানুষ কত তুচ্ছ! তাদের নিঃশ্বাসেই বোধ হয় মানুষ পোকা-মাকড়ের মতো উড়ে যেত। কিন্তু তবু তারা দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারেনি। একালের হাতি, গণ্ডার, হিপো, সিংহ, ব্যাঘ্র—এমনকি, ঘোড়া-মোষ-গরু পর্যন্ত গায়ের জোরে মানুষের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু তবু তারা মানুষকে ভয় করে এবং গোলামের মতো মানুষের সেবা করে। গায়ের জোরের অভাব মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা পূরণ করে নিয়েছে। আমাদের হাতে যে বন্দুকগুলো আছে, আর

আমাদের ব্যাগে যে বোমাগুলো আছে, এগুলো দান করেছে মানুষের মস্তিষ্কই। আজ যে-সব জীবের পাল্লায় আমরা পড়েছিলুম, তারা যত ভয়ানকই হোক, সভ্য মানুষের মস্তিষ্ক তাদের মাথায় নেই। তারা আমাদের ভয় করতে বাধ্য।"

রামহরি বিরক্ত স্বরে বললে, "খোকাবাবু, বোমা-টোমা তুমি আবার সঙ্গে করে এনেছ কেন? শেষকালে কি পুলিশের হাতে পড়বে?"

কুমার হেসে বললে, "ভয় নেই রামহরি, তোমার কোন ভয় নেই। দুষ্ট রাজবিদ্রোহীদের মতো আমরা যে মানুষ মারবার জন্যে বোমা ছুড়ব না, পুলিশ তা জানে। পুলিশকে লুকিয়ে আমরা বোমা আনিনি—আমরা পুলিশের অনুমতি নিয়েই এসেছি!"

বিমল বললে, "পূর্বদিকে একটু-একটু করে আলো ফুটছে, ভোর হতে আর দেরি নেই। সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম করে, তারপর আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।"

কুমার বললে, "বিমল, শুনতে পাচ্ছো? কাছেই কোথায় জলের শব্দ হচ্ছে!"

বিমল বললে, "হুঁ! বোধ হয় আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এখন সে-সব ভাবনা ভুলে ঘণ্টাখানেকের জন্যে চোখ মুদে নাও। বাঘা ঠিক পাহারা দেবে।"

সকালের আলোয় সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

বিমল উঠে বসে চেয়ে দেখলে, তার চারিদিকে শাল ও দেবদারু এবং আরো অনেক রকম গাছের ভিড়। গাছের তলায় তলায় লতাগুল্ম-ভরা ঝোপঝাপ। নীল আকাশ দিয়ে সোনার জলের মতো সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে—মিষ্টি বাতাসে পাখনা কাঁপিয়ে প্রজাপতিরা আনাগোনা করছে—রঙবেরঙের ফুলের টুকরোর মতো! দার্জিলিংয়ের চেয়ে এখানকার হাওয়া অনেকটা গরম!

কালকের নিবিড় অন্ধকারে যে-স্থানটা অত্যন্ত ভীষণ বলে মনে হচ্ছিল, আজকের ভোরের আলো তাকেই যেন পরম শান্তিপূর্ণ করে তুলেছে।

বিমল ও কুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে গেল। স্থানে স্থানে লতাগুল্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—যেন তাদের উপর দিয়ে খুব ভারি কোন জীব চলে গিয়েছে। এক জায়গায় অনেকখানি পুরু রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কুমার বললে, "বিমল, আমাদের বন্দুক ছোঁড়া তাহলে একেবারে ব্যর্থ হয়নি! দেখ, দেখ, এখানে রক্তমাখা সেই রকম মস্ত মস্ত পায়ের দাগও রয়েছে যে! দাগগুলো সামনে জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়েছে।"

আচম্বিতে পিছন থেকে শোনা গেল বাঘার বিষম চিৎকার!

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, "বাঘা তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল! আমি তাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে এসেছি। হঠাৎ কি দেখে সে চ্যাঁচালে?"

দু'জনে দ্রুতপদে ফিরে এসে দেখলে, বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে এবং শিকলি-বাঁধা অবস্থায় মাঝে মাঝে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে!

বিমল বললে, "রামহরিও তো এইখানেই শুয়েছিল! রামহরি কোথায় গেল? রামহরি!...রামহরি!...রামহরি!"

কিন্তু রামহরির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কুমার ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, "তবে কি তারা রামহরিকেও চুরি করে নিয়ে গেল?"

বিমল বললে, "কুমার! বাঘাকে এগিয়ে দাও! শত্রু কোন্‌দিকে গেছে, বাঘা তা জানে।"

কুমার ও বিমলের আগে আগে বাঘা আবার এগিয়ে চলল, মাটির উপরে নাক রেখে।

কুমার বললে, "বিমল, যে শত্রুদের পাল্লায় আমরা পড়েছি, তাদের তুমি মানুষের চেয়ে তুচ্ছ মনে করো না। দেখ, এরা প্রায় আমাদের সুমুখ থেকেই উপর-উপরি বিনয়বাবু আর রামহরিকে ধরে নিয়ে গেল, অথচ আমরা কিছুই জানতে পারলুম না। আমরা কি করছি না-করছি সমস্তই ওরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, অথচ আমরা তাদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি অসহায় অন্ধের মতো। এইবারে আমাদের পালা বিমল, এইবারে আমাদের পালা!"

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, "দেখা যাক!"

তারা একটি ছোট নদীর ধারে এসে পড়ল,—শিশুর মতো নাচতে নাচতে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে স্বচ্ছ জলের ধারা তরতর করে বয়ে যাচ্ছে!

নদীর ধারে এসে বাঘা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ব্যস্তভাবে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল—যেন যে বলতে চায়, 'শত্রুর পায়ের গন্ধ জলে ডুবে গেছে, এখন আমায় আর কি করতে হবে, বল?'

বিমল বললে, "আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এটা রঙ্গিত নদীর একটি শাখা।"

কুমার বললে, "এ জায়গাটা দার্জিলিং থেকে কত দূরে?"

বিমল বললে, "এখান থেকে দার্জিলিং এগারো-বারো মাইলের কম হবে না। আরও কিছুদূর এগুলেই আমরা সিকিম রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পড়ব।"

কুমার বললে, "এখন আমাদের উপায়? বাঘা তো শত্রুদের পায়ের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। এখন আমরা কোন্ দিকে যাব?"

বিমল বললে, "পায়ের গন্ধ বাঘা এই নদীর ধারে এসে হারিয়ে ফেলেছে। এই দেখ শত্রুদের পদচিহ্ন। তারা নদীর ওপারে গিয়ে উঠেছে। এই তো এতটুকু নদী, আমরা অনায়াসে ওপারে যেতে পারব।"—বলেই বিমল জলে নেমে পড়ল, তার সঙ্গে সঙ্গে নামল বাঘাকে নিয়ে কুমারও।

নদীর ওপারে উঠেই মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিমল বললে, "এই দেখ, আবার সেই অমানুষিক পায়ের চিহ্ন!"

বাঘাও তখনি হারিয়ে-যাওয়া গন্ধ আবার খুঁজে পেলে। গা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার সে ছুটে চলল।

কিন্তু বিমল তার শিকল চেপে ধরে বললে, "বাঘা, দাঁড়া!...কুমার! এখনো আমাদের কত দূরে কতক্ষণ যেতে হবে, কে তা জানে? পথে হয়তো জলও পাওয়া যাবে না! তাড়াতাড়ি এখানে বসে মুখে কিছু দিয়ে, জল পান করে 'ফ্লাস্কে' জল ভয়ে নিয়ে তারপর আবার শত্রুদের পিছনে ছুটব! কি বল?"

কুমার বললে, "খেতে এখন আমার রুচি হচ্ছে না!"

বিমল বললে, "খাবার ইচ্ছে আমারও নেই, কিন্তু শরীরের ওপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে, না খেলে একটু পরেই সে যে ভেঙে পড়বে! খান-কয় 'স্যান্ডউইচ' আছে, টপ্ টপ্ করে খেয়ে ফেলো। এই নে বাঘা, তুইও নে!"

আবার তারা এগিয়ে চলল—সর্বাগ্রে বাঘা, তারপর কুমার, তারপর বিমল।

খানিক পরে তারা পাহাড়ের যে-অংশে এসে পড়ল, সে দিক দিয়ে মানুষের আনাগোনা করার কোন চিহ্ন নেই। অন্তত মানুষের আনাগোনা করার কোন চিহ্ন তাদের নজরে ঠেকল না। যদিও কোথাও মানুষের সাড়া বা চিহ্ন নেই, তবুও বনের ভিতর দিয়ে পথের মতন একটা-কিছু রয়েছে বলেই তারা এখনো অগ্রসর হতে পারছিল। এখান দিয়ে চলতে চলতে যদিও বেত ও নানান কাঁটাগাছ দেহকে জড়িয়ে ধরে, ঝুলে-পড়া গাছের ডালে মাথা ঠুকে যায়, ছোট-বড় পাথরে প্রায়ই হোঁচট খেতে হয় এবং ঘাসের ভিতর থেকে বড় বড় জোঁক বেরিয়ে পা কামড়ে ধরে, অগ্রসর হবার পক্ষে এ-সবের চেয়ে বড় আর কোন বাধা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ বা ঝোপ উপড়ে বা ভেঙে ফেলে কারা যেন আনাগোনার জন্য পথ সাফ করে রেখেছে! এমনভাবে বড় বড় গাছগুলোকে উপড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে যে, দেখলেই বোঝা যায়, তা মানুষের কাজ নয়। যে-সব অরণ্যে হাতির পাল চলাফেরা করে, সেইখানেই এমন ভাবে ভাঙা বা

উপড়ানো গাছ দেখা যায়। এখানে হাতিও নেই, মানুষও নেই,—তবুও পথ চলবার বাধা সরিয়ে রেখেছে কারা?

এই প্রশ্ন মনে জাগতেই কুমারের বুকটা যেন শিউরে উঠল!

বেচারা রামহরি! তার সাহস ও শক্তির অভাব নেই, মূর্তিমান মৃত্যুর সামনেও সে কতবার হাসিমুখে ছুটে গিয়েছে। কিন্তু এক ভূতের ভয়েই সর্বদা সে কাতর হয়ে পড়ে! কিন্তু তার অদ্ভুত প্রভুভক্তি এই ভূতের ভয়কেও মানে না, তাই এত বড় বিপদের মাঝখানেও সে তাদের ছেড়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু এখন? এখন সে কোথায়? সে বেঁচে আছে কি না, কে জানে।

একটা পাহাড়ের খানিকটা যেখানে পথের উপর ঝুঁকে আছে, সেইখানে বাঘা হঠাৎ ডানদিকে মোড় ফিরলে।

কুমারও সেইদিকে ফিরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে কি একটা শব্দ শুনেই চমকে উঠে আবার ফিরে দাঁড়াল এবং তারপর সে কী দৃশ্যই দেখল!

ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের উপর থেকে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো মোটা এবং কালো রোমশ একখানা হাত বিমলের মুখ ও গলা একসঙ্গে চেপে ধরে তার দেহকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সাত

গুহামুখে

প্রথমটা কুমার বিস্ময়ে এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল যে, ঠিক কাঠের পুতুলের মতোই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের হাতের মতন দেখতে কোন হাত যে এত মস্ত হতে পারে, মানুষী স্বপ্নেও বোধহয় তা কল্পনা করা অসম্ভব। একখানা মাত্র হাতের চেটোর ভিতরেই বিমলের গলা ও সমস্ত মুখখানা একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে!

তার পরমুহূর্তেই বিমলের দেহ যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন কুমারের হুঁশ হল। কিন্তু বৃথা। তখন বিমল বা শত্রুর কোন চিহ্নই নেই—কেবল ধুপ ধুপ করে ভারি পায়ের এক বনজঙ্গল ভাঙার শব্দ হল, তারপরেই সব আবার চুপচাপ।

দুই চক্ষে অন্ধকার দেখতে দেখতে কুমার অবশ হয়ে সেইখানে বসে পড়ল। তার প্রাণ-মন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল—খানিকক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারলে না!

অনেকক্ষণ পরে তার মাথা একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে এল।

মৃণু তো সকলের আগেই গিয়েছে, তারপর গেলেন বিনয়বাবু, তারপর রামহরি, তারপর বিমল! বাকী রইল এখন কেবল সে নিজে। কিন্তু তাকেও যে এখনি ঐ ভয়ঙ্কর অজ্ঞাতের কবলে গিয়ে পড়তে হবে না, তাই-ই বা কে বলতে পারে?

শোকে কুমারের মনটা একবার হু-হু করে উঠল, কিন্তু সে জোর করে নিজের দুর্বলতা দমন করে ফেললে। এ-রকম অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে অচল হয়ে বসে যারা শোক বা হাহাকার করে, তারা হচ্ছে পঙ্গু বা কাপুরুষ। কুমার কোনদিন সে-দলে ভিড়বে না।

তার আশেপাশে লুকিয়ে আছে যে সব জীব, তাদের অমানুষিক কণ্ঠের চিৎকার সে শুনেছে, তাদের বিরাট পায়ের দাগও সে মাটির উপরে দেখেছে এবং তাদের একজনের অভাবিত একখানা হাতও এইমাত্র তার চোখের সুমুখ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুমার বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলে যে, যাদের হাত, পা ও কণ্ঠস্বর এমনধারা, তাদের সামনে একাকী গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টাটা হবে কালবোশেখী ঝড়ের বিরুদ্ধে একটা মাছির তুচ্ছ চেষ্টার মতোই হাস্যকর! এমন অবস্থায় কোন সাহসী ও বলিষ্ঠ লোকও যদি প্রাণ হাতে করে ফিরে আসে, তাহলে কেউ তাকে কাপুরুষ বলতে পারবে না।—এ-কথাটাও তার মনে হল। কিন্তু তখনি সে-কথা ভুলে কুমার নিজের মনে-মনেই বললে, 'মানুষের কাছে একটা ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে কতটা নগণ্য! মানুষের একটা নিঃশ্বাসে সে উড়ে যায়! কিন্তু মানুষ যদি সেই তুচ্ছ লাল পিঁপড়ের গায়ে হাত দেয়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মানুষকে আক্রমণ করতে একটুও ভয় পায় না। আমিও ঐ লাল পিঁপড়ের মতোই হতে চাই! বিমল যদি মারা পড়ে থাকে, তাহলে যে-পৃথিবীতে বিমল নেই, আমিও সেখানে বেঁচে থাকতে চাই না! যে-পথে বিনয়বাবু গেছেন, রামহরি গেছে, বিমল গেছে, আমিও যাব সে-পথে। যদি প্রতিশোধ নিতে পারি, প্রতিশোধ নেব। যদি মৃত্যু আসে, মৃত্যুকে বরণ করব। কুমার উঠে দাঁড়াল।

বাঘাকে ধরে রাখা দায়! উপরকার পাহাড়ের যেখানে খানিক আগে শত্রু-হস্ত আবির্ভূত হয়েছিল, বিষম গর্জন করতে করতে বাঘা এখন সেইখানেই যেতে চায়! বারংবার হুমকি দিয়ে সে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু তারপরেই শিকলে বাধা পেয়ে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুমুখের দু'পায়ে যেন মহা আক্রোশে শূন্যকেই আঁচড়াতে থাকে—কুমারের হাত থেকে শিকল খসে পড়ে আর কি!

কিন্তু কুমার শিকলটাকে হাতে পাকিয়ে ভালো করে ধরে রইল—সে বুঝলে, এই ভয়াবহ দেশে একবার হাতছাড়া হলে বাঘাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! এখন বাঘাই তার একমাত্র সঙ্গী—তার কাছ থেকে সে অনেক সাহায্যই প্রত্যাশা করে! এ-পথে এখন বাঘা তার শেষ বন্ধু!

পাহাড়ের গা বয়ে বয়ে কুমার উপরে উঠতে লাগলো। খানিক পরেই বিমল যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে এখন শত্রু বা মিত্র কারুর কোন চিহ্নই নেই।

কুমারের পায়ের তলায় পাহাড়ের গা তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করে দেখলে। কিন্তু রক্তের দাগ না দেখে কতকটা আশ্বস্ত হল।

সে এখন কি করবে? কোন্‌দিকে যাবে? এখানে তো পথের বা বিপথের কোন চিহ্নই নেই! যতদূর চোখ যায়, গাছপালা জঙ্গল নিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরের দিকে উঠে গিয়েছে!

কিন্তু কুমারকে কোন্‌দিকে যেতে হবে, বাঘাই আবার তা জানিয়ে দিলে। এদিকে-ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বাঘা যে কিসের গন্ধ পেলে তা কেবল বাঘাই জানে, কিন্তু তারপরেই মাটির উপরে মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি সে আবার এগিয়ে চলল। একটু পরেই ঘন জঙ্গল তাদের যেন গিলে ফেললে!

অল্পদূর অগ্রসর হয়েই জঙ্গলের ভিতরে আবার একটা পায়েচলা পথ পাওয়া গেল। সে-পথের উপরে বড় বড় গাছের ছায়া এবং দুধারে ঝোপঝাপ আছে বটে, কিন্তু পথটা যেখান দিয়ে গেছে, সেখান থেকে ঝোপঝাপ কারা যেন যতটা সম্ভব সাফ করে রেখেছে!

এইভাবে বাঘার সঙ্গে কুমার প্রায় ঘণ্টা-তিনেক পথ দিয়ে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু সারা পথে কেবল দু'চারটে বুনো কুকুর ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলে না। শত্রুরা এখনও লুকিয়ে তার উপর নজর রেখেছে কি না, সেটাও বুঝতে পারলে না। বিপুল পরিশ্রমে তার শরীর তখন নেতিয়ে পড়েছে এবং এমন হাঁপ ধরেছে যে, খানিকক্ষণ না জিরিয়ে নিলে আর চলা অসম্ভব।

পথটা তখন একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে পড়েছে, সেখান থেকে নীচের দিকটা দেখাচ্ছে ছবির মতো।

সেইখানে বসে পড়ে কুমার 'ফ্লাস্ক' থেকে জলপান করে আগে নিজের প্রবল তৃষ্ণাকে শান্ত করলে। বাঘাও করুণ ও প্রত্যাশী চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে তাকেও জলপান করতে দিলে।

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সে কি দৃশ্য! একদিকে পর্বত-সমুদ্রের

প্রস্তরীভূত স্থির তরঙ্গদল দৃষ্টিসীমা জুড়ে আছে এবং তারপরেই কাঞ্চনজঙ্ঘার সুগম্ভীর চির-তুষারের রাজ্য! আর একদিকে বনশ্যামল পাহাড়ের দেহ পৃথিবীর দিকে নেমে গিয়েছে এবং উজ্জ্বল রুপোর একটি সাপের মতন রঙ্গিত-নদী এঁকেবেঁকে খেলা করতে করতে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে,—এত উঁচু থেকে তার কল-গীতিকা কানে আসে না।

আশেপাশে, কাছে-দূরে সরল ও সিন্দুর গাছেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ম্যাগ্নোলিয়া এবং কোথাও বা রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে মর্ত্যের সামনে স্বর্গের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু এমন মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতন চোখ ও সময় কুমারের তখন ছিল না। এবং বাঘার লক্ষ্য এ-সব কোন-দিকেই নেই—তার চেষ্টা কেবল এগিয়ে যাবার জন্যেই।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছেড়ে কুমার আবার উঠে পড়ে অগ্রসর হল।

ঘণ্টাখানেক পথ চলবার পরেই দেখা গেল, পথের সামনেই পাহাড়ের একটা উঁচু, খাড়া গা দাঁড়িয়ে আছে। কুমার ভাবতে লাগল, তাহলে এ-পথটা কি ঐখানেই গিয়ে শেষ হয়েছে! কিন্তু ওখানে তো আর কোন কিছুরই চিহ্ন নেই! তবে কি আমি ভুল পথে এসেছি,—এত পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হবে?

সেই খাড়া-পাহাড়ের কাছে এসে কুমার দেখলে, না, পথ শেষ হয়নি—ঐ খাড়া-পাহাড়ের তলায় এক গুহা,—পথটা তার ভিতরেই ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

তবে কি ঐ গুহাটাই হচ্ছে সেই রাক্ষুসে জীবদের আস্তানা?

বাহির থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কুমার গুহার ভিতরে কিছুই দেখতে পেলে না—তার ভিতরে স্তম্ভিত হয়ে বিরাজ করছে কেবল ছিদ্রহীন অন্ধকার ও ভীষণ স্তব্ধতা!

টর্চের আলো ফেলেও বোঝা গেল না, গুহাটা কত বড় এবং তার ভিতরে কি আছে।

বাঘা সেই গুহার ভিতরে ঢুকবার জন্যে বিষম গোলমাল করতে লাগল।

বাঘার রকম দেখে কুমারেরও বুঝতে বাকি রইল না যে, শত্রুরা ঐ গুহার ভিতরেই আছে!

এখন কি করা উচিত? গুহার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেও কোন লাভ নেই এবং গুহার ভিতরে ঢুকলেও হয়তো কোন সুবিধাই হবে না—শত্রুরা হয়তো তার জন্যই আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে আছে, একবার সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেই পোকা-মাকড়ের মতন তাকে টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

কুমার বাঁ-হাতে বাঘার শিকল নিলে। রিভলভারটা খাপ থেকে বার করে একবার পরীক্ষা করে দেখলে। তারপর ডান-হাতে 'টর্চ'টা নিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে।

আট
গুহার ভিতরে

বাইরের প্রখর আলো ছেড়ে গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই চতুর্দিকব্যাপী প্রচণ্ড ও বিপুল এক অন্ধকারে কুমার প্রথমটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার 'টর্চে'র আলো-বাণে বিদ্ধ হয়ে অন্ধকারের অদৃশ্য আত্মা যেন নীরবে আর্তনাদ করে উঠল। সেখানকার অন্ধকার হয়তো জীবনে এই প্রথম আলোকের মুখ দেখলে!

'টর্চে'র আলোক-শিখা ক্রমেই কম-উজ্জ্বল হয়ে দূরে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। কুমার বুঝলে, এ বড় যে-সে গুহা নয়! 'টর্চে'র মুখ ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়েও আলো ফেলে সে পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কোনদিকেই অন্ধকারের থই পাওয়া গেল না।

এত বড় গুহা ও এত জমাট অন্ধকারের ভিতরে কোন্‌দিকে যে যাওয়া উচিত, সেটা আন্দাজ করতে না পেরে কুমার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু বাঘার ঘ্রাণ-শক্তি তাকে বলে দিলে, শত্রুরা কোন্ দিকে গেছে! শিকলে টান মেরে সে আবার একদিকে অগ্রসর হতে চাইলে। অগত্যা কুমারকেও আবার বাঘার উপরেই নির্ভর করতে হল।

কিন্তু আগেকার মতো বাঘা এখন আর দ্রুতবেগে অগ্রসর হল না। সে কয়েকপদ এগিয়ে যায়, আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শোনে এবং গরর্ গরর্ করে গজরাতে থাকে। যেন সে শত্রুর খোঁজ পেয়েছে!

কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকারের রাজ্যে শত্রুরা যে কোথায় লুকিয়ে আছে, অনেক চেষ্টার পরেও কুমার তা আবিষ্কার করতে পারলে না।

অদ্ভুত সেই অন্ধকার গুহার স্তব্ধতা! বাদুড়ের মতন অন্ধকারের জীবের পাখনাও সেখানে ঝটপট করছে না,—স্থির স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে এবং নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই গায়ে কাঁটা দেয়!

কিন্তু বাঘার হাব-ভাবের অর্থ কুমার ভালো-রকমই জানে। যদিও শত্রুর কোন চিহ্নই তার নজরে ঠেকল না, তবু এটুকু সে বেশ বুঝতে পারলে যে,

বাঘা যখন এমন ছটফট করছে তখন শত্রুরা আর বেশি দূরে নেই; হয়তো কোন্ আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে তারা তার প্রত্যেক গতিবিধিই লক্ষ্য করছে। কিন্তু একটা বিষয় কুমারের কাছে অত্যন্ত রহস্যের মতো মনে হল। অনেকের মুখেই শত্রুদের যে দানব-মূর্তির বর্ণনা সে শ্রবণ করেছে এবং তাদের একজনের যে অমানুষিক হাত সে স্বচক্ষে দর্শন করেছে, তাতে তো তাদের কাছে তার ক্ষুদ্র দেহকে নগণ্য বলেই মনে হয়! তার উপরে এই অজানা শত্রুপুরীতে সে এখন একা এবং একান্ত অসহায়। যখন তারা দলে ভারি ছিল, শত্রুরা তখনই বিনয়বাবু, রামহরি ও বিমলকে অনায়াসেই হরণ করেছে। এবং এত-বড় তাদের বুকের পাটা যে, আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র দার্জিলিঙে গিয়ে হানা দিতেও তারা ভয় পায় না। কিন্তু তারা এখনো কেন লুকিয়ে আছে,—কেন তাকে আক্রমণ করছে না? এর কারণ কি? কিসের ভয়ে তারা সুমুখে আসতে রাজি নয়?

এমনি ভাবতে ভাবতে কুমার প্রায় আধ মাইল পথ এগিয়ে গেল। তখনো গুহা শেষ হল না!

এখনো বাঘা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গর্জন করছে বটে, কিন্তু এখন তার ভাব-ভঙ্গিতে কুমার একটা নূতনত্ব লক্ষ্য করলে।

বাঘা এখন আর ডাইনে-বাঁয়ে বা সামনের দিকে তাকাচ্ছে না—বার বার দাঁড়িয়ে সে পিছন-পানে ফিরে দেখছে আর গর্জন করে উঠছে! যেন শত্রু আছে পিছন দিকেই! এ সময়ে কুমারের মনের ভিতরটা যে কি-রকম করছিল, তা আর বলবার নয়।

আর-একটা ব্যাপার তার নজরে পড়ল। 'টর্চে'র আলোতে সে দেখতে পেলে, তার ডাইনে আর বাঁয়ে গুহার কালো পাথুরে গা দেখা যাচ্ছে! তাহলে গুহাটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে!

আরো-খানিকটা এগুবার পর গুহার দুদিকের দেওয়াল তার আরো কাছে এগিয়ে এল। এখন সে যেন একটা হাত-পনেরো চওড়া পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

আরো-কিছু পরেই মনে হল, সামনের দিকের অন্ধকার যেন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কয়েক পা এগিয়ে আলো ফেলে দেখা গেল, গুহা-পথ সেখানে ডানদিকে মোড় ফিরেছে।

মোড় ফিরেই কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, গুহার পথ আবার ক্রমেই চওড়া এবং ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়ে আর একটা বিরাট গুহার সৃষ্টি করেছে!

এ গুহা অন্ধকার নয়, আলো-আঁধারিতে এখানকার খানিকটা দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা দেখা যাচ্ছে না! সন্ধ্যার কিছু আগে পৃথিবী যেমন আলো-ছায়ার

মায়া-ভরা হয়, এই নতুন গুহার ভিতরে ঠিক তেমনি-ধারাই আলো আর ছায়ার লীলা দেখা যাচ্ছে!

এই আলো-আঁধারির পরে একদিকে ঠিক আগেকার মতোই নিরেট অন্ধকার বিরাজ করছে এবং আর একদিকে—অনেক তফাতে উপর থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকের ঝরনা ঝরে পড়ছে! অর্থাৎ এখানে একদিক থেকে আসছে অন্ধকারের স্রোত এবং আর একদিক থেকে আসছে আলোকের ধারা,—এই দুইয়ে মিলেই এখানকার বিচিত্র আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে!

আচম্বিতে এই নতুন গুহার ভিতরে দূরে থেকে—নিবিড় অন্ধকারের দিক থেকে জেগে উঠল মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ! অত্যন্ত যন্ত্রণায় কে যেন তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠল! তারপরেই সব চুপচাপ!

কার এ কান্না? নিশ্চয়ই বিমলের নয়, কারণ মৃত্যুর মুখে পড়লেও বিমল যে কোনদিনই কাতরভাবে কাঁদবে না, কুমার তা জানত। মঙ্গলগ্রহে ও ময়নামতীর মায়া-কাননে গিয়ে বিনয়বাবুর সাহসও সে দেখেছে, তিনিও এমন শিশুর মতন কাঁদবেন বলে মনে হয় না। তবে কি রামহরি বেচারীই এমনভাবে কেঁদে উঠল? অসম্ভব নয়! তার বুকের পাটা থাকলেও ভূতের ভয়ে সে সব করতে পারে! হয়তো কল্পনায় ভূত দেখে সে কঁকিয়ে উঠেছে।...না, কল্পনাই বা বলি কেন, আজ সকালেই আমার চোখের উপরে যে-হাতের বাঁধনে বিমল বন্দী হয়েছে, সে কি মানুষের হাত?

কিন্তু এ আর্তনাদ যারই হোক, তার উৎপত্তি কোথায় এবং কোন্ দিকে? ভালো করে বোঝবার আগেই সেই আর্তনাদ থেমে গেল—কেবল গুহার বিরাট গর্ভের মধ্যে সেই একই কণ্ঠের আর্তনাদ প্রতিধ্বনির মহিমায় বহুজনের কান্নার মতন চারিদিক অল্পক্ষণ তোলপাড় করে আবার নীরব হল। গুহার মধ্যে আবার অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা—নিজের হৃৎপিণ্ডের দুপদুপুনি নিজের কানেই শোনা যায়!

কুমার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে—যদি আবার সেই কান্না শোনা যায়! কিন্তু কান্না আর শোনা গেল না।

তখন কুমার বাঘাকে ডেকে শুধোলে, "হ্যাঁ রে বাঘা, এবারে কোন্‌দিকে যাব বল দেখি?"

বাঘা যেন মনিবের কথা বুঝতে পারলে। সে একবার ল্যাজ নাড়লে। একবার পিছন-পানে চেয়ে গরর্-গরর্ করলে, তারপর ফিরে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

বাঘার অনুসরণ করতে করতে কুমার নিজের মনে-মনেই বলতে লাগল, 'বাঘার বার বার পিছনে ফিরে তাকানোটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না! শত্রুরা নিশ্চয়ই আমার পালাবার পথ বন্ধ করেছে। এখন সামনের দিকে এগুনো ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। প্রাণ নিয়ে ফেরবার কোন আশাই দেখছি না,—এখন মরবার আগে একবার খালি বিমলের মুখ দেখতে চাই।'

...গুহার মেঝে আর ঢালু নেই, সমতল। কুমার আলোকের সেই ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল। চারিদিকে আগে অন্ধকারের বেড়া-জাল তারপর আবছায়ার মায়া এবং তারই মাঝখানে সেই আলো-নির্ঝর ঝরে পড়ছে, যেন দয়ালু আকাশের আশীর্বাদ! কী মিষ্টি সে আলো! কুমার আন্দাজে বুঝলে, গুহার ছাদে নিশ্চয় কোথাও একটা বড় ফাঁক আছে!

হঠাৎ অনেক দূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ জেগে উঠল!

কুমার চমকে উঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘাও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

শব্দটা প্রথমে অস্পষ্ট ছিল, তারপরে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারপর শব্দ যখন আরো কাছে এসে পড়ল, কুমারের গা তখন শিউরে উঠল!

এ শব্দ যেন তার পরিচিত। কাল রাত্রেই সে যে এই শব্দ শুনেছে! এ যেন ইস্টিমার 'কু' দিচ্ছে। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো,—যেন শত শত ইস্টিমার একসঙ্গে 'কু' দিতে দিতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে! সেই উদ্ভট ও বীভৎস ঐকতান ক্রমেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে সমস্ত গুহাকে পরিপূর্ণ করে ফেললে এবং তার সঙ্গে যোগ দিলে চারিদিক থেকে অসংখ্য প্রতিধ্বনি। সেই শান্ত ও স্তব্ধ গুহা দেখতে দেখতে যেন এক শব্দময় নরক হয়ে উঠল! বাঘাও পাল্লা দিয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করলে—কিন্তু অনেকগুলো তোপের কাছে সে যেন একটা ধানি-পটকার আওয়াজ মাত্র!

এই ভয়াবহ গোলমালের হেতু বুঝতে না পেরে কুমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

কিন্তু গোলমালটা ক্রমেই তার কাছে এসে পড়ল। আবছায়ার ভিতরে জেগে উঠল দলে দলে কতগুলো সৃষ্টিছাড়া অতি-ভয়ঙ্কর মূর্তি—এতদূর থেকে তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অমানুষী দেহের বিশালতা যে বিস্ময়কর, এটুকু অনায়াসেই আন্দাজ করা যায়!

কুমার তাড়াতাড়ি বাঘাকে টেনে নিয়ে যে-পথে এসেছিল সেইদিকে ফিরতে

গেল—কিন্তু ফিরেই দেখলে তার পালাবার পথ জুড়ে খানিক তফাতে তেমনি বীভৎস এবং তেমনি ভয়ঙ্কর অনেকগুলো অসুরের মূর্তি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, দুঃস্বপ্নের মতো!

সে ফিরে আর-একদিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না, সেদিকেও অন্ধকারের ভিতর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আরো কতকগুলো মূর্তিমান বিভীষিকা! প্রত্যেক মূর্তিই মাথায় হাতির মতন উঁচু।

এতক্ষণ সকলে আঁধারে গা ঢেকে ওৎ পেতে ছিল, এইবারে সময় বুঝে চতুর্দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে তারা কুমারকে একেবারে ঘিরে ফেললে!

বাঘাও আর চ্যাঁচালে না, সেও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

গুহার অন্ধকার এখন কুমারের চোখের ভিতরে এসে তার দৃষ্টিকেও অন্ধকার করে দিলে!

নয়

অন্ধকারের গর্তে

কি ভয়ানক, কি ভয়ানক! মাথায় হাতির সমান উঁচু, দেখতে মানুষের মতন, কিন্তু কী বিভীষণ আকৃতি! তাদের সর্বাঙ্গে গরিলার মতন কালো কালো লোম এবং তাদের ভাঁটার মতন চোখগুলো দিয়ে হিংস্র ও তীব্র দৃষ্টি বেরিয়ে এসে কুমারের স্তম্ভিত মনকে যেন দংশন করতে লাগল!

সেই অমানুষিক মানুষদের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীলোকও আছে,—কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ!

কুমার লক্ষ্য করে দেখলে, দূর থেকে সার বেঁধে অসংখ্য মূর্তি দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে—ঠিক যেন মিছিলের মতো! সেই বীভৎস মূর্তিগুলোই হাত তুলে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করছে আর মনে হচ্ছে, যেন অনেকগুলো ইস্টিমার একসঙ্গে কু দিচ্ছে!...কোন জীবের কণ্ঠ থেকে যে অমন তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ আওয়াজ বেরুতে পারে সেটা ধারণা করাই অসম্ভব!

কিন্তু কিসের ঐ মিছিল? প্রথমটা কুমার ভাবলে, হয়তে ওরা তাকেই আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু তারা যখন আরো কাছে এগিয়ে এল, তখন বেশ বোঝা গেল, ও-দলের কারুর দৃষ্টি কুমারের দিকে নেই। নিজেদের খেয়ালে তারা নিজেরাই মত্ত হয়ে আছে।

চারিদিকের অন্ধকারের ভিতর থেকে এতক্ষণে আরো যেসব অপরূপ মূর্তি একে একে বেরিয়ে আসছিল, তারাও এখন যেন কুমারের অস্তিত্বের কথা

একেবারেই ভুলে গেল,—অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে সেই মিছিলের দিকে তাকিয়ে তারাও সবাই হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাফাতে তেমনি বিকট স্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে! এ কী ব্যাপার? কেন এত লম্ফ-ঝম্প, আর কেনই বা এত হট্টগোল?

কুমার কিছুই বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু আর একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করলে। সেই বিরাট মিছিলের আগে আগে মিশমিশে কালো কি একটা জীব আসছে! কী জীব ওটা? কুকুর বলেই তো মনে হয়!

কুমারের দৃষ্টি যখন মিছিল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন হঠাৎ একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। এখানকার এই অদ্ভুত মানুষগুলোকে দেখে বাঘা এতক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু নিজেদের জাতের নতুন একটি নমুনা দেখে তার সে-ভাব আর রইল না,—আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা-টান মেরে শিকলসুদ্ধ কুমারের হাত ছাড়িয়ে সে সেই মিছিলের কুকুরটার দিকে ছুটে গেল, তীরের মতন বেগে!

এর জন্যে কুমার মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বাঘাকে সে নিবারণ করতেও পারলে না।

তারপর কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না, কারণ সেই দানব-মানুষগুলো চারিদিক থেকে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বাঘাকে একেবারে তার চোখের আড়াল করে দিলে!

কুমার বুঝলে, বাঘার আর কোন আশাই নেই, এই ভয়াবহ জীবগুলোর কবল থেকে বাঘাকে সে আর কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না!

হঠাৎ আর একদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একটা ভীষণ দানব-মূর্তি তার দিকেই বেগে এগিয়ে আসছে! কুমার সাবধান হবার আগেই সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল এবং তাকে ধরবার জন্যে কুলোর মতন চ্যাটালো একখানা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।...কুমার টপ করে মাটির উপর বসে পড়ল এবং সেই অসম্ভব হাতের বাঁধনে ধরা পড়বার আগেই নিজের কোমরবন্ধ থেকে রিভলবারটা খুলে নিয়ে তিন-চারবার গুলিবৃষ্টি করলে! গুলি খেয়ে দানবটা ভীষণ আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল এবং সেই ফাঁকে কুমার দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল!

দৌড়তে দৌড়তে কুমার আবার নিবিড় অন্ধকারের ভিতর এসে পড়ল। দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে সে তা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু তার পিছনে পিছনে মাটির উপরে ভারি ভারি পা ফেলে সেই আহত ও ক্রুদ্ধ দানবটা যে ধেয়ে আসছে এটা তার আর জানতে বাকি রইল না।

আচম্বিতে কুমারের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল, দুই হাতে অন্ধকার শূন্যকে আঁকড়ে ধরার জন্যে সে একবার বিফল চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তে কঠিন পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেললে!

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান হল সে তা জানে না। কিন্তু চোখ খুলে সে আবার দেখলে তেমনি ছিদ্রহীন অন্ধকারেই চারিদিক আবার সমাধির মতোই স্তব্ধ, দানবদের কোন সাড়াই আর কানে আসে না। এদিকে-ওদিকে হাত বুলিয়ে অনুভবে বুঝলে, সে পাহাড়ের গায়েই শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল। দু'চারবার হাত-পা নেড়ে-চেড়ে দেখলে তার দেহের কোন জায়গা ভেঙে গেছে কিনা!

হঠাৎ সে চমকে উঠল! অন্ধকারে পায়ের শব্দ হচ্ছে!

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠেই শুনলে—"কুমার, তোমার কি বেশি চোট লেগেছে?"

এ যে বিনয়বাবুর গলা!

বিপুল বিস্ময়ে কুমার বলে উঠল, "বিনয়বাবু! আপনি?"

—"হ্যাঁ কুমার, আমি।"

—"আমিও এখানে আছি কুমার!"

—"অ্যাঁ! বিমল! তুমি তাহলে বেঁচে আছ!"

—"হ্যাঁ ভাই, আমি বেঁচে আছি, রামহরিও বেঁচে আছে, আরো অনেকেও বেঁচে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন কারুকেই বাঁচতে হবে না। দিনে দিনে আমাদের দল থেকে ক্রমেই লোক কমে যাচ্ছে। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা বেঁচে আছি!"

—"কি বলছ বিমল, তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"একে একে সব কথাই শুনতে পাবে। আগে তোমার কথাই বল।"

দশ

অন্ধকারের বুকে আলো-শিশু

কুমার নিজের সব কথা বিমলের কাছে বলে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তোমরা সবাই কেমন করে এখানে এসে মিললে?"

বিমল বললে, "আমাদের ইচ্ছায় এ মিলন হয়নি। এ মিলন ঘটিয়েছে শত্রুরাই।"

—"বিমল, তোমার কথা আমার কাছে হেঁয়ালির মতন লাগছে। আমাকে সব বুঝিয়ে দাও।"

—"এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই কুমার! কাদের হাতে আমরা বন্দী হয়েছি, তা তুমি জানো। কখন আমরা বন্দী হয়েছি, তাও তুমি জানো। এখন আমরা কোথায় আছি তাও তোমার অজানা নয়।"

—"না বিমল, এখন আমরা কোথায় আছি, তা আমার জানা নেই, চারিদিকে যে ঘুটঘুটে অন্ধকার!"

বিমল বললে, "এটা একটা মস্ত-বড় লম্বা-চওড়া গর্ত।"

বিনয়বাবু বললেন, "আর, এই গর্তটা হচ্ছে আমাদের শত্রুদের বন্দীশালা।"

—"বন্দীশালা?"

—"হ্যাঁ। শত্রুরা আমাদের এখানে বন্দী করে রেখেছে। তুমি যেচে এই কারাগারে এসে ঢুকেছ। এর চারিদিকে খাড়া পাথরের উঁচু দেওয়াল। এখান থেকে পালাবার কোন উপায়ই নেই।"

একটু তফাৎ থেকে রামহরির কাতরকণ্ঠ শোনা গেল—"ভূতের জেলখানা! বাবা মহাদেব! রোজ তোমার পুজো করি, কিন্তু এই কি তোমার মনে ছিল বাবা?"

কুমার বললে, "তাহলে শত্রুরা তোমাদের সকলকে একে একে ধরে এনে এইখানে বন্ধ করে রেখেছে?"

বিমল বললে, "হ্যাঁ। খালি আমরা নই, আমাদের সঙ্গে এই গর্তের মধ্যে আরো অনেক পাহাড়ী লোকও বন্দী হয়ে আছে। দার্জিলিং আর হিমালয়ের নানান জায়গা থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে।"

—"এর মধ্যে মৃণু নেই?"

—"না। মৃণু কেন, এই গর্তের ভেতরে কোন মেয়েই নেই। তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দীশালা আছে কিনা জানি না।"

—"এ যে এক অদ্ভুত রহস্য! আমাদের বন্দী করে রাখলে এদের কি উপকার হবে?"

—"তা জানি না। কিন্তু বন্দী পাহাড়ীদের মুখে শুনলুম, প্রতি হপ্তায় একজন করে বন্দীকে ওরা গর্ত থেকে বার করে নিয়ে যায়। যে বাইরে যায়, সে নাকি আর ফেরে না।...কুমার, এই ব্যাপার থেকে তুমি অনেক-কিছুই অনুমান করতে পারো।"

কুমার শিউরে উঠে বললে, "কী ভয়ানক! ওরা কি তবে প্রতি হপ্তায় একজন করে মানুষকে হত্যা করে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস। হঠাৎ একদিন তোমার কি আমার পালা আসবে। এস, সেজন্যে আমরা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকি।"

—"সে কি বিমল, আমরা কি কোনই বাধা দিতে পারি না?"

—"না। সিংহের সামনে ভেড়া যেমন অসহায়, ওদের সামনে আমরাও তেমনি। ওদের চেহারা তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি। ওদের একটা ক'ড়ে আঙুলের আঘাতেই আমাদের দফা রফা হয়ে যেতে পারে। বাধা দিয়ে লাভ?"

কুমার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, "ওরা কে বিমল? রূপকথায় আর আরব্য-উপন্যাসে দৈত্যদানবের কথা পড়েছি। কিন্তু তারা কি সত্যই পৃথিবীর বাসিন্দা?"

কুমারের আরো কাছে সরে এসে বিমল বললে, "কুমার তাহলে শোনো। আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যদানবরা সত্যি কি মিথ্যে, তা আমি বলতে পারব না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এক সময়ে যে দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড মানুষ ছিল, এ-কথা আমি মনে-মনে বিশ্বাস করি। মাঝে মাঝে সে-প্রমাণও পাওয়া যায়। তুমি কি জানো না, এই ভারতবর্ষেই কাটনির কাছে একটি ৩১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা বিরাট কঙ্কাল পাওয়া গেছে? তার পা দুটোই ১০ ফুট করে লম্বা। সে কঙ্কালটা প্রায় মানুষের কঙ্কালের মতোই দেখতে। রামগড়ের রাজার প্রাসাদে কঙ্কালটা রাখা হয়েছে। আমি 'স্টেটসম্যানে' এই খবরটা পড়েছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "দেখ, দার্জিলিংয়ের সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যেদিন 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র পুরনো ফাইলে হিমালয়ের রহস্যময় জীবের কথা পড়লুম, সেইদিন থেকে অনেক কথাই আমার মনে হচ্ছে। এর আগেও কোন কোন ভ্রমণ-কাহিনীতে আমি হিমালয়ের 'ঘৃণ্য তুষার-মানবে'র কথা পড়েছি। 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে' হয়তো তাদেরই কথা বেরিয়েছে। কিন্তু আসলে কে তারা? তারা কি সত্যিই মানুষ, না মানুষের মতন দেখতে অন্য কোন জীব? আধুনিক পণ্ডিতদের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিতরে খুঁজলে হয়তো এ-প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

কুমার শুধোলে, "আমাদের চেয়ে আপনার পড়াশুনো ঢের বেশি। আপনি কোন সদুত্তর পেয়েছেন কি?"

বিনয়বাবু বললেন, "সে-বিষয়ে আমি নিজে জোর করে কিছু বলতে চাই না। তবে পণ্ডিতদের আবিষ্কারের কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে পারি, শোনো।

পণ্ডিতদের মতে, এখন যেখানে হিমালয় পর্বত আছে, অনেক লক্ষ বৎসর

আগে মহাসাগরের অগাধ জল সেখানে খেলা করত। কারণ আধুনিক হিমালয়ের উপরে অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের শিলীভূত কঙ্কাল বা দেহাবশেষ অর্থাৎ fossil পাওয়া গিয়েছে।

হিমালয়ের আশে-পাশে যেসব দেশ আছে, এখনো ধীরে ধীরে তারা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। হিসাব করে দেখা গেছে, কাশীধামের উত্তরদিকের ভূমি এখনো প্রতি শতাব্দীতে ৬ ফুট করে উঁচু হয়ে উঠছে।

হিমালয়ের ঊর্ধ্বভাগ থেকে রাশি রাশি পচা গাছ-পাতা ও অন্যান্য আজে-বাজে জিনিস পাহাড়ের দুইপাশে নেমে এসে জমা হয়ে থাকত। কালে সেই-সব জায়গা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (mammals) বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এখানে তাই আজও এত আদিম জীব-জন্তুর শিলীভূত কঙ্কাল পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতেরা এ-জায়গাটাকে 'সেকেলে জীবদের গোরস্থান' বলে ডেকে থাকেন।

কিছুদিন আগে Yale North India Expedition-এর পণ্ডিতরা উত্তর-ভারত থেকে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানুষের মতন দেখতে এক নতুন জাতের বানরের অস্তিত্ব।

ঐ অভিযানে দলপতি ছিলেন অধ্যাপক Hellmut de Terra সাহেব। উত্তর-ভারতবর্ষে এক বৎসর কাল তিনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেছেন। তাঁর পরীক্ষার ফলে যে-সব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কোন-কোনটিকে দেখতে প্রায় মানুষের মতন। অন্তত গরিলা, ওরাং-উটান বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় বানরদের সঙ্গে তাদের দেহের গড়ন মেলে না। এইরকম দুই জাতের অজানা জীবের নাম দেওয়া হয়েছে Ramapithecus ও Sugrivapithecus! নাম শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নামানুসারেই তাদের নামকরণ হয়েছে!

পণ্ডিতদের মতে, উত্তর-ভারতে প্রাপ্ত এই-সব জীবের কোন-কোনটির মস্তিষ্ক, গরিলা প্রভৃতি সমস্ত বানর-জাতীয় জীবের মস্তিষ্কের চেয়ে উন্নত। তাদের মস্তিষ্কের শক্তি ছিল অনেকটা মানুষেরই কাছাকাছি।

কে বলতে পারে, ঐ-সব জীবের কোন কোন জাতি এখনও হিমালয়ের কোন গোপন প্রান্তে বিদ্যমান নেই? তারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়নি বলে আধুনিক মানুষ তাদের খবর রাখে না। কিন্তু আমরা জানি না বলেই যে তারা বেঁচে নেই, এমন কথা কিছুতেই মনে করা চলে না। হয়তো তারা বেঁচে আছে এবং হয়তো তারা সভ্য না হলেও মস্তিষ্কের শক্তিতে আগেকার চেয়েও উন্নত হয়ে উঠেছে।

বিমল, কুমার! আমি যা জানি আর মনে করি, সব তোমাদের কাছে খুলে বললুম। তবে আমার অনুমানই সত্য বলে তোমরা গ্রহণ না করতেও পারো।"

বিমল বললে, "তাহলে আপনার মত হচ্ছে, মানুষের মতন দেখতে বানর-জাতীয় দানবরাই আমাদের সকলকে বন্দী করে রেখেছে?"

বিনয়বাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "বললুম তো, ওটা আমার মত নয়, আমার অনুমান মাত্র।"

কুমার বাহুকেই বালিশে পরিণত করে কঠিন পাথরের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে।

বিমল প্রভৃতির মুখেও কোন কথা নেই। চারিদিক যেমন স্তব্ধ, তেমনি অন্ধকার।

হঠাৎ কুমারের মনে হল, অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা করে যেন ছোট্ট একটি আলো-শিশু কাঁপতে কাঁপতে হেসে উঠল।

প্রথমটা কুমার ভাবলে, তার চোখের ভুল। কিন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভালো করে চেয়ে সে বুঝলে, সে আলো একটা মশালের আলো! গর্তের উঁচু পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে কেউ মশাল হাতে নিয়ে কি দেখছে! মশালের তলায় একখানা অস্পষ্ট মুখও দেখা গেল,—কুমারের মনে হল, সে মুখ যেন তারই মতন সাধারণ মানুষের মুখ!

কে যেন উপর থেকে চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় ডাকলে "কুমারবাবু! কুমারবাবু!"

এ যে নারীর কণ্ঠস্বর! নিজের কানের উপরে কুমারের অবিশ্বাস হল—এই রাক্ষসের মুল্লুকে মানুষের মেয়ে!

এগারো

কুকুর-দেবতার মুল্লুক

কেবল কি মানুষের মেয়ে? এ মেয়ে যে তারই নাম ধরে ডাকছে!

কুমার ভাবলে, হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

আবার উপর থেকে চাপা গলার আওয়াজ এল—"কুমারবাবু!"

এবারে কুমার আর চুপ করে থাকতে পারলে না, চাপা গলায় উত্তর দিলে, "কে?"

উপর থেকে সাড়া এল, "ঠিক আমার নীচে এসে দাঁড়ান।"

কুমার কথা-মতো কাজ করলে।

—"এইটে নিন।"

কুমারের ঠিক পাশেই খট্ করে কি একটা শব্দ হল। গর্তের তলায় হাত বুলিয়ে কুমার জিনিসটা তুলে নিলে। অন্ধকারেই অনুভবে বুঝলে, একখণ্ড পাথরের সঙ্গে সংলগ্ন কয়েক টুকরো কাগজ! উপরে মুখ তুলে দেখলে, সেখানে আর মশালের আলো নেই।...আস্তে আস্তে ডাকল, "বিমল!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমরাও সব দেখেছি, সব শুনেছি।"

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার, তুমি মৃণুকে চিনতে পারলে না?"

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "মৃণু! যে আমাকে ডাকলে, সে কি মৃণু? আপনি চিনতে পেরেছেন?"

—"বাপের চোখ নিজের সন্তানকে চিনতে পারবে না?"

—"কিন্তু কি আশ্চর্য! যার খোঁজে এতদূর আসা, তাকে পেয়েও আপনি তার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনয়বাবু বললেন, "কত কষ্টে যে নিজেকে সামলেছি তা কেবল আমিই জানি কুমার! কিন্তু কি করব বল? যখন দেখলুম এই শত্রুপুরীতে আমার মেয়ে ভয়ে ভয়ে চাপা-গলায় তোমাকেই ডাকছে, তখন নিজের মনের আবেগ জোর করে দমন না করলে মৃণুকে হয়তো বিপদে ফেলা হত!"

বিমল বললে, "দেখুন বিনয়বাবু, আমার বিশ্বাস আপনি আর আমি যে আছি, মৃণু তা জানে না! খুব সম্ভব, কেবল কুমারকেই সে দেখতে পেয়েছে, তাই তাকে ছাড়া আর কারুকে ডাকেনি।"

বিনয়বাবু বললেন, "বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।"

কুমার বললে, "মৃণু কতকগুলো টুকরো কাগজ দিয়ে গেল, নিশ্চয় তাতে কিছু লেখা আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে কেমন করে পড়ব? আমার 'টর্চ' গর্তে পড়বার সময় ভেঙে গেছে।"

বিনয়বাবু বললেন, "কাল আমি দেখেছি, পাহাড়ের এক ফাটল দিয়ে কোন্ এক সময়ে এই গর্তের ভিতরে সূর্য-রশ্মির একটা রেখা কিছুক্ষণের জন্যে এসে পড়ে। আজও নিশ্চয় সেই আলোটুকু পাওয়া যাবে। অপেক্ষা কর।"

উপর থেকে সূর্যের একটি কিরণ-তীর নিবিড় অন্ধকারের বুক বিদ্ধ করে গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে এসে পড়ল।

বিনয়বাবু বললেন, "কুমার, চটপট কাজ সেরে নাও। এ আলো এখনি পালাবে।"

সূর্য-রশ্মির সামনে কাগজের টুকরোগুলো ধরে কুমার দেখলে, একখানা ছোট ডায়েরি থেকে সেগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। বোধহয়, দানবদের হাতে ধরা পড়বার সময়েই ডায়েরিখানা মৃণুর কাছে ছিল।

ডায়েরির ছেঁড়া কাগজে পেন্সিলে লেখা রয়েছে—

"কুমারবাবু, কি করে ধরা পড়েছি, সে কথা যদি দিন পাই, তবে বলব। কারণ আমার স্থান ও সময় দুই-ই অল্প।

তবে আপনিও যখন এদের হাতে ধরা পড়েছেন, তখন এরা যে কে ও কি প্রকৃতির জীব, সেটা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন!

যাদের কাছে আমি আছি, তারা মানুষ কিনা, আমি জানি না। তবে তাদের মুখ আর দেহ মানুষের মতন দেখতে বটে। এরা পরস্পরের সঙ্গে যখন কথা কয়, তখন এদের ভাষাও আছে। কিন্তু এদের ভাষায় কথার সংখ্যা খুবই কম।

কেবল ভাষা নয়, এদের একটা ধর্মও আছে। সে ধর্মের বিশেষ কিছুই আমি জানি না বটে, কিন্তু এরা যে সেই ধর্মের বিধি পালন করবার জন্যেই নানা জায়গা থেকে মানুষ ধরে আনে, এটুকু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

কুমারবাবু, আপনি শুনলে অবাক হবেন, এদের প্রধান দেবতা হচ্ছে কুকুর! আর আমি কে জানেন? কুকুর-দেবতার প্রধান পূজারিণী! আমার এখানে আদর-যত্নের অভাব নেই, সবাই আমাকে ভয়-ভক্তিও করে বোধ হয়, কিন্তু এরা সর্বদাই আমাকে চোখে-চোখে রাখে, পাছে আমি পালিয়ে যাই, সেজন্যে চারিদিকেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে।

আমার থাকবার জন্যে এরা একটা আলাদা গুহারও ব্যবস্থা করেছে। সে গুহার ভিতরকার কোন কোন আসবাব ও জামাকাপড় আর দেওয়ালে আজেবাজে জিনিস দিয়ে আঁকা ছবি দেখে মনে হয়, আমার আগেও এখানে অন্য পূজারিণী ছিল এবং সেও আমারই মতন মানুষের মেয়ে।

বোধ হয়, এদের দেশে মানুষের মেয়ে ছাড়া আর কেউ পূজারিণী হতে পারে না। একজন পূজারিণীর মৃত্যু হলে, মানুষের দেশ থেকে আবার একজন মেয়েকে বন্দী করে আনা হয়।

প্রতি হপ্তায় একদিন করে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী। সে নদী অত্যন্ত গভীর। এদেশের

কেউ সাঁতার জানে না বলে সে-নদীতে ভয়ে কেউ নামে না। এদের ইঙ্গিতে যতটুকু বুঝেছি, সে নদীর নাকি আদি-অন্ত নেই। প্রতি হপ্তায় বিশেষ পূজার দিনে, কুকুর-দেবতাকে নিয়ে আমাকে সেই নদীর ধারে যেতে হয়, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে আগে পিছে চলে দলে দলে এখানকার যত না-রাক্ষস, না-মানুষ, না-বানর জীব নাচতে নাচতে আর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। নদীর জলে কুকুর-দেবতাকে স্নান করিয়ে আবার ফিরে আসি এবং তারপর যা হয়,—উঃ, সে কথা বলবার নয়!

কুমারবাবু, এরা মানুষ চুরি করে আনে কেন, তা জানেন? কুকুর-দেবতার সামনে নরবলি দেবার জন্যে! বলির পরে সেই মানুষের মাংস এরা সবাই ভক্ষণ করে। চোখের সামনে এই ভীষণ দৃশ্য দেখে আমার যে কি অবস্থা হয়, সেটা আপনি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারবেন।

এমনি এক বিশেষ পূজার দিনে নদীর ধার থেকে ফিরে আসছি, আচম্বিতে কোথা থেকে মস্ত-বড় একটা কুকুর এসে এখানকার কুকুর-দেবতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তারপর দুই কুকুরে বিষম ঝটাপটি লেগে গেল। এখানকার কুকুরটা দেবতা হয়েও জিততে পারলে না, নতুন কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত দেহেই কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে ল্যাজ গুটিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল! নতুন কুকুরটা আমার কাছে এসে মনের খুশিতে ল্যাজ নাড়তে লাগল! তখন একটু আশ্চর্য হয়ে তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখি, সে হচ্ছে আমাদেরই বাঘা!

বাঘা এখানে কেমন করে এল, অবাক হয়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখ তুলেই আপনাকে দেখতে পেলুম। তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি লাগল না। আপনিও এদের কাছে বন্দী হয়েছেন।

বিজয়ী বাঘার বিক্রম দেখে এরা ভারি আনন্দিত হয়েছে! পরাজিত কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাঘাকেই এরা দেবতা বলে মেনে নিয়েছে! এবার থেকে আমাকে বাঘার পুজো করতে হবে!

কুমারবাবু, এখন আমাদের উপায় কি হবে? এই ভীষণ দেশ ছেড়ে আর কি আমরা স্বদেশে ফিরতে পারব না? আমাকে হারিয়ে না-জানি আমার বাবার অবস্থা কি হয়েছে!

আজ বলির নর-মাংস খেয়ে এরা সারা-রাত উৎসব করবে। কাল সকালে এরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়বে। যারা পাহারা দেবে তারাও বিশেষ সজাগ থাকবে

না। সেই সময়ে আমি আবার চুপিচুপি আপনার গর্তের ধারে যাবার চেষ্টা করব।

এখানে একরকম শক্ত লতা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আমি একগাছা লম্বা ও মোটা দড়ি তৈরি করছি। গর্তের ভিতরে সেই দড়ি ঝুলিয়ে দিলে হয়তো আপনি উপরে উঠেও আসতে পারবেন।

আমাদের অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু কাল আমরা মুক্তিলাভের চেষ্টা করবই—তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।

আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ইতি মৃণু।"

বারো

অন্ধকূপের নদী

কুমারের পত্রপাঠ শেষ হল।

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "এতদিন পরে আমার হারানো মেয়েকে পেয়ে মনে খুব আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু এ আনন্দের কোন দাম নেই।"

কুমার বললে, "কেন বিনয়বাবু? মৃণু তো খুব সুখবরই দিয়েছে। কাল সকালে সে লতা দিয়ে দড়ি তৈরি করে আনবে বলেছে। আমাদের আর এই অন্ধকূপে পচে মরতে হবে না!"

দুঃখের হাসি হেসে বিনয়বাবু বললেন, "কিন্তু দড়ি বয়ে উপর উঠলেও তো আমরা এই অন্ধকূপের গর্ত থেকে বেরুতে পারব না! অন্ধের মতন এর ভেতরে এসে ঢুকেছি, কিন্তু বেরুবার পথ খুঁজে পাব কেমন করে?"

কুমার খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "ভালোয় ভালোয় যদি বেরুতে না পারি, আমরা ঐ দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

বিনয়বাবু বললেন, "তাতে কোনই লাভ হবে না। যুদ্ধে হেরে মরব আমরাই।"

কুমার বললে, "তাদের ভয় দেখিয়ে জিতে যেতেও পারি। আমাদের কাছে তিনটে বন্দুক আর তিনটে রিভলভার আছে। তাদের শক্তি বড় অল্প নয়।"

রামহরি বললে, "তোমরা একটা বন্দুক আমাকে দিও তো! অন্তত একটা ভূতকে বধ করে তবে আমি মরব।"

বিনয়বাবু বললেন, "দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়! হ্যাঁ, ভালো কথা! এই গর্তে আরো অনেক মানুষ রয়েছে! এদের কি উপায় হবে?"

কুমার বললে, "কেন, ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওদের সঙ্গে নিলে আমাদের লোকবলও বাড়বে।"

বিনয়বাবু বললেন, "ছাই বাড়বে! দেখছ না, ভয়ে ওরা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে! কাপুরুষ কোন কাজেই লাগে না।"

কুমার বললে, "বিমল, তুমি যে বড় কথা কইছ না?"

বিমল বললে, "আমি ভাবছি।"

—"কী ভাবছ?"

—"মৃণু চিঠিতে লিখেছে—'আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী'—আমি সেই নদীর কথাই ভাবছি।"

—"এখন কি নদী-টদি নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত? আগে নিজের মাথা কি করে বাঁচবে সেই কথাই ভাবো।"

—"কুমার, আমি মাথা বাঁচাবার কথাই ভাবছি। তোমার বন্দুক-টন্দুক বিশেষ কাজে লাগবে না, ঐ নদীই আমাদের মাথা বাঁচাবে!"

কুমার আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি-রকম?"

বিমল বললে, "আমরা পাহাড়ের ওপরে আছি। এখানে যদি কোন মস্ত নদী থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে, এই অন্ধকূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছে। কেমন, তাই নয় কি?"

—"হুঁ। তারপর?"

—"মৃণু লিখেছে—'এদেশের কেউ সাঁতার জানে না ব'লে সে-নদীতে ভয়ে কেউ নামে না।' এর চেয়ে ভালো খবর আর কি আছে?"

কুমার হঠাৎ বিপুল আনন্দে এক লাফ মেরে বলে উঠল, "বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না! উঃ, আমি কি বোকা! এতক্ষণ এই সহজ কথাটাও আমার মাথায় ঢোকেনি!"

বিমল বললে, "এই গর্তের ওপরে উঠে কোন গতিকে একবার যদি সেই নদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তাহলেই আমরা খালাস। দানবরা সাঁতার জানে না, কিন্তু আমরা সাঁতার জানি। নদীর স্রোতে ভেসে অন্ধকূপের বাইরে গিয়ে পড়ব!"

বিনয়বাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "সাবাস বিমল, সাবাস! এত বিপদেও তুমি বুদ্ধি হারাওনি!"

বিমল বললে, "এখন মৃণুর ওপরেই সব নির্ভর করছে। সে যদি না আসতে পারে, তাহলেই আমরা গেলুম!"

রামহরি বললে, "তোমরা একটু চুপ কর খোকাবাবু, আমাকে বাবা মহাদেবের নাম জপ করতে দাও। বাবা মহাদেব তাহ'লে নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।"

আচম্বিতে গর্তের ভিতরে একটা বিষম শব্দ হল—তারপরেই ভারি ভারি পায়ের ধুপ ধুপ আওয়াজ!

অন্ধকারে পিছনে হটতে হটতে বিমল চুপি-চুপি বললে, "সরে এস! দেয়ালের দিকে সরে এস! গর্তের ভেতরে শত্রু এসেছে!"

গর্তের অন্য দিক থেকে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—তার মধ্যে একজনের আর্তনাদ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্মভেদী! সে চিৎকার ক্রমে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে উপরে গিয়ে উঠল এবং তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল!

বিনয়বাবু ভগ্নস্বরে বললেন, "আজ আবার নরবলি হবে। আমাদের আর একজনকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু আমরা কোন বাধাই দিতে পারলুম না।"

কাল সারা রাত গর্তের উপর থেকে রাক্ষুসে উৎসবের বিকট কোলাহল ভেসে এসেছে।

এখনো সকাল হয়েছে কিনা বোঝবার উপায় নেই, কারণ এখানে আলোকের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

তবে দানব-পুরী এখন একেবারে স্তব্ধ। এতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকূপের বাইরে সূর্যদেব হয়তো এখন চোখ খুলে পৃথিবীর পানে দৃষ্টিপাত করেছেন।

বিমল, কুমার, বিনয়বাবু ও রামহরির সাগ্রহ দৃষ্টির সামনে গর্তের উপরে আবার কালকের মতো সেই মশালের আলো জ্বলে উঠল।

গর্তের উপরে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে মৃণু ডাকলে, "কুমারবাবু!"

কুমার ছুটে গিয়ে সাড়া দিলে, "মৃণু, এই যে আমি!"

—"চুপ! চ্যাঁচাবেন না। শত্রুরা সব ঘুমিয়েছে! এই আমি দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি! দড়ি বয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে আসুন।"

বিমল বললে, "কুমার, তুমিই আগে যাও,—তারপর যাব আমরা। গর্তের আর সব লোককেও বলে রেখেছি, তারাও পরে যাবে।"

কুমার দড়ি বয়ে উপরে গিয়ে উঠল। সেখানে এক হাতে বাঘাকে আর এক হাতে মশাল ধরে মৃণু উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমার উপরে উঠতেই সে অগ্রসর হতে গেল।

কুমার বললে, "একটু সবুর কর মৃণু, তোমার বাবাকে উপরে উঠতে দাও।"

মৃণু বিস্মিত ভাবে বললে, "আমার বাবা?"

—"হ্যাঁ, কেবল তিনি নন,—তোমার খোঁজে এসে আমার মতন বিমল আর রামহরিও বন্দী হয়েছে।"

—"অ্যাঁ, বলেন কি!"

—"ঐ তোমার বাবা উপরে উঠলেন। দাও, বাঘাকে আমার হাতে দাও।"

মৃণু ছুটে গিয়ে বিনয়বাবুর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে রামহরি ও বিমলও উপরে এসে হাজির হল।

কিন্তু তারপরেই গর্তের ভিতর থেকে মহা হৈ-চৈ উঠল। গর্তের ভিতরে আর যে সব মানুষ বন্দী হয়ে ছিল, মুক্তিলাভের সম্ভাবনায় তারা যেন পাগল হয়ে গেল! তারা সকলেই একসঙ্গে দড়ি বয়ে উপরে আসবার জন্যে চ্যাঁচামেচি ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলে।

পরমুহূর্তেই দূর থেকে অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল রেল-ইঞ্জিনের বাঁশীর মতন তীক্ষ্ণ একটা শব্দ!

মৃণু সভয়ে বললে, "সর্বনাশ, ওদের প্রহরীর ঘুম ভেঙে গেছে!"

—"এখন উপায়?"

—"আর কোন উপায়ই নেই। ঐ শুনুন, ওদের পায়ের শব্দ! ওরা এদিকেই ছুটে আসছে!"

তেরো

রাত্রির কোলে সন্ধ্যানদী

আসন্ন মরণের সম্ভাবনায় যারা ছিল এতক্ষণ জড়ভরতের মতন, জীবনের নতুন আশা তাদের সমস্ত নিশ্চেষ্টতাকে একেবারে দূর করে দিলে।

লতা দিয়ে তৈরি মাত্র একগাছা দড়ি,—কোনরকমে একজন মানুষের ভার সইতে পারে, তাই ধরে একসঙ্গে উপরে উঠতে গেল অনেকগুলো লোক। তাদের সকলের টানাটানিতে সেই দড়িগাছা গেল হঠাৎ পটাস করে ছিঁড়ে! শূন্যে যারা ঝুলছিল, নীচেকার লোকদের ঘাড়ের এবং গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে তারা হুড়মুড় করে এসে পড়ল এবং আতঙ্ক ও যন্ত্রণা মাখা এক বিষম আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

সে আর্তনাদ গর্তের উপরে এসেও পৌঁছলো, কিন্তু সেখানে তখন তা

শোনবার অবসর ছিল না কারুরই! দলে দলে দানব ছুটে আসছে, তাদের পায়ের ভারে মাটি কাঁপছে, সকলের কান ছিল কেবল সেই দিকেই।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "মৃণু, মৃণু! কোন্ দিক দিয়ে গেলে আলোক-ঝরনা পেরিয়ে নদীর ধারে যাওয়া যায়?"

মৃণু বললে, "ঐদিকে!"

বিমল বললে, "সবাই তবে ঐদিকেই ছোটো—আর কোন"—

কিন্তু বিমলের কথা শেষ হবার আগেই একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি কোথা থেকে তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৃণুর মশালের আলোতে কুমার সভয়ে দেখলে, সেই ছায়ামূর্তির বিরাট দেহের তলায় পড়ে বিমল যেন একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল!

কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বন্দুকের শব্দ গিরি-গহ্বরের সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় বহুগুণ ভীষণ হয়ে বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তিটা সশব্দে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল!

তারপরেই বিমলের গলা শোনা গেল,—"একেবারে বুকে গুলি লেগেছে, এ যাত্রা আর ওকে মানুষ চুরি করতে হবে না! ছোটো ছোটো,—নদীর ধারে—নদীর ধারে!"

সবাই তীরের মতো ছুটতে লাগল! ঐ আলো-ঝরনা দেখা যাচ্ছে, চারিদিকের অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে আসছে এবং আলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসছে মুক্তির আভাস!

কিন্তু পিছন থেকে অমানুষিক কণ্ঠের তীক্ষ্ণ হুহুঙ্কার এবং অসংখ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে!

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "কুমার! বিনয়বাবু! ওরা একেবারে কাছে এসে পড়লে আমরা আর কিছুই করতে পারব না। এইবারে আমাদের বন্দুক ছুঁড়তে হবে! এখানে আলো আছে, আমরা লক্ষ্য স্থির করতে পারব!"

একসঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জন ও অগ্নি-উদ্গার করতে লাগল! বন্দুকের গুলি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন তিন-তিনটে রিভলবারের ধমক শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে রামহরি আবার বন্দুকগুলোতে নতুন কার্তুজ পুরে দেয় এবং বন্দুক আবার মৃত্যুবৃষ্টি করতে থাকে! এবং রামহরি দু-হাত শূন্যে তুলে নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে ওঠে—"বোম্ বোম্ মহাদেব! বোম্ বোম্ মহাদেব!"

আর বাঘা খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে তালে তালে বলে—ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চারটে দানবের লীলাখেলা একেবারে সাঙ্গ হয়ে গেল, আট-দশটা 'পপাত ধরণীতলে' হয়ে ছটফট করতে লাগল! তাই দেখে আর সবাই ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে আবার অন্ধকারের ভিতরে পিছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

বিমল বললে, "মৃণু! এইবারে ছুটে নদীর ধারে চল!"

আবার সবাই ছুটতে আরম্ভ করলে। আলো-ঝরনা পার হয়ে আরো খানিক দূর এগিয়েই শোনা গেল, গম্ভীর এক জল-কল্লোল!

তারপর আলো-ঝরনা ছাড়িয়ে সকলে যতই অগ্রসর হয়, চারিদিকের অন্ধকার আবার ততই ঘন হয়ে ওঠে!

বিমল শুধোলে, "মৃণু, আমরা কি আবার অন্ধকারের ভিতর গিয়ে পড়ব?"

মৃণু বললে, "না। এই দেখুন, আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি।" এখানে বেশি আলোও নেই, বেশি অন্ধকারও নেই,—এ যেন মায়া-রাজ্য! মায়া-রাজ্য না হোক, ছায়া-রাজ্য বটে! এখানে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না—সমস্তই যেন রহস্যময়! এই আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে যে বিপুল জলস্রোত কোলাহল করতে করতে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, তার পরপার যেন রাত্রির নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে! এ নদী দেখা যায়, কিন্তু স্পষ্ট করে দেখা যায় না। মনে হয়, ওর গর্ভে লুকিয়ে আছে কত অজানা আর অচেনা বিভীষিকা! ওর জলধারা যেন নেমে যাচ্ছে পাতালের বুকের তলায়!

বিমল বললে, "আমি যদি কবি হতুম তাহলে এ নদীর নাম রাখতুম, সন্ধ্যানদী। কবিতার ভাষায় বলতুম, অন্ধ রাত্রির পদতল ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যানদীর অশ্রুধারা!"

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি জানো না, এ হচ্ছে বৈতরণী নদী, এ নদী গিয়ে পৌঁচেছে যমালয়ে, এর মধ্যে নামলে কেউ বাঁচে না!"

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, এর ভেতরে নামা কি উচিত? পাহাড়ের গহ্বরে অনেক নদী আছে, পাহাড় থেকে বাইরে বেরিয়েছে যারা প্রপাত হয়ে। এ নদীও যদি সেই রকম হয়? তাহলে তো আমরা কেউ বাঁচাতে পারব না!"

বিমল জবাব দেবার আগেই তাদের চারদিক থেকে আচম্বিতে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হতে লাগল! বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"লাফিয়ে পড়—জলে লাফিয়ে পড়, আর কিছু ভাববার সময় নেই—দানবরা আবার আক্রমণ করতে এসেছে।"

সবাই একসঙ্গে নদীর ভিতর লাফিয়ে পড়ল! তখন জলের ভিতরেই পাথর পড়তে লাগল! সে-সব পাথর এত বড় যে তার একখানা গায়ে লাগলে আর

রক্ষা নেই! সকলে তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ডাঙা থেকে অনেক তফাতে গিয়ে পড়ল, শত্রুদের পাথর আর ততদূর গিয়ে পৌঁছতে পারলে না!

বিমল বললে, "এইবারে সবাই খালি ভেসে থাকো, স্রোতের টান যে-রকম বেশি দেখছি, আমাদের হাত-পা ব্যথা করবার দরকার নেই। স্রোতই আমাদের এই গহ্বরের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে!"

কুমার বললে, "বিমল, বিমল, তীরের দিকে তাকিয়ে দেখ!"

দূরে—নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে দলে দলে দানবমূর্তি, তাদের বিপুল দেহগুলো যেন কালি দিয়ে আঁকা! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে যেন কতকগুলো নিস্পন্দ পাথরের প্রকাণ্ড মূর্তি এনে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

নর-দানবের সঙ্গে বিমলদের সেই হল শেষ কথা। তারপর তারা নিরাপদে আবার সভ্যতার কোলে ফিরে এসেছিল, কিন্তু দার্জিলিংয়ে আর কখনো দানবের অত্যাচারের কাহিনী শোনেনি।

সমাপ্ত

সূর্যনগরীর গুপ্তধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইন্‌কাদের স্বর্ণভাণ্ডার

বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় নাম-করা ব্যারিস্টার মিঃ গুহের বাড়িতে, একটি বৈকালী চায়ের সভায়।

কিন্তু মৌখিক পরিচয়ের আগেই ফিলিপ সাহেব খবরের কাগজে পাঠ করেছিলেন বিমল ও আমার খ্যাতির কাহিনী।

সুতরাং মৌখিক পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই ফিলিপ সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, "বিমলবাবু! কুমারবাবু! এই গোটা পৃথিবীটার উপরে আমি সারাজীবন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু আপনাদের সামনে আমি হচ্ছি চাঁদের কাছে জোনাকির মতন তুচ্ছ!"

বিমল লজ্জিত স্বরে বললে, "মিঃ ফিলিপ, নিজেকে আপনি এতটা ছোট মনে করছেন কেন?"

—"করব না, বলেন কি? আমার দৌড়াদৌড়ি তো কেবল মানুষের চেনাশোনা পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু আপনারা বার বার দেখেছেন অজানা পৃথিবীর গুপ্তরহস্য—এমন-কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগ্রহে গিয়েও আপনারা হানা দিতে ছাড়েননি। আপনাদের অগম্য স্থান বোধ হয় ত্রিভুবনের কোথাও নেই!"

আমি বললুম, "না মিঃ ফিলিপ, এখনো পাতাল-রাজ্যটা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি!"

বিমল বললে, "কিন্তু দেখবার ইচ্ছা আমাদের ষোলো আনাই আছে।"

সেখানে বিনয়বাবুও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার এই সব উদ্ভট ইচ্ছা আমি ভয় করি বিমল! মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, কোন্‌দিন তুমি হয়তো যমালয়েও বেড়াতে যাবার বায়না ধরে বসবে।"

বিমল জিভ কেটে বললে, "সর্বনাশ! আমি অভিমন্যুর মতো বোকা নই বিনয়বাবু! যে-দেশে ঢুকলে আর বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে-দেশে যাবার নাম কোনদিনই আমি মুখে আনব না।"

ইতিমধ্যে খাবার ও চা এল। ফিলিপ সাহেব চা পান করতে করতে তাঁর দেখা নানান দেশের গল্প বলতে লাগলেন—কখনো হিমালয়ের তুষার-ঝটিকার কথা, কখনো অনন্ত তুষারের স্বদেশ সুমেরু ও কুমেরুর কথা, কখনো গোবি সাহারার অগ্নিময় বালুকা-সাগরের কথা এবং কখনো বা আফ্রিকার অজ্ঞাত সূর্যকরহারা নিবিড় অরণ্যের কথা। নানা দেশের নানা জাতের অদ্ভুত মানুষ ও তাদের রীতি-নীতি এবং

বন্ধুতা ও শত্রুতার কথা, অদেখা ও না-শোনা সব জীবজন্তুর রোমাঞ্চকর কথা—তাঁর মুখে সমস্ত শুনতে শুনতে আমাদের চির-উৎসাহী মন আবার যেন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করতে লাগল!

ফিলিপ সাহেব সর্বশেষে বললেন, "যখনি যে দেশ দেখবার সাধ হয়েছে তখনি সেই দেশেই আমি ছুটে গিয়েছি। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও একটি দেশ আজও আমার দেখা হয়নি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম "কেন?"

—"ভয়ে।"

—"ভয়ে? কিসের ভয়ে?"

—"তা ঠিক জানি না। তবে সে দেশ দেখতে গিয়েও ভয়ে পালিয়ে এসেছি বটে।"

বিমলের কৌতূহল অত্যন্ত জাগরিত হয়ে উঠল। সে বিস্মিত স্বরে বলল, "কিসের ভয় তা জানেন না, তবু পালিয়ে এসেছেন?"

—"হ্যাঁ। আপনারা এল্ ডোর‍্যাডোর নাম কখনো শুনেছেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল্ ডোর‍্যাডো বলতে বোঝায় সোনার দেশ। ষোলো শতাব্দীতে স্পেনের সেনাপতি পিজারো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথমে এই এল্ ডোর‍্যাডোর সন্ধান দেন। তাঁর পরেও শত শত লোক এই সোনার দেশের খোঁজে অগ্নিদগ্ধ পতঙ্গের মতন ছুটে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সার হয়েছে কেবল কাদা-মাখাই। আজ পৃথিবীর সকলেই জানে এল্ ডোর‍্যাডো হচ্ছে কল্পিত স্বপ্ন মাত্র, তার অস্তিত্ব দুনিয়ার কোথাও নেই।"

ফিলিপ সাহেব হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, "এল্ ডোর‍্যাডোর কথা স্বপ্নকাহিনী নয়। অবশ্য সে-দেশটা যে সোনা দিয়ে তৈরি এমন অসম্ভব কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে এমন এক গুপ্তদেশের অস্তিত্ব আছে যার বিপুল ভাণ্ডারে মিলবে অফুরন্ত সোনাদানা আর অমূল্য ধনরত্ন! পিজারো হয়তো এল্ ডোর‍্যাডো বলতে সেই দেশকেই বুঝেছিলেন।"

বিমল বললে, "মিঃ ফিলিপ, এল্ ডোর‍্যাডো নিয়ে আমি কোন তর্কই করব না—নামে কি আসে যায়? কিন্তু কোন্ দেশ থেকে আপনি ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, আমাকে সেই কথাই বলুন।"

ফিলিপ বললেন, "তাহলে আগে আমাকে ইতিহাসের দু-এক পাতা ওল্টাতে হয়। গল্পের আসরে ইতিহাস কি আপনাদের পছন্দ হবে?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল্ ডোর‍্যাডোর গাঁজার ধোঁয়ার চেয়ে ইতিহাস আমার ভাল লাগবে।"

ফিলিপ সাহেব আগে তাঁর পাইপে তামাক ভরে অগ্নি-সংযোগ করলেন। তারপর দু'পা ছড়িয়ে চেয়ারে আড় হয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "আজ যারা সারা আমেরিকার কর্তা হয়ে বসেছে, আসলে তারা আমেরিকার আধুনিক পোষ্যপুত্র ছাড়া আর কেউ নয়। পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার প্রাচীন ও প্রথম সন্তানরা এসেছিল এশিয়া থেকে। কোন্ পথ দিয়ে তারা এসেছিল, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আছে বেরিং প্রণালী। এখানে আমেরিকা ও এশিয়ার ভিতরে ব্যবধান হচ্ছে মাত্র চল্লিশ মাইল। প্রচণ্ড শীতের সময়ে প্রণালীর জল যখন জমে বরফ হয়ে যায়, তখন এশিয়ার মানুষ অনায়াসেই পদব্রজে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হতে পারে। এশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এই যোগসাধন হয় হাজার হাজার বছর আগে।

"আমরা আমেরিকার আদিম বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ান বা লাল-মানুষদের অসভ্য বলে মনে করে থাকি। এ বিশ্বাস ভুল। লাল-মানুষরা এক সময়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এবং এখানেও এক এক যুগে হয়েছিল এক এক জাতীয় সভ্যতার উত্থান ও পতন। তাদের নাম হচ্ছে প্রাচীন মায়া-যুগ, পরবর্তী মায়া-যুগ, টল্‌টেক্-যুগ, অ্যাজ্‌টেক্-যুগ ও ইন্‌কা-যুগ। এই সব বিভিন্ন যুগে লাল-মানুষরা আমেরিকার দিকে দিকে সভ্যতার এবং স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের যে সকল বিরাট নিদর্শন রেখে গিয়েছে, প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশের বহু-প্রশংসিত কীর্তির চেয়ে তাদের মূল্য কম নয়। ষোলো শতাব্দীতেও স্পেনীয় দস্যুরা যখন আমেরিকা আক্রমণ করেছিল, তখন তারা অ্যাজ্‌টেক্ ও ইন্‌কা-সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

"১৫১৯ খৃস্টাব্দে হার্নান্ডো কর্টেজ্ দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার দ্বারা অ্যাজ্‌টেক্-সম্রাট মন্টেকুজোমাকে পরাজিত করে গোটা মেক্সিকো কেড়ে নেয়। তারপর ১৫৩০ খৃস্টাব্দে আসে আর এক নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক দস্যু, তার নাম ফ্রান্‌সিস্কো পিজারো। দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান কলম্বিয়া, ইকুয়াডর ও পেরু প্রভৃতি দেশ তখন ইন্‌কা-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল চওড়ায় পাঁচশো মাইল ও লম্বায় দুই হাজার সাতশো মাইল।

"পিজারো মাত্র একশো আটষট্টি জন সৈনিক নিয়ে পেরু আক্রমণ করতে এসে দেখে ইন্‌কা-সম্রাট আটাহুয়াল্পা চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিজারো বুঝলে তার অকিঞ্চিৎকর ফৌজ তুচ্ছ নদীর মতো ইন্‌কাদের

সৈন্য-সাগরে তলিয়ে যাবে। তখন সে এক নীচ কৌশল অবলম্বন করলে। বন্ধুতার ভান করে সম্রাট আটাহুয়াল্পার কাছে সাদর আমন্ত্রণ পাঠালে। সম্রাটের দুর্ভাগ্য, সরল বিশ্বাসে তিনি পিজারোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ফলে তিনি হলেন দুরাত্মা পিজারোর হাতে বন্দী। সম্রাট ও প্রধান নেতা শত্রু হস্তগত, ইন্‌কা সৈন্যেরা হতাশ হয়ে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল।

"এইবারে আমাদের আসল কাহিনীর আরম্ভ। ইন্‌কাদের রাজধানীর নাম কুজ্‌কো—অর্থাৎ সূর্যনগরী (The City of the Sun)। পিজারো যখন বন্দী সম্রাটকে নিয়ে সূর্যনগরী দখল করে বসল, তখন দেশের চারিদিকে উঠল হাহাকার। সাম্রাজ্যের নানা দিক থেকে দলে-দলে লাল-মানুষ তাল তাল সোনার বস্তা নিয়ে ছুটে আসতে লাগল। ইন্‌কাদের দেশ ছিল সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। লাল-মানুষরা বুঝেছিল, সেই সোনার লোভেই এসেছে স্পেনীয় দস্যুর দল। তাই তারা চেয়েছিল রাশি রাশি স্বর্ণের বিনিময়ে ইন্‌কা-সম্রাটকে উদ্ধার করতে।

"সোনার স্তূপ নিয়ে লাল-মানুষেরা শত্রু-শিবিরে আসতে আসতে হঠাৎ একদিন খবর পেলে, পাপিষ্ঠ পিজারো তাদের সম্রাটকে হত্যা করেছে। যারা সোনার তাল নিয়ে আসছিল, তারা তৎক্ষণাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল স্পেনীয়রা আর তার কোনই সন্ধান পেলে না।

"কিন্তু স্থানীয় লাল-মানুষরা আজও আসল খবর জানে। অ্যান্ডেস্ পর্বতমালা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার হিমালয়—উত্তর-দক্ষিণে তার বিস্তার হচ্ছে সাড়ে চার হাজার মাইল। তার উচ্চতম শিখরের উচ্চতা ২২,৯০০ ফুট। ইকুয়াডরে এই পর্বতমালার অন্তর্গত একটি পাহাড় আছে, তার নাম হচ্ছে ল্লাঙ্গানটি। তারই মধ্যে কোন স্থানে আছে ইন্‌কাদের বিপুল গুপ্তধনের বিরাট ভাণ্ডার। শোনা যায় পৃথিবীর আর কোথাও এক জায়গায় অত সোনার তাল নেই। কিন্তু সেখানে যাবার গুপ্তপথ জানে কেবল এক জাতের লাল-মানুষ। আজ পর্যন্ত তারা শ্বেতাঙ্গদের বশ মানেনি বা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে বাস করে। তারা কিছুতেই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী নয়। কোন শ্বেতাঙ্গ তাদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে না। এই পর্বত-রাজ্যকে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের পূর্ব-রাজধানীর নামানুসারে সূর্যনগরী বলে ডাকা হয়। গত চারশো বছরের ভিতরে বহু স্বর্ণলোভী শ্বেতাঙ্গ সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করেছে, কিন্তু পরে তাদের আর খোঁজই পাওয়া যায়নি।

"অ্যান্ডেস্ পর্বতমালার এক স্থানে 'আরুয়াকো ইন্ডিয়ান' নামে এক জাতের

লাল-মানুষ বাস করে। বছরের অন্যান্য সময়ে তারা আধুনিক সভ্য জগতের চোখের সামনেই থাকে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তারিখে কিছুকালের জন্যে দল বেঁধে অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেউ তা জানে না, তারাও কারুকে বলে না।

"অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমি শেষটা দু-চারটে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আরুয়াকো লাল-মানুষরা নাকি প্রতি বৎসরই নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গুপ্ত সূর্যনগরীতে গমন করে। তারা সেখানকার দেবালয়ে ইন্‌কা-সাম্রাজ্যের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রার্থনা করতে যায়।

"আমি একদিন স্থির করলুম, গোপনে আরুয়াকোদের অনুসরণ করে সূর্যনগরীর রহস্য ভেদ করব। পাছে তাদের সন্দেহ হয়, সেই ভয়ে আমি আগে আমার অনুগত চারজন লাল-মানুষকে গুপ্তচর রূপে আরুয়াকোদের পথে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু সেই যে তারা গেল, আর তাদের দেখা পেলুম না। তারপর যথাসময়ে আরুয়াকোরা আবার স্বস্থানে ফিরে এল, তবু গুপ্তচররা এল না। আমার বিশ্বাস, তাদের কেউ বেঁচে নেই। এই ঘটনার পর আমি সূর্যনগরীর রহস্য নিয়ে আর কোন দিনই মাথা ঘামাইনি। বলুন, আমি কি অকারণেই ভয় পেয়েছি?"

বিনয়বাবু বললেন, "নিশ্চয়ই নয়—নিশ্চয়ই নয়! মিঃ ফিলিপ, আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও সেখান থেকে পালিয়ে আসতুম।"

বিমল বললে, "আমি কিন্তু পালিয়ে আসতুম না।"

বিনয়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তার মানে?"

বিমল বললে, "আমি হলে সূর্যনগরী না দেখে ফিরে আসতুম না।"

ফিলিপ মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, "তাহলে একটা নূতনত্ব হত বটে! দক্ষিণ আমেরিকায় বাঙালীর অ্যাড্‌ভেঞ্চার! এ একটা কল্পনাতীত ব্যাপার!"

বিমল বললে, "না মিঃ ফিলিপ, মোটেই কল্পনাতীত নয়। ইকুয়াডরের পাশেই হচ্ছে ব্রেজিল রাজ্য। গেল শতাব্দীতেই একটি অসহায় গরিব বাঙালীর ছেলে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভে ঐ ব্রেজিলে গিয়েই কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস নামে রীতিমতো অমর হয়ে আছেন!"

ফিলিপ বললেন, "ঠিক ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে! কিন্তু বিমলবাবু, আপনি যা বললেন সেটা কি আপনার মনের কথা? আমি যদি সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করি, তাহলে আপনি কি আমার সঙ্গী হতে রাজি আছেন?"

টেবিলের উপরে সশব্দ করাঘাত করে বিমল বললে, "নিশ্চয়ই রাজি আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাঙালী বীরবালা

বিমল সূর্যনগরে যেতে রাজি আছে শুনে ফিলিপ সাহেব বিস্ফারিত চক্ষে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বাঁ-হাতে মুখ থেকে পাইপটা খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দিত স্বরে বললেন, "আমার হাতে হাত দিন বিমলবাবু! আপনার মতন সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে আমি আবার নির্ভয়ে ইকুয়াডরে যাত্রা করব।"

আমি বললুম, "মিঃ ফিলিপ, আপনাদের দল থেকে আমি বাদ পড়ে যাব না তো?"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিলক্ষণ! আপনাদের খবর যে রাখে সেই-ই তো জানে যে, আপনারা দুজনে অভেদাত্মা।"

মিঃ গুহ বললেন, "হাঁ, আপনারা হচ্ছেন ছায়া আর কায়া!"

বিনয়বাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "কি সর্বনাশ! বিমল, বিমল, তুমি কী বলছ? আবার গুপ্তধন! আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা!"

বিমল হেসে বললে, "হাঁ বিনয়বাবু! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আমাদের সঙ্গে গুপ্তধনেরও বোধহয় তেমনি কোন যোগ আছে!"

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "ছি ছি, এত লোভ ভালো নয়! কেবল টাকার স্বপ্ন দেখবার জন্যে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি নয়!"

বিমল বললে, "আপনার মুখে এ কথা শুনে দুঃখিত হলুম বিনয়বাবু! এতদিনেও আপনি আমাদের চিনতে পারলেন না! গুপ্তধনের দোহাই দিয়ে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছি বটে, কিন্তু টাকার দুঃস্বপ্ন একবারও দেখিনি! আপনি কি জানেন না, আমাদের রক্তে মেশানো আছে দুর্গম পথের নেশা, অজানা বিপদের টান আর অদেখা নূতনের আনন্দ? নরম ফুল-বিছানায় শুয়ে তন্দ্রায় এলিয়ে আমরা দুর্লভ মানব-জীবনের মূল্যবান দিনগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে চাই না, আমরা গতিশীল করে তুলতে চাই এর প্রতি মুহূর্তটিকে। আমরা দেখতে চাই যা দেখিনি, আমরা শুনতে চাই যা শুনিনি, আমরা লাভ করতে চাই যে-নূতনকে আজও পাইনি। নিত্য নূতন পথ, নিত্য নূতন দৃশ্য, নিত্য নূতন গতির ছন্দ! বিশ্বকে ভালো করে ভোগ করতে চাই বিনয়বাবু, টাকার লোভে আমরা কোনদিনই পাগল হইনি!"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিনয়বাবু আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি! ভারতবর্ষ আজ যে জীবনের যাত্রাপথে এতটা পিছিয়ে পড়েছে, এর

কারণ এখানকার লোকেরা আজ অবলম্বন করতে চায় জড়ের ধর্ম! অথচ আমাদের দেশ য়ুরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখান থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর চারিদিকে—জলে-স্থলে-শূন্যে! কেউ আকাশে উঠে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে চায়, কেউ অতল সমুদ্র-গর্ভে নেমে পাতালের ইতিহাস জানতে চায়—আবার কেউ বা যেতে চায় তৃষ্ণার্ত সাহারার অশেষ মরু-জগতে, জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের মৃত্যুভীষণ উদরে, বিপদসঙ্কুল সুমেরু-কুমেরুর তুষার-ঝটিকার মধ্যে! শান্তিময় গৃহের আনন্দ আর আত্মীয়-বন্ধুর আদর-যত্ন ছেড়ে কেন তারা জীবনকে এমনভাবে বিপন্ন করে নিশ্চিত মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে চায় হাসিমুখে? এই সব মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ কি তুচ্ছ টাকার লোভেই ঘরের মায়া ত্যাগ করে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মিঃ ফিলিপ, এই পথের নেশাই একদিন ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। আপনাদের য়ুরোপ যখন ভূমধ্যসাগরের তীরে নিদ্রিত হয়ে আছে, ভারতের ছেলে তখন রচনা করেছিল সপ্তসাগরের ইতিহাস। যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের অনেকে বলেন আমেরিকার বুকেও পড়েছিল ভারতের পদচিহ্ন।"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করি কুমারবাবু! কাম্বোডিয়ায় আর জাভায় আজও প্রাচীন ভারতের যে-সব হাতের কাজ বর্তমান আছে, তাদের বিপুলতার সামনে বহু-বিজ্ঞাপিত মিশরেরও কীর্তি ছোট হয়ে যায়। কিন্তু যারা কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের আর জাভার বড়বুদ্ধের মন্দির গড়েছিল তাদের বংশধররা আজ পূর্বপুরুষদের চিনতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য!"

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মিঃ ফিলিপ, আমার মুখের একটা ছোট্ট কথাকে মস্ত-বড় করে তুলে আপনারা যে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি আছি। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখবার দরকার আছে কি? হচ্ছিল ইন্‌কাদের সূর্যনগরীর গুপ্তধনের কথা। আমার মত হচ্ছে আরুয়াকো লাল-মানুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই!"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "ওদের গুপ্তধনের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই। গুপ্তধনের লোভে আমি পৃথিবী-পর্যটনের ব্রত গ্রহণ করিনি।"

—"তবে আপনি সূর্যনগরীতে যেতে চান কেন?"

—"সূর্যনগরীর রহস্য জানার জন্যে। ভেবে দেখুন বিনয়বাবু, নবীন

আমেরিকার আধুনিক সভ্যতার মধ্যে আমরা যে লাল-মানুষদের পাই, তাদের আসল মুখ থাকে মুখোশের তলায় ঢাকা। আজও তারা মনে মনে শ্বেতাঙ্গদের বহিঃশত্রু বলে ঘৃণা করে, আমাদের কাছে নিজেদের কোন গুপ্ত তথ্যই প্রকাশ করে না। স্পেনীয় ডাকাতরা আমেরিকায় গিয়েছিল অর্থলোভে, তাই তারা অ্যাজ্‌টেক্ আর ইন্‌কা-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল। এমনকি পরধর্মদ্বেষী স্পেনীয় পুরোহিতরা লাল-মানুষদের পুরাতন পুঁথিপত্রগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে ছাড়েনি। নিদারুণ হিংসা আর মূর্খতার ফলে একটা প্রাচীন সভ্য জাতির অধিকাংশ ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু কেবল শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকেই! তাদের নিজেদের কাছে প্রাচীন ইন্‌কা-সভ্যতা এখনো অবিকৃতরূপেই বিরাজ করছে। অ্যান্ডেস্ পর্বতমালার কোন্ অজানা অন্তরালে আছে এই যে অদ্ভুত সূর্যনগরী, এখানে কেবল ইন্‌কাদের গুপ্তধনই পুঞ্জীভূত করা নেই, তাদের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত রীতি-নীতি আর বিচিত্র আদর্শ নিশ্চয়ই এখানে আগেকার মতোই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা যাব সেই-সব তথ্যই পুনরুদ্ধার করতে।"

বিনয়বাবু বললেন, "বেশ, তাহলে আমার আর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, সূর্যনগরীতে যাত্রা করলে আপনাদের পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতে হবে।"

ফিলিপ বললেন, "ও-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। সূর্যনগরীর পথে যে পদার্পণ করেছে, সে আর ফেরেনি। ভাগ্য যে আমাদের প্রতি বেশি প্রসন্ন হবে এমন ভরসাও দিতে পারি না। খুব সম্ভব, আমরাও ফিরব না।"

বিনয়বাবু হতাশ ভাবে বললেন, "তাহলে সূর্যনগরীর গুপ্তকথা জেনে আমাদের কি লাভ?"

—"লাভ? লাভ আবার কি? ক্যাপ্টেন স্কট প্রাণ দিয়েছিলেন মেরু-প্রান্তের তুষার-স্তূপের মধ্যে। তাতে তাঁর কোনই লাভ হয়নি। হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের উপরে উঠতে গিয়েও অনেকে আত্মদান করেছে—মরবার সময়ে তারাও বোধ হয় লাভ-ক্ষতির কোন কথাই ভেবে দেখেনি!"

বিমল বললে, "কিন্তু সেই সব বীর প্রমাণিত করে গেছেন, ইচ্ছা করলেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে। মিঃ ফিলিপ, দক্ষিণ আমেরিকার দিকে কবে আপনি যাত্রা করতে পারবেন?"

ফিলিপ বললেন, "আমি? আমি হচ্ছি পরিব্রাজক, ভ্রমণ করাই আমার ধর্ম। যখনি যাত্রার ঘণ্টা বাজবে তখনি আমি প্রস্তুত।"

বিমল বললে, "ভ্রমণ করা আমার ধর্ম নয় বটে, কিন্তু সুদূর অজানার আহ্বান সর্বদাই আমার কানে বাজে! তবে এখানে একটা কথা আছে। আপনার ঐ সূর্যনগরীতে যাবার জন্যে কিছু আয়োজন তো করতে হবে?"

—"আয়োজন! কি আয়োজন?"

—"সেটা আপনিই বলতে পারবেন, কারণ আমরা কোনদিন ইকুয়াডরে যাইনি, সেখানে কি-রকম বিপদের সম্ভাবনা, তাও আমরা জানি না।"

ফিলিপ অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, "বিপদ? হুঁ, ওদেশে আমাদের জন্যে যে অনেক-রকম বিপদ-আপদ অপেক্ষা করে আছে সেকথা আগেই আমি বলেছি। দুর্গম গহন অরণ্য, তার মধ্যে আছে হিংস্র জন্তু। নির্জন মরুর চেয়েও শুষ্ক বিশাল পর্বত-রাজ্য—তারই আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবে শত শত লাল-মানুষের সতর্ক চক্ষু। সে-সব নিষ্ঠুর চোখ যখনি আমাদের আবিষ্কার করবে তখনি ছুটে আসবে উত্তপ্ত বুলেটের ঝটিকা! এ-সব বিপদ আমরা এখানে বসেই কল্পনা করে নিতে পারি। এর ওপরেও আছে। অজ্ঞাত সব বিপদ, তাদের কথা আমি জানি না, সুতরাং বলতেও পারব না।"

বিমল বললে, "তবে আর ওসব কথা ভেবে লাভ নেই—অজানাকে জানব আমরা গায়ের জোরেই! কেবল এইটুকু আজ স্থির হয়ে রইল, আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষের আশ্রয় ত্যাগ করব।"

আমার বুকের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠল দুর্দান্ত আনন্দে। নীল সাগরের সুদূর পারে আছে দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট হিমালয় এবং তারই কোলে লুকিয়ে আছে সূর্যনগরীর গুপ্তরহস্য। সেখানে বনে বনে রাজত্ব করে জাগুয়ার-বাঘ, অজগর আর র‍্যাট্‌ল-সাপ, ঘোড়া ছুটিয়ে পাহারা দেয় মাথায় পালক-পরা বন্য লাল-মানুষের দল—পূজা করে তারা অদ্ভুত সব দেবতাকে, নরবলি দেয়, হয়তো এখনো মানুষের মাংস খায়! বিপদের সেই বেড়াজালের মধ্যে আছে না-জানি কত বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চ, কত ঘটনার পর ঘটনার মহোৎসব!

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে ফিলিপ সেদিনের মতন বিদায় গ্রহণ করলেন।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো?"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না।"

ঠিক সেই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিনয়বাবুর মেয়ে মৃণু। যাঁরা "হিমালয়ের ভয়ঙ্কর" উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের কাছে মৃণুর নূতন পরিচয় দিতে হবে না। আজ এখানে তারও চায়ের নিমন্ত্রণ। এতক্ষণ সে ছিল অন্দরমহলে, বাড়ির মেয়েদের কাছে।

মৃণু ছুটে এসে বিনয়বাবুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "সূর্যনগরীতে তুমি কেন যাবে না বাবা?"

বিনয়বাবু বললেন, "ও, তুই বুঝি আড়াল থেকে সব শুনছিলি?"

মৃণু হেসে বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কেন যাবে না বাবা?"

বিনয়বাবু মেয়ের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোকে এখানে একলা ফেলে রেখে গেলে আমার মন যে কেমন করবে মা!"

মৃণু বললে, "কেন তোমার মন কেমন করবে বাবা? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল না!"

—"তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সূর্যনগরীতে? বলিস কি রে?"

—"কেন বাবা, আমি কি আর ছোটটি আছি? এই মাসেই যে আমি উনিশ পার হলুম! আর আমার যে সাহসের অভাব নেই তাও তুমি জানো! হিমালয়ের সেই রাক্ষসরা যখন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন—"

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "থাক্, থাক্, ও-সব কথা আর বলতে হবে না। এখন বাড়ি চল্।"

মৃণু ধীরে ধীরে বিমলের কাছে গিয়ে বললে, "বিমলদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

বিমল বাধো-বাধো গলায় বললে, "না মৃণু, তা হয় না।"

—"কেন?"

—"তুমি তো আমাদের মতো পুরুষ-মানুষ নও!"

মৃণু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে, "আমি যে পুরুষ-মানুষ নই, সেটা আর তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, মশাই। কিন্তু মেয়ে হলেই যে আলমারির সাজানো পুতুল হতে হবে, এ কথা আমি মানব না। অজ্ঞাতবাসে যাবার সময়ে পাণ্ডবরাও কি দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাননি? চাঁদবিবি, রানী লক্ষ্মীবাঈ কি সাজানো পুতুল ছিলেন? আজও কি রুশিয়ায় আর চীনদেশে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও যুদ্ধ করছে না? মেয়ে হলেই ভীরু হতে হবে? তুমি তো জানো বিমলদা, আমিও বন্দুক-লাঠি-ছোরা ধরতে পারি!"

বিনয়বাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, "সর্বনাশ, সর্বনাশ! বিমল, কুমার—দেখ, দেখ, তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে মৃণুরও স্বভাব কিরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে! পাগলের মতো যা মুখে আসছে তাই বলছে!"

একখানা খবরের কাগজ খুলে ধরে আড়ালে মুখ লুকিয়ে আমি খুব হাসতে লাগলুম।

বিমল কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললে, "দেখ মৃণু, তোমার জন্যে আমরাও বকুনি খেয়ে মরছি!"

মৃণু বললে, "ও সব বাজে কথায় আমি ভুলছি না। আমায় না নিয়ে গেলে আমি কেঁদে-কেটে রসাতল করব।"

বিমল বললে, "এটা ঠিক মেয়ের মতোই কথা হল বটে! মৃণু, তুমি কেঁদে জিততে চাও?"

মৃণু অভিমান-ভরা স্বরে বললে, "হ্যাঁ, তাই! আমায় নিয়ে না গেলে আজ কাঁদব, কাল কাঁদব, রোজ কাঁদব—আমি কেঁদেই জিতব!"

আমি বললুম, "বিনয়বাবু, মৃণুর অশ্রু-সাগরে যদি তলিয়ে যেতে না চান, তাহলে ওর কথায় সায় দিয়ে আত্মরক্ষা করুন!"

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতন বসে রইলেন। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "কালে কালে এ হল কি! পৃথিবী ওলটাতে আর বুঝি দেরি নেই!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যাত্রা

বাঘার রাগ হয়েছে।

সারমেয়-শ্রেষ্ঠ বাঘার সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই বোধহয় চেনাশোনা আছে। তবে যাঁরা এখনো বাঘার নাম শোনেননি তাঁদের জানিয়ে রাখা দরকার, সে হচ্ছে মস্ত-বড় একটি দেশী কুকুর। দেশী হলেও বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও বিক্রমে বাঘা হচ্ছে অসাধারণ, তার গুণে আমি ও বিমল কতবার কত বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছি!

বিমলের সঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, রামহরি গেলাস তুলে জলপান করছে আর বাঘা তার মুখের পানে চেয়ে ধমক দিচ্ছে ঘেউ ঘেউ রবে। আশা করি বিমলের পুরাতন ভৃত্য রামহরিকেও নতুন করে চিনিয়ে দিতে হবে না।

বিমল শুধোলে, "কি গো রামহরি, বাঘা এত চটেছে কেন?"

রামহরি হেসে বললে, "ওকে আমার রসোগোল্লার ভাগ দিতে ভুলে গিয়েছি!"

আমি বললুম, "রাগ করিস নে রে বাঘা, আয় তোকে দুখানা বিস্কুট দিচ্ছি।" তাকে দুখানা বিস্কুট বার করে দিলুম, বাঘা ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানালে।

বিমল বললে, "হ্যাঁ রামহরি, আরো দু-চার দিন ভালো করে রসোগোল্লা

খেয়ে নাও, কারণ শীগ্‌গিরই আমরা যে-দেশে যাচ্ছি সেখানে ময়রারা রসোগোল্লা বানায় না!"

রামহরি চমকে উঠে বললে, "তার মানে? তোমরা আবার কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

—"হ্যাঁ লাল-মানুষদের মুল্লুকে।"

—"ও বাবা সে আবার কোথায়?"

—"আমেরিকার নাম শুনেছ তো? সেইখানে।"

—"মাপ কর খোকাবাবু, বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমার ভীমরতি হয়নি। গঙ্গাতীর ছেড়ে ম্লেচ্ছ-মুল্লুকে আমি যাব না।"

—"তোমাকে যেতে হবেই!"

—"কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না। আমায় কি তোমরা কলুর বলদ পেয়েছ? নাকে দড়ি দিয়ে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যাবে? আচ্ছা মাথা-পাগলাদের পাল্লায় পড়েছি যা-হোক্, হাড় জ্বালিয়ে মারলে!"

আমি বললুম, "বিমল, এ-যাত্রা রামহরিকে রেহাই দাও। বুড়ো হলে লোকে কাপুরুষ হয়।"

রামহরি রেগে যেন তিনটে হয়ে বললে, "কি রামহরি দাস কাপুরুষ? জানো, হাতে একগাছা পাকা বাঁশের লাঠি পেলে আজও আমি যমের তোয়াক্কা রাখি না?"

ঠিক এমনি সময় ঝড়ের মতন ঘরে এসে ঢুকল মৃণু। ছুটে গিয়ে রামহরির দুই হাত চেপে ধরে সে নাচতে নাচতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "নাচো রামুদা আমার সঙ্গে তুমিও একটু নাচো!"

রামহরি ব্যস্ত হয়ে বললে, "আরে আরে দিদিমণি, কর কি—কর কি! আমার কি আর তোমার সঙ্গে নাচবার বয়েস আছে?"

মৃণু বললে, "না না রামহরি, তোমাকে একবার নাচতেই হবে। আজ আমার ভারি আনন্দের দিন।"

রামহরি বললে, "এত আনন্দ কিসের গা? তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে নাকি?"

রামহরির হাত ছেড়ে দিয়ে মৃণু বললে, "ধ্যেৎ! বিয়ে! এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে পরাধীন হবার মেয়ে আমি নই।"

আমি বললুম, "ব্যাপার কি মৃণু? বিনয়বাবু তোমার কথায় রাজি হয়েছেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ কুমারদা, রাজি না হয়ে উপায় কি? আমার কান্নার অভিনয়টা নিশ্চয় খুব ভালো হয়েছিল। ঐ যে বাবা আসছেন, ওঁর মুখেই সব শোনো!"

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকেই ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "মৃণু, তুমি অন্যায়-রকম বাচাল হয়ে উঠেছ! মোটর থামাতে না থামাতেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে চলে এলে! এর অর্থ কি?"

মৃণু তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দুই হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, "এর অর্থ কি জানো বাবা? তুমি যে আমার কথায় রাজি হয়েছ, বিমলদা আর কুমারদাকে এই সুখবরটা দেবার জন্য আমার আর তর সইছিল না!"

বিনয়বাবু আরো বেশি রেগে গিয়ে বললেন, "তর সইছিল না! সুখবর! বাঙালীর মেয়ে যাচ্ছেন আমেরিকায় ধিঙ্গিপনা করতে! এটা আবার সুখবর নাকি?"

মৃণু বাপের বুকে মাথা রেখে বললে, "তুমি রাগ করো না। তুমি যে আমার লক্ষ্মী-বাবা।"

রামহরি এতক্ষণ মহা বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে অবাক হয়ে সব শুনছিল। এতক্ষণ পরে সে বললে, "ওগো বিনয়বাবুমশাই, এ-সব কী শুনছি? আমাদের খোকাবাবু আর কুমারবাবু কি এক ছিষ্টি-ছাড়া লাল-মানুষের দেশে যাবার বায়না ধরেছে। মৃণুদিদিও ঐ দুই ডানপিটে বোম্বেটের সঙ্গে যাবে নাকি?"

বিনয়বাবু হতাশভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে শ্রান্ত স্বরে বললেন, "আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না রামহরি, আমি কিছু জানি না।"

মৃণু বললে, "তুমি যদি অমন করে কথা কও বাবা, তাহলে আমি কিন্তু আবার কাঁদতে বসব।"

বিনয়বাবু বললেন, "রক্ষে কর বাছা, আমি আর কোন কথাই কইব না।"

রামহরি বিমলের কাছে গিয়ে বললে, "ও খোকাবাবু, এসব কি শুনছি?"

বিমল বললে, "হ্যাঁ রামহরি, মৃণুও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

—"তাহলে তোমারও ঐ মত?"

—"মোটেই নয়। মৃণু আমাদের সঙ্গে না গেলেই ভালো হয়।"

মৃণু যেন তেলে-বেগুনের মতন জ্বলে উঠে বললে, "তাই নাকি? বীরত্ব জিনিসটা বুঝি পুরুষদের একচেটে?"

বিমল হেসে বললে, "আমি তোমার মতন কাঁদুনে বীরবালার সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পাই। তবে তর্ক না করেও এ-কথা বলতে পারি যে, তুমি সঙ্গে গেলে আমাদের তোমাকে নিয়েই বিব্রত হয়ে থাকতে হবে। আমরা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছি না মৃণু!"

মৃণু কোন রকমে রাগ সামলে বললে, "ইডেন গার্ডেনে বেড়াবার ইচ্ছা আমার একটুও নেই মশাই! ইকুয়াডরে পৌঁছে আমিও তোমাদের কাছ থেকে চকোলেট কি আইসক্রিম খেতে চাইব না। নিজের ভার আমি নিজেই বইতে পারব, তোমরা দয়া করে নিশ্চিন্ত হও।"

মৃণু সঙ্গে থাকলে আমাদের যে নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব, এ কথাটা কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না। বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে রক্তলোভী শত্রু ও হিংস্র জন্তুদের মধ্যে আমাদের সর্বদাই বাস করতে হবে, পদে পদে যুঝতে হবে সাক্ষাৎ মৃত্যু ও নানা অভাবিত বিপদের সঙ্গে। এসব ক্ষেত্রে বাঙালীর মেয়ের উপস্থিতি কল্পনা করাও সহজ নয়।

কিন্তু মৃণু এ-যাত্রা কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। মৃণু যাচ্ছে বলে বিনয়বাবুকেও যেতে হল। তিনি বলে-কয়ে নারাজ রামহরিকেও রাজি করালেন।

আমি বললুম, "কিন্তু মৃণু-ঠাকরোণ, তুমি কি শাড়ি পরেই লাল-মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি করবে?"

মৃণু ঘাড় নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই নয়। যতদিন ইকুয়াডরে থাকব শাড়ির নামও আমি মুখে আনব না। আজকেই দরজির বাড়িতে খাকি কোট-প্যান্টের অর্ডার দেব, কি বল বাবা?"

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমি হচ্ছি ওল্ড ফুল, আমার মতামতের মূল্য নেই। তুমি যা-খুশি করতে পারো।"

রামহরি বললে "ঘোর কলি উপস্থিত। এইবার থেকে দেখছি শাড়ি পরে ঘোমটা দিতে হবে পুরুষদেরই।"

মৃণু বললে, "সে কথা মন্দ নয়। ঘোমটার ভেতরে পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ কেমন মানায়, সেটা দেখবার জন্যে আমার লোভ হচ্ছে।"

রামহরি বললে, "দিদিমণি, তুমি খালি দুষ্টুর ধাড়ি নও, তোমার বাক্যি-বাণগুলিও বিষ-মাখানো।"

—"শালুক চিনেছেন গোপাল-ঠাকুর", বলেই রামহরির গোঁফ ধরে মৃণু জোরে এক টান মারলে।

রামহরি আর্তনাদ করে বললে, "উঃ আমি তো লাল-মানুষ নই দিদিমণি, আমার গোঁফ নিয়ে আর টানাটানি করা কেন?"

মৃণু বললে, "গোঁফ আর টিকি দেখলেই আমার টান মারবার ইচ্ছে হয়।"

—"বাবা, তোমার পায়ে দণ্ডবৎ। ভগবান নিশ্চয়ই পুরুষ গড়তে বসে ভুল করে তোমাকে গড়ে ফেলেছিলেন।"

—"যা বলেছ! সেইজন্যেই তো আমি পুরুষের ব্রত নিয়ে ভগবানের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছি।"

রামহরির সাধ্য কি যে কথায় মৃণুকে এঁটে ওঠে! আর কেবল রামহরি কেন, মৃণুর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে গেলে আমাদের কারুর অবস্থাই বিশেষ আরামদায়ক হত না। এক-সন্তান বলে বিনয়বাবু তাঁর মেয়েটিকে সব দিক দিয়ে যেমন শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, তেমনি তাকে স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন যথেষ্ট। কলেজে পড়া বাঙালীর মেয়ে বললে মনের মধ্যে যে দুর্বলতার প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে, মৃণু তেমন মেয়ে নয়। তার দীর্ঘ ঋজু দেহখানি শক্তি ও স্বাস্থ্যে সুন্দর।...

...ঠিক দিন-পনেরো পরেই আমাদের যাত্রা শুরু হল। বিরাট ও অনন্ত এক জলের সাম্রাজ্য, মানুষ তার কোন অংশের নাম দিয়েছে ভারত-সাগর, কোন অংশের চীন-সাগর এবং কোন অংশের বা প্রশান্ত-সাগর। নাম আলাদা আলাদা বটে, কিন্তু চেহারা একই। আকাশের স্থির নীলিমার তলায় কেবল অস্থির নীলিমার গতির উচ্ছ্বাস! দিকচক্রবাল পর্যন্ত চিরকাল চলেছে স্থিরতার সঙ্গে এই অস্থিরতার অপূর্ব আলাপ! সূর্য উঠে দিনের বেলায় এখানে জলেও আগুন জ্বালে, রাত্রে চাঁদ এসে ঢেউয়ে দুলিয়ে দেয় হীরা-মানিকের মালা।

আমরা সমুদ্র-যাত্রা করেছি অনেকবার, কিন্তু মৃণুর পক্ষে এ হচ্ছে একেবারে নতুন অদেখা জগৎ—দিন-রাত সে কেবল ডেকের উপরেই থাকতে চায়। কান পেতে জলের গান শোনে, অবাক বিস্ময়ে তার চোখ ছোটে সামুদ্রিক পাখিদের পিছনে পিছনে। মাঝে মাঝে জাগে সবুজ স্বপ্নের মতন ছোট ছোট দ্বীপ, আর মৃণু শিশুর মতন আনন্দে করতালি দিয়ে বলে ওঠে, "দেখ বাবা? দেখ কুমারদা! ঐ দ্বীপে কারা থাকে জানো? রূপকথার পরীরা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওর প্রবাল-তটে উঠে রোজ রাত্রে মৎস্যনারীরা বীণায় বীণায় বাজায় সমুদ্র-রাগিণী! আহা, ওখানে যদি আমাদের বাড়ি হত।"

পথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। যথাসময়ে গিয়ে নামলুম দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে। এইবারে দেখা যাক্ ভাগ্যদেবী আমাদের সামনে তোলেন কোন্ দৃশ্যের যবনিকা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরফের আগুন-পাহাড়

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগাটো শহর। ট্রাম, ট্যাক্সি, ইলেকট্রিক, থিয়েটার, বায়োস্কোপ—এখানে আধুনিক সভ্যতার কোন উপকরণেরই অভাব নেই।

এখানকার বাসিন্দাও দেখলুম অনেক-রকম। খাঁটি লাল-মানুষই বেশি—সেই সঙ্গে আছে নিগ্রো ও অন্যান্য মিশ্র জাতি। শেষোক্তদের মধ্যে এক জাতের নাম "মেস্টিজো", তাদের দেহে আছে স্পানিয়ার্ড ও লাল-মানুষদের রক্ত। আর এক জাতের লোকের নাম "চোলস্"—তারা মেস্টিজো ও লাল-মানুষদের বংশধর!

বোগাটো থেকে আমরা চললুম ইকুয়াডরের রাজধানী কুইটো নগরে। পথিমধ্যে দেখা হল আরুয়াকো লাল-মানুষদের সঙ্গে।

তাদের কুটিরগুলি গোল গোল। এক-একটি পরিবার এক-একজোড়া কুটিরে বাস করে। কারণ হচ্ছে অদ্ভুত। এদেশী রীতি অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকতে হয় এবং স্বামীর ঘরে স্ত্রী বা স্ত্রীর ঘরে স্বামী প্রবেশ করতে পায় না!

আমরা যখন আরুয়োকাদের দেশে গিয়ে হাজির হলুম, তখন তাদের পল্লীগুলি ছিল প্রায় জনশূন্য! যাদের দেখলুম তাদের অধিকাংশই হয় বুড়ো, নয় শিশু, নয় পঙ্গু বা রুগ্ন, একজন জোয়ান বা সক্ষম লোকের সঙ্গে দেখা হল না।

ফিলিপ বললেন, "বৎসরের এই সময়েই আরুয়াকোরা উপাসনা করতে যায় সূর্যনগরীতে। দেশে পড়ে থাকে কেবল অক্ষমরা।"

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম।

যাত্রাপথের প্রথম থেকেই চোখের সামনে জেগে আছে অ্যান্ডেস্ মহাপর্বতের ক্রমোন্নত শিখরমালা। এই সাড়ে চার হাজার মাইল ব্যাপী পর্বত প্রথম যেখান থেকে মাথা তুলেছে, সেখানে তার উচ্চতা খুব বেশি বা অসাধারণ নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার দীর্ঘতা বেড়ে উঠে অবশেষে হারিয়ে গিয়েছে অনন্ত আকাশের মেঘ-রাজ্যের ভিতরে। পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন তাদের আর শেষ নেই—এ যেন এক বিশাল সোপানশ্রেণী এবং প্রত্যেক পাহাড় হচ্ছে সোপানের এক-একটি ধাপ! এমনি ধাপে ধাপে সে উঠে গিয়েছে প্রায় তেইশ হাজার ফুট উপরে। ভারতবর্ষের হিমালয় পর্বত অ্যান্ডেস্-এর চেয়ে উঁচু (২৯০০২ ফুট) বটে কিন্তু লম্বায় সে অনেক ছোট—মাত্র দেড় হাজার মাইল। চওড়াতেও অ্যান্ডেস্ বড় সামান্য নয়, স্থানে স্থানে প্রায় পাঁচশো মাইল।

এক বিরাট পর্বত-সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা জায়গায় নানারকম জলবায়ু আবহাওয়া—কোথাও শীত, কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও বর্ষা! এবং এখানকার দৃশ্যবৈচিত্র্যেরও যেন অন্ত নেই! অ্যান্ডেসের কোন কোন স্থান মরুভূমির মতো নিষ্পাদপ, আবার কোন কোন স্থান অপূর্ব শ্যামলতায় সুন্দর। এর কোথাও আছে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি, আবার কোথাও দেখা যায় চিরতুষারের দিগন্তব্যাপী শুভ্রতা।

নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে আমাদের গম্যস্থান ইকুয়াডরে এসে উপস্থিত হলুম! এর রাজধানীর নাম কুইটো। এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভারি ভালো লাগল। শুনলুম সারা বছরের কোন সময়েই এখানে গ্রীষ্মের উৎপাত নেই। চারিদিকে পর্বতমালার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে শহরটি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর খাতায় নিজের নাম লিখে রেখেছে। স্পানিয়ার্ডরা প্রথম যখন লাল-মানুষদের কাছ থেকে শহরটি কেড়ে নেয়, তখনও কুইটো প্রাচীন বলে গণ্য ছিল।

কুইটোর মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পনেরো হাজার নয়শো দশ ফুট উঁচু আগ্নেয় পর্বত। স্থানীয় লোকেরা তাকে "পিচিঞ্চা" বা "ফুটন্ত গিরি" বলে ডাকে। ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে সে হঠাৎ অগ্নি-উদ্‌গার করে গরম নুড়ি ও ছাই ঢেলে গোটা কুইটো শহরকে কবর দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে আর আগুন নিয়ে এমন সাংঘাতিক খেলা করেনি।

ইকুয়াডর রাজ্য শাসিত হয় প্রজাতন্ত্রের দ্বারা। এখানকার পাহাড়ের উপর যারা বাস করে, তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খাঁটি বা ঈষৎ মিশ্রিত জাতের লাল-মানুষ। এখানকার পুরুষরা "পঞ্চোশ্" বা উজ্জ্বল-রঙের 'র‍্যাপার' এবং স্ত্রীলোকেরা পুরু শাল গায়ে দিয়ে বেড়ায়। তারা যেমন ভদ্র তেমনি শান্ত। তাদের পেশা হচ্ছে চাষ-বাস বা দড়ি তৈরি করা বা পশমী কাপড় বোনা। পৃথিবীর সব দেশেই যে 'পানামা' টুপি বিখ্যাত, তা ইকুয়াডরেই প্রস্তুত হয়।

পাহাড়ের উপর থেকে কুইটো শহরকে দেখায় ঠিক ছবির মতো। উজ্জ্বল সূর্যের স্বর্ণকিরণে শহরের লাল-ছাদওলা সাদা রঙের বাড়িগুলি ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করতে থাকে। শহরের রাজপথ থেকেই চারিধারে কুড়িটি ছোট-বড় আগ্নেয় পাহাড়কে দেখা যায়।

কুইটো শহর থেকে আর একটি দৃশ্য দেখলুম। পিচিঞ্চা আগ্নেয়গিরি এবং তার ভিতরটা অগ্নিময়; কিন্তু বাইরে থেকে তাকে চেনবার যো নেই। কারণ, তার ঊর্ধ্বদিকে আছে চির-তুষারের শ্বেত প্রলেপ এবং নিচের দিকটা ঢাকা তৃণ ও বন্য জঙ্গলের শ্যামলতায়। বরফে ঢাকা অগ্নিপর্বত,—আশ্চর্য!

কুইটো থেকে বেরিয়েই ফিলিপ সাহেব আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে কয়েকজন এদেশী মালবাহী কুলি সংগ্রহ করলেন। কুলিরা কয়েকটি ঘোড়া ও লামার পিঠে মোটঘাট তুলে দিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। 'লামা' বলতে তোমরা বুঝবে হয়তো তিব্বতী সন্ন্যাসী। কিন্তু এ লামা তা নয়। এ হচ্ছে উটের ছোটখাটো সংস্করণ—যদিও এদের পিঠে কুঁজ থাকে না। লামা

হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকারই জন্তু, পাহাড়ের দুর্গম পথে অনায়াসেই তারা ভারি ভারি মাল নিয়ে আনাগোনা করতে পারে।

তারপর আমরা অগ্রসর হলুম ল্লাঙ্গানাটি পাহাড়ের দিকে—যার গর্ভে লুকোনো আছে সূর্যনগরী ও তার গুপ্তধনের রহস্য! জানি না, আমরা তাকে আবিষ্কার করতে পারব কিনা এবং প্রাণ নিয়ে এ পথ দিয়ে আবার ফিরতে পারব কিনা! কিন্তু চিরদিনই আমরা নিরুদ্দেশের যাত্রী, রহস্য-সাগরে সাঁতার কাটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ, তাই আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে আমরা পদে পদে উঠতে লাগলুম উপরে, উপরে, আরো উপরে—যেখানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল কাণ্ডার-জাতীয় বৃহৎ গৃধ্ররা দলে দলে, যেখানে সুদূর থেকে তুষার-মুকুট পরা শৈলশিখরদের মৌন আহ্বান ভেসে আসতে লাগল—আয়, আয়, আয় রে পথ-পাগলের দল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মূর্তির পর মূর্তি

আমরা এখন ল্লাঙ্গানাটি পাহাড়ের সম্মুখে।

এতটা পথ এগিয়ে এসেও আমরা বিপদের ইঙ্গিত পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পথিমধ্যে বহু লাল-মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং আমাদের আর বিশেষ করে মৃণুকে দেখে তাদের চোখগুলো রীতিমতো বিস্ময়-চকিত হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু বিস্ময়ের চমক ছাড়া সেসব দৃষ্টিতে আর কোন ভীতিকর ভাব লক্ষ্য করিনি। তারা তো বিস্মিত হবেই—বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ তাদের চোখে পড়ল বোধহয় এই প্রথম!

কিন্তু আজ একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি যদিও চমকপ্রদ নয়, তবু ফিলিপ সাহেব যেন কিছু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

গাঁয়ের পথে গাছের ছায়ায় বসে কয়েকজন লাল-মানুষ জটলা করছিল, আমরা তাদের কাছ দিয়ে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হচ্ছি হঠাৎ লাল-মানুষদের একজন লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠতেই কবির ভাষা মনে পড়ল—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!"

সত্য, কি বিশাল মূর্তি তার! লম্বায় সে অন্তত সাত ফুটের কম নয়, কিন্তু তবু তাকে বিশেষ ঢ্যাঙা বলে মনে হচ্ছিল না; কারণ চওড়ায় তার দেহ এমন আশ্চর্য-রকম বৃহৎ যে, তুলনায় লোকটার অস্বাভাবিক দীর্ঘতাও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার, সেই অসাধারণ লম্বা ও চওড়া দেহের অনুপাতে তার

মুখখানা হচ্ছে অসম্ভব-রকম বড়! তার চোখ দুটো কুৎকুতে হলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি—যেন বিষধর সর্পের মতন! মস্ত নাকটা শিকারি পাখির মতন বাঁকানো। উপর-ঠোঁটের মাঝখানটা কাটা—ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে বড় বড় দুটো হিংস্র ও হলদে দাঁত! মাথায় পালকের টুপি, দেহে রঙিন ঝলমলে পোশাক, পেশী স্ফীত, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ ডান হাতে একটা বর্শা!

লোকটা মাটির উপর সশব্দে পা ফেলে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। তাকে দেখেই বাঘার কণ্ঠে ফুটল গর্জন-রব!

ফিলিপ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "কালো বাজ!"

সে বিষম হেঁড়ে-গলায় হো-হো করে হেসে পরিষ্কার ইংরাজিতে বললে, "হাঁ, হাঁ—আমি কালো বাজই বটে! মিঃ ফিলিপ, তুমি এখনো আমাকে ভোলোনি দেখছি!"

ফিলিপ মৃদু হেসে বললেন, "তোমার ঐ পরমসুন্দর চেহারা একবার দেখলে কি জীবনে ভোলা যায়?"

কালো বাজ তার বর্শাদণ্ডটা মাটির উপরে ঠক্-ঠক্ করে ঠুকতে ঠুকতে বললে, "আমার চেহারা পরমসুন্দর কিনা জানি না, তবে যথার্থ পুরুষ-মানুষেরই মতন বটে! আমি তোমাদের মতন আদুরে ননীর পুতুল নই!"

ফিলিপ বললেন, "তোমাকে ননীর পুতুল বলে আমি অভিধানের অপমান করব না। কিন্তু কালো বাজ, তুমি এখানে বসে বসে কি করছ বল দেখি?"

—"তোমার কথার জবাব দেবার আগে আমি জানতে চাই, তুমি আবার এদেশে কেন?"

—"বেড়াতে এসেছি।"

—"বেড়াতে? এই পাহাড় আর জঙ্গল কি বেড়াবার জায়গা? এই দেখবার জন্যে তোমরা এসেছ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে? একবার এদেশ দেখেও তোমার দেখবার সাধ মেটেনি?"

—"না।"

—"বেশ, তবে বেড়িয়ে বেড়াও।"—বলেই সে ফিরে হন্-হন্ করে আবার গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমরাও আবার অগ্রসর হলুম।

বিমল শুধোলে, "লোকটা কে, মিঃ ফিলিপ?"

—"লাল-মানুষদের একজন সর্দার।"

—"দেখছি আপনি ওকে চেনেন।"

—"হ্যাঁ, গেল-বারে এদেশে এসে ওর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু ওকে আমি ভয় করি।"

—"কেন?"

—"আমরা এখন যেখানে এসেছি, এইটিই হচ্ছে সূর্যনগরে যাবার প্রধান পথ। গেল-বারেও ওকে এখানে দেখেছিলুম। আমার বিশ্বাস, কালো বাজ এইখানে বসে পাহারা দেয়—যাতে বাইরের কেউ সূর্যনগরের পথ ধরে এগুতে না পারে।"

—"তাহলে কালো বাজ আমাদের শত্রু?"

—"মিত্র যে নয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মৃণু বললে, "কালো বাজ! মাগো, নামের ছিরি দেখ! এমন নামও কেউ রাখে!"

ফিলিপ বললেন, "অনেক লাল-মানুষেরই নামকরণ হয় বিশেষ বিশেষ জন্তুর নাম অনুসারে।"

মৃণু বললে, "কালো বাজ যখন বললে তার চেহারা পুরুষ-মানুষের মতো, তখন আপনার বলা উচিত ছিল, যমদূতরাও পুরুষ-মানুষ। বাব্বা, কি চেহারা!"

ফিলিপ বললেন, "হয়তো ওর প্রকৃতিও ওর আকৃতির চেয়ে সুন্দর নয়। আমার মনে দুশ্চিন্তার উদয় হচ্ছে। হয়তো গতবারের মতন এবারেও আমাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে।"

মৃণু বললে, "বিমলদা, মিঃ ফিলিপের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কালো বাজ কি-রকম চোখে বার বার আমার পানে তাকাচ্ছিল, সেটা তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছ কি?"

—"এ পথে বাঙালীর মেয়ে কেউ দেখেনি। কালো বাজ হয়তো বিস্মিত হয়েছিল।"

—"না বিমলদা, না! কালো বাজের চোখ যেন খাই-খাই করছিল!"

—"ওটা তোমার মনের ভ্রম হতেও পারে।"

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মৃণুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মৃণুর ভ্রম হোক আর না-ই হোক, আজ থেকে ওকে আমি একদণ্ড কাছ-ছাড়া হতে দেব না।"

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা যেখানে গিয়ে তাঁবু ফেললুম, সে জায়গাটি বড় মনোরম। উপরে নীল আকাশ, তলায় সুদূর গিরিশ্রেণীর শুভ্র তুষার-রেখা, তারপর পাহাড়ের গায়ে মাখা ধূসর রং এবং তার নিচে স্নিগ্ধ-সবুজ শ্রী এবং এই বিভিন্ন বর্ণমালার উপরে ঝরে ঝরে পড়ছে অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ-ঝরনা।

মৃণু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "ও বিমলদা, ও কুমারদা! খালি ছবি নয়, এখানে গানও আছে! তোমরা ঝরনার কুলু-কুলু তান শুনতে পাচ্ছ?"

আমি বললুম, "শুধু ঝরনার তান নয় মৃণু, তাকে দেখতেও পাচ্ছি।"

—"কৈ, কৈ—কোথায়?"

—"বনের ফাঁকে—ঐখানে!"

—"বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার! ও যেন সোনালি জল-নর্তকী, নাচতে নাচতে নিচে নামছে পৃথিবীর নাট্যশালায়। সাধ হচ্ছে, এইখানেই ঘর বেঁধে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক যখন ঝাপসা হয়ে গেল, আমরা তখন তাঁবুর ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। এখানে তাঁবু খাটানো হয়েছে তিনটে। প্রথম তাঁবুতে থাকব আমি, বিমল, রামহরি আর বাঘা, তারপরের তাঁবুতে বিনয়বাবু আর মৃণু, তারপরের তাঁবুতে মিঃ ফিলিপ। কুলিরা গেল কাছাকাছি কোন্ গ্রামে রাত কাটাতে। রাত দশটার ভিতরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়লুম।...

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, হঠাৎ বাঘার ঘন ঘন চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বিমল তাঁবুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার বন্দুকটা পরীক্ষা করছে।

আমি জেগেছি দেখে, সে বললে, "কুমার, বাঘা অকারণে চ্যাঁচায় না। শীগগির বন্দুক নাও—"

এমন সময়ে বাহির থেমে মৃণুর গলা পাওয়া গেল—"বিমলদা, কুমারদা! বাঘা চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে কেন?"

—"কি সর্বনাশ, মৃণু তাঁবুর বাইরে! এস, এস, বেরিয়ে এস"—বলেই বিমল তাঁবুর ভিতর থেকে অদৃশ্য হল। আমিও অবিলম্বে বন্দুক নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটলুম।

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন বাইরে এসে রামহরি মৃণুকে ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছে, আর থেকে থেকে বলছে, "তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি, তাঁবুর ভেতরে চল!"

মৃণু বললে, "আমাকে ছেড়ে দাও রামহরি, ছেড়ে দাও। আমারও হাতে বন্দুক আছে—আমি কারুকে ভয় করি না!"

বিমল কঠিন কণ্ঠে বললে, "মৃণু, এখনি তাঁবুর ভিতরে যাও!"

তাঁবুর মধ্য থেকে বিনয়বাবুর ডাক শোনা গেল, "মৃণু, মৃণু!"

—"যাও মৃণু, তোমার বাবাকে আর ভয় দেখিও না!"

মৃণু অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল।

এমন সময় কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে ফিলিপ সাহেব এসে বললেন, "ব্যাপার কি মশাই! এত গোলমাল কিসের—" বলতে বলতে হঠাৎ আর্তনাদ করে তিনি একলাফে পিছিয়ে গেলেন!

আমি বললুম, "কি হল মিঃ ফিলিপ, হল কি?"

—"আমার বুকের উপরে কি একটা এসে লেগেছে!"

পর-মুহূর্তে বিমলের 'টর্চে'র আলো গিয়ে পড়ল ফিলিপ সাহেবের বুকের উপরে। তাঁর জামার বুক-পকেটে সংলগ্ন হয়ে আছে একটা উজ্জ্বল ইস্পাতের শলাকা!

শলাকাটা জামা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে দেখতে ফিলিপ সাহেব বললেন, "হুঁ, এ যে দেখছি 'ব্লো-পাইপের' 'তীর'! ভাগ্যে আমার বুক-পকেটে আছে একটা 'গান-মেটালের' সিগারেট-কেস, তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম। সিগারেট-কেস আমার বর্মের কাজ করেছে—ধন্য ভগবান!"

বিমল বিস্মিতস্বরে বললে, "ব্লো-পাইপ! আমি তো জানতুম ও-অস্ত্র ব্যবহার করে বোর্নিওর লোকেরা—"

—"না, দক্ষিণ আমেরিকাতেও ব্লো-পাইপের ব্যবহার আছে। এ শলাকা বিষাক্ত, আহত হলে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয় এখানে শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে, সে আবার অস্ত্র ছুঁড়তে পারে। আসুন ঐ বড় পাথরখানার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নি।"

পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলুম।

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। তার আলোর উজ্জ্বলতা কমে এলেও চারিদিক দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে।

পিছনে চাঁদ নিয়ে ডানদিকের পাহাড় ও অরণ্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে —যেন কালিমাখা চিত্র। সেদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

বাঁদিকের অরণ্য চাঁদের আলোয় করছে ঝিলমিল ঝিলমিল। সেদিকেও কেউ নেই।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আচম্বিতে ডানদিকের অন্ধকার ফুঁড়ে একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল মূর্তির পর মূর্তি। ক্রমে সংখ্যায় হল তারা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন। তাদের সর্বাগ্রে যে মূর্তিটা রয়েছে, তার বিরাট আকার দেখেই অনুমান করতে পারলুম সে হচ্ছে কালো বাজ স্বয়ং!

বিমল বললে, "মূর্তিগুলো আমাদের দিকেই আসছে। সবাই বন্দুক তোল, ওরা আরো কাছে এলেই গুলি ছুঁড়বে।"

আমি বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করলুম কালো বাজের দিকে।

মূর্তিগুলো পায়ে পায়ে খুব কাছে এসে পড়ল। বন্দুকের ঘোড়া টিপি-টিপি করছি, এমন সময়ে মূর্তিগুলো হঠাৎ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সভয়ে চিৎকার করে উঠে প্রাণপণে দৌড় মেরে একসঙ্গেই আবার অন্ধকারের অন্তরালে মিলিয়ে গেল!

বিমল আমার হাত চেপে ধরে অভিভূত স্বরে বললে, "দেখ, দেখ, বাঁদিকে চেয়ে দেখ!"

ও কী দৃশ্য! বাঁ-দিকের চন্দ্রালোকে কতকটা স্পষ্ট অরণ্য ভেদ করেও বেরিয়ে আসছে মূর্তির পর মূর্তি! ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, তবু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রত্যেক মূর্তিই কালির মতন কালো এবং প্রত্যেক মূর্তিই লম্বা-চওড়ায় মানুষের চেয়ে ঢের বড়! তারা মাটির উপর দিয়ে চলছে মাতালের মতন টলতে টলতে এবং তাদের ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অমানুষিক! প্রত্যেক মূর্তিই উলঙ্গ!

আমার বুক ধড়ফড় করে উঠল! এমন অস্বাভাবিক ও অভাবিত দৃশ্য আর কখনো দেখিনি!

কে এরা? পৃথিবীর জীব? না নরকের মূর্তিমান অভিশাপ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
রক্তাক্ত পদচিহ্ন

বিস্ময়-নীরবতার মাঝখানে সর্বপ্রথমে কথা কইলে বিমল। সে ফিলিপের কাঁধের উপরে হাত রেখে ঠেলা মেরে বললে, "মিঃ ফিলিপ, কে ওরা? ওরা কি পৃথিবীর মানুষ?"

ফিলিপ হতভম্বের মতো বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

এর মধ্যে মৃণু আবার কখন ছুটে বেরিয়ে এসেছে এবং তার পিছনে পিছনে বিনয়বাবুও।

বিনয়বাবু মৃণুর একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, "মৃণু, মৃণু! তুমি শীগগির তাঁবুর ভেতরে চলে এস!"

মৃণু রাজি নয় দেখে তিনি তাকে জোর করে টানতে টানতে আবার তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু সেই বিভীষণ মূর্তিগুলো একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না; দেখলে মনে হয়, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা যেন সম্পূর্ণ অচেতন। কয়েক

মুহূর্ত তারা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে আবার একসঙ্গে অগ্রসর হল।

রামহরি আর্তস্বরে বলে উঠল, "এই গো! এইবারে ভূতগুলো আমাদের ঘাড় ভাঙতে আসছে।"

বিমল বললে, "না। ওরা যাচ্ছে ঐ ঝরনার দিকে। ওরা বোধহয় আমাদের দেখতেই পায়নি।"

ফিলিপ বললেন, "লাল-মানুষগুলো নিশ্চয়ই ওদের দেখেই পালিয়ে গিয়েছে। আর ওরাও চলেছে তাদেরই পিছনে!"

আমি বললুম, "দেখ বিমল, দেখ! মূর্তিগুলো কিরকম দু'দিকে হেলে পড়ে টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে! মানুষরা তো ওভাবে চলে না।"

দেখতে দেখতে মূর্তিগুলো ঝরনার কাছে গিয়ে মোড় ফিরে বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ! বাতাস নিঃসাড়, অরণ্যও নীরব। শোনা যায় খালি নির্ঝরের গুঞ্জন-গান; দেখা যায় তার জলের ধারায় চাঁদের আলোর ফুলঝুরি।

তারপরেই আচম্বিতে ভয়াবহ প্রাণ-কাঁপানো আর্তনাদের ঐকতান জেগে উঠে সেই স্তব্ধ নিশীথের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। একজন নয়, দুজন নয়—যেন অনেক লোক একসঙ্গে সভয়ে বা মৃত্যু-যাতনায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল! বনের ভিতরে বিষম একটা হুটোপুটির শব্দও শোনা যেতে লাগল এবং এটাও লক্ষ্য করলুম যে, তিন-চারটে বড় বড় গাছ সশব্দে দুলে দুলে উঠছে!

রামহরি মাটির উপরে উবু হয়ে বসে পড়ল। ফিলিপ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিনয়বাবু তাঁবুর ভিতর থেকে ব্যস্তস্বরে চিৎকার করে বার বার আমাদের ডাকতে লাগলেন।

বিমল বললে, "রামহরি, তুমি তাঁবুর ভিতরে যাও। বিনয়বাবুকে গোলমাল করতে মানা কর। আমাদের এখন এইখানেই দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবে।"

অরণ্য আবার শব্দহীন। নিঝুম রাত নিয়েছে যেন সমাধির মৌনব্রত। প্রায় ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল, কিন্তু আর কোন বিভীষিকারই সাড়া পাওয়া গেল না। ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল অরণ্যের শ্যামল যবনিকার ওপারে এইমাত্র কোন্ বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

এতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিলিপ বললেন, "বিমলবাবু, এ-অঞ্চলে যা কিছু জানবার কথা সমস্তই আমি সংগ্রহ করেছিলুম। কিন্তু এইমাত্র যে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিগুলো দেখলুম, ওদের কোন কথাই তো আমার নোটবুকে লেখা নেই! ওদের রহস্য কিছুই জানি না বটে, তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, এখানকার লাল-মানুষরা ওদের জানে আর যমের মতো ভয় করে, তাই আমাদের আক্রমণ করতে এসে ওদের দেখেই ভীরু হরিণের মতো পালিয়ে গেল।"

আমি বললুম, "কিন্তু পালিয়ে গিয়েও লাল-মানুষেরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। জঙ্গলের ভিতর থেকে যে আর্তনাদ ভেসে এল, তা আমরা সকলেই শুনেছি!"

বিমল বললে, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে, চুপি-চুপি গিয়ে একবার জঙ্গলের ভিতরে উঁকি মেরে আসি!"

ফিলিপ সচকিত কণ্ঠে বললেন, "রক্ষা করুন মশাই, আপনার ঐ ভীষণ ইচ্ছাকে দমন করুন! জঙ্গলের রহস্য জঙ্গলের ভেতরেই চাপা থাক্, তা দেখবার ইচ্ছা আমার একটুও নেই!"

বিমল বললে, "আচ্ছা, আপাতত আমার ইচ্ছাকে দমন করছি। কিন্তু রাত পোয়ালেই জঙ্গলের ভেতরে আমাকে যেতেই হবে, কারুর মানা তখন শুনব না।"

আরো ঘণ্টাখানেক আমরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটল না। এবং সেজন্যে আমি দুঃখিত নই, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের উপর দিয়ে যে-সব ঘটনার পর ঘটনার ঝটিকা বয়ে গেল, এক রাত্রের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট!

তারপর তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম বটে, কিন্তু মৃণু ছাড়া আমাদের প্রত্যেককেই পালা করে সারা রাত পাহারা দিতে হল। বাঘা তো সমস্ত রাতটাই জেগে জেগে কাটিয়ে দিলে! সে এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, তার চিৎকার একবারও থামল না।

পূর্ব-আকাশে ঊষার প্রথম দীপ্তি ভালো করে ফুটে উঠতে না-উঠতেই বিমল আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে। উঠে বসে দেখি, বিমল ও ফিলিপ ধরাচুড়ো পরে প্রস্তুত।

বিমল চুপি চুপি বললে, "কুমার ভায়া, বনের ভেতর যেতে চাও তো চটপট তৈরি হয়ে নাও। মৃণু বোধহয় এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র স্বপ্ন দেখছে। সে জাগলে এখনি সঙ্গে যাবার বায়না ধরবে!"

তৈরি হতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। তারপর পা টিপে টিপে তাঁবুর ভিতর থেকে তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম।

প্রভাত এসেছে রুপোলী আলো আর পাখির ঝঙ্কার সঙ্গে নিয়ে। গাছের পাতা ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাসের আদর-ছোঁয়ায়। দূরে দূরে বরফে-মোড়া পাহাড়গুলিকে মনে হচ্ছে যেন চকচকে ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া। কোথাও বিভীষিকা বা রহস্যের আভাস নেই।

আমরা ঝরনার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কাল রাতে এইখান থেকেই সেই লাল-মানুষদের ও ভীষণ মূর্তিগুলোকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলুম।

ঝরনাটি ঝরে পড়ে বয়ে যাচ্ছে একটি উপত্যকার উপর দিয়ে। ছোট-বড় পাথরের উপরে তার স্বচ্ছ সঙ্গীতময় জলের গতি দেখলেই মনে পড়ে নৃত্যশীল কলহাস্য-চঞ্চল শিশুকে। ঝরনার ধারাটি চওড়ায় পাঁচ হাতের বেশি হবে না। ঝরনার পরেই অগভীর বন—একটি পায়ে-চলা পথের রেখা তার ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেই পথ ধরে আমরা সাবধানে চারিদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলুম।

অরণ্য অগভীর বটে, কিন্তু ছোট নয়। অনেক-রকম গাছ রয়েছে এবং এক-একটা বড় গাছের উঁচু ডালে বসে আছে সারি সারি ছোট ছোট জাতের বানর। তারা আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে মুখ ভ্যাংচাতে ও কিচির-মিচির ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল।

কিন্তু বনের ভিতরে মিনিট-পাঁচ ধরে এগিয়েও সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

ফিলিপ বললেন, "যাদের খোঁজে আমরা এসেছি, তারা বোধহয় এ পথে আসেনি।"

বিমল হঠাৎ মাটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, "মিঃ ফিলিপ, ওটা কি দেখুন দেখি!"

পথের উপরে পড়ে ছিল একখানা ভাঙা লাঠির আধখানা। অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে তা ছাড়া আর কিছু মনে হল না।

ফিলিপ হেঁট হয়ে লাঠিগাছা তুলে নিলেন। তারপর সেটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "দেখছি এর ভিতরটা ফাঁপা। বিমলবাবু, এটা হচ্ছে একটা ভাঙা 'ব্লো-পাইপ'!"

বিমল দণ্ডটা ফিলিপের হাত থেকে নিয়ে বললে, "দেখেই বোঝা যায়, এটা হচ্ছে সদ্য-ভাঙা। কিন্তু এটা ভাঙল কেন?"

ফিলিপ বললেন, "ব্লো-পাইপ ব্যবহার করে লাল-মানুষরা। হয়তো কাল আমাকে বধ করার জন্যে এই ব্লো-পাইপটাকেই ব্যবহার করা হয়েছিল!"

আমি বললুম, "কিন্তু এটুকু সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, লাল-মানুষরা নিজেদের অস্ত্র নিজেরাই ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি।"

ফিলিপ বললেন, "তাহলে বলতে হয় ব্লো-পাইপের এ দুর্দশা হয়েছে সেই অমানুষিক মূর্তিগুলোর হাতেই—যাদের দেখে কাল আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল!"

হঠাৎ পথের আর এক জায়গায় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "বিমল, বিমল, রক্তের দাগ!"

বিমল সেইখানে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "কুমার, এ খালি রক্তের দাগ নয়—এ হচ্ছে রক্তমাখা পায়ের দাগ!"

আমিও দাগগুলো ভালো করে দেখবার জন্যে সাগ্রহে সেইখানেই বসে পড়লুম।

হ্যাঁ, পায়ের দাগ বটে, কিন্তু আশ্চর্য পায়ের দাগ! মাটির পটে বিবর্ণ রক্ত-রেখায় আঁকা রয়েছে পায়ের পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের ও পদতলের চিহ্ন—তা যে কোন চতুষ্পদ জন্তুর পদচিহ্ন নয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা মানুষের পদচিহ্ন বলেও মনে হয় না।

ফিলিপ বললেন, "বিচিত্র ব্যাপার! যে পায়ের এই দাগ, তার বুড়ো আঙুলটা নিশ্চয় অন্য চারটে আঙুল থেকে অনেক তফাতে আছে!"

আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে দুই পাশেই বড় বড় গাছের তলায় রয়েছে অনেকগুলো ঝোপঝাপ। প্রত্যেক ঝোপ এত উঁচু যে, তার ভিতরে বেশ প্রকাণ্ড জানোয়ার পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, একটা ঝোপের ফাঁকে বিদ্যুতের মতন চমকে উঠেই মিলিয়ে গেল কৌতূহলে প্রদীপ্ত একজোড়া চক্ষু! ঝোপটাও যেন একবার দুলে উঠল।

সচমকে বললুম, "মিঃ ফিলিপ, দেখেছেন?"

—"কি?"

—"ঐ ঝোপের মধ্যে মানুষের চোখ!"

ফিলিপ এক লাফ মেরে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। আধ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনি ভুল দেখেছেন। ঝোপে কেউ নেই।"

বিমল তখন মাটির উপরে হেঁট হয়ে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মিঃ ফিলিপ, এদিকে আসুন—এদিকে আসুন।"

—"আবার কি ব্যাপার?"

—"এখানে আরো অনেক পায়ের দাগ রয়েছে। দাগগুলোর জন্ম যাদের পায়ের তলায়, তারা ঝোপের ওপাশ থেকে বেঁকে এদিকে এসেছে।"

আমি বললুম, "দাগগুলো তো এক পায়ের নয়! বোধ হয় পাঁচ-ছয় জোড়া পা থেকে ওদের উৎপত্তি!"

বিমল বললে, "কাল আমরাও তো একটি মূর্তিকে দেখিনি কুমার!...দেখ, প্রত্যেক পদচিহ্ন রক্তাক্ত, নইলে এখানে এদের অস্তিত্ব আমরা জানতেই পারতুম না।"

আমি অভিভূত স্বরে বললুম, "এতগুলো রক্তমাখা পদচিহ্ন! না জানি বনের ভিতরে কাল রাত্রে কী কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে গেছে!"

বিমল বললে, "মূর্তিগুলো যখন এখানে এসেছিল, তখনো তাদের পায়ের রক্ত শুকোয়নি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আমরা ঘটনাস্থলের খুব কাছেই এসে পড়েছি।"

বিমলের অনুমান মিথ্যা নয়। পায়ের দাগ ধরে আমরা একটা বড় ঝোপের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াতেই যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য জেগে উঠল চোখের সামনে, তা দেখবার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলুম না!

রক্ত, রক্ত—সবখানেই রক্ত। কাল এখানে প্রবাহিত হয়েছিল রক্তের ঢেউ, এখন পাথুরে মাটির উপরে তা শুকিয়ে রয়েছে ভীষণ পুরু প্রলেপের মতো! আর তারই উপরে আড়ষ্ট হয়ে এখানে-ওখানে পড়ে আছে সাতটা মানুষের মৃতদেহ! কোন কোন দেহ একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে—যেন কোন মহাবলবান বিপুল বাহুর চাপে এক-একটা দেহ মানুষের আকার হারিয়ে পরিণত হয়েছে হাড়গোড়-ভাঙা রক্তরাঙা মাংসপিণ্ডে! কারুর দেহ থেকে মুণ্ড এবং কারুর দেহ থেকে হাত বা পা যেন কেবল গায়ের জোরেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেক দেহই লাল-মানুষের।

ফিলিপ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কোন দেহেই অস্ত্রের দাগ নেই! যারা এদের আক্রমণ করেছিল নিশ্চয় তারা অসুরের মতন শক্তিমান! তারা লড়েছে খালি হাতেই—এদের বধ করেছে বিনা অস্ত্রেই! অথচ এরা সকলেই ছিল সশস্ত্র!"

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "কুমার, ভাগ্যে মৃণু আমাদের সঙ্গে আসেনি! এ বীভৎস দৃশ্য সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না!"

আচম্বিতে প্রায় আমাদের কানের কাছেই গুড়ুম শব্দে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল!

বিষম চমকে চোখের নিমেষে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখি, হাত পাঁচ-ছয় তফাতে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক ঝলক ধোঁয়ার রেখা!

—সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনেই সেই ঝোপটা লক্ষ্য করে বন্দুক তুললুম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেত-মানুষ ও লাল-মানুষ

যে-ঝোপটা ধোঁয়া উদ্গার করলে, বন্দুকের লক্ষ্য তার দিকে স্থির করে ঘোড়া টিপি আর কি, এমন সময়ে হঠাৎ নারী-কণ্ঠে চিৎকার শুনলুম, "বিমলদা! কুমারদা! বা রে, তোমরা ভগ্নী-হত্যা করতে চাও নাকি?"

—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ ভেদ করে দাঁড়িয়ে উঠল বন্দুকধারিণী মৃণু!

আমাদের হাতের বন্দুক রইল হাতে—সকলেই দারুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি!

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন ফিলিপ। দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি কাণ্ড! আপনি এখানে?"

বিপুল কৌতুকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠে মৃণু নাচতে নাচতে ও লাফাতে লাফাতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল এবং তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "ওহো, কেমন জব্দ, কেমন মজা! কেমন জব্দ, কেমন মজা!"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "তার মানে?"

—"বন্দুক ছুঁড়ে কেমন ভয় দেখিয়েছি! তোমরা হচ্ছ মহা মহা বীরপুরুষ, তুচ্ছ একটা বন্দুকের শব্দেই এত ভয়!"

—"তাহলে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিলে তুমিই?"

—"তা নয় তো আবার কে? তোমরা ভেবেছিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছ? মোটেই নয় দাদা গো, মোটেই নয়—আমাকে এত কাঁচা মেয়ে পাওনি! তোমরা যে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, সেটা আমি আগেই জানতুম! তাঁবুর পর্দার ফাঁকে আমার একজোড়া চোখ ছিল দস্তুরমতো সজাগ, তাইতো যথাসময়ে লুকিয়ে তোমাদের পিছু নিতে পেরেছি।"

—"তোমার বাবা বাধা দিলেন না?"

—"নাক যখন ডাকে, মানুষ তখন কারুকেই বাধা দিতে পারে না! বাবা বোধহয় এখনো জাগেননি।"

বিমল বললে, "মৃণু, তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ!"

—"উঁহু, অন্যায় স্বীকার করতে আমি রাজি নই! কেন তোমরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ? কেন তুমি বললে যে, এখানকার রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমি সহ্য করতে পারতুম না? তাইতো আমার রাগ হল আর তোমাদের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে তাইতো দিলুম দুম্ করে বন্দুকটা ছুঁড়ে!"

—"কিন্তু আমরাও যদি বন্দুক ছুঁড়তুম?"

মৃণু হাত-মুখ নেড়ে ছড়ার সুরে বললে,

"আমি নইকো বোকা, নইকো বোকা,
নইকো বোকা মেয়ে,
মরতে হেথায় আসিনিকো
হঠাৎ গুলি খেয়ে!

বন্দুক ছোঁড়বার ফাঁক তোমাদের দেব কেন মশাই?"

বিমল চটে গিয়ে বললে, "থামো থামো! তুমি যে কথায় কথায় ছড়া বাঁধতে পারো, তা আমার জানি! কিন্তু এটা ছড়া বাঁধবার আর মস্করা করবার জায়গা নয়—এ হচ্ছে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র!"

বিমলকে আরো-বেশি চটাবার জন্যে মৃণু আরো-বেশি হাত-মুখ নেড়ে বললে,—

"মৃত্যু আমার ভৃত্য, দাদা!
নিত্য হুকুম মানে,
তাইতো গাঁথি ছড়ার মালা
ভয়-ডর নেই প্রাণে!"

বিমল বোধহয় তাকে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খুব কাছ থেকে ক্রন্দন-স্বরে অজ্ঞাত ভাষায় কে চেঁচিয়ে উঠল!

আমি চমকে বললুম, "কে ও কেঁদে কথা কয়?"

ফিলিপ বললেন, "লাল-মানুষের ভাষায় কে বলছে—বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

বিমল এগুতে এগুতে বললে, "শব্দ আসছে ঐ ঝোপটার ভেতর থেকে!"

ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি, আর একজন লাল-মানুষ সেখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে—তার মাথায়, মুখে, সর্বাঙ্গে রক্তের লেখা, দুই চক্ষু মুদে অত্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে সে কাতর স্বরে চিৎকার করছে!

ফিলিপ তার দেহ স্পর্শ করবামাত্র সে শিউরে উঠে চোখ মেলে তাকালে—কী আতঙ্ক-মাখা তার সেই চাহনি! কিন্তু আমাদের দেখে সে যেন কতকটা আশ্বস্ত হল, সকাতরে নিজের ভাষায় কি বললে, বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু ফিলিপ এদেশী ভাষা জানতেন, তাই তার কথার উত্তর দিলেন। পরে শুনেছিলুম, তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল এইভাবে ঃ

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?"

—"ইক্‌টিনাইক্।"

—"কে তোমার এ দশা করেছে?"

ভীষণ ভয়ে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলে, "প্রেত-মানুষ, প্রেত-মানুষ!"

—"প্রেত-মানুষ! সে আবার কি?"

—"তারা পাহাড়ের গুহায় থাকে। জন্ম তাদের রাতের অন্ধকারে। তাদের চোখে আছে আগুন, হাতে আছে দানবের শক্তি, বুকে আছে অমানুষী হিংসা! ছায়ার মতো নিঃশব্দে তারা কখন আসে আর কখন অদৃশ্য হয়, কেউ জানতে পারে না। কাল আমরা তাদেরই কবলে পড়েছিলুম।"

—"তোমরা কাল এখানে কি করতে এসেছিলে?"

ইক্‌টিনাইক্ একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ও-কথার জবাব আমি দিতে পারব না।"

—"কেন?"

—"ইন্‌কার হুকুম!"

—"ইন্‌কা? ইন্‌কা মানে তো রাজা! তোমাদের শেষ ইন্‌কা আটাহুয়াল্পা মারা পড়েছেন চারশো বছর আগে। তারপর আর কোন ইন্‌কার নাম তো আমি শুনিনি!"

—"বিদেশী, তোমরা আমাদের কথা কতটুকু জানো? আমাদের ইন্‌কার সিংহাসন কোনদিন খালি হয়নি। আজও ইন্‌কার রাজধানী আছে সূর্যনগরে।"

—"তোমাদের ইন্‌কার নাম কি?"

—"মহামহিমময় সিন্‌চি রোক্কা।"

—"তিনিও কি কাল তোমাদের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন?"

—"না। সূর্যনগরের বাইরে তিনি কোনদিন আসেন না। আমরা এসেছি কালো বাজের সঙ্গে। কিন্তু এখন আর আমার কথা কইবার শক্তি নেই...তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আগে আমায় জল দাও।"

ফিলিপের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল কঠিন হাসি। তিনি বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, তুমি যে আমাদের পরম শত্রু, সে কথা আমরা জানি। আমাদেরই অনিষ্ট করবার জন্যে কাল তোমরা এখানে এসেছিলে, তাই ভগবান তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আমাদের কাছে জল চাইতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?"

ইক্‌টিনাইক্‌ বললে, "বেশ বুঝতে পারছি, আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আমার মাথা ফেটে গেছে, বুকে বিষম চোট লেগেছে, হাত আর পাও ভেঙে গিয়েছে। আমি তোমাদের শত্রু হলেও এই শেষ মুহূর্তেও তোমরা কি আমাকে দয়া করবে না?"

ফিলিপ কোন জবাব না দিয়ে সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে বললেন, "দেখ ইক্‌টিনাইক্‌, আমি হচ্ছি পাশ-করা ডাক্তার। আমি যদি তোমার ভার নি তাহলে তোমাকে বাঁচাতে পারব বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার মতো শত্রুকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?"

ইক্‌টিনাইক্‌ আর্তকণ্ঠে বললে, "বিদেশী, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারো, তাহলে চিরদিন আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব। আমার এখন মরতে ইচ্ছা নেই—বাড়িতে আমার বুড়ো মা-বাবা আছেন, আর আছে আমার ছেলে-মেয়ে-বউ। আমাকে বাঁচাও বিদেশী, আমি তোমার বন্ধু হব।"

এমন করুণ সুরে সে এই কথাগুলি বললে যে, আমার মন দয়ায় ভরে গেল। কিন্তু ফিলিপ অবিচলিত ভাবেই বললেন, "আমাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের কোনই মূল্য নেই।"

মৃণু বললে, "মিঃ ফিলিপ, আপনি যে এত নিষ্ঠুর তা আমি জানতুম না।"

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিলিপ একটু হাসলেন মাত্র।

ইক্‌টিনাইক্‌ বললে, "বিদেশী, যদি বলি আমার বন্ধুত্ব মূল্যবান?"

—"কেন?"

—"তোমরা সূর্যনগরে যেতে চাও?"

—"সেইরকম ইচ্ছাই তো করেছি।"

—"কিন্তু তোমরা কি সেখানে যাবার পথ জানো?"

—"জানি।"

—"না, আসল পথের সন্ধান তোমরা জানো না। তোমরা যে পথের খবর রাখো, সে পথ ধরে কেউ কোনদিন সূর্যনগর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।"

—"কেন?"

—"সে পথের উপর লুকিয়ে পাহারা দেয় হাজার হাজার প্রহরী। এই পথের পথিক হয়ে আজ পর্যন্ত কত বিদেশী পরলোকে গিয়ে হাজির হয়েছে, তার হিসাব কেউ রাখে না। কাল যদি প্রেত-মানুষেরা এসে না পড়ত তাহলে তোমরাও কেউ প্রাণে বাঁচতে না!"

—"তাই নাকি? তারপর?"

—"সূর্যনগরে যাবার আর একটি গুপ্তপথ আছে, আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী তার খবর পায়নি। সে পথ দুর্গম বটে, কিন্তু আর সব দিক দিয়েই নিরাপদ! তুমি যদি আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি তোমার কাছে সেই পথের সন্ধান দিতে পারি।"

ফিলিপের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "তাহলে আগে আমাকে জল দাও।"

ফিলিপ বললেন, "বিমলবাবু, ঝরনা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, আপনারা কেউ গিয়ে জল নিয়ে আসুন!"

—"বেশ, আমিই যাচ্ছি" বলেই মৃণু দ্রুতপদে ছুটে চলে গেল।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "বিদেশী, প্রাণের মায়া বড় মায়া। আমার এই অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে এই বনের ভেতর ফেলে রেখে যাও তাহলে মৃত্যু আমার নিশ্চিত। কিন্তু এমন কুকুরের মতন মরতে আমি পারব না! তাই প্রাণের মায়ায় আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে।"

ফিলিপ বললেন, "তুমি আবার কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

ইক্‌টিনাইক্ উত্তেজিত স্বরে বললে, "বিশ্বাসঘাতকতা নয়? বিদেশী, তোমরা এসে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছ, স্বাধীনতা হরণ করেছ—আমাদের করে রেখেছ ভেড়া-গরুর মতো। তোমাদের কাছ থেকে সরে এসে বিজন পর্বতের কোলে গহন-বনের ভিতরে আমরা একটি ছোট স্বপ্নপুরী রচনা করেছি, সেইখানে লুকিয়ে বসে মাঝে মাঝে আমরা কল্পনায় ভবিষ্যতের স্বর্গকে দেখবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে সুখেও তোমরা আমাদের বঞ্চিত করতে চাও। তোমরা আমার দেশের শত্রু, তোমাদের কাছে আমাদের স্বপ্নস্বর্গের পথের সন্ধান দেওয়া কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কিন্তু কি করব, উপায় নেই—উপায় নেই—প্রাণের মায়া বড় মায়া! তাই প্রাণের মায়ায় আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে।"

হঠাৎ দূর থেকে একটা বন্দুকের গর্জন শোনা গেল।

বিমল চমকে উঠে বললে, "আবার বন্দুক ছোঁড়ে কে?"

আমি বললুম, "মৃণু বোধহয় পাখিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে!"

তারপরেই শুনলুম মৃণুর চিৎকার!—"বিমলদা! কুমারদা!"

ফিলিপ লাফিয়ে উঠে বললেন, "ও কী ব্যাপার?"

ইক্‌টিনাইক্ বিকৃত স্বরে বললে, "প্রেত-মানুষ—প্রেত-মানুষ!"

আমি ও বিমল প্রাণপণে ঝরনার দিকে ছুটে চললুম।

বিমল দৌড়তে দৌড়তে বললে, "মৃণুকে একলা ছেড়ে দিয়ে ভালো করিনি কুমার, ভালো করিনি!"

খানিক পরেই ঝরনার কাছে এসে পড়লুম। কিন্তু সেখানে মৃণু নেই—ঝরনার পাশে পড়ে আছে শুধু তার বন্দুকটা।

চিৎকার করে ডাকলুম, "মৃণু! মৃণু! মৃণু!"

কিন্তু মৃণুর আর কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতন চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলুম—পাহাড়ের আনাচে-কানাচে, উপত্যকার এখানে-ওখানে, বনের ঝোপে-ঝোপে! তবু মৃণুর দেখা নেই!

বিমল চেঁচিয়ে বললে, "মৃণু! তুমি কি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য লুকিয়ে আছ? এখন দুষ্টুমি কোরো না মৃণু, সাড়া দাও—বেরিয়ে এস মৃণু! মৃণু!"

বিজন বন-পাহাড়ের ভিতর থেকে মৃণুর বদলে সাড়া দিলে কেবল প্রতিধ্বনি!

হতভম্বের মতন দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে পিছনে জাগল হা-হা রবে পৈশাচিক অট্টহাসি! সচমকে ফিরেই দেখলুম, কালো বাজের বিপুল মূর্তি। কেবল সে নয়, তার সঙ্গে রয়েছে আরো আট-দশটা মূর্তি—প্রত্যেকেরই হাতে এক একটা বন্দুক!

আমরাও চোখের পলক না ফেলতেই বন্দুক তুললুম।

কালো বাজ কর্কশ কণ্ঠে ইংরেজিতে বললে, "আমাদের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা কোরো না। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ইতিমধ্যে আমাদের পিছন দিকেও আবির্ভূত হয়েছে আর একদল বন্দুকধারী লাল-মানুষ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বুড়ো ঠাকুরদা

আমাদের সামনে আট-দশটা বন্দুক—পিছনেও তাই। বাধা দেবার বা পালাবার কোন উপায়ই নেই। নিজের বন্দুকের মুখ নামিয়ে নীরবে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বিমল বললে, "কালো বাজ, তোমার উদ্দেশ্য কি?"

কালো বাজ প্রথমটা জবাব দিলে না। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "বিদেশী, তোমরা কোন্ দেশের লোক?"

—"ভারতবর্ষের।"

—"হ্যাঁ, তোমাদের দেখে আমারও সেই সন্দেহ হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গরা আজ আমাদের 'লাল-মানুষ' বলে ডাকে বটে, কিন্তু আমাদেরও পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন এশিয়া থেকেই। ভারতবর্ষ হচ্ছে এশিয়ার মুকুটমণি, ও-দেশের ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে।"

বিমল ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললে, "সেই শ্রদ্ধার পরিচয় দেবার জন্যেই তোমরা বুঝি দল বেঁধে বন্দুক দিয়ে আমাদের বধ করতে এসেছ?"

কালো বাজের সুবিশাল দেহ বিপুল ক্রোধে ফুলে যেন আরো বড় হয়ে উঠল। কিন্তু কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ স্বরেই সে বললে, "আমি তোমাকে গোটাকয় প্রশ্ন করতে চাই,—জবাব দাও।"

—"কি প্রশ্ন বল।"

—"সুদূর ভারতবর্ষ থেকে তোমরা এদেশে এসেছ কেন?"

—"আমরা নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসি।"

—"কিন্তু ফিলিপ তোমাদের সঙ্গে এসেছে কেন?"

—"মিঃ ফিলিপ আমাদের বন্ধু।"

—"জানো বিদেশী, ফিলিপের বন্ধুদের আমরা শত্রু বলে গণ্য করি?"

—"কেন?"

—"ফিলিপ সূর্যনগরে যেতে চায়।"

—"সেটা এমন কিছু অন্যায় নয়। শুনেছি বাইরের কোন লোক আজ পর্যন্ত সূর্যনগরকে চোখে দেখেনি! এমন একটা অজানা দেশ দেখবার জন্যে কার মনে আগ্রহ জাগে না?"

কালো বাজ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নিজের হাতের বর্শা-দণ্ডটা সজোরে মাটির উপরে ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বললে, "আগ্রহ? কিসের আগ্রহ? সূর্যনগর হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন-নগর—আমাদের সাধনার তীর্থভূমি—আমাদের কল্পনার আনন্দলোক! তার মধ্যে কোন বাইরের লোকের পদার্পণ করবার অধিকার নেই! সেখানে যে কোন বিদেশী আসবে মৃত্যু তার নিশ্চিত!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল তাকেও কি তোমরা বন্দী করেছ?"

কালো বাজ হা-হা করে হেসে উঠে বললে, "হ্যাঁ গো বিদেশী, হ্যাঁ! সেই দেবী এখন সূর্যনগরের পথে যাত্রা করেছেন।"

বিমল ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল—আমি সবিস্ময়ে বললুম, "সূর্যনগরের পথে!"

কালো বাজ বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সূর্যনগরের পবিত্র পথে। বিদেশী, এই দেবী কি সূর্যনগরে যাবার জন্যেই তোমাদের সঙ্গে আসেননি?"

আমরা জবাব দিলুম না।

কালো বাজ আমাদের মুখের সামনে হাতির শুঁড়ের মতন গোটা একখানা হাত নেড়ে নেড়ে বললে, "তোমরা স্বীকার কর আর না কর, কিন্তু আমরা জানি, দেবী এসেছেন আমাদের আকর্ষণেই। জানো বিদেশী, দেবী যে এখানে আসবেন, বহুকাল আগেই সূর্যনগরের এক পুরোহিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ থেকে এসেছেন এক অপূর্ব সুন্দরী শ্যামলা দেবী, আর সূর্যনগরের তোরণে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ইন্‌কা নিজে। তারপর ইন্‌কার সঙ্গে হল দেবীর বিবাহ আর দেবীর বরে সূর্যনগর ফিরিয়ে পেলে তার সমস্ত হারানো গৌরব! এই দেবীর জন্যে আজ একশো বছর ধরে সূর্যনগর অপেক্ষা করে আছে—এতদিন পরে আমরা পেয়েছি তাঁর দেখা!"

এই আশ্চর্য কথার উত্তরে কি বলব আমরা তো ভেবেই পেলুম না—কালো বাজ কি পাগল? না সে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

সে আবার বললে, "এতক্ষণে বুঝছি, ফিলিপ আর তোমাদের প্রয়োজন হয়েছে দেবীকে এখানে এনে হাজির করবার জন্যেই।"

বিমল বললে, "বেশ তো সে প্রয়োজন যখন সিদ্ধ হয়েছে তখন আমাদের বিদায় করে দিলেই কি ভালো হয় না?"

কালো বাজ তার তীক্ষ্ণ অথচ কুৎকুতে চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে সকৌতুকে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তোমাদের মতন আপদকে ধরে রেখে আর কোন লাভ নেই!"

বিমল বললে, "তাহলে আমাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।"

কালো বাজ বললে, "এত বেশি ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল দেখি? বুড়ো ঠাকুরদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?"

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, "বুড়ো ঠাকুরদা আবার কে?"

হো-হো-হা-হা রবে হাসতে হাসতে কালো বাজ একেবারে যেন ভেঙে পড়ল! তারপর পেটে দুই হাত চেপে ধরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, "বটে, বটে, বটে! আমাদের বুড়ো ঠাকুরদাকে তোমরা চেনো না? অথচ ঠাকুরদা এই পৃথিবীতে লীলাখেলা করছেন যুগ-যুগান্তর ধরে! ঠাকুরদার বয়স কেউ বলে একশো বছর, কেউ বলে দুশো বছর—তবু এখনো তাঁকে দাঁত বাঁধাতে হয়নি,

এখনো তিনি মাংসের ভক্ত, মোটা মোটা হাড় চিবোতে পারেন কড়্‌মড়্‌ করে! আমাদের এমন বুড়ো ঠাকুরদাকে তোমরা চেন না, আরে ছোঃ!"

বিমল বললে, "তোমাদের ঠাকুরদা চুলোয় যাক্‌, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা আর তোমার প্রলাপ শুনতে চাই না, পথ ছাড়ো!"

কালো বাজ হঠাৎ ক্ষাপ্পা হয়ে চিৎকার করে উঠল, "ওরে কুকুর, ওরে শূওর, কি বললি তুই—"

বিপদে বিমল সর্বদাই মাথা ঠাণ্ডা রাখত বটে, কিন্তু তার মুখের উপরে তাকে গালাগালি দিয়ে কারুরই রক্ষা পাবার উপায় ছিল না—তখন সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। কালো বাজ তাকে গালাগালি দিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের বাকি কথা মুখেই রইল, বিমলের মুষ্টিযুদ্ধে সুপটু হস্তের প্রচণ্ড এক ঘুষি আচমকা গিয়ে পড়ল ঠিক তার চোয়ালের উপরে এবং পরমুহূর্তে তার বিরাট দেহ হাত-পা ছড়িয়ে ভূতলশায়ী হল সশব্দে!

অত-বড় একটা দানব-দেহকে এত সহজে 'পপাত ধরণীতলে' হতে দেখে লাল-মানুষের দল বিপুল বিস্ময়ে কোলাহল করে উঠল। আমি ভাবলুম এই ফাঁকে গোলে-হরিবোলে হঠাৎ বন্দুক ছুঁড়ে চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ি! কিন্তু কী হুঁশিয়ার এই লাল-মানুষগুলো। আমরা বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই তারা সবাই চারিদিক থেকে বাঘের মতন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চোখের নিমেষে আমাদের বন্দুক দুটো নিলে কেড়ে! আমরা বারকয়েক ঘুষি চালিয়ে জন-চারেক লোককে কাবু করলুম বটে, কিন্তু তাদের কবল থেকে কিছুতেই ছাড়ান পেলুম না—অনেকগুলো করে বলিষ্ঠ বাহু আমাদের দুজনকে যেন অক্টোপাসের মতন বেঁধে ফেলে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে এবং আমাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে স্থির হয়ে রইল বন্দুকের পর বন্দুকের চক্‌চকে কালো নল! এরা ইচ্ছা করলেই আমাদের বধ করতে পারত, কিন্তু কালো বাজের হুকুম পায়নি বলেই বোধহয় আমাদের উপরে গুলিবৃষ্টি করলে না!

এদিকে বিমলের বজ্র-মুষ্টির প্রভাব কতকটা সামলে নিয়ে কালো বাজ প্রথমে ধীরে ধীরে উঠে খানিকক্ষণ দুই পা জড়িয়ে চুপ করে বসে রইল। বোধহয় এতগুলো লাল-মানুষের সামনে এমনভাবে অপদস্থ হয়ে মুখ তুলে কথা কইতে তার লজ্জা করছিল।

কিন্তু তার এ ভাব বেশিক্ষণ রইল না। আচম্বিতে এক হুঙ্কার দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ানক চিৎকার করে বললে, "ওরে কুকুর, ওরে শেয়াল, এইবার তোদের কী দশা করি দ্যাখ্‌!"

বিমল বললে, "ওরে বাঁদরমুখো কালো বাজ, এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে আর একবার গালাগাল দিয়ে মজা দ্যাখ্ না!"

কালো বাজ গর্জন করে বললে, "কি বললি, আমি বাঁদরমুখো? আচ্ছা দ্যাখ্ তবে।"—এতক্ষণ সে আমাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিল, এইবার নিজের ভাষায় সঙ্গীদের ডেকে সে যে কি হুকুম দিলে, বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু লাল-মানুষেরা তার কথা শুনছিল না, তারা কালো বাজের পিছনকার বনের দিকে আড়ষ্ট ভাবে ভীত চোখে তাকিয়ে ছিল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম।

যা দেখলুম, সেই অবস্থাতেও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল! বনের তলায় একটা বড় ঝোপ—সূর্যের কিরণও সেখানকার অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি, কতকটা উজ্জ্বল করে তুলেছে মাত্র। সেই তরল অন্ধকার বা অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর দেখতে একখানা কালো-কুচকুচে মুখ! হয়তো সেখানা মানুষের মুখ—হয়তো সেখানা মানুষের মুখ নয়! সেই মস্ত কালো মুখখানা আবছায়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে আছে যে, স্পষ্ট করে কিছুই বোঝবার যো নেই—কিন্তু তার দুই চোখে জ্বলছিল দু-দুটো আগুনের শিখা!

আমাদের সকলকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কালো বাজও ফিরে তাকালে সেই ঝোপের দিকে! তারপরেই বিকট আর্তনাদ করে মারলে সুদীর্ঘ এক লাফ!

ঠিক সেই সময়েই বনের ভিতর থেকে ভেসে এল পরে পরে একাধিক বন্দুকের আওয়াজ!

ঝোপের ভিতরে চোখের আলো দপ্ করে নিবে গেল, সেই বীভৎস মুখখানাও মিলিয়ে গেল ছায়ার পটে যেন ছায়াছবির মতন!

কালো বাজ কিন্তু ঝোপের দিকে আর ফিরেও তাকালে না, স্বদেশী ভাষায় এক নিঃশ্বাসে কি হুকুম দিয়ে পাগলের মতন একদিকে ছুটে চলল!

অন্যান্য লাল-মানুষদেরও দেখে মনে হল সেখান থেকে পালাতে পারলে যেন তারা বাঁচে কিন্তু পালাবার সময়েও তারা আমাদের দেহদুটোকে শূন্যে তুলে প্রাণপণে চেপে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে ভুললে না। আমরা মুক্তির চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করতেই এমন লাঠি ও বন্দুকের খোঁচা খেলুম যে, মানে মানে চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করলুম।

কালো বাজ ও তার সঙ্গীরা ছুটতে ছুটতে উৎকণ্ঠিত ভাবে বারে বারে

পিছন ফিরে তাকাতে লাগল—যেন তারা সকলেই প্রতিমুহূর্তেই সন্দেহ করছে, এখনি কোন মূর্তিমান বিভীষণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে ওখানে!

এত বিপদের মধ্যেও না ভেবে পারলুম না যে, এরা এতগুলো জোয়ান লোক কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? এদের পিছনে পিছনে কে তেড়ে আসতে পারে? অন্ধকার ঝোপে আমরা কার মুখ দেখলুম? তাকেই কি এরা প্রেতমানুষ বলে ডাকে? কাল রাতে ঐ-রকম প্রেতমানুষের দলই কি এদের আক্রমণ করেছিল?

উঁচু-নিচু পাহাড়ে-পথ ভেঙে লাল-মানুষরা ছুটে চলেছে তো ছুটে চলেছেই—তাদের হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল।

হঠাৎ কালো বাজ কি হুকুম দিলে—সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালো বাজ ইংরেজিতে বলল, "ওহে, এইবারে আমরা বুড়ো ঠাকুরদার বাসার কাছে এসেছি।"

বনের ভিতরে জাগল আবার একাধিক বন্দুকের গর্জন!

কালো বাজ নিজের ভাষায় তাড়াতাড়ি কি বললে, লাল-মানুষরা আমাদের নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল একদিকে। এবং তারপরে আমরা কিছু দেখবার আগেই তারা হঠাৎ আমাদের সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম কালো বাজের পৈশাচিক অট্টহাস্য!

শূন্যপথে আমাদের দেহ বোঁ বোঁ করে নিচের দিকে নামতে লাগল—প্রথম মুহূর্তে ভাবলুম, দুরাত্মারা বোধহয় আমাদের হত্যা করবার জন্যে পাহাড়ের উপর থেকে নিচের খাদে ফেলে দিলে। কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্তে আমাদের চোখ অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে যেতেই বুঝলুম, আমরা নেমে যাচ্ছি পাহাড়ের কোন গভীর গহ্বরের মধ্যে। তারপরেই পেলুম চারিদিকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে জল কেটে তলিয়ে যেতে লাগলুম পাতালের দিকে! জলের ভিতরে হাত-পায়ের চাপ দিতেই হুশ করে আবার ভেসে উঠলুম।

চারিদিকে সমাধির মতো স্তব্ধপ্রায় অন্ধকারে থই থই করছে মৃত্যুর মতন শীতল কালো জল। মাথা তুলে দেখলুম, প্রায় সত্তর-আশী ফুট উপরে গহ্বরের ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে নীলাম্বরের সূর্যকর-লেখা। পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ভাবে এই গহ্বরের উৎপত্তি, কিংবা মানুষের হাতে এর সৃষ্টি, সেটা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু এর চারিদিকের দেওয়াল যেমন খাড়া তেমনি তেলা। এর কোন দিক দিয়েই উপরে ওঠবার উপায় নেই। এই অদ্ভুত গিরি-গহ্বরটা প্রায় ছোটোখাটো একটা পুকুরেরই মতো।

বিমল সাঁতার দিয়ে আমার পাশে এল। তারপর চুপিচুপি ডাকলে, "কুমার!"

—"কি বিমল?"

—"ওদের বুড়ো ঠাকুরদাকে তুমি দেখেছ?"

—"না। দেখতে ইচ্ছেও নেই।"

—"কিন্তু তাকে দেখতে তুমি বাধ্য।"

—"তার মানে!"

—"ঐ কোণে চেয়ে দেখ।" সে একদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

দেখলুম, অন্ধকারের কালিমা-মাখা বিরাট ও সুদীর্ঘ একটা দেহ আমাদের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছে অত্যন্ত ক্ষুধিত ও নির্মম দুটো অগ্নিময় দৃষ্টি নিয়ে!

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-গুহায়

লিখতে লিখতে আজও সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে করে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠছে।

অতি-গভীর প্রায়-পুকুরের মতো শৈল গহ্বর!—এত নিচে জলের উপরে আমরা অসহায়ভাবে ভাসছি যে, রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীর আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারছে না। সেখানে দিনের বেলাতেও বিরাজ করে সন্ধ্যার মলিন ছায়া এবং সেখান থেকে মুখ তুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুহামুখে ফ্রেমে আঁটা সমুজ্জ্বল নীলাকাশের ছবি—কিন্তু সে যেন নাগালের বাইরে অন্য কোন স্বপ্ন-জগতের আকাশ! এবং মুখ নামিয়ে দেখতে পাচ্ছি গুহার এক ঘুটঘুটে কালো কোণে জেগে উঠেছে যেন কোন দুঃস্বপ্ন জগৎবাসীর বর্ণনাতীত বিভীষিকা।

সেই জড়ের মতন স্থির ও পাথরের মতন মৌন দীপ্তচক্ষু জীবটা যে কোন্ জাতীয়, প্রথমে তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তার আকার যে ষোল-সতেরো ফুটের কম নয়, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম।

বিমল আবার ফিস্-ফিস্ করে বললে, "কুমার, ঐ হচ্ছে কালো বাজের বুড়ো ঠাকুরদা! ভালো করে চেয়ে দেখ, ও হচ্ছে একটা প্রাচীন কুমীর!"

কুমীর? হ্যাঁ কুমীরই বটে! ঘুমন্ত অথচ ক্ষুধিত ও জ্বলন্ত চোখে স্থির-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল, কিন্তু আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করলে না।

বিমল বললে, "এত উঁচু পাহাড়ের গর্তে নিশ্চয়ই কুমীর থাকে না, লাল-

মানুষেরাই ওকে এখানে এনে রেখেছে। বুড়ো-ঠাকুরদার পেট ভরাবার জন্যে নিশ্চয়ই আমাদের মতন আরো অনেক অভাগা মানুষকে ওরা এই গর্তের ভিতরে ফেলে দিয়েছে!"

আমি ভয়ার্ত স্বরে বললুম, "বিমল, গর্তের চারিদিকেই যে খাড়া পাথরের দেওয়াল—আমাদের মুক্তি পাবার যে কোন উপায়ই নেই।"

বিমল আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, "কুমীরটা এখনো আমাদের আক্রমণ করছে না কেন বুঝেছ? সে জানে তাড়াতাড়ি করবার কোনই দরকার নেই—এখান থেকে আমাদের পালাবার সব পথই বন্ধ! সে যখন-খুশি ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে গপ্ করে আমাদের গিলে খেয়ে ফেলতে পারবে!...কুমার, বার কর তোমার রিভলভার!"

লাল-মানুষরা আমাদের তাড়াতাড়ি স্বর্গে পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রিভলভার কেড়ে নেবার সময় যে পায়নি, এ খেয়াল আমারও ছিল। কিন্তু এই বিরাট কুমীরের বিরুদ্ধে তুচ্ছ দুটো রিভলভারের কোন মূল্যই নেই! তাই আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "রিভলভার নিয়ে তুমি কি করতে চাও বিমল?"

—"কুমার, আমাদের দুজনেরই হাতে টিপ্ অব্যর্থ। কুমীরটা বেশি দূরে নেই, আর এখনো স্থির হয়েই আছে। আমরা চেষ্টা করলে একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ে ওর চোখ দুটো কানা করে দিতে পারি। অন্ধ কুমীরকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন না হতেও পারে!"

বিমলের কথায় যদিও বিশেষ আশ্বস্ত হলুম না, তবু রিভলভার বার করলুম।

বিমলও রিভলভার বার করে বললে, "সাঁতার কাটতে কাটতে লক্ষ্য স্থির করা সহজ নয় বটে, তবু মনে রেখো কুমার, প্রথম চেষ্টাতেই আমাদের লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে! কারণ আমাদের জীবন নির্ভর করছে এই প্রথম গুলি দুটোর উপরেই! তুমি দৃষ্টি রাখো কুমীরটার বাঁ-চোখের দিকে, ডান-চোখের ভার আমার। আমি তিন পর্যন্ত গুনলেই গুলি ছুঁড়বে!"

কুমীরটা তখনো স্থির জলে মড়ার মতন নিশ্চেষ্ট হয়ে ভাসছিল, আমাদের রিভলভার তুলতে দেখেও তার ঘুমন্ত চোখদুটোর অগ্নিময় দৃষ্টি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল না।

বিমল গুনলে—"এক, দুই, তিন!"

ঠিক একসঙ্গেই আমাদের রিভলভার দুটো গর্জন করে উঠল—সেই বদ্ধ ও স্তব্ধ পাতালের মধ্যে রিভলভারের আওয়াজকে মনে হল কামানের ভৈরব হুঙ্কারের মতো!

পরমুহূর্তেই কুমীরটা যেন বিদ্যুৎ-বিদ্ধের মতো একদিকে ছিটকে গিয়ে প্রকাণ্ড লাঙ্গুল তুলে জলের উপরে করলে প্রচণ্ড এক আঘাত এবং সঙ্গে-সঙ্গে গহ্বরের সমস্ত জল উথলে উঠে ফেনিল তরঙ্গ সৃষ্টি করে যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল!

তার লাঙ্গুলের বাইরে থাকবার জন্যে আমরা একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে রইলুম। আরো বার-দুয়েক ল্যাজ আছড়েই কুমীরটা হঠাৎ জলের তলায় ডুব মারলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখে নিয়েছিলুম যে, তার দুই চক্ষু দিয়েই হু-হু করে বেরুচ্ছে রক্তধারা। তারপর আমাদের চোখের আড়ালে জলের তলায় যে বিষম তোলপাড় শুরু হল, বর্ণনা করে তা বোঝানো সম্ভব নয়!

আমি বললুম, "কুমীরটা হয়তো এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এই ছোট জায়গায় সে যদি আবার উপরে এসে এমন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, তাহলে তার ল্যাজ বা দেহের আঘাতেই আমাদের হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে যে।"

বিমল বললে, "কুমীরের কবল থেকে নিস্তার পেলেও আমাদের আর রক্ষা নেই কুমার! সাঁতার কেটে জলে ভেসে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে?"

এমন সময় গহ্বরের উপর থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

আমি বললুম, "বিমল, বন্দুকের এই শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই! ফিলিপ বা আর কেউ পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে নাকি?"

বিমল বললে, "খুব সম্ভব তাই। কিন্তু আমাদের উত্তর দেবার শক্তি নেই। সেই গভীর গর্তের ভিতরে রিভলভারের আওয়াজ যতই ভীষণ বলে মনে হোক্‌ বাইরে দূর থেকে তা শোনাই যাবে না...কুমার, কুমার, সাবধান!"

বিমল চিৎকার করে উঠতেই চমকে পিছন ফিরে দেখি, আমার কাছ থেকে হাত পাঁচ-ছয় তফাতেই কুমীরটা আবার ভেসে উঠেছে। রক্ত-প্রলেপের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তার প্রজ্বলিত নিষ্ঠুর চক্ষুদুটো! প্রাণপণে সাঁতার কেটে আমি দূরে সরে এলুম। কুমীরটা জলের উপরে একবার ল্যাজ আছড়েই আবার ডুব দিয়ে নিচে নেমে গেল।

হঠাৎ উপরে খুব কাছেই শোনা গেল কুকুরের ঘন ঘন চিৎকার। আমি ও বিমল তৎক্ষণাৎ সে-চিৎকার চিনতে পারলুম। দুজনে একসঙ্গেই বিপুল আনন্দে বার বার চ্যাঁচাতে লাগলুম—"বাঘা, বাঘা, বাঘা, বাঘা!"

কয়েক সেকেন্ড পরেই গহ্বরের উপরে দেখা গেল মহা-উত্তেজিত বাঘাকে। চিৎকার করতে করতে সে একবার গর্তের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ বাড়িয়ে

আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর আবার ফিরে এসে গর্তের মুখে লাফালাফি করে।

তারপরেই শুনলুম মানুষের কণ্ঠস্বর এবং গর্তের উপরে পরে পরে দেখলুম বিনয়বাবু, ফিলিপ ও রামহরির মুখ।

বিমল উচ্চকণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু! রামহরি! দড়ি—একগাছা লম্বা দড়ি ফেলে দাও!"

সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-গহ্বর ছেড়ে উপরে উঠে, বাইরের উজ্জ্বল আলোকে ও স্নিগ্ধ বাতাসে বিশ্রাম করতে করতে বিনয়বাবুর কথা শুনতে লাগলুম :

"বিমল! কুমার! ঘুম ভাঙবার পর যখনি দেখলুম, তাঁবুর ভিতরে মৃণু নেই, তখনি আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! আমি আর কালবিলম্ব না করে রামহরি, বাঘা আর অন্যান্য লোকজন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

বনের ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে মিঃ ফিলিপের সঙ্গে দেখা। তিনিও তখন ব্যস্ত হয়ে তোমাদের সন্ধান করছিলেন। তাঁর মুখে সমস্ত শুনে আমি তোমাদের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম। কিন্তু ভাগ্যে সঙ্গে ছিল বাঘা! মাটির উপরে শুঁকে শুঁকে সে-ই তোমাদের পায়ের গন্ধ আবিষ্কার করে ফেললে। বাঘা না থাকলে আজ তোমাদের কি দশা হত জানি না। আমরা তারই অনুসরণ করে বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘটনাস্থলে আসতে পেরেছি। তোমাদের ফিরে পেলুম বটে, কিন্তু আমার মৃণুর কি হল? পিশাচরা কি তাকে হত্যা করেছে?" বলতে বলতে বিনয়বাবুর মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল।

বিমল বললে, "মৃণুর কথা পরে সব শুনবেন। আপাতত এইটুকু খালি জেনে রাখুন যে, শত্রুরা মৃণুকে ধরে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই।...মিঃ ফিলিপ, আমরা যে আহত লাল-মানুষটাকে বনের ভিতরে পেয়েছি সে এখন কোথায়?"

ফিলিপ বললেন, "ইক্‌টিনাইকের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? বিনয়বাবু যে কুলিদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, এতক্ষণে তারা তাকে আমাদের তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "তাহলে শীঘ্র তাঁবুর দিকে ছুটে চলুন। ঐ ইক্‌টিনাইক্‌ই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। কারণ মৃণু গেছে যেখানে, সেই সূর্যনগরে যাবার গুপ্তপথের সন্ধান সে ছাড়া আমাদের আর কেউ জানে না!"

আমরা সবাই তাঁবুর দিকে ফিরে চললুম। এবং পথে যেতে যেতে বিনয়বাবুর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললুম।

বিনয়বাবু এবারে সত্য-সত্যই কেঁদে ফেললেন। সাশ্রুনেত্রে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "মৃণু হবে সূর্যনগরে ইন্‌কার রানী? তাহলে আর কি তাকে ফিরে পাব? হা ভগবান!"

বিমল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "কিছু ভাববেন না বিনয়বাবু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মৃণু যেখানেই থাক তাকে আবার উদ্ধার করে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনব।"

তাঁবুতে এসে দেখি, ইক্‌টিনাইক্ শয্যায় শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। আমাদের দেখে ক্ষীণ স্বরে বললে, "বিদেশী, আমি বোধহয় আর বাঁচব না!"

ফিলিপ বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই। আমার চিকিৎসায় তুমি দুই হপ্তার মধ্যে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, রক্তপাতের জন্যে তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ বটে, কিন্তু তোমার কোন আঘাতই গুরুতর নয়।"

ইক্‌টিনাইক্ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "আমি যদি বাঁচি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের সূর্যনগরে নিয়ে যাব।"

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু ইক্‌টিনাইক্, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল, কালো বাজ কেন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

ইক্‌টিনাইক্ ধীরে ধীরে বললে, "সেই মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যেই আমরা এদিকে এসেছিলুম। আমাদের রানী হবেন তিনিই। সূর্যমন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছেন, আসছে মাসের প্রথম পূর্ণিমার পর প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইন্‌কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে!"

—"আসছে মাসের পূর্ণিমা? তার তো এখনো অনেক দেরি! ইতিমধ্যে মেয়েটির উপরে কোন নির্যাতন হবে না তো?"

ইক্‌টিনাইক্ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "সূর্যনগরের মহিষীর উপর নির্যাতন করবে এত বড় বুকের পাটা আছে কার? জান বিদেশী কত কাল-কালান্তর ধরে সূর্যনগর অপেক্ষা করে আছে এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে লাভ করবার জন্যে? এতদিন পরে তিনি আমাদের দেখা দিয়ে ধন্য করেছেন, কে তাঁকে অপমান করতে সাহস করবে?"

ইক্‌টিনাইকের কথা শুনে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

তারপর থেকে ফিলিপ পরম যত্নে ইক্‌টিনাইকের পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন এবং তাঁর চমৎকার চিকিৎসার গুণে রোগী দিনে দিনে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু বিনয়বাবুর আর শান্তি নাই—সর্বদাই হা-হুতাশ ও ছট্‌ফট্‌ করেন। আমরা তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলি, কিন্তু বাপের প্রাণ কিছুতেই ধৈর্য মানতে চায় না।

ওদিকে দিনের আলো নিবিয়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকার জাগলেই তাঁবুর ভিতরে বাঘা হয়ে ওঠে বিষম অশান্ত! বারংবার কান পেতে কি শোনে এবং দারুণ ক্রোধে চিৎকার করতে থাকে।

সেই চিৎকারে ইক্‌টিনাইকের ঘুম ভেঙে যায় এবং সেও ধড়্‌মড়্‌ করে বিছানার উপরে উঠে বসে সভয়ে বলে, "প্রেতমানুষ! প্রেতমানুষ! আমি প্রেতমানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!"

আমরাও শুনতে পাই, বাইরে কারা যেন ভারি ভারি পায়ের চাপে পাহাড়ের পাথর-বুক কাঁপিয়ে মত্তহস্তীর মতন চলা-ফেরা করছে! বন্দুক নিয়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারি, কিন্তু রাত্রির আঁধার-ঘোমটা ভেদ করে দেখতে পাই না কারুকেই! কোন কোন দিন আন্দাজে দুই-একবার বন্দুকও ছুঁড়ি—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ থেমে যায়! শব্দ থেমে যায় বটে, কিন্তু তবু মনে হয়, শত শত সতর্ক ও অমানুষিক দৃষ্টি আড়াল থেকে আমাদের উপর সজাগ পাহারা দিচ্ছে!

ফিলিপ শিউরে উঠে বলেন, "প্রেতমানুষের রহস্য কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না! সর্বদাই মনে হয়, যেন কোন অলৌকিক অভিশাপ আমাদের মাথার উপরে বিষম আক্রোশে জেগে আছে—যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশ হতে পারে!"

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভাবেন, তারপর বলেন, "প্রেতমানুষ নামের কোন মানে হয় না। কিন্তু ইক্‌টিনাইকের মুখে তাদের যে বর্ণনা শুনি, তাতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে।"

ফিলিপ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "কি সন্দেহ?"

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বলেন, "এখন নয়। আগে তাদের স্বচক্ষে দেখি, তারপর বলব।"

দশম পরিচ্ছেদ

দামামা-বিভীষিকা

চলেছি আমরা সূর্যনগরীর পথে। কিন্তু এ কি পথ?

কখনো এমন জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ি যে মনে হয়, সূর্যহীন চিররাত্রির যাত্রী আমরা, অনন্ত অন্ধকারের গর্ভ ভেদ করে আর বুঝি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবো না। কখনো ঢালু পাহাড়ের শিলাকণ্টকিত গা দিয়ে বলের মতন প্রায় গড়াতে গড়াতেই নিচের দিকে নামতে থাকি একান্ত অসহায়ের মতো!

কখনো দুই হাতে বন্য লতাপাতা চেপে ধরে মাথার উপরে জলপ্রপাতের প্রবল ধারা ও পিচ্ছল পাষাণ-পথে পদে পদে মৃত্যুভয় নিয়ে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠতে থাকি অতি কষ্টে, অতি সাবধানে!

ইক্‌টিনাইক্ প্রায় আরোগ্য লাভ করেছে। ফিলিপ তাকে আরো দিন-তিনেক বিশ্রাম করতে বলেছিলেন, কিন্তু মৃণুর অদর্শনে বিনয়বাবুর কাতরতা দেখে সে আর স্থির থাকতে রাজি হল না; বললে, "বাড়িতে আমারও বুড়ো বাপ-মা আছেন, এতদিন আমাকে দেখতে না পেয়ে তাঁরাও এমনি কান্নাকাটি করছেন। বিদেশী, আমারও মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তোমাদের তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আমিও নিজের ঘরে ফিরে যেতে চাই!"

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছ শুনলে তোমার দেশের লোক রাগ করবে না?"

—"রাগ করবে না, বল কি বিদেশী? এ খবর প্রকাশ পেলে আমার জীবন যাবে।"

—"জীবন যাবে?"

—"নিশ্চয়! এদেশে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আমাকে বন্দী করে সূর্যমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর প্রধান পুরোহিত এসে জ্যান্ত অবস্থায় আমার বুক ছ্যাঁদা করে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে সূর্যদেবের সামনে উপহার দেবেন!"

ফিলিপ শিউরে উঠে বললেন, "কি সর্বনাশ! ইক্‌টিনাইক্, এই সব বর্বর প্রথা এখনো এদেশে আছে! আমি তো জানতুম বিংশ শতাব্দীর হাওয়া এসে তোমাদেরও সভ্য করে তুলেছে!"

ইক্‌টিনাইক্ আহত স্বরে বললে, "তোমার কথার মানে কি বিদেশী? তুমি কি বলতে চাও, এদেশে সাদা মানুষরা আসবার আগে লাল-মানুষরা অসভ্য ছিল?"

ফিলিপ তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, ও-কথা বলছি না—আমি যে তোমাদের পুরানো ইতিহাসের খবর রাখি। আমি যে তোমাদের মায়া অ্যাজ্‌টেক্ আর ইন্‌কা-সভ্যতার কথা জানি। যুগ-যুগান্তর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে-সব বিরাট মন্দির, পিরামিড আর প্রাসাদ গড়েছিলেন, আজও যে তাদের বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ আমেরিকার দিকে দিকে ছড়ানো রয়েছে! সুদূর অতীতে তোমাদের শিল্পীরা যে সব অপূর্ব মূর্তি গঠন করেছিলেন, আজ তো তারা একেবারে রূপ হারিয়ে নষ্ট হয়ে যায়নি! তবে কি করে তোমাদের আমি অসভ্য বলব? তোমাদের পূর্বপুরুষরা বড় বড় নগর বসিয়েছিলেন, তাঁদের সমাজ আর

সভ্যতার রীতি-নীতি ছিল উন্নত, তাঁদের ধর্ম আর শিল্প-শাস্ত্রেরও অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের কোন কোন প্রথা যে নিষ্ঠুর ছিল, একথা মানতেই হবে!"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "বিদেশী, তোমাদেরও কথা আমরা কিছু কিছু জানি। য়ুরোপেও কি ধর্মের নামে রোম্যান ক্যাথলিক পুরোহিতরা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেননি?"

ফিলিপ বললেন, "বুঝেছি, তুমি inquisition-এর কথা বলছ। কিন্তু সে প্রথা তো একালে আর নেই!"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "তুমি ভুলে যাচ্ছ বিদেশী, সূর্যনগরেও আধুনিক কোন যুগধর্মই নেই! এ হচ্ছে বর্তমানের কোলে অতীতের স্বপনপুরী! আধুনিক যুগ আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে; আমাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য কেড়ে নিয়েছে; তাই আমরা মহা পর্বতের অন্তরালে গহন-বনের অন্তপুরে গোপনে গড়ে তুলেছি এই অজানা সূর্যনগর—যেখানে এসে আমাদের গৌরবময় অতীত কালের পরিমাপ হারিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে! প্রাচীন যুগ যেমন ছিল, আমরা তাকে ঠিক তেমনিভাবেই রেখেছি—তার কোন ভাব, রূপ, রীতি-নীতি, সংস্কার নিষ্ঠুর বা সেকেলে হলেও একটুও বদলাতে দিইনি। প্রতি বৎসরেই আমরা বাইরের ঘরবাড়ি দেশ ছেড়ে একবার করে কিছুদিনের জন্যে সূর্যনগরে পালিয়ে আসি কেন জানো? নিজেদের দীনতা, হীনতা, অধঃপতনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে বর্তমান যুগকে ভুলে অতীতকে আলিঙ্গন করে আমরা খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়তে চাই বিদেশী, নিজেদের স্বরূপ দেখে আশ্বস্ত হতে চাই! দুর্দশাগ্রস্ত একালকে আমরা ব্যাধির মতো ঘৃণা করি—আমরা ভালোবাসি আমাদের মহিমময় সেকালকে, তাই তার দোষকেও সহ্য করতে নারাজ নই!"

ফিলিপ বললেন, "বুঝেছি ইক্‌টিনাইক্, বুঝেছি! কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিতে তোমার ভয় করছে না?"

—"ভয় করছে বৈকি, কিন্তু উপায় কি? আমার নিজের দলের লোকেরা আমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে গেল, আর শত্রু হয়েও আমার প্রাণরক্ষা করলে তোমরা! এমন মহৎ উপকার ভুলব কেমন করে! তাই গোপনে তোমাদের সাহায্য করে কেউ কিছু জানতে পারবার আগেই আবার বাড়ির পথ ধরব!"

ইক্‌টিনাইক্ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কি করে যে নিয়ে যাচ্ছে, তা কেবল সে-ই জানে! আমরা তো কোথাও পথের রেখাটুকুও দেখতে পাচ্ছি না! কেবল পাহাড়, বন, উপত্যকা, খাদ, নদী আর জলপ্রপাত! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও আমরা মানুষ তো দূরের কথা, একটা

স্থলচর জীবেরও সাড়া পেলুম না। এ যেন এক অভিশপ্ত পরিত্যক্ত প্রদেশ, এখানে পদার্পণ করতে সকলেই ভয় পায়! কেবল আকাশপথে পৃথিবীর মাটির নাগালের বাইরে মাঝে মাঝে দেখা যায় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, আর লতাজড়ানো বড় বড় বনস্পতির পত্রব্যূহের আড়াল থেকে ভেসে আসে বিহঙ্গদের কল-সঙ্গীত—পথভোলা মাধুর্যের ঝঙ্কারের মতো।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "এখন পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় কাটল! কিন্তু তবু আমার ভয় করছে!"

ফিলিপ বললেন, "কিসের ভয়! তুমি তো বললে এই দুর্গম গুপ্তপথের সন্ধান কেউ জানে না বলে এ অঞ্চলে কোন প্রহরীও নেই।"

—"হ্যাঁ, বলেছি বটে, তবু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিদেশী, কালো বাজ তোমাকে ভয় করে!"

—"আমাকে ভয় করবার কারণ আর নেই। আমি এখন সহায়হীন, কালো বাজ জানে যে আমার প্রধান দুই সঙ্গীকে এখন বুড়ো ঠাকুরদা গিলে হজম করে ফেলেছে!"

—"বিদেশী, কালো বাজ বেশি ভয় করে তোমাকেই। তুমি বেঁচে থাকতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তোমার পিছনে নিশ্চয়ই সে চর রেখেছে—আর আমার কথাও হয়তো জানতে পেরেছে!"

ফিলিপ বললেন, "এতখানি পথ পার হয়ে এলুম, কিন্তু আমাদের উপরে কারুর দৃষ্টি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!"

ইক্‌টিনাইক্ শুকনো হাসি হেসে বললে, "ভুল বিদেশী, ভুল! তুমি বাহির থেকে এখানে কোন জীবকে দেখতে পাচ্ছ না বটে, কিন্তু এ মারাত্মক পথের গুপ্তকথা আমি জানি। কত জাগুয়ার বাঘ, কত অজগর সাপ যে নীরবে আমাদের পথচলা লক্ষ্য করেছে, সেটা আমি বেশ অনুভব করতে পেরেছি! একে দিনের বেলা, তায় আমরা দলে হালকা নই, এই জন্যেই তারা নির্বিবাদে আমাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে!"

ফিলিপ বললেন, "জাগুয়ার কি অজগরকে আমরা শত্রু বলেই গণ্য করি না। আমাদের সামনে পড়লে তাদেরই বিপদ বেশি।"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "কিন্তু বনের ভিতরে আরো কত বিভীষিকা আছে, কে তার খবর রাখে?"

ফিলিপ হেসে ফেলে বললেন, "এখনো তুমি বুঝি প্রেত-মানুষদের ভুলতে পারোনি?"

বিস্ফারিত চক্ষে প্রায় আর্তনাদের স্বরে ইক্‌টিনাইক্‌ বললে, "দোহাই বিদেশী, ও অমঙ্গুলে নাম এখন মুখে এনো না! সন্ধ্যা হল, এখনি চারিদিক ছেয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে—আর তুমি যাদের নাম করলে, তারা হচ্ছে রাত্রিচর! ও নাম স্মরণ করলে এখনি সর্বনাশ হতে পারে!"

ইক্‌টিনাইকের কথা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে শোনা গেল ঘন ঘন দামামার আওয়াজ! এখানে মানুষের সাড়া নেই, দামামা বাজায় কে?

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ইক্‌টিনাইকের দিকে তাকালুম। সে বিবর্ণ মুখে উৎকর্ণ হয়ে দামামা-ধ্বনি শুনছিল।

ফিলিপ বললেন, "বিনয়বাবু, এই ঢাকের আওয়াজ শুভলক্ষণ নয়।"

বিনয়বাবু বললেন, "কেন?"

ফিলিপ বললেন, "আমি আমেরিকা, আফ্রিকা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দেশের বনে বনে অনেক ঘুরেছি। সব জায়গাতেই দেখেছি, বনবাসী আদিম বাসিন্দাদের কাছে ঢাকের আওয়াজ বেতার টেলিগ্রামের কাজ করে। ও ঢাকের আওয়াজ অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে আছে সাঙ্কেতিক ভাষা, আমরা যা বুঝি না। ঢাক বাজিয়ে ওরা দূর-দূরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খবর পাঠিয়ে দেয়! ইক্‌টিনাইক্‌কে দেখুন, ওর মুখ মড়ার মতন সাদা হয়ে গেছে, নিশ্চয় ও ঢাকের ভাষা বুঝতে পেরেছে!"

ইক্‌টিনাইক্‌কে তখন দেখাচ্ছিল নিশ্চল জড়মূর্তির মতন—আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে যেন ভুলে গিয়েছে! ফিলিপ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধের উপরে একখানি হাত রাখলেন। সে চমকে উঠে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "আমরা ধরা পড়ে গিয়েছি।"

—"কি করে জানলে তুমি?"

—"ঐ ঢাকের আওয়াজ শুনে।"

—"ও ঢাক কি বলছে?"

—"ও বলছে—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো'!"

তখন বনভূমি সমাধির মতন। পাখিরাও বাসায় ফিরে গান ভুলে গিয়েছে। আলোর আসরে কালোর প্রলেপ পুরু হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। দূরের দৃশ্য দেখাই যায় না, কাছের গাছপালাও ঝাপসা। সব যেন রহস্যময়।

গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে কেবল ঐ সুদূরের সুগম্ভীর দামামা! সে নাকি বলতে চায়—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো!' অসম্ভব নয়, ইক্‌টিনাইক্‌ ভুল বলবে কেন, সে যে স্বদেশী দামামার সাঙ্কেতিক ভাষা জানে!

আচম্বিতে দূর থেকে আর একটা দামামার ধ্বনি জাগল। তারপর তৃতীয়,

তারপর চতুর্থ দামামাও কথা কইতে লাগল! তারপর আমাদের পিছনে, আমাদের সামনে, আমাদের ডাইনে ও বাঁয়ে একই ভাষায় বেজে উঠল আরো কত যে দামামা, আন্দাজে তা হিসাব করা অসম্ভব! সবাই একস্বরে এক কথাই বলছে—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো! জাগো, জাগো, শত্রু মারো!'

আকাশ, বাতাস, পৃথিবী হয়ে উঠল শব্দে শব্দে শব্দময়! সেই ভয়াবহ সাংঘাতিক ঐকতানে বনস্পতিরা যেন থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করতে লাগল। অন্ধকার যত নিবিড় হয়, দামামার হুঙ্কার ততই বেড়ে ওঠে। পর্বত-অরণ্যের উপরে তিমিরের আবরণ ফেলে অন্ধ নিশীথিনী যেন স্তম্ভিত হয়ে সেই অভিশাপ-বাণী শুনতে লাগল—'মারো, মারো, শত্রু মারো! মারো, মারো, শত্রু মারো! মারো, মারো, শত্রু মারো!' একটানা দ্রিমি-দ্রিমি দ্রিমি-দ্রিমি দ্রিমি-দ্রিমি বোলে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমাদের কান ও প্রাণ!

ফিলিপ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ঢাকগুলোর শব্দ যে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে!"

সত্যই তাই! চতুর্দিক থেকে শব্দময় মৃত্যুর অদৃশ্য বেড়াজাল ক্রমেই এগিয়ে ছোট হয়ে আসছে! পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সব দিক থেকে আসছে শব্দতরঙ্গের পর শব্দতরঙ্গ! মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

বিনয়বাবু বললেন, "কোন্ দিকে যাব? শত্রু যে সব দিকেই!"

বিমল বললে, "শত্রুরা সংখ্যায় বোধহয় অগণ্য। বন্দুক ছুঁড়েও আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই!"

ফিলিপ বললেন, 'ইক্‌টিনাইক্, আমাদের কি শেষটা কলে-পড়া ইঁদুরের মতন মরতে হবে? পালাবার কোন পথই কি আর খোলা নেই?"

ইক্‌টিনাইক্ বাধো-বাধো গলায় বললে, "এক উপায় আছে। কিন্তু—"

—"কিন্তু বলে থামলে কেন? জীবন যখন বিপন্ন, তখন আবার 'কিন্তু' কি?"

—"কিন্তু সে যে মহাপবিত্র স্থান। বিধর্মী বিদেশীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ!"

—"এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা, ইক্‌টিনাইক্! আমরা মরব, আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে?"

—"ভুলে যেও না বিদেশী, যারা ঢাক বাজিয়ে ছুটে আসছে, তারা আমাকেও দয়া করবে না। আমি বিশ্বাসঘাতক। আমারও মৃত্যু অনিবার্য।"

—"তাহলে আর ইতস্তত করছ কেন? আমাদেরও বাঁচাও, নিজেরও প্রাণরক্ষা কর।"

—"বিদেশী, এক জায়গায় আশ্রয় নিলে আমরা বাঁচতে পারি বটে। কিন্তু

সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হবে।...আচ্ছা বিদেশী, তাই-ই হোক! এক পাপ ডেকে আনে অন্য পাপকে। নিজের কথা আর ভাবব না—এস তোমরা আমার সঙ্গে।"

'টর্চে'র আলো ফেলে দেখলুম, সামনেই একটা উঁচু পাহাড়। অত্যন্ত সংকীর্ণ এক শুঁড়িপথ ধরে ইক্‌টিনাইক্ উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। সে পথে পাশাপাশি দুজনের ঠাঁই হয় না।

পরে পরে আমরাও উঠতে লাগলুম। চল্লিশ-পঞ্চাশটা দামামা তখনও প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে এগিয়ে—আরও এগিয়ে—আরও এগিয়ে আসছে—'মারো, মারো, শত্রু মারো! মারো, মারো, শত্রু মারো!'

মিনিট দশেক ধরে উপরে উঠে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইক্‌টিনাইক্ বললে, "এইখানে আছে আমাদের আশ্রয়"—বলেই পাহাড়ের গায়ের উপর একখানা হাত রাখলে।

চারিদিকে ভালো করে 'টর্চে'র আলো ফেলেও সেখানে অটল পাহাড়ের মসৃণ ও নিরেট প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

ফিলিপ বললেন, "কোথায় আশ্রয়? এখানে তো মাথা গোঁজবারও জায়গা নেই! ওদিকে শত্রুরা যে পাহাড়ের তলায় এসে পড়ল।"

নিশ্চয়ই সেখানে কোন গুপ্তযন্ত্র ছিল। পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে ইক্‌টিনাইক্ কি করলে জানি না, কিন্তু হঠাৎ দুখানা বড় বড় পাথর দুদিকে সরে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বারপথের সৃষ্টি করলে।

ইক্‌টিনাইক্ গম্ভীর স্বরে বললে, "বিদেশী, ভিতরে ঢুকে দেখ।"

টর্চের আলো জ্বেলে সর্বাগ্রে ভিতরে ঢুকেই আমি স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়লুম। সবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত দেহে দেখলুম, সর্বাগ্রে কাপড় মুড়ি দিয়ে অত্যন্ত স্থির ভাবে বসে আছে আট-দশটা লাল-মানুষের মূর্তি এবং তাদের ভয়ঙ্কর বিকটদন্ত হাঁ-করা মুখে অত্যন্ত স্থির হয়ে আছে বিস্ফারিত চক্ষের এমন ভীষণ ও বীভৎস দৃষ্টি যে, দেখলেই বুকের কাছটা ভয়ে ধড়্‌ফড়্ করে ওঠে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুহার রহস্য

সেই অতি ভয়ানক ও পাথরের মূর্তির মতন স্থির মানুষগুলোকে দেখেই আমার সর্বাঙ্গ এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলাম না।

তারপরেই পিছন থেকে রামহরি চিৎকার করে বললে, "ওরে বাবারে, ভূতের খপ্পরে এসে পড়েছি রে—ও খোকাবাবু গো, ও কুমারবাবু, ও—" ভয়ে তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না।

রামহরির সেই ভীষণ চিৎকারে আমার আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল।

ফিলিপ সক্রোধে বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, তুমি কি ভুলিয়ে আমাদের শত্রুদের ফাঁদে এনে ফেললে?"

আমি তাড়াতাড়ি বন্দুক তুললুম।

ইক্‌টিনাইক্ আমার হাত চেপে ধরে বন্দুক ছুঁড়তে মানা করলে। তারপর ফিলিপের দিকে ফিরে বললে, "বিদেশী, এরা আমাদের শত্রু নয়। এরা জ্যান্ত মানুষও নয়!"

—"তার মানে?"

—"ওগুলো হচ্ছে মামি।"

—"মামি!"

—"কেন বিদেশী, তুমি কি জানো না, মিশরের মতো এদেশেও মৃতদেহকে শুকিয়ে রক্ষা করবার প্রথা ছিল? এগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ। এ গুহা হচ্ছে প্রাচীন সমাধি-গুহা! খানিক দূর এগিয়ে এই বিপুল গুহার গভীর অন্ধকার হাতড়ালে এমন হাজার হাজার অটুট মৃতদেহ পাওয়া যাবে। এই মৃতদেহের জনতার মধ্যে প্রত্যেকেই আগে ছিলেন দেশের প্রধান ব্যক্তি—কেউ বা ইন্‌কা, কেউ বা প্রধান মন্ত্রী, কেউ বা প্রধান সেনাপতি, কেউ বা প্রধান পুরোহিত। সাধারণ মৃতদেহের ঠাঁই এখানে নেই।"

ইতিমধ্যে বাঘা অতিশয় সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে সেই শুকনো মড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেহগুলো ভালো করে শুঁকে, দেখে, নির্ভয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল এমন একটা ভাব নিয়ে যেন সে বলতে চায়—"ওগো, তোমাদের কোন ভয় নেই! এগুলো হচ্ছে মানুষের মতন দেখতে বাজে পুতুল!"

বিমল বললে, "কুমার, আফ্রিকায় আমরা যখন আবার যখের ধনের খোঁজে গিয়েছিলুম, তখন রত্ন-গুহার ভেতরে যোদ্ধাদের 'মামি' দেখে কি-রকম আশ্চর্য হয়েছিলুম মনে আছে?"

আমি বললুম, "মনে আছে বৈকি! আমি তো সেই কথাই ভাবছিলুম!'

ওদিকে বাইরে দামামাগুলো এখনো শ্রান্ত হয়ে পড়েনি, তারা বেজে চলেছে সমান জোরে, সমান তালে! তাদের মুখে এখনো সেই একই সাঙ্কেতিক বাণী—

'জাগো, জাগো, শত্রু মারো! জাগো, জাগো, শত্রু মারো!' শব্দ ক্রমেই কাছে আসছে, ক্রমে আরো আরো কাছে।

গুহামুখ থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, পাহাড়ের নিচে নিকটে, দূরে সুবৃহৎ অরণ্যব্যাপী অন্ধকারকে যেন শতছিদ্র করে দিয়েছে শত শত জ্বলন্ত মশালের চলন্ত আলো!

ইক্‌টিনাইক্ রীতিমতো বিস্মিত ভাবে বললে, "বনে বনে এত মশালের আলো! বিদেশী, তোমাদের ধরবার জন্যে আজ বোধ হয় সূর্যনগরের সমস্ত যোদ্ধাই এখানে ছুটে এসেছে।"

ফিলিপ বললেন, "এ যেন মশা মারতে কামান পাতা! তুচ্ছ এই কজন লোককে মারবার জন্যে—"

ইক্‌টিনাইক্ বাধা দিয়ে বললে, "তোমরা আর তুচ্ছ নও বিদেশী, তুচ্ছ নও! তোমরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ পর্যন্ত আর কোন বিদেশী সূর্যনগরের এত কাছে আসতে পারেনি! যদি কোন ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে তোমরা সূর্যনগরে ঢুকে পড়, সেই ভয়েই ওরা চারিদিক আগলে মানুষের বেড়াজাল ফেলে এগিয়ে আসছে! এ জাল ভেদ করে একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত এখন আর বাইরে যেতে পারবে না!"

দেখতে দেখতে অনেকগুলো মশাল একেবারে পাহাড়ের নিচে এসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে দামামার শব্দকেও ছাপিয়ে জেগে উঠল জনসমুদ্রের কল-কোলাহল!

ইক্‌টিনাইক্ পাহাড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে আবার কোন কল টিপলে গুহামুখের পাথর-কপাট বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে!

ফিলিপ বললেন, 'ইক্‌টিনাইক্ গুহামুখ বন্ধ করে কোনই লাভ নেই। গুহার ভেতরে আসবার কৌশল ওরাও তো জানে!"

—"হ্যাঁ জানে। কিন্তু তবু ওরা ভেতরে আসতে পারবে না। এ কবাট এমনভাবে তৈরি যে, ভেতর থেকে বন্ধ করলে বাহির থেকে কেউ আর খুলতে পারবে না! তাই তো আমি এখানে এসেছি!"

সমাধি-গুহার ভুতুড়ে অন্ধকার বোধকরি রামহরির ধাতস্থ হল না, সে বিনা বিলম্বে পেট্রলের একটা লণ্ঠন জ্বেলে ফেললে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, দীর্ঘতায় এ গুহা কি বিপুল! পেট্রলের অমন যে তীব্র আলো, তাও গুহার দূরবর্তী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেল একেবারে! গুহামুখের দেওয়ালের দিকে আমরা পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঁয়ে আর ডাইনেও দুদিকে দূরে দূরে দেওয়াল দেখতে পেলুম বটে, কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, গুহার যেন আর শেষ নেই!

গুহার দুদিকেই চোখে পড়ল আর এক অপূর্ব-ভীষণ দৃশ্য! দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সুরক্ষিত মৃতদেহ! সংখ্যায় যে তারা কত, গুনে বলা অসম্ভব! দুদিকেই তাদের শ্রেণী আলোক-সীমানার বাইরে গিয়ে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে নিবিড় তিমিরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। তাদের কেউ যুবা, কেউ প্রৌঢ়, কেউ বৃদ্ধ! তাদের কারুর মাথায় মুকুট, কারুর মাথায় পালকের টুপি, কেউ বা মুণ্ডিতমুণ্ড! তাদের কারুর হাতে রাজদণ্ড, কারুর হাতে তরবারি, ধনুক বা বর্শা, কেউ বা যুক্তকরে যেন উপাসনায় নিযুক্ত! প্রত্যেকের নিষ্পলক চক্ষে স্তম্ভিত পাথুরে দৃষ্টি,—দেখলেই বুক শিউরে ওঠে, গায়ে দেয় কাঁটা! মৃত্যুর সময়ে মুখের উপরে যে বীভৎস ভাব নিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, অনেকের মুখমণ্ডলে আজও তার চিহ্ন লেখা রয়েছে!

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বললে, "তোমরা মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে এলে কিনা গোরস্থানের বাসি মড়ার মুল্লুকে! আজ রাতদুপুরে এরা যখন জাগবে, আমাদের দশা কি হবে গো!"

হঠাৎ খুব কাছেই আমাদের পিছন থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে কে বললে, "হত্যা, হত্যা! আজ তোদের হত্যা করব!"

এক এক লাফে আমরা চমকে ফিরে দাঁড়ালুম—কিন্তু কেউ নেই কোথাও!

ইক্‌টিনাইক্ মৃদু হেসে বললে, "ভয় নেই, এ হচ্ছে কালো বাজের গলা!"

ফিলিপ বললেন, "কোথায় সে?"

—"বাইরে! গুহার দরজার পাশে দেওয়ালে একটা ফুটো আছে। কালো বাজ কথা কইছে সেই ফুটোয় মুখ দিয়ে।"

কালো বাজ আবার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'ইক্‌টিনাইক্ তুমিই যে সমস্ত অনিষ্টের মূল, তা আমাদের জানতে বাকি নেই। ভালো চাও তো এখনি দরজা খুলে দাও।"

ফুটোর কাছে গিয়ে ইক্‌টিনাইক্ বললে, "কেন বল দেখি? নিজের হাতে দরজা খুলে নিজের মৃত্যুকে যেচে ডেকে আনব?"

কালো বাজ বললে, "ভালোমানুষের মতন এখনি যদি দরজা খুলে দাও, তাহলে তোমার সকল অপরাধ আমরা মার্জনা করব।"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "তুমি কত বড় দয়ালু তা আমার জানতে বাকি নেই। দরজা আমি কিছুতেই খুলব না।"

—"ওরে নির্বোধ, দরজা বন্ধ করেই তুই কি বাঁচবি বলে মনে করিস? জানিস্, এ গুহা থেকে বাইরে বেরুবার আর দ্বিতীয় পথ নেই?"

—"জানি।"

—"এইখানে বসে আমরা দিনের পর দিন পাহারা দেব। তার ফল কি হবে জানিস!"

—"পানীয় আর খাদ্যের অভাবে আমরা মারা পড়ব।"

—"সে মৃত্যু কি খুব সুখের?"

—"কালো বাজ, কোন মৃত্যুই সুখের নয়। কিন্তু তোমার মতন নরদানবের হাতে পড়ে শত অপমান আর নির্যাতন সয়ে মরার চেয়ে ভয়ানক আর কিছুই নেই।"

কালো বাজ বিকট স্বরে হা-হা করে হাসতে হাসতে বললে, "ওরে ইক্‌টিনাইক্, ওরে টিকটিকি! বেশ, বেশ, তবে তাই হোক রে, তাই হোক!" সে আরো জোরে হা-হা করে হাসতে লাগল। সে যত হাসে বাঘা রেগে ততই গালাগালি দেয়!

তার হাসি আরো কতক্ষণ চলত জানি না, কিন্তু বিমল হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ফুটোর ভিতরে বন্দুকের নলটা ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলে এবং তারপরেই বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে জাগল একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!

বিমল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আমাদের কপালে যা আছে তাই হবে, কিন্তু কালো বাজের অট্টহাসি পৃথিবী আর বোধহয় শুনতে পাবে না!"

আচম্বিতে গুহার ভিতরে রামহরি ও বাঘা একসঙ্গে বিষম জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললুম, "কী হল রামহরি, ব্যাপার কি?"

রামহরি খালি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, কোন কথাই বলতে পারে না।

বাঘার চিৎকার আরো বেড়ে ওঠে। আশ্চর্য!

বিনয়বাবু দুই হাতে রামহরির দুই কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, "শোনো রামহরি, শোনো! তুমি অমন করছ কেন?"

রামহরি মাটির উপর ধপাস্ করে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললে, "ভূত, ভূত!"

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, "মাথার উপরে ঝুলছে বিপদের খাঁড়া, এ-সময়ে ভূত-ভূত করে তোমার খোকামি আর ভালো লাগে না। উঠে দাঁড়াও! ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এখানে খালি আমরা আছি। আমরা ভূত নই।"

রামহরি কিছুমাত্র শান্ত হল না, তার দুই বিস্ফারিত চক্ষু যেন ঠিকরে পড়ছে! সে শিউরোতে শিউরোতে বললে, "ভগবান, আমাকে অজ্ঞান করে দাও, এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না।"

আমি বললুম, "কি দৃশ্য রামহরি? কোথায়? কোন্ দিকে?"

রামহরি একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ! ঐ দেখ!"

ডানদিকের দেওয়ালের সামনে দুটো শুষ্ক মৃতদেহের মাঝখানে মানুষের চেয়ে বড় একখানা কিম্ভূতকিমাকার কালো মুখ দেখা যাচ্ছে! কোন মৃতদেহের মুখের সঙ্গে সে মুখ মেলে না—না রঙে, না ভাবে, না আকারে! সে মুখ জীবন্ত, তার চোখেও নেই মরা চাহনি! মিথ্যা বলব না, আমারও বুকটা ঢিপ করে উঠল!

রামহরি বললে, "বাসি মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠল গো, আর আমাদের রক্ষা নেই!"

ইক্‌টিনাইক ক্ষীণ স্বরে বললে, "প্রেতমানুষ। প্রেতমানুষ।"

একসঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিমল ও ফিলিপের বন্দুক,—পরমুহূর্তেই মুখখানা সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল। একটা ভয়াবহ গর্জন শুনলুম এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃতদেহ হঠাৎ জীবন্ত হয়ে দুলতে লাগল!

খানিক-আলো আর খানিক-কালোর সেই লীলাখেলার মধ্যে বিভীষণ এক মূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এবং তারপরেই সেই গর্জন আর এই দোদুল্যমান মৃতদেহ রহস্যময় সমাধি-গুহার চারিদিকে যে রোমাঞ্চকর অপার্থিবতা সৃষ্টি করলে, বর্ণনায় আমি তা বোঝাতে পারব না। বলতে লজ্জা হয়, আমিও হতবুদ্ধির মতন হয়ে গেলুম!

রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "ঐগো। আরও একটা মড়া বেঁচে উঠল!"

বিমল বললে, "মড়া বেঁচে উঠল, না ছাই! ও মূর্তিটা নড়ছে কেন জানো? ওটা আমাদের কারুর—"

বিমলের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মৃতদেহটা হুড়মুড় করে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল!

রামহরি দুই হাতে চোখ চাপা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "খোকাবাবু, এরপরেও কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে না?"

বিমল বললে, "না! হয় আমাদের কারুর বন্দুকের গুলি ঐ মড়াটার গায়ে লেগেছে, নয় ওর পিছন থেকে যে মূর্তিটা সরে গেল, তারই ধাক্কায় ওটা দুলে নিচে পড়ে গিয়েছে।"

আমি বললুম, "কিন্তু অমন ভীষণ গর্জন করলে কে?"

—"সেই মূর্তিটা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছে।"

বিমলের কথা হয়তো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তবু আমার মন খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু এইমাত্র যে অদৃশ্য হল, কে সে?"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "প্রেতমানুষ।"

ফিলিপ বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, প্রেতমানুষ কথার কোন অর্থ হয় না! প্রেতও বুঝি মানুষও বুঝি, কিন্তু প্রেতমানুষ আবার কি?"

ইক্‌টিনাইক্ জবাব না দিয়ে ফ্যালফেলে চোখে চারিদিকে আনাচে-কানাচে তাকাতে লাগল।

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "যে মূর্তিটা এইমাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হল, তাকে তোমরা চিনতে না পারলেও আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!"

ফিলিপ বললেন, "যদি চিনতে পেরে থাকেন—"

কথা না শেষ করেই তিনি চমকে উঠে থেমে গেলেন। গুহার ভিতরে হঠাৎ শব্দ জাগল ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্! কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে গুহাতল কাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে! আমরা সকলেই সবিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম। পায়ের শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে শেষটা একেবারেই মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু আবার বললেন, "বড়ই আশ্চর্য, বড়ই আশ্চর্য!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি বার বার আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?"

—"আশ্চর্য হব না, বল কি? ইক্‌টিনাইক্ আর কালো বাজের মুখে শুনলে তো, এই গুহার ভেতরে ঢোকবার আর এখান থেকে বেরুবার পথ আছে একটিমাত্র—অর্থাৎ যে-পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি আর সে-পথ আমরা নিজেরাই খুলে আবার বন্ধ করেছি! কিন্তু—"

বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছি! ঐ মানুষ বা অমানুষ বা জন্তুটা এই গুহার ভেতরে ঢুকল কেমন করে? তবে কি এখানে অন্য কোন পথ আছে? জানবার চেষ্টা করলে হয়তো সে রহস্য জানতে পারাও যাবে! কুমার, পেট্রলের লণ্ঠনটা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এস তো! মিঃ ফিলিপ! বিনয়বাবু! বন্দুক বাগিয়ে ধরে আর সবাইকে নিয়ে আপনারাও আসুন!" বলেই সে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

এইমাত্র যেখান থেকে সেই কিম্ভূতকিমাকার দানব-মূর্তিটা অদৃশ্য হয়েছিল, বিমল একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির হল।

আমি লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরতেই বিমল বলে উঠল, "যা ভেবেছি তাই! দেখ কুমার দেখ।"

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম গুহাতলে টাট্‌কা রক্তের ছড়াছড়ি!

ফিলিপ বললেন, "বেশ বোঝা যাচ্ছে, সেই মূর্তিটা আহত হয়েই এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ। দেওয়াল আর মড়াগুলোর মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে। মূর্তিটা এইখান দিয়েই পালিয়ে গিয়েছে। দেখুন, দেখুন, রক্তের দাগও একটানা গিয়েছে ঐদিকেই! আমাদেরও তাহলে আর বাজে ঘুরে মরতে হবে না—ঐ পথই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য পথ!"

রক্তরেখা ধরে বিমল আবার অগ্রসর হল—সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগ্রত ও হাতের বন্দুক উদ্যত হয়েই রইল। বাম হাতে লণ্ঠন ধরে আমিও রিভলভারটা নিলুম ডান হাতে—কি জানি, কখন, কোথায়, কোন ভয়ঙ্করের সঙ্গে আচমকা চোখাচোখি হয়ে যায়, বলা তো যায় না!

মিনিট-দশেক এইভাবে এগিয়ে গিয়ে দেখি, মড়ার সারি শেষ হয়ে গিয়েছে এবং গুহার দেওয়ালটাও মোড় ফিরে গেছে ডানদিকে। কিন্তু মোড় ফিরেই আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

পায়ের তলায় দেয়ালের গায়ে সুদীর্ঘ কার্নিশের মতন হাত দেড়েক চওড়া জায়গা, তার উপর দিয়েই আমাদের রক্ত-ছড়ানো পথ এবং তার নিচেই রয়েছে এক ভয়াল বিরাট ও অদ্ভুত গহ্বর—অন্ধকারে তার ওপারেও নজর চলে না এবং তার অদৃশ্য তলদেশ খুঁজতে গেলেও বোধহয় পাতাল-প্রবেশ ছাড়া উপায় নেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেওয়াল ঘেঁষে অতি সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলুম—একবার পা ফস্কালেই নিশ্চিত মৃত্যু!

আরো খানিকটা এগুবার পর অকস্মাৎ এক নূতন ও বিস্ময়কর অনুভূতি আমাকে যেন চাঙ্গা করে তুললে! এতক্ষণ গুহার বদ্ধ আবহের মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল, হঠাৎ গায়ে এসে লাগল কনকনে ঠাণ্ডা মুক্ত বাতাসের আনন্দময় উচ্ছ্বাস!

বিমলও অনুভব করেছিল! পুলকিত কণ্ঠে বললে, "কুমার, কুমার! এ যে বাইরের হাওয়া!"

আমি জবাব দেওয়ার আগেই শুনতে পেলুম, অমানুষিক কণ্ঠের এক ভৈরব হুঙ্কার। পরমুহূর্তেই ঠিক যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরুলো একখানা প্রকাণ্ড, রক্তাক্ত

ও হিংস্র দানবের মতন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখ—তার দুই নিষ্ঠুর চক্ষু দিয়ে ঠিকরে পড়ছে যেন আগুনের ফুলকি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
সূর্যনগর

সেই মহা-ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য মুখখানা আমাদের স্তম্ভিত চক্ষের সামনে জেগেছিল মাত্র দুই-তিন সেকেন্ড!

আচম্বিতে অমানুষিক কণ্ঠের ভৈরব হুঙ্কার শুনে আর ততোধিক অমানুষিক মুখখানা দেখে আমি এমন চমকে উঠলুম যে, আমার হাত থেকে লণ্ঠনটা আর-একটু হলেই ফসকে পড়ে যাচ্ছিল আর কি!

কিন্তু কি সতর্ক আমার বন্ধু বিমল! সে যেন যে-কোন মুহূর্তেই এই রকম বিপদের জন্যেই প্রস্তুত ছিল, কারণ মুখখানাকে আমরা ভালো করে দেখবার আগেই গর্জন করে উঠল তার হাতের বন্দুক—একবার নয়, দু'বার!

প্রচণ্ড একটা দানব-দেহ বিষম এক ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গিয়ে একেবারে পাশের বিরাট ও গভীর গহ্বরের মধ্যে—মনে হল, অতল গহ্বরের নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল যেন আর একটা জ্যান্ত, মূর্তিমান অন্ধকার!

ভগবান জানেন, সেই বিরাট গহ্বরের গভীরতা কত! কারণ প্রায় পনেরো-বিশ সেকেন্ড কাটবার পরে অনেক—অনেক নিচু থেকে উঠে এল একটা মস্ত দেহপতনের শব্দ!

ফিলিপ বললেন, "বাহাদুর বিমলবাবু, আশ্চর্য আপনার লক্ষ্য! রাক্ষসটার দেহের এমন জায়গায় গুলি লেগেছে যে, মরবার আগে ও একটা আর্তনাদ করবারও সময় পেলে না!"

আমি বললুম, "রাক্ষসটা নিশ্চয়ই এইখানে এসে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে অপেক্ষা করছিল!"

বিনয়বাবু বললেন, "তোমরা রাক্ষস-রাক্ষস করছ কেন? ও রাক্ষস নয়!"

রামহরি বললে, "ভূত! পিশাচ! দৈত্য!"

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "প্রেতমানুষ।"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "রাক্ষসও নয়, ভূত-পিশাচও নয়! প্রেতমানুষও নয়!"

ফিলিপ বললেন, "তবে?"

বিনয়বাবু মুখ খোলবার আগেই বিমল বলে উঠল, "চুলোয় যাক ও সব

বাজে কথা! কোথা থেকে বাইরের হাওয়া আসছে, আগে সেইটেই দেখা দরকার!"

এমন সময়ে আমরা সবিস্ময়ে শুনলুম, বাঘার উচ্চ কণ্ঠের উত্তেজিত চিৎকার। এ ভয়ের বা রাগের নয়, পরিপূর্ণ আনন্দের চিৎকার এবং এ চিৎকার আসছে গুহার বাহির থেকেই!

তারপরেই যেখানে দানব-মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল ঠিক সেইখানেই যেন পাথরের দেওয়াল ফুঁড়ে দেখা দিলে আমাদের বাঘা!

আমাদের দিকে চেয়ে সে দুই-তিনবার ঘেউ-ঘেউ করে ডাকলে এবং তারপরেই প্রবলভাবে লাঙ্গুল দোলাতে দোলাতে একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর তার ঘেউ-ঘেউ রব আসতে লাগল আবার বাহির থেকে! যেন সে জানাতে চায়, "কর্তা, আমি বাইরে বেরুবার পথ খুঁজে পেয়েছি—তোমরা শীগগির আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এস।"

যদি আবার কোন দানব-শত্রু আমাদের অপেক্ষায় দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, সেই ভয়ে এতক্ষণ আমরা ইতস্তত করছিলুম, কিন্তু বাঘার ব্যবহার দেখে আমাদের আর কোন ভাবনাই রইল না—আবার এগিয়ে চললুম সামনের দিকে।

বেশিদূর নয়, মাত্র দশ-বারো পদ অগ্রসর হয়েই সানন্দে দেখলুম, পাশের দিকে পাহাড়ের দেওয়ালে মস্ত একটা ফাটল এবং তারই মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে লক্ষ তারকার চকমকি-জ্বালানো কালো আকাশের খানিকটা! সেই ফাটল দিয়েই গুহার ভিতরে হু-হু করে প্রবেশ করছে শীতল বাতাসের উচ্ছ্বাস।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "এ ফাটলের কথা আমরা কেউ জানতুম না। এই সেদিন এখানে ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে, হয়তো এটা তারই কীর্তি।"

ফাটলের জন্ম-বিবরণ নিয়ে আমরা কেউ আর মাথা ঘামালুম না, ফাটলটা যে এখন এখানে আছে আমাদের পক্ষে তাইই যথেষ্ট! সকলে একে একে সেই বিচিত্র সমাধি-গুহার বিপুল গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালুম মুক্ত বাতাসের এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যেই যেন চারিদিক থেকে ছুটে এল অরণ্যের মর্মর কলরব! একটা ঝরনার ঝর্ঝর-তানও শুনতে পেলুম—কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না, সবদিকেই ঘুট্‌ঘুট্ করছে দারুণ অন্ধকার।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "আমরা কোথায় এসেচি, আমি সেটা অন্দাজ করতে পারছি। বিদেশী, পাহাড়ের গা এখান থেকে সমান ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। অন্ধকারে আর পথচলা নয়—এইখানে বসেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতে হবে।"

ঊষার আলোকোৎসবে গান গাইতে লাগল পাখির দল, পুলক-রোমাঞ্চ জাগিয়ে বনে-বনে দুলতে লাগল সরস শ্যামলতা এবং আকাশ তার কালো শাড়ি বদলে পরলে আবার উজ্জ্বল নীলাম্বরীখানি।

আর আমাদের পায়ের তলায় এ কি অভাবিত অদ্ভুত দৃশ্য! আমরা সবাই তাকিয়ে রইলুম, অভিভূতের মতো।

কেমন করে সে দৃশ্য বর্ণনা করব, বুঝতে পারছি না। সার্কাসের গ্যালারি যেমন মণ্ডলাকারে চারিদিক জুড়ে নেমে আসে, এখানেও তেমনি মাইল তিন-চার জায়গা জুড়ে চতুর্দিক থেকেই পর্বতের প্রাচীর ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে একটি চক্রাকার সমতল জমির দিকে। সেই গোল জমির আয়তন দেড় কি দুই মাইলের মধ্যেই এবং সেইখানেই রয়েছে ছবির মতন চমৎকার শহর! উচ্চ মন্দির ও প্রাসাদ, সিংহদ্বার, ছোট-বড়-মাঝারি সারি সারি বাড়ি ও রাজপথ এবং এখানে ওখানে নীল সরোবর ও ফুলে ফুলে রঙিন উদ্যান—কিছুই আমাদের নজর এড়াল না।

ইক্‌টিনাইক্ হঠাৎ ভাবাভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "বিদেশী, পৃথিবীর বুকের ভিতর লুকিয়ে-রাখা এই আমাদের আদরের সূর্যনগরী! পূর্বপর্বতের উপরে ঐ দেখ গিরি-সঙ্কট! ওরই মধ্য দিয়ে সূর্যনগরে যাতায়াত করবার জন্যে আছে একটিমাত্র পথ, আর ওরই মধ্য দিয়ে প্রভাতের প্রথম সূর্যের সোনালী কিরণ এসে নগরের সূর্য-দেউলের সোনার গম্বুজে জ্বেলে দেয় বিদ্যুৎ-আগুনের পতাকা! তারপর দুপুরে সূর্য যখন পূর্ণ-মহিমায় জাগেন মাঝ-গগনে, তখন চারিদিকের এই ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে নগরের উপরে গড়িয়ে পড়তে থাকে আলোক দেবতার আশীর্বাদের মতন প্রখর রৌদ্রের প্রবল বন্যা—সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে জেগে ওঠে স্বর্ণ-ঘণ্টার ছন্দে ছন্দে দামামার পর দামামা আর পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্রগান! সেই সময়েই সূর্যনগরীর সমস্ত সন্তান প্রধান মন্দিরের প্রাঙ্গণে একত্রে নতজানু হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করে—'হে দিবাকর! হে সৃষ্টির প্রথম অগ্নিপুঞ্জ! হে চিরজাগ্রত জ্যোতির্ময় মহাদেবতা! আমাদের অন্ধকার বর্তমানকে আবার তুমি আলোকিত কর—ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো আবার আমাদের অতুলনীয় অতীতের নিখিল গরিমা, বিপুল মহিমা!' হায় বিদেশী, এ উপাসনায় যোগ দেবার সৌভাগ্য আর আমার হবে না!"

ফিলিপ বললেন, "কেন ইক্‌টিনাইক্, তোমার এতটা হতাশ হবার তো কোন কারণই নেই!"

গলদশ্রুলোচনে দুঃখের হাসি হেসে ইক্‌টিনাইক্‌ বললে, "বিদেশী, তুমি কি বুঝতে পারছ না, সূর্যনগর আর আমার মতন বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দেবে না? এখন থেকে আমাকে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হবে?"

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

ইক্‌টিনাইক্‌ চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কিন্তু তোমাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা আমি পালন করব। চল, তোমাদের সূর্যনগরে নিয়ে যাই!"

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু সেটা কি নিরাপদ হবে?"

—"হ্যাঁ, আপাতত বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। শহরে লোক থাকে মোটে তিন হাজার। তার মধ্যে যারা যোদ্ধা আর সক্ষম, তারা সবাই গিয়েছে তোমাদের খোঁজে। তারা এখনো বসে আছে সমাধি-গুহার পথ আগলে। তারা গুহা থেকে বেরুবার নতুন পথের খবর জানে না। শহরের ভিতরে আছে খালি বৃদ্ধ, শিশু, বালক আর নারীর দল। জনকয় প্রহরীও আছে, কিন্তু তাদেরও তোমরা নিরস্ত্র বলে মনে করতে পারো।"

—"কেন?"

—"তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যা-কিছু নতুন বা আধুনিক, যা-কিছু বিদেশী, তা নিয়ে কেউ সূর্যনগরে ঢুকতে পারে না। তোমাদের ঐ অটোমেটিক বন্দুক আর রিভলভার দেখলে প্রহরীরা নিশ্চয়ই বাধা দিতে সাহস করবে না।...এস, আর দেরি করো না, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গুপ্তচর আছে, যোদ্ধারা খবর পেলে আর রক্ষে নেই!"

সকলের সঙ্গে নিচের দিকে নামতে নামতে ফিলিপ বললেন, "যোদ্ধারাও কি বন্দুক নিয়ে নগরের ভিতরে ঢুকতে পারে না?"

ইক্‌টিনাইক্‌ বললে, "না। শহরের বাইরে আছে অস্ত্রশালা। সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র সেইখানে জমা রাখা হয়। শহরের ভিতরে যোদ্ধাদের হাতে থাকে কেবল বর্শা, কুঠার, তরবারি আর ধনুকবাণ। সংখ্যায় তার দেড় হাজারের কাছাকাছি। সুতরাং তারা যদি দল বেঁধে আক্রমণ করে, তোমাদের চার-পাঁচটা বন্দুক তাদের ঠেকাতে পারবে না। আশার কথা এই যে, সেই যোদ্ধার দল এখন শহরের ভিতরে নেই।"

প্রায় দুই হাজার ফুট নিচে রয়েছে সূর্যনগর। নামতে নামতে প্রধান সূর্যমন্দিরের রৌদ্রোজ্জ্বল সোনার গম্বুজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল বারংবার। যে দেবতার মন্দিরের এতবড় গম্বুজ সোনায় মোড়া, না জানি তাঁর ভাণ্ডারে জমা আছে কত আশ্চর্য ঐশ্বর্য! স্পেনীয় দস্যুদের হাতছাড়া হয়ে ইন্‌কাদের গুপ্তধনও নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরের ভেতরেই প্রবেশ করেছে!....এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে

আমরা যখন পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে গিয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ তীব্র এক তূর্যধ্বনিতে চারিদিক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল!

সচমকে অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে ইক্‌টিনাইক্ বললে, "সর্বনাশ!"

—"কি ইক্‌টিনাইক্?"

—"তূর্যধ্বনি করে যোদ্ধাদের কাছে খবর পাঠানো হল শত্রু এসেছে নগর-দ্বারে!"

আবার তূর্যধ্বনি হল—আবার, আবার! তারপরেই দূরে জাগল কালকের মতন সেই দামামা-ধ্বনি—শত শত দামামা একই স্বরে সেই একই কথা বলছে—'মারো মারো, শত্রু মারো। মারো মারো, শত্রু মারো!'

ফিলিপ বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, এখন আমরা কি করব?"

—"এক উপায় আছে, উপরে উঠে আবার সেই গুহার ভিতরে গিয়ে ঢোকা। কিন্তু তার আগেই হয়তো যোদ্ধারা এসে আমাদের দেখে ফেলবে। এখানে তারাও বন্দুক ব্যবহার করবে, আমরা তাদের বাধা দিতে পারব না।"

ইক্‌টিনাইক্ স্তব্ধ হয়ে কি ভাবতে লাগল। ইতিমধ্যে আমরা বেশ বুঝতে পারলুম যে, দামামাগুলোর ঐকতান খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে! বলতে বাধা নেই, প্রাণের আশা আমি একরকম ছেড়েই দিলুম!

ইক্‌টিনাইক্ হঠাৎ বলে উঠল, "বিদেশী, চল চল—শহরের দিকে চল!"

—"শহরের দিকে!"

—"হ্যাঁ, শহরের ভেতরে ওরা বন্দুক ব্যবহার করতে পারবে না। সেটা তবু মন্দের ভালো!"

—"কিন্তু তারপর?"

—"তার পরের কথা তার পরেই ভাবলে চলবে। এখানে দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। ঐ দেখ!"

পাহাড়ের শিখরের উপরে এর মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে একদল যোদ্ধা! অত উঁচু থেকে তাদের দেখাচ্ছে কতকগুলো ছোট ছোট অতিব্যস্ত চলন্ত পুতুলের মতো! প্রথম দল বেগে আমাদের দিকেই নামতে লাগল এবং তারপরেই পাহাড়ের টঙে দেখা দিলে নূতন আর একদল যোদ্ধা! বার কয়েক বন্দুকের গর্জনও শুনলুম, কিন্তু গুলিগুলো আমাদের কাছ পর্যন্ত এল না—বোধ হয় ওরা এখনো আমাদের দেখতে পায়নি!

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "এস আমার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে এক কথা।"

—"কি?"

—"আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারি, কিন্তু আমি বিধর্মী নই। সূর্যনগরে যাবার আগে তোমাদের এক প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

—"কি প্রতিজ্ঞা?"

—"সূর্যনগরে গিয়ে তোমরা যদি রক্ষা পাও, তাহলে তার গুপ্তধনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

ফিলিপ ইতস্তত করতে লাগলেন।

—"শীঘ্র প্রতিজ্ঞা কর। ঐ দেখ, শত্রুরা ক্রমেই কাছে এসে পড়ছে!"

ফিলিপ আমাদের দিকে ফিরে সব কথা বুঝিয়ে দিলেন।

বিমল বললে, "মিঃ ফিলিপ, আসবার আগেই তো আপনাকে বলেছিলুম, আমরা গুপ্তধনের খোঁজে বিপদকে বরণ করিনি। আমরা চেয়েছিলুম নূতন অভিযানে বেরুতে, জীবনের নিশ্চেষ্টতা দূর করতে, নূতন বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হতে। আমাদের সেই ইচ্ছা সফল হয়েছে। কেন আমরা এদের গুপ্তধন হরণ করব? আমরা কি দস্যু?"

ফিলিপ বললেন, "সাধু বিমলবাবু, সাধু! তাহলে আমারও ঐ কথা!"

ইক্‌টিনাইক্ অধীরভাবে বললে, "বল বিদেশী, বল! তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করবে না?"

ফিলিপ বললেন, 'ইক্‌টিনাইক্, প্রতিজ্ঞা করছি আমরা, গুপ্তধনের দিকে দৃষ্টিপাত করব না!"

ইক্‌টিনাইক্ নিচের দিকে নামতে নামতে বললে, "চল তবে সূর্যনগরে!"

আরো শ'-দুয়েক ফুট নিচে নেমেই সমতল জমির উপরে এসে পড়লুম।

সামনেই নগর-তোরণ। সেখানে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়েছিল, তাদের মুখের ভাব দেখেই বুঝলুম, আমাদের এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাবে তারা একেবারেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছে!

প্রহরীদের হতভম্ব-ভাবটা কাটতে না কাটতেই আমরা বাঘের মতন তাদের উপরে লাফিয়ে পড়লুম—বন্দুকের কুঁদোর দুই-এক ঘা খেয়েই তারা আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল।

ওদিকে এতক্ষণ পরে পাহাড়ের উপর থেকে যোদ্ধারাও আমাদের আবিষ্কার করে ফেলেছে। তারা ঘন ঘন বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু অত উঁচু থেকে দ্রুতপদে নামতে নামতে তারা বোধহয় লক্ষ্য স্থির করতে পারলে না—নগরপ্রান্তের রাজপথের উপরে এসে জড়ো হয়েছিল যে কৌতূহলী ও বিস্মিত জনতা, গুলিগুলো সোজা গিয়ে পড়ল তার ভিতরেই! স্বপক্ষের গুলিতেই হত বা আহত হয়ে পাঁচ-

ছয়জন লোক মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। তাদের কৌতূহল তখনি ঠাণ্ডা হয়ে গেল—দেখতে দেখতে সেই বিপুল জনতা অদৃশ্য! ইক্‌টিনাইক্ ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে, বৃদ্ধ, বালক, শিশু আর নারীর জনতা—এর মধ্যে একজনও যুবক নেই।

নগর-তোরণের আড়াল থেকে উঁকি মেরে আমরা দেখলুম, পূর্বদিকের পর্বত-পৃষ্ঠের যেখানেই তাকানো যায়, সেইখানেই চোখে পড়ে দলে দলে সশস্ত্র যোদ্ধার মূর্তি—নানারকম অস্ত্র আস্ফালন ও বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে তারা নিচের দিকে নেমে আসছে ঝড়ের মতো!

ফিলিপ ব্যগ্রস্বরে বললেন, "ইক্‌টিনাইক্, ওরা যে এসে পড়ল!"

কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে ইক্‌টিনাইক্ পাথরের মূর্তির মতন সেইখানে দাঁড়িয়ে মগ্ন হল আবার গভীর চিন্তায়!

ফিলিপ বললেন, "কি বিপদ! তাহলে কি আমাদের এখানেই দাঁড়িয়ে দেড় হাজার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?"

বিমল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্মিত স্বরে বললে, "চেয়ে দেখ কুমার, চেয়ে দেখ!"

—"কি?"

—"কালো বাজ!"

তাই তো, কালো বাজই তো! সে তাহলে মরেনি! পাহাড়ের সবচেয়ে নিচে এসে পড়েছে যে যোদ্ধার দল তারই সামনে সকলকার মাথার উপরে মাথা জাগিয়ে কালো বাজের দানবের মতন বিপুল দেহ লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে! তার মুখের একপাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা—বিমলের বন্দুকের কীর্তি।

তারপর ইক্‌টিনাইকের ধ্যানভঙ্গ হল। অত্যন্ত কাতর ও শ্রান্ত স্বরে সে বললে, "বিদেশী, নরপিশাচ কালো বাজ এখনো যখন বেঁচে আছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়েই চরম উপায় অবলম্বন করতে হবে।"

—"চরম উপায়?"

—"হ্যাঁ, চরম উপায়। সামনেই ঐ দেখ পবিত্র সূর্যমন্দির। একমাত্র বাঁচবার উপায় আছে ওর মধ্যেই। ভেবেছিলুম বিদেশীদের স্পর্শে ও-মন্দির কলঙ্কিত করব না।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল"—বলতে বলতে ইক্‌টিনাইক্ ছুটে চলল, আমরাও তার অনুসরণ করলুম।

নীলাকাশে সোনার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট সূর্যমন্দির—চারিদিকে তার প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল। ইক্‌টিনাইকের সঙ্গে সঙ্গে তোরণ পেরিয়ে শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে বার বার বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমরা মন্দিরের অঙ্গনে

গিয়ে পড়লুম। ঝড়ের মুখে উড়ে যায় যেমন শুকনো পাতার রাশি—বিস্মিত, চমকিত ও ভীত পুরোহিত ও অন্যান্য লোকরাও তেমনি আমাদের সুমুখ থেকে প্রাণপণে পালিয়ে কে যে কোথায় অদৃশ্য হল, বোঝা গেল না!

মস্ত অঙ্গনের পর প্রধান মন্দিরের বিস্তৃত সোপানশ্রেণী। দ্রুতপদে তার উপর দিয়ে উঠছি, হঠাৎ অভাবিত কণ্ঠের এক সঙ্গীত-ধ্বনি শুনে আমরা সবাই চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

উচ্চস্বরে গান হচ্ছে :

"জয়যাত্রার রথ ছুটেছে
দূর অজানার মন্তরে!
যা তুই ভীতু, আতুর মুখে
করিস নে হা-হন্ত রে!
রথ ছুটেছে উল্কাবেগে,
স্থবির জীবন উঠছে জেগে,
কালবোশেখীর তুফানে মোর
চিত্ত যে তাই সন্তরে!"

বিনয়বাবু চিৎকার করে বললেন, "মৃণু, মৃণু, আমার মৃণু!"

গান থামল না, সমানে চলল—

"রথ ছুটেছে—রথ ছুটেছে! শব্দে কাঁপে শৈলচুড়ো,
রথ ছুটেছে—চাকার তলায় ভয় ভীরুতা ধুলোয় গুঁড়ো!
রক্তে ফোটে রক্তজবা,
দেখছে চেয়ে বিশ্বসভা,
সারথি হয় বিপদ-রথের
কে সে ভাগ্যবন্ত রে—
জয়যাত্রার রথ ছুটেছে
দূর অজানার মন্তরে!"

"মৃণু, মৃণু" বলে পাগলের মতো চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বিনয়বাবু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে পিছনে জাগল ভীষণ কোলাহল।

ফিরে দেখি, মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে অঙ্গনের ভিতরে বেগে প্রবেশ করলে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো কালো বাজ এবং তার পিছনে পিছনে যোদ্ধার পর যোদ্ধার দল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
প্রেতমানুষ কারা

—"মৃণু, আমার মৃণু!"

মৃণুর গান থেমে গেল।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "বিদেশী, শীগগির সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়!"

আমরা যখন সবাই ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম, ইক্‌টিনাইক্ বললে, "এখন এই দরজাটা বন্ধ করতে হবে।"

মস্তবড় দরজা—প্রায় ষোলো ফুট উঁচু ও আট ফুট চওড়া। লোহার পুরু পাল্লা—যেমন ভারি, তেমনি দুর্ভেদ্য! এ দরজা বন্ধ করতে হলে অন্তত কয়েকজন লোকের দরকার!

ইতিমধ্যে সামনে এসে আবির্ভূত হল কালো বাজের বিভীষণ মূর্তি! কিন্তু বিমল তাকে এক মুহূর্ত দাঁড়াতেও দিলে না, হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় করলে এমন প্রচণ্ড আঘাত, যে মূল-কাটা কলাগাছের মতো তখনি দড়াম্ করে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর নড়ল না—একটা টুঁ-শব্দও করলে না।

পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল যে যোদ্ধার দল, আমরা বারকয়েক 'অটোমেটিক রাইফেল' ছুঁড়তেই তারা আবার চোখের আড়ালে সরে পড়ল কে কোথায়! অঙ্গনে পড়ে ছটফট করতে লাগল কেবল কয়েকজন আহত।

তারপর আমরা সবাই মিলে মন্দিরের সেই প্রকাণ্ড দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলুম।

বন্ধ দরজার উপরে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইক্‌টিনাইক্ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আর আমাদের ভয় নেই। মূল মন্দিরে ঢোকবার এই একটিমাত্র দরজা!"

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা প্রকাণ্ড ছাদ-ঢাকা সুদীর্ঘ পথের মতো—চারিদিকেই তার উঁচু পাথরের দেওয়াল। তার ভিতরে সর্বত্রই আলো-আঁধারির লীলা!

বিনয়বাবু আবার চিৎকার করলেন—"মৃণু, মৃণু! তুমি কোথায় আছ? সাড়া দাও!"

পথের অপর প্রান্ত দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে মৃণু! মুখে তার মধুর হাসি; পরনে তার রেড-ইন্ডিয়ান নারীদের মতন বর্ণোজ্জ্বল পোশাক; গলায়, হাতে জ্বলছে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার!

বিনয়বাবু ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকের ভিতরে টেনে নিলেন। তারপর কেঁদে ফেললেন আনন্দের আবেগে।

মৃণু আদর করে বাপের চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললে, "বাবা, তুমি কাঁদছ কেন, আমি তো কোন বিপদেই পড়িনি—এরা আমাকে খুব সুখেই রেখেছিল! এ অ্যাডভেঞ্চার আমার ভারি ভালো লেগেছে!"

বিনয়বাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তুই জানিস না মা, কত-বড় দুর্ভাগ্য ঝুলছিল তোর মাথার উপরে।"

—"দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য?"

—"এরা এখানকার ইন্‌কার সঙ্গে জোর করে তোর বিয়ে দিত!"

—"তাই নাকি বাবা, তাই নাকি? আমি হতুম ইন্‌কার ইন্‌কী? আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি একবার প্রাণ ভরে হেসে নি! হাসতে হাসতে মাটির ওপরে গড়িয়ে পড়ি।"

এমন সময়ে বাহির থেকে মন্দিরের লোহার দরজার উপরে দুম্ দুম্ করে আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ইক্‌টিনাইক্ বললে, "ওরা যতই ধাক্কা মারুক আর যতই চেষ্টা করুক, এ দরজা খুলবে না। এ হচ্ছে পাহাড়ের মতন অটল!"

ফিলিপ বললেন, "সবই তো বুঝলুম। কিন্তু আমরা তো চিরদিন এই মন্দিরের ভিতরে বন্দী হয়ে থাকতে পারব না!"

ইক্‌টিনাইক্ এতক্ষণ পরে হেসে বললে, "বিদেশী, বন্দী হব বলে তো এ মন্দিরের ভিতরে আসিনি!"

—"তোমার কথার মানে কি ইক্‌টিনাইক্?"

—"মন্দির থেকে বেরুবার জন্যে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ আছে!"

—"সুড়ঙ্গ-পথ!"

—"হ্যাঁ! সে পথের সন্ধান জানে কেবল পুরোহিতরা। এতক্ষণ তোমাকে বলিনি, আমিও এ মন্দিরের এক পুরোহিতের ছেলে। যদি কখনো অর্থলোভী শ্বেতাঙ্গরা সন্ধান পেয়ে এই মন্দির আক্রমণ করে, তাহলে গুপ্তধন নিয়ে পালাবার জন্যে এই সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।"

—"তুমি এই সুড়ঙ্গের সন্ধান জানো?"

—"জানি। মাটির ভিতর দিয়ে এই সুড়ঙ্গ এক মাইল গিয়ে এক পাহাড়ের গুহার সামনে শেষ হয়েছে।"

—"তাহলে চল ইক্‌টিনাইক্, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

—"কিন্তু বিদেশী—"

—"বল, থামলে কেন?"

—"সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে, যে পথ দিয়ে এসেছি আবার আমাদের সেই পথেই ফিরতে হবে।"

—"বেশ তো, তাই ফিরব।"

—"কিন্তু দলে আমরা হালকা। লাল-মানুষদের ফাঁকি দিলেও প্রেতমানুষদের আবার ফাঁকি দিতে পারব কি?"

—"তোমার ঐ প্রেতমানুষদের আমরা ভয় করি না।"

—"তোমরা কর না, কিন্তু তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আমাকে তো আবার এই পথ দিয়েই একলা ফিরতে হবে?"

—"ইক্‌টিনাইক্ অবোধের মতন কথা বোলো না। বুঝে দেখ, এদেশে আর তোমার ফেরবার উপায় নেই!"

—"তবে আমি কি করব?"

—"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। আমরা চিরদিন তোমাকে বন্ধুর মতন দেখব। নতুন দেশে গিয়ে তুমি নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করবে।"

ইক্‌টিনাইক্ মাথা হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

ফিলিপ সাহেব তখন আমাদের দিকে ফিরে সব কথা বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনে বিনয়বাবু বললেন, "মিঃ ফিলিপ, ইক্‌টিনাইক্‌কে প্রেতমানুষ নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করে দিন। ওকে বলুন, প্রেতমানুষরা প্রেতও নয়, মানুষও নয়।"

ফিলিপ বললেন, "কি আশ্চর্য, তবে তারা কি?"

—"বনমানুষ।"

আমি বললুম, "বনমানুষ বলতে আমরা বুঝি কেবল ওরাংউটান কি গরিলা। কিন্তু ওরাঙের স্বদেশ মালয়দ্বীপে আর গরিলার স্বদেশ হচ্ছে আফ্রিকায়। দক্ষিণ আমেরিকায় গরিলা কি ওরাঙের জন্ম অসম্ভব।"

বিনয়বাবু বললেন, "ঠিক। কিন্তু এখানে অন্য জাতের এক বৃহৎ বনমানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনো তাদের নামকরণ হয়নি—তবে তারা গরিলাও নয়, ওরাংও নয়।"

—"আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে?"

—"আছে বৈকি! Hammerton সাহেবের "Wonders of Animal Life" নামে বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে ১৫০৩ পৃষ্ঠায় এই জাতের বনমানুষের ছবি আমি

তোমায় দেখাতে পারি। কিছুদিন আগে একদল জীবতত্ত্ববিদ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে অভিযানে বেরিয়ে টারা নদীর ধারে এই জাতের দুটি বনমানুষের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাদের একটিকে তাঁরা গুলি করে মারতে পেরেছিলেন। লাল-মানুষরা নিশ্চয়ই তাদেরই প্রেতমানুষ বলে ভ্রম করে।"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "যাক, প্রেতমানুষের দুঃস্বপ্ন তাহলে ছুটে গেল। এখন তবে উদ্ধারলাভের চেষ্টা দেখা যাক!"

মৃণু বললে, 'সে কি! বিমলদা, তোমরা ইন্‌কাদের গুপ্তধন দেখবে না? চল, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। সে ঘর আমি স্বচক্ষে দেখেছি। একদিকে তার কড়িকাঠ-সমান উঁচু সোনার তালের স্তূপ, আর-একদিকে চারটে মস্ত মস্ত সিন্দুক-ভরা হীরে পান্না চুনি মুক্তো! আলিবাবার রত্নগুহাও তার কাছে হার মানে!"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "না মৃণু, আমরা ইক্‌টিনাইকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, ইন্‌কাদের গুপ্তধনের দিকে দৃষ্টিপাতও করব না। কি ছার সোনা-রুপো, কি ছার মণি-মুক্তো! আজ তুমি বিপুল বিশ্বে বেরিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে, এর সঙ্গে কি সোনাদানা মণিমুক্তোর তুলনা হয় মৃণু?"

ফিলিপ বললেন, "ইক্‌টিনাইক্ আমরা প্রস্তুত! এখন পথ দেখাও।"

ইক্‌টিনাইক্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চলুন তবে!"

আমরা সবাই একদিকে অগ্রসর হলুম। মৃণু গান ধরল—

"ইন্‌কা যদি করত আমায় ইন্‌কী রে!
চক্ষে তবে জ্বলত আমার
অগ্নিরাগের ফিন্‌কি রে!
এক চড়ে তার ঘুরত মাথা,
কুঁচকে যেত বুকের ছাতা,
ভাবত বোকা—'এমনি ভাবেই
কাট্‌বে আমার দিন কি রে.,—
এ যে বিষম ইন্‌কী রে!"

মৃণুর গান শুনেই বাঘা উপরদিকে মুখ তুলে শেয়ালের মতন স্বরে চিৎকার শুরু করলে—"ঔ, ঔ, ঔ—উ-উ-উ-উ!" আমাদের বাঘা মোটেই সঙ্গীত-কলার ভক্ত নয়। গান কি বাজনা শুনলেই তার মনে করুণ রসের সঞ্চার হয়।

প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ

বিমল ও কুমার তো তোমাদের অনেকদিনের বন্ধু; কিন্তু তোমরা বোধহয় এটা জানো না, তারা দুজনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এক তিথিতে এবং একই দিনে।

আজ মাসের পয়লা। এই মাসের আটাশ তারিখে তাদের দুজনের জন্মতিথি। তাদের প্রত্যেক জন্মতিথিতেই বিশেষ একটি অনুষ্ঠান হয়। এবারকার উৎসবে কি করা কর্তব্য, সেদিন সকালের চায়ের আসরে বসে গভীরভাবে চলছিল তারই আলোচনা।

জয়ন্ত এবং মানিক বোধহয় তোমাদের কাছে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তারা বিমলদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, সেদিনও এসেছিল। আর সুন্দরবাবুর কথা তো বলাই বাহুল্য; কারণ, এখানকার প্রভাতী চায়ের বৈঠকে কোন দিনই তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায় না। সুতরাং বলতে হবে আজকের চায়ের আসরটি জমে উঠেছিল রীতিমতো।

এমনকি বাঘা কুকুরও হাজিরা দিতে ভোলেনি। সেও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে দুই কান তুলে ঊর্ধ্বমুখে অত্যন্ত উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ছিল চায়ের টেবিলের দিকে। সে বেশ জানে, টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা-সেটা কিছু কিছু অংশ তারও দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

মাঝে মাঝে রামহরি খাবারের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে ঢুকে সকলকে পরিবেশন করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু একখানা গোটা স্যান্ডউইচ্ নিজের মস্ত মুখ-বিবরে ছেড়ে দিয়ে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "বিমল ভায়া, তোমাদের প্রতি জন্মতিথিতেই তো আমরা এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে যাই; কিন্তু এবারকার খাদ্য-তালিকার ভিতরে আমার একটি বিনীত প্রার্থনা ঠাঁই পাবে কি?"

সুন্দরবাবুকে জ্বালাবার কোন সুযোগই মানিক ত্যাগ করে না। সে বললে, "আপনার বিনীত প্রার্থনাটি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ? হয়তো বলে বসবেন, আমি কাঁঠালের আমসত্ত্ব খাবো।"

সুন্দরবাবু স-টাক মাথা নেড়ে বললেন, "না কক্‌খনো নয়, অমন অসম্ভব আবদার আমি করবো না। ফাজিল ছোকরা কোথাকার, আমায় কি কচি খোকা পেয়েছ?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের জন্মদিন আসতে না আসতেই চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ তোলা কেন? মানিকবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে আর বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না, ওঁর যা বলবার আছে উনি বলুন।"

সুন্দরবাবু মানিকের দুষ্টুমি-ভরা হাসির দিকে একবার সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে

বললেন, "আমার কথাটা কি জানেন কুমারবাবু? এবারে আপনাদের জন্মতিথির খাদ্য-তালিকায় কিঞ্চিৎ নূতনত্ব সৃষ্টি করলে কেমন হয়?"

—"কি রকম নূতনত্ব সুন্দরবাবু?"

—"দেখুন কুমারবাবু, চিরদিনই শুনে আসছি বন-মুরগির মাংস নাকি একটি উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, আজ পর্যন্ত আমার খাবারের থালায় বন-মুরগির আবির্ভাব হল না কখনও। আপনাদের জন্মতিথির দৌলতে যদি সেই সৌভাগ্যটা লাভ করতে পারি, তাহলে আমার একটি অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ হয়।"

মানিক বললে, "দেখছো তো জয়ন্ত, সুন্দরবাবুর আবদারটি কতদূর অসংগত!"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন, "কেন, অসংগত কেন? আমি কি কাঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে চাইছি? বন-মুরগি কি দুনিয়ায় পাওয়া যায় না?"

মানিক বললে, "দুনিয়ায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু কলকাতার শহরে পাওয়া যায় না। আপনার বন-মুরগির জন্যে বিমলবাবুরা বনবাস করবেন নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "অভাবে কলকাতার ফাউল হলে কি চলবে না? সুন্দরবাবু কি বলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই। আরজি পেশ করলুম এখন বিমলবাবুদের যা মর্জি হয়।"

কুমার চোঁ করে শেষ চাটুকু পান করে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "তথাস্তু, সুন্দরবাবু, তথাস্তু! আমাদের আসছে জন্মবারে আপনাকে বন-মুরগির মাংস খাওয়াবোই, খাওয়াবো!"

বিমল একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "কুমার, তুমি যে একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলে হে! কলকাতার কোন বাজারে বন-মুরগি বিক্রি হয় নাকি?"

কুমার বললে, "মোটেই না!"

—"তবে?"

—"আমার বন্ধু বিনোদলাল রায় চৌধুরী হচ্ছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার। তিনি প্রায়ই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। তুমি জানো বোধহয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনে ঝাঁকে ঝাঁকে বন-মুরগি পাওয়া যায়! মনে করছি, কালই আমি দিন-কয়েকের জন্য চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।"

মানিক বললে, "সে কি কুমারবাবু, সুন্দরবাবুর একটা আবদার রক্ষা করবার জন্যে আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করবেন?"

—"না মানিকবাবু, কেবল সুন্দরবাবু কেন, আমি আপনাদের সকলেরই তৃপ্তি সাধনের জন্যে চট্টগ্রামে যেতে চাই। জন্মতিথিতে বন্ধুদের যদি একটি নতুন জিনিস খাওয়াতে না পারি, তা হলে জন্মতিথির আর সার্থকতা রইল কোথায়? আমি কালই চট্টগ্রামের দিকে ধাবমান হবো। তারপর সেখানকার বন থেকে ডজন-খানেক জাত্ বন-মুরগি সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসবো আমাদের কলকাতায়।"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার 'বিনীত প্রার্থনা' তা হলে পূর্ণ হল। এইবারে

আপনি পরমানন্দে অট্টহাস্য করতে পারেন।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত খাপ্‌পা হয়ে কেবল বললেন, "হুম্‌।"

*　　*　　*　　*

চট্টগ্রাম থেকে কুমারের ফেরবার কথা ছিল বিশ তারিখে।

কিন্তু ঠিক তার আগের দিনে কুমারের কাছ থেকে বিমল এই টেলিগ্রাম পেলে, "বন-মুরগি পেয়েছি; কিন্তু আসছে কাল কলকাতায় পৌঁছুতে পারব না। বিশেষ কারণে আমাকে আরও দিন-কয়েক এখানে থেকে যেতে হবে। এ জন্যে যদি আমাদের জন্মতিথি-উৎসব মাটি হয়, উপায় নেই।"

টেলিগ্রামখানি হাতে করে বিমল বিস্মিত মনে ভাবতে লাগল, কুমারের বিশেষ কারণটা কী হতে পারে? নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ কারণ নয় যার জন্যে বন-মুরগি পেয়েও সে যথাসময়ে এখানে আসতে নারাজ!

তেইশ তারিখে কুমারের আর একখানা টেলিগ্রাম এলো। সেখানি পড়ে বিমল জানতে পারলে, চব্বিশ তারিখের সকালে সে কলকাতা এসে পৌঁছবে।

কুমার একটি রীতিমতো রহস্যপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল। সেই জন্য বৈঠকখানায় তার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল বিমল, জয়ন্ত ও মানিক।

খানিক পরে রাস্তায় দরজার কাছে একখানা গাড়ি আসবার শব্দ হল। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে কুমার। জয়ন্ত বললে, "কুমারবাবু, আপনার টেলিগ্রামে যা দেখেছি, আপনার মুখেও দেখছি তাই।"

—"আমার মুখে কি দেখছেন জয়ন্তবাবু?"

—"রহস্যের আভাস।"

হাতের বন্দুকটা একটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কুমার বললে, "হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আপনি ভুল দেখেননি। যা-তা রহস্য নয়—যাকে বলে একেবারে গভীর রহস্য; কিন্তু সে কথা পরে বলছি, আগে বন-মুরগিগুলোর একটা ব্যবস্থা করি।...রামহরি, ও রামহরি!"

পাশের ঘর থেকে সাড়া এলো, "কি বলছো গো কুমারবাবু?"

—"গাড়ির চালে এক ঝাঁকা জ্যান্ত রামপাখি আছে। তুমি সেগুলোকে বাগানে মুরগি-ঘরে রেখে এসো। তারপর তাড়াতাড়ি আমার জন্যে খুব গরম এক পেয়ালা চা বানিয়ে দাও।"

কুমার নিজের কোটটা খুলে একখানা সোফার উপরে নিক্ষেপ করলে। তারপর নিজেও সেখানে বসে পড়ে বলল, "বিমল, অদ্ভুত ব্যাপার—একেবারে অভাবিত!"

বিমল বললে, "তোমার মুখ থেকে শুনছি বলেই ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে বিশ্বাস করছি। পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে সব ব্যাপারকে অদ্ভুত বলে মনে করে, তার মধ্যে আমি কিছুমাত্র অদ্ভুতত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু তোমার-আমার কথা স্বতন্ত্র। এই জীবনেই আমরা এমন সব অসাধারণ ব্যাপার দেখেছি যে, আমাদের কাছে বোধহয় অদ্ভুত বলে আর কিছুই থাকতে পারে না। কাজেই তুমি যা অদ্ভুত আর অভাবিত বলে বর্ণনা করবে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে দস্তুরমতো অসাধারণত্ব আছে। আমরা প্রস্তুত, আরম্ভ করো তোমার অদ্ভুত কাহিনী।"

কুমার সোফার উপর একটু সোজা হয়ে বসলো। গল্প শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বিশাল হলঘর একেবারে নিস্তব্ধ!

দুই

কুমার শুরু করলে ঃ "কেমন করে আমি জ্যান্ত বন-মুরগি সংগ্রহ করলুম সে কথা শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদের আগ্রহ নেই। সুতরাং এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, চট্টগ্রাম-বিভাগে একটা পাহাড়-অঞ্চলের বনের ভিতরে গিয়ে এই পক্ষীগুলোকে আমি বন্দী করেছি। অবশ্য এই কাজে আমার জমিদার-বন্ধু বিনোদলাল আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

ফেরবার সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে আসছিলুম। সমুদ্র থেকে মাইল-দশেক তফাতে চাকারিয়া নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে বিনোদের কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তাদের কয়েকজন বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। লক্ষ্য করে দেখলুম, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। তারা জানালে, একটা নর-খাদক জন্তু এসে তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করছে। ইতিমধ্যে অনেক গরু ও ছাগল তো অদৃশ্য হয়েছেই, তার উপরে জন-পাঁচেক মানুষকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, 'জন্তুটা কি? বাঘ, না অন্য কোন জানোয়ার?'

উত্তরে জানা গেল, জানোয়ারটা কেউই স্বচক্ষে দেখেনি। গফুর আলীর বাড়ি থেকে জানোয়ারটা যেদিন একটা বাছুর নিয়ে যায়, সে রাত্রে বৃষ্টি পড়ে পথ-ঘাট হয়েছিল কর্দমাক্ত। সকালবেলায় খোঁজাখুঁজির পর বাছুরের আধ-খাওয়া দেহটা পাওয়া যায় মাঠের একটা ঝোপের ভিতরে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, সেখানে কাদার উপরে কোন জন্তুরই পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি। কেবল এটা বেশ বোঝা গিয়েছে যে, রাত্রে একজন মানুষ এই ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। কাদার উপর স্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল একটা মানুষের পদচিহ্ন।

এইখানেই জেগে উঠল আমার আগ্রহ। জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমরা কি বলতে চাও, মানুষ ছাড়া কোন জন্তুই মাটির উপরে পদচিহ্ন ফেলে সেই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করেনি?'

একজন বললে, 'প্রবেশ করেনি এ-কথা কেমন করে বলব! ঝোপের ভিতরে বাছুরটার আধ-খাওয়া দেহ যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, এ কাজ কোন মানুষের নয়। মানুষ কখনও গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খেতে পারে না। বাছুরটা যে কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছিল, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই জন্তুটা যে কেমন করে ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে, কাদার উপরে তার কোন চিহ্নই আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি!'

বিনোদ বললে, 'তা হলে কি তোমরা বলতে চাও জন্তুটা আকাশপথ দিয়ে আনাগোনা করেছে? তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

লোকটি বললে, 'হুজুর, আমাদের কথায় বিশ্বাস না করলে আমরা মারা পড়ব।

এ অঞ্চলে রোজ রাত্রেই, হয় মানুষ নয় গরু-ছাগল অদৃশ্য হচ্ছে। চারিদিকে এমন বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে যে, সন্ধ্যার পরে পথে-ঘাটে কেউ পা বাড়াতে ভরসা করে না। এমনকি রাত্রেও আমরা ভয়ে ঘুমুতে পারি না। হুজুর হচ্ছেন জমিদার, আপনি আমাদের রক্ষা না করলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো বলুন?'

বিনোদ বললে, 'এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

—'হুজুর, আপনাদের দুজনেরই কাছে বন্দুক রয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করলেই জন্তুটাকে বধ করতে পারেন।'

বিনোদ বললে, 'তোমরা বাজে কথা বলছ। তোমরাও জন্তুটাকে দেখতে পাওনি, আবার বলছ মাটির উপরে পায়ের দাগ ফেলে সে চলাফেরা করে না। ঝোপের কাছে পেয়েছো মানুষের কতকগুলো পদচিহ্ন। মানুষ গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খায় না, একথা সত্য; কিন্তু কোন মানুষ রাত্রে সেই ঝোপের ভিতরে যাবেই বা কেন? তোমাদের কোন কথারই মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

লোকটি কাঁদো কাঁদো মুখে আবার বললে, 'হুজুর, রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন।'

বিনোদ অধীর স্বরে বললে, 'আরে, আমরা তোমাদের কেমন করে রক্ষা করবো? তোমাদের জন্যে কি আমরা বন্দুক ঘাড়ে করে রাত্রে হাটে-মাঠে-ঘাটে পাহারা দিয়ে বেড়াব?'

বিমল, আগেই বলেছি ততক্ষণে আমার কৌতূহল রীতিমতো জেগে উঠেছে। ঘটনার মধ্যে আমি পেলুম যেন রহস্যের গন্ধ! আমি বললুম, 'বিনোদ আমরা ইচ্ছে করলে হয়তো এদের কিছু সাহায্য করতে পারি।'

—'কি রকম? তুমি তো কালকেই কলকাতার দিকে রওনা হতে চাও!'

—'তুমি যদি রাজী হও, তা হলে আমি আরও তিন-চার দিন এখানে থেকে যেতে পারি।'

বিনোদ হেসে ফেলে বললে, 'বুঝেছি। চড়ুকে পিঠ সড়সড় করে আর ধুনোর গন্ধ পেলেই মনসা নাচেন! বেশ, যা ভালো বোঝো কর।'

বিমল, তার পরেই তোমার কাছে আসে আমার প্রথম টেলিগ্রাম।

লোকে যেমন করে বাঘ শিকার করে, আমিও অবলম্বন করলুম সেই পদ্ধতি।

পরদিনেই খবর এলো, কুতুবদিয়া প্রণালী সৃষ্টি করে পৃথিবীর একটা বাহু যেখানে বঙ্গোপসাগরের ভিতরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, সেই নরখাদক জন্তুটার শেষ আবির্ভাব হয়েছে সেখানেই। ঝোপের ভিতরে সেখানেও পাওয়া গিয়েছে একটা গরুর খানিকটা-খাওয়া দেহ।

হিংস্র জন্তুদের স্বভাবই হচ্ছে, উদর পূর্ণ হবার পর কোন দেহের খানিকটা বাকি থাকলে তারা সেটা ঝোপ-ঝাপের ভিতর লুকিয়ে রেখে যায়। পরদিন রাত্রে আবার তারা ফিরে এসে দেহের বাকি অংশটাকে গ্রহণ করে।

আমরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলুম, যে ঝোপের ভিতরে গরুর দেহটা আছে, তার খুব কাছেই রয়েছে একটা মস্ত-বড় গাছ। লোকজনের সাহায্যে সেই গাছের

উপরে বাঁধলুম একটা মাচা। তারপর সন্ধ্যার আগেই বিনোদকে নিয়ে আমি সেই গাছে উঠে মাচার উপরে গিয়ে বসলুম।

রাত্রের প্রথম দিকে আকাশে ছিল অষ্টমীর চাঁদ। আলো খুব স্পষ্ট না হলেও চারিদিকে বেশ নজর চলছিল। যে ঝোপটার দিকে আমাদের লক্ষ্য, তার দুই পাশেই ছিল খানিকটা করে খোলা জমি। তারপর দুই দিকেই দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের প্রাচীর। ওই ঝোপটার ভিতরে ঢুকতে হলে খোলা জমিটা পার না হলে আর উপায় নেই। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

তারপর চাঁদ গেল অস্তে। চারিদিকে অন্ধকার, আমাদের চোখও অন্ধ। বিনোদ একে রাত জাগতে অভ্যস্ত নয়, তার উপরে এই অন্ধকারের জন্যে বিরক্ত হয়ে সে আরম্ভ করলে নিদ্রাদেবীর আরাধনা। আমি কিন্তু ঠায় জেগেই বসে রইলুম। কোন দিকে চোখ চলছিল না বটে, কিন্তু আমার দুই কান হয়ে রইল অত্যন্ত সজাগ। সে রাত্রে বাতাস পর্যন্ত ছিল না, বনের গাছপালা একেবারে নীরব; কিন্তু এই স্তব্ধতাকে ভাঙতে পারে এমন কোন শব্দই আমার কানে প্রবেশ করলে না।

পূর্ব আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলোর প্রথম আভাসটুকু। দু-একটা পাখিও ডাকতে আরম্ভ করলে।

আমার রাত-জাগা ব্যর্থ হল ভেবে বিনোদকে জাগিয়ে দেবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সচকিতে দেখলুম হঠাৎ এক দৃশ্য!

ডান দিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে জানোয়ারের মতো দেখতে কি একটা বেরিয়ে এলো। অত্যন্ত ঝাপসা আলোতে জানোয়ারটা যে কি, তা বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সে যে চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে এটুকু আমি লক্ষ্য করলুম। চলতে চলতে একবার সে সন্দিগ্ধ ভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ যেমন জ্বলে, তারও দুই চক্ষে রয়েছে তেমনি জ্বলন্ত নীলাভ আলো।

নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখতে পায়নি, কারণ আবার সে অগ্রসর হল সেই ঝোপটার দিকে—যার ভিতরে ছিল গরুটার অর্ধভুক্ত দেহ।

আমি বুঝলুম এই আমার সুযোগ। বন্দুক তুলে তখনই ঘোড়া টিপে দিলুম।

বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিৎকার! যাকে মনে করছিলুম হিংস্র জন্তু, হঠাৎ সে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিষম যন্ত্রণায় ইংরেজি ভাষায় আর্তনাদ করে উঠল, 'Oh my God! My God!'

দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোঁড়বার জন্যে আমার হাতের আঙুল তখন আবার ঘোড়ার উপরে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মনুষ্য-কণ্ঠের সেই আর্তনাদ শুনে আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেলুম যে, আর বন্দুক ছুঁড়তে পারলুম না।

মানুষই হোক আর জানোয়ারই হোক, সেই জীবটা আবার মাটির উপরে পড়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতোই বেগে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে।

ইতিমধ্যে কানের কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই বিনোদলালের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তার উপরে আবার মানুষের আর্তনাদে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে!

প্রায় এক মিনিটকাল আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

তারপর বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি কুমার? বন্দুক ছুঁড়লে কেন? মানুষই বা আর্তনাদ করলে কেন? জানোয়ার ভেবে তুমি মানুষ খুন করলে নাকি?'

আমি বললুম, 'আপাতত তোমার কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো একটা কিছু দেখেছিলুম নিশ্চয়ই, নইলে খামোকা বন্দুক ছুঁড়তে যাব কেন? কিন্তু বন্দুক ছোঁড়বার ঠিক পরেই একটা মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটা দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো; তারপর সে পালিয়ে গেল আবার চতুষ্পদ জন্তুর মতোই চার পায়ে ভর দিয়ে।'

বিনোদলাল আমার কথা বিশ্বাস করলে না। মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি নিশ্চয় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখে রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছ! চতুষ্পদ জানোয়ার কখনও মানুষের ভাষায় চিৎকার করে না। আর মানুষও কখনও চতুষ্পদ জন্তুর মতো চার পায়ে ভর দিয়ে ছুটে পালায় না।'

আমি বললুম, 'বেশ, তাহলে গাছ থেকে নেমে পড়। যে জীবটাকে দেখেছি, নিশ্চয় সে আমার গুলিতে জখম হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে তাকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না।'

সমস্ত বনভূমি তখন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জ্যোতির্ময়ী ঊষার শান্ত আশীর্বাদে। আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাখির প্রভাতী সংগীতে। মাথার ওপরে আকাশ-পথ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে বালি-হাঁস, বন-মুরগি এবং অন্যান্য পাখি। চোখের সামনে নেই আর অন্ধকার বা আবছায়ার বাধা।

মাটিতে নেমে আমরা দুজনে বন্দুক প্রস্তুত রেখে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের যেখানে গিয়ে জীবটা অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, মাটির ওপরে রয়েছে টাটকা রক্তের দাগ। সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা এগিয়ে চললুম।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর আমরা গিয়ে পড়লুম ফরসা জায়গায়। সেই খোলা জমির ওপরে গাছপালা নেই, মাঝে মাঝে আছে কেবল ঝোপঝাপ বা ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারপর দেখা যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সীমাহারা নীল জলের বিস্তার। রক্তের চিহ্ন চলে গিয়েছে সমুদ্রের দিকে।

বিনোদলাল বললে, 'কুমার, তুমি যে জীবটাকে আহত করেছ, নিশ্চয়ই সেটা জানোয়ার নয়। এখানে রক্তের দাগের সঙ্গে যে পায়ের চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো মানুষের পায়ের ছাপ না হয়ে যায় না।'

বিনোদলাল ভুল বলেনি। সত্যি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগই বটে।

বিনোদের কথার কোন জবাব না দিয়ে পদচিহ্নের অনুসরণ করে আমি দৌড়তে আরম্ভ করলুম। খানিকটা অগ্রসর হবার পরেই হঠাৎ দেখতে পেলুম, একখানা নৌকো তট ছেড়ে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এবং সেখানা চালনা করছে একটিমাত্র মানুষ।

আচম্বিতে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এলো একটা বিশ্রী অট্টহাসি। তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেই অদ্ভুত অট্টহাসির মধ্যে আমি পেলুম যেন একসঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং ব্যাঘ্রের হুঙ্কার!

খালি চোখে নৌকাবাহী মূর্তিটাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমার সঙ্গে

ছিল দূরবীন, তাড়াতাড়ি সেটা বার করে চোখের সামনে ধরলুম।

যা দেখলুম তা কেবল আশ্চর্য নয়, উদ্ভটও বটে! নৌকোর ভেতরে বসে আছে একটা সম্পূর্ণ নগ্ন মনুষ্য-মূর্তি। কিন্তু তার গায়ের রঙ অনেকটা চিতাবাঘের মতো! হলদের ওপরে গোল গোল কালো ছাপ। কোন কথা বা বলে দূরবীনটা বিনোদলালের হাতে দিলুম! সেও মূর্তিটাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর দূরবীন নামিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে, 'কুমার, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? ও লোকটা বোধ হয় নিজের দেহের ওপরে তুলি বুলিয়ে চিতাবাঘের রঙ ফলিয়েছে!'

—'কিন্তু কেন?'

—'কেন আর, ও লোকটা বোধহয় ছদ্মবেশে এখানকার সকলকে ভয় দেখাতে চায়!'

—'তাহলে তুমি ওকে মানুষ বলেই মনে কর?'

—'নিশ্চয়ই! রঙ ছাড়া ওর দেহের সমস্তটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে, ও হচ্ছে মানুষ! আর মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবকে কখনও তুমি কি নৌকো চালাতে দেখেছো?'

—'কিন্তু তুমি কি এ-কথাও কখনও শুনেছ যে, মানুষ কখনও নরখাদক বাঘের মতো কাঁচা মাংস খাবার জন্যে গো-হত্যা আর নর-হত্যা করেছে? ও মূর্তিটা আবার ইংরেজি ভাষায় কথা কয়! অথচ ও যে-ভাবে অট্টহাসি হাসলে, তার ভেতরেও পাওয়া গেল হিংস্র বাঘের গর্জন! কোন মানুষ ও-রকম গর্জন করতে পারে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আসলে কথা কি জানো বিনোদলাল? এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! নইলে স্বচক্ষে যা দেখছি, স্বকর্ণে যা শুনছি, তাও সত্য বলে ভাবতে পারছি না কেন?'

বিমল, এই হচ্ছে আমার কাহিনী। এইসঙ্গে এটুকু আমি বলে রাখি, এই ঘটনার পরে আরও দু'দিন আমি চট্টগ্রামে ছিলুম। কিন্তু ও-অঞ্চলে আর কোন নৈশ উপদ্রবের কথা আমরা শুনতে পাইনি।"

তিন

কুমারের কাহিনী শেষ হবার পর সকলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিমলের কপালের চর্ম কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তার মুখে ফুটল গভীর চিন্তার লক্ষণ।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত। সে ধীরে ধীরে বললে, "নেকড়ে বাঘ আর ভাল্লুকরা যে মাঝে মাঝে মানুষের শিশু ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা না করে পালন করে, এর কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে। কুমারবাবু যে কাহিনী শোনালেন, তাও কি সেইরকম কোন ব্যাপার হতে পারে না? হয়তো কোন মানুষ শিশু-বয়স থেকে চিতা-বাঘিনীর বাসায় পালিত হয়েছিল! তাই সেও পেয়েছে বাঘের স্বভাব, জীব-জন্তুর কাঁচা মাংস না হলে তার চলে না।"

বিমল বললে, "চিতা আর ভাল্লুকের বাসায় পালিত মানুষের কাহিনী যে সত্যি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ শ্রেণীর মানুষের স্বভাব জন্তুর মতো হয় বটে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা জানা গিয়েছে। প্রথমত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই

দেখা গিয়েছে তারা পনেরো-বিশ বছরের বেশি বাঁচে না। অনেকে তারও আগে মারা যায়। দ্বিতীয়ত, জঙ্গল থেকে মানুষের আশ্রয়ে এসেও তারা মানুষের ভাষায় দু'চারটের বেশি কথা কইতে শেখে না; তৃতীয়ত, নেকড়ে বা ভাল্লুকের দ্বারা পালিত মানুষের গায়ের রঙ নেকড়ে বা ভাল্লুকের মতো হয় না; কিন্তু কুমারের কাহিনীতে আমরা যে মানুষটির কথা শুনলাম, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আহত হলে সে পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় আর্তনাদ করে। এই ভাষা সে কোথায় কার কাছে শিখলে? ভারতবর্ষের কোথাও চিতা-বাঘের দ্বারা পালিত মানুষ সাহেবের আশ্রয়ে এসে ইংরেজি ভাষা শিখলে, সে কথা আজ দেশে দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠত। কিন্তু এমন কোন চিতা-মানুষের কাহিনী কোন দিনই আমাদের কানে ওঠেনি।

তারপর কুমার বলছে, তার গায়ের রঙ নাকি চিতা-বাঘের মতো। চিতার বাসায় পালিত হলেও সে হচ্ছে মানুষ। সুতরাং প্রকৃতি বন্য হলেও তার গায়ের রঙ কখনও চিতার মতো হতে পারে না। তার ওপরে সে নাকি শিকার করে মানুষ ও জন্তুর কাঁচা মাংস খায়। জন্তুর দ্বারা পালিত যে মনুষ্য-শিশু লোকালয়ে ফিরে এসেছে, তাদেরও এ-রকম স্বভাবের কথা শোনা যায়নি। যদি তর্কের অনুরোধে ধরে নেওয়া যায় যে, এই চিতা-মানুষটা বরাবর বনে থেকে নরখাদক বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে, তাহলেও এখানে প্রশ্ন উঠবে, তবে সে ইংরেজি ভাষা শিখলে কার কাছ থেকে? আর লোকালয়ে না এসেও সে নৌকোচালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করলে কেমন করে?—না জয়ন্তবাবু, এই ঘটনার ভেতরে আছে গভীরতর রহস্য!"

মানিক বললে, "কিন্তু সে রহস্যের চাবিকাঠি যখন আমাদের কাছে নেই, তখন ওকথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপাতত কোনই লাভ হবে না। তার চেয়ে এখন উচিত হচ্ছে, কুমারবাবুর প্রসাদে যে বন্য রামপক্ষীগুলো আত্মদান করবার জন্যে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, সকলে মিলে তাদের পরিদর্শন করে আসা।"

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "বেশ তো চলুন না। আসুন জয়ন্তবাবু, এসো বিমল।"

বিমল বললে, "আপাতত মুরগি দেখবার ইচ্ছে আমার নেই। তোমরা যাও।"

জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে কুমার ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরে তারা যখন আবার ফিরে এল তখন দেখলে, বিমল একখানা বই হাতে নিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মানিক শুধোলো, "ওখানা কি বই, বিমল?"

বিমল বললে, "এখানি এইচ. জি. ওয়েল্‌সের বই। তুমিও পড়েছো, এর নাম হচ্ছে The Island of Dr. Moreau, মনে আছে, এই বইখানা নিয়ে আমরা দুজনে মিলেই অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিলুম?"

কুমারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, "বিমল! তুমি কি বলতে চাও? না না, তা হচ্ছে অসম্ভব!"

বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "কি অসম্ভব, কুমার?"

—"ডাক্তার মোরোর দ্বীপের সঙ্গে নিশ্চয়ই চাটগাঁয়ের ওই আশ্চর্য মানুষটার কোন সম্পর্ক নেই।"

—"কেন?"

—"প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ-আমেরিকার পাশে কোথায় সেই ডাক্তার মোরোর আজব দ্বীপ, আর কোথায় এই ভারতবর্ষের চট্টগ্রাম! ও দ্বীপের কোন জীব কেমন করে এখানে এসে হাজির হবে? এটা কি অসম্ভব নয়?"

—"কুমার, তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমিও তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ওখান থেকে কোন জীবের ভারতবর্ষে আসাটা কি ডাক্তার মোরোর দ্বীপের চেয়েও বেশি অসম্ভব?"

—'তুমি কি বলতে চাও, বিমল?"

বিমল বললে, "ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কথা তোমার মনে আছে!"

কুমার বললে, "ফিলিপ? যার সঙ্গে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে সূর্যনগরীর গুপ্তধন দেখতে গিয়েছিলুম? নিশ্চয়ই। তাঁর কথা কি এত শীগগিরই ভুলতে পারি?"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমি সেই ফিলিপ সাহেবের কথাই বলছি। এটাও তুমি ভোলোনি বোধ হয়, মিস্টার ফিলিপ তাঁর ভূ-পর্যটনের গল্প বলতে বলতে কত দেশের বিচিত্র সব রহস্যের কথা শুনিয়েছিলেন! তাঁরই মুখে ডাক্তার মোরোর দ্বীপের কথা আমি প্রথম শুনি। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক যেখানে সেই দ্বীপটি আছে, মিঃ ফিলিপ একখানা নকশা এঁকে তাও আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যদি একখানা জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্রপথে বেরিয়ে পড়ি, তাহলে সেই নকশা অনুসারে অনায়াসেই মোরোর দ্বীপে গিয়ে হাজির হতে পারব।"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু বিমলবাবু, কুমারবাবুর মুখে যে অদ্ভুত মানুষটার গল্প শুনে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, আমিও সেই মানুষটার সঙ্গে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অদ্ভুত দ্বীপের কিছুমাত্র সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারছি না। আমারও প্রশ্ন হচ্ছে, একখানা ছোট বোটে চড়ে অত দূর থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে কেউ কি ভারতবর্ষে এসে উঠতে পারে!"

বিমল ধীরে ধীরে বললে, "জয়ন্তবাবু, মাঝে মাঝে আপনি কি খবরের কাগজে পড়েননি যে, ছোট ছোট তুচ্ছ নৌকোয় চড়ে একাধিক সাহেব সমুদ্রপথে পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন? মাঝে মাঝে এ কথাও শোনা যায়, চীনা ও জাপানীরা ওই রকম ছোট নৌকোয় চেপে অতবড় প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে! কিন্তু এখানে ওই নৌকোর কথা না তুললেও চলে। কারণ, কুমারের দেখা ওই অদ্ভুত জীবটা যে নৌকোয় চড়েই ভারতবর্ষে এসে পড়েছে, তারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। হয়তো সে অন্য কোনও উপায়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে, তারপর যেভাবেই হোক, একখানা নৌকো সংগ্রহ করেছে। সেই উপায়টা যে কি, তা নিয়ে আপাতত আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আর ওই জীবটা যে মোরোর দ্বীপেরই বাসিন্দা, তাও আমি জোর করে বলতে চাই না; কিন্তু কুমারের মুখে জীবটার বর্ণনা শুনে আমার মনে প্রথমেই অনেক দিন পরে জেগে উঠেছে ডাক্তার মোরোর দ্বীপের কাহিনী। বহুকাল থেকেই আমার বাসনা ছিল আমরাও একবার ওই দ্বীপে গিয়ে দেখে আসব ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের আর এইচ. জি. ওয়েল্‌সের কথা

সত্যি কিনা! যদি আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি, তাহলে চট্টগ্রামের এই আজব জীবটার সঙ্গে কেন যে আমি ওই দ্বীপটার সম্পর্ক নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি, সে কথা আপনাদের কাছে খুলে বলব।"

মানিক বললে, "বিমলবাবু, ডাক্তার মোরোর দ্বীপের রহস্য আমরা কোনদিনই শুনিনি। আপনি দু'চার কথায় খুলে বলবেন কি?"

এইচ. জি. ওয়েল্‌সের বইখানা এগিয়ে দিয়ে বিমল বললে, "আমার মুখে কিছুই শোনবার দরকার নেই। এই বইখানা নিয়ে যান; এর পাতাগুলোর ওপরে চোখ বুলোলেই সব কথা জানতে পারবেন; কিন্তু তার আগে বলুন দেখি, আমি আর কুমার যদি সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করি, তাহলে এই অ্যাডভেঞ্চারে আপনারাও কি যোগ দিতে রাজী হবেন?"

জয়ন্ত ও মানিক সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই।"

কুমার বললে, "বিমলের অনুমান, ফিলিপ সাহেবের গল্প আর এইচ. জি. ওয়েল্‌সের রচনা সত্য না হলেও আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না; জীবনে বড়ই ঘটনার অভাব হয়েছে, কলকাতা শহরকে মনে হচ্ছে ছোট খাঁচার মতো, এখানে আর বেশি দিন আবদ্ধ হয়ে থাকলে বেতো রুগীর মতো শয্যাগত হয়ে পড়ব। অন্য কোন ঘটনা ঘটুক বা নাই ঘটুক, অন্তত বঙ্গোপসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছুটোছুটি করে আসা যাবে তো? আমার পক্ষে তাও হবে একটা বিপুল মুক্তির মতো!"

বিমল বললে, "কিন্তু সাবধান, রামহরি যেন আপাতত ঘুণাক্ষরেও মোরোর দ্বীপের কথা জানতে না পারে। তাহলে সে এখান থেকে কিছুতেই নড়তে রাজী হবে না। আমাদের রন্ধনশালার হর্তাকর্তা সে, তাকে সঙ্গে না রাখলে কি চলে? কি বল, কুমার?"

কুমার বললে, "সে কথা আর বলতে? যখনই একলা বিদেশে গিয়েছি, রামহরির শ্রীহস্তের রান্না খেতে না পেয়ে রীতিমতো রোগা হয়ে পড়েছি!"

বিমল হঠাৎ চাপা গলায় বললে, "সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই বুঝছি ঘরের ভেতরে এখনি সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে। দলে ভারী হবার জন্যে তাঁকেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তাঁকেও আসল রহস্যের কথা বলবার দরকার নেই।"

ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন সুন্দরবাবু। কুমারের দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হুম্! এই যে কুমারবাবু, আমার বন-মুরগিদের খবর কি? নিশ্চয়ই তাদের চাটগাঁয়ে ফেলে আসেননি?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "না, আপাতত তারা বাস করছে এই বাড়িতেই।"

পেটের ওপরে ডান হাত বুলোতে বুলোতে এক গাল হেসে সুন্দরবাবু বললেন, "চমৎকার! চমৎকার!"

চার

সিন্ধুর মুখে বিন্দুর মতো অনেক দূরে দেখা গেল ছোট্ট একটি দ্বীপ।

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে আমরা জাহাজে উঠেছি, এবং জাহাজ এখন এসে

পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে এবং এখন যেখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তার একদিকে আছে ওই ছোট্ট দ্বীপটি, আর একদিকে আছে দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি। এখানটা সাধারণ জাহাজ চলাচলের পথ নয়, আর সেই কারণেই ভাড়া করে একখানি নিজস্ব জাহাজ নিয়ে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।

ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া 'চার্টের' ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর আবার দ্বীপের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিমল উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "ওইটেই যে ডাঃ মোরোর দ্বীপ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! ...ওই ছোট্ট জায়গাটুকুর ভেতরে কোন বৃহৎ রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, দূর থেকে দ্বীপটিকে দেখলে মোটেই সে সন্দেহ হয় না।"

হঠাৎ পেছন থেকে সুন্দরবাবুর কণ্ঠে শোনা গেল, "হুম্! আপনার এ কথার অর্থ কি বিমলবাবু?"

বিমল তাড়াতাড়ি চার্টখানা মুড়ে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এই যে সুন্দরবাবু! আপনি যে কখন চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কিছুই টের পাইনি!"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, টের পাননি বলেই তো পেছন থেকে আমি আপনাদের সব কথা শুনতে পেয়েছি!"

—"কি শুনেছেন, সুন্দরবাবু?"

—"আরে, শুধু কি শুনেছি, আসল ব্যাপারটা বুঝতেও পেরেছি।"

—"কি বুঝেছেন সুন্দরবাবু?"

—"সাগর-ভ্রমণে বেরুবেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, এমনি সব আরও নানা লোভ দেখিয়ে আপনারা আমাকে কলকাতা থেকে এখানে টেনে এনেছেন। তারপর অকূল পাথারে ভেসে রোজ আপনাদের হাবভাব ব্যবহার দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আপনাদের এই সাগরযাত্রার পেছনে কোন গভীর রহস্য আছে। মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ আপনাদের কাছে প্রকাশও করেছিলুম; কিন্তু আমার কথা আপনারা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মশাই, গোয়েন্দাগিরি করে আমি চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমার সন্দেহকে আপনারা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে পারবেন কেন? তবে ফাঁদে যখন পা দিয়েছি, ফলভোগ করতেই হবে, কাজেই মুখে কিছু আর বলিনি; কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, কলকাতা থেকেই আপনাদের লক্ষ্য ছিল ওই অজানা দ্বীপটার ওপরে।"

মানিক মুখে কপট ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, "বলেন কি সুন্দরবাবু! কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই ছোট্ট দ্বীপটা! মাঝখানে আছে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার মাইল ব্যাপী জলপথ। আমাদের লক্ষ্য করবার শক্তি কি এতই অসাধারণ যে কলকাতায় বসেই এই দ্বীপটা চোখে দেখতে পেয়েছি? না সুন্দরবাবু, না, আপনার এই অত্যুক্তির অত্যাচার আমরা সহ্য করতে রাজী নই!"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোমার ঠাট্টা থামাও মানিক! অসময়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমার বিরুদ্ধে একটা মস্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে! নইলে তোমরা যে এই বিশেষ দ্বীপটাতেই আসতে চাও, একথা আগে আমাকে বলনি কেন!"

—"বললে কি করতেন?"

—"করতুম আর কি, তোমাদের সঙ্গে আসতুম না।"

—"কেন আসতেন না?"

—"হুম্! এর আগে, বোকার মতো তোমাদের পাল্লায় পড়ে যতবারই দেশের বাইরে এসেছি, ততবারই পড়েছি সাংঘাতিক সব বিপদে। তবু বেশির ভাগ বিপদের ধাক্কা কোনরকমে সামলাতে পেরেছি ভারতবর্ষের মাটিতেই ছিলুম বলে। কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে এসে পড়েছি এমন এক জায়গায় যেখানে মা-বাপ বলতে কেউ থাকবে না। চারদিকে কেবল থইথই করছে জল, তার মাঝখানে একরত্তি একটা সরষের মতো রয়েছে ওই বাজে দ্বীপটা! হায় রে, আর কি আমি দেশে ফিরতে পারব?"

কুমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললে, "সুন্দরবাবু, একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখে আপনি এতটা ভড়কে যাচ্ছেন কেন?"

সুন্দরবাবু আরও রেগে উঠে বললেন, "ভড়কে যাব না কি-রকম? বলেন কি মশাই? আপনাদের আমি কি চিনি না? আমি কি জানি না পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে অপেক্ষা করে মারাত্মক সব আপদ-বিপদ, একটু খবর পেলেই সেই সব জায়গায় আপনারা ছুটে যান বদ্ধ পাগলের মতো! আপনারা যে ওই বিশেষ দ্বীপটাতে সুমুদ্দুরের হাওয়া ভক্ষণ করতে আসেননি, এটুকু বুঝতে পারব না এমন কচি খোকা আমি নই। আপনাদের ধাপ্পায় ভোলবার কথা আমার নয়; কিন্তু কি জানেন কুমারবাবু, মুনিরও মতিভ্রম হয়, আমারও মতিভ্রম হয়েছিল। নইলে কি আপনাদের সঙ্গে আবার দেশের বাইরে পা বাড়াতুম? কখনও না!"

এমন সময় রামহরি সেখানে এসে দাঁড়াল। সকলকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, "কী হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনি এত খাপ্পা হয়ে উঠেছেন কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "খাপ্পা না হয়ে উপায় কি রামহরি? এই বাবুগুলি ধাপ্পা দিয়ে আমাদের দুজনকে এখানে কেন টেনে এনেছেন জানো?"

—"কেন সুন্দরবাবু?"

—"আমরা জবাই হব বলে।"

রামহরি দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, "এরা সাত সুমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এতদূর এসেছে কেন জানো? ওই একফোঁটা দ্বীপে গিয়ে নামবে বলে।"

রামহরি ফিরে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাবুরা ওই দ্বীপে গিয়ে নামবে নাকি? ওটা কী দ্বীপ?"

—"ভগবান জানে! দ্বীপটার যা চেহারা দেখছি, পৃথিবীর কোন মানুষই বোধহয় ওর নাম কখনো শোনেনি!"

—"ওই দ্বীপে কি আছে?"

—"ওখানে নিশ্চয়ই আছে মূর্তিমান বিভীষিকার দল। তা নইলে এমন ডাহা ডানপিটে ছোকরার দল এতদূর কখনো ছুটে আসে? দ্বীপটাকে দেখেই আমার গায়ে

কাঁটা দিচ্ছে! ঘাড়ে ভূত না চাপলে অমন দ্বীপে কেউ বেড়াতে আসে না।"

রামহরি সায় দিয়ে বললে, "তা যা বলেছেন! এই বাবুগুলির প্রত্যেকেরই ঘাড়ে চেপে আছে একটা করে ভূত!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের ঘাড়ে তো ভূত নেই, আমরা কেন এদের সঙ্গে বেঘোরে ছুটোছুটি করে মরি!"

রামহরি দার্শনিকের মতো গম্ভীর ভাবে বললে, "সঙ্গ-দোষে সব হয় সুন্দরবাবু, সঙ্গদোষে সব হয়।"

সুন্দরবাবু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখ রামহরি, এসে যখন পড়েইছি তখন উপায় নেই! কিন্তু আমার একটা কথা সর্বদাই মনে রেখো। জেনো, এই দলে মানুষের মতো মানুষ বলতে আছি কেবল আমরা দুজন। আমরা ওদের দলে কোন দিনই যোগ দেব না। ভবিষ্যতে আমরা যা করব, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই করব, ওদের কারুর পরামর্শ আমরা শুনব না। চল, চুপি চুপি তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই।"

বিমলের দিকে একবার উত্তপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রামহরির হাত ধরে প্রস্থান করলেন সুন্দরবাবু।

জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছে। এখান থেকে দ্বীপের সবটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার আয়তন সাত-আট বর্গমাইলের বেশি হবে না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ দ্বীপেরই উৎপত্তি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে। এই দ্বীপটির উৎপত্তির মূলেও সেই কারণই অনুমান করা যায়।

দ্বীপের একদিকে রয়েছে নতোন্নত মুক্তভূমি, বাকি সবখানেই দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ রঙের ছবি, লতা-গুল্ম-পাতায় ঢাকা গাছের পর গাছের দল। সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে তালজাতীয় একরকম গাছ। একদিকে সমুদ্রের নীল জলের ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু ও সুদীর্ঘ কালো পাথুরে পাড়। তার ওপরে একটানা চলে গিয়েছে বড় বড় ঝোপের পর ঝোপ। সেখানকার নিবিড় শ্যামলতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল প্রভাত-সূর্যের সোনালী জলের ঢেউ।

বিমলের দৃষ্টি হঠাৎ চমকে উঠল। একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে, "দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন!"

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, ঝোপগুলোর তলায় সরাসরি বসে কতকগুলো নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু সেগুলো যে জীবন্ত মূর্তি, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও তাদের মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মূর্তির গায়ের ওপরই দেখা যাচ্ছে নানান-রকম রঙের খেলা—হলদে, কালো, সাদা ও লালচে প্রভৃতি।

কুমার বললে, "বিমল, ওরা যদি মানুষ হয় তাহলে ওদের গায়ের রঙ ওরকম কেন? ওরা কি গায়ের সঙ্গে মিলানো কোন রঙিন পোশাক পরে আছে?"

বিমল বললে, "কিছুই তো বলতে পারছি না। ডাঃ মোরোর দ্বীপে যে ওরকম রঙিন পোশাক-পরা মানুষ আছে, এ খবর তো আমিও পাইনি।"

জাহাজের সাইরেন হঠাৎ তীব্র স্বরে বেজে উঠে আকাশ-বাতাস চারদিক যেন

বিদীর্ণ করে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপগুলোর সুমুখ থেকে প্রত্যেক মূর্তিই এক এক লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, "ওগুলো নিশ্চয়ই মানুষের মূর্তি নয়।"

বিমল বললে, "কেন?"

—"মানুষ কখনও বসে বসেই অত উঁচু লাফ মেরে ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়তে পারে?"

বিমল কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু সুন্দরবাবুর টনক নড়ল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তিনি মত প্রকাশ করলেন, "ওগুলো মানুষ, নয়, হুম!"

মানিক বললে, "আপনি কি বলতে চান সুন্দরবাবু?"

দুই ভুরু সংকুচিত করে সুন্দরবাবু বললেন, "আমার কথার অর্থ হচ্ছে, তুমি একটি পাজীর পা-ঝাড়া!... রামহরি! অ রামহরি! শুনেছ? যা ভেবেছি তাই, আমরা এসেছি একটা ভুতুড়ে দ্বীপে!"

জাহাজ আর অগ্রসর হতে পারলে না। সেইখানেই নোঙর ফেললে। বিমলের আদেশে খালাসীরা দ্বীপে যাবার জন্যে বোট নামাবার আয়োজনে নিযুক্ত হল।

রামহরির কানে কানে সুন্দরবাবু বললেন, "আমাদের দুজনের কি উচিত জানো রামহরি? ওই দ্বীপে না উঠে এই জাহাজের ভেতরেই বাস করা।"

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "তা হয় না বাবুমশাই! খোকাবাবু যমালয়ে যেতে চাইলে আমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হবে।"

সুন্দরবাবু এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন যার দ্বারা বোঝা গেল, রামহরির উত্তর শুনে তিনি মোটেই প্রীত হননি।

পাঁচ

একদিকে অরণ্য ও ছোট ছোট পাহাড়ের শিখর, একদিকে একটি ছোট্ট নদী এবং আর দুই দিকে পনেরো-ষোল হাত প্রবাল-প্রাচীর, তারই মাঝখানে ফেলা হয়েছে কয়েকটা তাঁবু।

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, আপনি চমৎকার স্থান নির্বাচন করেছেন। ওই দু'দিকে প্রবাল-প্রাচীর আছে বলে শত্রু আসবার ভয় নেই। কেবল ওই বন আর নদীর দিকে সাবধানী দৃষ্টি রাখলেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব।"

হঠাৎ সুন্দরবাবু একটা সুউচ্চ লম্ফ ত্যাগ করে বলে উঠলেন, "বাপ্ রে, ভূমিকম্প হচ্ছে!"

বিমল সহজ স্বরেই বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই। এখানে পায়ের তলায় মাঝে মাঝে মাটি এমনি কাঁপবে!"

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "বটে! এখানকার মাটির এমন বেয়াড়া স্বভাবের কারণটা কি শুনি?"

—"এটা সাধারণ দ্বীপ নয়, এখানে সমুদ্রের তলায় যে আগ্নেয়-পর্বত আছে, এই দ্বীপটিকে তারই চূড়া বলে বর্ণনা করা যায়। আমি আর কুমার দ্বীপের খানিকটা

পরিদর্শন করে এসেছি। চারিদিকেই দেখেছি পাথরের গায়ে রয়েছে গর্তের পর গর্ত। সেই সব গর্ত আর কিছুই নয়, আগ্নেয়-পর্বতের ধোঁয়া বেরুবার পথ। ওই দেখুন, খানিক দূরে একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানেও গর্তের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়-পর্বতেরই ধোঁয়া!"

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, "বিমলবাবু, আপনি যে আমার আক্কেল গুড়ুম করে দিলেন! পায়ের তলায় ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরি নিয়ে মানুষ কখনও বাস করতে পারে? কোন্ দিন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন, আর আমাদের দেহের বদলে এখানে পড়ে থাকবে খালি মুঠোকয়েক ছাই।"

বিমল বললে, "অতটা দুর্ভাবনার দরকার নেই। এইচ. জি. ওয়েলস্ সাহেবের গল্পের নায়ক এই দ্বীপে এসেছিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তারও দশ-পনেরো বছর আগে যে দ্বীপটার অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এত দিনের মধ্যেও আগ্নেয়গিরি যখন উৎপাত করেনি তখন আরও গোটাকয়েক দিন আমরা বোধহয় নিরাপদেই কাটিয়ে দিতে পারব।"

বিমলদের সঙ্গে এসেছিল বারোজন গুর্খা। তারা সকলেই আগে ফৌজে কাজ করত। বিমল তাদের ডেকে হুকুম দিলে যে, যে দু'দিকে প্রবাল-প্রাচীর নেই সেইখানে সর্বদাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতে। তারপর ফিরে বললে, "আমাদের সবাইকে এখানে সর্বদাই সশস্ত্র হয়ে থাকতে হবে। কারণ, কোন্ দিক দিয়ে কখন শত্রুর আবির্ভাব হবে, কিছুই বলা যায় না। কুমার, আমাদের মেসিন-গান দুটো তুমি বাইরে এনে বসিয়ে রাখো।"

এইসব আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর উদ্বেগ ও অশান্তি ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বিমল, কুমার, মানিক ও জয়ন্তর কাছ থেকে তিনি কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পেলেন না। তাদের কাছে গেলেই তিনি পান শুধু ভীষণ সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

শেষটা রীতিমতো মুষড়ে পড়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে রামহরির তাঁবুর ভেতরে। রামহরি রান্নায় ব্যস্ত ছিল। তার রন্ধনের বিচিত্র আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর অশান্ত মনটা অনেকটা প্রশান্ত হয়ে উঠল। আর একটি প্রাণীও সেই তাঁবু-রান্নাঘরের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সে হচ্ছে বাঘা। তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছে মাংসের সুগন্ধ!

সেই রাত্রে।

চন্দ্রহীন অন্ধকার রাত যেন কান পেতে শ্রবণ করছে বিশাল সাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-কোলাহল!

আচম্বিতে মানুষের আর্তনাদের পর আর্তনাদে চারিদিক হয়ে উঠল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত! সঙ্গে সঙ্গে বার বার শোনা গেল রিভলভারের শব্দ! তারপরেই জাগল কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার!

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক সকলেই ব্যস্তভাবে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

কুমার উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, "এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বাঘাও চ্যাঁচাচ্ছে! সুন্দরবাবু

ক্রমাগত রিভলভার ছুড়ছেন! ব্যাপার কি?"

সকলে দ্রুতপদে সুন্দরবাবুর তাঁবুর ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখলে, তাঁবুর এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেন সুন্দরবাবু। তাঁর মুখ-চোখ আতঙ্কগ্রস্ত।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনার এমন অবস্থা কেন?"

প্রথমটা সুন্দরবাবু কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারলেন না। তারপর কেবল মাত্র বললেন, "হুনুমান-বিছে!"

—"হুনুমান-বিছে?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, হুনুমান-বিছেই বল আর বিছে-হুনুমানই বল, আমি দেখেছি, একটা অসম্ভব জীবকে।"

মানিক বললে, "জয়ন্ত, ভয়ে সুন্দরবাবুর মাথার কল বিগড়ে গেছে, যা বলছেন তার মানেই হয় না।"

ভয়ার্ত সুন্দরবাবু এইবারে হলেন রীতিমতো ক্রুদ্ধ। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হে বাপু, আমার তো মাথার কল বিগড়ে গেছে, কিন্তু এখানে আজ থাকলে তোমার দেহের ওপরে মাথাটাই বজায় থাকত কিনা সন্দেহ! আমি যা দেখেছি, কেউ কোন দিন দুঃস্বপ্নেও তা দেখেনি। বাস্ রে বাস্, আমার বুকটা এখনও শিউরে শিউরে উঠছে। ভাগ্যে রিভলভারটা ছিল, নইলে আজ কী যে হত কিছুই বলা যায় না।"

বিমল বললে, "শান্ত হন সুন্দরবাবু! ভালো করে বুঝিয়ে বলুন আপনি কি দেখেছেন।"

সুন্দরবাবু ধপাস করে বিছানার ওপরে বসে পড়ে আগে খুব খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিলেন। তারপর কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "সব কথাই বলবো বটে, কিন্তু সকলের কাছে আগেই একটি অনুরোধ করে রাখছি। আমি স্বচক্ষে সত্যই যা দেখেছি তা ছাড়া আর কিছুই বলব না। আমি ভুলও দেখিনি, অত্যুক্তিও করব না। কিন্তু আপনারা দয়া করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলকার সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব করে নিজের তাঁবুতে এসে আমি তো শুয়ে পড়লুম। খানিক পরেই ঘুমের ঘোরে জুড়িয়ে এল চোখের পাতা। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই মনে হল তাঁবুর ভেতরে আমি আর একলা নেই। প্রথমেই নাকে এল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ। তারপরেই শুনলুম মাটির ওপরে খসখস করে শব্দ হচ্ছে।

আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। ঘুমোবার সময় আলো নিবিয়ে দিইনি, তাঁবুর এক কোণে জ্বলছিল হারিকেন লণ্ঠনটা। সেই আলোতে দেখলুম, বেশ একটা মোটা সাপের মতো জীব আমার খাটের তলায় গিয়ে ঢুকছে, বাইরে বেরিয়ে আছে কেবল তার ল্যাজের দিকটা। ভালো করে দেখে বুঝলুম সেটা সাপ নয়, তার গায়ের রঙ তেঁতুলে বিছের মতো, আর দেহের গড়নও প্রায় সেই রকমই।

লম্বায় তার দেহটা কতখানি তা বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহটা সাত-আট ইঞ্চির কম হবে না। এত বড় বিছের কথা জীবনে কোনদিন শুনিনি। এ যদি কামড়ায় তাহলে আমার অবস্থাটা হবে কি রকম, তা অনুমান করেই

তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে নিলুম।

বিছেটা বোধ হয় টের পেয়েছিল যে আমি জেগে উঠেছি। সাঁত্ করে তার দেহের সবটাই ঢুকে গেল খাটের তলায়। আমি মহা ফাঁপরে পড়ে বিছানার ওপরে উবু হয়ে বসে ভীষণ ভয়ে ঘেমে উঠতে লাগলুম।

তারপর অত্যন্ত আচম্‌কা একটা ভয়ানক উদ্ভট জীব খাটের তলা থেকে বাইরে এসে পড়ল। সেটাকে দেখে তো আমার চক্ষুস্থির!

বিমলবাবু, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও সাত-আট ইঞ্চি চওড়া বৃশ্চিকের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে একখানা মস্ত হনুমানের মুখ? কল্পনা তো করতে পারবেনই না, হয়তো আমার কথা বিশ্বাসও করবেন না; কিন্তু আমি কিছুমাত্র ভুল দেখিনি, বলেন তো ঈশ্বরের নামে শপথ করতে পারি।

গোখরো সাপেরা ফণা তুলে যেমন মাটির ওপর থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে ওঠে, এই কিম্ভূতকিমাকার আশ্চর্য জীবটা ঠিক সেই ভাবে উঁচু হয়ে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে গর্জন করে উঠতেই আমি রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলুম। পরমুহূর্তেই জীবটা মাটির ওপরে আছাড় খেয়ে পড়ল আর তার ল্যাজের ঘা লেগে হারিকেন লণ্ঠনটা ভেঙে একেবারে নিবে গেল!

তাঁবুর ভেতর ঘোর অন্ধকার! হঠাৎ আমার খাটের ওপরে সশব্দে কি একটা এসে পড়ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তড়াক্ করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে উপর্যুপরি রিভলভার ছুঁড়তে লাগলুম। তারপর আপনাদের আবির্ভাব। এখন তো দেখছি সে আশ্চর্য জীবটা আর তাঁবুর ভেতরে নেই; কিন্তু বলুন আপনারা, যেটাকে এইমাত্র আমি দেখেছি, সেটা কি জীব হতে পারে? আপনারা হয়তো বলবেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে আমি জেগে উঠেছি। কিন্তু স্বপ্ন নয় মশাই, স্বপ্ন নয়। আমার রিভলভারের গুলি খেয়ে জীবটা আহত হয়েছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এখনও তার রক্তের দাগ ওখানে রয়েছে!"

জয়ন্ত হেঁট হয়ে রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করছি। একটা কোন জীব যে আপনার রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু আপনি যেরকম বললেন, জীবটাকে কি ঠিক সেই রকমই দেখতে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "একেবারে অবিকল! এখনও আমার চোখের সামনে তার মূর্তিটা যেন জ্বলজ্বল করছে! যত দিন বাঁচবো তার চেহারা কোনদিন ভুলবো না, হুম্!"

কুমার বললে, "জীবতত্ত্বে হনুমানের মতো মুখ আর বৃশ্চিকের মতো দেহধারী প্রাণীর কথা কোনদিন পাওয়া যায়নি। কোন জীবতত্ত্ববিদই এরকম উদ্ভট জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "জীবতত্ত্বের পণ্ডিতরা আমার কথা শুনে কি বলবেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার বিশ্বাস, আজ যাকে দেখেছি, জীবরাজ্যের কেউ সে নয়। বলেছি তো এটা হবে ভুতুড়ে দ্বীপ, ভুতেরা কতরকম দেহধারণ

করতে পারে তা কি কেউ জানে?"

বিমল ধীরে ধীরে বললে, "ডাঃ মোরোর দ্বীপে যে এ-রকম জীব পাওয়া যায়, এইচ. জি. ওয়েলস তার উল্লেখ করেননি; কিন্তু তাঁর কেতাবে এ সম্বন্ধে দু' একটা ইঙ্গিত আছে বটে।"

জয়ন্ত বললে, "কি রকম ইঙ্গিত?"

—"পরে তা বলব। আপাতত আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, এই দ্বীপটা ভাল করে পরিদর্শন করা। এখানকার জঙ্গলের ভেতরে গেলে আর পাহাড়ের ওপরে উঠলে নিশ্চয়ই বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কাল সকালেই আমরা এখানকার জঙ্গলের দিকে যাত্রা করব।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "আমরা মানে? আমি কোনদিনই ওই জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে রাজী নই। এখানকার একটিমাত্র জীবের যে নমুনা দেখলুম আমার পক্ষে তা যথেষ্টরও বেশি। জঙ্গলের ভেতরে নানা রূপ ধারণ করে আরও যাঁরা বিরাজ করছেন, আমি দূর থেকেই তাঁদের পায়ে প্রণাম করছি।"

ছয়

সকাল বেলায় চায়ের আসরে বিমলের কাছে গিয়ে রামহরি মিনতি করে বললে, "খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি। ও জঙ্গলের ভেতরে তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই।"

বিমল মুখ টিপে হেসে বললে, "ছি রামহরি, তুমি যত বুড়ো হচ্ছ, ততই ভীরু হয়ে উঠছ।"

রামহরি বললে, "হ্যাঁ খোকাবাবু, আমি ভয় পাচ্ছি বটে। কিছু তুমি কি জান না আমার ভয় হয় কেবল তোমার জন্যেই? ওই জঙ্গলটার লক্ষণ ভালো নয়। ওদিকে তাকালেই আমার বুক চমকে ওঠে, মনে হয় যত রাজ্যের যত বিপদ ওখানে যেন ওত পেতে বসে আছে! তুমি কি লক্ষ্য করনি খোকাবাবু, এখানে একটা পাখিরও গান শোনা যায় না?"

বিমল বললে, "এখানে চারদিকে কেবল জল আর জল! এই বিশাল সমুদ্র পার হয়ে কোন গানের পাখিই এতদূর উড়ে আসতে পারে না। কিন্তু ওই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওখানে বসে রয়েছে কত সামুদ্রিক পাখি! ওরা গান গায় না বটে, কিন্তু চিৎকার করে যথেষ্ট!"

রামহরি বললে, "যে সব পাখি গান গাইতে পারে না, তারা হচ্ছে অলক্ষুণে। যেমন পেঁচা আর বাদুড়। তাদের দেখলেই মনে ওঠে বিপদ-আপদের কথা। তা পাখি থাক আর নাই থাক, তুমি ওই জঙ্গলের ভেতরে যেও না।"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "তা হয় না রামহরি! আমরা যে রহস্যের খোঁজে এতদূর এসেছি, তাকে পাওয়া যাবে হয়তো ওই জঙ্গলের মধ্যেই। এ দ্বীপটা খুবই ছোট। ঘুরে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। সুন্দরবাবুকে নিয়ে তুমি

এখানেই থাকো, ফিরে এসে তোমার হাতের রান্না খাবো। ছ'জন গুর্খা এখানে পাহারা রইল, বাকি ছ'জন যাবে আমাদের সঙ্গে। কীরে বাঘা, তুইও এখানে থাকবি, না আমাদের সঙ্গে যাবি?"

কিন্তু বাঘা তাদের সঙ্গে যাবার জন্যেই প্রস্তুত। সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিমলের পায়ের কাছে ছুটে এসে বললে, "ঘেউ, ঘেউ!" তারপর বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক যখন পথে বেরিয়ে পড়ল তখন বাঘা ছুটতে লাগল সকলের আগে আগেই।

ছোট্ট একটি নদী নাচতে নাচতে ছুটে চলছে, দুই তট কল-সংগীতে পূর্ণ করে। মাঝে মাঝে তার জলরেখা হারিয়ে গিয়েছে বড় বড় ঝোপের তলায়। তারপর আরম্ভ হল চড়াই, লতাপাতা ও তৃণগুল্মে অলংকৃত ভূমি ক্রমেই উঠে গিয়েছে ওপর দিকে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট শৈলখণ্ড, এক জায়গায় রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, তার জল বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়-পাহাড়ের তপ্ত বুকের ভেতর থেকে। চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, দ্বীপের অনেকটা অংশ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে রিলিফ-ম্যাপের মতো।

নদী, পাহাড়, উপত্যকা, মাঠ ও অরণ্য এবং শ্যামলতার পরেই দেখা যাচ্ছে সীমাহীন মহাসাগরের নির্মল নীলিমা। এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না, এখানে যে জীব-জন্তু বাস করে, কোথাও এমন চিহ্নই নেই।

বিমল বললে, "সূর্যের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে বটে, কিন্তু সামনের ওই অরণ্যটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সূর্যকরও ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, এই দ্বীপের বাসিন্দারা সূর্যকে ভয় করে। ওই অরণ্যের অন্ধকারের ভেতরে গেলে হয়তো আমরা তাদের আবিষ্কার করতে পারব। কিন্তু সাবধান, বন্দুককে প্রস্তুত রেখে আমাদের ওই বনের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে।"

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সকলে আবার অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

নীচের দিকে ছোট-বড় পাথর, ঝোপ-ঝাপ ও আগাছার জঙ্গল এবং মাথার ওপরে লতার ঘন জালে বাঁধা মস্ত মস্ত গাছের শ্যামল পত্রছত্র। বাতাসের হিল্লোলে শোনা যাচ্ছে অশ্রান্ত তরু-মর্মরের ভাষা। দেখতে দেখতে দিনের আলো যেন ঝিমিয়ে পড়ল! বনের ভেতরে চারদিকে নেমে এলো সন্ধ্যার আবছায়া। সেই আলো-আঁধারি মাখা অরণ্যের অন্তঃপুর তখন হয়ে উঠল রীতিমতো রহস্যময়।

তারা বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পার্বত্য প্রদেশের অরণ্য। এখানে বনের এক-একটা অংশ হঠাৎ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। সেই রকম একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল সচমকে বলে উঠল, "চুপ!"

নীচের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে কাদের কণ্ঠস্বর! সেগুলো যে মানুষের কণ্ঠস্বর তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সে-রকম স্বরে কথা কয় না। তারও চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার। এই অদ্ভুত দ্বীপের গভীর জঙ্গলে বসে কারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে ইংরেজি ভাষায়! সে কথাগুলো শোনা গেল, বাংলা ভাষায় তরজমা করলে তা দাঁড়ায় এই রকম। একজন বললে, "চার পায়ে চলবো না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

কয়েকটা কণ্ঠ সমস্বরে বললে, "আমরা মানুষ!"

প্রথম কণ্ঠ বললে, "মাছ-মাংস খাবো না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

উত্তরে সমস্বরে শোনা গেল, "আমরা মানুষ।"

আবার প্রথম কণ্ঠ বললে, "মানুষদের দেখলে তাড়া করবে না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

সমস্বরে শোনা গেল, "আমরা মানুষ!"

তারা ইংরেজি ভাষায় কথা কইছে বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিকতা এবং উচ্চারণে ছিল অদ্ভুত এক জড়তা। কৌতূহলী বিমল মাটির ওপরে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে পাহাড়ের ধারে গিয়ে নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে সাবধানে দেখতে লাগল। অন্য সকলেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

নীচের দিকে রয়েছে একটা খাদের মতো অপরিসর জায়গা; দুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় নিয়ে সংকীর্ণ একটা উপত্যকার মতো সেই খাদটা খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। এধার থেকে ওধারের পাহাড় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ওপর দিকে রয়েছে এমন লতা-পাতার জাল যে, নীচের খাদের ভেতরে সূর্যরশ্মির একটা টুকরো পর্যন্ত প্রবেশ করছে না। ছায়ামাখা ময়লা আলোয় খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মানুষের মূর্তি। খানিকক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল, সেগুলো মানুষের মূর্তি হলেও তাদের দেহগুলোকে অমানুষিক বললেও অন্যায় হবে না। প্রত্যেক মূর্তিরই দেহের ওপর-অংশ যেমন বড়, পায়ের দিক তার তুলনায় তেমনি ছোট। তাদের মধ্যে যে মূর্তিটা সবচেয়ে বৃহৎ, তাকে দেখলে বনমানুষ বা গরিলা ছাড়া আর কোন জীবকেই মনে পড়ে না। অথচ তাকে গরিলা বলাও চলে না, কারণ তার দেহ খুব বেশি রোমশ নয় এবং তার মুখেও মাখানো রয়েছে প্রায় মানুষের মতো ভাব।

অন্যান্য মূর্তিগুলো তেমনি উদ্ভট। প্রত্যেকটাকে দেখলেই কোন না কোন জন্তুর কথা স্মরণ হয়। একটা মূর্তিকে দেখতে তো প্রায় প্রকাণ্ড একটা শূকরের মতোই, তার নাকের তলায় চিবুক বা ওষ্ঠাধরের কোনও চিহ্ন নেই বললেও চলে। অথচ সে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে এবং তার দেহের সাধারণ গঠনের মধ্যে শূকরের চেয়ে মানুষের সাদৃশ্যই বেশি। তাদের দেহের অন্যান্য বিশেষত্বগুলো আধ-অন্ধকারে ভালো করে বোঝা গেল না।

একটা বড় গাছের ডালের ওপর থেকে নেমে এসেছিল কাছির মতো মোটা খুব লম্বা দুটো ঝুরি। গরিলার মতো দেখতে মানুষটা হঠাৎ দুই হাতে সেই দুটো ঝুরি ধরে ফেলে অনায়াসে মাটির ওপর থেকে খানিকটা ওপরে উঠে বারংবার দোল খেতে লাগল মনের আনন্দে। তারপর সেই ভাবেই শূন্যে দুলতে দুলতে ভাঙা হেঁড়ে গলায় বললে, "আবার জাহাজ এসেছে, আবার প্রভুরা এসেছে, আবার আমাদের শাস্তি পেতে হবে।"

নীচে থেকে অন্য মূর্তিগুলো সমস্বরে বলে উঠল, "আবার আমাদের শাস্তি পেতে হবে।"

কুমার হঠাৎ বিমলের গায়ে একটা ঠেলা মারলে। বিমল সচমকে মুখ ফেরাতেই

কুমার ইঙ্গিতে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিলে।

যা দেখা গেল, ভয়াবহ!

খাদের ওপাশে পাহাড়ের ওপরে ছিল নানাজাতীয় গাছের তলায় একটানা ঝোপের সার। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে প্রকাণ্ড ও বীভৎস একখানা মুখ! সেটা যে কোন্ জীবের মুখ, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সেই ভয়ংকর মুখের গড়ন খানিকটা সিংহের, খানিকটা ভল্লুকের এবং খানিকটা গণ্ডারের মুখের মতো! এই দ্বীপের বাইরে পৃথিবীর দৃষ্টি নিশ্চয়ই কোনদিন এমন অভাবিত ও অপার্থিব জীবকে দর্শন করবার সুযোগ পায়নি! পণ্ডিতরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম পৃথিবীতে আশ্চর্যরূপে বীভৎস ও বিপুলবপু জীবরা নাকি বিচরণ করত। মাটি খুঁড়ে তাদের অনেকের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পণ্ডিতরা সেই সব কঙ্কাল দেখে তাদের চেহারা কতকটা অনুমান করে নিয়েছেন! এই দ্বীপে কি তাদেরই কোন কোন বংশধর আজও বিদ্যমান আছে?

জন্তুটার দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল যেন ক্ষুধিত হিংসার আগুন।

মানিক বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সেই মুখখানার ওপরে গুলিবৃষ্টি করবার উপক্রম করলে।

জয়ন্ত টপ্ করে তার হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে তিরস্কার করে বললে, "ক্ষান্ত হও মানিক, কর কি! বন্দুকের শব্দ শুনে এখানকার সব জীব যদি আমাদের কাছে ছুটে আসে, তাহলে আর কি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব?"

হঠাৎ ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল সেই বেয়াড়া মুখখানা।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "জীবটা যে ভয়ানক হিংস্র তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। মাঝখানে এই খাদটা আছে বলেই এতক্ষণ ও আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি। এখন বোধহয় অন্য দিক দিয়ে এদিকে আসবার জন্যে চেষ্টা করবে। এখানে ওরকম আরও কত জীব আছে কে জানে! আপাতত বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "আমারও ওই মত। এই অন্ধকার জঙ্গলের ভেতরে আমরা অত্যন্ত অসহায়। আমরা কারুকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের ওপরে নজর রেখেছে। এখানকার প্রত্যেক ঝোপ-ঝাপই বিপজ্জনক। আসুন, আবার আমরা বেরিয়ে যাই।"

সাত

দ্বীপের অরণ্য থেকে সকলে যখন আবার নিজেদের তাঁবুর ভেতরে ফিরে এল, তখন সর্বাগ্রে তাদের সম্ভাষণ করলেন সুন্দরবাবু। শুধোলেন, "জঙ্গলের ভেতরে আরও কতগুলো হনুমান-বিছে দেখে এলে?"

মানিক বললে, "আরে রেখে দিন আপনার হনুমান-বিছে! আমরা যাদের দেখেছি তাদের দেখলেই আপনি 'হুঁম্' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।"

বিস্ময়ে দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "বল কি হে? হুনুমান-বিছের চেয়েও আরও ভয়ানক কিছু থাকতে পারে নাকি? উঁহু! একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!"

—"আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন তবে নিজেই একবার জঙ্গলে গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন না!"

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "যে জঙ্গলে হুনুমান-বিছে পাওয়া যায় সেখানে কোন ভদ্রলোকেরই যাওয়া উচিত নয়।"

—"আরে বার বার কি হুনুমান-বিছের কথা বলছেন? আমরা একটা কি জানোয়ার দেখেছি জানেন? তাও তার সমস্ত দেহটা দেখতে পাইনি, দেখেছি কেবল তার মুখখানা! আপনি ছবির নৃসিংহ-মূর্তি দেখেছেন তো? এই মূর্তি দেখলে নৃসিংহও ভয়ে পিঠটান না দিয়ে পারবে না।"

—"হুম্, তুমি বড্ড বাজে কথা বল মানিক। নৃসিংহই হচ্ছে রূপকথার একটা অসম্ভব আর আজগুবি মূর্তি। তারও চেয়ে অপার্থিব কোন জানোয়ার পৃথিবীতে থাকতে পারে নাকি?"

—"সুন্দরবাবু, কল্পনা করুন এমন একখানা মস্ত বড় মুখ যার খানিকটা দেখতে সিংহের মতো, খানিকটা ভালুকের মতো আর খানিকটা গণ্ডারের মতো। অর্থাৎ তাকে সিংহও বলা যায় না, ভালুকও বলা যায় না, গণ্ডারও বলা যায় না।"

সুন্দরবাবু আতঙ্কে এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর মুখের ভেতর থেকে একটি টুঁ শব্দও নির্গত হল না।

মানিক বললে, "আমরা আরও কী সব আশ্চর্য মূর্তি দেখেছি শুনবেন? গরিলার মতো দেখতে মানুষ, শুয়োরের মতো দেখতে মানুষ, ষাঁড়ের মতো দেখতে মানুষ, বাঘের মতো দেখতে মানুষ, শেয়ালের মতো দেখতে—'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি মানিককে বাধা দিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, "থামো বাপু, থামো! তুমি কি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে চাও? তুমি কি আমাকে ডাহা হাঁদা-গঙ্গারাম পেয়েছ? আরে গেল রে!"

বিমল বললে, "না সুন্দরবাবু, মানিকবাবু সত্য কথাই বলছেন।"

তবু সুন্দরবাবু বিশ্বাস করতে চাইলেন না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখ জয়ন্ত, আমি বরাবরই দেখে আসছি, তুমি আমাকে কোন দিনই মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করনি। মানিক যা বলছে তা কি সত্যি?"

জয়ন্ত বললে, "মানিক একটুও অত্যুক্তি করেনি। এ-রকম সব সৃষ্টিছাড়া জীবকে আমরা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছি।"

অত্যন্ত দমে গিয়ে সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "জয়ন্ত, এসব দেখবার পরও তোমরা এখনও কি এই দ্বীপের ওপরে থাকতে চাও? আমি কি আগেই তোমাদের সাবধান করে দিইনি যে এটা হচ্ছে ভুতুড়ে দ্বীপ? দেশে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, মাস দুই পরে পেনশন নিয়ে পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে হাঁপ ছাড়ব মনে করছি, আর তোমরা কিনা আমাকে ধাপ্পা দিয়ে অপঘাতে মারবার জন্যে এই ভয়ংকর স্থানে টেনে নিয়ে এলে? তোমাদের

মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই ভাই?" বলতে বলতে সুন্দরবাবুর মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে এলো।

বিমল তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে শান্ত কণ্ঠে বললে, "ভাববেন না সুন্দরবাবু, আমরা বেঁচে থাকতে আপনার কোনই অনিষ্ট হবে না।"

সুন্দরবাবু আশ্বস্ত হলেন না, মুখ ভার করে বললেন, "আপনি ভারী কথাই তো বললেন! আপনারা বেঁচে থাকলে আমার অনিষ্ট হবে না, কিন্তু এই সাংঘাতিক দ্বীপে এসেও আপনারা যে বেঁচে থাকবেন এমন আশা কেউ করতে পারে কি?"

—"নানা বিপদের মুখে গিয়েও যখন আমরা মরিনি, তখন এই ছোট্ট দ্বীপ থেকে নিশ্চয়ই জ্যান্ত দেহ নিয়ে ফিরে যাব, এমন বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু এখন সে সব কথা থাক। আপাতত আমাদের দেহও হয়েছে শ্রান্ত আর উদরের ক্ষুধাও হয়েছে অশান্ত, এখন আমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে রন্ধনশালার রামহরি! চলুন সুন্দরবাবু, সেই দিকেই ধাবমান হওয়া যাক। বৈকালে চায়ের আসরে আপনাকে এই দ্বীপের রহস্য বুঝিয়ে বলব।"

* * * *

সারাদিন সুন্দরবাবু তাঁবুর বাইরে একটিবারমাত্র পা বাড়াননি। বৈকালে বিমলদের চায়ের আসর বসল বাইরে খোলা জমির ওপরে। সেখান থেকে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি বারংবার ডাকবার পরে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চায়ের আসরে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু চা পান করতে করতে ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত চক্ষে ক্রমাগত দূরের পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু দূরের আলোছায়া-মাখা অরণ্য ও পাহাড়কে দেখাচ্ছিল তখন ছবির মতো সুন্দর। এদিকে ছোট নদীটিও যেন রুপোলী আলোকলতার মতো পড়ে রয়েছে পৃথিবীর শ্যামল শয্যার ওপর। চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে পরম শান্তির মধুর ইঙ্গিত, কোথাও কোন বিভীষিকার এতটুকু আঁচ পর্যন্ত নেই।

চা-পান করতে করতে বিমল বললে, "সুন্দরবাবু, অনেকদিন আগে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে পেন্‌ড্রিক নামে এক সাহেব এই দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। এখানে এসে তিনি যা দেখেছিলেন সে সমস্তই কাগজে-কলমে লিখে রেখে গেছেন। সেই লেখাটি বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ্. জি. ওয়েলস্ "দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো" নামে একখানি পুস্তকে প্রকাশ করেছেন।

আমি বরাবরই ওয়েলস্ সাহেবের রচনার ভক্ত। তাঁর ওই বইখানি পড়েই আমি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপের কথা জানতে পারি। ডাঃ মোরো ছিলেন একজন বিচক্ষণ জীবতত্ত্ববিদ। কেবল তাই নয়, Surgery বা শল্যবিদ্যায় তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। অনেক গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হন যে, বিভিন্ন জন্তুর জীবন্ত দেহের উপরে অস্ত্রোপচার করে তাদের দেহগুলোকে মানুষের দেহের মতো করে তোলা যায়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই ডাঃ মোরো ছিলেন দস্তুরমতো উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি। আরে অপারেশন করে গাধাকে যদি মানুষ করে তোলা যেত

তা হলে তো ভাবনাই ছিল না!"

বিমল বললে, "ব্যস্ত হবেন না সুন্দরবাবু, আগে আমার কথা শুনুন। ডাঃ মোরো কেন যে এরকম অভাবিত সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ওয়েলস্ সাহেবের কেতাবখানা পড়ে দেখলে আপনিও তা উপলব্ধি করতে পারবেন। ডাঃ মোরোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে আমি আর কোন বাক্যব্যয় করতে চাই না। তবে তিনি যে সত্যসত্যই গরিলা, বৃষ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না, ভালুক, শুয়োর, কুকুর প্রভৃতির দেহের ওপরে অস্ত্রচালনা করে তাদের আকার করে তুলেছিলেন যথাসম্ভব মানুষের মতোই, পেন্‌ড্রিক্ সাহেব স্বচক্ষে তা দেখে লিখে রেখে গিয়েছেন। আর তাঁর কথা যে কাল্পনিক নয়, আমরাও আজ এই দ্বীপে এসে তার যথেষ্ট প্রমাণই পেয়েছি। দ্বীপে আমরা আজ যে সব মনুষ্য-রূপধারী জন্তুগুলোকে দেখেছি, সেগুলো হয় ডাঃ মোরোর স্বহস্তের কীর্তি, নয় তারা হচ্ছে তাঁরই সৃষ্ট জীবদের বংশধর। তাদের দেহই কেবল মানুষের মতো দেখতে নয়, তারা কথাও কয় মানুষের ভাষায় ইংরেজিতে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "নাঃ, ডাঃ মোরো পাগল না হলেও শেষটা আমাকেই দেখছি পাগল হতে হবে। আপনি কি বলতে চান বিমলবাবু, অস্ত্রোপচার করে জন্তুকেও শেখানো যায় মানুষের ভাষা?"

বিমল বললে, "না, আমি সে কথা বলতে চাই না। ডাঃ মোরো নিজেই পেন্‌ড্রিক সাহেবকে বলেছিলেন, এই সব জন্তুকে মানুষের আকার দিয়ে মানুষের ভাষা শিখিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কেবল মানুষের ভাষা নয়, তিনি তাদের মানুষের আচার-ব্যবহারও শেখাতে ভোলেননি। ওয়েলস্ সাহেবের কেতাবে এমন ইঙ্গিতও আছে, ডাঃ মোরো হিপ্‌নোটিজম্ বা সম্মোহন-বিদ্যাও জানতেন। খুব সম্ভব সেই সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবই ওই মানুষ-জন্তুগুলোর ওপরে কাজ করেছিল সবচেয়ে বেশি। মানুষ-জন্তুগুলো ডাঃ মোরোকে ভয় করত যমের মতো, তাঁকে তারা প্রভু বলে মনে করত। ডাঃ মোরো তাদের বুঝিয়েছিলেন—তোমরা হচ্ছ মানুষ; তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো চলাফেরা কোরো না; তোমরা কখনও মৎস্য-মাংস ভক্ষণ কোরো না; মানুষ দেখলে তোমরা তাদের পেছনে তাড়া করে যেয়ো না প্রভৃতি। এই সব নীতি-বাক্য তিনি তাদের সর্বক্ষণ মুখস্থ করতে বলতেন। আজ আমরাও তাদের মুখস্থ করা নীতিবাক্য কতক কতক শুনে এসেছি।"

সুন্দরবাবুর বিস্ময় এমন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল যে মুখব্যাদান করে তিনি নির্বাক ভাবে বসে রইলেন মূর্তির মতো।

বিমল বললে, "কিন্তু ডাঃ মোরো খোদার ওপরে খোদকারি করতে গিয়েছিলেন, তাই পরে প্রকৃতি নিতে চেয়েছে প্রতিশোধ। ওইসব গরিলা-মানুষ, বাঘ-মানুষ আর অন্যান্য জন্তু-মানুষ দেখতে মানুষের মতো হলেও মানুষের প্রকৃতি তাদের ওপরে সমানভাবে কাজ করতে পারলে না। তাদের ভেতরে ক্রমেই বেশি করে আবার ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল জানোয়ারের প্রকৃতি। তারপর জন্তু-মানুষদের যেসব সন্তান হল, তাদের দেহও হয়ে উঠল অনেকটা জন্তুর মতো দেখতেই। শিশু-বয়সে তারা বাপ-মায়ের কাছ থেকে মানুষের ভাষা ও নীতি শিক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু তাদের কাছে প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ জন্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব। আজ

তাদের মাংস খেতে আপত্তি নেই। মানুষ দেখলে হিংস্র জন্তুর মতোই তাড়া করবে আর মাঝে মাঝে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেও এখন তারা বিচরণ করবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো। তাদের বংশধররা হয়তো অবিকল জন্তুর দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে, হয়তো মানুষের ভাষায় কথা কইবার শক্তি পর্যন্তও তাদের থাকবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ধরলুম, এই দ্বীপে বাস করে কতকগুলো আজব জন্তু-মানুষ; কিন্তু আমি যে হুনুমান-বিছেটাকে দেখেছি, তার সঙ্গে তো কোন মানুষের কি কোন বিশেষ জন্তুর চেহারার কিছুই মেলে না! সেটা এই দ্বীপে এলো কেমন করে? তারপর ধরুন, আপনারা আজ যে কিম্ভূতকিমাকার সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারটাকে দেখেছেন, তাকেও তো তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারি না!"

বিমল বললে, "পেনড্রিক্ সাহেবের কাছে ডাঃ মোরো বলেছিলেন, জন্তু-মানুষের পর জন্তু-মানুষ গড়তে গড়তে তাঁর যখন একঘেয়ে লাগত, তখন তিনি বৈচিত্র্যের জন্যে একাধিক জন্তুর চেহারা মিলিয়ে মাঝে মাঝে সৃষ্টিছাড়া সব জানোয়ার তৈরি করতেন। ওই হুনুমান-বিছে প্রভৃতি সেই সব জানোয়ারেরই নমুনা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আপনার ওই পেন্‌ড্রিক্ সাহেব আর ডাঃ মোরো জাহান্নমে গেলেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উপস্থিত নিজেদের কথাও ভেবে দেখতে হবে তো? ওই নরদেহধারী জন্তুগুলো আর জন্তুদেহধারী উলঙ্গ বিভীষিকাগুলো যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"এর মধ্যে যদি-টদির কিছু নেই, ওরা আমাদের আক্রমণ করবেই।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "বলেন কি মশাই?"

—"হ্যাঁ। খুব সম্ভব ওরা আজ রাত্রেই আমাদের আক্রমণ করবে।"

—"কি করে জানলেন আপনি?"

—"ওরা আমাদের দেখেছে। ওদের মধ্যে যারা বেশি হিংস্র তারা নিশ্চয়ই আজ রাত্রে শান্তভাবে চুপ করে বাসায় বসে থাকবে না।"

—"কিন্তু আপনি কেবল রাত্রের কথাই তুলছেন কেন? আমাদের আক্রমণ করবার ইচ্ছে থাকলে ওরা দিনের বেলাতেও আসতে পারে তো?"

—"আপনি কি হিংস্র জন্তুদের স্বভাব জানেন না? দিনের বেলায় তাদের হিংস্র মন আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। দিনের আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা জাগ্রত হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। রাত্রি যত বাড়ে তাদের হিংস্র ভাবও তত বেশি হয়ে ওঠে। সেই সময় তারা বেরিয়ে পড়ে দলে দলে জীব-শিকারে। আমার অনুমান সত্যি কিনা আজে রাত্রেই পাওয়া যাবে তার প্রমাণ।"

সুন্দরবাবু ভয়ার্ত স্বরে বললেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি প্রমাণ-ট্রমাণ কিছুই পেতে চাইনে। এই মুহূর্তেই আমি জাহাজে গিয়ে উঠতে চাই।"

বিমল সে কথা কানে না তুলে বললে, "এই দ্বীপের সব জীবই যে হিংস্র আর হত্যাকারী, আমি সে কথা মনে করি না। আমরা আজ স্বকর্ণে শুনেছি, কতকগুলো জীব এখনও নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে আর মনুষ্য-ধর্ম পালন করবার জন্যে নীতি-বাক্যও মুখস্থ করে থাকে। এও শুনে এসেছি, এখানে আমাদের আবির্ভাবে

তারা ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মতো আসল মানুষকে তারা মনে করে প্রভুর মতোই। খুব সম্ভব তারা আমাদের আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিতে রাজী হবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "যে জীবগুলো তাদের মতো বৈষ্ণব নয় আপনি সেই হতভাগাদের কথা ভাবছেন না কেন? হুনুমান-বিছে আর ঐ ওর-নাম-কি সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের দল যদি আমাদের এখানে এসে হানা দেয়?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমরা যে সঙ্গে এতগুলো সেপাই, মেসিন-গান আর বন্দুক-রিভলভার এনেছি, সে সব কি খালি লোক দেখাবার জন্যে?—কুমার, আর খানিক পরেই সন্ধ্যা নামবে। তুমি এখন থেকেই সেপাইদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে এস। সকলেই যেন এক একটা ঝোপঝাপ বেছে নিয়ে ওই বন আর নদীর দিকে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। মেসিন-গানগুলো বাইরে যথাস্থানে এনে রাখবার ব্যবস্থা কর। আজকে আমরা রাত্রি যাপন করব কবির মতো চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুক্ত আকাশের তলায়। তফাত খালি এই, কবিরা ব্যবহার করেন মসী, আর আমরা হব অসির ভক্ত।"

কিন্তু এই অসাময়িক কবিত্বের জন্যে সুন্দরবাবুর গা যেন জ্বলে গেল। একে তো যুদ্ধের আয়োজনের কথা শুনেই তাঁর বুকের ভেতরে জেগেছে টিপটিপ শব্দ, তার ওপরে আবার এই কবিত্বের অত্যাচার! এতটা তাঁর আর সহ্য হল না, তিনি তাড়াতাড়ি দোদুল্যমান ভুঁড়ি নিয়ে ছুটলেন সকলের নামে নালিশ করতে রামহরির কাছে।

আট

সুন্দরবাবুকে 'উদর-পিশাচ' উপাধি দিয়ে মানিক যখন-তখন জ্বালাতন করত; কিন্তু এই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর সেই সুবিখ্যাত জঠরাগ্নি ঘুমিয়ে পড়েছিল যেন একেবারেই! তার ওপরে আজ আবার কতকগুলো দানব বা রাক্ষসের মতো জীবের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হতে পারে এই সম্ভাবনাটা তাঁকে এতটা কাহিল করে ফেললে যে, মুখ-বিবরে তিনি একখণ্ড খাদ্যও নিক্ষেপ করতে পারলেন না।

অভুক্ত অবস্থাতেই কেবল এক পেয়ালা কফি পান করেই বিমলদের সঙ্গে তিনি গাত্রোত্থান করলেন। তাঁবুর বাইরে পদার্পণ করবার ইচ্ছা তাঁর একটুও ছিল না। নিতান্ত চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই সকলের পেছনে পেছনে তিনি সুড়সুড় করে এগুতে লাগলেন ঠিক যেন বলির পাঁঠার মতো!

বিমল ভুল বলেনি, সত্যিই সেদিনকার রাত্রিটি ছিল কবিত্বময়। দূরে মহাসাগরের ভৈরব রাগের সঙ্গে কাছের নটিনী তটিনী জলবীণার তারে তারে বাজছিল অতি মৃদু একটি রাগিণীর গুঞ্জন। আকাশের তারা-সভায় জেগে ছিল সভাপতি চাঁদ। তালজাতীয় গাছগুলি দুলে দুলে উঠছিল বাতাসের তালে তালে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথার পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না পরিয়ে দিচ্ছিল ঝকমকে বিজলী-হার। আরও দূরে স্তব্ধ পাহাড় ও নিথর বনভূমিকে দেখাচ্ছিল স্বপ্ন-জগতের পরীপুরীর মতো।

কিন্তু এই শান্তি-সুষমা সুন্দরবাবুকে অভিভূত করতে পারলে না। তাঁর মতে, ঝড়ের আগে প্রকৃতিও এমনি শান্ত-ভাব ধারণ করে। যে কোন মুহূর্তে এখানে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধবার সম্ভাবনা, তাই ভেবে ভেবেই তিনি হয়ে পড়লেন যারপরনাই কাতর! কিন্তু সেই কাতরতার ভেতরেও তিনি পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করবার সঠিক উপায় খোঁজবার জন্যে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে ভুললেন না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল পরস্পরের দিকে হেলে পড়ে তিনটি তালজাতীয় গাছ। তারই তলায় রয়েছে একটি নাতিবৃহৎ ঝোপ এবং ঝোপের ভেতর থেকে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে মস্ত একখানা পাথর। সুন্দরবাবু বুঝলেন ও-জায়গাটা তাঁর পক্ষে হবে অনেকটা নিরাপদ।

বিমলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "বিমলবাবু, ওই তিনটে গাছের তলায় বসে আমি যদি পাহারা দি, তাহলে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

বিমল জায়গাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবুর মনোভাব বুঝে মুখ টিপে হেসে বললে, "আপত্তি? কিছুমাত্র না।"

মানিক বললে, "কিন্তু সুন্দরবাবু, একটু হুঁশিয়ার হয়ে ওখানে যাবেন।"

সুন্দরবাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু মানিকের কথা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "হুঁশিয়ার হয়ে যাবো! কেন বল দেখি?"

—"কে বলতে পারে ওই ঝোপের তলায় আপনার হনুমান-বিছের মতো কোন বিদকুটে জন্তু-টন্তু লুকিয়ে নেই?"

সুন্দরবাবু মানিকের কথা নিতান্ত অসংগত মনে করতে পারলেন না। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে ঝোপটার দিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ ভাই জয়ন্ত, তুমি একবার আমার সঙ্গে ওই ঝোপ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে?"

—"কেন সুন্দরবাবু?"

—"ভায়া হে, একজোড়া চোখের চেয়ে দু-জোড়া চোখের দাম বেশি। দুজনে মিলে ঝোপটা একবার পরীক্ষা করে দেখব, ওখানে যাচ্ছেতাই কিছু ঘুপটি মেরে আছে কিনা!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সেই ঝোপ পর্যন্ত গেল। না, সেখানে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কৃত হল না। সুন্দরবাবু তখন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চার হাতে-পায়ে গুঁড়ি মেরে ঝোপের ভেতরে ঢুকে বললেন, "হুম্! কপালে আজ কি লেখা আছে, কে জানে?"

রাত্রির মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছিল অশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জল-কল্লোল। আকাশ-সায়রে সাঁতার কেটে চাঁদ এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। চারিদিকে পুলক ছড়িয়ে দিয়েছে স্বচ্ছ আলোক। এখানে-ওখানে ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা খেলছে জ্যোৎস্না। মাঝে মাঝে ছোট নদীর ক্ষীণ রেখাটি দেখা যাচ্ছে গলানো হীরার মতো!

কেটে গেল প্রথম রাত্রি।

প্রকৃতির ভেতরে আলোকোৎসব হচ্ছে বটে, কিন্তু জ্যোৎস্নাকেও হার মানিয়ে দেয় এমন একটা সুতীব্র ও সুদীর্ঘ আলোক আজ এখানে ঘোরাফেরা করছে এই

ক্ষুদ্র দ্বীপের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সেটা হচ্ছে জাহাজের শক্তিশালী সার্চলাইট। অন্ধকারকে নির্বাসিত করবার জন্যে কুমারই আজ এই আলোর ব্যবস্থা করে এসেছে।

আচম্বিতে এই চলন্ত আলোক-রেখাটা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সকলে সচকিত দৃষ্টিতে দেখলে, একটা ঢালু পাহাড়ে-জমির ওপরে আবির্ভূত হল অনেকগুলি মূর্তি। দল বেঁধে তারা নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে বিমল বললে, "ওদের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে; কিন্তু ওরা হাঁটছে চতুষ্পদ জন্তুর মতোই!"

জয়ন্ত বললে, "ওরা আসছে আমাদেরই দিকে।"

বিমল বললে, "হুঁ, তা আসবেই তো। রাত্রি হয়েছে গভীর, জেগেছে ওদের নকল-মানুষ-দেহের মধ্যে বুভুক্ষু পশু-আত্মা! জয়ন্তবাবু, ডাঃ মোরোর থিয়োরির ভেতর, গোড়াতেই ছিল গলদ। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কোন পশুর বাইরেকার আকার বদলালেই তার ভেতরকার স্বভাব বদলায় না। পশুরা হচ্ছে—"

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

সার্চ-লাইটের সীমার মধ্যে এসে দাঁড়াল আরও একদল মূর্তি। তারা দেখতেই কেবল মানুষের মতো নয়, হাঁটছেও মানুষের মতো দুই পায়ে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট, কিন্তু গম্ভীর স্বর বললে, "চার পায়ে চলব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ!"

গম্ভীর কণ্ঠ আবার বললে, "মাছ-মাংস খাব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ!"

গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললে, "মানুষদের দেখলে তাড়া করব না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ!"

বিমল বললে, "শুনছেন জয়ন্তবাবু? এই দ্বীপের সব নরপশু এখনও ডাঃ মোরোর শিক্ষা ভোলেনি? এর একটা কারণও অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, যারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় তারা হচ্ছে, ডাঃ মোরোর দ্বারা সৃষ্ট নরপশুদের বংশধর। তারা ডাঃ মোরোকে দেখেওনি, তাই তাঁর সম্মোহন-শক্তি তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তারও করতে পারেনি!"

সুন্দরবাবুও নিজের ঝোপে বসে সব দেখছিলেন এবং শুনছিলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে উঠছিলেন চমকে চমকে! মাঝে মাঝে এটাও ভাবছিলেন যে, এমন ভয়ানক জায়গায় এই ভাবে একলা একটা ঝোপের ভিতরে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়! বিমলদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। বিখ্যাত প্রবাদ-বচনটি একটু বদলে নিয়ে মনে মনে তিনি বলছিলেন—'দশে মিলি করি কাজ, হারি-মরি নাহি লাজ।' শেষটায় সত্যসত্যই তিনি যখন নিজের ঝোপটি ত্যাগ করে বহির্গত হবার উপক্রম করছেন, তখন ঘটে গেল একটা অকল্পিত এবং ভয়ংকর ঘটনা।

হঠাৎ একদিক থেকে আকাশ-ফাটানো চিৎকার জাগল—"ওরে বাবা রে, ভূতে ধরলে রে।"

সুন্দরবাবু ভূতকে মানতেন অত্যন্ত বেশিরকম। ভূতের নাম শ্রবণ করলেই তাঁর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠত রোমাঞ্চিত—বিশেষত রাত্রিবেলায়। তদুপরি তিনি এখন যেখানে অবস্থান করছেন, তাঁর মতে সেটা হচ্ছে দস্তুরমতো ভুতুড়ে দ্বীপ! সুতরাং সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না! এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় স্তম্ভিত চক্ষে যে অসম্ভব দৃশ্য অবলোকন করলেন তা হচ্ছে এই।

রামহরি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে এবং তার পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সে বিভীষণ জীবটা। উঃ, সুন্দরবাবু প্রায় মূর্ছিত হয়ে ধরাশায়ী হন আর কি!

দেখা যাচ্ছে হাতির মতো প্রকাণ্ড একখানা আশ্চর্য মুখ! হাতির মতো প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু সেটা মোটেই হাতির মুখ নয়! সে যেন খানিক সিংহ, খানিক ভল্লুক, খানিক গণ্ডারের মুখ নিয়ে ভেঙে-চুরে অথচ মিলিয়ে মিশিয়ে গড়া! তার দুটি ক্ষুধিত চক্ষে দপদপ করে জ্বলছে দারুণ হিংসার অগ্নি!

সুন্দরবাবু প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন, "হুম্, হুম্, হুম্।"

পরমুহূর্তেই দেখা গেল বাঘাকে, এবং শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ চিৎকার! মস্ত একটা লাফ মেরে বাঘা সেই মুখখানার পেছনে এসে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! তারপর সে কী কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো তর্জন-গর্জন এবং কী ঝটাপটি, লাফালাফি ও হানাহানি!

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, দুই নেত্রে সরষেফুল দেখে 'বাবা রে' বলে চেঁচিয়ে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটির ওপরে!

অন্যান্য সকলেই সেই দৃশ্য দেখেছিল। বিমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, "কুমার, আমার সঙ্গে এস। জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! আপনারা এইখানেই বসে ওইদিকে দৃষ্টি রাখুন!"

বিমল ও কুমার বেগে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলে, সেই কিম্ভূতকিমাকার, সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের মতো দেখতে মস্ত মুখখানার পেছনে কণ্ঠদেশ কামড়ে রয়েছে বাঘা! সেই অদ্ভুত জন্তুটা বাঘার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাঘাকে নিয়েই বারংবার মাটির ওপর থেকে লাফ মেরে শূন্যে উঠে আবার মাটির ওপরে এসে পড়ে ছটফট করছে এবং গড়াগড়ি দিচ্ছে; কিন্তু বাঘা যেন ছিনে জোঁক—দাঁতের কামড় একটুও আলগা করতে রাজী নয়!

গুড়ুম! গুড়ুম!—গর্জে উঠল বিমল ও কুমারের বন্দুক।

সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের মুখ আর একবার বাঘাকে নিয়ে শূন্যে লম্ফত্যাগ করে আবার ধরাশায়ী হয়ে দুই-একবার ছটফট করে স্থির হয়ে গেল!

কুমার বন্দুকের অগ্রভাগ দিয়ে সেই জীবটার দেহকে পরীক্ষা করে বললে, "আয় রে আমার বাঘা—আয় রে আমার মহাবীর! ওটা একেবারে পাথরের মতো মরে গিয়েছে, সাঙ্গ হয়েছে ওর লীলাখেলা!"

বিমল বিস্ফারিত নেত্রে বললে, "ভাই কুমার! ডাঃ মোরোর বিচিত্র খেয়াল

এ কী জন্তু সৃষ্টি করেছে! দেখ, এত বড় হাতির মতো মুখ, কিন্তু এই মুখের তলায় রয়েছে মাত্র হাত দেড়েক লম্বা আর হাতখানেক চওড়া একটা থলের মতো দেহ! আর সেই দেহের তলায় রয়েছে কুমিরের পায়ের মতো চারখানা ছোট ছোট পা! এ যেন পর্বতের মূষিক প্রসব!"

ঠিক সেই সময়ে ওদিক থেকে জয়ন্ত চিৎকার করে বললে, "বিমলবাবু! কুমারবাবু!"

বিমল ও কুমার আবার দ্রুতবেগে হাজির হল গিয়ে যথাস্থানে।

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, ওদিকে তাকিয়ে দেখুন, চারপায়ে হাঁটা জীবগুলোর সঙ্গে দুইপায়ে হাঁটা জীবগুলোর লড়াই বেধে গিয়েছে!"

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে বললে, "তাই তো দেখছি! ওদের মধ্যে যারা নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে, নিশ্চয়ই তারা হিংসুক জীবগুলোকে বাধা দিতে চায়।"

মানিক বললে, "অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা! এই অজানা দ্বীপেও আছে আমাদের না-জানা বন্ধু।"

কুমার বললে, "বিমল, অন্য অন্য জীবরা মারামারি নিয়ে ব্যস্ত বটে, কিন্তু সেই ফাঁকে তিনটে মূর্তি চুপি চুপি আমাদের দিকে আসছে দেখতে পাচ্ছ?"

বিমল আবার দূরবীনের সাহায্য গ্রহণ করে বললে, "কুমার, কুমার! দুটো মূর্তির গায়ের রং, চিতাবাঘের মতো! চাটগাঁয়ে গিয়ে তুমি এমনি মূর্তিই দেখেছিলে না?"

নরপশু তিনটে ঝোপঝাপ ও গাছপালার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করতে করতে অনেকটা এগিয়ে এল।

বিমল বললে, "ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া নয়। ছোঁড়ো সবাই বন্দুক। এক, দুই, তিন।"

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল। একটা মূর্তি লাফ মেরে উঠেই মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর একটা মূর্তি ধরাশায়ী হয়ে আর একটুও নড়ল না। তৃতীয় মূর্তিটা বেগে পলায়ন করলে।

বন্দুকের ভীষণ গর্জন শুনেই নরপশুরা মারামারি থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিতের মতো। তারপরেই কতকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, "আবার আমাদের প্রভুরা এসেছেন! এইবারে আমাদের শাস্তি পেতে হবে!"

অতঃপর সুন্দরবাবুর অবস্থাটা দেখা দরকার।

সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের গর্জন শ্রবণ করে সুন্দরবাবু অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, এখন তাঁর মূর্ছা ভেঙে গেল বন্দুকের শব্দে। তিনি বলে উঠলেন, "হুম্! ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে যে! তাহলে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে? কিন্তু এখানে যে দুটো ভুতুড়ে জানোয়ারের নমুনা দেখেছি বাবা, তাদের সঙ্গে লড়াই করে কখনো পেরে ওঠা যায়? যাদের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে যায় চমকে, তাদের সঙ্গে লড়ব কেমন করে? এখান থেকে লম্বা দেবারও কোন উপায় নেই, মহাসমুদ্রের মাঝখানে পুঁচকে একটা দ্বীপ, তারই মধ্যে হয়েছি বন্দী! ঝোপের বাইরেও পা বাড়াতে ভরসা হয় না, কে জানে বাবা কোথায় ঘুপটি মেরে বসে আছে বদমেজাজী

কিম্ভূতকিমাকারের দল! হুম্! কী যে করি! ওরে বাপ রে! এ আবার কি?"

বিপুল বিস্ময়ে এবং বিষম আতঙ্কে সুন্দরবাবুর বিস্ফারিত চক্ষু দুটো গোল হয়ে উঠল চাকতির মতো!

থরথর করে কাঁপতে লাগল পায়ের তলাকার মাটি, তারপরেই শোনা গেল যেন অসম্ভবরূপে বিরাট এক মহাদানবের বিশ্ব-ফাটানো ভৈরব হুংকারের পর হুংকার! তারপরেই দেখা গেল, পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পুঞ্জিভূত ধূম্ররাশি এবং থেকে থেকে ঠিকরে উঠছে মেঘচুম্বী প্রচণ্ড অগ্নিশিখা!

দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল বহু জীবের ভীত কণ্ঠস্বরের একটানা আর্তনাদ। এও দেখা গেল, অনেক তফাতে দলে দলে জীব কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ছুটোছুটি করছে দিকে দিকে, কিন্তু সেগুলো মানুষ কি জানোয়ার কিছুই বোঝা যায় না।

দুই হাত দিয়ে চেপে বুকের কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু মনে মনেই বললেন, "এ আবার কি কাণ্ড বাবা? পৃথিবীর প্রলয়কাল এল নাকি?"

ঝোপের বাইরে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে সুন্দরবাবুর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। তিনি আবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যান!

তারপর শোনা গেল বিমল চিৎকার করে বলছে, "আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে! পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে তপ্ত লাভার স্রোত! দ্বীপের সমস্ত প্রাণী মারা যাবে। নৌকো ভাসাও, নৌকো ভাসাও—জাহাজে চল!"

মানিকের গলায় শোনা গেল—"জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবু কোথায় গেলেন? সুন্দরবাবু?"

—"এই যে আমি, এই যে আমি" বলতে বলতে সুন্দরবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মানিক তাঁর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বললে, "আর নয়, এই অভিশপ্ত দ্বীপে আর নয়! প্রাণে বাঁচতে চান তো প্রাণপণে দৌড়ে চলুন!"

জাহাজ ছুটছে। তার আর দ্বীপের মাঝখানে এখন অনেকখানি ব্যবধান।

কিন্তু দ্বীপের দিকে তাকালে এখন কেবল দেখা যায় বিপুল ধূম্রপুঞ্জের সঙ্গে বিরাট অগ্নিকাণ্ড! আগুনের শিখায় লালচে হয়ে উঠেছে ওখানকার আকাশ পর্যন্ত।

বিমল দুঃখিত ভাবে বললে, "বিদায় ডাঃ মোরোর দ্বীপ! মনে এই আক্ষেপ রয়ে গেল তোমার সমস্ত রহস্য জানা গেল না।"

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, "আবার আপনি রহস্যের নাম মুখে আনছেন? রহস্য! যতদিন বাঁচব আর কখনো কোন রহস্যেরই ধার মাড়াব না—হুম্!"

যক্ষপতির রত্নপুরী

১

চীনে হোটেল

অনেকে অভিযোগ করেন, আমার জীবন নাকি অস্বাভাবিক!

তাঁদের মতে, স্বাভাবিক মানুষের জীবন এমন ঘটনাবহুল হতে পারে না।

যদিও নিজেকে আমি পাগল বা গণ্ডমূর্খের মতন নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করছি না, তবে তর্কের খাতিরে এখানে কেবল এই প্রশ্ন বোধহয় করতে পারি—নেপোলিয়ন কি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না? তিনি মাত্র বাহান্নো বৎসর বেঁচে ছিলেন। তার ভিতর থেকে প্রথম পঁচিশ বৎসর অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি মাত্র সাতাশ বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়নের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যে ঘটনার পর ঘটনার প্রচণ্ড বন্যা, তাদের অবলম্বন করে কি অসংখ্য নাটক ও উপন্যাস রচনা করা চলে না?

না-হয় নেপোলিয়নের মতন মহামানুষ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কথা ছেড়ে দি, কারণ তাঁর জীবনে ঘটনা ঘটবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল প্রচুর। তাঁর বদলে আমি মধ্য-যুগের এক শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর নাম বেন্‌ভেনুতো শেলিনি। তিনি ছিলেন ইতালীর এক বিখ্যাত ভাস্কর ও ওস্তাদ স্বর্ণকার। তিনি একখানি প্রসিদ্ধ আত্মচরিতও লিখে গেছেন। সাধারণ শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে। কিন্তু বেন্‌ভেনুতোর ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী যোগাতে পারে বহু বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর ও প্রায়-অসম্ভব উপন্যাসের উপকরণ। এজন্যে তাঁর আত্মচরিতকে অস্বাভাবিক বলে অভিযোগ করা চলে না। কারণ তাঁর জীবনের ঘটনাবলি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এক-একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে এমনি বিচিত্র! হয় ঘটনা-প্রবাহ আকর্ষণ করে তাদের জীবনকে, নয় তাদের জীবনই আকর্ষণ করে ঘটনা-প্রবাহকে।

বরাবরই লক্ষ্য করে দেখছি, আমি স্বেচ্ছায় কোন রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টি করতে না চাইলেও, কোথা থেকে আচম্বিতে আমার জীবনের উপরে এসে ভেঙে পড়েছে অদ্ভুত সব ঘটনার প্রবাহ। আমার বন্ধু কুমার হয়তো এ-সব ঘটনা-চক্রের বাইরেই পড়ে থাকত, কিন্তু সে হচ্ছে আমার নিত্যসঙ্গী, তার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কাজেই তাকেও জড়িয়ে পড়তে হয় এই সব ঘটনার পাকে পাকে। অর্থাৎ প্রবাদে যাকে বলে—'পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।'

এবারেও কেমন করে আমরা নিজেদের অজান্তেই হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা-প্রবাহের দ্বারা আক্রান্ত হলুম, এইখানে সেই কথাই লিখে রাখছি :

সেদিন সন্ধ্যায় কুমার এসে বললে, 'কী সব বাজে বই নিয়ে মেতে আছ? চল, আজ কোন হোটেলের দিকে যাত্রা করি।'

বই মুড়ে বললুম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু কোন্ হোটেলে?'

—'সেটা তুমিই স্থির কর।'

—'চৌরঙ্গীর দিশী আর বিলিতী হোটেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। চল আজ ছাতাওয়ালা গলির চীনে-পাড়ায়।'

—'ন্যান্‌কিনে? সেও তো বিলিতীর নকল।'

—'না হে না, আমরা যাব খাঁটি চীনে হোটেলে, খাঁটি চীনে খানা খেতে।'

—'উত্তম প্রস্তাব। রাজি!'

বাইরে বেরুবার জামা-কাপড় পরছি দেখে বাঘাও গাত্রোত্থান করে গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হল।

কুমার বললে, 'ওরে বাঘা, আজ আর তুই সঙ্গে আসিস্ নে। হোটেলঅলারা বদ-রসিক রে, কুকুর-খদ্দের হয়তো পছন্দ করবে না!'

কিন্তু বাঘা মানা মানতে রাজি নয় দেখে রামহরিকে স্মরণ করলুম।

রামহরি এসে বললে, 'দুই স্যাঙাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

—'চীনে হোটেলে খানা খেতে।'

—'সর্বনাশ! চীনেরা তো তেলাপোকা খায়! তোমাদেরও খাবার সখ হয়েছে নাকি?'

—'রামহরি, চীনেম্যানদের নামে ও-অপবাদটা একেবারেই মিথ্যে। তারা তেলাপোকা খায় না, তবে পাখির বাসার ঝোল খায় বটে!'

—'রাম রাম! পাখির বাসাও আবার খাবার জিনিস নাকি?'

—'তবু তুমি তাদের আর-একটা খানার নাম শোনো নি। তারা পঞ্চাশ, ষাট, আশী, একশো বছরের পুরানো ডিম খেতে ভারি ভালোবাসে!'

—'ওয়াক্! ও খোকাবাবু, শুনেই যে আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসছে! ওয়াক্!'

—'হাঙরও তাদের কাছে সুখাদ্য!'

—'পায়ে পড়ি খোকাবাবু, আর বোলো না! ছি ছি, ঐ সব সিষ্টিছাড়া খাবার তোমরা খেতে চাও?'

—'না রামহরি, হাঙর বা একশো বছরের পচা ডিম খাবার সৎসাহস আজও আমাদের হয় নি। তবে বাঘা বোধহয় হাঙর পেলে ছাড়বে না, ওকে তুমি সামলাও।'

আমি আর কুমার বেরিয়ে পড়লুম।

চীনে-পাড়ার খাঁটি চীনে-হোটেলে বাঙালীর দেখা পাওয়া যায় না। আর কিছুই নয়, রামহরির মতন অধিকাংশ বাঙালীরই আসল চীনে-হোটেল সম্বন্ধে ভয়াবহ কুসংস্কার আছে—তাই তাদের দৌড় বড়-জোর 'ন্যান্‌কিন' বা 'চাঙ্গুয়া' পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা যে চীনে-হোটেলে গেলুম সেখানে ভয় পাবার বা বমন ওঠবার মতন কিছুই ছিল না। চারিধার সাজানো-গুছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবারগুলিও সুস্বাদু—যদিও আমাদের দেশী-বিলাতী খাবারের সঙ্গে তাদের কিছুই মিল নেই। পরিবেশন করছিল একটি চীনে মেয়ে।

সর্বশেষে মেয়েটি নিয়ে এল চীনে চা। এ চা তৈরি করবার পদ্ধতিও অন্য রকম। মেয়েটি দুটি কাঁচের বা পোর্সিলেনের বাটি আনলে। একটি বাটিতে গরম জল ঢেলে তাতে শুক্‌নো ও পাকানো একখণ্ড চায়ের পাতা দিয়ে উপরে দ্বিতীয় বাটিটি চাপা দিয়ে চলে গেল। মিনিট তিন-চার পরে সে ফিরে এসে উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে দিতেই দেখি, সেই গুটানো চায়ের পাতাখানি সমস্ত বাটি ভরে ছড়িয়ে পড়ে জলের উপরে ভাসছে। ব্যস্, চা প্রস্তুত—এখন খালি চিনি মেশাও, আর চুমুক দাও! কিন্তু এ চায়ের স্বাদ অধিকাংশ বাঙালীরই ধাতে সইবে না।

কুমার চায়ের পেয়ালা তুলে বললে, 'বিমল, চীনে-হোটেলের ভেতর বসে চীনে খানা খেতে খেতে আর চুং চাং—চুং চিং কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চীনদেশেই এসে পড়েছি। ও-পাশের ঘরে ঐ চীনেম্যানদের দেখছ? ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে কথাবার্তা কইছে বটে, কিন্তু ওদের মুখে কোন ভাবের ছাপ নেই—ওরা যেন রহস্যময় মূর্তি!'

কুমারের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই আমার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হল।

ঠিক আমাদের পাশের ঘরেই জাগল হঠাৎ এক ক্রুদ্ধ গর্জন—সঙ্গে সঙ্গে বিষম হুড়োহুড়ি ও চেয়ার-টেবিল উল্টে-পড়ার শব্দ! তারপরেই এক আর্তনাদ!

রাত্রিবেলায় এই চীনে-পাড়া মারামারি হানাহানির জন্যে বিখ্যাত। পাছে অন্যের হাঙ্গামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম।

পর-মুহূর্তেই একটা মাঝবয়সী রক্তাক্ত চীনেম্যানের মূর্তি টলতে টলতে আমাদের কামরার কাছ-বরাবর এসে হেলে পড়ে গেল এবং তার দেহটা এসে পড়ল কামরার ভিতরে একেবারে কুমারের বুকের উপরে।

তারপরেই দেখলুম আমাদের কামরার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল প্রায়

আট-দশ জন চীনেম্যান—তাদের চেহারা দেখলে ভালো মানুষের প্রাণ ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠবে। কিন্তু আমরা দুজনেই ভালো মানুষ নই।

সব-আগে রয়েছে, লম্বায় না হোক চওড়ায় মস্ত-বড় এক মূর্তি, তার ডানহাতে একখানা আধ-হাত লম্বা রক্তমাখা ছোরা। সেইখানা উঁচিয়ে সে আমাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়বার উপক্রম করলে!

মারলুম এক ঘুসি ঠিক চোয়ালের উপরে—আমার গায়ের সব শক্তি ছিল সেই মুষ্টির পিছনে। কারণ আমি জানি, মারামারির সময়ে দরদ করে মারলে ঠকতে হয় নিজেকেই।

লোকটা ঠিক্‌রে পড়ে গেল ঠিক বজ্রাহতের মতনই।

তারপরেই শুনলুম অনেকগুলো ভারি ভারি জুতোর দ্রুত শব্দ! চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আমাদের ঘরের সামনে থেকে সমস্ত জনতা হল অদৃশ্য! কিন্তু পর-মুহূর্তেই হোটেলের অন্যদিকে আবার নতুন গোলমাল উঠল—কাদের সঙ্গে আবার কাদের মারামারি ঝটাপটি চলছে! খুব সম্ভব পুলিশ এসে পড়েছে।

এতক্ষণে কামরার ভিতরে নজর দেবার সময় হল।

কুমার তখন আহত লোকটাকে সযত্নে মাটির উপর শুইয়ে দিয়েছে!

কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলুম, আর কোন আশা নেই।

লোকটাও বুঝেছিল। তবু সেই অবস্থাতেও সে চোখ নেড়ে আমাকে তার কাছে যাবার জন্যে ইশারা করলে। আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলুম।

নিঃশ্বাস টানতে টানতে অস্ফুট স্বরে ইংরেজীতে সে বললে, 'আমি আর বাঁচব না। আমার জামার বোতাম খুলে ফ্যালো।'

তাই করলুম!

—'আমার গলায় ঝুলছে একখানা লকেট। সেটা তাড়াতাড়ি বার করে নাও।'

লকেটখানা বার করতেই সে বললে, 'লুকিয়ে রাখো! ছুন্‌-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।'

—'ছুন্‌-ছিউ কে?'

সে প্রথমটা উত্তর দিতে পারলে না, কেবল হাঁপাতে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে থেমে থেমে বললে, 'যে আমাকে মেরেছে।...কিন্তু আমি যখন মরবই...গুপ্তধন তাকেও ভোগ করতে দেব না...হ্যাঁ, এই আমার প্রতিশোধ...মাটির ভিতরে... গুপ্তধন—' তার কথা বন্ধ হল, সে চোখ মুদলে।

ভাবলুম, লোকটা বোধহয় এ-জন্মের মতন আর কথা কইতে পারবে না।

কুমার বললে, 'এ কী বলছে, বিমল? কিছুই তো বোঝা গেল না! গুপ্তধন কোথায় আছে?'

লোকটা আবার চোখ খুললে। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে টেনে টেনে বললে, 'কি-পিন্...কি-পিন্...সেখানে যেও...কি-পিন্—' হঠাৎ তার বাক্য-রোধ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেল!...

বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, তার হৃৎপিণ্ড আর নড়ছে না।

২

কি-পিন্ কাহিনী

খুনোখুনি, হানাহানি বা কোনরকম রোমাঞ্চকর কাণ্ডের কথা পর্যন্ত আমি ভাবি নি, কিন্তু দেখ একবার ব্যাপারখানা! এখানেও ছোরাছুরি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি? আবার গুপ্তধন—আবার দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, 'কি-পিন্'? আবার বুঝি আমার চির-চঞ্চল দুষ্টগ্রহটি সজাগ হয়ে উঠেছেন—কলুর বলদের মতন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারবার জন্যে?

কুমার ব্যস্তভাবে বললে, 'চটপট সরে পড়ি চল ভায়া। নইলে পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

হোটেলের একদিক থেকে তখনো আসছিল প্রচণ্ড ছুটোছুটি হুড়োহুড়ির শব্দ, নিশ্চয় গুণ্ডাদের সঙ্গে চলেছে পুলিশের দাঙ্গা।

সেই ফাঁকে আমরা সরে পড়লুম। সদর দরজার কাছেও পুলিশের লোক ছিল, বোধহয় আমাদের বাঙালী দেখেই বাধা দিল না।

একেবারে সিধে বাড়িতে এসে উঠলুম।

হতভাগা রামহরি বুড়ো হয়েছে, তবু তার চোখের জেল্লা কি কম? আমাদের দেখেই বললে, 'কার সঙ্গে মারামারি করে আসা হল শুনি?'

—'কে বললে আমরা মারামারি করেছি?'

—'থামো খোকাবাবু, মিছে কথা বলে আর পাপ বাড়িও না। নিজেদের জামা-কাপড়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি। ও আবার কি? কুমারের জামায় যে রক্তের দাগ!'

কুমার হেসে বললে, 'ধন্যি তুমি রামহরি! পাহারাওয়ালার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলুম, কিন্তু—'

—'কি সর্বনাশ! এর মধ্যে আবার পাহারাওয়ালাও আছে? এই বুঝি তোমাদের খেতে যাওয়া? এমন সব খুনে ডাকাত নিয়ে আর যে পারা যায় না। হাড় যে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। জামা-টামা খুলে ফ্যালো, দেখি কোথায় লাগল?'

বাঘাও ঘরের কোণে বসে আমাদের লক্ষ্য করছিল। রামহরির কথাবার্তা শুনে ও হাবভাব দেখে তারও মনে বোধহয় কেমন সন্দেহ জাগল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের জামা-কাপড় শুঁকতে শুরু করে দিলে।

কোনগতিকে মানুষ রামহরি ও পশু বাঘার কবল ছাড়িয়ে, জামা-কাপড় বদলে বাইয়ে গিয়ে বসলুম।

কুমার বললে, 'এইবার ধুকধুকিখানা বের কর দেখি।'

কুমারের মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই হোটেলের সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের দেওয়া লকেটখানা আমি বার করে ফেললুম —সেখানাকে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে আমারও মনের কৌতূহল রীতিমত অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণত ধুকধুকি বা লকেটের আকার যে-রকম হয় এখানা তার চেয়েও বড়। রুপোয় তৈরি এই ধুকধুকির উপরকার কারুকার্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ হচ্ছে বিখ্যাত হুনুরী চীনে কারিকরের কীর্তি!

কারিকুরির মধ্যে মাঝখানে একটি মূর্তি আঁকা রয়েছে। মূর্তিটি এত ছোট যে, ভালো করে দেখবার জন্যে অনুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হল।

পাকা শিল্পী এতটুকু জায়গার মধ্যে অতি-সূক্ষ্ম রেখায় সম্পূর্ণ নিখুঁত এক মূর্তি এমন কায়দায় ক্ষুদে ফুটিয়ে তুলেছে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু কি কুৎসিত মূর্তি! মস্ত ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা এক চেহারা, দুই চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে যেন ঐশ্বর্যের বা ক্ষমতার দর্প, মুখের ফাঁক দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে বড়-বড় আটটা দাঁত এবং পা রয়েছে তিনখানা।

বললুম, 'কুমার, এ হচ্ছে কোন খেয়ালী শিল্পীর উদ্ভট কল্পনা, এর মধ্যে কিছু বস্তু নেই। এইবার ধুকধুকির ভিতরটা দেখা যাক।'

আঙুলের চাপ দিতেই ধুকধুকির ডালা খুলে গেল। ভিতরে রয়েছে একখানা ভাজ-করা খুব পুরু কাগজ—প্রায় কার্ড বললেও চলে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। যদিও তার উপরে কোন লেখা নেই, তবু একটা নতুনত্ব আছে বটে!

চামড়ার বা ধাতুর চাদরের উপরে যেমন নক্সা emboss করা থাকে, এর উপরেও রয়েছে তেমনি উঁচু-করে তোলা কতকগুলো 'ডট্' বা বিন্দু। কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও চারটে বা আরো বেশি বিন্দু!

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'ও বিমল, এ আবার কি-রকম ধাঁধাঁ হে?'

—'চীনে ধাঁধাঁ হওয়াই সম্ভব। বাঙালীর মাথায় ঢুকবে না।'

ধুকধুকির ভিতর থেকে আর কিছুই আবিষ্কার করা গেল না।

কিন্তু বিন্দুগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে, নইলে এত যত্নে কেউ এই কাগজখানাকে ধুকধুকির ভিতরে পুরে রেখে দিত না। সেই মৃত চীনেম্যানটা মরবার আগে যে দু-তিনটে কথা বলে গিয়েছিল তার দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ছুন্-ছিউ নামে কোন দুরাত্মা তাকে আক্রমণ করেছিল এই ধুকধুকির লোভেই। সে এমন ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে, 'কি-পিন্' নামক স্থানে গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, আর তার রহস্য এই ধুকধুকির মধ্যেই লুকানো আছে।

কুমার বললে, 'বিমল, প্রথমে যখন আমরা রূপনাথ গুহায় গুপ্তধন* আনতে যাই, তখন মড়ার মাথায় সাঙ্কেতিক লিপির পাঠ উদ্ধার করেছিলে তুমিই। এ বিষয়ে তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভালো করে ভেবে দেখ, এবারেও তুমি সফল হবে।'

এক ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেলু, বিন্দুগুলো নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলুম, কিন্তু ব্যর্থ হল আমার সকল চেষ্টাই।

শেষটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'চুলোয় যাক ধুকধুকির রহস্য! তার চেয়ে 'কি-পিন্' কথাটা নিয়ে আলোচনা করি এস। 'কি-পিন্' কোথায়?'

কুমার বললে, 'কি-পিন্' হয়তো চীনে মল্লুকের কোন জায়গা।'

—অসম্ভব। যাও তো কুমার, আমার লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এস 'এন্সাইক্লোপিডিয়া' আর 'গেজেটিয়ার'!'

কুমার তখনি ছুটে গেল আর বই নিয়ে ফিরে এল। দুজনে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু কোন ফলই হল না। কোথাও 'কি-পিন্' নামে কোন দেশের কথাই লেখা নাই।

কুমার বললে, 'মরবার সময়ে সেই চীনে বুড়ো যে আমাদের সঙ্গে ''প্র্যাকটিক্যাল জোক' করে গেছে, এ-কথা বিশ্বাস হয় না! 'কি-পিন্' বলে কোন জায়গা নিশ্চয়ই আছে।''

আমি বললুম, 'থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো সেটা তুচ্ছ গণ্ডগ্রাম। বাইরের কেউ তার কথা জানে না।'

সেদিন এই পর্যন্ত। কুমার বাড়ি ফিরে গেল। আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের ঘোর এসে মুছে দিলে 'কি-পিন্', ধুকধুকি আর গুপ্তধনের রহস্য!

---

* আমার লেখা 'যকের ধন' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

পরের দিন সকাল বেলা। আমি আর কুমার চা পান করছি, বাঘাও এসে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে তার প্রভাতী দুধের বাটির লোভে।

এমন সময়ে কমলকে নিয়ে বিনয়বাবু এলেন। যাঁরা আমাকে চেনেন এঁ-দুজনের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাঁদের পরিচয় আছে।

সকাল-বেলায় পরীক্ষা করতে করতে ধুকধুকিখানা চায়ের টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলুম, বিনয়বাবু এসেই সেখানা দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওটা কি হে বিমল?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল বিনয়বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা। সারা জীবন ধরে তিনি জ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরীর কাজ করে আসছেন। আজ বয়সে পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তবু বিদ্যাচর্চা ছাড়া আর কোন আনন্দই তাঁর নেই। তিনি হচ্ছেন আশ্চর্য এক বৃদ্ধ ছাত্র এবং এই বিশ্ব হচ্ছে তাঁর কাছে বিদ্যালয়ের মতন। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব—যে-কোন বিষয় নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি, কখনো সঠিক উত্তরের অভাব হয় নি। কুমার তো তাঁর নাম রেখেছে—'জীবন্ত অভিধান'! কাজেই তাঁকে পেয়ে আশান্বিত হয়ে ধুকধুকিটা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে তুলে দিলুম।

বিনয়বাবুর দুই চোখ ধুকধুকির দিকে চেয়েই কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, 'আরে এরকম লকেট তো কখনো দেখি নি। এটা তো এদেশে তৈরি নয়। হুঁ, চীনের জিনিস। কোথায় পেলে?'

—'এক চীনেম্যানের দান। কিন্তু ওপরের ঐ মূর্তিটা কি অদ্ভুত দেখেছেন?'

—'অদ্ভুত? হ্যাঁ, মূর্তির মুখখানা চীনে ছাঁচের বটে, কিন্তু আসলে এ হচ্ছে, আমাদেরই পৌরাণিক মূর্তি।'

সবিস্ময়ে বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের চেহারা। অষ্টদন্ত, তিনপদ। উদ্ভট, কুৎসিত চেহারার জন্যেই যক্ষরাজের নাম হয়েছে কুবের। তবে ঐশ্বর্যের মহিমায় তাঁর শ্রীহীনতার দুঃখ বোধ হয় দূর হয়েছে।'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি কুবেরকে তো চিনলেন। কিন্তু বলতে পারেন 'কি-পিন্' বলে কোন জায়গা আছে কিনা?'

বিনয়বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কি-পিন্'?...'কি-পিন্'। হুঁ নামটা শুনেছি বোধহয়। বুড়ো হয়েছি ফস করে সব কথা স্মরণ হয় না। বোসো ভায়া, মনে করবার জন্যে একটু সময় দাও।'

আগ্রহ-ভরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মিনিট তিনেট পরেই সমুজ্জ্বলমুখে বিনয়বাবু বললেন, 'মনে পড়েছে, মনে

পড়েছে। কিন্তু 'কি-পিন্' নিয়ে তোমাদের এমন আশ্চর্য মাথাব্যথা কেন? তোমরা কি আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ?'

আমি বললুম, 'রক্ষে করুন, আমাদের ইতিহাসবিদ বলে উপহাস করবেন না। আমরা খালি জানতে চাই 'কি-পিন্' কোন্ দেশ?'

—'কি-পিন্' বা 'কা-পিন্ হচ্ছে অনেক শতাব্দী আগেকার নাম। নামটি দিশীও নয়, চীনে। সপ্তম শতাব্দীতে 'কি-পিন্' বলতে বোঝাত উত্তর-পূর্ব আফগানিস্থানের 'কপিশ' নামে জায়গাকে। তার আগে আর এক সময়ে ভারত সীমান্তের গান্ধার প্রদেশকেও 'কি-পিন্' বলে ডাকা হত। চীনে লেখকরা ভারতের আরো কোন-কোন দেশকে 'কি-পিন্' বা 'কা-পিন্' নামে জানতেন। তোমরা কোন 'কি-পিনে'র কথা জানতে চাও বুঝতে পারছি না। তবে সপ্তম শতাব্দীর 'কি-পিন্' সম্বন্ধে বড় বড় ঐতিহাসিক একটি অদ্ভুত গল্প বলেছেন, তোমাদের ধুকধুকির উপরে কুবেরের মূর্তি দেখে সেটা আমার মনে পড়ছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা বিনয়বাবু, আগে গল্পটাই শুনি।'

বিনয়বাবু চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে বলতে লাগলেন, 'এই ঐতিহাসিক গল্প নিয়েও অল্প বিস্তর মতান্তর আছে, ও-সব গোলমালের মধ্যে ঢুকে দরকার নেই। চীনা পর্যটক হুয়েন্ সাংয়ের ভ্রমণ আর জীবন কাহিনীতে যে গল্পটি আছে, সেইটিই তোমাদের কাছে বলব। ভিন্সেন্ট্ এ. স্মিথের *Early History of India* নামে বিখ্যাত ইতিহাসেও (২৭৯ পৃষ্ঠায়) এ গল্পটি পাবে। কিন্তু গল্পটি বলবার আগে আমাকে আরো কয় শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে।

'শক-জাতীয় কণিষ্ক তখন ভারত-সম্রাট। দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। তখন সারা এশিয়ায় চীনাদের বড় প্রভুত্ব। শকেরা ভারত দখল করেও চীনাদের কর দিতে বাধ্য ছিল। দু-একবার বিদ্রোহ প্রকাশ করেও চীনাদের কাছে তারা সুবিধা করে উঠতে পারে নি। সম্রাট কণিষ্কই সর্বপ্রথমে চীনাদের জাঁক ভেঙে দিলেন। তিনি কেবল কর দেওয়াই বন্ধ করলেন না, তিব্বত ছাড়িয়ে চীন সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে পড়ে দেশের পর দেশ জিতে তবে ফিরে এলেন এবং আসবার সময়ে জামিন স্বরূপ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চীনের কয়েকজন রাজপুত্রকে—কেউ কেউ বলেন, তাঁদের মধ্যে চীন-সম্রাটের এক ছেলে ছিলেন।

'আফগানিস্থানকে সে সময়ে ভারতেরই এক প্রদেশ বলে ধরা হত। চীন-রাজপুত্ররা শীতের সময়ে পাঞ্জাবে থাকতেন, আর গরমের সময়ে থাকতেন আফগানিস্থানে, "শা—লো—কা" নামে বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের এক মঠে। এই মঠটি ছিল "কপিশ" পাহাড়ের এক ঠাণ্ডা উপত্যকায়। একথা বোধহয় না বললেও চলবে যে, তখন পৃথিবীতে মুসলমান ধর্মের সৃষ্টি হয় নি। আফগানিস্থানে

তখন বাস করত হিন্দু আর বৌদ্ধরাই। আজও আফগানিস্থানের চারিদিকে তখনকার বৌদ্ধমঠের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

'কিছুকাল পরে চীন-রাজপুত্রদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হল। যাবার সময়ে তাঁরা "শা—লো—কা" বা "কপিশ" মঠকে দান করে গেলেন বিপুল বিত্ত, তাল তাল সোনা, কাঁড়ি কাঁড়ি মণি-মুক্তা! সেকালের সেই ঐশ্বর্যের পরিমাণ একালে হয়তো হবে কোটি কোটি টাকা। চীন-রাজপুত্ররা কেবল টাকা দিয়েই গেলেন না, ভারতকে শিখিয়ে গেলেন ন্যাসপাতি ও পীচফল খেতেও। তাঁরা আসবার আগে এ অঞ্চলে ও-দুটি ফলের ফসল ফলত না।

'এইবার হুয়েন্ সাংয়ের কথা। তিনি ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। 'শা—লো—কা' 'কপিশ' মঠে ৩৬০ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে বর্ষাকালটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অত দিন পরেও মঠের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দ্বিতীয় শতাব্দীর সেই চীন-রাজপুত্রদের অসাধারণ দানের কথা নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেন নি।

'সন্ন্যাসীরা আর এক বিষয় নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে ধর্ণা দিলেন। সন্ন্যাসীরা বললেন, "কপিশ" মঠে যক্ষরাজ কুবেরের প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্তি আছে। এবং তাঁরই পায়ের তলায় পোঁতা আছে চীন-রাজপুত্রদের দেওয়া অগাধ ঐশ্বর্য।

'সেই ঐশ্বর্য উদ্ধার করবার জন্যে হুয়েন্ সাংকে অনুরোধ করা হল। হুয়েন্ সাং জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা যখন গুপ্তধনের সন্ধান জানেন, তখন আমাকে অনুরোধ করছেন কেন?"

'সন্ন্যাসীরা জানালেন, "ভয়াবহ যকেরা ঐ গুপ্তধনের উপরে পাহারা দেয় দিন-রাত! একবার এক অধার্মিক রাজা গুপ্তধন অধিকার করতে যান। কিন্তু যকেরা এমন উৎপাত শুরু করে যে রাজা প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আমরাও যতবার গুপ্তধন নেবার চেষ্টা করেছি ততবারই ভৌতিক উৎপাত হয়েছে। রাজপুত্ররা অর্থ দিয়েছিলেন মঠের উন্নতির জন্যে। কিন্তু সংস্কার অভাবে মঠের আজ অতি দুর্দশা হলেও ধন-ভাণ্ডারে হাত দেবার উপায় নেই। আপনি সাধু ব্যক্তি। আপনার উপরে হয়তো যকেরা অত্যাচার করবে না।"

'হুয়েন্ সাং রাজি হয়ে ধূপ-ধুনো জ্বেলে উপাসনা করে যক্ষদের উদ্দেশ করে বললেন, "হে যক্ষ, হে গুপ্তধনের রক্ষক! আমার উপরে প্রসন্ন হও! আমি মন্দির-মঠের মেরামতির জন্যে যে অর্থের দরকার কেবল তাই নিয়ে বাকি সব ঐশ্বর্য যথাস্থানে রেখে দেব!"

'যকেরা হুয়েন্ সাংকে বাধা দিলে না। গুপ্তধনের অধিকাংশই হয়তো এখনো মাটির তলায় লুকানো আছে। আমার গল্প ফুরুল।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমাদের গল্প এইবার শুরু হবে!'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসু চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে?'

—'পরে সব বলছি। আপনার এই ঐতিহাসিক গল্পটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু আলো দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। ধাঁধাঁয় পড়ে আছি এই কাগজখানা নিয়ে। এর রহস্য উদ্ধার করতে পারেন কি?' বলেই আমি ধুক্‌ধুকির ভিতর থেকে পুরু কাগজখানা বার করে তাঁর হাতে দিলুম।

বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই সহজ স্বরে বললেন, 'এতো দেখছি "ব্রেল্"-পদ্ধতিতে লেখা!'

কুমার লাফিয়ে উঠে বললে, "ব্রেল্"-পদ্ধতিতে লেখা? অর্থাৎ যে-পদ্ধতিতে অন্ধেরা লেখাপড়া করে?'

—'হ্যাঁ, এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালা প্রভৃতির সমস্ত কাজ সারা যায়। আমি অন্ধ না হলেও কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এ-পদ্ধতিটা শিখে নিয়েছি।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'তাহলে লেখাটা আপনি এখনি পড়তে পারবেন?'

—'নিশ্চয়! খুব সহজেই!'

কুমার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল, 'জয় বিনয়বাবুর জয়!'

৩

ছুন্-ছিউ

আমরা সবাই কৌতূহলী চোখে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

ধুক্‌ধুকির ডালা খুলে বাঁ-হাতের উপরে সেখানা রেখে বিনয়বাবু আগে সেই emboss করা বিন্দুগুলোর উপরে ডানহাতের আঙুল বুলিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'এর ওপরে ইংরেজী ভাষায় লেখা রয়েছে—'শা-লো-কো : পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্তি : গুপ্ত গুহা : '—ব্যাস্, আর কিছু নেই!'

আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে কথাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া করে দেখলুম, তারপর বললুম, 'বিনয়বাবু, আপনার মতে শা-লো-কা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ বলতে এক জায়গাকেই বোঝায়?'

—'আমার মত নয় বিমল, এ হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মত।'

—'ওখানে গুপ্তধন আছে, এটাও ঐতিহাসিক সত্য?'

—'একে ঐতিহাসিক সত্য না বলে ঐতিহাসিক গল্প বলা উচিত। এ গল্প বলেছেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং। ঐতিহাসিকেরা গল্পটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ এর সত্য-মিথ্যার জন্যে ঐতিহাসিকরা দায়ী নন।'

—'তাহলে শা-লো-কা বা কপিশ মঠের কথাও গল্পের কথা?'

—'না, কা-পিন, কি-পিন, শা-লো-কা বা কপিশ—যে নামেই ডাকো, ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে।'

—'উত্তর-পূর্ব আফগানিস্থানে?'

—'হ্যাঁ। ও-জায়গাটির আধুনিক নাম হচ্ছে কাফ্রিস্থান।'

কুমার বললে, 'কাফ্রিস্থান? ও বাবা, সে যে হিন্দুকুশ পাহাড়ের ওপারে! সেখানেও বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু দেবতা কুবের!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কুমার, আজকের দিনে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করে বটে, কিন্তু স্বদেশ আর স্বজাতি সম্বন্ধে হয়েছে রীতিমত অন্ধ। তোমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজরা আফগানিস্থানের এপারেই ভারতের সীমারেখা টেনেছে বলে সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নেবার কারণ নেই। এক সময়ে ভারত-সম্রাটের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল ইংরেজরা আজও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। আফগানিস্থান নামে কোন দেশের নাম কেউ তখন স্বপ্নেও শোনে নি। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুকুশেরও ওপারে। আজ বিলাতী জিওগ্রাফি যাকে আফগানিস্থান বলে ডাকে, তখনকার পৃথিবী তাকে ভারতবর্ষ বলেই জানত, আর সেখানে বাস করত ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনরাই। ওঁখানে যে বৌদ্ধ মঠ আর হিন্দু দেবতা থাকবে, এ আর আশ্চর্য কথা কি? ভারতের গৌরবের দিনে উত্তরে চীনদেশে, দক্ষিণে জাভা, বালি, সুমাত্রা দ্বীপে আর পূর্বে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু দেবতাদের যাতায়াত ছিল। তোমরা সত্যিকার ভারতের ইতিহাস পড় ভাই, নিজেদের এমন ছোট করে দেখো না!'

আমি বললুম, 'উত্তম! তাহলে দু-চার দিনের মধ্যেই আমরা কাফ্রিস্থানে ভারতের পূর্বগৌরব দেখবার জন্যে যাত্রা করব, আর আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন আপনিই!'

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমাদের এই আকস্মিক উৎসাহ অত্যন্ত সন্দেহজনক!'

—'কেন?'

—'বিমল-ভায়া, আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না, আমি তোমাদের

খুব ভালো করেই চিনি! ধুক্‌ধুকির ওপরে ব্রেল-পদ্ধতিতে লেখা এই অদ্ভুত কথাগুলো আর কা-পিন্‌, কি-পিন্‌ বা কপিশ মঠ সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আবার তোমরা নতুন কোন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র গন্ধ পেয়েছ! আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি?'

আমি তখন হাসতে হাসতে চীনে-হোটেলের ঘটনাটা বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে বিমলবাবু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'বিমল! কুমার! তোমাদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

—'কেন?'

—'কণিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। গুপ্তধনের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে, এতকাল পরে সেখানে গিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না।'

—'কারণ?'

—'কারণ ঐতিহাসিক গল্পেই প্রকাশ, প্রাচীনকালেও ঐ গুপ্তধনের কাহিনীটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত, তাই আরো অনেকে তা লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছিল।'

—'কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতেও হুয়েন্‌ সাং স্বচক্ষে সেই গুপ্তধন দেখেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী বড় কম দিনের কথা নয়।'

—'তারপর কত বিদেশী দস্যু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ঠিক ঐ অঞ্চল দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এ-কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তারা কি ঐ গুপ্তধনের কথা শোনে নি?'

—'না শোনাও আশ্চর্য নয়! তারপর ভারতে কতবার অন্ধযুগ এসেছে। বার বার কত রাজ্যের, কত ধর্মের উত্থান-পতন হয়েছে। মঠ গেছে ভেঙে, সন্ন্যাসীরা গেছে পালিয়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্যে পড়ে লোকে গুপ্তধনের কথা না ভুললেও ঠিকানা হয়তো ভুলে গিয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত গুপ্তধনের গল্প শোনা যায়, যার কথা সকলেই জানে কিন্তু যার ঠিকানা কেউ জানে না!'

কুমার বললে, 'তারপর আরো একটা কথা ভেবে দেখুন, বিনয়বাবু! আপনি ইতিহাসের যে গল্পটা বললেন আমরা কেউই তা জানতুম না। কিন্তু সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের কাছ থেকে আমরা যে ধুক্‌ধুকিটা পেয়েছি, তার সঙ্গে ঐ গল্পের প্রধান কথাগুলো অবিকল মিলে যাচ্ছে। যেমন শা-লো-কা, ভাঙা মঠ, কুবের মূর্তি। আপনি বলছেন, শা-লো-কা বা কপিশ মঠ ছিল পাহাড়ের উপত্যকায়, ধুক্‌ধুকির লেখাতেও রয়েছে গুপ্তগুহার কথা, আর গুহা থাকে পাহাড়েই। তারপর সেই চীনেম্যান মরবার আগে কি-পিন্‌-এরও নাম করেছিল। এথেকেই বোঝা

যাচ্ছে, যেমন করেই হোক্ একালের কেউ কেউ ঐ প্রাচীন ঐতিহাসিক গুপ্তধনেরই ঠিকানা জানতে পেরেছে।'

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'না ভায়া, আমি তোমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারব না। তোমরা যতই যুক্তি দেখাও, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটবার বয়স আর আমার নেই। তারপর অত লোভও ভাল নয়। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। আবার গুপ্তধনের উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করা কেন?'

বিনয়বাবু আমাদের ভুল বুঝেছেন দেখে আমি আহত স্বরে বললুম, 'বিনয়বাবু, আপনি তো জানেন, টাকাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান নয়! এ গুপ্তধন হচ্ছে আমাদের ঘর ছেড়ে পথে বেরুবার একটা ওজর বা উপলক্ষ মাত্র। গেল-জন্মে আমি আর কুমার নিশ্চয়ই বেদুইন ছিলুম—শান্ত শ্যামলতার সুখ-স্বপ্নের চেয়ে অশান্ত মরুভূমির বিভীষিকাই আমাদের কাছে লাগে ভালো। দখিন বাতাসের চেয়ে কালবৈশাখীর ঝড়ই আমরা বেশি পছন্দ করি।'

এমন সময়ে রামহরি ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, 'খোকাবাবু, চারটে চীনেম্যান এসেছে এ-বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'চীনেম্যান? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

কুমার চিন্তিত স্বরে বললে, 'চীনে হোটেলের কর্তারা নয়তো? হয়তো পুলিশ-হাঙ্গামে পড়ে আমাদের সাক্ষী মানতে এসেছে।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব। তারা ঠিকানা জানবে কেমন করে?'

কুমার বললে, 'তাও বটে!'

—'তাই তো, কে এরা? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কলকাতায় ভদ্র অভদ্র কোন চীনেম্যানের সঙ্গেই তো আমার আলাপ-পরিচয় নেই!'

রামহরি বললে, 'কি গো, ওদের কি বলব?'

—'এখানে আসতে বল।'

রামহরি চলে গেল। ধুক্‌ধুকিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমি জামার পকেটে রেখে দিলুম।

ঘরের ভিতরে প্রথমেই যে মূর্তিটা এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই চিনতে আমার একটুকুও বিলম্ব হল না। কাল রাত্রে হোটেলে এই লোকটাই ছোরা হাতে করে সেই চীনে-বুড়োকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল!

আমি হতভম্বের মতন তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একগাল হেসে ইংরেজীতে বললে, 'কি বাবু, তুমি কি আমাকে চিনে ফেলেছ? হা হা হা হা—আমরা পুরানো বন্ধু, কি বল?'

আমি রুক্ষ স্বরে বললুম, 'এখানে তোমার কি দরকার?'

—'বলছি। আগে ভালো করে একটু বসি।' তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। এবং তার আরো তিন জন সঙ্গীও ঘরের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক তিনটে পাথরের মূর্তির মতন।

কুমার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তোমরা হচ্ছ হত্যাকারী। এখনি পুলিশে খবর দেব।'

প্রথম চীনেম্যানটা আবার একগাল হেসে বললে, 'বেশ বাবু, তাই দিও। কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি কেন? আগে আমার কথাই শোনো।'

আমি বসে বসে লোকটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলুম। আগেও দেখেছিলুম এখনো দেখলুম, মাথায় সে পাঁচ ফুটও উঁচু হবে না, কিন্তু তার দেহটা চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। অসম্ভব চওড়া দেহের উপরে মঙ্গোলীয় ছাঁচে গড়া মুখ—আমার সামনে বসে আছে যেন মানুষের ছদ্মবেশে বীভৎস একটা ওরাং-উটাং!

সে হাসতে হাসতে বললে, 'বাবু, হোটেলে কাল তুমি আমার মুখের উপরে যে-ঘুসিটা চালিয়েছিলে, আমি এখনও তা ভুলি নি!'

আমি বললুম, 'ও, সেইজন্যেই কি তুমি আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছ?'

—'মোটেই নয় বাবু, মোটেই নয়! আমি তোমার ঘুসির তারিফ করি!'

জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলুম, লোকটার উদ্দেশ্য কি?

সে বললে, 'ভগবান আমাকে ঢ্যাঙা করেন নি, কিন্তু আমার গায়ে শক্তি দিয়েছেন। এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। একহাতে আমি তিন মণ মাল মাথার ওপরে তুলে ষোল হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি! কিন্তু আমার মতন লোককেও তুমি এক ঘুসিতে কাবু করেছ! যদিও আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত থাকলে এমন অঘটন ঘটত না, তবু তুমি বাহাদুর!'

—'তোমার নাম কি ছুন্-ছিউ?'

সে চম্‌কে উঠল। তারপর বললে—'তাহলে তুমি আমার নাম পর্যন্ত আদায় করেছ? ভালো কথা নয়—ভালো কথা নয়'—বলতে বলতে ধাঁ-করে পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে একটা রিভলভার।

তার পিছনের তিন মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গেই এক-একটা রিভলভার বার করে ফেললে!

আমাদের চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল চার-চারটে রিভলভারের চক্‌চকে নল্‌চে!

৪

রামহরির ভীমরতি হয় নি

ছুন্-ছিউ'র রিভলভারটার লক্ষ্য ঠিক আমার দিকেই!

এ-ভাবে চোখের সামনে রিভলভার তুললে কারুরই মনে স্বস্তি হয় না, আমারও হল না।

কুমার, বিনয়বাবু ও কমলের মুখের পানে একবার আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম। রিভলভারের মহিমায় তাদের কারুরই ভাবান্তর হয় নি দেখে বিস্মিত হলুম না। আমরা সকলেই একই বপদ-পাঠশালার পাঠ গ্রহণ করেছি বহুবার, রিভলভার দেখেই আর্তনাদ করবার অভ্যাস আমাদের নেই।

ঘরের এদিকে-ওদিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমাদের পিছনে ঘরের দেওয়াল। আমার ডানপাশে কুমার, বাঁ পাশে বিনয়বাবু, তাঁর পাশে কমল বসে আছে। আমার সামনেই একটা গোল মার্বেলের টেবিল। তার ওপাশে বসে ছুন-ছিউ এবং তার পিছনে এক সারে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনটে চীনেম্যান। তাদের পিছনেই এ-ঘর থেকে বেরুবার একমাত্র দরজা। পিছনে হটবার উপায় নেই, চীনেদের এড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়াও অসম্ভব। নিজের ঘরেই ফাঁদে পড়ে গিয়েছি, পালাবার পথ একবারে বন্ধ।

টেবিলের তলায় স্থির হয়ে বসে আছে বাঘা। অন্য কোন কুকুর হলে এতক্ষণে নিশ্চয় গর্জন করে তেড়ে যেত। কিন্তু রিভলভারের সামনে গর্জন করলে বা তেড়ে গেলে যে মহা বিপদের সম্ভাবনা, এটা বুঝতে তার দেরি লাগল না—এমনি শিক্ষিত কুকুর সে!

ছুন-ছিউ হাসতে হাসতে বললে, 'বাবু কি দেখছ, কি ভাবছ? বুঝতে পারছ তো এ-বাড়ির মালিক হচ্ছি এখন আমি?'

হতভাগার বাঁদুরে মুখে হাসি দেখে গা যেন জ্বলে গেল। বললুম, 'ছুন্-ছিউ, তোমার রিভলভার নামাও। তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা চীনদেশ নয়।'

ছুন্-ছিউ বললে, 'না বাবু, ভুলি নি। আমি জানি এটা বাংলাদেশ, আর এখানে বাস করে কাপুরুষ বাঙালীরা।'

—'আমরাও সশস্ত্র হলে এ-কথা বলবার সাহস তোমার হত না।'

—'চুপ কর বাবু! তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে আসি নি। কাল হোটেল থেকে তোমরা একটা লকেট চুরি করে এনেছে। ভালো চাও তো সেখানা ফিরিয়ে দাও।'

—'ছুন্-ছিউ, তুমি চণ্ডু খেয়ে স্বপ্ন দেখছ। লকেট! সে আবার কি?'

—'আকাশ থেকে খসে পড়বার চেষ্টা কোরো না বাবু! তুমি বলতে চাও তোমার কাছে একখানা রুপোর লকেট নেই?'

আমার যুক্তি হচ্ছে, চোর-ডাকাত খুনেকে ঠকাবার দরকার হলে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। অতএব কোন রকম দ্বিধা না করে বললুম, 'না। সোনার বা রুপোর বা পিতলের কোনরকম লকেট-ফকেটের ধার আমি ধারি না।'

কুমার মস্ত একটা হাই তুলে বললে, 'ওহে ছুন্-ছিউ, তোমার ছাতা-পড়া দাঁতগুলো দেখে আমার গা বমি বমি করছে। তুমি দাঁত বার করে আর না হাসলেই বাধিত হব।'

বিনয়বাবু টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলেন।

কমলও কম দুষ্ট নয়। বললে, 'ছুন্-ছিউ, তুমি একটা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী শুনবে?'

বাঘা যেন নাচারের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সামনের দিকে দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার উপরে নিজের মুখ স্থাপন করলে—কিন্তু তার দৃষ্টি রইল চীনেম্যানদের দিকেই।

ছুন্-ছিউ বললে, 'ওহে বাবু, আমার সঙ্গে রসিকতা করা নিরাপদ নয়। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি, চোখে দেখবার আগেই আমি মানুষ খুন করে বসি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু চোখে দেখেও তুমি দয়া করে আমাদের খুন করছ না কেন শুনি!'

—'লকেটখানা কোথায় রেখেছ এখনো টের পাই নি বলে।'

—'তাহলে লকেটখানা পেলেই তোমরা আমাদের খুন করবে?'

—'না। তোমরা ভদ্র ব্যবহার কর, আমরাও ভদ্র ব্যবহার করব।'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু লকেট আমাদের কাছে নেই।'

—'নেই নাকি? কিন্তু হোটেলে কাল তুমি যখন মরো-মরো বুড়ো চ্যাংয়ের গলা থেকে লকেটখানা খুলে নিচ্ছিলে, আমাদের লোক তা দেখেছিল। তারপর তোমাদের পিছু ধরে এসে আমাদের লোক এই বাড়িখানাও দেখে গিয়েছে। বুঝেছ? আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে এখানে আসি নি!'

ঠিক সেই সময়ে দেখলুম, দরজার বাইরে রামহরির মুখ একবার উঁকি মেরেই সাঁৎ করে সরে গেল! আগেই বলেছি, দরজার দিকে পিছু ফিরে তিনটে চীনেম্যান এক সারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছুন্-ছিউ। সুতরাং তারা কেউ এই দৃশ্যটা দেখতে পেলে না।

আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলুম—এবং কুমার ও কমলের মুখ দেখে বুঝলুম, তারাও দেখেছে এই দৃশ্যটা।

বিনয়বাবু হঠাৎ হাতের বইখানা টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর গোঁফদাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির ঝিলিক্ ফুটেই মিলিয়ে গেল। হুঁ, বিনয়বাবু তাহলে বই পড়তে পড়তে চোরা চোখেও তাকাতে পারেন!

বাঘা টপ করে উঠে পড়ে একটা ডন্ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন নাড়তে লাগল তার ল্যাজটা।

ছুন্-ছিউ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আরে, আরে, কুকুরটা খামোকা দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে কেন?'

আমি বললুম, 'এতক্ষণ পরে ও তোমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলেছে!'

ছুন্-ছিউ চট্ করে একবার পিছন দিকটা দেখে নিয়ে বললে, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি! না, আর দেরি নয়! হয় লকেট দাও, নয় মরো!' সে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দুই পা এগিয়ে এল!

কুমার বললে, 'অতটা এগিয়ে এস না ছুন্-ছিউ, অতটা এগিয়ে এস না! তাহলে আমি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারি!'

ছুন্-ছিউ আবার পিছিয়ে পড়ে বললে, 'কেড়ে নিবি? দানব মানব, ভগবান-শয়তান—ছুন্-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?...ওরে, এই বাঙালী-বাবুদের কেউ একটা আঙুল নাড়লেই তোরা গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিবি, বুঝেছিস?'

তারা চারজনে আমাদের এক-একজনের দিকে লক্ষ্য স্থির করে রিভলভার তুলে ধরলে।

এইবারে সত্য-সত্যই ছুন্-ছিউর দুই চক্ষে ফুটে উঠল হত্যাকারীর জ্বলন্ত দৃষ্টি! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বললে, 'এই আমি তিন গুণছি! এর মধ্যে লকেট না দিলে আর তোদের রক্ষে নেই!...এক...দুই—'

ছুন্-ছিউ দুই গোণবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপথে আবার রামহরির আবির্ভাব! পা টিপে টিপে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—এক গাছা লম্বা, মোটা দড়ির দুই মুখ দুই হাতে ধরে! তারপর সে গাছাকে 'স্কিপিং'-দড়ির মতন শূন্যে তুলেই সে একসঙ্গে তিন চীনে-মূর্তির মাথার উপর দিয়ে ফেলে খুব জোরে মারলে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচ্কা-টান! বয়সে রামহরি পঞ্চান্ন পার হলেও এখনো সে শক্তিহীন হয় নি—পর-মুহূর্তেই তিন চীনে-মূর্তি একসঙ্গে ঠিকরে পপাত ধরণীতলে! বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার ও কমল সেই মুহূর্তেই এক এক লাফে সেই ভূপতিত দেহ তিনটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

এদিকে শব্দ শুনে চম্‌কে ছুন্‌-ছিউ যেই ভুলে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি বাঘা তড়াক্‌ করে লাফ মেরে তার রিভলভারশুদ্ধ ডান হাতের কব্জিতে কামড় মেরে ঝুলে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ধাক্কা মেরে সামনের টেবিলটা সরিয়ে ছুন্‌-ছিউর চোয়ালের উপরে দিলুম বিষম এক 'নক্‌-আউট ব্লো'! হঠাৎ গোড়া-কাটা গাছের মতন ছুন্‌-ছিউ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মেঝের উপরে!

সমস্ত ব্যাপারটা বলতে এতগুলো লাইনের দরকার হয় বটে, কিন্তু এগুলো ঘট্‌তে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি!

হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা পরে চোয়ালের ঠিক জায়গায় ঘুসি মারতে পারলে প্রতিপক্ষ তখনি কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বেই পড়বে! কিন্তু দস্তানা-হীন হাতে চোয়ালের যথাস্থানে ঘুসি মারলেও প্রায়ই দেখা যায়, চোয়াল ভেঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে গেলেও এবং কাবু হয়ে পড়লেও প্রতিপক্ষ জ্ঞান হারায় নি!

ছুন্‌-ছিউও জ্ঞান হারালো না। মাটিতে পড়েই সে আবার ওঠবার উপক্রম করছে দেখে আমি তারই হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে ধমক দিয়ে বললুম, 'চুপ করে শুয়ে থাক্‌ চীনে-বাঁদর! নড়লেই মরবি—তোকে মারলে আমার ফাঁসী হবে না!'

আচ্ছন্ন হতভম্বের মতন আমার হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ফিরে দেখি, বিনয়বাবু, কুমার ও কমলেরও হাতে গিয়ে উঠেছে তিন চীনেম্যানের তিন রিভলভার! রামহরি আনন্দে আটখানা হয়ে হাততালি দিচ্ছে এবং বাঘা 'ঘেউ-ঘেউ' রবে ঘরময় ছুটে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

বললুম, 'রামহরি, নিয়ে এস আরো খানিকটা দড়ি! এই চার বেটার হাত-পা বেঁধে ফ্যালো!'

রামহরি তখনি আরো দড়ি নিয়ে এসে চীনেম্যানগুলোকে বাঁধতে বসল।

কুমার বললে, 'একেই ইংরেজীতে বলে টেবিল উল্টানো! চীনেদের হল্‌দে হাতের রিভলভারগুলোই এসেছে এখন আমাদের বাদামি হাতে!'

কমল বললে, 'দানব-মানব, ভগবান-শয়তান—ছুন্‌-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?—কেড়ে নেবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা! দানব-মানব, ভগবান-শয়তানের যা অসাধ্য কুকুর বাঘার এক কামড়ে তা সাধ্য হল!'

ছুন্‌-ছিউ রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'তোমরা এখন আমাদের নিয়ে কি করতে চাও?'

আমি বললুম, 'রামহরি, ও-ঘরে গিয়ে থানায় "ফোন" করে দিয়ে এস তো!'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমি আমাকে মনে কর কি? বুড়ো হলেও

এখনো আমার ভীমরতি হয় নি—আর লেখাপড়া না জানলেও বুদ্ধিতে আমি তোমাদের কারুর চেয়ে কম নই! এই চার চীনে-হনুমানের রকম-সকম উঁকি মেরে দেখেই আমি খানিক আগে থানায় 'ফোন' করে দিয়েছি—পুলিশ এসে পড়ল বলে!'

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'ধন্য রামহরি, ধন্য! আজকের এই নাট্যাভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় তোমার কৃতিত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি!'

৫

রাতের আঁধারে

এইবার বিনয়বাবুকে রাজি করিয়েছি।

তাঁর কাফ্রিস্থানে যেতে নারাজ হবার প্রধান কারণই ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধমঠের মধ্যে এখনো যে গুপ্তধন আছে এটা তিনি সত্য বলে মানতে পারছিলেন না। কিন্তু চীনেম্যানগুলোর কাণ্ড দেখে এখন তিনি মত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন, গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত না হলে ঐ চীনে দুরাত্মার দল এত মরিয়া হয়ে এমন সব সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে পারত না।

এখন তিনি বলছেন, 'ওহে, ঐ লকেটের পিছনে সত্যই কোন গুপ্তরহস্য আছে! গুপ্তধনের লোভ আমি করি না, কিন্তু রহস্যটা কি জানবার জন্যে ভারি আগ্রহ হচ্ছে।'

আগ্রহ নেই খালি রামহরির। সে থেকে থেকে বলে, 'ছি ছি! বিনয়বাবু, এই বয়সে কোথায় জপ-তপ আর হরিনাম নিয়ে থাকবেন, তা না করে আপনিও কিনা ঐ গোঁয়ার ছোঁড়াগুলোর দলে গিয়ে ভিড়লেন।'

বিনয়বাবু যুৎসই জবাব খুঁজে না পেয়ে অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

কুমার বলে, 'ভ্যাংচি দিও না রামহরি, দল ভাঙাবার চেষ্টা করো না। তোমার যদি এতই অমত, তবে থাকো না তুমি কলকাতায় পড়ে। আমরা তো মাথার দিব্যি দিয়ে তোমাকে সাধাসাধি করছি না? কি বলিস রে বাঘা?'

বাঘা বোধ করি সায় দেবার জন্যেই একবার কুমার আর একবার রামহরির মুখের পানে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

—'আরে মোলো, পাজী কুকুর! তুইও ঐ দলে?' রামহরি রেগে চড় মারতে যায়, বাঘা কুমারের পিছনে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

আমাদের যাত্রার তোড়জোড় চলছে। এতদিনে আমরা বেরিয়েও পড়তুম, কিন্তু যেতে পারছি না কেবল ঐ হতভাগা ছুন্-ছিউয়ের জন্যে। এখনো তার বিচার শেষ হয় নি, আর আমরা হচ্ছি সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী।

পুলিশের তদারকে প্রকাশ পেয়েছে, ছুন্-ছিউ হচ্ছে চীনদেশের এক বিখ্যাত ডাকাতসর্দার, তার দলের লোক অনেক। সে যে কবে চীন ছেড়ে ভারতে হাজির হয়েছে এবং তার এই আসার উদ্দেশ্যই বা কি, পুলিশ এখনো তা জানতে পারে নি।

কিন্তু আমরা আন্দাজ করছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গুপ্তধন।

পুলিশ আর একটা তথ্য সংগ্রহ করেছে। হোটেলে যে বুড়ো চীনেম্যানটা খুন হয়েছে, সেও নাকি আগে ছুন্-ছিউর দলে ছিল। বোধহয় লকেটটা কোন রকমে হাতিয়ে সে দল ছেড়ে সরে পড়ে এবং তারপর ভারতে আসে। তাকে অনুসরণ করে এসেছে ছুন্-ছিউ আর তার দলবল।

আমরা স্থির করেছি, ছুন্-ছিউ যদি প্রকাশ না করে, তাহলে আমরাও আদালতে লকেটের কথা জাহির করব না।

এখন পর্যন্ত ছুন্-ছিউ হাটে হাঁড়ি ভাঙে নি। কেবল এইটুকুই বলেছে, ঐ লকেটখানা সে এত পবিত্র বলে মনে করে যে, ওর জন্যে একশোটা নরহত্যা করতেও তার আপত্তি নেই।

তার এই লুকোচুরির মানে বোঝা যায়। ফাঁসী কাঠের ছায়ায় দাঁড়িয়েও সে আজ পর্যন্ত লকেটের আশা ছাড়তে পারে নি। তার বিশ্বাস, লকেটের লেখা ও তার মর্ম এখনো কারুর কাছে ধরা পড়ে নি।

বিচার যে-ভাবে চলছে তাতে বেশ বলা যায় ছুন্-ছিউর প্রাণদণ্ডই হবে।

এদিকে আমাদের থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে। অনুমান করতে পেরেছি, ছুন্-ছিউ হাজতে বাস করছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকেরা আমাদের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলে নি। কেননা আমাদের এ পাড়ায় চীনেম্যানদের আনাগোনা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। কেউ খেলনা, কেউ চেয়ার, কেউ কাপড়ের বস্তা বেচতে এসে আমার বাড়ির কড়া নাড়তে থাকে, কিছু কিনব না বললেও সহজে নড়তে চায় না। একদিন একটা ছিনেজোঁক চীনেম্যানকে তাড়াবার জন্যে বাঘাকে লেলিয়েও দিতে হয়েছিল! এই সব শুনে পুলিশ আমার বাড়ির দরজায় একজন পাহারাওয়ালা রাখবার ব্যবস্থা করেছে।

হঠাৎ বিনয়বাবু একদিন এলেন অদ্ভুত সংবাদ নিয়ে।

উত্তেজিত মুখে ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, 'ও হে, আজকের কাগজ পড়েছ?'

—'না।'

—'ছুন্-ছিউ হাজত থেকে পালিয়েছে!'

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'সে কি! কেমন করে?'

—'কাল আদালত থেকে তাকে হাজতে পাঠাবার জন্যে যখন নীচে নামিয়ে আনা হচ্ছিল, তখন হঠাৎ সে চোঁচা দৌড় মারে। প্রহরীরা পিছনে তাড়া করে। পথে অপেক্ষা করছিল খুব দ্রুতগামী একখানা বড় মোটর। সে লাফ মেরে তার উপরে গিয়ে ওঠে, আর গাড়ীখানা যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে যায়। পুলিশ তখনি অন্য গাড়িতে উঠে পিছনে অনুসরণ করে। খানিকক্ষণ এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ছোটাছুটির পর ছুন্-ছিউর গাড়িখানা ধরা পড়ে। তার মধ্যে দুটো চীনেম্যান ছিল, কিন্তু ছুন্-ছিউ ছিল না। সে কোন্ ফাঁকে কোথায় নেমে পড়ে পুলিশের চোখে বেমালুম ধুলো দিয়েছে!'

কুমার বললে, 'এতো ভারি বিপদের কথা!'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিপদ? হুঁ, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! ছুন্-ছিউ হয়তো আবার লকেট উদ্ধারের চেষ্টা করবে। সাবধান বিমল, সাবধান!'

আমি বললুম, 'ছুন্-ছিউর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সুযোগ হবে, এটাও অনুমান করতে পারছি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'লকেটখানা পুলিশের হাতে সমর্পণ কর, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক্।'

'লকেটের কথা অস্বীকার করবার পর আর তা করা চলে না। আমাদের সামনে এখন খোলা আছে একমাত্র পথ।'

—'কি পথ?'

—'কাফ্রিস্থানে যাত্রা করবার পথ। ছুন্-ছিউকে আমরা প্রস্তুত হবার অবসর দেব না। কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ছুন্-ছিউ এসে দেখবে, খাঁচা খালি, পাখি নেই।'

কুমার উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'ঠিক, ঠিক! উত্তম প্রস্তাব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বটে। কিন্তু তুমি কি মনে কর বিমল, ছুন্-ছিউ কি আমাদের সঙ্গ নিতে পারবে না?'

জবাব দিতে যাব—হঠাৎ ঝন্-ঝন্ করে জানলার একখানা সার্সি ভেঙ্গে গেল এবং ঘরের মেঝের উপর সশব্দে এসে পড়ল একখণ্ড পাথর, তার সঙ্গে সূতো-দিয়ে-বাঁধা একখানা কাগজ!

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, কুমার ছুটে গিয়ে কাগজশুদ্ধ পাথরখানা কুড়িয়ে নিল। তারপর কাগজখানার দিকে চেয়েই বলে উঠল, 'বন্ধুবর ছুন্-ছিউর চিঠি।'

ইংরেজীতে লেখা :

—'এখনো লকেট ফিরিয়ে দাও। নইলে মৃত্যু অনিবার্য!'

—ছুন্-ছিউ

কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, 'না রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। পাহারাওলা বললে, এখানে সে কোন চীনেম্যানকে দেখে নি।'

আমি বললুম, 'ছুন্-ছিউ এরি মধ্যে আবার জাল ফেলেছে! বেশ, আমরাও অপ্রস্তুত নই। কালই আমাদের যাত্রার দিন।'

রামহরি নিশ্চয় ঘরের বাহির থেকে সমস্ত শুনছিল। সে চীৎকার করে উঠল, 'হে মা কালী! হে মা দুর্গে! ও বাবা মহাদেব! খোকাবাবুর দিকে কৃপা-কটাক্ষে একটু নিরীক্ষণ করো!'

বোধ হয় রামহরির বিশ্বাস, খুব জোরে চেঁচিয়ে না ডাকলে সুদূর স্বর্গের দেবদেবীরা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না!

পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আয়োজন করতে করতে কেটে গেল। এর মধ্যে শত্রুপক্ষ আর কোন সজাগতার লক্ষণ প্রকাশ করে নি। এমন কি পথের চীনে-জনতা পর্য্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ হচ্ছে ঝড়ের আগেকার শান্তি!'

কমল বললে, 'ঝড় উঠলেই বজ্রনাদ করবার জন্যে আমাদের বন্দুকগুলো তৈরি আছে!'

বিনয়বাবু বললে, 'থামো ফাজিল ছোক্‌রা! এক ফোঁটা মুখে অত বড় বড় বুলি ভালো শোনায় না।'

সন্ধ্যার সময় স্টেশনে যাত্রা করা গেল। ফার্স্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করেছি। মেল ট্রেন। পথে বা স্টেশনে একবারও সন্দেহ হল না যে, আমাদের গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করেছে। স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একখানাও মঙ্গোলীয় ছাঁচের হল্‌দে মুখ নজরে ঠেকল না। গাড়ির প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে এসেছি। কোথাও সন্দেহজনক কিছুই নেই। আপাতত ছুন্-ছিউকে ফাঁকি দিতে পেরেছি ভেবে আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘণ্টা দিলে। ট্রেন ছাড়ল।

কুমার বললে, 'অজানার অভিমুখে আবার হল অভিযান শুরু! সুদূরের যাত্রী আমরা, অদৃষ্ট আমাদের জন্যে আবার কি নতুন উত্তেজনা সঞ্চয় করে রেখেছে, মনে মনে সেইটেই আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।'

কমল 'আইস-ক্রিম' চুষতে চুষতে বললে, 'এবারে আমরা অদৃষ্টের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করব!'

বিনয়বাবু কট্‌মট্‌ করে তার দিকে তাকালেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম। জেগে রইল কেবল রামহরি। রেলগাড়িতে তার ঘুম হয় না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচম্বিতে জেগে উঠেই অনুভব করলুম বিষম এক বেদনা। তারপরেই বুঝলুম, উপর থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে গিয়েছি।

রামহরি, কুমার, কমল ও বিনয়বাবুর দেহও নীচে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে এবং বাঘা করছে প্রাণপণে চীৎকার!

হতভম্বের মতন উঠে বসেই আর এক সত্য উপলব্ধি করলুম। ট্রেন চলছে না—ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাইরের দৃশ্য বিলুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম বহুলোকের চীৎকার!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন—'অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট!'

রামহরি চ্যাঁচালে, 'হে মা কালী, হে বাবা মহাদেব!'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল, তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

আমি তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ঝুপ-ঝাপ করে বৃষ্টি পড়ছে এবং গাড়ী যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই আবছায়ার মধ্যে দেখা যায় একটা উঁচু পাহাড়।

দূরে গাড়ীর বাইরে ছুটোছুটি করছে কতকগুলো আলো—গোলমাল আসছে সেই দিক থেকেই।

তারপরেই কামরার পর কামরার দরজাগুলো দুমদাম করে খুলে রেলপথের ওপরে নেমে পড়তে লাগল দলে দলে যাত্রী!

ব্যাপার কি?

৬

বিপদগ্রস্ত পৈতৃক প্রাণ

এই অস্থানে কেন হঠাৎ গাড়ি থামল? আলো নিয়ে জলে ভিজেই-বা অত লোক কেন ছুটোছুটি করছে?

পৃথিবীকে সশব্দ করে অন্ধকার আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল হুড়্‌-হুড়্‌ এবং

কামরার জানালা দিয়ে বেরিয়ে-পড়া আলোক-রেখার মধ্যে এসে সেই ঝরা জল উঠছিল চক্-চক্ করে। কিন্তু দেখতে দেখতে বৃষ্টির তোড় এল কমে।

আমি তাড়াতাড়ি বর্ষাতি বার করে পরতে লাগলুম।

বিনয়বাবু শুধোলেন, 'বিমল, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?'

—'হ্যাঁ, আপনারাও আসুন। কামরায় কেবল রামহরি থাক।' বলেই আমি রিভলভারটাও বার করে পকেটের ভিতরে রাখলুম।

—'ও কি, ওটা নিয়ে আবার কি হবে?'

—'সাবধানের মার নেই।'

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঘা আমাদের সাজগোছ দেখে কি-রকম উত্তেজিত হয়েছে দেখ! ওকেও সঙ্গে নেব নাকি?'

—'নিতে চাও, নাও।'

সবাই সশস্ত্র হয়ে কামরা ছেড়ে বাইরে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন ট্রেনের প্রত্যেক কামরা থেকে ভীত যাত্রীরা বেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড জনতা সৃষ্টি করেছে। ট্রেনের অনেক কামরার ভিতর থেকে আর্তনাদ ও শিশুদের কান্নাও শোনা যাচ্ছে; অত্যন্ত আচমকা ট্রেনের গতি রুদ্ধ হওয়াতে হয়তো বহু লোক চোট খেয়েছে অল্পবিস্তর।

দূরের আলোকগুলো লক্ষ্য করে ভিড় ঠেলে আমরা দ্রুতপদে এগুতে লাগলুম। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড ও আরো কয়েকজন কর্মচারী রেললাইনের উপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কি পরীক্ষা করছে।

সেই সময়ে এক সাহেব-যাত্রী এসে প্রশ্ন করাতে গার্ড বললে, 'কারা এখানে গাড়ি উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিল। এই দেখুন, লাইনের দুখানা রেল একেবারে খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে! ভাগ্যে 'ড্রাইভার' সতর্ক ছিল, তাই 'ব্রেক' কষে কোনরকমে শেষমুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে ফেলতে পেরেছে!'

রেলপথের দিকে তাকিয়ে দেখে গা শিউরে উঠল! ট্রেন থেমে পড়েছে লাইনের ভাঙা অংশের মাত্র হাত-কয়েক আগে! চালক যদি দেখতে না পেত বা একটু অন্যমনস্ক থাকত, তাহলে এই শত শত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুতে পরিপূর্ণ দ্রুতগামী মেল-ট্রেনের অবস্থা যে কি ভয়ানক হত, সেটা ভাবলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় বুক!

অনেকে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে গিয়ে সাদরে ড্রাইভারের করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে ধন্যবাদের পাত্র! তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না হলে এতক্ষণে হয়তো আমাদের সমস্ত সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যেত মাটির পৃথিবীর সঙ্গে। বেঁচে থাকলেও

হয়তো হাত বা পা হারিয়ে চিরজীবনের মতন পঙ্গু হয়ে দিন কাটাতুম—মৃত্যুর চেয়ে সে-অবস্থা ভয়ঙ্কর।

কুমার বললে, 'বিমল এ কাজ কার? এর মধ্যে ছুন্-ছিউর হাত নেই তো?'

গোলমালে ছুন্-ছিউর কথা ভুলে গিয়েছিলুম, কুমারের মুখে তার নাম শোনবামাত্র আমার সারা মন চমকে উঠল!

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, অসম্ভব!'

কুমার বললে, 'অসম্ভব কেন? সে যে আমাদের ভোলে নি, গত কালই তার প্রমাণ পেয়েছি! কে বলতে পারে, আমাদের গতিবিধির উপরে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে নি? হয়তো কাল যখন আমরা গাড়ি রিজার্ভ করতে স্টেশনে এসেছিলুম, তখনো তার চর ছিল আমাদের পিছনে পিছনে। টিকিট-ঘর থেকেই আমাদের গন্তব্যস্থানের খোঁজ নেওয়া কিছুই অসম্ভব নয়! হয়তো ছুন্-ছিউ ভেবেছিল, ট্রেন-দুর্ঘটনায় গাড়িশুদ্ধ লোক যখন হত বা আহত হবে, চারিদিকে যখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, তখন সে সদলবলে সেই গোলে-হরিবোলে এসে আবার লকেটখানা উদ্ধার করবে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তোমার আজগুবি কল্পনাকে সংযত কর! তুচ্ছ একখানা লকেটের লোভে ছুন্-ছিউর এতখানি বুকের পাটা কিছুতেই হতে পারে না।'

—'কেন হতে পারে না। ছুন্-ছিউ কত বড় গোঁয়ার, ভেবে দেখুন দেখি। কলকাতার জনতায় ভরা হোটেলে মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না, কলকাতার মতন শহরে দিনের বেলায় আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে সে পিছপাও হয় নি, কলকাতার পুলিশ-কোর্ট থেকে সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সে লম্বা দিয়েছিল—এমন সব দুঃসাহসের কাহিনী আর কখনো শুনেছেন? অদ্ভুত এই চীনে-দস্যু! আমার বিশ্বাস সে সব করতে পারে।

আমি এ তর্কে যোগ দিলুম না। আমি তখন ভাবছিলুম, ঘটনাস্থলে অদৃশ্য অপরাধী কোন চিহ্ন রেখে গেছে কিনা? বিজলী-মশালের আলো ফেলে রেলপথটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। সেখানে পাথর-ভাঙা নুড়িগুলোর উপরে কোন চিহ্নই নাই! উঁচু বাঁধের ঢালু গায়ে রয়েছে ঘাসের আগাছার আবরণ। সেখানেও কিছু পেলুম না। আঁধার রাত্রি তখনো টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি বর্ষণ করছিল—বাঁধের তলায় দেখলুম কর্দমাক্ত জমি! অপরাধীরা নিশ্চয়ই পাখি হয়ে উড়ে পালায় নি। বাঁধের এপাশে কি ওপাশে মাটির উপরে তাদের কোন চিহ্নই কি পাওয়া যাবে না? ভাবতে ভাবতে নীচে নামতে লাগলুম। বাঘা আমার অনুসরণ করলে। এ রকম কাজ পেলে সে ভারি খুশি হয়, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সেইটেই বোধ করি আমাকে জানিয়ে দিতে চাইলে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকি হে, ওদিকে কোথায় নামছ? শেষটা সাপের কামড়ে মারা পড়বে?'

কোন জবাব দিলুম না। একেবারে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম। ঝির্-ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে, গোঁ-গোঁ করে ঝড় ডাকছে, অন্ধকার ফুঁড়ে দূর অরণ্যের কোলাহল ভেসে আসছে। অদৃশ্য কালো মেঘকে দৃশ্যমান করে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে মাঝে মাঝে। খানিক তফাতে আঁধার-পটে আরো আঁধার-রং দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা ছোট বন, নীচের দিকে কালি-মাখা ঝোপ-ঝাপ, উপর দিকে টলোমলো গাছ—যেন কতকগুলো শিকলে-বাঁধা দানব মুক্তিলাভের চেষ্টায় ছট্‌ফট করছে।

বাঁধের তলাতেই পেলুম আমি যা খুঁজেছিলুম। কুমারকে ডাকতেই সে ছুটে নেমে এল।

সে বললে, 'এ যে অনেকগুলো লোকের পায়ের দাগ! দাগ দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলো মাঠের দিকে গিয়েছে!"

বাঘা গম্ভীরভাবে সশব্দে মাটি শুঁকতে লাগল! তারপর চাপা-গলায় গর্জন করে বোধ করি পলাতক শত্রুদেরই ধমক দিলে।

বাঁধের উপর থেকে কৌতূহলী গার্ডও নেমে এসে বললে, 'বাবু, তোমরা কি করছ?'

আমি অঙ্গুলনির্দেশে মাটির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

গার্ড খানিকক্ষণ নীরবে দাগগুলো পরীক্ষা করে বললে, 'দেখছি টাট্‌কা পায়ের দাগ!'

বললুম, 'হ্যাঁ, এদের বয়স বেশিক্ষণ নয়। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে এই দাগগুলো অপরাধীদেরই পায়ের। কারণ এমন দুর্যোগে এতগুলো লোক নিশ্চয়ই এখানে ফুর্তি করে হাওয়া খেতে আসে নি।'

গার্ড বললে, 'বাবু, ঐ কুকুরটা মাটির ওপরে কি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে!'

—'পায়ের চিহ্নর ভিতরে ও শত্রুদের গন্ধ আবিষ্কার করেছে।'

গার্ড বিস্মিত স্বরে বললে, 'ওটা তো দেখছি দেশি কুকুর, ও আবার পায়ের দাগের কি মর্ম বুঝবে?'

কুমার বললে, 'যত্ন আর শিক্ষা পেলে আমাদের দেশী কুকুর তোমাদের বিলিতী হাউন্ডের চেয়ে কম কাজ করে না। বাঘা শত্রুদের গন্ধ চেনে।'

বাঘার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও রেলপথের তারের বেড়া পার হয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল আরো অনেক কৌতূহলী লোক—তাদের ভিতরে সাহেব আছে, বাঙালী আছে, হিন্দুস্থানী আছে।

খানিক পরে একটা ঝোপ। গার্ডকে ডেকে বললুম, 'এইবার দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ!'

—'কি দেখব?'

—'খানিক আগে মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছিল বলে পায়ের ছাঁচগুলো ছিল জলে ভর্তি! কিন্তু এখানকার পায়ের ছাঁচ ভিজে হলেও জলে ভর্তি নয়।

—'তাতে কি বোঝায়?'

এই বোঝায় যে অপরাধীরা একটু আগেই ঝোপের আড়ালে ছিল দাঁড়িয়ে। বোধ হয় অপেক্ষা করেছিল ট্রেনখানা ওল্টাবার জন্যে। কিন্তু ট্রেন রক্ষা পেয়েছে আর আমরা আসছি দেখে তারা চটপট সরে পড়েছে।

—'বাবু, তোমার যুক্তি বুঝলুম না।'

—'মুষল-ধারার পর যখন টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি শুরু হয় অপরাধীরা তখনই এখান থেকে পালিয়েছে। তাই এখান থেকে যে-সব পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে তাদের ভিতরটা এখনও জলে পূর্ণ হবার সময় পায় নি।

গার্ড বললে, 'বাবু, তুমি কি পুলিশে কাজ কর?'

—'না।'

—'তবে তুমি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পেলে কেমন করে?'

—'ভগবান দিয়েছেন বলে। ভগবান সবাইকে চক্ষু দেন বটে, কিন্তু সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন না।'

গার্ড বললে, 'ঠিক বাবু, তোমার কথা আমি স্বীকার করি! পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। অথচ এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটুকু আমার অনায়াসেই বোঝা উচিত ছিল।.....বাবু, তুমি আর কিছু বুঝতে পেরেছ?'

—'এখান থেকে প্রায় দুশো গজ তফাতে একটা জঙ্গলের আবছায়া দেখা যাচ্ছে। পায়ের দাগগুলো ঐদিকেই গিয়েছে। অপরাধীরা নিশ্চয় ঐ জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আছে।'

গার্ড বললে, 'না, এখন আমাদের ফিরতে হবে!'

—'কেন?'

—'আমার উপরে রয়েছে অপরাধী গ্রেপ্তার করার চেয়েও বড় কর্তব্যের ভার। রেল-লাইন ভেঙেছে, এই খবর দেবার জন্যে আমাকে এখন গাড়ী নিয়ে পিছনের ষ্টেশনে ফিরে যেতে হবে! নইলে কোন ডাউন-ট্রেন এসে পড়লে বিষম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, আর সেজন্যে দায়ী হব আমিই।'

গার্ডের কথা সত্য। তার উপরে আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়েও আসি নি, সঙ্গে

যে লোকেরা রয়েছে তারা হয়তো এই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে ঐ অচেনা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ভরসা করবে না। আর এমন রাতে অপরাধীদের খুঁজতে যাওয়াও হবে হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে এলোমেলো ছুটোছুটি করার মতন। খুব সম্ভব তাদের খুঁজে পাব না, আর খুঁজে পেলেও ছুন্‌-ছিউ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা বড় চারটিখানিক কথা নয়! হয়তো তারা দলে ভারী আর সশস্ত্র।

বিনয়বাবু বললেন, 'ওহে বাপু বিমল! চুপ করে ভাবছ কি? গোঁয়ার্তুমি করবার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?'

আমি হেসে বললুম, 'মোটেই নয়! গার্ড-সাহেবের পিছু পিছু আমিও পলায়ন করতে চাই!'

কুমার বললে, 'যঃ পলায়তি স জীবতি! সেকালে কোন বুদ্ধিমান বাঙালীও বলে গেছেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমরা হচ্ছি পিতৃভক্ত পুত্র, বাপের নাম করবার সুযোগ পাব বলেই পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করা দরকার।'

আমি বললুম, 'কিন্তু কুমার, বাঘা বোধহয় পশু বলেই পৈতৃক প্রাণের মর্যাদা বোঝে না। ঐ দেখ, সে আবার বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!'

বাঘা খালি এগুচ্ছে না, উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ চীৎকারও করছে। তার ওরকম চীৎকারের অর্থ আমরা বুঝি। মানুষের পক্ষে অসাধারণ বাঘার পশু-দৃষ্টি তিমির-যবনিকা ভেদ করে নিশ্চয়ই কোন শত্রু আবিষ্কার করেছে।

বাঘা ফিরতে রাজি নয় দেখে কুমার দৌড়ে গিয়ে তার বগ্‌লোস্‌ চেপে ধরলে। কিন্তু তবু সে বাগ্‌ মানতে চাইলে না—বার বার জঙ্গলের দিকে ফিরে ফিরে দেখে আর কুমারের হাত ছাড়াবার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া করে। তার ক্রুদ্ধ চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতন।

ওদিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু খালি দেখলুম, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-বাহু আকাশে আন্দোলিত করে জঙ্গল করছে মর্মর-হাহাকার। তবে এ সন্দেহটা বারংবারই মনের মধ্যে জাগতে লাগল যে, ঐ অন্ধকার-কেল্লার ভিতরে যারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা একটুও অচেতন নয়—ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়ে আছে তাদের হিংস্র চক্ষুগুলো।

গার্ড বললে, 'আর দেরি নয়, সবাই ফিরে চল!'

কমল আফ্‌শোষ করে বললে, 'হায় রে হায়, একটা নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চার একেবারেই মাঠে মারা গেল!'

খাপ্পা হয়ে বিনয়বাবু বললেন, 'চুপ, চুপ! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!'

হঠাৎ বাঘা জঙ্গলের দিকে চেয়ে একেবারে যেন হন্যে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কুমার আর তাকে ধরে রাখতে পারে না!

গার্ড আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কুকুরটা হঠাৎ এমন করছে কেন?'

তার প্রশ্নের উত্তর এলো জঙ্গলের দিক থেকে। আচম্বিতে অন্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম করে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল—চোখের উপরে জ্বলেই নিবে গেল দুটো বিদ্যুতের চমক!

যে কৌতূহলী যাত্রীগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারা সভয়ে প্রাণপণে দৌড় মারলে রেলপথের দিকে, আমাদের চারজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল খালি গার্ড ও একজন সাহেব।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ঐ ঝোপের আড়ালে চল—ঝোপের আড়ালে চল!'

ঝোপের পাশে গিয়ে গার্ড উত্তেজিত স্বরে বললে, 'বাবু, বাবু, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়?'

কুমার বললে, 'করতে চায় কি, আক্রমণ করেছে! ঐ দেখ, জঙ্গলের দিক থেকে কতগুলো সাদা কাপড় পরা মূর্তি ছুটে আসছে!'

আমি রিভলভার বার করে বললুম, 'দেখছেন বিনয়বাবু, সঙ্গে কেন অস্ত্র আনতে বলেছিলুম?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'ভাই বিমল, আমাদের পৈতৃক প্রাণগুলো এ-যাত্রা শনির দৃষ্টি বুঝি আর এড়াতে পারলে না।'

৭

রামহরির ধূলিশয্যা

একটা ঝোড়ো দম্‌কা হাওয়া আচমকা জেগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে টলোমলো গাছপালাগুলো কেঁদে উঠল আরো বেশি উচ্চস্বরে। তারপরেই আবার এল ঝেঁকে বৃষ্টি! গড়্‌-গড়্‌ গড়্‌-গড়্‌ বাজের ধমক—চক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ বিদ্যুৎ-চমক!

একে মেঘে কাজল-মাখা রাতের অন্ধকার, তার উপরে সেই ঘন বৃষ্টিধারার পর্দা। চোখ আর এদের ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারল না। শত্রুরাও নিশ্চয় এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

যে সাহেবটা শত্রুদের বন্দুকের ভয়ে পালায় নি সে বললে, 'বাবু, এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি নিরস্ত্র?'

—'না, আমার কাছে রিভলভার আছে।'

—'তাহলে এই ঝোপের আড়ালে আমাদের মতন হাঁটু গেড়ে বসে পড়! শত্রুদের আমাদের রিভলভারের নাগালের ভেতরে আসতে দাও। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমরা নিতান্ত অসহায় নই।'

গার্ড বললে, 'কিন্তু শত্রুদের কারুকেই তো দেখা যাচ্ছে না! তারা—'

তার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আবার শোনা গেল দুটো বন্দুকের শব্দ! কিন্তু সে হচ্ছে লক্ষ্যহীনের বন্দুক, গুলি যে কোন্ দিকে ছুটল আমরা তা টেরও পেলুম না।

কুমার বললে, 'বন্দুকের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে! ওরা বন্দুক ছুঁড়ছে আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'এই সুযোগে দৌড়ে আমাদের গাড়ির দিকে যাওয়া উচিত।'

কুমার বললে, 'পিছনে সশস্ত্র শত্রু নিয়ে গাড়ির দিকে দৌড়োতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশের বুকে জ্বলে উঠল একটা সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ এবং তারই আলোকে দেখা গেল, খানিক তফাতে একদল লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে!

গার্ড ত্রস্ত স্বরে বললে, 'ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে—ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে! ওরা ভেবেছে আমরা আর এখানে নেই!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কি সর্বনাশ! ওরা কি ট্রেন আক্রমণ করতে চায়?'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! ওদের দেখা যাচ্ছে! ওদের নাগালের মধ্যে পেয়েছি!'

আমি বললুম, 'ছোঁড়ো রিভলভার!'

প্রায় একসঙ্গে আমাদের পাঁচটা রিভলভার গর্জন করে উঠল—এবং পরমুহূর্তেই জাগল একটা বিকট আর্তনাদ!

আবার ডাকল বাজ—আবার জ্বলল বিদ্যুৎ-শিখা! এবং আবার গর্জন করলে আমাদের রিভলভারগুলো!

কমল চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরা পালাচ্ছে—ওরা পালাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'আবার ছোঁড়ো রিভলভার!'

আমাদের পাঁচটা রিভলভার আর একবার চীৎকার করে উঠল।

রাত্রের শরীরী অভিশাপের মতন অস্পষ্ট মূর্তিগুলো আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকার ও বৃষ্টিধারার অন্তঃপুরে।

বাঘার উৎসাহিত গর্জনে কান পাতা দায়! ভাগ্যে কুমার তাকে সজোরে

নিজের দুই হাঁটুর ভিতরে চেপে, বাঁ-হাতে তার বগ্‌লোস্‌ টেনে ধরেছিল, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত!

কমল আহ্লাদে নৃত্য করতে করতে বললে, 'জয়, আমাদের জয়! বৎসগণ! ভেবেছিল ফাঁকতালে করবে কেল্লা ফতে! হুঁ হুঁ, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ তো দেখ নি!'

তখনি কমলের একখানা হাত ধরে বিনয়বাবু তার নৃত্যোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, 'এই হচ্ছে সরে পড়বার সুযোগ! ছোটো সবাই ট্রেনের দিকে!'

অন্ধকার আর বৃষ্টিধারা কেবল শত্রুদেরও ঢেকে রাখে নি, তাদের আশ্রয় পেয়ে আমরাও নিরাপদে ট্রেনের কাছে গিয়ে পড়লুম।

যাত্রীরা কেউ বাইরে ছিল না। বন্দুক আর রিভলভারের শব্দ লুপ্ত করে দিয়েছে তাদের সমস্ত কৌতূহল। প্রত্যেক কামরার দরজা ও খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিয়ে তারা হয়তো তখন ইষ্টদেবতর নাম জপ করছিল।

আমাদের সঙ্গের সাহেব বললে, 'ইন্ডিয়া কী ক্রমে আমেরিকা হয়ে উঠল? সশস্ত্র ডাকাত এসে ট্রেন আক্রমণ করে, এদেশে এমন কথা কে কবে শুনেছে?'

গার্ড বললে, 'কামরায় গিয়ে ও-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো! ইঞ্জিন এখনি গাড়িকে পিছনের ষ্টেশনে নিয়ে যাবে।' বলেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

এমন সময়ে হঠাৎ উপরি-উপরি আরো কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং কাঠ-ফাটা শব্দ শুনে বুঝলুম, একটা গুলি ট্রেনের কোন কামরার গায়ে এসে লাগল।

ডাকাতরা কি আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে? তারা কি আবার আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

অন্য ক্ষেত্র হলে আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে আবার তাদের উচিতমতন অভ্যর্থনা করতুম। কামরার ভিতরেই আছে আমাদের 'অটোমেটিক' বন্দুকগুলো। তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে পঁয়ত্রিশটা গুলি বৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো হাতে থাকলে আমরা পাঁচজনে দুইশত শত্রুকেও বাধা দিতে পারি।

কিন্তু সে সময় পেলুম না। দূর থেকে বেজে উঠল গার্ডের বাঁশী—গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই! 'টর্চে'র আলো ফেলে তাড়াতাড়ি আমাদের কামরা আবিষ্কার করতে বাধ্য হলুম। কোনরকমে গাড়িতে উঠে পড়বার সময় মাত্র পেলুম।

গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা কোলাহল। সে হচ্ছে মুখের গ্রাস পালিয়ে গেল দেখে ডাকাতদের হতাশার চীৎকার! হতভাগারা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছিল, সমস্তই ব্যর্থ হল।

ট্রেন পিছু হেঁটে চলেছে—তার গতি খুব দ্রুত নয়। আমাদের কামরার ভিতরেও ঘুট্‌-ঘুট্‌ করছে অন্ধকার।

কুমার বললে, 'ছি রামহরি, ছিঃ! তুমিও ভয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ইঁদুরের মতন লুকিয়ে আছ!'

রামহরি কেমন যেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'মোটেই নয় কুমারবাবু, মোটেই নয়। একবার আলো জ্বেলে দেখ না!'

কমল আলো জ্বাললে।

বিপুল বিস্ময়ে দেখলুম, কামরার মেঝের উপরে শুয়ে রয়েছে রামহরি, তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা!

বিস্ফারিত চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'রামহরি, এ কি ব্যাপার!'

ম্লান হাসি হেসে রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, কামরা থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবার পর আমি জানালায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ওদিকের জানালা দিয়ে জন-তিনেক লোক কখন যে নিঃশব্দে কামরার ভেতর ঢুকেছিল, আমি একটুও টের পাই নি। আমার অজান্তেই তারা আমাকে আক্রমণ করলে, আমি কোনরকম বাধা দেবার ফাঁক পর্যন্ত পেলুম না।'

—'কে তারা? চীনেম্যান?'

—'না, পশ্চিমের লোক, হিন্দুস্থানী।'

—'তারপর?'

—'একটা লোক ছোরা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'চ্যাচালেই মরবি!' আর দুটো লোক আমাদের মোটঘাট, 'সুট্‌কেশ'গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।'

ফিরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, আমদের অধিকাংশ মোটই মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক 'সুটকেশে'র তালা খোলা।

রামহরি বললে, 'ভয় নেই তোমাদের, তারা কিছু নিয়ে যায় নি! তাদের ভাব দেখে মনে হল, তারা যেন কোন বিশেষ জিনিসেরই সন্ধান করছে!'

কুমার বললে, 'তবে কি তারা সাধারণ চোর নয়? তারা কি সেই ধুক্‌ধুকিখানার লোভেই কামরার ভিতরে ঢুকেছিল?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ধুক্‌ধুকিখানা তো চীনেম্যানদের সম্পত্তি! আর রামহরি বলছে যারা এসেছিল তারা হচ্ছে হিন্দুস্থানী।'

আমি রামহরির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বললুম, 'বিনয়বাবু, এই চীনে ডাকাতেরা বড় সহজ লোক নয়। তারা বেশ জানে, ভারতে এসে কাজ হাসিল করতে গেলে এদেশী লোকের সাহায্য না নিলে চলবে না। কারণ কোন ছদ্মবেশেই চীনেদের মঙ্গোলীয় ছাঁচ ঢাকতে পারবে না, ভারতীয় জনতার মধ্যে তাদের দেখলেই সকলে চিনে ফেলবে। কাজেই তারা এদেশী গুণ্ডাদেরও সাহায্য

নিয়েছে। তাদের দলের লোক নিশ্চয়ই ট্রেনের মধ্যে ছিল, আমরা কামরা ছাড়বার পরেই সুযোগ পেয়ে এসেছিল রামহরির সঙ্গে আলাপ করতে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এবার থেকে আমাদের দেশী-বিদেশী দু-রকম শত্রুর সঙ্গেই যুঝতে হবে? ব্যাপারটা ক্রমেই সঙীন্ হয়ে উঠছে যে!'

কুমার বললে, 'উঠুক—আমরা থোড়াই কেয়ার করি! কিন্তু রামহরি, তোমার গল্পের শেষটা এখনো তো শোনা হয় নি।'

রামহরি উঠে বসে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'গল্পটা আরো কিছু বড় হতে পারত, কিন্তু শেষ হবার আগেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল তোমাদের জন্যেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের জন্যেই?'

—'হ্যাঁ গো খোকাবাবু, হ্যাঁ। কামরার আলো নিবিয়ে 'টর্চে'র আলোয় তারা একমনে খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময়ে বাইরে থেকে এল তোমাদের সাড়া। গার্ডের বাঁশীও শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভিতর থেকেও তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। আর আমার কথাও ফুরুলো।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ধুক্‌ধুকিখানা তারা খুঁজে পায় নি তো?'

আমি হাসতে হাসতে নীচু-গলায় বললুম, 'ধুক্‌ধুকিখানা আছে কলকাতায়।'

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কি?'

—'ধুক্‌ধুকিখানা একেবারেই বাজে। আসল দরকার তার ভিতরের লেখাটুকু। আমি আর কুমার সেটুকু মুখস্থ করে রেখেছি।

কমল খুশি হয়ে বলে উঠল, 'বাহবা কি বাহবা। ধুক্‌ধুকির লেখা পড়তে হলে ছুন্-ছিউকে এখন বিমলদা আর কুমারদার মনের ভিতরে ঢুকতে হবে!'

আরো খানিকক্ষণ পরে ট্রেন এসে স্টেশনে ঢুকে বিষম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। চারিদিকে মহা হৈ-চৈ, লোকজনের ছুটোছুটি!

রামহরিকে নিয়ে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। গার্ড আর পুলিশের সঙ্গে ট্রেনের প্রত্যেক কামরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলুম, কিন্তু রামহরি সেই তিনজন লোককে কোথাও আবিষ্কার করতে পারলে না। নিশ্চয়ই তারা মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

সকাল-বেলায় একদল পুলিশের লোক ঘটনাস্থলে গেল খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু মাঠ, জঙ্গল ও আশেপাশের গ্রাম খুঁজে অপরাধীদের কারুকেই পেলে না। আমার বিশ্বাস তারা কোন পাহাড়ে উঠে আত্মগোপন করে আছে।

যথাসময়ে লাইন মেরামত হল। ট্রেন আবার ছাড়ল। দিন-রাত যক্ষপতির

রত্নপুরীর সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ক্রমেই এগিয়ে চললুম, ভারতের উত্তর-সীমান্তের দিকে।

ভারতের উত্তর-সীমান্ত আমার মনে চিরদিনই জাগিয়ে তোলে বিচিত্র উত্তেজনা! আফগানিস্থান যখন হিন্দুস্থানেরই এক অংশ, তখন সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সেখানে হয়েছে কত না অদ্ভুত নাটকের অভিনয়! শক, তাতার, হুন্, মোগল, চীন, পারসী ও গ্রীক প্রভৃতি জাতির পর জাতি এই পথ দিয়েই মূর্তিমান ধ্বংসের মতন ছুটে এসেছে সোনার ভারত লুণ্ঠন করবার জন্যে। দেশরক্ষার জন্যে যুগে যুগে ভারতের কত লক্ষ লক্ষ বীর ঢেলেছে সেখানে বুকের রক্তধারা! ওখানকার আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের শিখরে শিখরে আজ বাতাসে বাতাসে যে অশ্রান্ত গান জেগে উঠে, সে হচ্ছে এই প্রাচীন ভারতেরই অতীত গৌরব-গাথা। ঐতিহাসিক ভারতের সর্বপ্রথম সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত ঐ পথ দিয়েই ভারতের শত্রু গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর্যাবর্তের বাহিরে। যে পার্বত্য জাতির প্রচণ্ড রণোন্মাদ পৃথিবীজয়ী আলেকজাণ্ডারকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাদের সুযোগ্য বংশধররা আজও বর্তমান আছে। এই বিংশ শতাব্দীর উড়োজাহাজ আর কলের কামানও তাদের যুদ্ধোন্মাদ শান্ত বা তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ-সিংহ আজও সেখানে ঘুমোবার অবসর পায় না। আজকের ভারতে যারা সত্যিকার 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' খুঁজে বেড়ায়, ভারতের উত্তর-সীমান্ত পূর্ণ করতে পারে তাদের মনের প্রার্থনা।

বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, আফগানিস্থানের মধ্যে কাফ্রিস্থান হচ্ছে এক রহস্যময়, অদ্ভুত দেশ। ওখানকার লোকজন, আচার-ব্যবহার সমস্তই নতুন-রকম। আমাদের যক্ষপতির ঐশ্বর্য আছে ঐ কাফ্রিস্থানেই। ঐখানেই উঠবে পরের দৃশ্যের যবনিকা।

৮

কাফ্রিস্থানের কথা

মালাকান্দ্ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে আগে পড়লুম সোয়াট্, তারপর ডির মুল্লুকে; তারপর উঠলুম লোয়ারি গিরিসঙ্কটের (দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু) উপরে এবং তারপরে পৌঁছুলুম চিত্রল রাজ্যে।

এ-সব জায়গার বেশি বর্ণনা দেবার দরকার নেই, কারণ আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে কাফ্রিস্থান। তবে অল্প দু-চার কথা বললে মন্দ হবে না।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে অপূর্ব, সে কথা বলা বাহুল্য। আমাদের মতন সমতল দেশের বাসিন্দাদের চোখ আর মন এই অসমোচ্চ পর্বত-সাম্রাজ্যে এসে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। নানা আকারের শৈলমালার এমন বিচিত্র উৎসব আমি আর কখনো দেখি নি। এই চিত্রল যে কি-রকম বন্ধুর দেশ, একটা কথা বললেই সকলে সেটা বুঝতে পারবেন। এ অঞ্চলে মোটঘাট স্থানান্তরিত করবার জন্য কেউ মালগাড়ি ব্যবহার করে না, কারণ তা অসম্ভব। চিত্রলীদের অভিধানে নাকি গাড়ির চাকা বোঝায় এমন কোন শব্দই নেই। তবে চিত্রলের শাসনকর্তার (Mehtar) দৌলতে আজকাল ওখানে খানকয় মোটরের আবির্ভাব হয়েছে বটে।

এ হচ্ছে কেবল পনের-ষোল-সতের হাজার ফুট উঁচু আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের দেশ—খালি চড়াই আর উৎরাই, খাদ আর উপত্যকা, শৈলশিখরের পর শৈলশিখরের নিস্পন্দ তরঙ্গ! দূরে দূরে দেখা যায় আরো উঁচু শৈলমালার উপরে চিরতুষারের শুভ্র সমারোহ। আমাদের একমাত্র সহায় এদেশী পনি-ঘোড়া—অতি ভয়াবহ, উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথেও এ-সব ঘোড়ার পা একবারও পিছলোয় না—কিন্তু একবার পিছলোলে আর রক্ষা নেই, কারণ পরমুহূর্তে তোমাকে নেমে যেতে হবে হাজার হাজার ফুট নীচে কোথায় কোন অতলে। ইহলোক থেকে একেবারে পরলোকে।

একদিন দুপুর-বেলায় নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলেছি, নির্মেঘ আকাশ পরিপূর্ণ রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ করছে, আচম্বিতে দূরে জাগলে ঘনঘোর মেঘগর্জন!

আমার বিস্মিত মুখের পানে তাকিয়ে গাইড হাসতে হাসতে বললে, 'বাবুজী, ও মেঘের ডাক নয়।'

—'তবে?'

—'পাহাড় ভেঙে পড়ছে।'

—'এদেশে প্রায়ই পাহাড় ভেড়ে পড়ে নাকি?'

—'প্রায়ই। লোকজন হামেশাই মারা পড়ে। সময়ে সময়ে গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।'

এই হিংস্র পাহাড়ের দেশে মানুষদেরও প্রকৃতি রীতিমত বন্য। আমরা যে সোয়াট ও ডির দেশ পিছনে ফেলে এসেছি, সেখানকার মুসলমানদের ধর্মোন্মাদ ভয়ঙ্কর। বিধর্মীদের হত্যা করা বলতে তারা বোঝে, স্বর্গে যাবার রাস্তা সাফ করা।

সোয়াট আর ডির দেশের মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। লড়তে, মারতে ও মরতে তারা ভালোবাসে—রক্ত ও মৃত্যু যেন তাদের প্রিয় বন্ধু!

একদিন যেতে যেতে দেখি এক জায়গায় দুই দল করছে মারামারি। বন্দুক

গর্জন করছে, বন্-বন্ লাঠি ঘুরছে আর ঝক্‌মক্ জ্বলছে তরবারি! দস্তুরমতন যুদ্ধ। মাটিতে পড়ে কয়েকটা আহত দেহ ছট্‌ফট্ করছে এবং কয়েকটা দেহ একেবারে নিস্পন্দন—অর্থাৎ এ-জীবনে তারা আর নড়বে না।

কিন্তু ওদের কেউ তখন বিধর্মী বধ করে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে আগ্রহ দেখালে না, বরং আমাদের দেখে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের গাইড ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ছুটে এসে বললে, 'বাবুজী, জলদি এখান থেকে চলে আসুন। পাছে আমরা জখম হই, তাই ওরা লড়াই করতে পারছে না।'

মনে মনে ওদের সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। তারপর রাস্তার মোড় ফিরে একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হৈ-চৈ শুনেই বুঝলুম, ওদের যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছে!

কুমার বললে, 'এরা লড়াই করছে কেন?'

গাইড বললে, 'এক পয়সার পেঁয়াজের জন্যে!'

চিত্রলের পরেই হচ্ছে কাফ্রিস্থান। এদেশটি এখন আফগানিস্থানের আমীরের শাসনাধীন হয়ে মুসলমান-প্রধান হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু এখানকার মুসলমানরা খুব বেশি গোঁড়াও নয়, তাদের আচার-ব্যবহারও একেবারে অন্যরকম। কিন্তু এখনো এদেশে পুরানো কাফ্রিদের এমন এক সম্প্রদায় বাস করে, যারা পৈতৃক রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতা বর্জন করে নি। নানান দেবতার কাঠের মূর্তি গড়ে তারা পূজা করে এবং তাদের প্রধান প্রধান দেবতার নাম হচ্ছে : ইন্দ্র, মণি, গিষ, বাগিষ্ট, আরম, সান্‌রু, সাতারাম বা সুদারাম। ওঁরা হচ্ছেন পুরুষ-দেবতা। দেবীদের নাম দিয়েছে ওরা সঞ্জীরক্তী, দিজোন, নির্মলী ও সুমাই প্রভৃতি। অনুমানে বেশ বোঝা যায়, এদের দেব-দেবী হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীরই রূপান্তর।

'কাফ্রিস্থান' বলতে বুঝায় কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের দেশ। বলা বাহুল্য, এ নামটি মুসলমানদের দেওয়া। হিন্দুদের পরে এক সময়ে এখানে ছিল চীনদের প্রভুত্ব। তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। আমাদের চোখের সামনে নাচছে যে গুপ্তধনের স্বপ্ন, তারও মালিক ছিলেন এক চীনা রাজপুত্র। সেই গুপ্তধন আছে এক বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সুতরাং এ অঞ্চলে আগে বৌদ্ধদেরও প্রাধান্য ছিল। তারপর মুসলমানরা বারে বারে আক্রমণ করেছিল কাফ্রিস্থানকে। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লং প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীরাও নাকি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কারুর প্রাধান্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজের চারিদিকে মুসলমান প্রতিবেশী নিয়েও গত শতাব্দী পর্যন্ত কাফ্রিস্থান আপন স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাফিররা দেখতে সুন্দর। তাদের গায়ের রং প্রায় গৌর, দেহ লম্বা, মুখ

চওড়া, চোখ গ্রীকদের মতন। শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা বলে তারা স্নান করতে একেবারেই নারাজ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে তাদের চেহারা যে আরো চমৎকার হত, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই!

কি মুসলমান ও কি পৌত্তলিক কাফির প্রত্যেকেই পরিবারের কেউ মারা পড়লে, গাঁয়ের প্রান্তে নির্দিষ্ট এক ঢালু পাহাড়ের গায়ে উঠে চার পায়াওয়ালা বড় সিন্দুকের ভিতরে মৃতদেহ রেখে আসে। তারা শবদেহ গোর দেয় না। এক একটি পারিবারিক সিন্দুকের ভিতরে পরে পরে দুটো, তিনটে বা চারটে মৃতদেহও রাখা হয়।

কাফিররা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যন্ত নাচের ভক্ত। সামাজিক বা ধর্মসংক্রান্ত যে কোন অনুষ্ঠানে তারা নাচের আসর বসায় এবং মেয়ে ও পুরুষরা একসঙ্গে দল বেঁধে সারা রাত ধরে নাচের আমোদে মেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গান ও দামামা। অনেকে দুই আঙুল মুখে পুরে শিস দেয়। পরীদের উপরে এদের অগাধ বিশ্বাস। নাচতে নাচতে কেউ কেউ পরী দেখে দশা পায়। তখন তারা নাকি ভাববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে! সবাই তাদের কাছে গিয়ে আগ্রহ-ভরে এইরকম সব প্রশ্ন করে—'এবার কি-রকম ফসল হবে?'—'এ বছরে গাঁয়ে মড়ক হবে কিনা?'—'আমার খোকা হবে না খুকী হবে?'

পৌত্তলিক কাফিররা মুসলমানদের বিষম শত্রু। এর কারণ বোঝাও কঠিন নয়। মুসলমানরা—অর্থাৎ আফগান প্রভৃতি জাতের লোকেরা চিরদিনই তাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছে, কাফিররাও তাই সুযোগ পেলেই ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের হত্যা করে! কেউ লুকিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলমানকে বধ করতে পারলে কাফির-সমাজে বীর বলে গণ্য হয়! তাদের মাথার পাগড়িতে গোঁজা পালকের সংখ্যা দেখেই বলে দেওয়া যায়, কে কয়জন মুসলমানকে হত্যা করেছে! আমরা যখন কাফ্রিস্থানে গিয়েছিলুম তখনই এ-শ্রেণীর মুসলমান-বিদ্বেষী কাফিররা দলে যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা বোধহয় নগণ্য, কারণ ওদেশে মুসলমান ধর্মের প্রভুত্ব বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

কাফিরদের প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় মৃত ব্যক্তিদের অশ্বারোহী কাঠের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। পৌত্তলিক হোক্, মুসলমান হোক্, পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা প্রত্যেক কাফিরই কর্তব্য বলে মনে করে। যার যেমন সঙ্গতি, সে তত-বড় মূর্তি গড়ায়। কিন্তু এ-সব হচ্ছে নামেই প্রতিমূর্তি, কারণ দেখতে সব মূর্তিই অবিকল একরকম!

কাফিররা মাছ খায় না—মাছে তাদের ভীষণ ঘৃণা। ব্যাং বা টিক্‌টিকি খেতে

বললে আমাদের অবস্থা যে-রকম হয়, মাছ খেতে বললে তারাও সেইরকম ভাব প্রকাশ করে। কাফিররা মুর্গীর মাংসও অপবিত্র মনে করে—কারণ তা মুসলমানদের খাদ্য এবং কাফির নারীদের পক্ষে পুরুষ-জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ!

কাফিররা পরী মানে এবং কাফ্রিস্থানকে সত্যসত্যই পরীস্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দৃষ্টিসীমা জুড়ে দূরে বিরাজ করছে ২৫,৪২৬ ফুট উঁচু টেরিচ্-মির পর্বত, বিরাট দেহ তার চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা এবং তার শিখর উঠেছে মেঘরাজ্য ভেদ করে। নীচেও সর্বত্রই অচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-প্রহরীর দল। এখন শীতকাল নয়, নইলে এ-সব পাহাড়ও পরত তুষার-পোষাক এবং তাদের উপত্যকা ও অলিগলি দিয়ে প্রবাহিত হত তুষারের নদনদী। শীতকালে এখানকার অনেক গ্রাম বাহিরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখতে পারে না—তাদের মাথার উপর দিয়ে বইতে থাকে বরফের ঝড়, তাদের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বরফের স্তূপ।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে সমস্ত কাফ্রিস্থান ছেয়ে যায় ফুলে-ফুলে। কোথাও বেদানা ও আঙুরের ঝোপ, কোথাও মনোরম সবুজে-ছাওয়া বনভূমি—তাদের উপরে ঝরে পড়ছে নির্ঝরের কৌতুকহাসি এবং নীচে দিয়ে নেচে যাচ্ছে গীতিময়ী নদী। পাহাড়ের তলার দিকে ঢেকে থাকে জলপাই ও ওক্‌গাছের শ্যামলতা এবং পাথরের ধারে ধারে ফলে আছে আখ্‌রোট, তুঁত, খুবানী, দ্রাক্ষা ও আপেল গাছ। আরো উপরে উঠলে দেখা যায় দেবদারু গাছের বাহার। ফুলও ফোটে যে কতরকম তার ফর্দ দেওয়া অসম্ভব!

এই হল গিয়ে কাফ্রিস্থানের মোটামুটি বর্ণনা।

৯

পাহাড়ে মেয়ে

চিত্রল থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে আড্ডা গেড়েছি। এখানে দিন দুই-তিন থাকব স্থির করেছি—কেবল বিশ্রামের জন্যে নয়, দরকারি খবরাখবর নেবার জন্যেও।

এ গ্রামের বাড়িগুলোর অবস্থান বড় অদ্ভুত। দূর থেকে বাড়িগুলোকে দেখায় গেলারির মতন। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়িগুলো থাকে থাকে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে।

এখানে বাড়ি তৈরির নিয়মও আলাদা। তার প্রধান উপাদান হচ্ছে কাঠ, পাথর আর কাদা! কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো হয় বড় বড় পাথরের পর পাথর এবং কাদা দিয়ে সারা হয় সুরকির কাজ। ছাদ মাটির। রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারেও আমি পাকা বাড়ির মাটির ছাদ দেখেছি। এর কারণ জানি না।

যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সে হচ্ছে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, নাম গুম্‌লী। বিধবা। এ গ্রামে তার পসার-প্রতিপত্তি বড় কম নয় দেখলুম।

রামহরি মুসলমানের বাড়িতে অতিথি হতে রাজি নয়—জাত খোয়াবার ভয়ে। সেই খুঁজে খুঁজে গুম্‌লীকে আবিষ্কার করেছে। গুম্‌লী পুরানো কাফির-ধর্ম—অর্থাৎ পৌত্তলিকতা—ত্যাগ করে নি।

গুম্‌লী লোক ভালো, অতিথি-সৎকার করতে খুব ভালোবাসে। আমাদের প্রধান খাদ্য হয়েছে ঘি-জবজবে চাপাটি আর খাশির মাংস। তার উপরে পিঠা ও অন্যান্য খাবারেরও অভাব নেই।

কমল জানতে চাইলে, এখানে মুর্গী পাওয়া যায় কিনা?

গুম্‌লী ঘৃণায় নাক তুলে থুতু ফেলে বললে, 'ছি ছি, মুর্গী খায় মুসলমানরা, আমার বাড়িতে মুর্গী ঢোকে না।'

সে পুস্তো ভাষায় যা বললে, বিনয়বাবু তা বাংলায় তর্জমা করে আমাদের শোনালে। এদেশে তিনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করছেন!

রামহরি পরম শ্রদ্ধাভরে বললে, 'গুম্‌লী বড় পবিত্র মেয়ে, সে তোমাদের মত ম্লেচ্ছ নয়।'

গুম্‌লী বললে, 'বাবুজীরা যদি গরুর মাংস খেতে চান, আমি খাওয়াতে পারি।'

রামহরি দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললে, 'কি সর্বনাশ, এরা মুর্গী খায় না, কিন্তু গরু খায় নাকি? অ্যাঁঃ, তবে তো এদের হেঁসেলে খেয়ে আমার জাত গিয়েছে! হে বাবা ভগবান, এ তুমি আমার কি করলে? লুকিয়ে লুকিয়ে জাতটি কেড়ে নিলে?'

'বাবা ভগবানে'র কাছ থেকে প্রশ্নের কোন উত্তর বা সান্ত্বনা না পেয়ে রামহরি কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে সে ফিরে এল বটে, কিন্তু গুম্‌লীর বাড়িতে আর জলগ্রহণ করলে না।

কাফিররা দশজনকে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসে। শুনলুম বড় বড় ভোজ দিয়ে অনেকে ফতুর হতেও ভয় পায় না। অতিথি সৎকারের আইনও এখানে বেজায় কড়া! যে ভোজ দেয় সে যদি ভালো খাবার না খাওয়ায়, তাহলে তার জরিমানা হয়!

সন্ধ্যার আগে সবাই মিলে বেড়াতে গেলুম। সেদিন কাফিরদের কি-একটা উৎসব ছিল, তাই মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচের আমোদে মেতেছে। খানিকক্ষণ নাচ দেখে চললুম নদীর ধারে। আমি আগে আগে এগিয়ে নদীর জলে হাত দিলুম। উঃ কী কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল! বুঝলুম কোন বরফের পাহাড় থেকে নেমে আসছে এই নদী।

আচম্বিতে পিছনে দূর থেকে কুমারের চীৎকার জাগল—'বিমল, বিমল! পালিয়ে এস—শিগ্‌গির পালিয়ে এস।'

চমকে ফিরে দেখি, কোথা থেকে গুম্‌লী আবির্ভূত হয়ে হাত-মুখ নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা কইছে! সে কি বলছে শুনতে পেলুম না, কিন্তু তারপরেই দেখলুম, বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার, কমল ও রামহরি বেগে দৌড় মারলে! বোঝা গেল ভয়েই তারা পালাচ্ছে, কিন্তু কেন পালাচ্ছে বোঝা গেল না।

তারপরেই শুনলুম বহু নারী-কণ্ঠে বিষম চীৎকার! দেখি দলে দলে কাফির নারী চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

তবে কি এই নারীদের ভয়েই ওরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল! কি আশ্চর্য, এরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়? আমাদের শত্রুরা কি নিজেরা আড়ালে থেকে এই নারীসৈন্য নিযুক্ত করেছে? এখন আমার কি করা উচিত? পালাব? নারীর ভয়ে পালাব? হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই! আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না!

কিন্তু এখন আর পালানোও অসম্ভব! সেই বিপুল নারীবাহিনী তখন পঙ্গপালের মতন চারিধার থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আর নারী বলে তাদের কারুকে তুচ্ছ করবারও উপায় নেই! তাদের কেউই বাংলাদেশের ভেঙে-পড়া লতার মতন মেয়ে নয়, তাদের অধিকাংশই সাধারণ বাঙালী পুরুষেরও চেয়ে মাথায় উঁচু—শক্ত ও বলিষ্ঠ তাদের দেহ!

আমি রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম—এমন অদ্ভুত সমস্যায় কখনো আর পড়ি নি! বিকট স্বরে চেঁচিয়ে মেয়ের দল সবেগে আমাকে আক্রমণ করলে! আর সে এমন বিষম আক্রমণ যে, স্বয়ং ভীমসেন তাঁর বিরাট গদা ঘুরিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না!

ভীতু ভেড়ার মতন আমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলুম! তারা ছিনেজোঁকের মতন আমাকে চেপে ধরে হিড়্‌-হিড়্‌ করে টানতে টানতে নিয়ে চলল এবং তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে একেবারে নদীর ভিতরে ফেলে দিল!

ঝুপ করে জলে পড়লুম। নদী সেখানে গভীর নয় বটে, কিন্তু সেই বরফ-

গলা জলে আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল। নাকানি-চোবানি খেয়ে অসাড় দেহটাকে কোন রকমে টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, মেয়ের পাল সকৌতুকে হাসতে হাসতে আর একদিকে চলে যাচ্ছে! তবে কি এটা হচ্ছে ওদের ঠাট্টা? মেয়েমানুষ তেড়ে এসে জোয়ান পুরুষকে ধরে বেড়ালছানার মতন জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—এ কি রকম সৃষ্টিছাড়া দেশ? প্রাচীন গ্রীক সৈনিকরা নাকি এক-জাতের বীর-নারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্রাচীন কাফির নারীদের কোন সম্পর্ক নেই তো?

কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে চললুম। পথের চারিদিকেই মেয়ের দল হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে, পাছে আবার তাদের পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে মানে মানে আমি পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলুম—কিন্তু তারা কেউ আর আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আজ যেন এ দেশটা দস্তুরমত মেয়ে-রাজ্যে পরিণত হয়েছে—পথে পুরুষ খুব কম, কেবল মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে! যে কয়জন পুরুষের সঙ্গে দেখা হল তাদের প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় ভিজে সপ্-সপ্ করছে! একটু পরেই সব রহস্য বোঝা গেল।

বাসায় ঢুকতেই কুমার, কমল আর রামহরি অট্টহাস্য করে উঠল। বিনয়বাবুও বোধহয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা হেসে নিলেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, 'যত-সব কাপুরুষ! ভয়ে পালিয়ে এসে আবার দাঁত বার করে হাসতে লজ্জা করছে না?'

কুমার বললে, 'স্বীকার করছি ভাই, আমরা হচ্ছি পয়লা নম্বরের কাপুরুষ! এই সব পাহাড়ে-মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করবার শক্তি আমাদের নেই! কিন্তু হে বীরবর, তোমার চেহারা ভগ্নদূতের মতন কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি কাপড়-চোপড় বদ্‌লাতে লাগলুম।

বিনয়বাবু বললেন, 'ভায়া বিমল, কুমার তোমাকে সাবধান করে দিলে, তবু তুমি আমাদের সঙ্গে পালিয়ে এলে না কেন?'

—'কেমন করে বুঝব যে ঐ দজ্জাল মেয়েগুলো আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে?'

—'আমরাও আগে বুঝতে পারি নি! ভাগ্যে গুম্‌লী এসে সাবধান করে দিলে, তাই আমরা মানে মানে মাথা বাঁচাতে পেরেছি।'

—'কিন্তু এ প্রহসনের অর্থ কি?'

—'আজ এখানে যে উৎসবটা হয়ে গেল, এর শেষে এখানকার মেয়েরা

পুরুষদের ধরে নদীর জলে হাবুডুবু খাইয়ে দেয়। এটা হচ্ছে কাফিরদের লোকাচার —এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোন জারিজুরিই খাটে না।'

—'তাই নাকি? তাহলে গুম্‌লীর কাছ থেকে জেনে রাখবেন, ওদের এ-রকম আরো লোকাচার আছে কিনা?'

* * * *

* * *

* *

অজানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের ও নিত্যনতুন দৃশ্য-সমারোহের মধ্যে আমরা ছুন্‌-ছিউ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। তারা যে এখনো আমাদের পিছনে লেগে আছে, এমন সন্দেহ করবার কোন কারণও পাই নি। অন্তত তারা যে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, এ বিশ্বাস আমার ছিল!

কিন্তু হঠাৎ বোঝা গেল, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত।

আজ বৈকালে মুখ অন্ধকার করে গুম্‌লী এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল! তারপর যেন আপন মনেই বললে, 'বার্মুক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়!'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বার্মুক? সে আবার কে?'

—'সে হচ্ছে এই গাঁয়ের 'জাষ্ট'।*

১০

বেড়াজালে

গুম্‌লীর মুখের ভাব দেখে আমাদের সকলেরই মনে খটকা লাগল। কিন্তু এই অজানা গাঁয়ের অচেনা সর্দার যদি সুবিধার লোকও না হয়, তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে?

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা সুবিধের নয় বলছ কেন?'

—'আজ দুপুর-বেলায় আমি ভিন্‌-গাঁয়ে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে দেখলুম, পাহাড়ে একটা ঝোপের ছায়ায় বসে আছে বার্মুক আর দুটো চীনেম্যান।'

---

* 'জাষ্ট'—অর্থাৎ সর্দার।

বিনয়বাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'চীনেম্যান?'

—'হাঁ বাবুজী। তারা চুপি চুপি কি বলাবলি করছিল, আমাকে দেখেই একেবারে চুপ মেরে গেল। আমি কোন কথা না বলে এগিয়ে এলুম। খানিক দূর এসেই ফিরে দেখলুম, বার্মুক আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চীনেম্যান দুটোকে কি যেন বলছে।

—'তারপর?'

—'তারপর তখন আর কিছু হল না। কিন্তু এইমাত্র বার্মুক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

—'কেন?'

—'হতভাগা আমাকে কি বলে জানেন বাবুজী? আজ রাত্রে আমি যদি আপনাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে আর সদর-দরজা খুলে রাখতে পারি, তাহলে সে আমাকে পাঁচশো টাকা বখ্‌সিস্ দেবে। অর্ধেক টাকা সে এখনি দিতে চায়।'

—'বখ্‌সিসে লোভ তোমার আছে নাকি?'

—'আছে বাবুজী, আছে!'

—'মানে?'

—'মুখপোড়া বার্মুকের কাছ থেকে বখ্‌সিসের আগাম আড়াই-শো টাকা আমি আদায় করে নিয়েছি।'

—'গুম্‌লী!'

—'ঘাব্‌ড়াবেন না বাবুজী, ঘাব্‌ড়াবেন না। বার্মুক হচ্ছে পাজীর পা ঝাড়া, মানুষ মারতে তার হাত এতটুকুও কাঁপে না। সে কাফির হলেও আমাদের ধর্ম ছেড়েছে, তাই তাকে আমরা পরম শত্রু বলেই মনে করি। তাকে ঠকিয়ে যদি আড়াই-শো টাকা লাভ করতে পারি, তাহলে আমার কোন পাপ হবে না।'

—'গুম্‌লী, আমরা এখনি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই।'

—'ভয় নেই বাবুজী। যখন সব কথা প্রকাশ করলুম, তখন আপনাদের খাবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি বিষ মাখিয়ে দেব না। বার্মুকের মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তার অর্ধেক টাকা যখন নিয়েছি, অর্ধেক কাজও আমি করব।'

—'অর্থাৎ?'

—'আজ রাত্রে সদর-দরজাটা খুলে রাখব।'

—'তারপর?'

—'তারপর রাত্রে কেউ আমার বাড়িতে ঢুকলে ভালো করেই তাকে আদর-

যত্ন করব। গরক্, বাচিক্, কারুক্, আর মাল্কানকে খবর দিয়েছি, তারা এলো বলে।'

—'তারা আবার কে?'

—'আমার বিশ্বাসী লোক—আমার কথায় তারা ওঠে-বসে। আজ রাত্রে তারা আমার বাড়িতে পাহারা দেবে।'

বিনয়বাবু যখন সব কথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তখন আমিও বললুম, 'আমিও গুম্‌লীর মতে সায় দিই। শঠের সঙ্গে শঠতা করতে কোন দোষ নেই। আসুক ছুন্-ছিউ, আসুক বার্মুক! এখানে এলেই তারা দেখতে পাবে, মড়ারা জ্যান্তো হয়ে বন্দুক ধরে বসে আছে!'

কুমার কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'গুম্‌লী-ঠাক্‌রুণ! তোমার বাকি আড়াই-শো টাকাও মারা যাবে না। ও-টাকাটাও আমরা নিজেদের পকেট থেকে তোমায় দেব!'

গুম্‌লী একগাল হেসে সেলাম করে বললে, 'বাবুজী মেহেরবান্!'

পাহাড়ের টঙে কাফিরদের ছোট্ট গাঁ, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল প্রথম রাত্রেই। রাত যত গভীর হয় স্তব্ধতা ততই থম্‌থমে হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন বোবা দুনিয়ায় জেগে আছে কেবল গোটাকয়েক বদ-রাগী কুকুর।

সদর-দরজার পাশেই একটা ঘর তার মধ্যে আলো নিবিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে একটা করে রিভলভার। এই সংকীর্ণ স্থানে বন্দুকের সাহায্য দরকার হবে না।

গরক্, বাচিক্, কারুক্, আর মাল্কানও এসেছে। তারা সবাই ছয় ফুট করে লম্বা, সারা গায়ে কঠিন মাংসপেশীর খেলা। তারা কথা কয় কম, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বেশ বোঝা যায়, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গরক্ ও বাচিক্ বাড়ির ছাদের উপরে বসে আছে পাহারা দেবার জন্যে। কারুক্ আর মাল্কান অপেক্ষা করছে গাঁয়ের পথে, শত্রুরা দেখা দিলেই তারা আমাদের সাবধান করে দেবে। প্রথমে তারা আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি বাড়ির ভিতরে পাঁচটা রিভলভারই যথেষ্ট, তারা যদি যথাসময়ে শত্রুদের আগমন সংবাদ দিতে পারে, তাহলেই আমাদের যথার্থ উপকার করা হবে।

রাতের অসাধারণ নীরবতার মাঝে আমাদের হাতঘড়িগুলোর টিক্-টিক্ শব্দ যেন রীতিমত কোলাহল বলে মনে হচ্ছে!

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, আমরা কোন অযাচিত ও অনাহুত অতিথিকে

অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার কোল ঘেঁষে কান খাড়া করে বসে আছে।

আচম্বিতে দূর পথ থেকে ভেসে এল একটা বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও চীৎকার! তারপরই ছাদের উপর থেকে সাড়া দিলে আর একটা বিড়াল!

এই হল আমাদের সঙ্কেত-ধ্বনি! এর মানে, এখনি হবে শত্রুদের আবির্ভাব।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, 'আমরা কি করব?'

—'বিশেষ কিছু না। এখানে সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে হুলুস্থূল বাধিয়ে দিলে পুলিশ হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে। বদমাইসগুলোকে কিছু ভয় দেখাতে বা সামান্য জখম করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রামহরি, বাঘাকে সামলে রাখো। কুমার, শত্রুরা যখন পালাবে তখন তোমরা সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে তাদের পেটের পিলে চমকে দিতে পারো।'

এক, দুই করে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট কাটল। তারপরেই একটু একটু করে সদর-দরজাটা ফাঁক হয়ে ভিতরে ক্রমেই বেশি চাঁদের আলো এসে পড়তে লাগল।...সদর-দরজা একেবারে খুলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পোশাক পরা তিনতিনটে মূর্তি।

প্রথম মূর্তিটার পা লক্ষ্য করে আমি রিভলভার ছুঁড়লুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আমার রিভলভার আরো দুইবার গর্জন করলে—কিন্তু এবারে আমি আর কারুকে লক্ষ্য করি নি।

যে পায়ে চোট খেয়ে বসে পড়েছিল, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করলে! অন্য দুজনও দাঁড়াল না।

ছাদের উপর থেকে বড় বড় পাথর-বৃষ্টি হতে লাগল—নিশ্চয় গরক্ ও বাচিকের কীর্তি! কুমার প্রভৃতিও ঘর থেকে বেরিয়ে ঘন ঘন রিভলভার ছুঁড়তে লাগল—আর বাঘার চ্যাঁচামেচির তো কথাই নেই! শান্তিপূর্ণ মৌন রাত্রি যেন কর্কশ শব্দের চোটে হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠল!

তারপরেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল, দুজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকেই আসছে! প্রথমটা তাদের শত্রু ভেবে আমি আবার রিভলভার তুললুম, কিন্তু তারপরেই দেখি তারা হচ্ছে আমাদেরই লোক—কারুক্ আর মাল্কান।

মাল্কান কাছে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'পশ্চিম দিক থেকে অনেক লোক এই দিকেই আসছে!'

—'অনেক লোক! কত?'

—'তা বিশ বাইশ জনের কম হবে না!'

—'তারাও কি আমাদের শত্রু?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে বাবুজী! এত রাতে ভালো লোকেরা দল বেঁধে কখনো পাহাড়-পথে চলে না!'

এমন সময়ে ছাদের উপর থেকে গরক্ চীৎকার করে বললে, 'হুঁশিয়ার বাবুজী, হুঁশিয়ার! পুব-দিক থেকে অনেক আদ্‌মি আসছে!'

কারুক্ সভয়ে বললে, 'কি মুশ্‌কিল! দুষমনরা কি বাড়িখানা ঘিরে ফেলতে চায়?'

কারুক্ বোধহয় ঠিক আন্দাজই করেছে! হয়তো আমাদের বেড়া-জালেই ধরা পড়তে হবে।

১১

মৃত্যুর হুঙ্কার

দু-দিক থেকে শত্রুরা আসছে দলে দলে, হয়তো পালাবার সব পথই বন্ধ করে—আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

জানি, আমাদের পাঁচজনের কাছে আছে পাঁচটা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক বা 'অটোমেটিক রাইফেল'—তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে গুলিবৃষ্টি করতে পারে পঁয়ত্রিশবার! সুতরাং শত্রুরা যে সহজে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি অপরিচিত শত্রুদের স্বদেশে; গুম্‌লীর বাড়িখানা এখানে আমাদের পক্ষে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন বটে, কিন্তু সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে পাঁচজনে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারব? আর আমাদের আশ্রয় দিয়ে গুম্‌লীই বা বিপদে পড়বে কেন? শত্রুরাও নিশ্চয় নিরস্ত্র নয় এবং ওদের দলে যদি শয়তান ছুন্-ছিউ থাকে তাহলে ওদের সঙ্গেও যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, এটাও অনুমান করতে পারি। অতএব আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই বিদেশিনী নারীর অঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা বোধহয় সঙ্গত নয়।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই—প্রতি মুহূর্তেই শত্রুরা আরো কাছে এসে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মাল্কান, আমাদের পালাবার কোন পথই কি খোলা নেই?'

মাল্কান যা বললে বিনয়বাবু তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন।—'একটা পথ আছে বাবুসাহেব!'

—'কোথায়?'

—'বাড়ির খিড়কী দিয়ে বেরুলে উত্তর দিকে একটা সরু পাহাড়ী-পথ পাওয়া যাবে।'

—'উত্তর দিকে?...মাল্কান, আমরা কি দেখবার জন্যে এদেশে এসেছি সে-কথা তুমি বোধহয় জানো না?'

—'জানি বাবুসাহেব! গুম্‌লী-বিবির মুখে আমি সব শুনেছি—কারণ আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমারই ওপরে। আপনারা তো সেকালের সেই ভাঙা মঠ দেখতে যেতে চান?'

—'হ্যাঁ! সে মঠও তো উত্তর দিকে?'

—'হ্যাঁ! বাবুসাহেব।

—'এখান থেকে সে মঠ কত দূরে?'

—'তা প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।'

—'তুমি এখনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?'

—'এখনি?'

—'হ্যাঁ মাল্কান, যদি রাজি হও একশো টাকা বখ্‌সিস পাবে।'

মাল্কান ইতস্তত করছিল, কিন্তু এই দরিদ্র কাফ্রিস্থানে একশো টাকা হচ্ছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য! সে মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'বাবুসাহেব, আমি যেতে রাজি!'

আসছে কাল সকালেই আমাদের এখান থেকে বেরুবার কথা বলে আমরা আগে থাকতেই মোটঘাট বেঁধে রেখেছিলুম।

হুট্ বলতে ছুট দেওয়ার অভ্যাস আমাদের বরাবরই। এ হপ্তায় আমরা কলকাতার সৌখীন নাগরিক, আসছে হপ্তায় আফ্রিকার বিপুল অরণ্যে বনবাসী! এমনি ভবঘুরের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে একটা ভালো শিক্ষা আমরা পেয়েছি। প্রবাসে যেতে হলে বাঙালীরা মস্ত-বড় গৃহস্থালী ঘাড়ে করে বেরোয়—বড় বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা, পোটলা-পুটলী! কিন্তু কত কম জিনিস সঙ্গে নিয়ে পথে-বিপথে অনায়াসেই দৈনিক জীবন যাপন করা যায়, সে-সমস্যা আমরা সমাধান করতে পেরেছি! যা দরকার সে সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, অথচ আমাদের মালের সংখ্যা এত কম যে, কুলী ডাকবার দরকার হয় না—নিজেদের মাল নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা মোটমাট গুছিয়ে নিয়ে অজানার অন্ধকারে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম!

গুম্‌লী এসে ম্লান মুখে বললে, 'বাবুজী, আমি এখন বুঝতে পারছি, বার্মুকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভালো কাজ করি নি। আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই! এ দুঃখ আমার কখনই যাবে না!'

কুমার বললে, 'না গুম্‌লী-বিবি, মিথ্যে অনুতাপ কোরো না। শত্রুরা নিশ্চয়ই আজ আমাদের আক্রমণ করত। তবে ওরা কেবল একবার চেষ্টা করে দেখেছিল যে, তোমার সাহায্যে চুপি চুপি নিরাপদে কাজ সারা যায় কিনা! আর সময় নেই—সেলাম!'

—'সেলাম বাবুজী, সেলাম! একটা সেকেলে ভাঙা মঠে বেড়াতে যাবার জন্যে এত বিপদ মাথায় নিয়েছেন কেন, সে কথা আমি জানি না বটে, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!'

বাড়ির খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলুম, গুম্‌লীর শেষ কথাগুলোর অর্থ কি?

চাঁদ তখনো অস্ত যায় নি বটে, কিন্তু একটা উঁচু পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়েছে—চারিদিকে রাত্রির বুকের উপরে দুলছে ঘন ছায়ার রহস্যময় যবনিকা।

শত্রুরা এখন আর চোরের মতন আসছিল না, পাহাড়ে-পথের উপরে বহু পাদুকার কঠিন ধ্বনি শুনে নিশীথিনী তার মৌনব্রত ভঙ্গ করে যেন সচমকে জেগে উঠল। বুঝলুম কৌশলে কার্যোদ্ধার হল না দেখে শত্রুরা এমন মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে দস্যুর মতন।

ছুন্‌-ছিউর বাহাদুরি দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারলুম না। যে লোক এরই মধ্যে অপরিচিত দূর-বিদেশে এসে এমন বৃহৎ এক দল গড়তে পারে, নিশ্চয়ই সে অসাধারণ ব্যক্তি।

কিন্তু বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না বিমল, আমি ছুন্‌-ছিউর অসাধারণত্ব স্বীকার করি না। পৃথিবীতে সঙ্গীর অভাব হয় ভালো কাজেই, কারণ জগতে সাধুর সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কুকার্যে নিযুক্ত হয়ে তুমি যদি একবার ডাক দাও, চারিদিক থেকে সঙ্গী এসে জুটবে পঙ্গপালের মতন। পৃথিবীর হিতসাধন করবার জন্যে বুদ্ধদেবকে পথে বেরুতে হয়েছিল একাকীই, কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং আর নাদির শা যখন পৃথিবীর উপরে অমঙ্গলের অভিশাপ বর্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাদের লক্ষ লক্ষ পাপ-সঙ্গীর অভাব হয় নি।'

আলোর ছায়া পড়ে না জানি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল চারিদিককে মায়াময় করে তুলেছে যেন অচঞ্চল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ছায়া! কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে

না, অথচ সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই পাহাড় বা জঙ্গল বা ঝোপ-ঝাপের আবছা অস্তিত্ব জাগে চোখে।

সব-আগে চলেছে মাল্কান, তারপর আমরা। এমন এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে, দুজনের পাশাপাশি চলবার উপায় নেই।

কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাঘা, তুমি এখন কারুকে ধমক-টমক দেবার চেষ্টা কোরো না। একেবারে চুপ করে থাকো--বুঝেছ?'

বাঘা নিশ্চয়ই বুঝলে। আমরা নিজেদের মনুষ্যত্বের গর্বে কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে পশু বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, মানুষের সংসারে যে-সব জীব বা পশু পালিত হয়, তাদের অনেকেই আমাদের মুখের ভাষা বা মনের ভাব বুঝতে পারে। বাঘাও কুমারের বক্তব্য বুঝে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করলে না।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে শত্রুদের পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। কিন্তু আরো মিনিট-কয়েক পরে বহু কণ্ঠের একটা উচ্চ কোলাহল জেগে উঠে রাতের নীরবতা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

মাল্কান বললে, 'বাবুসাহেব, ওরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে শিকার হাতছাড়া হয়েছে। যদিও ওরা জানে না আমরা কোনদিকে গিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই—তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন।'

আমরা দৌড়াতে আরম্ভ করলুম। সেই পাহাড়ে-পথ কোথাও বনের অন্ধকার, কোথাও চাঁদের আলো মেখে এবং কোথাও উঁচু দিকে উঠে ও কোথাও নীচু দিকে নেমে এঁকেবেঁকে সমান চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখি দু-পাশেই গভীর খাদ, সেখানে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথে ছুটতে গিয়ে একবার যদি হোঁচট্ খাই তাহলে এ-জীবনে আর শা-লো-কা মঠ, কুবের মূর্তি ও গুপ্ত গুহার গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই দরকার হবে না।...

এতক্ষণে পথটা চওড়া হয়ে এল! এখন চার-পাঁচ জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি চলতে পারে। চাঁদের আলোও আর পাহাড়ের আড়ালে নেই। সুতরাং পথ চলবার কষ্ট আর হঠাৎ বিপদে পড়বার ভয় থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

মাল্কান একবার পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অভিভূত স্বরে বললে, 'দেখুন বাবুসাহেব, দেখুন!'

পিছন ফিরে দেখলুম, অনেক দূরে—প্রায় হাজার ফুট নীচে এক জায়গায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আরক্ত অগ্নির ক্রুদ্ধ শিখায় শূন্যের অনেকখানি লাল হয়ে উঠেছে।

কুমার বললে, 'ওখানে অমন আগুন জ্বলবার কারণ কি?'

মাল্কান বললে, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, আগুনে পুড়ছে গুম্‌লী-বিবির বাড়ি! শয়তানরা আমাদের ধরতে না পেরে রেগে পাগল হয়ে গুম্‌লী-বিবির বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

রামহরি দরদ ভরা গলায় বললে, 'আহা, আমাদের আশ্রয় দিয়েই গুম্‌লী আজ পথে বসল!'

মাল্কান মাথা নেড়ে বললে, 'একখানা বাড়ি পুড়ে গেলেই গুম্‌লী-বিবি পথে বসবে না। তার কেবল টাকাই নেই, যে-সব কাফির এখনো বাপ-পিতামহের ধর্ম ছাড়ে নি, তাদের কাছে গুম্‌লীবিবির মানমর্যাদাও যথেষ্ট, তার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও নারাজ নয়। তারা যখন খবর পাবে তখন বিধর্মী বার্মুককে প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু বাবুসাহেব, আমার কি ভাবনা হচ্ছে জানেন? আজ গুম্‌লী-বিবিকে হাতে পেয়ে দুষমণরা যদি তার ওপরে অত্যাচার করে, তাহলে কে তাদের বাধা দেবে?'

মাল্কানের কথা শুনতে শুনতে নীচে আর এক দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেখানটায় চাঁদের আলো নেই, অন্ধকারের মধ্যে নাচছে কতকগুলো ছোট ছোট চলন্ত আলোক-শিখা।

মাল্কানও দেখতে পেলে। ত্রস্ত স্বরে বললে, 'বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! শত্রুরা আবার আমাদের ধরতে আসছে!'

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পারলে। চাপা গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ করে গজরাতে লাগল।

আমি বললুম, 'এগিয়ে চল—এগিয়ে চল! যতক্ষণ পারি এগিয়ে তো চলি, তারপর দরকার হলে যুদ্ধ করতেও আপত্তি নেই?'

কুমার বললে, 'হুঁ, ছুন্‌-ছিউ এখনো আমাদের ভালো করে চিনতে পারে নি! ভেবেছে দলে ভারি হয়ে আমাদের ওপরে সে টেক্কা মারবে!'

কমল বললে, 'দেখা যাক্ ছুন্‌-ছিউ কত বড় গুলিখোর—আমাদের অটোমেটিক রাইফেলের ক-টা গুলি সে হজম করতে পারে!'

বিনয়বাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'থামো ছোক্‌রা, থামো—অত আর বাক্য-বন্দুক ছুঁড়তে হবে না! কথায় কথায় যুদ্ধ অমনি করলেই হল না? বিনা যুদ্ধে যাতে কার্যসিদ্ধি হয়, আগে সেই চেষ্টাই দেখ।'

রামহরিও বিনয়বাবুর কথায় সায় দিয়ে কমলের দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বললে, 'যা বলেছেন বাবু! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!'

আমি হাসছি দেখে বিনয়বাবু বললেন, 'না বিমল, এ-সব হাসির কথা নয়! আমার বিশ্বাস, শত্রুদের দলে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম লোক নেই, আর ওরাও

হয়তো বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। যুদ্ধে ওদের দশ-পনেরো জন মারা পড়লেও দলে ওরা ভারি থাকবে। কিন্তু গুন্‌তিতে আমরা তো মোটে ছয় জন লোক, এর মধ্যে তিন-চার জন যদি মারা পড়ে বা জখম হয় তখন কি উপায় হবে?'

আমি বললুম, 'ঠিক কথা বিনয়বাবু! নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব না। চল, চল, তাড়াতাড়ি পা চালাও!'

আরো মিনিট পনেরো ধরে নীরবে দ্রুতবেগে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু শত্রুরা এগিয়ে আসছিল আমাদেরও চেয়ে বেশি বেগে। কারণ খানিকক্ষণ পরেই তাদের চীৎকার শুনতে পেলুম।

চলতে চলতে কেটে গেল আরো মিনিট দশ-বারো! পথ সেখানে সিধে নেমে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, মশালের আলোগুলো আমাদের কাছ থেকে বড়-জোর সিকি মাইল তফাতে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, 'বিনয়বাবু, আর এগুবার চেষ্টা করা নিরাপদ নয়। তাহলে প্রস্তুত হবার সময় পাব না।'

বিনয়বাবু হতাশভাবে বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।'

—'হ্যাঁ, করতেই হবে। কুমার, তোমারা প্রত্যেকেই ব্যাগগুলো সামনের দিকে রেখে মাটির উপরে শুয়ে পড়। ওরা যদি বন্দুক ছোঁড়ে, তাহলে ব্যাগগুলো সামনে থাকলে আত্মরক্ষার খানিকটা সুবিধে হবে।'

মাল্কান বললে, 'বাবুসাহেব, বাঁ পাশেই পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। আমরা এর মধ্যে আশ্রয় নিলে কি ভালো হয় না?'

—'এ গুহার ভিতর দিয়ে কি অন্য দিকে বেরুবার পথ আছে?'

—'না বাবুসাহেব।'

—'তাহলে ও গুহা হবে আমাদের পক্ষে ইঁদুর-কলের মতন। ওর মধ্যে বন্দী হতে চাই না।'

ঠিক সেই সময়ে নীচের দিকে চার-পাঁচটা বন্দুকের আওয়াজ হল—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মাটির উপরে সটান শুয়ে পড়ে নিজের নিজের বন্দুক বাগিয়ে ধরলুম।

আচম্বিতে আর একটা ভয়াবহ গম্ভীর ধ্বনি জেগে উঠে সেই পর্বতরাজ্যকে শব্দময় করে তুললে। সে ধ্বনি অপূর্ব, বিস্ময়কর, বজ্রাধিক ভীষণ—শুনলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এদেশে এসে এ-রকম ধ্বনি আগেও শুনেছি—এ হচ্ছে পাহাড় ধ্বসে পড়ার শব্দ—কাফ্রিস্থানের এক সাধারণ বিশেষত্ব!

কিন্তু আমাদের এত কাছে এমন শব্দ-বিভীষিকা আর কোনদিন জাগ্রত হয় নি! দলবদ্ধ বজ্র যেন গড়্ গড়্ করে ভৈরব নাদে ধেয়ে আসছে আমাদের মাথার উপর-দিক থেকেই।

মাল্কান এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতন চীৎকার করে বললে, 'বাবুসাহেব, পাহাড় ধ্বসে পড়ে নেমে আসছে এই পথ দিয়েই।'

বারো

সলিল-সমাধি

সেই কল্পনাতীত, গতিশীল শব্দ-বিভীষিকার তলায় থেকে মনে হল, সৃষ্টির শেষ-মুহূর্ত উপস্থিত এবং দুর্দান্ত প্রলয় উৎকট আনন্দে নেমে আসছে আমাদের মাথার উপরে!

প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি—হঠাৎ মাল্কান প্রাণপণে চীৎকার করে প্রচণ্ড এক লাফ মেরে আমাদের বাঁ পাশের গুহাটার ভিতর গিয়ে পড়ল।

চোখের পলক পড়তে না-পড়তেই আমরাও প্রায় এক সঙ্গেই গুহার ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হলুম—এমন কি বাঘা পর্যন্ত! আত্মরক্ষার চেষ্টা এমনি স্বাভাবিক যে, মানুষ আর পশু চরম বিপদের সময়ে ব্যবহার করে ঠিক একই রকম!

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুহার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল এবং পথের উপর দিয়ে চলে যেতে লাগল যেন কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো মহাশব্দের অদ্ভুত এক ঝটিকা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ—চারিদিকে নুড়ির পর নুড়ি ছড়াতে ছড়াতে। একটা নুড়ি এসে লাগল কমলের কাঁধের উপরে, সে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

মিনিট দুই ধরে গুরুভার পাথরের স্তূপগুলো ঠিক জীবন্ত ও হিংস্র প্রাণীর মতন গড়াতে গড়াতে ও লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নামতে লাগল—সেই দুই মিনিট যেন দুই ঘণ্টার চেয়েও বেশি। গুহার ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন ভূমিকম্পে! গুহার ছাদটাও যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে চায়!

ভয়ানক মৃত্যুর বন্যা যখন গুহামুখ ছেড়ে নীচের দিকে নেমে গেল, তখনো আমরা স্তম্ভিতের মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন বিনয়বাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বিমল, নীচের দিক থেকে বিষম এক হাহাকার শুনতে পেয়েছ?'

আমি বললুম, 'পেয়েছি। যে মৃত্যুকে আমরা ফাঁকি দিলুম, শত্রুরা বোধহয় তাকে এড়াতে পারে নি! অনেক লোকের কান্না শুনেছি, বোধহয় তারা সদলবলে মারা পড়েছে।'

কমল আর্তস্বরে বললে, 'বিমলদা, নুড়ি লেগে বোধহয় আমার কাঁধের হাড় ভেঙে বা সরে গেছে। আমি ডানহাত নাড়তে পারছি না।'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি কমলের কাছে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন।

কুমার ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, 'সর্বনাশ। আমার বন্দুকটা যে বাইরে ফেলে এসেছি!'

আমারও বন্দুক বাইরে পড়ে আছে—প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বন্দুকের কথা ভাববার সময় পাই নি।

বিনয়বাবু আর কমল বন্দুকহীন—বন্দুক নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পেরেছে কেবল রামহরি।

ছুটে গুহার বাইরে গেলুম। সেখানেও বন্দুকগুলোর কোন চিহ্ন নেই—ছুটন্ত পাথরের বিষম ধাক্কায় ঝাঁটার মুখে তুচ্ছ ধূলোর মতন বন্দুকগুলো যে কোথায় গিয়ে পড়েছে তা কে জানে! পাথরের চাপে হয়তো সেগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে!

কুমার বললে, 'শত্রুদের অবস্থাও যদি বন্দুকগুলোর মতন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। রামহরির একটা বন্দুক আর আমাদের চারটে রিভলভারই যথেষ্ট।'

পাহাড়ের গা দিয়ে যে ঢালু পথ বেয়ে বেয়ে আমরা উপরে উঠেছি তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। যতদূর নজর চলে কেবল দেখা যায়, পথের উপরে ছড়ানো রয়েছে নুড়ি আর নুড়ির রাশি,—বড় বড় পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নেমে হারিয়ে গিয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে। শত্রুরাও অদৃশ্য। হয়তো তাদের দেহগুলো এখন পাহাড়ের পদতলে পড়ে আছে নির্জীব ও রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মতন।

আশ্বস্ত হলুম বটে, কিন্তু দুঃখিতও হলুম যথেষ্ট। এতগুলো মানুষের এমন শোচনীয় পরিণাম!

তখন রঙিন ঊষার রহস্যময় আলো সেই শৈলরাজ্যকে করে তুলেছে নতুন এক স্বপ্নলোকের মতন। ভোরের পাখিদের সভায় জাগল ঘুম-ভাঙানি গান এবং পলাতক অন্ধকারের পরিত্যক্ত আসন জুড়ে বিরাজ করছে স্নিগ্ধসবুজ লতা পাতা বনস্পতি।

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, আমাদের মোটঘাটগুলোও রসাতলে গিয়েছে!'

আমি বললুম, 'তাহলে উপায়? শত্রু নিপাতের পর বন্দুকের দরকার নেই বটে কিন্তু রসদ না থাকলে পেট চলবে কেমন করে?'

মাল্কান বললে, 'ভয় নেই বাবুসাহেব, আমাদের আর বেশিদূর যেতে হবে না। এই পাহাড়ের নীচেই আছে একটা নদী। তারপর নদী পার হয়ে ঘণ্টাখানেক পথ চললেই আমরা সেই মঠে গিয়ে হাজির হব।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'নদীটা কত বড়?'

—'চওড়া খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু জল খুব গভীর। তবে আপনাদের ভাবনা নেই, নদীর ওপরে একটা কাঠের সাঁকো আছে।'

—'বেশ, তাহলে আবার যাত্রা করা যাক', এই বলে আমি অগ্রসর হলুম। সঙ্গীরাও আমার পিছনে পিছনে চলল। পিছন থেকে মাঝে মাঝে কমলের 'আঃ! উঃ!' বলে আর্তনাদ কানে আসতে লাগল—বোধহয় তার আঘাতটা হয়েছে গুরুতর।

মিনিট পঁচিশ পরেই আমরা পাহাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই প্রভাত সূর্য-করে জ্বলন্ত সুদীর্ঘ এক বাঁকা তরোয়ালের মতন একটি বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে কলনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে। চওড়ায় সে ষাট-সত্তর ফুটের বেশি হবে না, কিন্তু তার স্রোতের টান এমন বিষম যে দেখলেই মনে হয়, জল যেন টগবগ করে ফুটছে!

কুমার শুধোলে, 'মাল্কান, তুমি যে সাঁকোর কথা বললে সেটা কোথায়?'

মাল্কান মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললে, 'সাঁকোটাতো এইখানেই ছিল।'

—'এইখানেই ছিল তো গেল কোথায়? সাঁকোর তো আর পা নেই যে 'মর্নিং ওয়াক্' করতে বেরুবে?'

মাল্কান বললে, 'আমি আজ এক বছর এদিকে আসি নি। গেল বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকোটা নিশ্চয় ভেসে গিয়েছে। এদেশে এমন ব্যাপার হামেশাই হয়।'

আমি হতাশ ভাবে বললুম 'তাহলে আমরা কি করব? এ নদীটা তো দেখছি দুই পাহাড়ের মাঝখানকার ঢালু জমি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, সাঁতার কেটে এর প্রখর স্রোত এড়িয়ে ওপারে যাওয়া সোজা নয়।'

কমল বললে, 'সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, আমার পক্ষে সাঁতার কাটা অসম্ভব। আমি ডান হাত নাড়তেই পারব না।'

কুমার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে ইংরেজী ভাষায় কর্কশ স্বরে কে বললে, 'এখনি সবাই মাথার ওপরে হাত তোলো।'

চম্‌কে ফিরে দেখি ঠিক আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছুন্-ছিউ, আরো দুজন চীনেম্যান এবং চারজন কাফির! ছুন্-ছিউ ও তার চীনে সঙ্গীদের হাতে বন্দুক!

ছুন্-ছিউ আবার শাসিয়ে বললে, 'এখনো হাত তুললে না?'

বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, কাঠের মূর্তির মতন।

ছুন্-ছিউ ইঙ্গিত করতেই কাফিররা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে আমাদের মাটির উপরে শুইয়ে দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেললে।

আমার সামনে এগিয়ে এসে ছুন্-ছিউ প্রথমে করলে বিকট অট্টহাস্য! তারপর বললে, 'বাবু, এইবারে তোমাদের আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি! কিন্তু আমি বেশি কথা বলতে চাই না। প্রাণ বাঁচাতে চাও তো লকেটখানা ফিরিয়ে দাও।'

আমি বললুম, 'তুমি যা চাইছ আমার কাছে তা নেই।'

আবার হা হা করে হেসে উঠে ছুন্-ছিউ বললে, 'নেই? তাহলে কি তোমরা এতদূরে এসেছ ছেলেখেলা করতে? ওহে, দেখতো এদের জামা কাপড়গুলো খুঁজে!'

তারা আমাদের প্রত্যেকের জামা কাপড় তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে—এমন কি আমাদের মুখ বিবর পর্যন্ত দেখতে ছাড়লে না।

লকেট আছে কলকাতায়, কিন্তু তার লিখন আছে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে। ছুন্-ছিউকে সে কথা বলা উচিত মনে করলুম না।

ছুন্-ছিউ রাগে যেন পাগলের মতন হয়ে উঠল। চীৎকার করে বললে, 'ওরে বাঙালী কুত্তার দল! তোদের জন্যে আমার দুর্গতির সীমা নেই! চীন থেকে এলুম বাংলাদেশে, সেখানে বিপদের পর বিপদ এড়িয়ে এসেছি এই কাফ্রিস্থানে। এখানে এসে আমাদের আটাশজন লোকের প্রাণ গিয়েছে, তবু আমি তোদের সঙ্গ ছাড়ি নি। এত করেও শেষটা কি আমাকে ফাঁকে পড়তে হবে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক আন্দাজ করেছ! এখন দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও।'

ছুন্-ছিউ চোখ পাকিয়ে বললে, 'তাই নাকি? আমাকে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে তোমাদেরও এই পৃথিবীতে রেখে যাব না!'

—'বেশ, তাহলে আমাদের খুন করো। মরতে হবে সকলকেই—মরতে আমরা ভয় পাই না।'

—'আচ্ছা, দেখা যাক? ওরে, তোরা এই লোকগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে ফ্যাল। তারপর ওদের ঐ নদীতে ভাসিয়ে দে!'

প্রতিবাদ করলুম না—কারণ এই উন্মত্ত শয়তানদের কাছে প্রতিবাদ বা দয়া প্রার্থনা করে কোনই লাভ নেই।

তারা আমার ও কুমারের উপরে রাখলে বিনয়বাবু ও কমলের দেহ এবং

তার উপরে শোয়ালে মাল্কান ও রামহরিকে। তারপর লোকে যেমন করে চ্যালাকাঠের বোঝা বাঁধে, সেইভাবে দড়ি দিয়ে আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে ফেললে। আমাদের হাত-পা আগেই বাঁধা ছিল—এটা হল বাঁধনের উপর বাঁধন!

ভেবেছিলুম মাল্কান তো আমাদের মতন বিপদের পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করে নি, প্রাণের ভয়ে কাবু হয়ে সে হয়তো কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি তার সাড়ে ছয় ফুট উঁচু দেহটির সবটাই হচ্ছে দুর্জয় সাহসে পরিপূর্ণ। তার মুখ ভাবহীন, কণ্ঠে টুঁ শব্দ নেই।

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেল।

ছুন্-ছিউ বললে, 'এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—বল, লকেট কোথায় রেখেছ?'

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, 'আমাকে বার বার জ্বালাতন কোরো না ছুন্-ছিউ! লকেট আমাদের কাছে নেই।'

ছুন্-ছিউ বিস্ময়মাখা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এই বাঙালীটা আমাকে আশ্চর্য করলে যে! এ মরবে, তুব মিছে কথা বলতে ছাড়বে না!'

আমি বললুম, 'আমি সত্য কথাই বলছি।'

—'সত্য কথা? তুমি কি বলতে চাও, লকেট তোমার কাছে ছিল না?'

—'নিশ্চয়ই ছিল!'

—'তবে?'

—'লকেট এখন আমার কাছে নেই।'

—'মানে?'

—'মানে আমি জানি না।'

—'এই তোমার শেষ কথা?'

—'হুঁ।'

—'বেশ। তাহলে আমরাও আমাদের শেষ কাজ করি। ওদের জলে ফেলে দাও।'

তারা সকলে মিলে আমাদের শূন্যে তুলে ধরলে।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, 'হে বাবা বিশ্বনাথ, চরণে ঠাঁই দিও!'

পর-মুহূর্তে আমরা ঝপাং করে পড়লুম নদীর গর্ভে এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলুম পাতালের শীতল অন্ধকারে।

১৩

আমাদের বাঘা

পাতলের দিকে তলিয়ে গেলুম এবং তারপর আবার ভেসে উঠলুম।—কেবল আমি নই, আমার সঙ্গে যারা বাঁধা ছিল তারাও ভেসে উঠল আমার সঙ্গেই। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হবার উপায় নেই।

আচ্ছন্নের মতন শুনতে পেলুম—কল্-কল্ কল্-কল্ করে গভীর জল গর্জন! কী তীব্র স্রোত—গতি তার প্রায় বন্যার মতন! জল টল্‌মল্ করে হেল্‌ছে দুল্‌ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ফুল ফুটিয়ে উপরে উঠছে, নীচে নামছে, ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে ফিরছে এবং শত সহস্র বল্লমের ফলকের মতন চক্‌চকিয়ে ছুটে যাচ্ছে হু-হু করে! সেই নিম্নমুখী গিরিনদীর গতি অত্যন্ত দ্রুত বলে আমরা তৎক্ষণাৎ আবার ডুবে গেলুম না—টানের মুখে ভেসে চললুম খানিক দূর। এজন্যে বিস্মিত হলাম না। অতি-বেগবতী নদী যে পাথরকে খানিক দূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ-কথা সকলেই জানে।

তারপর আবার আমরা ডুবে গেলুম এবং জলের তলায় নিঃশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে এসেছে, নদী আবার আমাদের উপরে ভাসিয়ে তুলল।

এবার ভেসে উঠেই দেখি, ঠিক আমাদের পাশেই সাঁতার কাটছে বাঘা! এতক্ষণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তুচ্ছ কুকুর ভেবে শত্রুরা হয় তাকে কিছু বলে নি, নয় সে নিরাপদ ব্যবধানে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এখন প্রভুভক্ত বাঘা এসেছে আমাদের মৃত্যু-যাত্রার সাক্ষী হয়ে এবং আমাদের সঙ্গেই মরতে।

যে-কয় মুহূর্ত ভেসে থাকি, এর মধ্যেই সুন্দরী পৃথিবীকে ভালো করে শেষবার দেখে নিই! সূর্যের উপরে ঐ সেই নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তীরে তীরে ঐ সেই পাখি-ডাকা সবুজ বনভূমি, দূরে কাছে ঐ সেই গিরিরাজ হিমালয়ের স্তম্ভিত শৈল-তরঙ্গ! ভালো করে আরো কিছু দেখতে-না-দেখতেই আবার ডুবে গেলুম—কিন্তু আবার ভেসে উঠলুম পর মুহূর্তেই। এবার মনে হল, কে যেন আমাদের টেনে তুললে।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, বাঘা প্রাণপণে আমাদের বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরেছে!

বাঘা আর দড়ি ছাড়লে না—আমরাও আর ডুবলুম না।

আমাদের পাঁচজনকে টেনে তোলবার শক্তি নিশ্চয়ই বাঘার নেই। কিন্তু প্রথমত জলে গুরুভারও হয় লঘুভার এবং দ্বিতীয়ত এই খরস্রোতা নদীর তীব্র টান আমাদের ভাসিয়ে রাখবার পক্ষে সাহায্য করলে যথেষ্টই।

বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরে বাঘা নদীর তীরের দিকে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্রোতের টানে তার চেষ্টা সফল হল না। তবে সে কোনক্রমে জলের উপরে আমাদের ভাসিয়ে রাখলে। ধন্যবাদ, বাঘাকে ধন্যবাদ!

এতক্ষণ পরে কুমার কথা কইলে। বললে, 'বিমল বাঘা আজ যা করলে, অন্য কোন কুকুর তা করতে পারত না। কিন্তু এ-ভারে বাঘা আর কতক্ষণ আমাদের ভাসিয়ে রাখবে? বাঘা জলচর জীব নয় আর একটু পরেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন যে মরণ ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই?"

—'আমিও সেই কথাই ভাবছি কুমার!'

বিনয়বাবু বললেন, 'শত্রুরা কি এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?'

আমিও বললুম, 'তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি।'

কমল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'দেখ বিমলদা! বাঘার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। সে একটু একটু করে আমাদের তীরের খানিকটা কাছে এনে ফেলেছে!'

কমলের উৎসাহ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি এল।

আমাদের এই অবস্থায় তীরের খানিকটা কাছে আসা আর তীরে গিয়ে ওঠার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!

এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। নদীর গতি হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে উঠল—বোধহয় এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি নদীর তলাকার জমি সেখানে খুব বেশি ঢালু। যেদিকে চলেছি সেই দিকেই ছিল আমার মাথা, তাই ওদিককার কিছুই এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচম্বিতে ঘূর্ণায়মান স্রোতের টানে আমাদের একসঙ্গে বাঁধা দেহগুলো উল্টে ঘুরে গেল—প্রচণ্ড বেগে খানিকদূর ভেসে গিয়েই দেখি, তীর একেবারে আমাদের খুব কাছে সরে এসেছে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি—আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি!'

—সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেলুম এক বিষম আঘাত! অন্য সময় হলে সে আঘাতে রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়তুম, কিন্তু এখন আমরা অভিভূত হবারও অবকাশ পেলুম না—কারণ আমাদের দেহের উপরে লাগল কঠিন পাথুরেমাটির স্পর্শ! এ স্পর্শ যত কঠিনই হোক—এটা যে স্নেহময়ী পৃথিবীর মাটির ছোঁয়া, এই আশ্চর্য অনুভূতিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে উন্মত্ত আনন্দে!

আমরা ঠেকে গিয়েছি নদীর বাঁকে! কেবলই তাই নয়, বাঁকের মুখে ছিল কি একটা জলজ লতা-পাতার ঘন জাল, দেহগুলোকে সে যেন জীবন্তেরই মতন জড়িয়ে ধরলে! স্রোত আর আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

রামহরি বলে উঠল, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

কমল বললে, 'হায় রামহরি, তোমার কৃষ্ণ আমাদের রাখলেন বটে, কিন্তু বাঁধনগুলো খুলে দেবার ব্যবস্থা করলে না কেন?'

বাঘা তখন গলা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ রবে গর্জন শুরু করলে!

আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঘা এতটা চটে উঠল কেন?

পর-মুহূর্তেই এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম।

হঠাৎ বাঘা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁধন-দড়িকে! এই দড়ির উপরেই তার রাগ হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে এই দড়ির বাঁধনই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল!

কুমার তাকে উৎসাহ দিয়ে বারংবার বলতে লাগল, 'আমার সোনার বাঘা! আমার বন্ধু বাঘা! বাহাদুর বাঘা! কেটে দাও তো দড়িগুলো—চট্‌পট্‌ কেটে দাও তো ভাই!'

উৎসাহ পেয়ে বাঘার আনন্দ আর ধরে না, জয়পতাকার মতন তার লাঙ্গুল জলের উপর তুলে সে নাড়তে লাগল ঘন ঘন!

* * * *

স্বাধীন, আমরা স্বাধীন! বাঘার দৌলতে আমরা জলে ডুবে মরি নি, বাঘার অনুগ্রহে ঘুচল আমাদের বন্ধন দশা!

এতক্ষণ মাল্কান একটিমাত্র কথা কয় নি, সে হঠাৎ এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে বাঘাকে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বললে, 'বন্ধু, আমার জীবন-রক্ষক বন্ধু!'

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, 'দেখছ কমলবাবু, কৃষ্ণ বাঁধন খুলে দিলেন কিনা? বাঘা সেই কৃষ্ণেরই জীব!'

কুমার বললে, 'ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে! দেখ বিমল, ছুন্‌-ছিউ চেয়েছিল আমাদের পাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা এসে উঠেছি নদীর এপারে! আর সাঁকোর দরকার হল না!'

আমি বললুম, 'মাল্কান, আমরা "শা-লো-কা" মঠের কাছে এসে পড়েছি নয়?'

—'হ্যাঁ বাবুসাহেব, খুব কাছে।'

—'তাহলে আর দেরি নয়! ছুন্‌-ছিউ নদীর ওপারে সদল-বলে স্বদর্পে বিচরণ করুক, ইতিমধ্যে আমরা করব কার্যোদ্ধার!'

১৪

গুপ্ত গুহা

ইতিহাস-বিখ্যাত কপিশ-পাহাড়ের উপত্যকা। এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের পথের শেষে।

ধ্বংস স্তূপের পর ধ্বংস স্তূপ! প্রাচীন মঠের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে—এমন একখানা ভাঙাচোরা ঘরও নাই, যার ভিতরে মাথা গোঁজা যায়। সম্রাট কণিষ্ক এখানে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আজ তার সৌন্দর্যই উপভোগ করবার উপায় নেই। অতীতের ঐশ্বর্য অতীতের আড়ালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

মঠের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু অষ্টদন্ত তিনপদ কুবের-মূর্তির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমি তো আগেই এ-কথা বলেছিলুম! দ্বিতীয় শতাব্দীর কণিষ্ক আর বিংশ শতাব্দীর আমরা! এর মধ্যে কত যুগ যুগান্তর চলে গিয়েছে—কত দস্যু, কত লোভী এখানে এসেছে, গুপ্তধনের এক কণাও আর পাওয়া যাবে না!'

আমার মন মুষড়ে পড়ল। তাহলে এতদিন ধরে আমরা দেখছিলুম আলেয়ার স্বপ্ন? আমাদের এত আগ্রহ, এত চেষ্টাশ্রম, এত বিপদভোগ, সবই হল ব্যর্থ?

মাল্কান বললে, 'বাবুসাহেব, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে আর একটা ছোট ধ্বংস স্তূপ আছে। তার ভিতরে একটা ভাঙা মূর্তিও দেখেছিলুম বলে মনে হচ্ছে।'

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়েই বললুম, 'যখন এতদূর এসেছি তখন সেখানেও না-হয় যাচ্ছি, কিন্তু আর কোন আশা আছে বলে মনে হয় না।'

কুমার ও কমল প্রভৃতি একেবারে গুম মেরে গেল। মাল্কানের পিছনে পিছনে আবার আমরা এগিয়ে চললুম বটে, কিন্তু সে যেন নিতান্ত জীবন্মৃতের মতনই।.....

মিনিট পনেরো পরে আমরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে একটা জঙ্গল-ভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম! সেখানেও প্রায় আশী ফুট জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেল।

পরীক্ষা করে বুঝলুম, একসময়ে সেখানে একটা মাঝারি আকারের মন্দির ছিল—এখন কোথাও পড়ে আছে রাশীকৃত পাথর, কোথাও বা খোদাই করা থামের টুকরো এবং কোথাও বা ভাঙাচোরা মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। ধুক্‌ধুকির উপরকার লেখাটা বার বার স্মরণ করতে লাগলুম :—"শা-লো-কা : পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্তি : গুপ্তগুহা।"

আমরা আগে যে ধ্বংসস্তূপে গিয়েছিলুম হয়তো সেইখানেই ছিল প্রাচীন শা-লো-কা মঠ। তারপর আমরা পশ্চিমদিকেই এসেছি বটে এবং এখানেও পেয়েছি একটা মঠ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু কোথায় কুবের-মূর্তি?

কুমার বললে, 'হয়তো আগে এখানে কুবেরের মূর্তি ছিল। এখন সেটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু গুপ্ত গুহাটাই বা কোথায়?'

এমন সময় বিনয়বাবু সাগ্রহে আমাদের নাম ধরে ডাক দিলেন—তিনি তখন এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে কি পরীক্ষা করছিলেন।

বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে কোমর পর্যন্ত ভাঙা একটা মূর্তি রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় অটুট অবস্থায় তার উচ্চতা ছিল অন্তত বারো ফুট। মূর্তির একখানা পা ভাঙা, তার তলায় রয়েছে একটা হাতখানেক উঁচু লম্বাটে বেদী।

বিনয়বাবু বেদীর উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না তার পরই লক্ষ্য করলুম, বেদীর উপরে মূর্তির অটুট পায়ের পাশেই রয়েছে পরে পরে আরো দুখানা পায়ের চিহ্ন! পা দুখানা অদৃশ্য হয়েছে বটে কিন্তু পায়ের ছাপ এখনো বর্তমান।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, এই তোমাদের কুবের মূর্তি! কুশ্রী কুবেরের অষ্টদন্ত মুখ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি মহাকালের প্রহারে নষ্ট হয়ে গেছে, প্রথম দৃষ্টিতে একখানার বেশি পদও নজরে পড়ে না বটে, কিন্তু পাথরের উপরে অন্য দুখানা পদের কিছু কিছু চিহ্ন আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। হ্যাঁ, এই তোমাদের কুবের-মূর্তি। বোঝা যাচ্ছে, ধুক্‌ধুকিতে মিছে কথা লেখা নেই। কিন্তু গুপ্তগুহা কোথায়?'

কমল বললে, 'সেটা যদি সহজে আবিষ্কার করা যেত, তাহলে তার নাম গুপ্তগুহা হত না।'

কমল ঠিক বলেছে কিন্তু কুবের-মূর্তি যখন পেয়েছি, তখন ধুক্‌ধুকির লিখনকে আর অবিশ্বাস করা চলে না। নবজাগ্রত উৎসাহে আমরা সকলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে গুহার সন্ধান করতে লাগলুম। জঙ্গল ভেঙে আনাচে কানাচে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু গুহার কোন অস্তিত্বই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

সকলে আবার নিরাশ মনে ভাঙা কুবের-মূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালুম। ঘাটে এসে নৌকা ডুবল বোধহয়।

কুমার বললে, 'উপত্যকার শেষে ঐ যে পাহাড় রয়েছে, ওখানে গিয়ে একবার গুহার খোঁজ করে দেখব নাকি?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমার বিশ্বাস, গুহা যদি থাকে, এই কুবের-মূর্তির কাছেই আছে। মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরের বাইরে থাকবে কেন?'

যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু বেদীর উপরে এই তো রয়েছে কুবের মূর্তি, তার আশপাশের অনেকখানি পর্যন্ত সমস্তটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো—কারণ এটা হচ্ছে বিলুপ্ত মন্দিরের মেঝে। এখানে গুহা থাকবে কোথায়? খানিকক্ষণ ভেবেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

কুমার হঠাৎ কৌতুকচ্ছলে কুবেরের পা টেনে ধরে বললে, 'হে কুবের, হে দেবতা। আমরা হচ্ছি টাকার—অর্থাৎ তোমার পরম ভক্ত! কোথায় তোমার ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছ প্রভু, দেখিয়ে দাও—দেখিয়ে দাও!'

হঠাৎ আমার মনে হল, কুবের-মূর্তি যেন নড়ে উঠে ডান দিকে একটু সরে গেল।

তাড়াতাড়ি মূর্তির পায়ের তলায় হেঁট হয়ে পড়ে দেখি, ধূলিধূসরিত বেদীর উপরে আধ ইঞ্চি চওড়া একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখা! মূর্তিটা যে একটু সরে গেছে, আর তার নীচেকার পরিষ্কার অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, 'কুমার, কমল, রামহরি! এস, আমরা সবাই মিলে মূর্তিটাকে বাঁ দিক থেকে ঠেলা দিই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মূর্তির ভেতরে কোন রহস্য আছে?'

সকলে মিলে যেমন ঠেলা দেওয়া, ভাঙা মূর্তিটা হড়্-হড়্ করে প্রায় হাত-দুয়েক সরে গিয়ে আবার অটল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অবাক বিস্ময়ে দেখলুম, মূর্তির তলদেশেই আত্মপ্রকাশ করেছে একটি চতুষ্কোণ গর্ত এবং তার ভিতরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সংকীর্ণ সিঁড়ি। এই তাহলে গুপ্তগুহা?

কুমার আনন্দে মেতে বলে উঠল, 'আজ দেখছি আমাদের উপরে সব দেবতারই অসীম দয়া! রামহরির কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ বাঁচালেন, আর পাথরের কুবের আমাদের সামনে খুলে দিলেন তাঁর রত্ন-ভাণ্ডারের গুপ্তদ্বার! এখন দেখা যাক্, ভাণ্ডার পূর্ণ কিনা!'—বলেই সে গর্তের ভিতর পা বাড়িয়ে দিলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'ওগো কুমারবাবু, কোথা যাও? এখানে যকের ভয় আছে, সে-কথা কি ভুলে গেছ?'

আমি বললুম, 'থামো রামহরি, বাজে বোকো না। প্রায় দু-হাজার বছর ধ'রে

বেঁচে আছে, এমন ভূতের গল্প কোনদিন শুনি নি। বেঁচে থাকলেও সে এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, আমাদের দুটো ঘুসিও সইতে পারবে না। চল সবাই গুহার মধ্যে।'

১৫

গুপ্তধন

সিঁড়ির পরেই মাটির তলায় মস্ত একটি ঘর—তার চারিদিকে পাথরের দেওয়াল! সে ঘরে অন্তত দুশো লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে।

আমাদের সমস্ত মোটঘাট চুলোর দোরে পাঠিয়েছে ধ্বসে যাওয়া পাহাড় এবং আমাদের সঙ্গে যা-কিছু ছিল সমস্ত কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে ছুন্-ছিউর দলবল। কেবল কমলের কাছে ছিল ছোট্ট একটি পকেট টর্চ, নদীর জলও তার শক্তি ক্ষয় করতে পারে নি।

সেইটেই চারিদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিরেট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেখলুম, সেই প্রশস্ত গুহাগৃহের একদিকে রয়েছে তিনটে বড় বড় পাথরের সিন্ধুক—পুরাকালের এইরকম সিন্ধুক আমি কোন কোনও যাদুঘরে দেখেছি। প্রত্যেক সিন্ধুক প্রায় দুই হাত করে উঁচু ও চওড়া এবং পাঁচ হাত করে লম্বা। তার এক-একটার মধ্যে অনায়াসেই একজন লম্বা-চওড়া মানুষ শুয়ে থাকতে পারে।

রামহরি প্রথমটা ভুতের ভয়ে জড়োসড়ো হয়েছিল। এখন সিন্ধুক দেখে সমস্ত ভয় ভুলে তাড়াতাড়ি একটার ডালা তুলে ফেললে! অন্য দুটোর ডালা তুললে কুমার ও কমল।

তিনটে সিন্ধুকের ভিতরেই পাওয়া গেল কেবল ছোট-বড়-মাঝারি থালা ও অন্যান্য পাত্র।

বিনয়বাবু দু-চারখানা থালা পরীক্ষা করে বললে, 'অনেক কালের জিনিস, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে এগুলো সোনার বাসন। নইলে এত সাবধানে গুপ্ত-গুহায় লুকিয়ে রাখা হত না।'

কমল চমৎকৃত স্বরে বললে, 'এত সোনার বাসন কোশন! না-জানি এর দাম কত হবে?'

বিমলবাবু বললেন, 'অনেক। কেবল এইগুলো বেচলেই আমরা লক্ষপতি হতে পারি। কিন্তু কেবল সোনার বাসন কেন কমল, পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখানে আরো অনেক ধনরত্ন আছে।'

বিনয়বাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি 'টর্চে'র আলোটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফেলতেই দেখি, ঘরের আর এক কোণে সাজানো রয়েছে সারে সারে বড় বড় ঘড়া।

সবাই ছুটে সেই দিকে গেলুম। গুণে দেখলুম, প্রত্যেক সারে রয়েছে চারটে করে ঘড়া—এমনি পাঁচ সারে মোট কুড়িটা ঘড়া।

ব্যগ্রহস্তে সবাই ঘড়াগুলো তুলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রথম তিন সারে প্রত্যেক ঘড়াই খালি। চতুর্থ সারের দুটো ঘড়া খালি ও দুটো ঘড়া তুলেই বোঝা গেল, তাদের মধ্যে কিছু আছে—সে দুটো রীতিমত ভারি।

আমি ও কুমার দুটো ঘড়াই তুলে মেঝের উপরে উপুড় করে দিলুম—ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্ রবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি গোল গোল চাক্তি।

একটা চাক্তি তুলে নিয়েই দেখি, মোহর! অনেক কালের পুরানো মোহর—খুব সম্ভব দু-হাজার বছর আগেকার।

পঞ্চম সারের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘড়াও মোহরে মোহরে পরিপূর্ণ!

তৃতীয় ঘড়া থেকে বেরুলো যেন হুড়্-হুড়্ করে মুক্তা আর মুক্তার স্রোত! কোন মুক্তাই ছোট নয়, অনেক মুক্তাই পায়রার ডিমের মতন বড়। মেঝের উপরে মুক্তার স্তূপ। এত মুক্তা জীবনে এক জায়গায় দেখি নি।

চতুর্থ বা শেষ কলস মেঝের উপরে সৃষ্টি করলে রত্নের স্তূপ! তার মধ্যে না আছে কি—হীরা, চূণী, পান্না, পোখ্রাজ, পদ্মরাগ মণি—কত আর নাম করব? 'টর্চে'র আলোতে সেই সব অপূর্ব রত্ন জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলতে লাগল!

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আত্মহারার মতন দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ বাঘা চাপা গলায় গর্জন করে উঠল!

পরমুহূর্তে শুনলুম কাদের কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ! কারা যেন খট্খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে!

কে ওরা? আবার ছুন্-ছিউর দল নাকি?

কিন্তু ভাববারও সময় নেই—আমরা নিরস্ত্র!

বললুম, 'শীগ্গির ঘরের দিকে চল! ঐ বড় বড় সিন্ধুকের পিছনে।'

সিন্ধুকের আড়ালে হুমড়ী খেয়ে আমরা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রইলুম! সমস্ত ঘর আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তা মশাল কিংবা লণ্ঠনের আলো, উঁকি মেরে দেখবার ভরসা হল না।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে ঢুকল সাত-আট জন লোক!

একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দী ভাষায় বললে, 'বার্মুক্, তুমি ঠিক বলেছ! গুহার দরজা যখন খোলা, তখন সেই হতভাগা বাঙালীরা বেঁচে আছে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! আশ্চর্য!'

—'ছুন্-ছিউ সাহেব, আমার চোখ ভুল দেখে না! আমি দূর থেকে চকিতের মতন দেখেছি, একটা পাহাড়ের আড়ালে তারা মিলিয়ে গেল!'

—'কিন্তু বদমাইসগুলো গেল কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে কোথায় তারা গা-ঢাকা দিলে? গুহার ভেতরটা ভালো করে খুঁজে দেখ!'

দুই-তিনজনের পায়ের শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল! বুঝলুম, আর রক্ষে নেই! স্থির করলুম, শুধু হাতেই লড়তে লড়তে মরব—আত্মসমর্পণ করব না কিছুতেই!

হঠাৎ বার্মুকই বোধহয় বললে, 'ছুন্-ছিউ সাহেব! দেখ, দেখ, ওদিকে জ্বলে জ্বলে উঠছে কী ওগুলো?'

যে দিকে কলসগুলো ছিল সকলে সেই দিকেই দ্রুতপদে ছুটে গেল—তারপরই বিস্ময়পূর্ণ চীৎকার!

বার্মুক্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আল্লা, আল্লা! এ-যে হীরা, মুক্তা, পান্না!'

তারপরেই গুহায় নামবার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল আবার অনেক লোকের পায়ের শব্দ! নিশ্চয় গুহার ভিতরে আনন্দ-কলরব শুনে শত্রুদের দলের আরো অনেক লোক নীচে নেমে আসছে! আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই!

নতুন পায়ের শব্দগুলো এল ঘরের ভিতরে! পর-মুহূর্তে ছুন্-ছিউয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জাগল ভীষণ গর্জন এবং তারপরেই বন্দুকের পর বন্দুকের কানফাটা আওয়াজ সেই বদ্ধ গুহাগৃহের ভিতরটা হয়ে উঠল ভয়াবহ! সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের অভিশাপ ও আর্তনাদ, ধুপ্-ধাপ্ করে দেহপতনের শব্দ! মনে হল কারা যেন কাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধও করছে!

এ আবার কী কাণ্ড? কারা লড়ছে কাদের সঙ্গে? গুপ্তধনের লোভে শত্রুরা কি নিজেদের মধ্যেই মারামারি হানাহানি লাগিয়ে দিয়েছে? দেখবার জন্যে মনের ভিতরে জাগল বিষম কৌতূহল, কিন্তু মুখ বাড়াতে গিয়ে যদি শেষটা ধরা পড়ে যাই, সেই ভয়ে দমন করলুম সমস্ত কৌতূহল!

মিনিট-পাঁচেক ধরে চলল এমনি হুলুস্থুল কাণ্ড! তারপর বন্দুকের চীৎকার থামল—কেবল একাধিক কণ্ঠের আর্তনাদে সারা ঘরটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কাফির-ভাষায় কে একজন বললে, 'কৈ, বাবুরা তো এখানে নেই! মাল্কানও নেই!'

সিন্ধুকের পিছন থেকে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে মাল্কান আনন্দবিহ্বল স্বরে বললে, 'বাচিক্! কারুক্! গরক্! তোমরা?'

—'আরে, আরে, এই যে মাল্কান! বাবুরা কোথায়?'

মাল্কান আমাদের ডেকে বললে, 'বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! আর ভয় নেই! আমাদের বন্ধুরা এসেছে!'

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাচিকদের মশালের আলোকে এমন এক বিষম রক্তরাঙা দৃশ্য দেখলুম যে, আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না!

সিঁড়ির দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাচিক্, কারুক্ ও গরক্ এবং তাদের আরো বিশ-বাইশজন সঙ্গী—অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। ঘরের মেঝের উপরে এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের দেহ—তাদের কেউ একেবারে নিস্পন্দ এবং কেউ বা করছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্! ভূপতিত দেহের সংখ্যা এগারো—তার মধ্যে ছুন্-ছিউর দলের লোক ছিল সাতজন! সমস্ত দেহের চারিপাশ দিয়ে বইছে যেন রক্তের নদী—সে রক্ত-বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠে কমল দুই হাতে চোখ ঢেকে অবশ হয়ে আবার বসে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাচিক্, তোমরা কি করে এখানে এলে?'

বাচিক্ সেলাম করে বললে, 'গুম্‌লী-বিবির হুকুমে বাবুসাহেব?'

—'তার মানে?'

—'গুম্‌লী-বিবি হুকুম দিয়েছে, যেমন করে-হোক শয়তানদের হাত থেকে বাবু সাহেবদের উদ্ধার করবার জন্যে। আপনারা কোন্ পথে কোথায় আসবেন আমরা জানতুম, তাই প্রস্তুত হয়েই দলবল নিয়ে এইদিকে ছুটে এসেছি!'

তখন আমার মনে পড়ল, আমরা যখন বিদায় নিই, গুম্‌লী বলেছিল : 'আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই।.....কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদের ওপরে!'

গুম্‌লী নিজের কথা রেখেছে। নইলে আমাদের মৃত দেহগুলো সকলের অজান্তে এই অন্ধকার গুপ্ত গুহার মধ্যেই মাংসহীন কঙ্কালে পরিণত হত। গুম্‌লীর উদ্দেশে করলুম মনে মনে নমস্কার। মহিয়সী নারী!

পায়ে পায়ে এগিয়ে দিয়ে দেখি, রত্নস্তূপের উপরে এগিয়ে পড়ে রয়েছে দুরাত্মা ছুন্-ছিউর রক্তাক্ত মৃতদেহ! তার দুদিকে ছড়িয়ে পড়া দুই হাতের এক মুঠার ভিতরে মুক্তারাশি এবং আর এক মুঠার মধ্যে হীরা-চুনী-পান্না! তার দুই চক্ষু ও মুখবিবর খোলা—স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মৌন ভাষায় সে যেন বলতে চায়—'বাঙালীবাবু, আমারই জয় জয়কার, গুপ্তধন লুণ্ঠন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—গুপ্তধন নিয়েই চললুম আমি পৃথিবী ছেড়ে!'

—ঃ শেষ ঃ—

কুবের পুরীর রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রধান পাত্রগণের পরিচয়

বিমল ও কুমার স্থির করেছে, এ-জীবনে তারা বিবাহ করবে না!

সকলেই জানেন, তাদের জীবন হচ্ছে মহা-ডানপিটের জীবন এবং সে জীবন হচ্ছে সত্যসত্যই পদ্মপাতায় জল বিন্দুর মতো,—যে-কোনও মুহূর্তে টুপ করে ঝরে পড়তে পারে! যে-সব ভয়াবহ বিপদ মানুষের কল্পনারও অতীত, তাদেরই সঙ্গে দিন-রাত তাদের কারবার। তারা কখনও পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে যায় এবং যখন পৃথিবীতেও থাকে তখন কখনও যায় ময়নামতীর মায়া-কাননে আদিম দানব-জীবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কখনও মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যকের ধনের সন্ধানে আসামের পরিত্যক্ত বৌদ্ধমঠে বা আফ্রিকার অসভ্য মানুষ ও সিংহ-হিপো-গরিলার দেশে এবং কখনও হিমালয়ের মেঘাবৃত শিখরে উঠে দেখা করে ভয়ঙ্কর নর-দৈত্যদের সঙ্গে।

এমন অসাধারণ জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতো বিবাহ করা চলে না। কোথায় থাকবে তারা, আর কোথায় থাকবে তাদের বউ? হয়তো কবে তারা উত্তর-মেরুর তুষার-মরুর মধ্যে পথ হারিয়ে শ্বেত-ভাল্লুকদের দেশে মাসের পর মাস প্রবাস-যাপন করতে বাধ্য হবে, আর এদিকে তাদের বউরা ঘরের কোণে বসে চোখের জলে বুক ভাসাতে থাকবে! হয়তো কবে তাদের খেয়াল হবে চন্দ্রলোকে যাবার জন্যে, আর খেয়ালমতো কাজ করে এ-জন্মে আর দেশে ফিরে আসা হবে না! তখন স্বামী থাকতেও তাদের বউদের হতে হবে অনাথা বিধবার মতো! এইসব বুঝে-সুঝেই তারা পণ করে বসেছে, এ-জীবনে কোনওদিন টোপরও পরবে না—গাঁটছড়াও বাঁধবে না!

কিন্তু তারা ধনী এবং বিখ্যাত! তাদের নাম জানে না দেশে এমন লোক নেই। এ-রকম দুটি সৎপাত্র যে চিরকুমার হয়ে পাওনাগণ্ডা থেকে তাদের ফাঁকি দেবে, ঘটকঠাকুররা মোটেই এমন অভাবিত ব্যাপার ভাবতে রাজি নন!

অতএব ঘটকের দল বিমল ও কুমারকে প্রায়ই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। কিন্তু তারা যে কী উপায়ে ঘটকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে, আজকের এই ঘটনা থেকেই সেটা বেশ জানা যাবে।

কুমার চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে ও বিমল দুই চক্ষু মুদে টেবিলের উপরে দুই পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে বসে শুনছে, এমন সময়ে আচম্বিতে হল এক ঘটকের আবির্ভাব।

কুমারের শিথিল হাত থেকে ফস করে খসে পড়ল খবরের কাগজ এবং বিমলের পা দুটো আবার টপ করে নেমে পড়ল টেবিলের তলায়! ঘটকঠাকুর তার সাড়ে-তেরোটা তালি-মারা বাঁটভাঙা বেরঙা ছাতাটা সযত্নে ক্রোড়দেশে রক্ষা করে একখান চেয়ারের উপরে এমন জাঁকিয়ে উপবেশন করলে যে বেশ বোঝা গেল, অতঃপর বহুক্ষণের মধ্যে সে আর ওঠবার নাম মুখেও

আনবে না! দুই বন্ধুর অবস্থা হল বিরাট হাউইটজার কামানের মুখে অসহায় দুই আসামির মতো!

বিমল ও কুমার অনেকক্ষণ ধরে আপত্তি জানিয়েও সেই নাছোড়বান্দা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঘটককে বিদায় করতে পারলে না।

বিমল তখন নাচার হয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি বিয়ে করতে রাজি! কিন্তু বউটি আমার মনের মতো হওয়া চাই।'

ঘটক খুব খুশি হয়ে আনন্দ-গদগদ স্বরে বললে, 'আমার হাতে সবচেয়ে ভালো যে পাত্রীটি আছে, তাকে নিশ্চয়ই আপনার পছন্দ হবে। সে তো যে সে বউ নয়, একেবারে ডানাকাটা পরী!'

বিমল গম্ভীর হয়ে বললে, 'পাত্রী এরোপ্লেন চালাতে জানে?'

ঘটক আকাশ থেকে পড়ে বললে, 'সে কী বাবু, বাঙালির মেয়ে এরোপ্লেন চালাবে কী?'

—'পাত্রী বন্দুক ছুড়তে পারে?'

ঘটক মাথা নেড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই পারে না। তবে আপনি শেখালে শিখতে পারে।'

—'সে ঘোড়ায় চড়তে, কুস্তি আর বক্সিং লড়তে পারে?'

ঘটক বিস্ময়ের চরমে উঠে বললে, 'ঘরের বউ কুস্তি লড়বে কী!'

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, 'তাহলে আপনি পথ দেখতে পারেন। যে-মেয়ে ও-সব বিদ্যে জানে না, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব।'

ঘটক কুমারের দিকে ফিরে বললে, 'মশায়েরও কি ওই মত?'

কুমার বললে, 'আমরা দুজনে একসঙ্গে খাই, একসঙ্গে বেড়াই, একসঙ্গে ঘুমোই—মরবারও সাধ আছে একসঙ্গে। কাজেই আমাদের মতামতও একরকম।'

ঘটক তবু হাল ছাড়তে রাজি না হয়ে বললে, 'কিন্তু—'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'আর কিন্তু-টিন্তু নয়! আপনার বিদায় নিতে দেরি হচ্ছে বলে ওই দেখুন বাঘা নিজেই খবরদারি করতে এসেছে!'

ঘটক ফিরে দেখলে ঠিক তার চেয়ারের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড একটা কুকুর, মস্ত মস্ত ধারালো দাঁত বার করে! সে দাঁতগুলো দেখবার পরেও আর কোনও যুক্তি দেখানো চলে না! অতএব ঘটক হতাশ ভাবে উঠে ঘর থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

কুমার হাসতে হাসতে আবার খবরের কাগজখানা তুলে নিলে এবং বিমল আবার দুই চক্ষু মুদে টেবিলের উপরে দুইপা তুলে দিলে। কিন্তু কুমার পড়া শুরু করবার আগেই পুরাতন ভৃত্য রামহরি ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'খোকাবাবু, একটি বাবু দেখা করতে চান।' বিমল আজ আর খোকা নয়, কিন্তু রামহরি তার পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে নারাজ।

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, 'আবার কোন মহাপ্রভু জ্বালাতে এলেন? ঘটক-টটক নয় তো?'

কুমার বললে, 'তাহলে হয়তো কোনও কনের বাপ এসেছে! ঘটকের কাছে পার আছে কিন্তু কনের বাপের হাত ছাড়ানো সোজা নয়! হয়তো এসেই দু পা জড়িয়ে ধরবে!'

শুনেই বিমল চমকে উঠে টেবিলের উপর থেকে নিজের পা দুটো নামিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি আবার চেয়ারের তলায় ঢুকিয়ে দিলে!

রামহরি হেসে ফেলে বললে, 'না, যে-বাবুটি এসেছেন, সে-বাবুটি তোমাদেরই বয়সি হবেন! এত কম-বয়সে কেউ কনের বাপ হতে পারে না!'

রামহরি বললে, 'না, বাবুটিকে ঘটক বলে তো মনে হচ্ছে না!'

বিমল আশ্বস্ত স্বরে বললে, 'আচ্ছা, লোকটিকে নিয়ে এসো।'

ঘরের ভিতরে যে-লোকটি এসে ঢুকল তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। জোয়ান চেহারা, ফরসা রং।

আগন্তুক ঘরে ঢুকেই বললে, 'আপনি বিমলবাবু, আর আপনি কুমারবাবু তো? কাগজে আপনাদের ফটো আমি দেখেছি।'

কুমার হেসে বললে, 'দেখছি আমরা বড়োই বিখ্যাত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আপনার নাম আর এখানে আসবার কারণ তো আমরা জানি না।'

আগন্তুক বললে, 'আমার নাম হচ্ছে দিলীপকুমার চৌধুরী, দেশ রাধানগর। বিশেষ এক বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।'

বিপদের নাম শুনেই বিমল সাগ্রহে উঠে সোজা হয়ে বসল।

কুমার বললে, 'বিপদে পড়ে আমাদের মতো অচেনা লোকের কাছে এসেছেন কেন?'

দিলীপ বললে, 'আপনাদের সঙ্গে চোখোচোখি দেখা না হলেও বাংলা দেশের কারুর কাছেই আপনারা বোধ হয় অচেনা নন। আপনাদের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ কে না জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই বিপদে আপনারা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

কুমার বললে, 'তাহলে আর বাজে কথা না বলে, গোড়া থেকে আপনার বিপদের সব কথা খুলে বলুন। কিছু লুকোবেন না, কারণ সমস্ত না জানলে আমরা আপনার কোনও উপকারেই লাগব না।'

দিলীপ বললে, 'মশাই, এসে পর্যন্ত দেখছি, একটা মস্ত-বড়ো বিশ্রী কুকুর দরজার ফাঁক দিয়ে কটমট করে আমার পানে তাকিয়ে আছে! ওটাকে তাড়িয়ে দিন, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কোনও কথা বলতে পারব না।'

কুমার ফিরে দেখলে, তাদের প্রিয় কুকুর বাঘা দরজার ওপাশে মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দিলীপকে নিরীক্ষণ করছে! সে হেসে উঠে বললে, 'আপনি আমাদের চেনেন, ওকে চেনেন না! ও যে আমাদের বাঘা!'

—'বাঘা! কিন্তু ও যে দেখছি নেড়ি কুত্তা!'

কুমার গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, বাঘা আমাদেরই মতো নেটিভ বটে! আমরা স্বদেশের ধুলোকেও ভালোবাসি, তাই বিলিতি কুকুর পুষি না। আমরা হচ্ছি কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত। আমরা—তাঁর ভাষায় :

'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!'

কোনও বিলিতি কুকুরই বাঘার চেয়ে বুদ্ধিমান আর জোয়ান নয়। আপনি চেয়ারে বসে নির্ভয়ে

সব কথা বলুন, বাঘাকে কোনও ভয় নেই, ও খালি আপনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে—আপনি ভালো, না মন্দ লোক!'

দিলীপ আর কিছু না বলে একখানা চেয়ারের উপরে বসে নিজের কাহিনি শুরু করলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিলীপের কাহিনি

আমাদের রাধানগর হচ্ছে বেশ একখানা বড়ো গ্রাম। যদিও সেখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির চেয়ে নিম্নজাতির দলই বেশি ভারী।

গাঁয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাউরী নদী। তার সঙ্গে গঙ্গার যোগ আছে। সেইজন্যে রাধানগরের ঘাটে অনেক দূর-দেশের নৌকো আর ইস্টিমার এসে লাগে। এই বাউরী নদীর তীরেই আমাদের বাড়ি।

ছেলেবেলাতেই আমার মা মারা যান—তাঁর মুখও আমার মনে পড়ে না। মাস-ছয়েক আগে আমার ঠাকুরদাদাও ইহলোক ত্যাগ করেন—ঠাকুরমা অনেক আগেই স্বর্গে গিয়েছিলেন। ঠাকুরদাদা মারা যাবার সময়ে বাবাকে কী বলে যান তা জানি না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বাবা সর্বদাই যেন কী চিন্তা করতেন। তারপর মাস-তিনেক আগে হঠাৎ তিনি তীর্থযাত্রা করেন।

আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আগে আমাদের খুব বড়ো জমিদারি ছিল, কিন্তু ঠাকুরদাদা বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট করে ফেলেন। এখন সামান্য কিছু জমিজমা আছে, আর আমার কোনও ভাগীদারও নেই, তাই কোনওরকমে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। আমাদের অবস্থার এই পরিবর্তনে বাবা বড়ো কাতর হয়ে পড়েছিলেন, এর জন্যে সর্বদাই দুঃখিত মুখে থাকতেন। আমার বাবার নাম তারিণীচরণ চৌধুরী, আর ঠাকুরদাদার নাম ছিল শ্যামাপদ চৌধুরী।

বাবা তীর্থযাত্রা করবার দিন-পনেরো পরেই কিষণ সিং নামে এক ভদ্রলোকের চিঠিতে হঠাৎ এক দুঃসংবাদ এল। আলমোড়ার কাছে এক জঙ্গলে বাবাকে নাকি ডাকাতের দল আক্রমণ ও আহত করে এবং কিষণ সিং তাঁকে পথ থেকে তুলে এনে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি।

হঠাৎ পিতৃহীন হয়ে আমার মনের অবস্থা কী রকম হল এখানে সেটা আর বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। এমনই হতভাগ্য আমি যে, পিতার দেহের সৎকার পর্যন্ত করতে পারিনি। কারণ সেই পত্রেই জানা গেল যে, তাঁর নশ্বর দেহ দাহ করে ফেলা হয়েছে।

এইবারে আমার আসল বিপদের কথা শুনুন।

বাবার শ্রাদ্ধাদি কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন একটি লোক আমাদের গ্রামে এসে হাজির হলেন। লোকটি আমাদের বাড়িতে এসে এই বলে আত্মপরিচয় দিলেন : 'আমার নাম ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস। আমি কলকাতায় থাকি। তোমার বাবা তারিণীবাবু যখন আলমোড়ায় কিষণ সিংয়েব বাসায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

তোমার বাবা অন্তিমকালে আমাকে যে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, সেই অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যেই আজ আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

তিনি বাবার অন্তিমকালের বন্ধু শুনে আমি তাড়াতাড়ি সসম্মানে তাঁকে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসে বসালুম।

ভৈরববাবু দেখতে অত্যন্ত লম্বা ও দোহারা। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তিনি নিয়মিত কুস্তি লড়েন ও অন্যান্য ব্যায়াম করেন। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, কিন্তু এই বয়সেই মাথার আধখানা টাকে ভরা। শ্যামবর্ণ, গোঁফ-দাড়ি কামানো। কিন্তু তাঁর ছোটো ছোটো অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দুটির সঙ্গে মুখের মিষ্ট ও ছেলেমানুষি-মাখা সরল হাসি কেমন যেন খাপ খাচ্ছিল না।

আমি তাঁকে বাবার শেষ-অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি করুণ ভাবে বললেন, 'আহা, সে কথা আর শুনতে চেয়ো না, শুনলে তোমার কষ্ট হবে!'

আমি বললুম, 'তাহলে বাবা কেন যে আপনাকে আমার কাছে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই কথাই বলুন!'

ভৈরববাবু বললেন, 'বেশি কথা তিনি কিছুই বলেননি—বলতে পারেননি। তবে মারা যাবার মিনিট-দুয়েক আগে তিনি আমার দুই হাত চেপে ধরে আকুল স্বরে বলেছিলেন—'রাধানগরে আমার ছেলে দিলীপ আছে, তার মাথার ওপরে কেউ নেই। আমার যে-সব দলিল আর কাগজপত্তর আছে সেগুলো দেখে যদি আপনি সুব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।' এই তাঁর শেষ কথা। আমি স্বীকার করলুম। তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।'

সেই ঘরেই বাবার লোহার সিন্দুক ছিল। আমি সিন্দুক খুলে ভিতরকার সমস্ত কাগজপত্তর ভৈরববাবুর সামনে বার করে দিলুম। তিনি খুব মন দিয়ে সমস্ত কাগজপত্তর পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছোট্ট একটা ক্যাশবাক্সে একখানা খামের ভিতরে একটুকরো কাগজ ছিল, সেইটেই তিনি প্রায় দশমিনিট ধরে দেখলেন। তারপর কাগজখানা আবার বাক্সের ভিতরে রেখে দিয়ে বললেন, 'দিলীপ, তোমার কাগজপত্রের ভিতরে কোনও গোলমাল নেই, তবে তোমার বাবা এত ব্যস্ত আর চিন্তিত হয়েছিলেন কেন, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! আর কোনওখানে কি তোমার বাবার আর-কোনও কাগজপত্তর আছে?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে না।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে তিনি বিদায়গ্রহণ করলেন। যাবার সময়ে লক্ষ করলুম, ভৈরববাবুর ডান হাতে আঙুল আছে ছয়টা!

ভৈরববাবু অতক্ষণ ধরে একটুকরো কাগজ নিয়ে কী লক্ষ করছিলেন তা জানবার জন্যে মনে কেমন কৌতূহল হল। ক্যাশবাক্সটা আবার খুললুম। খামের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে ভাঁজ খুলে দেখলুম, তার ভিতরে খালি একটা ম্যাপ আঁকা আছে! কোথাকার ম্যাপ সে-সব কিছুই জানবার উপায় নেই, খুব পুরোনো কালি দিয়ে টানা গুটিকয় লাইন এবং হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'পাহাড়', 'গুহা', ও 'সরোবর' প্রভৃতি।

এই তুচ্ছ ম্যাপখানা ভৈরববাবু এতক্ষণ ধরে দেখোছিলেন কেন? অনেকক্ষণ ভেবেও কিছুই বুঝতে না পেরে, বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কাগজপত্তর সব আবার সিন্দুকের ভিতরে পুরে রাখলুম।

এইবার থেকে আপনারা বিশেষ মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। কারণ এর পরের ঘটনাগুলির কারণ জানবার জন্যেই আমি আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।

ভৈরববাবুর আগমনের দিন-তিনেক পরে আমি একটা দরকারি কাজে পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরে এসে উপরে উঠে দেখি, আমার উপরকার বসবার ঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে! অথচ যাবার সময়ে এ-ঘরের দরজায় আমি যে নিজের হাতে তালা বন্ধ করে গিয়েছিলুম, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল, লোহার সিন্দুকটা খোলা! তাড়াতাড়ি তার ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখলুম, দামি কিছুই চুরি যায়নি!

ঘরের মেঝেতে সেই ছোটো ক্যাশবাক্সটা কাত হয়ে পড়েছিল। সেটা খুলে অবাক হয়ে দেখি, তার ভিতর থেকে সেই ম্যাপ-সুদ্ধ খামখানা অদৃশ্য হয়েছে!

বাড়ির সমস্ত ঘর পরীক্ষা করে আর কিছু হারিয়েছে বলে মনে হল না। হারিয়েছে শুধু সেই তুচ্ছ ম্যাপখানা—যে বাজে কাগজখানা হয়তো আমি নিজেই কোনওদিন বাক্স থেকে বার করে ছুড়ে ফেলে দিতুম!

হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়িতে চোর এল, দরজার তালা ভাঙলে, লোহার সিন্দুক খুললে, কিন্তু নিয়ে গেল কেবল এক টুকরো কাগজে হাতে-আঁকা একখানা ম্যাপ! এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনও শুনেছে?

কেন জানি না, কেবলই সন্দেহ হতে লাগল, এই অদ্ভুত রহস্যের সঙ্গে সেই ভৈরববাবুর একটা কোনও সম্পর্ক আছেই! এই ম্যাপ দেখবার জন্যে ভৈরববাবুর অতিরিক্ত আগ্রহ তো তাঁর মুখে-চোখে স্পষ্টই ফুটে উঠতে দেখেছি! আর সেই আগ্রহেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ম্যাপখানা অন্তত তাঁর চক্ষে কম মূল্যবান নয়!

এই ঘটনার হপ্তাখানেক পরে আমার বাড়িতে আর এক মূর্তি এসে হাজির! পশ্চিমের লোক, বয়সে প্রৌঢ়, আধময়লা জামাকাপড়। নাম বললে, কিষণ সিং। নিবাস আলমোড়ায়!

তাঁকে আদর করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলুম, কারণ এই কিষণ সিংই আমাকে বাবার মৃত্যু-সংবাদ জানিয়েছিলেন এবং অন্তিমকালে বাবার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন।

তাঁর মুখে বাবার মৃত্যুর যে শোচনীয় কাহিনি শুনলুম এখানে সে কথাও বলে সময় নষ্ট করতে চাই না! নিজের দুঃখ আমার নিজের বুকের ভিতরেই লুকানো থাক।

সমস্ত শোনবার পরে কিষণ সিংকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কেন এত দূরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

কিষণ সিং ভাঙা ভাঙা বাংলায় যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে এই : 'বাবুজি, তারিণীবাবু যখন মারা যান, তার একটু আগেই আমাকে ডেকে বললেন, 'কিষণ সিং, তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে

অন্তিমকালে আমার যে সেবা করলে, তার পুরস্কার ভগবানই তোমাকে দেবেন। কিন্তু তুমি যদি আমার আর একটি উপকার করো, তাহলে তোমাকে আমি কিছু পুরস্কার দিতে পারি।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী উপকার?' তারিণীবাবু বললেন, 'আমার পকেটে আটশো টাকার নোট আছে। তোমরা সদলবলে এসে পড়াতে ডাকাতরা সেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি। ওই পকেটেই একটি বড়ো ফাউন্টেন পেনও আছে। পাঁচশো টাকা আর ওই ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে তুমি যদি দেশে গিয়ে আমার ছেলেকে দিয়ে আসতে পারো, তাহলে বাকি তিনশো টাকা তোমাকে আমি পুরস্কার দিয়ে যাব।'—আমি বললুম, 'বাবুজি, পুরস্কার পাবার আশায় আমি অসময়ে আপনার উপকার করতে চাই না। ও টাকা আর কলম আমি ডাকে আপনার ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেব।' কিন্তু তারিণীবাবু বললেন, 'না কিষণ সিং, ও তিনশো টাকা তুমি না নিলে আমি মরেও শান্তি পাব না। আর ডাকে নয়, কলম আর টাকা তোমাকে নিজে গিয়ে আমার ছেলের হাতে দিয়ে আসতে হবে। তাকে বলবে, সে যেন তার বাপের এই শেষ দান কলমটিকে ভালো করে রেখে দেয়!' তখন আমি বাধ্য হয়ে তাঁর কথামতোই কাজ করব বলে স্বীকার করলুম। তারপর তারিণীবাবু আর বেশিক্ষণ বেঁচে ছিলেন না।.....এই নিন বাবুজি, আপনার বাপের শেষ-দান পাঁচশো টাকা আর ফাউন্টেন পেন!'

কিষণ সিং তাঁর পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট আর একটি ফাউন্টেন পেন বার করে আমার হাতে দিলেন এবং আবার বললে, 'বাবুজি, বাকি তিনশো টাকাও আমি সঙ্গে করে এনেছি। আমি গরিব মানুষ, তিনশো টাকা আমার কাছে অনেক টাকা। কিন্তু উপকারের দামের মতন ও-টাকা নিতে আমার মন সরচে না।'

সেই দরিদ্র সাধু কিষণ সিংয়ের হাত ধরে আমি অভিভূত স্বরে বললুম, 'কিষণ সিং, তুমি দেবতা! ও-সমস্ত টাকাই তুমি যদি নিজে যেচে না দিতে, তাহলে তো আমি কিছুই জানতে পারতুম না! কিন্তু আমার বাবা তোমাকে যা দিয়ে গেছেন, আমি কিছুতেই তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

কিষণ সিং সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই বিদায়গ্রহণ করলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'বাবুজি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তারিণীবাবু মারা যাবার আগে আর-একবার বলেছিলেন, ও-কলমটা আপনি খুব সাবধানে রাখবেন—যেন ওটা হারিয়ে না যায়!'

আমারও আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা কিষণবাবু, একটা কথা বলতে পারেন? আমার বাবা যখন মারা যান, তখন সেখানে ভৈরববাবু বলে কোনও বাঙালি ভদ্রলোক হাজির ছিলেন?'

কিষণ সিং বললেন, 'বাঙালি ভদ্রলোক? আপনার বাবা মারা যান আমার বাসায়। তিনি ছাড়া আর কোনও বাঙালিই সেখানে ছিলেন না!' শুনে বিস্মিত হলুম। কিষণ সিং চলে যাবার পরেও মনের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে বারংবার এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কে এই ভৈরববাবু, কী তাঁর উদ্দেশ্য?

সেদিন সারাদিন আকাশে মেঘ জমেছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল।

একে পল্লিগ্রাম, তায় দুর্যোগের রাত। চারিদিক খুব শীঘ্রই নিসাড় হয়ে পড়ল—একটা কুকুরেরও চিৎকার পর্যন্ত শোনা যায় না।

বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্ন সেই কলমটি নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, বাবার সঙ্গে তো আরও অনেক জিনিস ছিল, কিন্তু তিনি এই কলমটি বিশেষ করে আমাকে দিয়ে গেলেন কেন? আর এই কলমটিকে খুব সাবধানে রাখতেই বা বলে গেলেন কেন?

এই-সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ বাহির থেকে তীব্র ও উচ্চ এক আর্তনাদে চতুর্দিকের স্তব্ধতা যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল!

বলেছি, আমাদের বাড়ি নদীর ঠিক উপরেই। আর্তনাদটা এল নদীর দিক থেকেই।

ধড়মড় করে উঠে বসে জানলা খুলে দিলুম। হু-হু করে জোলো বাতাস ঘরের ভিতরে ছুটে এল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সেই নিরেট অন্ধকার ভেদ করে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না!

আবার সেই ভয়ানক আর্তনাদ!

বেশ শুনলুম, কে যেন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলছে—'দিলীপবাবু! বাবুজি! রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

এ যে সেই কিষণ সিংয়ের গলা!

এক লাফে খাট থেকে নীচে নেমে পড়ে একগাছা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে তখনই আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলুম। বেগে ছুটতে ছুটতে যখন নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম, তখন চারিদিক আবার নীরব হয়ে পড়েছে—কারুর কোনও আর্তনাদই শোনা যাচ্ছে না! নদীর কল-কল শব্দ আর বৃষ্টির টিপ-টিপ ধ্বনি ও থেকে থেকে বাতাসের হাহাকার ছাড়া এই অন্ধ পৃথিবীর কোথাও আর কেউ যেন জেগে নেই!

এখন এখানে বিদেশি কিষণ সিং কী করতে পারে? এবং অমন বিপদগ্রস্তের মতো আমারই বা নাম ধরে ডাকবে কেন? সে কি জলপথে এখান থেকে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝড়ে নৌকো ডুবে গেছে?

লাঠির উপরে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতা আর কেউ ভাঙলে না। তখন আমারই শুনতে ভুল হয়েছে ভেবে ধীরে ধীরে আবার বাড়ির দিকে ফিরে এলুম।

হঠাৎ খানিক তফাত থেকে আমার বাড়ির দোতলার ঘরের দিকে চোখ গেল। আমার শয়নগৃহের খোলা জানলা দিয়ে দেখা গেল, ঘরের ভিতরে একটা আলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে! যেন কেউ ল্যাম্পটা নিয়ে ঘরের ভিতরে এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করছে!

সেদিন আমার চাকরটা পর্যন্ত ছুটি নিয়ে কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল—বাড়িতে ছিলুম আমি কেবল একা! তবে এ কী কাণ্ড? আমার শোবার ঘরে কে ঢুকেছে? আলো জ্বেলে ঘুরে-ফিরে কী খুঁজছে?

দ্রুতপদে আবার বাড়ির দিকে ছুটলুম—অমনি অন্ধকারের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে বাইরের কোথায় একটা বাঁশি বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আলোটা দপ করে নিবে গেল!

আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম—'চোর, চোর, চোর!'

সেই অন্ধকারের ভিতরেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনলুম—যেন কারা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! তাহলে চোরেদের দলে অনেক লোক আছে?

তাদের ধরবার চেষ্টা করা বৃথা বুঝে আমি আবার নিজের বাড়িতেই ফিরে এলুম। উপরে উঠে দেখলুম, আমার শয়নঘরে আর আলো জ্বলছে না!

ফের আলো জ্বেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো কাদামাখা পায়ের দাগ! নিশ্চয় এখানে কারা এসে ঢুকেছিল!

কিন্তু, কেন? আমার মতন গরিব মানুষের বাড়ি হঠাৎ যত চোরের তীর্থের মতো হয়ে উঠল কেন?

যারা এসেছিল তারা যে ঘরের জিনিসপত্তর ঘেঁটে গেছে, তাও বেশ দেখা যাচ্ছে! কিন্তু কিছুই তো হারায়নি!

তবে?

হঠাৎ টেবিলের উপরে নজর পড়ল। সেখানে আমার তিনটে ফাউন্টেন পেন ছিল, কিন্তু এখন একটাও দেখা যাচ্ছে না! ...তবে কি অতগুলো চোর এসেছিল শুধু ওই তিনটে ফাউন্টেন পেন চুরি করতে? না, আমি এসে পড়াতে তারা আর কিছু নিয়ে পালাতে পারেনি? ...সেদিনের চোরেরা চুরি করলে একটুকরো কাগজ, আর আজকের চোরেরা নিয়ে গেল কেবল তিনটে কলম! চোরেদের ঘরে কি কাগজ-কলমের এতই অভাব?

বাবার সেই কলমটির কথা মনে পড়ে গেল। বাইরে আর্তনাদ শুনে কলমটা আমি তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় গুঁজে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। ছুটে গিয়ে বালিশ তুলে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—নাঃ, বাবার শেষ-স্মৃতিচিহ্ন যথাস্থানেই আছে, চোরেরা তার সন্ধান পায়নি!

পরের দিন নদীর ধারে বিষম একটা হট্টগোল শুনে গিয়ে যা দেখলুম তা আবার বর্ণনা করতে—বা মনে আনতেও দুঃখ-কষ্টে বুক যেন ভেঙে যায়!

ঘাটের তলায় একটা মৃতদেহ ভাসছে, তার সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন! আর, সে মৃতদেহ হচ্ছে পরোপকারী, ধার্মিক ও নিরীহ কিষণ সিংয়ের! নিজের বাক্যরক্ষা ও আমার উপকার করতে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে হতভাগ্যের আজ প্রাণ গেল! বেচারা এখানকার আর কারুকেই চেনেন না, তাই মৃত্যুকালেও তিনি আমারই নাম ধরে ডেকে সাহায্যভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সে আর্ত-প্রার্থনা শুনেও আমি তাঁর কোনও উপকারই করতে পারিনি। এ-অনুতাপ আমার জীবনেও যাবে না! আমি মহাপাপী!

বিমলবাবু, কুমারবাবু! এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি দেশ ছেড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি? কিষণ সিংয়ের হত্যাকাণ্ডের পরেও দেশে থাকতে আর আমার ভরসা হয়নি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোনও সাংঘাতিক শত্রুর শনিদৃষ্টি পড়েছে আমার উপরে! এ শত্রু যেমন সহজে চুরি করে, তেমন সহজেই করে মানুষ খুন! অষ্টপ্রহর মনে হচ্ছে, এরা যেন আমার চারপাশে ওত পেতে বসে আছে, আমার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ করছে এবং যে-কোনও মুহূর্তে রক্তপিপাসু পিশাচের মতো আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়তে পারে!

কারণ কিষণ সিংয়ের হত্যাকাণ্ডের পরেও দেখেছি, সন্ধ্যা হলেই কারা যেন আমার বাড়ির কাছে আনাচে-কানাচে ঝোপে-ঝাপে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়! রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়, ছাদে যেন কাদের পায়ের শব্দ শুনি, 'কে, কে?' বলে চেঁচিয়ে উঠি, আবার পায়ের শব্দ শুনি, কারা যেন তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়!

কে ওই ভৈরববাবু? জীবনে কখনও তাঁকে দেখিনি, বাবার মুখেও তাঁর নাম শুনিনি! কিন্তু তিনি কেমন করে বাবার মৃত্যুর কথা, কিষণ সিংয়ের কথা আর আমার কথা জানলেন? আমার কাগজপত্র ও বিশেষ করে সেই হাতে-আঁকা ম্যাপ দেখবার জন্যে তাঁর অত আগ্রহ কেন? আর সেই ম্যাপখানা তারপরেই চুরি গেল কেন? কোথাকার ম্যাপ সে-খানা? লোহার সিন্দুকের মধ্যে সেখানাকে অত যত্ন করে রাখাই বা হয়েছিল কেন?

আমার বাবার শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে কি কোনও রহস্যময় কারণ আছে? এত জিনিস থাকতে তিনি মৃত্যুর সময়ে আমায় একটা ফাউন্টেন পেন পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন কেন? আর কলমটা অতি-সাবধানে রক্ষা করতেই বা বললেন কেন? এ-রকম ফাউন্টেন পেন তো পৃথিবীর সর্বত্রই প্রত্যহ হাজার হাজার বিক্রি হচ্ছে!

কিষণ সিংকে কে হত্যা করলে—কেন হত্যা করলে?

আর সেই হত্যাকাণ্ডের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমার বাড়িতে একদল চোর ঢুকে কেবল তিনটে ফাউন্টেন পেন নিয়েই সরে পড়ল কেন? তারা কি বাবার সেই কলমটাই খুঁজতে এসেছিল?

কিন্তু, কেন?

এই-সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তরই পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনেছি, আপনারা এইরকম রহস্যময় অনেক ঘটনার কিনারা করেছেন। এখন আপনারাই বলুন, আমার কর্তব্য কী?

আমি একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি। হয়তো আমার জীবনও নিরাপদ নয়! নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি এ কোন অপূর্ব ও বিপজ্জনক নাটকের নায়ক হয়ে পড়েছি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাউন্টেন পেনের গুপ্তকথা

এতক্ষণ পর্যন্ত বিমল একটাও কথা কয়নি। দিলীপের সমস্ত কাহিনি শুনেও সে প্রথমে কিছু বললে না, চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'দিলীপবাবু, এমন কোনও লোককে আপনি জানেন কি, আপনার সঙ্গে বা আপনাদের পরিবারের সঙ্গে যার শত্রুতা আছে?'

দিলীপ বললে, 'না, এমন কারুকেই আমি জানি না।'

—'আপনাদের সম্পত্তির আর কোনও উত্তরাধিকারী যে নেই, সে-বিষয়েও আপনি নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ। আর সম্পত্তি তো ভারী! বছরে বারো-তেরোশো টাকা আয়!'

—'হয়তো আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনি নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্য কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। যাদের স্বার্থ আছে, হয়তো তারা আপনার স্বপক্ষের প্রমাণগুলো সরিয়ে ফেলতে চায়!'

—'স্বপক্ষের প্রমাণ বলতে আপনি কী বোঝেন কুমারবাবু? চোরেরা একখানা হাতে-আঁকা ম্যাপ আর তিনটে ফাউন্টেন পেন সরিয়ে ফেলেছে। এগুলো কি আবার প্রমাণ?'

বিমল এইবারে কথা কইলে। বললে, 'কুমার, যদিও তুমি ভুল যুক্তি অনুসরণ করছ, তবু একটা বিষয় বোধহয় কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছ। ওই হাতে-আঁকা ম্যাপখানা খুব বড়ো প্রমাণও হতে পারে! চোরেরা যে তিনটে ফাউন্টেন পেন নিয়ে গেছে, তাও হয়তো অকারণে নয়! ভৈরব খুব সম্ভব নিজের কোনও গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ওই ম্যাপখানা চুরি করেছে। কিন্তু ম্যাপ ছাড়াও নিশ্চয় সে আরও কিছু চায়। সেই 'আরও কিছু' বলতে কী বোঝাতে পারে? সেই 'আরও কিছু'র লোভেই কিষণ সিংকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে বধ করবার আগে হয়তো যন্ত্রণা দিয়ে কিষণ সিংয়ের মুখ থেকে জেনে নেওয়া হয়েছে যে, তারিণীবাবু তাঁর হাতে যা দিয়েছিলেন, তিনি সে-সব দিলীপবাবুর হাতে সমর্পণ করে এসেছেন। দিলীপবাবুর হাতে তিনি দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা আর একটা ফাউন্টেন পেন। চোরেরা যখন টাকার বদলে ভুল ফাউন্টেন পেনই চুরি করেছে, তখন বুঝতে হবে যে, ঠিক ওই জিনিসটিই তাদের দরকার! কিন্তু আসল ফাউন্টেন পেনটি এখনও দিলীপবাবুর কাছেই আছে। সেটি যদি এখানে থাকত তাহলে হয়তো এখনই আমি সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারতুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলমটি আমাদের হাতে নেই!'

দিলীপ বললে, 'কলম আছে বিমলবাবু, কলম আমার সঙ্গেই আছে! চোরেদের অদ্ভুত প্রবৃত্তি দেখে বাবার সেই শেষ-স্মৃতিচিহ্নটিকে আমি বাড়িতে ফেলে আসতে ভরসা করিনি!'—এই বলে সে জামার ভিতর থেকে একটি ফাউন্টেন পেন বার করে সামনের টেবিলের উপরে রাখলে।

বিমল আগ্রহ-ভরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর কলমটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, 'এটি দেখোছি ওয়াটারম্যানের সবচেয়ে বড়ো সাইজের রেগুলার ফাউন্টেন পেন। এতে কালি ঢালতে হলে প্যাঁচ খুলে ড্রপারের সাহায্যে ফাঁপা ব্যারেলটিকে ভরতি করতে হয়। কলমটির আকারে কোনও নতুনত্ব বা অসাধারণতা দেখছি না বটে, কিন্তু'—সে মুখের কথা শেষ না করেই কলমটি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে এবং প্যাঁচ ঘুরিয়ে তার মুখের দিকটা খুলে ফেলে ব্যারেলের ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহাস্যে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি তাই! সব রহস্যই এইবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে! কুমার! একটা ছোটো সন্না নিয়ে এসো তো!'

কুমার তখনই উঠে গিয়ে একটি ছোটো সন্না এনে দিলে।

বিমল সন্নাটা ব্যারেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খুব সরু করে পাকানো একখানা কাগজ টেনে বার করে ফেললে!

দিলীপ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'ও কী বিমলবাবু, ও কী! ব্যারেলের ভেতরে কাগজ!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব দরকারি কাগজ! এইজন্যেই আপনার বাবা আপনাকে কলমটি খুব সাবধানে রাখতে বলেছিলেন! আর ভৈরবও বোধহয় এইরকম কিছু সন্দেহ করেই ফাউন্টেন পেন চুরি করতে নিজে এসেছিল বা লোক পাঠিয়েছিল! এখন দেখা যাক, কাগজে কী লেখা আছে!'

বিমল আস্তে আস্তে পাকানো কাগজখানি খুলতে লাগল। খুব পাতলা একখানা কাগজ ভালো করে পাকিয়ে ব্যারেলের ভিতরে পুরে রাখা হয়েছিল। তাতে খুদে খুদে হরফে লেখা আছে :

'কল্যাণীয়েষু দিলীপ, আমার স্থান অতি অল্প, একেবারে কাজের কথা বলি।

আমার বাবা, অর্থাৎ তোমার ঠাকুরদাদা তিব্বত বেড়াতে গিয়ে পথে গুপ্তধনের সন্ধান পান। কিন্তু কোনও দুর্ঘটনায় তাঁকে খালি হাতে কেবল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে সে-জায়গাটির ম্যাপ তিনি এঁকে এনেছিলেন, সেখানি আমাদের লোহার সিন্দুকে আছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে আমিও ওই গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছি। কিন্তু পথে বেরিয়ে এখন বুঝতে পারছি যে, ওই গুপ্তধনের ঠিকানা না জানলেও তার অস্তিত্ব আমি ছাড়া বাংলা দেশের অন্য লোকেও জানে। সেই শত্রুও আমার অনুসরণ করেছে—হয়তো আমাকে কোনও বিপদে ফেলবে। যদি আমি কোনও মারাত্মক বিপদে পড়ি, তাহলে তুমি যাতে সব জানতে পারো আমি সেইজন্যেই এই পত্র লিখছি।

হিমালয়ের মানস সরোবরের কাছে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল। গুপ্তধন সেইখানেই আছে। ম্যাপ দেখলেই সব জানতে পারবে। সাবধানতার জন্যে ম্যাপে রাক্ষস তালের নাম লেখা নেই। কারণ যদি ম্যাপখানা চুরি যায়, তাহলেও কেউ বুঝতে পারবে না যে, কোথাকার ম্যাপ! আমিও সাবধানতার মার নেই বলে ম্যাপখানা সঙ্গে নিলুম না—কিন্তু তার সবটাই আমার মনের ভিতরে এমন ভাবে গাঁথা আছে যে, বিনা ম্যাপেই আমি কাজ চালাতে পারব।

গুপ্তধনের সমস্ত ইতিহাস আমি জানি না। তবে শুনেছি, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময়ে যখন বৌদ্ধদের উপরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন একদল সন্ন্যাসী একটি পরাজিত রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিব্বতে পালাবার পথে রাক্ষস তালের কাছে লুকিয়ে রাখে। সে ঐশ্বর্যের নাকি অন্ত নেই।

কিন্তু ঐশ্বর্যলাভে দুটি বাধা আছে বলে শুনেছি। প্রথমত, গুপ্তধন রক্ষা করে নাকি একদল প্রেতাত্মা! তিব্বতের লামারা এই ঐশ্বর্যের কথা জানে। এতদিনে তারা হয়তো গুপ্তধন সব সরিয়ে ফেলত, কিন্তু তারা কুসংস্কারে অন্ধ, ভূতের ভয়ে রত্নগুহার সন্ধান করে না! আর সন্ধান না করার অন্য কারণ বোধ হয়, রত্নগুহার ঠিক ঠিকানা তাদের জানা নেই। কিন্তু ঠিকানা না জানলেও লামারা সর্বদাই সাবধান হয়ে থাকে, এ-অঞ্চলে কারুকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সন্দেহ করে যে, সে বুঝি সন্ধান পেয়ে রত্নগুহা খালি করতে এসেছে! ওই লামারা অত্যন্ত হিংস্র, কারুর উপরে সন্দেহ করলেই তাকে হত্যা করতে ইতস্তত করে না! দ্বিতীয়ত, এখানে অত্যন্ত ডাকাতের উপদ্রব, বিদেশি পথিক দেখলে সর্বদাই আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

তবু আমি ওখানেই যাচ্ছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস আছে যে, লামাদের চোখে আমি ধুলো দিতে পারব! আর ভূত-প্রেত আমি মানি না। আমার মতে, ওই প্রেতাত্মাদের কথা রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। খুব সম্ভব, এই ভূতের ভয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু লোভী লোকদের তফাতে রাখবার জন্যে! আর ডাকাতের ভয়? বুদ্ধি থাকলে তাদের চোখেও ধুলো দেওয়া অসম্ভব নয়।

আমি যদি অকৃতকার্য হই, তাহলে তুমি বা তোমার বংশধর আমার পরে এই পথে আসতে পারো—অবশ্য সাহস ও যোগ্যতা থাকলে। ইতি

আশীর্বাদক তোমার পিতা।'

পত্রপাঠ শেষ হলে পর তিনজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সর্বপ্রথমে মুখ খুলে দিলীপ অভিভূত স্বরে বললে, 'এতক্ষণে সব বোঝা গেল! ভৈরব এই জন্যেই কলম চুরি করতে চায়! গুপ্তধন!'

কুমার বললে, 'কিন্তু আসল কলমটা না পেলেও ভৈরব ম্যাপখানা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে! সে ম্যাপের অভাবে আপনার পক্ষে গুপ্তধন থাকা আর না থাকা দুইই এক কথা!'

দিলীপ বললে, 'কিন্তু জায়গাটির সন্ধান যখন পেয়েছি তখন আমরা সবাই মিলে খুঁজলে আবার কি গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারব না?'

কুমার হেসে বললে, 'কাজটা যদি এতই সোজা হত, তাহলে গুপ্তধন আজ আর সেখানে থাকত না—কেউ না কেউ তা খুঁজে বার করতই! তাকে ও-ভাবে খুঁজে বার করা অসম্ভব বলেই ম্যাপের দরকার হয়েছে। সে ম্যাপ যখন নেই, গুপ্তধন পাবার আশা তখন আর না করাই উচিত!'

বিমল ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, 'কুমার, বোধ করি অতটা হতাশ হবার দরকার নেই। ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়েছে এইরকম : গুপ্তধন কোন দেশে আছে আমরা তা জানি, কিন্তু ঠিক ঠিকানাটি আমাদের জানা নেই। ভৈরবের কাছে ম্যাপ আছে, কিন্তু কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, সেটা তার জানা নেই। একজন দরজার সামনে যেতে পারে, কিন্তু চাবির অভাবে দরজা খুলতে পারবে না। আর একজনের কাছে চাবি আছে, কিন্তু সে-চাবিতে কোন দরজা খুলতে হবে সেটা তার অজানা। বুঝতেই পারছ, দুই পক্ষেরই সমান অসুবিধা!'

কুমার বললে, 'কাজেই ও-ব্যাপার নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ভালো!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এখন দুই পক্ষে যদি একটা বোঝাপড়া হয়?'

কুমার বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'ওই দুরাত্মা ভৈরবের সঙ্গে? মাপ করো ভাই, আমি ওর মধ্যে নেই!'

বিমল বললে, 'তুমি বোধহয় ভৈরবের শয়তানি এখনও ভালো করে আন্দাজ করতে পারোনি! তারিণীবাবু যে শত্রুর জন্যে বিপদের ভয় করেছিলেন, কে সে? তিনি তাকে বাংলা দেশের লোকও বলেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ওই ভৈরব ছাড়া আর কেউ নয়! তাঁরও মৃত্যুর কারণ ওই ভৈরবই!'

দিলীপ মহাক্রোধে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উঠে দাঁড়াল এবং তীব্র স্বরে বললে, 'আমি আমার

পিতৃহন্তার সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করতে রাজি নই! আমি গুপ্তধন চাই না—কেবল তাকে আর একবার দেখোতে চাই! তাকে খুন করে আমি ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত!'

কুমার বললে, 'ওই ভৈরবকে পেলে আমিও কিছু শিক্ষা দিতে চাই! তার সঙ্গে বোঝাপড়া অসম্ভব!'

বিমল ধীর স্বরে বললে, 'কুমার, আমি কীরকম বোঝাপড়ার কথা বলছি আগে সেইটেই ভালো করে শোনো! আমি বন্ধুভাবে বোঝাপড়ার কথা বলছি না! আমার সন্দেহ হচ্ছে, দিলীপবাবুর উপরে ভৈরব তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলেনি। কারণ তারও সন্দেহ হয়েছে যে, গুপ্তধন কোন দেশে আছে দিলীপবাবু সে কথা জানেন। সুতরাং দিলীপবাবু এখন যদি হঠাৎ প্রকাশ্যেই হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেন, তাহলে ভৈরবও তাঁর পিছু না নিয়ে পারবে না!'

কুমার বললে, 'তারপর?'

—তারপর আমরা আপাতত যখন অলস হয়ে বসে আছি তখন দিলীপবাবুর সঙ্গী হলে নিতান্ত মন্দ হবে কি? তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা! হয়তো ভৈরবকে কোনও ফাঁদে ফেলে আবার সেই ম্যাপখানা কেড়ে নেবারও সুযোগ পাওয়া যাবে!'

কুমার মস্ত এক লাফ মেরে বলে উঠল, 'সাধু, সাধু, চমৎকার ফন্দি! বিমল, তুমি একটি জিনিয়াস!'

বিমল বললে, 'কিন্তু অত বিপদ-আপদের মধ্যে দিলীপবাবু যেতে রাজি হবেন কি?'

দিলীপ মহা-উৎসাহে বললে, 'রাজি হব কী, রাজি হয়েছি! এক—গুপ্তধনের লোভ; দুই—নরপিশাচ ভৈরবকে আর একবার দেখবার লোভ; তিন—আপনাদের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের বন্ধুরূপে পাবার লোভ! এই তিন-তিনটে লোভ সামলানো কি বড়ো সহজ কথা! কবে যাবেন বলুন—আমি প্রস্তুত!'

বিমল চিৎকার করে বললে, 'রামহরি, রামহরি!'

রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, 'অত চ্যাঁচানো হচ্ছে কেন, আমি কি কালা?'

—'রামহরি, মোটঘাট বাঁধতে শুরু করো—আমরা গুপ্তধন আনতে যাব!'

রামহরি চমকে উঠে বললে, 'কী! আবার গুপ্তধন? তোমাদের সঙ্গে এবারে আমি নেই জেনো!'

—'রামহরি, অনেকগুলো ভূত নাকি সেই গুপ্তধনের ওপরে পাহারা দেয়!'

রামহরি শিউরে উঠে বললে, 'কী! আবার ভূত? তোমাদের সঙ্গে এবারে আমি নেই জেনো!'

কিন্তু হপ্তাখানেক পরে বিমল, কুমার ও দিলীপ যেদিন হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলে সেদিন দেখা গেল, তাদের পিছনে পিছনে চলেছে বেজায় বিরক্তমুখে শ্রীরামহরি এবং সর্বশেষে যাচ্ছে বেজায় খুশিভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাংলার কুকুর বাঘা!

(রত্নগুহার সন্ধানে যাত্রা করে যে-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল দিলীপের ডায়েরি থেকে এখানে

তা উদ্ধার করে দেওয়া হল। অর্থাৎ অতঃপর দিলীপই প্রধান বক্তা হয়ে নিজের ভাষায় সমস্ত বর্ণনা করবে।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিলীপের ডায়েরি শুরু হল

কলকাতা থেকে বেরিলি, বেরিলি থেকে আলমোড়া, আলমোড়া থেকে আসকোট। আমরা এখন একেবারে হিমালয়ের বুকের ভিতরে, সমতল ক্ষেত্র থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উপরে উঠেছি!

পাহাড়ের পিছন থেকে চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্ত দেখছি, গিরি-নির্ঝরিণীর গান-ভরা নাচ দেখছি, পাইন গাছের নতুন বাহার দেখছি।

কিন্তু বাংলা দেশে যে জন্মেছে, কিংবা বাংলা দেশকে যে একবার ভালোবেসেছে, বাংলার বাইরেকার আর কোনও জায়গাই বোধহয় তার মনে ধরবে না! সেই ছয় ঋতুর বিচিত্র সমারোহ; সেই নানা ফুলের আতরমাখা বাতাস; সেই সিন্ধ সোনালি রোদের মিষ্ট পরশ; সেই কলাপাতার পতাকা ওড়ানো, তাল-নারিকেলের চামর ঢোলানো, অশথ-বটের ছায়া বিছানো কাচা-সবুজ স্বপ্ন দেখানো রঙিন বনভূমি, সেই শত নদীর তীরে তীরে দূর্বাশ্যামল সরস শয্যা, সেই পল্লিকুটিরে চারিদিক থেকে ভেসে আসা দোয়েল কোয়েল শ্যামা পাপিয়া ও বনকপোতের অশ্রান্ত সঙ্গীত-তরঙ্গ, এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে? চলেছি কোন নির্জন নিস্তব্ধ নীরস তৃষিত কঠিন পাষাণপুরে রত্নগুহার অন্বেষণে, কিন্তু বাংলা দেশের রসালো মাটিতে নিত্য যে সোনা ফলে, তার তুলনা কোথায়?

এইজন্যেই তো বাঙালি 'কুনো' নাম কিনেছে, সে তার সুখময় শোভাময় আনন্দময় গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয় এবং এইজন্যেই তো যে-বিদেশি একবার বাংলার স্বাদ পায়, সে আর বাংলাকে ভুলে স্বদেশে ফিরতে রাজি হয় না। কুয়াশার দেশ থেকে ছুটে আসে ইংরেজরা, মরু-বালুর দেশ থেকে ছুটে আসে মারোয়াড়িরা, পাথরের দেশ থেকে ছুটে আসে কাবুলি আর নেপালিরা! বাংলার সোনা লুটছে যত বিদেশি এ-অঞ্চলের পাজামা পরা স্নান-ভীত নোংরা লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ হয় না এবং নাছোড়বান্দা মশা-মাছি-পিশুর উৎকট বন্ধুত্বও ভালো লাগে না। এখানকার ডাল আর চালের সঙ্গে কাঁকরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, মুখে দিলে মনে হয় একটা দাঁতও নিয়ে আর দেশে ফিরতে পারব না! এখানে দিনে রোদ আর শুকনো হাওয়া গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয় এবং রাতের ঠান্ডা দেয় বুকের রক্ত কনকনিয়ে জমিয়ে!

কিন্তু এতদূর এসেও আমার মনে একটুও শান্তি নেই! বাংলা দেশের সবুজ বুক ছেড়ে যারা এই শুকনো পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথে হোঁচট খেতে আসে, তারা হচ্ছে মানস সরোবরের

তীর্থযাত্রী, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনওই সহানুভূতি নেই—পরকালের ভাবনা ভাববার বয়স আমাদের হয়নি! আপাতত আমরা কোনও দেবতা দর্শন করতে চাই না—আমাদের ধ্যানধারণা চায় এখন এক দানবকে! যার আশায় এতদূর আসা—সেই ভৈরব কোথায়?

ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে পাঞ্জাবি, মারোয়াড়ি, গুজরাটি, মারাঠি, মাদ্রাজি—নানা জাতের তীর্থযাত্রী আমাদের আশপাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, দু-একজন বাঙালিকেও দেখলুম, কিন্তু তাদের দলে ভৈরবকে আবিষ্কার করতে পারলুম না।

তাহলে কি আমাদের অনুমান একেবারেই মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল? ভৈরব কি জানতে পারেনি যে, রত্নগুহার সন্ধানে আমরা এই পথে এসেছি? কিংবা জানতে পেরেও আমাদের পিছু নেওয়া দরকার মনে করেনি?

ইতিমধ্যে বিমল ও কুমারের সঙ্গে আমার এমন বন্ধুত্ব হয়েছে যে, আমরা কেউ কারুকে আর 'বাবু' বা 'আপনি' বলে ডাকি না। বিমল ও কুমার চমৎকার লোক! এই দুটি দুঃসাহসী লোক বার বার কল্পনাতীত বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে এবং মৃত্যুর সঙ্গে বারংবার যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশ-বিদেশে এমন অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে কিন্তু তবু তাদের হাবভাবে ব্যবহারে এতটুকু গর্ব প্রকাশ পায় না!

আসকোট পাহাড়ের শিখরে আছে একটি কালীমন্দির এবং তার পদতলে এসে মিশেছে কালী ও গৌরী নামে দুটি নদী। এই নদী-সঙ্গমে আমাদের তাঁবু খাটানো হল—আজকের ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাতটা আমরা এইখানেই পুইয়ে যাব।

আমরা একটা বড়ো ও একটা ছোটো তাঁবু এনেছিলুম। ছোটো তাঁবুতে রামহরি থাকত ও রান্নাবান্না করত এবং বড়ো তাঁবুতে বাঘাকে নিয়ে আমরা তিনজনে বাস করতুম।

এই আসকোটে অমাবস্যার রাতে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। একে সারাদিন পাহাড়ে-পথ হাঁটা, তায় রাত্রে কনকনে পাহাড়ে-ঠান্ডা! ঘুম আসতে দেরি হল না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, আচম্বিতে বাঘার ভীষণ গর্জনে জেগে উঠলুম এবং সেই-সঙ্গে শুনলুম বিষম এক ঝটাপটির শব্দ!

প্রথমে অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ল না। একবার ভাবলুম, তাঁবুর ভিতরে বাঘ কি ভাল্লুক ঢুকেছে! উঠে পড়ে ভয়ে সিঁটিয়ে বিছানার এক কোণে সরে গিয়ে বসলুম,—কিন্তু তারপরেই শুনলুম কে আর্তস্বরে বলে উঠল—'উঃ!' তারপরেই ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ এবং শব্দটা যেন তাঁবুর ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল! বুঝলুম তাঁবুর মধ্যে কোনও জন্তু আসেনি, এসেছে মানুষই! কিন্তু কে সে? চোর?

ইতিমধ্যে বিমল ও কুমারও জেগে উঠে তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে ফেললে।

কিন্তু তাঁবুর ভিতরে আর কেউ নেই। কেবল বাঘা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লাফালাফি করে শিকল প্রায় ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করছে!

বিমল একবার বাইরে গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, 'বাইরে তো কারুকে দেখতে পেলুম না! বাঘা, তোর হল কী?'

বাঘা সমানে চ্যাঁচাতে ও লাফাতে লাগল!

কুমার লণ্ঠন জ্বেলে বাঘার কাছে গিয়ে তাকে ভালো করে দেখে বললে, 'বিমল, তাঁবুর ভিতরে নিশ্চয় কেউ এসেছিল! এই দ্যাখো, বাঘার মুখে রক্তের দাগ! যে এসেছিল, সে বাঘার কামড় খেয়ে চম্পট দিয়েছে! বাঘা যদি বাঁধা না থাকত, তাহলে সে আজ পালিয়েও বাঁচতে পারত না!'

তাঁবুর দরজার কাপড়ে বিমল আর একটা নতুন আবিষ্কার করলে। একখানা রক্তাক্ত হাতের স্পষ্ট ছাপ!

বিমল বললে, 'দ্যাখো দিলীপ, যে এসেছিল তার হাতে আঙুল আছে ছয়টা!'

আমি হতভম্বের মতো বললুম, 'ভৈরবেরও ডান হাতে যে ছয়টা আঙুল দেখেছি!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'তাহলে ভৈরবই আজ আমাদের আদর করতে এসেছিল! কিন্তু এখানে যে বাঘার মতন সজাগ প্রহরী আছে, অতটা সে খেয়ালে আনেনি! ওরে বাঘা, ভৈরবের মাংস খেতে কেমন রে? খানিকটা কামড়ে তুলে নিতে পেরেছিস কী?'

বাঘা তার পলাতক শত্রুর উদ্দেশে ক্রমাগত ধমক দিতে লাগল।

কুমার বললে, 'বাঘা বোধহয় ভৈরবকে ভীরু কাপুরুষ বলে গালাগাল দিচ্ছে!'

বিমল আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'আঃ, বাঁচলুম! তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়! ভৈরব লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে। নিশ্চয় সে কোনও ছদ্মবেশ পরেছে! কিন্তু সে তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল কেন? সে একা, না দল বেঁধে এসেছে?'... মিনিট-দুয়েক পরেই বিচিত্র সুরে তার নাক ডেকে উঠল! অদ্ভুত মানুষ! বিপদ তার কাছে এত সহজ যে, ঘুম আসতে একটুও বিলম্ব হয় না!

অল্পক্ষণ পরে কুমারও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কিন্তু প্রায় শেষরাত পর্যন্ত জেগে রইলুম। তন্দ্রা আসে, আর ভেঙে যায়। খালি মনে হয়, কারা যেন ধারালো ছুরি নিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে আমার গলা কাটতে আসছে।

সকালে উঠে দেখি, তাঁবুর ভিতরে বিমল ও কুমার নেই।

পাশের তাঁবুতে গিয়ে দেখলুম, রামহরি মাংস রান্না করছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁ রামহরি, তোমার বাবুরা কোথায়?'

রামহরি বললে, 'কোথায় যাচ্ছে, তারা কি বলে যাবার ছেলে? ফরসা হবার আগেই দুই স্যাঙাতে বেরিয়ে গেল, কোথায় যাচ্চো শুধোতে দুজনেই মুখ টিপে একটুখানি হাসলে, আর কিছু বললে না!'

—'তাই তো রামহরি, এখনই পাহাড়ে-রোদে চারিদিক যেন ফেটে যাচ্ছে, তাহলে আজ আর দেখছি তাঁবু তুলে বেরুনো হবে না!'

ঘণ্টা-তিনেক বাইরে কোথায় কাটিয়ে বিমল ও কুমার ফিরে এল।

আমি বললুম, 'তোমরা কোথায় ছিলে? আজ কি এখানেই থাকা হবে?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, আজ এখানেই বিশ্রাম। এই যে, রামহরির রান্নায় যে খাসা খোসবায় বেরুচ্ছে! আজ কী হচ্ছে, কারি না কোর্মা?'

রামহরি বললে, 'স্টু।'

—'স্টু? আরে কেয়াবাত! তার সঙ্গে?'

—'জয়পুরি ঘিয়ে-ভাজা রুটি আর আলুর লপসি।'

—'রামহরি, তোমার মতন মূর্তিমান রত্ন সঙ্গে থাকতে আমাদের আর রত্নগুহা খুঁজতে যাওয়া কেন?'

রামহরি বললে, 'জানো সব, কিন্তু বোঝো কই? তোমরা যে জ্ঞানপাপী—রত্নগুহার ভূতকে কোনওদিন ঘাড় থেকে নামতে দেবে না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে সে কথা তো বললে না?'

কুমার বললে, 'কালকের রাতের অতিথিকে খুঁজছিলুম।'

আমি সাগ্রহে বললুম, 'তার কোনও খোঁজ পেলে নাকি?'

বিমল বললে, 'কে জানে! তবে ডাকঘরের কাছে দেখলুম আট-দশজন মারোয়াড়ি জটলা করছে। তারা আমাদের দেখেই চলে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেজায় ষণ্ডা—যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। তার বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা আর ডান হাতে ছটা আঙুল। তার মুখে ছেলেমানুষি হাসি, কিন্তু চোখদুটো যেন আগুনের মতো জ্বলছে!'

আমি বলে উঠলুম, 'নিশ্চয়ই সে ভৈরব বিশ্বাস! তার বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কারণ বাঘা তাকে কামড়েছে। লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখে শিশুর হাসি, জ্বলজ্বলে চোখ আর ডান হাতে ছটা আঙুল! এ সেই শয়তান না হয়ে যায় না, এখানে এসে মারোয়াড়ি সেজেছে!'

বিমল শুধু বললে, 'অসম্ভব নয়।'

দুপুরে রামহরির হাতের অমৃতের মতো রান্না খেয়ে বেশ একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা দেওয়া গেল। বৈকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, রামহরি চায়ের পিয়ালা আর ওমলেটের ডিশ নিয়ে হাসতে হাসতে আসছে! সেগুলি সদ্ব্যবহারের পর দু-চারটে গল্প করতে করতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল—এই পাহাড়ে-দেশে সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর সঙ্গে দেখা করতে আসে!

বিমল বললে, 'দিলীপ, একটা কাজ করতে পারবে?'

—'কী কাজ?'

—'কাল আমরা বেরুব। তুমি একবার ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে পারবে, পথে কোনও ডাকবাংলো আছে কি না?'

—'তা পারব, কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেল যে?'

—'বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে অন্ধকারের কোনও ভয় নেই। পেট্রলের বড়ো লণ্ঠনটা নিয়ে যাও।'

লণ্ঠনটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকার আকাশ, আবছায়ার মতো পাহাড় এবং মাঝে মাঝে অস্পষ্ট বাড়ি, ঘর ও গাছপালা দেখতে দেখতে আমি ডাকঘরের দিকে যাত্রা করলুম। দূর থেকে দু-একটা গোরু, কুকুরের ডাক বা ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কোনও কোনও

বাড়ির ভিতর থেকে গৃহস্থালির নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পথে জনপ্রাণী নেই।

ফেরবার সময়ে কারুর আর কোনও সাড়া পেলুম না—নিশুত রাতের আগেই এ-সব দেশ যেন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চতুর্দিককে মনে হয় জীবনহীনতার রাজ্য! সে-সময়ে পথেঘাটে দু-চারটে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাও থাকে।

সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম। যেখান দিয়ে যাই, লণ্ঠনের তীব্র আলোকে অন্ধকার যেন সভয়ে পিছিয়ে যায়।

হঠাৎ চোখে পড়ল, পাহাড়ের একটি পাথরে-বাঁধানো ঝরনার কাছে তিনজন লোক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও একটু এগিয়ে দেখলুম, লোকগুলোর পোশাক মারোয়াড়ির মতো।

আমাকে দেখে তারাও এগিয়ে আসতে লাগল।

আমার বুকের কাছটা কেমন গুড়-গুড় করে উঠল। তাদের দিকে না তাকিয়েই আমি হন-হন করে এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কে বললে, 'শোনো দিলীপ, দাঁড়াও!'

আমি সবিস্ময়ে ফিরে দেখলুম, মারোয়াড়ির পোশাক পরে ভৈরব বিশ্বাস একেবারে আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!

আমি বললুম, 'ভৈরববাবু? আপনি এখানে কেন? আর, এ কী বেশ!'

ভৈরব হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'তাহলে আমার মুখ এখনও তুমি ভোলোনি? কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

—'আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।'

—'বেড়াতে এসেছ! এইটেই বেড়াতে আসবার দেশ বটে! কোন কোন দেশে তোমরা বেড়াতে যাবে?'

ভৈরবের এই প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম। সে জানতে চায়, কোন দেশে যাবার জন্যে আমরা যাত্রা করেছি। সেটা না জানতে পারলে তার চুরি-করা ম্যাপ কোনও কাজেই লাগবে না!

তার আশায় ছাই দেবার জন্যে আমি বললুম, 'আমরা আসকোট থেকে কালী নদী পার হয়ে নেপালে বেড়াতে যাব।'

—'নেপালে!'—বলেই সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'নেপালের কোথায় তোমরা যাবে?'

—'কাটমাণ্ডুতে।'

—'কাটমাণ্ডুতে? মিথ্যাকথা! বাংলা দেশ থেকে কাটমাণ্ডুতে যেতে হলে কেউ এ পথ দিয়ে যায় না!'

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, 'আমার কথা যখন বিশ্বাস করবেন না, তখন আপনার সঙ্গে আমিও আর কথা কইতে চাই না!'

আমি দু পা অগ্রসর হলুম।

তৎক্ষণাৎ ভৈরবের সঙ্গী দুজন দুই লাফে আমার সামনে গিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়াল।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, 'ভৈরববাবু, এর অর্থ কী?'

ভৈরব এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে আমার কোটের কলার চেপে ধরলে। তারপর আমাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'দিলীপ, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না! দেখছ, রাত কী অন্ধকার, আর পথ কী নির্জন? এই বিদেশের পথে কাল সকালে যদি কোনও বাঙালির মৃতদেহ পড়ে থাকে, তাহলে কেউ তাকে চিনতে পারবে না!'

সামনের অন্ধকারেরও চেয়ে গাঢ় আর একটা অন্ধকার আমার চোখের উপরে ঘনিয়ে এল। এরা কি আমাকে খুন করতে চায়?

কিন্তু মুখে যতটা সম্ভব সাহস দেখিয়ে আমি বললুম, 'ভৈরববাবু, আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না।'

ভৈরব আমাকে আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'এখন শোনো! অচেনা বিদেশ, রাত অন্ধকার আর পথ নির্জন। দ্যাখো, আমার হাতে এটা কী?'

আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখলুম, সে গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে ফস করে প্রকাণ্ড একখানা চকচকে ছোরা বার করে ফেললে!

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, 'আপনি কী জানতে চান?'

—'সত্যি করে বলো, তুমি কোন দেশে যাবে?'

কী করব? বলব, কি বলব না? কোথায় কোন অতলে গুপ্তধন লুকানো আছে কিংবা নেই, তার লোভে নিজের প্রাণ নষ্ট করব?

ভৈরব দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করে বললে, 'চুপ করে রইলে যে বড়ো? বলো, তুমি কোথায় যাবে?'

হঠাৎ কাছ থেকেই পরিচিত স্বরে শুনলুম, 'ভৈরববাবু, দিলীপ যদি না বলে তাহলে আমি বলতে পারি—আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

বিদ্যুৎবেগে ফিরে দেখি, পাশের একটা পাথরের আড়াল থেকে বিমল ও কুমার বেরিয়ে আসছে, তাদের দুজনেরই হাতে রিভলভার!

যে দুটো লোক আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিল তারা তিরের মতো ছুটে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল এবং ভৈরবও পালাবার উপক্রম করলে!

কিন্তু কুমার খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরলে!

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'দেখছেন ভৈরববাবু, রাত খুব অন্ধকার হলেও পথ খুব নির্জন নয়?'

কুমারের হাত থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ভৈরব বললে, 'কে তোমরা?'

বিমল অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললে, 'ভৈরববাবু, স্থির হোন। বেশি ছটফট করলে আমরাও রিভলভার ছুড়তে ইতস্তত করব না! আপনি তো নিজেই বলেছেন, এই বিদেশের পথে কোনও বাঙালির মৃতদেহ পড়ে থাকলে কাল সকালে কেউ তাকে চিনতে পারবে না!'

ভৈরব তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে বললে, 'তোমরা কী চাও?'

—'মাত্র একখানা ম্যাপ।'

—'ম্যাপ? কীসের ম্যাপ?'

—'কীসের ম্যাপ তা তুমিও জানো, আমরাও জানি। যে ম্যাপখানা তুমি দিলীপের বাড়ি থেকে চুরি করেছিলে, আমরা সেইখানাই চাই।'

—'ম্যাপ-ট্যাপ আমি কিছু জানি না। আমার হাত ছাড়ো, নইলে আমি চিৎকার করে লোক ডাকব।'

—'তুমি চিৎকার করলে এখানে খালি প্রতিধ্বনিই উত্তর দেবে। কিন্তু তার আগেই আমি তোমাকে গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলব।'

—'আমার কাছে কোনও ম্যাপ নেই।'

—'তোমার কাছেই ম্যাপ আছে। অমন মূল্যবান জিনিস তুমি যে কাছছাড়া করেছ, কি অন্য কারুর কাছে রেখেছ, এ কথা আমি আমি বিশ্বাস করি না। নির্বোধ! এখনও কি বুঝতে পারছ না যে, তোমাকে ধরবার জন্যেই আজ আমরা ফাঁদ পেতেছি? আমরা জানি, তুমি আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছ? আমরা জানি, রাত্রে নির্জন পথে দিলীপকে একলা পেলেই তোমরা ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে আমাদের গন্তব্য স্থানের কথা জানবার চেষ্টা করবে! আমরা জানি, গুপ্তধনের ঠিকানা পাওনি বলে তোমার আপশোশের সীমা নেই! মূর্খের মতো ফাঁদে যখন পা দিয়েছ, তখন ম্যাপখানা ফিরিয়ে না দিলে আর তোমার মুক্তি নেই!'

ভৈরব তার ছেলেমানুষি হাসি হেসে বললে, 'ম্যাপের কথা আমি কিছুই জানি না।'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'কুমার, তুমি ভৈরবের হাত দুখানা ওর গায়ের কাপড় দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যালো তো! ও যদি পালাবার চেষ্টা করে আমি তাহলে এখনই গুলি করে ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!'

বিমল রিভলভার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কুমার আর আমি ভৈরবকে খুব কষে বেঁধে ফেললুম—দারুণ ক্রোধে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ফুলে উঠল, কিন্তু সে কোনও বাধা দিলে না।

বিমল বললে, 'এইবারে ওর জামাকাপড় ভালো করে খুঁজে দ্যাখো। ম্যাপ নিশ্চয়ই ওর কাছে আছে।'

প্রথমে তার কোটের পকেট, তারপর ফ্লানেলের শার্ট, তারপর ভিতরকার মেরজাই খুঁজে পাওয়া গেল একটা মানিব্যাগ। সেই মানিব্যাগের মধ্যে পেলুম আমাদের হারামণি—অর্থাৎ রত্নগুহার সেই হাতে-আঁকা ম্যাপখানা!

বিমল বললে, 'ভৈরব, তুমি যে বেচারা কিষণ সিংকে খুন করেছ, তাও আমরা জানি। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নেই বলে তোমাকে আমরা পুলিশের হাতে সঁপে দিতে পারলুম না। তুমি মহাপাপিষ্ঠ, যাও—আমাদের সুমুখ থেকে দূর হও!'

সেই হাতবাঁধা অবস্থায় ভৈরব ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফেরবার মুখে আমি বললুম, 'বিমল, শিকারিরা যেমন গোরু-ছাগলের লোভ দেখিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলে, তোমরা আমাকে ঠিক সেই ভাবেই আজ ব্যবহার করেছ!'

বিমল উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক সেই ভাবেই!'

আমি আহত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু অনেক সময়ে বাঘ সেই গোরু-ছাগলকে বধ করে, সেটাও জানো তো?'

বিমল হেসে বললে, 'অভিমান কোরো না বন্ধু, অভিমান কোরো না! যদিও তুমি আমাদের দেখতে পাওনি, তবু এটা জেনো যে, আমাদের দৃষ্টি বরাবরই তোমার উপরে ছিল!'

—'কিন্তু আগে থাকতে এই কৌশলের কথা আমাকে জানালে কি ক্ষতি হত?'

—'এ-সব বিপদে-আপদে তুমি এখনও আমাদের মতো অভ্যস্ত হওনি। হয়তো তুমি ভয় পেতে।'

কুমার বলে উঠল, 'আরে, কেল্লা যখন এত সহজে ফতে হয়েছে, তখন এত কথা-কাটাকাটি আর মান-অভিমান কেন? এখন আনন্দ করো ভাই, আনন্দ করো! গুপ্তধনের ঠিকানা আমরা জানি, হারা ম্যাপ আবার ফিরে এসেছে, দুরাত্মার দুরাশায় ছাই পড়েছে,—এখন কেবল আনন্দ করো!'

বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু বিনামেঘের বজ্র হয়তো এখন আমাদের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিনামেঘের বজ্র

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, আমাদের জন্যে সামনে খাবার সাজিয়ে রামহরি বসে বসে ঢুলছে এবং তার পাশে বসে আছে বাঘা, ঘুমের ঘোরে তারও দুই চক্ষু মুদ্রিত।

বিমল চিৎকার করে বললে, 'ওঠো রামহরি, কুলিদের ডাকো! মালপত্তর বাঁধতে থাকো, ততক্ষণে আমরা চটপট খেয়ে নি।'

রামহরি মুখ ব্যাজার করে বললে, 'কেন, এত তাড়াতাড়ি কীসের শুনি?'

—'আমরা এখনই যাত্রা করব!'

—'এই অন্ধকার রাতে?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই অন্ধকার রাতে! সবাই একটা করে পেট্রলের লণ্ঠন নাও, কলিকালের বিজ্ঞান অন্ধকারকে জয় করেছে, তা কি তুমি জানো না রামহরি? ওঠো ওঠো, রামহরি! আমাদের পিছনে শত্রু!'

শত্রুর নাম শুনেই রামহরির সমস্ত জড়তার ভাব কেটে গেল,—সে তখনই উঠে মালপত্তরের ব্যবস্থা করতে ছুটল।

প্রবল বিক্রমে খাবারের থালা আক্রমণ করে বিমল বললে, 'এসো কুমার, এসো দিলীপ, আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করো! ভৈরবের শিবিরে এতক্ষণে হয়তো পরামর্শ-সভা বসেছে। শত্রুকে

পরাজিত করবার প্রধান উপায় কী জানো? তারা যা ভাবেনি, তাই করা! আজ রাত্রেই আমরা যে আসকোট ছেড়ে লম্বা দেব, এটা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তারা এখন কালকের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু কাল আমরা অনেক দূরে থাকব। তারপর আমাদের নাগাল ধরা তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এখন আমাদের চাই খালি স্পিড—স্পিড—গতি! আমরা যত গতি বাড়াতে পারব, শত্রুরা তত পিছনে পড়ে থাকবে! স্পিড-স্পিড, আধুনিক সভ্যতার প্রাণ! এই স্পিডের লোভেই একালের মানুষ রেলগাড়ি, ইস্টিমার, উড়োজাহাজ, মোটর সৃষ্টি করেছে! এই স্পিডের জোরেই জীবনের যাত্রাপথে ইউরোপ আজ অগ্রসর, আর তার অভাবেই গোরুর গাড়িতে চড়ে ভারতবর্ষ আজও সেকালের গর্ভের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি!'

আমরা আবার উপরে উঠছি আর উঠছি আর উঠছি! উতরাইয়ের পর চড়াই আর চড়াইয়ের পর উতরাই! যখন উতরাই দিয়ে নীচের দিকে নামছি, তখনও নামছি আরও বেশি উপরে ওঠবারই জন্যে! রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে রাত আসে,—কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বগতির বিরাম নেই!

তবু বিমল বার বার বলছে, 'স্পিড—আরও স্পিড! দ্রুতগতিতেই এখন আমাদের শত্রুদের হারাতে হবে—দ্রুতগতির মহিমাতেই নেপোলিয়ন শত্রুদের হারিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন! স্পিড—আরও স্পিড!'

কুমার বললে, 'নেপোলিয়ন আল্পস পর্বত পার হয়েছিলেন, ভৈরবকে হারাবার জন্যে যদি দরকার হয় আমরাও হিমালয় পর্বত পার হব!'

গাঢ়-নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি! আকাশের নীলিমা যে এমন নির্মল হয়, বাংলা দেশে বসে কখনও তা কল্পনা করতে পারিনি! সেই পবিত্র নীলের তলায় হিমালয়ের শিখরের পর শিখরের ভিড়! চতুর্দিকে যেন শিখরের মহাসভা! উপত্যকার পর উপত্যকা এবং শত শত শিশু-শৈল,—তারা যেদিন মেঘ-ছোঁয়া মাথা তুলবে, সেদিন হয়তো সেকালের অতিকায় জীবজন্তুদের মতো একালের মানবজাতিও ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়ে অন্য কোনও উচ্চতর জীবের জন্যে স্থান ছেড়ে দেবে! এই পর্বত-বিশ্বের ভিতরে মাঝে মাঝে ভুটিয়া স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আর মনে হচ্ছে, মানুষ এখানে কী নিকৃষ্ট, অকিঞ্চিৎকর জীব! দেবতার এই বিরাট লীলা-জগতে মানুষের তুচ্ছ দেহ যেন মোটেই মানায় না!

কোথাও রক্ষক মানুষ ও কুকুরের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ে-রাস্তা দিয়ে ভেড়ার পর ভেড়ার পাল চলেছে, কোথাও পাহাড়ের বুকে সাজানো সিঁড়ির সারের মতো সবুজ শস্যক্ষেতে কপনি-পরা পুরুষ ও বুকে ন্যাকড়া-বাঁধা স্ত্রী-চাষিরা কাজ করছে, কোথাও শুকনো পাথরকে ভিজিয়ে ঝরনার লহর মিষ্ট নাচে-গানে মেতে নেমে আসছে!

নীচে বয়ে যাচ্ছে কালী নদী। উপর থেকে দেখা গেল, ছোটো-বড়ো কয়েকটি ঝরনার ধারার সঙ্গে কালী নদীর মিলন হয়ে এক অপূর্বসুন্দর আনন্দ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। চিরস্তব্ধ হিমালয়ের অসাড় প্রাণে চিরঝঙ্কৃত কলসঙ্গীতের সাড়া! যেন এইখানেই আর্য ঋষিরা প্রথম বেদগানের আভাস অনুভব করেছিলেন! এই পবিত্র সঙ্গমের সঙ্গীতে শহুরে মনের সমস্ত ধুলো-মাটি ধুয়ে-মুছে যায়!

এই এক পরম বিস্ময়! নদ-নদী সমতল পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে এবং নদীর নাম করলেই আমাদের মনে হয় মাটির পৃথিবীর কথা! অথচ নদী নরম মাটির সম্পদ হলেও, সমতল জগতে সে বিদেশিনী! তার জন্ম এই কঠিন, অসমোচ্চ, নিষ্করুণ, শুকনো পাথরের কোলে! যে-জল পাথর ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে পারে না, সেই জলই পাথর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে, মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। হিমালয় না থাকলে ভারত আজ জীবশূন্য মরুভূমি হয়ে যেত এবং সেইজন্যেই হয়তো কৃতজ্ঞ ভারতবাসী হিমালয়কে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে!

গারবেয়াং নামক স্থান থেকে কিছু এগিয়ে হঠাৎ এক বিপদ! একটা উঁচু জায়গা থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়ে রামহরি বিষম চোট খেলে। তার পক্ষে দু-চারদিনের মধ্যে আর পথ-চলা অসম্ভব।

বিমল হতাশ ভাবে বললে, 'আমাদের সমস্ত স্পিড ব্যর্থ হল—এখন এইখানেই বসে থাকতে হবে! রামহরি, তুমিই আমাদের বিপদে ফেললে দেখছি!'

রামহরি অত্যন্ত অপরাধীর মতো দুঃখিত স্বরে বললে, 'কী করব খোকাবাবু, আমি তো সাধ করে আছাড় খেয়ে তোমাদের বিপদে ফেলিনি! তোমরা বরং এক কাজ করো। আমাকে এখানে কোনও লোকের বাড়িতে রেখে তোমরা এগিয়ে যাও—আমার জন্যে কেন তোমরা সব পণ্ড করবে?'

কুমার বললে, 'সে হয় না রামহরি! যত বিপদই আসুক, আমাদের তোমার কাছেই থাকতে হবে!'

বিমল বললে, 'এখানে আর তাঁবু খাটিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাজ নেই। যতদিন না রামহরি সেরে ওঠে, ততদিন কারুর বাড়িতে অতিথি হয়ে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে।'

হিমালয়ের এ-অঞ্চলের লোক অতিথি-সৎকারের জন্যে বিখ্যাত! এখানে অনেক জায়গাতেই বাজার-হাটের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, পয়সা খরচ করেও সময়ে সময়ে জিনিস পাওয়া সম্ভব নয়, তাই মানস সরোবরের তীর্থযাত্রীরা গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করেই পথখরচের টাকা বাঁচাতে পারে। সুতরাং আমাদেরও আশ্রয়ের অভাব হল না।

দুদিন এখানেই কাটল—রামহরির আরও দিন-কয়েক বিশ্রাম দরকার।

তৃতীয় দিন বৈকালে বিমল বললে, 'শুনছি এখানে এক মস্ত উতরাই আছে, প্রায় দু-মাইল ধরে। চলো তো, আমরা তিনজনে সেই উতরাইটা একবার দেখে আসি, রামহরি সে পথে চলতে পারবে কি না, সেটা আগে জানা দরকার।'

আমরা এখন মালপা নামক স্থানের কাছে আছি। এখানে বনজঙ্গল শেষ হয়ে হিমালয়ের বৃক্ষশূন্য রুক্ষ ঊর্ধ্বস্তর আরম্ভ হয়েছে। আর্যসুলভ দীর্ঘ নাক, আয়ত চক্ষু ও সুগোল কপোলের দেশ ছেড়ে তিব্বতের খুব কাছে এসে পড়েছি। এ-জায়গাটায় তিনটি রাজ্যের মিলন হয়েছে—ভারত, নেপাল ও তিব্বত।

কালী নদীর ওপার থেকে দেখা যাচ্ছে নেপালের ঝাউ ও দেবদারু গাছের বন। আশে-পাশে পাখিদের গানের সভা বসেছে, দূরে দূরে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা ঝরছে—যেন চকচকে জলের ফিতা ঝুলছে! নির্জনতা এখানে যেন ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে।

তারপর সেই উতরাই দেখলুম—এটি এখানকার প্রসিদ্ধ উতরাই! পাহাড়ের ঢালু গা প্রায় সোজা হয়ে নীচে—নীচে—আরও কত নীচে যে নেমে গেছে তা জানি না, মানুষের পক্ষে এ-পথে দু-পায়ে খাড়া হয়ে নামা একেবারেই অসম্ভব, লাঠির সাহায্যে প্রায় বসে বসেই নামা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষলতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই—আছে কেবল ধসে পড়া ছোটো-বড়ো শৈলখণ্ড, একবার পা ফসকালেই দেহের সঙ্গে আত্মার সকল সম্পর্ক ঘুচে গিয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে!

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'রামহরিকে নিয়ে তিন-চারদিন পরেও হয়তো এ-পথ দিয়ে নামা চলবে না! স্পিড বাড়িয়ে এতটা এগিয়েও কোনও লাভ হল না, ভৈরব হয়তো শীঘ্রই আমাদের নাগাল ধরবে। অদৃষ্টের মার, উপায় কী?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিমান অদৃষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল—মনে করলে এখনও বুকের কাছটা ধক-ধক করে ওঠে!

সেই মূর্তিমান অদৃষ্ট আমাদের পিছন থেকে কঠিন কৌতুকের স্বরে বললে, 'এই যে বন্ধুর দল! নমস্কার!'

আমরা তিনজনেই চমকে ফিরে দাঁড়ালুম!

আমাদের কাছ থেকে চার-পাঁচ হাত তফাতে একদল লোক ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছে! সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে ভৈরব বিশ্বাস, তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ দুটো যেন আগুনের ফিনিক ছড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ ওষ্ঠাধরে ঝরছে শিশুর মতো সরল ও মিষ্ট হাসি! এবং তার হাতে রয়েছে একটা দোনলা বন্দুক।

ভয়ে-ভয়ে লক্ষ করলুম, তার সঙ্গীদেরও কারুর হাতে মোটা লাঠি, কারুর হাতে বর্শা, কারুর হাতে তরোয়াল, কারুর হাতে ছোরা!

আর, আমরা একেবারেই নিরস্ত্র!

শুনেছি বিমলের গায়ে অসুরের মতো শক্তি এবং কুমার ও আমিও দুর্বল নই। কিন্তু দশ-বারোজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে আমরা তিনজনে খালি হাতে কী করতে পারি?

পিছনে খাড়া উতরাই—পালাবারও পথ নেই!

বিমল কিন্তু একটুও দমল না। দু পা এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বললে, 'ভৈরববাবু যে! এত শীঘ্র আপনার চন্দ্রবদন দেখতে পাব বলে আশা করিনি।'

ভৈরব বললে, 'কিন্তু আমার মনে বরাবরই আশা ছিল যে, শীঘ্রই তোমাদের দেখতে পাব।'

বিমল বললে, 'আপনার আশা সফল হয়েছে, আপনি ভাগ্যবান। এখন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান, আমরা বাসায় ফিরব।'

ভৈরব একগাল হেসে দু-পাটি বড়ো বড়ো হলদে দাঁত বার করে বললে, 'এত ব্যস্ত কেন? এসো না, খানিকক্ষণ গল্প করি।'

—'আমাদের এখন গল্প করবার সময় নেই বলে বড়ো দুঃখিত হচ্ছি। পথ ছাড়লে বাধিত হব।'

—'কিন্তু গল্পে যখন তোমার আপত্তি, তখন দয়া করে আমার দুটো উপকার করে যাও।'

—'কী উপকার, আজ্ঞা করুন।'

—'তোমরা কোন দেশে যেতে চাও বলো, আর সেই ম্যাপখানা আমাকে দিয়ে যাও। তারপর তোমরা স্বর্গে বা নরকে যেখানেই যাও, আমি আর কোনও আপত্তি করব না।'

বিমল বললে, 'মাপ করবেন ভৈরববাবু, আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব না।'

—'পারবে না?'

—'না। প্রাণ গেলেও নয়।'

—'দিলীপ, তোমারও কি ওই মত?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। ও ম্যাপ আমার সম্পত্তি, আপনাকে দেব কেন?'

ঘুমন্ত বাঘ যেন জেগে উঠল! ভৈরব ভীষণ গর্জন করে বললে, 'মিথ্যা কথা! ও ম্যাপে তোমার কোনও অধিকার নেই। তোমার ঠাকুরদা আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করে ওই ম্যাপ চুরি করেছিল,—তুমি হত্যাকারীর বংশধর! আজ আমি ওই ম্যাপ আবার আদায় করে তোমাকেও প্রাণে মেরে প্রতিশোধ নেব। আমি দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার পিতৃহত্যাকারীর বংশ রাখব না! তোমার বাবাকে নরকে পাঠিয়েছি, আজ তোমার পালা!'

এই অদ্ভুত কথা শুনে আমি বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

বিমল ধীর স্বরে বললে, 'ভৈরববাবু, আপনার মতো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না।'

ভৈরব মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'ছোকরা, তোমার বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ম্যাপ চাই!'

—'ম্যাপ আপনি পাবেন না।'

—'এখনও ভেবে দ্যাখো! নইলে যে-শাস্তি আমি দেব, তোমরা তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'ভৈরববাবু, আমাদের আপনি চেনেন না, তাই শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন! আমরা হাসতে হাসতে মরতে পারি।'

—'মৃত্যু? সে তো খুব সহজ ব্যাপার! কিন্তু বেঁচে বেঁচে তোমরা কি কখনও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছ? ম্যাপ না পেলে আজ আমি তোমাদের সেই শিক্ষাই দেব!'

বিমলের মুখে হাসি তখনও মেলাল না। সে স্থির ভাবেই বললে, 'আমরা তিনজন, আপনারা দশ-বারো জন। আমরা নিরস্ত্র, আপনারা সশস্ত্র। কাজেই সমস্ত শাস্তি আজ আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে। কিন্তু প্রাণ থাকতে ম্যাপ আমরা দেব না।'

ভৈরব হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'বেশ, দেখা যাক! শ্যামা! সিধু! তোরা সবাই মিলে ওদের হাতগুলো দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যাল তো! তারপর ওদের জামাকাপড় হাতড়ে দেখ, ম্যাপখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!'

তারা পিছমোড়া করে আমাদের হাতগুলো বেঁধে ফেললে—আমরা কোনওই বাধা দিলুম

না।—অকারণে বাধা দিয়ে লাভ কী? তারপর আমাদের জামাকাপড় তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু ম্যাপ কোথাও পাওয়া গেল না!

বিমল যে ম্যাপখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, আমিও তা জানতুম না। সে-সময়ে আমার মন এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে, ম্যাপের সন্ধান জানলে সকলের প্রাণরক্ষার জন্যে আমি হয়তো বলে ফেলতুম!

ভৈরব গজরাতে গজরাতে বললে, 'হুঁ, ম্যাপখানা তাহলে দেবে না?'

বিমল বললে, 'না বন্ধু, না! খুঁজে পাও তো দ্যাখো না!'

ভৈরব বললে, 'ম্যাপখানা তাহলে কী করে আদায় করি, এইবারে সেইটেই দ্যাখো!... ওরে, ওদের প্রত্যেকের পাদুটো আলাদা আলাদা দড়িতে বেঁধে ফ্যাল তো!'

আমাদের ধাক্কা মেরে মাটিতে পেড়ে ফেলে, এক-একটা দড়িতে এক-একজনের পা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। আচ্ছন্নের মতন হয়েও ভাবতে লাগলুম, এই নরপিশাচ আমাদের নিয়ে কী করতে চায়?

ভৈরব আবার হুকুমজারি করলে, 'এইবারে একগাছা মোটা দড়িতে ওদের পায়ে-বাঁধা দড়ি-তিনগাছা শক্ত গেরো দিয়ে বাঁধ দেখি!'

তৎক্ষণাৎ তার আদেশ পালিত হল।

—'আচ্ছা, এখন পাহাড়ের ধার দিয়ে ওদের নামিয়ে দিয়ে মোটা দড়িগাছা উপরে কোথাও বেঁধে রাখ। অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাতে এ-পথে কোনও লোক আসবে না। সারা-রাত ওরা লাউ-কুমড়োর মতো শূন্যে ঝুলতে থাক!'

সেই ভয়ানক প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে দেরি হল না!

এখন আমরা শূন্যে দোদুল্যমান! নীচের দিকে তাকিয়েই শিউরে চোখ মুদে ফেললুম—দড়ি যদি ছিঁড়ে যায়, একেবারে দুইশো কি আড়াইশো ফুট তলায় গিয়ে পড়ে আমাদের দেহগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না!

উপর থেকে চেঁচিয়ে ভৈরব বললে, 'এখনও ম্যাপ কোথায় রেখেছ বলো!'

বিমল সহজ স্বরেই বললে, 'বন্ধু, বলব না!'

ভৈরব বললে, 'বেশ, তাহলে সারারাত দোল খাও। কাল সকালে আমি আর একবার আসব। তখনও যদি ম্যাপ না দাও তো, তোমাদের ওই-ভাবে ঝুলিয়ে রেখেই বিদায় হব!' তারপর হাহাহাহা করে একটা শয়তানি হাসির শব্দ, তারপর সব চুপচাপ!

নিম্নমুণ্ডে এমন করে শূন্যে ঝুলে আমরা কি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব? এখনই আমার দেহের রক্ত মুখে নেমে এসেছে এবং পা দুটো ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে!

দিনের আলো নিবে গেছে বটে, কিন্তু আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে—চারিদিকে আলো-আঁধারির লীলা। এবং দূর থেকে স্তব্ধতা ভেঙে একটা বাঘ ডেকে উঠল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাচের টুকরো

নরকের পাপীরা কী রকম যন্ত্রণাভোগ করে জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই তা আমাদের এখনকার যন্ত্রণার চেয়ে বেশি নয়। দেহের কষ্ট যে এত বেশি হতে পারে এটা ছিল আমার কল্পনাতীত।

নিচু দিকে মুখ করে ঝুলতে ঝুলতে আকাশের চাঁদ, পাহাড়ের ঝরনা, দূর সমতল ক্ষেত্রের আঁকাবাঁকা নদীর গলানো রুপোর রেখা সব স্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু সে-সমস্তই আজ যেন বিকৃত আকার ধারণ করেছে! মানুষ তো চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে, মন যখন অসহ্য কষ্টে ছটফট করে, বাইরের সুন্দর জগতে চোখ তখন ব্যর্থ!

মনের ও দেহের ভিতরে যা হচ্ছে, ভাষায় তা বর্ণনা করবার অসম্ভব চেষ্টা আর করব না। বাঘের ডাক শুনে মনে হচ্ছে, সে যদি এখন এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারত, তাহলে সুখময় মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমি এখনই আনন্দে হেসে উঠতুম! ভৈরব ঠিকই বলেছে, বেঁচে বেঁচে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা ভয়ানকই বটে!

আর্তস্বরে আমি বলে উঠলুম, 'বিমল, বিমল! কেন তুমি ম্যাপখানা দিলে না! আমরা যদি মরি, গুপ্তধন ভোগ করবে কে?'

বিমল প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'আজ ম্যাপ দিইনি, কাল সকালেও দেব না!'

আমি বললুম, 'বলো কী! তোমার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে না?'

বিমল হেসে উঠে বললে, 'কষ্ট হচ্ছে না! হচ্ছে বইকি! কিন্তু দেহের কষ্ট আমার মনকে অধীর করতে পারে না! জানো দিলীপ, ইউরোপে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকদের রাজত্বে কয়েদিদের অমানুষিক ভাবে শাস্তি দেবার জন্যে ভীষণ সব যন্ত্র ছিল। সে-সব যন্ত্র যে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিত, তার তুলনায় আমাদের যাতনা যথেষ্ট মোলায়েম। কোনও কোনও যন্ত্র মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে তার দেহের সমস্ত হাড় মড়মড়িয়ে ভেঙে দিত! কিন্তু তেমন যন্ত্রণাও মুখ বুজে সহ্য করে সেকালের অনেক বন্দি অপরাধ স্বীকার করেনি। বিশেষ আমরা যখন স্বেচ্ছায় এই যাতনা বরণ করে নিয়েছি, তখন কাতর হওয়া কাপুরুষতা মাত্র।'

—'তাহলে মরণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এই যাতনা সহ্য করতে চাও?'

—'সহ্য করতে চাই না, কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? কুমার, তোমার অবস্থা কেমন?'

কুমার কেমন জড়িত, অস্বাভাবিক স্বরে বললে, 'তোমারই মতন।'

—'কুমার, তোমার কি বড়ো বেশি কষ্ট হচ্ছে? তোমার কথা অমন অস্পষ্ট কেন?'

—'আমার মুখে একখানা ধারালো কাচের টুকরো আছে।'

—'কাচের টুকরো?'

—'হুঁ। ওরা যেখানে ফেলে আমার পা বাঁধছিল, সেইখানে পাথর-কুচির সঙ্গে এই ভাঙা কাচের ফালি পড়েছিল। আমি সকলের অগোচরে সেটা মুখে পুরে ফেলেছি!'

বিমল ঝুলতে ঝুলতে মহা আনন্দে একটা দোল খেয়ে বললে, 'কুমার, তুমি বাহাদুর! জয় কুমার বাহাদুরের জয়!'

তার আনন্দ-ধ্বনি আমার কানে এমন বেসুরো শোনাল! পাগলের মতো ভাঙা কাচের টুকরো মুখে পুরে এমন কী বাহাদুরের কাজ করেছে আমি তো কিছুতেই সেটা বুঝতে পারলুম না!

বিমল আবার সহর্ষে বলে উঠল, 'এতবড়ো আবিষ্কারের কথা এতক্ষণ তুমি আমাকে বলোনি!'

—'ভয়ে বলিনি। কী জানি শত্রুরা যদি কেউ উপরে লুকিয়ে থাকে।'

—'না, তারা আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গিয়েছে। জীবনে অনেকবার অনেক বিপদে পড়েছি, সে-সব হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ এই ভৈরব আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, ভেবেছিলুম আমাদের লীলাখেলা এইবারে বুঝি সত্যি-সত্যিই ফুরুল—মুক্তির আর কোনও উপায় নেই! কিন্তু ধন্য কুমার, ধন্য তোমার উপস্থিত বুদ্ধি! হয়তো আমাদের মুক্তির উপায় তোমার মুখেই আছে! একবার যদি হাত দুটো খোলা পাই! তুমি তো অনেক রকম 'বারে'র এক্সারসাইজ করেছ, দেহটা দুমড়ে মুখ তুলে কাচ দিয়ে আমার হাতের দড়ি কাটতে পারো কি না দ্যাখো না!'

এই অদ্ভুত লোক দুটির আশ্চর্য কথাবার্তা আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম! এরা বিপদকে ডরায় না, সাক্ষাৎ-মৃত্যু নিয়ে খেলা করে, শত কষ্টে অটল থাকে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও কখনও হারায় না। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারলুম না যে, কুমার কী করে বিমলের কথামতো অসাধ্যসাধন করবে!

আমরা তিনজনে প্রায় পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে ঝুলছিলুম। কুমার সেই অবস্থাতেই নিজের দেহের ঊর্ধ্বদিকটা দুমড়ে উঁচু হয়ে উঠল এবং বিমলও একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজের দেহটা ঘুরিয়ে কুমারের দিকে পিছন ফিরলে এবং তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুখানা যথাসম্ভব নামিয়ে কুমারের মুখ-বরাবর আনলে। কুমার তখন কাচের টুকরোটা দাঁতে চেপে ধরে বিমলের হাতের দড়ি কাটবার চেষ্টা করতে লাগল!

বিস্ময়ে, আগ্রহে ও কৌতূহলে নিজের অমন বিষম যন্ত্রণাও ভুলে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে চাঁদের আলোতে আমি তাদের কাণ্ড দেখতে লাগলুম।

একখণ্ড ভাঙা কাচ,—অকেজো বলে কবে কে এখানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে! শত্রুদের হস্তগত হয়ে আমি যখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে উঠেছিলুম, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কোনও কথাই ভাবতে পারিনি, কুমারের স্থিরবুদ্ধি তখনই বুঝে নিয়েছিল, এই কাচের ফালিই একটু পরে আমাদের কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে উঠবে! আজ এই মস্ত শিক্ষা পেলুম—আজ থেকে ধুলোকণাকেও অবহেলা করব না;—মস্তিষ্ক থাকলে, কাজে লাগাতে জানলে পৃথিবীতে কিছুই অকেজো নয়!

কিন্তু কুমারের কাজটা খুব সহজসাধ্য হল না। একে কুমার বদ্ধপদে শূন্যে ঝুলছে, তায় তার দেহের অমন অস্বাভাবিক দুমড়ানো অবস্থা, তার উপরে ভরসা কেবল দাঁত ও একখণ্ড ভাঙা

কাচ! মাঝে মাঝে আবার সোজা হয়ে ঝুলে পড়ে কুমার হাঁপ ছাড়ে, মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় বা অন্য কারণে বিমলের ঝুলন্ত দেহ ঘুরে যায়!

প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর বিমলের হাতের বাঁধন কাটা গেল।

বিমল নিম্নমুণ্ডে ঝুলতে ঝুলতেই বিপুল উৎসাহে দুই বাহু ছড়িয়ে বলে উঠল, 'আর কারুর কোনও ভয় নেই! কুমার, তুমি একটি জিনিয়াস! তুচ্ছ একখানা ভাঙা কাচ দিয়ে আজ তুমি তিন-তিনটে মূল্যবান মানুষের প্রাণরক্ষা করলে!'

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু এখনও আমরা কলার কাঁদির মতো শূন্যে ঝুলছি!'

বিমল বললে, 'জীবনে আর কখনও হয়তো এ-ভাবে শূন্যে ঝোলবার অবসর পাবে না, আরও মিনিট-কয়েক শূন্যে ঝোলার আমোদ ভোগ করো ভায়া! কয়-মিনিটের জন্যে বিদায়!' বলেই সে খুব জোরে দুবার দোল খেয়ে নিজের দেহকে উপরদিকে দুমড়ে ফেলে ঊর্ধ্বে উঠে মূল মোটা দড়িগাছা চেপে ধরলে এবং তারপর এক হাত মূল দড়িতে রেখে আর এক হাতে আপনার পায়ের বাঁধন খুলতে লাগল।

পায়ের বাঁধন খুলতে বেশি দেরি লাগল না। বিমল তখন দড়ি ধরে সড়-সড় করে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরেই সে উপর থেকে বললে, 'এইবার আমি তোমাদের তুলছি!'

আমাদের দুজনের দেহ ওজনে চার মনের কম হবে না। কিন্তু বিমল অনায়াসেই আমাদের টেনে তুলতে লাগল।

পাহাড়ের উপরে গিয়ে আমাদের দেহ যখন বন্ধনমুক্ত হল, তখন পূর্ব-আকাশে রাঙা পদ্মের মতো তাজা রং ফুটে উঠেছে!

আমার দেহের অবস্থা এমন যে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আবার অবশ হয়ে বসে পড়লুম। অথচ এমন অবস্থাতেও বিমলের শক্তি ফুরিয়ে যায়নি—একসঙ্গে আমাদের দুজনের দেহ টেনে উপরে তুলেছে!

পাহাড়ের উপরে আমাদের জুতোগুলো পড়ে রয়েছে, আমাদের পা বাঁধবার সময়ে ভৈরবের দল ওগুলো খুলে নিয়েছিল।

নিজের একপাটি জুতো হাতে তুলে নিয়ে বিমল মৃদু হেসে বললে, 'এ জুতোর গুপ্তরহস্য, কুমার, জানো তো?'

কুমারও হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, 'জানি।'

আমি সকৌতূহলে বললুম, 'জুতোর গুপ্তরহস্য! সে আবার কী?'

বিমল বললে, 'শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে আমার খালি এই ভাবনাই হচ্ছিল যে, পাছে ভৈরব আমার জুতো চুরি করে! কিন্তু তুচ্ছ জুতোগুলো নেড়েচেড়ে দেখা সে দরকার মনে করেনি। দিলীপ, যার জন্যে এত হানাহানি, এই জুতোই হচ্ছে তার ভাণ্ডার! দ্যাখো!' বলেই সে জুতোর গোড়ালি থেকে খুদে ড্রয়ারের মতো একটা অংশ টেনে বার করলে এবং তার মধ্যে রয়েছে গুপ্তধনের সেই মূল্যবান ম্যাপ!

আমি সবিস্ময়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম!

কুমার বললে, 'দিলীপ, বিমলের এই স্পেশ্যাল জুতোর চোরা-কুঠুরি আফ্রিকাতেও আর একবার আমাদের মুখরক্ষা করেছিল!'

আমি বললুম, 'ভৈরব যার লোভে এত মহাপাপ করছে, আবার হাতে পেয়েও তাকে হারালে!'

কুমার বললে, 'এই হাতে পেয়েও হারানোর দুঃখ হচ্ছে দুনিয়ার আর একটা বিশেষত্ব! ভগবান আমাদের চারপাশে রয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তবু তাঁকে দেখতে না পেয়ে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে দূরে-দূরান্তরে আকুল হয়ে ছুটে যায় আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভগবানকে খুঁজে না পেয়ে হাহাকার করতে থাকে!'

হঠাৎ বিমল দাঁড়িয়ে উঠে কান পেতে কী শুনতে লাগল। বললে, 'নীচে যেন কাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে! দাঁড়াও, একটু এগিয়ে দেখে আসি!' বলেই সে পথের দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বললে, 'আট-দশজন লোক আসছে। নিশ্চয় ভৈরবের দল সকাল হয়েছে দেখে আবার আমাদের আদর করতে আসছে!'

শুনেই আমাদের সমস্ত শ্রান্তি পালিয়ে গেল, একলাফে আমরা উঠে দাঁড়ালুম।

বিমল ব্যস্ত স্বরে বললে, 'ওদের সঙ্গে লড়বার শক্তি আমাদের নেই—আমরা নিরস্ত্র! আমাদের পালাতেই হবে! কিন্তু কোনদিকে পালাই? আমাদের ফেরবার পথ দিয়েই ওরা আসছে! উতরাই দিয়ে নামা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই! এসো, এসো—জলদি!'

আমরা উতরাইয়ের পথ ধরলুম—শুনেছি এই উতরাই দুই মাইল লম্বা। অতিশয় সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে হবে—কারণ প্রতিপদেই এখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা!

কিন্তু পিছনে আসছে যমদূতের দল, ধরতে পারলে তারা আমাদের কুকুরের মতো মেরে ফেলবে! তাদের ভয়ে আমরা সমস্ত সাবধানতা ভুলে গেলুম! পদে পদে মৃত্যুকে সামনে রেখে যে-রকম মরিয়ার মতো আমরা সেই বন্ধুর, প্রায়-খাড়া চড়াইয়ের পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নামতে লাগলুম, কেউ তা দেখলে নিশ্চয় আমাদের বদ্ধপাগল বলে মনে করত! সেদিন যে আমরা মরিনি কেন, সেটা ভাবলে এখনও বিস্মিত হই! প্রত্যেক লাফেই আমরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেক বারেই মৃত্যু যেন দূরে সরে গিয়ে আবার পরের বারের জন্যে অপেক্ষা করছে!

মাইল-খানেক পথ নেমে আমি শুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বিমল, আমার দম বেরিয়ে গেছে—আমি আর পারছি না!'

বিমল এক টান মেরে আমাকে খাড়া করে তুলে বললে, 'ভৈরব এতক্ষণে আমাদের পলায়ন আবিষ্কার করেছে! সে-ও হয়তো সদলবলে এই পথেই তেড়ে আসছে!'

কুমার বললে, 'আসছে কী—ওই এসে পড়েছে! উপর দিকে চেয়ে দ্যাখো!'

সত্য! উতরাইয়ের অনেক উপরে দেখা গেল, একদল লোক তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে আসছে!

শরীরের শেষ শক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার আমি নামতে লাগলুম। ওই রাক্ষসদের কবলে যাওয়ার চেয়ে এই পাহাড় থেকে পড়ে মরা ঢের ভালো!

কিন্তু আমার গতি ক্রমেই কমে আসছে, হাঁপের চোটে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে; কাল সারা-রাত ওরা পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তার উপরে এই সাংঘাতিক পথ, আমার পা এখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল, আবার আমি আচ্ছন্নের মতো হয়ে শুয়ে পড়লুম।

ভৈরবের দল তখন বেশ কাছে এসে পড়েছে, তাদের তো সারা রাত হেঁটমুখে শূন্যে দোল খেতে হয়নি, তাই সতেজ দেহে এত শীঘ্র এতখানি পথ নেমে আসতে পেরেছে! বিপদের উপর বিপদ! তারা আমাদের লক্ষ্য করে বড়ো বড়ো পাথরবৃষ্টি করতে লাগল! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দরকার হবে না ভেবে ভৈরব আজ বোধহয় বন্দুকটা সঙ্গে আনেনি, বন্দুক থাকলে এতক্ষণে আমাদের আর দেখতে-শুনতে হত না!

বিমল বললে, 'ওঠো ভাই দিলীপ, লক্ষ্মীটি। আর বেশি পথ নেই—আমরা তো নীচে এসে পড়েছি!'

আবার ধুঁকতে ধুঁকতে ওঠবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বৃথা চেষ্টা! আমার দেহে আর একফোঁটা শক্তি নেই! ক্ষীণ স্বরে বললুম, 'বিমল! কুমার! আমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমরাও আর মরণকে ডেকে এনো না! তোমরা পালাও—আমার আয়ু ফুরিয়েছে!'

শত্রুর দল আরও নিকটস্থ হয়ে হই-হই রবে চিৎকার করে উঠল! তারপরেই একরাশ পাথর বৃষ্টি! একখানা পাথর কুমারের মাথা ঘষে চলে গেল—তার মুখের উপর দিয়ে দর-দর ধারে রক্ত পড়তে লাগল!

বিমল তাড়াতাড়ি নিজের রুমাল বার করে কুমারের মাথাটা বেঁধে দিলে, তারপর প্রদীপ্ত চক্ষে ঊর্ধ্বমুখে ভৈরবদের উদ্দেশে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ক্রোধবিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি দিন পাই, এই রক্তপাতের প্রতিশোধ নেব!'

আমি কাতর স্বরে বললুম, 'হয় ওদের ম্যাপ ফিরিয়ে দাও, নয় এখান থেকে পালাও!'

বিমল একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে—তার মুখে দুশ্চিন্তার কোনও চিহ্নই নেই! তারপরেই সে হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ে অতি-অনায়াসে আমাকে ঠিক শিশুর মতোই পিঠে তুলে নিলে! তারপর গায়ের কাপড় দিয়ে আমাকে তার পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আবার নীচের দিকে দ্রুতপদে নামতে লাগল! সেই প্রায়-মূর্ছিত অবস্থাতেও তার অসাধারণ গায়ের জোর দেখে আমার মন সচকিত হয়ে উঠল! তার মাংসপেশিগুলো কি মহাশক্তির গুপ্তমন্ত্রে তৈরি, শত ব্যবহারেও তারা নিস্তেজ হতে জানে না?

খানিকক্ষণ পরে উতরাই যখন শেষ হল তখন ভৈরবদের দল আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত-ত্রিশ উপরে! আর বোধহয় ওদের খপ্পর থেকে রক্ষা নেই!

সামনেই কালী নদী, কিন্তু তার রূপ আজ বদলে গেছে। তার জলে এখন নূপুর-নিক্কণের মতো মিষ্টধ্বনি নেই, নর্তকীর লাস্যলীলাও নেই! নদীর হাত-ত্রিশ চওড়া খাদের ভিতরে ভীষণ-প্রবল জলের ধারা যেন রুদ্ধ ক্রোধে ও আক্রোশে ফুলে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—যেমন ভয়ঙ্কর তার গতি, তেমনি স্তম্ভিত-করা তার গর্জন! তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি করে সূর্যালোকে চকচকে ইস্পাতের দীর্ঘ অস্ত্রের মতো লকলক করতে করতে লাফাতে লাফাতে ছুটে যাচ্ছে—টগবগ করে ফুটছে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা! চিরস্থির প্রস্তর-রাজ্যে সেই মৃত্যুরূপিণী তরঙ্গিনীর

অস্থিরতা দেখে প্রাণ যেন ভয়ে শিউরে উঠল! কিন্তু তার এই হঠাৎ পাগলামির কারণ তখন বুঝতে পারিনি—পরে বুঝেছিলুম।

সেই কালী নদীর উপরে রয়েছে কাঠ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ছোটো একটা পলকা সেতু—উন্মত্ত তরঙ্গের ধাক্কার পর ধাক্কায় তা থর-থর করে কাঁপছে!

বিমল ও কুমার সেইখানে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে বোধহয় কী করবে তাই ভাবতে লাগল! সেই পলকা সাঁকো এখন আমাদের ভার সইতে পারবে কি না, সন্দেহ হয়!

ইতিমধ্যে ভৈরবদের দলের একটা লোক সর্বাগ্রে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল—তার হাতে একখানা মস্ত ছোরা!

কুমার চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই মাটি থেকে প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে নিলে এবং সবেগে ও সজোরে সেই লোকটার দিকে নিক্ষেপ করলে!

আমার মনে হল, সশব্দে হতভাগ্যের মাথার খুলি ফেটে গেল—একটিমাত্র চিৎকার করেই লোকটা ধুপ করে মাটির উপরে ঠিকরে পড়ে ছটফট করতে লাগল! তাকে নিশ্চয় আর পৃথিবীর আলোক দেখতে হয়নি। চোখের সামনে মানুষ বধ এই আমি প্রথম দেখলুম—শিউরে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম!

—'কুমার, কুমার, কী করি?'

—'চলো, পোল দিয়ে ওপারে!'

—'তারপর?'

—'লড়তে লড়তে মরব!'

—'বহুৎ-আচ্ছা! বিছানায় শুয়ে বুড়ো হয়ে রোগে ভুগে মরার চেয়ে সে মরণ ঢের ভালো মরণ! শত্রু মেরে মরব!'

কুমার ও আমাকে পিঠে নিয়ে বিমল সেতুর উপর দিয়ে ছুটল—আমি সভয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের পিছনে পিছনে শত্রুদেরও একজন লোক তরোয়াল উঁচিয়ে তেড়ে আসছে এবং তারও পরে আরও তিনটে লোক হুড়মুড় করে সেতুর উপরে এসে পড়ল! এত চেষ্টার পরেও বোধহয় এ-যাত্রা আর রক্ষা নেই!

—কিন্তু এমন সময়ে ঘটল এক কল্পনাতীত ঘটনা!

আচম্বিতে কালী নদীর সেই সেতু ভীষণ শব্দে ক্ষুধিত জলের গর্ভে মড়মড়িয়ে ভেঙে নেমে গেল!

কুমারের পর আমাকে নিয়ে বিমল তখন সবে ওপারে পা দিয়েছে!

যে-চারজন শত্রু সেতুর উপরে ছিল, তারাও তীব্র আর্তনাদে চারিদিক কাঁপিয়ে তলিয়ে গেল! দুটো দেহ জলের উপরে একবার ভেসে উঠে এবং আর একবার চিৎকার করে বিদ্যুৎ-বেগে পাক খেয়ে আবার অদৃশ্য হল!

বিমল ও কুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

ওপারেও স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভৈরব ও তার সঙ্গীরা!

চোখের সুমুখে এ কী অভাবিত দুঃস্বপ্নের অভিনয়! এও কি সম্ভব?

মাঝখান দিয়ে নির্দয় কৌতুকে মৃত্যু-প্রলাপে মেতে ও অট্টহাস্য করে বেগে ছুটে চলেছে উন্মাদিনী কালী নদী—সেতুর ভাঙা কাঠগুলো পর্যন্ত কোথায় ভেসে গিয়েছে তার আর কোনও ঠিকানাই নেই! সমস্ত এক মুহূর্তে গ্রাস করে জীবন্ত এক বিরাট জলরূপী অজগরের মতো নদী পাকসাট খাচ্ছে, একবার স্ফীত ও উঁচু হয়ে উঠছে, আবার খল-খল চামুণ্ডা-হাসি হেসে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে, এবং বারে বারে প্রচণ্ড হিংসায় হিমালয়ের দেহ যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে কূলে কূলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে!

আমি বললুম, 'আর নয় বিমল, এইবার আমাকে ঘাড় থেকে নামাও!'

বিমল আমাকে নামিয়ে দিলে।

ও আবার কার স্বর? কে চেঁচিয়ে কাঁদে, কে সাহায্য চায়?

তীরের কাছে, জলের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে ঝুলছে সেই লোকটা—যে তরবারি নিয়ে আমাদের পিছনে ধেয়ে আসছিল!

আমাদের উদ্দেশে সক্রন্দনে সে বললে, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! ঢেউ আমাকে টানছে—আর আমি পারছি না!'

স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে বুকে দুই হাত বেঁধে বিমল বললে, 'যা, তুই নরকে যা! একটা দড়ি-টড়ি ফেলে দিয়ে হয়তো তোকে আমি বাঁচাতে পারতুম, কিন্তু তোকে আমি বাঁচাব না!'

—'তোমার পায়ে পড়ি, এমন কাজ আমি আর কখনও করব না! বাঁচাও—গেলুম, গেলুম, বাঁচাও—বাঁচা—' নদীর স্ফীত জলরাশি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঠিক কোনও হিংস্র দানবের মতো তাকে যেন কোঁত করে গিলে ফেললে!

কাঁপতে কাঁপতে আমি চোখ মুদে ফেললুম—এ কী ভয়ানক মৃত্যু!

ওপার থেকে এতক্ষণ পরে ভৈরব কথা কইলে! কর্কশ চিৎকার করে বললে, 'আমাকে বড়ো ফাঁকি দিলি তোরা! আচ্ছা, এর পরের বারে তোদের সঙ্গে আবার যখন দেখা হবে—'

—'তখন তোকেই আমি আগে বধ করব!' বলেই বিমল খিল-খিল করে হেসে উঠল!

ব্যর্থ আক্রোশে আমাদের দিকে একখানা পাথর ছুড়ে ভৈরব বললে, 'জীবন থাকতে আমি তোদের ছাড়ব না!'

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে তুলে ধরে বিমল ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'এই দেখ সেই ম্যাপ! নিবি তো এগিয়ে আয়!'

ভৈরব গর্জন করে উঠল!

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আর দরকার নেই বিমল, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই!'

সেতুভঙ্গের কারণ পরে শুনেছিলুম।

বেশি বৃষ্টি হলে, কিংবা বেশি গরমে হিমালয়ের টঙে বরফ গলে গেলে, কালী নদীর জল ক্ষেপে উঠে এখানকার পলকা সেতু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রতি বৎসরেই নাকি এমন ব্যাপার হয়।

তবু কেন যে এখানে বড়ো ও দৃঢ় সেতু তৈরি করা হয় না তা জানি না, কেননা মানস সরোবরের যাত্রীদের ও স্থানীয় লোকদের পক্ষে এই সেতুটি অত্যন্ত দরকারি।

কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যথাসময়ে এই সেতু ভাঙার মধ্যে আমি ভগবানের মঙ্গলময় হস্তই দেখতে পাই। এই সেতু আত্মদান করে আমাদের বাঁচালে এবং সেই সঙ্গে পাপীদেরও শাস্তি দিলে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোলাপ ফলের মুল্লুক

'নির্পানীকা সড়ক' নামে পথ বটে, কিন্তু আসলে বিপথ। দুইক্রোশব্যাপী বিষম এক চড়াই, ওঠবার সময়ে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যায়, কিন্তু কোথাও জল নেই! কালী নদীর সাঁকো ভেঙে গেলে এই পথই হয় যাত্রীদের অবলম্বন। কাজেই অর্ধ-মৃতদেহ নিয়ে এই বিপথ দিয়েই আমাদের ফিরে আসতে হল।

পথ হোক বিপথ হোক, প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আসতে পারলুম, এইটুকুই সৌভাগ্যের কথা! ভৈরব নিশ্চয়ই তখনও এ-পথের কথা জানতে পারেনি, নইলে আমাদের অবস্থা হত হয়তো তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো!

আমাদের সন্ধান না পেয়ে রামহরির উদ্বেগের সীমা ছিল না, বাঘাও নাকি আজ খাবার ছোঁয়নি। রাতে আমরা ফিরিনি, সকাল গেল—দুপুর গেল তবু আমাদের দেখা নেই এবং উত্থান-শক্তিহীন আহত রামহরির পক্ষে আমাদের খোঁজ নেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং সে কেবল কেঁদে-কেঁদেই সময় কাটিয়েছে!

এখন ক্ষতবিক্ষত শ্রান্ত দেহে সকলকে ফিরে আসতে দেখে সে হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, বিমলের মাথাটা দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কান্না-ভরা গলায় রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমি কি আমার সর্বনাশ করতে চাও? গতর যে চূর্ণ হয়ে গেছে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

রামহরিকে শান্ত করতে সেদিন বিমল ও কুমারের অনেকক্ষণ লেগেছিল!

ধরতে গেলে, এখন শুধু রামহরির নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা শয্যাগত হবার মতো! গায়ের ব্যথা মরতে ও ক্ষতস্থানগুলো সারতে প্রায় দুই হপ্তা লাগল। এই দু-হপ্তা আমরা আর মানস সরোবরের পথে পা বাড়ালুম না।

বিমল বললে, 'এ একরকম ভালোই হল! আমরা যে পিছিয়ে পড়ে এখানে বসে আছি, ভৈরব তা জানে না। দলবল নিয়ে নিশ্চয়ই সে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের চারিদিকে খুঁজছে! আমরা যে মানস সরোবরের দিকে যেতে চাই, তাও সে জানে না। হয়তো আমাদের খোঁজে সে এখন নেপালে ঢুকে পথ হেঁটে মরছে! আমাদের এখন উচিত হচ্ছে, তাকে আরও দূরে আর

ভুল পথে যাবার সময় দেওয়া। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমরা এখানে অলস হয়ে বসে থেকেই খুব মস্ত কাজ করছি! আহত না হলেও আমি এখন এই উপায়ই অবলম্বন করতুম!'

কুমার বললে, 'ভৈরবদের দল এখন প্রায় আধাআধি হালকা হয়ে গেছে। তারা গুণতিতে ছিল বারোজন। একজনকে আমি বোধহয় বধই করেছি, আর চারজনকে গ্রাস করেছে কালী নদী, তাহলে ওদের দলে এখন সাতজনের বেশি লোক নেই। আমরা হচ্ছি চারজন—না, বাঘাও বড়ো কম নয়, তাকে নিয়ে পাঁচজন! ভৈরবকে আর আমি ডরাই না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু ভৈরবের একটা কথায় আমি যে বড়ো দমে গিয়েছি ভাই! আমার ঠাকুরদা তার বাবাকে হত্যা করে গুপ্তধনের ম্যাপ পেয়েছিলেন? তাহলে ধর্মত এই গুপ্তধন থেকে ভৈরব বঞ্চিত হতে পারে না!'

বিমল বললে, 'আমি ভৈরবের মতো মহাপাপীর একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি কি তোমার ঠাকুরদার ইতিহাস জানো না?'

—'ও-সব কোনও কথাই আমি শুনিনি। তবে আমার ঠাকুরদা বড়োই বদরাগি মানুষ ছিলেন—বাবা একমাত্র ছেলে হয়েও তাঁর সামনে ভয়ে মুখ তুলে কথা কইতে পারতেন না!'

কুমার বললে, 'কে জানে ভৈরবের বাপ ছেলের মতোই গুণধর ছিল কি না! তোমার ঠাকুরদা হয়তো আত্মরক্ষার জন্যেই তাকে বধ করেছিলেন—যেমন আমার হাতে মরেছে ভৈরবের এক স্যাঙাত!'

বিমল বললে, 'কিছুই অসম্ভব নয়! মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, ম্যাপ যখন আমাদের কাছে, তখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না! অতএব দিন-কয় এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে খাও-দাও মজা করো, আর ভৈরব পথে পথে ঘুরে কাহিল হয়ে পড়ুক!'

দিন-কয় এ-জায়গাটার হালচাল দেখে কাটিয়ে দিলুম। আবার যাত্রা আরম্ভ করবার আগে, মাইল ত্রিশ পথ খুব সন্তর্পণে এগিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, ভৈরবরাও কোথাও লুকিয়ে আছে কি না! কিন্তু কোথাও তাদের টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না!

এ হচ্ছে থ্যাবড়া নাক ভুটিয়াদের মুল্লুক। মেয়েরাই এখানে বেশি কাজকর্ম করে, পুরুষরা বেশির ভাগ সময়ই পিতলের হুঁকায় তামাক টানতে টানতে আড্ডা দিয়ে আয়েস করে কাটায়।

এদের বিয়ে বড়ো মজার। বর আর কনে পরস্পরকে পছন্দ করলেই এবং কনের আংটি গড়াবার জন্যে বর কন্যাপক্ষকে গোটাকয়েক টাকা দিলেই বুঝতে হবে—ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল,—না আছে সেকেলে বাপ-মায়ের মত নেওয়া, না আছে কোনও আজেবাজে মন্ত্রতন্ত্র, না আছে টিকি-নাড়া পুরুত-টুরুত!

মেয়েরা রুপোর গয়না পরে বাহার দিয়ে বেড়ায়,—গলায় দোলায় সিকি বা আধুলির মালা। কায়দা করে চুল বাঁধবার শখ তাদের খুব বেশি এবং চুল বাঁধবার সময়ে তারা থুঃ থুঃ করে থুতু দিয়ে চুল ভিজিয়ে নেয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে বনগোলাপ গাছের মেলা। গোলাপ এখানে জন্মে তার বিখ্যাত কাঁটাকে ত্যাগ করেছে এবং তার ফুলও বেলফুলের মতো খুদে খুদে। গোলাপফুল বলতে আমরা যা বুঝি এরা তা বোঝে না—এরা বোঝে ও বলে গোলাপফল! স্বচক্ষে দেখলুম, ভুটিয়ারা গোলাপগাছ

থেকে টোপা কুলের মতো ছোটো লাল বা বেগুনি রংয়ের গোলাপফল পেড়ে মুখে পুরে দিচ্ছে এবং দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে! কাঁচা গোলাপফলের রং সবুজ। ওদের দেখাদেখি আমিও একটা গোলাপফল খেয়ে দেখলুম তা একটু-কষা ও একটু-মিষ্ট! আমাকে অবাক করলে এই পাহাড়ি গোলাপ!

চারিদিকে ভৈরবদের খোঁজ নিয়ে বাসায় ফিরে এসেই বিমল যা বললে, তাতে আবার আমাদের চক্ষুস্থির হয়ে গেল!

যে জুতোর গোড়ালির কুঠুরিতে গুপ্তধনের ম্যাপ লুকানো ছিল, সেই জুতোজোড়া আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

রামহরিকে ডেকে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'রামহরি, তুমি কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাইরে গিয়েছিলে?'

রামহরি বললে, 'বাইরে মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে বইকি, কিন্তু দরজায় তো তালা না দিয়ে যাইনি!'

বিমল বললে, 'তাহলে নিশ্চয় কেউ অন্য চাবি দিয়ে তালা খুলেছে! কিন্তু কে সে? এত জিনিস থাকতে সে কেবল আমারই জুতো চুরি করলে কেন? জুতোর গুপ্তরহস্য সে কি জানে?'

উত্তর পেতে দেরি হল না। বিছানার উপরে একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাতে লেখা রয়েছে :

'বিমল,

তুমি যে চালাক, তা স্বীকার করি। কিন্তু অতিচালাকি দেখাতে গিয়েই তুমি ঠকে মরলে।

তোমরা নিশ্চয় ভেবেছ যে, আমরা আর এ-মুল্লুকে নেই—কেমন, তাই নয় কি? ভাবছ, আমরা ভুল পথে গিয়ে তোমাদের খুঁজে মরছি?

নিশ্চয়ই নয়! তোমাদের কাছে-কাছেই আমিও আছি, চব্বিশ ঘণ্টাই তোমাদের উপরে সতর্ক পাহারা রেখেছি, কেবল তোমাদের অসাবধানতার সুযোগ খুঁজেছি,—কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব কিছুতেই জানতে দিইনি, কারণ আমরা কাছে আছি জানলে তোমরাও সাবধান হয়ে থাকতে!

তুমি আমাকে বোকা ভেবে আমার চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলে বটে, কিন্তু আসলে তোমারই চোখে ধুলো দিলুম আমি। শত্রুদের যারা বোকা ভাবে, তারাই হচ্ছে অতিবড়ো বোকা!

কিন্তু অতিচালাকি দেখাতে গিয়ে তুমি যে ভ্রম করেছ, সে-ভ্রম আর কখনও সংশোধন করতে পারবে না।

কালী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে ম্যাপখানা দেখিয়ে তুমি প্রথম শ্রেণীর নির্বোধের মতো কাজ করেছ!

আমি তখনই ভেবে দেখলুম, তোমাদের প্রত্যেকের দেহ আর কাপড়চোপড় খুব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যে ম্যাপ পাওয়া যায়নি তা আবার তোমার কাছে এল কেমন করে?

ভেবে-চিন্তে সন্দেহ করলুম, তোমার জুতো খুঁজতে ভুলে গিয়েছিলুম, ম্যাপ হয়তো সেই জুতোর ভিতরেই লুকানো ছিল!

আজ তোমরা বেরিয়ে গিয়েছ, আমিও তোমার ঘরে ঢুকেছি। আগেই আমার চরের মুখে

খবর পেয়েছি, আজ তোমরা সেদিনকার জুতো না পরে বুটজুতো পায়ে দিয়ে গিয়েছ!

আমার অনুমান সত্য হয়েছে! ম্যাপসুদ্ধ এই চমৎকার জুতো জোড়াটি আমি তোমার সাদর উপহার বলে গ্রহণ করলুম। আবার যদি কখনও দেখা হয়, তোমাকে তোমার জুতোজোড়া ফিরিয়ে দেব। কারণ আমি জুতোচোর নই!

আর একটা কথা শুনলেও খুশি হবে। তোমাদের বাসাঘরের দরজায় কান পেতে আমার ছদ্মবেশী চর বসে থাকত। তোমরাও তাকে দেখেছ, কিন্তু চিনতে পারোনি।

তোমাদের অনেক কথাই সে শুনেছে। মানস সরোবরের কাছে রাক্ষস তালে গিয়েই তো তোমাদের পথ চলা শেষ হবে?

সেখানেই তোমাদের সঙ্গে আবার হয়তো আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

তোমাদের জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই থাকব। ইতি

শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস

পুঃ কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না। সেদিন পাহাড়ের দড়ির দোলনা থেকে তোমরা মুক্তি পেলে কেমন করে? দেখা হলে এ-খবরটা দিতে ভুলো না। ভৈঃ

বিমল কপালে করাঘাত করে বসে পড়ে বললে, 'আমি গাধা! আমি গোরু! বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই আমি সব মাটি করলুম!'

কুমার বললে, 'আমাদের পিছনে ফেলে ভৈরব এতক্ষণে মানস সরোবরের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে! আর কি তার নাগাল ধরতে পারব?

আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললুম, 'আমাদের এত কষ্ট সব বিফল হল! এখন খালি কাদা ঘেঁটেই দেশে ফিরতে হবে!'

বিমল সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তীব্র স্বরে বললে, 'কখনও না, কখনও না! আমরা আজই ঝড়ের বেগে ভৈরবদের পিছনে ছুটব। এতদিন তারা আমাদের অনুসরণ করেছিল, এইবারে আমাদের পালা! তাদের নাগাল আমরা ধরবই—নইলে এ মুখ আর কারুকে দেখাব না! আমার ভাগ্য চিরদিনই আমাকে সাহায্য করেছে, এবারেও নিশ্চয় সে আমার পক্ষ ত্যাগ করবে না! প্রতিজ্ঞা করছি দিলীপ, আমি ভৈরবের মুখের গ্রাস আবার কেড়ে নেব! দেখো, অদৃষ্ট আমাদের সাহায্য করবেই!'

আমি কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে বললুম, 'কিন্তু আর রাক্ষস তালে গিয়ে আমাদের লাভ কী? আমরা তো সেখানে বেড়াতে যাচ্ছিলুম না—যাচ্ছিলুম গুপ্তধনের সন্ধানে। কিন্তু এখন আমাদের কাছে ম্যাপ নেই, তবে কেন আর এত কষ্ট আর বিপদ মাথায় করে অন্ধকার হাতড়াতে যাওয়া?'

বিমল বললে, 'ভৈরব আমাকে যতটা মনে করেছে আমি ততটা বোকা নই! আসল ম্যাপ সে পেয়েছে বটে, কিন্তু তার অবিকল নকল আমার কাছে আছে! এখন যে আগে রাক্ষস-তালে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, গুপ্তধন হবে তার।'

মনের ভিতরে কতকটা আশার সঞ্চার হল। এখনও তাহলে সফল হলেও হতে পারি!

বিমল বললে, 'কিন্তু আর এক মিনিট সময় নষ্ট করবারও সময় নেই! প্রতি মিনিটেই

আমাদের আরও পিছনে ফেলে ভৈরব আরও বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। ওঠো কুমার, এসো দিলীপ, জাগো রামহরি! রাক্ষস তালে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে রাক্ষসের মতো ব্যবহারই করতে হবে—দয়া মায়া স্নেহ মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দাও! ভৈরব জানে না, দরকার হলে আমি তার চেয়েও কত নিষ্ঠুর হতে পারি!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমলের ভাগ্যলক্ষ্মী

বুদি, গারবেয়াং, কালাপানি প্রভৃতি পার হয়ে আমরা লিপিধুরায় এসে পড়েছি। এইখানেই ইংরেজ-রাজ্যের শেষ এবং তিব্বতের আরম্ভ।

আমরা এখন যেখানে এসে উঠেছি, বাংলা দেশে তার ঢের নীচে মেঘের দল আনাগোনা করে। বাঙালিরা দার্জিলিঙে গিয়েই পায়ের তলায় মেঘ-চলাচল দেখে অবাক হয়, কিন্তু দার্জিলিংও এখন আমাদের কত নীচে পড়ে আছে! এখানকার অতিরিক্ত নির্মল বাতাস এত লঘু যে নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়—আমরা নীচেকার পৃথিবীর ধুলো-মাটির জীব, এত নির্মলতা পর্যন্ত আমাদের সহ্য হয় না!

দেখতে দেখতে শ্যামলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বললেও চলে, এখানে-ওখানে কাঁটালতা ছাড়া গাছের আর দেখাই নেই। এখন চলেছি আমরা তুষারের শুভ্র রাজ্য দিয়ে—তার কনকনে শীতলতা ভয়াবহ। এমন বিষম ঠান্ডা বাতাস বইছে যে, এর মধ্যেই আমাদের গায়ের চামড়া বুড়োর মতো কুঁচকে গিয়েছে—অথচ সর্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়ে জ্বালা করছে!

কোথাও নদী কি নির্ঝরের, পাখি কি তরুপল্লবের গান আর শোনা যায় না—চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা অসাধারণ। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে শব্দের সৃষ্টি করছে হঠাৎ-জাগা শুকনো হাওয়া এবং এক-একটা দাঁড়কাক।

লিপিধুরাতে এসে শৈলশিখর থেকে চোখের সামনে ছবির মতন স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে দেখা যায়, বিচিত্রবর্ণ শৈলসমাকীর্ণ তিব্বত দেশকে। এবং তারই উপরে অনন্তকাল ধরে জাগ্রত প্রহরীদলের মতো বিরাজ করছে তুষারধবল ব্যোমস্পর্শী গিরিশিখরের পর গিরিশিখর।

মানুষের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি পথ চলা সম্ভব, আমরা তত তাড়াতাড়িই এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ পার হয়ে এসেছি।

কিন্তু লিপিধুরায় পৌঁছবার কিছু আগে এক পথিকের কাছে একটা সন্দেহজনক খবর পেলুম। একদল মানস সরোবরের বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে তার নাকি দেখা হয়েছে।

বিমল শুধোলে, 'সে দলে কজন লোক আছে?'

—'সাতজন।'

—'তারা কি সশস্ত্র?'

—'এ-পথে সবাই মোটা লাঠি নিয়ে চলে, তাদেরও হাতে লাঠি আছে। কেবল একজনের হাতে বন্দুক দেখলুম। কিন্তু তারা ভালো লোক নয়। একজন গরিব দোকানির কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে আর জুলুম করে খাবার জিনিস কেড়ে নিয়েছে!'

বিমল ফিরে বললে, 'জাগো কুমার! জাগো দিলীপ! আমরা বোধহয় ভৈরবেরই দলের খবর পেলুম। ধনুকের তির যেমন কোনওদিকে না বেঁকে সিধে লক্ষ্যের দিকে বেগে ছোটে, ভৈরবও এখন তেমনি সোজা ছুটেছে রত্নগুহার দিকে। আমাদেরও পক্ষে সেই রত্নগুহা হচ্ছে চুম্বক, আর আমরা হচ্ছি তার দ্বারা আকৃষ্ট লোহার মতো। মাঝ-পথের কোনও বাধাই আর মানব না।'

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্ত নিয়ে আমরা লিপিধুরায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

কিন্তু এখানে এসে এক দুঃসংবাদ শুনলুম। তিব্বতের রাজ-সরকার থেকে হুকুম না এলে আমরা নাকি ইংরেজ-রাজত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারব না।

একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এই খবরটা দিলে। এবং আরও বললে যে, চার-পাঁচদিনের মধ্যেই তিব্বতে যাতায়াতের পথ খোলবার জন্যে হুকুম আসার সম্ভাবনা আছে।

বিমল বললে, 'আমরা যদি তার আগেই লুকিয়ে ওদিকে যাই?'

—'বাবুজি, তাহলে আপনারা বিপদে পড়তে পারেন। আমাদের কথা না শুনে কাল একদল বাঙালিবাবু তিব্বতে ঢুকে বন্দি হয়েছে!'

বিপুল আগ্রহে প্রদীপ্ত হয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঙালিবাবু? কে তারা?'

—'তা জানি না। আমরা বারণ করলুম, তবু তারা তিব্বতের সীমায় গিয়ে ঢুকল। শুনেছি, তিব্বতি চৌকিদাররাও ভালো কথায় তাদের ফিরে আসতে বলেছিল, কিন্তু তারা বোকার মতো তাদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে যায়! তখন অনেক চৌকিদার এসে পড়ে তাদের সকলকেই বন্দি করে নিয়ে যায়!'

—'রাজ-সরকার থেকে পথ খোলবার হুকুম এলেই আবার তাদের ছেড়ে দেবে তো?'

—'না। আপাতত কিছুকাল তাদের কয়েদখানাতেই থাকতে হবে। তারা তো কেবল আইন অমান্য করেনি, তিব্বতি চৌকিদারদের সঙ্গে মারামারিও করেছে। এজন্যে তাদের বিচার হবে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের তো কয়েদখানাতে থাকতেই হবে, বিচারে কী হবে সে তো পরের কথা।'

—'তাদের কারুর চেহারা তোমার মনে আছে?'

—'আমাদের চোখে সব বাঙালিবাবুকেই একরকম বলে মনে হয়। তবে তাদের মধ্যে এক বাবুর খুব জোয়ান চেহারা ছিল বটে। আর তার এক হাতে ছিল ছটা আঙুল। সে বাবুর মেজাজও ভারী গরম, কথায় কথায় রুখে ওঠে। সেইজন্যেই তো বিপদ হয়েছে।'

বিমলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আমাদের সংবাদদাতা বিদায় হলে পর সে বললে, 'দেখলে তো, ভাগ্য আমার উপরে কেমন সুপ্রসন্ন! আমার ভাগ্য সঙিন মুহূর্তে একটা আস্ত সাঁকো উড়িয়ে দেয়, তিব্বতি চৌকিদার লেলিয়ে আমার শত্রুদের গ্রেপ্তার করে!'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কেবল তোমার ভাগ্য বলছ কেন, বলো আমাদের সকলকারই ভাগ্য!'

—'ও একই কথা, আমরা যে অভিন্ন—এক প্রাণে একই কর্তব্যসাধন করতে চলেছি। কেবল আমাদের ভাগ্য নয়, পৃথিবীর সমস্ত উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যই এমনি যথাসময়ে সুপ্রসন্ন হয়! হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে মানুষ ভাগ্যলক্ষ্মীর অপমান করে, হতাশ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। কিন্তু থাক ও-কথা। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা যে ভৈরব আর তার দলবল, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ওই তিব্বতি-চৌকিদারদের প্রাণের বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করতে সাধ হচ্ছে। আমরা যা চেষ্টা করেও পারতুম না, তারা তাই করেছে। অতঃপর আমরা এখানে পথ না খোলা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারব। তারপরেও আমরা যখন যাত্রা করব, ভৈরব-বাবাজি তখন তিব্বতি জেলখানার ভিতরে শুয়ে হয়তো কড়িকাঠ গণনা করবে,—আঃ, কী সুসংবাদ! ও রামহরি, শিগগির চায়ের কেটলি চড়িয়ে দাও!'

খানিক পরেই রামহরির চড়ানো কেটলির জল আগুনের আঁচে গর্জন করে উঠল।

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, আশা ও নিরাশার, আনন্দের ও নিরানন্দের এ কী উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই কোন পরিণামের দিকে যাত্রা করেছি! অবশেষে সফল হব কি বিফল হব জানি না, কিন্তু এই অপূর্ব বৈচিত্রের দোলায় দুলে জীবন যে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। সফলতা অর্জন করতে না পারলেও আমার জীবনে এই বৈচিত্রের মূল্য কমবে না! বিমল ও কুমার যে কীসের মোহে বিপদকে এত ভালোবাসে সেটা এখন খুব ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে!

পদে পদে বিপদকে নিয়ে খেলা করা মানুষের পক্ষে একটা মস্ত নেশার মতো। যারা ধনী-বিলাসী, আজন্ম পরম সুখের কোলেই মানুষ, সেই রাজা-মহারাজারাও চিরদিন নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটিয়ে আনন্দ পায় না, স্বেচ্ছায় সুখ-শয্যা ছেড়ে গভীর বনেজঙ্গলে শিকার করতে ছুটে যায়, খানিকক্ষণের জন্যে অনিশ্চিত বিপদের বিপুল পুলক উপভোগ করবে বলে। যারা সাহস ও শক্তির অভাবে কাপুরুষ, তারাও শান্তিময় জীবনযাত্রা থেকে মাঝে মাঝে ছুটি পাবার জন্যে, কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে টিকিট কিনে সার্কাসে গিয়ে বিপজ্জনক খেলা দেখে আসে!

প্রত্যেক মানুষ বিপদকে ভয়ও করে, ভালোওবাসে!

নবম পরিচ্ছেদ

গুহা-ভূত

আজ আমরা একটি পাহাড়ের নীচে তাঁবু ফেলেছি। এই পাহাড়টির নাম গুরলা। এটি পার হলেই রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল।

পথের প্রায় শেষে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে উত্তেজনার অন্ত নেই! রাবণ-হ্রদের কাছেই আছে রত্নগুহার গুপ্তধন!

লিধুপুরা থেকে এই গুরলা পাহাড় পর্যন্ত সর্বদাই আমরা সাবধানে এসেছি—আমাদের সতর্ক

চক্ষু একবারও অন্যমনস্ক হয়নি। কিন্তু শত্রুরা একেবারেই অদৃশ্য। মাঝে মাঝে লাল বা ধূসর রঙের নানা আকারের পাহাড়—তার পরেই তুষার-সাম্রাজ্য। পথে ও প্রান্তরেও বরফের আভাস, সবুজের স্নিগ্ধতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু তারা সবাই হচ্ছে ভুটিয়া কি তিব্বতি। কেউ ঘোড়ায় চড়ে যায়, কেউ যায় হেঁটে। মাঝে মাঝে তিব্বতি ভিখারির দল এসে জ্বালাতন করে। কিন্তু এদের মধ্যে ভৈরবের ছদ্মবেশে থাকাও অসম্ভব। ভৈরব ভুটিয়া কি তিব্বতি পোশাক পরতে পারে, কিন্তু নিজের নাক থ্যাবড়া, গালের হাড় উঁচু ও চোখ কুতকুতে করে তোলবার জন্যে নিজের মুখ তো আর ভেঙেচুরে তুবড়ে গড়তে পারবে না! আমাদের অপরিচিত তিব্বতি চৌকিদার-বন্ধুরা নিশ্চয়ই এখনও তাদের জেলখানা থেকে বিদায় করে দেয়নি! আমি যেন মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোহার শিকল পরে ভৈরবচন্দ্র বিফল ক্রোধে মাথার চুল ছিঁড়ছে, গর্জন করছে এবং ভাবছে এতক্ষণে আমরা হয়তো সদলবলে রত্নগুহা লুণ্ঠন করছি!

এখানেও সকালে ও রাতে রক্ত-জমানো শীত, কিন্তু দুপুরবেলায় বিষম তাপে এবং শুকনো ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে পথ চলা অসম্ভব। চোখের সামনে বরফের বিরাট স্তূপ, কিন্তু বুকের ভিতরে মরুভূমির জ্বালা—কাজেই দুপুরে আমরা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দিবানিদ্রায় সময় কাটাবার চেষ্টা করতুম। সে-সময়ে পাহারা দিত খালি বাঘা। বাঘা এমন সজাগ হয়ে পাহারা দিতে শিখেছিল যে, সকলে মিলে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেও আমরা ভয় পেতুম না।

আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। যদিও ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়, তবু মনে একটা খটকা লেগে গেল।

আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ বাঘার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

বিস্মিত নেত্রে দেখলুম, তাঁবুর দরজার কাছে একটা ভীষণ দুষমন চেহারার লোক দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ করছে!

তার দেহ লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি—খুব জোয়ান চেহারা। মুখখানা একেবারে তিব্বতি ছাঁচের। মাথায় টুপি, পিছনে টিকি বা বেণী, গায়ে কোর্তা, পায়ে এদেশি ধ্যাবড়া বুট। কোমরবন্ধে ঝুলছে তরবারি ও পিঠে বাঁধা সেকেলে গাদা বন্দুক এবং ডান হাতে একগাছা খাটো কিন্তু মজবুত লাঠি।

বিমল ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে হিন্দিতে রুক্ষস্বরে বললে, 'কে তুমি?'

প্রথমে সে কোনও জবাব দিলে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের মোটঘাটগুলো দেখতে লাগল।

বিমল আবার শুধোলে, 'এখানে কী দরকার তোমার?'

অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বিশ্রী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে সে বললে, 'তোমরা এখানে কী করছ?'

বিমল বললে, 'আমরা তীর্থযাত্রী। মানস সরোবর যাচ্ছি।'

লোকটা সন্দেহ-ভরা চোখে আমাদের পোশাকের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাদের মতো প্যান্ট-কোট-বুট পরা তীর্থযাত্রী দেখতে সে বোধ হয় অভ্যস্ত নয়।

বিমল বললে, 'তোমার কোনও দরকার আছে?'

সে জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেল। তারপরেই বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলুম। আমি

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখোলুম, লোকটা ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

কুমার বললে, 'কে জানে, এ আবার কোন মূর্তি!'

বিমল বললে, 'দিলীপের বাবার চিঠির কথা মনে করো। এখানে ডাকাতের ভয় আছে। এখানকার লামারাও নাকি সর্বদাই সাবধান হয়ে থাকে, পাছে কেউ গুপ্তধন চুরি করতে আসে। ও লোকটা হয়তো তাদেরই কারুর চর!'

আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বললুম, 'তাহলে আবার কি আমাদের নতুন নতুন শত্রুর সঙ্গে যুঝতে হবে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'তা হবে বইকি! গুপ্তধন কি নিজের বাড়ির বাগানে গাছের ফল, যে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই হল? এখনও কত নতুন শত্রুর সঙ্গে দেখা হবে, কে তা বলতে পারে? হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা গুপ্তধনের কাছেই যেতে পারব না!'

আমি আরও বেশি মুষড়ে পড়ে বললুম, 'তাহলে মিছামিছি নিজেদের জীবনকে এমন ভাবে বিপন্ন করে লাভ কী?'

বিমল হো-হো করে উচ্চহাসি হেসে বললে, 'কী বললে দিলীপ? লাভ? তুমি কি কেবল লাভের জন্যেই এখানে এসেছ? তাহলে আমরা এখানে এসেছি কেন? গুপ্তধনে তো অধিকার কেবল তোমারই, আমরা তো কোনওদিনই তোমার অংশীদার হতে চাইনি! আমরা এসেছি শুধু বিপদের শিক্ষালাভের জন্যে। মানুষের ভিতরে কতটা শক্তি লুকিয়ে আছে, এই বিপদের শিক্ষালয়েই তার চরম পরীক্ষা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যাবার জন্যে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠবার জন্যে, উড়োজাহাজে চড়ে পৃথিবীর এপার থেকে ওপারে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে মানুষ এই যে দলে দলে প্রাণ দিচ্ছে, এ-সব করছে তারা কোন লাভের আশায়? প্রাণ গেলে আবার লাভের আশা কী? আমরা বলি—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ওরা তা বলে না! মানুষের সুনামের জন্যে ওরা হাসতে হাসতে আত্মবলি দেয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই মানুষ মৃত্যুজয়ী হয়, এইটুকুই হয়তো ওদের লাভ! কোনও লাভের আশা রেখো না দিলীপ, বিপদের ভিতর দিয়ে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে শেখো। মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হতে পেরেছে কেবল এই শিক্ষার গুণেই।'

আমি মাথা নামিয়ে লজ্জিত স্বরে বললুম, 'ভাই বিমল, বিপদের পাঠশালায় সবে আমার হাতেখড়ি হচ্ছে, মাঝে মাঝে তাই ভুল কথা বলে ফেলি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

কুমার আমার পিঠ চাপড়ে সহানুভূতি জানিয়ে বললে, 'অতটা লজ্জা পাবার দরকার নেই। রোমও একদিনে তৈরি হয়নি, শিশুও একদিনে মানুষ হয় না।'

বিমল ততক্ষণে গুপ্তধনের নকল ম্যাপখানা নিয়ে বিছানার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানা দেখে সে মুখ তুলে বললে, 'দিলীপ, কুমার, তোমরাও দ্যাখো। এখন চড়াই পার হয়ে আমাদের গুরলার উপরে উঠতে হবে। তারপর উতরাই দিয়ে নেমে গিয়ে পড়ব রাবণ হ্রদের ধারে। ম্যাপের দিকে তাকালেই দেখোতে পাবে, মাঝখানে পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল সোজা চলে গিয়েছে, তার একধারে রাবণ হ্রদ, আর একধারে মানস সরোবর—ম্যাপে এই দুটো

হ্রদের নাম নেই, শুধু লেখা আছে—'সরোবর', কেন, তা তোমরা আগেই শুনেছ। দুই হ্রদের মাঝখানকার পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে এক জায়গায় ট্যারাকাটা আর পাশেই লেখা 'গুহা'। এই গুহাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য স্থান, কেননা এখানেই আছে গুপ্তধন! কিন্তু কেবল গুহা বললে তো কিছুই বলা হয় না, এমন দীর্ঘ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে গুহা আছে হয়তো শত শত, প্রত্যেক গুহা খুঁজলেও হয়তো বুঝতে পারব না ঠিক কোনটি হচ্ছে গুপ্তধনের রত্নগুহা। যিনি ম্যাপ এঁকেছেন, তিনি সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই দ্যাখো, যেখানে 'গুহা' লেখা, ঠিক তার উপরেই আঁকা পাশাপাশি তিনটি শিখর। জায়গাটা দেখছি পাহাড় শ্রেণীর ঠিক মাঝ-বরাবর। তাহলে ওই পাহাড় শ্রেণীর মাঝ-বরাবর গিয়ে আমাদের এমন একটা পাহাড় খুঁজে বার করতে হবে, যার উপরে পাশাপাশি তিনটি শিখরের তলায় গুহার অস্তিত্ব আছে। এ ম্যাপ বোঝা খুবই সহজ, কোথাকার ম্যাপ জানলে আর কিছুই বেগ পেতে হয় না। কুমার, মনে পড়ে, আসামে যকের ধন আনতে যাবার আগে মড়ার মাথার উপরে ক্ষোদা সাঙ্কেতিক লিপি পড়বার জন্যে আমাদের কী কষ্টই না করতে হয়েছিল?'

কুমার বললে, 'মনে পড়ে না আবার? সেই তো আমাদের প্রথম বিপদের শিক্ষা, সে কথা কি ভুলতে পারি?'

এমন সময়ে রামহরি হঠাৎ আমাদের পিছন থেকে গলাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে সাগ্রহে বললে, 'দেখি খোকাবাবু, আমিও একবার ম্যাপটা দেখি!'

বিমল বললে, 'কেন, তুমি আবার ম্যাপে কী দেখবে?'

—'তোমাদের গুহা-ভূত কোথায় থাকে, একবার দেখোতে সাধ হচ্ছে!'

কুমার বললে, 'গুহা-ভূত আছে তোমার মুণ্ডুর ভিতরে, ম্যাপে তার চেহারা আঁকা নেই।'

রামহরি চটে বললে, 'আমার মুণ্ডুর ভিতরে কোনওদিন কোনও ভূতকে আড্ডা গাড়তে দিইনি, ভূত চেপেছে তোমাদের ঘাড়ে, তাই দেশ ছেড়ে এখানে ছুটে এসেছ?'

বিমল বললে, 'রামহরি, প্রস্তুত হও। আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, সন্ধের আগেই তাঁবু তুলে আমরা গুরলা পাহাড়ে উঠব! হয়তো কালকেই আমরা তোমার সঙ্গে গুহা-ভূতের পরিচয় করিয়ে দিতে পারব!'

দশম পরিচ্ছেদ

মূর্তিমান বিপদের জনতা

এখানে ফুল ফোটে না, কিন্তু চাঁদ ওঠে। আর সে চাঁদ বোধহয় বাংলা দেশের চাঁদের চেয়ে ঢের বেশি ফরসা। একই চাঁদ ওঠে সব দেশে, কিন্তু সব দেশে তার বাহার একরকম নয়।

যাঁরা ভাবছেন বনভূমি নেই বলে চাঁদের শোভা এখানে কম, তাঁদের আমি মত বদলাতে বলি। প্রকৃতির সমস্তটাই শোভাময়, দেখার মতো দেখতে পারলে। গভীর অন্ধকার ভরা অরণ্য,

সীমাহীন ধু-ধু মরুভূমি, কূলহারা নীল সমুদ্র, অনুর্বর কঠিন পর্বত, আবার ছোট্ট নদী বা নির্ঝরিণী ও একরত্তি গাছের চারা পর্যন্ত যা কিছু আমরা দেখি, প্রত্যেকেই আপন আপন রূপে অপরূপ হয়ে ওঠে।

পূর্ণিমার চন্দ্রলেখা যখন তুষারভূষণ হিমালয়ের শিখরে শিখরে স্বপ্নের আলপনা এঁকে দেয়, তখন তার অপূর্বতা বাংলা দেশের কেউ দেখতে পায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে বিপুল আলো-ছায়ার কী বিচিত্র মৌন অভিনয়! বনরাজ্যে আলো-ছায়া জীবন্ত রূপে নৃত্য করে, কিন্তু এখানে তারা এই হিমালয়ের মতোই চিরস্থির। যোগী-ঋষিরা তাই বুঝি এই স্থিরতার অন্তঃপুরে এসে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হয়ে অকম্পিত দীপশিখার মতো বসে থাকতে ভালোবাসেন।

স্থিরতার সঙ্গে মিলেছে এখানে নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা।

পৃথিবী যে এত সাড়াহীন হতে পারে, সেটা ভাবতেই মনে জাগে পরম বিস্ময়! নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও এখানে এত উচ্চ বলে মনে হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে নিজেরাই চমকে-চমকে উঠছি!

এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্থিরতা, নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি হাড়ভাঙা শীতে কাঁপতে কাঁপতে। পূর্ণিমার কিরণ এখানে তুষার-শুভ্রতায় প্রতিবিম্বিত হয়ে দ্বিগুণ উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করেছে।

কুমার বললে, 'চড়াইয়ের উপরে খানিকটা উঠলেই আমাদের দেহ গরম হয়ে শীত কমিয়ে দেবে।'

কিন্তু আমার কান তখন কুমারের কথা শুনলেও আমার চোখ আকৃষ্ট হয়েছিল পথের একটি জিনিসের দিকে। জিনিসটি সাদা, হাওয়ায় নড়ছিল বলেই দেখতে পেলুম!

দু পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, একখানা শৌখিন রুমাল!

হিমালয়ের আঠারো-উনিশ হাজার ফুট উপরে অসভ্য তিব্বতিদের দেশে এমন একখানা শৌখিন রুমাল দেখে চোখ আমার চমকে উঠল! হেঁট হয়ে তখনই সেখানা পথ থেকে কুড়িয়ে নিলুম।

বিমল বললে, 'ওটা কী দিলীপ?'

—'রুমাল।'

বিমল কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বললে, 'বোধহয় কোনও পথিকের পকেট থেকে পড়ে গেছে।'

রুমালখানা একমনে পরীক্ষা করতে করতে আমি বললুম, 'তাই হবে। কিন্তু এই পথিকটি খুব শৌখিন। সে বিলিতি রুমাল ব্যবহার করে, আর তাতে বকুলের এসেন্স মাখায়! তিব্বতিরা এত বাবু হয়েছে বলে জানতুম না! রুমালের কোনে বাংলাতে কার নামের একটা প্রথম অক্ষরও আছে দেখছি!'

ততক্ষণে বিমল ও কুমার তাড়াতাড়ি আমার দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!

—'দিলীপ, কী বলছ!'—বলেই বিমল রুমালখানা আমার হাত থেকে ফস করে টেনে নিলে!

কুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'রুমালের কোণে কী অক্ষর আছে বিমল?'

—'ভ।'

—'ভ!'

কিছুক্ষণ আমরা সকলেই স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে রইলুম! বোধহয় আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের ভিতরে তখন ঝড় বইছিল!

সর্বপ্রথমে কথা কইলে বিমল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এই 'ভ' হচ্ছে ভয়াবহ! অর্থাৎ 'ভ' অর্থে এখানে ভৈরবকেই বুঝতে হবে! আর কোনও বাঙালি এখন মানস সরোবরের পথে এলে সে-খবর আগেই আমাদের কানে উঠত। তাহলে বরং ওই 'ভ'কে ভীমচন্দ্র বলে সন্দেহ করা চলত। এখন এইটেই বুঝতে হবে যে, আমরা যখন একচক্ষু হরিণের মতো ভৈরবের ভাবনা ভুলে নিজেদের সাফল্যে পুলকিত হয়ে ধীরে-সুস্থে ভ্রমণ করছিলুম, ভৈরব তখন আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে দ্রুতপদে রাবণ হ্রদের দিকে এগিয়ে গেছে!'

কুমার বললে, 'কারাগার থেকে সে কবে মুক্তি পেলে?'

—'ভগবান জানেন, তবে রুমালখানা নিশ্চয়ই এখানে বেশিক্ষণ পড়ে নেই, খুব সম্ভব আজকেই কিছুক্ষণ আগে পকেট থেকে কোনওগতিকে পড়ে গেছে। কারণ কালকের সারারাত শিশিরে ভিজলে, আর আজকে সারাদিন রোদে পুড়লে রুমালে এসেন্সের গন্ধ নিশ্চয়ই উবে যেত! দিলীপ, এই রুমাল আজ খবরের কাগজের মতো সব খবরই আমাদের জানিয়ে দিলে! কিন্তু এখনও হয়তো সময় আছে, এখনও হয়তো যবনিকা পড়বার আগেই আমরা যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারব,—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! মানুষ আশার দাস—আশার শেষ নেই!'

আমার পা আর এগুতে চাইছিল না! মানুষের আশার শেষ নেই বটে, কিন্তু এ আশা যেন আলেয়ার মতো আমাদের অন্ধকার থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ কখনও নাগালের ভিতরে আসছে না পূর্ণতাকে নিয়ে! কিন্তু এখনও আমরা যেতে চাই কোথায়? বার বার দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে অনেকটা যখন নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, তখন হঠাৎ স্থির-সমুদ্রের টাইফুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে এই রুমালখানা আবির্ভূত হল! তুচ্ছ একখানা রুমাল! সময়বিশেষে তারও দাম কত বেশি!

বিমল বললে, 'দিলীপ, তোমার মুখ দেখলে যে প্যাঁচারাও আশ্চর্য হবে! কীসের এত ভাবনা? দেখতে পাচ্ছ না, এই রুমালখানা আমাদের চোখের সামনে ভগবানের অনুগ্রহের পতাকার মতো এসে পড়েছে? এ যে আমাদের ঘুমন্ত চোখকে জাগিয়ে বলতে চায়—ভয় নেই বন্ধুগণ! সর্বশেষের ঘণ্টা বাজাবার আগেই আমি তোমাদের সাবধান করে দিতে এসেছি! বুঝেছ দিলীপ, গুপ্তধন যদি ভৈরবের হাতের মুঠোর ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তাহলেও সে নিজে এখনও আমাদেরই হাতের মুঠোর ভিতরে থাকবে! যখন আগে থাকতে খবর পেয়েছি, তখন সে কোথায় পালাবে? এ হচ্ছে প্রায় অরাজক দেশ, তাকে ধরতে গেলে কোনও সভ্য আইন আমাদের বাধা দিতে পারবে না!'

কুমার বললে, 'এতক্ষণ ভৈরব ছিল না, আমাদের এই যাত্রাকে যেন লবণহীন তরকারির মতো বিস্বাদ লাগছিল! ভৈরব এসে ব্যাপারটাকে আবার জমিয়ে তুললে! দিলীপ, এইবারেই তো আসল খেলা শুরু হল!'

এই দুটি অপূর্ব যুবকের প্রচণ্ড উৎসাহের ধাক্কায় সমস্ত নিরাশাই যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! ধীরে ধীরে আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলুম।

... আমরা গুরলার চড়াই অবলম্বন করে উপরে উঠছি। সেখানকার ঘুমন্ত নীরবতা আমাদের পায়ের ও হাতের লাঠির শব্দে যেন সবিস্ময়ে জেগে চমকে চমকে উঠতে লাগল! মাঝে মাঝে আমাদের পা লেগে গড়ানে পথ দিয়ে রঙিন নুড়িগুলো খড়বড় খড়বড় করে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল সে যেন স্তব্ধতার হাসির শব্দ!

চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে। পথ দেখে চলতে—অর্থাৎ উঠতে আমাদের কোনওই কষ্ট হচ্ছে না! অত্যন্ত লঘু বাতাসে শ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চন্দ্রালোকের সমুদ্রেই ডুবে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! চাঁদের আলো, চাঁদের আলো, চাঁদের আলো,—কোথাও তা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কোথাও তা তুষারের সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে গেছে, কোথাও তা হিরার কণার মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে, কোথাও তা ছায়াময় হয়ে যেন আঁধারকে খুঁজছে!

আমি যখন নিজের মনে চাঁদের আলো নিয়েই মেতে আছি, তখন কুমার হঠাৎ চুপিচুপি বললে, 'আচ্ছা বিমল, তোমার মনে কি কোনও অস্বস্তি জাগছে না?'

এই আলোকময় স্তব্ধতার শান্তির মধ্যে কুমারের কথাগুলো কেমন বেসুরো শোনাল! যেখানে জনপ্রাণী নেই, কোনও গোলমাল নেই, সেখানে আবার অস্বস্তি কীসের?

কিন্তু কুমারের কথা শুনে বুকের কাছটা তবু ছাঁৎ করে উঠল! একবার চারিদিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলুম, কিন্তু ঘুমন্ত চন্দ্রালোকের স্বপ্নজগতে হিমালয়ের ধ্যানমূর্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

বিমল প্রথমে চুপ করে রইল। অল্পক্ষণ পরে বললে, 'কুমার, তোমার কি অস্বস্তি হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ ভাই, হচ্ছে।'

—'কী অস্বস্তি বলো দেখি?'

—'মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের উপরে যেন আমরা ছাড়াও আরও অনেক লোক আছে।'

—'আর কিছু?'

—'যেন তারা আমাদের প্রত্যেক ভাবভঙ্গি লক্ষ করছে! যেন অনেকগুলো হিঁসকুটে চোখ আমাদের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!'

কুমার বলে কী! ভাবলুম, বিমল বোধ হয় তার অকারণ ভয় দেখে এখনই ঠাট্টা শুরু করবে! কিন্তু সে ঠাট্টা করলে না! পিঠ থেকে নিজের বন্দুকটা নামিয়ে একবার পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'কুমার, আমারও মনের অবস্থা অনেকটা তোমারই মতো। কেবল তোমার আর আমার নয়, বাঘার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো! ও চলতে চলতে হঠাৎ থেমে থেমে দাঁড়াচ্ছে, আর কান খাড়া করে যেন কী শোনবার চেষ্টা করছে!'

ফিরে চেয়ে দেখলুম, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘা দু-কান খাড়া করে পাহাড়ের উপরদিকে তাকিয়ে আছে!

চাঁদের আলোর কথা তখনই মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল! খালি চাঁদের আলোই দেখছি একচক্ষু হরিণের মতো! কিন্তু ওই যে পাহাড়ের আশেপাশে শত শত কালো ছায়া অমাবস্যার

রহস্যকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিও যাদের ভিতরে ঢুকতে না পেরে ফিরে আসে, ওগুলোর মধ্যে কি কোনও বিভীষিকা লুকিয়ে থাকা অসম্ভব? যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি আমি তাড়াতাড়ি বিমল ও কুমারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালুম। এই দুটি লোক, অসংখ্য বিপদে অভিজ্ঞতা লাভ করে বিপদ সম্বন্ধে এদের একটা সহজ জ্ঞান হয়েছে নিশ্চয়ই!

এইবারে বাঘা রুদ্ধ ক্রোধে গর গর করতে লাগল—শত্রুর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন নিঃসন্দেহ হয়েছে! পাছে বাঘা নাগালের বাইরে ছুটে যায়, সেই ভয়ে রামহরি তাড়াতাড়ি তার গলায় শিকল লাগিয়ে দিলে!

আমার মনের ভিতরে যাইই হোক, বাইরে আমি কিন্তু এখনও কিছু দেখতে-শুনতে পেলুম না বা কোনও বিপদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলুম না! চতুর্দিক তেমনি স্থির, স্তব্ধ ও শান্তিময়!

আচম্বিতে রামহরি পাহাড়ের নীচের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো খোকাবাবু, দ্যাখো!'

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অবাক হয়ে দেখলুম, যে নির্জন পথ দিয়ে আমরা উপরে উঠেছি সেই পথ দিয়ে নীচে থেকে দলে দলে লোক নীরবে উপরপানে উঠে আসছে। আলোর ভুবনে যেন দলবদ্ধ ছায়ামূর্তি আকাশ থেকে অকস্মাৎ খসে পড়েছে!

বিমল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'যে কুলিগুলো আমাদের মোটঘাট নিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল, তারা কোথায় গেল?'

কুমার বললে, 'তারা হয় বিপদ দেখে পালিয়েছে, নয় ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে!'

বিমল কঠিন হাস্য করে বললে, 'যাক, তল্পিতল্পার ভাবনা চুকে গেল, এখন নিজেদের ভাবনা ভাবা যাক!'

ঠিক সেই সময়ে মুখ তুলে দেখি, পাহাড়ের উপরদিকেও দলে দলে নরমূর্তি ঠিক যেন পাথর ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করছে!

আমাদের নীচের ও উপরের—পিছনের ও সুমুখের, দুইদিকেই পথ বন্ধ!

বিমলের চোখ বিদ্যুৎবেগে চারিদিকটা একবার দেখে নিলে—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টর্চটাও ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দিকে সমুজ্জ্বল আলোক-রেখা নিক্ষেপ করলে!

এমন সময়ে উপরের জনতাও নীচে আমাদের দিকে নেমে আসতে লাগল!

বিমলের মুখ প্রশান্ত। কুমারের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তারও ওষ্ঠাধরে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কঠোর হাস্য। সেই ভূতভয়গ্রস্ত প্রৌঢ় রামহরি, সেও অটল পদে বিমলের পিছনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—এমনকি বাঘা পর্যন্ত সদর্পে ল্যাজ তুলে গরর-গরর করছে! প্রভু, ভৃত্য, কুকুর,—সব এক ধাতুতে গড়া! বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্যই করে না!

এদের মধ্যে আমি শেষ পর্যন্ত কোন ভূমিকায় অভিনয় করব জানি না, কিন্তু আমার মনের অবস্থা বিশেষ শান্ত নয়!

উপর ও নীচে থেকে যারা আসছে, তারা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে কোনও শব্দ শোনা গেল না। যেন তারা সবাই বোবা!

হঠাৎ বিমল পাশের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললে, 'ওই যে একটা শুঁড়িপথ, ওর শেষে একটা গুহার মতো দেখা যাচ্ছে! ওই গুহার মুখে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে হাজার শত্রু থাকলেও শুঁড়িপথের ভিতরে ঢুকতে পারবে না! ওই ঠাঁই ছাড়া আপাতত আর কোথাও আশ্রয় দেখছি না! চলো সবাই ওর মধ্যে!'

আমাদের পথ ছেড়ে ওখানে যেতে দেখে উপর ও নীচে থেকে জনতার শত শত কণ্ঠে সমুদ্রনির্ঘোষের মতো গম্ভীর এক গর্জন জেগে উঠল! এবং সে গর্জন ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে—আরও দূরে! স্তব্ধতাকে হত্যা করে এ যেন শব্দময় মৃত্যুর নৃশংস উল্লাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাবা কৈলাসের মহাদেব

সেই বিরাট জনতার বিপুল চিৎকার যখন নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতাকে নির্বাসিত করে আকাশ বাতাস ও হিমাচলকেও কাঁপিয়ে তুলছে, বিমল তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে টর্চের আলোকে গুহার ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগল। তার ভাব দেখলে মনে হয়, ও-চিৎকারে যেন ভয় পাবার কিছুই নেই, ও যেন বৈঠকখানার পাশের রাস্তায় আনন্দমেলায় সমবেত নিরীহ জনতার নিরাপদ কোলাহল!

কুমার বললে, 'গুহাটা ছোটো হলেও আপাতত আমাদের আশ্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট!'

আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত হতে পারলুম না! বললুম, 'কিন্তু আমরা হচ্ছি চারজন আর ওরা বোধহয় আড়াইশোর কম হবে না!'

কুমার আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'আজ এই গুরলা গিরিসঙ্কটে থার্মাপলির পুনরভিনয় হবে! কিন্তু হায়, আমাদের সঙ্গে কোনও কবি নেই, এই বীরত্ব-কাহিনি পৃথিবীকে শোনাবে কে? দিলীপ, তুমি পদ্য লিখতে পারো?'

এই কি কৌতুকের সময়? আমি রেগে-মেগে মাথা নেড়ে বললুম, 'না! লিখতে পারলেও এখন পদ্য নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না!'

—'তবে কী করতে?'

—'কী উপায়ে প্রাণ বাঁচানো যায়, সেই চেষ্টাই করতুম।'

—'কেবল চেষ্টা করেই যদি প্রাণ বাঁচানো যেত, তাহলে পৃথিবীতে আজ কোনও জীবজন্তুই মরত না। না-মরবার জন্যে সবাই চেষ্টা করে, তবু তো সবাই মরে! সুতরাং ও-চেষ্টা ছেড়ে ভবিষ্যতে তুমি পদ্য লেখবার চেষ্টা কোরো, তবু কবি বলে নাম কিনতে পারবে।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে এমন কোনও কবি আছেন বলে মানি না, যিনি এখন কবিতা লিখতে পারেন।'

—'আমি কবি হলে লিখতে পারতুম দিলীপ! জীবন কী? মৃত্যু কী? দীপশিখা জ্বালা আর নেবার মতোই সহজ! আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো কবি তাই বলেছেন—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'!'

তারপর একটু থেমে বিমল ডাকলে, 'কুমার!'

—'বলো।'

—'তিব্বতি হনুমানগুলো প্রায় আমাদের সামনে এসে পড়েছে। ওরা খুব জয়ধ্বনি করছে! ভাবছে আমরা ফাঁদে পড়েছি, এখন একে একে ধরে টিপে মেরে ফেললেই হয়! কিন্তু ওদের ধারণা যে ভুল, সেটা কী ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায় বলো দেখি?'

কুমার একবার মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে বললে, 'ওদের কাছেও বন্দুক আছে।'

—'কিন্তু সেকেলে গাদা বন্দুক। ইংরেজদের তিব্বত-অভিযানের সময়ে ওই বন্দুক নিয়েই ওরা বীর-দম্ভে লড়াই করতে এসেছিল, আর তার ফল কী হয়েছিল তা জানো তো? আজও দেখছি ওরা ও-বন্দুক ছাড়েনি! ও-সব বন্দুক প্রত্যেকবার মাটিতে রেখে বারুদ ঠেসে তারপর টিপ করে গুলি ছুড়তে কত সময় লাগবে বুঝেছ?'

—'হ্যাঁ, তার আগেই আমরা শত্রুদের ঝড়ে কলাগাছের মতো মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারব। ওরা অবশ্য এই শুঁড়িপথে ঢুকে হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের কাবু করবার চেষ্টা করবে।'

—'হ্যাঁ, ওরা কাছে আসতে পারলে আমরা আর বাঁচব না। কিন্তু ওরা কাছে আসতে পারবে না!'

—'এই শুঁড়িপথে একসঙ্গে দুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি চলা অসম্ভব। এ পথে ঢুকলে কেউ আর জীবন নিয়ে বেরুতে পারবে না। বেঁচে থাকুক আমাদের হাতের একেলে বন্দুক!'

—'কিন্তু ওরা যদি এই গুহা অবরোধ করে?'

—'তাহলে দু-চারদিন পরেই অনাহারে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু সে আজকের কথা নয়! আজকের কথা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'মারো মারো, শত্রু মারো'!'

—'ওই ওরা এসে পড়েছে! কুমার, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও! রামহরি, দিলীপ! তোমরা আমাদের পিছনে থাকো! এখন আমাদের দরকার, খুব-তাড়াতাড়ি বন্দুক ছোড়া! আমি আর কুমার বন্দুকের নলগুলো খালি করেই দিলীপ আর রামহরিকে দেব, তারা তাদের বন্দুক আমাদের হাতে দিয়ে আবার আমাদের বন্দুকে টোটা ভরতে থাকবে! এ ব্যবস্থায় দিলীপ আর রামহরি বন্দুক ছুড়তে পারবে না বটে, কিন্তু আমরা শত্রুদের উপরে গুলিবৃষ্টি করতে পারব অশ্রান্ত ভাবেই!'

তখন পাহাড়ের উপরকার ও নীচেকার দল একসঙ্গে মিলে গুহার শুঁড়িপথের সামনে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে! এরা সবাই তিব্বতি, আজ দুপুরে আমাদের তাঁবুর ভিতরে হঠাৎ যে বেয়াড়া মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, এদের সকলকেও দেখতে প্রায় সেই-রকম। এদের অনেকের পিঠে বন্দুকের বদলে তিরধনুকও দেখা গেল!

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ভৈরবই বোধহয় লোকজন সংগ্রহ করে পথের কাঁটা সরাবার

জন্যে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। এরা নতুন লোক! কিন্তু কারা এরা? ডাকাত, না গুপ্তধনের রক্ষক? যদিও এখনও এরা আক্রমণ করেনি, তবু এরা যে আমাদের বন্ধু নয় সেটা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে!

বিমল ও কুমার গুহার অন্ধকারে সরে এসে হুমড়ি খেয়ে বসে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করছে, বোধহয় এদের উদ্দেশ্য কী, বুঝবার জন্যেই। যদি এরা ঠিক শত্রু না হয়!

কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝতে আর বিলম্ব হল না! হঠাৎ কয়েকটা বন্দুকের গর্জন শোনা গেল এবং তারপরেই কয়েকজন লোক বিকট চিৎকার করে শুঁড়িপথের দিকে ছুটে এল! নির্বোধ!

বিমল বললে, 'ব্যস, আর দয়া নয়—আগে শুঁড়িপথ সাফ করো, তারপর চড়াইয়ের পথে যারা আছে তাদের মারো! চালাও গুলি!'

এবং বিমল ও কুমারের বন্দুকরা স্বভাষায় অনর্গল কথা কইতে শুরু করল! তাদের বন্দুক শূন্য হলেই আমাদের হাতে আসে এবং আমাদের বন্দুক যায় পূর্ণোদরে তাদের হাতে!

দুইপক্ষের বন্দুকের শব্দে, জনতার চিৎকারে, আহতদের আর্তনাদে কান আমার কালা হয়ে যাবার মতো হল, শিকল-বাঁধা বাঘাও আর কিছু সুবিধা করতে না পেরে কেবল গলাবাজির দ্বারাই আসর মাত করে তুললে!

দেখতে দেখতে শুঁড়িপথ সাফ হয়ে গেল, সেখানে পড়ে রইল কেবল হত ও আহতদের দেহগুলো! তারপর চড়াইয়ের পথে যারা ছিল গরমাগরম গুলির আস্বাদ পেয়ে তাদেরও সাহস উবে গেল, তারাও তাড়াতাড়ি পাহাড়ের আরও উপরদিকে উঠে বন্দুকের নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে কেবল চেঁচিয়ে ও লাফিয়ে আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল! এত বিপদেও তাদের বাঁদুরে ভাবভঙ্গি দেখে আমি না হেসে পারলুম না!

বাঙালির ছেলে আমি, চিরদিন আদুরে-গোপালের মতো বাপ-মায়ের কোলেই মানুষ হয়ে এসেছি, আজকের এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হতে লাগল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি রূপকথার রাজ্যে গিয়ে স্বপ্ন দেখছি!

এই হিমালয়ের জ্যোৎস্নাময় তুষারসাম্রাজ্য, এই দলবদ্ধ শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ও যুদ্ধহুঙ্কার, এই বন্দুকের ঘন ঘন বজ্রগর্জন, এই চোখের সামনে এতগুলো নরবলি, এই মৃত্যুভয়ের মূর্তিমান লীলা, এ-সমস্তই আমার কাছে নূতন—একেবারে অভিনব! গল্পে এ-রকম ঘটনা পড়া বা শোনা, আর স্বচক্ষে তা দেখা এককথা নয়। আমি অভিভূতের মতো হয়ে গেলুম।

শুঁড়িপথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আহতরা পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এবং চড়াইয়ের উপরে দশ-বারোটা দেহ একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছে—সে-হতভাগ্যরা আর কখনও পালাতে পারবে না।

বিমল বললে, 'দেখেছ কুমার, ওই জংলি-বাঁদরগুলো বন্দুকের ব্যবহারও ভুলে গেছে? এতগুলো বন্দুকের শব্দ শুনলুম, কিন্তু একটাও গুলি গুহার ভিতরে এল না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দুটো তির গুহার ভিতরে এসেছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, বন্দুকের চেয়ে ধনুকে ওদের হাত ভালো। কিন্তু এখন ওরা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে তির ছুড়লেও আমাদের কোনও ভয় নেই। ওদের তির এতদূর আসবে না।'

ওরা দূরে দাঁড়িয়ে সমানে চিৎকার করতে লাগল। আমাদের বন্দুকের প্রতাপ দেখে ওদের মন থেকে যুদ্ধ-সাধ বোধহয় একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তবু তারা ওখান থেকে নড়ল না। ওদের উদ্দেশ্য কী?

বিমল বললে, 'বোধহয় যা ভেবেছিলুম তাই। আক্রমণ করে ফল নেই বলে হয়তো ওরা আমাদের এইখানেই বন্ধ করে রাখতে চায়।'

তাহলে উপায়? আমাদের সঙ্গে চামড়ার বোতলে সামান্য জল আছে বটে, কিন্তু তা ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ? বিশ্বাসঘাতক কুলিরা আমাদের মালপত্তর নিয়ে পালিয়েছে, খাবার পাব কোথায়? অনাহারে কতদিন আত্মরক্ষা করতে পারব?

আচম্বিতে ও আবার কী ব্যাপার? আমাদের গুহার উপরে গড়-গড় করে কী-একটা শব্দ উঠল। এবং তারপরেই গুহার ঠিক মুখেই ভীষণ শব্দে বড়ো বড়ো কতকগুলো পাথর এসে পড়ল। ওরা কি পাথর ছুড়ে আমাদের মারতে চায়? গুলি গেল, পাথর? কিন্তু কোথা থেকে ছুড়ছে?

তারপর লক্ষ করে দেখলুম, এমন সব প্রকাণ্ড পাথর কোনও-একজন-মানুষের পক্ষেই ছোড়া সম্ভবপর নয়! এ-সব পাথরের এক-একখানা শূন্যে তুলতেই তিন-চারজন লোকের দরকার!

আবার গুহার গড়ানে ছাদে তেমনি গড়গড় শব্দ, আবার তেমনি কতকগুলো পাথর গুহার মুখে এসে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে শুনলুম শত্রুদের কণ্ঠে দ্বিগুণ উৎসাহে উল্লাসের চিৎকার! তখন আন্দাজ করলুম, শত্রুদের ভিতর থেকে বোধহয় একদল লোক অন্য কোনও পথ দিয়ে আমাদের গুহার ছাদে এসে উঠেছে এবং সেইখান থেকেই এই পাথরগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে ফেলে দিচ্ছে! ক্রমাগত পাথর পড়ছে, গুহা থেকে বেরিয়ে ছাদের শত্রুদের মারবারও উপায় নেই!

বিমলও ব্যাপার বুঝে বললে, 'কুমার, এইবারে আমাকে ভাবালে দেখছি! ওরা গুহার ছাদ থেকে পাথর ফেলে গুহার মুখ বন্ধ করে দিতে চায়!'

কুমার দমে গিয়ে বললে, 'সে যে জ্যান্ত কবর!'

—'কিন্তু এখন গুহা থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় গেলে হয়তো অনেক শত্রু মারতে পারব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই তাহলে আমাদের মরতে হবে!'

কুমার চুপ করে রইল।

রামহরি বললে, 'হে বাবা কৈলাসের মহাদেব! আমরা তোমার রাজ্যে এসেছি, আমাদের রক্ষা করো!'

বিমল বললে, 'কিন্তু রামহরি, মহাদেব যে প্রলয়কর্তা, সে কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ?'

রামহরি খাপ্পা হয়ে বললে, 'থামো থামো, তোমায় আর অত ব্যাখ্যানা করতে হবে না, তুমি ভারী পণ্ডিত! দুনিয়াসুদ্ধ লোক যে শিবপুজো করছে তা কি মরবে বলেই করছে?... হে বাবা কৈলাসের মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার কথায় তুমি রাগ কোরো না, তুমি আমাদের রক্ষা করো—এই পাথর পড়া বন্ধ করে দাও!'

গড়গড় আওয়াজ হচ্ছে তো হচ্ছেই, পাথরের পর পাথর পড়ছে তো পড়ছেই এবং সেইসঙ্গে বারংবার জেগে জেগে উঠছে শত শত নির্মম কণ্ঠে পৈশাচিক অট্টহাস্য! গুহার

আধখানা মুখ তখন বন্ধ হয়ে গেছে, বাকি আধখানা বন্ধ হলেই জীবন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্কের অবসান!

অর্ধরুদ্ধ গুহাপথ দিয়ে চন্দ্রকিরণ ভিতরে ঢুকে তখন নীরব ভাষায় যেন ডাক দিয়ে বলছিল, 'বন্ধু, এখন কি আমায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে না?'

কুমার বললে, 'রামহরি, এত রাতে আর এই শীতে শিব কৈলাসপুরীতে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তোমার প্রার্থনা তিনি শুনতে পাননি!'

রামহরি বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'ও হচ্ছে ক্রিশ্চানের কথা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কি তোমার-আমার মতো? পৃথিবী তাঁদের মুখ চেয়ে আছে, তাঁরাও পৃথিবীর শিয়রে দিন-রাত জেগে বসে আছেন! তাঁরা যদি আমাদের দয়া না করেন তাহলে বুঝব আমরাই মহাপাপী, দয়ার যোগ্য নই!'

অশিক্ষিত রামহরির সরল বিশ্বাসের কথা শুনে আমার চোখে জল এল।

বিমল বললে, 'কুমার, আমি এই অন্ধকূপের মধ্যে দিনে দিনে তিলে তিলে মরতে পারব না!'

—'কী করবে?'

—'এখনও বাইরে যাবার পথ আছে। আমি বাইরে যাব!'

—'তারপর?'

—'তারপর শত্রু মারতে মারতে বীরের মতো হাসতে হাসতে মরব।'

—'আমারও ওই মত। দিলীপ, কী বলো?'

কোনওরকমে মনের আবেগ সামলে বললুম, 'আমার কোনও মত নেই। তোমরা যা বলবে তাই করব।'

আচম্বিতে বাইরের সমস্ত চিৎকার একসঙ্গে থেমে গেল এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল, বহু—বহু দূরে অনেকগুলো জয়ঢাক ও তূরী-ভেরি বেজে উঠেছে! হিমারণ্যের এই অপরিসীম নিস্তব্ধতায় বহুদূরের শব্দকেও মনে হয় যেন কাছের শব্দ বলে। তাই কত দূর থেকে সেই তূরী-ভেরি ও ঢাকের শব্দ আসছে, ভালো করে সেটা বোঝা গেল না।

রামহরি খুশি কণ্ঠে বললে, 'খোকাবাবু, খোকাবাবু, পাথর আর পড়ছে না!'

আমি সাগ্রহে বললুম, 'ব্যাপার কী বিমল?'

বিমল বললে, 'কিছু তো আমিও বুঝতে পারছি না! তবে কৈলাসের মহাদেব এসে যে ওদের পাথর ছুড়তে বারণ করেননি, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই! কিন্তু ওই ঢাক আর ভেরী বাজছে কেন? ও কি কোনও সঙ্কেতধ্বনি?'

গুহামুখে যে পাথরগুলো জড়ো হয়েছে তার উপর দিয়ে দেহের আধখানা বাড়িয়ে কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! ওরা চলে যাচ্ছে!'

—'চলে যাচ্ছে!'

—'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে! দৌড়চ্ছে! যেখানে ওরা এতক্ষণ ছিল, সে-জায়গাটা প্রায় খালি হয়ে গেছে!'

রামহরি গদগদ কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, 'হে বাবা কৈলাসের মহাদেব, ওদের সুমতি দাও বাবা, ওদের সুমতি দাও! কলকাতায় গিয়ে খুব ঘটা করে আমি তোমাকে পুজো দেব!'

কুমার বললে, 'ব্যস, পাহাড়ের উপরে আর কেউ নেই! পথ সাফ!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এটা হতভাগাদের নতুন কোনও চাল নয় তো? হয়তো আমাদের বাইরে বার করবার আর একটা ফিকির!'

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা গুহার ভিতরে বসে রইলুম, কিন্তু বাইরে আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না।

বিমল ফিরে হাসতে হাসতে বললে, 'রামহরি, মহাদেব সত্যিই ঘুমোন না! তিনি তোমার কথা শুনতে পেয়েছেন!'

রামহরি বললে, 'কলকাতায় গিয়ে আমাকে দশটা টাকা দিয়ো। আমি ঠাকুরকে পুজো দেব বলে মানত করেছি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, সমস্ত ব্যাপারটাই যে রহস্যময় আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে!'

—'চলো, বাইরে গেলে হয়তো একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে।'

আমরা পাথরের স্তূপ টপকে একে একে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে, যে-সব পাহাড়ের শিখর এতক্ষণ জ্যোৎস্নাময় হয়েছিল, এখন তারা হয়েছে ছায়াময়। এবং যেখানে ছিল ছায়া, সেখানে এসেছে আলো।

শুঁড়িপথে জন-পাঁচেক তিব্বতি মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের প্রাণবধ করতে এসে এরা নিজেদের প্রাণই রক্ষা করতে পারলে না। পৃথিবীতে মানুষের যদি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাকত, তাহলে জগতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহই ঘটত না! অনেক পাপীও সাবধান হত।

মৃতদেহগুলোর বিকৃত ভয়ানক মুখ দেখে শিউরে উঠলুম। কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে আবার চড়াইয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

হঠাৎ আমার পায়ের তলায় কে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'বাবুজি, পানি!'

চমকে চেয়ে দেখি, সেখানে একজন আহত তিব্বতি পড়ে রয়েছে!

বিমল তখনই নিজের বোতল থেকে তার মুখে জল ঢেলে দিলে। বন্দুকের গুলি তার বুকে লেগেছে। সে এত হাঁপাচ্ছে যে বেশ বোঝা গেল, তার মৃত্যুর আর দেরি নেই!

বিমল হিন্দিতে শুধোলে, 'তোমাদের লোকজনরা হঠাৎ পালিয়ে গেল কেন?'

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'লামারা বিপদের সঙ্কেত করেছে বলে চলে গেছে। তারা পালায়নি।'

—'তাই কি ভেরি আর ঢাক বাজছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিপদটা কীসের?'

—'বোধহয় গুপ্তধনের গুহায় চোর ঢুকেছে!'

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বিমল হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কী ভেবে আবার বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা আমাদের আক্রমণ করেছিলে কেন?'

—'পুরাংয়ে কজন বাঙালিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম। জুম্পানওয়ালাকে (শাসনকর্তাকে) অনেক টাকা জরিমানা দিয়ে তারা ছাড়ান পায়। সেই বাঙালিদের মুখে শোনা গেল, গুপ্তধন আনবার জন্যে তোমরা এদিকে এসেছ। জুম্পানওয়ালা তাই আমাদের পাঠিয়েছে।'

—'আর সেই বাঙালিরা?'

—'জানি না, বাবুজি, আর আমি কিছু বলতে পারব না—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে আর একটু জল দাও।'

বিমল তার গলায় আবার জল ঢেলে দিলে। মিনিট দশ পরে সে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করলে।

বিমল বললে, 'চমৎকার!'

কুমার বললে, 'চমৎকার আবার কী?'

—'এই ভৈরবের বুদ্ধি! বেশ বোঝা যাচ্ছে, শাসনকর্তাকে ঘুষ দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। তারপর এখানকার সেপাই-চৌকিদারদের চোখ আমাদের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তারা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্যমনস্ক হয়ে আছে, আর সেই ফাঁকে ভৈরব তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছে! কিন্তু এমন চমৎকার চালাকি খাটিয়েও ভৈরব বোধহয় শেষরক্ষা করতে পারেনি। লামার দল তাদের আবিষ্কার করে ফেলেছে, জয়ঢাক প্রভৃতি বাজিয়ে তাই তারা করেছে সাহায্যপ্রার্থনা! এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল! এখন নাটকের শেষ-অঙ্কের অভিনয় হচ্ছে,—চলো, চলো, আমাদের যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হতে হবে!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভৈরবের পুনঃপ্রবেশ

আমরা যখন গুরলার উপরে উঠে ওপাশের উতরাই দিয়ে নীচের দিকে নামছি, তখন চাঁদের আলো ধীরে ধীরে ঊষার আলোর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে! কোনও অদৃশ্য চিত্রকর যেন দু-রকম আলো-রং একসঙ্গে মিলিয়ে নতুন কোনও অপূর্ব ছবি আঁকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন!

কুয়াশার ভিতর থেকে যেন রূপকাহিনীর মায়াজগৎ একটু-একটু করে আত্মপ্রকাশ করছে।

ক্রমে কুয়াশার স্বপ্ন-যবনিকা বিরাট কোনও রঙ্গালয়ের অর্ধ-স্বচ্ছ পাতলা পরদার মতো ধীরে ধীরে শূন্যে উপরে উঠতে লাগল দুলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে!

ওই সেই ভুবনবিখ্যাত কৈলাস পর্বত,—নীলিমার কোলে যেন তুষারে-গড়া বিরাট এক শিবলিঙ্গ! গৌরী ঊষার অরুণ কিরণ-কুসুম প্রভাতী পূজার নিবেদনের মতো মহাতাপস শিবের তুষার-কান্তির উপরে এসে পড়ে তাকেও রাঙা করে তুললে!

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এ কী! সরোবর, না সাগর? নীলাকাশের অসীমতার তলায় আর এক বিপুল নীলিমার সৃষ্টি করে রাবণ হ্রদ প্রভাতের প্রথম আলোকের আশীর্বাদ গ্রহণ

করছে! ধু-ধু-ধু প্রস্তরমরুপ্রান্তরে মাইলের পর মাইল থই-থই করছে অগাধ জলের রাশি! স্বপ্নাতীত মহাবিস্ময় যেন মূর্তি ধরেছে!

এমন মনোহর সরোবর, যেখানে এলে তপস্যা করতে সাধ যায়, সেখানে কিন্তু লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত দেখলুম না। মরুভূমিতেও লোকের বসতি থাকে, কিন্তু এ যেন অভিশপ্তের মুল্লুক! সেইজন্যেই কি একে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষস তাল বলে ডাকা হয়? মনে পড়ল, পথে একজন লোক সাবধান করে দিয়েছিল যে, রাক্ষস তালের রূপ দেখে ভুলে যেন তার জলে নামতে না যাই! কেন, এখানে তো ভয়ের কিছুই দেখছি না! ... কিন্তু একটু পরেই আমরা ভয়ের কারণ বুঝতে পারলুম!

রামহরি শিবলিঙ্গরূপী আশ্চর্য কৈলাস-শিখর দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বোম মহাদেব! আজ আমার জন্ম সার্থক হল!'—বলেই সে পাহাড়ের উপরে দণ্ডবত হয়ে শুয়ে পড়ে প্রণামের পর প্রণাম ঠুকতে লাগল!

আমিও কৈলাসের সূর্যোদয় দেখতে দেখতে ভুলে গেলুম আর সব কথা!

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো,—ও কী কাণ্ড!'

চমকে ফিরে কুমারের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবিস্ময়ে দেখলুম, রাবণ হ্রদের পাশ দিয়ে নানা-রঙা নুড়ি-ছড়ানো পথে ছয়-সাতজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে গুরলার দিকেই!

কে ওরা? দূর থেকে চেনা গেল না! কিন্তু অমন করে ছুটছে কেন? যেন ওদের বাঘে তাড়া করেছে!

তারা আরও কাছে এসে পড়ল! ... ক্রমে আরও কাছে!

এমন সময়ে তাদের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে দেখা গেল পিঁপড়ের সারির মতো দলে দলে লোক! তারাও ছুটে আসছে! তাহলে প্রথম দল পালাচ্ছে ওদেরই ভয়ে?

বিমল উৎকট আনন্দপূর্ণ স্বরে বললে, 'কুমার, আমাদের প্রিয়বন্ধু ভৈরব আর তার স্যাঙাতদের চিনতে পারছ কি? পিছনে তিব্বতি পঙ্গপাল নিয়ে ওরা এইদিকেই আসছে!'

ভৈরব, ভৈরব! আবার তাহলে ভৈরবের সঙ্গে দেখা হল,—আমার পিতৃহত্যাকারী ভৈরব! হ্যাঁ, আজ আমি তার সঙ্গে শেষবার দেখা করতে চাই!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই হাতে বড়ো বড়ো এক-একটা বাক্স রয়েছে কেন?'

বিমলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'ওগুলোকে বড়ো বাক্স না বলে ছোটো সিন্দুক বলাই উচিত! ওগুলোর ভিতরে কী আছে?'

রামহরি আমাদের সকলের মনের সন্দেহ ভাষায় প্রকাশ করে বললে, 'গুপ্তধন নয় তো?'

বিমল বললে, 'তা ছাড়া আর কী হতে পারে? প্রাণের ভয়ে পালাবার সময়েও ওরা যখন সিন্দুকগুলো ছাড়েনি, তখন ওদের মধ্যে খুব দামি জিনিস ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারে না!'

রামহরি আশ্চর্য স্বরে বললে, 'ওরা যকের ধন নিয়ে এল, ভূত কিছু বললে না!'

খেদে দুঃখে আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার মতো হল! সাত ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে হাজির হলুম কি এই দেখবার জন্যে?

কুমার আমার চিন্তার প্রতিধ্বনি করে বললে, 'বিমল, বিমল! আমাদের চোখের সামনে ওরা গুপ্তধন নিয়ে পালাবে, আর আমরা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব?'

বিমল বললে, 'ওরা আর কোথায় পালাবে কুমার? ওদের পিছনে পঙ্গপালের মতো শত্রু, ওদের একপাশে পাহাড়, আর একপাশে হ্রদ, ওদের সুমুখে আছি আমরা,—আর ওরা এদিকেই আসছে সিন্দুকগুলো আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে! আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল! ... আমি এখন খালি এই কথাই ভাবছি যে, সিন্দুকগুলো ওদের হাত থেকে নিতে কত সময় লাগবে? তার মধ্যে তিব্বতি হনুমানগুলো কাছে এসে পড়বে না তো? আমাদেরও তো যথাসময়ে পালাতে হবে?'

কুমার বললে, 'তিব্বতিরা এখনও অনেক তফাতে আছে, আমাদের কাছে আসতে হলে এখনও ওদের আধমাইল পথ পার হতে হবে!'

আমি ব্যগ্রভাবে বললুম, 'কিন্তু ভৈরবরা যে এসে পড়ল! ওরাও আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে!'

বিমল বললে, 'ওদের পালাবার আর কোনও পথ নেই! আবার ধরো বন্দুক! অগ্রসর হও!'

বন্দুক তুলে আমরা বেগে তাদের আক্রমণ করতে ছুটলুম!

প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভৈরবরা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল,—আমাদের এখানে দেখবার জন্যে ওরা কেউই প্রস্তুত ছিল না! ভৈরব একবার পিছনপানে তাকালে, কিন্তু সেদিকের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর! কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে, জনতার যেন শেষ নেই! এ জনতা-সাগর কাছে এসে পড়লে ভৈরবের সঙ্গে আমাদেরও কোথায় তলিয়ে যেতে হবে!

বিমল একবার বন্দুক ছুড়লে,—বোধহয় ভৈরবকে ভয় দেখাবার জন্যেই, কারণ গুলি কারুর গায়েই লাগল না!

ভৈরব মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে বললে, 'ভাই-সব! জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো! সাঁতার দাও!'

চোখের নিমেষে তারা সাতজনেই রাবণ হ্রদের দিকে ফিরল!

বহুদূর থেকে তিব্বতিদের কণ্ঠে আবার প্রায় সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর চিৎকার জেগে উঠল—তারাও ভৈরবদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে! কিন্তু তারা চ্যাঁচালে কেন? ওরা জলে ঝাঁপ দিলে গুপ্তধনের সিন্দুকগুলো ডুবে যাবে বলে?

বিমল অট্টহাস্য করে চেঁচিয়ে বললে, 'আর কোথায় যাবে তুমি ভৈরব? তুমি যদি জলে ঝাঁপ দাও, আমি পাতালে গিয়েও তোমাকে ধরব!'

কুমার বললে, 'হয় বাক্সগুলো দাও, নইলে জলে পড়েও বাঁচবে না!'

কিন্তু তারা কেউ আমাদের কথায় কানও পাতলে না—একবার ফিরেও তাকালে না! আমরা তাদের কাছে যাবার আগেই তারা অতি বেগে রাবণ হ্রদের মধ্যে গিয়ে পড়ল!

তারপরেই চোখের সুমুখে যে অভাবিত ও ভয়ানক দৃশ্য জেগে উঠল তা আমাদের সকলেরই দেহ প্রস্তর-মূর্তির মতো আড়ষ্ট করে দিলে! সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলুম, এই হ্রদের নাম রাক্ষস তাল হয়েছে কেন? আমি হলে এ হ্রদের নাম রাখতুম 'মৃত্যু-সায়র'! সে দৃশ্যের কথা মনে হলে ভয়ে এখনও আমার সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে যায়! কিন্তু হয়তো এটা বিধাতার দেওয়া শাস্তি!

ভৈরবের দলের ছয়জন লোক দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ঠিক পাগলের মতোই জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল! কিন্তু হাঁটুজলে গিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তাদের প্রত্যেকের দেহ কোমর পর্যন্ত হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তারা সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল!

তারপর দেখতে দেখতে তাদের বুক পর্যন্ত ডুবে গেল—যেন পাতাল তাদের পা ধরে সজোরে আকর্ষণ করছে!

রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—'চোরাবালি! চোরাবালি!'

অভাগারা পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে বললে, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'—কিন্তু জীবন যেতে বসেছে, তবু তারা সিন্দুকগুলো ছাড়লে না—বরং যেন আরও-বেশি জোরে দুই হাতে বুকের উপরে আঁকড়ে ধরে রইল! আমার বিশ্বাস, ওই সিন্দুকগুলোর ভারেই তাদের দেহ বেশি-শীঘ্র চোরাবালির মধ্যে বসে যাচ্ছে!

রামহরি আবার চ্যাঁচালে—'লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো! লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো!'

কিন্তু কে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে? তখন তাদের গাল পর্যন্ত বসে গেছে এবং মুখ খালি চিৎকার করছে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে!

বিমল একবার জলের ভিতরে পা বাড়াল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তারও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল!

রামহরি একলাফে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড টান মেরে তাকে সরিয়ে আনলে!

বিমল বললে, 'এ কী ভয়ানক মৃত্যু! আমরা কি কোনও সাহায্যই করব না?'

কুমার বললে, 'নিজেদের প্রাণ দিয়ে? দুরাত্মাদের জন্যে আমি প্রাণদান করতে রাজি নই!'

তখন কারুর দেহ একেবারে তলিয়ে গিয়েছে, কারুর কেবল মাথা দেখা যাচ্ছে এবং কোথাও বা একখানা হাতমাত্র জলের উপরে জেগে ছটফট করছে!

কিন্তু পালের গোদা ভৈরব ছিল সর্বশেষে, ঝাঁপ দেবার আগেই দলের লোকের অবস্থা দেখে সে আর জলে নামেনি!

এতক্ষণ সে আড়ষ্টের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, প্রবল উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি!

আমরাও এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে হঠাৎ অমন মৃত্যুফাঁদে পড়তে দেখে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলুম।

এখন আমার হুঁশ হল! তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি ভৈরব যেখানে ছিল সেখানে আর নেই!

সেও জলে ঝাঁপ দিলে নাকি? না, তাহলে এত-শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে যেত না!

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিব্বতিরা চিৎকার করতে করতে অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। সেদিকেও ভৈরব নেই!

চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল! কুমার! ভৈরব কোথায় গেল?'

তারা বিদ্যুৎ-বেগে ফিরে দাঁড়াল! এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বিমল বললে, 'ভৈরব কী আবার ফাঁকি দিলে?'

রামহরি বললে, 'ওই যে, শয়তান পাহাড়ে উঠছে!'

তাই তো! সিন্দুকটা কাঁধে করে ভৈরব দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে!

বিমল বললে, 'ভৈরব, যদি বাঁচতে চাও এখনও দাঁড়াও!'

ভৈরব দাঁড়াবার নামও করলে না!

বিমল বললে, 'প্রাণ থাকতে তোমাকে পালাতে দেব না! বাঘা!'

বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিমল হাত দিয়ে ভৈরবকে দেখিয়ে ইশারা করে বললে, 'বাঘা! ধর ওকে!'

বাঘা লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের দিকে ছুটল এবং আমরাও তার অনুসরণ করলুম!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যবনিকা পতনের আগে

মেঘলোকবাসী পবিত্র কৈলাস-শিখর এবং হিমাচলবাসী আরক্ত প্রভাতসূর্য নীলপদ্মনীল রাবণ হ্রদকে দেখে আসছে না জানি কত হাজার হাজার শতাব্দী ধরে; এই নির্জন তটভূমিতে গীতকারী পাখির তান বা হরিৎ অরণ্যের গান পর্যন্ত জাগে না, মাঝে মাঝে এখানকার ধ্যানমৌন বিজনতা ভঙ্গ করে শ্রান্তদেহে পথ পেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় কেবল মানস সরোবর ও কৈলাসের যাত্রীরা! কিন্তু এখানে আজ অকস্মাৎ যে মৃত্যু-দৃশ্যের অভিনয় চলছে, সৈন্যদল চলাচল করছে, আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করছে, মহাদেব ও সূর্যদেব তা দেখে কি বিস্মিত হচ্ছেন না?

এখনও বুঝতে পারছি না এই সাংঘাতিক নাটকের সমাপ্তি কোথায়? একটা ঘটনা শেষ হতে না হতেই নূতন ঘটনার আবির্ভাব হচ্ছে, একটা বিপদের পিছনে ছুটে আসছে আর-একটা বিপদ, যেন বায়োস্কোপের এক অনন্ত 'সিরিয়াল' ছবি! কিন্তু ভৈরবের মতন পিচ্ছল দুরাত্মা আমি কোনও চলচ্চিত্রেও দেখিনি! আজ ভাবলুম সব লুকোচুরি শেষ হল—কিন্তু আবার সে পালিয়ে গেল আমাদের হাত পিছলে!

পাহাড়ের অপথ-বিপথ দিয়ে একটা সিন্দুক ঘাড়ে করে মানুষ যে এত তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে পারে, আজ স্বচক্ষে ভৈরবের পলায়ন না দেখলে কখনও আমি বিশ্বাস করতুম না! প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এই বুঝি সে পা হড়কে আছাড় খেয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়ে, কিন্তু তার পরেই দেখি, সে নিজেকে আশ্চর্য ভাবে সামলে নিয়ে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফ মারছে! মানুষ এমন মরিয়াও হতে পারে!

বাঘা যদি সমতল ক্ষেত্রে থাকত, তাহলে ভৈরবকে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারত! কিন্তু এই দুরারোহ পাহাড়ের উপরে উঠে ভৈরবকে ধরা তার পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠল! শেষ পর্যন্ত সে হয়তো ভৈরবকে ধরতেই পারবে না!

আমরাও প্রাণপণে পাহাড়ে উঠছি। উঠতে উঠতে আমি বললুম, 'বিমল, ভৈরবকে ধরবার ঝোঁকে নিজেদের বিপদের কথা যেন ভুলে যেয়ো না! পিছনে তিব্বতি সেপাইরা আছে, তারা আর মিনিট ছয়-সাতের মধ্যেই পাহাড়ের তলায় এসে পড়বে!'

বিমল প্রায় ডিগবাজি খেয়ে নীচে থেকে উপরের একখানা পাথরে উঠে বললে, 'আমি তাদের কথা ভুলে যাইনি। কিন্তু তারা বোধহয় অনেকক্ষণের জন্যেই আমাদের কথা ভুলে যাবে!'

কুমার হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঢালু জায়গা পার হয়ে বললে, 'কেন?'

—'গুপ্তধন যে কারা চুরি করেছে সেটা তারা স্বচক্ষেই দেখেছে। আর এটাও তাদের চোখ এড়ায়নি যে, চোরেরা সিন্দুক জড়িয়ে হ্রদের চোরাবালির তলায় আশ্রয় নিয়েছে! তখন তারা অত চ্যাঁচাচ্ছিল কেন জানো? হ্রদ যে বিপজ্জনক, নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে চোরদের সাবধান করবার জন্যে! চোরদের প্রাণের চেয়ে তাদের কাছে ঢের বেশি মূল্যবান হচ্ছে ওই সিন্দুকগুলো! আমার বিশ্বাস এখন তারা চোরাবালির ভিতর থেকে রত্নোদ্ধার করতেই ব্যস্ত থাকবে। সে বড়ো অল্প সময়ের কাজ নয়—ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে সরে পড়তে পারব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা চোর যে সিন্দুক নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠেছে!'

—'গোলমালে আমরাই যা প্রথমে দেখতে পাইনি, অতদূর থেকে তিব্বতিরা কি সেটা লক্ষ করতে পেরেছে?'

এখন ভৈরব বা বাঘা কারুকেই দেখা যাচ্ছে না, কেবল পাহাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে বাঘার চিৎকার! সেই চিৎকার শুনেই বুঝতে পারছি কোন দিকে যেতে হবে!

কুমার ক্রুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'রাস্কেল ভৈরব! আমার যে দম ছুটে গেল! এখনও সে কতদূরে আছে?'

বিমল বললে, 'বোধহয় আর বেশি দূরে নেই! খুব কাছেই বাঘার চিৎকার শোনা যাচ্ছে!'

—'লোকটার গায়ে শক্তি তো কম নয়! অত বড়ো একটা বোঝা নিয়ে এখনও এই পথ দিয়ে উঠতে পারছে!'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'হুঁ। বলবান বটে!'

এমন সময়ে একটা উঁচু পাথরের উপরে লাফিয়ে উঠেই দেখি, সামনেই খানিকটা সমতল জায়গা এবং তার উপর দিয়ে প্রথমে ভৈরব ও তার পিছনে বাঘা বেগে দৌড়াদৌড়ি করছে!

আমি মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বিমল! কুমার! এই যে ভৈরব!'

তারাও এক এক লাফে আমার পাশে এসে দাঁড়াল!

ভৈরব বাঘাকে এড়াবার জন্যে শেষে সিন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়েই ছুটতে শুরু করলে—কিন্তু বাঘা এখন সমতল জমি পেয়েছে, তার সঙ্গে ভৈরব পারবে কেন?

বাঘাকে তখন দেখলে সত্যই ভয় হয়! তার বাঘের মতন ছোপ-ধরা প্রকাণ্ড দেহ ক্রোধে ফুলে যেন আরও বড়ো হয়ে উঠেছে, রাঙা-টকটকে জিভখানা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, পথশ্রমে মুখের দুপাশ দিয়ে ফেনা ঝরছে, বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতগুলো শিকার ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তীক্ষ্ণ দুটো চক্ষুতে ফুটেছে ক্ষুধিত হিংসার বিদ্যুৎ! সে একবার মস্ত লাফ মেরে

ভৈরবের বুক পর্যন্ত উঠে তার গলা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, ভৈরব তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্যদিকে ছুটে গেল!

কুমার উৎসাহে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাহবা বাঘা! বাহাদুর বাঘা! ধর ওর টুঁটি কামড়ে!'

ভৈরব ছুটতে ছুটতে বিষম চেঁচিয়ে বললে, 'রক্ষা করো! আমি ধরা দিচ্ছি!'

কুমার বললে, 'বাঘা, থাম!'

বাঘা অমনি দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন নিশ্চল মূর্তি! আশ্চর্য শিক্ষিত কুকুর!

আমরা সকলে যখন ভৈরবের চারপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে তখন দুই হাতে ভর রেখে মাটিতে বসে পড়ে হেঁটমুখে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে!

খানিকক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম—এমন ভয়ানক মানুষ দ্রষ্টব্য জীবই বটে! আমাদেরই মতন দেখতে তার দেহ, কিন্তু তার মন যে কোনও পশুর চেয়েও হীন! এক-একজন মানুষকে সৃষ্টিকর্তা এমন করে গড়েন কেন?

বিমল তার সামনে বসে পড়ে বললে, 'তারপর ভৈরব! এখন কী করা যেতে পারে তোমাকে নিয়ে?'

ভৈরব তার তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটো তুলে হেসে বললে, 'আমাকে নিয়ে? কী করতে চাও তুমি?'

বিমল বললে, 'আমি কী করতে চাই? আচ্ছা, আগে তোমার কীর্তিকলাপের ফর্দটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। প্রথমত, তুমি দিলীপের বাবাকে হত্যা করেছ। দ্বিতীয়ত, তুমি কিষণ সিংকে হত্যা করেছ। তৃতীয়ত, তুমি আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করেছ। বার বার গুপ্তধনের ম্যাপ চুরি, আমাদের পিছনে তিব্বতিদের লেলিয়ে দেওয়া, তোমার এ-সব কীর্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এখন তুমিই বলো দেখি, আমাদের কাছ থেকে কতটুকু দয়া তোমার প্রত্যাশা করা উচিত?'

ঘৃণায় ওষ্ঠাধর বেঁকিয়ে ভৈরব ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'দয়া? দয়া আমি কারুর কাছেই প্রত্যাশা করিনি! আমি আমার কর্তব্যপালন করেছি। দিলীপের ঠাকুরদা আমার বাবাকে খুন করেছিল। আমি তারই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।'

আমি বললুম, 'মিথ্যা কথা!'

—'মিথ্যা কথা? জানো তুমি দিলীপ, গুপ্তধনের গুহায় গিয়ে আমি আমার বাবার কঙ্কাল আবিষ্কার করেছি? সেই কঙ্কালের পাশে এখনও একখানা ছোরা পড়ে আছে! তিব্বতিদের ভয়ে তোমার ঠাকুরদা আমার বাবাকে মেরেও গুপ্তধন আনতে পারেনি। এ-সব কথা আমি আমার মায়ের মুখে শুনেছি।'

বিমল বললে, 'তোমার বাবা হয়তো তোমার মতোই সাধু ছিলেন! হয়তো তাঁকে মেরে দিলীপের ঠাকুরদা কোনও অন্যায়ই করেননি—যেমন আজ তোমাকে বধ করলে আমাদেরও কোনও অন্যায় হবে না।'

ভৈরব অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তোমাদের সঙ্গে আমি আর কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। তোমরা জিতেছ, আমি হেরেছি। যদিও আসলে জয়ী হয়েছি আমিই। কারণ গুপ্তধনের গুহায় তোমরা ঢুকতে পারোনি, কিন্তু পথ থেকে সমস্ত বাধা সরিয়ে

আমিই সেই বিশাল গুহা আবিষ্কার করেছি, তার ভিতরে ঢুকেছি, সেখানকার কুবেরের ঐশ্বর্য স্বচক্ষে দেখেছি। যে অফুরন্ত ধনরত্ন সেখানে থরে থরে সাজানো আছে, তোমরা কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি তার কয়েকটি কণা মাত্র! আমার দলের লোকরা যদি নিরেট বোকার মতো আচ্ছন্ন আর অবাক হয়ে, আমার নিষেধ অমান্য করে গুহার ভিতরে অতক্ষণ বসে না থাকত, বিহ্বল হয়ে গোলমাল না করত, যথাসময়ে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে তিব্বতি বানরগুলো কিছুই টের পেত না, তোমরাও আমাদের ধরতে পারতে না, আর আমার সঙ্গীদেরও পাতালপ্রবেশ করতে হত না। এই সিন্দুকগুলো পাহাড়ের অন্য কোনও গুহায় লুকিয়ে রেখে, আমরা আবার সেখানে যেতুম, আবার আরও ধনরত্ন নিয়ে আসতুম! কিন্তু সেখানে যাবার পথ এখন একেবারে বন্ধ,—তিব্বতিরা সাবধান হয়ে গেছে, তোমরাও তাদের চোখে আর ধুলো দিতে পারবে না! এখন এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্ছে যে, নিয়তির চক্রান্তে সফল হয়েও আমি বিফল হয়েছি বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তোমাদেরও সব আশা নির্মূল হয়েছে!'—এই বলে সে পাগলের মতো অট্টহাস্য করে উঠল!

বিমল গম্ভীর ভাবে বললে, 'ভৈরব, তোমার বক্তৃতা এতক্ষণ ধরে শুনলুম। এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, অতঃপর তোমাকে নিয়ে কী করা যেতে পারে?'

ভৈরব সগর্বে বললে, 'তোমরা আমাকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারো, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। তোমরা চারজন, আমি একলা। তোমাদের অস্ত্র আছে, আমি নিরস্ত্র—গুহা থেকে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে আমার বন্দুকটা পর্যন্ত ফেলে এসেছি। কাজেই তোমাদের বাধা দেবার কোনও শক্তিই আমার নেই।'

বিমল মৃদু হেসে হাতের বন্দুকটা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলে। কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটাও বার করে রামহরির হাতে দিলে। তারপর ধীর স্বরে বললে, 'আমিও এখন তোমার মতোই নিরস্ত্র।'

—'আর তোমার দলের লোকরা?'

—'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার দলের কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না।'

ভৈরব বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'তোমার উদ্দেশ্য কী?'

বিমল শান্ত স্বরে বললে, 'আমি আগে ন্যায়যুদ্ধে একলা তোমার দর্পচূর্ণ করতে চাই। তারপর ভেবে দেখব, কোন শাস্তি তোমার উপযুক্ত।'

—'তুমি আমার সঙ্গে হাতাহাতি লড়বে?'

—'হ্যাঁ।'

—'যদি আমি জিতি?'

—'তাহলে তুমি স্বাধীন! ওই সিন্দুকটা নিয়ে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো!'

মহা আনন্দে ভৈরবের দুই চক্ষু জ্বল-জ্বল করতে লাগল! সে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'তাহলে ধরে নাও, আমি এখনই স্বাধীন হয়েছি! আমার এই হাত দুখানা দেখছ তো?

এই দুখানা হাত অনেক বড়ো বড়ো পালোয়ানকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। খালি হাতে তোমরা চারজনও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমি হাসতে হাসতে লড়তে রাজি আছি!'

বিমল হেসে বললে, 'তোমাকে আর অতটা বাহাদুরি দেখাতে হবে না। তুমি কেবল আমার সঙ্গেই লড়ো!'

ভৈরব যখন তার বিপুল দেহ আরও ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন বিমলের জন্যে আমারও ভয় লাগল! বিমলের চেয়ে তার চেহারা কেবল বড়োই নয়, জোয়ানও বটে!

রামহরি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'খোকাবাবু, ও-পাপিষ্ঠের সঙ্গে তোমার আর লড়ে কাজ নেই!'

বিমল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তুমি থামো রামহরি!'

কুমারের দিকে তাকালুম, সে কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্তের মতো দুই পা ছড়িয়ে বসে বাঘার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—তার মুখে মৃদু মৃদু হাসি! যেন যুদ্ধের ফল কী হবে সেটা সে এখন থেকেই জানে!

বিমল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভৈরব, তুমি কী লড়বে? কুস্তি, ঘুসি, না যুযুৎসু?'

—'কুস্তি!'

কুমার বললে, 'কিন্তু সাবধান ভৈরব! অন্যায় যুদ্ধ করলে আমাদের কাছ থেকে তুমি একতিল দয়াও পাবে না!'

ভৈরব নির্দয় হাস্য করে বললে, 'একটা তুচ্ছ লোককে হারাবার জন্যে অন্যায় যুদ্ধের দরকার হবে না! তোমার বন্ধুকে আমি ধরব, আর আছাড় মারব! হুঁশিয়ার!'

বুনো মোষের মতো সে তেড়ে এসে বিমলকে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বিমল সাঁৎ করে তার নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল! ভৈরব আবার সেই চেষ্টা করলে, কিন্তু সেবারেও কোনও সুবিধা করতে পারলে না!

আমি বিমলের শক্তির কথা ঠিক জানি না, কিন্তু গোড়াতেই এটা বুঝতে পারলুম যে, ভৈরবের চেয়ে তার গতি বেশি ক্ষিপ্র!

ভৈরব আবার আক্রমণ করলে, কিন্তু এবারে বিমল আর সরে গেল না, দুজনেই দুজনের কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল এবং দুজনেই দুজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলবার জন্যে প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল!

উত্তেজনায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল—এইবারেই আসল পরীক্ষা!

বিমলের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভৈরবের মুখ দেখলুম রাঙা-টকটকে হয়ে উঠেছে! নিশ্চয়ই দেহের সমস্ত শক্তি সে ব্যবহার করছে!

কিন্তু বিমল ভূমিসাৎ হল না, হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিলে। বুঝলুম, ভৈরবের চেয়ে সে বেশি-কৌশলী!

আবার দুজনে খানিকক্ষণ জড়াজড়ি হল, আবার ভৈরবের পেশিস্ফীত বাহু ছাড়িয়ে বিমল সরে এল।

ভৈরব হাঁপাতে শুরু করলে, কিন্তু বিমলের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। বুঝলুম, বিমলের দম বেশি! আমার মনে আশার উদয় হল।

ভৈরব এতক্ষণ লড়ছিল হাসতে হাসতে। কিন্তু তার মুখ এখন গম্ভীর। সে বুঝে নিয়েছে, কেবল গায়ের জোরে বিমলকে সহজে কাবু করা যাবে না, এবং তাকে তাড়াতাড়ি কাবু করতে না পারলে শেষটা হয়তো দমের জোরেই বিমল তাকে কাবু করে ফেলবে!

এতক্ষণ বিমল শুধু আত্মরক্ষাই করছিল, এইবারে হঠাৎ বেগে আক্রমণ করলে, বোধ হয় সে ভৈরবের শক্তির মাত্রা বুঝে নিয়েছে!

ভৈরব তার আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—বিমল তাকে মাটি থেকে দুই হাত উঁচুতে তুলে হাত-চারেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে!

তার শক্তি সম্বন্ধেও আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না, সানন্দে আমি কুমারের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখি, সে তখনও সেই ভাবে বসেই বাঘার গায়ে সাদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণে তার নিশ্চিন্ততার কারণ বুঝলুম! বিমলের ক্ষমতা সে জানে!

ভৈরবের মুখের ভাব তখন ভয়ানক! মাটির উপরে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে রাগে অজ্ঞানের মতো বেগে ছুটে এল, কিন্তু এবারে বিমল আর তাকে এড়াবার চেষ্টা করলে না, সে কাছে আসতেই কী-এক কৌশলে তার দেহকে চোখের নিমেষে আবার শূন্যে তুলে ভূতলে নিক্ষেপ করলে!

ভৈরব বেজায় হাঁপাতে হাঁপাতে আবার উঠে দাঁড়াল, তার গায়ের জোরের গর্ব আর রইল না!

কুমার অবহেলা ভরে বললে, 'বিমল, ওকে চিত করে এবারে এই বেলে-খেলা সাঙ্গ করে দাও!'

—'হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি' বলেই বিমল আবার বেগে অগ্রসর হল, কিন্তু হঠাৎ একখানা বড়ো পাথরে হোঁচট খেয়ে ভূমিতলে পড়ে গেল!

চোখের পলক না পড়তেই ভৈরব প্রকাণ্ড একখানা প্রস্তর তুলে নিয়ে বিমলের মাথার উপরে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল—

এবং সেই মুহূর্তেই অতি-সতর্ক রামহরির হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল!

... বিমল যখন উঠে দাঁড়াল, দুরাত্মা ভৈরবের দেহ তখন মাটির উপরে স্থির হয়ে পড়ে আছে!

বিমল এগিয়ে গিয়ে তার দেহটাকে নেড়েচেড়ে বললে, 'পৃথিবীকে আর এর ভার সইতে হবে না। গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করেছে।'

বিমল সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললে।

তার ভিতরে তাকিয়ে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল! হিরে, চুনি, পান্নার ছড়াছড়ি! পায়রার ডিমের মতো বড়ো বড়ো মুক্তো! এ কী অসম্ভব দৃশ্য! আমার মাথা ঘুরতে লাগল!

বিমল সহাস্যে বললে, 'দিলীপ, এখানে যা আছে তাই দিয়েই তুমি একটা রাজ্য কিনতে পারো। এ সব এখন তোমার!'

আমি বললুম, 'না, না,—এ ধনরত্ন আমরা সবাই সমান ভাগ করে নেব!'

কুমার মাথা নেড়ে কঠোর কণ্ঠে বললে, 'আমরা এখানে এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে,—তোমার দান গ্রহণ করতে নয়!'

বিমল বললে, 'আমারও ওই মত। কিন্তু আপাতত রত্নগুলো ওর ভিতর থেকে বার করে নিয়ে প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে কিছু কিছু লুকিয়ে রাখো। ও সিন্দুক ঘাড়ে নিয়ে যেতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই ধরা পড়ব।'

তাড়াতাড়ি সিন্দুক খালি করে ফেলে আমরা দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে এলুম।

রত্নশূন্য সিন্দুক ও জীবনশূন্য ভৈরবের দেহের দিকে কৈলাসের রক্তমুখ দীপ্ত সূর্য তাকিয়ে রইল নিষ্পলকনেত্রে।

সুলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ

প্রথম

সূচের ছ্যাঁদায় কাছি

—'হ্যালো!'

—'হ্যালো!.....কে?'

—'হুম! তুমি জয়ন্ত?'

—'বুঝেছি। ব্যাপার কী সুন্দরবাবু?'

—'গুরুতর।'

—'মানে?'

—'খুনের মামলা।'

—'কে খুন হল?'

—'মনোহরবাবু।'

—'তাঁর পরিচয়?'

—'পরিচয় দেবার মতো বেশি কিছুই নেই। মালয়ে কারবার করতেন। জাপানিদের আক্রমণের সময়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু প্রাণ তাঁর বাঁচল না।'

—'আমাকে যখন স্মরণ করেছেন, খুনি নিশ্চয়ই ধরা পড়েনি?'

—'না।'

—'মামলাটা কি জটিল?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'খুনি কোনও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যায়নি। চুরির জন্যে খুন নয়, অথচ সে দেরাজ নিয়ে টানাটানি করেছিল।'

—'তারপর?'

—'মনোহরবাবুর ভাই বলেন, দেরাজের ভিতর থেকে কিছু চুরি যায়নি।'

—'খুনি তবে দেরাজ নিয়ে টানাটানি করেছিল কেন?'

—'হুম। প্রশ্নের উত্তর নেই।'

—'কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়েছে?'

—'কার উপরে সন্দেহ করব? মনোহরবাবু নির্বিরোধী লোক, কারুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই। এখানকার সকলেই তাঁকে ভালোবাসত।'

—'তারপর?'

—'আবার বলে—'তারপর'? আরে, তারপর যা শোনবার এখানে এসে শোনো! ফোনে কি সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনানো যায়? শিগগির এসো। আমি তোমার সাহায্য চাই।'

—'আপনি কোথায়?'

—'আমি ঘটনাস্থল থেকেই ফোন করছি।'

—'ঠিকানা?'

—'সাত নম্বর মণি মিত্র স্ট্রিট। নামেই স্ট্রিট, আসলে গলি। রাস্তাটা জানো তো?'

—'জানি।'

—'তবে চটপট এসো।'

—'উত্তম। ফোন ছাড়লুম।'

—'হুম!'

'রিসিভার' ত্যাগ করে ফিরে দাঁড়াল জয়ন্ত।

মানিক অদূরেই চেয়ারের উপরে বসেছিল। চোখের ইশারায় জানতে চাইলে, ব্যাপার কী?

—'সুন্দরবাবুর জরুরি হুকুম, কে মনোহরবাবুর প্রাণহরণ করেছে তা আবিষ্কার করবার জন্যে এখনই আমাদের ঘটনাস্থলে যাত্রা করতে হবে।'

মানিক একটু বিরক্ত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু কি সব মামলাই আমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করবেন?'

—'না মানিক, মামলা জটিল না হলে তো সুন্দরবাবু আমাদের ডাকেন না! আমি এখনই যাচ্ছি, তুমিও যাবে তো?'

—'সেকথা আবার বলতে? তুমি কায়া আমি ছায়া!'

—'তবে ওঠো।'

একখানা বড়ো সেকেলে বাড়ি। তিনতলা। তিন-চারখানা করে ঘর নিয়ে কয়েকটি পরিবার বাড়ির ভিতরে বাস করে।

সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সুন্দরবাবু নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

—'খুনি বাইরে থেকে কেমন করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলে, সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করছি।'

—'বুঝতে পারলেন?'

বাড়ির দোতলার এক জায়গায় অঙ্গুলিনির্দেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, 'খুন হয়েছে ওই ঘরের ভিতরে। ওর সামনেই বারান্দা দেখছ তো? বারান্দার দিকের ঘরের দরজা খোলা ছিল, সেই দরজা দিয়েই খুনি প্রবেশ আর প্রস্থান করেছে। এখন এইদিকে এসো। এই বাড়ির আর পাশের বাড়ির মাঝখানে খুব সরু গলিটা দ্যাখো। চওড়ায় দেড় হাতের বেশি নয়। যে কোনও লোক দুই দিকের দেওয়ালে হাত আর পা রেখে খুব সহজেই উপরের বারান্দায় গিয়ে উঠতে পারে।'

—'ঠিক!' বলেই জয়ন্ত ঠিক সেই উপায়েই দুই দিকের দেওয়াল অবলম্বন করে বারান্দার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'খুনির পথ ধরে এই আমি উপরে এলুম। আপনিও আসবেন নাকি?'

সুন্দরবাবু একবার সেই সরু গলিটার এবং আর একবার নিজের হৃষ্টপুষ্ট মস্ত ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন নিতান্ত করুণ ও হতাশ ভাবে।

মানিক ওষ্ঠাধরে দুষ্ট হাসি মাখিয়ে বললে, 'জয়ন্ত, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? তুমি কী বলছ! তুমি কি ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতরে জাহাজের কাছি ঢোকাতে চাও?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই রে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! মানিকের বিষাক্ত জিভের ছোবল আর আমি সহ্য করতে পারব না!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি আমলে আনেন বলেই তো মানিক অমন করে আপনাকে খ্যাপাতে চায়! এখন বাজে কথা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসুন।'

দ্বিতীয়

'সারাঙ্গানি'

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে একটি ছোটো লোহার সিন্দুক, একটি টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার এবং আর একদিকে একখানা খাট। ঘরের ভিতরে অন্য কোনও আসবাব নেই।

খাটের পাশেই ঘরের রক্তরাঙা মেঝের উপরে কাপড়-ঢাকা যা পড়ে রয়েছে তার দিকে তাকালেই চোখ ওঠে চমকে। কাপড়ের গায়ে ফুটে উঠেছে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শায়িত একটা দেহের রেখা। তলাতেই যে আছে একটা নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-মূর্তি সেটা বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

জয়ন্ত শুধোলে, 'সুন্দরবাবু, কাল রাত্রে কখন ঘটনাটা ঘটেছে?'

—'রাত তিনটের পরেই।'

—'খুব সম্ভব মনোহরবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে?'

—'প্রায়।'

—'ঘটনার মোটামুটি বিবরণ শুনেছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে আমি সেইটেই শুনতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মনোহর তাঁর স্ত্রী আর ভাইকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাস করতেন। তাঁর ব্যাবসা ছিল সেখানকার ভারতীয়দের কাছে ভারত থেকে নানা শ্রেণির চালানি মাল বিক্রয় করা। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর ভাই অবিবাহিত, নাম মহীতোষ।

'মনোহরের কারবার চলছিল বেশ ভালোই। ব্যাংকে তিনি লক্ষাধিক টাকাও জমিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জাপানিদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে গেল। মনোহর বুদ্ধিমান লোক। ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। তাই জাপানিরা সিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার আগেই তিনি সপরিবারে পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

'এখানে তাড়াতাড়িতে তিনি ভালো বাসা—অর্থাৎ একখানা সম্পূর্ণ নিজস্ব বাড়ি না পেয়ে এই দু-খানি ঘরই ভাড়া নিতে বাধ্য হলেন এবং স্থানাভাবের জন্যে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাপের বাড়িতে। তারপর থেকে তিনি এইখানেই বাস করতেন। শুনছি শ্যামবাজার অঞ্চলে তিনি একখানি বাড়ি কিনেছেন, আসছে মাসেই তাঁর সেখানে উঠে যাবার কথা। মনোহরের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু জানবার কথা নেই।

'দু-খানি ঘরে মনোহররা দুই ভাই বাস করতেন। তাঁদের খাবার আসত এই পাড়ারই একটি হোটেল থেকে।

'কাল রাত্রের আহারাদি সেরে মনোহর ও মহীতোষ দশটার সময়ে যে যার ঘরে ঢুকে শয্যাগ্রহণ

করেন। মনোহরের ঘরে বাড়ির ভিতর দিকের দরজা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে দক্ষিণের বারান্দার দরজা খোলাই ছিল—মনোহরের মৃত্যুর কারণ হল তাই-ই।

'জয়ন্ত, আমি অনেক মামালাতেই লক্ষ করেছি এইরকম অসাবধানতার সাংঘাতিক পরিণাম। বহু লোকেরই বদঅভ্যাস, তারা বাড়ির ভিতরে নিজেদের এত নিরাপদ মনে করে যে, রাত্রে শয়নগৃহের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে না। ভারত-বিখ্যাত বলদা খুনের মামলা জানো তো? ঢাকার জমিদার এবং সাহিত্যিক নরেন চৌধুরির একমাত্র পুত্র গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? তাঁর অভ্যাস ছিল, রাত্রে শয়নগৃহের দরজা খুলে রাখা। ঠিক এই একই কারণে আরও যে কত নরহত্যার অনুষ্ঠান হয়েছে, এখানে তার হিসাব দাখিল করবার দরকার নেই। হুম! প্রত্যেকেরই এরকম কুঅভ্যাস ত্যাগ করা উচিত!

'রাত তিনটে বাজবার পরেই কাল মহীতোষের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যায়। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেই তিনি শুনলেন, পাশের ঘর থেকে মনোহর আর্তনাদের পর আর্তনাদ করলেন—পরে পরে দুইবার।

'মহীতোষ তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে মনোহরের ঘরের ভিতর দিকের দরজার উপরে ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগলেন। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও সভয়ে সেখানে ছুটে এল। তারপর সকলের ধাক্কা এবং পদাঘাত সহ্য করতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঘরের দরজা।

'ভিতরে ঢুকে বৈদ্যুতিক আলোকে দেখা গেল ভীষণ দৃশ্য! খাটের পাশে মেঝের উপরে পড়ে রক্তাক্ত দেহে ছটফট করছেন মনোহর এবং ঘরের ভিতরে অন্য কেউ নেই।

'সকলের স্তম্ভিত নেত্রের সামনেই মনোহরের ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল। মহীতোষ যখন সক্রন্দনে 'দাদা, দাদা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, মনোহর তখন ত্যাগ করেছেন শেষ-নিশ্বাস!

'জয়ন্ত! আমি এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি। অনেক মাথা ঘামিয়েও আমি বুঝতে পারছি না, এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের কারণ কী? মহীতোষ বলেন, তাঁর দাদার ঘর থেকে মূল্যবান কোনও জিনিসই অদৃশ্য হয়নি। লোহার সিন্দুকের ভিতরে নগদে আর গহনায় প্রায় পনেরো হাজার টাকার সম্পত্তি ছিল, হত্যাকারী কিন্তু লোহার সিন্দুক স্পর্শ করেছে বলেও মনে হয় না। টেবিলের ওই দেরাজটা খুব সম্ভব হত্যাকারীই বাইরে টেনে বার করেছিল, আর তার ভিতরে নগদ পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল, কিন্তু হত্যাকারী তাও নিয়ে যায়নি। মনোহরের কোনও শত্রুও নেই—তবে কে তাঁকে খুন করলে, আর কেনই বা করলে? হত্যা কখনও উদ্দেশ্যহীন হয় না—দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করে এইটুকুই সার বুঝেছি। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? এটা আবিষ্কার করবার ভার রইল তোমারই উপরে। হুম!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এগিয়ে গিয়ে মনোহরের শবদেহের পাশে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে দেহের উপর থেকে তুলে নিলে চাদরের আবরণী।

মনোহরের দুই চক্ষু মুদ্রিত, মুখ প্রশান্ত। ঠিক যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ ভয়াবহরূপে রক্তাক্ত। কপালের উপরে এবং বুকের কাছে অস্ত্রাঘাতের গভীর চিহ্ন।

জয়ন্ত বললে, 'মনোহরবাবু দু-বার আর্তনাদ করেছিলেন, হত্যাকারী তাঁর দেহের উপরেও দুইবার অস্ত্রাঘাত করেছে। কোন আঘাত মারাত্মক হয়েছে, ডাক্তারি পরীক্ষাতেই জানতে পারা যাবে। ক্ষতচিহ্ন দেখলে বোধহয়, হত্যাকারীর হাতে ছিল একখানা খুব বড়ো ছোরা। হত্যাকারী সাধারণ চোর নয়, সে নরহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এটুকু তো আমিও বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এই মৃতদেহের ভিতর থেকে কি আর কিছু সূত্র পাওয়া যায় না?'

জয়ন্ত বললে, 'একটা সূত্র পাচ্ছি বটে, কিন্তু আপাতত সেটা কোনও কাজে লাগবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

—'কী সূত্র?'

—'হত্যাকারী অত্যন্ত দীর্ঘাকার, সে যদি সাত ফুট লম্বা হয় তাহলেও আমি বিস্মিত হব না।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'মনোহরবাবুর দেহ দেখছেন? এঁর দেহের মাপ পাঁচ ফুটের বেশি নয়। কিন্তু এঁর দেহের ক্ষতচিহ্ন দুটো দেখুন। অত্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী—একেবারে অসাধারণ।'

—'তাতে কী প্রমাণিত হয়?'

—'প্রমাণিত হয় যে, কেউ যেন খুব উঁচু থেকে এই দেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করেছে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে, মনোহরের আততায়ীর দেহ অতিশয় সুদীর্ঘ, হত ব্যক্তির মাথার অনেক উপর থেকে অস্ত্র তুলে সে নীচের দিকে আঘাত করেছে।'

—'হুম! তোমার অনুমান সঙ্গত। কিন্তু হত্যাকারীর যখন পাত্তা নেই, তোমার এই আবিষ্কার তো আপাতত আমাদের কোনওই কাজে লাগবে না!'

জয়ন্ত কিন্তু সুন্দরবাবুর কথা শুনছিল না! সে বিড়বিড় করে আপন মনে বললে, 'লাশের বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো, কিন্তু ডান হাতটা মুঠো করা কেন?'

মৃত মনোহরের মুঠো করা ডান হাতের আঙুলগুলো জয়ন্ত খোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রথম চেষ্টায় পারলে না, মৃত্যুমুখে পড়েও মনোহর যেন হাত মুঠো করে ছিল প্রাণপণে। জয়ন্ত প্রয়োগ করলে তখন নিজের অসাধারণ দৈহিক শক্তি! একটা শব্দ হল, যেন মৃতদেহের আঙুলের হাড় গেল মট করে ভেঙে! মুঠো খুলে গেল।

মুঠোর ভিতরে রয়েছে একটা কাগজের পিণ্ড!

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও আবার কী?'

—'সেইটেই তো দ্রষ্টব্য।' —বলে জয়ন্ত সেই পিণ্ডাকৃতি কাগজ নিয়ে তার এলোমেলো ভাঁজ খুলতে লাগল।

একখানা ছেঁড়া কাগজ। তার উপরে গোটাকয়েক রেখার টান।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'ওটা কী, জয়?'

জয়ন্ত কাগজখানার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কতগুলো রেখা দেখছি। উপরদিকে কতগুলো কালো ফুটকি—একটা ফুটকি লাল রঙের। উপরের ডান দিকে এক জায়গায় লেখা রয়েছে একটি অক্ষর—'সু'। তারপরেও বোধহয় আরও অক্ষর ছিল, কিন্তু সে-সব আর দেখবার উপায় নেই—কারণ তার পরের অংশটা কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে!'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত,কণ্ঠে বললেন, 'হুম, হুম, হুম! জয়ন্ত, তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ! এই ছেঁড়া কাগজখানার ভিতরেই বোধ হয় পাওয়া যাবে, হত্যা-রহস্যের চাবিকাঠি!'

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে বললে, 'চোখের সামনে আমি যেন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি! মনোহরবাবু শয্যায় নিদ্রিত। অন্ধকার ঘরের ভিতরে চুপিচুপি বাইরের লোকের প্রবেশ। নিশ্চয়ই তার হাতে ছিল 'টর্চ'। সে এদিক-ওদিক দেখে ওই টেবিলের কাছে গেল। একটা দেরাজ টেনে খুললে এবং 'টর্চ' জ্বেলে দেরাজের ভিতর খুঁজে বার করলে একখানা কাগজ। মনোহরবাবুর ঘুম সজাগ। দেরাজ টানার শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম গেল ভেঙে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে চাবি টিপে জ্বেলে দিলেন বিজলি-বাতি! ঘরের

ভিতরে বাইরের লোক দেখেই তিনি সবিস্ময়ে খাট থেকে নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত কিংবা পরিচিত ব্যক্তি ছুটে এসে করলে তাঁকে আক্রমণ! কিন্তু ইতিমধ্যেই মনোহরবাবু দেখে নিয়েছিলেন, এই অপ্রার্থিত অতিথি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে বার করে নিয়েছে কী একটা জিনিস! সেটা যে কী তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে তাঁকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই (কিংবা তার আগেই) তিনি তার হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিতে গেলেন—যদিও কাগজখানার সবটা তিনি পেলেন না। তারপর আবার অস্ত্রাঘাত—মনোহরবাবুর পতন। হত্যাকারী নিশ্চয়ই কাগজের বাকি অংশটাও তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিত, কিন্তু তার আগেই মহীতোষ আর বাড়ির অন্য সব লোক উঠল জেগে! বাইরে হই-চই, দরজায় আঘাতের পর আঘাতের পর আঘাত, ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি হত্যাকারীর পলায়ন! সুন্দরবাবু, চিরদিনই জানেন যে, আমি কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করি—আপনারা যা করেন না। কিন্তু বলুন দেখি, আমি যা বললুম সেইটাই কি সম্ভবপর নয়?'

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, তুমি একটা আশ্চর্য গল্প বললে! পুলিশে চাকরি করি, কল্পনা-টল্পনা নিয়ে চাকরি করা চলে না। কিন্তু যা বললে, তাই কি সত্যি?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সত্যি-মিথ্যে জানি না সুন্দরবাবু! তবে মনে হচ্ছে, হত্যাকারীর মতো আমাদেরও উচিত, ওই টেবিলের দেরাজটা একবার পরীক্ষা করা! এসো মানিক, তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

জয়ন্ত ও মানিক টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—সুন্দরবাবুও গেলেন পিছনে পিছনে।

দেরাজটা তখনও খোলাই ছিল। তার ভিতরে পাওয়া গেল কয়েকখানা হিসাবের খাতা, একতাড়া চিঠি এবং একখানা ডায়ারি।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি বললেন দেরাজের ভিতরে নাকি পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল?'

—'ছিল। সেগুলো এখন আমার জিম্মায় আছে।'

জয়ন্ত আগে হিসাবের খাতাগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে গেল। বললে, 'ধেৎ! কেবল টাকা-আনা-পয়সার অঙ্ক, দেখলেই গায়ে জ্বর আসে!'

সে চিঠির তাড়াটা তুলে নিলে। একে একে চিঠির উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে বললে, 'মানিক, ততক্ষণে তুমি ডায়ারির পাতাগুলো উলটে দ্যাখো।'

মানিক ডায়ারিখানা তুলে নিয়ে তার মধ্যে দৃষ্টি চালনা করতে করতে বললে, 'জানবার মতন কোনও তথ্যই দেখছি না। সুন্দরবাবু, এ খবরটা শুনে আপনার জিভ বোধকরি সরস হয়ে উঠবে। এ পাতায় লেখা রয়েছে,—'আজ কলকাতা থেকে পাঁচটা বায়ুশূন্য টিনে করে বাগবাজারের রসগোল্লা এসেছে!' সিঙ্গাপুরে বাগবাজারের রসগোল্লার আবির্ভাব নিশ্চয়ই স্মরণীয়, মনোহরবাবু তাই ডায়ারিতে খবরটা লিখে না রেখে পারেননি! .....তারপর, এ আবার কী?' সে একেবারে চুপ মেরে গিয়ে সাগ্রহে কী পড়তে লাগল।

জয়ন্ত চিঠির তাড়া থেকে চোখ তুলে বললে, 'কী সংবাদ বন্ধু?'

—'শোনো। ডায়ারির এখানে লেখা রয়েছে: 'বুড়ো মামুদ আমার ধার শোধ করতে না পেরে আমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস উপহার দিয়ে বলে গেছে—বাবু, আমার সম্বলও নেই সহায়ও নেই, এটা তুমিই নাও, আমি কোনও কাজে লাগাতে পারব না।' জিনিসটা বিশেষ কিছুই নয়, একখানা

নকশার মতন কী, তার একপ্রান্তে লেখা কতগুলো অঙ্ক। ছাইভস্ম কিছুই বুঝলাম না। মামুদ আরও যেসব কথা বলে গেল, শুনলে হাসি পায়। সারাঙ্গানি! রত্নগুহা! রূপকথা বিশ্বাস করবার মতো বয়স আমার নয়।' জয়ন্ত, এটুকু তথ্য তোমার কোন কাজে লাগবে?'

জয়ন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ডায়ারির পাতা ওলটাও মানিক, ডায়ারির পাতা ওলটাও! দ্যাখো, ও বিষয়ে আর কোনও কথা আছে কি না!'

পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর এক জায়গায় থেমে মানিক বললে, 'আবার শোনো আজ 'পাবলো নামে একটা মস্ত ঢ্যাঙা লোক এসেছিল, সে নাকি ফিলিপাইন দ্বীপের বাসিন্দা। মামুদের নকশাখানা সে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চায়, আমি রাজি হইনি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, মামুদের কথা বোধহয় রূপকথা নয়।' আরও খানকয় পাতার পরে লেখা আছে 'আজ কদিন ধরে দেখছি, আমার বাসার আশেপাশে জনকয় গুন্ডার মতন লোক ঘোরাফেরা করছে। তারা কেউই স্থানীয় লোক নয়। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারছি না।' তারপর আর এক জায়গায় লেখা : 'কাল রাত্রে আমার বাসায় চোর এসেছিল। সে আমার শোবার ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা জেগে উঠতেই পালিয়ে গিয়েছে।' ব্যাস, এইখানেই ডায়ারি শেষ!'

জয়ন্ত বললে, 'ডায়ারি শেষ হলেও ক্ষতি নেই। যতটুকু আশা করেছিলুম, তার চেয়ে ঢের বেশি কথা আমরা জানতে পেরেছি! এতক্ষণে মামলাটা একেবারে জলের মতন সোজা হয়ে গেল।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে—হুম!'

—'কী সন্দেহ?'

—'ওই পাবলোকে আমার সন্দেহ হচ্ছে—ওই মস্ত ঢ্যাঙা ফিলিপিনোটাই খুনি না হয়ে যায় না।'

—'কেন?'

—'তুমিই তো বললে, মনোহরকে যে খুন করেছে মাথায় সে হয়তো সাত ফুট লম্বা!'

—'দুনিয়ায় পাবলো ছাড়া আরও মস্ত ঢ্যাঙা লোক তো থাকতে পারে?'

—'আরে, তাদের সঙ্গে এ মামলার সম্পর্ক কী? তারা তো মনোহরের নকশার জন্যে লোভপ্রকাশ করেনি! মনে ভেবে দ্যাখো, পাবলো এই নকশাখানা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। তারপরে সিঙ্গাপুরে খুব সম্ভব সেই-ই মনোহরের বাসা থেকে নকশাখানা আর-একবার চুরি করবারও চেষ্টা করেছিল। তারপর জাপানিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে। মনোহর কলকাতায় পালিয়ে আসেন। ও-অঞ্চল থেকে ভারতে আসবার পথ বন্ধ হয়, পাবলো এতদিন তাই মনোহরের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি। যুদ্ধ থামতেই সে এখানে এসে নিজের কার্যোদ্ধার করেছে। কেমন, আমার এ অনুমান কি অসঙ্গত? কী বলো হে মানিক?'

মানিক বললে, 'আলবাত! আপনার অনুমানই তো প্রমাণ!'

—'হুম, ঠাট্টা নয় মানিক, ঠাট্টা নয়! আজ থেকেই আমি পাবলোব্যাটার সন্ধানে ফিরব।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। মনোহরের ডায়ারিতে পাওয়া গিয়েছে 'সারাঙ্গানি' বলে একটা শব্দ। তার অর্থ কী? আর তার সঙ্গে 'রত্নগুহা'রই বা সম্পর্ক কী? তারপর এই ছেঁড়া নকশাখানা দ্যাখো। এর উপরে কতগুলো রেখা টানা রয়েছে। কতগুলো কালো আর একটিমাত্র লাল রঙের ফুটকিও দেখা যাচ্ছে। এসব কী? আর ওই 'সু' অক্ষরটা! ওটা কোন কথার আদ্য অক্ষর?'

মানিক বললে, 'মনোহরের ডায়ারিতে প্রকাশ, নকশার একপ্রান্তে ছিল কতগুলো অঙ্ক। এই ছেঁড়া নকশায় তা নেই। নিশ্চয়ই নকশার সেই অংশটা আছে খুনির কাছেই। পুরো কাগজখানা না পেলে বোধহয় আমরা নকশার আসল অর্থ উদ্ধার করতে পারব না।'

জয়ন্ত বললে, 'মাথা ঘামালে এই নকশার কিছু কিছু অর্থ হয়তো আমি আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু আমাদের অতটা মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো।'

—'কী?'

—'চলো, সকলে মিলে বিমল আর কুমারবাবুর কাছে যাওয়া যাক। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই মামলাটার পিছনে আছে রত্নগুহা বা যকের ধন। এসব ব্যাপারে বিমলবাবুদের মাথা খুব খোলে। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়?'

মানিক উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'চমৎকার প্রস্তাব!'

তৃতীয়

সারাঙ্গানির গুপ্তকথা

দু-দিকে দু-খানা কৌচে অর্ধশয়ান অবস্থায় বিমল এবং কুমার।

দরজার কাছে মেঝের উপরে উপু হয়ে বসে রামহরি বুরুশ-চালনা করছিল বাঘার দেহের উপরে।

বিমল শুধোলে, 'কুমার হে!'

কুমার বললে, 'উঁ!'

—'আর তো পারা যায় না।'

—'একেবারেই না।'

—'কী পারা যায় না, বুঝেছ?'

—'বুঝিনি আবার, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

—'কী বুঝেছ বলো দেখি?'

—'আজ ছ-মাস ধরে আমাদের ছ-মেসে ধরেছে।'

—'অর্থাৎ?'

—'আজ ছ-মাস ধরে আমরা যাপন করছি শয্যাশায়ী বিলাসীর জীবন! আমাদের দেহের হাড়গুলো যদি লোহার হত তাহলে এতদিনে সেগুলো মর্চে পড়ে অকেজো হয়ে যেত!'

—'আজ ছ-মাস ধরে রোজ সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছি, প্রাতরাশ খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, কিছুক্ষণ দাবা-বোড়ে খেলে মধ্যাহ্ন-আহার সেরে আবার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি, বৈকালি চায়ের পালা সাঙ্গ করে বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারছি, তারপর রাত্রে বাড়ি ফিরে ডান হাতের ব্যাপার সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ছি! উঃ!'

—'কী ভয়ানক!'

—'রামচন্দ্রঃ!'

—'মহাভারত!'

—'এই কি জীবন?'

—'আমরা কি সেই বিমল, সেই কুমার?'

—'এ যে বেঁচে থেকে মরে থাকা!'

রামহরি ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'থামো থামো, আর ফাজলামি করতে হবে না! তোমরা মন্দটা কী আছ বাপু? খাচ্ছ-দাচ্ছ, রাজার মতো বসে আছ পায়ের ওপরে পা দিয়ে! দুনিয়ার লোক তো এই চায়!'

বিমল বললে, 'তোমার মোটাবুদ্ধিতে আমাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না রামহরি! আমার আত্মহত্যা করতে সাধ হচ্ছে।'

কুমার বললে, 'আমারও। অন্তত সেটাও একটা বৈচিত্র্য হবে। মরে ভূত হয়ে আমরা রামহরির ঘাড় মটকাতে আসব!'

রামহরি বললে, 'ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন ভয়টা আমার কী?'

বাঘা হঠাৎ দুই কান খাড়া করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

রামহরি বললে, 'কী হল রে বাঘা, চ্যাঁচাস কেন? ও, কাদের পায়ের শব্দ শুনেছিস বুঝি? হ্যাঁ, কারা যেন আসছে।'

অত্যন্ত অবসাদ-ভরে বিমল ও কুমার নিজেদের দুই চক্ষু মুদে ফেললে।

ঘরের ভিতরে তিন মূর্তির আবির্ভাব। সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে আরে, এ কী মশাই? এই অবেলায় ঘুম?'

বিমল চোখ খুলে বললে, 'আমরা ঘুমোচ্ছি না।'

কুমার চোখ খুলে বললে, 'আমরা মরবার চেষ্টা করছি।'

—'সে কী মশাই, কেন, কেন?

বিমল বললে, 'হাতে কোনও কাজ নেই।'

কুমার বললে, 'জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'উঠুন। আমরা আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

বিমল কিছুমাত্র উৎসাহপ্রকাশ না করে বললে, 'পরামর্শ? কীসের পরামর্শ?'

কুমার ম্রিয়মান ভাবে বললে, 'কোন ছিঁচকে চোর কার ঘটি-বাটি চুরি করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে আমরা মোটেই রাজি নই!'

—'উঁহু! এ ঘটি-বাটি চুরি নয়! এ হচ্ছে খুন, আর রত্নগুহার নকশা চুরি!'

বিমল তৎক্ষণাৎ কৌচের উপরে সিধে হয়ে উঠে বসে বললে, 'কী বললেন?'

কুমার লাফ মেরে কৌচ থেকে নেমে পড়ে বললে, 'রত্নগুহা? 'হতাশ পথিক,—সে কোথায়, সে কোথায়'?'

অকস্মাৎ দুই বন্ধুর এই অত্যন্ত জীবন্ত ভাব লক্ষ করে জয়ন্ত কোনওরকমে হাসি চাপতে চাপতে বললে, 'রত্নগুহা যে কোথায় আছে তা যদি আমরা জানতুম, তাহলে আমরা আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতুম না। কিন্তু দেখুন দেখি, এই নকশাখানার রহস্য কী?' সে পকেট থেকে নকশাখানা বার করে বিমল ও কুমারের সাগ্রহ-দৃষ্টির সামনে খুলে ধরলে।

বিমল গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানা দেখতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'মনে হচ্ছে এই কাগজখানার উপরে আঁকা রয়েছে কয়েকটা দ্বীপের খানিক খানিক অংশ। এখানা হচ্ছে ম্যাপ। কুমার, এশিয়ার একখানা ছাপানো ম্যাপ নিয়ে এসো তো!'

কুমার তখনই বন্ধুর কথামতো কাজ করলে।

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ! যা ভেবেছি তাই! এই কাগজখানার উপরে আঁকা আছে উত্তর—অর্থাৎ 'ব্রিটিশ'-বোর্নিয়োর, আর ফিলিপাইন দ্বীপের খানিক খানিক অংশ। আর দ্বীপগুলোর মাঝখানে সুলু সাগর—দক্ষিণ চিন সাগরের পূর্ব দিকের এক অংশের নাম সুলু সাগর। ওইখানে অনেকগুলো খুব ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে, এই ম্যাপে কালো কালো ফুটকি দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটা ফুটকি লাল রঙের—খুব সম্ভব ওই দ্বীপটির দিকেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'কাগজের উপরে লেখা রয়েছে 'সু', ওটা তাহলে 'সুলু সাগরেরই প্রথম অক্ষর?'

—'নিশ্চয়ই। ম্যাপখানা দেখছি ছেঁড়া। গোটা ম্যাপে নিশ্চয়ই লেখা ছিল 'সুলু সাগর'।'

জয়ন্ত বললে, 'দুর্ভাগ্যক্রমে ম্যাপের অন্য অংশ এখন অপরের হস্তগত হয়েছে। সেই অংশে খালি সুলু সাগরের সব অক্ষর নয়, কতকগুলো রহস্যময় অঙ্কও ছিল। কিন্তু আপাতত তা দেখবার আর কোনও উপায়ই নেই।'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, এ ম্যাপ দেখে তো কিছুই বুঝছি না। আপনারা আমাদের সঙ্গে কী পরামর্শ করতে এসেছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা বিমলবাবু, আপনি কি জানেন, 'সারাঙ্গানি' বলতে কী বোঝায়?'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর থেমে থেমে বললে, 'সারাঙ্গানি..... সারাঙ্গানি.....মনে হচ্ছে কথাটা যেন পরিচিত!.....আচ্ছা কুমার, আমাদের 'স্ক্র্যাপ বুক'খানা একবার নিয়ে এসো তো!—সারাঙ্গানি.....সারাঙ্গানি! হ্যাঁ, ও-কথাটা আমি আগেও শুনেছি। আমি একবার যা শুনি, একবার যা দেখি, তা আর ভুলি না—আমার স্মৃতিশক্তিকে আমি নিজেই ধন্যবাদ দিতে পারি!'

কুমার একখানা খুব মোটা আর লম্বা-চওড়া 'স্ক্র্যাপ বুক' এনে স্থাপন করলে বিমলের সামনে। তার ভিতরে দেশি-বিলাতি নানা পত্রিকার অংশবিশেষ কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে।

পাতার পর পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে বিমল সহর্ষে বলে উঠল, 'পেয়েছি! পেয়েছি! এই তো 'সারাঙ্গানি' দ্বীপের কাহিনি!'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'সারাঙ্গানি দ্বীপ! সে আবার কোথায়?'

বিমল বললে, 'সুলু সাগরে।'

—'সুলু সাগরে! তবে কি ওই লাল ফুটকি দিয়ে সেই দ্বীপেরই অবস্থান দেখানো হয়েছে?'

—'হতে পারে। আচ্ছা, আগে দেখা যাক সারাঙ্গানি দ্বীপের ভিতরে কী আছে? জয়ন্তবাবু, আমি কোনও মন-গড়া কথা বলতে চাই না, এইবারে আমি ১৯৩৯ অব্দের ২৫শে জুন, রবিবারের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হুবহু বাংলায় অনুবাদ করে আপনাদের শোনাব। সংবাদটি হচ্ছে এই

'রত্নদ্বীপ

'ফিলিপাইনের অনেক উত্তরে, সুলু সমুদ্রের মধ্যে আছে অত্যন্ত রহস্যময় ও ভয়াবহ সারাঙ্গানি দ্বীপ।

'যেসব ইউরোপীয় ওখানে গিয়েছেন তাঁরা সবাই বলেন, মনে হয় যেন ওই দ্বীপের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে একটা স্থির বায়ু আর রহস্যপূর্ণ স্তব্ধতা!

'চারিদিক যেন বিষাক্ত এবং চারিদিক থেকেই যেন ফুটে উঠেছে শ্মশান-শ্মশান ভাব! অথচ পেলব শ্যামলতায় সুন্দর সেই দ্বীপ এবং তার ভূমিও উর্বর।

'কিন্তু এই দ্বীপের সঙ্গে জড়ানো আছে একটি প্রাচীন কাহিনি। সারাঙ্গানি ছিল সাংঘাতিক জলদস্যু, তার নামে সবাই ভয়ে কাঁপত।

'ও-অঞ্চলে তখন স্পানিয়ার্ডদের প্রভুত্ব। তারা বার বার চেষ্টা করেও সারাঙ্গানিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তারপর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সে বোম্বেটে-ব্যবসায় ছেড়ে দেয়।

'তারপর রাত্রের অন্ধকারে কয়েক দিন ধরে সে তার সমস্ত ধনসম্পত্তি একটি দ্বীপে স্থানান্তরিত করে। তার ঐশ্বর্য বহন করে নিয়ে যেত কয়েকজন ক্রীতদাসী। রাত্রির পর রাত্রি নৌকায় চড়ে সে ক্রীতদাসীদের নিয়ে দ্বীপে গমন করত। কিন্তু ফিরে আসত একাকী।

'দ্বীপে ঐশ্বর্য বহন করবার জন্যে সে যেসব ক্রীতদাসী নির্বাচন করত, তারা ভয়ে কাঁপতে বলির পাঁঠার মতো। তাদের ভয় পাবার যথেষ্ট কারণও ছিল। জীবন্ত ক্রীতদাসীদেরও সে মাটির ভিতরে পুঁতে রেখে আসত ধনরত্নের সঙ্গে! সে নিজে ছাড়া গুপ্তধনের ঠিকানা আর কেউ যে জানতে পারবে, এটা তার অভিপ্রেত ছিল না।

অবশেষে সারাঙ্গানির শেষ দিন ঘনিয়ে এল। সে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'পঞ্চাশ বছর বোম্বেটেগিরি করে তুমি যে ঐশ্বর্য অর্জন করেছ তা লুকিয়ে রেখেছ কোথায়?'

'সে জবাব দিলে,—খুঁজে দ্যাখো। গুপ্তধন পেলেও পেতে পারো।'

'কিন্তু সে দ্বীপের মধ্যে বাইরের কারুর প্রবেশ নিষেধ!

'সারাঙ্গানি মরবার সময়ে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছে,—গুপ্তধনের লোভে যে আমার দ্বীপে গিয়ে নামবে, প্রাণ নিয়ে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না।'

'এই রত্নদ্বীপের কথা অনেকেই জানে। কিন্তু এ-অঞ্চলের বাসিন্দারা কেহই ভয়ে ওই দ্বীপের ত্রিসীমানায় যেতে চায় না।'

জয়ন্তবাবু, ওই দ্বীপটিই এখন সারাঙ্গানি দ্বীপ নামে বিখ্যাত।'

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'স্টেটসম্যানের লেখক বলছেন, 'সারাঙ্গানি দ্বীপের অবস্থান হচ্ছে ফিলিপাইনের অনেক উত্তরে, সুলু সমুদ্রের মধ্যে।' কিন্তু মনোহরের ম্যাপে লাল ফুটকি দিয়ে যে দ্বীপটি দেখানো হয়েছে, ওটি তো আছে দেখছি একেবারে দক্ষিণ ফিলিপাইনের পশ্চিম দিকে। সুতরাং ওই লাল ফুটকিটিকে কী করে আমরা সারাঙ্গানি দ্বীপ বলে গ্রহণ করব?'

বিমল বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, স্টেটসম্যানের লেখকই এখানে মস্তবড়ো একটা ভ্রম করেছেন। আসল ছাপানো ম্যাপ দেখুন। সুলু সমুদ্র রয়েছে ফিলিপাইনের নীচের দিকে পশ্চিম পাশে। ফিলিপাইনের উত্তর দিকে আছে চিন সাগর। সুলু সমুদ্রের অবস্থান বোর্নিয়োর উত্তর দিকে—ফিলিপাইনের উত্তরে নয়।'

কুমার বললে, 'জয়ন্তবাবু, এই সারাঙ্গানি দ্বীপের ম্যাপখানা আপনার হাতে এল কেমন করে?'

—'তাহলে গোড়া থেকেই সব কথা শুনুন।' জয়ন্ত তখন একে একে মনোহরের হত্যা-সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার কথাই বর্ণনা করে গেল। তারপর বললে, 'এখন আমাদের কী করা উচিত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে আছে ফিলিপিনো পাবলো।'

বিমল বললে, 'কিন্তু সে তো পলাতক।'

—'আমার মনে হয় তাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হবে না।'

—'তবে আগে সেই চেষ্টাই করুন। কেবল খুনের জন্যে নয়, পাবলোকে আমাদের দরকার আর এক কারণে।'

—'আর এক কারণে?'

—'হ্যাঁ। পাবলোর কাছে এই ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশ আছে—যার উপরে আছে অঙ্কের মতন কিছু। মনে হচ্ছে তার ভিতরেই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা পেলে আপনার কী লাভ হবে?'

বিমল বললে, 'লাভ-লোকসান জানি না, এই বিষম একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে চাই।'

—'মানে?'

'আমি সারাঙ্গানি দ্বীপে যেতে চাই একান্ত স্থির জীবন-সমুদ্রকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল করে তোলবার জন্যে।'

কুমারও সমুজ্জ্বল নেত্রে বললে, 'আমিও কবিতার ভাষায় বলি—'

হোক-গে এ গুপ্তধন যার খুশি তার—
দুর্দান্ত জীবন চাই—দৃপ্ত, দুর্নিবার!

হ্যাঁ! সেই অশান্ত জীবন চাই—যা জলে-স্থলে শূন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে কালবোশেখীর মতো!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না যেন, রত্নদ্বীপে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ! সারাঙ্গানির অভিশাপে রত্নদ্বীপ এখন মৃত্যুদ্বীপ।'

বিমল হেসে উঠে বললে, 'ওসব কুসংস্কার আমরা মানি না। জীবনে বহুবার মৃত্যুকে কলা দেখিয়েছি, এবারেও দেখাতে পারব। কিন্তু আপাতত আমাদের সর্বাগ্রে দরকার ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশটাকে। দোহাই জয়ন্তবাবু, আগে সেই চেষ্টাই করুন!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনে হয়, মনোহরের মুঠোর ভিতরে আমরা ম্যাপের যে অংশটুকু পেয়েছি সেটা না পেলেও পাবলোর চলবে। রত্নদ্বীপের অবস্থান ও-অঞ্চলের অনেকেই যখন জানে তখন পাবলোর কাছেও নিশ্চয়ই তা অজানা নেই। সে কেবল জানে না, দ্বীপের ঠিক কোন জায়গায় গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যাপের যে অংশ সে পেয়েছে তার ভিতরেই আছে গুপ্তধন ভাণ্ডারের আসল চাবিকাঠি। এখন ভেবে দেখা যাক, পাবলোর উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে, তখন অতঃপর তার পক্ষে কী করা উচিত? সে বিদেশি, কলকাতায় খুব সহজেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সুতরাং নরহত্যার পর সে যে প্রথম সুযোগেই এই বিপজ্জনক শহর ত্যাগ করবে, সে- বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কোন দিকে যাবে? যে দিকে আছে রত্নদ্বীপ—নিশ্চয়ই সেই দিকে! সুন্দরবাবু, আমি জানি, কাল সকালেই সিঙ্গাপুরগামী একখানা জাহাজ ছাড়বে। যথাস্থানে যথাসময়ে হাজির হতে পারলে আমরা হয়তো দেখতে পাব, সেই জাহাজের যাত্রী হয়েছে ফিলিপিনো পাবলো!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! ঠিক এই উপায়েই আমরা আর একজন বোর্নিয়োগামী আসামিকে গ্রেপ্তার করেছিলুম না?'*

—'হ্যাঁ, এ শ্রেণির আসামিরা ধরা পড়ে প্রায় এক ভাবেই।'

পরদিন দুপুরেই জয়ন্ত ও মানিক এল বিমল ও কুমারের কাছে।

বিমল বললে, 'মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনারা সুখবর এনেছেন।'

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, খবর শুভ।'

—'পাবলো ধরা পড়েছে?'

—'হ্যাঁ, জাহাজ-ঘাটে।'

—'সেই ছেঁড়া ম্যাপের বাকি অংশ?'

—'তাও পেয়েছি। এই নিন।'

জয়ন্তের হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে বিমল সাগ্রহে তার উপরে ঝুঁকে পড়ল।

ছেঁড়া কাগজ। একপ্রান্তে এই অক্ষর কয়টি আছে—

লু সাগর।

তার পাশেই ইংরেজিতে লেখা

দক্ষিণের বাঁশঝাড় ও পাঁচটি নারিকেলগাছ। উত্তরে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০; পূর্বে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ থেকে ১০০ পর্যন্ত। পূর্ব-দক্ষিণে ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত। উত্তরে ১ থেকে ৫৮ পর্যন্ত। নীচে ১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র।

কুমার 'ফোন' ধরেই শুনলে সুন্দরবাবু ব্যস্ত কণ্ঠে জয়ন্তকে ডাকছেন।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো! ব্যাপার কী?'

—'ব্যাপার আর কী, মাথা আর মুণ্ডু! পাবলো বেটা লম্বা দিয়েছে!'

—'সে কী? কেমন করে?'

—'পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে হাতকড়ি পরে পাবলো রাস্তা দিয়ে থানার দিকে আসছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একখানা প্রাইভেট মোটর হুড়মুড় করে পাহারাওয়ালাদের উপরে এসে পড়ে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পর-মুহূর্তে পাবলো একলাফে মোটরে উঠে পড়ে, আর গাড়িখানাও চোখের নিমেষে উল্কাবেগে অদৃশ্য হয়ে যায়। জয়ন্ত, কলকাতায় পাবলো সহায়হীন নয়, নিশ্চয় তার বন্ধুরাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।'

—'সুন্দরবাবু, যে দুধ মাটিতে পড়ে গিয়েছে তা নিয়ে আর দুঃপ্রকাশ করব না। পারেন তো একবার বিমলবাবুর বাড়িতে আসুন।'

চার

বিদ্যুৎ-গতির যুগে

পাবলোর পলায়ন-কাহিনি শুনে বিমল কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'পাবলো পালিয়েছে? তাহলে আমাদের কর্তব্য কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে উঠল দেখছি!'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

—'আমাদের সুলু সাগর ভ্রমণ হয়তো ততটা নিরাপদ হবে না!'

—'তার মানে?'

—'পাবলো হয়তো আমাদের বাধা দেবে।'

—'আপনি সত্যসত্যই সুলু সাগরে যেতে চান?'

—'নিশ্চয়ই!'

—'গুপ্তধন আনতে?'

—'ধরুন তাই।'

—'কিন্তু গুপ্তধন তো আমরা আনতে যেতে পারি না।'

—'কেন?'

—'মনোহরবাবু পরলোকে। আপাতত এই গুপ্তধনের উপরে দাবি আছে কেবলমাত্র তাঁর উত্তরাধিকারীর।'

—'এখানে দাবির কথা তোলা বৃথা। গুপ্তধন কোনওদিনই আইনসঙ্গত উপায়ে লাভ করা যায় না। আইনের কথা যদি ধরেন, তাহলে সুলু সাগরের ওই দ্বীপটি যে গভর্নমেন্টের অধীন, গুপ্তধনের উপরে এখন একমাত্র অধিকার আছে তারই। কিন্তু এখানে তার কথা ধর্তব্যই নয়। তবে সে-গুপ্তধন অধিকার করতে পারে কে? পাবলোও পারে, আমরাও পারি। যার বুদ্ধি বেশি, গুপ্তধন হবে তার!'

—'যুক্তিটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

—'ম্যাপের কোণে লেখা হেঁয়ালিটা দেখেছেন তো? যে ওই হেঁয়ালির পাঠোদ্ধার করতে পারবে, সেই হবে গুপ্তধনের যথার্থ অধিকারী। মনোহরবাবু যে ওই হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারেননি, তাঁর ডায়েরি পড়লেই সেটা বেশ জানা যায়। তারপর ওই পাবলো। যতদূর আন্দাজ করা যায়, সে সারাঙ্গানি দ্বীপের অবস্থান আর গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু ম্যাপের হেঁয়ালি তার জানা থাকলে সে এই দূর দেশে নিজের জীবন বিপন্ন করে ম্যাপখানা চুরি করতে আসত না। ম্যাপের প্রান্তে লেখা হেঁয়ালির অংশটা সে হস্তগত করতেও পেরেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে-অংশটা আবার আমরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পেরেছি। খুব সম্ভব হেঁয়ালির অর্থ এখনও সে আবিষ্কার করতে পারেনি। আর পারলেও হেঁয়ালিটা এখন আর তার কাছে নেই। এইবারে আমাদের নিজেদের কথা ধরুন, কারণ হেঁয়ালি আছে আমাদেরই কাছে।'

—'কিন্তু হেঁয়ালিটা আমরা বুঝতে পেরেছি কি?'

—'উত্তরে আমিও একটা প্রশ্ন করি। বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন কি?'

—'তা অবশ্য করিনি।'

—'কিন্তু আমি বোঝবার চেষ্টা করেছি।'

—'কিছু বুঝেছেন?'

—'নিশ্চয়!'

—'বলেন কী, এত তাড়াতাড়ি!'

—'জয়ন্তবাবু, ছেলেবেলা থেকেই এইরকম সব সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করে আসছি। ওটা আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইংরেজিতে ও-সম্বন্ধে অনেক কেতাবও আছে। সেসব পড়লে বোঝা যায়, পৃথিবীতে সাংকেতিক লিপি রচনার নিয়ম আর কৌশল আছে কতরকম! এ-এক বিচিত্র 'সাহিত্য'! সাংকেতিক লিপি রচনার কোনও পদ্ধতিই আজ আর বোধহয় অজানা নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, এই অদ্ভুত 'সাহিত্য' নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি আমিও। সময়ে সময়ে তার সাহায্যে অনেক রহস্যময় মামলার কিনারাও করতে পেরেছি।'

—'আধুনিক ডিটেকটিভ কাহিনির জন্মদাতা এডগার অ্যালেন পো সাহেবও এইরকম সাংকেতিক লিপির রহস্যউদ্ধারের জন্যে অনেক গবেষণা করে গিয়েছেন। বলতে কী, তাঁর 'Gold bug' নামে বিখ্যাত গল্পটি পড়েই এদিকে আমার প্রথম ঝোঁক জাগে।'

মানিক বললে, 'বিমলবাবু, খুব হালেই জয়ন্ত যে 'সোনার আনারস' * মামলার কিনারা করেছিল, আপনি তার কথা শোনেননি বুঝি?'

—'না।'

—'তার ভিতরেও ছিল একটি অদ্ভুত সাংকেতিক ছড়া। বহুকাল ধরে কেউ তার অর্থ আবিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু জয়ন্ত তার রহস্য ভেদ করে অবাক করে দিয়েছিল সবাইকেই!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে মৌনব্রত ভঙ্গ করে বললেন, 'হুম! বাব্বা, সে কী কাণ্ড! জয়ন্তের বুদ্ধি হচ্ছে যাকে বলে ক্ষুরধার! আমার মতন লোকও ওর কাছে পদে পদে হার মানতে বাধ্য হয়, অথচ পুলিশে চাকরি করে আমি মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম। হুঁ হু, এ বড়ো চারটি-খানেক কথা নয়!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, জয়ন্তবাবুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর কারুর চেয়েই কম নয়!'

জয়ন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বললে, 'আপনারা দয়া করে থামুন। সামনা-সামনি প্রশংসা আমার মনে হয় গালাগালির মতো।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু সামনা-সামনি গালাগালিকে আপনি প্রশংসা বলে মনে করতে পারেন?'

—'না, তাও পারি না। আমার মত কী জানেন? সামনা-সামনি প্রশংসা আর গালাগালি, ও দুটো ব্যাপারই হচ্ছে ভদ্রলোকের পক্ষে অসহনীয়। আমি ওর কোনওটারই পক্ষপাতী নই। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল! কথায় কথায় আসল কথাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে বিমলবাবু, আপনি ওই ম্যাপের হেঁয়ালির মানে বুঝতে পেরেছেন?'

—'পেরেছি।'

—'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অর্থ উদ্ধার করলেন কেমন করে?'

—'কারণ এর সংকেতগুলো অত্যন্ত সহজ। যারা দীর্ঘকাল ধরে সাংকেতিক লিপি নিয়ে আলোচনা করেছে, তাদের কাছে এই ম্যাপের সংকেতগুলো হচ্ছে ক-খ-গ-ঘ-এর মতন সোজা।'

—'বেশ, আপনার কথাই মানলুম। ম্যাপের রহস্য কী, আপাতত তাও আমি জানতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

—'অনায়াসে।'

—'আপনি তো সুলু সাগরের ওই বোম্বেটে দ্বীপে যেতে চান?'

—'অবশ্য।'

—'গুপ্তধন উদ্ধার করতে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আইন বা অন্যান্য কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু সাধারণ আইনের উপরে আর-একটা উচ্চতর আইন আছে। একথা আপনি মানেন তো? সে আইনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের উচ্চতর হৃদয়?'

---

*'সোনার আনারস' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

বিমল দাঁড়িয়ে উঠল। জয়ন্তের একখানি হাত নিজের ডান হাতের মুষ্টির ভিতরে গ্রহণ করে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝেছি। আমরা যদি গুপ্তকথা জানতে পেরে গোপনে গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করে নি, তাহলে চলতি কোনও আইনই আমাদের বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু এই যে একখানি ছোট্ট ম্যাপের অজানা হেঁয়ালি, এর জন্যেই মনোহরবাবু কিছু ভালো করে না জেনেও নিজের প্রাণ দিয়ে সহধর্মিনী আর অন্যান্য পোষ্যদের অনাথ করে গিয়েছেন। সুতরাং এই ম্যাপেরই সাহায্যে যদি সত্যসত্যই গুপ্তধন পাওয়া যায়, তাহলে তার উপরে দাবি-দাওয়া থাকা উচিত কেবল মনোহরবাবুর পরিবারবর্গেরই। কেমন, আপনি এই কথাই বলতে চান তো?'

—'হ্যাঁ বিমলবাবু।'

—'কিন্তু একথা তো বলাই বাহুল্য! জেনে রাখুন, গুপ্তধন যদি পাই তা আমরা স্পর্শও করব না।'

সুন্দরবাবু একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তবে গুপ্তধন আনতে যাবার জন্যে আপনার এত বেশি আগ্রহ কেন?'

বিমল পরিপূর্ণ স্বরে বললে, 'আগ্রহ কেন? আগ্রহ কেন? গুপ্তধন পেলেও তার উপরে অধিকার থাকবে কেবলমাত্র মনোহরবাবুর পরিবারবর্গের। কিন্তু আসলে গুপ্তধনের জন্যে আমাদের নিজেদের কোনওই আগ্রহ নেই। আমরা সুলু সাগরে তরণী ভাসাতে চাই অন্য কারণে।'

পুলিশের পুরাতন কর্মচারী সুন্দরবাবু। দীর্ঘকাল ধরে চোর-ডাকাত-খুনিদের সংসর্গে থেকে থেকে মানুষের নিঃস্বার্থতা ও উচ্চতর প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কাজেই একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, 'কারণটা কী শুনতে পাই না?'

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'আঃ! সুন্দরবাবু, কী বলছেন!'

কিন্তু ইতিমধ্যে কুমার উঠেছে দাঁড়িয়ে। সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'কারণটা কী, শুনতে চান? আমরা কারুর মুখাপেক্ষী নই, কারুর দাসত্বও আমরা করি না! ভগবান আমাদের যে ঐশ্বর্য দিয়েছেন, অনায়াসেই আমরা রাজা বা মহারাজা খেতাব লাভ করতে পারতুম—বুঝেছেন সুন্দরবাবু? ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্যে আমরা গুপ্তধন আনতে যাচ্ছি না—আমরা যেতে চাই কেবল এই সুযোগে বিপুলা ধরণীর জলেস্থলে অথবা শূন্যে আর একবার নিজেদের ছড়িয়ে দিতে দিকে দিকে! চাই ঘটনা, চাই উত্তেজনা, চাই উন্মাদনা! মোহরের স্তূপ অন্বেষণ করুক লক্ষ্মীপেচকরা, কিন্তু আমরা খুঁজতে চাই বারুদের স্তূপ—পদে পদে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা! বিপদের মধ্যে কতখানি 'রোমান্স' আছে আপনি তার কতটুকু খবর রাখেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বাস রে বাস, বিপদের মধ্যে 'রোমান্স'! আপনারা দেখছি জয়ন্ত আর মানিকের উপরেও টেক্কা মারতে চান! বিপদের মধ্যে আবার 'রোমান্স' কী রে বাবা?'

মানিক বললে, 'সে তো আপনি বুঝবেন না সুন্দরবাবু! ভগবান কোনও কোনও জীবকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন কেবল ভারবহন করবার জন্যে, তাদের তো 'রোমান্সে'র খবর রাখবার কথা নয়!'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এর মানেটা কী হল? আমি হচ্ছি ভারবাহী জীব? আমি হচ্ছি গর্দভ?'

মানিক ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'সে কী কথা? গর্দভের তো লাঙ্গুল থাকে, আপনার লাঙ্গুল কই?'

—'হুম! তুমি হচ্ছ প্রচণ্ড নচ্ছার! আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, 'বড্ড বাজে কথা হচ্ছে! এখন কাজের কথা হোক। বিমলবাবু, আবার জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আপনি সুলু সাগরে যাত্রা করতে চান?'

—'ও-সম্বন্ধে কি এখনও আপনার সন্দেহ আছে?'

—'আপনার সঙ্গী তো চাই?'

—'নিশ্চয়!'

—'সঙ্গে যাবেন কে কে?'

—'আপনি, মানিক, কুমার—আর যদি ইচ্ছা করেন তো সুন্দরবাবু।'

—'হুম, আমি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আমি কি তোমাদের ওই বিপদের 'রোমান্স' হজম করতে পারব?'

—'পুলিশ হয়ে এই কথা বলছেন!'

—'ভায়া, পুলিশের চাকরিতে যে পদে পদে বিপদের ভয় একথা মানি। তবে কী জানেন, সে-সব হচ্ছে চেনা বিপদ, তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর আছে আমার নখদর্পণে। কিন্তু আপনারা যে- সব অজানা বিপদকে জলে-স্থলে-শূন্যে খুঁজে বেড়ান, আমার ধারণায় তারা ধরা পড়ে না। এই যে সারাঙ্গানি দ্বীপ নামে একটা উদ্ভট জায়গায় যাবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করছেন, ওখানে কি মানুষে যায়? একে তো শুনছি সে হচ্ছে শ্মশানের মতন ঠাঁই, কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা পর্যন্ত গুপ্তধনের লোভেও সেখানে পা বাড়াতে ভরসা পায় না, তার উপরে সেই বোম্বেটে বেটা নাকি মরবার সময়ে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছে—ও-দ্বীপে যে যাবে সে আর ফিরবে না। এমন অভিশাপের অর্থ কী? বোম্বেটেটা যেসব নারীকে দ্বীপে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে, তারা কি আজ যক হয়ে পাহারা দিচ্ছে গুপ্তধনের উপরে?'

মানিক বললে, 'যক নয় সুন্দরবাবু, যক্ষিণী।'

—'যক্ষিণী?'

—'হ্যাঁ। সংস্কৃতে 'যক'কে বলে 'যক্ষ'। আর যক্ষের বউকে বলে 'যক্ষিণী'। কাজেই সারাঙ্গানি দ্বীপে যেসব স্ত্রীলোককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের প্রেতাত্মাকে যক্ষিণী বলেই ডাকা উচিত।'

—'ও বাবা!'

—'আমরা সব জোয়ান পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-ভূতকে আবার ভয়টা কীসের? যক্ষিণী কখনও দেখিনি, এইবারে দেখবার সুযোগ পাব?'

—'আমি যক্ষিণী দেখতে রাজি নই।'

—'রাজি নই বললে কি চলে? আমরা যখন যাচ্ছি, আপনাকে যেতেই হবে!'

—'কী একটা গানে আছে না—'ছাড়বে না সন্ন্যাসী তোমায় কাশী দেখাবে'—তোমরাও তাই করতে চাও নাকি?'

—'হুম!'

—'আমাকে যেতেই হবে?'

—'হুম!'

—'আরে গেল, বার বার 'হুম' বলছ কেন?

—'আপনি বার বার 'হুম' বলতে পারেন, আমি পারি না? 'হুম' শব্দটা কি আপনারই একচেটে?'

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'ও, আমাকে রাগাবার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা দেখি, কেমন করে তুমি আমাকে রাগাও? আজ আমি কিছুতেই রাগব না!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'যাক, সুন্দরবাবু তবে আজ ক্রোধকে 'বয়কট' করলেন, বাঁচা গেল! তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো?'

—'অগত্যা। ছিনে জোঁকদের পাল্লায় পড়েছি, উপায় কী?'

—'এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, কবে আমরা যাত্রা করব বিমলবাবু?'

—'দিন-চারেক লাগবে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিতে।'

—'কী রকম জিনিস-পত্তর?'

—'এই ধরুন, সর্বাগ্রে দরকার একটা মেশিনগান।'

—'মেশিনগান?'

—'হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে অটোমেটিক বন্দুক, রিভলভার আর হাত-বোমা প্রভৃতি অস্ত্র থাকবে বটে, কিন্তু তার উপরেও চাই অন্তত একটা মেশিনগান।'

—'কিন্তু মেশিনগান পাবেন কোথায়?'

—'একটু চেষ্টা করলেই মেশিনগান জোগাড় করতে পারি।'

—'বৈধ, না অবৈধ উপায়ে?'

—'বৈধ উপায়েই। অবশ্য সুপারিশের দরকার।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু মেশিনগান কী হবে? কাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব?'

মানিক বললে, 'যক্ষিণীদের সঙ্গে। বিনা যুদ্ধে তারা গুপ্তধন ছাড়বে কেন?'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না মানিক, ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে।'

বিমল হাস্যমুখে বললে, 'আশ্বস্ত হোন সুন্দরবাবু, আশ্বস্ত হোন। যাচ্ছি অজানা দ্বীপে, না-জানারই বিপদ-আপদের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তো? মেশিনগানের মতো একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকলে দ করো, ভারী না হলেও আমরা মনের ভিতরে জোর পাব কতখানি! কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

—'সে কথা ঠিক। কিন্তু কবে, কোথা থেকে আমরা কোন জাহাজে উঠব?'

—'জাহাজ? জাহাজ কেন? জাহাজ, রেলগাড়ি ওসব তো সেকেলে ব্যাপার! এ যুগ হচ্ছে 'স্পি যুগ, মানুষ চায় বিদ্যুৎ-গতির সঙ্গে ছুটতে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের গতি চাইবে তুলেছে অধিকতর দ্রুত। ভেবে দেখুন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। মানুষ তখন কেবল পায়ে হেঁটে ফেরা করত। তারপর বেশি সভ্য হয়ে সে ঘোড়া, হাতি, উটদের বশ করলে, আরও তাড়াতাড়ি এক থেকে স্থানান্তরে যাবার জন্যে। কিছুকাল পরে তাতেও তার পোষাল না, আবিষ্কার করলে বেগবা বাষ্পীয় পোত, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি। তারপর এসেছে আধুনিক—অর্থাৎ আজকের যুগ। আজ মানুষ আরও বেগে ছুটতে চায়, তাই আবিষ্কার করেছে বিমানপোত। জয়ন্তবাবু, আমরা যাব এরোপ্লেনে!'

সুন্দরবাবু চমকে লাফিয়ে উঠলেন। সভয়ে বললেন, 'এরোপ্লেন? অসম্ভব!' ন্য

—'কেন?'

—'ছেলেবেলায় নাগরদোলায় চড়লেই বন বন করে আমার মাথা ঘুরত। এ বয়সে এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে আকাশে ঘুরতে আমি পারব না।'

জয়ন্ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সবতাতেই আপনার আপত্তি!'

সুন্দরবাবু আবার বসে পড়ে কাঁচুমাচু মুখে করুণ স্বরে বললেন, 'ভায়া, তোমরা বুঝছ না। আমি হচ্ছি গত যুগের রক্ষণশীল মানুষ, আর তোমরা হচ্ছ বিশ শতাব্দীর মানসপুত্র—অতীতের বিরুদ্ধে করো যুদ্ধঘোষণা। আমরা জড়িয়ে থাকতে চাই চিরপরিচিত অতীতকে, আর তোমরা চাও উল্কার মতন ছুটে যেতে অপরিচিত ভবিষ্যতের দিকে। আমরা চাই পিছোতে, তোমরা চাও এগুতে। কাজেই তোমাদের বুঝতে পারি না, ভয় পাই তোমাদের কথায়। এ কেবল বুদ্ধির দোষ নয়, আমাদের অভ্যাসের দোষ! কাঁচা চুলের সঙ্গে পাকা চুলের তফাত যে এইখানেই।'

মানিক সহানুভূতির সঙ্গে বললে, 'অন্যান্য পাকাচুলদের কথা ছেড়ে দিন সুন্দরবাবু, চোখ মুদে তারা খালি পিছোতেই জানে। কিন্তু আপনার বিশেষত্ব আছে। আপনি প্রথমে অভ্যাস-দোষে দু-পা পিছিয়ে যান বটে, কিন্তু তারপরেই আমাদের সঙ্গে ছুটে আসতে পারেন সামনের দিকে। তার মানে, আজও আপনি 'ফসিলে' পরিণত হননি।'

কুমার বললে, 'বিমল, রামহরি এক মাস ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তাকে কি এবারে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে?'

বিমল বললে, 'না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তবেই সেরেছে! আপনাদের সঙ্গে বিদেশ যাত্রার সময়ে আমার সর্বপ্রধান আকর্ষণ হয় রামহরি।'

—'কেন?'

—'অমন খাসা রাঁধতে কেউ পারে না—আহা, রান্না তো নয়, অমৃত!'

বিমল বললে, 'মাভৈ! রামহরি থাকবে না বটে, কিন্তু রন্ধনে তার নিজের হাতে-গড়া শিষ্য বিমল আর কুমার থাকবে তো?'

মানিক বললে, 'বাঘাও তো আমাদের সঙ্গে যাবে না?'

বিমল বললে, বলেন কী, তাও কখনও হয়? বাঘার মতন বন্ধু আমাদের কে আছে? বাঘা- হীন জীবন আমরা কল্পনাও করতে পারি না!' বাঘা খানিক তফাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, কিন্তু তার নাম হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বিমলের কাছে এসে দাঁড়াল—তার ভাবটা এই : আমি হাজির। এখন কী হুকুম?

পাঁচ

সুন্দরবাবু এরোপ্লেনে চড়বেন না

রেঙ্গুন—সিঙ্গাপুর—ব্রিটিশ বোর্নিয়ো! সেখান থেকে ফিলিপাইনের মিন্ডানাও দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে। আপাতত তাদের আকাশ-ভ্রমণ শেষ হল।

এই আধুনিক ভ্রমণে 'স্পিড' থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণনা করবার কথা বিশেষ কিছুই থাকে না। ট্রেনে বা জাহাজে চড়ে পথে বেরুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক কিছুই। ট্রেন নানা দেশ মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছোটে—কত রকম দৃশ্য, কত রকম পাহাড়, নদী, মাঠ, বন, কতরকম জাতের লোকের কত ভাষার কথা—চোখের সুমুখ দিয়ে যেন সবাক সিনেমার ছবির পর ছবির শোভাযাত্রা! জাহাজও থামে দেশে

দেশে বন্দরে বন্দরে, সে-ও জোগায় নব নব বৈচিত্রের খোরাক, সেই মানুষের আঁখি-পাখিকে ছোটায় পৃথিবীর নানা সাজঘরের পর্দা তুলে দিকে দিকে।

উড়োজাহাজও যখন প্রথমে শূন্যে ওঠে চোখে তখন মন্দ লাগে না। বিপুলা ধরণী গা এলিয়ে শুয়ে থাকে অনেক—অনেক নীচে। তার গন্ধ বা ধ্বনির ছন্দ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চোখে দেখা যায় তার রামধনু রঙের ঐশ্বর্য। সেখানেও ছবির পর ছবি—কিন্তু রিলিফ মানচিত্রের মতো। একসঙ্গেই অনেকটা দেখা হয়ে যায়, এক-একখানা করে বইয়ের পাতা উলটে নতুন নতুন ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মনে যেমন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আনন্দ-ছন্দ জাগে, উড়োজাহাজের দর্শকরা তাথেকে হয় বঞ্চিত। পৃথিবীর বুকে বসে পৃথিবীকে দেখা আর পৃথিবী ছাড়িয়ে উপরে উঠে দূর থেকে পৃথিবীকে দেখা, এর মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। বিমানপোতের যাত্রীরা যেন অন্য গ্রহ থেকে দেখে নিজেদের পৃথিবীকে!

আরও একটু নূতনত্ব আছে। এক-একবার মাথার উপরে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখি নির্মল নীলিমাকে, আবার এক-একবার নীলচন্দ্রাতপের আওতায় গিয়ে পায়ের তলায় তাকিয়ে মেঘ-বাতায়ন দিয়ে নজর চালিয়ে দেখি রূপসী ধরণীর খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে। কখনও তোমার উপরে মেঘছত্র, কখনও তোমার নীচে মেঘের আসন। পৃথিবীকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না।

অনেক উঁচু থেকে একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সুন্দরবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত রক্ত-ছোটাছুটির কোলাহল তিনি শুনতে পেলেন স্বকর্ণে! মনে হল খবরের কাগজে তো প্রায়ই পড়া যায়, ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় এরোপ্লেন 'পপাত ধরণীতলে' হয়ে যাত্রীসমেত একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এখনই তো সেইরকম একটা কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে? উঃ! সুন্দরবাবুর মাথার ভিতরটা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ। সেই যে তিনি চোখ ফিরিয়েছিলেন, আর একবারও নীচের দিকে চাইতে সাহস করেননি। তাঁকে দেখাচ্ছিল জীবন্মৃতের মতো। মানিকের বাছা বাছা ধারালো টিটকারিও জাগ্রত করতে পারেনি তাঁর দ্বিতীয় রিপুকে।

যাত্রাশেষে পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'বাবা অনেক পুণ্য করেছিলেন, তারই মহিমায় এ-যাত্রা কোনওগতিকে বেঁচে গেলুম। তোমরা যতই ধিক্কার দাও আর যতই আবদার করো, ফেরবার পথে আমি আর কিছুতেই এরোপ্লেনে চড়ব না! না, না, না, কিছুতেই না—হুম!'

মানিক সকৌতুকে বললে, 'আপনি কি আর দেশে ফিরতে পারবেন?'

—'মানে?'

—'সারাঙ্গানি দ্বীপের কোনও কঙ্কালময়ী যক্ষিণী হয়তো আপনাকে বিয়ে করে আর ছাড়তে চাইবে না!'

—'যাও, যাও, বাজে বোকো না!'

—'দেখবেন!'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢের দেখছি—এবারেও দেখব!'

মানিক খিলখিল করে হাসতে লাগল এবং সুন্দরবাবু গজরাতে লাগলেন হুম হুম রবে।

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আমরা ভারতের অতীত কীর্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়ার জন্যে বৃহত্তর ভারতে—অর্থাৎ ওদিকে কাম্বোডিয়ার আর এদিকে বোর্নিয়ো, সুমাত্রা আর জাভা প্রভৃতি দ্বীপে ভ্রমণ করেছি বটে, কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপে পদার্পণ করবার সুযোগ কখনও পাইনি। এই দ্বীপ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

বিমল বললে, 'আমি আর কুমার এ অঞ্চলে দু-বার এসেছি, আমরা এখানকার কথা কিছু কিছু জানি বটে! আচ্ছা, কুমার। তুমি জয়ন্তবাবুকে ফিলিপাইনের কাহিনি শোনাও, আমি ততক্ষণে একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে দেখে আসি, একখানা চিনে 'জাঙ্ক' ভাড়া পাওয়া যায় কি না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চিনে 'জাঙ্ক' কী আবার?'

—'একরকম উঁচু পাল তোলা চিনে নৌকো, ছোট্ট জাহাজ বলাও চলে। সমুদ্রে ভাসতে পারে। তলদেশ সমতল। জাপানিরাও এইরকম পোত ব্যবহার করে।'

—'ও ভাড়া করে কী হবে?'

—'সুলু সমুদ্রে তরণী ভাসিয়ে ম্যাপের সেই দ্বীপে উঠতে হবে তো? আয়রে বাঘা, আমার সঙ্গে চল! দুই বন্ধুতে খানিক বেড়িয়ে আসি।'

জলপথ বা স্থলপথ বাঘাকে বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু সুন্দরবাবুর মতো তারও শূন্যপথ ছিল না মোটেই পছন্দসই। শূন্যপথের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে—সে অভিজ্ঞতা আনন্দজনক নয় আদৌ।* কাজেই এরোপ্লেনে চড়ে এখনও পর্যন্ত তার মন খারাপ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হচ্ছিল, আবার বুঝি সেই অমঙ্গুলে মঙ্গলগ্রহের কিম্ভুতকিমাকার বাসিন্দাদের পাল্লায় গিয়ে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হবে। এখন পায়ের তলায় ফের পৃথিবীর মাটি খুঁজে পেয়ে সে আশ্বস্ত হয়ে বোধকরি ভাবছিল, মানুষদের দেশ ছাড়া কুকুরদের আর কোনও দেশে যাওয়া উচিত নয়! এখন বিমলের আহ্বান শুনেই সে টক করে উঠে দাঁড়িয়ে কুমারের পানে তাকিয়ে বললে 'ঘেউ, ঘেউ' (অর্থ বোধহয়—'আসি কর্তা'), তারপর লাঙ্গুলকে জয়পতাকার মতন ঊর্দ্ধে তুলে তাড়াতাড়ি ছুটল বিমলের পিছনে পিছনে।

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, এইবারে ফিলিপাইন সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করুন।'

কুমার যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই

'ফিলিপাইন একটা দ্বীপ নয়—অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। ফিলিপাইন বলতে বুঝায়, ছোটো-বড়ো সাত হাজারেরও বেশি দ্বীপ। তার কোনও কোনও দ্বীপ খুব বড়ো—যেমন উত্তরে 'লুজন' ও দক্ষিণে 'মিন্ডানাও' দ্বীপ। কোনও-কোনও দ্বীপ মাঝারি—যেমন 'পালাওয়ান', 'নেগ্রোস', 'প্যানে', 'সমর', 'কেবু' ও 'মিন্ডোরো'। কোনও কোনও দ্বীপ ছোটো—তাদের নাম করবার দরকার নেই। আবার কোনও কোনও দ্বীপ এত খুদে যে, একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। সারাঙ্গানি দ্বীপ খুব সম্ভব ওই-রকমই—বাজার চলতি বা ইস্কুলের ম্যাপে তার কোনওই ঠাঁই নেই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী 'ম্যানিলা' নগর আছে উত্তরের 'লুজন' দ্বীপে। সমগ্র ফিলিপাইনের লোকসংখ্যা হচ্ছে এক কোটি তেইশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত (অবশ্য এক যুগেরও আগেকার আদমসুমারিতে—লোকসংখ্যা এখন নিশ্চয়ই বেড়েছে)।

ফিলিপাইনের বাসিন্দা ফিলিপিনোরা অসভ্য নয়—ইংরেজরা যখন ছিল প্রায় বর্বরের মতো, ফিলিপিনোরা ছিল তখন রীতিমতো সভ্য। ইংরেজরা যখন চামড়ার পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে জানত না, ফিলিপিনোরা তখনও রেশম ও কার্পাস প্রভৃতির পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে বিখ্যাত হয়েছিল। সোনা রুপা ও জড়োয়ার কাজের জন্যেও তারা কম বিখ্যাত ছিল না। এমনকি সেই প্রাচীন যুগেই তারা বারুদের ব্যবহার জানত এবং তাদের কামান-বন্দুক তৈরি করবার জন্যে কারখানাও ছিল। তবে ভারতবর্ষের মতো ফিলিপাইনের মধ্যেও এখানে ওখানে রীতিমতো অসভ্য অথবা আদিম জাতির

*লেখকের 'মেঘদূতের মর্তে আগমন' দ্রষ্টব্য।

অভাব নেই—যেমন 'নেগ্রিটো', 'মোরো', 'ইগোরোট', 'ইলনগট', 'গ্যাডডেন্স', 'কালিঙ্গা', 'মান্ডায়া', 'ইফুগায়ো', 'ইটাভি' প্রভৃতি। কোনও কোনও অসভ্য জাতি শ্বেতাঙ্গদের চেষ্টায় আজকাল 'সভ্য' হয়েছে বলে গর্ব করতে পারে অল্পবিস্তর পরিমাণে!

এখানে চিনেম্যানদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। ফিলিপিনোরাও চিনেদের মতোই মঙ্গোলীয় জাতিরই অন্তর্গত। সাধারণ ফিলিপিনোরা তেমন পরিশ্রমী নয়—ব্যাবসা-বাণিজ্যেও তারা সহজে মাথা ঘামাতে চায় না। সুচতুর ও কর্মঠ চিনেম্যানরাই ওসব ক্ষেত্রে বাজার প্রায় দখল করে আছে—বাংলাদেশে মাড়োয়ারি ও অন্যান্য অবাঙালি জাতিদের মতো।

ফিলিপাইনকে কোনও কোনও গ্রন্থে 'অশান্তির দ্বীপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অভিযোগ মিথ্যা নয়। হতভাগ্য ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা ভালোবাসে, অথচ নানা কারণে তাদের মালয়বাসীগণের, চিনেদের, স্পানিয়ার্ডদের ও আমেরিকানদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তারা হয়েছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জাপানিদের করতলগত। অবশ্য তারপর এখন তারা হয়েছে স্বাধীন—যদিও এখনও পর্যন্ত তাদের উপরে আমেরিকার প্রভাবই আছে কম-বেশি মাত্রায়।

ষোলো শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অমানুষিক অত্যাচার করে এখানে এসে হাজির হয় স্পেনীয় জলদস্যুরা। ফিলিপিনোরা কাপুরুষ ছিল না, তাদের সঙ্গে ওই নিষ্ঠুর জলদস্যুদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে বহু বৎসর ধরে। খুব সম্ভব বোম্বেটে সারাঙ্গানি ছিল ওই জলদস্যুদেরই একজন।

প্রাচীন ফিলিপিনোদের নিজেদের সাহিত্য এবং ললিতকলা ছিল, কিন্তু তথাকথিত সভ্যতাগর্বিত স্পানিয়ার্ডরা সেসব প্রায় নিঃশেষে ধ্বংস করেছে। ভগবানের অভিশাপে এই স্পানিয়ার্ডরা পৃথিবীতে আজ কোণঠাসা হয়ে আছে এবং শ্বেত বা অশ্বেত কোনও জাতিই তাদের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করে না। যখন তাদের ছিল পাশবিক ক্ষমতা, তখন তারা দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যান্য বহু স্থানে অগ্নি, তরবারি ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল প্রাণপণ চেষ্টায়! কিন্তু আপাতত যাকগে সেসব কথা।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে প্রকৃতি খুলে দিয়েছে তার বিচিত্র সাজঘর। কোথাও আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পর পাহাড়, এবং তাদের মাঝে মাঝে তরুশ্যামল ও নির্ঝরসরস উপত্যকা; কোথাও নৃত্যশীলা গীতিময়ী তটিনী এবং এখানে-ওখানে রূপসুন্দর নীল সরোবর; কোথাও উর্বর সমতল শস্যক্ষেত্র আর ঘাসের গালিচা পাতা তেপান্তরের মাঠ এবং আশেপাশে বিপুল অরণ্যের সবুজ সমারোহ!

বড়ো বড়ো বনের মধ্যে অসংখ্য মূল্যবান বৃক্ষ আছে, তারা সেগুন, আবলুস ও চন্দন প্রভৃতি কাঠ সরবরাহ করে। এখানে নারিকেল, আনারস, তেঁতুল, চা, কফি, কোকো, নীল, ইক্ষু, ধান, কার্পাস, গাঁজা, তামাক ও কদলী প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সোনা, তামা ও কয়লার খনিরও অভাব নেই।

কোনও কোনও মাসে অতিরিক্ত গরম পড়ে বটে, কিন্তু সাধারণত এখানকার আবহাওয়া বেশ প্রীতিকর। বেশি গরমের সময়ে যারা বাইরে কাজ করে, তারা দুপুরের পর কাজ থামিয়ে করে দিবানিদ্রার আনন্দ উপভোগ।

প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে জাপানের মতো ফিলিপাইনেও বেশির ভাগ বাড়ি ইট-পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় না। অধিকাংশই কাঠের বাড়ি। এখানে সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলিতে 'টাইফুন' নামক ভয়াবহ ঝড়েরও প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যেসব দ্বীপের জঙ্গলে থাকে অসভ্য জাতিরা, সেখানকার ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রথা আলাদা। এক অসভ্য জাতি অন্য অসভ্য জাতিকে পছন্দ করে না, পরস্পরের মধ্যে

যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, খুনোখুনি লেগেই আছে। তাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবার জন্যে তারা দুরারোহ পাহাড়ের উপত্যকা বা মস্ত মস্ত গাছের উঁচু ডালের উপরে তৈরি করে বাস করবার ঘর।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এসে আধুনিক ফিলিপিনোদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বেশির ভাগ লোকই ইউরোপীয় পোশাক পরে—যদিও তারা নিজেদের জাতীয়তার বিশিষ্টতা হারায়নি। এখানকার শহরগুলিতেও আধুনিকতার কোনও উপকরণেরই অভাব নেই—বিজলি বাতি ও পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রাম, মোটরগাড়ি, রেডিয়ো, প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ, বড়ো বড়ো লোহার সাঁকো, ইস্কুল, কলেজ, বাজার, সুগঠিত গির্জা, প্রাসাদ, অট্টালিকা।

এইবার কোনও কোনও অসভ্য জাতির কথা বলি।

উত্তরের লুজন দ্বীপের ইগোরোটরা হচ্ছে একটি প্রধান অসভ্য জাতি। তাদের গায়ের রং ঘোর তামাটে। থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, দুই গালের হাড় উঁচু। তাদের চওড়া বুক ও পেশিবদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেয় বিপুল শক্তির পরিচয়। তারা মোটেই পছন্দ করে না আধুনিক সভ্যতা।

ওই দ্বীপেই বাস করে গ্যাডডেন্স নামে আর-এক অসভ্য জাতি, তারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। লুজন-এ আর দুটি অসভ্য জাতি আছে—ইটাভি ও ইফুগায়ো। শেষোক্ত জাতের লোকদের ধর্ম ছিল নরমুণ্ড শিকার করা।

ফিলিপাইনে আরও অনেক অসভ্য জাতি আছে, সকলকার কথা বলবার দরকার নেই।

আমরা যে মিন্ডানাও দ্বীপে এসে উঠেছি, এটি আকারে ৩৬,৯০৬ বর্গ মাইল। এর লোক সংখ্যা ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার।

এখানকার প্রধান অসভ্য জাতিকে মোরো বলে ডাকা হয়। ধর্মে এরা মুসলমান। মোরোরা মিন্ডানাও দ্বীপে এবং নিকটস্থ সুলু দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। স্পানিয়ার্ড ও আমেরিকানদের সঙ্গে তারা বরাবরই যুদ্ধ করে এসেছে। মালয়বাসীদের সঙ্গে তাদের একটা জাতিগত সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে তারা সুলু সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে ছোটো ছোটো দ্বীপের উপরে গিয়ে হানা দেয়। এইজন্যে এইসব ছোটো দ্বীপের বাসিন্দারা তাদের যমের মতো ভয় করে।

তাদের স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ মাঝারি আকারের, মাথার চুল ও গায়ের রং কালো এবং দৃষ্টি খুব ধারালো। সাধারণত ফিলিপাইনের অন্যান্য অসভ্য জাতিদের তুলনায় তারা অনেকটা অগ্রসর। বেশ সহজেই গ্রহণ করতে পারে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার। তাদের সাজপোশাকেও অপেক্ষাকৃত উন্নত রুচির প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল সভ্যতার সম্পর্কে এসে অধিকাংশ মোরোই হয়েছে শান্ত ও সংযত। মোরো নারীরাও রংচঙে পোশাক পরতে ভারী ভালোবাসে।

এখানে মান্ডায়া নামে আর-এক অসভ্য জাত আছে। তাদের সর্দারদের ডাকা হয় 'বাগানী' নামে। বহু নরহত্যা করতে না পারলে কেউ 'বাগানী' উপাধি লাভ করতে পারে না। মান্ডার নারীদের গায়ের রং ফরসা।

মহিষ হচ্ছে ফিলিপাইনের একটি অত্যন্ত কাজের জীব। মহিষকে এখানে ডাকা হয় 'কারাবাও' বলে। পুরুষ-মহিষরা গাড়ি টানে, শষ্য-খেতে কাজ করে। স্ত্রী-মহিষরা দুধ দেয় এবং তাথেকে তৈরি হয় ঘি। ফিলিপিনোদের মহিষের মাংস খেতেও আপত্তি নেই।

ম্যাপের দিকে চেয়ে দেখুন। মিন্ডানাও দ্বীপের একটি বাহু পশ্চিম দিকে এগিয়ে সুলু সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তারপর বাহুটা আবার দক্ষিণ দিকে নিম্নমুখী হয়ে নেমে গিয়েছে সুলু দ্বীপের দিকে। এই নিম্নমুখী বাহুর সর্বশেষ প্রান্তে আছি আমরা।

এখান থেকে যদি খুব ভালো দূরবিনের ভিতর দিয়ে সুলু সমুদ্রের উপরে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখবেন, নীলসাগরের দিকে দিকে জেগে আছে ছোটো ছোটো দ্বীপ। কোনও কোনও দ্বীপে আছে হয়তো মাত্র কয়েক বিঘা জমি। কোনও কোনও পুঁচকে প্রবাল দ্বীপে গাছপালার কোনও চিহ্নই নেই। আবার কোনও কোনও সবুজে ছাওয়া দ্বীপ যেন রূপকথার স্বপ্ননীড়ের মতো।

জানি না আমরা যে সারাঙ্গানি দ্বীপ খুঁজতে এসেছি, তার সত্যিকার রূপটি কী রকম। 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত বর্ণনা পড়লে তো মনে কোনওই আশার সঞ্চার হয় না। আর সেইটেই তো স্বাভাবিক। বাঘের ভালো লাগে রক্ত, যমদূতের ভালো লাগে নরক। সারাঙ্গানির মতন নরপিশাচের ভালো লেগেছে যে দ্বীপ, দেখতে তাকে নিশ্চয়ই সুন্দর নয়।'

শেষ হল কুমারের কাহিনি।

ছয়

সুন্দরবাবুর নতুন বিপদ

এখানে ম্যানোবো নামে এক অসভ্য জাত আছে, আগে তারা ছিল পৌত্তলিক এবং দাস-ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এখন তাদের অধিকাংশই হয়ে গিয়েছে ক্রিশ্চান, পোশাকও পরে ইউরোপীয়দের মতো।

এদেরই পল্লিতে বিমল প্রভৃতি যে বাসা পেয়েছিল তার মধ্যে নূতনত্ব আছে যথেষ্ট।

নীচে মাটির উপরে চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া। মাঝখানে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে খুব উঁচু ও খুব মোটা দুটো মস্তবড়ো গাছ—গাছের গুঁড়ি বলাই উচিত—দাঁড়িয়ে আছে, তার উপর দিকের সমস্ত ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছে এবং সেইখানে নির্মাণ করা হয়েছে একখানা একতলা কাঠের বাড়ি। তিনখানা ঘর ঘিরে চারিধারে বারান্দা। মাটি থেকে একখানা তিনতলা সমান উঁচু কাঠের মই বেয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠতে হয়।

বাসা দেখে পর্যন্ত সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু হয়ে আছে বিস্ফারিত।

মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে তিনি কেবলই সন্দিগ্ধ ভাবে মস্তক আন্দোলন করেন এবং মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, 'এই দেহ নিয়ে ওই মই বেয়ে কোনও অভদ্রলোকই কি উপরের ঘরে উঠতে পারে?' তারপর নিজের জিজ্ঞাসার জবাব দেন নিজেই। আবার ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন, 'উঁহু, পারে না—মোটেই পারে না! গাছের উপরে বাসা! মানুষ কি বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি? মানুষ কি পক্ষী? হুম!'

কুমারের কাহিনি সমাপ্ত হবার খানিকক্ষণ পরে বাঘাকে নিয়ে ফিরে এল বিমল। তার মুখ গম্ভীর।

কুমার শুধোলে, 'কী হে ভায়া, মুখমণ্ডল নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন কেন? 'জাঙ্ক' ভাড়া হয়েছে?'

—'হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।'

—'কষ্টে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'ও-দ্বীপের কথা এখানকার সবাই জানে।'

—'তারপর?'

—'দ্বীপের গুপ্তধনের কথাও কারুর অজানা নয়।'

—'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনও জাঙ্কওয়ালাই ওখানে যেতে রাজি নয়।'

—'কারণটা কী বলে?'

—'বলে, ও ভূতুড়ে দ্বীপ।'

—'আর কী বলে?'

—'বলে, মাঝে মাঝে কোনও কোনও লোভী লোক দ্বীপে গিয়ে নামে। কিন্তু তারা আর ফিরে আসে না।'

—'কেন ফিরে আসে না?'

—'কারণ কেউ জানে না। বলে, ওটা প্রেত-দ্বীপ। ওর বাসিন্দা প্রেতাত্মারা। গভীর রাত্রে কোনও কোনও জাঙ্কের নাবিকরা দূর থেকে দেখেছে, দ্বীপের ভিতরে অনেকগুলো আলো জ্বলছে! দূর থেকে এও শুনেছে, দ্বীপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে নারী-কণ্ঠে হাসি আর গানের ধ্বনি! বলে, দিনের বেলায় ও-দ্বীপ থাকে নির্জন আর নিস্তব্ধ। কিন্তু রাত্রিবেলায় হয়ে ওঠে শব্দে, সংগীতে আর আলোকে জীবন্ত! এই ধরনের আরও নানা কথাই তারা বললে।'

—'তুমি কি এসব বিশ্বাস করো?'

—'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও। আমি যা শুনেছি তাই বললুম।'

—'ওদের কথার উত্তরে তুমি কী বললে?'

—'সে অনেক কথা। বলার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত চারগুণ বেশি ভাড়ার লোভে একজন জাঙ্কওয়ালা আমাদের দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।'

—'জয় হিন্দ! ব্যাস, আমরা আর কিছু জানতে চাই না! আগে দ্বীপে গিয়ে তো নামি, তারপর আসুক ভূত, আসুক যক্ষিণী, আসুক অন্য যে-কোনও আপদ! আমরা তো জানি, বিপদ চিরদিনই আমাদেরই বিপজ্জনক মনে করে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে!'

সুন্দরবাবু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'হুম! দ্বীপে যে যায়, আর ফেরে না। রাত্রে দ্বীপ জ্যান্ত হয়। আলো জ্বলে, মেয়ে-গলায় হাসি-গান শোনা যায়। এসব কী ব্যাপার বিমলবাবু?'

—'জানি না।'

—'না-জেনেই পতঙ্গের মতন ছুটেছেন আগুনের পানে?'

—'ঠিক তাই। আমরা না-জেনেই সুমুখের দিকে ছুটি অজানাকে পাবার আনন্দে। জানা ব্যাপারে কোনও আনন্দ পাই না। আমরা পতঙ্গও নই। আমরা মানুষ। আগুনের দিকে ছুটলেও পুড়ে মরব না। মানুষ আগুন নেবাতেও জানে।'

'শিশুরাও মানুষ। তারা কিন্তু আগুনে হাত পুড়িয়ে কাঁদে।'

'আমরা শিশু নই। আগুন নেবাবার শক্তি আমাদের আছে।'

—'তাহলে আমি নাচার! আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমি আর পরামর্শ দেব না। আমি আর মুখ খুলব না। হুম!'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে কবে আমরা যাত্রা করছি?'

—'কাল সকালেই। খুব ভোরে। সূর্যোদয়ের আগেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু এইবারে আবার মুখ খুলতে হল। দ্বীপে যেতে হবে অত সকালে! তাহলে কাল উপবাসই ব্যবস্থা নাকি?'

—'পাগল! উপবাস করবার অভ্যাস আমার নেই।'

—'খাব কোথায় শুনি?'

—'জাঙ্কে।'

—'জাঙ্ক কি খাবার প্রসব করবে?'

—'মোটেই নয়। রন্ধনের ভারগ্রহণ করব আমি স্বয়ং আর কুমার। খেয়ে বলবেন, আমরা রামহরির উপযুক্ত শিষ্য কি না। এখন গাত্র উত্থাপন করতে আজ্ঞা হয়।'

—'হুম। গাত্রোত্থান করে যাব কোথায়?'

—'ওই গাছের বাসায়।'

—'ওই মই দিয়ে? মাফ করতে হল! আমি এই বয়সে আত্মহত্যা করতে অসম্মত।'

জয়ন্ত একবার সেই সংকীর্ণ মইয়ের দিকে এবং আর-একবার সুন্দরবাবুর বিস্তীর্ণ বপুর দিকে করলে দৃষ্টিপাত। তারপর কেবল চিন্তিত ভাবে বললে, 'তাই তো?'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর একটু মুশকিল আছে। ওঁর দেহের আধখানাই হচ্ছে ভুঁড়ি। সেইজন্যেই উনি চিন্তিত হচ্ছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কোনওই কারণ নেই। আমাদের কেউ উপর থেকে ওঁকে টানবে, আর কেউ নীচে থেকে ওঁকে ঠেলে ঊর্ধ্বদেশে প্রেরণ করবে। তাহলেই হয়ে যাবে সব সমস্যার সমাধান!'

সুন্দরবাবু সুন্দিগ্ধ ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'মানিকের ব্যবস্থাটা আমার কাছে মোটেই সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না।'

মানিক বললে, 'সন্তোষজনক না-হলেও এই ব্যবস্থাই মানতে হবে আপনাকে। রাত্রে থাকবেন কোথায়? এই নীচে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না, যে মুল্লুকে মানুষ মাটি ছেড়ে বাসা বাঁধে গাছের টঙে, সেখানে মাটির উপরটা কতদূর বিপজ্জনক? হয়তো আসবে দুর্দান্ত বন্য জন্তু, হয়তো আসবে রক্তপিপাসী দস্যু বা হত্যাকারী, তখন আপনি কী করবেন? তখন—'

ভুঁড়ি দুলিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আর কিছু বলতে হবে না মানিক! আমি সব সত্যই হৃদয়ঙ্গম করেছি! এখানে মাটির উপরে আমি আর কিছুতেই থাকব না—লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেও নয়! অতএব আমার এই বিপুল বপুর ভার মরিয়া হয়ে তোমাদের হাতেই অর্পণ করলুম—একে নিয়ে তোমরা যা-খুশি তাই করতে পারো। হুম, হুম, হুম, হুম!'

যাক। নিরাপদে সুন্দরবাবুকে সকলে মিলে প্রায় বহন করে কষ্টেসৃষ্টে ঊর্ধ্বদেশে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলে যথাস্থানে।

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বাপ রে বাপ! ভূত-পেতনির কথা শিশুবয়স থেকে শুনে আসছি, তাদের সঙ্গে যেন কতকটা চেনাশোনাও হয়ে গেছে! তাই ওই ভূতুড়ে-দ্বীপেও যেতে নারাজ হইনি। কিন্তু আগে যদি জানতুম, আমাকে মানুষ হয়েও বানর বা পাখির মতো বাঁধতে হবে আকাশ-ছোঁয়া গাছের উপরে বাসা—তাহলে হুম, মা-কালীর দিব্যি গেলে বলছি, কিছুতেই আমি তোমাদের সঙ্গে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসতে রাজি হতুম না। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি!'

বিমল বললে, 'আপাতত সুন্দরবাবুর একটা ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু এখনও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন বলুন দেখি?'

—'জাঙ্কের নাবিকদের কাছ থেকে আর একটা সন্দেহজনক খবর শুনে এলুম।'

—'সন্দেহজনক খবর?'

—'হ্যাঁ। শুনলুম আজ সকালেই আর-একদল লোকও নাকি একখানা মোটরবোটে চড়ে স্যারাঙ্গানি দ্বীপের দিকে যাত্রা করেছে।'

—'কারা তারা?'

—'তারা সবাই ফিলিপিনো। তাদের আর-কোনও পরিচয় জানতে পারিনি।'

—'ভাববার কথা বটে।'

—'ভেবে আর কী হবে বলুন? কার্যক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হয়েছি, শেষ পর্যন্ত না-দেখে ছাড়ব না। তবে, আমাদের রীতিমতো সাবধান হয়ে থাকতে হবে আর কী!'

সাত

নীল আলো, লাল আলো

যাত্রা শুরু হয়েছে।

উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ, নীচে পরিষ্কার নীল সাগর। পাল তুলে দিয়ে জাঙ্ক চলেছে জলের দোলায় দুলতে দুলতে। তরণীর তলায় শোনা যাচ্ছে পুলকোচ্ছল তরঙ্গদের করতালি। শূন্য-পথে উড়ে যাচ্ছে সাগরকপোতের দল। দৃষ্টিসীমা ভরে ঝরছে সূর্যালোকের সোনালি আশীর্বাদ। চারিদিকে শান্তির ইঙ্গিত, আনন্দের ছবি, সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

নিজেদের বাক্যরক্ষার জন্যে বিমল ও কুমার রন্ধনের আয়োজনে নিযুক্ত হয়েছে। সুন্দরবাবু সানন্দে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছেন। তাঁর মুখের পানে মানিক তাকিয়ে আছে সকৌতুকে। জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বসে আছে, তার দৃষ্টি কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে বাইরের সমুদ্রের দিকে।

দুটো বড়ো ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দেওয়া হল। একটাতে হবে ফাউলের রোস্ট, এবং ডিম, কপি, কলাইশুঁটি, আলু, বিট, শালগ্রাম, গাজর ও টোম্যাটো প্রভৃতি সিদ্ধ। আর-একটা কুকারে হবে পোলাও এবং ভাজা মাছ।

বিমল বললে, 'ব্যাস, আমাদের আয়োজন পর্ব সমাপ্ত। দু-ঘণ্টা পরেই ডান হাতের কাজ শুরু হবে। কী বলেন সুন্দরবাবু, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে আপনার বিশেষ কষ্ট হবে না তো?'

সুন্দরবাবুর রসনা সরস হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। সহাস্যে তিনি বললেন, 'তার আগে কি দু-এক পেয়ালা চা পাওয়া যায় না?'

—'বিলক্ষণ! তা আবার পাওয়া যাবে না? কুমার, 'স্টোভে' একটু গরম জল চড়িয়ে দাও তো!'

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ওর নাম কী, একটু আগে মনে হল যেন দেখলুম, আপনারা আর-একটা কী জিনিস বানাচ্ছেন!'

—'হ্যাঁ। শশার 'স্যান্ডউইচ'। চায়ের সঙ্গে তাও দু-একখানা দেব নাকি?'

—'হুম! আপত্তি নেই।'

রাত্রি।

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক, ঘুমন্ত দ্বীপ, স্তব্ধতার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছে সাগরতরঙ্গের কোলাহলে।

প্রধান মাঝি বললে, 'এই সারাঙ্গানি দ্বীপ।' তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস।

সবাই আগ্রহে দ্বীপের দিকে তাকালে।

সন্ধ্যার আগেই দূর থেকে তারা দেখেছিল, দ্বীপটি বড়ো নয়—লম্বায় হয়তো ছয় মাইলের বেশি হবে না। গাছপালার মাঝখানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি ছোটো পাহাড়ও।

মাঝি শুধোলে 'এইখানেই নোঙর করব নাকি?'

—'না, দ্বীপের খুব কাছ দিয়ে জাঙ্ক চালিয়ে যাও। দ্বীপটাকে আগে ভালো করে দেখি।'

মাঝি মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। বললে, 'দ্বীপে নামতে ভয় হচ্ছে বুঝি?'

—'ভয় পেয়েছি বললে যদি খুশি হও, তাহলে তোমার খুশিতে বাধা দেব না।'

জাঙ্ক চলতে লাগল।

দ্বীপের উপরে সমুদ্রের বালুকাতটের পরেই আরম্ভ হয়েছে বেশ ঘন জঙ্গল। বড়ো বড়ো গাছও আছে। সেগুলো কী গাছ, চাঁদের আলোয় ভালো করে বোঝবার জো নেই। চেনা গেল খালি বাঁশঝাড় আর নারিকেলগাছগুলোকে। এ অঞ্চলে এত নারিকেলগাছও আছে!

দ্বীপটাকে সম্পূর্ণ নির্জন বলেই মনে হয়। ভিতর থেকে গাছপালার মর্মর ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসছে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কই হে, যক্ষিণীর গান শুনছি না তো?'

মানিক বললে, 'যক্ষিণীরা ঘুমোচ্ছে।'

—'একটা বন্দুক ছুড়ে বেটিদের ঘুম ভাঙিয়ে দেব নাকি?'

—'পাগল!'

একদিকে চাঁদের আলো, আর-একদিকে কালো ছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপের ছোটো পাহাড়টা।

জয়ন্ত পাহাড়ের উপর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে অন্ধকার। সেদিকে এক-জায়গায় জ্বলছে একটা আলো। নীল আলো।

সকলের দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত।

কুমার বললে, 'মানুষ না-থাকলে আলো জ্বলে না।'

বিমল বললে, 'আলোটার রং নীল কেন?'

হঠাৎ নীল আলোটা নিবে গেল। জ্বলে উঠল লাল আলো।

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে এ হচ্ছে সাংকেতিক আলো।'

বিমল বললে, 'লাল আলো হচ্ছে বিপদের নিশানা। কেউ যেন দূরের কারুকে জানিয়ে দিচ্ছে—বিপদ উপস্থিত। হুঁশিয়ার!'

কুমার ঈষৎ হেসে বললে, 'বিপদ বলতে বোঝাচ্ছে বোধহয় আমাদেরই?'

বিমল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জয়ন্তের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, 'দেখুন, দেখুন!'

প্রায় তীরের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একখানা মোটরবোট!

খুব বড়ো ও বিশেষ শক্তিপূর্ণ একটা 'টর্চে'র তীব্র শিখা বোটের ইতস্তত নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, 'ভিতরে কোনও লোক নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

—'নিশ্চয়ই বোটের লোকেরা দ্বীপে গিয়ে নেমেছে।'

মাঝি বললে, 'বোধহয় ওই বোটখানাই আজ সকালে দ্বীপের দিকে এসেছিল।'

বিমল বললে, 'আমরা এইখানেই তীরে গিয়ে নামব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কাল সকালে তো?'

—'না, এখনই।'

—'সে কী, এই রাত্রে?'

—'হ্যাঁ। চাঁদের আলো থাকলেও দ্বীপে বনের ভিতরে অন্ধকার। সহজেই আত্মগোপন করতে পারব। দিনের আলোর স্পষ্টতা হবে আমাদের শত্রু। কী বলেন জয়ন্তবাবু?'

—'আমারও ওই মত।'

আট

আকাশ ফাটানো কান্না

মোটমাট নিয়ে সকলে দ্বীপে গিয়ে নামল।

মাঝি বললে, 'দ্বীপের এত কাছে থাকতে আমাদের সাহস হচ্ছে না। আমরা খানিক দূরে গিয়ে নোঙর ফেলব। কাল পর্যন্ত আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি না ফিরে আসেন তাহলে বুঝব, আপনারা আর-কোনও দিন ফিরে আসবেন না।'

বিমল হেসে বললে, 'তোমার কথাগুলি বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট, মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।'

জয়ন্ত তখন 'টর্চ' জ্বেলে সমুদ্রতীরের বালি হেঁট হয়ে লক্ষ করছিল।

বিমল বললে, 'কী ব্যাপার? কিছু হারাল নাকি?'

—'উঁহু। বালির উপরে পায়ের দাগ।'

—'দেখুন। পদচিহ্ন পড়ে আপনাদের বিভাগেই আপনারা হচ্ছেন পদচিহ্ন বিশারদ।'

—'এখানে আটজন লোকের পায়ের দাগ আছে। তারাই বোট থেকে নেমেছে। আসুন আমার সঙ্গে। লোকগুলো এইদিকে গিয়েছে।'

জয়ন্ত পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হল। অন্যান্য সকলে চলতে লাগল তার পিছনে পিছনে।

পদচিহ্নগুলো বালুকাতট ছেড়ে ঘাসজমি ও জঙ্গলের কাছে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আর পদচিহ্ন দেখবার উপায় নেই। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, লোকগুলো এইখান থেকেই বনের ভিতরে ঢুকেছে।'

বিমল বললে, 'কুছ পরোয়া নেহি! লোকগুলো কোথা দিয়ে কোন দিকে গেছে তাই জানা দরকার তো?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'কুমার, বাঘাকে ছেড়ে দাও।'

শিকলিতে বেঁধে বাঘাকে নিয়ে আসছিল কুমার। সে খুলে দিলে বাঘাকে।

জয়ন্ত বললে, 'বাঘা কী করবে?'

—'মানুষ-গোয়েন্দাকে হারিয়ে দেবে।'

—'কেমন করে?'

—'কুকুরের ঘ্রাণশক্তি আশ্চর্য। পদচিহ্নের অধিকারীরা যখন জমির উপরে পা ফেলে গিয়েছে, তখন তাদের গন্তব্যস্থান বাঘা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করে ফেলবে।'

—'কোনও কোনও জাতের বিলাতি কুকুরের এই শক্তি আছে বটে। কিন্তু বাঘা হচ্ছে দেশি কুকুর।'

সুন্দরবাবু ঘৃণায় নাক তুলে বললেন, 'আরে যাকে বলে নেড়ি কুত্তা! ছোঃ, ও-কুকুর আবার পোষে!'

বিমল বললে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। দেশি কুকুরদের তুচ্ছ ভাবা হয়, অবহেলা করে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। কুকুর তো জানোয়ার, শিক্ষা না পেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শিশুও নিকৃষ্ট পশুর সামিল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাঘার শিশুবয়স থেকেই অনেক যত্ন নিয়েছি, তার পিছনে অনেক খেটেছি, তাকে কতরকম শিক্ষা দিয়েছি। তার ফল স্বচক্ষে দেখুন। আয় তো রে বাঘা!'

বাঘা বিমলের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিমল বালুকাতটের পদচিহ্নগুলোর দিকে বাঘার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তাকে আর কিছু বলতে হল না। সে মাটির উপরে মুখ নামিয়ে বারকয়েক শ্বাসগ্রহণ করলে। একবার মুখ তুলে বললে, 'ঘেউ'! তারপর আবার মুখ নামিয়ে শুঁকতে শুঁকতে ঘাসজমির উপরে গিয়ে উঠল। তারপর সোজা প্রবেশ করল জঙ্গলের ভিতরে।

তার পিছনে যেতে যেতে বিমল বললে, 'আমাদের আর-কোনও ভাবনার নেই। বাঘাই আমাদের গন্তব্য পথ নির্দেশ করবে।'

জয়ন্তের চক্ষু হল চমৎকৃত। সুন্দরবাবু তখনও অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'বাঘা যে ভুল পথে যাচ্ছে না, তারই বা প্রমাণ কী?'

বিমল বললে, 'প্রমাণ পেতে বিলম্ব হবে না।'

—'হুম, দেখা যাক।'

জঙ্গল কোথাও পাতলা কোথাও ঘন। যেখানে গাছের ভিড় সেখানটা ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, যেখানে গাছ কম সেখানে দেখা যায় আলো-ছায়ার মিতালি। এখানে-ওখানে ছোটো-বড়ো ঝোপঝাপও যথেষ্ট।

কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন নেই। বাতাসে থর থর করে কাঁপছে বটে গাছের পাতারা, কিন্তু তারাও যেন ঘৃণাভরে হিংসা ভরে অভিশাপ দিয়ে বলছে, মর মর মর মর মর মর! মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির বিশ্রী চিৎকার—তাও বুকের ভিতরে জাগিয়ে তোলে আকস্মিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা! প্রত্যেক ঝোপ, প্রত্যেক ছায়া যেন অপার্থিব বিভীষিকার বাসা!

বিমল চুপি চুপি বললে, 'জয়ন্তবাবু, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী সন্দেহ?'

—'কেউ যেন আড়ালে আড়ালে আমাদের অনুসরণ করছে।'

—'আমিও দূরে দূরে কোনও কোনও ঝোপকে অস্বাভাবিক ভাবে নড়তে দেখেছি।'

—'আমাদের ভুলও হতে পারে।'

—'অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু অস্ত্র তৈরি রাখুন।'

—'বলা বাহুল্য।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বিমলবাবু, আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই।'

—'কেন?'

—'জঙ্গলটা ভালো বোধ হচ্ছে না।'

—'তাই নাকি?'

—'বুকটা কেমন ছাঁৎ ছাঁৎ করছে। এতক্ষণ তো করছিল না!'

—'বুককে ছাঁৎ ছাঁৎ করতে বারণ করুন।'

—'ঠাট্টা করছেন? কিন্তু আমি বলে রাখছি, এই জঙ্গলের বাইরে না-গেলে আমরা মারাত্মক বিপদে পড়ব। এখানে কেমন যেন অমানুষিক ভাব আছে। নইলে এমন পূর্ণিমার রাত্রেও চারিদিক খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছে কেন?'

আচম্বিতে মাথার উপরে একটা বড়ো গাছের ডাল দুলে উঠল সশব্দে।

'ওই রে!' বলেই সুন্দরবাবু পিছন দিকে মারলেন মস্ত এক লাফ!

সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল—এমনকি বাঘা পর্যন্ত। গাছের ভিতরে তখনও শব্দ হচ্ছে। যেন কেউ ডাল বেয়ে চলে যাচ্ছে গাছের এদিক থেকে ওদিকে। কিন্তু তাকে দেখা গেল না।

আচমকা বুক কাঁপানো স্বরে কোথা থেকে চ্যাঁচাতে লাগল একপাল শেয়াল।

বাঘা তাদের বেসুরো, অসভ্য, বন্য চিৎকার সইতে পারলে না। ধমক দিয়ে বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

শেয়ালদের পালা সাঙ্গ। গাছটাও নিসাড়।

বিমল বললে, 'গাছের উপরে হয়তো কোনও বাঁদর কি বনবিড়াল কি অন্য কোনও জন্তু আছে। আমাদের অভাবিত আবির্ভাবে চমকে গিয়েছে।'

বাঘা আবার অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'একটা বাজে নেড়ে কুত্তার ল্যাজ ধরে আমরা এতগুলো মানুষ বোকার মতন কোথায় চলেছি?'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, বাঘার নিন্দা আমরা ভালোবাসি না।' সে আর মানিক 'মেশিনগানে'র কাঠের কেসটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা-বলে একটা কুকুরের পিছু ধরে আমরা মানুষ হয়েও অপথে-বিপথে গিয়ে প্রাণ হারাব নাকি?'

কুমারের দুই চক্ষে ফুটল ক্রোধের চিহ্ন। কিন্তু মুখে সে আর কিছু বললে না।

মানিক ফিসফিস করে বললে, 'সুন্দরবাবুর কথায় কান দেবেন না কুমারবাবু। উনি লোক ভালো, কিন্তু ওঁর মুখ বড়ো আলগা।'

সকলে পথ চলতে লাগল নিঃশব্দে। খানিকক্ষণ পরে একটা উঁচু ও বড়ো ঝোপ পার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই জঙ্গল শেষ হয়ে গেল হঠাৎ।

একটা মাঠ—লম্বায়-চওড়ায় সিকি মাইলের কম নয়। তার বুকের উপরে মূর্ছিত হয়ে আছে চন্দ্রালোক। সেখানেও কেমন খাঁ খাঁ ভাব। মানুষের পৃথিবী, অথচ এখানে কোথাও দেখা নেই মানুষের। পৃথিবীর মধ্যে এ এক অপার্থিব দেশ।

বাঘা মাঠের উপর দিয়ে তখনও অগ্রসর হচ্ছিল, বিমল হঠাৎ বললে, 'বাঘা! দাঁড়া!'

সব পোষা কুকুরেরই মতো বাঘাও মানুষের অনেক ছোটো ছোটো কথাই বোঝে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

সামনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিমল সানন্দে বলে উঠল, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন!'

মাঠের এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বেশ বড়ো একটা বাঁশবন এবং পাশেই সারি সারি পাঁচটি নারিকেলগাছ!

জয়ন্ত সেই দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তা-হলে মনোহরবাবুর ম্যাপের প্রান্তে যে সাংকেতিক কথাগুলো আছে তা মিথ্যা নয়! বাঁশঝাড় আর পাঁচটি নারিকেলগাছ! বাঘা আমাদের আসল জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে! সাধু বাঘা, সাধু!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো কেবল বললেন, 'হুম!'

বিমল বললে, 'আর-একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে এদিকে যে-লোকগুলো এসেছিল, তারাও গিয়েছে ওইদিকেই। চল বাঘা, চল!'

জ্যান্ত লাঠির মতো লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলে বাঘা আবার এগিয়ে চলল সেই বাঁশঝাড় আর নারিকেলগাছগুলোর দিকেই।

বিমল আনন্দিত-কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, বাঘা ঠিক পথই ধরেছে! লোকগুলো ওইদিকেই গেছে—ওইদিকেই গেছে! বাঘার কাছে কোথায় লাগে ডিটেকটিভ শার্লক হোমস! জয়ন্তবাবুও বাঘার উপরে টেক্কা মারতে পারবেন না!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আমি মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার করছি। বাঘা হচ্ছে অতুলনীয়!'

অল্পক্ষণ পরেই সকলে বাঁশঝাড়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু সচমকে ও আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী দেখা যাচ্ছে ওখানে? কী ওগুলো পড়ে আছে—কী ওগুলো?'

সকলেই হাতের 'টর্চ' জ্বাললে। নারিকেলগাছগুলোর তলদেশ দিয়ে বয়ে যেতে লাগল তীব্র আলোকের তরঙ্গের পর তরঙ্গ!

সকলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, মাটির উপরে পাশাপাশি পড়ে রয়েছে কতকগুলো মানুষের মৃতদেহ! প্রত্যেক মৃতদেহের হাত-পা বাঁধা এবং প্রত্যেক মৃতদেহই মুণ্ডহীন!

জয়ন্ত মৃতদেহগুলোকে গুনে গুনে বললে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট!'

খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'এরাই বোধহয় আজ এসেছিল এই দ্বীপে। কিন্তু এরা কারা?'

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, 'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো! ওদিকে আবার কী কতকগুলো পড়ে রয়েছে দ্যাখো!'

বাঁশঝাড়ের পাশেই মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কতকগুলো রক্তাক্ত নরমুণ্ড!

জয়ন্ত আবার গুনে গুনে বললে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট!'

এমন বীভৎস দৃশ্য কল্পনারও অগোচর!

সুন্দরবাবু একটা মুণ্ডের উপরে 'টর্চে'র শিখা স্থির করে রেখে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ মুণ্ডটা আমি চিনি এ হচ্ছে সেই পলাতক ফিলিপিনো আসামি পাবলোর ছিন্নমুণ্ড!'

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থেকে বললে, 'সবই জলের মতন স্পষ্ট! পাবলোও কলকাতার পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আমাদেরই মতো উড়োজাহাজে চড়ে আমাদেরও আগে এখানে ফিরে এসেছিল। খুব সম্ভব মনোহরবাবুর ম্যাপের যে-অংশ সে পেয়েছিল, তা থেকে আর একখানা ম্যাপ নকল করে নিজের কাছে রেখেছিল। সে ভেবেছিল, আমাদের আগেই দলবল নিয়ে এখানে এসে গুপ্তধন উদ্ধার

করবে! কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, অজ্ঞাত হত্যাকারীর হাতে তাকে আর তার দলের সবাইকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু অজ্ঞাত হত্যাকারী কারা? নিশ্চয়ই তারা দলে ভারী, কারণ সাত-আটজন লোককে এমন ভাবে হত্যা করা দু-চারজন লোকের কাজ নয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এসবই ভৌতিক ব্যাপার!'

বিমল বললে, 'ভূতেরা যে আগে মানুষের হাত-পা বেঁধে হত্যা করে, এ কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি!'

সুন্দরবাবু কী জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আচম্বিতে সবাইকে স্তম্ভিত করে নারীকণ্ঠে জাগ্রত হল এমন এক অস্বাভাবিক তীব্র ক্রন্দন, যা বিদীর্ণ করে দিলে যেন সমস্ত আকাশকে!

নয়

কান্না-হাসির পর

সে কান্না থামতে না থামতে আর-একদিক থেকে জেগে উঠল আর-এক নারীর তীব্র ও তীক্ষ্ণ ক্রন্দন! তারপর নানা দিক থেকে তেমনি চিৎকার করে কান্না ধরলে নানা নারী কণ্ঠ! ক্রন্দনের অদ্ভুত ঐকতান!

সুন্দরবাবু ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যক্ষিণী! যক্ষিণী! যক্ষিণী!'

সর্বদাই কৌতুকপ্রিয় যে মানিক, সে-ও এখন সুন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতে ভুলে গেল।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব কান্নার উপদ্রব!

এবং আরম্ভ হল এবার খল খল অট্টহাসির পালা! নানা দিকে নানা স্বরে নানা নারী অট্টাহাসি হাসতে লাগল—হা হা হা হা, হি হি হি হি, হো হো হো হো!

এমন ভয়াবহ এবং বুকের রক্ত জল করা সেই অভাবিত অট্টহাসি যে, কবরের মড়াও যেন চিরনিদ্রা ভুলে কফিনের মধ্যে ছটফট ছটফট করে ওঠে!

দুই কানের উপরে প্রাণপণে হাত চেপে সুন্দরবাবু ধুপ করে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ রক্তহীন।

—'বিমলবাবু?'

—'কী জয়ন্তবাবু?'

—'এসব কী?'

—'ভগবান জানেন।'

—'সত্যিই কি এটা ভূতুড়ে দ্বীপ?'

—'ভূত মানি না।'

—'তাহলে কারা কাঁদলে? কারা হাসছে?'

—'আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে পারি।'

—'কিন্তু ও-প্রশ্নের উত্তর তো আমার কাছে নেই।'

—'ও হাসি-কান্নার অর্থ বুঝতে না-পারলেও একটা বিষয় বেশ বুঝতে পারছি।'

—'কী?'

—'যারা হাসছে তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই।'

—'ঠিক। এতক্ষণ এটা খেয়ালে আনিনি!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পলায়নের চেষ্টা করলেন।

খপ করে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেলে জয়ন্ত বললে, 'কোথা যান?'

—'যক্ষিণী! যক্ষিণী! আমি এখনই এই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাব! ঝাঁপ খাব—আমি ঝুপ করে সমুদ্রে ঝাঁপ খাব!'

—'থামুন মশাই, পাগলামি করবেন না। এখান থেকে চলে গেলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য।'

—'মৃত্যু যে অনিবার্য সেটা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু আমি যক্ষিণীদের খপ্পরে পড়তে রাজি নই।'

বিমল বললে, 'যক্ষিণীরা নিকুচি করেছে! জয়ন্তবাবু, চলুন, আমরা ওই ঝোপটার ভিতরে গিয়ে বসি। পিছনে থেকে আমাদের পৃষ্ঠরক্ষা করবে ওই বাঁশঝাড়। কুমার, 'কেস' থেকে বার করো 'মেশিনগান'টা। যথাসময়ে ওটাকে চালনা করবার ভার রইল তোমারই উপরে। বাঘা, তুই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কান খাড়া করে কী শুনছিস? তুইও কি সুন্দরবাবুর মতো ভয় পেয়েছিস? না, না, ভয় নয়—বোধ হয় তুই অবাক হয়ে গেছিস—না? হ্যাঁ, অবাক-হবার কথাই তো! আয়, তুই আমার পাশে এসে বোস।'

হঠাৎ থেমে গেল খলখল খিলখিল অট্টহাসির কনসার্ট!

উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে মাঠের উপরে দেখা দিলে একদল লোক। খানিকটা এগিয়ে আসতেই ধবধবে পূর্ণিমায় বোঝা গেল, সংখ্যায় তারা পঁচিশজন। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বন্দুক। দেখলেই আরও বোঝা যায়, তারা চিনেম্যান।

জয়ন্ত বললে, 'ওরা আমাদের দিকেই আসছে।'

বিমল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'আসুক। হতভাগারা জানে না, আমরা কী অস্ত্র দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করব! ওদের আরও কাছে আসতে দিন। তারপর যেই মাঠের মাঝ-বরাবর আসবে, অমনি শুরু হবে আমাদের 'মেশিনগান' আর 'অটোমেটিক রাইফেলে'র অশ্রান্ত রুদ্র সংগীত! এক বেটাকেও পালাতে দেওয়া সম্ভব নয়!'

নিজের নিজের বন্দুক উঁচিয়ে লোকগুলো দ্রুতপদে এগিয়ে আসতে লাগল—তারা বুঝতে পেরেছিল, বিমলরা আশ্রয় নিয়েছে ঝোপের ভিতরে।

বিমল বললে, 'সবাই লক্ষ্য স্থির করো।'

আরও মিনিট দুয়েক কাটল।

বিমল বললে, 'চালাও গুলি!'

পর মুহূর্তে যে কাণ্ড শুরু হল, শত্রুরা তা একেবারেই আশা করতে পারেনি। কুমারের 'মেশিনগান' এবং অন্য সকলের 'অটোমেটিক রাইফেল' ধারাবাহিক তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে! পঁচিশজন লোক আক্রান্ত হল যেন একশোজনের দ্বারা।

শত্রুরা উত্তরে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ করলে বটে, —কিন্তু সে ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র! এদিক থেকে হচ্ছে যেন ঝড়ের সঙ্গে গুলির পর গুলিবৃষ্টি! তার সামনে দাঁড়াবার বা অগ্রসর হবার চেষ্টাও হচ্ছে পাগলামির সামিল! এমন অভাবিত এবং সাংঘাতিক আক্রমণের জন্যে শত্রুরা প্রস্তুত ছিল না। তারা বেগতিক দেখে মিনিটখানেকের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে করলে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যের মতো পলায়নের চেষ্টা।

কিন্তু পলায়নও নিরাপদ নয়। খোলা মাঠ, গা ঢাকা দেওয়া যায় এমন কোনও গাছ বা ঝোপঝাপের

আড়াল নেই। পালাতে পালাতেও তাদের অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে এদিকে ওদিকে লুটিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত 'মেশিনগান'কে ফাঁকি দিতে পারলে মাত্র জন তিন-চার লোক।

যাকে দলের সর্দার বলে মনে হয়েছিল, বিমল প্রথমেই তাকে পেড়ে ফেলেছিল অব্যর্থ লক্ষ্যে।

সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলে, লোকটা তখনও মরেনি বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর বাঁচবেও না।

লোকটাকে বুড়ো বলা চলে, কিন্তু তার মাথার চুল পাকলেও, দেহ যুবকের মতন জোয়ান।

অতি কষ্টে কোনওরকমে দুই হাতে ভর দিয়ে বসে, অল্প একটু হেসে লোকটা ইংরেজিতে বললে, 'বাবু, তোমারই জিত!'

—'কে তুমি?

—'বলছি, বলছি। নাম আমার স্যামসন। মরবার সময় কিছু লুকোব না। কিন্তু আগে একটু জল দাও—একটু জল!'

জলপান করে লোকটা যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই

'সে বংশানুক্রমে বোম্বেটে। তার পূর্বপুরুষরাও চিন সাগরে জলদস্যুতার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা বহুকাল থেকেই গোপনে সারাঙ্গানি দ্বীপে বাস করে আসছে। এই দ্বীপ সম্বন্ধে এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের কুসংস্কার আছে বলে এখানে কেউ ভরসা করে আসতে চাইত না। তারাও আত্মগোপন করবার এই সুযোগ ত্যাগ করেনি। বরং কুসংস্কার যাতে আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, তারা বরাবরই সেই চেষ্টা করেছে। তাদের দলভুক্ত জনকয় চিনা স্ত্রীলোক রাত্রে দ্বীপে বসে গান গাইত বা হাসত বা কাঁদত। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুঃসাহসী লোকরা দ্বীপে এসে উঠেছে, কিন্তু কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়নি। লোকগুলো যে দ্বীপে আসে গুপ্তধনের লোভে, একথা তারাও জানে। কিন্তু এখানে গুপ্তধন আছে, এটা তারা বিশ্বাস করে না। কারণ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এখানে কোনও গুপ্তধনই পাওয়া যায়নি।'

খানিকক্ষণ পরেই স্যামসনের মৃত্যু হল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! তাহলে আমাদের পেটের পিলে চমকেছে নিতান্তই অকারণে? পেতনিদের হাসি-কান্না, যক্ষিণীদের গান, ভূতুড়ে দ্বীপ—সবই ধাপ্পাবাজি? আমার বিশ্বাস, সারাঙ্গানির গুপ্তধনও হচ্ছে ওইরকম আর-একটা বাজে রূপকথা!'

বিমল বললে, 'দেখা যাক আপনার বিশ্বাস অভ্রান্ত কি না!'

দশ

গুপ্তধনের গুপ্তকথা

উপরে মেঘময় অচঞ্চল নীলাম্বর, নীচে দ্বীপময় নৃত্যচপল নীল সাগর, এই নয়নমোহন অনন্ত নীলিমার স্থির ও অস্থির ছন্দের মধ্যে জেগে উঠেছে প্রথম প্রভাতের প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

অন্ধ রাত্রিকে বিদায় করে আসছে দিবসদেবতা জ্যোতির্ময় সূর্য, প্রশস্তি-গীতি গেয়ে তাঁকে সানন্দে অভ্যর্থনা করলে তরুশ্যামল দ্বীপে দ্বীপে লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গরা।

আলোর পরে কালো এবং কালোর পরে আলো, এদেরই বিচিত্র দোলায় রাত্রি আর দিবাকে দুলিয়ে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে একই কর্তব্য পালন করে আসছে আমাদের এই বসুন্ধরা।

বিপৎসংকুল অরণ্যের অন্তঃপুরে যারা অসহায় ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়, দীপ্তিময়ী রঙিন উষার সূচনা তাদের চোখকে যে কতখানি নন্দিত করে তোলে, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী একখানা কেতাবে পড়েছিলুম, বনবাসী আদিম মানুষের সর্বপ্রথম দেবতা ছিলেন নাকি সূর্যদেব। আমারও আজ সূর্যকে দেবতা বলে মেনে উপাসনা করবার ইচ্ছা হচ্ছে। আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগেই আমি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

বিমল বললে, 'ওই সময়ের মধ্যে যদি গুপ্তধনের সন্ধান না মেলে?'

—'তাহলেও আমি পিঠটান দেব। আবার এখানে রাত্রিবাস? অসম্ভব!'

—'বেশ, তাহলে সময় থাকতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসুন।'

সকলে আবার সেই পঞ্চ-নারিকেলকুঞ্জ এবং বাঁশঝাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেঁড়া ম্যাপের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করে বিমল বললে, 'পাবলো ম্যাপের গুপ্তকথা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আমার মতে, ম্যাপের এই এক এক সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এক এক গজ বা ফুট! আচ্ছা, আগে গজের হিসাবেই অগ্রসর হওয়া যাক। সফল না হলে পরে ফুটের হিসাব গ্রহণ করলেই চলবে। প্রথমে আছে,—উত্তরে ১ থেকে বিশ পর্যন্ত। কুমার, 'কম্পাস'টা আমাকে দাও। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ঠিক উত্তর দিক। এখন আমাদের বিশ গজ অগ্রসর হতে হবে।'

সকলে হিসাব করে মেপে পা ফেলে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

বিমল বললে, 'এবারে পূর্ব দিকে ঠিক দুইশো গজ যাওয়া চাই। এই পূর্ব দিক। আসুন।'

চলতে চলতে কুমার বললে, 'কিন্তু আমাদের পথের ঠিক উপরেই যে গাছপালা আর ঝোপঝাপ রয়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস, ম্যাপে সংকেতগুলো লেখবার পরে ওই গাছ আর ঝোপগুলো জন্মেছে।'

বিমল বললে, 'ঠিক তাই। কিন্তু বাধাগুলো এড়িয়েও আমরা চুলচেরা হিসাব ঠিক রাখতে পারব।'

সকলে দুইশো গজ পার হল।

বিমল বললে, 'এইবারে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত পদচালনা করুন।'

পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত এগুবার পর সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে, সামনেই যে পাহাড়! এগুতে গেলেই মাথা যাবে ঠুকে! এইবার কী হবে? ম্যাপ কী বলে?'

বিমল বললে, 'ম্যাপ বলে, আটান্ন গজ পর্যন্ত উপর দিকে উঠতে হবে। এই তো সামনেই পাহাড়ে ওঠবার পথ। উঠুন।'

সকলে হিসাব করে পাহাড়ের উপরে উঠে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

বিমল বললে, 'হুঁ, পাহাড়ে-পথটা আরও উপরে উঠে গিয়েছে, কিন্তু ম্যাপ বলছে আমাদের নীচের দিকে পঁইত্রিশ গজ নেমে যেতে হবে। এই তো, একটু বাঁ পাশ দিয়েই একটা খুব সরু পথ নেমে গিয়েছে উপত্যকার দিকে। আমাদের হিসাব ভুল হয়নি—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হুম হুম! জয় মা-কালী, শেষ পর্যন্ত মুখ রেখো মা!'

তেত্রিশ গজ পর্যন্ত নেমে পাওয়া গেল একটা কাঁটাঝোপ, তার ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই।

বিমল বললে, 'এ ঝোপটাও নিশ্চয় প্রাচীন নয়। কুমার, নিয়ে এসো অস্ত্রশস্ত্র। সকলে মিলে ঝোপটাকে চটপট কেটে ফেলি এসো!'

ঝোপটাকে বিলুপ্ত করতে বেশিক্ষণ লাগল না। বাকি দুই গজ এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'এ কী হল? এখানে পাহাড়ের নিরেট পাথর ছাড়া তো আর কিছুই নেই!'

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে বললেন, 'হায় মা-কালী? এ কী করলে মা? পাহাড়ের উপরে তুলে একেবারে পাতালে বসিয়ে দিলে?'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, সব তো মিলল, কিন্তু শেষ হিসাব মিলছে না কেন?'

—'আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কুমার বললে, 'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী?'

—'হিসাবে বোধ হয় ভুল হয়নি। কিন্তু মনে রেখো, স্পেনীয় জলদস্যুরা এ অঞ্চলে অত্যাচার করত তিন-চার শতাব্দী আগে। সে কত কালের কথা! কত যুগের কত ধুলো-মাটি-কাঁকর পুরু হয়ে জমে আছে এখানে, আমরা তা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। শত শত বর্ষার জলে ভিজে তারপর তিন-চার শতাব্দীর রোদে পুড়ে সেই ধুলো-মাটি-কাঁকর আজ হয়ে উঠেছে পাথরের মতন কঠিন। তার তলায় এখানকার সব রহস্য হয়তো একেবারেই চাপা পড়ে গিয়েছে!'

বিমল একটু ভেবে বললে, 'কুমার, তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হচ্ছে। উত্তম! সবকিছুর জন্যেই আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি। নিয়ে এসো 'ডিনামাইটের স্টিক'। জয়ন্তবাবু, আপনারা খানিক তফাতে নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে দাঁড়ান। আমরা এখনই আপনাদের সঙ্গে যোগদান করব।'

জয়ন্ত প্রভৃতি সরে গেল। কুমার ডিনামাইট এগিয়ে দিলে। যেখানে একটু আগে ঝোপটা ছিল সেইখানে ডিনামাইট রেখে বিমল তার পলিতায় করলে অগ্নিসংযোগ। তারপর তারাও দৌড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু দুই চোখ বুজে মাকালীর উদ্দেশে জোড়হাতে প্রণাম করে বললেন, 'ও-মাকালী, আর ভোগা দিয়ো না মা, ভক্তদের চরণে ঠেলো না!'

ফাটল ডিনামাইট, ভীষণ শব্দের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠল পাহাড়টা। যেন আকাশ উঠল শিউরে, বাতাস হয়ে গেল স্তম্ভিত!

আশা-নিরাশার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সকলে আবার ছুটে গেল সেইখানে।

সর্বাগ্রে বিমল। বিপুল আনন্দে চিৎকার করে বললে, 'কুমার হে! ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে! একেই বলে ক্ষুরধার বুদ্ধি। বোড়ের চালে কিস্তিমাত! ধন্য!'

ডিনামাইটের প্রতাপে যেখানে ঝোপ ছিল সেখানে পাহাড়ের খানিকটা অংশ ভেঙে উড়ে গিয়েছে এবং বেরিয়ে পড়েছে একটা অন্ধকার গুহার মুখ!

নিজের মস্ত মোটা দেহকে যথাসম্ভব লীলায়িত করে, দুই বাহু কোমরে রেখে সুন্দরবাবু অদ্ভুত এক 'ওরিয়েন্টাল ডান্স' নাচতে নাচতে বার বার বলতে লাগলেন, 'হুম, হুম, হুম, হুম।'

গুহার মুখ থেকে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে সংকীর্ণ একসার সিঁড়ি।

বিমল বললে, 'গুহার ভিতরে নিশ্চয়ই বাস করছে অন্তত তিন শতাব্দীর পুরাতন নিবিড় অন্ধকার। আমাদের এখন গোটা-দুই পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালতে হবে।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে গিয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, মনে আছে, পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজে এমনি এক গুহায় ঢুকে আমরা কী ভয়ানক বিপদে পড়েছিলুম?'

—'মনে আছে বই কী!'

—'এখানেও যদি সেইরকম কোনও বিপদ-আপদ থাকে?'

—'আশা করি এখানে সেরকম কিছুই নেই।'

—'হুম! নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না নাকি?'

—'তাহলে আপনি এইখানে বসেই বায়ুসেবন করুন, আমরা গুহার ভিতরে নেমে যাই।'

—'দ্যুৎ, তা কি বলছি? আমিও গুহার ভেতরে যাব, তবে তোমাদের আগে আগে নয়, সকলকার পিছনে।'

—'অর্থাৎ বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সর্বাগ্রে দৌড় মারতে পারবেন আপনি?'

—'ঠিক তাই হে, ঠিক তাই! সত্যি কথা স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই—হলুমই বা পুলিশের লোক। জানোই তো প্রবাদ বিধান দিয়েছে, 'চাচা আপনা বাঁচা'!'

বিমল ও কুমার পেট্রলের সমুজ্জ্বল লণ্ঠন নিয়ে গুহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচের দিকে। তাদের আগে আগে, বাঘা এবং তাদের পরে যথাক্রমে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু।

সিঁড়ি শেষ হল। সামনেই আসল গুহা। আকার তার মাঝারি। কয় শতাব্দী পরে হঠাৎ বিদ্যুতের মতন তীব্র আলোকের আঘাতে অতীতের নীরন্ধ্র অন্ধকার যেন আহত হয়ে মৌন আর্তনাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় কে জানে!

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এক ধারণাতীত বীভৎস দৃশ্য।

নরকঙ্কাল, নরকঙ্কাল, নরকঙ্কাল! গুহার চারিদিকেই নরকঙ্কাল! শুভ্রতা সুন্দর। কিন্তু কঙ্কালের শুভ্রতা যে এত বীভৎস হতে পারে সেটা তারা আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

গুহার পাথুরে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে রাশিকৃত কঙ্কাল। কেউ চিত হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ পাশ ফিরে, কেউ বা গুটিসুটি মেরে জড়সড় হয়ে। এবং কোথাও-বা একটা কঙ্কালের উপরে লম্বমান হয়ে আছে আর-একটা কঙ্কাল। কোনও কোনও কঙ্কাল পা ছড়িয়ে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তাদের মুণ্ডগুলো খসে পড়ে আছে গুহাতলে।

মানিক অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, এই সেই যক্ষিণীরা। আহা, অভাগীর দল! সারাঙ্গানি এদের এখানে ফেলে রেখে গুহামুখ বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আর এরা এই অন্ধকারে অনাহারে অসহায় ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিলে তিলে ছটফট করতে করতে আত্মসমর্পণ করেছিল দারুণ যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কবলে। এতদিন বদ্ধ গুহা থেকে বেরুতে না পেরে তাদের অন্তিম নিশ্বাস এখনও হয়তো বন্দি হয়ে আছে এইখানে। আজ জীবন্ত আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলন হল তাদের অন্তিম নিশ্বাসের! ওঃ, কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে যাতনাভরা কণ্ঠে বললেন, 'মানিক, আর বোলো না—আর বোলো না—আমি আর সহ্য করতে পারব না—উঃ!'

গুহার ভিতরে একধারে ছিল দশটা বড়ো বড়ো সেকেলে সিন্দুক।

বিমল একে একে গোটা-চারেক সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললে।

প্রত্যেকটাই পরিপূর্ণ। কোনওটায় রয়েছে নানাদেশি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, কোনওটায় রয়েছে রকম-রকম মূল্যবান রত্ন, কোনওটায় রয়েছে খাঁটি সোনার বাসন-কোশন এবং কোনওটাতে বা রৌপ্যনির্মিত অনেক রকম জিনিস!

বিমল প্রায়-বদ্ধ-স্বরে বললে, 'কুমার, আর কোনও সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই! যা দেখছি, এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে দেখবার কল্পনাও কোনওদিন করিনি!'

জয়ন্ত বেদনাবিদীর্ণ কণ্ঠে বললে, 'এখানকার সব ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাখানো রয়েছে অসংখ্য হতভাগ্যের অশ্রুধারা! এ ঐশ্বর্য বিষাক্ত! আর-কিছু দেখবার ইচ্ছা আমার নেই।'

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হুম! মনে হচ্ছে আমি এখনই পাগল হয়ে যাব—একেবারেই পাগল হয়ে যাব! ওঃ!'

মানিক শিউরোতে শিউরোতে বললে, 'গুপ্তধন এমন ভয়ঙ্কর? চলুন, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

দুই চক্ষু মুদে কুমার বললে, 'ঠিক! বাইরে আছে অম্লান সূর্যালোক—পবিত্র, স্বাস্থ্যকর! শীঘ্র চলুন, এই ঐশ্বর্যময় নরকের মধ্যে বন্ধ হয়ে আসছে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস!'

অসম্ভবের দেশে

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অদ্ভুত জন্তু

সকালবেলায় উঠানের ধারে বসে কুমার তার বন্দুকটা সাফ করছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, হাসিমুখে বিমল আসছে।

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'এ কী, বিমল যে! তুমি কবে ফিরলে হে?'

—'আজকেই।'

—'তোমার তো এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা ছিল না!'

—'ছিল না। কিন্তু ফিরতে হল। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।'

কুমার অধিকতর বিস্ময়ে বললে, 'আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে! ব্যাপার কী?'

—'গুরুতর। আবার এক ভীষণ নাটকের সূচনা!'

কুমার উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাহলে এ নাটকে তুমি কি আমাকেও অভিনয় করবার জন্যে ডাকতে এসেছ?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'সাধু, সাধু! আমি প্রস্তুত। যাত্রা শুরু হবে কবে!'

—'কালই।'

—'কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে কি?'

—'তা বলব বই কি! শোনো। ...তুমি জানো, সুন্দরবনে আমি শিকার করতে গিয়েছিলুম। যে জায়গাটায় ছিলুম তার নাম হচ্ছে মোহনপুর। কিন্তু সেখানে গিয়ে শিকারের বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারিনি। একটিমাত্র বাঘ পেয়েছিলুম কিন্তু সে-ও আমার বুলেট হজম করে হয়তো খোশমেজাজে বহাল তবিয়তেই তার বাসায় চলে গিয়েছে।

'স্থলচরেরা আমাকে বয়কট করছে দেখে শেষটা জলচরের দিকে নজর দিলুম। আমার সুনজরে পড়ে একটা কুমির আর একটা ঘড়িয়াল তাদের পশু-জীবন থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুক্তি লাভ করলে। তারপর তারাও আর আমার সঙ্গে দেখা করিতে রাজি হল না। মনটা রীতিমতো তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলুম, কাজ নেই বনেজঙ্গলে ঘুরে, ঘরের ছেলে আবার ঘরেই ফেরা যাক।

'ঠিক এমনি সময়ে এক অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। মোহনপুর থেকে মাইল পনেরো তফাতে আছে রাইপুর গ্রাম। রাইপুরের একজন লোক এসে হঠাৎ একদিন খবর দিলে, সেখানে জঙ্গলে নাকি কী একটা আশ্চর্য জীব এসে হাজির হয়েছে। সে জীবটাকে কেউ বলে বাঘ, কেউ বলে গন্ডার, কেউ বা বলে অন্য কিছু। যদিও তাকে ভালো করে দেখবার অবসর কেউ পায়নি, তবু এক বিষয়ে সকলেই একমত। আকারে সে নাকি প্রকাণ্ড—যে-কোনও মোষের চেয়েও বড়ো। তার ভয়ে রাইপুরের লোকেরা রাত্রে ঘুম ভুলে গিয়েছে।'

কুমার শুধাল, 'কেন? সে জীবটা মানুষ-টানুষ বধ করেছে নাকি?'

—'না। সে এখনও মানুষ-টানুষ বধ করতে পারেনি বটে, তবে রাইপুর থেকে প্রতিরাত্রেই অনেক হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুর অদৃশ্য হয়েছে। এর মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে সেই অজানা জীবটার কবলে পড়ে রাইপুরের অনেক বেড়াল ভবলীলা সাঙ্গ করেছে বটে, কিন্তু বেড়ালগুলোর দেহ সে ভক্ষণ করেনি।'

কুমার বললে, 'কেন, এর মধ্যে তুমি উল্লেখযোগ্য কী দেখলে?'

বিমল বললে, 'উল্লেখযোগ্য নয়? হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুরগুলোর দেহ পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রত্যেক বেড়ালেরই মৃতদেহ পাওয়া যায় কেন? সেই অজানা জীবটা আর সব পশুর মাংস খায় কিন্তু বেড়ালের মাংস খায় না কেন? আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার শোনো। দু-তিন জন মানুষও তার সামনে পড়েছিল। তারা তার গর্জন শুনেই পালিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের আক্রমণ করবার জন্যে সে পিছনে পিছনে তেড়ে আসেনি।'

কুমার কৌতূহলভরে বললে, 'তারপর?'

বিমল বললে, 'তারপর আর কী, এমন একটা কথা শুনে আর কি স্থির হয়ে বসে থাকা যায়! আমিও মোটঘাট বেঁধে নিয়ে রাইপুরে যাত্রা করলুম।'

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সে জীবটাকে দেখে এসেছ?'

'হ্যাঁ। বনেজঙ্গলে দুই রাত্রি বাস করবার পর তৃতীয় রাত্রে তার সাক্ষাৎ পেলুম। আমি একটা গাছের উপরে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে বসে ঢুলছিলুম। রাত তখন বারোটা হবে। আকাশে খুব অল্প চাঁদের আলো ছিল, অন্ধকারে ভালো নজর চলে না। চারিদিকের নীরবতার মাঝখানে একটা গাছের তলায় হঠাৎ শুকনো পাতার মড়-মড় শব্দ কানে এল। শব্দটা হয়েই থেমে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের ভিতরে ভাঁটার মতন বড়ো বড়ো দুটো আগুন-চোখ জেগে উঠেছে। সে-চোখদুটো আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখদুটো কোন জানোয়ারের আমি বোঝবার চেষ্টা করলুম না, তারপরেই বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ। সে-আর্তনাদ বাঘ-ভাল্লুকের ডাকের মতন নয়, আমার মনে হল যেন এক দানব-বেড়াল আহত হয়ে ভীষণ চিৎকার করছে।

'খানিক পরে আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ ধীরে ধীরে থেমে এল! কিন্তু আমি সেই রাতের অন্ধকারে গাছের উপর থেকে আর নামলুম না। গাছের ডালেই হেলান দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলুম। সকালবেলায় চারিদিকে লোকজনের সাড়া পেয়ে বুঝলুম, রাত্রে আমার বন্দুকের শব্দ আর এই অজানা জন্তুটার চিৎকার শুনেই এত ভোরে সবাই এখানে ছুটে এসেছে। আস্তে আস্তে নীচে নেমে পাশের ঝোপের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলুম, একটা আশ্চর্য ও প্রকাণ্ড জীব সেখানে মরে পড়ে রয়েছে। জন্তুটা যে-কোনও বাঘের চেয়ে বড়ো। তাকে দেখতে বাঘের মতন হলেও সে মোটেই বাঘ নয়। তার গায়ের রং ধবধবে সাদা, কিন্তু মুখটা কালো। আসলে তাকে একটা অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড বেড়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।'

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি বলো কী হে বিমল, বাঘের চেয়েও বড়ো বেড়াল? এও কি সম্ভব!'

বিমল বললে, 'কী যে সম্ভব আর কী অসম্ভব তা আমি জানি না। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু এখনও সব কথা শেষ হয়নি।'

কুমার বললে, 'এর উপরেও তোমার কিছু বলবার আছে নাকি? আচ্ছা শুনি!'

বিমল বললে, 'বেড়ালটার দেহ পরীক্ষা করতে করতে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। তার গলায় ছিল একটা ইস্পাতের বগলস আর একটা ছেঁড়া শিকল। দেখেই বোঝা গেল, এ বেড়ালটাকে কেউ বেঁধে রেখে দিয়েছিল। কোনওগতিকে শিকল ছিঁড়ে এ পালিয়ে এসেছে। ...কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন একটা বিচিত্র বেড়াল এ অঞ্চলে যদি কারুর বাড়িতে বাঁধা থাকত তাহলে সকলে তার কথা নিশ্চয়ই জানতে পারত। কিন্তু কেউ এই বেড়াল ও তার মালিক সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে পারলে না। এই বেড়ালের কথা লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে তাকে দেখতে লাগল। এমন একটা অসম্ভব জীব দেখে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল!'

কুমার বললে, 'এইখানেই তাহলে তোমার কথা ফুরুল?'

বিমল বললে, 'মোটেই নয়। এইখানেই যদি আমার কথা ফুরিয়ে যেত, তাহলে তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসতুম না।'

কুমার উৎসাহিত ভাবে বললে, 'বটে, বটে, তাই নাকি?'

বিমল বললে, 'বিকেলবেলায় দূর গ্রাম থেকে রাইপুরে একটা লোক এল, ওই বেড়ালটাকে দেখবার জন্যে। এমন ভাবে সে বেড়ালটাকে দেখতে লাগল যাতে করে আমার মনে সন্দেহ হল যে এই লোকটার এ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে। তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বললে, সে হচ্ছে মাঝি, নৌকো চালানোই তার জীবিকা। আমি জানতে চাইলুম, এই বেড়ালটাকে সে আগে কখনও দেখেছে কি না? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও কিছু ইতস্তত করে সে বললে, 'বাবু, এই রাক্ষুসে বেড়ালটাকে আমি আগে কখনও দেখিনি বটে, কিন্তু বোধহয় এর ডাক আমি শুনেছি!' তার কথা শুনে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা জানতে চাইলুম। সে যা বললে তা হচ্ছে এই—

'দিন-পনেরো আগে একটি বুড়ো ভদ্রলোক আমার নৌকো ভাড়া করতে আসেন। সে-বাবুকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তাঁর মুখেই শুনলাম, তিনি অন্য একখানা নৌকো করে এখানে এসেছেন, সেই নৌকোর মাঝির সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে সে তাঁকে আমাদের গ্রামে নামিয়ে দিয়েছিল।

'তিনি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায় যেতে চান। যে তাঁকে নিয়ে যাবে তাকে তিনি রীতিমতো বকশিশ দিয়ে খুশি করবেন, এমন কথাও আমাকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোটও আগাম ভাড়া বলে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আগাম এতগুলো টাকা পেয়ে আমি তখনই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হলুম। তাঁর সঙ্গে ছিল মস্ত বড়ো একটা সিন্দুক, এত বড়ো সিন্দুক আমি আর কখনও দেখিনি। আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সেই সিন্দুকটাকে নৌকোর উপরে নিয়ে গিয়ে তুললুম। তোলবার সময় শুনতে পেলুম, সিন্দুকের ভিতর থেকে কী একটা জানোয়ার বিকট গর্জন করছে।

'আমরা ভয় পাচ্ছি দেখে বাবুটি বললেন, 'তোমাদের কোনও ভয় নেই, ওর ভিতরে

একটা খুব বড়ো জাতের বনবেড়াল আছে।' সে যে কোন জাতের বনবেড়াল তা বলতে পারি না, বনবেড়াল যতই বড়ো হোক তার চিৎকার এমন ভয়ানক হয়, আমি তা জানতুম না। আমি বললুম, 'বাবু, এ যদি সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কোনও বিপদ হবে না তো?' তিনি হেসে বললেন, 'না, সিন্দুকের ভিতরেও বেড়ালটা শিকলে বাঁধা আছে।'

'কিন্তু নৌকো নিয়ে আমাদের বেশিদূর যেতে হল না। সমুদ্রের কাছে গিয়ে আমরা হঠাৎ এক ঝড়ের মুখে পড়লুম। ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে নৌকো বাঁচানোই দায়। দাঁড়িরা সব বেঁকে বসল, বললে—'ওই ভারী সিন্দুকটা নৌকো থেকে নামিয়ে না দিলে কারুকেই আজ প্রাণে বাঁচতে হবে না।'

'কিন্তু তাদের কথায় সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি প্রথমটায় কিছুতেই সায় দিতে চাইলেন না। শেষটা দাঁড়িরা যখন নিতান্তই রুখে উঠল, তখন তিনি নাচার হয়ে বললেন, 'তোমাদের যা-খুশি করো আমি আর কিছু জানি না।'

'সকলে মিলে সেই বিষম ভারী সিন্দুকটা তখনই জলে ফেলে দেবার জোগাড় করলে। কেবল আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওর ভিতরে যে বনবেড়ালটা আছে, তার কী হবে?' দাঁড়িরা বললে, 'বনবেড়ালটাকে বাইরে বার করলে আমাদের কামড়ে দেবে, তার চেয়ে ওর জলে ডুবে মরাই ভালো!'

'ভদ্রলোকও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'না, না, ওকে বাইরে বার করতে হবে না, সিন্দুক সুদ্ধই ওকে জলে ফেলে দাও!'

'সিন্দুকটাকে আমরা তখন জলের ভিতর ফেলে দিলুম। তার একটু পরেই জলের ভিতর থেকে কী একটা মস্ত জানোয়ার ভেসে উঠল। সেটা যে কী জানোয়ার, দূর থেকে আমরা ভালো করে বুঝতে পারলুম না—বোঝবার সময়ও ছিল না, কারণ আমরা সবাই তখন নৌকো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছি।

'ঝড়ের মুখ থেকে অনেক কষ্টে নৌকোকে বাঁচিয়ে, সন্ধ্যার সময় আমরা সমুদ্রের মুখে মাতলা নদীর মোহানায় গিয়ে পড়লুম। দূরে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে সেইটে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে তোমরা ওইখানে নামিয়ে দাও।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'এই অসময়ে ওই দ্বীপে নেমে আপনি কোথায় যাবেন?'

'ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বললেন, 'সে কথায় তোমাদের দরকার নেই, যা বলছি শোনো।' আমরা আর কিছু না বলে নৌকো বেয়ে দ্বীপের কাছে গিয়ে পড়লুম। তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে—দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর নজর চলে না।

'এ দ্বীপে আমরা কখনও আসিনি, এখানে যে কোনও মানুষ থাকতে পারে তাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোকটি অনায়াসেই নৌকো থেকে নেমে সেই অন্ধকারের ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

'তখন ভাটা আরম্ভ হয়েছে। নৌকো নিয়ে আর ফেরবার চেষ্টা না করে সে রাতটা আমরা সেইখানেই থাকব স্থির করলুম। নৌকো বাঁধবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে সেই ভদ্রলোকের গলায় শুনলুম, 'তোমরা এখানে নৌকো বেঁধো না, শিগগির পালিয়ে যাও, নইলে বিপদে পড়বে!'

'আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'এখানে থাকলে বিপদ হবে কেন বাবু?'

'ভদ্রলোক খুব কড়া গলায় বললেন, 'আমার কথা যদি না শোনো, তাহলে তোমরা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না!'

'তবুও আমি বললুম, 'বাবু, সারাদিন খাটুনির পর এই ভাটা ঠেলে আমরা নৌকো বেয়ে যাই কী করে? এখানে কীসের ভয়, বলুন না আপনি! বুনো জন্তুর, না ডাকাতের?'

'ভদ্রলোক বললেন, 'জন্তুও নয়, ডাকাতও নয়; এ দ্বীপে যারা আছে তাদের দেখলেই ভয়ে তোমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে! শিগগির সরে পড়ো!'

'আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে এমন ভয়ানক জায়গায় আপনি নামলেন কেন?'

'ভদ্রলোক 'হা হা হা হা' করে হেসেই চুপ করলেন, তারপর তাঁর আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদেরও মনে কেমন একটা ভয় জেগে উঠল, সেখান থেকে তখুনি নৌকো চালিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।

'বাবু, আমার বিশ্বাস, আপনি এই যে রাক্ষুসে বেড়ালটাকে মেরেছেন, সেই সিন্দুকের ভিতর এইটেই ছিল।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নতুনত্ব কী

বিমলের গল্প শেষ হলে পর কুমার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'সেই বুড়ো লোকটি যে কে, সে কথা তুমি জানতে পেরেছ কি?'

—'তাই জানবার জন্যেই তো আমার এত আগ্রহ! তবে মাঝির মুখে শুনেছি, লোকটি নাকি বাঙালি, আর বুড়ো হলেও তিনি খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান, আর তাঁর মেজাজ বড়ো কড়া।'

—'কিন্তু বিমল, সে দ্বীপে এমন কী থাকতে পারে? বৃদ্ধ কি মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছেন? দ্বীপে ভয়ের কিছু থাকলে তিনি একলা সেখানে নামবেন কেন!'

—'কুমার, তুমি আমায় যে প্রশ্নগুলি করলে, আমারও মনে ঠিক ওইসব প্রশ্নই জাগছে। ওইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্যেই আমরা সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করব।'

'কিন্তু আগে থাকতে তবু কিছু ভেবে দেখা দরকার তো। বৃদ্ধ বলেছেন, সে দ্বীপে যারা আছে তারা জন্তু নয়, ডাকাতও নয়। তবে তারা কে? মানুষ তাদের দেখলে ভয় পেতে পারে। তবে কি তারা ভূত? তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? ভূত-প্রেত তো কবির কল্পনা, খোকা-খুকিদের ভয় দেখিয়ে শান্ত করবার উপায়।'

—'না কুমার, ভূত-টুত আমিও মানি না, আর বৃদ্ধ যে ভূতের ভয় দেখিয়েছিলেন তাও আমার মনে হয় না।'

—'তবে?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশ্য সেই দ্বীপে যদি এইরকম দানব-বেড়ালের আত্মীয়রা থাকে তাহলে সেটা বিশেষ ভয়ের কথা হবে বটে। কিন্তু বৃদ্ধ জন্তুর ভয় দেখাননি।'

কুমার কিছুক্ষণ ভেবে বললে, 'দ্যাখো, আমার বোধহয় সেই বৃদ্ধ মিথ্যা কথাই বলেছেন। দ্বীপের ভিতরে হয়তো কোনও অজানা রহস্য আছে। অন্য কেউ সে কথা টের পায়, হয়তো বৃদ্ধ তা পছন্দ করেন না। হয়তো সেইজন্যেই তিনি দাঁড়ি-মাঝিদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন?'

বিমল বললে, 'কিন্তু সে রহস্যটা কী? যে-দ্বীপে এমন দানব-বেড়াল পাওয়া যায় সে-দ্বীপ যে রহস্যময় তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে এমন অসম্ভব বেড়ালের চেয়েও অসম্ভব আরও কোনও রহস্য আছে কি না সেইটেই আমি জানতে চাই।'

কুমার বললে, 'মঙ্গল গ্রহে, ময়নামতীর মায়াকাননে, অসম আর আফ্রিকার বনেজঙ্গলে, সুন্দরবনে, অমাবস্যার রাতে আর হিমালয়ের দানবপুরীতে অনেক অসম্ভব রহস্যই আমরা দেখলুম। তার চেয়েও বেশি অসম্ভব কোনও রহস্য যে আর ত্রিজগতে থাকতে পারে একথা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রেতলোক যদি সম্ভবপর হত তাহলেও বরং নতুন কিছু দেখবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রেত যখন মানি না তখন নতুন কিছু দেখবার আশাও রাখি না।'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'না কুমার, ত্রিজগতে নতুনত্বের অভাব কোনওদিনই হয়নি। ধরো ওই চন্দ্রলোক। ওর আগাগোড়াই তুষারে ঢাকা, ওকে তুষারের এক বিরাট মরুভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ পণ্ডিতেরা বলেন ওর ভিতরও নাকি জীবের অস্তিত্ব আছে। তাঁদের মতে সে-সব জীব মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়, তাদের দেখলে হয়তো আমরা নতুন কোনও জন্তু বলেই মনে করব, যদিও মস্তিষ্কের শক্তিতে হয়তো মানুষেরও চেয়ে তারা উন্নত। হয়তো তারা বাস করে তুষার মরুভূমির পাতালের তলায়, সেখানে গেলে আমাদেরও তারা নতুন কোনও জন্তু বলেই সন্দেহ করবে। তুমি কি বলতে চাও কুমার, সেখানে গেলে তুমি এক নতুন জগৎ দেখবার সুযোগ পাবে না?'

কুমার বললে, 'কিন্তু আপাতত চন্দ্রলোকের কথা তো হচ্ছে না, আমরা থাকব এই পায়ে চলা মাটির পৃথিবীতেই। সুন্দরবনের প্রান্তে, গঙ্গাসাগরের কাছে ছোট্ট এক দ্বীপ, কলকাতা থেকে সে আর কত দূরই বা হবে? সেখানে যে বিশেষ কোনও নতুনত্ব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

বিমল মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দ্যাখো কুমার, একসার পিঁপড়ে খাবার মুখে করে কোথায় যাচ্ছে।'

কুমার বললে, 'ওই যে, চৌকাঠের তলায় ওই গর্তের ভিতরে গিয়ে ওরা ঢুকছে।'

—'হুঁ। এটা তোমার নিজের বাড়ি, এখানকার প্রতি ধূলিকণাটিকেও তুমি চেনো। কিন্তু তোমারই ঘরের দরজার তলায় পিঁপড়েদের যে উপনিবেশ আছে, তার কথা তুমি কিছু বলতে পারো?'

—'তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, তার সন্ধান আবার রাখব কী?'

—'তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, কিন্তু এবার থেকে তাদেরও সন্ধান রাখবার চেষ্টা করো।

মানুষের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক হয়তো ওজনে বেশি হবে না; কিন্তু সন্ধান রাখলে জানতে পারবে, মানুষের সমাজের চেয়ে পিঁপড়ের সমাজ অনেক বিষয়েই উন্নত। পৃথিবীতে কর্তব্যে অবহেলা করে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের ভিতরে এমন একটি পিঁপড়েও তুমি পাবে না, নিজের কর্তব্যে যার মন নেই। যার যা করবার নিজের ইচ্ছাতেই সে অশ্রান্ত ভাবে করে যাচ্ছে। পিঁপড়েদের দেশে অবাধ্য ছেলেমেয়ে একটিও নেই। তাদের যে রানি সে-ও এক মুহূর্ত অলস হয়ে বসে থাকে না, অষ্টপ্রহরই ডিম প্রসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। একদল পিঁপড়ে সর্বদাই করছে রানির সেবা-যত্ন, একদল করছে একমনে ডিম আর বাচ্চাদের পরিচর্যা, আর একটা বৃহৎ দলের কাজ খালি বাইর থেকে রসদ বহন করে আনা। এদের উপনিবেশের ভিতরটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে অতি বড়ো বুদ্ধিমান মানুষও অবাক হয়ে যাবে। তার ভিতরে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে, রসদখানা আছে, ডিম রাখবার আলাদা মহল আছে, এমনকি পিঁপড়েদের উপযোগী সবজি বাগান পর্যন্ত আছে। কুমার, তুমি বোধহয় জানো না যে, পিঁপড়েরাও গাভি পালন করে। অবশ্য সে গাভিকে দেখতে আমাদের গাভির মতো নয়, কিন্তু তারা 'দুগ্ধ'দান করবে বলেই তাদের পালন করা হয়।'

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'বলো কী বিমল, এসব কথা যে আমার কাছে একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে!'

—'অথচ এই পিঁপড়েদের উপনিবেশ তোমার ঠিক পায়ের তলাতেই। পৃথিবীতে তুমি নতুনত্বের অভাব বোধ করছ, কিন্তু নিজের পায়ের তলায় কী আছে তার খবর তুমি রাখো না। কেবল তুমি নাও, অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব হচ্ছে এইরকম। যাদের জানবার আগ্রহ আছে, জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি আছে, দেখবার মতো চোখ আছে, জীবনে তাদের কোনওদিনই নতুনত্বের অভাব হয় না।'

কুমার অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'মাফ করো ভাই বিমল, আমারই ভ্রম হয়েছে। কিন্তু এখন আসল কথাই হোক। নতুনত্ব খুঁজে পাই আর না পাই, তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে আনন্দ আর কিছুই নেই। তাহলে কবে আমরা যাত্রা করব?'

বিমল বললে, 'যে মাঝির কাছ থেকে সেই দ্বীপ আর সেই দ্বীপবাসীর খবর পেয়েছি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই-ই। আমার যে মোটরবোট আছে, তাতেই চড়ে আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করব। রাইপুর থেকে মাঝি তার নৌকো নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। সে প্রথমটা কিছুতেই রাজি হয়নি, টাকার লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে শেষটা তাকে আমি রাজি করাতে পেরেছি। মাঝি তার নৌকো আর লোকজন নিয়ে রাইপুরেই প্রস্তুত হয়ে আছে, তোমার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।'

কুমার বললে, 'আমার আবার অসুবিধে কী? কালকেই আমি যেতে পারি।'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পুনরাবির্ভাব

মাঝির নাম ছিল কাসিম মিয়া। রাইপুরের ঘাটে মোটরবোট ভিড়িয়ে বিমল ও কুমার তার দেখা পেলে।

বিমলকে মোটরবোট ছেড়ে ডাঙায় নামতে দেখে সে-ও তাড়াতাড়ি জাল বোনা রেখে নিজের নৌকো থেকে নেমে এল।

বিমল তাকে দেখে শুধোলে, 'কী মিয়াসায়েব, তোমরা সব তৈরি আছ তো?'

কাসিম সেলাম ঠুকে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, আমরা সবাই তৈরি। আজকে বলেন, আজকে যেতে পারি।'

—'তোমার সঙ্গে ক-জন লোক নিয়েছ?'

—'চারজন দাঁড়ি নিয়েছি হুজুর।'

—'কিন্তু এ-যাত্রা দাঁড় বোধহয় তাদের কারুকেই টানতে হবে না। আমাদের বোটই তোমাদের পানসিকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমরা খাবে-দাবে আর মজা করে ঘুমোবে।'

কাসিম একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'ঘুমোতে কি আর পারব হুজুর? আমার লোকেরা ভারী ভয় পেয়েছে!'

বিমল আশ্চর্য স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ভয় পেয়েছে? কেন?'

কাসিম কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বললে, 'তাদের বিশ্বাস যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না। অছিমুদ্দী মাঝির মুখে তারা শুনেছে, ও দ্বীপে নাকি ভূত প্রেত দৈত্য দানোরা বাস করে। সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে তিন-চার খানা নৌকো নাকি আর ফিরে আসেনি। নৌকোয় যারা ছিল তারা কোথায় গেল, তাও কেউ জানে না। জল ঝড় নেই, অথচ মাঝে মাঝে ওখানে নাকি অনেকবার নৌকোডুবি হয়েছে। পেটের দায়ে নৌকো চালিয়ে খাই, আপনি ডবল ভাড়া আর তার উপরে বকশিশের লোভ দেখালেন বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছি। কিন্তু আগে অছিমুদ্দীর কথা শুনলে আমরা এ কাজে বোধহয় হাত দিতুম না।'

বিমল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি এমন জোয়ান-মদ্দ কাসিম মিয়া, তুমিই শেষটা ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

কাসিম বললে, 'একেবারে ভয় পাইনি বললে মিথ্যে বলা হয় হুজুর! দ্বীপের সেই বুড়োবাবুটিও তো আমাদের ভয় দেখাতে কসুর করেননি। কেন তিনি আমাদের সেখানে রাত কাটাতে মানা করলেন? কেন তিনি বললেন, সেখানে জন্তুর ভয় নয়, ডাকাতের ভয় নয়, অন্য কিছুর ভয় আছে? অন্য কীসের ভয় থাকতে পারে? আমরা ভেবেচিন্তে কোনওই হদিস খুঁজে পাচ্ছি না!'

বিমল বললে, 'অত হদিস খোঁজবার দরকার কী মিয়াসাহেব? একটা কথাই খালি ভেবে দ্যাখো না। সেই বুড়োবাবুটি তো মানুষ, সেখানে যদি অন্য কিছুর ভয় থাকত, তাহলে কি

তিনি নিজে সেই দ্বীপে নামতে সাহস করতেন? অত বাজে ভাবনা ভেব না, সেই দ্বীপে হয়তো এমন কিছু আছে, বুড়োবাবুটি যা অন্য লোককে জানতে দিতে রাজি নন। তাই তিনি তোমাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন!'

কাসিম বললে, 'সেখানে অন্য কিছু কী আর থাকতে পারে?'

—'ধরো হয়তো সেই দ্বীপে গুপ্তধন আছে, আর বুড়োবাবুটি কোনওরকমে তা জানতে পেরেছেন!'

গুপ্তধনের নামেই কাসিমের সারা মুখ সাগ্রহ কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার পরেই সে আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে বললে, 'আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব নয় বটে কিন্তু রাক্ষুসে বেড়ালের মতো দেখতে সেই ভূতুড়ে জানোয়ারটার কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? সেই জানোয়ারটা কোত্থেকে এল? সেই দ্বীপ থেকেই তো?'

বিমল বললে, 'জানোয়ারটা যে দ্বীপ থেকেই এসেছে এমন কথা জোর করে কিছুতেই বলা যায় না। তোমার নৌকোর সিন্দুকের ভিতরে যে সেই জানোয়ারটাই ছিল এটা তো তুমি আর স্বচক্ষে দ্যাখোনি, আন্দাজ করছ মাত্র। তারপর ধরো, জানোয়ারটা না-হয় সেই সিন্দুকের ভিতরেই ছিল। কিন্তু বুড়োবাবুটি তাকে নিয়ে হয়তো সেই দ্বীপ থেকে আসছিলেন না, দ্বীপের দিকেই যাচ্ছিলেন! হয়তো তিনি অন্য কোনও জায়গা থেকে সেই জানোয়ারটাকে ধরে এনেছিলেন। এত বড়ো এই সুন্দরবন, এর ভিতরে কোথায় কত অজানা জানোয়ার আছে, তার খোঁজ কি তোমরা রাখো?'

কাসিম যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। সে বললে, 'আর একটা নতুন খবর আছে হুজুর। সেই বুড়োবাবুটি আবার এখানে এসেছিলেন।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'তাই নাকি? তারপর?'

—'আপনি যেদিন মোহনপুর থেকে চলে যান, ঠিক তার পরের দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললেন, 'কাসিম, তোমাদের এ অঞ্চলের নাকি কী একটা আশ্চর্য জানোয়ার এসে উৎপাত করছে?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ হুজুর, একটা জানোয়ার এসে এখানে উৎপাত করছিল বটে, কিন্তু কলকাতার এক বাবু এসে বন্দুক ছুড়ে তার লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিয়েছেন।' শুনেই রাগে তাঁর সারা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, আর কোনও কথা না বলে হনহন করে তিনি একদিকে চলে গেলেন।'

বিমল ব্যস্ত ভাবে বললে, 'কাসিম, আমরা যে সেই দ্বীপে যাব সে কথা তাঁকে তুমি বলোনি তো?'

কাসিম বললে, 'আজ্ঞে না হুজুর, বলবার সময়ই পাইনি।'

বিমল হাঁপ ছেড়ে বললে, 'সেই বাবুটি এখনও এখানে আছেন নাকি?'

কাসিম বললে, 'বোধহয় নেই। কোথায় যে তিনি গেলেন, তারপর থেকে আমরা কেউ আর তাঁকে দেখতে পাইনি।'

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবুটি কেমন দেখতে বলো দেখি!'

কাসিম বললে, 'বলেছি তো, খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান লোক। তাঁর বয়স ষাট বছরের

কম হবে না, কিন্তু তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় এখনও তাঁর গায়ে অসুরের মতো জোর আছে। তাঁর রং শ্যামলা, মাথায় লম্বা সাদা চুল আর মুখে লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি। নাকে ধোঁয়া রঙের চশমা, সেই চশমার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর চোখদুটো যেন দপ দপ করে জ্বলছে!'

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'কাসিম, আমাদের মোটগুলো বোট থেকে নামিয়ে তোমাদের পানসিতে তুলে নাও। আজ বিকালেই আমরা নৌকো ছাড়ব।'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

জ্যোৎস্নাময় জঙ্গলে

পূর্ণিমা রাত। নির্মেঘ নীল আকাশে তারাদের সভা বসেছে আর তারই ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ভরা জোছনার জোয়ার।

পৃথিবীতেও দুই ধারে যেন পরির হাতে সাজানো নীল বনের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কানায় কানায় ভরা নদীর জোয়ারের জল। সে জলস্রোতকে মনে হচ্ছে রুপালি জোছনার স্রোত।

নির্জনতা যে কত সুন্দর, মায়াময় হতে পারে শহরে বসে কেউ তা অনুভব করতে পারে না।

বনে বনে গাছের ডালে ডালে সবুজ-পাতা-শিশুরা খেলা করছে আলোছায়ার ঝিলমিলি দুলিয়ে দুলিয়ে এবং নদীর বুকে বুকে ঢেউ-শিশুরা খেলা করছে হিরে-ধারার জাল বুনতে বুনতে।

এক-একবার ঠান্ডা বাতাসের উচ্ছ্বাস ভেসে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ-শিশু আর পাতা-শিশুরা খুশির হাতে চারিদিকের নীরবতা অস্ফুট, অপূর্ব শব্দময় করে তুলছে।

কিন্তু এই বনভূমির মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে অনেক ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। চাঁদের আলোর যে একটি নিজস্ব শান্ত সুর আছে, যা এই নির্জন বনভূমিকে মোহনীয় করে তুলেছে, ওইসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তার অনেকখানি সৌন্দর্যই নষ্ট করে দিচ্ছে।

বিমলদের মোটরবোটের যন্ত্রের গর্জন এই নিরালায় কী কর্কশ শোনায়!

সেই গর্জন শুনে মাঝে মাঝে চরের উপর থেকে জীবন্ত ও ভয়াবহ গাছের গুঁড়ির মতো কী কতকগুলো জলের উপর সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারিদিক তোলপাড় করে তোলে।

কাসিম বলে ওঠে, 'হুজুর, কুমির!'

বিমল ও কুমার তা জানে। জলবাসী ওই করাল মৃত্যুর শব্দ তারা আরও অনেকবার শুনেছে।

এক জায়গায় চার-পাঁচটি হরিণ জলপান করছে। কাছেই অরণ্যের অন্তঃপুরে বাঘের ঘন ঘন হুঙ্কার জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভীত মৃগদের জলপান করার শব্দ।

অরণ্যের মধ্যে দিনে যারা ঘুমোয়, সদলবলে জেগে উঠেছে তারা আজ রাত্রে। লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ। জ্যোৎস্নার মুখে কালো অভিশাপের মতো দলে দলে বাদুড় ও কাল-পেচক। কোথাও গাছের ভিতর থেকে ভীরু পাখির দল আর্তনাদ করে উঠল, হয়তো তাদের বাসার ভিতরে এসেছে বিপজ্জনক কোনও অতিথি।

থেকে থেকে অদ্ভুত ভূতুড়ে স্বরে ডেকে উঠছে তক্ষকের দল। কোনও গাছের টং থেকে যেন একদল অশরীরী ও অমানুষ নরশিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল, তারা হচ্ছে বকের ছানা। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক স্বরে ব্যাং চিৎকার করে উঠছে—এ আর কিছু নয়, সর্পের কবলগত হয়ে হতভাগ্যের প্রবল অথচ ব্যর্থ প্রতিবাদ।

এই চন্দ্রকিরণের রাজ্য দিয়ে, এই বনস্পতিদের তপোবন দিয়ে, এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগৎ দিয়ে, জলের বুকে ফেনার আলপনা কাটতে কাটতে তীব্র গতির বেগে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে বিমলদের মোটরবোট।

চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে, চারিদিকের শব্দ শুনতে শুনতে বিমল হঠাৎ বলে উঠল, 'শোনো কুমার, কান পেতে শোনো! মহাকাল এই নির্জন অরণ্যে একলা বসে জীবন-সংগ্রামের অনন্ত ইতিহাস নিজের মনেই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে যাচ্ছেন! কবিরা বনে এসে বিজনতা আর নীরবতার সন্ধান পান। কিন্তু এই মিষ্ট চাঁদের আলোয়, এই অরণ্যের অন্তঃপুরে এসে, তুমি কি মৃত্যুর নিষ্ঠুর রথচক্রের ধ্বনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছ না? এ বন নির্জন বটে, কিন্তু এখানকার অন্ধকারের অন্তরালে বসে কত কোটি কোটি কীটপতঙ্গ আর জীবজন্তু জীবনযুদ্ধের চিরন্তন নিষ্ঠুরতায় অশ্রান্ত আর্তনাদ করছে—কত দুর্বল কত সবলের কবলে পড়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে কত সহস্র জীবের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে! আমরা মানুষ, আমরা হচ্ছি নগরবাসী সামাজিক জীব, প্রতিপদে আমাদেরও আত্মরক্ষা করতে হয় বটে,—কিন্তু সে হচ্ছে অন্য নানান কারণে। জীবনের ভয় যে সেখানে নেই এমন কথা বলি না, কিন্তু এখানকার তুলনায় সেখানকার নীতি হচ্ছে স্বর্গীয় নীতি! সেখানেও বিপদ আছে বটে, কিন্তু সে-বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে আমরা প্রায়ই সাবধান হতে পারি। আর এখানকার নীতি কী? এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মরো, নয় মারো! জীবন আর মৃত্যু নিয়ে এখানে চিরদিনের নির্দয় খেলা চলছে। যে অপরকে মারতে পারবে না, এখানে তাকে অপরের হাতে মরতেই হবে। এ অরণ্য হচ্ছে এক মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র—যে-যুদ্ধে কোনওদিন সন্ধি নেই, শান্তি নেই। চারিদিকে ওই যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি জেগে রয়েছে, ওর ভিতর থেকে আমি খালি এক কঠিন বাণীই শুনতে পাচ্ছি—হয় মরো, নয় মারো! এখানকার আকাশের নীলিমার মধুরিমা, চাঁদের আলোর ঝরনা, সবুজ পাতার গান আর নদীর কলতান যার মনে স্বপ্ন আর কবিত্ব সঞ্চার করবে সে নিরাপদ থাকতে পারবে না এক মুহূর্তও! বুঝেছ কুমার, এখানে এসে আমাদেরও সজাগ হয়ে সর্বদা এই মন্ত্রই জপ করতে হবে—হয় মরো, নয় মারো। কবিরা বনের নিষ্ঠুর ধর্ম ভালো করে জানেন না, কবিতার অরণ্যে তাই আমরা কেবল মাধুর্যকেই দেখতে পাই।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আমার বন্দুক তৈরি আছে বন্ধু! বলো, কাকে মারতে হবে? ওই চন্দ্রকিরণকে, না কাসিম মিয়াকে?'

বিমল একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, 'তুমি তৈরি আছ শুনে সুখী হলুম। থাক, আজকের মতো চাঁদের আলো আর কাসিম মিয়াকে অব্যাহতি দাও; এসো, এখন বিছানা পেতে ফেলে হাত-পা ছড়ানো যাক।'

পরদিন সকালে বোটের কামরায় বসে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে বিমল চা-পানের আয়োজন করছিল।

কুমার বাইরে বসে দুই ধারের দৃশ্য দেখছিল।

দৃশ্যের কিছুই পরিবর্তন হয়নি, কেবল চাঁদের আলোর বদলে সূর্য এসে এখন দিকে দিকে কাঁচা সোনার জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। নদীর দুই তীরে সবুজ বন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার ভিতর থেকে রাত্রের সেই ভয়ানক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। বোট একদিকের তীর ঘেঁসে যাচ্ছিল, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই বনের ভিতরে গাছপালারা এমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই নজরে আসে না। মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানটা দেখাচ্ছে ঠিক জলাভূমির মতো। সেখান দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে গেলে এক কোমর কর্দমাক্ত জল ভেঙে অগ্রসর হতে হয়। সেই কর্দমাক্ত জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে নলখাগড়ার দল। দূরে দূরে বনের শিয়রে শিয়রে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো বাষ্পের মেঘ।

এক জায়গায় দেখা গেল, কুৎসিত দেহের আধখানা ডাঙার উপরে তুলে প্রকাণ্ড একটা কুমির স্থিরভাবে রোদ পোয়াচ্ছে। এত বড়ো কুমির কুমার আর কোনওদিন দেখেনি। তার বন্দুকটা পাশেই ছিল, সে আস্তে আস্তে সেটা তুলে নিয়ে কুমিরের দিকে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে।

বিমল তখন দুটো চায়ের পেয়ালা হাতে করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কুমারের অবস্থা দেখে সে-ও কুমিরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থামো কুমার, বন্দুক ছুড়ো না!'

কুমার একটু আশ্চর্য হয়ে বন্দুক নামিয়ে বললে, 'কেন?'

বিমল চললে, 'কুমিরের ঠিক উপরে গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এখন রাত নেই, কিন্তু জীবন-যুদ্ধের জের এখনও চলেছে।'

কুমার সেইদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল জড়িয়ে একটা মস্ত অজগর সাপ স্থির ভাবে কুমিরকে লক্ষ করছে। হঠাৎ তার মাথাটা ডাল থেকে একটুখানি নীচে নেমে পড়ল, তারপর দু-এক বার এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল—এবং তার পরেই ঠিক বিদ্যুতের ঝড়ের মতো তার দেহটা একেবারে কুমিরের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল। তারপর সমস্ত জল তোলপাড় করে যে দৃশ্য শুরু হল ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না! কুমির চায় তার বলিষ্ঠ লাঙ্গুলের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে অজগরকে কাবু করে জলে ডুব দিতে আর অজগর চায় পাকে পাকে কুমিরকে ক্রমেই বেশি করে জড়িয়ে ডাঙার উপরে টেনে তুলতে।

এই বন্য নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবার আগেই বোটখানা নদীর একটা মোড় ফিরে আড়ালে গিয়ে পড়ল।

কুমার বললে, 'কুমিরটাকে আমি মারতে পারতুম, অজগরটাকেও পারতুম। কিন্তু বিমল, প্রকৃতির অভিশাপ যাদের উপরে এসে পড়েছে, তাদের কারুকে মারতে আমার হাত উঠল না। ওরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা পূরণ করুক।'

বিমল বললে, 'এখন বন্দুক রেখে চা খাও। তারপর এসো, কাসিম মিয়ার সঙ্গে একটু কথা কওয়া যাক। ওরা আজ সকাল থেকে মাছ ধরতে বসেছে দেখছি।'

পানসি থেকে বিমলের কথা শুনতে পেয়ে কাসিম বলে উঠল, 'হ্যাঁ হুজুর, হাতে কোনও কাজ নেই, কী আর করি বলুন!'

বিমল বললে, 'মাছ-টাছ কিছু ধরতে পেরেছ নাকি কাসিম?'

—'ধরেছি হুজুর। দুটো মাছ ধরেছি।'

—'বেশ, বেশ, আমাদের দু-একটা উপহার দিয়ো। .....কিন্তু বলতে পারো কাসিম, সে-দ্বীপে গিয়ে পৌঁছোতে আমাদের আরও কত দেরি লাগবে?'

কাসিম বললে, 'আমাদের পানসিতে দাঁড় টেনে গেলে সেখানে পৌঁছুতে হয়তো আরও দু-দিন লাগত। কিন্তু আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই বিলিতি বোট, বোধহয় আজ রাতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যার পর আবার রাত এল। আকাশ থেকে আবার প্রতিপদের চাঁদের সাজি চারিদিকে আলোর ফুল ছড়াতে লাগল, অরণ্যের মর্মরধ্বনি ও নদীর জলকল্লোল আবার স্পষ্টতর হয়ে উঠল, বনভূমির ভিতর থেকে আবার স্ফুট ও অস্ফুট বিচিত্র সব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল—চারিদিকে আবার অন্ধকারের আবছায়ায় নানা বিভীষিকার সাড়া পাওয়া গেল।

নদী ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে, দুই তীরের বন রেখা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

কাসিম বললে, 'হুজুর, আমরা সমুদ্দুরের কাছেই এসে পড়েছি।'

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নদীর দুই তীর এত দূরে সরে গেল যে বনের ভিতরকার শব্দ আর বড়ো কানে আসে না। সেখানে শোনা যায় চারিদিক আচ্ছন্ন করা কেবল নদীর অশ্রান্ত কোলাহল। এ যেন নদী-কল্লোলের পৃথিবী!

সেই কোলাহলের ভিতরে দূর থেকে আর-একটা শব্দ বিমল ও কুমারের কানে ভেসে এল।

সে শব্দ কাসিমও শুনেছিল। সে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, 'হুজুর, ও আবার কীসের আওয়াজ?'

বিমলও কান পেতে শুনতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে,—তার মানে, শব্দটা ক্রমেই তাদের কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'কাসিম, আমাদের মতো আর একখানা মোটরবোট এই দিকে আসছে। ও তারই শব্দ।'

কুমার বললে, 'ওটা যে মোটরবোটের শব্দ তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন অসময়ে এখানে কার ও মোটরবোট? হ্যাঁ কাসিম, এখান দিয়ে প্রায়ই কি এইরকম নৌকো আর মোটরবোট আনাগোনা করে?'

কাসিম বললে, 'না হুজুর, এখান দিয়ে নৌকো আনাগোনা করে না। সেই বুড়োবাবুটি পথ দেখিয়ে নিয়ে না এলে আমরা কোনওদিনই এদিকে আসতুম না।'

বিমল বললে, 'কাসিম, তাহলে ওই মোটরবোট চড়ে আসছেন তোমাদের সেই বুড়োবাবুটি।'

কাসিম বললে, 'হতে পারে হুজুর, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম, সেই বুড়োবাবুটি আবার রাইপুরে গিয়েছেন। হয়তো তিনিই ফিরে আসছেন।'

বিমল বললে, 'তোমাদের সেই বুড়োবাবু রোজ এদিকে ফিরে আসুন, আমাদের তাতে কোনওই আপত্তি নেই। কিন্তু আজ তিনি আমাদের যাতে এইখানে দেখতে না পান, এখনই এমন কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এই খোলা নদীতে লুকোতে গেলে নৌকোসুদ্ধ পাতাল প্রবেশ ছাড়া আমাদের তো আর কোনও উপায় নেই।'

বিমল বললে, 'উপায় বোধহয় আছে কুমার! মাইল খানেক তফাতে ছোটো একটা চরের মতো কী যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?' —মোটরবোট যে চালাচ্ছিল তার দিকে ফিরে সে বললে, 'ওহে জোরে চালাও, খুব জোরে!'

বোটের গতি তখন দ্বিগুণ বেড়ে উঠল এবং মিনিটকয়েক পরেই তারা একটা চরের কাছে এসে পড়ল।

গঙ্গাসাগরের কাছে সুন্দরবনের অসংখ্য নদীর ভিতরে এইরকম সব ছোটো ছোটো চর দেখা যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এই চরগুলো জলের উপরে জেগে থাকে, তার বুকে ঝোপঝাপ ও জঙ্গলের আবির্ভাব হয় এবং দূর থেকে তাদের দেখায় এক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। কিন্তু বর্ষার সময়ে নদীর জল যখন বেড়ে ওঠে তখন এইসব চরের কোনও চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাদের বোট এইরকম একটা চরের কাছেই এসে পড়ছিল। এখানেও ঝোপঝাপ ও বনজঙ্গলের কোনওই অভাব ছিল না।

বিমল বললে, 'আরও এগিয়ে মোড় ফিরে বোটখানাকে চরের ওপাশে নিয়ে চলো। ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়লে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

বোটের চালক বিমলের কথামতোই কাজ করলে।

বিমলদের বোট দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে এসেছিল বলে পিছনের বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ তখন আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু খানিক পরেই সেই শব্দটা ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠল।

কুমার বললে, 'বিমল, আমরা যখন ও বোটের শব্দ শুনতে পেয়েছি, তখন ওরাও যে আমাদের শব্দ শুনতে পায়নি এমন কথা বলা যায় না।'

বিমল চিন্তিত ভাবে বললে, 'তা যদি পেয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কথা।'

কুমার বললে, 'ভাবনা কীসের?'

—'তুমি তো শুনেছ কুমার, দ্বীপের ওই ভদ্রলোক চান না যে আর কেউ তাঁর ওখানে গিয়ে ওঠে। আমরা এসেছি শুনলে তিনি খুশি হবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

পিছনের মোটরবোটের শব্দ তখন খুব কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু চরের কাছে এসেই শব্দটা থেমে গেল।

বিমল মৃদু স্বরে বললে, 'কুমার, তোমার সন্দেহই সত্য। ওরা আমাদের বোটের শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। তাই ওরা বোট থামিয়ে লক্ষ করছে আমরা কোথায় মিলিয়ে গেলুম।'

কুমার বললে, 'ওরা যদি এদিকে আমাদের খুঁজতে আসে?'

—'খুঁজতে যদি আসে তাহলে উপায় কী? তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করতেই হবে।'

—তুমি কি কোনওরকম বিপদের ভয় করছ বিমল?'

—বিপদ? বিপদের ভয় আছে কি না ঠিক বলতে পারি না, তবে এখানে আমাদের দেখতে পেলে ওই বোটের লোকেরা হয়তো নতুন জামাই বলে ভ্রম করবে না। কুমার, সকলের চোখের আড়ালে যারা লুকিয়ে এমন জায়গায় বাস করে, তারা খুব ভালোমানুষ বলে মনে হয় না।'

কুমার আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুকটা টেনে নিলে।

বিমল বললে, 'আমারও বন্দুকটা এগিয়ে দাও,—সাবধানের মার নেই।'

কাসিম ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, আমরা কী করব?'

বিমল বললে, 'তোমরা আপাতত চুপ করে নৌকোর ভিতরে বসে থাকো। দরকার হলে আমি তোমাদের ডাকব।'

সেই অজানা মোটরবোটের শব্দ আবার জেগে উঠল।

কুমার বন্দুকটা পরীক্ষা করতে করতে চুপি চুপি বললে, 'বিমল, বোধহয় ওরা এইদিকেই খুঁজতে আসছে।'

বিমল বললে, 'খুব সম্ভব তাই—'

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল ও কুমার উৎকর্ণ হয়ে মোটরবোটের গর্জন শুনতে লাগল।

কিন্তু খানিক পরেই তারা বুঝতে পারলে, গর্জনটা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ এতটা ক্ষীণ হয়ে এল যে, আর কোনওই সন্দেহ রইল না।

কুমার সানন্দে বলে উঠল, 'যাক, বাঁচা গেল! ও বোটখানা এদিকে আসছে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু ওদের মনে সন্দেহ হয়েছিল বলেই যে বোটখানা হঠাৎ এখানে থেমেছিল, সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, ও বোটখানাকে আরও খানিক এগিয়ে যেতে দেওয়া। ততক্ষণে এইখানে বসে বসে রেঁধে বেড়ে খাওয়া-

দাওয়া সেরে নেওয়া যাক। ইকমিক কুকারে খিচুড়ি চড়িয়ে দাও কুমার। কাসিম মিয়া, আমাদের চুবড়ি থেকে একটা মুরগি বার করে স্বর্গে পাঠাব, না তোমরা দু-একটা মাছ উপহার দিতে পারবে?'

সন্ধ্যার মায়া-আলো মিলিয়ে গেল, আকাশ থেকে নেমে এল অন্ধকারের যবনিকা। বিমলদের মোটরবোট চলছে—চারিদিকে চলচল-ছলছল জলের কান্না।

প্রতিপদের চাঁদ উঠল। কিন্তু আজকে আর বন্য জীবনের কোনও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই—এমনকি কোনওদিকে বনজঙ্গলের কোনও চিহ্নই নেই,—উপরে আছে খালি আকাশের অনন্ত চন্দ্রাতপ এবং ডাইনে আর বাঁয়ে, সুমুখে আর পিছনে আছে শুধু সেই চলচল-ছলছল জলের কান্না।

চতুর্দিকে সেই অসীমতার অপূর্ব আভাস দেখে কুমার বললে: 'প্রলয়পয়োধিজলে নারায়ণ সেদিন বটপত্রে ভেসে গিয়েছিলেন, সেদিন তাঁরও অবস্থা হয়েছিল বোধ করি আমাদেরই মতো! এই অকূল জলের জগতে আমাদের বোটখানাকে বটপত্রের চেয়ে বড়ো বলে মনে হচ্ছে না।'

বিমল তখন কুমারের কথা মন দিয়ে শুনছিল না, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করছিল।

নৌকোর পিছনের হালের কাছে দাঁড়িয়ে কাসিমও সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওই সেই দ্বীপ, হুজুর!'

বিমল বললে, 'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তো কাসিম? কোনও ভুল হয়নি?'

'না হুজুর, ভুল হতে পারে না। এখানে আর কোনও দ্বীপ নেই।'

বোট এগিয়ে চলল—দ্বীপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এখানটা সমুদ্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কুমার বললে, 'এখানে যদি নৌকো ডোবে, বাঁচবার কোনও উপায়ই নেই!'

বিমল বললে, 'বাঁচবার একমাত্র উপায় ওই দ্বীপ। কিন্তু ওখানেও আছেন সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ—যিনি অতিথি পছন্দ করেন না।'

কুমার বললে, 'কে জানে ওই দ্বীপের কী রহস্য!'

কাসিম বললে, 'হুজুর, আপনারা কি আজকেই ওখানে গিয়ে নামবেন?'

বিমল বললে, 'এই রাত্রে? নিশ্চয়ই নয়! আমরা ডাঙার কাছে একটা ঝুপসি জায়গা পেলেই নোঙর করব। ডাঙায় নামব কাল সকালে। ড্রাইভার, তুমি মোটরের ইঞ্জিন থামাও, নইলে ও-শব্দ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে। —কাসিম, এখন বেশ জোয়ারের টান আছে, এইবারে তোমার নৌকো আমাদের বোটকে দ্বীপের কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারবে?'

কাসিম বললে, 'পারবে।'

তখন সেই ব্যবস্থাই হল।

বিমল বললে, 'সবাই আস্তে আস্তে দাঁড় ফ্যালো। সাবধানের মার নেই।'

দ্বীপ কাছে এসে পড়ল। তার বনজঙ্গলে জ্যোৎস্নার ঝালর ঝিকমিক করছে এবং তার সর্বত্র বিরাজ করছে নিস্তব্ধ এক থমথমে নির্জনতা।

কুমার বললে, 'বুড়ো এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে।'

বিমল বললে, 'স্বপন দেখতে দেখতে সে জেগে উঠতেও পারে!'

দ্বীপের ভিতর থেকে জীবনের টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কানে এল না। এখানে যে মানুষ আছে, গাছ-পাতার ফাঁক দিয়ে কোনও কম্পমান আলোকশিখাও তার ইঙ্গিত দিলে না। এখানে যে প্রবল ও দুর্বল পশু আছে, পূর্বপরিচিত বন্য নাট্যাভিনয়ের কোনও হুঙ্কার বা আর্তনাদও তার প্রমাণ দিলে না। বিমল ও কুমারের মনে হল গঙ্গাসাগরের লবণাক্ত অশ্রুজলের উপরে অজানা বিভীষিকার ছায়া নাচিয়ে এই রহস্যময় দ্বীপ যেন পৃথিবীর ভিতরে থেকেও পৃথিবীর ভিতরে নেই।

বিমল চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, 'কাসিম, বুড়োবাবুকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে সেখানটা তুমি চিনতে পারবে?'

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, 'না হুজুর। তিনি বোধহয় কোনও আঘাটায় নেমেছিলেন। এখানে কোনও ঘাট আছে কি না আমরা জানি না।'

বিমল বললে, 'তাহলে কাল সকালে আমাদেরও আঘাটাতেই নামতে হবে। আপাতত এক কাজ করো। ওই যেখানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ প্রায় জলের উপরে হেলে পড়ে চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ওইখানে গিয়েই নৌকো বাঁধো। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না; এরপর একবার ওই অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারলেই আমরা আজকের রাতের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

কাসিম বললে, 'কিন্তু ও-অন্ধকার তো ভালো নয় হুজুর! মাথার উপরে গাছপালা—সেখানে অজগর থাকতে পারে। পাশেই ডাঙা—সেখানে বাঘ থাকতে পারে। যদি তাদের কেউ নৌকোয় এসে ওঠে?'

—'আমরা কামরার সব জানলা দরজা বন্ধ করে ভিতরে শুয়ে থাকব। এখন তো রাত দুপুর, বাকি রাতটুকু কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারব বোধহয়।'

নৌকো ও মোটরবোট ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতরে ঢুকল। সেইখান থেকে তারা দেখতে পেলে, আশেপাশের কষ্টিপাথরের মতো কালো ও নিরেট ছায়ায় সীমানা ছাড়িয়েই শুরু হয়েছে মুক্ত আকাশ থেকে নেমে আসা চাঁদের আলো-লহর—রুপোর জলতরঙ্গে নেচে নেচে উঠছে আলো চিকন ফেনার মালা। সেই রূপময় তরল ও চঞ্চল অসীমতা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে যে সুন্দর সংগীত গাইতে গাইতে, ভাবুকের মন নিয়ে তা শুনলে শান্তি ও আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

সবাই কামরার ভিতরে ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে।

বিছানা পেতে বিমল ও কুমার শুয়ে পড়ল।

একথা সেকথা কইতে কইতে তাদের দুজনেরই চোখের পাতা তন্দ্রার আমেজে যখন ভারী হয়ে এসেছে, তখন বাইরের জলকল্লোলের মাঝখানে আচম্বিতে কী একটা বেসুরো শব্দ জেগে উঠল।

প্রথমে উঠল গাছের পাতার মর্মর-শব্দ,—যেন তিন-চারটে বড়ো বড়ো জীব ডাল-পাতার ভিতরে লাফাতে লাফাতে নৌকোর কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, 'অজগর নাকি?'

তারপর শোনা গেল—'কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচির-মিচির!'

কুমার আবার পাশ ফিরে শুয়ে চোখ মুছে বললে, 'বাঁদর।'

বিমলও আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে শোনা গেল—'কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ মিচ—

কচমচে কাঁচা মাথা
কুচি কুচি কচু কাটা
কিছু যদি বোঝো দাদা,
ফিরে যাও ক্যালকাটা।

হা হা হা হা হা হা হা হা হা!'—সে কী হাসি, যেন থামতেই চায় না!

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ওঠো কুমার! বন্দুক নাও! আমি দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখি, তুমি বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে পাশে থাকো। বিপদ দেখলেই বন্দুক ছুড়বে।'

দরজা খুলে টর্চের উজ্জ্বল আলোকে কেবল দেখা গেল, বোটের ঠিক ওপারেই মস্ত বটগাছের দুটো-তিনটে ডাল খুব জোরে নড়ছে, যেন এইমাত্র কেউ সেখানে থেকে লাফ মেরে ঘন পাতার আড়ালে সরে গিয়েছে।

কুমার বললে, 'প্রথমে বাঁদরের কিচির-মিচির তারপরই মানুষের গান আর হাসি!'

বিমল বললে, 'বাঁদরের কিচির-মিচির ঠিকই শুনেছি বটে। কিন্তু যে গান আর যে হাসি শুনলুম, ও কি মানুষের? অমন অস্বাভাবিক আওয়াজ কোনও মানুষের গলায় কেউ কি কখনও শুনেছ?'

কুমার আর একবার চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনও গাছে বাঁদরও নেই। তবে কি আমরা কোনও অশরীরীর সাড়া পেলুম?'

বিমল হতভম্বের মতো বললে, 'এতদিন পরে শেষটা কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে হবে?'

খানিক তফাত থেকে আবার আর একরকম আওয়াজ জেগে উঠল—'ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট!

ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট!'

কুমার চমকে বলে উঠল, 'ও আবার কী?'

বিমল বললে, 'ওই শোনো!'

'ঘট-ঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট
ঘট-ঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট—
ঘুটঘুটে আন্ধি,
একলাটি কান্দি,
রেখে গেছে বান্ধি
সমুদ্রে!

মোটরের পাণ্ডা!
জল খুব ঠান্ডা
মোরগের আণ্ডা
দে ক্ষুদ্রে!
দাও যদি ঝম্প—
মোর মুখে লম্ফ
নিবে যাবে লম্ফো
চক্ষের!
কেন শ্রম যত্ন?
মোরা দুঃস্বপ্ন,
হেথা নেই রত্ন
যক্ষের!'

বিমল তাড়াতাড়ি জলের উপরে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলে—কিন্তু বৃথা। কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল এক জায়গায় জল অত্যন্ত তোলপাড় করছে—যেন কেউ সেখানে সবে ডুব দিয়েছে।

বিমল বোকার মতন কুমারের মুখের পানে তাকালে। কিন্তু কুমার বলে উঠল, 'বুঝেছি, বুঝেছি! এসব হচ্ছে ওই দ্বীপের বুড়োর চালাকি! নিশ্চয়ই সে ভেনট্রিলোকুজম জানে! লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে!

বিমল বললে, 'অসম্ভব নয়। কিন্তু গাছের ডাল কেন হঠাৎ দোল খায়, জল কেন হঠাৎ তোলপাড় করে?'

কুমার জুতসই কোনও জবাব না দিতে পেরে বললে, 'বুড়ো হয়তো ম্যাজিকের নানান কল-কৌশল জানে।'

বিমল বললে, 'ওসব বাজে কথা ভাববার সময় এখন নয়। উপরে গাছে, নীচে জলে ভিন্ন ভিন্ন গলায় কারা অমন অদ্ভুত রকম শব্দ করে, পদ্যে কথা কয়, হা হা করে হাসে, আমাদের ভয় দেখায়, আবার সাবধান করেও দেয়? তারা আমাদের দেখে, কিন্তু নিজেরা দেখা দেয় না! তারা স্পষ্টই বলেছে—'এ বড়ো মারাত্মক জায়গা, এখানে ধনরত্ন কিছুই নেই, ভালোয় ভালোয় তোমরা প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাও!' কে তারা? তারা শত্রু বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু তারা কি আমাদের বন্ধু?'

হঠাৎ কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়েই সারা দ্বীপ যেন সশব্দে সজাগ হয়ে উঠল।

সমুদ্রে প্রবল বন্যার দুরন্ত গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির অগ্নিহুঙ্কারের মতো কল্পনাতীত কী এক ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যেন ক্রুদ্ধ আবেগে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে তুললে। এবং তারই মাঝে মাঝে আবার শোনা যেতে লাগল—কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ কিচ কিচ! ঘ্যাট ঘ্যাট ঘট ঘট ঘ্যাট ঘ্যাট! বানর ও আর একটা কোনও পশুর ভীত আর্তনাদ।

কুমার বিহ্বলের মতো বললে, 'দ্বীপে ও কাদের চিৎকার? হুড়মুড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে—চিৎকারও যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

ওদিকে পানসি থেকে কাসিমও সভয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'হুজুর! আমার লোকজনরা ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছে! বলছে, তারা এই শয়তানের দ্বীপের কাছে আর একদণ্ড থাকবে না! আমরা পানসি নিয়ে চলে যেতে চাই!'

বিমল ফাঁপরে পড়ে বললে, 'সে কী কাসিম মিয়া, তোমরা কি আমাদের এখানে ফেলেই পালাতে চাও?'

'কী করব হুজুর, ভূতের সঙ্গে কে লড়াই করবে? আমরা গরিব মানুষ, ঘরে মা-বউ-বেটা আমাদের পথ চেয়ে দিন গোনে, আমরা কি ভূতের হাতে প্রাণ দিতে পারি?'

বিমল বললে, 'শোনো কাসিম, আরও বকশিশ চাও তো বলো!'

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, 'মাপ করবেন হুজুর! প্রাণ গেলে বকশিশ নেবে কে? ...ভাই সব! বোট থেকে আমাদের নৌকোর দড়ি খুলে নাও!'

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

বিপদ জলে-স্থলে

কিন্তু সামুদ্রিক বন্যার গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির হুঙ্কারের মতো, কালবৈশাখীর বজ্রকণ্ঠের চিৎকারের মতো ওসব কীসের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দ্বীপের ভিতর থেকে ক্রমেই জলের দিকে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে? ওই সব সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ তো কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের নয়, ওদের উৎপত্তি যেন জ্যান্ত জীবজন্তুর কণ্ঠ থেকেই!... পৃথিবীতে এমন কোনও জীবজন্তু আছে, যারা এমন সব ভয়ানক অপার্থিব চিৎকার করতে পারে?

সেই আশ্চর্য চিৎকার একেবারে দ্বীপের প্রান্তে নদীর ধারে এসে পড়ল। বিমল অবাক হয়ে দেখলে, একটা বনের অনেকখানি অংশ যেন হেলে বেঁকে একবার দুমড়ে পড়ছে এবং আর্তনাদ করে আবার শূন্যে ঠিকরে উঠছে,—তার ভিতরে যারা আজ এসে ঢুকছে, বনস্পতিরা তাদের যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। সেই অসহনীয় অত্যাচারী কল্পনাতীত দুরন্তদের ভৈরব হুঙ্কার বনস্পতিদের আর্ত মর্মর নাদকেও ডুবিয়ে দিলে।

কুমার হঠাৎ বিমলের কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

বিমল আগেই দেখেছিল। চাঁদ তখন পশ্চিম দিকে গিয়ে একটা তালকুঞ্জের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। আচম্বিতে সেই কুঞ্জের তালগাছগুলো চারিদিকে ঠিকরে পড়ল এবং তার মধ্যে বিকট দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠল সুদীর্ঘ ও বিরাট একটা ছায়ামূর্তি—চকিতের জন্যে। পরমুহূর্তে সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তালগাছগুলোও আবার খাড়া হয়ে উঠে যেন বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

ওই মুহূর্তের মধ্যেই বিমল দেখে নিলে, সেই বিরাট দানবের দেহ প্রায় তালগাছগুলোরই মতো উঁচু।

কাসিম কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'হুজুর, আমরা নৌকো খুলে দিয়েছি! আপনারা কী করবেন?'

বিমল বললে, 'আমরাও যাব। ড্রাইভার, মোটরের স্টার্ট দাও। কাসিম তোমাদের পানসি আমাদের বোটের পিছনে বেঁধে নাও।'

হঠাৎ অন্ধকার জলের ভিতর থেকে আরও অন্ধকার মস্ত একটা কুৎসিত মুখ জেগে উঠল—তার চোখদুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো।

পানসির লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কুমির!'

কুমিরটা আবার ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাছের একটা বড়ো ডাল হঠাৎ দোল খেলে—সেখানেও দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সেটা বানর, না মানুষ, না অন্য কোনও জীব তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত আগ্রহভাবে নৌকোর লোকদের গতিবিধি লক্ষ করছে, এটুকু ভালো করেই বুঝতে পারা গেল।

দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতর থেকে এতক্ষণ যে ভীষণ হট্টগোল উঠে চতুর্দিক শব্দময় করে তুলেছিল, আচম্বিতে তা থেমে গেল। অরণ্যের ছটফটানিও বন্ধ হয়ে গেল। বিমল ও কুমারের মনে হল যেন বিরাট এক নিস্তব্ধ বিভীষিকা দম বন্ধ করে ওঁত পেতে তাদের উপরে হঠাৎ লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

মোটারবোটের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেল কে একজন হা হা হা হা করে অট্টাহাস্য করছে।

কুমার তাড়াতাড়ি টর্চের আলোটা সেইদিকে নিক্ষেপ করলে।

একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় এক দীর্ঘদেহ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে মূর্তির কাছ পর্যন্ত টর্চের আলোক রেখা ভালো করে পৌঁছোল না বলে তাকে স্পষ্ট করে দেখা গেল না; কিন্তু এটা বোঝা গেল, তার ধবধবে সাদা দীর্ঘ চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লটপট করে হু হু বাতাসে উড়ছে।

কাসিম বললে, 'ওই সেই বুড়ো ভদ্রলোক!'

বিমল তাঁর উদ্দেশে চিৎকার করে বললে, 'নমস্কার মশাই, নমস্কার! এ যাত্রায় আর আপনার সঙ্গে আলাপ করা হল না।'

সে মূর্তি যেন পাথরের মূর্তি। একটু নড়লও না, আর কোনও সাড়াও দিলে না।

মোটরবোট ক্রমেই দ্বীপ থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে, দ্বীপ ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিমল ও কুমার একদৃষ্টিতে সেই রহস্য-রাজ্যের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

তারপর দ্বীপটা যখন একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেল, বিমল বললে, 'কুমার আবার আসব, আর রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আসব। ও-দ্বীপের কিছুই আমি জানতুম না বলে এবার ব্যর্থ হতে হল, কিন্তু এর পরের বারের ইতিহাস হবে অন্যরকম।'

কুমার বললে, 'কলকাতা থেকে আমরা আশি মাইলের বেশি দূরে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না, মনে হয় আমরা যেন অন্য কোনও পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছি। যা দেখলুম, আর যা শুনলুম, তা স্বপ্ন, না চোখ আর কানের ভ্রম?'

বিমল বললে, 'আমাদের সামনে এখন অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, ওই বুড়ো কে? কেন সে এমন অদ্ভুত জায়গায় বাস করে? দ্বিতীয়ত, জল আর গাছের উপর থেকে

কারা ছড়া কেটে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছিল? কেনই বা তারা এখানে থাকে আর কেনই বা দেখা দেয় না? তৃতীয়ত, দ্বীপের বনজঙ্গলের ভিতরে কারা অমন হট্টগোল আর হুড়োহুড়ি করছিল? চতুর্থত, তালগাছগুলো ঠেলে যে অসম্ভব বিরাট ছায়ামূর্তিটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, সেটা কী? পঞ্চমত, সেই বাঘের মতন বড়ো বেড়ালটা কি এই দ্বীপেই বাস করত? সেরকম বিড়াল কি এখানে আরও আছে?'

কুমার বললে, 'দ্বীপের ব্যাপার যা দেখলুম তাতে মনে হচ্ছে বেশ একটি বড়ো দলবল না নিয়ে এলে আমরা ওখানে নামতেই পারব না।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ। কেবল দলবল নয়, দলে বাছা বাছা লোক নিতে হবে। কাসিমদের মতো ভিতু লোক নিয়ে কোনওই কাজ হবে না। এবারে যখন আসব, তখন আমাদের দলে বিনয়বাবু, কমল আর রামহরি তো থাকবেই, তার উপরে জনকয়েক বন্দুকধারী পুলিশের লোক যাতে পাওয়া যায়, সে-চেষ্টাও করতে হবে; নইলে এবারে এসেও হয়তো দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব না। দ্বীপে যারা আছে তারা বাধা দেবেই।'

কুমার বললে, 'আর আমাদের বাঘা? সে কার কাছে থাকবে?'

বিমল বললে, 'বাঘার মতন চালাক কুকুর অনেক মানুষের চেয়ে ভালো। এখানে তাকেও হয়তো দরকার হবে। সে-ও আমাদের দলে থাকবে।'

পানসি থেকে কাসিম শুধোলে, 'হুজুর আপনারা কোন দিকে যাবেন?'

বিমল বলল, 'আমরা পোর্ট ক্যানিংয়ে গিয়ে নামব।'

—'তাহলে হুজুর আমাদের রাইপুরের কাছে ছেড়ে দেবেন।'

—'আচ্ছা। চলো কুমার, শেষ রাতে আমরা একটু ঘুমিয়ে নি।'

বিমলের কথা শেষ হবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে তলিয়ে দিয়ে একটা আর্তনাদ জেগে উঠল—'রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

বিমল ও কুমার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল। এই জনমানবহীন জলের দেশে সাহায্য চায় কে!

তখন একটা ছোট্ট চরের পাশ দিয়ে বোট যাচ্ছিল। তারা চাঁদের নির্বাণোন্মুখ ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখলে চরের উপরে সাদা মতো চলন্ত কী একটা দেখা যাচ্ছে।

আবার আর্তনাদ শোনা গেল—'রক্ষা করো! আমাকে এখানে ফেলে যেয়ো না!'

বিমল বললে, 'ড্রাইভার, বোট চরে ভেড়াও।'

কাসিম ভীত স্বরে বললে, 'হুজুর, এও ভূতের কারসাজি! এখানে মানুষ থাকে না!'

বিমল তার কথায় কর্ণপাত করলে না।

বোট চরে গিয়ে ঠেকল। 'টর্চ' জ্বেলে দেখা গেল, একটা লোক পাগলের মতো নৌকোর দিকে ছুটে আসছে—তার জামা কাপড় ছেঁড়া, চুল উশকোখুশকো, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।

লোকটা কাতর স্বরে বললে, 'আজ তিন দিন অনাহারে এখানে পড়ে আছি! আমাকে বাঁচান!'

বিমল তাকে নৌকোর উপরে উঠতে বললে।

নৌকোয় উঠে সে বললে, 'আগে আমাকে কিছু খেতে দিন!'

কুমার তখনই একখানা পাউরুটি, কিছু মাখন ও খানিকটা জেলি এনে দিলে। লোকটা গোগ্রাসে তা খেয়ে ফেললে।

সে একটু ঠান্ডা হলে পর বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেমন করে এখানে এলে?'

সে বললে, 'গ্রহের ফেরে! আমি হচ্ছি কাঠের ব্যাপারি। নৌকো করে লোকজনের সঙ্গে এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম। পথে একটা দ্বীপ পেয়ে ভাবলুম, ওখানে নেমে দেখব ভালো কাঠের গাছ পাওয়া যায় কি না। সেই কুবুদ্ধিই হল আমার কাল। দ্বীপে গিয়ে নামবামাত্র চারিদিকে যেন দৈত্যদানবরা চিৎকার করতে লাগল আর ভূমিকম্প হতে লাগল! আমার দলের লোকদের কী হল জানি না, কিন্তু আমি দেখলুম, হাতির মতো কী একটা জানোয়ার তিরের মতো আমার দিকে তেড়ে আসছে!'

বিমল বললে, 'সে জানোয়ারটাকে কি মস্ত একটা বিড়ালের মতো দেখতে?'

—'বিড়াল? না, তাকে দেখতে হাতির মতো বড়ো যেন একটা ডালকুত্তা!'

—'তারপর?'

—'আমি তখন জলের কাছে ছিলুম। প্রাণের ভয়ে তখনই জলে ঝাঁপ দিলুম—সঙ্গে সঙ্গে আমার খুব কাছেই প্রকাণ্ড একটা কুমির ভেসে উঠল। ডাঙায় প্রকাণ্ড অদ্ভুত জানোয়ার আর জলে কুমির দেখে আমার যে কী অবস্থা হল, সেটা বুঝতেই পারছেন। যদিও প্রাণের আশা আর রইল না, তবু দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাঁতার কাটতে লাগলুম,—কারণ আমি শুনেছিলুম, মানুষ যখন সাঁতার কাটে কুমির তখন তাকে ধরতে পারে না। একথা সত্যি কি না জানি না, কিন্তু সেই কুমিরটা নাছোড়বান্দার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর এল বটে, তবু আমাকে ধরবার কোনও চেষ্টাই করলে না। তারপর সে ডুব মারলে। আমার ভয় আরও বেড়ে উঠল, ভাবলুম জলের ভিতর থেকে এইবারে সে আমাকে কামড়ে ধরবে! ক্রমাগত পা ছুড়তে লাগলুম! ...সেইভাবে ভাসতে ভাসতে যখন এই চরে এসে উঠলুম, তখন আমি আধমরা। এই চরেই আজ তিন দিন তিন রাত কেটে গেছে। আজ আপনাদের নৌকো এ পথে না এলে আমি অনাহারেই মারা পড়তুম।'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কুম্ভকর্ণের বংশধর

বিনয়বাবু তাঁর পরীক্ষাগারে বসে একমনে আকাশের গ্রহ-তারা দেখবার বড়ো দূরবিনটা সাফ করছিলেন, এমন সময় একখানা খবরের কাগজ হাতে করে কমল সেই ঘরে প্রবেশ করল।

কমলের পায়ের শব্দ বিনয়বাবু চিনতেন, কাজেই দূরবিন থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসো কমল।'

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'বিনয়বাবু, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

—'না। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে, নতুন কোনও খবর আছে।'

—'কেবল নতুন নয়, আশ্চর্য খরব!'

বিনয়বাবু দূরবিন থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়েছি, ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়েছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্করের দেশে গিয়েছি। আমাদের কাছে কি কোনও খবরই আর আশ্চর্য বলে মনে হবে?'

কমল বললে, 'আচ্ছা, আগে আপনি খবরটা শুনুন।' এই বলে সে কাগজখানা খুলে পড়তে লাগল :

গঙ্গাসাগরের কুম্ভকর্ণ

'গঙ্গাসাগরের নিকটে এক অদ্ভুত রহস্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাগর দ্বীপের নিকটস্থ নদ-নদীতে যাহারা নৌকো লইয়া আনাগোনা করে, সম্প্রতি তাহাদের ভিতরে অত্যন্ত বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে।

কয়েকখানি নৌকার এবং তাহাদের মাঝি-মাল্লার ও লোকজনের কোনও খবর পাওয়া যাইতেছে না, তাহারা যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেখানেও ফিরিয়া আসে নাই, অথবা গন্তব্যস্থলেও গিয়া উপস্থিত হয় নাই। যদি মনে করা যায় কোনওরকম দুর্ঘটনায় হঠাৎ নৌকাডুবি হইয়াছে, তবে এই কথা জিজ্ঞাস্য হওয়া স্বাভাবিক যে, দুর্ঘটনা কি এমন নিয়মিতভাবে ঘটিতে পারে? ঝড় বাদল বা বন্যা নাই, অথচ পরে পরে কয়েকখানা নৌকা আরোহীদের সহিত একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, একজন লোকেরও প্রাণরক্ষা হইল না? এটা কি যার-পর-নাই অস্বাভাবিক নহে?

নদীর কেবল এক নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই নৌকোগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। সাগর দ্বীপের পরে ফ্রেজারগঞ্জ। তাহার পর জামিরা নদী। তাহার পর বুলছড়ি দ্বীপ। তাহার পর মাতলা নদী। জামিরা নদীর জল যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকিয়া মাতলা নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানেই কোনও এক জায়গায় গিয়া প্রত্যেক নৌকাই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে।

পুলিশের লোকেরা তদন্তে গিয়া আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছে।

পুলিশের নৌকা একটা অজানা দ্বীপের নিকটে নোঙর ফেলিয়াছিল। শুক্লপক্ষের শুভ্র রজনি। নৌকার উপরে বসিয়া একজন চৌকিদার পাহারা দিতেছিল।

দ্বীপের উপরে হঠাৎ সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিল। প্রায় তালগাছ সমান উচ্চ ভয়াবহ এক মূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে যদিও তাহার মুখ চক্ষু দেখা যাইতেছিল না, তবে সেটা যে কোনও দানব-মনুষ্যমূর্তি, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই।

চৌকিদারের ভীত চিৎকারে নৌকোর অন্যান্য লোক বাহিরে আসে এবং তাহারাও সেই বিরাট মূর্তিকে দেখিতে পায়। সকলে তখন নৌকা লইয়া সভয়ে পলায়ন করে।

যেসব নৌকা অদৃশ্য হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত অমানুষিক মূর্তির কোনও সম্পর্ক আছে কি না, পুলিশ এখন এই কথা লইয়াই মাথা ঘামাইতেছে।

প্রকাশ, শীঘ্রই বৃহৎ এক পুলিশ বাহিনী ওই অজানা দ্বীপের দিকে যাত্রা করিবে।

স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই—লঙ্কাদ্বীপের কোনও অজ্ঞাত অংশ হইতে কুম্ভকর্ণের বংশধরগণ সন্তরণ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গাসাগরের নিকটস্থ ওই দ্বীপের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অদৃশ্য নৌকাগুলির আরোহীরা গিয়াছে তাহাদেরই বিপুল উদরের মধ্যে।

অবশ্য এরকম কুসংস্কারে আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যে ভালো করিয়া তদন্ত করা উচিত, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। নহিলে সুন্দরবনের ও-অঞ্চলে নৌকা চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।'

বিনয়বাবু তাঁর মাথার কাঁচা-পাকা চুল ক-গাছির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে একমনে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'পৃথিবীতে কি আবার পুরাকাল ফিরে এল? এখন দানবের অত্যাচার যেন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে! আমরা মৃনুকে উদ্ধার করতে গিয়ে হিমালয়ের যেসব ভয়ঙ্করকে দেখে এসেছি, এতদিন অনেকে তাদের কথা বিশ্বাস করত না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এভারেস্ট অভিযানের লোকেরা হিমালয়ের টঙে যে বিরাট পদচিহ্ন দেখেছিল, সেটা তখন একটা মজার গল্প বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সে গল্প যে সত্যি, আমরা তা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করি। আমাদের চেষ্টা বেশি-বুদ্ধিমানদের কাছে সফল হয়নি। তারপর গেল বছরে যখন খবরের কাগজে বেরুল যে, দার্জিলিংয়ের আরও নীচে আর বাংলা দেশের নানা স্থানে দানবের মতো বৃহৎ মানুষ দেখা গেছে, তখন আমাদের কাহিনির উপরে লোকের শ্রদ্ধা হল। বিমল বলে, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররা তাদের দেবী...অর্থাৎ আমাদের মৃনুকে সারা দেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং একদিন তারা মৃনুকে আবার খুঁজে বার করবেই করবে। গেল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' কাগজে দেখেছি, মিঃ সিপটন নামে এক ভদ্রলোক মালয়ের ১৬,০০০ হাজার ফুট উপরে বরফের গায়ে আবার দানবের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বিমলের মত যদি ঠিক হয় তবে কে বলতে পারে, মৃনুকে খুঁজতে খুঁজতে দু-একটা দানব গঙ্গাসাগরের কাছে গিয়ে হাজির হয়নি?'

কমল বললে, 'বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা দ্বীপে দানব-বিড়ালের খোঁজে গিয়েছেন, সে-কথাটাও মনে রাখবেন। দানবদের দেশে গিয়ে আমরা কিন্তু বাঘের মতো কোনও বিড়াল-টিড়াল দেখতে পাইনি। সেখানকার কুকুর দেখেছি, সাধারণ কুকুরের চেয়ে সে বড়ো নয়। গঙ্গাসাগরের কাছে কি তাহলে দানব-জীবদের অজানা কোনও আস্তানা আছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'কেমন করে তা বলব? তবে এইটুকু জানি যে, বিলাতেও দানব-মানুষের কাহিনি কেবল গালিভারের গল্পে বা ছেলেভুলানো রূপকথায় পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষেরাও তাদের চর্মচক্ষে দেখতে পেয়েছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হচ্ছে 'বেল মাকবুই'। সে পাহাড়টি আছে হাইল্যান্ডারদের দেশে। যখন বরফ পড়ে তখন স্থানীয় লোকেরা কিছুতেই সেই পাহাড়ের উপরে উঠতে রাজি হয় না।

কারণ তারা বলে, বরফ পড়লেই সেখানে 'Lang mon'রা বেড়াতে আসে, তারা সাধারণ মানুষকে সুনজরে দেখে না। 'Lang mon' হচ্ছে 'Long man'-এরই রূপান্তর—অর্থাৎ 'লম্বা মানুষ'। সকলেই এই লম্বা মানুষদের অলীক কল্পনা বলেই মনে করত। কিন্তু কিছুদিন আগে Alpine Club-এর ভূতপূর্ব সভাপতি আর এভারেস্ট অভিযানেরই এক সাহেব স্বচক্ষে একজন লম্বা মানুষকে দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে উঁচু ছিল প্রায় ১২ ফুট। এই দুজন নির্ভরযোগ্য, বিখ্যাত আর শিক্ষিত দর্শকের কথা আজ আর কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না।'

কমল বললে, 'কিন্তু গঙ্গাসাগরের এই দানব-মানুষ নাকি প্রায় তালগাছের সমান উঁচু। হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও এদের চেয়ে ঢের ছোটো ছিল।'

বিনয়বাবু বললেন, 'উঁচু দানবের কথা যখন তুললে তখন আর একটা সত্য কাহিনি বলি শোনো। এরও ঘটনাস্থল হচ্ছে বিলাতে, ডিভনশায়ারে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারির সকালবেলায় ডিভনশায়ারের অনেকগুলো শহরের বাসিন্দারা সবিস্ময়ে দেখলে যে বরফের উপরে অদ্ভুত সব খুরের চিহ্ন সারিসারি এগিয়ে গেছে। এ ঘোড়া বা গাধা বা অন্য কোনও চতুস্পদ পশুর খুরের দাগ নয়—এ দাগ হচ্ছে কোনও দু-পেয়ে জীবের। পৃথিবীতে এমন কোনও দু-পেয়ে জীব নেই যার পায়ে খুর আছে। প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত চলে গেছে ওই আশ্চর্য পদচিহ্ন। যে সারা রাত ধরে অশ্রান্তভাবে পথ চলেছে এবং এক রাতে যে একশো মাইল পথ চলে, সে কীরকম জীব তা বুঝে দ্যাখো! যেতে যেতে একটা এক মাইল চওড়া নদীও (River Exe) সে অনায়াসে পার হয়ে গেছে—কারণ তার পদচিহ্ন নদীর এপারে জলের ধারে শেষ হয়ে গিয়ে আবার ওপার থেকে আরম্ভ হয়েছে। পথে অনেক ছোটো-বড়ো বাড়ি পড়েছিল, কিন্তু সেই রহস্যময় জীবটা কোনও বাড়ির ভিতরেই ঢোকেনি। অনেক বাড়ির এপাশে শেষ হয়ে গিয়ে ফের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে, তাদের ছাদের উপরে কোনও দাগই নেই—যেন সে অনায়াসেই গোটা বাড়িটাই ডিঙিয়ে চলে গেছে। ...এখন ভাববার চেষ্টা করো, এ কোন জীব? এরকম পদচিহ্ন ডিভনশায়ারে তার আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। তার খুরওয়ালা দু-খানা পা, সে এক মাইল চওড়া নদী পার হয়, অম্লান বদনে এক রাতে একশো মাইল হাঁটে, বাড়ির ছাদে উঠে নেমে যায় বা বিনা কষ্টেই বাড়ি-কে বাড়ি লঙ্ঘন করে অগ্রসর হয়। স্থানীয় লোকেরা ধরে নিলে, গত রাত্রের তুষার বৃষ্টির সময়ে শয়তান ডিভনশায়ারে বেড়াতে এসেছিল—কারণ, প্রচলিত মতে, শয়তানের দুই পায়ে খুর আছে। এই ঘটনার পরে অনেক দিন পর্যন্ত ডিভনশায়ারের বাসিন্দারা সন্ধ্যার আগেই যে যার বাড়ির ভিতরে পালিয়ে এসে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকত।'

কমল বললে, 'তবু লোকে বলে, পৃথিবীতে এখন আর অসম্ভব ঘটনা ঘটে না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আপাতত ওসব কথা থাক।.....কমল, বিমল আর কুমার কি সুন্দরবন থেকে কোনও খবর পাঠিয়েছে? তারা তো এই দানবের খবর পাওয়ার আগেই গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েও যায়নি, —যদি তারা কোনওরকম বিপদে পড়ে?'

এমন সময়ে একতলা থেকে শোনা গেল, একটা কুকুর পরিচিত গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠল—'ঘেউ, ঘেউ ঘেউ!'

কমল উৎসাহ ভরে লাফিয়ে উঠে বললে, 'ওই বাঘা আমাদের ডাকছে! বাঘা যখন আসছে, তখন ওইসঙ্গে বিমলবাবুদেরও দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাবে!'

বলতে বলতে ঘরের দরজাটা দুম করে খুলে গেল এবং বিমল ও কুমারের আগে আগে বাঘা ভিতরে ঢুকে বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের পা দিয়ে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করলে। তারপর কমলকেও সেইভাবে আদর করে বিপুল বেগে পটপট রবে ল্যাজ নাড়াতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'এই যে! তোমরা যে এরই মধ্যে ফিরে এলে?'

বিমল বললে, 'আমরা ফিরে এলুম না বিনয়বাবু, পালিয়ে এলুম!'

—'দানব-মানুষের ভয়ে?'

—'এই যে, আপনিও খবর পেয়েছেন দেখছি! হ্যাঁ, দানবের ভয়েই বটে। কিন্তু পালিয়ে এসেছি, আটঘাট বেঁধে পুনরাক্রমণ করব বলে।'

—'আবার তোমরা যাচ্ছ?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু এবারে কেবল আমরা দুজনই নই, আপনি যাবেন, কমল যাবে, রামহরি যাবে—এমনকি বাঘাও পড়ে থাকবে না। নিন! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! আমরা প্রস্তুত, আপনারাও দ্বিগুণ উৎসাহে মোটমাট বেঁধে তৈরি হয়ে নিন। আমরা কালকে সকালেই যাত্রা করব।'

বিনয়বাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'তার মানে?'

—'তার মানে, কাল সকালেই আমরা আপনাদের নিয়ে সম্ভবের মুল্লুক থেকে অসম্ভবের দেশে যাত্রা করব। তালগাছের মতো উঁচু মানুষ! হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা! বাঘের মতো মস্ত বিড়াল! পুলিশের লঞ্চ আর বন্দুকধারী সেপাই আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এতক্ষণে প্রস্তুত হয়েছে, আমাকে ডানপিটে বলে গালাগাল দিতে দিতে আর রাগে গরগর করতে করতে বুড়ো রামহরি পর্যন্ত সমস্ত তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়েছে, আর আপনারা এখনও অলস হয়ে এখানে বসে আছেন? ছিঃ বিনয়বাবু! ছিঃ কমল!'

বিনয়বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমরা কেমন করে জানব যে—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'ব্যাস, ব্যাস, আর কথা নয়! এখন জেনেছেন তো? কাল সকালে আমরা সুন্দরবনে যাত্রা করব, আপনার জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিন। আমাদের হাতে এখনও অনেক কাজ রয়েছে। —চলো কুমার, আয় বাঘা।'

বাঘা বিনয়বাবুর দিকে ফিরে আবার বললে—'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ,' কুকুর-ভাষায় তার অর্থ বোধহয়—'কর্তা, এখন আসি?'

বিমল ও কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বিনয়বাবু হতাশভাবে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'না, আমার অপঘাত-মৃত্যু না ঘটিয়ে বিমল বোধহয় ছাড়বে না! ওরা এল আর গেল যেন কালবোশেখির মতো,—এখন সামলাও ধাক্কা!'

খিল খিল করে হেসে উঠে কমল বললে, 'আমার কিন্তু ভারী মজা লাগছে!'

বিনয়বাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'তা তো লাগবেই, সব গাধারই যে এক বুলি! কিন্তু আমার বয়স যে পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমার কি এসব পোষায়, না শোভা পায়?'

দুষ্টু কমল বললে, 'শাস্ত্রে বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেতে। আপনি তো সুন্দরবনেই যাচ্ছেন বিনয়বাবু! যে সে বন নয়, পরমসুন্দর বন!'

বিনয়বাবু আরও রেগে বললেন, 'থামো, থামো! আর জ্যাঠামি করতে হবে না!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

আবার সেই সুন্দরবন। নির্জন বনভূমির মধ্যে আবার সেই নদীর 'জলতরঙ্গ' বাজনা। সে-যেন নিস্তব্ধতার বীণায় কার মূর্ছা ভাঙাবার অশ্রান্ত সুর।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আজ দেরি করে মুখ দেখাবে। জ্যোৎস্নার যে কুহক স্বপ্ন নিয়ে বিমল ও কুমার গেলবারে ফিরে গিয়েছিল, এবার তারা সেই মাধুর্যের অভাব অনুভব করতে লাগল অত্যন্ত। আকাশে একটিমাত্র চাঁদকে দেখা না গেলে বনবাসী রাত্রির চেহারা যে কীরকম বদলে যায়, যারা তা দেখেনি তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। আকাশে কোটি কোটি তারকার নির্নিমেষ নেত্রে যেটুকু আলোর বোবা ভাষা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে কিছুমাত্র সান্ত্বনার আভাস নেই। বাতাসে বাতাসে কী যেন একটা বুকচাপা স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে। কে যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে আতঙ্কে কাঁদতে পারছে না! অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! পায়ের তলা থেকে নদী সাড়া দিচ্ছে, দু-পাশ থেকে বিরাট অরণ্যের শিউরে ওঠা মর্মর আর্ত রব শোনা যাচ্ছে এবং তার জঠর থেকে ভেসে ভেসে আসছে লক্ষ লক্ষ নিশাচর জীবের জীবনযুদ্ধের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। কারুকেই দেখবার জো নেই, কেবল শব্দ—কেবল শব্দ। অন্ধকারের বিভীষিকা সমস্ত ধ্বনিপ্রতিধ্বনিকে করে তুলেছে ভয়াবহ। যে-দেশে তারা সবাই আজ যাত্রা করেছে, পথের এই অন্ধকারময় বিভীষিকা তারই স্বরূপের আভাস দেবার চেষ্টা করছে।

গভীর আঁধার সাগরে যেন ভেসে চলেছে দুটি ছোটো-বড়ো আলোক দ্বীপ—বিমলদের মোটরবোট ও পুলিশের ইস্টিমার।

বোটের কামরার ভিতরে বসে রামহরি ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছে এবং এখনও আহারের যথেষ্ট বিলম্ব দেখে বাঘা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল পেট্রলের লণ্ঠনের আলোকে কমল একখানা গল্পের বই পড়ছে এবং বিনয়বাবু, বিমল ও কুমার কথাবার্তা কইছে।

বিমল বলছিল, 'না বিনয়বাবু, এই দ্বীপে হিমালয়ের সেই ভয়ঙ্কর দানবেরা এসে যে আস্তনা গেড়েছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। হিমালয়ের ভয়ঙ্করদের কাহিনি যে আমাদের

কল্পনার দুঃস্বপ্ন নয়, বাংলা দেশে এখন এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে আমি খুবই খুশি হয়েছি; কিন্তু সেদিন দ্বীপের উপরে যে দানবমূর্তির আভাসমাত্র দেখেছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও হাত বাড়িয়ে তার মাথার নাগাল পাবে বলে মনে হয় না! সে এক নতুন আর অসম্ভব দানব!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তুমি আভাসমাত্র দেখেছ। তোমার চোখের ভ্রম হতেও তো পারে?'

—'আমাদের চোখের ভ্রম যদি হয়ে থাকে, তাহলেই মঙ্গলের কথা, কারণ ওই দ্বীপে অমন সৃষ্টিছাড়া দানব যদি আরও গোটাকয়েক থাকে, তাহলে এই যাত্রাই আমাদের শেষ যাত্রা হতেও পারে!'

রামহরি প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, 'খোকাবাবু, এই বুড়ো বয়সে ভূতুড়ে রাক্ষসের খোরাক হবার জন্যেই কি তোমরা আমাকে ধরে আনলে?'

কুমার হেসে ফেলে বললে, 'ভয় কী রামহরি, গঙ্গাসাগরে মরলে রাক্ষসের পেটের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে তুমি সোজাসুজি স্বর্গে গিয়ে হাজির হতে পারবে। সকলে তখন মহা পুণ্যবান বলে তোমাকে হিংসা করবে!'

রামহরি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'থামো থামো, আর কথার ফোড়ন দিতে হবে না, ঢের হয়েছে! রাক্ষসের পেটেই যদি হজম হই, তাহলে স্বর্গে যাবে কে?'

কুমার বললে, 'এইবারে রামহরি তুমি নিরেট বোকার মতো কথা কইলে। রাক্ষসের ভুঁড়ি বড়ো জোর তোমার দেহকেই হজম করতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মাকে হজম করে এমন সাধ্য কার আছে? মানুষের দেহ তো স্বর্গে যায় না, স্বর্গে যায় তার আত্মাই!'

রামহরি বললে, 'অমন স্বর্গে যাওয়ার পায়ে আমি গড় করি,—অমন করে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না!'

কমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি ভাবছেন বিমলবাবুদের চোখের ভ্রম হয়েছে। কিন্তু আপনি খবরের কাগজের রিপোর্ট ভুলে যাচ্ছেন কেন? তাতেও তো এখানকার একটা দ্বীপে তালগাছ সমান উঁচু এক দানবের কথা আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কী জানি বাপু, এখানকার ব্যাপারটা আমার মনে কেবল একটা অমঙ্গলের ভাব জাগিয়ে তুলছে! মনে হচ্ছে এদিকে না আসাই যেন উচিত ছিল!'

কুমার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললে, 'এতক্ষণে চাঁদ উঠল। কিন্তু চাঁদের আর জেল্লা নেই।'

বিনয়বাবু একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নেই বা রইল জেল্লা! চাঁদ যে উঠেছে, এই অন্ধ করা অন্ধকারে সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা। এতক্ষণ আমার তো মনে হচ্ছিল চাঁদের বুঝি মৃত্যু হয়েছে, আলো আর ফুটবে না!'

কমল বললে, 'কিন্তু ও চাঁদ যেন অন্ধকারকেই ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছে! গাছের তলায় পড়ন্ত ছায়াগুলোকে দেখে সন্দেহ হয়, ওরা যেন বিরাট দেহ প্রেতমূর্তি, আমাদের ঘাড় ভাঙতে পারলে আর ছেড়ে কথা কইবে না!'

রামহরি কাজ করতে করতে মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে বনজঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সন্দেহ আবার কী, সত্যি কথাই! নিশ্চয় ওখানে ভূত-প্রেত আছে!'

বিমল বললে, 'পৃথিবীর শৈশবে আদিম মানুষরা গিরিগুহার ভিতর থেকে বাইরের আলো-আঁধারিতে চোখের ভ্রমে অমনি সব কত বিভীষিকাই দেখতে পেত। সেই সময় থেকেই ভূত-প্রেতের মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি। সে-ভয় আজও আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হয়েও মানুষ তাই তাকে আর ভুলতে পারে না!'

হঠাৎ বাঘা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে কানদুটো খাড়া করে কী শুনতে লাগল।

বিমলও বাইরের দিকে তাকালে। বোট তীরের একদিক ঘেঁসে যাচ্ছিল—দেখা গেল কেবল খানিক কালো আর খানিক আলো মাখা গাছপালা। সেখানে কোনও জীবজন্তুর সাড়া পর্যন্ত নেই।

আচম্বিতে শোনা গেল—

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘট ঘট!
ঘণ্টা বাজে যমালয়ে, কে যাবি আয় চটপট!'

কুমারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল এবং বাঘাও বোটের ধারে গিয়ে জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করতে লাগল।

বিমল লাফিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় হু হু করে জলস্রোত ছুটে চলেছে, তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

রামহরি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'কোথাও জনপ্রাণী নেই, তবে এমন হেঁড়ে গলার ভয়ানক চেঁচিয়ে কে কথা কইলে খোকাবাবু?'

সত্য-সত্যই সে এমন উচ্চ কণ্ঠস্বর যে, পিছনের ইস্টিমারে পুলিশের লোকেরাও তা শুনতে পেয়েছিল, ইস্টিমারের 'সার্চলাইট' তখনই নদীর বুকের উপরে তীব্রোজ্জ্বল আলোক-সেতুর মতন গিয়ে পড়ল, তারপর সে অরণ্যের বক্ষ ভেদ করেও খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও জ্যান্ত কোনও কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'এ কী ব্যাপার, কুমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

কুমার বললে, 'এ কণ্ঠস্বর গেলবারেও আমরা দ্বীপের কাছে এসে শুনেছি। কিন্তু কে যে কথা কয়, কিছুতেই দেখতে পাইনি!'

কমল বললে, 'মানুষের কথা শুনলুম বটে, কিন্তু এমন বিকট স্বরে কোনও মানুষ কি কথা কইতে পারে?'

বিমল বললে, 'দ্বীপটা এখনও মাইল দশ-বারো দূরে আছে বোধহয়। কিন্তু গেলবারে কেউ তো দ্বীপ থেকে এত দূরে এসে এমন স্বরে কথা কয়নি!'

কুমার বললে, 'তাহলে আমরা যে আবার আসছি, এর মধ্যেই কি দ্বীপে সে খবর পৌঁছে গেছে?'

বিমল জবাব দেবার আগেই অনেক দূর থেকে আবার সেই উৎকট ভৈরব আওয়াজ জেগে উঠল—

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট ঘট ঘট!'

বিমল বললে, 'এ ভালো লক্ষণ নয়। শব্দটা দ্বীপের দিকেই চলে যাচ্ছে।'

রামহরি বলে উঠল, 'রাম রাম রাম রাম! অনেক ভূতের কথা শুনেছি, কিন্তু শব্দ-ভূতের কথা তো কখনও শুনিনি!'

বিমল বললে, 'কুমার, বাঘার গলায় শিকল দাও! ও পাগলের মতো হয়ে উঠেছে—জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওর পশু-চোখ বোধহয় জলের ভিতরেই কোনও বিপদকে আবিষ্কার করেছে!'

বিমল টর্চ নিয়ে আবার নদীর ভিতরটা দেখতে লাগল—ঝাপসা চাঁদের আলো আর আবছায়া নিয়ে লোফালুফি করতে করতে ও পাক খেতে খেতে প্রবল জলের স্রোত ছুটছে এবং চিৎকার করে যেন নিকটস্থ সমুদ্রকে ডাকের পর ডাক দিচ্ছে। জলচর কুমির ও হাঙর ছাড়া সেখানে কোনও মানুষের পক্ষে এতক্ষণ ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব।

ইস্টিমার থেকে 'মেগাফোনে' মুখ দিয়ে ইনস্পেকটার জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে কোনও লোক ভয়ানক চেঁচিয়ে কথা কয়েছে। আপনারা কেউ দেখতে পেয়েছেন?'

বিমল বললে, 'না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমার মতে আজ রাতে দ্বীপের কাছে না যাওয়াই ভালো, আজ এইখানেই নোঙর ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক, কাল সকালে আলোয় আলোয় দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হব।'

বিমল বললে, 'আমারও সেই মত।'

পরদিন পূর্ব আকাশে প্রভাত এসে যখন রঙিন আলোর লাইন টানছিল, বিনয়বাবু তখন বোটের ভিতর থেকে বাইরে এসে বসলেন।

কাল সারারাত তাঁর অশান্তিতে কেটেছে, একবারও ঘুম আসেনি, কারণ জলধারার একটানা ঐকতানের মাঝে মাঝে সেই অমানুষিক মানুষের চিৎকার আরও কয়েকবার জেগে উঠেছে—অনেক দূর থেকে।

কার এই কণ্ঠস্বর? এ যদি কোনও দানবের কণ্ঠস্বর হয় তাহলে কোথায় সে? দানবের আকার যদি আশ্চর্যরকম প্রকাণ্ড হয় তবে তাকে তো আরও সহজেই দেখতে পাবার কথা! আর, এই গভীর নদীর গর্ভে কোনও নরদেহী দানবের এতক্ষণ ধরে থাকবার ঠাঁই-ই বা কোথায়?

এইসব উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়েই বিনয়বাবুর রাত কেটে গেছে, এখন ভোরের আলো দেখে বাইরে এসে বসে তিনি অনেকটা আরাম বোধ করলেন। রামহরি তাঁর আগেই উঠে তখন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে—'স্টোভে' চায়ের জল গরম হচ্ছে এবং আর একটা 'স্টোভ' জ্বালিয়ে 'অমলেট' ভাজবার উদ্যোগ চলছে। রামহরি সকলকে রেঁধে খাওয়াতে ভারী ভালোবাসত, বিষম সব বিপদ-আপদের মাঝখানেও এ বিভাগের কর্তব্য পালনের জন্যে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করত। তাই পৃথিবীর ভিতরে ও বাইরে অনেক সৃষ্টিছাড়া দেশে গিয়েও বিমল ও কুমার প্রভৃতিকে কখনও কোনও কষ্ট-বোধ করতে হয়নি।

রাত্রের বিভীষিকা রোদের সোনার জলের ধারায় কুয়াশার মতোই ধুয়ে মুছে গিয়েছে, নদীর কলধ্বনি শুনে মনে হচ্ছে যেন ছোটো শিশুর খুশিভরা হাসির শব্দ। দূরে বনে বনে

গায়ক পাখির দলও জেগে উঠে চারিদিক সরগরম করে তুলেছে এবং বাতাসের উচ্ছ্বাসে ভেসে আসছে যেন কোনও চন্দনস্নিগ্ধ পুলকস্পর্শ।

বিমল, কুমার ও কমল বাইরে এসে বসতে না বসতেই রামহরি সকলের সামনে চায়ের পিয়ালা এবং 'প্লেটে' করে গরম 'টোস্ট' ও 'অমলেট' সাজিয়ে দিয়ে গেল।

বাঘাও যথাসময়ে অত্যন্ত সভ্য-ভব্যের মতো সকলের মাঝখানে এসে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রামহরির গতিবিধি লক্ষ করছিল। তার জন্যেও এল কতকগুলো কুকুর-বিস্কুট।

বিমল আগে বোট ও ইস্টিমার চালাবার হুকুম দিলে, তারপর এক 'স্লাইস' রুটি তুলে নিয়ে বললে, 'বিনয়বাবু, আর ঘণ্টা দুয়েক পরেই আমরা সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তারপর?'

—'তারপর আমরা একেবারে তীরে গিয়ে নামব।'

—'যদি কেউ বাধা দেয়?'

—'ইস্টিমারে মিলিটারি পুলিশ আছে—এমনকি একটা 'মেশিনগান'ও আছে। যদি সত্যই সেখানে কোনও বিপজ্জনক অতিকায় বিড়াল, কুকুর, বাঘ ও দানব থাকে, তাহলে তাদের মেজাজ ঠান্ডা করবার জন্যে আমরা কোনও আয়োজনেই ত্রুটি করিনি।'

—'কিন্তু এইসব অদ্ভুত জীবের সঙ্গে সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধের সম্পর্ক কী, সেটা তো আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না! লোকালয়ের বাইরে এমন বিজন জায়গায় নির্বাসিতের মতো বসে দানব-জীবদের নিয়ে তিনি কী করেন? দানবের ভয় তার যখন নেই তখন এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, দানবরাও তাঁর উপরে কোনও অত্যাচার করে না।'

কুমার বললে, 'আরও একটা মস্ত জানবার কথা হচ্ছে, সামান্য এক তুচ্ছ অজানা দ্বীপের বিড়াল আর কুকুর কেমন করে বাঘ আর হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠল?'

বিনয়বাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু, এসব কি সত্যি?'

বিমল বললে, 'কুকুরটাকে আমি দেখিনি বটে, কিন্তু বাঘের মতো বড়ো একটা বিড়ালকে আমি নিজেই যে গুলি করে মেরেছি সে কথা তো আপনি শুনেছেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! আর তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, যেখানেই আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানেই তোমরা? আমাদের এই নিত্য দেখা একঘেয়ে পৃথিবীটাকে তোমরা ক্রমেই অসাধারণ আর বিচিত্র করে তুলছ!'

বোট ও ইস্টিমার তখন ছুটে চলেছে পুরোদমে—কেবল একদিকেই নদীর বনশ্যামল তটরেখা দেখা যাচ্ছে, অন্য তীর হারিয়ে গেছে প্রায় অসীমতার মধ্যেই।

হঠাৎ কুমার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দূরে ওই সেই দ্বীপ দেখা যাচ্ছে!'

আর সকলেও সাগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠল। দূরে একটা গাছপালা ভরা ভূমি জেগে উঠেছে বটে।

বিমল খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'হ্যাঁ, কুমারের চোখ ঠিক দেখেছে।'

ধীরে ধীরে দ্বীপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বাহির থেকে সে দ্বীপের মধ্যে কোনও নতুনত্বই আবিষ্কার করা গেল না—প্রবল হাওয়ায় গাছাপালা দুলছে এবং নদীর

জলে ঝিলমিল করছে তাদের ছায়া। কালকের রাতের সেই অমানুষিক কণ্ঠস্বর আজ আর কারুকে ভয়াবহ অভ্যর্থনা করলে না এবং বনজঙ্গলের উপরে তালগাছ সমান উঁচু দেহ নিয়ে কোনও বিরাট দানবও আবির্ভূত হল না।

বিনয়বাবু একটা দূরবিনের সাহায্যে দ্বীপটা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তিনি চমকে উঠে দূরবীক্ষণটা বিমলের হাতে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'দ্যাখো বিমল, দ্যাখো!'

দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে বিমল দেখলে, দ্বীপের একটা উঁচু জমির উপরে একটি লোক পাথরে তৈরি মূর্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন সে ইস্টিমারের দিকেই তাকিয়ে আছে নিষ্পলক নেত্রে। আজকেও তার ধবধবে সাদা লম্বা চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লট পট করে হু হু বাতাসে উড়ছে।

দূরবিনটা নামিয়ে বিমল বললে, 'ওই সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ! এখানে যত রহস্যের সৃষ্টি বোধহয় ওই লোকটির জন্যেই! .....যাক, সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে আর বেশি বিলম্ব নেই!'

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

উড়ো বোট

দ্বীপ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

গেলবারে রাত-আঁধারে আর নানারকম অস্বাভাবিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিভীষিকার জন্যে এই অজানা দ্বীপটাকে যেমন রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল, আজ তাকে দেখে বিমল ও কুমারের মনে তেমন কোনও ভাবেরই উদয় হল না।

নীল আকাশের ছায়া দোলানো, নদীর গান জাগানো চপল জলের কোলে আজ এই সূর্যকরের আলো-আদর মাখা সবুজ সুন্দর দ্বীপটিকে মনে হতে লাগল ঠিক যেন কোনও ভোরের স্বপ্নে দেখা পরিস্থানের মতো।

গায়ক-পাখিরা গাছের এ ডালে বসে খানিক নেচে আবার ও ডালে উড়ে গিয়ে বসে নাচে গানে মেতে উঠছে, ছবিতে আঁকা শকুন্তলার তপোবনের হরিণের মতো দুটি ছোটো ছোটো হরিণ এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে একান্ত নির্ভয়ে এবং দ্বীপের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দলে দলে বকেরা আকাশের দোলন্ত বেলের গোড়ের মতো।

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কী চমৎকার দ্বীপটা! যেন মুনি-ঋষির সাধনকুঞ্জ! এখানে ভয়ানক কিছু দেখবার আশাই করা যায় না!'

বিমল বললে, 'দিনের আলো বড়ো কপট, ভয়াবহকে অনেক সময়ে সুন্দর করে দেখায়।'

কুমার বললে, 'বাইরের খোলস অনেক সময়ে চোখে ধাঁধা দেয়। সুন্দর মৌমাছিকে দেখলে কে বলবে যে তার ভিতরে বিষাক্ত হুল আছে!'

এমন সময়ে ইস্টিমার থেকে 'মেগাফোনে', ইনস্পেকটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ইস্টিমার আর এগুতে পারবে না, এখানে জল বেশি নেই।'

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'বেশ, আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই, এইখানেই নোঙর ফেলা যাক।'

দ্বীপ সেখান থেকে একশো হাতের ভিতরেই।

কমল বললে, 'ওই ভদ্রলোক কিন্তু এখনও সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন!'

কুমার বললে, 'বোধহয় আমরা কী করি তাই দেখছেন।'

বিমল বললে, 'কিংবা কী করে আমাদের তাড়ানো যায় তাই ভাবছেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু ওকে দেখলে তো আমার চেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হয় না!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, দিনের বেলায় উনি এই দ্বীপের মতোই নিরীহ। কিন্তু রাত্রে বিপরীত মূর্তি ধারণ করেন। .....এইবার দ্বীপে নামবার ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন? ইস্টিমারের সঙ্গে দু-খানা বোট আছে, তাতে সিপাইরা আর ইনস্পেকটার থাকবেন। আমরা মোটরবোটেই যাব।'

...সবাই যখন দ্বীপের উপরে গিয়ে উঠল, দুপুরের রোদ তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল—অধিকাংশ ঝোপঝাপের ভিতরে পর্যন্ত নজর চলে।

দ্বীপের মধ্যে কোনওরকম নতুনত্ব নেই—চারিদিকে গাছপালা জঙ্গল ঝোপঝাপ, মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা পথ, মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো মাঠ।

বিমল বললে, 'ইনস্পেকটারবাবু, আপনার সেপাইদের বন্দুক তৈরি রাখতে বলুন।'

ইনস্পেকটারবাবু হেসে বললেন, 'যত সব গাঁজাখোরের কথা শুনে আমরা এসেছি বটে, কিন্তু এখানে তো ভয় পাবার কিছুই দেখছি না। কোথায় মশাই আপনাদের কুম্ভকর্ণ? এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'হতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা তার টিকিটিও আবিষ্কার করতে পারব না।'

—'তাহলে এখানে এত তোড়জোড় করে এসে কী লাভ হল?'

—'আমরা এসেছি জনরব সত্য কি না জানবার জন্যে। জনরব যদি মিথ্যে হয়, তবে ফিরে গিয়ে সেই রিপোর্টই দেবেন।'

'জনরব কী মশাই? কুম্ভকর্ণকে তো আপনারাও দেখেছেন বললেন। তারপর হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা, বাঘের মতো বড়ো বিড়াল, কত আজগুবি গল্পই যে শুনলুম!'

—'কাল রাতে নদীর মাঝখানে যে অমানুষিক কণ্ঠস্বর আপনারা শুনেছেন সেটাও তো আমাদের বানানো নয়?'

ইনস্পেকটার একটু যেন শিউরে উঠলেন এবং আর কোনও কথা বললেন না।

যে-পথ ধরে সবাই চলেছে, হঠাৎ তার মোড় ফিরেই দেখা গেল, সামনের একখানা বাংলোর মতো ছোটো একতলা মেটে বাড়ি, উপরে পাতার ছাউনি।

বারান্দায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক।

সকলে যখন বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, বুড়ো ভদ্রলোকটি দুই পা এগিয়ে এলেন। একবার সকলের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্ত হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'এত সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে আপনারা কোন রাজ্য জয় করতে যাচ্ছেন?'

বিমল এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমরা দিগ্বিজয়ে বেরুইনি। খালি এই দ্বীপটা খুঁজতে এসেছি।'

—'কেন?'

—'এখানে এমন কিছু দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।'

—'বলেন কী মশাই? আমি এখানে বাস করি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই তো দেখিনি!'

এমন সময়ে ইনস্পেকটার তাঁর সমুখে গিয়ে বললেন, 'আপনার নাম কী?'

—'ধরণীকুমার মজুমদার।'

—'এই নির্জন দ্বীপে আপনি কী করেন?'

—'আমি সন্ন্যাসী নই বটে, কিন্তু সংসার ত্যাগ করেছি। এখানে বসে পরকালের চিন্তা করি।'

—'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

—'একজন পুরানো চাকর।'

—'কোথায় সে?'

ধরণী মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'হরিদাস!'

ঘরের ভিতর থেকে আর একটি অতিশয় নিরীহের মতো দেখতে প্রাচীন লোক বেরিয়ে এল।

ইনস্পেকটার তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললেন, 'ধরণীবাবু, আপনার বাড়ির ভিতরটা আমরা একবার দেখব।'

—'স্বচ্ছন্দে।'

কিন্তু সেখানেও নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল না। আসবাবপত্তর খুবই কম।

বিমল শুধোলে, 'আপনার একখানা মোটরবোট আছে না?'

ধরণী বললেন, 'আছে। দেখতে চান তো ওইদিকে নদীর ধারে গেলেই দেখতে পারেন।'

বিমল বললে, 'না। আজ অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। কাল আমরা সারা দ্বীপটা একবার ভালো করে ঘুরে দেখব, আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

—'নিশ্চয়ই করব! কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখছি, এখানে বনজঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই।'

বিমল তাঁর কাছে গিয়ে খুব চুপিচুপি শুধোলে, 'বনজঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দু-একটা হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা আর বাঘের মতো বড়ো বেড়ালও খুঁজে পাওয়া যাবে না?'

ধরণী যেন কিছুতেই বুঝতে না পেরে বিমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

—'আর তালগাছ সমান উঁচু মানুষ?'

—'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?' বলেই ধরণী হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। সে অট্টাহাস্য বিমল ও কুমার আগেই শুনেছিল—গেলবারে দ্বীপের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময়ে।

কমল সেদিন রামহরিকে ধরে বসেছিল, তাকে একটা নতুন রান্না খাওয়াতে হবে!

রামহরি যত বলে, 'সুমুদ্দুরের জলে ডোঙায় বসে কি নতুন রান্না খাওয়ানো চলে ভাই?'

—কমল ততই বলে, 'পাকা রাঁধিয়ে আকাশে উড়েও হাতের বাহাদুরি দেখাতে পারে! রামহরি, তুমি তাহলে কোনও কর্মের নও!'

তার রন্ধন নিপুণতার উপরে কেউ কৌতুক ছলে ঠাট্টা করলেও রামহরি সহ্য করতে পারত না। অতএব সবাই যখন গিয়েছিল দ্বীপে বেড়াতে, রামহরি তখন ছিল নৌকোয় বসে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

এবং আজ রাত্রে সে যে নতুন রান্না করল ও আর সবাইকে খাওয়ালে, তার নাম রেখেছিল 'মুখবন্ধ'।

রান্নাটি কমলের এতই ভালো লেগেছিল যে মনের ভাব আর প্রয়োগ করতে পারলে না।

বিনয়বাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে শেষটা বললেন, 'এটা কোন দেশি রান্না বিমল?'

বিমল বললে, 'তা আমি জানি না। তবে লিখিত মতে একে 'মাছের রোস্ট' বলেও ডাকা যায়।'

আহারাদির পর যখন শয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন কুমার বললে, 'দ্বীপটা স্বচক্ষে দেখে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছি। মনে হচ্ছে আমাদের খালি গাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!'

বিমল বললে, 'আমি কিন্তু এখনও হতাশ হইনি। আমি কালকের জন্যে অপেক্ষা করছি। হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারব।'

বিনয়বাবু সারাদিন দ্বীপের কথা নিয়ে কোনও মত প্রকাশ করেননি। এখন তিনি হঠাৎ সবাইকে বিস্মিত করে বললেন, 'দ্বীপে গিয়ে আমি কিন্তু একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছি।'

কুমার বললে, 'আপনি! কী আবিষ্কার?'

—'ধরণীবাবুর বাংলোর পিছনে আছে একটা জলাভূমির মতো জায়গা। সেখানে ভিজে মাটির উপরে আমি এমন কতকগুলো পায়ের দাগ দেখেছি, যা মানুষের পায়ের দাগের মতোই, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে বারো-তেরো গুণ বেশি বড়ো।'

কমল সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু আপনি এতক্ষণ তো এ কথা বলেননি!'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু বলেননি, আমিও বলিনি। সে-পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি।' —বলেই সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং বিনয়বাবুও তার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করলেন।

কুমার ও কমল একবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারপর যে-যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই সকলকার কানে অদ্ভুত স্বর জেগে উঠল :

'ঘোঁ ঘট ঘট,
ঘোঁ ঘট ঘট!
ঘোঁ ঘট ঘট,

চল রে চল,
চট পট চল
দি চম্পট!'

সকলেই সচমকে ধড়মড় করে আবার উঠে বসল। গতকল্য গভীর রাত্রে নদীর বক্ষে এই অমানুষিক কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল।

সকলেই বোটের ধারে ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়ালে। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, কিছুই দেখা গেল না এবং কিছুই দেখবার উপায় নেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমরা মঙ্গলগ্রহেও গিয়েছি, কিন্তু সেখানেও এমন আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনিনি!'

বিমল টর্চের কল টিপে আলো জ্বেলে বললে, 'নদীর জল এক জায়গায় খুব তোলপাড় হচ্ছে,—যেন কেউ ওখানে বিরাট দেহ নিয়ে সবে ডুবে দিয়েছে। কিন্তু আর কিছুই দেখা যায় না।'

এমন সময়ে খানিক তফাতে উপর থেকে আবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'কিচির-মিচির কিচির-মিচির
কচ মচ মচ কচ মচ মচ!
বুকের কাছে করছে কেমন
খচ মচ খচ খচ মচ মচ!
মানুষ-ভূতে কালকে পাবে,
কলকাতা কি শালকে যাবে,
কাটবে মগজ চালিয়ে ছুরি
কচু কাটা কচ কচ কচ!'

টর্চের আলো শূন্যের অন্ধকার ফুঁড়ে খুঁজে পেলে খালি শূন্যতাই।

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'বিংশ শতাব্দীতেও তাহলে দৈববাণী হয়?'

কুমার একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, 'কিন্তু এ দৈববাণীর জন্ম বোধহয় গাছগুলোর ভিতরে থেকেই।'

সকলে দেখলে, নদীর জলের উপরে ঘন শাখাপল্লব নিয়ে একটা মস্তবড়ো গাছ ঝুঁকে পড়েছে এবং তারই ডালপালাগুলো সশব্দে দুলে দুলে উঠছে—যেন তার ভিতরে কোনও জীব লুকিয়ে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করছে।

রামহরি বন্দুক নিয়ে বললে, 'খোকাবাবু, আন্দাজে আন্দাজে একটা গুলি ছুড়ব নাকি?'

বিমল বললে, 'না রামহরি, কেউ তো এখনও আমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেনি! আমরাই বা আগে থাকতে অস্ত্র ব্যবহার করব কেন?'

এমন সময়েই ইস্টিমারের 'সার্চলাইট' অন্ধকারের উপর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলের তোলপাড় শব্দ এবং গাছের ডালপালার মড়মড়ানি একেবারে থেমে গেল।

কুমার বললে, 'এখানে যেসব কবি কবিতা শোনায়, তারা সশরীরে দেখা দিতে রাজি নয় দেখছি!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু কে ওরা? আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, না সাবধান করে দিচ্ছে?'

ইস্টিমার থেকে চেঁচিয়ে ইনস্পেকটার বললেন, 'এসব কী কাণ্ড মশাই!'

বিমল বললে, 'যা শুনছেন আর দেখছেন, তা কি গাঁজাখোরের কল্পনা বলে মনে হচ্ছে?'

—'কিন্তু কেউ বোধহয় ভয় দেখাবার জন্যে আমাদের ঠাট্টা করছে! এটা তো আর সত্যযুগ নয় যে, জল আর গাছ কথা কইবে!'

—'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাট্টা করছে কে?'

—'নিশ্চয় সেই বুড়ো জাদুকরটা! আমি কালই ধরণীকে গ্রেপ্তার করব!'

—'কী অপরাধে? সে তো এখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট করেনি!'

—'সরকারি লোকেদের ভয় দেখানোর মজাটা তাকে টের পাইয়ে দেব!'

দ্বীপের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে কে ভীষণ অট্টহাসি হেসে উঠল। এ সেই হাসি,—যে হাসি সবাই আজই ধরণীর কণ্ঠে শুনে এসেছে, কিন্তু এখন তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র ও ভীতিপ্রদ।

ইনস্পেকটার খাপ্পা হয়ে বললেন, 'সেপাই, সেপাই! সবাই বন্দুক নাও! বোট ভাসাও! আজই আমি বুড়োকে গ্রেপ্তার করব!'

বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, আজ আর গোলমালে কাজ নেই। আজ খালি দেখুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। নইলে সব পণ্ড হবে।'

অট্টাহাসি থামল না,—কিন্তু ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'ধরণী পাগল নয় তো?'

অনেক দূর থেকে যথাক্রমে নদীর জলে ও গাছের উপরে উঠছে সেই আশ্চর্য ঘোঁ ঘট ঘট ও কিচির-মিচির শব্দ।

কুমার বললে, 'ওই হাসি আর শব্দ দুটো যখন একসঙ্গে হচ্ছে, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে তিনটে আলাদা আলাদা জীব আছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে এই তৃতীয় জীবটি কে? দ্বীপে গিয়ে আমরা তো কেবল ধরণী আর তার চাকর হরিদাসের দেখা পেয়েছি।'

বিমল ভাবতে ভাবতে বললে, 'কুমার তুমি ঠিক ধরেছ। হ্যাঁ বিনয়বাবু, এই তৃতীয় জীবটি কে, এখন সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ক্রমে সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেল, নির্জনতা সজাগ হয়ে উঠল এবং রাত্রির অন্ধ স্তব্ধতাকে সংগীতময় করে তুলতে লাগল সাগরসঙ্গমে উচ্ছ্বসিত নদীর কলধ্বনি। ...সে অশ্রান্ত ধ্বনি যেন সুদূর অসীমের স্মৃতিকে কানের কাছে ডেকে আনে। সে-ধ্বনি যেন নিকটের যা-কিছুকে সুদূর অসীমতায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বিমল বাঘাকে বোটের বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যা বাঘা, বাইরে যা। আমরা এখন একটু ঘুমোব, তুই পাহারা দে।'

বাঘা যেন বিমলের কথা বুঝতে পারলে। সে বোটের ধারে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল।

বোটের তলায় নদীর করাঘাতের শব্দ শুনতে শুনতে সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল।

এমনকি শেষটা বাঘার চোখেও ঢুল এল।

গভীরা নিশীথিনীর কালো শাড়ির আঁচল সরিয়ে বেরিয়ে এল যেন রুগ্ন চাঁদের অত্যন্ত হলদে মুখ। তাকে এই বিজনতার মধ্যে দেখলে ভয় হয়, চিতার পাশে খাটে শোয়ানো মড়ার মুখ মনে পড়ে যায়।...

আচম্বিতে বাঘা ভয়ানক জোরে চেঁচিয়ে উঠল এবং কমল জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কমলের মনে হল, সে বোটের ভিতরে আছে বটে, কিন্তু বোট যেন আর নদী গর্ভে নেই! কী অদ্ভুত অনুভূতি!

হঠাৎ বাঘা ভয় পেয়ে বোটের উপর থেকে লাফ মারলে। অনেক উঁচু থেকে জলে লাফিয়ে পড়লে যে-রকম শব্দ হয়, সেই রকম একটা শব্দ হল।

ইতিমধ্যে আর সকলেও জেগে উঠল। তাদেরও মনে হল তারাও যেন কারুর মাথার উপরে ঝাঁকার ভিতরে মোরগের পালের মতো বসে রয়েছে।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে মুখ বাড়িয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে বিস্মিত চোখে দেখলে, তারা দ্বীপের গাছের সারের চেয়েও আরও উপরে উঠেছে এবং অনেক নীচে আলো-আঁধারির মধ্যে চিক চিক করছে নদীর জল।

একটা নিশ্বাস ফেলে, কঠিন হাস্য করে বিমল বললে, 'বোধহয় সেই কুম্ভকর্ণই বোটসুদ্ধ আমাদের মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে!'

সেই রুগ্ন চাঁদের হলদে মুখ। মিটমিটে আলোতে পৃথিবীর কিছুই ভালো করে নজরে পড়ে না। বিমল বোটের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। বোটের তলায় রয়েছে কেবলই অন্ধকার—কষ্টিপাথরের মতো কালো আর নিরেট।

বোটের ভিতরে আর সবাই তখন নির্বাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছে, বোধহয় তাদের মাথার ভিতরে তখনও বিমলের সেই অসম্ভব কথাগুলোই বারংবার ঘোরাফেরা করছে—'সেই কুম্ভকর্ণই বোটসুদ্ধ আমাদের মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে!'

বোটের নীচের দিকটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বিমল আবার বললে, 'না, আর কোনও সন্দেহ নেই। কুম্ভকর্ণই আজ ঝাঁকামুটে হয়েছে! তার ঝাঁকা হয়েছে এই বোট, আর বোটের মধ্যে আছি আমরা!'

বিনয়বাবুর মুখে অস্ফুট স্বর শোনা গেল—'অসম্ভব!'

বিমল শুকনো হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ অসম্ভবই বটে, কিন্তু অসম্ভবের দেশে অসম্ভবও সম্ভব হয়! জলে সাঁতার কাটা যার একমাত্র কর্তব্য, সেই বোট পাখিও নয় এরোপ্লেনও নয় যে শূন্য দিয়ে উড়ে যাবে। বিনয়বাবু, চেয়ে দেখুন—নদীর জল এখন কত দূরে!'

সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, নদীর জলে আলোর ঝিকিমিকি বহু দূরে সরে গিয়েছে এবং ক্রমে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। জলতরঙ্গের কলকল্লোলও আর শোনা যায় না।

বিমল বললে, 'আমাদের মাথায় নিয়ে কালাপাহাড় এখন জমির উপর দিয়ে হাঁটছে।'

বিনয়বাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছে সে!'

—'এর উত্তর সেই-ই জানে। কলকাতায় ঝাঁকায় চড়ে রামপাখিরা আসে আমাদের জন্যে। এখানে ঝাঁকায় চড়ে আমরা যাচ্ছি হয়তো ধরণীর বাসায়!'

এতক্ষণে রামহরির হুঁশ হল। সে হাউমাউ করে বলে উঠল, 'ও খোকাবাবু! ওই ধরণী কি পিচাশ? আমাদের কেটে খানা খাবে নাকি?'

কুমার বলে উঠল, 'বন্দুক নাও বিমল! বোটের তলার দিকে গুলি বৃষ্টি করো!'

বোটের তলায় কে আছে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যে-জীবই থাকুক, সে যে কুমারের কথা শুনতে পেলে ও বুঝতে পারলে, তৎক্ষণাৎ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ কুমারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বোটখানা ধরে সে এমন ঘন ঘন বিষম ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে সকলেই তার ভিতরে চারিদিকে ছিটকে পড়ল। সে ভয়ানক ঝাঁকুনি আর থামে না—সকলেরই অবস্থা হল কুলোর মধ্যে ফুটকড়াইয়ের মতো, গতর গুঁড়ো হয়ে যাবার জোগাড় আর কী! ঝাঁকুনি যখন থামল, বোটের ভিতরে সবাই তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

* * *

একে একে যখন তাদের আবার জ্ঞান হল, তখন রাত কি দিন প্রথমে তা বোঝা গেল না। চারিদিকে না আলো না অন্ধকার,—সন্ধ্যার মুখেই পৃথিবীকে দেখতে হয় এইরকম আবছা মায়া মাখা রহস্যময়।

সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা দরজার মতো, বিমলের চোখ সেই ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল—কিন্তু সেখানেও আলো খুব স্পষ্ট নয়।

বিমল ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না। তার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কুমার বললে, 'বন্ধু, আমরা বন্দি!'

বিমল বললে, 'হুঁ! কিন্তু কার বন্দি—ধরণীর না কুম্ভকর্ণের?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বোধহয় ধরণীর। বিমল, ভালো করে তাকালেই বুঝতে পারবে, আমরা একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে আছি। এর দরজাটা সাধারণ মানুষ ঢোকবারই উপযোগী, এর ভিতর দিয়ে তোমাদের ওই কুম্ভকর্ণ কিছুতেই দেহ গলাতে পারবে না। সুতরাং যে আমাদের এ ঘরে এনে রেখেছে তার দেহ তোমার আমার চেয়ে বড়ো হতে পারে না।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা কোথায় আছি? বাহির থেকে গাছপালার আওয়াজ আসছে—একটা কাকও কা কা করছে। মনে হচ্ছে এখন দিনের বেলা। কিন্তু আলো এত কম কেন?'

কমল বললে, 'বাইরে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে আলো আসছে যেন উপর থেকেই। আমরা বোধহয় কোনও উঠানওয়ালা বাড়ির একতলার ঘরে বন্দি হয়ে আছি।'

বিমল বললে, 'কিন্তু দ্বীপে এমন কোনও উঁচু বাড়ি থাকলে কালকেই আমাদের নজরে পড়ত। ...বিনয়বাবু, আমরা বোধহয় জমির নীচে কোনও পাতালপুরীতে বন্দি হয়েছি!'

হঠাৎ রামহরি আর্ত স্বরে বলে উঠল, 'ওই। আবার সেই শব্দ-ভূত!'

সকলে কান পেতে শুনলে, বাইরে আবার কোথায় সেই পরিচিত কিচির-মিচির কিচির-

মিচির শব্দ হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ডাল-পাতা নড়ে ওঠারও শব্দ; কে যেন গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করছে।

তারপরেই সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'নেইকো হেথায় রম্ভা-টম্ভা
আছে অষ্টরম্ভা
লম্বা লম্বা লম্ফ মেরে
জলদি দে রে লম্বা।
হুমড়োমুখো ধুমড়ো বিড়াল,
আকাশমুখো দৈত্য,
দেখলে তাদের চিত্ত কাঁপায়
হিমালয়ের শৈত্য।
মুখ বাড়িয়ে কুত্তা ধরে
বটের ডালের পক্ষী,
পালাও ভায়া! কেমন করে
সইবে এসব ঝক্কি।'

বিমল অভিভূত স্বরে বললে, 'সেই কণ্ঠস্বর! আবার আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে।'

কুমার বললে, 'অতিকায় বিড়াল, কুকুর, দৈত্য—সকলকার কথাই ও বলছে। কে ও, বিমল? অমন করে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে কেন, বিপদের আগেই সাবধান করে দেয় কেন, আর কবিতাতেই বা কথা কয় কেন?'

বিমল বললে, 'আর একটা কণ্ঠস্বরও আমরা শুনেছি—নদীর জলে সেই ভীষণ অমানুষিক কণ্ঠস্বর। এখানে জল নেই বলেই বোধহয় সেই গলার আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'চুপ চুপ, ওই শোনো।'

আবার শব্দ হতে লাগল—কিচির-মিচির। আবার গাছের ডালে ডালে লাফালাফির শব্দ। কিচির-মিচির শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর শোনা গেল, অত্যন্ত দুঃখে যাতনায় যেন ভেঙে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে কে বলছে—

'অনেক দিনের রূপকথা ভাই,
বহুকালের গল্প—
ছিলাম যেন মাটির মানুষ,
সুখ ছিল না অল্প!
রাঙা রাঙা খোকা-খুকি
খেলত আমার বক্ষে,
টুকটুকে মোর বউটি সদাই
হাসত মুখে চক্ষে!

আজ অদৃষ্ট শক্ত করে
আমার যখন বাঁধছে—
হায় রে তারা কোথায় বসে
আমার তরেই কাঁদছে!'

হঠাৎ একটা নতুন কণ্ঠে উচ্চস্বরে শোনা গেল, 'হা হা হা হা! কী হে কবি, এখনও কবিতা ভোলোনি? হা হা হা হা!' এ ধরণীর হাসি।

কবিতা আর শোনা গেল না ...খালি গাছের ডাল-পাতার শব্দ হল। তারপরেই আর এক শব্দ। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। বিমল ও কুমার পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। দরজার কাছটা অন্ধকার করে একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল—ধরণী।

খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধরণী ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর সহাস্যে বললে, 'এই যে বন্ধুগণ! ধরণীর শ্রেষ্ঠশয্যা ভূমিশয্যায় শুয়ে আছ, আশা করি বিশেষ কোনও কষ্ট হচ্ছে না?' কেউ কোনও জবাব দিলে না। ধরণী তেমনি হাসতে হাসতে বললে, 'হাতির মতো বড়ো ডালকুত্তা দেখতে চেয়েছিলে, শীঘ্রই তাকে দেখতে পাবে। আর বাঘের মতো বড়ো বিড়ালকে তো তোমরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছ। আর তালগাছের মতন উঁচু মানুষকে কাল অন্ধকারে তোমরা ভালো করে দেখতে পাওনি—নয়?'

বিমল বললে, 'কে সে?'

ধরণী বললে, 'দেখছি এখনও তোমার কৌতূহল দূর হয়নি। সে কে জানো? আমার চাকর হরিদাসকে কাল দেখেছ তো? সে তার ছোটোভাই রামদাস—তোমরা যার নাম রেখেছ কুম্ভকর্ণ।'

বিমল সবিস্ময়ে থেমে থেমে বললে, 'হরিদাসের ছোটোভাই রামদাস?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুম্ভকর্ণ নয়, আর কেউ নয়, হরিদাসের ছোটোভাই রামদাস। ভাবছ, কেমন করে রামদাস এত বড়ো হল? হা হা হা হা!'—তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর স্বরে ধরণী বললে, 'কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করবার জন্যে এখানে এসেছ? মূর্খ মানুষদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমি এত দূরে পৃথিবীর একপ্রান্তে এসে অজ্ঞাতবাস করছি, কিন্তু এখানেও তোমাদের মূর্খতা আর অন্যায় কৌতূহল থেকে মুক্তি নেই? যতসব তুচ্ছ জীব, কতটুকু শক্তি তোমাদের, এসেছ আমার সাধনায় বাধা দিতে? জানো, আমি একটা আঙুল নাড়লে তোমরা এখনই ধুলোয় মিশিয়ে যাবে?'—ধরণী জ্বলন্ত চক্ষে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল অতিশয় উত্তেজিতভাবে।

বিনয়বাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ধরণীবাবু, আমাদের আপনার শত্রু বলেই বা ধরে নিচ্ছেন কেন? আমরা তো আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি শুধু এখানকার অদ্ভুত ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখবার জন্যে।'

ধরণী আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে আরও বেশি চেঁচিয়ে বললে, 'দেখবার জন্যে, না মরবার জন্যে? তোমরা আমার বিড়ালকে হত্যা করেছ, তোমাদের আমি ক্ষমা করব না!'

বিমল বললে, 'আপনার বিড়ালকে মেরেছি একলা আমি। আমার অপরাধে ওঁরা কেন শাস্তি পাবেন? ওঁদের ছেড়ে দিন।'

—'ছেড়ে দেব? হা হা হা হা! ছেড়ে দেবই বটে! ওদের ছেড়ে দি, আর ওরা দেশে গিয়ে সারা পৃথিবীর লোককে নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসুক! সবাই আমরা গুপ্তকথা জানুক! জানো বাপু, যে আমার গুপ্তকথা জেনেছে তার আর মুক্তি নেই!'

—'আপনার কী গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?'

—'কিছু কিছু জানতে পেরেছ বই কি। আসল কথা এখনও জানতে পারোনি বটে, তবে তোমাদের কাছে তা বলতে এখন আমার আর আপত্তিও নেই। তোমরা তো আর দেশে ফিরে যাবে না!'

ঘরের কোণে একটা টুল ছিল, ধরণী তার উপরে গিয়ে বসল। তারপর বলতে লাগল, 'এই নির্জনে একলা বসে আমি সাধনা করি। কী সাধনা করি জানো? পুরাতন পৃথিবীকে নতুন রূপ, নতুন শক্তি দেবার সাধনা। মানুষ বড়ো ছোট্ট, বড়ো দুর্বল জীব। তার মস্তিষ্ক অন্য সব জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেহ হিসেবে তার চেয়ে বৃহৎ আর বলবান প্রাণী আছে অনেক। কাজেই মানুষকে কী করে আরও বড়ো ও শক্তিমান করে তোলা যায় প্রথমে সেইটেই হল আমার ধ্যান-ধারণা। কেমন করে সে ধ্যান-ধারণা সফল হল, তোমাদের কাছে সেকথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের গোবর ভরা মাথায় তা ঢুকবে না। তবে সামান্য দু-একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি শোনো। Glands বা গ্রন্থিদের নাম শুনেছ তো! এই গ্রন্থিদের রসেই মানুষের দেহ টিকে থাকে। গুটি পাঁচেক গ্রন্থি দেহের ভিতর রস সঞ্চার করে; আর তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি গ্রন্থির নাম হচ্ছে Thyroid, Adrenal ও Pituitary. প্রথমটির অবস্থান মানুষের কণ্ঠে, দ্বিতীয়টির মূত্রাশয়ে আর তৃতীয়টির মস্তিষ্কে। এইসব গ্রন্থির হের-ফের মানুষের দেহের অদল-বদল হয়। ধরো Thyroid গ্রন্থির কথা। যে-শিশুর দেহে এই গ্রন্থি বিকৃত অবস্থায় থাকে—'

বিনয়বাবু ধরণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—'তার মস্তিষ্ক আর কঙ্কালের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সেও তার দেহ আর বুদ্ধি হয় খোকারই মতন। আমি এসব জানি ধরণীবাবু। আবার Pituitary গ্রন্থি অতিরিক্ত রস ঢাললে মানুষের দেহের বাড়ও অতিরিক্ত রকম হয়ে ওঠে—কেউ হয় আশ্চর্য রকম মোটা, আবার কেউ বা হয় আট-দশ ফুট লম্বা। গ্রন্থি নিয়ে মিছিমিছি লেকচার না দিয়ে আপনি কাজের কথা বলুন,—যতটা ভাবছেন আমরা ততটা মূর্খ নই!'

ধরণী একটু থতমত খেয়ে অল্পক্ষণ বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'তাহলে তোমাদের ঘটে একটু-আধটু বুদ্ধি আছে দেখছি! তবে আমার পরীক্ষার আসল পদ্ধতিটা তোমাদের কাছে আর খুলে বলা হবে না। যদিও ওই দেহ নিয়ে তোমরা আর এ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না, তবু সাবধানের মার নেই।'

কুমার বললে, 'দেহ নিয়ে বাইরে বেরুতে পারব না! তার মানে?'

ধরণী হেসে উঠে বললে, 'মানে? মানে নিশ্চয়ই একটা আছে। হ্যাঁ, শীঘ্রই তোমাদের চেতনা থাকবে বটে, কিন্তু তোমাদের দেহগুলো পঞ্চভূতে মিশিয়ে যাবে।'

সকলে মহা বিস্ময়ে এই ধাঁধার কথা ভাবতে লাগল। চেতনা থাকবে, কিন্তু দেহ থাকবে না? আশ্চর্য! ভয়ানকও বটে!

ধরণী বললে, 'তারপর শোনো। আমার পরীক্ষা পদ্ধতির কথা আর বলব না বটে, কিন্তু পরীক্ষার ফলের কথা তোমাদের কাছে বলতে ক্ষতি নেই। আমি এমন সব বিশেষ ঔষধ বা খাবার আবিষ্কার করেছি, দ্রব্যগুণে যা গ্রন্থিদের রস উৎপাদনের ক্ষমতা কল্পনাতীতরূপে বাড়িয়ে তোলে। ওই আবিষ্কারের দৌলতে আমি এখন মানব-দানব সৃষ্টি করতে পারি।'

বিমল বললে, 'যেমন হরিদাসের ভাই রামদাস?'

—'হ্যাঁ। রামদাস জন্মাবার পর থেকেই মানুষ হয়েছে আমার আবিষ্কৃত খাবার খেয়ে। সে যখন তিন মাসের শিশু, তখনই তার দেহ লম্বায় হয়ে উঠেছিল তিন ফুট। তার অতি বাড় দেখে পাড়ার লোক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠল যে আমাকে এই নির্জন দ্বীপে পালিয়ে আসতে হল। কেবল রামদাস নয়, একটা বিড়াল ও একটা কুকুরকেও আমি আমার খাবার খাইয়ে বাঘ আর হাতির মতো বড়ো করে তুলেছি। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। আদিম যুগের হাতি, বাঘ, সিংহ আর ষাঁড়রা এখনকার চেয়ে ঢের বড়ো হত কেন? কোমোডোর গোসাপরা এখনও বড়ো বড়ো কুমিরেরও চেয়ে মস্ত হয় কেন? কেবল ওই গ্রন্থির অতিরিক্ত রসের মহিমায়। এদিকে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন সুদিনের অপেক্ষায় বসে আছি।'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের সুদিন?'

ধরণী বিকট উল্লাসে চিৎকার করে বললে, 'আমি এই ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষের পৃথিবী জয় করব! আর বছর বারো পরে আমার দানববাহিনী নিয়ে তোমাদের মতো জ্যান্ত পুতুলের নগরী আক্রমণ করব, ধীরে ধীরে একালের সমস্ত মানুষ জাতিকে লুপ্ত করে দিয়ে দুনিয়ার সর্বশক্তিমান সম্রাট হয়ে নূতন এক মহামানবের পৃথিবী গড়ে তুলব! সে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ হবে প্রায় কলকাতার মনুমেন্টের মতন উঁচু, আর সেখানকার বড়ো বড়ো অট্টালিকা উঁচু হবে দার্জিলিং পাহাড়ের সমান! আমার তৈরি মানুষরা তিন-চার বার পা ফেলে হেঁটেই গঙ্গা আর পদ্মা নদী পার হয়ে যাবে! আমার রামদাস তো এখনও বালক, মাথায় সে আরও কত উঁচু হবে আমিই তা জানি না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'পৃথিবীর মানুষ যত ছোটো আর দুর্বলই হোক, আপনার ওই রামদাসের মতন একটিমাত্র দানবকে বধ করবার শক্তি তাদের আছে।'

'—একটিমাত্র দানব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! আর এক দ্বীপে আমি আমার শিশু-দানবদের লুকিয়ে পালন করছি। সেই দ্বীপ থেকে এখানে আসবার সময়েই তো আমার বিড়ালবাচ্চাটাকে হতভাগা মাঝি-মাল্লারা জলে ফেলে দিয়েছিল! না জানি সে বাচ্চাটা আরও কত বড়ো হতে পারত! তাকেই তোমরা হত্যা করেছ, তোমাদের ও-অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না!'

বিমল একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'দানব-রহস্য তো বুঝলুম, কিন্তু ছড়া কাটে কারা?'

প্রশ্ন শুনেই ধরণী ও হো হা হা হা হা করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, 'ছড়া কাটে কারা? ছড়া কাটে কারা? এখনও তাদের দেখতে পাওনি বুঝি? তারা হচ্ছে বাংলা দেশের মাসিকপত্রের দুজন কবি!'

বিমল সবিস্ময়ে বললে, 'কবি!'

—'হ্যাঁ। তারা এমনি যাচ্ছেতাই কবিতা লিখত যে বাংলা মাসিকপত্রগুলো অপাঠ্য হয়ে উঠেছিল। কত সমালোচক তাদের গালাগালি দিয়েছে, কিন্তু তাদের ভয়ঙ্কর কবিতা লেখার উৎসাহ একটুও কমাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আমি তাদের এখানে এনে ধরে রেখেছি—অবশ্য তাদের দেহকে নয়, তাদের মস্তিষ্ককে।'

—'সে আবার কী?'

—'তোমরা কি এখনকার ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসকদের বাহাদুরির কথা শোনোনি? বাঁদরের দেহের গ্রন্থি কেটে তারা মানুষের দেহের ভিতরে বসিয়ে দিচ্ছে। একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গেলে কেটে বাদ দিয়ে, তার জায়গায় কোনও সদ্য মৃত মানুষের হৃৎপিণ্ড তুলে বসিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেও ডাক্তারি পাশ করেছি। তাই এসব নিয়েও পরীক্ষা করি। মানুষের মস্তিষ্ক জন্তুর মাথায় চালান করলে কী ব্যাপার হয় সেটা দেখবার জন্যে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাই একদিন ওই দুই নাছোড়বান্দা দুষ্ট কবিকে ধরে এনে কী করলুম জানো? করলুম ছোটোখাটো একটা অস্ত্রোপচার। একটা কুমির আর একটা হনুমান ধরলুম, তারপর তাদের জানোয়ারি মস্তিষ্ক কেটে বাদ দিয়ে দুই কবির মস্তিষ্ক কেটে নিয়ে বসিয়ে দিলুম। কিন্তু হতভাগা কবির মস্তিষ্ক! কুমির আর হনুমানের দেহে ঢুকেও কবিতা রচনা করতে ভোলে না! করুক তারা এই অরণ্যে রোদন। কিন্তু বাংলা মাসিকের পাঠকরা বেঁচে গিয়েছে!'*

এই ভীষণ কথা যারা শুনলে তাদের মনের ভিতরটা তখন কেমন করছিল, তা জানেন কেবল অন্তর্যামীই! ধরণী আবার অট্টহাস্য করে বললে, 'তোমরাও বেশি ভয় পেয়ো না, তোমাদের আমি একেবারে মেরে ফেলব না। তোমাদের দেহগুলো নষ্ট হবে বটে, কিন্তু তোমাদের মস্তিষ্ক বেঁচে থাকবে পশুদের মাথার ভিতরে গিয়ে। তবে, কোন পশুকে কার মস্তিষ্ক দান করব, সেটা এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ রাত্রেই একটা কোনও ব্যবস্থা করতে পারব বলে বোধ হচ্ছে! হা হা হা হা!'

কুমার গর্জন করে বললে, 'পিশাচ! দুরাত্মা! মনে করছিস আমাদের হত্যা করে তুই নিস্তার পাবি? ইস্টিমারে আমাদের বন্ধুরা আছে, তারা তোকে ক্ষমা করবে না!'

বিমল শান্তভাবেই বললে, 'ধরণীবাবু, এখনও আমাদের ছেড়ে দিন, নইলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।'

অট্টাহাসি হাসতে হাসতে ধরণী বললে, 'তোমরা হাসালে দেখছি! আমরা এখন কোথায় আছি জানো? পাতালে! এই পাতালে ঢোকবার পথ এমন গভীর জঙ্গলে ঢাকা আছে, আজ সারাদিন ধরে খুঁজলেও ইস্টিমারের লোকেরা কোনও সন্ধান পাবে না! আজ রাত্রেও যদি ইস্টিমার দ্বীপের কাছে থাকে, তাহলে অন্ধকারে গা ঢেকে রামদাস গিয়ে সেখানাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে আসবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মনুষ্য দেহ ত্যাগ করবার জন্যে তোমরা এখন প্রস্তুত হও! হা হা হা!' হাসতে হাসতেই ধরণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

---

*পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক চালান করবার এই অদ্ভুত কল্পনার জন্যে আমি এক বিলাতি লেখকের কাছে ঋণী। ইতি—লেখক

রামহরি হঠাৎ গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। বিমল হেসে বললে, 'থামো রামহরি, থামো! অমন শেয়ালের মতো চ্যাঁচালে ধরণী এখনই এসে তোমার মগজ কেটে নিয়ে হয়তো শেয়ালেরই মাথায় ঢুকিয়ে দেবে!'

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললে, 'না, ঠাট্টা নয় বিমল! যা শুনলুম তা আমাদের পক্ষেও ভয়াবহ, সমস্ত মানুষ জাতির পক্ষেও ভয়াবহ! এখন কীসে প্রাণ বাঁচে, ভালো করে সেটা ভেবে দেখা দরকার।'

বিমল অবহেলা ভরে বললে, 'আর মিথ্যা ভাবনা! আছি পাতালপুরীতে—বাইরে রামদাসের পাহারা। আমাদের হাত-পা এমনভাবে বাঁধা যে, নড়বার ক্ষমতাও নেই। বিনয়বাবু, বাঁচবার ভাবনা মিথ্যা!'

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইবার ভাষা খুঁজে পেলে না।

পাতালপুরীর গর্ভে যেটুকু রোদ এসে পড়েছিল, সেও যেন ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে—ঘরের ভিতরে দিনের বেলাতেই সন্ধ্যার আভাস ফুটে উঠছে।

বাহির থেকে মাঝে মাঝে গাছপালার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসছে না।

কুমার বললে, 'পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহ জয় করেও শেষটা কি তাহলে ওই বুড়ো ধরণীর হাতে আমাদের হার মানতে হবে?'

বিমল বললে, 'উপায় কী? মরতে তো হবেই একদিন। আজ না হয় ধরণী হবে আমাদের যমদূত! জীবনের প্রবল আনন্দ আমরা দুই হাতে লুণ্ঠন করে নিয়েছি—সাধারণ মানুষের দশ জন্মের যৌবন আমাদের এক জন্মের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; তোমার আর কী অভিযোগ থাকতে পারে কুমার? এই অতিরিক্ত জীবনের বন্যা আমার যৌবনকে শ্রান্ত করে তুলেছে, আমি এখন ঘুমোতে পেলে দুঃখিত হব না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এ তো চিরনিদ্রা নয় বিমল, এ যে জীবন্ত মৃত্যু! আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে ধরণী কী করতে চায়, শুনলে তো!'

বিমল চিন্তিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ, ওই কথা ভেবেই মাঝে মাঝে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। মানুষের দেহ থাকবে না, কিন্তু মানুষের প্রাণ থাকবে—কিন্তু সে প্রাণের মূল্য কী? কারণ এক হিসাবে মস্তিষ্কই হচ্ছে মানুষের প্রাণ! কিন্তু বিনয়বাবু, এও কি সম্ভব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আজীবন বিজ্ঞানচর্চা করছি, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনার কথা কখনও মনেও আসেনি। এ কল্পনায় যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সে যেন রূপকথার যুক্তি!'

কমল বললে, 'আমাদের মধ্যে বাঘাই সুখী! রামদাস আমাদের বোট ঘাড়ে করতে না করতেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে গেছে!'

রামহরি কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'আহা, সেকি আর বেঁচে আছে!'

কুমার বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। শত বিপদেও বাঘা কখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সে রামদাসের পিছনে পিছনে আসত।'

* * *

বাঘার কী হল সেটা আমাদের দেখা দরকার। বিমল ও কুমারের সমস্ত ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, বাঘা সাধারণ কুকুর নয়। পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক ঢুকিয়ে ধরণী নতুন পরীক্ষা করতে চায়, কিন্তু পশুর মস্তিষ্কে যে খানিকটা মানুষী বুদ্ধি থাকতে পারে, অনেক কুকুরই অনেকবার তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে। বাঘাও হচ্ছে সেই জাতীয় কুকুর।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই বাঘা যখন দেখলে জলের নৌকো আকাশে উড়ছে, তখন তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন অস্বাভাবিক কাণ্ড কোন কুকুর কবে দেখেছে? ভয়ে তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না, বিকট চিৎকার করে এক লাফে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পড়ে জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সে দেখলে, খানিক তফাতেই একটা তালগাছ সমান উঁচু ছায়ামূর্তি কোমর জল ভেঙে ডাঙার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু সেই দানবমূর্তি দেখেও বাঘা বিশেষ বিস্মিত হল না। কারণ বিমল ও কুমারের সঙ্গে গিয়ে 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' দেরও সে দেখে এসেছে, তার চক্ষে দানবমূর্তি এখন আর অস্বাভাবিক নয়। সে খালি এইটুকুই বুঝে নিলে যে, ওই দানবের কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায় ততই ভালো।

এমন সময়ে আর-একদিকে তার নজর পড়ল। জলের উপরে আবছা-আলোর ভিতরে যেন খানিকটা নিরেট অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। খালি তাই নয়, অন্ধকারের এক জায়গায় যেন দু-টুকরো আগুনের মতো কী জ্বলজ্বল করছে।

সে-অন্ধকার আর কিছুই নয়, মস্ত বড়ো একটা কুমির।

এই জলচর জীবটিও বাঘার চোখে নতুন নয়। জলে এর সঙ্গে লড়াই হলে তারই যে সমধিক বিপদের সম্ভাবনা এটাও সে বুঝতে পারলে।

কুমির হঠাৎ বললে :

'ঘোঁ ঘট ঘট ঘোঁ ঘট ঘট, ঘোঁ ঘট ঘট!
দে চম্পট দে চম্পট দে চম্পট!'

হতভম্ব বাঘার দুই কান খাড়া হয়ে উঠল। সে মানুষের ভাষার কথা কইতে পারে না বটে, কিন্তু শুনলে মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। এই কুমিরটার কথা যে মানুষের মতন শোনাচ্ছে!

কিন্তু এসব কথা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করবার সময় নেই। সে নিজের দেহ দিয়ে কোনও ক্ষুধার্ত জলচরের উপবাস ভঙ্গ করতে মোটেই রাজি নয়। অতএব বাঘা তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে অনেক দূরে চলে গেল।

কিন্তু কুমিরটা তাকে একবারও আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে না।

বাঘা তখন আবার ডাঙার দিকে ফিরল। তখন আবার সেই ছায়া-দানবের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোনওদিকেই তাকিয়ে বাঘা তাকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

বোট যে কেন আকাশে উড়েছিল, সে এখন তা বুঝতে পেরেছে। দানবের মাথায় বোটের

ভিতরেই যে তার মনিবরা আছেন, এও সে জানে। এখন সে অনায়াসেই পুলিশের ইস্টিমারে উঠে নিজে নিরাপদ হতে পারত, কিন্তু সেকথা একবারও তার মনে হল না। বাঘা যে-জাতের জীব, সে-জাত প্রাণের চেয়েও বড়ো মনে করে মনিবকে। অতএব সে সাঁতার কেটে ডাঙায় গিয়ে উঠল,—কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, মনিবরা দানবের মাথায় চড়ে ওই দ্বীপেই গিয়েছেন।

কিন্তু দ্বীপে উঠে হল আর এক মুশকিল। দানবটা কোনদিকে গিয়েছে? চারিদিকেই গভীর জল, কোনদিকে যাওয়া উচিত?

মানুষ হলে বাঘাকে এখন হতাশ হতে হত। কিন্তু সে হচ্ছে কুকুর, তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। রামদাস যখন বোট শূন্যে তুলেছিল, তখনই তার গায়ের বিশেষ গন্ধ বাঘার নাকে এসেছিল। সে এখন চারিদিকে মাটি শুঁকে শুঁকে রামদাসের গায়ের গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায় লেগে গেল।

ভোর হল। সূর্য উঠল। গাছের মাথায় মাথায় রোদের আলপনা। বাঘা তখনও ব্যস্ত হয়ে মাটি শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে।

আরও কতক্ষণ পরে এক জায়গায় বড়ো বড়ো কয়েকটা পায়ের দাগ দেখা গেল। সেইখানে নাক বাড়িয়েই বাঘা আনন্দে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল। এতক্ষণে সেই গন্ধ পাওয়া গেছে!

আর কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না! মহা খুশি হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাঘা মাটিতে নাক রেখে অগ্রসর হল।

কখনও খোলা জমির উপর দিয়ে এবং কখনও বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ পথ চলে বাঘা শেষটা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির পাশে তাদের সেই মোটরবোটখানা কাত হয়ে পড়ে আছে।

বাঘা দৌড়ে গিয়ে বোটে উঠল। কামরার ভিতরে ঢুকল। সেখানে তার মনিবদের জিনিসপত্তর ও বন্দুকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তার মনিবরা কোথায়?

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বাঘা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা দাড়িওয়ালা লোক ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে এল।

এ লোকটাকে বাঘা আগেও দেখেছে এবং তার কুকুর বুদ্ধি বললে, এ তাদের বন্ধুলোক নয়। সে চটপট আবার কামরার ভিতরে গা ঢাকা দিলে।

খানিক পরে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সেই সন্দেহজনক লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

তখন, অমন হঠাৎ লোকটা কেমন করে আবির্ভূত হল তার তদারক করবার জন্যে কৌতূহলী বাঘা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে কতকগুলো ডালপাতা রাশীকৃত হয়ে রয়েছে এবং তারই ফাঁক দিয়ে একসার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ঝোপের বাহির থেকে এসব কিছুই দেখা যায় না এবং ঝোপের ভিতরে এসে দাঁড়ালেও সহজে সেই সিঁড়ির সার আবিষ্কার করা যায় না।

বাঘা সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। তারপরেই তার কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। বাঘার খুশি-ল্যাজ তখনই বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাঘা সর্বপ্রথমে কুমারের ভূতলশায়ী দেহের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আদর করে তার গা চেটে দিতে লাগল।

রামহরি বিষাদ ভরা গলায় বললে, 'কেন বাঘা মরতে এলি এখানে? আমরা মরব, তুইও মরবি!'

বিমল কিন্তু বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, 'না, না! আমরাও বাঁচব, বাঘাও বাঁচবে! ভগবান এখনও বোধহয় আমাদের স্বর্গের টিকিট দিতে রাজি নন! বাঘা সেই খবরই নিয়ে এসেছে!'

বিনয়বাবু ম্লান মুখেই বললেন, 'বিমল, হঠাৎ তোমার এতটা খুশি হওয়ার কারণ বুঝলুম না!'

'বুঝলেন না? কিন্তু আমি বুঝেছি। বাঘা যখন এসেছে, তখন ধরণীর ছুরি থেকে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা বাঁচাতে পারব। মরি তো একেবারেই মরব, কিন্তু মাসিকপত্রের ওই দুই কবির মতো কুমির কি হনুমান হয়ে থাকব না!'

কমল বললে, 'আমাদের হাত-পা দুই-ই বাঁধা, ধরণী আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে!'

কুমার বললে, 'না, তা আর পারে না! বিমল কী বলছে আমি বুঝেছি। —বাঘা!'— বলেই সে বাঘার মুখের কাছে নিজের বাঁধা হাতদুটো কোনওরকমে এগিয়ে দিলে।

বাঘা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল।

কুমার তখন বাঘার মুখের উপরে নিজের হাতদুটো ঘষতে ঘষতে বললে, 'ও কী রে বাঘা, তুই আমার ইশারা বুঝতে পারছিস না? নে, নে, দড়ি কাট!'

বাঘার আর কোনও সন্দেহ রইল না। সে তখনই নিজের ধারালো দাঁত দিয়ে কুমারের হাতের দড়ি চেপে ধরলে। দেখতে দেখতে তার হাতের দড়ি খসে পড়ল। কুমার তখন আগে নিজেই নিজের পায়ের বাঁধন খুলে ফেললে। এবং তারপর একে একে সকলেরই বন্ধনদশা ঘুচতে আর দেরি লাগল না।

বিমল বাঘাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'ওরে বাঘা, বাঘা রে! গেল জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি রে বাঘা?' বাঘাও সুখে যেন গলে গিয়ে বিমলের কোলের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে দিলে।

বিনয়বাবু বললেন, 'ওঠো বিমল, পরে বাঘাকে ধন্যবাদ দেবার অনেক সময় পাবে!'

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ঠিক বলেছেন! আগে এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে না পারলে নিস্তার নেই! এসো সবাই! কিন্তু খুব ধীরে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে!'

একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে, যেখানটাকে তারা এতক্ষণ উঠান বলে মনে করেছিল, সেখানে রয়েছে মস্ত বড়ো একটা জলের ইঁদারা।

বিমল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'বিনয়বাবু, এই পাতালপুরীটা কী রকম তা বুঝেছেন? লক্ষ্ণৌয়ের নবাবরা গরমের সময়ে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে বাস করতেন। সে আদর্শেই এটা তৈরি হয়েছে। বর্ধমানেও এইরকম পাতালপুরী আছে। বিপদের সময়ে লুকাবার জন্যেই ধরণী এটা বোধহয় তৈরি করেছে।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হো হো হো করে একটা বিষম অট্টাহাসি সেই পাতালপুরীর ভিতরে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুললে। বিমল সচমকে মুখ তুলে দেখলে, সিঁড়ির উপরকার ধাপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে ধরণী।

ধরণী হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিষ্ঠুর স্বরে বললে, 'এই যে, দড়িটড়ি সব বুঝি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে?'

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা মানুষ, দড়ি বাঁধা থাকতে ভালো লাগল না!'

ধরণী দুই পা পিছিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'ও! এখনও তোমরা মানুষই বটে! কিন্তু ভয় নেই, তোমাদের মনুষ্য দেহ আর বেশিক্ষণ থাকবে না!'

বিমল সিঁড়ির উপরে এক ধাপ উঠে বললে, 'আজ্ঞে না, এখনও আমাদের নরদেহ ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়নি।'

ধরণী গর্জে উঠে বললে, 'খবরদার! আর এক পা এগিয়ো না! ভাবছ এখান থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচবে? জানো, বাইরে কে পাহারা দিচ্ছে?'

—'রামদাস।'

—'হ্যাঁ, এখান থেকে এক পা বেরুলেই সে তোমাদের পায়ের কড়ে আঙুলে টিপে বধ করবে!'

—'বেশ, সেইটেই একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক'—বলেই বিমল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল এবং তার পিছনে পিছনে আর সকলেও।

বিমলের ইচ্ছা ছিল, ধরণীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার অভিপ্রায় বুঝে ধরণী এক মুহূর্তেই তিন লাফ মেরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারাও তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলে ধরণী তিরবেগে ছুটছে এবং প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকছে—'রামদাস! রামদাস! রামদাস!'

ঝোপের বাইরে একটুখানি ঘাস জমি এবং তারপরেই নিবিড় অরণ্য যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধরণী সেই অরণ্যের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, 'এখন আমরা কোনদিকে যাব?'

কুমার বললে, 'আমাদের আর কোনওদিকে যেতে হবে না। ওই দেখুন!'

অরণ্যের এক অংশ আচম্বিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে—মড় মড় করে বড়ো বড়ো ডালপালা ভেঙে পড়ার এবং মাটির উপরে ধুপ ধুপ করে আশ্চর্য পায়ের শব্দ।

তারপরেই এক অতি ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর—'রামদাস, রামদাস! ওই পোকাগুলোকে পায়ে থেঁতলে, ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও!'

বিমল মৃদু হেসে বললে, 'এইবারে রামদাসকে আমরা স্বচক্ষে দেখব।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

কবির আবির্ভাব

রামদাস, ছোট্ট হরিদাসের মস্ত ভাই রামদাস, ধরণীর সৃষ্টিছাড়া পরীক্ষার জ্যান্ত ফল রামদাস,—যার পায়ের তলে পৃথিবী টলে, যার হাতের জোরে মানুষ ভরা মোটরবোট জল ছেড়ে শূন্যে ওড়ে, যার মাথা দোলে বুড়ো তালগাছের মাথার সমান উঁচু হয়ে ঝড়ের হুহুঙ্কারে!

সেই রামদাস আসছে আজ বিমলদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, ধরণীর নিষ্ঠুর হুকুম পালন করবার জন্যে, এক এক বিরাট পায়ের চাপে পাঁচ-পাঁচটি ক্ষুদ্র মানুষের দেহ ঠুনকো কাচের পেয়ালার মতো চূর্ণ করবার জন্যে।

সকলে অত্যন্ত অসহায়ের মতো এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল,—কিন্তু কোথায় পালাবার পথ? সামনে খোলা জমি, তারপরেই দুর্ভেদ্য বন, যার ভিতর দিয়ে মড় মড় করে বড়ো বড়ো ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে আসছে স্বয়ং রামদাস, বাম পাশে ও ডান পাশেও নিবিড় অরণ্য যেন নিরেট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো তার ভিতরেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই হাতির মতো ডালকুত্তা এবং সেখানে গিয়ে পথ খোঁজবারও সময় নেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, আমাদের আবার সেই পাতালপুরীতেই ফিরে গিয়ে বন্দি হতে হবে—রামদাস তার ভিতরে ঢুকতে পারবে না!'

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, 'সেখানে গিয়ে ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দান করব? প্রাণ থাকতে নয়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এখানেই প্রাণ আর থাকছে কই?'

কুমার বললে, 'রামদাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমি প্রাণ দিতে রাজি আছি, কিন্তু ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দিয়ে মরেও বেঁচে থাকতে পারব না!'

কমল বললে, 'আমারও ওই মত!'

রামহরি কেবল কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বাঘা চ্যাঁচাচ্ছে শুধু ঘেউ ঘেউ করে—সে বোধহয় রামদাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে কুকুর ভাষায় সবচেয়ে খারাপ গালাগালিগুলো বর্ষণ করছে।

হঠাৎ কমল বলে উঠল, 'বিমলবাবু, দেখুন—দেখুন!'

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ডান দিকের একটা বড়ো গাছের উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসছে মস্ত একটা হনুমান। নীচের ডাল থেকে এক লাফে ভূতলে অবতীর্ণ হল এবং তারপর দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে সবাইকে ডাকতে লাগল।

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'ও কী ব্যাপার?'

বিমল বললে, 'বোধহয় সেই হনুমান—যার মাথায় বেঁচে আছে মানুষের মগজ!'

কুমার বললে, 'ও যে আমাদের ডাকছে!'

বনের ডালপালা ভাঙার শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে—রামদাসের দেখা পেতে বোধহয় আর আধ মিনিটও দেরি লাগবে না।

বিমল বললে, 'ধরণীর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওই পশুদেহের ভিতরে আছে মানুষেরই মন। চলো সবাই, প্রাণ তো গিয়েছেই, এখন ওর কথা শুনে কী হয় সেইটেই দেখা যাক!'

বাঘা গরর গরর করে এগিয়ে যাচ্ছিল হনুমানজিকে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে বাহাদুরি নেবার জন্যে; কিন্তু কুমারের কাছ থেকে এক চড় খেয়ে সে ল্যাজ গুটিয়ে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল—কিন্তু বুঝতে পারল না যে, হনুমানের মতো একটা জানোয়ারকে কামড়াতে যাওয়াটা আজ হঠাৎ অপরাধ হয়ে দাঁড়াল কেন?

তারা সবাই হনুমানের দিকে অগ্রসর হল, হনুমানও গিয়ে দাঁড়াল একেবারে অরণ্যের ধার ঘেঁষে একটা ঝোপের পাশে। তারপর, কী আশ্চর্য, সে ঠিক মানুষেরই মতো ঝোপের দিকে হাত তুলে আঙুল দিয়ে কী ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু বিমলের তখন অসম্ভব ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবার অবকাশ ছিল না, তারা তাড়াতাড়ি যখন সেই ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হনুমান তখন লাফ মেরে একটা গাছে উঠে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

ঝোপের পিছনেই প্রায় নিরেট বনের তলায় একটা অন্ধকারমাখা পায়ে চলা সরু পথ।

বিমল মহা খুশি হয়ে বলে উঠল, 'হনুমান আমাদের পথ দেখিয়ে দিলে! জয় হনুমান!'

সকলে সেই পথ ধরে যখন বনের ভিতরে প্রবেশ করলে তখন তাদের মনে হল, যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো চোখের সমুখে 'সুইচ' টিপে কে নিবিয়ে দিলে। সে অরণ্য এমনি নিবিড় যে, তার ভিতরে রোদ বা জ্যোৎস্না কোনওদিন বেড়াতে আসতে পারেনি!

অন্ধকার যখন একটু চোখ সওয়া হয়ে এল, তখন তারা চারিদিক হাতড়াতে হাতড়াতে কোনওগতিকে গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল।

সেই সময়ে পিছন থেকে ভেসে এল যেন গম্ভীর মেঘগর্জন।

বিনয়বাবু বললেন, 'আমাদের দেখতে না পেয়ে রামদাস বোধহয় খাপ্পা হয়ে গর্জন করছে!'

সকলে সেই অবস্থাতে যথাসম্ভব পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই চির অন্ধকারের রাজ্য দিয়ে তাদের আর বেশিক্ষণ যেতে হল না, অরণ্যের নিবিড়তা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল এবং আলোকের আভাসে বনের ভিতরটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অরণ্য শেষ হয়ে গেল, তারা আবার একটা বড়ো মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল।

সারা আকাশ তখন প্রখর রৌদ্রে সমুজ্জ্বল, ময়দানের নীলিমার উপর দিয়ে সোনালির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বিমল একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করে যেন সেই নির্মল আলোক আর প্রমুক্ত বাতাসকে দৃষ্টি আর নিশ্বাস দিয়ে নিজের বুকের ভিতরে টেনে নিতে লাগল।

কুমার বললে, 'এখনও আঃ বলে নিশ্চিন্ত আরাম করবার সময় হয়নি বিমল! রামদাস গোটা কয় লাফ মারলেই এখানে এসে হাজির হতে পারবে!'

বিমল বললে, 'ঠিক! খোলা মাঠ পেয়েছি, চলো এইবার আমরা দৌড়োই!'

কমল বললে, 'কিন্তু কোনদিকে যাব?'

কুমার বললে, 'কোনদিকে আবার! আমরা এসেছি পূর্ব দিক থেকে, আমাদের যেতেও হবে পূর্ব দিকে।'

সবাই পূর্ব দিকে ছুটতে শুরু করলে। ছুটোছুটিতে বাঘার ভারী আমোদ! সে ভাবলে এইবারে খেলার পালা শুরু হল! তখনই সে ভালো করেই দেখিয়ে দিলে ছুটোছুটি খেলায় তাকে হারিয়ে কেউ 'ফার্স্ট প্রাইজ' নিতে পারবে না।

ময়দানের ওপারে আবার একটা বনের আরম্ভ,—এ বন তেমন ঘন নয়।

কিন্তু সকলে এখানে এসেই সভয়ে শুনলে, বনের ভিতর দিয়ে কারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

শত্রুরা কি তাদের ইস্টিমারে যাবার পথ বন্ধ করে আক্রমণ করতে আসছে?

পিছনে আছে রামদাস, আর এদিকে আছে কে! সশস্ত্র ধরণী, হরিদাস—আর সেই হাতির মতো ডালকুত্তা?

তাহলে উপায়? তারা নিরস্ত্র, বাধা দেবার কোনও উপায়ই নেই। এক উপায়, পালানো। কিন্তু এবারে তারা কোনদিকে পালাবে?

কুমার হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাহে বলে উঠল, 'পুলিশ! পুলিশ! মিলিটারি-পুলিশ!'

বিমল চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বনের ভিতর থেকে সার বেঁধে সমতালে পা ফেলে মিলিটারি-পুলিশের লোক বেরিয়ে আসছে।

সে সানন্দে বললে, 'আর আমাদের কোনও ভয় নেই! বিনয়বাবু, ওই দেখুন বন্দুকধারী পুলিশ ফৌজ, ওই দেখুন 'মেশিনগান'! আসুক এখন রামদাস, আসুক এখন ধরণী আর আসুক তার হাতি কুকুর!'

ইনস্পেকটার তাদের দেখে দৌড়ে এসে বললেন, 'বিমলবাবু, ব্যাপার কী? মোটরবোটসুদ্ধ কোথায় উধাও হয়েছিলেন?'

বিমল বললে, 'আমরা যমালয় ফেরত মানুষ!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে তালগাছের মতন উঁচু দৈত্য মোটরবোটসুদ্ধ আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল!'

—'কী যে আপনি বলেন!'

—'বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন।'

বিমল তাড়াতাড়ি খুব অল্প কথায় মোটামুটি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে।

ইনস্পেকটার সব শুনে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! এ যে গাঁজাখুরি কথার মতো শোনাচ্ছে!'

—'বিশ্বাস করুন মশায় বিশ্বাস করুন। গাঁজার ধোঁয়া যেমন সত্য, আমাদের কথাও তেমনি সত্য।'

—'আপনারা স্বপ্ন বা ম্যাজিক দেখেছেন কি না জানি না, কিন্তু আপনারা যে বিপদে পড়েছেন, এটা আমি আন্দাজ করেছিলুম। তাই তো লোকজন নিয়ে আমি আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছি!'

—'বড়ো ভালো কাজ করেছেন মশাই, বড়ো ভালো কাজ করেছেন। আমাদের তো খুঁজে পেয়েছেন, এইবারে চলুন সেই রামদাসের খোঁজে!'

—'নিশ্চয়ই যাব! কিন্তু ওই যে বললেন, আপনাদের এই রামদাসের গল্প গাঁজার ধোঁয়ার মতন সত্য, শেষটা গাঁজার ধোঁয়ার মতোই রামদাস উবে যাবে না তো?'

কুমার বললে, 'হুঁ! রামদাস উবে যাবারই ছেলে বটে! ওই দেখুন, মাঠের পারের ওই বনে দাঁড়িয়ে রামদাস আমাদেরই দেখছে!'

ইনস্পেকটার সেইদিকে তাকিয়েই চমকে মস্ত এক লাফ মারলেন।

ময়দানের ওদিককার বনের সারের উপরে এক মানুষ-তালগাছ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ করছে, দুই হাত দুই কোমরে রেখে। তার অদ্ভুত দেহের তুলনায় বড়ো বড়ো তালগাছগুলোকেও ছোটো দেখাচ্ছে। এতদূর থেকে তার মুখের ভাব দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেটা যে বিপুলবপু এক নরদৈত্যের মূর্তি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

মিলিটারি-পুলিশের দলের ভিতর থেকে একটা বিস্মিত কোলাহল ধ্বনি উঠল।

বিমল বললে, 'কিন্তু সেই হাতির মতো ডালকুত্তা? সে এখনও একবারও দেখা দিলে না কেন?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'রক্ষে করুন মশায়, আর আমি তাকে দেখতে চাই না! যা দেখেছি, তাতেই পিলে চমকে উঠেছে! এই সেপাই, ফায়ার করো—ফায়ার করো!'

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, 'না না! আগে দেখাই যাক, রামদাসকে আমরা জ্যান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারি কি না!'

ইনস্পেকটার দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তুলে সবিস্ময়ে বললেন, 'গ্রেপ্তার! ওকে গ্রেপ্তার করতে চায় কে? ওর কাছে গেলে ও তো পুঁটিমাছের মতো টপ টপ করে আমাদের মুখে ফেলে দেবে! ওর হাতে পরাবার হাতকড়িই বা কোথায় পাব? ইস্টিমারে ওর দেহ কুলোবে না, নিয়ে যাব কেমন করে? না না, গ্রেপ্তার-ট্রেপ্তার নয়, ওকে একেবারে বধ করতে হবে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু এত দূর থেকে গুলি ছুড়লে তো ওর গায়ে লাগবে না!'

—'তবু বন্দুক ছুড়ুক! বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে দৈত্যবেটা এখান থেকে পালিয়ে যাক? ওকে দেখতে আমার একটুও ভালো লাগছে না! এই সেপাই, বন্দুক ছোড়ো—'মেশিনগান' ছোড়ো!'

বন্দুক ও কলের কামানের ঘন ঘন বজ্র গর্জনে চতুর্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের দেহ বনের ভিতর ডুব মারলে। তাহলে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি সে জানে।

ইনস্পেকটার উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন, 'দেখছি দৈত্যবেটা গোঁয়ারগোবিন্দ নয়। তবে

চলো সবাই অগ্রসর হই। কিন্তু খবরদার, বন্দুক ছোড়া বন্ধ কোরো না। সেই ফাঁকে দৈত্যটা কাছে এসে পড়লে আর রক্ষে নেই!'

সকলে মিলে অগ্রসর হল—যেখানটায় রামদাসকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে রামদাসের বদলে পাওয়া গেল ধরণীকে। একটা গাছের তলায় ধরণী লম্বা হয়ে শুয়ে আছে—বন্দুকের গুলি লেগে তার কপাল বয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

বিমল তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে, 'ধরণী এ জীবনে আর আমাদের মগজ নিয়ে পরীক্ষা করতে পারবে না!'

তারপর আবার রামদাসের সন্ধান আরম্ভ হল। কিন্তু দ্বীপের চারিদিক, ছোটো-বড়ো সমস্ত বন খুঁজেও তার কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না।

সবাই যখন দ্বীপের ওপাশে আবার নদীর ধারে এসে পড়ল, বিনয়বাবু তখন একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আগেই বলা হয়েছে, নদী এখানে প্রায় সমুদ্রের মতন দেখতে। সেই বিশাল জলের রাজ্যে দেখা গেল, বহুদূরে দুটো বড়ো বড়ো জীব সাঁতার কেটে কোথায় ভেসে চলেছে।

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই ওরা হচ্ছে রামদাস আর সেই বিরাট কুকুর!'

—'কিন্তু রামদাসের দাদা হরিদাসটা গেল কোথায়?'

—'হয়তো রামদাসের চওড়া পিঠে বসে নদী পার হচ্ছে! কী বলেন ইনস্পেকটারমশাই, ইস্টিমারে চড়ে আবার ওদের তাড়া করব নাকি?'

ইনস্পেকটার বললেন, 'আপদ যখন নিজেই বিদেয় হয়েছে, তখন আর হাঙ্গামা করে দরকার কী? কীসে কী হয় বলা তো যায় না, ও বেটা যদি ডুবসাঁতার দিয়ে এসে ঢুঁ মেরে ইস্টিমারের তলা ফাটিয়ে দেয়?'

সকলে যখন বনের ভিতর দিয়ে আবার ফিরে আসছে, তখন মাথার উপরকার একটা গাছের ডাল-পাতা হঠাৎ নড়ে উঠল, তারপর শোনা গেল—কিচির-মিচির কিচির-মিচির কিচ কিচ কিচ কিচ!

'মানুষ আমি নইকো রে ভাই,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই!
আমার দেশের সবুজ মাঠে
ধানের খেতে সোনার দোল,
বইছে নদীর রুপোর লহর,
শিউলি ঝরা মাটির কোল!'

সে করুণ স্বর শুনে সকলেরই মন ব্যথায় ভরে উঠল।

বিনয়বাবু উপর দিকে মুখ তুলে মমতা-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'কবি, আজ তোমার চেহারা

যেরকমই হোক, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ। তুমি গাছ থেকে নেমে এসো, আমাদের সঙ্গে আবার দেশে ফিরে চলো।'

গাছের উপর থেকে আবার সেই দুঃখমাখা কণ্ঠ শোনা গেল :

'আমার ঘরের মিষ্টি বধূ
ডাকছে আমায় রাত্রিদিন,
আমার খোকার, আমার খুকির
কণ্ঠে বাজে স্বপ্ন-বীণ।
কেমন করে ফিরব ঘরে,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই!'

কুমার বিমলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

অদৃশ্যের কীর্তি
পিশাচ
ডালিয়ার অপমৃত্যু
অগাধ জলের রুই কাতলা
বাবা মুস্তাফার দাড়ি
বনের ভেতরে নতুন ভয়
গুহাবাসী বিভীষণ

অদৃশ্যের কীর্তি

এক

বিমল আর কুমারের জন্য ভৃত্য রামহরি যখন বৈকালিক চা নিয়ে এল, কুকুর বাঘা তখন টেবিলের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে সেই সব স্বপ্ন দেখছিল, কুকুর ছাড়া আর কেউ সে-স্বপ্ন দেখতে পারে না।

কিন্তু রামহরি চা আনামাত্র বাঘার ঘুম চট করে ভেঙে গেল। সে প্রথমে মাথা তুলল, তারপর চায়ের টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দুই-তিন বার নাক কুঁচকে গন্ধ নিয়েই টের পেল, চায়ের সঙ্গে আজ চপ কাটলেট ওমলেট বা আমিষের কোনো সম্পর্কই নেই! অতএব বাঘা আর অকারণে চতুষ্পদে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শরীরকে কষ্ট দিতে চাইল না। সে আবার চোখ মুদে স্বপ্নলোকে ফিরে গেল।

স্যান্ডউইচ সহযোগে বিমল ও কুমার পেয়ালার চা শেষ করতেই নীচে থেকে শোনা গেল—'বিমলবাবু! কুমারবাবু! বাড়িতে আছেন নাকি?'

কুমার বলল, 'ইনস্পেক্টর সদানন্দবাবুর গলা না? রামহরি,—ওঁকে ওপরে নিয়ে এসো।'

সদানন্দবাবু ভিতরে এসে দাঁড়ালেন,—তাঁর মুখের উপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অত্যন্ত দুর্ভাবনার চিহ্ন।

বিমল শুধোল, 'ব্যাপার কী সদানন্দবাবু? কোনো শক্ত মামলা ঘাড়ে পড়েছে নাকি?'

চেয়ারের উপর বসে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একটা শক্ত মামলায় জড়িয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু মামলায় পুলিশ না ডেকে ওঝা ডাকাই উচিত।'

কুমার বলল, 'তার মানে? ব্যাপারটা ভৌতিক নাকি?'

বিমল বলল, 'পুলিশ কেস নিয়ে আমাদের কথা কওয়া উচিত নয়, কারণ গোয়েন্দাগিরি কিছুই আমরা জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা যদি ভৌতিক হয়, তাহলে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে রাজি আছি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তাহলে আপনিও ভূত মানেন?'

বিমল ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভূত? মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়! কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে আমি ভারি ভালোবাসি!'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ভূত-টুত আমি মানতাম না মশাই। কিন্তু যে বেয়াড়া মামলায় পড়েছি সেটাকে ভৌতিক ছাড়া আর কী বলব বুঝতে পারছি না।'

বিমল বলল, 'আপাতত হাতে কাজ নেই। আপনার ভূতের গল্প মন্দ লাগবে না। বলুন।'

দুই

সদানন্দবাবু বলতে লাগলেন—

'ভূতের দৌরাত্ম্যের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অমুক বাড়িতে চারিদিক থেকে—ইট পাটকেল পড়ছে। নানারকম গোলমাল হচ্ছে—এমনই সব অভিযোগ প্রায়ই থানায় আসে। কিন্তু সদলবলে

তদন্ত করতে গিয়ে প্রাই আমরা আবিষ্কার করি যে, সে-সব উৎপাতের মূলে আছে পাড়ার সব দুষ্ট লোক। ভেবেছিলাম, এবারের ব্যাপারটাও সেই শ্রেণির।

'অভিযোগ এসেছে জোড়াসাঁকোর চৌধুরীবাড়ি থেকে। চৌধুরীরা হচ্ছেন কলকাতার বনেদি পরিবার, তাঁদের বসতবাড়ির বয়স দেড়শো বছরের কম হবে না। এ-বাড়িতে ভূতের উৎপাতের কথা কখনো শোনা যায়নি।

'কিন্তু কিছুদিন থেকে সেখানে হঠাৎ যে-সব কাণ্ড শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত আশ্চর্য! আচম্বিতে দুমদাম করে জানলা দরজা খুলে যায়, টেবিল-চেয়ারগুলো জ্যান্ত হয়ে ঘরময় ছুটোছুটি আর পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে ভেঙে খানখান হয়ে যায়, যাদের শূন্যে ওড়বার কথা নয়, সেই সব বাসনকোসন শূন্যে উঠে পাখির মতো খানিক এদিক-ওদিক করে আবার মাটির উপরে আছড়ে পড়ে। অথচ কারা যে এসব কাণ্ড করছে, তা দেখা, কি বোঝা যায় না। ধনী চৌধুরীর বাড়ির সর্বত্র শিখ-গুর্খা পাহারা, কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর কীর্তি দেখে তারা দস্তুরমতো হতভম্ব হয়ে গেছে।

'খবর পেয়ে চৌধুরীবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তখন সকাল বেলা, দিনের আলোয় কোনোদিকে আবছায়া নেই। আমি বাড়ির চারিদিকে পাহারাওয়ালাদের দাঁড় করিয়ে দিলাম, তাদের উপর হুকুম রইল,—কারুকে যেন বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে না দেয়।

'তারপর বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। সর্বপ্রথমেই আমাকে ভয়াবহ অভ্যর্থনা করল একখানা থান ইট! কোথা থেকে কে যে ছুড়ল কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ইটখানা শোঁ করে আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়ে দুম করে দেয়ালের উপরে গিয়ে পড়ল।

'চৌধুরীদের কর্তা বগলবাবু বললেন,—দেখলেন তো?

'আমি মাথা বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সামনের একটা ঘরে ঢুকে পড়ে বললাম, এই কাণ্ড কি সর্বদাই হচ্ছে?

'সর্বদাই। স্থান-কাল-পাত্র নেই, বাড়ির যেখানে মানুষ থাকে সেইখানেই উপদ্রব। কিন্তু উপদ্রবে আমাদের প্রাণ এরই মধ্যে যায় যায় হয়ে উঠেছে। ঘরের কোনো দরজা বন্ধ রাখবার উপায় নেই, ভিতর থেকে বন্ধ করলে দরজার খিল কখনো আপনি খুলে যায়, কখনো বাইরে এমন ধাক্কার পর ধাক্কা পড়তে থাকে যে, আমরাই খুলে না দিয়ে পারি না—অথচ দেখতে পাই না কারুকেই! বাড়ির আসবাবপত্তর ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে এই ঘরেরই অবস্থা দেখুন না!

'ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। কোথাও একখানা প্রকাণ্ড দেয়াল-আয়না মেঝের উপর চুরমার হয়ে রয়েছে, কোথাও একখানা ভাঙা চেয়ার বা ওলটানো টেবিল, আবার কোথাও-বা ছিঁড়ে-পড়া আলোর ঝাড়ের টুকরো ছড়ানো!

'একদিকে তখনও দু-খানা আস্ত চেয়ার ছিল, আমি বসবার জন্যে তাদের একখানার দিকে অগ্রসর হলাম।

'হঠাৎ চেয়ারখানা জীবন্ত হয়ে এমন অপূর্ব তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিল যে, উদয়শঙ্করও দেখলে অবাক হয়ে হার মানতেন! আমি যতই তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করি, সে ততই আমার হাত ছাড়িয়ে নাচতে নাচতে এঁকেবেঁকে তফাতে সরে যায়!

'তখন হার মেনে চেয়ারম্যানকে ছেড়ে আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে বললাম, ঘরের ভিতর যদি কেউ এসে থাকে, তাহলে দেখি সে কেমন করে বেরিয়ে যায়! বলেই বন্ধ দ্বারের উপরে পিঠ রেখে দাঁড়ালাম।

'আমার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই নৃত্যশীল চেয়ারখানা সশব্দে আমার বদলে মেঝের উপর পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল! পরমুহূর্তেই শুনলাম, খিল খোলার ও ধড়াস করে দরজা খোলার শব্দ! ফিরে দেখি, যে-দরজা স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছি আবার তা খুলে গেছে—অর্থাৎ ঘরের ভিতর যাকে বন্দি করতে চেয়েছিলাম সে আর ঘরের ভিতর নেই।

'বগলাবাবু শুকনো গলায় বললেন, দেখছি, আজ থেকে মানুষেরও উপর আক্রমণ আরম্ভ হল। না, এ বাড়িতে আর থাকা চলে না—।

'আমি বললাম, রহস্য এখনও আমি বুঝতে পারছি না। বগলাবাবু, আমাকে বাড়ির সব ঘর একে একে দেখান দেখি!

'প্রথমে বাড়ির একতলার ঘরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। সাত-আটখানা ঘর পরীক্ষা করবার পর একখানা অদ্ভুত ঘর দেখলাম, একটিমাত্র দরজা ছাড়া তার কোথাও কোনো জানলা নেই। সে যেন গুহাঘর!

'বগলাবাবু বললেন, এখানা হচ্ছে কর্তাদের আমলের ঘর। এমন অন্ধকূপ তাঁরা যে কেন তৈরি করিয়েছিলেন কেউ তা জানেন না। আমি এটাকে গুদামঘর করে রেখেছি।

'ঘরে ঢুকে দেখলাম, তার ভিতরে রয়েছে অনেক পুরোনো আসবাব ও যজ্ঞিবাড়িতে ব্যবহার করবার জন্যে বড়ো বড়ো কড়া, পিতলের হাঁড়ি, থালা ও গামলা প্রভৃতি তৈজসপত্র।

'বগলাবাবু—না, আগেই তো বলেছি, যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে উপদ্রবও হয় না! ঘরের মেঝেতে কীরকম পুরু ধুলো জমে আছে, দেখছেন তো? এঘরে আমরা আসি কালেভদ্রে কদাচ! কিন্তু ও কী দেখুন, দেখুন বলেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দরজার নীচের দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

'স্তম্ভিত নেত্রে দেখলাম, দরজার সামনেই ধূলিধূসরিত মেঝের উপরে দাগের পর দাগ পড়ছে! সে দাগ কী করে কেন হচ্ছে জানি না, সেগুলো ঠিক যেন চোখের অগোচর শূন্য থেকে ঝরে পড়ছে—আর ঝরে পড়ছে। সে দাগগুলো যদি পায়ের দাগ হয় তাহলে তেমন অদ্ভুত পায়ের দাগ আমি জীবনে দেখিনি! কেউ যেন ঠিক হাতের মতো দেখতে অদৃশ্য পায়ের আঙুলগুলো ছড়িয়ে পাঁচ আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে হেঁটে ঘরের ভিতর ঢুকছে!

'আমরা দুজনেই আতঙ্কে শিউরে উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম এবং সেখান থেকেই দেখতে পেলাম সেই আঙুল-ছড়ানো হাতের মতো অদৃশ্য পায়ের ভীষণ দাগগুলো আবার বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে। পদশূন্য পদচিহ্ন।

'আমি কাপুরুষ নই, পুলিশে চাকরি নিয়ে অনেক গুণ্ডা, খুনে আর ডাকাতের সঙ্গে নির্ভয়ে লড়াই করেছি, ভূত-প্রেতও কখনো মানিনি, কিন্তু স্পষ্ট দিনের বেলায় এই অপার্থিব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা হল না, কোনো রকমে সপ্রতিভ ভাব বজায় রেখে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লাম।

'এখন বলুন বিমলবাবু, এ কি ভৌতিক কাণ্ড, না ভোজবাজি, না আমরা জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছি?'

তিন

বিমল অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগল।

তারপর বলল, 'সদানন্দবাবু, আমি ভূত মানি না।'

'তবে এসব কী?'

'পরে হয়তো বলতে পারব। আপাতত একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কী কাজ, বলুন।'

'বগলাবাবুকে গিয়ে বলুন, যেখানে পায়ের দাগ দেখেছেন, সেই গুদোমঘরের দরজার সামনে তিনি যেন একটা খুব মজবুত কলাপসিবল গেট লাগিয়ে দেন।'

'তাতে লাভ?'

'পরে বুঝতে পারবেন।'

দুই দিন পরে সদানন্দবাবু এসে বললেন,—

'বিমলবাবু আপনার কথামতো কাজ করা হয়েছে, যদিও আপনার এ খেয়ালের কোনো অর্থই হয় না!'

বিমল হেসে বলল, 'আমার খেয়াল নিয়ে ভেবে আপনি মাথা খারাপ করবেন না সদানন্দবাবু। চলুন, এখন আমরা বগলাবাবুর বাড়িতে যাই। কুমার তুমিও আসবে নাকি?'

কুমার বলল, 'সে-কথা আবার বলতে? তুমি আর আমি হচ্ছি কায়া আর ছায়া।'

বগলাবাবুদের অট্টালিকার কাছে গিয়ে তারা দেখল, বাড়ির সামনে কৌতূহলীদের বিষম জনতা! ভিড় ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখল, কয়েকজন প্রেততত্ত্ববিদ ও খবরের কাগজের রিপোর্টার প্রশ্নের পর প্রশ্নে বগলাবাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

সদানন্দবাবু বিমলের সঙ্গে বগলাবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিমল বলল, 'আমি প্রথমেই আপনাদের গুদোমঘরে যেতে চাই।'

বগলাবাবু বললেন, 'আসুন এই পথে!'

একতলার দালান দিয়ে এগোতে এগোতে বিমল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বগলাবাবু, খালিঘরে কি কোনো উপদ্রবই হয় না?'

'না। যেখানে মানুষ যায়, ভূত যেন সেখানেই তার পিছু নেয়। সে যেন আমাদের চোখের সামনে ভয় দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়! ওই দেখুন, কী কাণ্ড!'

দালানের দেয়ালে একটা মস্ত গোল ঘড়ি টাঙানো ছিল, হঠাৎ সেটা দেয়াল থেকে খসে মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল! প্রেততত্ত্ববিদরা ও কাগজের রিপোর্টাররা প্রাণপণে পদচালনা করে এক মুহূর্তে সেখান থেকে অদৃশ্য হল!

কুমার বলল, 'আমি তো তাই চাই!'

বগলাবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'এই আমার গুদোমঘর! আপনাদের কথামতো দরজার পাল্লার সঙ্গেই আমি কলাপসিবল গেটটা তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু এতে কী উপকার হবে জানি না।'

গেটটা খুলে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বলল, 'পৃথিবীতে সত্যিই যদি অশরীরি ভূত থাকে তাহলে কোনো উপকারই হবে না; কিন্তু—' মুখের কথা শেষ না করেই সে ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরটি মাঝারি। কোথাও জানলা নেই বলে ভিতর দিকটা দিনের বেলাতেই অন্ধকার, চোখ চলে খালি দরজার কাছেই।

সদানন্দবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই দেখুন বিমলবাবু, সেই দাগগুলো—'

পুরু ধুলোর উপরে মানুষের পায়ের দাগের সঙ্গে আরও যে চিহ্নগুলো রয়েছে তাকে পদচিহ্ন বলে সন্দেহ হয় না, কারণ মানুষ বা পশু কোনো জীবেরই পায়ের দাগ সেরকম নয়! দুই হাতের

আঙুল ছড়িয়ে আঙুলের দাগগুলো ধুলোর উপর রাখলে এইরকম দাগ হতে পারে বটে! কিন্তু কেবল দুই হাতে ভর দিয়ে মানুষ তো হাঁটে না!

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কুমার, 'বিমল বিমল! এই দেখো, ধুলোর ওপরে আবার নতুন দাগের সৃষ্টি হচ্ছে!'

সবাই আড়ষ্ট ও স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, জোড়া জোড়া দাগ ঘরের অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল! তারপরেই কে প্রকাণ্ড একটা পিতলের গামলা তুলে মাটির উপরে আছড়ে ফেলল, সশব্দে!

বিমল বলে উঠল, 'শিগগির! সবাই বাইরে চলুন!'

এক-এক লাফে প্রত্যেকেই বাইরে এসে পড়ল! বিমল ক্ষিপ্র হাতে কলাপসিবল গেট টেনে বড়ো বড়ো দুটো তালা লাগিয়ে ও-দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল!

তারপরেই ঘরের ভিতরে জেগে উঠল সে কী কান-ফাটানো অমানুষিক ক্রুদ্ধ গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ দরজার উপরে ভীষণ ধাক্কার পর ধাক্কা! সেরকম বীভৎস ও রক্ত-ঠান্ডা-করা গর্জন পৃথিবীর কোনো জীবের কণ্ঠেই কেউ কখনো শোনেনি—সে যেন একসঙ্গে সিংহ, বন্য মহিষ ও অজগরের উন্মত্ত চিৎকার!

বিমল বিপুল আনন্দে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি তাই। বগলাবাবু, আর কেউ আপনাদের ওপরে অত্যাচার করবে না, শত্রু এখন বন্দি!'

'তার মানে?'

'বৈঠকখানায় চলুন। বুঝিয়ে বলছি।'

চার

সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। বিমল বলতে লাগল

'আমি ভূত মানি না।

'প্রায়ই শুনি ভূতের অত্যাচারের গল্প। তাকে দেখা যায় না, অথচ সে ঢিল ছোড়ে, জিনিসপত্তর ভাঙে, চ্যাঁচায় বা নানান শব্দ করে। আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল, এসব ভূতের কীর্তি নয়। আজ সেই বিশ্বাস দৃঢ় হল।

'সদানন্দবাবুর মুখে যখনই শুনলাম, এখানে যে উপদ্রব করছে তাকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে আসতে বা ঘর থেকে বেরোতে হলে তার দরজার দরকার হয়, তখনই বুঝলাম এসব উপদ্রবের মূলে আছে কোনো অদৃশ্য জীব! আর ঘরে পুরে দরজা বন্ধ করলেই তাকে আটক করা যাবে।

'অদৃশ্য জীবের কথা শুনে আশ্চর্য হবেন না! বাতাসও অদৃশ্য, কিন্তু আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। অদৃশ্য হলেও মৃদু বাতাস হালকা নিরেট জিনিস নিয়ে ছোড়াছুড়ি করতে পারে। বাতাস যখন ঝড় হয়ে দাঁড়ায় তখন সে বাড়িঘরও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। মরুভূমির বালির উপরে আলের জলের পটে বাতাস কতরকম দাগ কাটে, তাকে বাতাসের পদচিহ্ন বললে ভুল হয় না, অদৃশ্য বাতাসের পক্ষে যা সম্ভব, অদৃশ্য জীবের পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। ফুটবলের ভিতরে বাতাসকে বন্দি করা যায়, এই অদৃশ্য জীবকেও আজ আমি ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে বন্দি করেছি।

'বিরাট বিশ্বে গ্রহে উপগ্রহে কত রহস্যময় জীব আছে, মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও তা

আবিষ্কার করতে পারেনি। হিমালয়ের দানব-মানুষের কথা সবে জানা গিয়েছে। মঙ্গলগ্রহেও নূতন এক জীবের কথা সবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহে কোনোরকম জীব নেই একথা জোর করে বলা চলে না। কে জানে তাদের মধ্যে কোনো কোনো জীব বাতাসের মতো অদৃশ্য অথচ শক্তিমান কি না? তাদের কেউ কেউ হয়তো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসে, আর আমরা তাদের ভূত ভেবে ভয় পাই।

'বগলারাবু, আপনাদের বিভীষিকাকে আমি বন্দি করেছি। বেশি দিন ওখানে বন্ধ থাকলে হয়তো সে অনাহারে মারা পড়বে। তাকে মুক্তি দিলেও হয়তো সে আপনাদের আক্রমণ করবে। আপনাদের কর্তব্য আপনারাই স্থির করুন, আমি এখন বিদায় হলাম—নমস্কার মশাই, নমস্কার।'

পিশাচ

॥ এক ॥

বাড়িওয়ালা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, এ বাড়িখানা নিয়ে আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে গিয়েছি। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা মিথ্যে নয়। এ বাড়িতে গেল তিন মাসের মধ্যে তিনজন লোক মারা পড়েছে! আর সেই তিনটি মৃত্যুই রহস্যময়। এ বাড়িতে আর বোধহয় নতুন ভাড়াটে আসতে রাজি হবে না।'

বিমল বললে, 'ব্যাপারটা আমাদের একটু খুলে বলবেন কি?'

বাড়িওয়ালা বললে, 'ব্যাপারটা এখন সবাই জানতে পেরেছে। সুতরাং আমার আপত্তি নেই।'

কুমার বললে, 'এ বাড়িতে যিনি শেষ-ভাড়াটে ছিলেন, সেই রামময়বাবুর নাম আমরা শুনেছি। উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে তিনি খুব নাম কিনেছেন।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আসবার আগে কিন্তু আমার বাড়ির কোনও দুর্নামই ছিল না। কলকাতার কাছেই যতটা-সম্ভব নির্জনে বসে উদ্ভিদশাস্ত্র আলোচনা করবেন বলেই এই বাড়িখানা তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়ির পিছনকার বাগানে তিনি হরেকরকম দামি গাছ-গাছড়া আনিয়ে নানারকম পরীক্ষা করতেন। পাছে কোনও অভিজ্ঞ লোক তাঁর বাগানে গিয়ে গাছ-গাছড়ার ক্ষতি করে, সেই ভয়ে কারুকে তিনি সেখানে যেতে দিতেন না—এ বিষয়ে তাঁর নিষেধ ছিল খুব স্পষ্ট। কিন্তু মাসতিনেক আগে একদিন সকালবেলায় দেখা গেল, রামময়বাবুর উড়ে বেয়ারাটার মৃতদেহ বাগানের ভিতরে পড়ে রয়েছে! তার সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা কালশিরা,—তার দেহকে যেন অনেকগুলো দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছিল! তার গলাতেও ফাঁসির দাগ! কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য আর ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, তার দেহের ভিতরে এক ফোঁটাও রক্ত বা রস ছিল না। কে যেন তার শরীরের সমস্ত রক্ত আর রস একেবারে নিংড়ে বার করে নিয়েছিল! পুলিশ এল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের কোনও কিনারাই হয়নি। রামময়বাবু রটিয়ে দিলেন, তাঁর বাগানে ভূত আছে,—কেউ যেন আর তার ত্রিসীমানায় না যায়!'

বিমল বললে, 'তারপর থেকে রামময়বাবুও কি আর বাগানের ভিতরে যেতেন না?'

বাড়িওয়ালা বললে, 'যেতেন বই কি! বাগানের ভিতরেই তাঁর সারা বেলা কেটে যেত। তারপর শুনুন। মাস দেড়েক আগে আর এক সকালে বাগানের ভিতরে আর একটা অচেনা লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পায়, সে হচ্ছে একজন পুরানো দাগি চোর, চুরি করবার মতলবেই এখানে এসে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। সে-হতভাগ্যের গায়েও ছিল তেমনি লম্বা লম্বা কালশিরার ডোরা আর তার দেহের ভিতরেও একফোঁটা রক্ত বা রস ছিল না!'

বিমল খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'তারপর রামময়বাবু কেমন করে খুন হলেন, সেই কথা বলুন।'

বাড়িওয়ালা বললে, 'খুন? না, খুন নয়। হপ্তাখানেক আগে বাড়ির একটি ঘর থেকে রামময়বাবুর মৃতদেহ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন, তাঁকে কেউ হত্যা করেনি, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

কুমার শুধোলে, 'তাঁর দেহেও কি কালশিরার দাগ ছিল? রক্ত আর রস কেউ শোষণ করেছিল?'

বাড়িওয়ালা মাথা নেড়ে বললে, 'মোটেই না, মোটেই না! তাঁর মৃতদেহের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু হুজুগে লোকরা তা বিশ্বাস করবে কেন? রামময়বাবুর মৃত্যু নিয়েও তারা মহা হই-চই লাগিয়ে দিয়েছে!'

বিমল বললে, 'আপনার আর কিছু বলবার নেই?'

—'আছে, তবে সে বিশেষ কিছু নয়। রামময়বাবু মারা পড়বার আগেই, ওই বাগানের ভিতরে প্রায় ইঁদুর, ছুঁচো, প্যাঁচা, বাদুড় আর চামচিকের মরা দেহ পাওয়া যেত। তাদের দেহেও রক্ত কি রস থাকত না!'

বিমল উত্তেজিত ভাবে বললে, 'আপনি যেসব জীবের নাম করলেন তারা সবাই নিশাচর। বাগানে কি মরা-কাক, চিল বা চড়াই পাখি পাওয়া গেছে?'

—'না। ও বাগান সাংঘাতিক হয় রাত্রেই। সন্ধ্যার পর আজকাল ওর আশপাশ দিয়ে কেউ তাই হাঁটতে চায় না। সকলেরই বিশ্বাস, রাত্রে ওখানে পিশাচের আবির্ভাব হয়। রামময়বাবুর মৃত্যুর পর থেকেই বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। ওখানে আর কেউ বাস করতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

কুমার বললে, 'কিন্তু আমরা যদি ওখানে কিছুদিন বাস করতে চাই?'

বাড়িওয়ালা খানিকক্ষণ বিস্মিত নেত্রে কুমার ও বিমলের মুখের পান তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'তাহলে আমার আপত্তির কোনও কারণই নেই! কিন্তু মনে রাখবেন, সব কথা শোনবার পরেও ওখানে গিয়ে আপনারা যদি কোনও বিপদে পড়েন, সেজন্যে আমাকে পরে দায়ী করতে পারবেন না। আমি ভাড়া দিই অর্থলাভের জন্যে, নরহত্যার জন্যে নয়।'

বিমল বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের রক্ত শোষণ করে, আজও বোধহয় এমন পিশাচের সৃষ্টি হয়নি। তাহলে এই কথাই রইল। আজ বৈকালেই আমরা ওই বাড়িতে গিয়ে উঠব।'

॥ দুই ॥

বিমল ও কুমার বৈকালের পরে সেই রহস্যময় বাড়িতে এসে উঠল। টালিগঞ্জ থেকে যে-পথটি রিজেন্ট পার্কের পাশ দিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে চলে গিয়েছে, তারই একপাশে এই সঙ্গীহীন বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ আর শষ্যখেত, মাঝে মাঝে এক-একটা পোড়ো পুকুর বা জলাভূমি অস্তগামী সূর্যকিরণে চক চক করে উঠছে। জায়গাটা নির্জন বটে!

বাড়ির পিছনেই খানিকটা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এইটেই হচ্ছে রামময়বাবুর বাগান।

বাগানের ঠিক উপরেই দোতলার একটা ঘরে গরম জলে চা মিশাতে মিশাতে বিমল বললে, 'আচ্ছা কুমার, তুমি ভূত-পেত্নী-পিশাচ বিশ্বাস করো?'

কুমার বললে, 'সাধারণ লোকে যখন ভূতের গল্প বলে তখন আমি তা হেসে উড়িয়ে দিই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও যখন ভূতপ্রেত নিয়ে মাথা ঘামান, তখন তা আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না বটে, কিন্তু বিশ্বাসও করতে প্রবৃত্তি হয় না।'

বিমল বললে, 'পিশাচরা নাকি মানুষের মতন দেহধারী হলেও মানুষ নয়। অনেক সময়ে প্রেতাত্মারা নাকি মানুষের মৃতদেহের ভিতরে এসে আশ্রয় নেয়। তখন সেই মড়া জ্যান্ত হয়ে জীবিত মানুষদের রক্ত চুষে খায়! লোকের কথা মানতে গেলে বলতে হয়, পাশের ওই বাগানে অমনি কোনও জ্যান্ত মড়া রোজ রাত্রে জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করতে আসে!'

বিমল ও কুমার দুজনেই জানলা দিয়ে বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগান আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বিমল চা ঢেলে একটা পিয়ালা কুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'কিন্তু এই নির্বোধ পিশাচটা রক্তপানের জন্যে আর কি কোনও ভালো জায়গা খুঁজে পেলে না? ওই পাঁচিল-ঘেরা বাগানটুকুর ভিতরে ক-টা জীবই বা আসতে পারে?'

সামনের টেবিলের উপরে এক চাপড় বসিয়ে দিয়ে কুমার বলে উঠল, 'ঠিক! বাগানের বাইরে এত বড়ো বড়ো জীব থাকতে সে এখানে বসে অপেক্ষা করবে কেন?'

বিমল হেসে বললে, 'হ্যাঁ, তবে যদি বলো, এই পিশাচটি অত্যন্ত বিলাসী, কবির মতো, ফুলের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে, তাহলে—'

কুমার বাধা দিয়ে বললে, 'আমি ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমার মত হচ্ছে, এখানে পিশাচ-টিশাচ কিছুই আসে না!'

বিমল মৌনমুখে চা পান করতে লাগল। কুমারও আর কিছু বললে না।

চারিদিকে সন্ধ্যার নীরবতা ক্রমেই বেশি ঘনিয়ে উঠছে.....

আচম্বিতে পাশের ঘরে একটা শব্দ হল—কে যেন কী-একটা মাটির উপরে ফেলে দিলে!

বিমল ও কুমার দুজনেই চমকে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দ্রুতপদে পাশের ঘরে ছুটে গেল।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একটা মস্ত বিড়াল।

বিমল হাস্যমুখে গর্জন করে বললে, 'তবে রে দুরাত্মা পিশাচ! এমন করে আমাদের ভয় দেখানো? রোস তো!'

বিড়ালটা প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে জানলা-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল!

কিন্তু তার কয়েক সেকেন্ড পরেই বাগানের ভিতর থেকে একটা বিড়ালের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক আর্তনাদ জেগে উঠল—মাত্র একবার! তারপরেই সব চুপচাপ!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বাগানে গিয়ে বিড়ালটা অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন?'

কুমার দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললে, 'দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি!'

বিমল তাড়াতাড়ি বললে, 'খবরদার! যা দেখবার, কাল সকালে দেখলেই চলবে। মনে রেখো, রাত্রে ও-বাগান বিপজ্জনক।'

—'কী বিমল, তুমি ভয় পেলে নাকি?'

—'না ভাই, একে ভয় বলে না। এ হচ্ছে সাবধানতা। সকালে আগে বাগানটা দেখি, তারপর ওখানে রাত্রিবাস করব।'

॥ তিন ॥

রামময়বাবুর বাগান সাধারণ লোকের কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হবে না। কারণ সকলে যেসব বিখ্যাত ফুলগাছকে আদর করে, তাদের কোনওটাই সেখানে নেই।

কিন্তু সেখানে যেসব গাছ-গাছড়া রয়েছে, তার অনেকেরই পরিচয় বিমল ও কুমার জানে না। ফার্ন, পাতাবাহার, ঝাউ, ক্যাকটাস ও পাম জাতীয় এমন অনেক গাছ সেখানে রয়েছে, বাংলা দেশে যাদের দেখা মিলে না।

একদিকে রয়েছে অনেকরকম অর্কিড।

বিমল বললে, 'কুমার, তোমার-আমারও তো বাগানের শখ আছে, কিন্তু এ-রকম অর্কিড কখনও দেখেছ কি?'

কুমার বললে, 'না। এগুলো বোধহয় ভারতবর্ষের অর্কিড নয়।'

বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'বাঃ, বাঃ, কী চমৎকার! দ্যাখো কুমার, দ্যাখো! আর সব অর্কিডের মাঝখানে, বাঁধানো বেদির উপরে যে প্রকাণ্ড অর্কিডটা রয়েছে! অর্কিড যে অত বড়ো আর তার ফুল যে এমন অদ্ভুত হয়, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। গাঢ় বেগুনি ফুল আর তার প্রত্যেক পাপড়ির মুখ থেকে যেন টকটকে রক্ত ঝরে পড়ছে! রক্তমুখো অর্কিড-ফুল!'

কুমার সেইদিকে এগিয়ে গিয়েই বলে উঠল, 'বিমল, শিগগির এদিকে এসো!'

বিমল কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, কালকের সেই বিড়ালটার মৃতদেহ সেইখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে!

দুজনে অবাক হয়ে অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'তাহলে কাল আমরা এই বিড়ালটারই মরণের কান্না শুনেছি! কে একে বধ করলে? কোন অজানা বিভীষিকা এই বাগানে বাস করে? আজ রাত্রে তা বোঝবার চেষ্টা করব!'

॥ চার ॥

পেট্রলের একটা চারশো-বাতি লণ্ঠন ও দুটো বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার সন্ধ্যার পর বাগানে এসে বসল।

খানিক আলোয় খানিক কালোয় বাগানের বিচিত্র গাছগুলোকে আরও অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

বাড়িওয়ালা সত্য কথাই বলেছিল, সন্ধ্যার পরে ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। কারণ দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরেও আশপাশ থেকে তারা কোনও মানুষেরই সাড়া পেলে না। তাদের মনে হল, এ যেন সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই, কেবল অভিশপ্তরাই এখানে বাস করতে পারে।

দু-তিনটে প্যাঁচা ও বাদুড় শূন্যকে শব্দিত করে কোথায় উড়ে গেল। বিমল ও কুমার দুজনেই তাদের উড়ন্ত দেহের দিকে মুখ তুলে দেখলে—হয়তো তারা আশা করেছিল যে, এখনই কোনও অজ্ঞাত শত্রু তাদের দেহ ধরে বাগানের জমিতে পেড়ে ফেলবে!

বিমল বললে, 'কুমার, একটা চমৎকার মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ কি?'

—'পাচ্ছি। কিন্তু এ বাগানে সকালে কোনও ফুলও দেখিনি, কোনও সুগন্ধও পাইনি!'

—'হয়তো এ ফুল রাত্রে ফোটে। আমার যেন মনে হচ্ছে, সুগন্ধ আসছে ওই অর্কিডগুলোর দিক থেকেই।'

—'আচ্ছা, আমি দেখে আসছি'—এই বলে কুমার উঠে পড়ল।

বিমল দেখলে, কুমার ধীরে ধীরে অর্কিডগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর সেই রক্তমুখো অর্কিডফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমারের দেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে বিষম ছটফট করতে লাগল!

চোখের পলক ফেলবার আগেই বিমল সেখানে গিয়ে হাজির হল এবং কুমারের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। সে তখনই রিভলভার তুলে অর্কিডগাছটাকে লক্ষ্য করে উপরি উপরি দুইবার গুলিবৃষ্টি করলে, তারপর মাটি থেকে কুমারের বন্দুকটা নিয়ে আরও দু-বার ছোড়বার পরেই রক্তমুখো ফুলসুদ্ধ অর্কিড-গাছটা দু-খানা হয়ে ভেঙে পড়ল!

কুমার তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার সারা দেহ জড়িয়ে অনেকগুলো লম্বা শুয়া বা দাড়া থর থর করে কাঁপছে! বিমল তাড়াতাড়ি ছুরি বার করে সেইগুলো কাটতে বসল!

॥ পাঁচ ॥

কুমারের জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু তার সর্বাঙ্গ তখন ফোড়ার মতন টাটিয়ে রয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'আসল ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল.। কেতাবে পড়েছিলুম, দক্ষিণ আমেরিকা ও আরও কোনও কোনও দেশে এমন কোনও কোনও জাতের অর্কিড পাওয়া যায়, যারা জীবজন্তুর রক্তশোষণ করতে পারে। উদ্ভিদশাস্ত্রে পণ্ডিত রামময়বাবু ওই-রকম এক মারাত্মক অর্কিড এনে এখানে পালন করছিলেন। দিনে সে নিরাপদ ছিল, কিন্তু রাত্রে তার ফুলে গন্ধ জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রক্তপান করতে চাইত! তখন গন্ধ ছড়িয়ে নানা জীবজন্তুকে কাছে আকর্ষণ করে এই পিশাচ অর্কিড অক্টোপাসের মতন শুয়া দিয়ে তাদের আক্রমণ করত!'

ডালিয়ার অপমৃত্যু

॥ ক ॥

বিমলের বাড়ির ছাদের উপরে ছোটোখাটো একটি ফুলের বাগান ছিল। সেখানে বছরের নানা সময়ে জুঁই, চামেলি, বেল, হাসনুহানা, গন্ধরাজ ও গোলাপ প্রভৃতি তো ফুটতই, তার উপরে ছোটো-বড়ো কাঠের বাক্সে ও টবেও দেখা যেত নানা-জাতের মরশুমি ফুলের রঙের বাহার।

সেদিন সকালে বিমল বসে বসে কতগুলো চারাগাছের গোড়ায় সার দিচ্ছে, এমন সময়ে কুমারের আবির্ভাব।

মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকিয়েই বিমল বললে, 'কুমার, তোমাকে আজ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

কুমার বললে, 'আমার এক বন্ধু বড়ো বিপদে পড়েছে। তারই কথা ভাবছি।'

—'বন্ধুটি কে? আর বিপদই বা কী?'

—'তাকে তুমিও চেনো। সুবোধ রায়, কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। চুরির দায়ে পড়েছে।'

—'চুরি!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সে চুরি করেনি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বলে বোধ হচ্ছে। ঘরের ভিতরে চলো।'

দুজনে ছাদের পাশের ঘরের ভিতরে গিয়ে বসল। রামহরিকে চা তৈরি করতে বলে বিমল ফিরে বললে, 'আচ্ছা ভাই, এখন তোমার বন্ধুর বিপদের কথা বলো।'

কুমার বললে, 'তাহলে গোড়া থেকেই শোনো....সুবোধের দাদামশাই বিপিনবাবু খুব ধনী লোক। কিন্তু তাঁর ছেলে নেই, আছেন কেবল দুই মেয়ে। বড়োমেয়ের এক ছেলে, নাম অনন্ত বসু। সুবোধের মা হচ্ছেন ছোটোমেয়ে। অনন্ত আর সুবোধ দাদামশাইয়ের কাছেই থাকে, কারণ তারাই তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

বিপিনবাবু অনেকদিন থেকেই উদরী রোগে ভুগছেন। সম্প্রতি ডাক্তাররা জবাব দিয়ে বলে গেছেন, তিনি আর মাসখানেকের বেশি বাঁচবেন না। কাজেই বিপিনবাবু স্থির করেছেন, আসছে সোমবার তিনি উইল করে দুই নাতিকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন।

ইতিমধ্যে গেল-কাল রাত্রে বিপিনবাবুর লোহার সিন্ধুক থেকে একসুট মুক্তার গহনা অদৃশ্য হয়েছে! গহনাগুলি ছিল বিপিনবাবুর স্বর্গীয় স্ত্রীর—অর্থাৎ সুবোধের দিদিমার। তাদের দাম হবে নাকি পঁচিশ হাজার টাকা।

ইনস্পেকটার সদানন্দবাবুকে তুমি তো চেনো? এই মামলার ভার পড়েছে তাঁরই উপরে। তিনি সন্দেহ করছেন সুবোধকে।'

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'সন্দেহের কারণ?'

'প্রথমত, গেল কাল বিপিনবাবুর রোগশয্যার পাশে বসে রাত কাটিয়েছে সুবোধই। আর সিন্ধুকের চাবি যে তার দাদামশায়ের মাথার বালিশের নীচে ছিল, এ কথা সে জানত। দ্বিতীয়ত, আজ সকালে লোহার সিন্ধুকের তলায় সুবোধের দেরাজ আর টেবিলের চাবি পাওয়া গেছে। পুলিশের মতে, এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।'

—'লোহার সিন্ধুক কি বিপিনবাবুর শয়নগৃহেই থাকত?'

—'না, অন্য ঘরে।'

—'তোমার বন্ধু যখন সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে, তখন উইল হবার ঠিক আগেই বোকার মতন এমন চুরি করবে কেন?'

—'পুলিশ একটা উদ্দেশ্যও আবিষ্কার করেছে। সুবোধ 'শেয়ার মার্কেটে' গিয়ে 'স্পেকুলেশন' করত। ওই কাজে লোকসান হওয়াতে তার বিশ হাজার টাকা দেনা হয়েছে। পুলিশের মতে, সুবোধ চুরি করে ওই দেনা শুধতে চায়।'

—'বিপিনবাবু নিজে কী বলেন?'

—'তিনি রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছেন। সুবোধ যে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।'

—'বিপিনবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তাহলে সুবোধের মাসতুতোভাই অনন্ত?'

—'তা ছাড়া আর কী!'

—'সুবোধের সঙ্গে অনন্তের বেশ বনিবনাও আছে?'

—'হ্যাঁ। সুবোধের এই বিপদে অনন্ত অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। এমনকি আমার সামনেই সে কেঁদে ফেললে।'

—'লোহার সিন্ধুকের ভিতর কেবল কি ওই একসুট মুক্তার গহনা ছিল?'

—'না, ছিল আরও অনেক কিছুই, কিন্তু চোর কেবল ওই মুক্তার গহনাগুলোই সরিয়েছে। এইজন্যেই তো পুলিশ সন্দেহ করছে যে, এ চোর বাহির থেকে আসেনি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'দ্যাখো কুমার, গোয়েন্দাগিরি করা আমার কাজ নয়। তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারব বলেও মনে হচ্ছে না। তবু চলো, একবার বিপিনবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।'

॥ খ ॥

বিমল ও কুমার বিপিনবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে, দেউড়িতে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কুমার একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'সুবোধবাবু কোথায়?'

সে বললে, 'বড়দাদাবাবুর বসবার ঘরে।'

কুমার বললে, 'অনন্তবাবুর বৈঠকখানায়। এসো বিমল!'

উঠোনের পাশের সুদীর্ঘ দালান পার হয়ে কুমারের সঙ্গে বিমল একটি বড়ো ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখলে, সেখানে চারজন লোক বসে আছে। পুলিশইনস্পেকটার সদানন্দবাবু, তাঁর একজন সহকারী, অনন্ত ও সুবোধ।

বিমলকে দেখেই সদানন্দবাবু বলে উঠলেন, 'একী, আপনি যে এখানে! 'অ্যাডভেঞ্চারে'র খোঁজে বুঝি?'

বিমল হেসে বললে, 'যেসব বঙ্গবীর ঘরের কোণে কি চৌকির তলায় 'অ্যাডভেঞ্চার' খোঁজে, আমি তাদের দলে নই। সুবোধবাবুকে অল্পস্বল্প চিনি, কুমারের মুখে তাঁর বিপদের কথা শুনে দেখা করতে এলুম।'

সুবোধ এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে বসেছিল। এখন মৃদুস্বরে বললে, 'বিমলবাবু, চোর অপবাদ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়াও ভালো ছিল! আমি নির্দোষ!'

অনন্ত ছলছল চোখে বললে, 'সুবোধ আমার ভাই। সে কখনও চোর হতে পারে না।'

সদানন্দবাবুর সামনের টেবিলের উপরে রুমালের খুঁটে বাঁধা কতকগুলো চাবিসুদ্ধ রিং-য়ের দিকে বিমলের চোখ পড়ল। সে বললে, 'ওই চাবিগুলোই কি লোহার সিন্ধুকের তলায় পাওয়া গেছে?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

বিমল চাবি-বাঁধা রুমালখানা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলে। দেখলে, রুমালের এককোণে রেশমি সুতোয় একটি 'এস' অক্ষর বোনা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, 'সুবোধবাবু, এই রুমাল আর চাবি আপনার?'

ম্লানমুখে সুবোধ বললে, 'হ্যাঁ আজ দু-দিন ওই রুমাল আর চাবি আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

বিমল বললে, 'সদানন্দবাবু, আপনারা আর কোনও সূত্র পেয়েছেন?'

—'এইমাত্র ওই বাগানের ভিতরে একটি মুক্তা-বসানো আংটি কুড়িয়ে পেয়েছি।'

—'মুক্তার আংটি? দেখি!'

সদানন্দবাবু আংটিটি বিমলের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই আংটিটিও চোরাই মালের সঙ্গেই ছিল. চোরের অগোচরে কী করে পড়ে গিয়েছে!'

ঘরের কোলেই দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট একটি বাগান। আংটি থেকে মুখ তুলে বিমল সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে। খানিকক্ষণ পরে বললে, 'দেখছি বাগানে যেতে গেলে এই ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। চোরও তাহলে এই ঘর দিয়েই বাগানে গিয়েছিল?'

অনন্ত বললে, 'অসম্ভব! কাল রাত্রে আমি নিজের হাতে এই ঘর বন্ধ করে শুতে গিয়েছি!'

বিমল সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে, 'আচ্ছা সুবোধবাবু, আপনি কি এসেন্স ভালোবাসেন?'

তার এই অর্থহীন, অসংলগ্ন প্রশ্ন শুনে একটু বিস্মিত স্বরে সুবোধ বললে, 'জীবনে কখনও আমি এসেন্স ব্যবহার করিনি! এসেন্স ভালোবাসেন আমার দাদা!'

—'অনন্তবাবু?'

—অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বেশ, বেশ! কোন গন্ধ আপনি বেশি পছন্দ করেন?'

—'বকুল। কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ আপনি এসেন্সের কথা তুললেন কেন?'

—'মনে হল, তাই জিজ্ঞাসা করলুম! আসুন সদানন্দবাবু, এসো কুমার, আমরা একবার বাগানটাও ঘুরে আসি।'

॥ গ ॥

বাগানটি আকারে তিন কাঠার বেশি হবে না। নানান গাছে নানান রকম ফুল ফুটে রয়েছে। একটি ছোট্ট কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরনাও রয়েছে। চারিদিকে মৌমাছি ও প্রজাপতিরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে।

এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে বিমল বললে, 'বাগানটিকে খুব যত্ন করা হয় দেখছি।'

অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই এক শখ নিয়েই আমার সারাদিন কেটে যায়। এ বাগান একা আমিই তৈরি করেছি। এখান থেকে কেউ একটি ফুল ছিঁড়লেও আমার সহ্য হয় না। আমার অগোচরে পাছে কেউ এখানে ঢোকে, সেই ভয়েই বাগানে ঢোকবার দরজা করেছি আমার বৈঠকখানার ভিতরে।'

এক জায়গায় অনেকগুলো ডালিয়াগাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় দুলছিল। বিমল খানিকক্ষণ তাদের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'চমৎকার ফুল ফুটেছে তো!'

অনন্ত গর্বিত স্বরে বললে, 'ফুটবে না, প্রত্যেক গাছটিকে যে আমি যত্ন করি!'

একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিমল বললে, 'কিন্তু এত যত্নেও ও-গাছটি এমন নেতিয়ে পড়েছে কেন?'

অনন্ত বললে, 'বোধহয় শিকড়ে পোকা-টোকা ধরেছে!'

সদানন্দবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'এই কি ফুলগাছ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়? আপনারা পাগল হলেন নাকি?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'সদানন্দবাবু, আপনারা বড়ো বড়ো মামলা করেন, বড়ো বড়ো প্রমাণ দেখেন, বড়ো বড়ো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান! কিন্তু ছোটো ছোটো ব্যাপারকে একেবারে এতটা ঘৃণা করবেন না! গাছের শিকড়ে পোকা-ধরাটা সব সময়ে খুব তুচ্ছ বিষয় না হতেও পারে!'—এই বলেই সে একটানে সেই নেতিয়ে-পড়া ডালিয়াগাছটা মাটি থেকে উপড়ে তুলে ফেললে!

অনন্ত হাঁ হাঁ করে বলে উঠল, 'ছি ছি, কী করলেন!'

বিমল আচম্বিতে সেইখানে বসে পড়ে যেখানে গাছটা ছিল সেখানকার মাটির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা ক্যাশবাক্স টেনে বার করলে!

কুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ও কী কাণ্ড!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'গাছের গোড়ায় ক্যাশবাক্স আর বাক্সের ভিতরে মুক্তার গহনা! সদানন্দবাবু, এখনই আপনি অনন্তবাবুকে অনায়াসেই হাতকড়ি পরিয়ে থানায় চালান দিতে পারেন!'

॥ ঘ ॥

সদানন্দবাবু বললেন, 'কেমন করে আপনি এত সহজে চোর ধরলেন?'

বিমল বললে, 'ব্যাপারটা খুব সহজ বলেই! গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল অনন্তের উপরে। সুবোধবাবু যদি তাঁর দাদামশাইয়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে লাভ হবে কার? অনন্তের! তাই বিপিনবাবু যেই উইল করতে চাইলেন, অমনি সুবোধবাবুকে চোর সাজানো হল, সুবোধবাবুর নাম-লেখা রুমালে বাঁধা চাবির গোছা পাওয়া গেল, লোহার সিন্ধুকের তলায়! দু-দিন পরে যে তার মৃত্যুন্মুখ মাতামহের অর্ধক সম্পত্তির মালিক হবে, সে যে এমন বোকা বা পাগলের মতন চুরি করে নিজের সর্বনাশ করবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না.....সদানন্দবাবু, ওই রুমালে যে বকুলের এসেন্সের মৃদু গন্ধ ছিল, এই সামান্য বিষয়টা আপনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এটাকে আমার কাজে লাগিয়েছি। এই জন্যেই যখন শুনলুম সুবোধবাবু এসেন্স ব্যবহার করেন না আর অনন্ত বকুলের এসেন্স ভালোবাসে, তখনই বুঝলুম এই চাবিসুদ্ধ রুমালখানা চুরি করে চোর তার যে-পকেটে রেখেছিল সেখানে তার নিজের এসেন্স-মাখানো রুমালও ছিল! এই সামান্য প্রমাণেই জানতে পারলুম, সুবোধবাবু নিরপরাধ! আপনার মুখে শুনলুম, বাগানে চোরাই মুক্তার আংটি পাওয়া গেছে; অনন্তের মুখে শুনলুম, এ বাগান তার নিজের, আর ঘটনার সময়ে বাগানে যাবার পথ ছিল বন্ধ,—অর্থাৎ সে ভিন্ন আর কেউ এখানে আসতে পারত না। তখনই মনে প্রশ্ন জাগল, তবে এ বাগানে চোরাই মাল পাওয়া গেল কেমন করে? নিশ্চয়ই সে চোরাই মাল নিয়ে বাগানে এসেছিল, আর সেই সময়ে কোনও-গতিকে আংটিটা বাইরে পড়ে গিয়েছিল! বাগানে চোরাই মাল নিয়ে আসবার কারণ কী? চোর নিশ্চয়ই মাল লুকোবার জন্যে ওখানে গিয়েছিল! তার পরের প্রশ্ন—মালগুলো কোথায় লুকানো হয়েছে? আমি লক্ষ করে দেখলুম,

বাগানের সব ফুলের গাছই সতেজ আর সজীব, কেবল একটি পরিপুষ্ট ডালিয়াগাছ অসম্ভবরকম নেতিয়ে পড়েছে! তখনই আমার মন বললে, গাছের গোড়ায় কোনও সন্দেহজনক গলদ আছে! অনন্ত বুদ্ধি খাটিয়েছিল যথেষ্ট! সে ভেবেছিল যে, ডালিয়াগাছের গোড়া খুঁড়ে চোরাই মাল পুঁতে রাখলে কেউ আর কোনও সন্ধান পাবে না! কিন্তু শিকড়ে চোট লেগে গাছটি যে মরো মরো হবে, আর তাই দেখে কারুর মনে যে সন্দেহ হবে, এতটা সে আন্দাজ করতে পারেনি! হায় হায় সদানন্দবাবু, চোরের পাল্লায় পড়ে এমন সুন্দর একটি ডালিয়াগাছ যে অপঘাতে মারা পড়ল, এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কেন না ফুলকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি!.....চলো কুমার, আর আমাদের এখানে থাকবার দরকার নেই!'

বিমল ও কুমার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সদানন্দবাবু চমৎকৃত কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য লোক এই বিমলবাবু! জুলিয়াস সিজারের মতন উনিও অনায়াসে বলতে পারেন, Veni, vidi, vici—আমি এলুম, আমি দেখলুম, আমি জয় করলুম!' যেন তাক লাগিয়ে দিয়ে গেল হে!'

অগাধ জলের রুই-কাতলা

॥ এক ॥

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে বিমল বললে, 'হ্যালো! কে? সুন্দরবাবু? নমস্কার মশাই, নমস্কার! কী বলছেন? আমাদের দরকার? কেন বলুন দেখি? পরামর্শ করবেন? কীসের পরামর্শ? রহস্যময় হত্যাকাণ্ড, আসামি নিরুদ্দেশ? কিন্তু সেজন্যে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কী হবে বলুন, আমরা তো ডিটেকটিভ নই! আপনার ডিটেকটিভবন্ধু জয়ন্তবাবুর কাছে যান না! তিনি অন্য একটা মামলা নিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন? ও! আচ্ছা, আসতে ইচ্ছে করেন, আসুন,—কিন্তু আমরা বোধহয় আপনার কোনও কাজেই লাগব না, কারণ গোয়েন্দাগিরিতে আমরা হচ্ছি নিতান্ত গোলা ব্যক্তি, কিছুই জানি না বললেও চলে! কী বলছেন? আমাদের ওপরে আপনার গভীর বিশ্বাস? ধন্যবাদ!.....এখানে এসে চা খাবেন? বেশ তো! গোটা-দুয়েক 'এগপোচ' পেলেও খুশি হবেন? চারটে 'পোচ' পেলেও আপত্তি করবেন না? তথাস্তু!' রিসিভারটা রেখে দিয়ে বিমল ফিরে বললে, 'বাঘা, রামহরিকে ডেকে আন তো!'

বাঘা তখন উপরদিকে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ভাবছিল, দেয়ালের গা থেকে ওই টিকটিকিটাকে কী উপায়ে টেনে নীচে নামানো যায়! বিমলের ফরমাজ শুনে সে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মানুষের ছোটো ছোটো কোনও কোনও কথা কুকুর হলেও বাঘা বুঝতে পারত। যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁরাই এ কথা জানেন।

একটু পরেই বাহির থেকে রামহরির গলা পাওয়া গেল—'ছাড় ছাড়! ওরে হতচ্ছাড়া, কাপড় যে ছিঁড়ে যাবে, এমন ছিনেজোঁক ধড়িবাজ কুকুর তো কখনও দেখিনি!' তার পরেই

দেখা গেল, রামহরির কোঁচার খুঁট কামড়ে ধরে বাঘা তাকে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে এনে হাজির করলে।

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমিই বুঝি বাঘাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ?'

বিমল হেসে বললে, 'লেলিয়ে দিইনি, তোমাকে ডেকে আনতে বলেছি। শোনো রামহরি, মিনিট-দশেকের মধ্যেই ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু এখানে এসে পড়বেন, তিনি তোমার হাতে তৈরি চা আর 'এগপোচের' পরম ভক্ত। অতএব, বুঝেছ?'

রামহরি ঘাড় নেড়ে বললে, 'সব বুঝেছি।'

কুমার ঘরের এক কোণে বসে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। মুখ তুলে বললে, 'আর বুঝেছ রামহরি, আমাদেরও পেটে যে খিদে নেই, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না।'

রামহরি বললে, 'সব বুঝেছি। তোমরা দুটিতে যে বাঘার মতোই পেটুক, আমি তা খুব জানি। খাবারের নাম শুনলেই তোমাদের খিদে পায়।'

কুমার বললে, 'খাবারের নাম তো দূরের কথা রামহরি, তোমার নাম শুনলেই আমাদের খিদের ঘুম ভেঙে যায়? বুঝেছ?'

—'সব বুঝেছি। ভয় হয়, এইবারে কোনদিন হয়তো আমাকেই গপ করে গিলে ফেলতে চাইবে'—বলতে বলতে রামহরি বেরিয়ে গেল।

বিমল বললে, 'কুমার, সেই 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্নের' মামলার পর থেকেই আমাদের উপরে সুন্দরবাবুর বিশ্বাস খুব প্রবল হয়ে উঠেছে দেখছি। কী একটা হত্যাকাণ্ড তদ্বির করার ভার পড়েছে তাঁর উপরে, তাই নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছেন।'

কুমার বললে, 'হত্যাকাণ্ডটা নিশ্চয়ই রহস্যময়, নইলে পরামর্শের দরকার হত না।'

অল্পক্ষণ পরেই মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ শুনে বিমল পথের ধারের জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, গাড়ির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছে সুন্দরবাবুর কাঁসার রেকাবির মতো তেলা টাক এবং ধামার মতন মস্ত ভুঁড়ি।

বিমল হাঁকলে, 'রামহরি, অতিথি দ্বারদেশে, তুমি প্রস্তুত হও।'

॥ দুই ॥

টেবিলের উপরে তখনও চা এবং খাবারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল।

বিমল সোফার উপরে ভালো করে বসে বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে আপনার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুরু করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তাহলে শুনুন। যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম মোহনলাল বিশ্বাস। লোকটি খুব ধনী, আর তাঁর বয়স ষাটের কম নয়। তিনি নিজের বাড়িতে একলাই বাস করতেন, কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্র কেউ আর বেঁচে নেই। আত্মীয়ের মধ্যে আছেন কেবল এক ভাগিনেয়, তিনিই বর্তমানে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী, তাঁর নাম ভূপতিবাবু। কিন্তু

তিনিও মোহনবাবুর বাড়িতে থাকেন না। তার প্রথম কারণ ভূপতিবাবু বেড়াতে আর শিকার করতে ভালোবাসেন বলে আজ তিন বৎসর ধরে ভারতের বাইরে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কলকাতায় ভূপতিবাবুরও নিজের বাড়ি আছে। মোহনবাবুর বাড়ির পিছনেই একটি ষাট-পঁয়ষট্টি গজ লম্বা বাগান, তারপরেই একটি ছোটো রাস্তার উপরে ভূপতিবাবুর বাড়ি।

'মাসখানেক আগে মোহনবাবু নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ে যে, ভূপতিবাবুও খবর পেয়ে বিদেশ থেকে চলে আসেন। তিনি তখন রেঙ্গুনে ছিলেন।

'তারপর কিন্তু মোহনবাবুর অবস্থা আবার ভালোর দিকে ফিরতে থাকে। ডাক্তারদের মতে, ভূপতিবাবুর আশ্চর্য সেবা-শুশ্রূষার গুণেই মোহনবাবুর অবস্থা হয় আবার উন্নত।

'কিন্তু তবু যম তাঁকে ছাড়লে না, তাঁর কাল ফুরিয়েছিল। পরশুদিন দুপুরবেলায় মোহনবাবু দোতলার ঘরে বিছানার উপরে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘরের ভিতরে আর কেউ ছিল না।

'পাশের ঘরে ছিল 'নার্স'। মোহনবাবুর ঘরে ঢুকবার দরজা আছে একটিমাত্র। সেই দরজার সামনেই বারান্দার উপরে মাদুর বিছিয়ে বিশ্রাম করছিল বাড়ির পুরানো চাকর চন্দর। তাকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে কোনও লোকের ঘরের ভিতরে ঢোকবার উপায় ছিল না। সে ছেলেবেলা থেকে এই বাড়িতেই কাজ করছে। চন্দর এত বিশ্বাসী লোক যে, সকল রকম সন্দেহের অতীত।

'ভূপতিবাবু তখন আহার ও বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় ছিল দারোয়ান। সে বলে, বাহির থেকে কোনও লোক বাড়ির ভিতরে ঢোকেনি। চন্দর বলে, সে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল, বারান্দা দিয়ে কোনও লোক তাকে পেরিয়ে ঘরের ভিতরে যায়নি।

'বেলা তখন দেড়টা। ঘরের ভিতর থেকে মোহনবাবু হঠাৎ উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন।

'সেই চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে 'নার্স' ছুটে এল। চন্দরও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে দরজা ঠেলে মোহনবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'মোহনবাবুর মুখ দিয়ে তখন ফেনা উঠছে, আর গলা দিয়ে বেরুচ্ছে গোঁ গোঁ আওয়াজ। দেখতে দেখতে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল!

'নার্স, ও চন্দর দুজনেই নিশ্চিতভাবে বলেছে, ঘরের ভিতরে মোহনবাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

'খবর পেয়ে ভূপতিবাবু ও-বাড়ি থেকে ছুটে এলেন। তখনই ডাক্তারও এসে পড়লেন। কিন্তু তাঁর সামনেই অল্পক্ষণ পরে মোহনবাবুর মৃত্যু হল। ডাক্তারের মতে, মৃত্যুর কারণ হচ্ছে কোনও রকম তীব্র বিষ।

'অকারণে বিষের সৃষ্টি হয় না। মোহনবাবুর কাঁধের উপরে বিদ্ধ হয়ে ছিল অদ্ভুত একটি অস্ত্র। এমন অস্ত্র আমি জীবনে দেখিনি। এটা যে বিষাক্ত, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। এই দেখুন'—বলে সুন্দরবাবু মোড়কের ভিতর থেকে খুব সন্তর্পণে কাঠির মতন একটি জিনিস বার করলেন।

বিমল সাগ্রহে সেটিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। লম্বায় সেটি এক বিঘৎ। চওড়ায় নরুণের চেয়ে মোটা নয়। তার মুখটা তীক্ষ্ণ, আর এক দিকে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটি সোলার চোঙা বা নল বসানো।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, এই কাঠিটি কোন কাঠ দিয়ে তৈরি, বুঝতে পেরেছেন?'

—'হুম, না!'

—'সাগুকাঠ দিয়ে।'

—'কাঠ-ফাট নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমাদের এখন জানা দরকার, ওই বিষাক্ত কাঠের সূচ দিয়ে মোহনবাবুকে আঘাত করলে কে? অস্ত্রটা তো আর আকাশ থেকে খসে পড়েনি?'

কুমার বললে, 'কার উপরে আপনার সন্দেহ হয়?'

—'কপাল-দোষে সন্দেহ করবার কোনও লোকই পাচ্ছি না। ঘরের আশেপাশে হাজির ছিল কেবল দুজন লোক—'নার্স' আর চন্দর। কিন্তু মোহনবাবুকে খুন করবে তারা কোন উদ্দেশ্যে? মোহনবাবুর ঘরের ভিতর থেকে টাকা বা কোনও দামি জিনিসও চুরি যায়নি। তাঁর মৃত্যুতে তাদের কোনওই লাভ নেই, বরং লোকসান আছে। মোহনবাবুর মৃত্যুর জন্যে লাভ হবে খালি ভূপতিবাবুর। কারণ তিনিই তাঁর বিশ লাখ টাকা দামের সম্পত্তির মালিক হবেন। কিন্তু তাঁর উপরেও সন্দেহ করবার উপায় নেই। কারণ প্রথমত, ঘটনার সময়ে তিনি যে নিজের বাড়িতেই ছিলেন এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে এ বাড়িতে আর চন্দরের চোখ এড়িয়ে মোহনবাবুর ঘরে ঢোকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয়ত, তিনি যদি মোহনবাবুর মৃত্যু চাইতেন, তবে সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে 'নিউমোনিয়া'র কবল থেকে উদ্ধার করতেন না। চতুর্থত, মোহনবাবুর মৃত্যুতে তিনি এমন কাতর হয়ে পড়েছেন যে তা আর বলা যায় না। হুম, ভালো কথা। এটা আপনাকে এখনও বলা হয়নি! ভূপতিবাবু অঙ্গীকার করেছেন, মোহনবাবুর হত্যাকারীকে যে ধরে দিতে পারবে, তাকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন!'

বিমল বললে, 'বলেন কী, বি-শ হা-জার টা-কা!'

—'হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো মামলাটা নিয়ে এতবেশি মাথা ঘামাচ্ছি। কিন্তু হায় রে, ব্যাপার যা দেখছি, হত্যাকারীর নাগাল পাওয়া একরকম অসম্ভব বললেও চলে! হুম, আমার কপাল বড়ো মন্দ!'

বিমল খানিকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সাগুকাঠের সেই কাঠিটির দিকে। তারপর সে বললে, 'বিশ হাজার টাকা পুরস্কার! এ লোভ সামলানো শক্ত। আচ্ছা সুন্দরবাবু, এ বিষয় নিয়ে আমি ভূপতিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ তো, এখনই আমার সঙ্গে চলুন না!'

॥ তিন ॥

ভূপতিবাবুর বাড়িখানি বড়ো নয়, কিন্তু দিব্য সাজানো-গুছানো।

তিনি বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন, সুন্দরবাবু তাঁর সঙ্গে বিমল ও কুমারের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভূপতিবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, চেহারা লম্বা-চওড়া, রং ফরসা, মুখশ্রী সুন্দর।

বিমল হাসিমুখে বললে, 'আপনার বিশ হাজার টাকার গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।'

ভূপতি বললেন, 'হ্যাঁ, হত্যাকারীকে ধরতে পারলেই ওই টাকা আমি উপহার দেব। এর মধ্যেই আমি বিশ হাজার টাকার একখানি চেক আমার অ্যাটর্নির কাছে জমা রেখেছি।'

বিমল নীরবে কৌতূহলী চোখে ঘরের সাজসজ্জা লক্ষ করতে লাগল। এ ঘরের ভিতরে এলেই বোঝা যায়, এর মালিক খুব শিকার-ভক্ত লোক। মেঝের উপরে বাঘ-ভাল্লুকের ছাল পাতা এবং দেয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে বুনো বাঘ আর হরিণের মাথা বা শিং ও হরেক-রকম ধনুক, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র।

বিমল বললে, 'আপনি কি শিকার করতে খুব ভালোবাসেন?'

ভূপতি বললেন, 'খুব—খুব বেশি ভালোবাসি। শিকারের লোভে আমি কোথায় না গিয়েছি—আফ্রিকা, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলোন, বর্মা কিছুই আর বাকি নেই। ওই যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেখছেন, ওগুলিও আমি নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন 'হুম, আমিও শিকার করতে ভালোবাসি। তবে আপনি করেন জন্তু-শিকার, আর আমি করি মানুষ-শিকার।'

বিমল বললে, 'মোহনবাবুর বাড়ি এখান থেকে কোন দিকে?'

সুন্দরবাবু বললেন 'উত্তর দিকে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখুন না, ওই যে, বাগানের ওপারে ওই লাল বাড়িখানা! দোতলার ডান পাশে সব-শেষে যে-ঘরখানা দেখছেন, ওই ঘরেই হতভাগ্য মোহনবাবুর মৃত্যু হয়েছে। মাঝখানের জানলার দিকে চেয়ে দেখুন, যে খাটে তিনি শুতেন তারও খানিক অংশ এখান থেকে দেখতে পাবেন।'

ভূপতি দুঃখিত স্বরে বললেন, 'ও-ঘরের দিকে তাকালেও আমার বুকটা হু হু করে ওঠে!'

বিমল সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক, ভূপতিবাবু!..... আপনি কি এই বাগান পেরিয়েই ওই বাড়িতে যেতেন?'

—'না, ওর ভিতর দিয়ে যাবার কোনও উপায়ই নেই। একে তো ওর চারিদিকেই উঁচু পাঁচিল, তার উপরে ওটা হচ্ছে পরের বাগান। বাগানের ওপার থেকে ও-বাড়িতে ঢোকবার কোনও দরজাও নেই।'

সুন্দরবাবু বিমলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে এসে বিশ হাজার টাকার পাকা খবরটা পেলেন তো? এখন চলুন, আমার হাতে অনেক কাজ রয়েছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। ভূপতিবাবুর এই ঘরখানি আমার ভারী ভালো লাগছে—'

বলতে বলতে ও চারিদিকে তাকাতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই বর্শাটা কোন দেশের ভূপতিবাবু?'

—'বোর্নিওর।'

বিমল হাত বাড়িয়ে বর্শাটা নামাতে গেল, কিন্তু ভূপতি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, করেন কী, করেন কী! ওর ফলায় বিষ আছে!'

কিন্তু বিমল ততক্ষণে বর্শাটা নামিয়ে নিয়েছে। সে শান্ত ভাবে বললে, 'ভয় নেই, আমি খুব সাবধানেই এটা নাড়াচাড়া করব। কিন্তু এর ফলায় কী বিষ আছে। ইপোগাছের বিষ?'

ভূপতি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'আপনি কী করে জানলেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বললে, 'বর্শার ডান্ডিটা তো দেখছি জাজাং-কাঠে তৈরি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এর ডান্ডিটা আবার ফাঁপা! এর কারণ কী বিমলবাবু?'

—'কারণ এর দ্বারা বর্শার কাজ চালানো গেলেও আসলে এটি বর্শা নয়, বোর্নিওয়ে একে কী বলে ডাকা হয় ভূপতিবাবু?'

—'আমার মনে নেই।'

—'আমার মনে আছে। এর নাম হচ্ছে সুম্পিটান।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, কী বিচ্ছিরি নাম! কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? আপনিও কি বোর্নিওয়ে গিয়েছিলেন?'

—'গিয়েছিলুম। সুম্পিটান ব্যবহার করতেও শিখেছিলুম। এটা একবার ধরুন না, আপনাকেও এর ব্যবহার হাতে-নাতে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি ভুঁড়ি দুলিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম, না, আমি ওর ব্যবহার-ট্যবহার শিখতে চাই না! শেষটা কি বিষ-টিষ লেগে খুন-টুন হব? আপনিও আপদ রেখে দিয়ে আসবেন তো আসুন! আমার হাতে ছেলেখেলা করবার সময় নেই!'

—'আর একটু সবুর করুন সুন্দরবাবু, আপনাকে সুম্পিটানের বাহাদুরিটা না দেখিয়ে আমি এখান থেকে এক পা নড়ছি না! হ্যাঁ, সাগুকাঠের কাঠিটা আমাকে একবার দিন তো!'

সুন্দরবাবু কাঠিটা বিমলের হাতে দিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'আপনার মতলোবটা কী?'

বিমল জবাব না দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সাগুকাঠের লাঠিটা আগে বর্শার ফাঁপা ডান্ডির গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তারপর জানলা গলিয়ে সেটাকে দুই হাতে তলার দিকে ধরে উঁচু করে ফেললে। তারপর ডান্ডির তলার দিক মুখে পুরে দুই গাল ফুলিয়ে খুব জোরে দিলে বিষম এক ফুঁ!

বাগানের ওপারে মোহনবাবুর বাড়ির ছাদের উপরে একটা চিল চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ সে ঘুরতে ঘুরতে ধুপ করে মাটির উপরে পড়ে গেল।

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কোথাও কিচ্ছু নেই, খামোকা চিলটা পড়ে গেল কেন?'

বিমল বর্শাটা নামিয়ে সহজ ভাবেই বললে, 'আপনার সাগুকাঠের কাঠিটা তার গায়ে গিয়ে বিঁধেছে। সুন্দরবাবু, সুম্পিটানের ইংরেজি নাম কী জানেন? 'ব্লো-পাইপ'! বোর্নিওর লোকেরা 'ব্লো-পাইপে' বিষাক্ত কাঠি ঢুকিয়ে এইভাবে জন্তু বা শত্রু নিপাত করে। এই তিরকাঠির গতি বড়ো কম নয়, সত্তর গজ দূরেও সে মারাত্মক। বোর্নিওয় কাঠিতে ইপো গাছের বিষ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কাঠিতে অন্য কোনও রকম বেশি-তীব্র বিষ মাখানো হয়েছে!....আরে, আরে, ভূপতিবাবু! পায়ে পায়ে পিছু হটে কোথায় যাচ্ছেন? আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইছি বটে, কিন্তু ওই আরশিখানার দিকে চেয়ে আপনার ওপরেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছি! পালাবার চেষ্টা করবেন না, আমি বর্শা ছুড়লে আপনি মারা পড়তে পারেন। আপনার মতন দুরাত্মা ছুঁচোকে মেরে আমি হাতে গন্ধ করতে চাই না! আসল ব্যাপার কী জানেন সুন্দরবাবু? এই ভূপতি মোহনবাবুর লোক-দেখানো সেবা করেছিল, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি এ যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পাবেন না! কিন্তু মোহনবাবু যখন আবার সামলে উঠে ভূপতির বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জোগাড় করলেন, ভূপতি তখন মরিয়া হয়ে 'ব্লো-পাইপে'র আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সে বোর্নিওয় গিয়ে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শিখেছিল। এখান থেকে খাটের উপরে শয্যাশায়ী মোহনবাবুকে দেখা যায়। এখান থেকে পথের কাঁটা সরালে ভূপতিকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ বাংলা দেশের পুলিশ ওই সাগুকাঠের আসল রহস্য চিনবে কী করে? অতএব সে নির্ভাবনায় করে বসল বিশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা। ভূপতি হচ্ছে অগাধ জলের রুই-কাতলা। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ দৈবগতিকে ডেকে এনেছে জল-স্থল-শূন্যের পরিব্রাজক বিমল আর কুমারকে! কাজে-কাজেই ভূপতির পুরস্কার ঘোষণা ব্যর্থ হল না, সে যখন ফাঁসিকাঠে দোললীলার সুখ উপভোগ করবে, তখন আপনি আর আমি করব বিশ হাজার টাকা আধাআধি ভাগ করে নেবার সাধু চেষ্টা! কী বলেন?'

সুন্দরবাবু পকেট থেকে হাতকড়ি বার করে ভূপতির দিকে এগুতে এগুতে কেবল বললেন, 'হুম!'

সুন্দরবাবুর এই বিখ্যাত 'হুম' হচ্ছে আশ্চর্য শব্দ। এর দ্বারা তিনি হাস্য, করুণ, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নয় রকম রসেরই ভাব প্রকাশ করতে পারেন।

বাবা মুস্তাফার দাড়ি

বিমল ও কুমার হচ্ছে নিছক অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত, সাধারণ গোয়েন্দাগিরি নিয়ে তারা কোনওদিন মাথা ঘামাত না। কিন্তু গোয়েন্দার প্রধান প্রধান গুণ, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের দুজনেরই ছিল যথেষ্ট। এইসব কারণে তারা মাঝে মাঝে খুব সহজেই এমন সব শক্ত মামলারও কিনারা করে ফেলতে পারত বড়ো বড়ো পেশাদার গোয়েন্দারাও যাদের মধ্যে তল খুঁজে পায়নি। এই রকমেরই একটি ঘটনার কথা আজ তোমাদের কাছে বলতে চাই।

'ড্রাগনের দুঃস্বপ্নে'র গল্প যাঁরা শুনেছেন, বিমল ও কুমারের সঙ্গে কী করে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর প্রথম পরিচয় হয়, এরই মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই তা ভুলে যাননি।

ওই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। বিমল ও কুমার একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে অকারণেই সুন্দরবাবুর থানায় গিয়ে হাজির হল।

একটা টেবিলের ধারে সুন্দরবাবু চিন্তিত মুখে মাথার টাকে হাত দিয়ে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে বললেন, 'এই যে হুম! একেবারে যুগলে উদয়, ব্যাপার কী?'

কুমার হেসে বললে, 'কিছুই নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম আপনার সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করে যাই!'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'আর গল্প করব! পোড়া অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? একটা বিচ্ছিরি মামলা নিয়ে মহা-ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে ভাই! তবু এসে যখন পড়েছেন, দু-কাপ চা খেয়ে যান!'

বিমল চেয়ার টেনে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মামলাটা কী, শুনতে পাই না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনে কোনোই লাভ হবে না ভায়া, এ মামলার কিনারা করা অসম্ভব।'

'তবু শুনতে দোষ কী?'

'তাহলে শুনুন।...দিন কয় আগে আমারই এলাকায় এক রাত্রে হরেনবাবু নামে একটি ভদ্রলোক খুন হয়েছেন শুনে সকালে তদন্ত করতে গেলুম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, ঘরময়

বইছে রক্তের ঢেউ, আর চারদিকে ছড়ানো কতকগুলো জিনিসপত্তর। তারই মাঝখানে হরেনবাবুর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে, কাঁধে আর বুকে তিনটে গভীর ক্ষত, সেগুলো ছোরার আঘাত বলেই মনে হল। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলুম, হত্যাকারীর সঙ্গে হরেনবাবু রীতিমতো যোজাযুঝি করেছিলেন। মেঝেতে একটা মাঝারি আকারের ঘড়ি পড়ে রয়েছে, ঘড়িটা রাত বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বোঝা গেল, ঠিক ওই সময়েই ঘটনাটা ঘটেছে। রক্তের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলো নিখুঁত জুতোর ছাপ!

'হরেনবাবুর সঙ্গে ওই বাড়িতেই তাঁর ছোটোভাই সুরেন বাস করে। হরেনবাবু বিপত্নীক আর নিঃসন্তান। সুরেন এখনও বিবাহ করেনি। বাড়িতে ওরা দুজন ছাড়া আর একজন প্রায় কালা বুড়ো চাকর থাকে, ঘটনার সময়ে সে একতলার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার কানে কোনও গোলমালই ঢোকেনি। বাড়ির সদর দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, হত্যাকারী কোনও জিনিসই চুরি করেনি।

'বাড়ি খানাতল্লাশ করতে করতে সুরেনের ঘরে পাওয়া গেল একজোড়া রক্তমাখা জুতো। সে জুতো তারই, আর সেই জুতোর সঙ্গে হত্যাকারীর পদচিহ্ন অবিকল মিলে গেল। খুব সহজেই মামলার কিনারা হল ভেবে আমি তখুনি সুরেনকে গ্রেপ্তার করলুম। কিন্তু সুরেনকে বোধহয় আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন?'

'সুরেন বলে ঘটনার রাত্রে সে তার এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত খেটেখুটে সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে। তার পরদিন সকালে বাড়িতে ফিরে সেই-ই প্রথমে হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে। সুরেনের এই বন্ধুর বাপ হচ্ছেন কলকাতা পুলিশেরই আর এক ইনস্পেকটর, তাঁর নাম অবনীবাবু। বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়িটা দেখে আমরা জেনেছি, হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। শবব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারও সেই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইনস্পেক্টার অবনীবাবু বলেন, সুরেন সে রাত্রে তাঁর বাড়ি ছেড়ে এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায়নি। কেবল অবনীবাবু নন, বিবাহ সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপরেও আর সুরেনকে ধরে রাখি কী করে? বিশেষ, তার সপক্ষে আর একটা মস্ত প্রমাণ রয়েছে।'

'কী প্রমাণ?'

'মৃত হরেনবাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে গাছকয় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছে। চুলগুলো নিশ্চয়ই হত্যাকারীর, ধস্তাধস্তি করবার সময়ে হরেনবাবু যে হত্যাকারীর চুল চেপে ধরেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সুরেনের মাথায় একগাছাও পাকা চুল নেই।'

বিমল বললে, 'চুলগুলো একবার আমাকে দেখাবেন?'

'কেন দেখাব না? এই নিন' বলে সুন্দরবাবু ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিলেন।

মোড়কটা খুলে বিমল বললে, 'একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিতে পারেন?'

'তা যেন দিচ্ছি, কিন্তু অতটা খুঁটিয়ে দেখবার কিছুই নেই। ওগুলো পাকাচুল, আর সুরেনের মাথার চুল সব কালো। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।'

বিমল ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে চুলগুলো পরীক্ষা করে বলল,—'এই চুলগুলো কী প্রমাণ দিচ্ছে জানেন? হত্যাকারীকে মৃত হরেনবাবু চিনতেন, আর খালি তার মাথার লম্বা পাকাচুল নয়, মুখেও দাড়ি গোঁফ ছিল।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী করে জানলেন আপনি?'

'পরে তা বলব। আপনি আর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি?'

'না। তবে হরেনবাবুর মৃত্যুর দিন দশেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর এক আত্মীয় মরবার সময়ে উইল করে তাঁদের দুই ভাইকে এক লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছেন। কিন্তু এই উইলের খবর তাঁরা কেউ জানতেন না, কারণ হরেনবাবুর মৃত্যুর মোটে চার দিন আগে ওই আত্মীয়টি মারা পড়েন। এখন অ্যাটর্নি বাড়ি থেকে এই খবর সবে প্রকাশ পেয়েছে।'

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'হরেনবাবুর অবর্তমানে এখন সুরেনই সব টাকার মালিক হবে তো?'

'হ্যাঁ! কিন্তু সুরেনও যদি ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তাহলে তাদের সব সম্পত্তি যাবে হরিহরের হাতে।'

'হরিহর আবার কে?'

'হরেন আর সুরেনের খুড়তুতো ভাই। ঠিক পাশেই তার বাড়ি।'

'সেখানে কিছু খোঁজ নিয়েছেন?'

'তা আবার নিইনি, আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে হে? কিন্তু হরিহর সমস্ত সন্দেহের বাইরে। কারণ প্রথমত, খুনের সময়ে সে উইলের ব্যাপার জানত না, আর জানলেও সুরেন থাকতে তার সম্পত্তি লাভের কোনও সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, তার পায়ের জুতো হত্যাকারীর জুতোর দাগের চেয়ে আধ ইঞ্চি ছোট। তৃতীয়ত, তারও মাথায় পাকাচুল নেই। চতুর্থত, সে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা। ঘটনার দিনে থিয়েটারে এক বিশেষ অভিনয় ছিল, অর্থাৎ সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়। তিন-তিন খানা নাটকে তার পার্ট ছিল। আমি থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, হরিহর ঘটনার পরদিন ভোর সাড়ে ছ-টায় বাড়িতে ফিরেছে। বিমলবাবু, আপনাদের সঙ্গে গল্প করব কী, আমি এখন অকূল পাথারে ভাসছি,—হুম, গল্প করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না!'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার দুরবস্থা দেখে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে! আচ্ছা, আজ

আর বেশিক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না, কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করে বিদায় হব।'

'কী কথা?'

ঘটনাস্থলের কাছে, মাঝরাতে সেদিন যে পাহারাওয়ালা রাস্তায় পাহারায় ছিল, তাকে একবার ডেকে দিন।'

পাহারাওয়ালা এল।

বিমল শুধোলে, 'তোমার নাম কী?'

'চন্দর সিং।'

'আচ্ছা চন্দর সিং, যে বাড়িতে খুন হয় তার কাছ থেকে কত তফাতে তুমি পাহারায় ছিলে?'

'পাঁচ-ছ খানা বাড়ির পরেই।'

'খুন হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়োনি তো?'

চন্দর সিং আহত কণ্ঠে বললে, 'পাহারা দিতে দিতে কোনওদিন আমি ঘুমোইনি, হুজুর!'

'বেশ, বেশ, তুমি দেখছি অসাধারণ পাহারাওয়ালা! তাহলে রাত বারোটার সময় তুমি কি কোনও আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলে?'

'না হুজুর!'

'এখন শীতকালের রাত। বারোটার সময়ে পথে খুব কম লোক চলে। ঘটনাস্থলের কাছে রাত বারোটার সময়ে তুমি কি এমন কোনও লোক দেখেছিলে, যাকে দেখলে সন্দেহ হয়?'

'তিন-চার জন লোককে দেখেছিলুম, কিন্তু কারুর ওপরে আমার সন্দেহ হয়নি!'

'এমন কোনও লোকই দ্যাখোনি, যার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল, আর মুখে ছিল পাকা গোঁফ-দাড়ি?'

চন্দর সিং অল্পক্ষণ ভেবেই বলে উঠল, 'হ্যাঁ হুজুর, দেখেছিলুম। একটা বুড়ো বাঙালি-মুসলমান রাত বারোটার খানিক পরেই আমার সামনে দিয়ে হনহন করে চলে গিয়েছিল বটে।'

'কী করে জানলে, সে বাঙালি-মুসলমান?'

'তার পরনে ছিল বাঙালির মতো আলোয়ান, ধুতি আর পিরান, কিন্তু পশ্চিমা মুসলমানদের মতো তার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল আর মুখে ছিল লম্বা পাকা গোঁফ-দাড়ি।'

'তাকে দেখে তোমার কোনও সন্দেহ হয়নি?'

'সন্দেহ হয়নি বটে, তবে একটা কথা মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল আর মুখের গোঁফ-দাড়ি বেজায় বুড়োর মতন ধবধবে সাদা, কিন্তু সে হনহন করে হাঁটছিল খুব জোয়ান লোকের মতোই!'

'শাবাশ চন্দর সিং! এতটা তুমি লক্ষ করেছিলে? সত্যিই তুমি অসাধারণ পাহারাওয়ালা। আচ্ছা, আমার আর কিছু জানবার নেই।'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'কী আশ্চর্য বিমলবাবু, এই বুড়ো বাঙালি মুসলমানটিকে আপনি আবার কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? আমরা পেয়েছি কেবল গাছকয়েক লম্বা পাকা চুল, কিন্তু দাড়ি-গোঁফই বা আপনি কেমন করে দেখতে পেলেন?'

বিমল সহাস্যে বললে, 'মানস চক্ষু আর কল্পনা শক্তি ব্যবহার করলে অনেক কিছু দেখা যায় সুন্দরবাবু! আমার মত কী জানেন? হত্যাকারীকে হরেনবাবু চিনতেন, তাই সে ছদ্মবেশ পরে খুন করতে গিয়েছিল। খালি পাকা চুলে মুখ লুকোনো যায় না, গোঁফ-দাড়িরও দরকার হয়।'

'তাহলে আপনি বলতে চান, খুনির মাথায় পাকা চুলের তলায় ছিল কাঁচা কালো চুল? আমরা যে সুরেনকে ধরেছি, তার মাথাতেও কালো চুল আছে। তবে কি সুরেনই—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'শীঘ্রই আবার দেখা হবে, তখন সব বলব।' এই বলে সে কুমারের হাত ধরে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চেয়ারের ওপরে আড় হয়ে পড়ে মুখভঙ্গি করে বললেন, 'হুম! বিমলবাবু একটি আস্ত পাগল! খালি আস্ত নয়, মস্ত পাগল!'

পরদিন প্রভাতে থানায় আবার বিমল ও কুমারের আবির্ভাব! তখন সুন্দরবাবুর সঙ্গে একটি যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে জোরে সিগারেটে দম মারতে মারতে হাত-মুখ নেড়ে কথা কইছিল। বিমল লক্ষ করলে, যুবকের মাথায় বাবরি-কাটা চুল, মুখে পাউডারের চিহ্ন, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবি, পরনে জরিপাড় দিশি কাপড়, পায়ে বাহারি লপেটা,—হ্যাঁ, লোকটি রীতিমতো শৌখিন বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে, আসুন—আসুন, নমস্কার! আবার এক নতুন কাণ্ড দেখুন,—জাল-পুলিশের মামলা! এখুনি আবার হন্তদন্ত হয়ে তদন্তে ছুটতে হবে! যত বদমাইশ জুটেছে কিনা আমারই এলাকায়!'

বিমল বললে, 'জাল-পুলিশের মামলা!'

'হ্যাঁ। এই ভদ্রলোকেরই নাম হরিহরবাবু, হরেনবাবুর খুড়তুতো ভাই। ইনি সক্কালবেলায় থানায় অভিযোগ করতে এসেছেন, কাল দুপুরে পুলিশের লোকরা নাকি ওঁদের থিয়েটারে গিয়ে গোলমাল করে আর ওঁর সাজঘরে গিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে এসেছে! অথচ সত্যিকথা বলছি বিমলবাবু, আমরা এর বিন্দুবিসর্গও জানি না!'

বিমল হাসিমুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'নমস্কার হরিহরবাবু! আপনি নিজেই থানায় এসেছেন দেখে সুখী হলুম, কারণ, নইলে আমাদেরই এখুনি আপনার বাড়িতে ছুটতে হত!'

হরিহর বিস্মিত ভাবে ফ্যালফেলে চোখে বললে, 'মশাইকে তো এ জন্মে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'উহুঁ, এ জন্মেও দেখেননি, গেল-জন্মেও দেখেননি বোধহয়। আপনি আর আমরা এক

জগতে বাস করি না তো! কিন্তু আমাকে না চিনলেও আপনি এই চুল-গোঁফ-দাড়িকে চেনেন কি?' বলেই বিমল একরাশ পরচুলা বার করে তুলে দেখালে।

হরিহরের মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। তার পরেই সামলে নিয়ে সে বললে, 'ওগুলো কার, আমি জানি না।'

'জানেন না? বেশ, বেশ, তাহলে ভালো করে বসুন, ধীরে সুস্থে একটা ছোট্ট গল্প শুনুন। এ গল্পেরও পাত্রদের নাম হরেন সুরেন দুই সহোদর, আর তাদের খুড়তুতো ভাই হরিহর। হরেন-সুরেনের নামে এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা সে সৌভাগ্যের কথা টের পাওয়ার আগেই, অ্যাটর্নি-বাড়ির কেরানি সুবোধের মুখ থেকে হরিহর খবরটা জেনে ফেললে, কারণ তারা দুজনেই এক থিয়েটারে অভিনয় করত।

'হরিহর দেখলে, রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার এ একটা মস্ত সুযোগ! উইলের কথা এখনও কেউ জানে না, এই অবসরে হরেন আর সুরেনকে পথ থেকে সরাতে পারলেই লাখ টাকা তার হাতের মুঠোয়! হরিহর মূর্খ হলেও বোকা নয়, চট করে একটা শয়তানি ফন্দি এঁটে ফেললে।

'সে রাত্রে তাদের থিয়েটারে বিশেষ অভিনয়, তিন-তিনটে পালা শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যাবে। প্রথম পালা 'কণ্ঠহার' শুরু হল সন্ধ্যার মুখে। তারপর আরম্ভ হল 'চন্দ্রগুপ্ত', রাত এগারোটার সময়ে। এ পালায় হরিহর সাজলে আলেকজান্ডার। মিনিট পনেরোর মধ্যে তার পার্ট শেষ হয়ে গেল। তার পরে শেষ পালা 'আলিবাবা'য় তার 'বাবা মুস্তাফা' সাজবার কথা, অর্থাৎ মাঝে তার একটানা ঘণ্টা-পাঁচেক ছুটি। হরিহর সবাইকে জানালে, সে থিয়েটারের ওপরের একটা ঘরে এই সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু সে ঘুমোতে গেল না। থিয়েটার থেকে তার বাড়ি মিনিট পনেরোর পথ। হরিহর লুকিয়ে বাড়িতে গিয়েই হাজির হল, কারণ সে জানে থিয়েটারের সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, তার পার্টের সময় না হলে কেউ তাকে খুঁজবে না।

হরিহর বাবা মুস্তাফার পাকা চুল আর দাড়ি-গোঁফ সাজঘর থেকে লুকিয়ে সঙ্গে এনেছিল। নিজের বাড়িতে এসে সেইগুলো সে পরে নিলে, কারণ এবারে তাকে পাশের বাড়িতে যেতে হবে, সেখানে সবাই তাকে চেনে!

হরিহর নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়িতে গেল। সে জানত, সুরেন আজ বিয়ে-বাড়িতে থাকবে। প্রথমে সে সুরেনের শূন্য ঘরে ঢুকে জুতো চুরি করলে। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে হরেনকে আক্রমণ করলে। হরেন তাকে বাধা দিতে গেল, পারলে না, কেবল হরিহরের মাথায় একগোছা পরচুলা রইল তার হাতের মুঠোয়!

ধস্তাধস্তির সময়ে ঘরের টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা যে মাটিতে পড়ে ঠিক রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে গেল, এটাও সে জানতে পারলে না। জানলে নিশ্চয়ই সাবধান হত।

খুনের পর হরিহর সুরেনের জুতো পরে রক্তের ওপরে পায়ে হেঁটে চলে বেড়াল। তারপর সরে পড়বার আগে জুতোজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেল।

হরিহর বুঝলে, ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে ধরা পড়ে সুরেনের ফাঁসি হবেই। তখন লাখ টাকা ভোগ করবে সে একলা। এক ঢিলে মরবে দুই পাখি।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই হরিহর থিয়েটারে ফিরে ওপরের ঘরে ঢুকলে। কিন্তু থিয়েটারে পালিয়ে আসবার সময়ে সে যে তাড়াতাড়িতে নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল, পাহারাওয়ালা চন্দর সিংহের মুখে আগেই আমরা সেটা জানতে পেরেছি।...ওদিকে থিয়েটারে 'আলিবাবা'র সময়েও তাকে স্টেজে না দেখে ড্রেসার ওপরে এসে হরিহরের কপট নিদ্রা ভঙ্গ করলে। সে যে থিয়েটারেই শুয়েছিল, তারও একজন সাক্ষী রইল।

হরিহর বাবা মুস্তাফার পরচুলা পরে সে রাত্রে যখন যখন অভিনয় করতে নামল, তখন দুটি সত্য জানতে পারেনি। প্রথমটি হচ্ছে, মৃত হরেনের মুঠোর চুলের সঙ্গে মুস্তাফার মাথার ছেঁড়া পরচুলা মেলানো সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাবা মুস্তাফার দাড়ির এক অংশে হরেনের রক্ত লেগে আছে।

সে নির্ভাবনায় পরচুলা সাজঘরেই রেখে গেল। এই হচ্ছে সেই পরচুলা। হরিহর নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুক।'

কিন্তু কে পরীক্ষা করে দেখবে? হরিহর তখন চেয়ারের ওপরে বসে-বসেই দারুণ আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর বললেন, 'হুম! আপনি কি তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছেন বিমলবাবু? এত অসম্ভব কথা জানলেন কী করে?'

বিমল বললে, 'আপনিও যদি আমার মতো যত্ন করে হরেনের মুঠোর চুলগুলো পরীক্ষা করতেন তাহলেই বুঝতে পারতেন, ওগুলো রুক্ষ মরা চুল, অর্থাৎ পরচুলা। তাইতেই সর্বপ্রথমে আমার সন্দেহ হল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই সকলকার পরিচিত লোক, তাই ছদ্মবেশ পরে খুন করতে যায়। তারপর যখন শুনলুম হরেন-সুরেনের অবর্তমানে লাখ টাকার মালিক হবে হরিহর, তখনই আমার কড়া নজর পড়ল তার ওপরে। সে থিয়েটারের অভিনেতা শুনে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। কারণ কে না জানে, অভিনেতারাই পরচুলা নিয়ে নড়াচড়া করে? এই একটা ছোট্ট সূত্র আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলেই আপনি গোলকধাঁধায় পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।'

সুন্দরবাবু নিজের গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বীকার করছি, আমি হচ্ছি মস্ত হাঁদা-গঙ্গারাম! কিন্তু, তারপর?'

'তারপর আর কী, পথ খুঁজে পেয়েই আমি থিয়েটারে ছুটলুম। জাল-পুলিশ সেজে

খোঁজখবর নিতে লাগলুম। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাটর্নি-বাড়িতেও গিয়ে খবর পেয়েছি, ওখানকার কেরানি সুবোধও হরিহরের সঙ্গে অভিনয় করে, আর লাখ টাকার উইলের গুপ্তকথা তার কাছে থেকেই হরিহর সব আগে জানতে পারে। থিয়েটারে গিয়ে প্রথমে আমি খোঁজ নিলুম, ঘটনার রাত্রে হরিহর কখন কোন নাটকে অভিনয় করেছিল। হিসাব করে দেখলুম, রাত এগারোটার পর প্রায় পাঁচঘণ্টা তাকে সাজতে হয়নি, আর সেই সময়টার মধ্যে কেউ খোঁজও নেয়নি যে, সত্যসত্যই সে থিয়েটারে আছে কিনা! তারপর আমার কাজ খুবই সোজা হয়ে গেল। এর ওপর সাজঘরে খানাতল্লাশ করে যখন বাবা-মুস্তাফার ছেঁড়া চুল আর রক্তাক্ত দাড়ি পাওয়া গেল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। বাকি গল্পটা আমি আন্দাজে রচনা করেছি, কিন্তু তা যে মিথ্যা নয়, সেটা আপনারা সকলেই দেখছেন তো?...আচ্ছা সুন্দরবাবু, আমার কাজ ফুরোল, এখন আমরা সরে পড়ি, কী বলেন?'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মহা-উৎসাহে বিমলের হাত চেপে ধরে বললেন, 'সে কী, বিলক্ষণ! আমার ঘাড় থেকে এতবড়ো বোঝা নামিয়ে দিলেন, অন্তত কিছু মিষ্টিমুখ করে যান...ওরে, কে আছিস রে! শিগগির এক টাকার ভালো সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আয় তো!'

বনের ভেতরে নতুন ভয়

॥ এক ॥

কুচবিহার থেকে মোটর ছুটেছে—আলিপুর গেল, কুমারগ্রাম পিছনে পড়ে রইল, এখন জয়ন্তীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বিমল ও কুমার শিকারে বেরিয়েছে। কুমারের মেসোমহাশয় কুচবিহারে বড়ো চাকরি করেন, তাঁরই নিমন্ত্রণে কুমার ও তাঁর বন্ধু বিমল কুচবিহারে এসে আজ কিছুদিন ধরে বাস করছে। তাদের শিকারের তোড়জোড় করে দিয়েছেন তিনিই।

জয়ন্তীতে কুচবিহারের মহারাজার শিকারের একটি ঘাঁটি বা আস্তানা আছে। স্থির হয়েছে, বিমল ও কুমার দিন দুই-তিন সেখানে থাকবে এবং শিকারের সন্ধান করবে। জয়ন্তীর অবস্থান হচ্ছে কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্তে। এখানকার নিবিড় বনে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর অভাব নেই।

শীতের বিকাল। রোদের আঁচ কমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই পাহাড়ে শীতের আমেজ একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। ধুলোয় ধূসরিত আঁকা-বাঁকা পথের দুই পাশে চাষাদের গ্রামগুলো

গাছপালার ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়েছে। এপাশে-ওপাশে বুনো কুলগাছের ঝোপের পর ঝোপ। মাঠে মাঠে যে গোরুগুলো চরছে, তাদের কোনও-কোনওটা মোটর দেখে নতুন কোনও দুষ্টু জন্তু ভেবে ল্যাজ তুলে তেড়ে আসছে এবং দেশি কুকুরগুলোও গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে খাপ্পা হয়ে ঘেউ ঘেউ করে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে।

এইসব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে উঠল এবং গাড়িও জয়ন্তীর ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছল।

একতলা সমান উঁচু শালকাঠের খুঁটির ওপরে শিকারের এই ঘাঁটি বা কাঠের বাংলো। একজন কুচবিহারী রক্ষী এখানে থাকে। আগেই তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল, সে এসে গাড়ি থেকে মোটমাট নামিয়ে নিতে লাগল।

একটি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বিমল ও কুমার বাংলোর ওপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে চারদিকের দৃশ্য টার্নারের আঁকা একখানি ছবির মতো।

একদিকে ভুটানের পাহাড় আকাশের দিকে মটুক পরা মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নীচের দিকটা গভীর জঙ্গলে ডুব দিয়ে অদৃশ্য। অস্তগত সূর্যের ফেলে যাওয়া খানিকটা রাঙা রং তখনও আকাশকে উজ্জ্বল করে রাখাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পাতলা অন্ধকারে চারদিক ঝাপসা হয়ে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে এবং বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দুই-একটা গোরুর হাম্বা রব।

বিমল পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, ও জঙ্গলে কেবল বাঘ নয়, হাতিও থাকতে পারে।'

কুমার বললে, 'ভালোই তো, কলকাতায় অনেকদিন ধরে লক্ষ্মীছেলের মতো হাত গুটিয়ে বসে আছি, একটুখানি নতুন উত্তেজনা আমাদের দরকার হয়েছে।'

॥ দুই ॥

কিন্তু সে-বারে উত্তেজনা এল সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধরে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

কুচবিহারি শীত ভুটানের সীমান্তে দার্জিলিঙের প্রায় কাছাকাছি যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার সঙ্গে করে যে শীত নিয়ে এল, তিনটে পুরু গরম জামার ওপরে মোটা আলোয়ান চাপিয়েও তার আক্রমণ ঠেকানো যায় না।

রক্ষী ঘরের ভেতরে এসে জিনিসপত্তর গুছোচ্ছে, বিমল তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে, তোমার নামটি কী শুনি?'

'আজ্ঞে, শ্রীনিধিরাম দাস।'

'আচ্ছা নিধিরাম, তুমি এখানে কতদিন আছ?'

'আজ্ঞে, অনেকদিন!'

'কাল ভোরে আমরা যদি বেরুই, কাছাকাছি কোথাও কোনও শিকার পাওয়া যাবে?'

'আজ্ঞে, ওই জঙ্গলে বরা (বরাহ) তো পাওয়া যাবেই, বাঘও আছে। কাল রাতেই আমি বাঘের ডাক শুনেছি। আজ সকালে উঠে দেখেছি, কাছেই একটা ঝোপে বাঘে গোরু মেরে আধখানা খেয়ে ফেলে রেখে গেছে।'

'তাহলে গোরুর বাকি আধখানা খাওয়ার লোভে বাঘটা হয়তো বেশি দূরে যায়নি। নিধিরাম, জঙ্গল ঠেঙাবার জন্যে কাল আমার সঙ্গে জনকয়েক লোক দিতে পারো?'

নিধিরাম একটু ভেবে বললে, 'হুজুর, লোক পাওয়া শক্ত হবে!'

'কেন, আমরা তাদের ভালো করেই বকশিশ দেব!'

'সে তো জানি হুজুর। হপ্তাখানেক আগে হলে যত লোক চাইতেন দিতে পারতুম, কিন্তু এখন ডবল বকশিশ দিলেও বোধহয় লোক পাওয়া যাবে না!'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন নিধিরাম, হপ্তাখানেকের মধ্যেই এখানে কি বাঘের উপদ্রব বড়ো বেড়েছে?'

নিধিরাম মাথা নেড়ে বললে, 'না হুজুর, বাঘের সঙ্গে থেকে এখানকার লোকের কাছে বাঘ গা-সওয়া হয়ে গেছে! বাঘকে আমরা খুব বেশি ভয় করি না, কারণ সব বাঘ মানুষ খায় না।'

কুমার এগিয়ে এসে বিমলের হাতে এক পেয়ালা কফি দিয়ে বললে, 'নিধিরাম, তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না! বাঘের ভয় নেই, তবু লোক পাওয়া যাবে না কেন?'

নিধিরাম শুষ্কস্বরে বললে, 'হুজুর, বনে এক নতুন ভয় এসেছে!'

বিমল বললে, 'নতুন ভয়!'

কুমার বললে, 'নিধিরাম বোধহয় পাগলা হাতির কথা বলছে!'

নিধিরাম প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বলল, 'না হুজুর, বাঘও নয়—পাগলা হাতি-টাতিও নয়! এ এক নতুন ভয়! এ ভয় যে কী, এর চেহারা যে কীরকম, কেউ তা জানে না! কিন্তু সকলেই বলেছে, এই নতুন ভয় ওই পাহাড় থেকে নেমে বনে এসে ঢুকেছে!'

বিমল ও কুমারের বিস্ময়ের সীমা রইল না, তারা পরস্পরের সঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টি বিনিময় করলে।

নিধিরাম বললে, 'জানেন হুজুর, এই নতুন ভয় এসে এক হপ্তার ভেতরে তিনজন মানুষকে প্রাণে মেরেছে?'

'বলো কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিদাম একদিন বনের ভেতরে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করতে করতে বন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ধড়াস করে মাটিতে পড়ে মরে গেল! সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, তার ডান পায়ের ডিমে একটা বাণ বিঁধে আছে!'

'বাণ?'

হ্যাঁ, ছোটো একটি বাণ। এক বিঘতের চেয়ে বড়ো হবে না! কোনও মানুষ ধনুক থেকে সে-রকম বাণ ছোড়ে না!'

কুমার প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'তারপর?'

'দিনচারেক আগে এক কাঠুরেও দুপুরবেলায় বনের ভেতর থেকে তেমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা পড়ল! তারও গোড়ালির ওপরে তেমনি একটা ছোটো বাণ বেঁধা ছিল!'

'তারপর, তারপর?'

'কাল বনের ভেতরে আমাদের গাঁয়ের অছিমুদ্দির লাশ পাওয়া গেছে। তার পায়ের ওপরেও বেঁধা ছিল সেইরকম একটা ছোটো বাণ! বলুন হুজুর, এর পরেও কেউ কি আর ওই ভেতরে যেতে ভরসা করে?'

বিমল ও কুমার স্তব্ধভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'নিধিরাম, তুমি যা বললে তা ভয়ের কথাই বটে! তিন তিনটি মানুষের প্রাণ যাওয়া কি যে সে কথা? কিন্তু যারা এই খুন করেছে তাদের কোনও সন্ধানই কি পাওয়া যায়নি?'

'কিছু না হুজুর! লোকে বলে, এ মানুষের কাজ নয়, এত ছোটো বাণ কোনও মানুষ কখনও ছুড়েছে বলে শোনা যায়নি!'

'প্রত্যেক বাণই এসে বিঁধেছে পায়ের ওপরে, এও একটা ব্যাপার!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কোনও বাণই পায়ের ডিম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি!'

'আর পায়ে কেবল অতটুকু বাণ বিঁধলে মানুষ মারা পড়ে না, কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বাণের মুখে বোধহয় বিষ মাখানো ছিল!'

'কবরেজমশাই ও লাশগুলো দেখে ওই কথাই বলেছেন!'

বিমল বললে, 'একটা বাণ দেখতে পেলে ভালো হত!'

'দেখবেন হুজুর? আমি এখনই একটা বাণ নিয়ে আসছি'—এই বলে নিধিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

বিমল জানলা দিয়ে কুয়াশামাখা ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, অ্যাডভেঞ্চার বোধহয় আমাদের অনুসরণ করে—কাল আমরাও ওই বনের ভেতরে প্রবেশ করব! কে জানে, শিকার করতে গিয়ে আমরাই কারও শিকার হব কি না!'

কুমার বললে, 'কিন্তু এমন অকারণে নরহত্যা করার তো কোনও অর্থ হয় না!'

বিমল বললে, 'হয়তো বনের ভেতরে কোনও পাগল আড্ডা গেড়ে বসেছে! নইলে এত জায়গা থাকতে পায়েই বা বাণ মারে কেন?'

এমন সময় নিধিরামের পুনঃপ্রবেশ। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক, সে খুব ভয়ে ভয়ে সেটাকে বিমলের হাতে সমর্পণ করলে।

বিমল মোড়কটা খুলে টর্চের তীব্র আলোকে জিনিসটা সাম্পিল ধরে পরীক্ষা করলে, কুমারও তার পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট আভাস জাগিয়ে বিমল বললে, 'কুমার, দেখছ?'

'কী?'

'এ তো বাণের মতো দেখতে নয়! এ যে ঠিক ছোট্ট একটি খেলাঘরের বর্শার মতন দেখতে!'

সত্যই তাই! এক বিঘত লম্বা পুঁচকে একটি কাঠি, তার ডগায় খুব ছোট্ট এক ইস্পাতের চকচকে ফলা! অবিকল বর্শার মতো দেখতে!

কুমার বললে, 'মানুষ যদি দূর থেকে এই একরত্তি হালকা বর্শা ছোড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই তার লক্ষ স্থির থাকবে না!'

বিমল ভাবতে ভাবতে বললে, 'তাই তো, এ যে মনে বড়ো ধাঁধা লাগিয়ে দিলে! হ্যাঁ নিধিরাম, বনের ভেতরে অছিমুদ্দির লাশ যেখানে পাওয়া গেছে, অন্তত সেই জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারবে তো?'

নিধিরাম বললে, 'তা যেন পারব, কিন্তু হুজুর, এর পরেও কি আপনারা ভূতুড়ে বনে যেতে চান?'

বিমল হেসে বললে, 'ভয় নেই নিধিরাম, এত সহজে মরবার জন্যে ভগবান আমাদের পৃথিবীতে পাঠাননি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! আমরা কাল সকালেই ওই বনের ভেতরে ঢুকতে চাই! কুমার, আমাদের শিকারি-বুট পরতে হবে, কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি হাঁটুর নীচে পায়ের ওপরেই!'

॥ তিন ॥

ওইটুকু পলকা কাঠির তির বা বর্শা যে শিকারি-বুট ভেদ করতে পারবে না, বিমল এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল। শরীরের অন্যান্য স্থানেও তারা ডবল করে জামা প্রভৃতি চড়িয়ে, দুটো পা পর্যন্ত ঝোলা ওভারকোট পরে নিল।

বিমল বললে, 'সাবধানের মার নেই, কী জানি, বলা তো যায় না!'

উপরি উপরি দুই দুই পেয়ালা কফি পান করে হাড়ভাঙা শীতের ঠকঠকানি যতটা সম্ভব কমিয়ে বিমল ও কুমার বাংলো থেকে নীচে নেমে এল। সামনের বনের মাথায় দূরে তখনও

কুয়াশার পাতলা মেঘ জমে আছে। কাঁচা রোদ চারদিকে সোনার জলছড়া দিচ্ছে, ভোরের পাখিদের মনের খুশি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে গানে গানে।

বিমল ও কুমারের মাঝখানে থেকে নিধিরাম ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল। তার ভাব দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, সামান্য বিপদের আভাস পেলেই সে সর্বাগ্রে অদৃশ্য হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে! একটা পায়ে চলা পথ ধরে তারা যখন একেবারে বনের কাছে এসে পড়ল, নিধিরামের সাহসে আর কুলাল না, হঠাৎ হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকে সে বললে, 'হুজুর, ঘরে আমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আমি গোঁয়ারের মতো প্রাণ দিতে পারব না!'

কুমার হেসে বললে, 'তোমাকে বলি দেওয়ার জন্যে আমরা ধরে আনিনি, নিধিরাম! খালি দেখিয়ে দিয়ে যাও, অছিমুদ্দির লাশ কোথায় পাওয়া গিয়েছিল!'

'ওইখানে হুজুর, ওইখানে! বনের ভেতরে ঢুকেই এই পথটা যেখানে ডানদিকে মোড় ফিরে গেছে, ঠিক সেইখানে!'—বলেই নিধিরাম সেলাম ঠুকুতে ঠুকতে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল!

বিমল ও কুমার আর কিছু না বলে নিজেদের বন্দুক ও রিভলভার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলে। তারপর সাবধানে বনের ভেতরে প্রবেশ করলে।

সব বন যেমন হয়, এও তেমনি! বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া ডালপাতাভরা মাথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে যেন সূর্যের আলো যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেই চেষ্টাই করছে! গাছের ডালে ডালে ঝুলছে অজানা বন্য লতা এবং গাছের তলার দিক অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপে-ঝাপে-আগাছায়।

কিন্তু সব বন যেমন হয় এও তেমনি বন বটে, তবু এখানকার প্রত্যেক দৃশ্যের ও প্রত্যেক শব্দের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত রহস্য মাখানো আছে, এই বনকে যা সম্পূর্ণ নতুন ও অপূর্ব করে তুলেছে!

পথ যেখানে ডানদিক মোড় ফিরেছে সেখানে রয়েছে একটা মস্ত বড়ো ঝোপ।

সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল বললে, 'এইখানেই অছিমুদ্দি পৃথিবীর খাতা থেকে নাম কাটিয়েছে! কুমার, এ ঝোপে অনায়াসেই প্রকাণ্ড বাঘ থাকতে পারে! লুকিয়ে আক্রমণ করবার পক্ষে এ একটা চমৎকার জায়গা!'

কুমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ঝোপটার দিকে তাকালে, তারপর হঠাৎ একটানে বিমলকে সরিয়ে এনে উত্তেজিত—কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বললে, 'ও ঝোপে সত্যিই বাঘ রয়েছে!'

চোখের নিমেষে দুজনে বন্দুক তুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল!

বিমল বললে, 'কই বাঘ?'

'ঝোপের বাঁ-পাশে তলার দিকে চেয়ে দ্যাখো!'

ঝোপের তলায় বড়ো বড়ো ঘাসের ফাঁক দিয়ে আবছা আলোতে মস্ত একটা বাঘের মুখ দেখা গেল! মাটির ওপরে মুখখানা স্থির হয়ে পড়ে আছে,—এমন উজ্জ্বল ভোরের আলোতেও ব্যাঘ্রমহাশয়ের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়নি।

তারা দুজনেই সেই মুখখানা লক্ষ করে একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু বাঘের মুখখানা একটুও নড়ল না!

দুটো বন্দুকের ভীষণ গর্জনে যখন সারা বন কেঁপে উঠল, গাছের উপরকার পাখিগুলো সভয়ে কলরব করতে করতে চারদিকে উড়ে পালাল, তখন বিমল ও কুমার বাঘের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বলে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পেলে না!

বন্দুকের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ঝোপের তলাকার দীর্ঘ ঘাস বনগুলো হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল—যেন তাদের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো জীব চমকে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে! সেগুলো খরগোশও হতে পারে, সাপও হতে পারে!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ঘুমন্ত বাঘ গুলি খেয়েও একটু নড়ল না! তবে কি ওটা মরা বাঘ?'

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর বন্দুক দিয়ে ঝোপটা দু-ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখলে, বাঘটা সত্যি-সত্যিই মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে, তার সর্বাঙ্গ ভরে ভনভন করছে মাছির পাল!

কুমার হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে বাঘটার তলপেট থেকে কী একটা জিনিস টেনে বার করলে। তারপর সেটাকে বিমলের চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরলে।

বিমল অবাক হয়ে দেখলে, সেই ছোট্ট কাঠির ডগায় এতটুকু একটা বর্শার ফলা চকচক করছে!

॥ চার ॥

বিমল বললে, 'সেই খুদে বর্শা আর সেই মারাত্মক বিষ! এ বনে বাঘেরও নিস্তার নেই!'

কুমার বললে, 'বর্শাটা ছিল বাঘের তলপেটে। অমন জায়গায় বর্শা মারলে কেমন করে?'

বিমল খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'দ্যাখো কুমার, ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময়। এতটুকু হালকা বর্শা দূর থেকে নিশ্চয়ই কেউ ছুড়তে পারে না। তিনজন মানুষ মরেছে—প্রত্যেকেই চোট খেয়েছে হাঁটুর নীচে। বাঘটাও তলপেটে চোট খেয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, যে এই বর্শা ছুড়েছে নিশ্চয়ই সে ছিল বাঘের পেটের নীচে। হয়তো বনের এই অজানা বিপদ থাকে নীচের দিকেই,—ঝোপঝাপে লুকিয়ে।

কুমার বললে, 'কিংবা বাঘটা যখন চিত হয়ে শুয়েছিল, বর্শা মারা হয়েছে তখনই।'

আচম্বিতে বিমলের চোখ পড়ে গেল কুমারের শিকারি-বুটের ওপরে। সচকিত স্বরে সে বলে উঠল, 'কুমার, কুমার! তোমার জুতোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

কুমার হেঁট হয়ে সভয়ে দেখলে, তার শিকারি-বুটের ওপরে বিঁধে রয়েছে একটা ছোটো বর্শা! আঁতকে উঠে তখনই সেটাকে টেনে সে ছুড়ে ফেলে দিলে!

বিমল বললে, 'ও বর্শা নিশ্চয়ই তোমার বুটের চামড়া ভেদ করতে পারেনি। কারণ, তোমার পায়ের মাংস ভেদ করলে তুমি নিশ্চয়ই টের পেতে!'

'ওঃ, ভাগ্যে শিকারি-বুট পরেছিলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য বিমল, এই অদৃশ্য শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে?'

বিমল ও কুমার সাবধানে ওপরে নীচে আশেপাশে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু উঁচু গাছের ডালে একটা ময়ূর, একটা হিমালয়ের পায়রা, গোটাকয়েক শকুনি ছাড়া আর কোনও জীবকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারলে না। বনের তলায় আলো-আঁধারির মধ্যেও জীবনের কোনও লক্ষণ নেই—যদিও কেমন একটা অস্বাভাবিক রহস্যের ভাব সেখানকার প্রত্যেক আনাচ-কানাচ থেকে যেন অপার্থিব ও অদৃশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং সুযোগ পেলেই যে-কোনও মুহূর্তেই সে যেন ধারণাতীত মূর্তি ধারণ করে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে!

হঠাৎ সামনের লম্বা লম্বা ঘাসগুলো সরসর করে কাঁপতে লাগল, তার ভেতর দিয়ে কী যেন ছুটে যাচ্ছে—ঠিক যেন দ্রুত গতির একটা দীর্ঘ রেখা কেটে!

মাটি থেকে টপ করে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে কুমার সেই দিকে ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল!

'ওটা কী জন্তু দেখতে হবে' বলে কুমার যেখানে নুড়ি ছুড়েছিল সেইদিকে দৌড়ে গেল! তারপর পা দিয়ে ঘাস সরিয়ে হেঁট হয়ে দেখেই সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল!

'কী কুমার, কী, কী?'

কিন্তু কুমার আর কোনও জবাব দিতে পারলে না—সে যেন একেবারেই থ হয়ে গেছে।

বিমল তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে সে-ও যেন শিউরে উঠে বললে, 'কুমার, কুমার, এও কি সম্ভব?'

॥ পাঁচ ॥

মাটির ওপরে শুয়ে আছে, অসম্ভব এক নকল মানুষ-মূর্তি!

লম্বায় সে বড়োজোর এক বিঘত! কুমারের নুড়ির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

এক বিঘত লম্বা বটে, কিন্তু তার ছোট্ট দেহের সবটাই অবিকল মানুষের মতো—মাথার চুল, মুখ, চোখ, ভুরু, নাক, চিবুক, কান, হাত, পা—মানুষের যা-যা থাকে তার সে-সবই আছে।...তার পাশে হাতের খুদে মুঠো খুলে পড়ে রয়েছে সেই রকম এক কাঠির বর্শা!

বিমল ও কুমার নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে রাজি হল না! বিমল সেই এক বিঘতি মানুষটিকে দুই আঙুলে তুলে একবার নিজের চোখের কাছে ধরলে—সেই একফোঁটা মানুষের এতটুকু বুক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে বারবার উঠছে আর নামছে! বিমল তুলে ধরতেই তার মাথাটা কাঁধের ওপরে লুটিয়ে পড়ল! শিউরে উঠে আবার সে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে!

কুমার হতভম্বের মতো বললে, 'বিমল, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?'

বিমল বললে, 'এও যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে আমরাও স্বপ্ন!'

'পাহাড় থেকে নেমে এসে তাহলে এই ভয়ই বনবাসী হয়েছে?'

'তা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? এদের চেহারাই খালি আমাদের মতো নয়, এই পকেট সংস্করণের মানুষ আমাদেরই মতো বর্শা তৈরি করে, ইস্পাতের ফলা ব্যবহার করতে জানে, আবার বিষ তৈরি করে বর্শার ফলায় মাখিয়ে বড়ো বড়ো শত্রু মারতেও পারে! সুতরাং এর বুদ্ধিও হয়তো মানুষের মতো! জানি না, এর দলের আরও কত লোক এখানে লুকিয়ে আছে!...ওই যাঃ, কুমার—কুমার—'

ইতিমধ্যে কখন যে এক বিঘতি মানুষের জ্ঞান হয়েছে, তারা কেউ তো টের পায়নি! যখন তাদের হুঁশ হল তখন সেই পুতুল-মানুষ তিরবেগে ঘাস জমির ওপর দিয়ে দৌড় দিয়েছে!

ব্যর্থ আক্রোশে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে কেন যে গুলি ছুঁড়লে তা সে নিজেই জানে না, তবে এটা ঠিক যে, সেই পুতুল-মানুষকে হত্যা করবার জন্যে নয়!

কিন্তু যেমনি গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল, অমনি তাদের এপাশে-ওপাশে, সামনে পিছনে লম্বা লম্বা ঘাসের বন যেন সচমকে জ্যান্ত হয়ে উঠল—ঘাসে ঘাসে এলোমেলো দ্রুত গতির রেখার পর রেখা, যেন শত শত জীব লুকিয়ে লুকিয়ে চারদিক দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে!

বিমল ও কুমারও পাগলের মতো চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল, অন্তত আর-একটা পুতুল-মানুষকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে!

—কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা!

তারপরেও বিমল ও কুমার বহুবার বনের ভেতরে খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু আর-কোনও পুতুল-মানুষ সে অঞ্চলে আর দেখা দেয়নি বা বিষাক্ত বর্শা ছুড়ে আমাদের মতো বড়ো বড়ো মানুষকে হত্যা করেনি। বোধহয় বন ছেড়ে তারা আবার পালিয়ে গিয়েছিল ভুটানের পাহাড় জগতে।

গুহাবাসী বিভীষণ

॥ এক ॥

বিমল ও কুমার আমেরিকান ও ইংরেজি পদ্ধতিতে 'বক্সিং' অভ্যাস করছিল।

আজ সকালেই ওই দুই দেশের বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হয়ে গেছে। এখন খুব-খানিকটা ঘুসোঘুসি করেও তর্কের কোনো শেষ-মীমাংসা হল না।

বিমল মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা খুলে ফেলতে ফেলতে বললে, 'ঘুসির জোরেও যে তর্কের মীমাংসা হয় না, আপাতত সে-তর্ককে বাতিল করে দেওয়া যাক।'

কুমার বললে, 'তোমার 'সোলার প্লেক্সাসে' একটি মাত্র ঘুসি মারবার ফাঁক পেলেই এখনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমেরিকান কায়দা সে ফাঁক দেয় না! মনে রেখো, 'সোলার প্লেক্সাসে' ঘুসি মেরে যোদ্ধাকে অজ্ঞান করবার কৌশল প্রথমে আমেরিকাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।'

বাইরে থেকে ডাকপিয়ন হাঁকলে—'চিঠি আছে!'

বিমল বললে, 'দ্যাখো গে বিনয়বাবুর চিঠি এল কি না! বাহাদুরগঞ্জে গিয়ে পর্যন্ত তিনি কোনো চিঠি লেখেননি!'

কুমার বেরিয়ে গেল। তারপর একখানা খাম হাতে করে ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ, বিনয়বাবুর চিঠিই বটে!'

—'কী লিখেছেন পড়ে শোনাও।'

কুমার খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল,

'প্রিয় বিমল ও কুমার,

বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এখানে এসে পর্যন্ত তোমাদের যে কোনো পত্র লিখিনি তার কারণ হচ্ছে, এতদিন দেবার মতো কোনো খবর ছিল না। এখানকার প্রধান ঐশ্বর্য ব্রহ্মপুত্র নদ। সে আগেও যেমন বইত, এখনও তেমনি বইছে। সকালে সন্ধ্যায় তার তীরে বসে সূর্য-কিরণের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে আমার খুব ভালো লাগে বটে, কিন্তু পত্রে সে-খবরের মধ্যে তোমরা কোনোই নূতনত্ব আবিষ্কার করতে পারতে না। কবির কলম পেলে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের উজ্জ্বল বর্ণনা করতে পারতুম। কিন্তু তোমরা জানো, আমি কবি নই,—শুষ্কপ্রাণ বৈজ্ঞানিক মাত্র।

কিন্তু সম্প্রতি এখানে একটি দেবার মতো খবর পাওয়া গেছে।

তোমরা ভূত মানো না, আমিও মানি না। ভূতের গল্প শুনে ও পড়ে আমি

কেবল শখ করে ভয় পেতে ভালোবাসি। হয়তো তোমাদেরও সেই অভ্যাস আছে, তাই আমি আজ তোমাদের একটি নতুন ভূতের গল্প শোনাব।

এখানকার বাসিন্দাদের মতে, একটি অজানা ভূত নাকি আমারই মতো বায়ু পরিবর্তনের জন্যে এ-অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু সে ভূতটি আমার মতো শান্তিপ্রিয় নয়। সে রীতিমতো উপদ্রব শুরু করেছে।

রোজ রাত্রে সে ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে সাঁতার কাটে। তাকে চোখে কেউ দেখেনি বটে, কিন্তু সে নাকি রোজ রাত্রেই ভয়ানক হেঁড়ে গলায় কান্নাকাটি করে আর একটা গুহার কাছে জলের ভিতর থেকে তার বিষম ঝাঁপাই-ঝোড়ার শব্দও শোনা যায়!

সে অনায়াসেই খুব চেঁচিয়ে হাসতে পারত। কিন্তু সে হাসে না, কাঁদে—খালি কাঁদে!

লোকের কথায় প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু দিন-পাঁচ আগে আমিও স্বকর্ণে তার কান্না শুনেছি!

ব্রহ্মপুত্রের তীরেই একখানা বাংলোয় আমি আছি। সেদিন রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি আসায় আমার ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি উঠে মাথার দিককার জানলাটা বন্ধ করে দিতে গেলুম।

হু হু ঝোড়ো-হাওয়ার সঙ্গে এক আশ্চর্য ও অমানুষিক কণ্ঠের উচ্চ ও তীব্র চিৎকার ঘরের ভিতরে ভেসে এল!

তেমন কান্নাভরা বিকট চিৎকার আমি আর কখনো শুনিনি। সে চিৎকার মানুষেরও বটে, মানুষের নয়ও বটে! অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করলেও তেমন ভাবে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না!

তিনবার সেই চিৎকার শুনলুম। তারপর ঝড় ও বৃষ্টির রোখ এমন বেড়ে উঠল যে, জানলা বন্ধ করে দিতে হল।

নদীর জলের ভিতরেই ডাঙা থেকে প্রায় দু-শো গজ তফাতে আছে এক শিশু-পাহাড়। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তার চূড়া হয়তো একদিন মেঘ রাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, কিন্তু এখন তার মাথা জল ছাড়িয়ে ত্রিশ ফুটের বেশি উপরে উঠতে পারেনি। এই ছোট্ট পাহাড়ের নীচের দিকে একটা গুহা আছে। জোয়ারের সময়ে সেই গুহাটা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভাটার সময়েও তার আধাআধি জলে ভরতি হয়ে থাকে।

আমার মনে হল, সেই ভয়াবহ আর্তনাদ আসছে ওই পাহাড়ের কাছ থেকেই।

পরশুদিন রাত্রে আবার এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

একটা কুলি সন্ধ্যার পর জল আনতে গিয়েছিল নদীর ঘাটে।

কিন্তু হঠাৎ সে মহা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার দুজন সঙ্গী ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ঘাটের দিকে ছুটে গেল। অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু সভয়ে শুনলে যে ঘাটের খুব কাছ থেকেই অমানুষিক কণ্ঠে কে ঘন ঘন গর্জন করছে! তারা আর না এগিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল!

কাল সকালে গোলমাল শুনে আমি নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি, সেই হতভাগ্য কুলি মৃতদেহ জলের ভিতরে অর্ধমগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ভালো করে লক্ষ করে বুঝলুম, কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। গলার উপরে তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মোটা মোটা আঙ্গুলের দাগ! সেগুলো যে মানুষের আঙ্গুলের দাগ, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই!

কে তাকে হত্যা করলে? কেন হত্যা করলে? রাত্রে নদীর জলে কে কাঁদে বা গর্জন করে? পুলিশের পাহারা বসেছে, কিন্তু এসব প্রশ্নের কোনোই জবাব নেই।

এখানকার লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে ও দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েছে। সূর্য অস্ত গেলে পর কেউ আর নদীর ধার মাড়ায় না। সত্যি কথা বলতে কী, আমিও হতভম্ব হয়ে গেছি।

এরকম অসাধারণ ঘটনা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাতে খুব ভালোবাসো, তাই তোমাদের খবরটা জানিয়ে দিলুম। যদি নূতন উত্তেজনার প্রতি তোমাদের লোভ থাকে, তাহলে আমার বাংলোয় তোমাদের স্থানাভাব হবে না।

অতএব আশা করছি, অবিলম্বেই তোমরা সশরীরে এসেই আমার পত্রের উত্তর দেবে। ইতি—

তোমাদের—
'বিনয়বাবু'

কুমার বললে, 'বিমল, তোমার মত কী?'

বিমল সহাস্যে বললে, 'তাও আবার জিজ্ঞাসা করছ? এক্ষেত্রে তোমাতে আমাতে মতের অমিল হবার সম্ভাবনা নেই।'

কুমার বললে, 'তাহলে তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করি?'

—'নিশ্চয়ই।'

॥ দুই ॥

জায়গাটি চমৎকার। যেখানে পাহাড়, নদী আর অরণ্যের মিলন হয় সেখানে প্রকৃতির রূপে কেউ খুঁত ধরতে পারে না।

আকাশের নীলিমা আছে পৃথিবীর সর্বত্রই, কিন্তু আসলে তার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়, নদী আর অরণ্যের উপরে চাঁদোয়া হবার জন্যেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'দ্যাখো বিমল ওই সেই শিশু-পাহাড়!'

বিমল ও কুমার দেখলে, ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে ছোট্ট একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

বিমল বললে, 'ওরই তলায় গুহা আছে?'

—'হ্যাঁ। এখন ভাটা পড়েছে, তাই গুহার উপরদিকটা দেখা যাচ্ছে।'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি কোনোদিন ওই গুহার কাছে যাননি?'

—'না। এতদিন যাবার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস ওই গুহার ভিতরটা একবার পরীক্ষা করা উচিত।'

বিমল বললে, 'বেশ তো, এখনই সে চেষ্টা করা যাক না! ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা রয়েছে, একখানা ভাড়া করে গুহার কাছে গেলেই চলবে।'

সকলে ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কোনো মাঝিই তাদের গুহার কাছে নিয়ে যেতে রাজি হল না।

বিমল বললে, 'আচ্ছা, তোমরা নৌকো ছেড়ে নেমে দাঁড়াও, আমরাই দাঁড় বেয়ে গুহার কাছে যাব। তোমরা পুরো ভাড়াই পাবে।'

এ বন্দোবস্তে তাদের আপত্তি হল না। বিনয়বাবু ধরলেন হাল এবং দাঁড় নিয়ে বসল বিমল ও কুমার।

নৌকো ভেসে চলল ছোটো পাহাড়ের দিকে।

প্রথমে তারা পাহাড়টাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে, তার চারিদিকেই রোদে উজ্জ্বল নদীর জল নেচে নেচে খেলা করছে। পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া, তার রুক্ষ কালো গায়ে সবুজের আঁচটুকু পর্যন্ত নেই। তারই টঙের উপর স্থির হয়ে বসে আছে একটা শকুন।

একদিকে রয়েছে সেই গুহাটা। এখন জোয়ার নয় বলে গুহার উপর দিকটা খিলানের মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। গুহার মুখ চওড়ায় দশ-বারো ফুটের বেশি নয়।

নৌকো গুহামুখে গিয়ে উপস্থিত হল। তার ভিতরটা ঘন ছায়ায় ভরা, সর্বদাই সেখানে সন্ধ্যার আলো-আঁধার বিরাজ করে। সকলে নৌকার উপরে হেঁট হয়ে পড়ে গুহার ভিতর দিকটা দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ভিতরে শুধু জল থই থই করছে! ভালো করে কিছু দেখাও গেল না, সন্দেহজনক কিছু আছে বলেও মনে হল না।

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, এখানে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছ না কি? কাছে কুমির থাকলে এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।'

বিমল বললে 'হুঁ।' তারপর দাঁড়টা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে গুহার ভিতরকার দেয়ালে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল।

আচম্বিতে তাদের নৌকোখানা তীব্রবেগে পিছু হটে গুহার মুখ থেকে খানিক তফাতে গিয়ে পড়ল! সকলে মহাবিস্ময়ে হুমড়ি খেয়ে জলের ভিতর তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না!

কুমার বললে, 'জলের ভিতর থেকে বিষম ধাক্কা মেরে কে যেন নৌকোখানাকে দূরে ঠেলে দিলে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু কে সে? কুমির যে এমন করে নৌকো ঠেলে দিতে পারে, এ-কথা তো কখনো শুনিনি!'

—'কিন্তু সে যেইই হোক, আমরা যে ওখানে থাকি, এটা সে চায় না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা কি আবার নৌকো নিয়ে গুহার কাছে যাব?'

বিমল বললে, 'না, আমরা এইবারে ওই পাহাড়ে গিয়ে উঠব।'

॥ তিন ॥

পাহাড়ের নীচের দিকটা নদীর জল লেগে লেগে এমন পিছল হয়ে আছে যে, তার উপরে উঠতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হল।

পাহাড়ের উপরে মানুষের আবির্ভাব দেখে শকুনটা বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, 'এই ন্যাড়া পাহাড়ের টুকরোর উপরে একটা মাছিও লুকিয়ে থাকতে পারে না। এখানে এসে লাভ কী?'

বিমল বললে, 'আমরা ওই গুহার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো করে দেখবার সুযোগ পাব।'

গুহার পাশেই রয়েছে মস্ত একখানা পাথর—জল থেকে হাত-চারেক উঁচু। কুমার তার উপরে গিয়ে জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। বিমল ও বিনয়বাবুও তার পাশে গিয়ে বসলেন।

বিমল স্থির চক্ষে গুহার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই গুহার ভিতরে অনায়াসেই কোনো জলচর জীব লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিনয়বাবু, আপনি যে চিৎকার শুনেছিলেন, কোনো জলচর জন্তুর পক্ষে কি সে-রকম চিৎকার করা সম্ভব?'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, সে হচ্ছে মানুষের কণ্ঠে অমানুষিক চিৎকার!'

—'বেশ বুঝতে পারছি, এই ভাটার সময়েও গুহার ভিতরে ডুবজল রয়েছে। কোনো মানুষ নিশ্চয়ই ওখানে বাস করতে পারে না।'

—'কোনো মানুষ ওখানে বাস করুক বা না-করুক, কিন্তু চিৎকারটা এইখানেই উঠেছিল বলে আমার সন্দেহ হয়।'

—'সেদিনের সেই চিৎকার, তারপর ঘাটের উপরে সেই নরহত্যা, তারপর আজকের এই নৌকোয় ধাক্কা মারার ব্যাপার! এই তিনটের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, আমাদের এখন সেই বিচারই করতে—'

হঠাৎ কুমার চমকে পাথরের একটা কোণ দুই হাতে চেপে ধরে আর্তস্বরে বলে উঠল—'কে আমার পা ধরে টানছে—বিমল—'

বিমল জলের দিকে একবার উঁকি মেরেই চোখের পলক না ফেলতে পকেট থেকে রিভলভার বার করে উপর-উপরি দু-বার গুলি ছুড়লে!

তারপরেই এক বুক-কাঁপানো গগনভেদী ভয়ংকর চিৎকার!

বিনয়বাবু জলের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনি দেখলেন কেবল মস্ত একটা ছায়া জলের ভিতরে সাঁ করে মিলিয়ে গেল এবং জলের উপরে ভেসে উঠল খানিকটা রক্ত।

কুমার তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মতো বিমলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখের ভাব উদ্ভ্রান্তের মতো!

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'বিমল, বিমল, জলের ভিতর থেকে কে আমার পা ধরে টানছিল?'

—'তুমি কি কিছুই দ্যাখোনি?'

—'না দেখবার সময় পেলুম কই? খালি এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার পা ধরেছিল মানুষের দু-খানা হাত!'

বিমল অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'আমিও যা দেখেছি হয়তো সেটা মানুষেরই মুখ! কিন্তু মানুষের মুখের চেয়ে অন্তত আড়াই গুণ বড়ো! তার চোখ, নাক, ঠোঁট, গলা, হাত আছে, অথচ তার কিছুই সত্যিকার মানুষের মতো নয়! সে এক ভয়ানক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন, আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্ছে!'

॥ চার ॥

নৌকা আবার পাহাড় ছেড়ে তীরের দিকে ফিরল।

বিনয়বাবু বললেন, 'পৃথিবীতে চিরদিনই এক বিচিত্র জীবের কথা শোনা যায়, সাহেবরা যাবে বলে mermaid, আর আমরা বলি মৎস্যনারী। ভারতের নানা স্থানে সেকেলে মন্দিরের গায়ে এই রকম জলবাসী আর এক জীবের—অর্থাৎ নাগকন্যাদের মূর্তি দেখা যায়। মৎস্যনারীদের দেহের উপর দিকটা হয় মানুষের

মতো আর নীচের দিকটা মাছের মতো। নাগকন্যাদেরও উপর দিক মানুষের মতো দেখতে হলেও তাদের নীচের দিকটা হয় সাপের মতো।'

কুমার বললে, 'কিন্তু তারা তো কল্পনা-জগতের জীব!'

—'আগে শোনো। অনেক নাবিক অজানা সমুদ্র থেকে ফিরে এসে অনেকবারই মৎস্যনারীর কথা বলেছে। পণ্ডিতরা সে সব কথা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন 'স্টেটসম্যান' কাগজে দেখলুম, এইবারে অবিশ্বাসী পণ্ডিতদের মুখ বন্ধ হয়েছে।'

—'কী রকম?'

'সিয়েরা লিওনের ডা. গ্রাহাম মৎস্যনারীর একটি 'মমি' অর্থাৎ রক্ষিত দেহ নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এক দোকানদার ওই দেহটি কিনেছে। বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক আর জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত পরীক্ষা করে বলেছেন, ওটি যে একদা-জীবন্ত কোনো জীবের মৃতদেহ, সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় নেই। এটিও অর্ধ-মৎস্য আর অর্ধ-মানবীর দেহ। এর পরেও মৎস্যনারীকে আর কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি?'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমি আজ যে জীবটাকে দেখলুম, তার নীচের দিকটা জলের তলায় ঢাকা ছিল। আর তার মুখে ছিল একরাশ দাড়ি গোঁফ। সে নারী নয়।'

কুমার বললে, 'মৎস্যনারী যদি থাকে তবে মৎস্যনরও আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হয়তো ও-জীবটা বানের টানে বা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে পড়েছে। দিনের বেলায় গুহার ভিতরে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রে বেরিয়ে স্বদেশে ফিরতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়!'

কিন্তু এর পরেও তার কান্না আর কেউ শুনতে পায়নি। তার কারণ কি বিমলের রিভলভার?

মান্ধাতার মুল্লুকে

আজব জীব

প্রভাতি চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের তারিখের দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, 'ওহে বিমল, আজ সকালেই মি. রোলাঁর আসবার কথা, মনে আছে তো?'

বিমল বললে, 'হুঁ! কিন্তু দুনিয়ার এত লোক থাকতে আমাদেরই তিনি খুঁজে বার করলেন কেন, সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে আসল ব্যাপার তিনি ভাঙতে চাইলেন না, কিন্তু তাঁর কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময় বলে বোধ হল।'

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কুমার বললে, 'বেশ, অপেক্ষা করা যাক, মিঃ রোলাঁর আবির্ভাব হলেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বিমল যেন আপন মনেই বললে, 'রোলাঁ। নাম শুনে বোঝা যায়, ভদ্রলোক জাতে ফরাসি। আমরা তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কেমন করে?'

সিঁড়িতে হল পায়ের শব্দ। একাধিক ব্যক্তির পায়ের শব্দ। তার পরে ঘরের ভিতরে বিনয়বাবু ও কমলের আবির্ভাব।

যাঁরা 'মেঘদূতের মর্তে আগমন', 'ময়নামতীর মায়াকানন,' 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'নীলসায়রের অচিনপুরে' ও 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিনয়বাবু ও কমলের নতুন পরিচয় দেবার দরকার নেই। এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও চিন্তাশীলতায় বিনয়বাবু হচ্ছেন অদ্বিতীয়। লোকে তাঁকে মূর্তিমান সাইক্লোপিডিয়া বলে মনে করে। কমল তাঁর পালিত পুত্র। বিমল ও কুমারের বহু দুঃসাহসিক অভিযানে কমলকে নিয়ে তিনি হয়েছেন তাদের সহযাত্রী। দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছেন বিনয়বাবু এবং সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে কমল।

বিমল একটু বিস্মিত স্বরেই বললে, 'সক্কালবেলায় নিজের লাইব্রেরির কোণ ছেড়ে আমাদের কাছে আপনি! ব্যাপার কী বিনয়বাবু? এ যে মহম্মদের কাছে পর্বতের আগমন!'

বিনয়বাবু উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নতুন অভিযান, নতুন অভিযান!'

কুমার খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে বিনয়বাবু মুখের দিকে সমুৎসুক দৃষ্টিপাত করলে।

বিমল কৌতূহলী কণ্ঠে শুধোলে, 'নতুন অভিযান? কাদের অভিযান?'

—'আমাদের।'

এমন সময়ে বিনয়বাবুর গলা পেয়ে রামহরি প্রবেশ করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমল বললে, 'আরো চা-টা নিয়ে এসো রামহরি! বিনয়বাবু সুখবর এনেছেন।'

রামহরি হাসিমুখে বললে, 'কী সুখবর গো বাবু? আমাদের খোকাবাবুর জন্যে খুকিবিবি আনবেন নাকি?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা আবার নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।'

রামহরির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে বললে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অভিযান-টভিযানের মানে জানি না। তবে কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আবার বুঝি সবাই মিলে হাঘরের মতো দেশ-বিদেশে ছুটোছুটি করে বেড়াবে?'

বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'বোধ হয় তাই রামহরি, বোধ হয় তাই! বিনয়বাবু বোধ হয় আমাদের কোনও নতুন দেশ দেখাতে চান। তাই নয় কি বিনয়বাবু?'

—'প্রায় তাই বটে। অবশ্য তোমরা যদি রাজি হও।'

রামহরি বিরস কণ্ঠে বললে, 'ত্রিভুবনে পাতাল ছাড়া কোন দেশটা দেখতে তোমরা বাকি রেখেছ খোকাবাবু? তবে কি এবারে তোমরা পাতালের দিকে ছুটে যাবে?'

বিমল বললে, 'দেশের নামটা এখনও শুনিনি রামহরি! তবে নতুন অভিযানের কথা শুনেই আমার পা দুটো দৌড় মারবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ বিনয়বাবু, আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান?'

—'সে কথা যিনি বলবেন, তিনি এখনই এসে পড়বেন। আমি তাঁর অগ্রদূত মাত্র।'

কুমার ভুরু তুলে বললে, 'আপনি কি মি. রোলাঁর কথা বলছেন?'

—'ঠিক তাই।'

—'এইবারে বোঝা গেছে। তাহলে আপনার পরামর্শেই মি. রোলাঁ আমাদের এখানে আসতে চান?'

রামহরির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একরকম তাই বটে।'

রামহরি বিরক্ত স্বরে বললে, 'তাহলে এবারে খাল কেটে কুমির আনছেন আপনিই? হ্যাঁ গো বিনয়বাবু, বুড়োবয়সে কী ভীমরতিতে ধরল? সাধ করে নিজেও খেপতে আর পরকেও খ্যাপাতে চান? আসছেন আমাদের কোন সুমুন্দি, নিয়ে যেতে চান কোন যমের বাড়ি?'

কুমার বললে, 'আচ্ছা রামহরি, ফি বারেই আমরা তোমার কথা কানে তুলি না, তবু ফি বারেই আমরা কোথাও যাব শুনলেই তুমি এমন হলুস্থুলু বাধিয়ে মিথ্যে মুখ ব্যথা করো কেন বলো দেখি!'

—'তোমাদের ভালোর জন্যেই বাপু, তোমাদের ভালোর জন্যেই। মাথার ওপর দিয়ে বারে বারে যে সব ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই জন্যেই মুখ ব্যথা করে মরি, নিয়তিকে চিরদিন কি ফাঁকি দেওয়া যায়?'

কমল খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'তোমার যদি এতই প্রাণের ভয়, তাহলে তো আমাদের সঙ্গে না এলেও পারো।'

রামহরি এক ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'থামো, তোমাকে আর ফ্যাচ ফ্যাচ করতে হবে না! কালকের ফচকে ছোঁড়া, আমাকে এসেছেন উপদেশ দিতে! খোকাবাবুকে এতটুকু বয়েস

থেকে মানুষ করে তুলেছি, ও হচ্ছে আমার সন্তানের মতো। সন্তানকে যমের মুখে পাঠিয়ে কেউ যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে!'

বাড়ির ভিতর থেকে ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল।

বিমল বললে, 'ও রামহরি, তোমার আর এক সন্তান শান্তিভঙ্গ করতে চায় কেন?'

রামহরি বললে, 'কেন আর, খিদের চোটে। বাঘা দেখেছে তোমাদের জন্যে খাবার এনেছি, অথচ তাকে এখনও খুশি করা হয়নি।'

—'যাও যাও, বাঘাকে ঠান্ডা করে এসো।'

রামহরির প্রস্থান।

অল্পক্ষণ পরেই মি. রোলাঁ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। লম্বায়-চওড়ায় দশাসই চেহারা। চোখে চশমা, মুখে বিনয়বাবুর মতো দাড়িগোঁফ এবং বয়সেও তাঁর মতোই প্রৌঢ়, তবে দেহ এখনও যুবকের মতোই বলিষ্ঠ। ভদ্রলোকের শান্ত সৌম্য মুখ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমল ও কুমার তাঁকে সাদরে সোফার উপরে বসিয়ে আবার চা, টোস্ট ও ওমলেট প্রভৃতি আনবার জন্যে রামহরিকে আহ্বান করলে।

বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে রোলাঁ শুধোলেন, 'আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি আপনি এঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন?'

—'না, বিশেষ কিছুই বলিনি, সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছি মাত্র।'

বিমল সহাস্যে বললে, 'কিন্তু সেই ইঙ্গিতটুকুই হয়েছে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। মি. রোলাঁ, আপনি যদি আমাদের কোনও বিপজ্জনক অভিযানে যাত্রা করতে বলেন, তাহলে জানবেন আমরা বাইরে পা বাড়িয়েই আছি।'

রোলাঁ বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি যথাস্থানেই এসে পড়েছি।'

এমন সময় চায়ের ট্রে হাতে করে রামহরির পুনঃপ্রবেশ। ট্রে-খানা টেবিলের উপরে রেখে যাবার সময়ে সে রোলাঁর আপাদমস্তকের উপরে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে গেল।

রোলাঁ বললেন, 'গোড়ায় সংক্ষেপে নিজের কথা কিছু কিছু বলি শুনুন। আমার নিবাস ফ্রান্সে। পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদে কোনওদিন আমাকে জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে হয়নি। কিন্তু পায়ের উপরে পা দিয়ে নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা আমার ধাতে সয় না। আমার দুটি মাত্র শখ আছে—নানা দেশ দেখা আর নানা ভাষা শেখা। পৃথিবীর কত দেশেই যে বেড়িয়েছি—কখনও শহরে শহরে, কখনও জঙ্গলে জঙ্গলে, কখনও পাহাড়ে পাহাড়ে, মরুভূমিতে, নির্জন দ্বীপে। কখনও ভয় পেয়েছি, কখনও মোহিত হয়েছি, কখনও বিস্ময়ে অবাক মেনেছি। এই ভারতবর্ষও আমার পুরাতন বন্ধু, এবার নিয়ে, এখানে আমার তিন বার আসা হল। প্রথম বারে এসেছিলুম হিমালয়ের তুষারমানবদের দেখবার কৌতূহল নিয়ে, কিন্তু পদচিহ্ন ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় বার এসেছিলুম মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা দেখবার জন্যে, তাদের দেখে ভারতের প্রাচীন গৌরবের কথা ভেবে মন আমার শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবারে এখানে এসেছি স্বাধীন ভারতকে দেখবার জন্যে। কিন্তু

দেখছি দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হতে পারেনি।' রোলাঁ কিছুক্ষণ নীরবে চা পান করতে লাগলেন।

বিমল বললে, 'বললেন আপনার নানা ভাষা শেখবার শখ আছে। আমাদের বাংলা ভাষা বোধ হয় এখনও শেখেননি?'

রোলাঁ অত্যন্ত শুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'বিলক্ষণ! যে ভাষার মর্যাদা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সে ভাষা আবার শিখব না?'

বিমল বললে, 'কী আশ্চর্য, তবে আর আমরা ইংরেজিতে কথা কই কেন? ও-ভাষা তো আপনারও নয়, আমাদেরও নয়?'

রোলাঁ হাসতে হাসতে বললেন, 'বেশ, তবে আপনার মাতৃভাষাতেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি রোজ আপনাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে কিছু কিছু লেখাপড়া করি। সেইখানেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় বন্ধুত্বে। তাঁর মুখেই আপনাদের অদ্ভুত কীর্তিকাহিনি শুনি। তাই আজ আপনাদের কাছে এসেছি সাহায্য ভিক্ষা করতে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা কোন দিক দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

রোলাঁ বললেন, 'একটু মন দিয়ে শুনুন, কারণ এইবারে আসল কথা শুরু হবে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের কাছে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দেখা দেয় এক আজব জীব।'

—'আজব জীব?'

—'হ্যাঁ, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে উদ্ভটও বলতে পারেন।'

বিমলের মুখ দেখে বোধ হয়, সে যেন নিজের স্মৃতিসাগর মন্থন করছে মনে মনে। হঠাৎ সে উঠে পড়ে পুস্তকাধারের ভিতর থেকে একখানা রীতিমতো মোটা বই বার করলে। সেখানা হচ্ছে 'স্ক্র্যাপবুক'— খবরের কাগজ থেকে ছোটো-বড়ো নানা অংশ কেটে গঁদ দিয়ে তার মধ্যে জুড়ে রাখা হয়েছে।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থেমে বিমল বললে, '১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সাতাশে অক্টোবর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই খবরটি বেরিয়েছিল—'প্যারিস নগর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী মেলুন নামে গ্রামের বাসিন্দারা গত সপ্তাহকাল ধরে এক আজগুবি জীবের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। জীবটাকে দেখতে গরিলার মতো, তার গায়ে আছে রাঙা ওভারকোট এবং পায়ে আছে পাদুকা। ফরাসি সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, তাকে বন্দি করবার জন্যে খানাতল্লাশিকারীরা দলে দলে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছে। জীবটাকে সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে একদল শিশু, সে তখন অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুলতে দুলতে।' মি. রোলাঁ, আপনি কি এই ঘটনার কথা বলতে চান?'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ।'

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল বললে, 'খবরটা কৌতূহলোদ্দীপক বলেই আমি 'স্ক্র্যাপবুক'-এ তুলে রেখেছিলুম। কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যই কাগজে প্রকাশিত হয়নি। জীবটা কী? গরিলা? কিন্তু জামা-জুতো পরা গরিলার কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি।'

রোলাঁ মাথা নেড়ে বললেন, 'না, সে গরিলা নয়।'

—'তবে কি তাকে আপনি মানুষ বলে মনে করেন?'

—'মানুষ বলতে আমরা ঠিক যা বুঝি, সে তাও নয়।'

—'তার মানে?'

—'মানেটা ভালো করে বোঝাতে গেলে আমাকে সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে হবে—সেই যখন রোমশ ম্যামথ হাতি ও গন্ডার, খাঁড়াদেঁতো বাঘ, গুহাভল্লুক আর অতিকায় বৃষ প্রভৃতি জীবের দল পৃথিবীতে বিচরণ করত।'

—'সে সব কথা আমরাও কেতাবে কিছু কিছু পাঠ করেছি। খালি পশু নয়, তখন মানুষেরও অস্তিত্ব ছিল।'

—'আমি যখনকার কথা বলছি, তখনও 'হোমো সেপিয়েন' বা সত্যিকার মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। নৃবিদ্যাবিশারদরা সত্যিকার মানুষদের নাম দিয়েছেন—'ক্রো-ম্যাগ্‌নন'। আমি তাদের কথা বলছি না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাদের আগেকার যুগে ইউরোপে যে মানুষদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতদের কাছে তারা 'নিয়ানডার্থাল' মানুষ বলে পরিচিত। সত্যিকার মানুষদের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। তাদের চেহারা অনেকটা গরিলার মতো দেখতে হলেও তারা গুহায় বাস করত, আগুনের ব্যবহার জানত, চকমকি পাথরের হাতিয়ার প্রভৃতি তৈরি করতে পারত। আরও নানা জাতের তথাকথিত মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেমন জাভা দ্বীপের বানর-মানুষ, ইংল্যান্ডের পিল্টডাউন মানুষ, আফ্রিকার রোডেশিয়ান মানুষ! এরাও কেউ সত্যিকার মানুষের জ্ঞাতি নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ-সব হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগেকার কথা, আবার কোনও কোনও জাতের মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে আরো অনেক কাল আগে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে অন্তত দুই লক্ষ বৎসর আগেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষ যে কতকাল ধরে চেষ্টা করে আসছে, তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু মানুষ আজও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি।'

রোলাঁ বললেন, 'হয়তো তা পারবেও না। নিখুঁত হবার আগেই পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্যে মানুষ আজ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। মারাত্মক অ্যাটম বোমা তৈরি করেও সে খুশি নয়, তারও চেয়ে সাংঘাতিক হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে আজ ব্যস্ত হয়ে আছে।'

আলোচনাটা মোড় ফিরে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কুমার বললে, 'মি. রোলাঁ, পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষদের আবির্ভাব যখন হয়নি, আপনি তখনকার কথা বলতে যাচ্ছিলেন না?'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে একজাতীয় মানুষের খুলি আর দেহের হাড় পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতরা পরীক্ষা করে বলেছেন, ইউরোপে যখন নিয়ানডার্থাল মানুষরা বাস করত, খুব সম্ভব সেই সময়েই আফ্রিকায় বর্তমান ছিল এই রোডেশিয়ান মানুষরা। গরিলার সঙ্গে তাদের চেহারার মিল ছিল নিয়ানডার্থালদের চেয়ে বেশি। আজকাল পৃথিবীতে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জাতি বলে গণ্য হয় অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা। হয়তো সুদূর অতীতে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল সেই রকম রোডেশিয়ান মানুষরাই।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আধুনিক ফ্রান্সে যে গরিলার মতো জীবটাকে দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে এসব কথার সম্পর্ক কী?'

—'আমার মতে, ওই জীবটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর।'

—'আমরাও তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর! তা বলে আমাদের তো আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলা চলে না?'

—'তা চলে না। কিন্তু শুনুন। এই বিপুলা পৃথিবীতে আজও হয়তো এমন কোনও কোনও স্থান থাকতে পারে, প্রাচীন বা আধুনিক কোনও সভ্যতারই সংস্পর্শ না পেয়ে স্মরণাতীত কাল থেকেই যেখানকার মানুষের অগ্রগতি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ক্রমোন্নতির জন্যে কোনও চেষ্টাই নেই, বর্তমানকে নিয়েই যারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, তাদের 'বর্তমান'-ও আবদ্ধ হয়ে থাকে সুদূর অতীতের আবহের মধ্যেই। সুতরাং আজও কোনও কোনও অজানা দুর্গম প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ থাকা অসম্ভব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও কোনও মাছের অস্তিত্ব আজও লুপ্ত হয়নি। আমেরিকার প্যাট্যাগোনিয়া প্রদেশে কেউ কেউ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুও দেখেছে। তবে কোনও বিশেষ জাতের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই, এ কথা কি জোর করে বলা যায়?'

বিমল বললে, 'তর্কের অনুরোধে না হয় আপনার কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু ফ্রান্সে যে আজব জীবটা দেখা গেছে, সে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, আপনার এমন অনুমানের কারণ কী?'

রোলাঁ বললেন, 'এ আমার অনুমান নয়, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস।'

—'আপনার দৃঢ়বিশ্বাস?'

—'হ্যাঁ। কারণ তাকে আমি চিনি। সে আমার বাড়ি থেকেই পালিয়ে গিয়েছে।'

বিমল ও কুমার দুইজনেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'তাই নাকি?'

—'ঠিক তাই। সব কথা আগেই আমি বিনয়বাবুর কাছে বলেছি।'

বিমল সাগ্রহে বললে, 'আমরাও সে-সব কথা শুনতে চাই।'

চেয়ারের উপরে ভালো করে বসে রোলাঁ বললেন, 'সেই কথা বলবার জন্যেই আমি

আজ এখানে এসেছি। চায়ের প্রতি আমার অতিভক্তি আছে। আর এক পেয়ালা আনলেও আপত্তি করব না।'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'আমারও ওই মত। অষ্টপ্রহরের কোনও সময়েই চা আপত্তিকর পানীয় নয়। (সচিৎকারে) রামহরি, আবার চা!'

আবার চা এল। পিয়ালায় মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে রোলাঁ বলতে লাগলেন:

'১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমন্ত্রিত হয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলুম বেলজিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত মধ্য-আফ্রিকায়—অর্থাৎ কঙ্গো প্রদেশে। সে এক অদ্ভুত দেশ। সেখানে আছে পিগমি বা বামন জাতের মানুষ আর বামন হাতির দল। সেখানে বড়ো জাতের হাতিও আছে, আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বন্য মহিষ, চিতাবাঘ প্রভৃতি জন্তু। আমরা গিয়েছিলুম গরিলা শিকারে।

'নীলাভ জল নিয়ে যেখানে কিভু হ্রদ টলমল করছে, তারই তীরে আছে কিভুর নিবিড় অরণ্য। সেইখানে আকাশের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে মিকেনো পর্বত। সেখানকার ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতে গেলে দরকার হবে কবির ভাষা। আমি কবি নই, সুতরাং সে চেষ্টা করব না। যদি আবার আমরা কখনও সেখানে যাই, আপনারা সকলেই সমস্ত দেখতে পাবেন স্বচক্ষে। আপাতত সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা সেরে নিতে চাই।

'একদিন আমরা সদলবলে মিকেনো পর্বত থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ রাস্তার পাশে পাহাড়ে-বাঁশবনে জেগে উঠল হাতির ক্রুদ্ধ বৃংহিত, সেই সঙ্গে বিকট আর্তনাদ আর একটা ভারী দেহপতনের শব্দ।

সে অঞ্চলে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু এক রকম গাছ জন্মায়, স্থানীয় লোকরা যার নাম দিয়েছে 'মুসুঙ্গুলা' বা বুনো গোলাপ গাছ। সেই রকম একটা গাছের গুঁড়ির পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, একটা মত্ত হস্তি শুঁড় আস্ফালন করতে করতে আর বাঁশবন দোলাতে দোলাতে বেগে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। সেখানে আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

'কিন্তু আমরা সকলেই যে একটা ভয়াবহ, বিকট আর্তনাদ শুনেছি, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তখন গোধূলি কাল। বনের পাখিরা সব বাসায় ফিরে এসে মুখর কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করছে, একটু পরেই সন্ধ্যা এসে চারিদিকে তিমিরাঞ্চল উড়িয়ে সমস্ত দৃশ্য ঢেকে দেবে। তখনও আমরা পাহাড়ের প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে আছি, সন্ধ্যার আগে পৃথিবীর বুকে গিয়ে নামতে না পারলে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে বিপজ্জনক অপথে বিপথে কুপথে।

'কিন্তু চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে এখনই যে প্রচণ্ড আর্তনাদটা শ্রবণ করলুম, তা কি কোনও মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে? মানুষের কণ্ঠস্বর কি এমন ভাবে বুকের রক্ত হিম করে দিতে পারে?

'পায়ে পায়ে পথ ছেড়ে বনের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, 'কোথা যাও?'

—'কে অমন করে চেঁচিয়ে উঠল, একবার দেখা দরকার।'

—'না, কিছুই দেখবার দরকার নেই। আমাদের আগে এখন নীচে নামা দরকার। এ হচ্ছে আদিম কালের গভীর অরণ্য, মানুষের সভ্যতা এখনও এর অন্দরমহলে ঢুকতে পারেনি। ওখানে কত রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে, কিন্তু তা নিয়ে তুমি-আমি মাথা ঘামিয়ে মরব কেন?'

'আমি বললুম, 'বন্ধু, রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার ধর্ম। এখনই যে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদটা হল, তুমিও তো তা শুনেছ?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমার মতে ওটা হচ্ছে অমানুষিক আর্তনাদ।'

—'হতে পারে। তবু ওটা বোধ হয় কোনও জানোয়ারের চিৎকার নয়। আমি ওর মধ্যে পেয়েছি মানুষের ভাব।'

—'রোলাঁ, তুমি নির্বোধের মতো কথা বলছ। এই গহন বনে যারা বাস করে তারা জন্তুই হোক আর মানুষই হোক, তাদের জীবনের নীতি হচ্ছে একেবারেই স্বতন্ত্র। সকল রকম বিপদ-আপদের জন্যে সর্বদাই তারা প্রস্তুত থাকে, কারণ তাদের ন্যায়শাস্ত্র বলে—'হয় মরো, নয় মারো'! মারতে না পারলে বাঁচতে পারবে না, এই বিপজ্জনক নীতিই যেখানে সর্ববাদিসম্মত, সেখানে পরের ভালো-মন্দ নিয়ে আমরা ভেবে মরব কেন?'

'কিন্তু বন্ধুর যুক্তি আমার মনঃপুত হল না, আমি বললুম, 'এই দুর্গম অরণ্যে সত্য-সত্যই যদি কোনও মানুষ বিপদে পড়ে থাকে, তবে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তাকে সাহায্য করা। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।' এই বলে দুই হাতে ঝোপ সরিয়ে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর সেখানে গিয়ে দেখলুম সে কী দৃশ্য!

'এখানে যেখানে-সেখানে জন্মায় মস্ত মস্ত বিছুটির ঝোপ—স্থানীয় ভাষায় বিছুটিকে বলে, 'কাগারা'। সেই রকম একটা ঝোপের ভিতরে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে শরীরী দুঃস্বপ্নের মতো একটা আশ্চর্য মূর্তি।

'তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কম নয়, প্রকাণ্ড চওড়া বুক, কণ্ঠদেশ নেই বললেই হয়—যেন কাঁধের উপরেই আছে মুখমণ্ডল—আর সে মুখও দেখতে অনেকটা গরিলার মতো। সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা কালো রোম। সে যেন কতক মানুষ আর কতক গরিলার আদর্শে গড়া এক মূর্তি! তার দেহের ঠিক পাশেই রয়েছে একটা বর্শাদণ্ড—ফলক তার পাথরে গড়া!

'অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।'

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

রোলাঁর কাহিনি

'সেই অদ্ভুত, বিভীষণ মূর্তিটার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে, অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ।

'বিমলবাবু, কুমারবাবু, Anthropology, Biology আর Zoology কে আপনাদের

ভাষায় বলে নৃবিদ্যা, জীববিদ্যা আর প্রাণীবিদ্যা। সংসার-চিন্তা আর অর্থাভাব নেই, কাজেই সময় কাটাবার জন্যে শখের খাতিরেই ওই সব বিষয় নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া করতে ছাড়িনি।'

কুমার বললে, 'আপনি দেখছি আমাদের বিনয়বাবুর দলে।'

রোলাঁ হেসে বললেন, 'আপনাদের দেশের প্রবাদে বলে না—রতনেই রতন চেনে?' হয়তো সেইজন্যেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছে। কিন্তু থাক ও-কথা। খানিকক্ষণ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবার পর আন্দাজ করলুম, 'কাগারা' বিছুটির ঝোপের ভিতরে এই যে আশ্চর্য মূর্তিটা পড়ে আছে, রোডেশিয়ার ইতিহাস-পূর্ব যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে এর একটা দূর-সম্পর্ক থাকতেও পারে। আগেই বলেছি, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক শ্রেণির মানুষের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। আমরা এখন কঙ্গো প্রদেশের কিভু হ্রদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু এরই অনতিদূরে পাওয়া যায় সমুদ্রের মতো বিশাল টাঙ্গানিকা হ্রদ। তারই দক্ষিণ প্রান্তে আছে রোডেশিয়া প্রদেশ; সুতরাং স্মরণাতীত প্রাচীনকালে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের কোনও দল যে এ অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়েনি, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

'তারপর এই কঙ্গো হচ্ছে আফ্রিকার এক রহস্যময় প্রদেশ। আধুনিক সভ্যতা এখানকার অনেক রোম্যান্স নষ্ট করে দিলেও, এর বহু স্থলেই আজও তার পদচিহ্ন পড়েনি। পর্যটকদের মুখে সময়ে সময়ে যে-সব কাহিনি শোনা যায়, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। আপনারা কেউ ডবলিউ বাকলে সাহেবের 'Big Game Hunting in Central Africa' নামে পুস্তক পাঠ করেছেন?

'পড়েননি? বেশ, তাহলে আমার মুখ থেকে সংক্ষেপে দুটো কাহিনি শুনুন। বাকলে নিজেও হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারি, আর অন্যান্য শিকারিরাও তাঁর কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। একবার তিনি কঙ্গো প্রদেশের ম'বোমা নদীপথে নৌকাযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। এক জায়গায় গিয়ে শুনলেন, জলপথের সেই অংশটাকে স্থানীয় লোকেরা ভীষণ ভয় করে। সেখানে আছে নাকি এক অতিকায় জলদানব। যখন তার অভিরুচি হয়, সে এক গ্রাসে সমস্ত যাত্রীকে গিলে ফেলে—নৌকা-কে-নৌকা সুদ্ধ! তাই সেখান দিয়ে যাবার সময়ে নৌকার লোকেরা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়, কারণ গোলমাল হলেই জলদানব দারুণ খেপে যায়। কিন্তু মৃদুস্বরে গান গাইলে সে নাকি খুশি হয়! প্রত্যেক নৌকার মাঝি নদীর জলে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করে প্রণামি দিয়ে জলদানবের মেজাজ ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করে। এ গল্প সেখানকার ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষও বিশ্বাস করেন। আপাতত জলদানবকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কারণ ম'বোমা নদীর দিকে কেউ আমরা যেতে চাই না। কিন্তু এইবারে দ্বিতীয় যে গল্পটি বলব, সেটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

'বাকলে বলছেন, 'কঙ্গোর জঙ্গলে বেরিয়েছিলুম হাতিশিকারে একদিন। মদ্দা একটা

হাতির সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু হাতিটা বেজায় চালাক। লোকলস্করের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কখনও জঙ্গল ভেঙে, কখনও জলাভূমি পেরিয়ে হাতিটার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলুম, কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাগাল করতে পারলুম না। অবশেষে বেলা গড়িয়ে এল বিকালের দিকে।

'হাতিটা যে পথ ধরে গিয়েছে, হঠাৎ দেখি সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে কী একটা কালো রংয়ের জানোয়ার। ঘন জঙ্গলের ছায়ায় ভালো করে নজর চলছিল না, তাই প্রথমটায় মনে হল, সেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা হাতি। আরও কাছে এলে বোঝা গেল, সেটা অন্য কোনও জানোয়ার।

'ক্রমেই সে আরও কাছে এসে পড়ল। সে মাথা নামিয়ে হেঁটমুখে আসছিল। তারপর আমার কাছ থেকে হাতচারেক তফাতে এসেই টপ করে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম, কারণ দেখতে তাকে সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের মতো! কয়েক সেকেন্ড ধরে সে তাকিয়ে রইল আমার পানে। তারপর 'ওয়া!' বলে চেঁচিয়ে, কিছুমাত্র ভয়ের ভাব না দেখিয়ে আবার ফিরে গেল বনের দিকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম হতভম্বের মতো। নরহত্যার ভয়ে বন্দুক ছুড়তে হাত উঠল না।

'আমার সঙ্গে দেশীয় অনুচররা বললে, 'বায়ানা (কর্তা), ও হচ্ছে কামা মুনটু। মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের মতোই দেখতে।'

'আমি শিম্পাঞ্জি-গরিলা দেখেছি, এ কিন্তু দেখতে অন্য রকম—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজানা কোনও জীবের মতো। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলুম, এক সময়ে এখানকার অরণ্য থেকে বানরজাতীয় হিংস্র জীবরা বেরিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের আক্রমণ করত, তারপর তাদের বধ করে মৃত দেহগুলো নিয়ে বনের ভিতরে গিয়ে খেয়ে ফেলত।

'বানররা মাংসাশী হয় না, সুতরাং তারা যে বানর নয়, এটুকু সহজেই বোঝা যায়। তবে বাকলে যে জীবটা দেখেছিলেন, আসলে সেটা কী? আজ মিকেনো পাহাড়ের এই 'কাগারা' ঝোপের ভিতরে যে কিম্ভূতকিমাকার জীবটাকে দেখছি, এও কি সেই 'কামা মুনটু'দের নতুন কোনও নমুনা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবছি, হঠাৎ দূর থেকে বন্ধুর সাড়া পেলুম—'রোলাঁ, রোলাঁ, সন্ধ্যার আর দেরি নেই। তুমি এখনও না এলে আমরা তোমাকে ফেলেই চলে যেতে বাধ্য হব।' আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'তোমরাও বনের ভিতরে এসে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে যাও!'

'বন্ধু সদলবলে 'কাগারা' ঝোপের কাছে এসে সচমকে বলে উঠলেন, 'কী এটা? গরিলা?' আমি বললুম, 'না, মানুষের এক আদি পুরুষ।' বন্ধু বললেন, 'ও বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

'এর পরেই আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলে আমাদের সঙ্গী 'আস্কারি' (দেশীয় সৈনিক বা পাহারাওয়ালা)-র দল। তারা মূর্তিটাকে দেখেই একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল—'কামা

মুনটু, কামা মুনটু!' অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে কেবল এইটুকু জানা গেল, কামা মুনটুরা এই অঞ্চলে বাস করে। তারা কিভুর জঙ্গলের ভিতরে কি মিকেনো পাহাড়ের উপরে থাকে, সে কথা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তাদের ঠিকানা জানবার জন্যে কারুর কোনোই আগ্রহ নেই, কারণ তারা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির, স্থানীয় বাসিন্দাদের দেখলেই মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

'বন্ধু বললেন, 'জানোয়ারটা দেখছি অত্যন্ত জখম হয়েছে বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এর এমন দশা কে করলে?' আমি বললুম, 'খুব সম্ভব কোনও পাগলা হাতি। এখানে বাঁশের (এদেশি ভাষায় 'মিগ্যানো') বনে কচি কচি পাতা খাবার লোভে পাহাড়ের উপরে উঠে আসে দলে দলে হাতি।' বন্ধু বললেন, 'চুলোয় যাক যত বাজে কথা। এখন তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে পড়বে চলো, নইলে অন্ধকারে অন্ধ হতে হবে।' আমি বললুম, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই মূর্তিটাকেও নিয়ে যেতে চাই।' বন্ধু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী? এই মূর্তিটা নিয়ে আমাদের কী লাভ হবে?' আমি বললুম, 'তোমাদের নয়, লাভ হবে কেবল আমারই। আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরিধি আরও একটু বাড়াতে চাই।' কিন্তু বন্ধু অত্যন্ত নারাজ, আমিও একেবারেই নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, আপাতত আহত ও অচৈতন্য মূর্তিটাকে নিয়ে আমরা এক সঙ্গেই ক্যাম্পে ফিরে যাব বটে, কিন্তু তারপরেই হবে আমাদের ছাড়াছাড়ি। যদিও তথাকথিত আদিম মানুষটার জন্যে আমাকে বন্ধু ত্যাগ করতে হল, তবু প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্য আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, বন্ধুকে হারিয়েও আমি কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করলুম না।

'আর এক কারণে জাগ্রত হয়েছিল আমার বিশেষ কৌতূহল। মূর্তিটার কণ্ঠদেশে শুকনো চামড়ার বন্ধনীতে সংযুক্ত ছিল একটা জিনিস, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে একখণ্ড কাচ বলেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু আসলে তা হচ্ছে মস্ত একখণ্ড হীরক! খনির ভিতরে এমনি আকাটা হিরা পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি নামক স্থানে বেড়াতে গিয়ে এই অকর্তিত খনিজ হিরা আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি, সুতরাং আমার ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল না। হিরাখানা আকারে মস্ত, এমন অসাধারণ রত্ন যে অত্যন্ত মূল্যবান, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন দুর্লভ জিনিস এই অসভ্য বন্য জীবটার দখলে এল কেমন করে? তবে কি তাদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও হিরার খনির অস্তিত্ব আছে? কিন্তু বন্ধুর আবির্ভাবে এ সব কথা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার সময় আমি পাইনি। বলা বাহুল্য, অন্য কেউ দেখতে পাবার আগেই হিরাখানা আমি নিজের পকেটের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছিলুম।

'তারপরের কথা সবিস্তারে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সুতরাং মোদ্দা কথা আমি খুব সংক্ষেপেই বলতে চাই। আমার 'আদিম মানুষ'কে নিয়ে আমি উগাণ্ডা প্রদেশের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া হ্রদের কাছে গিয়ে পড়লুম। স্থলপথে বেশি দূর যাত্রা করলে পাছে যার-তার কাছে গিয়ে প্রচুর জবাবদিহি করতে হয়, সেই ভয়ে আমি অবলম্বন করলুম জলপথ। নিজস্ব নৌকায় নীলনদ দিয়ে যাত্রা করলুম আবার সভ্যজগতের দিকে।

এই জাতের আদিম মানুষকে এখানকার লোকে 'কামা মুনটু' বলে ডাকে। আমি সংক্ষেপে তার নাম রাখলুম, মুনটু। কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তার স্বরূপ লুকোবার জন্যে আমাকে কম বেগ পেতে হয়নি। তবে সে অত্যন্ত আহত ছিল বলে আমি সেই সুবিধা গ্রহণ করতে ছাড়লুম না। সব চেয়ে বীভৎস ছিল তার মুখখানা, তা একেবারেই অমানুষিক। কেবল চোখদুটো ছাড়া তার মুখমণ্ডলের সবটাই আমি ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখলুম। প্রথম দশ দিনের ভিতরে মুনটুর জ্ঞান ফিরে আসেনি; কিন্তু চেতনা লাভ করবার পরেই আমাকে দেখে তার দুই চক্ষের মধ্যে যে ভয়াল জিঘাংসু দৃষ্টি ফুটে উঠল, তা অবর্ণনীয় বলা চলে। তৎক্ষণাৎ সে তার মুখের ও দেহের ব্যান্ডেজ খুলে ছিন্নভিন্ন করে ফেললে। আমরা বাধ্য হয়েই কয়জনে মিলে তার হাতে পরিয়ে দিলুম হাতকড়ি। কিন্তু এমনি তার আসুরিক শক্তি যে, সেই আহত, পঙ্গু অবস্থাতেও সে হাতকড়ি ভেঙে ফেললে অবলীলাক্রমে। তখন শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে রাখতে হল।

'ফ্রান্সে ফিরে তাকে মেলুন গ্রামে নিজের বাগানবাড়িতে এনে রাখলুম। এবং তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলুম নিজেই। মুনটুর দেহের তিনখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিল, মাথাতেও সে বিষম চোট খেয়েছিল। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ হলে নিশ্চয়ই সে বাঁচত না, কিন্তু মুনটুর অসাধারণ শক্তিশালী দেহ ও বন্য স্বাস্থ্যই তাকে খুব তাড়াতাড়ি আবার আরোগ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। কিছুকালের মধ্যেই সে আবার শক্তসমর্থ হয়ে উঠল।

'বনের ভিতরে তার দেহ ছিল প্রায় উলঙ্গ, কেবল তার কোমরে লম্বমান ছিল এক টুকরো চামড়ার আচ্ছাদন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ভিতরে তো তাকে সেই অবস্থায় রাখা চলে না, তাই আমরা জোরজার করে তাকে পরিয়ে দিয়েছিলুম জামা, ইজের, জুতো।

'মুনটু যখন বুঝলে আমাদের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তখন সে দায়ে পড়ে আর কোনও বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। কিন্তু সর্বক্ষণই সে মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকত, তাকে কথা কওয়াবার কোনও চেষ্টাই আমাদের সফল হয়নি, এমনকি সে উচ্চারণ করেনি একটা টুঁ-শব্দও। অবাক হয়ে ভাবতুম, সে কি বোবা, না তার কোনও ভাষা নেই?

'বনের দুর্দান্ত সিংহও অবশেষে মানুষের পোষ মানতে বাধ্য হয়। আমিও ভাবলুম, এতদিনে নিশ্চয় মুনটুর আক্কেল হয়েছে। প্রথমে তার পায়ের, তারপর তার হাতের বাঁধন খুলে দিলুম। বন্ধনমুক্ত হয়েও সে কোনওরকম বেচাল করলে না, গুম হয়ে চুপ করে বসে রইল, সে খুশি হয়েছে কি না তাও বোঝা গেল না।

'কিন্তু পরদিন প্রভাতেই আবিষ্কার করলুম, গত রাত্রে জানালা ভেঙে মুনটু দিয়েছে চম্পট। তারপর খবরের কাগজে পলাতক মুনটুর কাহিনি প্রকাশিত হতে লাগল। আপনারা এদেশে বসেও তার খবর পেয়েছেন। ফ্রান্সের নানা জায়গায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হল— জামা, ইজের, জুতো পরা গরিলার মতো ভয়াবহ জন্তু, এ আবার কী ব্যাপার! আমি কিন্তু সাত-পাঁচ কিছুই ভাঙলুম না। মুনটুর শেষ দেখা পাওয়া যায় ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে আল্পস গিরিমালার ব্ল্যাঙ্ক পাহাড়ের কাছে। তারপর থেকেই সে একেবারে নিরুদ্দেশ।'

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

রামহরির আশা

রোলাঁর কাহিনি শুনে সকলেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ভুত মানুষ নয়, এই কাহিনির মধ্যে ছিল আরও এমন সব বিচিত্র কথা এবং অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত, যা মনকে অভিভূত না করে পারে না।

দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে রামহরিও গল্প শুনতে ছাড়েনি। তার আগ্রহ হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। বিমল ও কুমারের চড়ুকে পিঠ যে কত সহজে সড়সড় করে ওঠে, এটা তার কাছে মোটেই অজানা ছিল না। কে একটা উটকো সাহেব কোথা থেকে হঠাৎ এসে আবার যখন তাদের খেপিয়ে তুলতে চায়, তখন এই খ্যাপামির দৌড় কত দূর, সেটা জানবার জন্যে তার কৌতূহল জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক।

রোলাঁর কাহিনির কতক কতক সে বুঝতে পারলে বটে, আবার তার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেল অনেক কথাই। কিন্তু একটা কারণে তারও উৎসাহ জেগে উঠতে বিলম্ব হল না।

রোলাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে সাগ্রহে বলে উঠল, 'ও সায়েব, তুমি কী বললে? সেই বনমানুষটার হাতে ছিল মস্ত একখানা হিরে?'

তার রকম-সকম দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ।'

—'এ যে অবাক কথা বাপু! হিরে থাকে তো হিরের খনিতে, জহুরির দোকানে আর রাজা-রাজড়ার লোহার সিন্দুকে! বনমানুষ আবার হিরে পেলে কোত্থেকে?'

রোলাঁ বললেন, 'আমরা যে জায়গায় গিয়েছিলুম, নিশ্চয়ই তার কাছাকাছি কোথাও হিরার খনি আছে।'

কমল বললে, 'আপনি যে জীবটার কথা বললেন, তাকে দেখলেই নাকি গরিলা বলে মনে হয়! এমন কোনও জীব কি হিরার খোঁজে খনি কাটতে পারে?'

রোলাঁ শুধোলেন, 'আপনি হিরার খনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'যে-অঞ্চলে হিরার খনি আছে, সেখানে খনির বাইরেও এখানে-ওখানে হিরা কুড়িয়ে পাওয়া যায়।'

—'ব্যাপারটা বুঝলুম না।'

—'শুনুন। হীরকের জন্যে আগে প্রাচ্যদেশ—বিশেষ করে আপনাদের ভারতবর্ষই ছিল বিখ্যাত। গোলকুণ্ডায় এখন বোধ হয় হিরা পাওয়া যায় না, কিন্তু আগে দুনিয়ার সবাই গোলকুণ্ডা বললেই বুঝত হীরকের দেশ। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যের এই গৌরব অটুট ছিল। তারপর পৃথিবীর আরও নানা দেশে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। আজকাল তো দক্ষিণ আফ্রিকা হীরকের ব্যবসায় প্রায় একচেটে করে ফেলেছে। সেখানে অনেক সময়ে হীরক আবিষ্কার করবার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয় না, কখনও কখনও কাঁকরের সঙ্গে এখানে-

ওখানে এমন হীরকও কুড়িয়ে পাওয়া যায়, যা সত্য-সত্যই সাত রাজার ধন মানিকের মতো মূল্যবান। আমার কী বিশ্বাস জানেন? ওই রকম কোনও হীরকের খনির কাছেই আছে মান্ধাতার মানুষদের আধুনিক বসতি। খুব সম্ভব তারা হীরকের খনির কোনও ধারই ধারে না, হীরক যে দুর্লভ রত্ন এ খবরও রাখে না, কেবল তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এইটুকুই অনুমান করতে পেরেছে যে, এ হচ্ছে কোনও অসামান্য স্ফটিক, একে অলঙ্কারের মতন অঙ্গে ধারণ করা উচিত।'

কুমার বললে, 'আপনি যে হিরাখানা পেয়েছেন তার ওজন কত?'

—'একশো ক্যারেট।'

—'তার কত দাম হতে পারে?'

—'বলেছি তো, সেখানা হচ্ছে আকাটা হিরা, আদিম অসভ্য মানুষরা হিরা কাটবার আর্ট জানে না। ঠিক ভাবে কাটতে পারলে তার রং, রূপ, চাকচিক্য আর দাম যথেষ্ট বেড়ে যাবে বলেই মনে করি। তবে বর্তমান অবস্থাতেই একজন পাকা জহুরি সেখানা আমার কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

রামহরি দুই চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে বললে, 'বলো কী সায়েব, তোমার ওই মান্ধাতার মুল্লুকে গেলে আমাদের কি পদে পদে হিরেমানিক মাড়িয়ে চলতে হবে!'

রোলাঁ হেসে উঠে বললেন, 'হিরা-মানিক পথের ধুলো নয় বন্ধু, তা এত সস্তা ভেব না। দু-এক খানা মহার্ঘ স্ফটিক আমরাও হয়তো কুড়িয়ে পেতে পারি, কিন্তু সে হচ্ছে দৈবাতের ব্যাপার। আসল খনি আবিষ্কার করতে গেলে প্রচুর কাঠ-খড় না পোড়ালে চলে না।'

এতক্ষণ পরে বিমল মুখ খুলে বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, তাহলে আপনার এই নতুন অভিযানের আসল উদ্দেশ্য কী? আপনি কি ধনকুবের হবার জন্যে হিরার খনি আবিষ্কার করতে চান?'

কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে রোলাঁ বললেন, 'হঠাৎ আপনি এমন প্রশ্ন করলেন কেন?'

বিমল বললে, 'ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রত্ন-শিকার', আমার আর কুমারের পক্ষে সেটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ভগবান আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়েছেন, তাকে আরও অসামান্য করে তোলবার জন্যে আমরা আর পৃথিবীময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে রাজি নই। রাশি রাশি হীরকের মোহে আপনি যদি মুগ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের আশা ছেড়ে দিয়ে আপনাকে একলাই যাত্রা করতে হবে, কারণ লক্ষ্মীলাভের লোভে আমরা আর সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে পারব না।'

রোলাঁ বললেন, 'না, না বিমলবাবু, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। এই বিংশ শতাব্দীতেও মান্ধাতার মানুষদের জীবনযাত্রা দেখবার সুযোগ পাওয়া যে অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা, এটা আর ফলাও করে না বললেও চলবে। তাই দেখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আর বিনয়বাবুও আমার পক্ষে। আপনারাও আমাদের সহযাত্রী হবেন, সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। যদি হিরার খনির লোভই আমাকে পেয়ে বসত, তাহলে প্রথম বারেই আমি সে চেষ্টা করতে ছাড়তুম না। তবে ওই হীরকঘটিত ব্যাপারটা যে এই

অভিযানের আনুষঙ্গিক আকর্ষণ, এ কথা অস্বীকার করবার চেষ্টা আমি করব না।'

কুমার বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, আপনার ওই মান্ধাতার মানুষ ফরাসি দেশে আত্মপ্রকাশ করে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার গুপ্তকথা জানবার জন্যে ফরাসি পুলিশও কোনও পাথর ওলটাতে বাকি রাখেনি। হয়তো অনেক কথাই তারা জানতে পেরেছে—এমনকি ওই একশো ক্যারেট হীরকের কথাও।'

মস্তকান্দোলন করে রোলাঁ বললেন, 'না, কেউ কিছু জানতে পারলে এত দিনে আমিও সেটা জানতে পারতুম। পেটের কথা আমি ঘুণাক্ষরেও কারুর কাছে প্রকাশ করিনি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'মান্ধাতার মানুষের কথা প্রকাশ করলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হত না। তা নিয়ে আমাদের মতন দুই-এক জন পাগল ছাড়া আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইবে না। কিন্তু গোল বাধবার সম্ভাবনা ওই হিরার খনি সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে। অর্থলোভ হচ্ছে সবচেয়ে প্রবল লোভ।'

রোলাঁ বললেন, 'তার গুপ্তকথাও আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

—'কিন্তু আমি বরাবরই দেখে আসছি, ও-সব কথা লুকিয়ে রাখা যায় না। মঁসিয়ে রোলাঁ, আপনি বললেন না, হিরাখানার জন্যে একজন জহুরি দেড় লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল?'

—'হ্যাঁ। হিরাখানা কোন জাতের তা পরীক্ষা করবার জন্যে আমি তার কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম।'

—'তাহলেই বুঝুন, আর একজন বাইরের লোকও আপনার হিরার কথা জানে।'

—'কিন্তু ওই পর্যন্ত! হিরার ঠিকানা বা কার কাছ থেকে তা পেয়েছি, এসব কিছুই সে জানে না।'

—'কিন্তু আপনার মতো অব্যবসায়ীর কাছে এত দামি একখানা আকাটা হিরা দেখে সহজেই কি তার কৌতূহল জাগ্রত হবে না?'

—'জাগ্রত হলেই বা ক্ষতি কীসের?'

বিমল বললে, 'ক্ষতি কীসের, শুনুন। তাহলে তার মুখে আরও কোনও কোনও লোক এ কথা শুনতে পেয়ে ওই হিরাখানা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।'

—'মাথা ঘামালেও আমি কেয়ার করব না। কারণ, আমাদের এই অভিযান তো হিরার খনি আবিষ্কার করবার জন্যে নয়!'

কুমার বললে, 'তা নয় বটে, তবু উদোর বিপদ যে বুধোর ঘাড়ে এসে পড়বে না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না।'

—'কিন্তু বিপদের কথা কী বলছেন? একটা কথা সত্য বটে, এ রকম অভিযান সর্বদাই বিপজ্জনক—আমরা যাচ্ছি পদে পদে বিপদের দেশে। এর জন্যে আমরাও অপ্রস্তুত নই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনা তো আমি দেখছি না!'

বিমল বললে, 'দেখছেন না? যদি ভাসা ভাসা খবর পেয়ে একদল রত্নসন্ধানী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে?'

—'আমাদের উদ্দেশ্য তাদের বুঝিয়ে দেব।'

—'যদি তারা আমাদের কথায় তত সহজে বিশ্বাস না করে?'

—'তাহলে তাদের আমি সোজা জাহান্নমে যেতে বলব।'

—'বেশ, তাই বলবেন! ফলেন পরিচীয়তে। এখন কোন পথে, কোন দিক দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে তাই বলুন দেখি।'

—'প্রথমে সমুদ্রপথ। সরাসরি উঠব গিয়ে আফ্রিকার কেনিয়া কলোনির মোম্বাসা বন্দরে। সেখান থেকে রেলপথে নাইরোবি শহরে। তারপর উগান্ডা প্রদেশের ভিতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থান কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে। এই হল মোটামুটি পথের বিবরণ।'

বিমল বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, কঙ্গোর গহন বনে প্রবেশ করতে হলে আমাদের তো রীতিমতো তোড়জোড় করতে হবে।'

—'তা তো হবেই।'

—'যথা—'

—'সেজন্যে আপনাদের কোনও চিন্তাই করতে হবে না, আপনাদের ব্যবস্থাপক হব আমি নিজেই। আপনাদের পেলেই আমি আর কিছু চাই না।'

—'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে রোলাঁ, আফ্রিকায় আমরাও এই প্রথম যাচ্ছি না, ওখানকার পথ-ঘাট আছে আমাদের নখদর্পণে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, এরকম অভিযানের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের দরকার হয়!'

—'কিছু ভাববেন না, সমস্ত অর্থ ব্যয়ের ভার গ্রহণ করব আমিই।'

—'ক্ষমা করবেন মহাশয়, ওইখানেই আমার আপত্তি।'

—'আপনি কী করতে চান?'

—'খরচের অর্ধেক দায় আমাদেরও।'

—'উত্তম, আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।'

—'ধন্যবাদ! তাহলে পরের দৃশ্য আমাদের অভিনয় শুরু হবে একেবারে আফ্রিকার বুকে।'

রামহরি বললে, 'চুলোয় যাক তোমাদের মান্ধাতার মানুষ! ও সব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা খারাপ করতে রাজি নই, আমি দেখব খালি হিরের খনি! এক কোঁচড় হিরে পেলেই আমাদের চলবে, কী বলিস রে বাঘা?'

বাঘা কুকুর কী বুঝলে জানি না, সে বললে, 'ঘেউ, ঘেউ ঘেউ।'

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

দুঃসংবাদ

আরবদের একটি প্রবাদ: 'নীল নদের জল একবার যে পান করেছে, আবার তা পান করবার জন্যে তাকে প্রত্যাগমন করতে হবেই।'

প্রবাদটা হয়তো অমূলক নয়। কারণ এবার নিয়ে এ অঞ্চলে বিমল ও কুমারের আসা

হল বার বার—তিন বার। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ভ্রমণকাহিনি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'আবার যকের ধন' ও 'রত্নপুরের যাত্রী' উপন্যাসে!

দ্বীপনগরী মোম্বাসা—আগে ছিল (১৮৮৭-১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে) ইংরেজ-অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী। বয়স তার প্রাচীন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দেও বিখ্যাত আরব ভ্রমণকারী ইবন বতুতা তাকে একটি বৃহৎ জনপদ বলে বর্ণনা করেছেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দেও পর্তুগিজ নৌ-বীর ভাস্কো-ডি-গামা এখানে এসে ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখে গিয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে জলপথে পূর্ব আফ্রিকায় আসতে গেলে আজও প্রথমে এসে নামতে হয় মোম্বাসার কিলিন্দিনি বন্দরে।

মোম্বাসাকে নিয়ে আরব ও পর্তুগিজের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গিয়েছে—কখনও জিতেছে আরবরা, কখনও পর্তুগিজরা। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা এখানে যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল, আজও তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু এখন আর তা আরব বা পর্তুগিজ কারুর ভোগেই লাগে না। মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সর্বগ্রাসী ইংরেজরা, সেখানে আছে তাদের সামরিক রসদের ভাণ্ডার এবং কয়েদখানা। এই প্রাচীন দুর্গটির অবস্থান সুন্দর, চল্লিশ ফুট উঁচু প্রবালশৈলের উপরে দাঁড়িয়ে সে কাটিয়ে দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং তার সুমুখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বয়ে যায় সুনীল ভারতসাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গমালা।

বন্দর থেকে বিমল, কুমার, রোলাঁ, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি প্রমুখ নিয়ে রিকশাগুলো ছুটতে লাগল হোটেলের দিকে এবং আরোহীদের কৌতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে রইল রাজপথের দৃশ্যের দিকে।

আফ্রিকাকে আগে সকলে মনে করত রহস্যময় দেশ, কিন্তু তার পূর্ব প্রান্তরে সমুদ্র-তীরবর্তী নগরগুলো এখন যেন হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। রাজপথ দিয়ে ছুটছে রিকশা, মোটর, ট্যাক্সি ও লরি এবং তাদের আরোহীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হরেক-রকম পোশাক পরা নানান দেশের নানান জাতের লোক। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, কালো-কুচকুচে 'সোয়াহিলি' বা স্থানীয় বাসিন্দা, অপেক্ষাকৃত অল্প-কালো আরব এবং সাধারণত শ্যামবর্ণ ভারতীয়।

বহু ভারতবাসী এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। রাজপথের নানা স্থানে দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক—হিন্দু, মুসলমান, পার্সি। দিকে দিকে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কত মন্দির ও মসজিদ এবং তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, ভারতবাসীর সংখ্যা এখানে নগণ্য নয়। এমনকি, এখানে ভারতীয় বাজারেরও অভাব নেই।

একটি বিখ্যাত চলতি কথা আছে: 'কোনও ভৃত্যের কাছেই তার প্রভু বীর বলে গণ্য হয় না।' বলা বাহুল্য, এ কথা খাটে কেবল মনুষ্য সমাজেই।

কিন্তু কুকুররা হচ্ছে প্রভুগত প্রাণ। প্রভুই তাদের দেবতা। কাজেই বিদেশে এসে বাঘা তার প্রভুর সঙ্গ ছাড়তে রাজি হয়নি, কুমারের পিছনে-পিছনেই রিকশায় এসে উঠেছে। ভালো করে আঘ্রাণ নিয়েই সে বুঝতে পেরেছে এ দেশ তার কাছে মোটেই নতুন নয়—এখানে বাতাসে বাতাসে মিশিয়ে আছে পুরাতন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ! তার মনের ভিতরে জেগে উঠল বোধ করি নতুন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, কারণ লাঙ্গুল-পতাকা উত্তোলন

করে উদগ্র উৎসাহে সে চিৎকার করতে লাগল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কমল হচ্ছে দলের মধ্যে সকলের ছোটো। সে এর আগে আর কখনও আফ্রিকায় আসেনি বটে, কিন্তু পর্যটকদের পুস্তকে এখানকার বহু রোমাঞ্চকর কাহিনি পাঠ করেছে। তার কাছে আফ্রিকা হচ্ছে এক বিচিত্র রোমান্সের দেশ—যেখানে দিকে দিকে শোনা যায় সিংহ, গন্ডার, হাতি, হিপো আর গরিলার গর্জন, যেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে বাজতে থাকে জুলু, হটেন্টট ও মাসাই প্রভৃতি অসভ্য যোদ্ধাদের রণ-দামামা, যেখানে পথে-বিপথে পদে পদে অতর্কিতে হয় ভয়াবহ বিপদের আবির্ভাব!

কাজেই এখানে এসেও সে সেই নিত্যপরিচিত নাগরিক দৃশ্য এবং একান্ত-সাধারণ, পোষ-মানা মনুষ্য-জাতীয় জীবদের একঘেয়ে জনতা দেখে মোটেই তৃপ্ত হতে পারলে না, হতাশ ভাবে বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ এখানে এসে মনে হচ্ছে না তো আমার স্বপ্নে-দেখা আফ্রিকায় এসে হাজির হয়েছি। এ যে দেখছি বাংলা দেশের মফস্‌সলের কোনও শহরের মতো একটা জায়গা!'

রোলাঁ মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এখান থেকে আমরা যাব এরও চেয়ে একটা বড়ো শহরে। নাম তার নাইরোবি, সেটা হচ্ছে কেনিয়ার রাজধানী।'

কমল মুখ ভার করে বললে, 'তাহলে আমরা কি আফ্রিকায় এসেছি শহরের পর শহর দেখবার জন্যেই?'

—'আপাতত তাই বটে। কমলবাবু, প্রথমে আমাদের গোড়া বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে অনেক লটবহর, তাঁবু, মোটর, লরি, আগ্নেয়াস্ত্র, একদল আস্কারি—'

—'আস্কারি আবার কী?'

—'এখানে আস্কারি বলে সেপাই আর পাহারাওয়ালাকে।'

—'কোথায় তারা?'

—'ভারতবর্ষে থাকতেই যথাসময়ে তারবার্তা পাঠিয়ে আমার এজেন্টকে সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখতে বলেছি। এখনই ব্যস্ত হবেন না, অজ্ঞাত আফ্রিকার বুকে ঝাঁপ দেবার আগে যথাস্থানেই সব হাজির থাকবে।'

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে কমল বললে, 'তাহলে এখনও অজ্ঞাত আফ্রিকার অস্তিত্ব আছে?'

রোলাঁ বললে, 'এখনও আছে কমলবাবু, এখনও আছে। কাপড়ের ধারে ধারে থাকে যেমন পাড়, আফ্রিকার চার প্রান্তেই আছে তেমনি সভ্যতার বসতি। কিন্তু তার অন্তঃপুর হচ্ছে এমন বিরাট যে, সেখানে কোথায় যে কী হচ্ছে আর কী না হচ্ছে, আজও কেউ নিশ্চিতরূপে সে সন্ধান রাখতে পারে না। এই তো সবে প্রস্তাবনা, এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন কেন?'

বুঝতে পারছি, কমলের মতো অনেক পাঠকও এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবেই প্রাথমিক পথের বর্ণনা দিয়ে আমরা মূল ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হব।

দিন-দুই মোম্বাসার দুঃসহ কাঠফাটা উত্তাপ সহ্য করে অবশেষে তারা ট্রেনে চড়ে নাইরোবির দিকে যাত্রা করলে।

দুই দিকে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঝোপঝাপ, বনজঙ্গল এবং মাঝে মাঝে ধূসর পাহাড়। সেখানে বিচরণ করছে হরিণ, উটপাখি, জেব্রা ও জিরাফের দল। এক জায়গায় খানার ধারে দাঁড়িয়ে জলপান করছিল একটা চিতাবাঘ, ছুটন্ত ট্রেনের দিকে মুখ'তুলে তাকিয়েই সে দৌড় মেরে একটা ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বললে, 'কুমার, মনে আছে, প্রথম বারে এ অঞ্চলে এসে কী বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছিলুম? সে যেন নানা জাতের জীবজন্তুর বিপুল শোভাযাত্রা!'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, এক জায়গায় ট্রেনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা-দুটো নয়, একদল সিংহ!'

বিমল বললে, 'এখানকার জীব-রাজ্যকে ক্রমেই ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা আর আগ্নেয়াস্ত্র। আজ যা দেখছি, দু-দিন পরে তাও আর থাকবে না।'

তারপর সুদূরের রহস্যময়, কুয়াশা-মাখা নীলবর্ণের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল এক রৌদ্রবিধৌত পর্বতের মেঘভেদী সমুজ্জ্বল তুষার-মুকুট।

কমল সবিস্ময়ে বললে, 'দারুণ গ্রীষ্মের কবলে ছটফট করছিলুম, এখন এ যে দেখছি বরফের পাহাড়!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম কিলিম্যাঞ্জেরো।'

রামহরি বললে, 'উঁহুঁ, এটা হচ্ছে এখানকার হিমালয়। বাবা মহাদেব এদিকে বেড়াতে এলে ওইখানে গিয়েই ওঠেন'—এই বলে সে ভক্তিভরে দুই হাত যুক্ত করে বাবা মহাদেবের উদ্দেশে ঘন ঘন প্রণাম করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কমল সাগ্রহে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন, আবার একটা বরফের পাহাড়।'

রোলাঁ বললেন, 'হ্যাঁ, মাউন্ট কেনিয়া। মাথায় তুষারের গম্বুজ থাকলেও এ হচ্ছে আগ্নেয় পর্বত—কিলিম্যাঞ্জেরোর চেয়ে দুই হাজার ফুট নিচু। ওরই বুকের ভিতরে আছে আফ্রিকার বহু হ্রদ আর নির্ঝরের মূল।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে রামহরি বললে, 'বাবা, এদেশে একটা নয়, দু-দুটো হিমালয় আছে!'

অবশেষে ট্রেন এসে থামল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির সুনির্মিত আধুনিক রেল-স্টেশনে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থেকে নামল শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর দল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কামরায় ছিল যথাক্রমে ভারতীয় ও আফ্রিকার দেশীয় যাত্রীরা।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কমল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'শুনেছিলুম আফ্রিকা হচ্ছে পশুরাজ সিংহের স্বদেশ। কিন্তু হায় রে, এতখানি পথ পার হয়ে এলুম, তবু পশুরাজের একগাছা ল্যাজের ডগাও তো দেখতে পেলুম না!'

রোলাঁ বললেন, 'প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ম্যাপে নাইরোবির নাম খুঁজে পাওয়াও সহজ ছিল না। তখন এ জায়গা ছিল সিংহদের শখের বেড়াবার জায়গা। শহরের পত্তন হবার

অনেক পরেও বড়ো বড়ো রাস্তায় বিচরণ করত সিংহের দল। তাদের ভয়ে রাত্রে কেউ বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে ভরসা করত না। বাড়ির ভিতরে থেকেও গৃহস্থদের শান্তি ছিল না, কারণ সিংহরা খাবারের লোভে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজা ঠেলাঠেলি করত। শহরে সিংহের কবলে মৃত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের কবর এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন আর নেই, আজকের নাইরোবি হচ্ছে যে কোনও সভ্য দেশের উপযোগী সম্পূর্ণ আধুনিক নগর। সিংহেরা আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী নয়। তারা ঘৃণাভরে এ অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়েছে। বাসিন্দারা এখন রাস্তায় শুয়েও ঘুমোতে পারে।'

এমন সময়ে স্টেশনের জনতার ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে রোলাঁকে অভিবাদন করলে। লম্বায় সে প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, গঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। পরনে খাকি রঙের কোট, প্যান্ট ও জুতো।

রোলাঁ বললেন, 'গেল বারে এ ছিল আমার সাফারির সর্দার। এর নাম কামাথি, জাতে কিকুয়ু, অত্যন্ত বিশ্বাসী।'

কমল শুধোলে, 'সাফারি কাকে বলে?'

রোলাঁ বললেন, 'লটবহরবাহী কুলির দল।'

রোলাঁ স্থানীয় ভাষায় কামাথির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠল কেমন একটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

বিনয়বাবু বললেন, 'মসিঁয়ে রোলাঁ, আপনি কি কোনও অশুভ খবর পেয়েছেন?'

রোলাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, অশুভ খবর—অত্যন্ত অশুভ খবর। গত কল্য আর একদল শ্বেতাঙ্গ কঙ্গো প্রদেশের দিকে যাত্রা করেছে।'

—'এজন্যে আমাদের ব্যস্ত হবার কোনও কারণ আছে?'

—'নিশ্চয়ই আছে! আমাদের মতো তাদেরও গন্তব্য স্থান হচ্ছে মিকেনো পর্বত। বড়োই দুঃসংবাদ, বড়োই দুঃসংবাদ!'

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

সর্দার ডাকু এবং মউ মউ

দুঃসংবাদ শুনে বিমল নীরব হয়ে রইল।

তারপর কুমার বললে, 'দেখছেন মঁসিয়ে রোলাঁ, শেষটা আমাদের অনুমানই সত্য হয়ে দাঁড়াল?'

রোলাঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তাই তো দেখছি! মনুষ্য-চরিত্রে আমার চেয়ে যে আপনাদের অভিজ্ঞতা বেশি, এটাও বুঝতে পারছি! কিন্তু কথা হচ্ছে এই, গেল যারা মিকেনো পর্বতের দিকে যাত্রা করেছে, তারা কারা? কামাথি, গেল বারে তুমি তো আমাদের দলে ছিলে, সবাইকেই তুমি চেনো। এরা কি তারাই?'

কামাথি মাথা নেড়ে বললে, 'না কর্তা, এদের কারুকেই আমি চিনি না। কিন্তু আমি খবর পেয়েছি, এরা আপনাদের কথা জানে।'

কুমার বললে, 'আমার বিশ্বাস, একদল রত্নলোভী মানুষ ফ্রান্সেই আপনার ওই একশো ক্যারেট হিরাখানার ইতিহাস জানতে পেরেছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, তারা ধরে নিয়েছে, ওই হীরকের জন্মভূমি আবিষ্কার করবার জন্যেই এবার দেশ ছেড়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছেন। হয়তো আমাদের পিছনে পিছনেই আছে তাদের চর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ড হবে তাদের সমস্ত আশা-ভরসা। হিরা-মানিকের লোভে আমরা আসিনি, খুব সম্ভব হিরার খনির সন্ধানও আমরা পাব না!'

বিনয়বাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'বুড়ো-বয়সে জঙ্গলে ঢুকে খুন-খারাপি কাণ্ডে যোগ দিতে আমার মন চাইছে না। তুমি কী বলো রামহরি?'

বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রামহরি বললে, 'আমিও তো ওই কথাই বলি বাবু, কিন্তু আমাদের খোকাবাবুর কথা বাদ দিন—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি!'

কমল বললে, 'ধর্মের কাহিনি শোনবার জন্যে এত তোড়জোড় করে সাগর পার হয়ে আমরা এখানে আসিনি রামহরি! আসুক সিংহ, আসুক গন্ডার, আসুক দলে দলে শত্রু—আমরা কারুর তোয়াক্কা রাখি না!'

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো বাচাল গোঁয়ার কোথাকার! ফাঁকা টেঁকির শব্দ বেশি!'

রোলাঁ বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু ভীরু নন মঁসিয়ে রোলাঁ, তিনি হচ্ছেন আমাদেরই দলে, তবে আমাদের চেয়ে সাবধানী!'

বিমল বললে, 'মসিয়ে রোলাঁ, গেল বারে যে বন্ধুর সঙ্গে আপনি মিকেনো পর্বতে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম কী?'

—'ক্লেমাঁ। আপনি কি ভাবছেন, বুঝেছি। না, এবারে যারা মিকেনোর দিকে যাচ্ছে, ক্লেমাঁ নিশ্চয়ই এদের দলে নেই। মিকেনো সম্বন্ধে আমার চেয়ে সে কম বিশেষজ্ঞ নয়। আর হিরাখানার কথা ঘুণাক্ষরেও তাকে টের পেতে দিইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এবারে যারা যাচ্ছে তারা হচ্ছে নতুন লোক। তারা জানে না, ঠিক কোনখানে গিয়ে আমরা হিরাখানা পেয়েছি, তাই আমাদেরই মুখাপেক্ষী তারা। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, কামাথির কাছ থেকে সব কথা আমি আরও ভালো করে জেনেনি।'

রোলাঁ একটু তফাতে গিয়ে কামাথির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথোপকথনে নিযুক্ত হলেন। বিমল ও কুমার মালপত্তর তদারক করতে লাগল। রামহরিকে নিয়ে বিনয়বাবুও একদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন—তাঁদের দুজনেরই মুখ রীতিমতো বিরক্ত।

কমল বেচারা কোনও জুটি না পেয়ে বাঘার কাছে গিয়ে বললে, 'আয় রে বাঘা, আমরা দুজনেও গল্প করি!'

বাঘা ল্যাজ নেড়ে তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'ঘেউ!'

—'তোর ওই ঘেউ মানে কী রে বাঘা?'

বাঘা পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা বাড়িয়ে কমলের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

—'একবারের বদলে চারবার ঘেউ? তবু মানে কিছু বোঝা গেল না তো?'

ওদিকে খানিক পরে কামাথির সঙ্গে কথা বলে রোলাঁ যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর ভাবভঙ্গি দেখাচ্ছিল অত্যন্ত উত্তেজিত!

কুমার বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এইবারে উনি আরও একটা রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদে বসবেন!'

রোলাঁ বললেন, 'ঠিক তাই কুমারবাবু, ঠিক তাই! তবে একটা নয়, দুটো গল্প!'

—'যথা—'

—'একে একে বলব। এবারে যারা মিকেনো পর্বতে যাচ্ছে, তাদের নায়কের নাম জোফার।'

—'কে সে মহাপুরুষ?'

—'ফ্রান্সের এক কুখ্যাত দস্যু-দলপতি। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ফেরারি আসামি। তার সঙ্গে আছে আরও দশজন ইউরোপীয়, নিশ্চয়ই তাদের কেইই মহাত্মা নয়; আর আছে বিশজন দেশীয় আস্কারি (সৈনিক)। তাদের সাফারিতেও আছে দু-ডজন কুলি।'

—'মোট পঞ্চান্নজন লোক। বিমল, শুনছ?'

—'শুনছি বইকি! মসিয়ে রোলাঁ, আমাদের লোকসংখ্যা কত হবে?'

—'আমরা ছয়জন, আস্কারি বারোজন আর কুলি ত্রিশজন—সবশুদ্ধ আটচল্লিশজন লোক।'

—'হুঁ। যদি মারামারি বাঁধে, তবে সংখ্যায় তারা খুব বেশি হবে না।'

—'তা হবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মারামারি বাঁধলে দুই দল থেকেই নিরীহ কুলিরা তাড়াতাড়ি দূরে সরে দাঁড়াবে।'

—'আপনার বিশ্বাস বোধ হয় ভ্রান্ত নয়। সে-ক্ষেত্রে একত্রিশজন শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাদের আঠারোজনকে। তা সেজন্যে আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই।'

রোলাঁ চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু ভয় পাবার আর একটা কারণ আছে।'

—'আবার কী কারণ?'

—'আপনি কেনিয়ার মউ মউ আন্দোলনের কথা শুনেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, খবরের কাগজে পড়েছি। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে এই মউ মউ আন্দোলন। কিকিয়ু জাতের অনেক লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আপনার ওই কামাথিও তো জাতে কিকিয়ু?'

—'হ্যাঁ। যদিও কামাথি ওই দলে যোগ দেয়নি, তবু মউ মউ আন্দোলনের সব কথাই সে জানে। সমস্ত কেনিয়া প্রদেশেই জ্বলছে এখন দারুণ অশান্তির আগুন। তারই খানিকটা শিখা ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকে—অর্থাৎ উগাণ্ডা-কঙ্গোর সীমান্ত প্রদেশে। মউ মউ আন্দোলনকারীদের একটা ভাঙা দল ইংরেজদের তাড়া খেয়ে

পালিয়ে এসে ওখানকার পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নাকি মারমুখো হয়ে আছে—তাদের ত্রিসীমানায় যাওয়া এখন নিরাপদ নয়।'

—'মঁসিয়ে রোলাঁ, আমি শুনেছি এই বিদ্রোহীদের যত রাগ ইংরেজদের উপরেই। আপনিও শ্বেতাঙ্গ বলে আপনার যদি ভয় হয়, তবে ছদ্মবেশ ধারণ করে চটপট ভারতীয় হয়ে পড়ুন না!'

রোলাঁ মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'না, বিমলবাবু, ব্যাপারটা অত সহজে উড়িয়ে দেবার নয়। খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু কথা বলি শুনুন: কেনিয়া প্রদেশে কৃষ্ণাঙ্গজাতির লোকসংখ্যার তুলনায় ইউরোপীয়রা তুচ্ছ—অর্থাৎ পঞ্চান্ন লক্ষের ভিতরে মাত্র বিয়াল্লিশ হাজার। এই সংখ্যায় নগণ্য শ্বেতাঙ্গরা অধিকাংশ ভালো জমি জোর করে নিজেদের দখলে রেখেছে। এখানে খুব ফলাও করে কফির চাষ হয়। শ্বেতাঙ্গরা হাজার হাজার কফির চারা বপন করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের একশোর বেশি চারা বপন করবার অধিকার নেই। ইংরেজরা এখানে নিরঙ্কুশ প্রভু, আফ্রিকানরা হুকুমের দাস মাত্র—তাদের জন্ম যেন কেবল কুলির মতন খেটে মরবার জন্যেই। রাজকার্যে শিক্ষিত আফ্রিকানরাও ইংরেজদের ছায়ার পাশেও দাঁড়াতে পারে না। কেনিয়ায় কয়েক জাতের আফ্রিকান বাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কিকিয়ু জাতের লোকেরা। তারা অধিকতর শিক্ষিত, সংখ্যাতেও প্রায় দশ লক্ষ। তারা আর স্বদেশে প্রবাসীর মতন ক্রীতদাসের মতন থাকতে রাজি নয়—ন্যায়ত ধর্মত নিজেদের যা প্রাপ্য তারা তা আদায় করে নিতে চায় এবং এই নিয়েই তাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বেঁধেছে। কিকিয়ুদের বহু লোক মউ মউ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘোষণা করেছে—(১) ইংরেজদের কেনিয়া ছাড়তে হবে। (২) আমাদের প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। (৩) আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। (৪) আমাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। ইংরেজরা একেবারেই নারাজ। বিদ্রোহীরা করেছে অস্ত্রধারণ। ইংরেজরাও নির্বিচারে কিকিয়ু জাতির উপরে সশস্ত্র অত্যাচার চালিয়েছে—গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারী, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্রদেরও ক্ষমা করছে না, যারা মউ মউ আন্দোলনে যোগ দেয়নি, সন্দেহক্রমে তাদেরও দলে দলে গুলি করে মেরে ফেলছে। বিদ্রোহীরাও দমবার পাত্র নয়, তারাও প্রতিশোধ নিচ্ছে সদসৎ যে কোনও উপায়ে। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে ইউরোপীয়দের হত্যা করছে। ইংরেজরা বিলাত থেকে অসংখ্য সৈন্য আমদানি করেছে; তাদের সঙ্গে আছে বড়ো বড়ো কামান আর বোমারু বিমান প্রভৃতি, বিদ্রোহীরা তাই সম্মুখ-যুদ্ধে তাদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে না, তারা করে গেরিলা-যুদ্ধ। বেগতিক দেখলেই তারা জঙ্গলে-পাহাড়ে গা-ঢাকা দেয়। এই রকম একটা পলাতক দল কোনও গতিকে উগান্ডা-কঙ্গোর জঙ্গলে এসে লুকিয়ে আছে। কামাথির মতে তাদের দলে লোক আছে প্রায় পাঁচশো। বিমলবাবু, একদিকে দস্যুসর্দার জোফার, আর একদিকে পাঁচশো মউ মউ বিদ্রোহী,—মাঝখানে পড়ে আমাদের অবস্থা হবে কীরকম, আন্দাজ করতে পারছেন কি? এমন সব সম্ভাবনার কথা আগে জানলে আপাতত আমি এ পথে পদার্পণ করতুম না!'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু ভারতীয়দের উপরে মউ মউ বিদ্রোহীদের আক্রোশ নেই তো?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, তোমার এ কথার মানে হয় না! মউ মউ বিদ্রোহের সব খবরই আমি রাখি। এই কেনিয়ায় এসে বাসা বেঁধেছে হাজার হাজার ভারতীয় ব্যবসায়ী, তাদের অনেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের মধ্যে আবার এক শ্রেণির নির্বোধ লোক আছে, যারা দুই শত বৎসর ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করেও আজ স্বাধীন হয়ে সে দুর্দশার কাহিনি ভুলে গিয়েছে। কেনিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ না দিয়েও তারা নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার তা করেনি। তারা অত্যাচারী ইংরেজদের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে সহযোগিতা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ফল হয়েছে অত্যন্ত খারাপ। বিদ্রোহীরা ভারতীয়দেরও শত্রু বলে ভাবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন ভারতীয় তাদের হাতে মারা পড়েছে। মসিয়ে রোলাঁ, তাই নয় কি?'

—'ঠিক তাই। বিমলবাবু, বিদ্রোহীদের কবলে পড়লে ভারতীয় বলে আপনারাও রেহাই পাবেন না।'

বিমল বললে, 'সব বুঝলুম। কুমার, তোমার মত কী?'

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমরা এতদূরে এসেছি কীসের জন্যে? তুচ্ছ হীরক, যা খেয়ালি ধনীর কাছে পরম ঐশ্বর্যের মতো তার লোভে নয়! আমরা এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে, নতুন দেশ দেখবার জন্যে, পৃথিবীর অজানা আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে ফিরে যাব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা!'

বিমল বললে, 'বলা বাহুল্য, আমিও তোমার কথায় সায় দি। বাধা আর বিপদ আর মৃত্যুকে ভয় করা আমাদের কোষ্ঠীতে লেখেনি। শক্তির উপরে গণ্য করি আমি বুদ্ধিকে। আসে যদি শত্রু, বুদ্ধিবলে করব শত্রুসংহার। আমার মূলমন্ত্র—আগে চলো, আগে চলো ভাই!'

কমল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ধন্য বিমলদা, সাধু কুমারদা!'

বিনয়বাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'কমল, আবার?'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, আমাদের আস্কারির দল, সাফারি আর লটবহর কোথায় আছে?'

—'উগান্ডা-কঙ্গোর সীমান্তে বেহুঙ্গি গ্রামে।'

—'উত্তম, তাহলে আর মাথা ঘামানো নয়, চলুন সবাই বেহুঙ্গির দিকে!'

॥ সপ্তম পর্ব ॥

ভয়াবহ পরিস্থিতি

আহা, কী সুন্দর বেহুঙ্গি! এ নয় জনপদ, একে বলতে হয় লীলাবতী প্রকৃতির মনোহর নাচঘর!

তার মস্ত রঙ্গমঞ্চ সাজানো পূর্বে উগান্ডা থেকে পশ্চিমে কঙ্গোর সীমান্ত পর্যন্ত। দিকে

দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, সবুজে ছাওয়া উপত্যকা, মনোরম শৈল-বীথিকা, শস্য-বোনা ক্ষেত্র, নীলিমা-মাখানো হ্রদ, বেণুবনের সারি এবং দূরে দূরে পরে পরে যেন প্রহরায় নিযুক্ত মরা আগ্নেয়গিরির তুঙ্গ শিখর—তাদের নাম সিবিইনিয়ো, মুহাবুরা, মুহাহিঙ্গা! সূর্যাস্তের সময়ে চক্ষে জাগে মহিমময় বর্ণাঢ্য দৃশ্য! আবার তুষারমুকুট পরা অথচ অগ্নিগর্ভ জ্যান্ত পাহাড়ও আছে, নাম তার নিয়ামলাজিরা—সূর্যের পর চন্দ্র বিদায় নিলেও পৃথিবীকে সে তিমিরাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকতে দেয় না, নৈশ আকাশকে করে রাখে আলোয় আলোময়! এবং সেই সমুজ্জ্বল আকাশের তলায় গভীর রাত্রির মৌনব্রত ভেঙে দেয় বিনিদ্র বনগ্রামবাসীদের মুখর সব দামামা—দূরদূরান্ত থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তাদের রহস্যময় দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি, যেন প্রাগৈতিহাসিক আদিম আফ্রিকার মৃত্যুহীন ভাষা!

এমন সব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে বিমল ও কুমার প্রমুখ যাত্রা করেছে যাদের বর্ণনা দিতে গেলে আমাদের গল্প বলা বন্ধ হয়ে যাবে। এত রকম দৃশ্য এবং এত তাড়াতাড়ি দৃশ্য পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোথাও কল্পনাতীত। তুষার-শুভ্র উত্তুঙ্গ পর্বতমালা; জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি; যোজনের পর যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত মহারণ্য; দুষ্পার, দু-কূলপ্লাবী, দুরন্ত নদ-নদী; নৃত্যশীল ঝরঝর নির্ঝর; শব্দায়মান জলপ্রপাত এবং দিকে দিকে ছড়ানো হ্রদের পর হ্রদ। এত কাছাকাছি এত বড়ো বড়ো হ্রদও আর কোনও দেশে দুর্লভ—ভিক্টোরিয়া (২৭ হাজার বর্গ-মাইল), অ্যালবার্ট (দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ এবং ২৫ মাইল), এডওয়ার্ড (দৈর্ঘ্যে ৪৪ মাইল), জর্জ, কিভু, কিঙ্গা, মোয়েরু ও টাঙ্গানিকা প্রভৃতি। ভিক্টোরিয়া ও টাঙ্গানিকাকে দেখলে সমুদ্র বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা শিকেয় তুলে রেখে এখন গল্পকথাই শুরু করি।

সবাই যেখান দিয়ে চলেছে তার উত্তরে আছে এডওয়ার্ড হ্রদ ও দক্ষিণে কিভু হ্রদ। যতক্ষণ যাচ্ছিল কেনিয়া ও উগান্ডা প্রদেশের ভিতর দিয়ে, ততক্ষণ তারা আধুনিক সভ্যতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, কিন্তু এইবারে সকলে এসে পড়ল যেন আদিম পৃথিবীর বন্য জীবনের নির্জনতার মধ্যে। কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, কিন্তু হিংস্র জন্তুদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় যত্র-তত্র। বনভূমির জঙ্গল ভেঙে মাটি কাঁপিয়ে চলে যায় হাতির পাল ও হিপোর দল, গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়ায় ছোটো-বড়ো নানাজাতের বানররা—একদিন দেখা গেল একদল শিম্পাঞ্জিও। রাত্রে শোনা যায় বনে বনে পশুপতি সিংহদের কণ্ঠে মেঘগর্জনের অনুকরণ এবং ছিঁচকে চোর হায়েনাদের হা-হা-হা-হা হাস্যধ্বনি। কোনও কোনও দিন সকালে উঠে মাটির উপরে দেখা যায় অতি-সাবধানী চিতাবাঘের থাবার দাগ।

বুরঙ্গা নামে একটি পাহাড়ে জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়েছে। অনেক তফাতে মাঝে মাঝে রয়েছে বনবাসী কৃষাণদের 'সাম্বা' বা শস্যখেত। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো গাছের ঝাড় ও ঝোপঝাপ। একটা অজানা পত্রহীন গাছে ফুটে রয়েছে থোকা থোকা রক্তরঙা ফুল। এবং বহু—বহু দূরে নিম্নভূমিতে সূর্য-কিরণে চকচক করে উঠছে কিভু হ্রদের নীলজল।

চায়ের পালা সাঙ্গ হবার পর রামহরি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে রান্নাবান্নার আয়োজনে নিযুক্ত হয়েছে।

কমল এসে বললে, 'রামহরিদা, আজ টাটকা মাংস খাবার সাধ হয়েছে। রোজ রোজ কি টিনে প্যাক-করা মাংস খেতে ভালো লাগে?'

রামহরি বললে, 'শোনো একবার ছেলের কথা! এই বনমানুষের দেশে কি হুট বললেই টাটকা মাংস পাওয়া যায় বাপু? টাটকা মাংস খাবে তো বন্দুক নিয়ে বনের ভিতরে যাও, হরিণ কি পাখি মেরে আনো।'

কমল বললে, 'আরে ধেৎ, সে পথ যে বন্ধ! তুমি কি জানো না, পাছে শত্রুরা টের পায় সেই ভয়ে আপাতত আমাদের বন্দুক ছুড়তে মানা?'

—'তবে আবার টাটকা মাংস খাবার আবদার ধরেছ কেন?'

কমল বললে, 'টাটকা মাংসের ভাবনা কী? কাছেই তো দেখলুম চাষাদের 'হেমা' রয়েছে, সেখানে গেলে কি 'কুকু'—নিদেন পক্ষে 'কণ্ডু'রও খোঁজ পাওয়া যাবে না?'

রামহরি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'ও কমলবাবু, বনে বনে ঘুরে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? 'হেমা', 'কুকু', 'কণ্ডু'—এ-সব কী মাথামুণ্ডু বকছ?'

কমল খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, 'রামহরি হে, এদেশি ভাষায় 'হেমা' বলতে কুঁড়েঘর, 'কুকু' বলতে মুরগি আর 'কুণ্ডু' বলতে ভেড়া বুঝায়!'

রামহরি রেগে গিয়ে বললে, 'যাও যাও, আর পাকামি করতে হবে না! আমাকে কি আফ্রিকার কাফ্রি-ভূত পেয়েছ যে আমার কাছে ওই সব ছিষ্টিছাড়া কথা কপচাতে এসেছ?'

ওদিকে তাঁবুর ভিতরে বসে রোলাঁ, বিনয়বাবু, বিমল ও কুমার।

বিনয়বাবু বলছিলেন, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, কামাথির খবর বোধহয় ঠিক নয়। আমরা এতখানি পথ এগিয়ে এলুম, ডাকাত জোফারদের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না তো!'

রোলাঁ বললেন, 'মৃত্যুকে দেখা যায় না, সে আসে আমাদের অজ্ঞাতসারেই!'

কুমার বললে, 'আমার কিন্তু এই কথা ভেবেই অস্বস্তি হচ্ছে, মৃত্যু আছে আমাদের সামনে না পিছনে সেটা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না!'

বিমল বললে, 'ধরে নাও মৃত্যু আছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই! একটু যদি অসাবধান হও, তারপর আর অনুতাপ করবারও ফুরসত পাবে না!'

সেইদিনই রাত্রি নিয়ে এল বিপদের প্রথম সঙ্কেত।

অন্ধকারে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। তাঁবুর মধ্যে সবাই নিদ্রায় অচেতন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে ঢুলছে কেবল একজন প্রহরী।'

আচম্বিতে বাঘার ক্রুদ্ধ গর্জন! তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মানুষের কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! ধস্তাধস্তির শব্দ!

চকিতে টুটে গেল বিমল ও কুমারের সতর্ক নিদ্রা।

—'কুমার, কুমার!'

—'আমি উঠেছি!'

—'বাঘার চিৎকার,—কারা ধস্তাধস্তি করছে!'

—'বাইরে চলো—ওইদিকে!'

বাইরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল অভাবিত দৃশ্য!

মাটির উপরে চিৎপাত হয়ে পড়ে ছটফট করছে একটা মনুষ্য-দেহ এবং বাঘা রয়েছে তার গলা কামড়ে ধরে বুকের উপরে চেপে বসে!

ততক্ষণে রোলাঁ, রামহরি, বিনয়বাবু, কমল, কামাথি এবং আরও অনেকে চারিদিক থেকে ছুটে এল। সকলে মিলে বাঘার কবল থেকে রক্ষা করলে লোকটাকে। যদিও তার কণ্ঠদেশটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, তবু পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সে যতটা ভয় পেয়েছে ততটা আহত হয়নি।

রোলাঁ বললেন, 'একে তো আমাদের দলের লোক বলে মনে হচ্ছে না!'

কামাথি বললে, 'না কর্তা, এ হচ্ছে ওয়াহুটু জাতের লোক। কাপুরুষের একশেষ!'

—'এত রাত্রে লোকটা কেমন করে এখানে এল?'

বিমল বললে, 'রাত দুটো বেজে গেছে। এমন সময়ে এই মারাত্মক অরণ্যে কেউ শখ করে বেড়াতে আসে না। নিশ্চয় এ লোকটা হয় চোর নয় গুপ্তচর!'

কুমার বললে, 'চোর তত বিপজ্জনক নয়। কিন্তু গুপ্তচর হচ্ছে ভয়াবহ জীব। আমরা এর ভাষা জানি না, কেমন করে এর পরিচয় পাব?'

রোলাঁ বললেন, 'ওয়াহুটুদের ভাষা আমিও বুঝি না। তবে এখনই আমি সে ব্যবস্থা করছি। কামাথি!'

—'কর্তা!'

—'কামাথি, এ লোকটা চোর কি গুপ্তচর বুঝতে পারছি না। যেমন করে পারো, তুমি এর পেটের কথা আদায় করে নাও। পারবে?'

—'খুব পারব কর্তা!' বলেই কামাথি তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ফস করে শাণিত 'পাঙ্গা' খানা বার করে ফেললে। এদেশে তরবারিকে বলে 'পাঙ্গা'।

রোলাঁ বললেন, 'ও কী, তুমি পাঙ্গা বার করলে কেন? ওকে কেটে ফেলবে নাকি?'

কামাতি হেসে বললে, 'না কর্তা, মরা লোক কথা কয় না। ওকে পাঙ্গা বার করে ভয় দেখাব—তবে দু-একটা খোঁচাও দিতে পারি। ও যদি ওয়াটুসি জাতের লোক হত, তবে পাঙ্গার খোঁচা খেয়েও পেটের কথা ফাঁস করত না। কিন্তু ওয়াহুটু জাতের লোকরা হচ্ছে হায়েনার চেয়েও কাপুরুষ। পাঙ্গা দেখলেই সব কবুল করে ফেলবে!'

রোলাঁ বললেন, 'উত্তম। আসল কথা যদি আদায় করতে পারো, মোটা বকশিশ পাবে।'

কামাথি সেলাম ঠুকে বললে, 'সান্তা সামা (বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ)!'

কামাথির উপরে বন্দির ভার অর্পণ করে সবাই আবার ছাউনির ভিতরে গিয়ে বসল।

রোলাঁ বললেন, 'রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। এখন একটু কফি পেলে মন্দ হত না।'

সদাপ্রস্তুত রামহরি তৎক্ষণাৎ কফির জন্যে জল গরম করতে গেল।

বাঘাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে কুমার বললে, 'দেখছেন মঁসিয়ে রোলাঁ, আমার বাঘা হচ্ছে মানুষের চেয়ে হুঁশিয়ার চৌকিদার?'

—'হ্যাঁ কুমারবাবু, বাঘাকেও ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই!'

কফির পেয়ালা নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামাথির আবির্ভাব।

রোলাঁ শুধোলেন, 'কী সমাচার, কামাথি?'

—'সমাচার শুভ নয় কর্তা! লোকটা সত্য সত্যই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর!'

—'ডাকাত জোফার ওকে পাঠিয়েছে?'

—'হ্যাঁ কর্তা! ও লুকিয়ে আমাদের ভিতরকার খবরাখবর নিতে এসেছিল।'

—'তারপর?'

—'শত্রুরাও এই পথেই আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।'

—'তারা কত পিছনে আছে?'

—'মাইল তিন-চার।'

—'তাদের উদ্দেশ্য কী?'

—'বন্দি তা জানে না।'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি। আমরা পথের ঠিকানা জানি, তারা জানে না। খুব সম্ভব তারা হঠাৎ চড়াও হয়ে আমাদের বন্দি করতে চায়।'

—'বিমলবাবু, আপনার অনুমান বোধহয় ভুল নয়। এখন উপায়?'

—'উপায়, খুব তাড়াতাড়ি—অর্থাৎ দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে যাওয়া। আগে তো মিকেনো পর্বতে গিয়ে পৌঁছই, পরের কর্তব্য যথাসময়ে স্থির করা যাবে। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু এ যে রক্তারক্তির উপক্রম! এত হামলার মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি আবার ফিরে যাই?'

রোলাঁ বললেন, 'শত্রুরা আমাদের পথ আগলে থাকবে, আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব!'

তখনই তাঁবু তোলবার ব্যবস্থা হল। সূর্যোদয়ের আগেই তারা লটবহর নিয়ে এগিয়ে চলল সদলবলে।

চারিদিক রোদের সোনালি মেঘে ঝলমল করছে। আর শস্যক্ষেত্র নেই, দিকে দিকে দেখা যায় কেবল যেন পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছোটো-বড়ো শৈলশ্রেণি, মাঝে মাঝে শ্যামল উপত্যকা, কলরোলে মুখর জলপ্রপাত, মর্মরসংগীতে পূর্ণ বনস্পতি। দূরে তাদের পিছন থেকে আকাশের অনেকটা ছেয়ে দাঁড়িয়ে তুষারমৌলি আগ্নেয়পর্বত নিয়ামলাজিরা।

বেলা যখন দুপুর, ঊর্ধ্বশ্বাসে ভীত মুখে ছুটে এসে কামাথি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কর্তা, কর্তা,! কেবল পিছনে নয়, আমাদের সামনের পথও বন্ধ! এইমাত্র আমাদের এক অগ্রদূত খবর নিয়ে এসেছে, সামনের পথ দিয়েও ছুটে আসছে মউ মউ বিদ্রোহীদের মস্ত একটা দল!'

॥ অষ্টম পর্ব ॥

বিমলের রণকৌশল

তিক্ত হাস্য করে বিনয়বাবু বললেন, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য? আমাদের সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু—বিমল, এখন কোন বুদ্ধিবলে তুমি দু-দিক সামলে এদের কবল থেকে উদ্ধারলাভ করবে?'

বিমল কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে শান্ত ভাবেই বললে, 'সামনের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ শুনেছি সংখ্যায় তারা প্রায় পাঁচ শত। কিন্তু পিছনের শত্রুরা দলে বেশি ভারী নয়, তাদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে পারি।'

—'কিন্তু পরীক্ষার ফলে আমরাই হয়তো পরাজিত হব।'

—'অসম্ভব নয়।'

—'তবে?'

সে-জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, মিকেনো পর্বতে যাবার পথ কি এই একটিমাত্র?'

'এ অঞ্চলে এই পথ দিয়েই সকলে মিকেনোর দিকে যায়। আমি আর কোনও পথের কথা জানি না। আচ্ছা, কামাথিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

তারপর কামাথির সঙ্গে কথা কয়ে রোলাঁ বললেন, 'বিমলবাবু, এখান থেকে সামনের দিকে মাইলখানেক তফাতে ডান দিকে আছে একটা দুর্গম, বন্ধুর, সংকীর্ণ বন্য পথ। কিন্তু সে-পথটা এত ঘুরে-ফিরে নানা পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে মিকেনো পর্বতের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণত কোনও পথিকই তার উপর দিয়ে চলাচল করে না।'

বিমল বললে, 'আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি পাশের ওই পাহাড়টার উপরে উঠে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ করে আসি।'

পথ থেকে নেমে এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে অল্প দূর অগ্রসর হলেই সেই জঙ্গলময় পাহাড়টার নাগাল পাওয়া যায়। পাহাড়টা আকারে ছোটো, উচ্চতায় দুই শত ফুটের বেশি হবে না। দেখতে দেখতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বিমলের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোলাঁ উত্তেজিতভাবে কামাথির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কইতে লাগলেন। কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে একটা গাছতলায় বসে রইল—তার মুখ-চোখের ভাব পরম নিশ্চিন্ত। দলে রক্ষীরা বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল—অতিরিক্ত গম্ভীর মুখে। কুলিরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখলেই মনে হয়, তারা যেন পালাবার জন্যে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে।

বিনয়বাবু হতাশভাবে বার বার মাথা নাড়তে থাকেন আর তাই দেখে কমল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ফিক ফিক করে হাসে।

রামহরি বলে, 'ওগো বিনয়বাবু, আপনি অত ভাবছেন কেন? বিমলকে মানুষ করেছি,

তাকে আমি 'খোকাবাবু' বলে ডাকি বটে, কিন্তু তার মগজটি মোটেই খোকার মতো নয়। তার ওপরে বিশ্বাস রাখুন, বিপদ তাকে দেখলে ভয়ে পালায়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু বিমল তো অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে না! সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু—দাঁড়াব কোথায়?'

এমন সময়ে বিমল পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আবার সকলের কাছে এসে দাঁড়াল।

রোলাঁ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখলেন?'

—'দূরবিন দিয়ে দেখলুম, জোফারের দল আসছে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। মউ মউ বিদ্রোহীরা আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। দুই দলই এখান থেকে প্রায় তিন মাইল তফাতে আছে!'

—'এখন আমাদের কর্তব্য?'

—'সামনের দিকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া।'

—'নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে?'

—'না, এক মাইল দূরে ডান দিকের ছোটো অচল পথের কাছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বুঝেছি। তুমি বড়ো পথ ছেড়ে ওই পথটাই অবলম্বন করতে চাও। কিন্তু শত্রুরা কি এতই বোকা যে এই তুচ্ছ কৌশলটাও বুঝতে পারবে না?'

—'কেন বুঝবে না?' কিন্তু অসময়ে বুঝবে। তখন আমরাও তাদের অনায়াসে—বুঝেছেন, অনায়াসেই বাধা দিতে পারব। আমি আমার যুদ্ধকৌশল স্থির করে ফেলেছি। চলুন সবাই! বেগে এগিয়ে চলুন! বিলম্বে সব পণ্ড হবে! কামাথি, তুমি আমাদের পথ-প্রদর্শক হও।'

আবার হল যাত্রা শুরু। কুলিদের যাবার ইচ্ছা ছিল না—কেমন করে তারা গোপন খবর পেয়ে গেছে! কিন্তু সশস্ত্র সেপাইদের তাড়নায় তারা যেতে বাধ্য হল।

প্রায় মিনিট-পনেরো পথ চলার পর কামাথি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'এইখানে!'

দুই ধারে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, মাঝখানে শুঁড়িগলির মতো একফালি পথ। তিনজনের বেশি লোক পাশাপাশি চলতে পারে না।

কামাথি বললে, 'কেবল কাঠুরেদের জন্যেই এ পথের অস্তিত্ব বজায় আছে। আর কেউ এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করে না।'

বিমল বললে, 'ওই পথই হবে আমাদের বাঁচবার পথ।'

কামাথি গলা তুলে বললে, 'কিন্তু ভাইসব, খুব হুঁশিয়ার। উপরকার গাছের ডালে অজগররা লুকিয়ে থাকে। প্রায়ই তারা ছোবল মেরে মানুষ ধরে!'

কুমার বললে, 'কী সুসংবাদ! শুনলেই অঙ্গ শীতল হয়ে যায়!'

কিন্তু সেদিন বোধ হয় অজগরদের ছুটির দিন। তারা অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে সকলেই নিরাপদে একটা প্রায় প্রান্তরের মতো বড়ো মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝখানে রোদে ইস্পাতের মতো চকচক করছে জল।

বিমল কামাখির দিকে চেয়ে শুধোলে, 'কী ওটা? নদী?'

—'না, জলাভূমি। আমাদের ওটা পেরিয়ে আবার মাঠের উপর দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

—'জলায় কতটা জল আছে?'

—'হাঁটুভর।'

বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে কী চিন্তা করতে লাগল।

কুমার সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এর মধ্যেই এদেশি ভাষায় কতকগুলো গাছের নাম জেনে নিয়েছে।

কোথাও রয়েছে 'কাগারা' বা বিছুটির ঝোপ, কোথাও 'মুসুঙ্গুরা' বা বন্য গোলাপ গাছ, কোথাও 'মুকেরি' বা কালো-জাম জাতীয় গাছ, কোথাও 'রুগানো' বা বাঁশবন, কোথাও ঝুলছে 'সারান্দা' বা একরকম গুল্ম এবং কোথাও বা দোদুল্যমান 'রুহুন্‌গাঙ্গেরি' বা হলদে-ফুল-ফোটা দ্রাক্ষা জাতীয় লতা। অনেক বড়ো বড়ো গাছের নাম কুমার এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু আগাছার জঙ্গলই সেখানে সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কণ্টক-তরুলতারও সংখ্যা হয় না—তাদের দুষ্প্রবেশ্য ব্যূহ ভেদ করে মানুষ তো দূরের কথা, বন্য পশুরাও অগ্রসর হতে পারে না।

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, এখানকার অরণ্যে কখনও দাবানল দেখেছেন?'

—'দেখেছি। সে এক দিগন্তবিস্তৃত ভয়াবহ কাণ্ড! বর্ণনা করাও সহজ নয়!'

আচম্বিতে কেঁপে উঠল যেন দিগবিদিক! দুটো-চারটে নয়, একসঙ্গে বহু আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ গর্জন! দুইবার-একবার নয়, বারংবার!

বিনয়বাবু সচমকে বলে উঠলেন, 'ও আবার কী ব্যাপার! শত্রুদের আক্রমণ?'

বিমল সানন্দে বললে, 'ওই ব্যাপারের জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছি!'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হচ্ছে!'

রোলাঁ বললেন, 'তবে কি মউ মউ বিদ্রোহীরা জোফারের দলকে আক্রমণ করেছে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'ঠিক তাই। আমি জানতুম এ অবশ্যম্ভাবী। আমি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে চেয়েছিলুম। মাঝখান থেকে আমরা সরে এসেছি যথাসময়ে। জোফারের দল এসে পড়েছে মউ মউ বিদ্রোহীদের সামনাসামনি। এই তো আমার রণকৌশল!'

কমল প্রায় নাচতে নাচতে বললে, 'বিমলদা, আপনার কথাই সত্য! বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য!'

তখনও আওয়াজের পর আওয়াজ হচ্ছে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! আকাশে কান্তারে পাহাড়ে প্রান্তরে ছুটোছুটি করছে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি!

কমল বললে, 'জোফার বাবাজি হেলে ধরতে এসে কেউটের সামনে পড়ে গেছে,—তার আর রক্ষা নেই!'

বিনয়বাবু প্রশংসাভরা কণ্ঠে বললেন, 'বিমল, তুমি আমার অভিনন্দন নাও। অদ্ভুত এই বুদ্ধির খেলা!'

রামহরি বললে, 'কী গো বিনয়বাবু, কী বলেছিলুম?'

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু জোফারের দলকে সাবাড় করতে বিদ্রোহীদের বেশিক্ষণ লাগবে না। বিমলবাবু, তারপর তারা যদি আমাদের খোঁজ করে?'

—'আমাদের খোঁজ পাবে না। জোফারদের মতো তারাও তো জানে না আমরা যেতে চাই মিকেনো পর্বতে!'

—'কিন্তু—'

—'কিন্তু তবু যদি তারা আমাদের পিছু নেয়?'

—'তারা আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

—'কে তাদের বাধা দেবে?'

—'দাবানল।'

—'মানে?'

—'তাদের আর আমাদের মাঝখানে থাকবে দারুণ দাবানল।'

—'কোথায় দাবানল?'

—'সেই ভয়ংকরকে আমন্ত্রণ করব আমরাই। পাহাড়ের টঙে উঠে চারিদিক দেখতে দেখতে সব প্ল্যান আমি স্থির করে ফেলেছি। দেখছেন তো, এখানকার জঙ্গল রোদে পুড়ে বারুদের মতো হয়ে রয়েছে? ওই জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া কত সহজ বুঝতে পারছেন তো? বন্দুকের আওয়াজ এইবারে কমে আসছে, কামাথি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের হুকুম দিন, এখনই তারা জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিক। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দিকে দিকে তাধিন তাধিন তাণ্ডবে মেতে উঠবে প্রমত্ত দাবানলের লেলিহান শিখা!'

রোলাঁ একেবারে চমৎকৃত!

কমল ভয়ে ভয়ে বললে, 'দাবানল যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

'অসম্ভব। প্রথমত, হাওয়ার গতি বিদ্রোহীদের দিকে। দ্বিতীয়ত, এদিকে আছে ধু ধু খোলা মাঠ আর জলাভূমি। আমরা জলারও ওপারে গিয়ে দাঁড়াব।'

পনেরো-ষোলো জন লোক ছুটে গিয়ে অরণ্যের নানাস্থানে ভাল করে পেট্রল ঢেলে ও ছড়িয়ে দিলে। তারপরই জ্বলন্ত দীপশলাকার ছোঁয়া পেয়ে এখানে ওখানে দপদপিয়ে জ্বলে উঠল কয়েকটা খণ্ড খণ্ড আগুন। অনতিবিলম্বে সব আগুন একাকার হয়ে সৃষ্টি করলে এক প্রকাণ্ড, অখণ্ড ও প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড! দেখতে দেখতে ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল সেই দীপ্যমান অরণ্যের জ্বালাময় পরিধি! তখন খোলা মাঠে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরও সর্বাঙ্গ যেন বিষম উত্তাপে ঝলসে যেতে লাগল। জাগ্রত বায়ুতরঙ্গে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি অগ্নিকণা!

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'সবাই আরও দূরে চলো—জলাভূমির ওপারে!'

তারা যখন জলার ওপারে গিয়ে উঠল সীমাবদ্ধ অগ্নিকাণ্ড তখন পরিণত হয়েছে বিরাট এক সীমাশূন্য দাবানলে—যা ক্রমেই অধিকতর বিস্তৃত ও বিভীষণ হয়ে চমকপ্রদ অগ্ন্যুদগার করে যেন দৃশ্যমান সবকিছুকেই করতে চায় ভস্মসাৎ! সেই ঘোরশব্দময় অরণ্যানীর এদিক

থেকে ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টি জুড়ে হাজার হাজার ক্রুদ্ধ অগ্নিসর্প আকাশ নীলিমাকে রক্তারক্ত করে মারতে লাগল ছোবলের পর ছোবল এবং নীড় থেকে বিতাড়িত হয়ে শূন্যমার্গে উড়তে লাগল হাজার হাজার ত্রস্ত বিহঙ্গ। নীচেও সেই নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী দাবানলের কবল থেকে নিস্তারলাভ করবার জন্যে বন থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে একসঙ্গে ছুটে পালাতে লাগল দলে দলে হাতি, সিংহ, গন্ডার, হিপো, বরাহ, বন্যমহিষ, জেব্রা ও নানাজাতের হরিণ প্রভৃতি!

সেই দীপ্তোজ্জ্বল অরণ্যের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে বিমল বললে, 'এই আমার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ—এর মধ্যে আহুতি দিতে চাই শত্রুদের প্রাণ পতঙ্গ! যে দাবানল জ্বাললুম, কয়েক দিনের আগে তা নিববে না। এইবারে অগ্রসর হও মিকেনো পর্বতের দিকে—পথ এখন নিরাপদ!'

আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন তখন আর শোনা যাচ্ছিল না।

॥ নবম পর্ব ॥

(অতঃপর কুমারের ডায়েরি শুরু হল)

'টিকে টিকে'

চলেছি আর চলেছি। বেলা দুপুরে সূর্যের তাপ বেড়ে দুঃসহ হয়ে উঠলে এবং সন্ধ্যাকালে বনে-জঙ্গলে দুর্ভেদ্য অন্ধকার নেমে এলে সকলে মিলে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করি, তারপর আবার উঠে নিয়মিত যাত্রারম্ভ করি যখন ঊষাকালীন নীলাম্বরের পূর্বপ্রান্তে লাগে রক্তোৎপলের তাজা ছোপ।

জোফার ও মউ মউ বিদ্রোহীদের মাঝখানে পড়ে আমাদের পিষে মরবার কথা, কিন্তু বিমলের আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি কেবল যে সেই মারাত্মক দু-মুখো আক্রমণ ব্যর্থ করে আমাদের বিপদের সীমানার বাইরে নিয়ে এসেছে তা নয়; উপরন্তু রণদক্ষ প্রতিভাবান সেনাপতির মতো সমূহ বিপদকেও নিজেদের কাজে লাগিয়ে অমঙ্গলের ভিতরেই করেছে মঙ্গলের পত্তন—অর্থাৎ এক শত্রুর দ্বারা হয়েছে আর এক শত্রুর ধ্বংসসাধন!

তবু খুঁত খুঁত করতে থাকেন মঁসিয়ে রোলাঁ। বলেন, 'পাঁচশো বিদ্রোহীর সামনে জোফারের পঞ্চান্নজন লোক যে ঝড়ের মুখে খড়ের কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এত অল্পে কি বিদ্রোহীরা তুষ্ট হবে? তারা আমাদের খোঁজ পেয়েছে—শিকারের সন্ধান পেলে ক্ষুধার্ত সিংহ কি নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'জোফারও হয়তো মরেনি, জনকয় সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে এই বনেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে, সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাগাড় দেবে।'

কিন্তু এ-সব ভয়-ভাবনা সম্ভাবনার কথা বিমল শুনেও কানে তোলে না, তার সমস্ত মন এখন একাগ্র হয়ে আছে সেই অজানা, অদেখা, রহস্যময় মিকেনো পর্বতের দিকে।

রামহরির লোভ হিরার খনির প্রতি। রোলাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তিনিও ও-সম্বন্ধে খুব নির্লোভ নন—যদিও কেবল ধনকুবের হবার উদ্দেশ্য নিয়েই সাত সাগর তেরো নদীর পারে পাড়ি দেননি। আমাদের মতো তিনিও দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। তফাত খালি এই, আমাদের মতো তাঁরও জীবনযাত্রাপথে কাঞ্চনকৌলীন্য নগণ্য নয়!

হিরার খনি আবিষ্কার করবার কোনও আশাই আমরা রাখি না। আমরা এসেছি জীবনবৈচিত্র্য দেখতে এবং উপভোগ করতে দুঃসাহসের উত্তেজনায়! রক্ত ঠান্ডা রাখা আমরা পছন্দ করি না—সে যে জড়ভরতবৃত্তি! বলা বাহুল্য, মুখে যতই সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করুন, প্রাচীন বিনয়বাবুও হচ্ছেন আমাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত—দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনলেই তাঁরও চড়ুকে পিঠ সড় সড় করে!

দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যের জন্যে আমাদের একটা বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। মিকেনো পর্বতে গিয়ে পৌঁছবার পথ হয়ে উঠেছে দীর্ঘতর। আমাদের যাত্রা হবে বিলম্বিত। এবং এ পথ কেবল দুর্গম ও বিসর্পিত নয়, এর মধ্যে নাকি আরও নানা বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় হতে পারে! সাফারি বা কুলির দল এ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে অত্যন্ত নারাজ, সঙ্গে সশস্ত্র 'আস্কারি' না থাকলে তাদের বাগে আনা সহজ হত না। পাছে তারা চম্পট দেয় সেই ভয়ে কুলিদের আগে ও পিছনে এক এক দল সেপাই মোতায়েন রেখে তবে আমাদের পথ চলতে হচ্ছে।

অরণ্য ক্রমেই অধিকতর দুশ্চর হয়ে উঠছে। অবশেষে আমরা এমন নিবিড় বনে প্রবেশ করলুম যেখানে অরণ্য বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছ ডালপালা ও লতাপাতার জাল বিছিয়ে—আকাশ ও সূর্যালোককে একেবারে আড়াল করে রেখেছে। আমরা এসে পড়লুম যেন এক বিষণ্ণ কুজ্ঝটিকার জগতে, উপর থেকে ঝরছে আর্দ্রতা, পায়ের তলার মাটিও জলার মতো ভিজে স্যাঁৎসেতে। দিনের বেলাতেও চোখ বেশি দূর চলে না, ঘন বিন্যস্ত জঙ্গল পদে পদে ব্যাহত করে অগ্রগতি এবং মাঝে মাঝে সকলে মিলে অস্ত্র চালিয়ে ঝোপঝাপ কেটে পথ করে নিতে হয়। শুনলুম এই ভয়াবহ অরণ্য ভেদ করে বাইরে যেতে তিন দিন লাগবে।

সেই অপার্থিব ও অদ্ভুত বনভূমির ভিতরে একটা ছোটো নদীর ধারে প্রথম রাত কাটাবার জন্যে তাঁবু ফেলা হল। সেই নিরানন্দ জায়গায় নৃত্যশীলা তটিনী বা সুমধুর কলধ্বনি কেমন যেন খাপ খাচ্ছিল না। আসন্ন রাতের আবছায়া ভালো করে ঘনিয়ে উঠতে না উঠতেই অসংখ্য কীটপতঙ্গের আক্রমণে তাঁবুর ভিতরে পিঠটান দিতে হল। সেখানেও দলবদ্ধ মশকের বিক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রয় নিতে হল মশারির দুর্গে। বাঘা বেচারা পুঞ্জ পুঞ্জ মশা কপাকপ গিলে ফেলেও কিছুমাত্র সুবিধা করতে পারলে না।

তারপর সে কী গোলমেলে রাত্রি! সেই বিভীষণ জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার সংখ্যা বোধ করি কোটি কোটির কম হবে না। একসঙ্গে অত ঝিঁঝির কান-ঝালাপালা করা বেয়াড়া চ্যাঁচামেচি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তারপর চিত্তকে উচ্চকিত করে তুললে যেন ভূতুড়ে আঁতুড়ের অমানুষিক শিশুদের কান্নার মতো গেছো বাসায় শকুনবাচ্চাদের চিৎকার! প্যাঁচা ও অন্যান্য অজানা নিশাচর পাখিরাও চুপ করে ছিল না। এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা মেলাচ্ছিল আফ্রিকায় সুলভ বৃক্ষচর মণ্ডুকের দল।

শব্দময়ী রাত্রিও আমাদের শ্রান্ত দেহ-মনকে নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারলে না বটে, কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। আচম্বিতে বিষম ঘেউ ঘেউ চিল্লাচিল্লি শুনে জেগে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে টর্চের আলো ফেলে দেখি, বাঘা শিকল ছিঁড়বার জন্যে লাফালাফি করছে!

—'কী হল রে বাঘা, কী হল?'

বাঘা উৎকর্ণ হয়ে কী শুনলে, তারপরেই তাঁবুর বাইরে যাবার চেষ্টা করলে।

আমরা বন্দুক নিয়ে বাইরে গেলুম, কিন্তু দেখলুম কেবল এদিক-ওদিক আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে নিবাত-নিষ্কম্প অরণ্যানী যেন চিত্রার্পিত! চলন্ত বা নড়ন্ত কোনও কিছুই আকৃষ্ট করে না দৃষ্টি।

রোলাঁ বললেন, 'বাঘা অকারণেই আমাদের ঘুম ভাঙালে।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব। বিশেষ কারণ ছাড়া বাঘা কখনোই উত্তেজিত হয় না।'

বিমল বললে, 'আমিও এ কথায় সায় দি। বাঘার চিৎকারের পিছনে আছে নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণ।'

কিন্তু সেই বিশেষ কারণটা যে কী, আন্দাজ করা গেল না।

মশারির ভিতরে ঢুকলুম বটে, কিন্তু অস্বস্তির জন্যে চোখে এল না তন্দ্রার আমেজ। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এপাশ-ওপাশ করবার পর মনে হল নিদ্রাদেবী এইবারে বোধ হয় দয়া করবেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁবুর বাইরে শোনা গেল মাটি থরথরিয়ে ধুপ ধুপ করে অনেকগুলো ভারী ভারী পায়ের শব্দ! ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ ধপ!

গাত্রোত্থান করে দেখি, বাঘাও কান খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এবারে আর চিৎকার করছে না; বিপুল বিস্ময়ে শূন্যে মুখ তুলে যেন সে কোনও বিজাতীয় গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করছে!

সকলে একজোট হয়ে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালুম—সেই ধুপধুপনি শব্দ প্রত্যেকেরই কানে গিয়েছে।

কয়েকটা টর্চের দীর্ঘ শিখা বিদ্যুৎতীব্র অস্ত্রের মতো ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলে জঙ্গলের নিরবচ্ছিন্ন প্রগাঢ় অন্ধকার।

মনে হল কতকগুলো বড়ো জাতের ষাঁড় ধূসর ও ধুমসো দেহ দুলিয়ে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে!

রামহরি আশ্চর্য স্বরে বললে, 'ও বাবা, ওগুলো কী জানোয়ার গো!'

রোলাঁ বললেন, 'বামন-হাতি!'

কমল বললে, 'একসঙ্গে অতগুলো হাতি বামন?'

—'হ্যাঁ, ওরা জাত-কে-জাত বামন। এখানকার কোনও হাতিই ভাগলপুরি ষাঁড়ের চেয়ে বড়ো হয় না।'

—'আশ্চর্য!'

—'কেবল হাতি নয়, এ মুল্লুকে বামন-হিপো, বামন-মহিষও পাওয়া যায়।'

—'ভারী আজব দেশ তো।'

—'কুমারবাবু, আপনার বাঘা বোধ হয় এই বামন হাতিদের সাড়া পেয়েই অত গোলমাল করছিল।'

বললুম, 'না। বাঘার ধরন-ধারণ আমি জানি। হাতিদের অস্তিত্ব টের পেয়ে সে বিস্মিত হয়েছিল বটে, কিন্তু গর্জন বা চিৎকার করেনি।'

—'ব্যাপারটা তাহলে রহস্যময়!'

কিন্তু রহস্যভেদ হতে দেরি লাগল না।

সেই অসূর্যম্পশ্যা বনভূমির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে পরদিনেও এল সন্ধ্যা, এল রাত্রি। পড়ল তাঁবু। রজনী হল শব্দময়ী। আশ্রয় নিলুম বিছানায়। ঝর ঝর করে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জল-ঝরার টুপটাপ শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে এল তন্দ্রায়।

তারপর হল আবার গতকল্যকার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

আবার বাঘার উভরায় গর্জন, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ, শয্যাত্যাগ, তাঁবুর বাইরে আগমন।

কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ! সেই অন্ধকারে অন্তর্লীন জঙ্গলের দঙ্গল, তার মধ্যে কোথাও নেই জনপ্রাণী! আমরা অবাক!

এবারে রোলাঁর দৃঢ় ধারণা হল, খামোকা চ্যাঁচামেচির দ্বারা রাত্রির শান্তি ভঙ্গ করাই হচ্ছে বাঘার স্বভাব।

কিন্তু পরদিন প্রভাতেই রোলাঁকে মত পরিবর্তন করতে হল।

তাঁবুর বাইরে কালকের বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট কাদার প্রলেপের উপরে পদচিহ্নের পর পদচিহ্ন! একজনের নয়, কয়েকজনের পায়ের দাগ! পা টিপে টিপে তারা এসেছিল, কিন্তু বাঘার কানকে ফাঁকি দিতে পারেনি!

এই আড়ি-পাতুনিয়ারা কারা?

বিমল বললে, 'কুমার, পদচিহ্নগুলোর একটা বিশেষত্ব লক্ষ করেছ?'

বললুম, 'হ্যাঁ। যারা এসেছিল তারা বালক। বয়সে নয়-দশ বছরের বেশি নয়।'

—'আশ্চর্য!'

—'অত্যন্ত!'

—'এই গহন বনে, চির-অন্ধকারের দেশে, নিশুতি রাতে, হিংস্র জন্তুর আস্তানায় একদল বালক এসেছিল আমাদের খবরাখবর নিতে? না কুমার, এ যুক্তি মনে লাগে না!'

উদ্ভট, অতিশয় উদ্ভট! কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণকেও তো অস্বীকার করা চলে না!

বিনয়বাবু বললেন, 'আরও একটা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, যেখানে শত্রুমিত্র বা জনমানবের সাড়া নেই, সেখানে আমাদের খবর নিতে আসে কারা? লুকিয়ে আসে কেন? দেখা না দিয়ে পালায় কেন?'

রামহরি এককথায় সব সমস্যার সমাধান করে দিলে। বললে, 'ভূত!'

কমল হাসি চেপে বললে, 'ভূত! ভূতরা ভিতু নয়, তারা পালায় না, দেখা দেওয়াই তাদের পেশা!'

রোলাঁ নিম্নস্বরে কামাথির সঙ্গে কথা কইছিলেন। এখন আমাদের কাছে এসে বললেন, 'কামাথি কী বলে জানেন?'

—'কী বলে?'

—'এখানে আড়ি পাততে এসেছিল মউ মউ বিদ্রোহীদের চর।'

—'বালক চর!'

—'না, নারী চর!'

—'কী বলছেন!'

—'নারীদের পায়ের দাগ ছোটো হয়।'

—'জানি। কিন্তু এখানে নারীর উপস্থিতি আরও অসম্ভব। বিদ্রোহীদের দলে কি পুরুষ নেই?'

—'পুরুষ আছে, নারীও আছে।'

—'নে?'

—'কামাথি বলে, বিদ্রোহীরা জনকয় নারীকেও দলে নিয়েছে। তারা চরের কাজ করে, দরকার হলে অস্ত্র চালাতেও পারে। তাদের হাতে থাকে 'সিমি'। কিকিয়ুরা 'সিমি' বলে একরকম দু-মুখো তরবারিকে, লম্বায় প্রায় এক হাত।'

বিমল সকৌতুকে বলে উঠল, 'ভাই কুমার, এ-সব শুনছি কী? শেষটা কি নারীর সঙ্গে হাতাহাতি করতে হবে?'

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, 'যুগমাহাত্ম্য ভায়া, যুগমাহাত্ম্য! আধুনিক নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকায় চায়!'

কমল বললে 'পৌরাণিক যুগেও নারীরা পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করত। প্রমাণ—'

বিনয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো জ্যাঠা ছেলে কোথাকার!'

বিমল বললে, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, কামাথির সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত নয়। মউ মউ বিদ্রোহীরা সংখ্যায় নাকি পাঁচশো। আমাদের মুষ্টিমেয় দলকে যমালয়ে পাঠাতে চাইলে তারা চোরের মতো চর পাঠাত না, ডাকাতের মতো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তবে কি জোফার সদলবলে পঞ্চত্বলাভ করেনি, জনকয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে লম্বা দিতে পেরেছে?'

—'কিন্তু জোফার এতগুলো বালক আমদানি করবে কোত্থেকে?'

—'তাও তো বটে!'

আচমকা শূন্যপথ দিয়ে একঝাঁক তির এসে টপাটপ করে পড়ল মাটির উপরে—কিন্তু কোনওটাই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে না!

বিমল চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি! সবাই তাঁবুর আড়ালে গা-ঢাকা দাও!'

খানিক দূরে ছিল কতকগুলো ঝোপঝাপ। তিরগুলো এসেছিল সেই দিক থেকে।

আমরা উপর-উপরি দুইবার সেইদিকে গুলিবৃষ্টি করলুম। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা মানুষের আর্তনাদ এবং দেখা গেল, ঝোপের পর ঝোপ দুলিয়ে কারা যেন লুকিয়ে দূরে—আরও দূরে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে!

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরেও আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। জঙ্গল আবার নিথর ও নীরব।

কিন্তু কারা এই অদৃশ্য শত্রু?

আমরা আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তিরগুলো একে একে কুড়িয়ে নিলুম।

অদ্ভুত তির!

প্রত্যেকটাই যেন ছেলেখেলার তির! —তির তো ভারী, শক্ত কাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়, কাঠির ডগাটা ছুঁচলো করে নেওয়া হয়েছে মাত্র, লোহা বা অন্য কোনও ধাতু দিয়ে ফলা তৈরি করা হয়নি। তিরের পিছনে পালকও নেই, কাঠির গোড়ার দিকটা চিরে নিয়ে গাছের একখানা পাতা গুঁজে দেওয়া হয়েছে, বাতাস কাটবার সুবিধা হবে বলে। এমন আজব তির কখনও দেখিনি।

হঠাৎ কামাথি বলে উঠল, 'টিকে টিকে, টিকে টিকে!'

রোলাঁ বললেন, 'কী বললে কামাথি? টিকে টিকে? ঠিক ঠিক! আমি নির্বোধ, এতক্ষণ ধরতে পারিনি! টিকে-টিকেই বটে, ঠিক, ঠিক!'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললুম—'মঁসিয়ে রোলাঁ, টিকে টিকে ব্যাপারটা কী বলুন দেখি?'

—'মউ মউ বিদ্রোহীদের ভয়ে আমার ভীমরতি ধরেছিল, এখন তিরগুলো দেখে সব বোঝা যাচ্ছে!'

কামাথি আবার বললে, 'টিকে টিকে!'

রামহরি ভুরু কুঁচকে বললে, 'আরে গেল, খালি খালি বলে টিকে টিকে! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে না আছে হুঁকো, না আছে তামাক, খামোকা টিকে টিকে করা কেন বাপু?'

রোলাঁ বললেন, 'টিকে টিকেরাই এ-রকম তির ব্যবহার করে থাকে।'

আমি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু টিকে টিকেরা আবার কারা?'

—'বামন-মানুষরা।'

—'বামন-মানুষ?'

—'হ্যাঁ। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, বামন-হাতি, বামন-হিপো, বামন-মহিষের সঙ্গে এ অঞ্চলে বামন-মানুষরাও বাস করে। মাথায় তারা বালকের মতোই—সাধারণত সাড়ে তিন থেকে চার ফুটের বেশি উঁচু হয় না। তাদের মধ্যে যাদের বলা চলে অতিকায়, তারাও উঁচু হয় বড়ো জোর সাড়ে-চার ফুট।'

কমল বললে, 'ওহো, কী মজা। গলিভার সাহেব গিয়েছিলেন লিলিপুটে, যেখানকার মানুষ বালখিল্যদের মতো খুদে খুদে। আর আমরা এসেছি বামনদের দেশে—এখানে মানুষ আর জন্তু কেউ মাথায় বাড়ে না!'

—'মাথাতেও না, গায়েও না। এখানকার মানুষ মোটা হয় না, ওজনেও ত্রিশ সেরের মধ্যে!'

—'আপনার মতে, ওই টিকে টিকেদেরই পায়ের দাগ আমরা দেখেছি?'

—'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কামাথি নিজের ভাষায় ওদের টিকে টিকে বলছে বটে, কিন্তু ওদের মধ্যেও নানান জাত আছে—যেমন 'আক্কা' আর 'বাতোয়া' প্রভৃতি। ওরা যাযাবর। এক জায়গায় স্থায়ী বাসা বাঁধে না, শিকার করে খায়, এক বনে শিকারের অভাব হলে অন্য বনে যায়। শোয় আদুড় মাটিতে—ঘটি-বটি-গেলাস-থালার ধার ধারে না, যাকে বলে নিছক বন্য জীবন!'

কমল বললে, 'ভাগ্যিস এই বামনের দেশে জন্মাইনি!'

—'হ্যাঁ, তাহলে আমরাও বামন হতুম। সূর্যালোক হচ্ছে প্রকৃতির আশীর্বাদ, তার অভাবে কোনও জীব—এমনকি গাছপালা পর্যন্ত আকারে বাড়তে পারে না। আজ দু-দিন আমরা এই গহন বনের মধ্যে রোদ বা আকাশের আলোর বদলে দেখছি কেবল দিনে আবছায়া আর রাতে অন্ধকার! এর মধ্যে আমাদেরই প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে!'

বিমল বললে, 'বামনগুলো ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু বন্দুক ছোড়বার পর একটা বিকট আর্তনাদ শুনেছি। মনে হচ্ছে বামন-তিরন্দাজদের কেউ আহত বা নিহত হয়েছে। এসো কুমার, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।'

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু খুব সাবধান, এখানে আগে থাকতে মৃত্যুর পদশব্দ শোনা যায় না। কামাথি বলছে, টিকে টিকেদের তির দেখতে ছোটো বটে, কিন্তু তার ডগায় মাখানো থাকে বিষ!'

বিমল বললে, 'তাই নাকি! আয় রে বাঘা, তুইও আয়! টিকে টিকেরা যতই লুকিয়ে থাকুক, নিজেদের গায়ের বুনো গন্ধ তো লুকিয়ে রাখতে পারবে না, বাঘার সূক্ষ্ম, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঠিক তা আবিষ্কার করে ফেলবে!'

বিশেষ সন্তর্পণে আমরা সম্মুখবর্তী অরণ্যের দিকে অগ্রসর হলুম। সেদিকটা হচ্ছে আবছায়ামাখা সূর্যকরহারা জঙ্গলের মধ্যেই অধিকতর নিবিড় আর একটা অরণ্য, সেখানকার ঘনান্ধকারে দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যেতে চায়! পা চলতে চলতে থেমে যায়, বুক চমকে চমকে ওঠে, বন্ধ আবহের মধ্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে! বাতাসের অভাবে গাছপালা লতাপাতা সব যেন আড়ষ্ট। চারিদিকে গহীন বিজনতা এমন থম থম করছে যে, মনের মধ্যে সৃষ্ট হয় একটা অপার্থিব পরিস্থিতি!

হঠাৎ বাঘা কান খাড়া করে মুখ তুলে চাপা গর্জন করে উঠল! নিশ্চয় শত্রুর গন্ধ পেয়েছে!

তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলুম দিকে দিকে। অদৃশ্য শত্রু! বিষাক্ত তির!

কিন্তু মৃত্যুর ইঙ্গিতে ভয়াবহ সেই ছায়াধূসর নিঃশব্দ বনানী নিজের জঠরের গভীরতার মধ্যে কোথায় যে গোপন করে রেখেছে ছায়াচর শত্রুদের, বাহির থেকে বুঝতে পারা অসম্ভব!

এখানে গলা তুলে কথা কইতেও আতঙ্ক হয়! রোলাঁ ফিস ফিস করে বললেন, 'বিমলবাবু, ফিরে চলুন।'

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। বাঘার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

বাঘা তখন মাটির উপরে নাক রেখে একদিকে অগ্রসর হয়েছে নিশ্চিত পদে।

আমি সাগ্রহে বললুম, 'বাঘা শত্রুর নাগাল ধরতে পেরেছে, চোখের সাহায্যে যে দুশমনকে দেখা যায় না, বাঘা নাকের সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়বে না!'

বাঘা যাচ্ছিল সকলের আগে আগে। আগাছার ভিতরে জেগে আছে খালি তার মাথা আর ঊর্ধ্বোত্থিত লাঙুলের অগ্রভাগ। তার সামনেই একটা বড়ো, ঝুপসি কাঁটাঝোপ। সেটা পেরিয়ে গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার সেই ঊর্ধ্বকর্ণ, চমকিত ও হঠাৎ-আড়ষ্ট ভাব দেখলেই আন্দাজ করা যায়, এমন একটা কিছু সে দেখেছে, যা সাধারণ নয়!

বাঘার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমরাও যা দেখলুম তা হচ্ছে এই :

একজন প্রৌঢ়বয়স্ক লোকের বালকের মতো ছোটো মৃতদেহ সেখানে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। মাথায় চার ফুট লম্বা হবে কি না সন্দেহ! তার মুখ প্রায় নিগ্রোর মতো দেখতে, কিন্তু গায়ের রং হরিদ্রাভ তামাটে। বামহাতের মুঠোয় খেলনার মতো পুঁচকে ধনুক এবং দেহের পাশে মাটির উপরে চামড়ার তূণীর। দেহ প্রায়-নগ্ন, কেবল কোমরে ঝুলছে এক টুকরো চামড়ার প্রচ্ছাদনী।

কামাথি বললে, 'টিকে টিকে!'

রোলাঁ বললেন, 'বামন-মানুষ!'

বিনয়বাবু বললেন, 'সিংহল দ্বীপেও 'বেদা' বলে এইরকম আদিবাসী আছে। তারাও বনে বনে বেড়ায়, শিকার করে খায়।'

রোলাঁ বললেন, 'দেখেছি। কিন্তু তারাও এতটা খর্বকায় নয়।'

পরদিনও কাটল সেই চিরছায়াচ্ছন্ন বন্য দুঃস্বপ্ন-জগতে, কিন্তু বামন মানুষদের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে ও বর্ষণে তাদের পিলে বোধহয় চমকে গিয়েছে!

তারপর সেই সুদূরবিস্তৃত অরণ্যানীর বিশাল কুক্ষি থেকে নির্গত হয়ে পেলুম ভগবানের অতুল্য দাক্ষিণ্য—অমৃতায়মান সূর্যকরধারা! আঃ, আলো কী চমৎকার!

॥ দশম পর্ব ॥

সিম্বাদের স্বর্গে

বনবাস থেকে রেহাই পেয়ে আমাদের যে আনন্দ, বাঘাও তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করতে ছাড়লে না, অন্ধকার থেকে আলোকে এসে চারিদিকে বেগে ছুটোছুটি, লাফালাফি ও চ্যাঁচামেচি করে প্রকাশ করতে লাগল নিজের প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগকে।

আমাদেরও পা না ছুটলেও পুলকিত মন শতদলের মতো পাপড়ি মেলে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে—অবারিত আকাশের নীলিমায়, সোনালি রোদের উদারতায়, এবং বাঁধনহারা বাতাসের স্বাধীনতায়।

এখানেও অরণ্যের অভাব নেই, কিন্তু তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। কোথাও অরণ্য, কোথাও প্রান্তর, কোথাও পর্বত, কোথাও প্রপাত, কোথাও নদী। প্রকৃতি যে কত বিচিত্র রূপিনী, চলতে চলতে চোখে পড়ে তারই অফুরন্ত দৃষ্টান্ত।

কখনও দেখা যায় 'কুডু' কি 'ইল্যান্ড' কি কতকটা কৃষ্ণ ষাঁড়ের মতো দেখতে 'নিউ' জাতীয় হরিণের দল (তাদের মাথায় মহিষের মতো শিং, ল্যাজ ঘোড়ার মতো এবং পা মৃগের মতো—তারা অতিশয় হিংস্র) মানুষের সাড়া পেয়ে দূর থেকেই ধুলো উড়িয়ে সরে পড়ে; কোথাও দেখি একপাল হৃষ্টপুষ্ট জেব্রা আপন মনে তৃণভূমির উপরে বিচরণ করছে; কোথাও 'ওয়ার্ট-হগ' নামে আফ্রিকাদেশীয় বরাহদল আমাদের দেখেই ঘোঁত ঘোঁত করে ঝোপেঝাপে ঢুকে যায়; কোথাও বা নদীর মাঝখানে ভেসে ওঠে বা ডুব মারে কুমির আর হিপোপটেমাস। এক জায়গায় ঝোপের ওপাশ থেকে লম্বা গলা তুলে উঁকি মারলে একটা জিরাফ। আর এক জায়গায় দেখা গেল গাছের ডালে জড়ানো রয়েছে মস্তমোটা কাছি—আসলে সেটা পাইথন বা অজগর!

হঠাৎ আঙুল তুলে একদিক দেখিয়ে দিয়ে কমল চোখ পাখিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন মি. রোলাঁ! ওটা আবার কী জানোয়ার? গাধা, না বামন-জিরাফ?'

জন্তুটা মাথায় হবে আন্দাজ পাঁচ ফুট উঁচু; অসাধারণ দ্রুতগতিতে একটা বড়ো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোলাঁ বললেন, 'ওর নাম ওক্যাপি। ওকে দেখতে ক্ষুদ্র সংস্করণের জিরাফের মতোই বটে! কিন্তু জিরাফ হচ্ছে বোবা জীব, আর ওক্যাপি গলাবাজির জন্যে বিখ্যাত। ও জীবটি বড়োই দুর্লভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও ওর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু একালে আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও ওক্যাপি দেখতে পাওয়া যায় না!'

কমল খুশিমুখে বলে, 'হ্যাঁ, এইবারে কতকটা মনে হচ্ছে আমরা সত্যসত্যই আফ্রিকায় এসে পড়েছি!'

চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত প্রাণে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ কামাথি এসে সতর্ক করে জানিয়ে দিয়ে গেল, এখানটা হচ্ছে 'সিম্বা'দের নিজস্ব চারণভূমি। এদেশি ভাষায় 'সিম্বা' বলতে বুঝায় সিংহ!

প্রথম দিন সন্ধ্যার আগে পশুরাজের লাঙুল পর্যন্ত দেখা গেল না বটে, কিন্তু গভীর রাত্রে তাদের ভৈরব কণ্ঠসাধনায় নিদ্রাদেবী সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। মনে হল, রাজ্যের সিংহ যেন সেখানে এসে দলবদ্ধ হয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সমস্বরে। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র শোনা গেল মুহুর্মুহু সিংহগর্জন—এত সিংহকে একসঙ্গে ডাকাডাকি করতে শুনিনি আর কোথাও আর কখনও! চূর্ণ হয়ে গেল রাত্রির স্তব্ধতা, থর থর করে ভয়ে কাঁপতে লাগল যেন বনজঙ্গল!

বন্দুকটা আরও কাছে টেনে নিলুম বটে, কিন্তু নিজেদের একান্ত অসহায় বলেই মনে হতে লাগল! সিংহরা হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েছে, এতগুলো হিংস্র ক্ষুধিত ও দুরন্ত সিংহ যদি এক জোট হয়ে নড়বড়ে তাঁবুর উপরে এসে হানা দেয়, আমাদের বন্দুক তাহলে কিছুতেই তাদের ঠেকাতে পারবে না!

মাঝে মাঝে তাদের প্রচণ্ড প্রশ্বাসে তাঁবুর কানাত ওঠে দুলে দুলে, তারপরে খুব কাছ থেকেই ঘন ঘন সিংহনাদ! বুঝতে পারি, তাদের আনাগোনার জন্যে নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক উৎপাতের মতো আমাদের তাঁবুগুলোর অভাবিত আবির্ভাব দেখে সিংহেরা সবিস্ময়ে নির্ণয় করতে এসেছে প্রকৃত তথ্য!

রোলাঁ আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সিংহেরা যতক্ষণ গলাবাজি করে, ততক্ষণ সবাই নিরাপদ। তারা শিকার ধরে চুপিসাড়ে!'

রাত্রি যত শেষের দিকে এগিয়ে চলল, মেঘ গর্জনের মতো সিংহনাদ ততই দূরে সরে গিয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে! তার খানিকক্ষণ পরেই শোনা গেল, আসন্ন প্রভাতি উৎসবে বিহঙ্গদের কনসার্ট! আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, তাঁবুর চারিপাশ ঘিরে সিংহদের থাবার দাগ! তারা যথাস্থানে এসেছে, কিন্তু মানুষের গন্ধ পেয়েও আক্রমণ করেনি! এর একমাত্র কারণ বোধহয় তাদের জঠরানল ছিল নির্বাপিত!

প্যাটারসন সাহেবের 'ম্যান ইটার্স অফ স্যাভো' নামে বিখ্যাত শিকারের কেতাবে পাঠ করেছি, যখন ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকা রেলওয়ে-র জন্যে লাইন পাতা হয়, তখন শত শত ভারতীয় কুলি সেখানে কাজ করত; কিন্তু অভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ শিকারিদের বহু সাবধানতা ও বিনিদ্র প্রহরা সত্ত্বেও সিংহরা প্রতিদিন নিঃশব্দে এসে তাঁবুর ভিতর থেকে ঘুমন্ত কুলিদের মুখে করে তুলে নিয়ে যেত!

একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। প্রান্তরের সুদূর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণি, মাঝে মাঝে তরুকুঞ্জ এবং ছোটো ছোটো গাছগাছড়ার ঝাড়—এদেশি ভাষায় যাদের বলে 'বোমা'। তা ছাড়া দিকে দিকে পড়ে আছে কেবল উন্মুক্ত তৃণভূমি—যেখানে হরিণ চরে, জেব্রা বেড়ায় এবং আরও যারা বিচরণ করে, একদিন হঠাৎ তারা অযাচিতভাবেই দেখা দিলে!

দুই ধারে খোলা মাঠ, মাঝখানে উঁচু পথ দিয়ে চলেছি আমরা।

হঠাৎ বিমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'কমল, তুমি না আফ্রিকার স্বাধীন সিংহ দেখতে চাও?'

—'নিশ্চয়!'

—'ওই দ্যাখো!'

বিমল একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে। দেখেই আমার চক্ষু হয়ে উঠল উচ্চকিত। হ্যাঁ,

তাই তো বটে! একটা নয়, দুটো নয়, অনেকগুলো! সিংহ, সিংহিনী এবং তাদের কাচ্চাবাচ্চা! নিশ্চয়ই তারা এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ আমি গুনে দেখলুম, সংখ্যায় তারা মোট সাতাশটা! আজ কি এখানে সিংহদের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান?

ত্রস্তভাবে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলুম।

রোলাঁ বললেন, 'কেউ যেন বন্দুক না ছোড়ে! সিংহরা বাঘের মতো হিংস্র নয়, ক্ষুধার্ত না হলে ওরা আক্রমণ করে না—ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই!'

সত্য, সিংহগুলোর পেটে ক্ষুধা আছে বলে মনে হল না! তাদের কেউ চার পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কেউ মাটির উপরে চিত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ থেবড়ি খেয়ে বসে অবসাদগ্রস্তের মতো হাই তুলছে এবং একটা 'বোমা'-র ওপাশ থেকে মুখ তুলে কয়েকটা সিংহ নিশ্চিন্তভাবেই আমাদের পানে তাকিয়ে রয়েছে! গোটা চার সিংহশিশু মায়ের সামনে ঠিক কুকুর-বিড়ালের ছানার মতোই পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে।

কেবল একটা জোয়ান সিংহ কতকটা কৌতূহল প্রকাশ করলে। আমাদের হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে সে হন হন করে বেশ খানিকটা এগিয়ে এল, যেন কতকগুলো বাজে, দ্বিপদ জীবের অতর্কিত আবির্ভাবে তার মেজাজ রীতিমতো গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দুই চক্ষে স্পষ্ট জিজ্ঞাসার ভাষা—যেন সে শুধোতে চায়, 'তোমরা কে বট হে? কোত্থেকে এলে? কী মতলবে এলে?'

বিনয়বাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে দ্যাখো! তাহলে সিংহরাও গাছে চড়ে!'

তাই তো! 'বোমা'-র পিছনে রয়েছে একটা মস্ত অশ্বত্থ-বটের মতো দেখতে গাছ। তারই একটা একতলা-সমান উঁচু মোটা ডাল জড়িয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আলস্যজড়িত চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করছে আর-একটা ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড সিংহ!

কমলের দেহ তখন মূর্তির মতো স্থির, চক্ষু, নিষ্পলক, হতভম্ব মুখে নেই রা! স্বাধীন, বন্য সিংহের এতটা পোষমানা ভাব সে বোধ হয় কখনও কল্পনা করতে পারেনি!

রোলাঁ বললেন, 'কিন্তু এই সিংহই রাগলে হয় মহাভয়ংকর! তখন সময়ে সময়ে আট-দশ জন শিকারিও বন্দুক নিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। বিশ্ববিখ্যাত মার্টিন জনসনের এক শিকার কাহিনিতে দেখা যায়, দলবদ্ধ শিকারিদের দ্বারা চারিদিক থেকে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হয়েও একটা সিংহ কয়েকজন শত্রুকে আহত ও নিহত করে এবং অবশেষে মারা পড়ে পঁচিশটা বুলেটের আঘাত পাবার পর! এক সিংহেই রক্ষা নেই, আর এখানে আছে সাতাশটা সিংহ!'

সিংহদের আখড়া থেকে নিরাপদ ব্যবধানে যাবার জন্যে যতটা পারি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। তারপর মাইল-দুয়েক এগিয়ে যাবার পরই দেখলুম আর এক অচিন্তিত দৃশ্য!

মাঠের উপরে পড়ে রয়েছে একটা জেব্রার সদ্যমৃত রক্তাক্ত দেহ এবং একটা সিংহ তার পেট চিরে ফেলে তারই ফাঁকে সমস্ত মুখখানা ঢুকিয়ে দিয়ে মাংস ভক্ষণ করছে। ছয়-সাত হাত তফাতে চুপ করে বসে বসে তার খাওয়া দেখছে একটা সিংহী—সে বোধ হয় বউ,

স্বামী প্রভুর ভোজন-কাণ্ড শেষ হবার পর সে-ও নিজের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে, নইলে বেয়াদপির জন্যে নখের ভীষণ চপেটাঘাত খাবার সম্ভাবনা!

আরও দূরে থেকে সন্তর্পণে পশুরাজের আহারের সমারোহ নিরীক্ষণ করছে গোটাকয়েক সেয়ানা হায়েনা। সিংহ ও সিংহী পরিতৃপ্ত হয়ে বিদায় নিলে পর তাদের ভোজনাবশেষ নিয়ে কামড়া-কামড়ি করবার পালা আসবে হায়েনাদের!

সিংহী একবার মুখ তুলে আমাদের দেখলে, তারপর আবার অবহেলাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে। জ্যান্ত দ্বিপদ জীবের চেয়ে মৃত চতুষ্পদের খণ্ডিত দেহটাই তার কাছে মনে হল অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

সিংহও আমাদের সাড়া পেয়ে জেব্রার ছিন্নভিন্ন উদরগহ্বর থেকে নিজের রক্তকরাল মুখখানা বার করে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌!' (অর্থ বোধ করি—'খবরদার, কাছে এলে মজাটা টের পাবে!') তারপর আবার মাথাটা ঢুকিয়ে দিলে জেব্রার ফেঁড়ে-ফেলা পেটের গর্তে।

রোলাঁ বললেন, 'সিংহদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হচ্ছে জেব্রার মাংস। তাই যেখানে জেব্রা, সেইখানেই থাকে সিংহ।'

প্রান্তরের প্রান্তে যাবার আগেই আবার আর একদল সিংহের সঙ্গে মূলাকাত হল। সংখ্যায় এক ডজন। সার বেঁধে তারা যাচ্ছিল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, এবং যেতে যেতে মাঝপথে মানুষের আবির্ভাবে প্রত্যেকেই একবার করে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে, কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না।

কমল অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাবা, এযে সিংহদের স্বর্গ!'

রোলাঁ বললেন, 'এই আফ্রিকা! আর সিংহ হচ্ছে তার প্রধান গৌরব!'

আমি বললুম, 'একসময়ে ভারতবর্ষও এই গৌরব করতে পারত। সিংহকে আমরা 'পশুরাজ' উপাধি দিয়েছিলুম, আর আদ্যাশক্তির বাহন রূপে নির্বাচন করেছিলুম তাকেই। আজ আর সেদিন নেই। ভারতের সিংহ আজ কোণঠাসা, নামরক্ষার জন্যে কোনওরকম টিকে আছে মাত্র।'

বিমল বললে, 'এর কারণ মানুষের অত্যাচার। মানুষ সিংহ আর ব্যাঘ্রকে হিংস্র বলে অভিযোগ করে বটে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব লোপ করবার জন্যে মানুষ যে চেষ্টা করেছে তার তুলনাই নেই। এই আফ্রিকাও সিংহদের নিয়ে বেশিদিন আর গৌরব করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আজ তো আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমায় মানুষ হয়েছে বলীয়ান। কিন্তু যখন আগ্নেয়াস্ত্রের চলন হয়নি, সেই হাজার হাজার বৎসর আগেও মানুষ বুদ্ধিবলে আফ্রিকার অসংখ্য সিংহ বন্দি করে চালান দিত ইউরোপে। যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার আগেও রোমের বিভিন্ন সম্রাট যে কত হাজার সিংহ বন্দি করেছিলেন তার কোনও হিসাব নেই। খেলা দেখবার জন্যে পম্পি, জুলিয়াস সিজার আর অক্টোভিয়াস আগস্টাস যথাক্রমে ছয় শত, চার শত আর আড়াই শত সিংহকে ধরে রেখেছিলেন।'

রোলাঁ বললেন, 'বুঝুন তাহলে ব্যাপারটা! যুগ যুগ ধরে সিংহদের বধ আর বন্দি করা হচ্ছে, কাজেই আফ্রিকার ভাণ্ডার ক্রমেই খালি হয়ে আসছে। এর মধ্যেই আফ্রিকার কোনও কোনও সিংহপ্রধান অঞ্চল একেবারেই সিংহশূন্য হয়ে গিয়েছে।'

পথ চলতে চলতেই এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। সকলে তখন প্রান্তর-প্রান্তের একটা তরুকুঞ্জের কাছে এসে পড়েছিল।

সহসা আঙুল তুলে কমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন!'

দেখা গেল, কয়েকটা মস্ত মস্ত বানর একটা উঁচু গাছের ডালে ডালে বসে সাগ্রহে পথিকদের লক্ষ করছে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বুঝেই তারা লম্বা লম্বা লাফ মেরে গাছের ঘন পাতার অন্তরালে একেবারে গা ঢাকা দিলে।

রোলাঁ বললেন, 'শিম্পাঞ্জি!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল, আকার হিসাবে বনমানুষ জাতীয় লাঙুলহীন বানর গরিলা ও ওরাংউটানের পরেই হচ্ছে শিম্পাঞ্জিদের স্থান। মাথায় এরা চার ফুটের চেয়ে কম উঁচু হয় না। এরা সহজেই পোষ মানে আর সব কাজেই মানুষের নকল করতে ভালোবাসে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাঞ্জি সিগারেট টানতেও শিখেছিল। গরিলার মতো শিম্পাঞ্জিরও জন্মভূমি হচ্ছে এই আফ্রিকা। গায়ের জোরে শিম্পাজিকে মানুষ বশ করতে পারে না, রাগলে সে হয় বিপজ্জনক।'

—'আর গরিলা?'

—'একটা গরিলা ছয়জন মানুষের মতো শক্তিশালী।'

—'গরিলাদের দেশ আরও কত দূরে?'

রোলাঁ বললেন, 'আমরা তার কাছেই এসে পড়েছি।'

॥ একাদশ পর্ব ॥

হাইর‍্যাক্স, ব্যাসেঞ্জি ও কামা মুনটু

ওই মিকেনো! উচ্ছ্রিত, উদ্ধত, জলদজালজড়িত! বিস্ময়কর, ভীতিকর, প্রীতিকর! যথাস্থানে পৌঁছেছি।

হ্যাঁ, চোখের সামনে দৃষ্টিসীমা জুড়ে বিরাজ করছে অভ্রভেদী মিকেনো পর্বতের দিগন্তব্যাপী বিরাট দেহ। মিকেনো হচ্ছে মরা 'ভলকেনো'—আগে করত ঝলকে ঝলকে অগ্নিপ্রসব। তার শুভ্র তুষার-শিখর সমুদ্রতল থেকে চৌদ্দ হাজার চারশো বিশ ফুট ঊর্ধ্বে উঠে সদর্পে স্পর্শ করতে চায় যেন গগনের সুদূর নীলিমাকে! মিকেনোর শিখরের অনেক নীচে দিয়ে অচলতার পটভূমিকায় গতির আলপনা আঁকতে আঁকতে এবং শূন্যপথে অস্থায়ী ও বিচিত্র সব কাল্পনিক মূর্তি গড়তে গড়তে ভেসে আর ভেসে যাচ্ছে মেঘপুঞ্জের পর মেঘপুঞ্জ—তাদের ভেসে যাওয়ার আর ভাঙাগড়ার অন্ত নেই!

আপাতত শিবির সন্নিবেশ করা হয়েছে মিকেনোর পায়ের তলায় জঙ্গালাকীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে এসেই পড়েছি দুরন্ত বর্ষার কবলে। তিন দিন তিন রাত ধরে অবিরত অঝোরে ঝরছে বৃষ্টিধারা, মাঠ-ঘাট জলে জলে জলময়, দিনের বেলাতেও আরণ্য তিমির মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে পিছনে-ফেলে-আসা বামন-অধ্যুষিত জঙ্গলের অপ্রীতিকর স্মৃতি!

গতকল্য রাত্রে বারংবার হতে হয়েছে জ্বালাতন।

একে তো উটকো জায়গা, মশা ও হরেকরকম পতঙ্গের অত্যাচার, আর চিতাবাঘের উৎপাত; তার উপরে এখানে আবার আর এক নতুন উপসর্গের সাড়া পাওয়া গেল। জনৈক কুলি ঘুটঘুটে অন্ধকারে এ তাঁবু থেকে ও তাঁবুতে যাবার জন্যে লণ্ঠন হাতে করে বাইরে বেরিয়েছিল। ব্যাস, আর যায় কোথা। ঠিক যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগল! সেখানে কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল একদল গেছো 'হাইর‍্যাক্স', আলো দেখেই তারা সকলে মিলে সমস্বরে জুড়ে দিলে তুমুল আর্ত চিৎকার! তেমন উদ্ভট ও অবর্ণনীয় চিৎকার আমি আর শুনিনি এবং তাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দিলে হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকা আর ভেক—সেই বিকট শব্দতরঙ্গে নিদ্রার কথাও হয়ে উঠেছিল অচিন্তনীয়! ...গেছো হাইর‍্যাক্স হচ্ছে আফ্রিকার আর এক বিশেষত্ব, একরকম শশকজাতীয় জীব। আকার খরগোশের মতো পুঁচকে বটে, কিন্তু জীবতত্ত্ববিদরা বলেন, তারা নাকি গোদা হাতির খুদে জ্ঞাতি!

তাঁবুর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই, তাঁবুর ভিতরকার অবস্থাও আদৌ সন্তোষজনক নয়—এখানে-ওখানে কিলবিল করে কেঁচো, বিছে, জোঁক! হাত-পা গুটিয়ে ক্যাম্প খাটের উপরে বসে বসে জীবনটা একেবারেই ভারবহ হয়ে উঠত, ওরই মধ্যে যদি না সান্ত্বনা দিত অদ্বিতীয় সূপকার রামহরির সুপটু হাতের প্রসাদ! আমি বরাবরই দেখে আসছি, আমাদের জীবনযাত্রা যখন আলস্য-শিথিল ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে, তখনই ভালো করে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে রামহরির রন্ধন-প্রতিভা! এই অস্থানে গভীর অরণ্যে খাবার জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দুর্যোগ মাথায় করেও বিমল, কমল ও রোলাঁর সঙ্গে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি এবং একদিন হরিণ, একদিন বুনো হাঁস এবং একদিন জংলি মুরগি না এনে ছাড়িনি। তার আগে একদিন বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল নিরামিষ, কিন্তু রামহরির হাতের গুণে নিরামিশ ভোজ্যও হয়ে উঠেছিল লোভনীয় ও মুখরোচক—রেঁধেছিল সে নিরামিষ চপ, আলুর দম, নিরামিষ ভিণ্ডালু ও নিরামিষ আর্মেনিয়ান পোলাও।

এরই মধ্যে একদিন বনের ভিতরে অদ্ভুত এক জাতের কুকুর দেখলুম। আমাদের সাড়া ও দেখা পেয়ে তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না, কেবল দূরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোলাঁর মুখে শুনলুম, তারা নাকি বোবা, ঘেউ ঘেউ করতে পারে না! আরও শুনলুম, খ্রিস্ট-পূর্ব যুগে প্রাচীন মিশরেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। শিকারের সময়ে এই জাতের কুকুর ব্যবহার করা হত। একালে কঙ্গো ও মধ্য-আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। এ জাতের কুকুরের নাম হচ্ছে 'ব্যাসেঞ্জি'। বোবা কুকুর? আশ্চর্য!

আজও মেঘলা মেঘলা করে আছে বটে, কিন্তু দুপুরের পর বৃষ্টি ধরেছে।

রোলাঁ বললেন, 'গেল বারে মিকেনো পর্বতে উঠেছিলুম অন্যদিক দিয়ে কিন্তু এ অঞ্চলের পথঘাট আমার অজানা। সেইজন্যেই ভাবনা হচ্ছে।'

বিমল শুধোলে, 'কীসের ভাবনা?'

—'কামা-মুণ্টুদের খুঁজে বার করতে পারব কি না! মিকেনোর বিস্তার যোজনের পর যোজন জুড়ে, তার কোথায় আছে কী রহস্য সে-সব আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়।'

আমি বললুম, 'বেশ তো, আজ আকাশ তো একটু ধরেছে, আহারাদি সেরে নিয়ে তিনজনে মিলে একবার একটু বেরিয়ে পড়া যাক না! আর কিছু নয়, অন্তত এখানকার পরিস্থিতি কতকটা আন্দাজ করতে পারব।'

বিমল বললে, 'প্রস্তাব মন্দ নয়। রামহরি, 'লাঞ্চ' নিয়ে এসো। খেয়েদেয়ে আমরা তিনজনে একটু বেড়িয়ে আসব।'

কমল বললে, 'আর আমরা?'

—'বিশ্রাম করবে। অর্থাৎ নাকে সর্ষের তেল দিয়ে—'

—'ঘুমোবার চেষ্টা করব?'

—'ঠিক তাই।'

—'মাপ করতে হল বিমলদা! তিন দিন ধরে বিশ্রাম করে গাঁটে গাঁটে বাত ধরবার মতো হয়েছে! খানিক হাত-পা না চালালে আর যে চলে না!'

—'উত্তম। ডন দাও, বৈঠক দাও, মুগুর ভাঁজো, ব্যায়াম করলে বাত ধরে না। তারপর ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম ভাঙবার পর যদি পেটের জ্বালা ধরে, রামহরি আছে। আমরা তিনজন যাচ্ছি কেবল অগ্রদূতের মতো। বৃষ্টি না পড়লে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরেই থাকব। রামহরি, লে আও খানা!'

সেদিন ভোজ্য ছিল চিকেন গ্রিল, চিকেন স্টু ও চিকেন আফগানি পোলাও প্রভৃতি।

রোলাঁ বললেন, 'রামহরিকে অভিনন্দন দি। সে হচ্ছে যাদুকর। আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না যে, আমরা বনবাসে আছি, না শহুরে হোটেলে বাস করছি। ধন্য!'

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লুম। বাঘাও ছোড়নেওয়ালা নয়, পিছু নেবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু তাকে বন্দি করা হল লৌহশৃঙ্খলে। পথে যেতে যেতে দূর থেকে শুনতে পেলুম, বাঘা তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে আমাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। বাঘা বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন কিছু দেখবার নেশা তাকে পেয়ে আছে। ইংরেজি প্রবাদে বলে, যেমন মনিব তেমনি কুকুর! ঠিক! বাঘারও স্বভাব হয়েছে আমাদেরই মতো।

মিকেনোর পাদদেশটা চিরহরিৎ জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। জলধারার তালে তালে উপলে উপলে সংগীত সৃষ্টি করে একটি নদী উচ্চভূমি থেকে নাচতে নাচতে নীচের দিকে আসছে। পাহাড়ে-বর্ষায় উপর থেকে ঢল নেমে তার স্রোতকে করে তুলেছে পরিপুষ্ট, গতির কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠেছে অরণ্যভূমি।

এই তটিনীই পাহাড়ের উপরে হয় নির্ঝরিণী। পাছে পথ হারাই সেই ভয়ে তার তীর

ধরেই আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম, নামবার সময়ে এই নদী বা নির্ঝরিণীই দেবে আমাদের পথের নিশানা।

খানিকক্ষণ পরে রোলাঁ বললেন, 'আপনারা একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন?'

—'কী?'

—'পাহাড়ের গা এখানে নীলাভ?'

—'হ্যাঁ। তাতে কী বোঝায়?'

—'এইরকম জায়গাতেই হিরার খনি থাকবার সম্ভাবনা।'

—'কিন্তু আমাদের পক্ষে খনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? বহু লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি আনিয়ে তোড়জোড় করে আর কাঠখড় পুড়িয়ে পাথর খুঁড়ে তবে খনির খোঁজ পাওয়া যেতে পারে—আর পাওয়া যে যাবে শেষপর্যন্ত তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

শুকনো হাসি হেসে রোলাঁ বললেন, 'তা নেই। তবে এ রকম জায়গায় এলে সম্ভাবনার স্বপ্নই যে মানুষকে আশান্বিত করে তোলে! তা ছাড়া আগেই বলেছি তো, এমন সব জায়গায় প্রায়ই পথ চলতে হিরা কুড়িয়ে পাওয়া যায়! পৃথিবীর কোনও কোনও হীরক এইভাবেই মানুষের হস্তগত হয়েছে।'

—'যদি সময় পাই আমরাও না হয় পথে পথে হিরে কুড়োবার চেষ্টা করে দেখব।'

আমরা উঠছি—উপরে, উপরে, আরও উপরে! মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বনবলয়িতা, তটিনীমেখলা শ্যামাঙ্গী ধরণী অনেক নীচে পড়ে রয়েছে বন্ধুর মানচিত্রের মতো।

যে দিকে তাকাই, বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়! এত বাঁশঝাড় আমি আর কোথাও দেখিনি—সেই ঘনবিন্যস্ত বংশবন ভেদ করে অগ্রসর হতে গেলে মানুষের হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাঁশগুলো উচ্চতায় দশ থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট, মাথায় তাদের ঝিলমিলে পত্রভূষণ। নীচের দিকে জন্মেছে সব চারা আর লতা, তাদের গায়ে পাটকিলে ও সাদা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে এবং সেইসঙ্গে আরও আছে বেগুনি, লাল ও হলদে রঙের সমুজ্জ্বল অর্কিড আর বিছুটির জঙ্গল। বাগান-বিলাসীদের আদরের 'ফিউসা'-র মতো দেখতে একরকম সাদা সাদা ফুলও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেখানে বাঁশবন নেই সেখানে দেখা যায় সব একশো ফুট কি তারও চেয়ে বেশি উঁচু মস্ত মস্ত গাছ।

আমি বললুম, 'লোকে কথায় বলে—বাঁশবনে ডোম কানা! আমাদেরও সেই অবস্থা হবে নাকি? এই বাঁশের জঙ্গলে এসে দিগ্বিদিক জ্ঞান যে হারিয়ে ফেলতে হয়!'

রোলাঁ বললেন, 'শুনলে অবাক হবেন যে, এই দুর্গম অরণ্যেও অনায়াসে পথ কেটে নিয়ে আনাগোনা করে হাতি আর গরিলা আর বন্যমহিষরা। বাঁশের পাতা হচ্ছে গরিলা আর হাতিদের অতিশয় প্রিয় খাদ্য। গেলবারে এমনি 'রুগানো' বা বৃহৎ বাঁশের জঙ্গলেই আমি এসেছিলুম গরিলা-শিকারে।'

—'আপনি কত বড়ো গরিলা দেখেছেন?'

—'আন্দাজ ছয় ফুট উঁচু। শুনি, সাত ফুট উঁচু গরিলাও পাওয়া গেছে। আমি নিজে একটা পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি উঁচু গরিলা মেরেছিলুম। তার বুকের পাটার মাপ ছিল বাষট্টি ইঞ্চি আর ওজন ছিল পাঁচ মন।'

—'মানুষের সঙ্গে গরিলার সম্পর্ক কী রকম?'

—'বিশেষ প্রীতিজনক বলতে পারি না। তবে গরিলাকে চটিয়ে না দিলে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর মতো সে তেড়ে এসে গায়ে পড়ে মানুষকে আক্রমণ করে না। সে জানে মানুষের চেয়ে তার গায়ের জোর ঢের বেশি, আর বোধ হয় সেই কারণেই দলবদ্ধ মানুষ দেখলেও ভয় পায় না। আমি স্বচক্ষে গরিলার শারীরিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটা বড়ো চিতাবাঘ একবার একটা শিশু গরিলাকে আক্রমণ করেছিল। তৎক্ষণাৎ একটা ধাড়ি গরিলা বেগে ছুটে এসে অত্যন্ত অনায়াসে কামড়ে আর আছাড় মেরে চিতাবাঘটার দফা রফা করে দিলে!'

ঊর্ধ্বে মেঘের আস্তরণ ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছিল। বাতাসও বেশি ঠান্ডা হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। দূরে পশ্চিম আকাশটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চিরজ্বলন্ত নিয়ামলাগিরার বিরাট অগ্নিযজ্ঞে। তার অতল ও প্রকাণ্ড চিতা থেকে মুহুর্মুহু জেগে উঠছে আকস্মিক দীপ্তি এবং উপরের পুঞ্জীভূত মেঘের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে ছুটে যাচ্ছে শত শত লকলকে অগ্নিশলাকা!

অনেকটা উপরে উঠেছি এবং যতই উঠছি শীতও বাড়ছে। আরও উপরে এখানে পাওয়া যাবে বোধহয় হিমালয়ের শীত। এরই মধ্যে বুকে জাগল দস্তুরমতো কাঁপুনি।

বললুম, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, এমন কনকনে ঠান্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আকাশের গতিকও সুবিধার নয়—এত ঠান্ডায় ভিজে মরবার ইচ্ছা নেই, এইবারে আবার নীচে নামা উচিত।'

কিন্তু আমার কথা রোলাঁর কানে ঢুকল না, তিনি তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনছিলেন। আমি এবং বিমলও শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

অনেকটা শিঙার আওয়াজের মতো। হস্তীর বৃংহতি? না, এ আওয়াজে তেমন জোর নেই।

সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে হচ্ছে আর এক আওয়াজ। কে যেন ঢাকে কাঠি পিটছে!

—'ও কীসের শব্দ মঁসিয়ে রোলাঁ?'

—'গরিলার ডাক!'

আমাদের পিছনে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করে রোলাঁ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সামনেই একটা বড়ো ঝোপ। তারই ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, সামনেই খানিকটা অপেক্ষাকৃত খোলা জমি এবং সেখানে নানা ভঙ্গিতে বিরাজ করছে একদল গরিলা! গুনে দেখলুম, তেইশটা!

পুরুষ ও নারী—বুড়ো, জোয়ান, শিশু। চার-পাঁচটা বাচ্চা খেলা করছে—ছুটছে, লাফাচ্ছে,

গাছে চড়ছে। একটা বাচ্চা মায়ের স্তন্যপান করছে। কয়েকটা জোয়ান গরিলা দুমড়ানো বাঁশডাল থেকে মুখ দিয়ে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটু তফাতে গম্ভীর ভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড এক গরিলা—কী চ্যাটালো তার বুক, কী ধামার মতো তার ভুঁড়ি, কী মোটা মোটা তার বাহু, তার সর্বাঙ্গ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে অসাধারণ পশুশক্তির উচ্ছ্বাস! নিশ্চয় দলের সর্দার!

আচম্বিতে মস্তবড়ো গরিলাটা দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং দুই হাত দিয়ে নিজের বুক সশব্দে চাপড়াতে লাগল!

রোলাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'সরে আসুন, শিগগির সরে আসুন!'

—'হঠাৎ কী হল বলুন দেখি?'

—'সর্দার বাতাসে আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে! ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, চলুন, আর এখানে নয়!'

—'কোন দিকে যাব?'

—'নীচের দিকে। যে খোঁজে এদিকে এসেছিলুম, ব্যর্থ হল। এ অঞ্চলে গরিলারা আছে, মান্ধাতার মানুষরা নিশ্চয়ই এদিকে থাকে না।'

আমাদের গতি হল নিম্নাভিমুখী। নামতে নামতে মাথার উপরে বেড়ে উঠল মেঘের ঘটা। একে তো রোদ ওঠেনি, তার উপরে ঘনায়মান মেঘতিমিরে বেলাশেষের টিমটিমে আলোটুকুও হয়ে উঠল অধিকতর ঘোরালো। ঘন ঘন বিদ্যুৎপ্রভা—থেকে থেকে বজ্রনাদ—বাতাসে তুষারের নিশ্বাস! ধারাপাতের আর দেরি নেই!

যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে নামতে লাগলুম। তারপর উৎরাই শেষ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টিপাত।

রোলাঁ বললেন, 'যথাসময়ে নেমে আসতে পেরেছি, নইলে আজ তাঁবুতে ফিরতে পারতুম না।'

বিমল বললে, 'কেন?'

—'আর মিনিট-পনেরো দেরি হলে উপরের জল নেমে ওই পাহাড়ে নদী ফেঁপে ফুলে আরও খরস্রোতা হয়ে উঠত—এপারে আসবার কোনও উপায়ই থাকত না!'

এদেশের বৃষ্টিরও কী প্রতাপ! বাংলা দেশের খুব জোর বৃষ্টিও তার কাছে হার মানে! হয়তো এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কেবল চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত বৃষ্টি!

মোটা মোটা ফোঁটা! দেহকে ব্যথা দেয় রীতিমতো, অন্ধ করে দেয় চোখকে! ছুটতে ছুটতে শিবিরের কাছে এসে পড়লুম।

শোনা গেল বাঘার উচ্চ চিৎকার—অতিশয় ক্রুদ্ধ চিৎকার!

মানুষদেরও হট্টগোল! গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ। একটু তফাতে হুড়মুড় করে জঙ্গল ভাঙার শব্দ, ঝোপঝাপের ঝটপটানি! কে বেগে দৌড়চ্ছে—তার দ্রুত পদের ধুপ ধুপ আওয়াজ!

—'বিমল!'

—'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! দৌড়ে চলো, দৌড়ে চলো!'

আড়াল থেকে রামহরির গলা পেলুম।—'কোন দিকে গেল, কোন দিকে গেল!' বলতে বলতে সে তাঁবুর ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল—তার হাতে বন্দুক। বাঘার চ্যাঁচানি তখনও থামেনি।

—'কী হয়েছে রামহরি, এত হইহল্লা কেন?'

চোখ খত্তাল করে রামহরি বললে, 'ভূত খোকাবাবু, ল্যাংটা ভূত!'

—'পদে পদে ভূত দ্যাখো তুমি, ভূত তো তোমার হাতধরা! আর জ্বালিয়ো না, থামো!'

—'ঠাট্টা নয় খোকাবাবু, এ হচ্ছে মানুষ-ভূত। গায়ে লম্বা লম্বা কালো চুল, ইয়া রাক্ষুসে চেহারা, দেখলেই ভিরমি যেতে হয়।'

এমন সময়ে বিনয়বাবু, কমল ও কামাথি প্রভৃতিরও আবির্ভাব।

—'বিনয়বাবু, ব্যাপার কী?'

—'আমি দেখিনি, কমল দেখেছে।'

কমল বললে, 'ভালো করে কিছু দেখতে পাইনি বিমলদা! তবে বাঘার চিৎকারে চমকে উঠে দূর থেকে দেখলুম, গরিলার মতো একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি সাঁৎ করে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল! রামহরি আর কামাথিও দেখেছে, তারা তখনই বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগেনি।'

কামাথি বললে, 'কামা মুনটু!'

চমৎকৃত কণ্ঠে রোলাঁ বললেন, 'কামা মুনটু! যার খোঁজে আমরা এসেছি, সেই-ই এসেছিল আমাদের কাছে! মহম্মদের কাছে পর্বতের আগমন! আশ্চর্য!'

একদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে কমল বললে, 'মূর্তিটা ওইদিকে গেছে!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমরাও ওইদিকের জঙ্গল দুলতে দেখেছি!'

বিমল বললে, 'ওদিকেও একটু এগুলেই নদী। তারপরেই পাহাড়। নদীর জল এখনও বোধ হয় বেশি বাড়েনি। তাহলে খুব সম্ভব সে নদী পেরিয়ে পাহাড়েই উঠেছে!'

রোলাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ আর তার পিছু ধরবার উপায় নেই। একে এই দারুণ বৃষ্টি, তার উপরে সন্ধ্যার অন্ধকার আসন্ন।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আজকের পরে আছে, কাল। আমাদের ফাঁকি দিয়ে সে যাবে কোথায়? খুব ভোরে উঠেই কাল আমরা ওইদিক দিয়ে আবার পাহাড়ে গিয়ে উঠব।'

॥ দ্বাদশ পর্ব ॥

হাসি, কি হুঙ্কার, কি হাহাকার

পূর্বাচলে ফুটল প্রভাত-সূর্যের রক্তারক্ত অগ্নিরাগ এবং নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গকণ্ঠে যথারীতি আবৃত্ত হল আলোক-কাব্যের বিভিন্ন পদ।

প্রাতরাশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে কামাথি এসে বললে, 'কর্তা, 'সাফারি'রা কেউ পাহাড়ে উঠতে রাজি নয়। 'আস্কারি'-রা নিমরাজি বটে, কিন্তু তারাও খুঁত খুঁত করছে।'

রোলাঁ বললেন, 'কেন?'

—'বলে, পাহাড়ে আছে নানান বিভীষিকা! তাদের সব চেয়ে ভয় কামা মুনটুদের। বলে, তারা হচ্ছে প্রেতাত্মা, বনমানুষদের দেহে আশ্রয় নিয়ে মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায়!'

হো হো করে হেসে উঠে রোলাঁ বললেন, 'কামাথি, তোমারও কি ওই বিশ্বাস?'

কামাথি নত হয়ে সেলাম ঠুকে বললে, ' 'বোয়ানা' (প্রভু), আমার বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, আমি আপনার হুকুমের দাস।'

কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল, আপাতত কেবল আমাদের ছয়জনকে (রোলাঁ, বিনয়বাবু, বিমল, আমি, কমল ও রামহরি) নিয়ে গঠিত হবে অনুসন্ধান সমিতি। প্রাথমিক তদন্তকার্য শেষ করে ফিরে এসে আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

অতএব তখনকার মতো শিবিরে রইল সেপাই ও কুলির দল। এবং তাদের ভার অর্পণ করা হল কামাথির উপরেই। সকলকেই জানিয়ে গেলুম, বড়ো জোর চব্বিশ ঘণ্টা আমরা থাকব পাহাড়ের উপরে। বলা বাহুল্য, এবারে বাঘাও হল আমাদের সাথি। তাকে সঙ্গে না আনাই উচিত ছিল!

প্রকৃতির পরনে তখনও রয়েছে মেঘরুচি বসন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে ঝরছে ইলশে-গুড়ুনি, বাতাস যেন হিমশিলা।

সৌভাগ্যক্রমে অল্প খোঁজাখুঁজির পরেই পাহাড়ে ওঠবার একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল। কাঠুরিয়া, মধুসংগ্রাহক ও স্থানীয় শিকারিদের অগম্য ঠাঁই নেই। নিশ্চয়ই তাদের পদক্ষেপেই এই পথের উৎপত্তি।

সেই পথ—যা সুপথ নয়, কুপথ—ধরেই আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। বরাবরের মতো এবারেও আমাদের অগ্রণী হল বাঘা। সে অগ্রবর্তী হলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি এই ভেবে যে, অন্তত পুরোভাগ থেকে কোনও আকস্মিক বিপদ আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারবে না।

পা চালাতে চালাতে চলছে আমাদের মুখও। বিনয়বাবু বলছিলেন: 'মঁসিয়ে রোঁলার বিশ্বাস, আজও এই অঞ্চলে নৃতত্ত্বে বিখ্যাত 'রোডেশিয়ান' মানুষদের বংশধররা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অনুমান করা হয়, রোডেশিয়ান মানুষরা পনেরো-ষোলো হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত! আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশে তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।'

কমল বললে, 'কিন্তু আমরা তো এখন রোডেশিয়া প্রদেশে নেই!'

—'না। আমরা আছি কঙ্গো প্রদেশে। কিন্তু দক্ষিণ দিকে কঙ্গোর সীমান্তেই আছে রোডেশিয়া। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ ছিল যাযাবর। তারা চাষবাস

করতে জানত না, শিকার বা বনের ফলমূল আহরণের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করত। এক জায়গায় খাদ্যাভাব হলেই অন্য জায়গায় বা দেশে গিয়ে বসবাস করত। সুতরাং স্মরণাতীতকালে রোডেশিয়ান মানুষরা যে কঙ্গোয় এসে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পণ্ডিতদের মত হচ্ছে, রোডেশিয়ান মানুষদের চিহ্ন হাজার হাজার বৎসর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

—'সে কথাও জোর করে বলা যায় না। অনুসন্ধান-কার্যের সুবিধার জন্যেই পণ্ডিতরা এক এক জাতের মানুষকে বিশেষ নামে ডাকেন—যেমন নিয়ানডার্থাল, রোডেশিয়ান, হিডেলবার্গ প্রভৃতি। এরা যে পরে ভিন্ন ভিন্ন নামে পৃথিবীতে অজ্ঞাতবাস করেনি, এমন কথাই বা কেমন করে বলব? দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্যাখো, আজও অস্ট্রেলিয়ার গভীর জঙ্গলে এমন সব অসভ্য মানুষ আছে, যাদের সঙ্গে রোডেশিয়ান মানুষদের অনেক লক্ষণই মিলে যায়। অথচ কোথায় রোডেশিয়া আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া!'

—'রোডেশিয়ান মানুষদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

—'মোটামুটি পারি। মঁসিয়ে রোলাঁর মুখেও তার আভাস তোমরা পেয়েছ। দেহের তুলনায় তার মুখ বড়ো নাক চ্যাপটা। ভারী চোয়াল। খর্ব গ্রীবা। চ্যাটালো বুকের পাটা। দেহ প্রকাণ্ড। রোমশ গা। পেশিবদ্ধ বলিষ্ঠ মূর্তি। হঠাৎ দেখলে গরিলা বলে ভ্রম হয়।'

—'তারা কি নরভুক?'

—'অসম্ভব নয়। তাদের চেয়ে অগ্রসর অসভ্যরা আজও মানুষের মাংস খেতে আপত্তি করে না।'

—'তাহলে তারা জীবনযাপন করে হিংস্র পশুর মতো?'

—'নিশ্চয়ই। তবে তাদের মস্তিষ্ক গরিলা আর ওরানউটানের চেয়ে উন্নত। পৃথিবীতে আজও কোনও কোনও জাতের অসভ্য মানুষ আছে যারা আগুনের ব্যবহার জানে না। অথচ এটা প্রমাণিত হয়েছে, পনেরো-ষোল হাজার বৎসর আগে যে নিয়ানডার্থাল মানুষদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল, তারা আগুনের ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। রোডেশিয়ানরাও তাদের সমসাময়িক। অপেক্ষাকৃত সভ্য আদিম বাসিন্দারা ক্রমোন্নত অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করতে পেরেছিল, বিশেষ বিশেষ কাঠ ঘর্ষণের ফলে আগুনের জন্ম দেয়। সভ্যতার দিকে আরও এগিয়ে তারা জানলে যে অগ্নি-উৎপাদক পাথর (চকমকি) থেকে আরও তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় এই রকম কাঠ আর পাথরের নামই হচ্ছে 'অগ্নিকাষ্ঠ' ও 'অগ্নিপ্রস্তর'। বর্তমান কালেও কোনও কোনও পশ্চাৎপদ অসভ্য জাতির মধ্যে ওই দুই উপায়েই অগ্নি উৎপাদন করবার নীতি প্রচলিত আছে। নিয়ানডার্থাল মানুষরা চকমকি পাথরের অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করত। মঁসিয়ে রোলাঁর পোষা মুনটুর হাতেও ছিল পাথরের বর্শা। নিয়ানডার্থাল মানুষরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত, এদিক দিয়েও

সম্ভবত কামা মুনটুদের মিল আছে, যাদের খোঁজে আমরা এই পাহাড়ে উঠেছি, তারাও হয়তো গুহাবাসী জীব। আদিম কালের মানুষরা শত্রু আর বন্য জীবদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে হয় গুহায় নয় জলের উপরে বাসা বাঁধত।'

কমল বলল, 'জলের উপরে মানে নৌকায়?'

—'না। জলের ভিতরে মোটা মোটা খোঁটা পুঁতে তার উপরে পাটাতন পেতে ঘর বানিয়ে বাস করা হত। সুইজারল্যান্ড আর ইতালিতে এই রকম প্রাগৈতিহাসিক বসতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। তবে এ ভাবে যারা বাস করত তারা যে গুহাবাসী আদিম মানুষদের চেয়ে উন্নত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

বেলা ক্রমে দুপুরের দিকে গড়িয়ে চলেছে। বৃষ্টি ধরেছে বটে, কিন্তু আকাশের গায়ে তখনও জড়ানো মেঘের চাদর। বাতাসে বেড়ে উঠছে শীতের আমেজ। সকলে অনেক চড়াই আর উতরাই পার হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আদিম মানুষদের কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না।

প্রাণীদের মধ্যে ক্রমাগত সাড়া ও খেদা দিচ্ছে কেবল পাখিরা—কখনও একা একা, কখনও দলে দলে। আমাদের দেশে পরিচিত পাখিদের মধ্যে দেখলুম দাঁড়কাক, কাঠঠোকরা, তিত্তির, ঘুঘু ও বুলবুলি প্রভৃতি। চড়াই পাখির মতো দেখতে একরকম পাখি, কিন্তু শিস দেয় কেনারির মতো। বিদেশি পাখিদের মধ্যে দেখা গেল থ্রাশ, টুর‍্যাকো, স্রাইক ও টিটমাউস প্রভৃতিকে। সায়েবরা যাদের সানবার্ড বা সূর্যপাখি বলে, তাদেরও কয়েক জাত আছে। তারা মধুপায়ী। আরও যে কত অজানা পাখি। তাদের গলায় গানের সুর, গায়ে রামধনুর নিছনি। কখনও কানে ঝরে সুরবাহারের মাধুরী, কখনও চোখে লাগে স্বপনের রংবেরং!

কমল পেটে হাত দিয়ে বায়না ধরলে, 'জঠরানলে পুড়ে মরি রামহরিদা, আগুন নেবাও, ঠান্ডা করো!'

—'তোমার জঠরানল তো রাবণের চিতা, কখনও নেবে না! কিন্তু খাবে কী?'

—'আছে কী?'

—'হাতে গড়া রুটি, ভাজাভুজি, আমের চাটনি!'

—'আবার হাতে রেখে বলছ কেন দাদা? তুমি শেষ রাতে উঠে যখন মাংস রাঁধছিলে, আমি কি তার সুগন্ধ পাইনি?'

—'একটুখানি হরিণের মাংস ছিল তাই দিয়ে কোর্মা রেঁধেছি। আর মেটুলি-চচ্চড়ি।'

—'আবার মেটুলি-চচ্চড়ি?—শাবাশ! ধন্য! ব্রাভো!'

আমরাও উদরের শূন্যতা অনুভব করছিলুম, সেইখানেই সার বেঁধে বসে পড়লুম বিনাবাক্যব্যয়ে। অগ্রবর্তী বাঘাও ব্যাপার বুঝে আবার পশ্চাৎপদ হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘুরতে লাগল রামহরির পিছনে পিছনে। বাঘা বেশ জানে কখন কার খোসামোদ করা উচিত।

একটি পরম সুখী পরিবারের মতো আমরা যখন একাগ্র মনে ডানহাতের কাজ সারছি

এবং রামহরির রন্ধন নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠছি, তখন সহসা হল অত্যন্ত ছন্দপতন—বাঘার কণ্ঠে জাগল বেসুরো চিৎকার।

সামনের দুই থাবা দিয়ে একখানা হরিণের হাড্ডি বেশ বাগিয়ে ধরে বাঘা মাথা কাত করে চর্বণানন্দ উপভোগ করছিল বটে, কিন্তু তার চক্ষু (এবং বোধ করি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও) ছিল অত্যন্ত জাগ্রত, কারণ চেঁচিয়েই সে তিরবেগে ছুটে গেল পাহাড়ের যেখানে, সেখানে দোতলা সমান উঁচু পাথুরে প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। লাফের পর লাফ মেরে বাঘা সেই খাড়া প্রাচীরের উপরে ওঠবার জন্যে অসম্ভব চেষ্টা করতে লাগল!

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি দেখেছি—আমি দেখেছি! আবার একটা গরিলামুখো খত্তালচোখো দানব! বাঘা চ্যাঁচাতেই একলাফে অদৃশ্য হল!'

তার পরেই কানফাটানো প্রাণদমানো হা হা হা হা হা হা ধ্বনি—সেটা হুঙ্কার, না হাসি, না হাহাকার, কিছুই বোঝা গেল না।

এমন সময়ে কোর্মা-কারি কিছুই মুখে রোচে না, হুড়মুড় করে উঠে পড়ে আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দুক তুলে নিলুম। কিন্তু শত্রু কোথায়? কেবল মেঘচ্ছায়ায় মেদুর পাহাড় আর সবুজ বন। সেই উদ্ভট হাসি বা হুঙ্কার বা হাহাকারও আর শোনা গেল না।

রামহরি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'কী গো, শুনলে তো? এইবারে ফিরবে, না মরবে?'

—'ফিরবও না, মরবও না, আরও এগিয়ে দেখব! আমরা এত সহজে ভয় পাবার ছেলে নই!' বলতে বলতে বিমল অটল পদে এগিয়ে চলল সামনের দিকে, নির্ভীক মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব। তার সঙ্গে পদচালনা করলুম আমরাও।

বাঘা কিন্তু নিজের পাওনাগণ্ডা ভোলবার পাত্র নয়—বিপদ-আপদেও মাথা ঠিক রাখতে পারে। পুনর্বার যাত্রা করবার আগে পরিত্যক্ত হাড্ডিখানা আবার মুখে তুলে নিয়ে চলল।

বিনয়বাবু বললেন, 'একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমরা আর বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছি না—আদিম মানুষদের সন্ধানে ঠিক পথই ধরতে পেরেছি, যদিও তারা এগিয়ে যাচ্ছে আলেয়ার মতো!'

রোলাঁ মাথা নেড়ে বললেন, 'না বিনয়বাবু, তারা আলেয়ার মতো এগিয়ে যাচ্ছে কি পিছনের ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আসছে, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তারা হয়তো আমাদের চোখে চোখেই রেখেছে!'

রোলাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই যেন কোথা থেকে জাগ্রত হল আবার সেই অবর্ণনীয় হা হা হা হা অট্টরোল!

বাঘা বিষম ক্রোধে সর্বাঙ্গের লোম ফুলিয়ে একদিকে দৌড়ে যাবার চেষ্টা করলে, আমি তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত হাতে চেপে ধরলুম তার চামড়ার গলাবন্ধ।

॥ ত্রয়োদশ পর্ব ॥

নরভুকদের আত্মপ্রকাশ

সে দিনের কথা ভুলিনি। ভুলতে পারব না। সে হচ্ছে আগুন-রেখা দিয়ে জ্বলজ্বলে করে আঁকা জ্বালাময় স্মৃতিচিত্র।

আবার সেই বিকট অট্টরোল শুনলুম বটে, কিন্তু তার উৎপত্তি কোথায়, আবিষ্কার করতে পারলুম না। কেবল লক্ষ করলুম, দূরের একটা জঙ্গলের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ব্যস্ত ভাবে শূন্যে উড়ে গেল। যাকে আমরা ধরতে চাই, ওই জঙ্গলের মধ্যেই কি আছে তার ভীতিকর উপস্থিতি?

দ্রুতপদে সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম। পাতি পাতি করে খুঁজলুম। সব খাঁ খাঁ। গাছের উপরে একটাও পাখি নেই। গাছের নীচেও নেই একটা জীব। বিজনতায় যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা।

রোলাঁ হতাশ ভাবে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওরা যেচে ধরা না দিলে আমরা কিছুতেই ওদের ধরতে পারব না!'

আমি বললুম, 'হিমালয়ের পৃথিবী বিখ্যাত তুষার মানুষদের কথা স্মরণ করুন। কত লোক নাকি তাদের দেখেছে, কিন্তু ধরতে গিয়ে কেউ তাদের খুঁজে পায়নি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা হিমালয়ে গিয়ে যে ভয়ংকরদের দেখেছিলুম, হয়তো তারাই হচ্ছে তথাকথিত তুষার মানুষ।'

বললুম, 'কিন্তু তার কোনও সঠিক প্রমাণ নেই।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবুর অনুমান, কামা মুনটুরা গুহাবাসী জীব। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে পাহাড়ের কোথাও না কোথাও তাদের গুহাগুলো আমরা আবিষ্কার করতে পারব। তারা পালালেও তাদের গুহাগুলোও তো আর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারতে পারবে না!'

কমল বললে, 'গুহায় কখনও বাস করিনি, আজকের রাতটা গুহার ভিতরে কাটাতে পারলে মন্দ হয় না!'

কথা কইতে কইতে এইবারে আমরা একটা অনতিবৃহৎ উপত্যকার উপরে এসে পড়লুম। তখন মাথার উপরে থেকে থেকে বিদ্যুতের আলো-আলপনা ও মেঘডম্বর, দুইদিকে ছায়াম্লান জঙ্গল-সবুজ পাহাড়ের গড়ানে গা এবং তার মাঝখানে তৃণশয্যা-বিছানো সমতল ভূমি। বেশ স্বস্তিবোধ করলে আমাদের চড়াই-উৎরাই-শ্রান্ত দেহগুলো।

কমল বললে, 'বাঃ, একটি ঝরনাও আছে যে!'

ঠিক একটি ছোট্ট রুপোলি লহর। শৈলরন্ধ্র টুটে বেরিয়ে হাত দশেক নীচে ঝিরঝিরিয়ে ঝরতে ঝরতে গিরিতটে বাজাতে চায় যেন সেতারের টুং টাং! রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র কথা মনে হল!

এখানেও পায়ে বিছুটির ঝোপ জড়িয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফুরন্ত বংশবন। তার উপরে মাথা তুলেছে 'মুসুঙ্গুরা' বা বন্য গোলাপ গাছ, তার পাতা ছোটো ছোটো, ফুলের রং হলদে, উচ্চতা পঞ্চাশ-ষাট ফুট। আর এক জাতের অগুন্তি গাছ আছে, স্থানীয় ভাষায় নাম হচ্ছে 'মুগেসি'—বিলাতি নামে বুঝায় 'কাগজি বল্কল গাছ'। তার উচ্চতা সত্তর থেকে একশো ফুট পর্যন্ত। ডালে বাহার দেয় থোলো থোলো গোলাপি-মেশানো বেগুনি ফুল—গড়ন তাদের 'লিলি'র মতো। দেখলুম কালোজাম জাতীয় এক ফলগাছ, স্থানীয় নাম 'মুকেরি'। এখানে সেখানে দেখা যায় এক জাতের ঝুলন্ত লতা, নাম 'রুহুনগাঙ্গেরি', তাতে ফোটে হলুদবরন ফুল।

চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে করতে উপত্যকার প্রায় শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি, আচম্বিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে আবার জাগ্রত হল সেই ভৈরব হা হা হাস্য, কি হুঙ্কার কি হাহাকার!

এবারে অট্টরোলের তরঙ্গ ধেয়ে এল আমাদের পিছন দিক থেকে।

রোলাঁ বললেন, 'তবে কি ওই জীবটাকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে এসেছি?'

বিমল ভুরু কুঁচকে নীরবে মাথা চুলকাতে লাগল।

কমল বললে, 'আমরা বোধহয় হতভাগাদের আড্ডা ছাড়িয়ে এসেছি! ফিরে চলুন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোথায় তারা থাকতে পারে? দু-দিকেই নজর রেখেছি, পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটা গুহাও নেই।'

রোলাঁ বললেন, 'হয়তো ওরা গুহায় থাকে না। হয়তো ওরা গেছো জীব।'

বিনয়বাবু ঘন ঘন মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'উঁহুঁ, হতেই পারে না!'

রোলাঁ বললেন, 'কেন?'

—'আপনার মুখে বারংবার কামা মুনটুর হুবহু বর্ণনা শুনেছি। তার হাত-পায়ের গড়ন নাকি মানুষের মতো। বৃক্ষবাসী জীবের তা হয় না।'

রোলাঁ নিরুত্তর। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল তিনি সুখী নন। ওঁরা দুজনেই নৃতত্ত্বে পণ্ডিত। আর কে না জানে, পণ্ডিতেরা হচ্ছেন উড়ো তর্কে তুখোড়। তর্ক পেলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যান। এত সহজে রোলাঁ তর্কে ক্ষান্তি দিলেন দেখে বাঁচলুম। বোধহয় বড়োই ভয় পেয়েছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এখানে কি একাধিক কামা মুনটুর আবির্ভাব হয়েছে? বিমলের কাছে সেই সন্দেহই প্রকাশ করলুম।

বিমলও বললে, 'আমারও তাই মনে হয়। ওদের মতলবটা কী?'

সহসা আমাদের ডান দিক থেকে জেগে উঠল সেই রোমাঞ্চকর হা হা হা হা ধ্বনি।

তারপর আবার বাম দিক থেকেও সেই ভয়াল চিৎকার!

তারপর কখনও সুমুখ, কখনও পিছন, কখনও এপাশ, কখনও ওপাশ থেকে উঠতে লাগল সেই অমঙ্গল্য অট্টরোল!

বাঘা বারংবার চমকে চমকে দিকে দিকে ছুটেই আবার থমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে

লাগল—এবং তারপর দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারার মতো সারমেয়-ভাষায় ধমকের পর ধমক দিতে লাগল অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশে!

বিমল গম্ভীর মুখে বললে, 'ওরা চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

কমল বললে, 'কিন্তু কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না, ওরা কোথায় আছে?'

—'জঙ্গলের নীচের দিকটা আগাছার ঝোপেঝোপে আচ্ছন্ন, ও-সব জায়গায় বড়ো বড়ো জানোয়াররাও লুকিয়ে থাকতে পারে।'

—'কিন্তু ওরা চ্যাঁচায় কেন? আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে?'

—'না। আমাদের ভয় দেখিয়ে ওদের লাভ নেই।'

—'তবে?'

—'ওরা আমাদের আক্রমণ করতে চায়।'

—'কেন? আমরা তো ওদের অনিষ্ট করিনি।'

বিমল তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'কেন? হরিণরা আমাদের অনিষ্ট করে না, তবু আমরা তাদের আক্রমণ করি কেন?'

কমল শিউরে উঠে বললে, 'বিমলদা, তুমি হাসছ! ওরা আমাদের পেটে পুরতে চায়, আর তুমি হাসছ!'

রামহরি করুণ কণ্ঠে বললে, 'ওরে বাবা রে, এ কী হাসির ব্যাপার রে!'

রোলাঁ ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'বিমলবাবু, বিমলবাবু, এখন উপায় কী?'

—'এক উপায় আক্রান্ত হলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমাদের বন্দুক আছে, ওদের নেই।'

—'কিন্তু ওদের দলে যদি শত শত লোক থাকে, আমাদের ছয়টা বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে পারব?'

—'জনকয় লোককে বধ করলেও ঠেকাতে পারা সম্ভব নয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের মরতেই হবে।'

—'তবেই তো!'

—'কিন্তু আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে সরাসরি ওদের সঙ্গে লড়ব না।'

—'তবে?'

—'একটা উপায় নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি। ...কুমার!'

—'বলো!'

—'ওইদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।' বিমল অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

খানিক তফাতেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গহ্বরের মতো জায়গা। আন্দাজ—চওড়ায় ছয়-সাত আর গভীরতায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত।

বিমল বললে, 'ওর মধ্যে আশ্রয় নিলে কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণের জন্যে, কিন্তু তারপর?'

—'মৃত্যু!'

—'খাসা পরিণাম!'

—'একেবারে অতটা হতাশ হবেন না বিনয়বাবু। মনে রাখবেন, কামা মুনটুরা বন্দুকের মহিমা জানে না! গহ্বরের মুখে যখন ধড়াদ্ধড় করে সঙ্গীদের মাটির উপরে হতাহত হয়ে আছড়ে পড়তে দেখবে, তখন ওদের জানোয়ারি সাহস আর নরমাংস খাবার লোভ কর্পূরের মতো উবে যাবে বলেই মনে করি!'

॥ চতুর্দশ পর্ব ॥

পঞ্চভূতের হামলা

বরাবরই দেখে আসছি বিপদ যত বেশি ঘনিয়ে ওঠে, বিমলের মেজাজ হয়ে পড়ে তত বেশি প্রশান্ত। মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও নিতান্ত সহজ ভাবেই সে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলতে পারে।

কমল বললে, 'বিমলদা, তাহলে আমরা কি এখনই ওই গহ্বরে—'

কিন্তু তার অসমাপ্ত ভাষণ ডুবিয়ে দিয়ে এইবারে চারিদিক থেকে একসঙ্গে সম্মিলিত শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশ জাগানো উচ্চণ্ড কোলাহল—পাহাড়ের শিখরে শিখরে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি! বিপুল জনতার সেই মিলিত কণ্ঠস্বর যে অর্থপ্রকাশ করতে লাগল, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রইল না—সে হচ্ছে হিংস্র, বুভুক্ষু ও মারাত্মক হুহুঙ্কার!

আমি বললুম, 'বিমল, এইবার ওরা বোধহয় আক্রমণ করবে!'

বাক্যহীন মুখে কেবল মাথা নেড়ে বিমল আমার কথায় সায় দিলে।

বেশ বোঝা গেল, সেই গর্জমান জনতা এগিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। একদিক থেকে নয়, চারিদিক থেকে! শেষটা বেড়াজালে বন্দি হব নাকি?

রোলাঁ বললেন, 'বিমলবাবু, ওরা দেখতে পাবার আগেই কি আমাদের ওই গহ্বরের ভিতরে লুকিয়ে পড়া উচিত নয়?'

বিমল হাস্য করে বললে, 'লুকোবেন? লুকোচুরির সময় আর নেই। ভাবছেন কি ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওরা জঙ্গলে জীব, জঙ্গলের আড়াল থেকে আমাদের সব গতিবিধি লক্ষ করছে।'

—'তাহলে গহ্বরে ঢুকে আমাদের লাভ?'

আমি বললুম, 'বিমলের 'স্ট্র্যাটিজি' কি জানেন? গহ্বরের মুখ সংকীর্ণ, ওরা দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে পারবে না। তিন-চার জন মিলে ঢোকবার চেষ্টা করলেই আমাদের গুলি খেয়ে ভূমিসাৎ হবে। এইভাবে আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওদের বাধা দিতে পারব।'

—'ঠিক, ঠিক!'

এইবারে দেখা গেল হানাদারদের! জঙ্গল, ঝোপঝাপ, বড়ো বড়ো পাথরের ও গাছের আড়াল থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল দৈত্যের মতো বিকটদর্শন সব মূর্তি! বস্ত্রহীন, বর্শাধারী, লম্বকেশ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অমানুষ ও দীর্ঘায়ত মূর্তি—চ্যাঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, আস্ফালন করছে, ছুটে আসছে—দিকে দিকে, পরে পরে, দলে দলে—তাদের সংখ্যা গণনা অসম্ভব!

বিমল বললে, 'গহ্বরে, গহ্বরে!'

সবাই বেগে গহ্বরের দিকে ছুটে চললুম, সর্বশেষে আমি।

পথে পড়ল একটা ঝোপ। তার কাছে আসতেই যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! একটা বিষম গুরুভার দেহ অতর্কিতে এমন ভাবে আমার উপরে লাফিয়ে পড়ল যে চক্ষে অন্ধকার দেখে আমি ঠিকরে লম্বমান হলুম মাটির উপরে! উঠে বসবার উপক্রম করে পরমুহূর্তেই দেখি, প্রায় গরিলার মতো একটা করালবদন সুবৃহৎ মূর্তি আমার দিকে নিক্ষেপ করলে এক দীর্ঘ বর্শাদণ্ড!

বর্শার অমোঘ আঘাতে আমার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত, কিন্তু কোথা থেকে বিদ্যুতের ঝটকার মতো এসে সেই নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের গতিপথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার প্রভুভক্ত বাঘা—বর্শা ভেদ করলে তার দেহ! তারপরেই তার অন্তিম চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ এবং একটা দানবীয় আর্তনাদ!

তারপরেই শুনলুম আমার হাত ধরে সজোরে টানতে টানতে বিমল বলছে, 'ওঠো কুমার, শিগগির ওঠো!'

—'আমার বাঘা, আমার বাঘা!'

—'ওই ওরা এসে পড়ল! বাঘার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কি মরতে চাও?' বিমল আমাকে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিলে।

আমার পায়ের তলায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে বাঘার বর্শাবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহ। এবং তার পাশেই মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে সেই দানব-দেহটা—বুলেটে তার বক্ষ ভেদ করে বিমলের বন্দুক নিয়েছে বাঘার মৃত্যুর প্রতিশোধ। প্রতিশোধ? কিন্তু একটা নিকৃষ্ট দানবের তুচ্ছ মৃত্যু দিয়ে কি বাঘার মতো মহান জীবের মহিমময় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া যায়? আমার বাঘা যে অতুলনীয়!

বাঘা প্রাণ দিলে আমার জন্যেই, কিন্তু তার দিকে আর ফিরে তাকাবারও সময় নেই। দিকে দিকে ছুটন্ত পদশব্দ ক্রমেই নিকটস্থ! আবার একটা বর্শাদণ্ড সোঁ করে আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে গেল।

—'চলে এসো কুমার, চলে এসো!' বিমল ছুটল—আমিও তার পিছনে পিছনে!

সবাই মিলে গহ্বরের পিছন দিকে গিয়ে বন্দুক তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলুম—সকলের দেখাদেখি আমিও যন্ত্রচালিতের মতো বন্দুক ধরলুম বটে, কিন্তু আমার শোকাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত মনে তখন আত্মরক্ষার কোনও ইচ্ছাই ছিল না।

ওদিকে সেই মৃতের জগতেও নিদ্রাছুটানো কর্ণভেদী হুঙ্কারের ধুন্ধুমার একেবারে কাছে এসে পড়ল এবং সেইসঙ্গে শোনা যেতে লাগল শত শত ধাবমান এলোমেলো পায়ের শব্দ—ধুপধাপ ধুপধাপ!

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'গহ্বরের মুখে কারুকে দেখলেই গুলি চালাবে!'

প্রথমেই আবির্ভূত হল তিনটে উন্মত্তের মতো তাণ্ডবে মত্ত দানব-মূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছয়টা বন্দুকের এককালীন অগ্নিবৃষ্টির চোটে তারা ভূতলশায়ী হল গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো!

কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধগুলো তবু দমল না—বোধ করি কার্য ও কারণ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদের মতো তীক্ষ্ণ ছিল না, কারণ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তারা বেপরোয়া পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বারংবার! আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও বিশ্রামলাভের অবকাশ পেলে না—অক্ষত, তেরিয়ান হানাদারদের ক্রুদ্ধ ও স্পর্ধিত হই-হই রবে, আহতদের পাশবিক আর্তনাদে এবং বন্দুকের অশ্রান্ত গর্জনে কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম! একে সেই কুয়াশামাখা মেঘমলিন দিনের আলো ছিল রীতিমতো অস্পষ্ট, তার উপরে অবিরাম অগ্নিবর্ষণের ফলে বারুদের ধূম্রকুণ্ডলী নিবিড়তর হয়ে বেরিয়ে যাবার পথে গহ্বরের মুখটা এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে দিলে যে, শত্রুদের কারুকেই আর চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু তবু আমরা অন্ধের মতো বর্ষণ করতে লাগলুম বুলেটের পরে বুলেট—আমাদের অস্ত্র তখন কেবল শব্দভেদী!

এমন হুলুস্থুলুকাণ্ড আরও কতক্ষণ চলত জানি না, কিন্তু আচম্বিতে দানবদের চিৎকার হয়ে উঠল অত্যন্ত আতঙ্কিত! শত শত পায়ের শব্দ গহ্বরের মুখ থেকে সরে যেতে লাগল ত্বরিত-গতিতে—আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, দানবগুলো কি অবশেষে প্রাণের ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হল?

অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল, তারা প্রাণভয়ে সত্যসত্যই পলায়ন করেছে বটে, তবে আমাদের জন্যে নয়!

চারিদিক গমগম করতে লাগল আর এক অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর শব্দ বিভীষিকায়! যেন সংখ্যায় অসংখ্য কোনও অজানা ভয়ংকরের দল উপত্যকার উপরে গুরু গুরু মস্ত মস্ত দুরমুশ আছড়াতে আছড়াতে ধেয়ে আর ধেয়ে আসছে পাহাড় কাঁপিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ, তীক্ষ্ণ শব্দে শিঙা বাজিয়ে!

প্রথমটা আমরা হতভম্ব হয়ে গেলুম।

তারপর রোলাঁ বলে উঠলেন, 'ও যে হাতির বৃংহিত!'

বিনয়বাবু বললেন, 'একটা-দুটো নয়, অনেক হাতির চিৎকার!'

—'ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! শুনেছেন তো, এই পাহাড়ের বাঁশবন হচ্ছে হাতিদের চরবার জায়গা—তারা বাঁশপাতা খেতে ভারী ভালোবাসে। আজও তারা এখানে চরতে এসেছিল। হাতিরা সহজেই খেপে যায়, আচমকা একটা পটকার শব্দও তারা সহ্য করতে পারে না। আজ হঠাৎ তাদের নির্জন, নিরুপদ্রব চারণভূমি কামা মুনটুদের বিজাতীয় তর্জন-গর্জনে আর আমাদের বন্দুকগুলোর দুমদাম শব্দে অশান্তিময় হয়ে ওঠাতে তারা একেবারে খেপে গিয়ে দল বেঁধে তেড়ে এসেছে। এখন তাদের সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই!'

গহ্বরের মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল কুণ্ডলিত ধোঁয়ার যবনিকা। দানবদের কোনও সাড়াশব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু গহ্বরের ভিতরে বসে বসেই বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলুম এক বিস্ময়কর ও বিচিত্র বিপুলতার মিছিল! ঊর্ধ্বে প্রহারোদ্যত শুণ্ড তুলে উত্তেজিত মত্ত মাতঙ্গরা ক্রুদ্ধ বৃংহিত ধ্বনি করতে করতে ধেয়ে চলেছে—হাতিরা যে এত বেগে ছুটতে পারে, তাদের নাদুসনুদুস ভারী দেহগুলো দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব!

তারপর মিছিল ফুরুল। সমস্ত গণ্ডগোল থেমেথুমে গেল। বাইরের মেঘ ও কুয়াশার সঙ্গে মিলল দিনান্তকালের ম্লানিমা।

তবু এত শীঘ্র বাইরে বেরুবার ভরসা হল না। কিন্তু কারুর মুখে কথা নেই। সবাই বোধকরি ভাবছে বাঘার কথা।

না ভেবে উপায় কী! বাঘাকে আমরা তো পশুর মতন দেখতুম না, সে ছিল আমাদের পরিবারেরই একজন—আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, সুখ-দুঃখের সাথির মতো।

সেই প্রথম যৌবনে আসামে রূপনাথের গুহায় আমরা যেদিন যকের ধন আনতে গিয়েছিলুম, বাঘারও অ্যাডভেঞ্চার আরম্ভ তখন থেকেই। তারপর সে আমাদের সঙ্গে ভারতে আর ভারতের বাইরে কত না দেশেই (এমনকি পৃথিবীর বাইরেও) কত না জায়গায় গিয়েছে, কতবার মানুষের মতোই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছে, বারে বারে আমাদের কত সাংঘাতিক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, আমাদের বিভিন্ন অভিযানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন সেসব বিচিত্র কাহিনি!

এতদিন পরে সেই বাঘা আমার জীবনরক্ষার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিলে—মৃত্যু তার বীরের মতো! আজ তার শেষ অ্যাডভেঞ্চার!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠলুম—দূর থেকে জলদ গর্জনের মতো ভেসে এল আগ্নেয়াস্ত্রের একটানা গর্জন! একসঙ্গে বহু বন্দুকের বিস্ফোরণ—কোথায় যেন কারা তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে!

আমরা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম, প্রত্যেকেরই চক্ষে একই প্রশ্ন—এ আবার কী?

দ্রুতপদে সকলেই গহ্বরের অন্ধকার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। সেখানেও বেলাশেষে আলোকের অভাব এবং মেঘাস্পদ আকাশে আরও জমে উঠেছে মেঘের ঘটা। ক্ষণে ক্ষণে

বিদ্যুতের জ্বলজ্বলে হিজিবিজির সঙ্গে ঘন ঘন বেজে বেজে উঠছে বজ্রের মেঘমল্লার, এবং বাতাস ক্রমেই হয়ে উঠছে অধিকতর প্রদৃপ্ত ও তুহিনশীতল। ঝড়বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ!

তখনও সমান ভাবে শব্দিত হচ্ছে অজ্ঞাত হস্তে পরিচালিত বন্দুকগুলো—ধ্রুম্ ধ্রুম্ ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম্...

বিনয়বাবু বললেন, 'কারা বন্দুক ছোড়ে? কোথা থেকে ছোড়ে? কেন ছোড়ে?'

গুহামুখের দৃশ্য ভয়াবহ। দানবদের যে মৃতদেহগুলো সেখানে ছিল ভূতলশায়ী, বৃহৎ হস্তীযুথের পদমর্দিত হয়ে সেগুলো এখন পরিণত হয়েছে তালগোল-পাকানো আকারহীন, রক্তভীষণ, বীভৎস মাংসপিণ্ডে! এবং তারই মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে হতভাগ্য বাঘারও দেহাবশেষ! সে দৃশ্য সহ্য করা যায় না।

দুইদিকে পাহাড়ের উচ্চ দেওয়াল। উপত্যকার ভিতরে নেই জনপ্রাণী—পাখিরাও বাসায় ফিরে গিয়েছে।

পাহাড়ে ঢালু গা বেয়ে ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বিমল বললে, 'এসো কুমার, টঙে না চড়লে কিছুই দেখা যাবে না। আর সবাই নীচেই থাক।'

অনেক কষ্টে কোনওমতে প্রায় আশি-নব্বই হাত উপরে যেতেই চোখে জাগল বিদায়ী বেলায় সমতল পৃথিবীর গাঢ়ছায়াচ্ছন্ন প্রায় অদৃশ্য দৃশ্য!

ততক্ষণে থেমে গিয়েছে বন্দুকের শব্দ। কেবল অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার-জ্বালানো একটা ধু ধু অগ্নিকাণ্ডের দাউ দাউ শিখা!

—'কুমার, কুমার, ওইখানেই আমাদের ছাউনি থাকবার কথা!'

—'তবে কি আগুন লেগেছে আমাদের তাঁবুগুলোয়?'

—'আপনি লাগেনি, নিশ্চয় আগুন কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ হচ্ছিল ওইখানেই—নিশ্চয় মউ মউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে!'

—'তোমার কি বিশ্বাস, বিদ্রোহীরা আবার আমাদের সন্ধান পেয়েছে?'

—'তা ছাড়া আর কী? বন্দুক গর্জনের ঘটাটা শুনলে না? দস্তুরমতো যুদ্ধ। দু-পক্ষই লড়েছে। আমাদের দল ভারী নয়, হেরেছে তারাই। তারপর বিদ্রোহীরা লুটপাট করে আমাদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো তারা এখন আমাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

তারপরেই গড় গড়, ঝন ঝন, ঝম ঝম—আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! এতক্ষণ ধরে পঞ্চভূতে মিলে যে একটা কোনও অঘটন ঘটাবার জন্যে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করছিল, সেটা আমরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু এমন দুর্দান্ত দুর্যোগ ছিল আমাদের কল্পনাতীত! পড়ে গেলুম যেন খণ্ডপ্রলয়ের আবর্তে—বজ্রবিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ঝড়, শিলাপাত ও সন্ধ্যান্ধকার একসঙ্গে যোগ দিয়ে পৃথিবীকে করে তুললে অমানুষের নরকধাম! অতবড়ো শিলার আকার আর বৃষ্টির ফোঁটা আগে কখনও দেখিনি এবং ঝড়ের তোড়ে দেহ যেতে চায় উড়ে! চক্ষু প্রায় অন্ধ, সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত!'

শব্দব্রহ্ম আজ উন্মত্ত? প্রকৃতির বিরাট পাগলা গারদে জেগেছে দুর্দম বিদ্রোহ?

—'এখানে থাকলে মারা পড়ব কুমার, পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও।'

—'পালিয়ে যাব কোথায়?'

—'আপাতত গহ্বরে।'

—'তারপর? আমরা যে নিরাশ্রয়?'

—'কে বলে আমরা নিরাশ্রয়? আমাদের আশ্রয় যে বিপুল ধরণী! মনে নেই, বিশ্বকবি বলেছেন—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'?'

অবশেষ

আর বেশি কিছু বলবার নেই।

বিমলের অনুমান সঠিক! আমাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল মউ মউ বিদ্রোহীরা। কুলিরা আগেই পালায়। কিছুক্ষণ লড়াই করে সেপাইরাও পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। আহত কামাথি কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে।

বাঘার মতো রোলাঁরও এই শেষ অ্যাডভেঞ্চার। ফেরবার পথে জঙ্গলে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরে। নাইরোবির হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েও ফল না পেয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। কলকাতায় এসে আমরা খবর পাই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কেবল বাঘা আর রোলাঁ নয়, আমাদেরও এই শেষ অ্যাডভেঞ্চার। বাঘা আমাদের মন ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

রামহরি বার বার বলে, 'বাঘার জন্যে দুঃখ করব না, সে তো বুড়ো হয়েছিল, আর দু-দিন পরে মরতই। বাঘার জন্যে দুঃখ করব না—সে পরের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, এ তো মরণের মতো মরণ! বাঘার জন্যে দুঃখ করব না, কিন্তু বাঘাকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে গো, থাকব কেমন করে?'

রামহরি কাঁদে আর চোখের জল মোছে। তারপর আবার কাঁদে। আমাদেরও চোখের পাতা ভিজে আসে।